দাসাশ্রমের মাসিক পত্র।

সম্পাদক—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ.

চতুর্থ বর্ষ—চতুর্থ ভাগ।

কলিকাতা

২০৮।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস
দ্বারা প্রকাশিত।

মূল্য ২৲ টাকা।

সূচী।

সূচী।

দাসী

আধুনিক সূত্র কাতন।

(Modern cotton spinning)

(৩)

মিশ্রণ (Mixing)।

নানা জাতীয় তুলা একত্র মিশ্রণ করাকে Mixing বলে। ইহাই সূতার কারখানায় প্রথম ও প্রধান কার্য্য; ইহা হস্তদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সস্তায় কাতনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করাই মিশ্রণের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, একই বৃক্ষের একই ফল হইতে এক রকমের তুলা পাওয়া কঠিন; তারগুলি প্রায়ই ছোট বড় হইয়া থাকে। এই সকল তার একত্র না মিশাইলে কাতনকার্য্য কঠিন হইয়া পড়ে এবং একত্র মিশ্রণ ব্যতীত নানা জাতীয় তুলা হইতে সূতা কাটা এক রকম অসম্ভব। এই সকল কারণে মিশ্রণ সূতারকারখানায় একটি প্রধান কার্য্য।

নানা জাতীয় তুলা একত্র মিশাইলে আরো একটি লাভ এই হয় যে, ইহাতে উত্তম জাতীয় তুলার দর কমান হইয়া থাকে ও অধম জাতীয় তুলার উৎকর্ষ সাধন করা হয়। মনে করুন, খাণ্ডোয়া (Khundwa) তুলা হইতে ২০ নম্বরের সূতা অপেক্ষা মিহি সূতা কাটা কঠিন কিন্তু ইহা অপেক্ষা উত্তম হিঙ্গনঘাটের তুলা হইতে ২২ কিম্বা ২৪ নম্বরের সূতা কাটিলে তাহা কিছু মহার্ঘ হইয়া পড়ে; সে জন্য দশ কিম্বা বার গাঁঠ খাণ্ডোয়াতে চারি পাঁচ গাঁঠ হিঙ্গনঘাট মিশাইলে, উক্ত নম্বরের সূতা অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে ও সুচারুরূপে কাটা যাইতে পারে।

চারি পাঁচ জাতীয় তুলা একত্র মিশাইতে হইলে, এক জাতীয় তুলার কতকগুলি গাঁঠ খুলিয়া তাহাদের তুলা হস্তের দ্বারা পাতলা করিয়া মাটিতে বিছাইতে হয়। এক জাতীয় কতক তুলা বিছান হইলে, অপর জাতীয়

কতকগুলি গাঁট খুলিয়া তাহার তুলা পূর্ব্ব তুলার উপরে বিছাইতে হয়; তাহার উপর অন্যান্য জাতীয় তুলা পর্য্যায়ক্রমে বিছাইতে হয়। এইরূপ যে যে তুলা মিশ্রণে দেওয়া হইবে, তাহা দেওয়া হইলে মিশ্রণের এক Layer বা স্তর (চলিত কথায় "থর") প্রস্তুত হয়। এইরূপে এক স্তরের পর আর এক স্তর, তাহার উপর আর এক স্তর করিয়া যত বড় মিশ্রণ করা দরকার, তত বড় করা হয়।

নিম্নলিখিত মিশ্রণের তালিকা হইতে পাঠকবর্গ মিশ্রণ কিরূপে করা হয় তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন—

মাহা	তারিখ	তুলা	টাংরা*	গাঁঠ	স্তর
জুলাই	২০	হিঙ্গনঘাট		১০	২-২-২-২-২
		গাড়ারবারা (Gadarwara)	৩০		৬-৬-৬-৬-৬
		মল্কাপুর		১৫	৩-৩-৩-৩-৩
		খাণ্ডোয়া (Khundwa)		২০	৪-৪-৪-৪-৪

এই মিশ্রণ চারি জাতীয় তুলার, ৫ স্তরে পূর্ণ করিতে হইবে। প্রথমে হিঙ্গনঘাট তুলার দুইটি গাঁট খুলিয়া, উত্তমরূপে তুলার চাঙ্গড় † ভাঙ্গিয়া মিক্সিং ঘরের ফ্লোরেতে পাৎলা করিয়া বিছাইতে হইবে; তাহার উপর গাড়রবারা ৬ টাংরা খুলিয়া পাৎলা করিয়া বিছাইতে হইবে; তাহার উপর মাল্কাপুরের গাঁঠ খুলিয়া চাঙ্গড় ভাঙ্গিয়া পাতলা করিয়া বিছাইতে হইবে; তাহার উপর খাণ্ডোয়ার ৪ গাঁঠ সেইরূপে বিছাইলে এক স্তর মিশ্রণ পুরা হইবে। এই প্রথম স্তরের উপর পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিতীয়, দ্বিতীয়ের উপর

* Unpressed bags of cotton are colloquially known as Tongras in the Western Presidencies.

† তুলা প্রেস করিয়া গাঁট বাঁধিবার সময় তাহা প্রায়ই চাঙ্গড় বা জমাট বাঁধিয়া যায়। সচরাচর হস্ত দ্বারাই চাঙ্গড় ভাঙ্গা হইয়া থাকে। কিন্তু বড় বড় মিলে Bale-breaking machine ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

তৃতীয়, তৃতীয়ের উপর চতুর্থ, চতুর্থের উপর পঞ্চম স্তর করিতে হইবে। এইরূপে পাঁচ স্তর পূর্ণ হইলে মিশ্রণটি সম্পূর্ণ হইবে। মিশ্রণ পূর্ণ হইলে তাঁহার এক পার্শ্ব হইতে (in vertical sections) কাটিয়া কাটিয়া তুলা ব্যবহার করা উচিত, কারণ তাহাতে সকল জাতীয় তুলা সমভাবে আসিবে, উপর হইতে লইলে একই জাতীয় তুলা আসিবে।

অনেক জাতীয় তুলা একত্র মিশ্রণ করিতে হইলে তুলা বাছাই সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত; যতদূর সম্ভব, নানা জাতীয় তুলার তার দীর্ঘতায় এক রকম হওয়া উচিত। ছোট তারের তুলা বড় তারের তুলার সহিত একত্র মিশান হইলে কাতন কার্য্যে তুলার অত্যন্ত অপচয় হয়। কারণ, যে সকল যন্ত্র দীর্ঘ তুলা ব্যবহারের নিমিত্ত সেট (set) করা, তাহাতে ছোট তারের তুলা উত্তমরূপে চলে না, অনেক পড়িয়া যায়; কাজেই তাহার অপচয় ও অপব্যবহার হইয়া থাকে। আর যে সকল যন্ত্র ছোট তারের তুলা ব্যবহারের জন্য সেট করা, তাহাতে দীর্ঘ তারের তুলা চালাইলে উহা রোলারে (roller) জড়াইয়া যায়, কাজেই অনেক তুলা নষ্ট হইয়া থাকে। কাতন কার্য্য উত্তমরূপে চালাইতে হইলে ছোট, বড় ও মাঝারি রকমের তুলা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ব্যবহার করা উচিত। মোটা সূতা কাটিবার জন্য অনেকেই কাচ্রা * (waste) তুলা ব্যবহার করিয়া থাকেন। মিশ্রণের জন্য তুলা বাছাই করিতে যেরূপ সাবধান হওয়া দরকার, সেইরূপ কাচ্রা বাছাই করিবার সময়েও সাবধান হওয়া উচিত।

মিশ্রণ একেবারে যত বড় করা যায়, ততই ভাল। কারণ, মিশ্রণ অনেক দিন ধরিয়া ব্যবহৃত হইলে তাহার গুণাগুণ কাতকগণ উত্তমরূপে বুঝিতে পারে এবং তাহাতে তাহাদের কাজে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। ইহাতে সূতা রঙ্গে ও বলে একই রকম হইয়া থাকে, সে জন্য বাজারে কারখানাধিকারীদের বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ হইয়া থাকে। এই হেতু সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে মিশ্রণ বদল না করিয়া একেবারে তিনমাস কিম্বা ছয় মাসের জন্য মিশ্রণ প্রস্তুত করা উচিত; তাহাতে সূতার সমতাহেতু বাজারে তাহার বিশেষ আদর হইয়া থাকে, এবং গ্রাহকগণ নিঃসন্দেহে তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। সপ্তাহে সপ্তাহে কিম্বা মাসে মাসে মিশ্রণ বদল করিলে সূত্র কাতনে সমতা আদৌ থাকে না; প্রত্যেক মিশ্রণ হইতে প্রস্তুত সূতার রঙ্গে কিম্বা

* যে সকল তুলা ধোনাই ও সাফাই করিবার সময় আবর্জনার সহিত পড়িয়া যায়।

বলে কিম্বা অন্য কোন না কোন বিষয়ে প্রভেদ হইয়া থাকে। তাহাতে গ্রাহকগণের মনে সহজেই সন্দেহ জন্মে, কাজেই তাহারা সেইরূপ মাল ক্রয় করিতে পশ্চাৎপদ হয়। তাহাতে কারখানার অধিস্বামীদিগের লাভের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। ছোট ছোট মিশ্রণ, যতদূর সম্ভব, না করাই ভাল। তবে নেহাত দরকার হইলে করিতেই হয়। কিন্তু যখন বাধ্য হইয়া এরূপ করিতে হইবে, তখন, যতদূর সম্ভব মিশ্রণটি পূর্ব্বকৃত মিশ্রণের ঠিক অনুরূপ হওয়া উচিত। ইহাতে সূতার কতকটা সামঞ্জস্য থাকিবার সম্ভাবনা থাকে।

মিশ্রণের উপর কারখানার লাভালাভ নির্ভর করে বলিয়া এই কার্য্যের ভার উপযুক্তলোকের হাতে রাখা উচিত। কারণ, মিশ্রণে ভুল হইলে, পরে তাহা সংশোধন করা যায় না ; তাহাতে কারখানার অত্যন্ত লোকসান হয়। লোক জন দ্বারা উত্তমরূপে স্তর প্রস্তুত করাইয়া মিশ্রণ করান কিছু শক্ত নহে ; তবে তুলা বাছাই করাই কঠিন। কোন্ কোন্ জাতীয় তুলা একত্র মিশাইলে আবশ্যকীয় প্রকারের সূতা সস্তায় সুন্দররূপে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা জানাই কঠিন। এ বিষয়ে অনেকদিন ধরিয়া মনোযোগ না দিলে ইহা শিক্ষা করা যায় না, আর অনেকে এ বিষয় শিক্ষা করিতেও পারে না। মিল ম্যানেজারদিগের ভিতরে অনেকে এ কার্য্যে সম্পূর্ণ পটু নহেন। বিশেষতঃ যাঁহারা পূর্ব্বে মিকানিক ছিলেন,পরে ম্যানেজার হইয়াছেন তাঁহাদের ভিতর অনেকেরই পক্ষে প্রথম প্রথম এ কার্য্য বোঝা কঠিন। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, কল কারখানা সকলই সুন্দররূপে চলিতেছে, জল, কয়লা, তেল বা পরিশ্রম প্রভৃতির কিছুরই অন্যায় খরচ নাই, অথচ কারখানার লাভ হইতেছে না। সে স্থলে মিশ্রণের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই লোকসানের কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রথম হইতে কার্ডিং কিম্বা স্পিনিং কার্য্যে ঢুকিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে এ বিষয় শিক্ষার অনেকটা সুবিধা থাকে ; আর তাঁহারা চেষ্টা করিলেই সহজে ইহা বুঝিতে পারেন। অপরের পক্ষে এ বিষয়ে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করায় লাভ নাই, কারণ কাজ না করিলে বা না জানিলে এ চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। অনেক স্থলে দেখা যায়, যিনি মিশ্রণ কার্য্যে ক্লার্ক থাকেন তিনি এ কার্য্যের অনেক বোঝেন, বিশেষতঃ অভ্যাস হেতু তিনি কিসে মিশ্রণের দর কম বেশি হইবে তাহা সহজেই বলিতে পারেন। ইহার উপর কতকটা মিশ্রণের দায়িত্ব

থাকে বলিয়া এ কার্য্যে একজন বিচক্ষণ ও বিশ্বাসী লোক রাখা দরকার। ইহার তুলা বাছাই করিবার ক্ষমতা উত্তমরূপে থাকা প্রয়োজন; কোন্ কোন্ প্রকারের তুলা হইতে কি কি প্রকারের সূতা উত্তমরূপে কাটা যাইতে পারে সে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ সকল গুণ যাঁহার নাই, তাঁহাকে মিশ্রণ কার্য্যে রাখিয়া কোন লাভ নাই।

কারখানায় কিরূপ সূতা কাটা হইবে, তাহা স্থির করিয়া তুলা খরিদ করিবার পরে মিলের অধ্যক্ষদের প্রথম কার্য্য, সমস্ত ক্রীত তুলার গুণাগুণ পরীক্ষা করা। এরূপ করিলে মিশ্রণের সময় মন্দ গাঁট সকল ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা কম থাকে এবং পুনরায় তুলা ক্রয় করিবার সময় এই প্রকারের মন্দ গাঁট সকলের মার্কানুরূপ মার্কাযুক্ত গাঁট না ক্রয় করিলেই মন্দ গাঁট ক্রয়ের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। সচরাচর কোন গাঁটের কিম্বা বোরার তুলা পরীক্ষা করিতে হইলে তাহার দুই তিন স্থান হইতে কিছু কিছু তুলা বাহির করিয়া লইয়া পরস্পর কিম্বা নমুনার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। এই সকল তুলার তার টানিয়া তাহার দীর্ঘতা ও অন্যান্য গুণ পরীক্ষা করিয়া তুলাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে হয়। যে সকল তুলা অপক্ক অবস্থায় বৃক্ষ হইতে উৎপাটিত হইয়া থাকে, তাহারা সুপক্ক তুলা হইতে নরম ও ক্ষীণ হয়, আর তাহাদিগের তারের জোড়েনে সমতা আদৌ থাকে না। যে সকল তুলা অতিপক্ক অবস্থায় বৃক্ষ হইতে উৎপাটিত হয় তাহাদের তারগুলি প্রায়ই কোঁকড়ান কোঁকড়ান, এবং অধিক শুষ্কতা হেতু কড়া ও ভঙ্গপ্রবণ হইয়া থাকে; উত্তম তুলার সহিত সহজে মিশ খাইতে চাহে না, আর উত্তম তুলার সহিত মিশিলেও তাহার গুণ অনেক নষ্ট করিয়া থাকে। যে সকল লোক তুলা বাছাই করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের দর্শনশক্তি ও স্পর্শশক্তি (sensitiveness of touch) অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার; তুলা বাছাই কার্য্যে দর্শনশক্তি অপেক্ষা স্পর্শশক্তি অধিক কাজে লাগিয়া থাকে, এ জন্য সতত অভ্যাস দ্বারা এই শক্তির বৃদ্ধি সাধন আবশ্যক। তুলার বাছাই করিতে ভুল হইলে মিশ্রণে নিশ্চয়ই ভুল হইবে এবং তাহাতে কারখানার বিশেষ লোকসান; সে জন্য এই সকল কার্য্যে বিচক্ষণ ও বহুদর্শী লোকের প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের অনেক মিলের অধিস্বামিগণ এই কার্য্যের দায়িত্ব না বুঝিয়া অল্প বেতনের লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন; তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ

লোকসান হইয়া থাকে। এই ঘোর বিজাতীয় প্রতিযোগিতার দিনে ভারতের সমস্ত মিলঅধিকারীর এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

মিশ্রণ পুরা হইলে তাহা একেবারে ব্যবহার না করিয়া কিয়দংশ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। মিশ্রণ পরীক্ষা করিতে হইলে তাহার কিয়দংশ লইয়া প্রথমে ওজন করিতে হয় তাহার পর, তাহা নানাপ্রকার ধোনাই ও সাফাইয়ের কলে চালাইতে হয় এবং তাহাতে কত কাচ্‌রা নির্গমন ও অন্যান্যরূপ লোকসান হয় তাহা নোট্‌ করিতে হয়। তাহার পর তাহাকে কাতন যন্ত্রে চালাইয়া দেখিতে হয়। কিরূপ ফল হয়, তাহাও নোট্‌ করিতে হয়। এই সকল ফল সন্তোষজনক হইলে সমগ্র মিশ্রিত তুলা ব্যবহার করা যাইতে পারে; নচেৎ আবশ্যক মতে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহা পুনরায় পরীক্ষা ও ব্যবহার করা উচিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

সুন্দরীনন্দ চরিত।

তাঁরা এ ভুবনে ধন্য দয়ালুর অগ্রগণ্য
যাঁরা জীব উদ্ধার কারণ
বিশ্বপ্রেমে মগ্ন হিয়া শুভ উপদেশ দিয়া
অনুগ্রহ করেন বর্ষণ॥

ভগবান্‌ বুদ্ধ, কপিলবাস্তু নগরীস্থ বটকাননে অবস্থান করিতেছেন। শাক্যরাজের পুত্র নন্দ, তাঁহার সন্দর্শনের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। নানা কথোপকথনের পর ভগবান্‌ বলিলেন, "বৎস নন্দ! তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।" নন্দ বলিলেন, "ভগবন্‌! প্রব্রজ্যায় পুণ্য লাভ হইলেও উহা আমার অভিমত নহে; আমি সমুদয় পরিব্রাজকের উপাসক হইয়া সর্ব্ববিধ উপকার দ্বারা তাঁহাদের ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্য করিব।" এই কথা বলিয়া রত্নময় মুকুটে ভগবানের চরণ স্পর্শ করতঃ নন্দ প্রিয়তমার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহে গমন করিলেন ও মনোহর উদ্যানে লাবণ্যবতী প্রেয়সীর সহবাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহারা পরস্পরের বিরহ সহিতে পারিতেন না। এক-দিন ভগবান্‌ গুণবানেরপ্রতি প্রীতি-নিবন্ধন ভিক্ষুগণের সহিত স্বয়ং নন্দের ভবনে আগমন করিলেন।

নন্দ ভগবানের আগমনে আহ্লাদিত হইয়া পাদ বন্দনাপূর্ব্বক তাঁহাকে মহামূল্য আসনে উপবেশন করাইলেন এবং পূজা করতঃ বলিলেন, "ভগবন্! এ কোন পুণ্যের পরিণাম; যেহেতু ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া স্বয়ং দর্শন দিলেন। মহাত্মাদের স্মরণ, দর্শন ও উপদেশ শ্রবণ মহাফলজনক। আহা! এই বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মার দেহজ্যোতিঃ সন্দর্শনে কাহার না হৃদয় বিকসিত হয়! মহাত্মাদের দর্শন, দান অপেক্ষা প্রিয়, পুণ্য অপেক্ষা ফলজনক, সদাচার অপেক্ষা প্রশংসনীয়। ভগবান্ নন্দের তদ্রূপ ভক্তি ও প্রণয়ে চারুতর পূজালাভ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করতঃ প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দ স্বর্ণপাত্রে নিজ হৃদয়ের ন্যায় মধুর কতকগুলি উপহার লইয়া ভগবানের পশ্চাৎ গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রিয়তমকে ভগবানের পশ্চাৎ গমন করিতে দেখিয়া, তাঁহার বিরহভয়ভীতা প্রেয়সী পত্নী সুন্দরী তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। সেই সময় গুরুজনের অগ্রে সরল ও তরল দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া ভয়-প্রযুক্ত মুকুলিত নয়নে স্বামীর প্রতি ঈষৎ কটাক্ষপাত করতঃ সেই সুন্দরী যে ক্ষণকালের জন্য মৌনবদনা হইলেন, তাহাতেই "হে নাথ তুমি যেও না" এই কথা অধিকতর রূপে বলা হইয়াছিল। নন্দ, প্রণয়িনীকে চঞ্চলনয়না দেখিয়া, "এই আসিতেছি," বলিলেন। তৎপরে আশ্রমে গিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন, "ভগবন্! তবে গৃহ গমনের জন্য অনুমতি করুন!" কারণ, তখন নন্দ প্রিয়তমার বিরহে অধীর হইয়াছিলেন। "ভগবান্ আসন পরিগ্রহ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক নন্দকে বলিলেন, "বৎস নন্দ! গমনের জন্য এত ত্বরা কেন? হায় বিষয়ের আস্বাদে ও গৃহসুখে যাহারা মোহিত, তাহাদের মন কোন প্রকারেই বৈরাগ্যের প্রতি ধাবিত হয় না। গুণ জীবনের আভরণ, বিবেক গুণের আভরণ, শান্তি বিবেকের আভরণ, বৈরাগ্য শান্তির আভরণ। অতএব বৎস, রাজপুত্র নন্দ! তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রব্রজ্যা পরিগ্রহ কর, এই পার্থিবসম্পদ্ যৌবন বসন্তের ন্যায় কেবল ভোগকালে সুখপ্রদ। আত্মার কল্যাণের জন্য ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ কর, এই অসার গৃহ-সংসার পরিত্যাগ কর।" ভগবানের করুণাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া পত্নী প্রণয়ে অনুরক্ত নন্দ বলিলেন, "ভগবন্ প্রব্রজ্যা অপেক্ষা ভিক্ষুসঙ্ঘের উপ-কারের জন্য গৃহস্থ ধর্ম্মে আমার অধিক প্রীতি।" এই কথা বলিতে বলিতে ভগবানের কথা অতিক্রম করিতে অসমর্থ ও প্রিয়তমার প্রেমে আকৃষ্টচিত্ত

হইয়া নন্দ কিয়ৎকালের নিমিত্ত সংশয়াকুল হইলেন। কিন্তু ভগবান্ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ব্রত গ্রহণের জন্য আদেশ করিতে লাগিলেন। সাধুগণ পরোপকারে উদ্যত হইয়া প্রায়ই যোগ্যতার বিচার করেন না। যখন নন্দ ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে প্রব্রজ্যা গ্রহণে বাঞ্ছা করিলেন না, তখন আপনা হইতেই তাঁহার দেহে প্রব্রজ্যার লক্ষণ লক্ষিত হইল। তখন তিনি গৈরিকবসনপরিধায়ী, কমণ্ডলুহস্ত ও সুবর্ণবৎকান্তিবিশিষ্ট হইয়া মহাপুরুষের লক্ষণে শোভিত হইলেন এবং ভগবানের আদেশে আরণ্য ফলমূলে তাঁহার জীবন যাপিত হইতে লাগিল। নন্দ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেও শশাঙ্ক যে প্রকার নিজদেহে সুস্পষ্ট মৃগলাঞ্ছন ধারণ করেন, তদ্রূপ তিনি প্রিয়তমার কমনীয়ছবি হৃদয়ে বহন করিতে লাগিলেন। মন স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হইলেও অনুরাগ কোন্ পথে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বলিতে পারি না, ক্ষালিত হইলেও উহা হৃদয় পরিত্যাগ করিতে চায় না। বিরহে অক্ষম নন্দ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কাননে বিচরণ করিতেন, ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার প্রেয়সী সুন্দরীকে বিস্মৃত হইতেন না; ভাবিতেন, "হায় ভগবান্ নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়া আমার জন্য এইরূপ যত্ন করিলেন কিন্তু আমার রাগাসক্ত চিত্ত কিছুতেই বিমল ভাব প্রাপ্ত হইতেছে না। সংসারের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম, নিঃসঙ্গব্রত অবলম্বন করিলাম, তথাপি আমার মন সেই হরিণনয়নাকে ভুলিতে পারিতেছে না। হা প্রেয়সি! 'ক্ষণকাল মধ্যেই আমি আসিতেছি' এই কথা বলিয়া আগমন করতঃ তোমার দর্শনে একান্ত অন্তরায় এই কৃতঘ্ন ব্রত অবলম্বন করিলাম! আমার বিরহে সেই প্রিয়তমা সুন্দরী নদীপুলিনস্থিতা বিরহিণী চক্রবাকীর ন্যায় সৌধতলে একাকিনী শয়ন করিয়া শোকোচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। হা প্রিয়ে! আমি সত্যনিষ্ঠা হইতে পরিভ্রষ্ট ও বঞ্চকের ন্যায় তোমার চিত্তহারী হইয়া এই মিথ্যাব্রত অবলম্বন করিয়াছি। আমি ব্রত পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়ার নিকটে যাই। প্রণয়াসক্ত চিত্ত ব্যক্তিদের তপস্যা দুঃসহ সন্তাপ মাত্র। আহা! সেই রাজপুত্রী, আমার প্রিয়তমা সুন্দরী, বহু বিলম্বেও যাইতে না দেখিয়া আমাকে নিষ্ঠুর মনে করতঃ অভিনব বিরহে কি করিবেন জানি না। যে মুহূর্ত্তে ভগবান্ এই বনে থাকিবেন না সেই মুহূর্ত্তেই আমি গৃহে চলিয়া যাইব, ইহাই

নিশ্চয়। এই শিলাতলে গৈরিক ধাতু দ্বারা সেই চন্দ্রমুখীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করি, যদি ইহাদ্বারা কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য লাভ হয়। অথবা সেই প্রিয়তমাকে কি প্রকারে চিত্রিত করিব, সুধাকর ও সরসিজে যাঁহার সৌন্দর্য্যের লেশ মাত্র লক্ষিত হয়?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেই সুন্দরীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার নয়ন হইতে বিগলিত বাষ্পবারিতে অঙ্গুলি ধৌত হইতে লাগিল। তাহার পর প্রিয়ার মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া বিরহযন্ত্রণায় নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরিব্রাজকগণ নন্দের অবস্থাবলোকনে বিরক্ত হইয়া ভগবান্‌কে বলিলেন, "প্রভো! লোকে কুক্কুরের গলদেশে যেমন পুষ্পমালা প্রদান করে, তদ্রূপ আপনি বাৎসল্যপ্রযুক্ত এই দুর্বিনীতকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়াছেন। দেখুন, নন্দ শিলাতলে প্রিয়ার মুখ অঙ্কিত করিয়া তাহাকে কত কি বলিতেছে এবং তাহারই ধ্যানে মগ্ন আছে। ভগবান্ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস নন্দ! একি?"

নন্দ বলিলেন, "ভগবন্! সত্য সত্যই আমার চিত্ত কান্তার প্রতি অনুরক্ত, ভিক্ষুগণের অভিমত এই কাননবাসে আমার মন অভিলাষ করে না। ভগবান্ বুদ্ধ তাহা শুনিয়া তাঁহার মুখের প্রসন্নতাদ্বারা নন্দের সংসারানুরাগ ধৌত করিয়া বলিলেন, "হে সাধো! তোমার সংসারের প্রতি মতি করা যুক্তিযুক্ত নহে, বিঘ্ন কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। কোথায় পবিত্রতম যোগ, আর কোথায় ক্ষণিক সুখপ্রদ নিন্দনীয় বিষয়োপভোগ! দুরতিক্রম্য এই নিকৃষ্ট সুখাভিলাষ মানবের কল্যাণ অপহরণ করে। হায়! প্রেমান্ধ ব্যক্তিদের এই দশাই ঘটিয়া থাকে!" ভগবান্ এইরূপ বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া "এখানে থাক" এই কথা বলিতে বলিতে নিজ কার্য্যে প্রস্থান করিলেন। নন্দ গমনের উত্তম অবসর পাইয়া প্রিয়তমার দর্শন লালসায় প্রফুল্লচিত্তে স্বগৃহে গমন করিলেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেই নগরী দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধ সেই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কি নন্দ! এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাওয়া হইতেছে?" নন্দ বলিলেন, "ভগবন্! আমার বনবাসে ইচ্ছা নাই। অনুরাগাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিদের কোন ক্রিয়াই সফল হয় না। যে প্রকার পঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গ উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালযাপন করে, তদ্রূপ আমি

অনুরাগাসক্তচিত্তে এই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি। আমি প্রব্রজ্যা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। আমার অনন্ত নরক হউক। মঞ্জিষ্ঠার রক্তবর্ণ বসন কদাচ শুভ্রতা লাভ করে না"।

এই কথা বলিয়া গমনে উদ্যত হইলে, ভগবান্ বুদ্ধ নন্দকে নিবারণ করতঃ অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিলেন, "হে নন্দ! বিপর্য্যয় ঘটাইও না, তত্ত্বজ্ঞানে অবহেলা করা বড়ই নিন্দনীয়। যাঁহারা বিবেকদ্বারা বিশদচিত্ত, চরিত্রবান্, জ্ঞানী, তাঁহাদের বুদ্ধি অসার সুখের নিমিত্ত অকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় না। তুমি গৃহজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছ, পুনরায় কেন তাহাতে ধাবিত হইতেছ? সারঙ্গ একবার নির্গত হইলে কি পুনরায় জালে প্রবেশ করে?" এই সকল শ্রবণ পূর্ব্বক নন্দ ভগবানের শাসনে বদ্ধ হইয়া, নিজ প্রিয়তমা পত্নী সুন্দরীকে চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর একদিন নন্দকে আশ্রমের মার্জ্জনায় নিযুক্ত করিয়া ভগবান্ ধ্যান করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। নন্দ ভগবানের আদেশে আশ্রমের মার্জ্জনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্তবৃত্তিস্থ রজঃ অর্থাৎ অনুরাগের ন্যায় সেই ভূতলের রজঃ অর্থাৎ ধূলি দূরীভূত হইল না। তিনি জলাহরণের নিমিত্ত কুম্ভ লইয়া গিয়া অন্যাসক্তিনিবন্ধন শূন্য কলস লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। সেই সকল ঘটনায় নন্দের চিত্ত নিতান্ত বিষণ্ণ হইল, তিনি সুন্দরীর দর্শনের আশায় আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধ দিব্যজ্ঞানপ্রযুক্ত সেই বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, ঝটিতি নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! রমণীর প্রতি অভিলাষ পরিত্যাগ কর, নীলীবর্ণের ন্যায় তোমার চিত্তে কি একপ্রকার অনুরাগ বদ্ধমূল হইয়াছে, যাহা বহু চেষ্টায়ও দূরীভূত হইতেছে না। অসৎ বন্ধুগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়বর্গ, জীবগণকে বিষয়ের আস্বাদ প্রদান করিয়া দুস্তর নরকে পাতিত করে।" এইরূপ নানা উপদেশান্তে ভগবান্ নন্দকে লইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন, সেখানে বনাগ্নিতে দগ্ধা কদাকারা একটী দৃষ্টিহীনা মর্কটী দেখাইয়া বলিলেন, "নন্দ! এই যে কদাকারা মর্কটী দেখিতেছ, এও কোন ব্যক্তির প্রিয়দর্শনা যোগ্যপাত্রী, ইহার প্রতিও কাহারও অনুরাগ হয়। বস্তুতঃ পদার্থের কোন সৌন্দর্য্য কিংবা অসৌন্দর্য্য নাই, হৃদয়ের অনুরাগই বস্তুর রমণীয়তা অবলোকন করে। যে যাহার প্রিয়, সেই তাহার পক্ষে রমণীয়। বৎস নন্দ! তুমি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সত্য

করিয়া বল দেখি, সেই তোমার পত্নী সুন্দরীর সহিত এই মর্কটীর লাবণ্যের কি পার্থক্য? আমরা প্রার্থী নহি, সুতরাং আমাদের নিকট সৌন্দর্য্যের কি প্রভেদ হইবে? প্রার্থী ব্যক্তিই প্রার্থিত বস্তুর চারুতা অনুভব করিতে পারে। আমি সেই সুন্দরী ও এই মর্কটীতে কোনই বিশেষ দেখিতেছি না; মাংস, চর্ম্ম ও অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত এই যন্ত্রে সময়ের গুণে রমণীয়তা বোধ হয়।"

ভগবান্ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে নন্দ বলিলেন, "ভগবন্! আপনার এই প্রশ্ন অত্যন্ত অনুচিত। ভগবান্ কি বলেন, 'যাঁহারা বিশ্বগুরু তাঁহাদের আর কে উপদেশ দিবে'? অধিকসুন্দরীর প্রতি ঔৎকর্ষপ্রযুক্ত অধিক প্রণয় হইয়া থাকে। আমার সেই প্রেয়সী সুন্দরীর সহিত কাহারও তুলনা হয় না, জ্যোৎস্নার সহিতও আমার প্রিয়ার কান্তির উপমা হয় না, হংস ও হরিণ যথাক্রমে তাঁহার বিলাসগতি ও নয়নশোভা অপহরণ করিয়া ভয়-প্রযুক্ত কানন আশ্রয় করিয়াছে।" ভগবান্ রাগাসক্তচিত্ত নন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্যপ্রভাব নিবন্ধন তাঁহাকে সুরলোকে লইয়া গেলেন এবং সেখানে দেবরাজের নন্দনকাননে সমুদ্র মন্থন কালে সমুত্থিতা অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী দিব্যাঙ্গনা সকল দেখাইলেন। সেই সুরসুন্দরীগণের অরুণবৎ কান্তি, লোহিত পদ্মের ন্যায় চরণতল, অঙ্গুলি সকল পারিজাত পল্লবের ন্যায় মনোহর। পূর্ণযৌবনা অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী সেই সুরললনাগণকে সহসা নিরীক্ষণ করিয়া নন্দ স্তম্ভিত হইলেন।

ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন, "বৎস নন্দ! এই দেবাঙ্গনারা দেখিতে কেমন? ইহাদের সহিত তোমার পত্নী সুন্দরীর কোন রূপের পার্থক্য আছে কি? তোমার সুন্দরী অপেক্ষা ইহারা যদি অধিক সুন্দরী হয়, তুমি অনন্যচিত্তে প্রসন্ন মনে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান কর, এই অপ্সরা সকল তোমাকে প্রদান করিব।" ভগবানের এই বাক্যে নন্দ নিশ্চিন্তচিত্তে ব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন। সেই স্বর্গীয় ললনাগণের সমাগম প্রত্যাশায় নিজ বনিতা সুন্দরীর প্রতি নন্দের অনুরাগ বিলয়প্রাপ্ত হইল। কেন হইবে না? বাহিরের সৌন্দর্য্য লইয়া যাহাদের ক্রয় বিক্রয়, তাহাদের ভালবাসার স্থায়িত্ব কোথা হইতে হইবে? হায়! প্রবাসে বিস্মৃতি ও অন্যের সহবাস নিবন্ধন পুরুষগণের অভ্যাসগত ভালবাসা হঠাৎ লীন হয়। শরীরীদিগের যৌবনের রমণীয়তা ক্ষণিক, তজ্জন্য প্রণয়ও ক্ষণিক, ইহা সত্য কিংবা নিত্য অথবা সুখকর হইতে পারে না।

তাহার পর ভগবান্ নন্দকে আশ্রমে লইয়া গেলেন, নন্দ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদা নন্দ ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে কুম্ভীনামক এক ঘোর নরক দেখিতে পাইলেন, সেখানে পাপিগণকে প্রতপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিমজ্জিত করিয়া যাতনা প্রদান করিতেছে। নন্দ পাতকীদিগের দারুণ যন্ত্রণা দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নরকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তত্রত্য লোকেরা বলিল, "কামাসক্তচিত্ত নন্দের জন্য এই নরক সৃষ্ট হইয়াছে। অদ্যাপি তাহার হৃদয়হইতে বাসনা বিদূরিত হয় নাই। সে স্বর্গাঙ্গনাদের কামনায় মিথ্যা ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিতেছে। যাহারা কপট ব্রত আচরণ করে এবং লোভী, রাগদ্বেষহিংসায় যাহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ, তাহাদের অনন্ত কালের জন্য এই কুম্ভীনামক নরকে বাস হয়।" নন্দ ইহা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল, কুম্ভী নামক নরকে পতিত হইয়া যেন তিনি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তিনি অনেকক্ষণ পশ্চাত্তাপ অনুভব করিলেন, তাঁহার সমস্ত বাসনা দূরীভূত হইল, তাহার পর একান্ত মনে ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। মোহ এবং সংশয়বিমুক্ত হইয়া তাঁহার চিত্ত শরৎ-কালের সাগরবারির ন্যায় বিমল ভাব ধারণ করিল। তখন নন্দ কামনাশূন্য ও পবিত্র চিত্ত হইয়া পরম শান্তিলাভ করিলেন এবং ভগবান্ জিনদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রভো! আমার অপ্সরাগণে প্রয়োজন নাই, সুন্দরীকেও আর আমি চাহি না। ইহারা আপাত রমণীয়, পরিণামে অতি বিরস। যখন এই সকল বস্তু ভাবনা করা যায় তখনই হৃদয়বৃত্তি কলুষিত হয়, ঐ সকল মন হইতে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই হৃদয়ের ভার যায়, হৃদয় প্রসন্ন হয়।" নন্দের এই সকল কথা শ্রবণে ভগবান্ বুদ্ধদেব ভাবিলেন, নন্দ যথার্থই নির্ব্বাণোচিত সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

অনন্তর পরিব্রাজকগণ ভগবান্ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! নন্দ কোন্ কুশল কর্ম্মের জন্য এইরূপ সিদ্ধিলাভ করিলেন, আমাদিগকে বলুন।" ভগবান্ বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ! নন্দ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহারই পরিণামে এই সিদ্ধিলাভ হইল। পবিত্র বংশে জন্ম, সুন্দর দেহ, প্রণয়িনী ভার্য্যা, সুখপ্রদ সম্পৎ, সাধুগণের প্রিয়ব্যবহার, অবশেষে শান্তি সলিলে স্নান ও নির্ব্বাণ,—এ সকল কুশল কর্ম্মরূপ কুসুমের সৌরভ।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঋগ্বেদের সময়ে আর্য্যেরা এমন অজ্ঞান ছিলেন না যে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও মেঘ প্রভৃতি বস্তুকে তাঁহারা এক একটা প্রকাণ্ড জীব বলিয়া মনে করিবেন। তথাপি তাঁহাদের চিত্তে অহং ও ইদংএর স্বরূপ জ্ঞান তখনও সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় নাই; এজন্য তাঁহারা এই সকল প্রাকৃতিক বস্তুকে আপনাদেরই ন্যায় শক্তিমন্ত—শক্তির আধার বলিয়া মনে করিতেন।

ঋগ্বেদের সময়ে আর্য্যদের চিত্তে অহং ও ইদংএর স্বরূপ জ্ঞান সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হয় নাই।

প্রথমে তাঁহারা বিশেষ বিশেষ অগ্নিতে, বিশেষ বিশেষ মেঘে, বিশেষ বিশেষ বাত্যায় শক্তির প্রকাশ দেখিতেন। আকাশকেও এক অখণ্ড বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। কালক্রমে তাঁহারা বহুত্ব ছাড়িয়া একত্বে পহুঁছিতে লাগিলেন। ভূলোক ও দ্যুলোকে যত অগ্নি আছে, সকলেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন এক অগ্নি। যত মেঘ, বিদ্যুৎ ও বজ্র আছে, সকলেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন এক ইন্দ্র; এবং এক অখণ্ড সর্ব্বাধার আকাশদেবতা হইলেন বরুণ।

প্রথমে বিশেষ বিশেষ বস্তুতে এবং পরে এক এক জাতীয় বস্তুতে শক্তির প্রকাশ দর্শন

এইরূপে যেমন এক এক জাতীয় বস্তুতে এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইলেন, তেমনি অন্য দিকে দেবতাগণের ক্ষমতা ও অধিকার (function) নির্দ্দিষ্ট হইতে লাগিল। বজ্রধারী, মহাপরাক্রমশালী ইন্দ্র জাতীয় সেনানায়ক হইয়া উঠিলেন। ঋষি বলিতেছেন—"হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধের নেতা, তুমি মরুৎগণের সহিত প্রধান প্রধান যুদ্ধে স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক শত্রু সংহারে সমর্থ। তুমি শূরগণের সহিত স্বয়ং (সংগ্রামসুখ) অনুভব কর।" "হে উগ্র ইন্দ্র! তোমার ভক্ত যজমানের বিরুদ্ধকারীকে উগ্ররক্ষণ-কার্য্যরূপ তেজোময় উপায় সমূহ দ্বারা অবনত করিয়া দাও। তুমি পূর্ব্বকালে যেরূপ (আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলে) আমাদিগকেও সেইরূপ লইয়া যাও।" অগ্নি পাবক। তৃণকাষ্ঠাদির ন্যায় তিনি

দেবতাগণের ক্ষমতা ও অধিকার নির্দ্দেশ—ইন্দ্র জাতীয় সেনানায়ক

অপরাধ ও পাপ সকলকেও দগ্ধ করেন। সুতরাং তিনি দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে মধ্যবর্ত্তীর স্থান অধিকার করিলেন। যজ্ঞস্থলে দেবোদ্দেশে অন্ন, ঘৃত, ব্রীহি ও যবাদি যাহা কিছু উৎসর্গিত হয়, অগ্নি সে সমস্তকে দেবগণের সমক্ষে লইয়া যান। আবার দেবগণকেও তিনি প্রসন্ন করিয়া যজ্ঞস্থলে লইয়া আসেন। পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের পূজাতেও অগ্নিদেবতা মধ্যবর্ত্তী। আবার অগ্নিদেবতাকে সাক্ষী করিয়া বিবাহাদি সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন করিতে হয়; সুতরাং পারিবারিক ও সামাজিক সমস্ত সম্বন্ধের পবিত্রতা বিধানও করেন অগ্নি। বৈদিক ঋষি বলিতেছেন—"অগ্নিকামনাকারী ঋত্বিকগণ মনুষ্য সমাজে অগ্নিকে প্রবর্ত্তিত করিয়া, মনুষ্যদিগের পবিত্র হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন; সে অগ্নি এক্ষণে সোম পানে মত্ত হয়েন, হোতা হয়েন, যজ্ঞ গ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানের পথ দেখাইয়া দেন, সর্ব্বত্র বিচরণ করেন এবং হোমের দ্রব্য দেবতাদের নিকট বহন করেন।" "যে সকল সাধুশীল পিতৃলোক দেবতাদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া হোমের দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করেন এবং ইন্দ্রের সহিত এক রথে আরোহণ করেন, হে অগ্নি! সেই সমস্ত দেবারাধনাকারী যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী প্রাচীন ও আধুনিক পিতৃলোকদিগের সহিত এস।" আকাশ অতি শুভ্র ও নির্ম্মল, প্রশান্ত ও বিশাল। আকাশ সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বসাক্ষী, সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল। এজন্য আকাশ-দেবতা বরুণ সমস্ত নৈতিক গুণের, সমস্ত পুণ্যের আধার বলিয়া কল্পিত হইলেন; এবং ঋত অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষক বলিয়া আর্য্যসমাজে পূজিত হইতে লাগিলেন। ঋগ্বেদ-সংহিতায় বরুণের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিশেষণ গুলির প্রয়োগ দেখা যায়:—সর্ব্বদ্রষ্টা, শুদ্ধবল, সুকর্ম্মা, সত্যবান্, সত্যদর্শী, হিংসাবর্জ্জিত, ক্রোধবিহীন, দানশীল, সদাশয় ইত্যাদি। বরুণ সর্ব্বদ্রষ্টা,—তিনি পাপ পুণ্য সমস্ত দেখিতে পান; কিন্তু তিনি পাপীর প্রতিও কৃপাপরবশ। অনেক ঋকে এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—"অপরাধ করিলেও যে বরুণ দয়া করেন।" হৃদয়ে পাপের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হইলে, আর্য্যগণ বরুণের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেন—"হে বরুণ, আমরা মনুষ্য; দেবগণের সম্বন্ধে আমরা যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ

অগ্নি দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী এবং সমস্ত পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধের পবিত্রতা বিধায়ক

বরুণ শুদ্ধচেতা, পাপ পুণ্যের সাক্ষী এবং পরিত্রাতা

করিয়াছি, সেই সকল পাপ প্রযুক্ত আমাদিগকে হিংসা করিও না।" "হে বরুণ! যদি আমরা কখনও কোন দাতা, মিত্র, বয়স্য, ভ্রাতা, নিকট প্রতিবেশী বা মূকের প্রতি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা নষ্ট কর।" "হে বরুণ দ্যুত-ক্রীড়ায় প্রবঞ্চনাকারী পাশক্রীড়কের ন্যায় যদি আমরা জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানবশতঃ (অপরাধকরি); তাহা হইলে তুমি শিথিল (বন্ধনের) ন্যায় তৎসমুদায় হইতে মুক্ত কর।"

বরুণের ন্যায় শুদ্ধচেতা দেবতা কল্পনা কিরূপে সম্ভব হইল

কিন্তু কেবল মাত্র অন্ধ জড়শক্তির সংস্রবে আসিয়াই কি আর্য্যেরা বরুণের ন্যায় শুদ্ধচেতা পুণ্যবান্ এক দেবতা কল্পনা করিতে সমর্থ হইলেন? এরূপ মনে করিলে মোক্ষমুলরের ন্যায় আমরাও বিষম ভ্রমে পতিত হইব। সর্ব্বদাই আমাদিগকে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতি পূজার মধ্যে আমরা আর্য্যদের জীবনের একটী মাত্র দিক দেখিতে পাই। উহার অন্তরালে তাঁহাদের আর একটী বৃহত্তর ও মহত্তর জীবন আছে। এখানে আর্য্যদের সেই সামাজিক জীবন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা ধর্ম্ম ও সমাজ বন্ধনের দিকে আর্য্যদের অধিক দৃষ্টি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আর্য্যজাতি শান্তিপ্রিয়। সত্য বটে, অনার্য্যদের সহিত তাঁহাদিগকে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল; তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে,আর্য্যেরা সমরপ্রিয় জাতি (military nation) ছিলেন না। ধর্ম্ম ও সমাজ বন্ধনের দিকেই তাঁহাদের অধিক দৃষ্টি ও মনোযোগ ছিল।

এজন্যই ঋগ্বেদে ঋত অর্থাৎ সমাজধর্ম্মরক্ষক পিতৃপুরুষগণের প্রেতাত্মার পূজা, বীরপুরুষগণের প্রেতাত্মার পূজা নহে

এজন্যই আমরা ঋগ্বেদে বীরপুরুষগণের প্রেতাত্মাপূজার কোনও নিদর্শন পাই না। যে সকল পিতৃপুরুষ ঋগ্বেদে পূজিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যজ্ঞরক্ষক—ঋত অর্থাৎ সমাজধর্ম্মরক্ষক। এই সকল শুদ্ধচেতা, সৎকর্ম্মনিরত পুরুষগণ আর্য্যসমাজে প্রাদুর্ভূত হইয়া শুদ্ধ চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন এবং আর্য্যসমাজে ঋত অর্থাৎ ধর্ম্মনিয়মাদি সংস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই, যেমন একদিকে সাধুশীল পিতৃপুরুষগণের প্রেতাত্মার পূজা আরম্ভ হইল; তেমনি অন্যদিকে শুদ্ধবল, সুকর্ম্মা, ধর্ম্মরক্ষক এক বরুণ দেবতা কল্পনা করা সম্ভব হইয়া উঠিল।

আর্য্যসমাজে শুদ্ধচেতা ঋষিগণের আবির্ভাব এবং শুদ্ধচেতা বরুণ দেবতা কল্পনা।

অগ্নির স্তব করিতে করিতে ঋষি পিতৃপুরুষগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন—"হে অগ্নি! যে

সকল পিতৃলোক হোম করিতে জানিতেন এবং বিবিধ ঋক্ রচনা পূর্ব্বক স্তব প্রস্তুত করিতেন, সুতরাং যাঁহারা নিজ সৎকর্ম্ম প্রভাবে এক্ষণে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; যদি তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে লইয়া (যজ্ঞ স্থলে) আমাদের নিকট এস,......তাঁহাদিগের জন্য এই সকল উৎকৃষ্ট কব্য অর্থাৎ দ্রব্য রহিয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম অর্থাৎ শেষ মণ্ডলে আসিয়া আমরা এই পিতৃলোক-পূজা দেখিতে পাই। এই পূজা কালক্রমে বর্দ্ধিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কল্পান্তর্গত গৃহ্যসূত্রে বিবাহাদি দশ সংস্কার সম্বন্ধীয় নান্দী শ্রাদ্ধে পরিণত হয়। পিতৃপুরুষগণ গার্হস্থ্য ও সমাজধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা—সমস্ত কল্যাণকর বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তক ও রক্ষক; এ জন্যই আর্য্যগণ পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের অর্চ্চনা করিয়া,—তাঁহাদের উদ্দেশে অন্নযবাদি উৎসর্গ করিয়া, এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, বিবাহাদি প্রত্যেক গার্হস্থ্য ও সামাজিক অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতেন। এইরূপে অগ্নি, বরুণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় পিতৃপুরুষগণেরও ক্ষমতা ও অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইল।

পিতৃপুরুষ পূজার শেষ পরিণাম বিবাহাদি দশ সংস্কার সম্বন্ধীয় নান্দীশ্রাদ্ধ

কিন্তু অন্যদিকে দেবতাদের মধ্যে কে প্রধান, আর্য্যগণের মনে এই এক প্রশ্ন উদিত হইল। এ সময় ভিন্ন ভিন্ন দেবোপাসকগণের মধ্যে কিছু কিছু বৈরিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ও লক্ষিত হয়। দেবোপাসকেরা একে অন্যকে আক্রমণ করিতেছেন—পরস্পরের নিন্দা করিতেছেন। কোন উপাসক অগ্নিকে, কেহ বা ইন্দ্র অথবা বরুণকে, অন্য কেহ বা অন্য কোন দেবতাকে দেবতাগণের সম্রাট্, প্রজাপতি অর্থাৎ সৃষ্টির সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া অর্চ্চনা করিতেছেন। যখন যে দেবতার পূজা হইতেছে, তখনই তিনি সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া কল্পিত ও স্তুত হইতেছেন। এইরূপ অবস্থাকেই মোক্ষমূলর Henotheism নাম দিয়াছেন। আর্য্যেরা তখনও Theism অর্থাৎ একেশ্বরবাদে পঁহুছান নাই। কালক্রমে আর্য্য ঋষিগণের চিত্তে বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উদয় হইল। ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"সেই বনই বা কি? সেই বৃক্ষই বা কি? যাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ পূর্ব্বক এই দ্যুলোক ও ভূলোক নির্ম্মাণ করা হইয়াছে?"

দেবোপাসকগণের মধ্যে পরস্পর বৈরিতা এবং এক এক সময় এক এক দেবতার প্রাধান্য কীর্ত্তন

এই অবস্থা Henotheism, Theism নহে

আর্য্যগণের চিত্তে বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উদয়

বিদ্বান্‌গণ, তোমরা একবার আপন মনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন।” অনেক চিন্তা ও অনুসন্ধানের পর আর্য্য ঋষিরা এই প্রশ্নের এইরূপ মীমাংসা করিলেন—“দ্যুলোক ও ভূলোক, ইহারাই শেষ নহেন, ইঁহাদের উপর আরও একজন আছেন। তিনি প্রজা সৃষ্টি করেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভু। যে কালে সূর্য্যের ঘোটকগণ সূর্য্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সময় তিনি আপনার পবিত্র চর্ম্ম (শরীর) প্রস্তুত করিয়াছিলেন।” “সেই এক প্রভু, তাঁহার সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ।” “বিশ্বকর্ম্মা যিনি তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নির্ম্মাণ করেন, ধারণ করেন, সপ্তর্ষির পরবর্ত্তী যে স্থান তথায় তিনি একাকী আছেন, বিদ্বান্‌গণ এইরূপ কহেন।” “যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়।”

সৃষ্টিকর্ত্তৃভাবের প্রথম স্ফূর্ত্তি

ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম অর্থাৎ শেষ মণ্ডল হইতে উপরের কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের শেষভাগে ঋষিরা, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, ও পরমাত্মা নামে এক মহান্ সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সকল মন্ত্রে সৃষ্টিকর্ত্তার ভাব আরও প্রশস্ত ও উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এখানে আসিয়াই ঋষিরা বিরত হন নাই। জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঋষিরা ঈশ্বরজ্ঞানের মধ্য দিয়া ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণভাগে প্রবেশ করিয়াই, ইহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে তৎ, স প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ঋষিরা এক সর্ব্বব্যাপী অনির্দ্দেশ্য মহাসত্তাকে লক্ষ্য করিতেছেন। সেই মহান্‌কে তাঁহারা চিত্তে ধারণ করিতে অক্ষম,—বাক্যে ব্যক্ত করিতেও অক্ষম। এজন্য ঋষিরা নানাবিধ রূপক ও উপমা অবলম্বন করিয়া, সেই অনির্দ্দেশ্য মহান্‌কে চিন্তায় আয়ত্ত ও বাক্যে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন; এবং

সৃষ্টিকর্ত্তৃভাবের চরমোৎকর্ষ

ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম স্ফূর্ত্তি

তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টার ফলস্বরূপ অবশেষে তাঁহারা বহির্জ্জগতে এক অদ্বিতীয় মহাশক্তির প্রকাশ দেখিতে পাইলেন। এই এক সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় মহাশক্তিই ব্রহ্ম। বহির্জ্জগদ্‌ব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ এই ব্রহ্মই ব্রাহ্মণ-ভাগে বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ—বহির্জ্জগদ্‌ব্যাপিনী এক অদ্বিতীয় মহাশক্তি

আর্য্যেরা যখন এই ব্রহ্মতত্ত্বে পহুঁছিলেন তখন ঈশ্বরতত্ত্বও তাহার অন্তর্ভূত হইয়া গেল। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর এখন আর সৃষ্টির প্রভু নহেন, তিনি নিজেই সেই পরব্রহ্মের অধীন—সেই পরব্রহ্মের শক্তিমাত্র। সৃষ্টিকর্ত্তা অর্থাৎ পরব্রহ্মের সৃষ্টি-শক্তি এখন ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইলেন।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ—ঈশ্বর ব্রহ্মের শক্তি—ব্রহ্মের অধীন

ঈশ্বর—ব্রহ্মা

প্রত্যেক মন্বন্তরে ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি অর্থাৎ সেই মন্বন্তরের আদি পুরুষ উদ্ভূত হন। সেই আদি পুরুষ প্রজাপতিই সৃষ্টি রচনা করেন এবং সেই মন্বন্তরের সমস্ত বেদ বিধি প্রকাশ করিয়া প্রজা অর্থাৎ জীবের কল্যাণ সাধন করেন। এই আদি পুরুষ প্রজাপতির মধ্যেই আমরা পরবর্ত্তী অবতারবাদের বীজ দেখিতে পাই।

প্রত্যেক মন্বন্তরে ব্রহ্মা হইতে আদি পুরুষ প্রজাপতির উৎপত্তি। প্রজাপতি সৃষ্টির রচয়িতা ও বেদ বিধির প্রকাশক

আর্য্যেরা যখন ঈশ্বরতত্ত্ব ছাড়িয়া ব্রহ্মতত্ত্বে উঠিলেন, তখন তাঁহাদের চিত্তে এক ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। এ দ্বন্দ্ব ব্রহ্মতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্বের মধ্যে। আর্য্যদের তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, কিন্তু তাঁহা-দের উপাসনা এখনও সেই যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পড়িয়া রহিল। তত্ত্বকাণ্ড ও সাধনকাণ্ডের মধ্যে এরূপ বৈষম্য উপস্থিত হইলে মানবচিত্ত কখনও স্থির থাকিতে পারে না। আর্য্যদের মনেও এ সময় নানা তর্ক, বিতর্ক ও সন্দেহের উদয় হইল। কোন্ মন্ত্রের কি শক্তি, কোন্ যজ্ঞের কি উদ্দেশ্য, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন চিন্তাশীল ঋষিদের চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল। মন্ত্র ও যজ্ঞাদির রূপক ও কাল্পনিক অনেক প্রকার অর্থ করা হইল। কিন্তু কিছুতেই চিত্তের সন্দেহ ঘুচিল না। অবশেষে আরণ্যক অর্থাৎ অরণ্যবাসী কতিপয় ঋষি উপা-

তত্ত্বকাণ্ড ও সাধনকাণ্ডের মধ্যে বিরোধ—নানা তর্ক, বিতর্ক ও সন্দেহের উৎপত্তি

মন্ত্রাদির রূপক ও কাল্পনিক ব্যাখ্যা

সনাতত্ত্বের এক নূতন ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,' "বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের চিন্তনই উপাসনা।" এইরূপে আরণ্যক ঋষিরা ব্রহ্মবিষয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অন্তর্মুখি হইল। পূর্ব্বে তাঁহারা বাহ্য প্রকৃতিতে পরব্রহ্মের প্রকাশ দেখিতেছিলেন ; কিন্তু এখন তাঁহারা অন্তরের হিরণ্ময় কোষে এক অদ্বিতীয় চিদ্রূপি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তাঁহার সত্তায় ডুবিয়া গেলেন। প্রতিক্রিয়া প্রভাবে তাঁহারা বাহির হইতে একেবারে অন্তরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং সকল বিষয়েই তাঁহারা বহির্বিমুখ হইয়া দাঁড়াইলেন। এই আরণ্যক ঋষিরাই আদি উপনিষদের নির্গুণব্রহ্মবাদের প্রবর্ত্তক।

আরণ্যক ঋষিগণ কর্তৃক উপাসনাতত্ত্বের নূতন ব্যাখ্যা

আরণ্যক ঋষিগণের অন্তরাত্মায় চিন্ময় পরব্রহ্মের প্রকাশ—প্রতিক্রিয়া প্রভাবে আরণ্যক ঋষিরা সর্ব্ববিষয়ে বহির্বিমুখ

বেদের ব্রাহ্মণভাগের ব্রহ্ম এক মহাশক্তি। অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ভূলোক ও দ্যুলোক সর্ব্বত্রই তিনি ব্যাপ্ত আছেন। তিনি ইহাতে আছেন, উহাতে আছেন, ব্রহ্মের এই মাত্র লক্ষণা করিলে প্রকৃতির অগণ্য বস্তুর মধ্যে ব্রহ্মের লুপ্ত হইয়া যাওয়ার অত্যন্ত সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণযুগে ব্রহ্মজ্ঞান এইরূপে লুপ্ত ও বিনষ্ট হওয়ার খুব আশঙ্কা ছিল। যাগযজ্ঞাদি জটিল কর্ম্মকাণ্ডজাল এবং উহাদের রূপক ও কাল্পনিক ব্যাখ্যারাশি মনুষ্যবুদ্ধিকে বিকৃত এবং ব্রহ্মজ্ঞানকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য তটস্থ লক্ষণ ছাড়িয়া ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণকে জাগ্রত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্রাহ্মণযুগে ব্রহ্মজ্ঞান লোপের আশঙ্কা এবং ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের উপর জোর দেওয়ার আবশ্যকতা

স্বরূপলক্ষণের উপর জোর দিতে গিয়াই ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি আদি উপনিষৎকর্ত্তারা নির্গুণ ব্রহ্মবাদী* হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা বলিলেন, ব্রহ্ম বাহিরের সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্,—ইন্দ্র বরুণাদি দেবতা হইতে পৃথক্, "নেদং যদিদমুপাসতে", দেহ হইতে পৃথক্,

স্বরূপ লক্ষণের উপর জোর দিতে গিয়াই আদি উপনিষদকর্ত্তারা নির্গুণব্রহ্মবাদী

---

* আদি উপনিষদ্ সমূহে সগুণভাবাত্মক শ্লোক এবং পরবর্ত্তী উপনিষদ্ সমূহে নির্গুণ ভাবাত্মক শ্লোক থাকিলেও আদি উপনিষদ্ সমূহে নির্গুণ ভাবের এবং পরবর্ত্তী উপনিষদ সমূহে সগুণ ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্, মন হইতেও পৃথক্। তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধ, অনাদি ও অনন্ত। তিনি সর্ব্বাতীত, পরাৎপর, নিত্য, চিন্ময় পুরুষ। বাহিরে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ধ্যানযোগে অন্তরাত্মার হিরণ্ময় কোষেই কেবল তিনি প্রকাশিত হন। অন্তর্মুখ হইয়া অন্তরের অন্তরতম স্থানে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই অমরত্ব লাভ করেন। কিন্তু যাহারা বহির্মুখ—যাহারা কর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহারা অন্ধকার ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আদি উপনিষৎকর্ত্তারা বেদের বাহ্য ব্রহ্ম ও বাহ্য কর্ম্ম উভয়েরই ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিও তাঁহাদের তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে একেবারে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করাই তাঁহারা প্রশস্ত মনে করিতেন।

আদি উপনিষদ্‌কর্ত্তারা বেদের বাহ্য ব্রহ্ম ও বাহ্য কর্ম্ম উভয়েরই বিরোধী

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও তাহার কাল্পনিক ব্যাখ্যাদির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া আরণ্যক ঋষিদের ন্যায় চার্ব্বাকগণও তাহার প্রতিবাদ করেন। চার্ব্বাকগণের অন্য নাম লোকায়ত। লোকায়ত, অর্থাৎ যে মত পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত, কিম্বা লোক অর্থাৎ ইহলোক লইয়াই যে মত। তবেই চার্ব্বাকগণ প্রত্যক্ষবাদী (Positivist)। আধুনিক প্রত্যক্ষবাদীদের ন্যায় চার্ব্বাকগণও একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন; অনুমান ও শাব্দ প্রমাণ স্বীকার করেন না। চার্ব্বাকেরা বলেন, আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি স্বভাব ও স্বভাবের কার্য্য। সুতরাং ব্রহ্মনামে অপর কোনও শক্তি নাই। দেহাতিরিক্ত আত্মাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, সুতরাং আত্মাও নাই। চৈতন্য পঞ্চভূতাত্মক দেহের একটী ধর্ম্ম (function) মাত্র। দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং আত্মার পরকাল ও জন্মান্তরপ্রাপ্তি নাই। চার্ব্বাকেরা বেদ অর্থাৎ আপ্তবাক্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, বেদবাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখিতেছি। বেদে পুনরুক্তি ও মিথ্যাকথন দোষও লক্ষিত হয়। সুতরাং বেদ অপ্রমাণ্য। কতকগুলি প্রতারক, ধূর্ত্ত ও ভণ্ড অর্থ লাভের লালসায়, স্বর্গ নরকাদির ভয়

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডাদি হইতে প্রতিক্রিয়া—চার্ব্বাকদর্শন

চার্ব্বাকগণ প্রত্যক্ষবাদী সুতরাং চার্ব্বাকমতে স্বভাবাতিরিক্ত ব্রহ্ম এবং দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই

চার্ব্বাকমতে বেদ স্ববিরোধিতাদি দোষে দূষিত ও অপ্রামাণ্য। অর্থলোভী প্রতারকগণের দ্বারা যাগযজ্ঞাদি প্রবর্ত্তিত

দেখাইয়া লোকদিগকে যাগযজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া উত্তরকালীন লোকেরা ঐ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতে ঐ প্রথা বহুকাল হইতে জনসমাজে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ স্বর্গসুখ ও নরকদণ্ড উভয়ই মিথ্যা। আত্যন্তিক ঐহিক সুখই প্রত্যক্ষ স্বর্গ, দুঃখই প্রত্যক্ষ নরক এবং প্রত্যক্ষ রাজদণ্ডই একমাত্র দণ্ড। পারলৌকিক সুখের আশায় ধর্ম্মসাধন দ্বারা আত্মাকে ক্লেশ দেওয়া মূর্খতার কার্য্য।

সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম প্রথামূলক

স্বর্গ, নরক মিথ্যা—আত্যন্তিক ঐহিক সুখই স্বর্গ, দুঃখই নরক এবং রাজদণ্ডই একমাত্র দণ্ড

ঐহিক সুখভোগই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু সুখের অনুষঙ্গি অবশ্যম্ভাবি দুঃখ আছে ইহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু দুঃখমিশ্রিত বলিয়া কি সুখকে দূরে নিক্ষেপ করিব? তাহা নহে। বরং সুখের ভাগ বৃদ্ধি করিতে (অর্থাৎ একটা Balance of pleasure over pain লাভ করিতে) চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। চার্ব্বাকগণ সকল বিষয়েই অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন-চিন্তাবাদিগণের (Freethinkers) অনুরূপ। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন-চিন্তাবাদীরাও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এমন তীব্র যুক্তি প্রয়োগ এবং এমন নিঃশঙ্ক প্রতিবাদ করেন নাই।

ঐহিক সুখভোগই পরম পুরুষার্থ। সুখের অনুষঙ্গি দুঃখ আছে বলিয়া সুখ কদাপি পরিত্যজ্য নহে

চার্ব্বাকগণ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন-চিন্তাবাদিগণ

উপনিষদের যুগেও বৌদ্ধ ও সাংখ্যাচার্য্যগণের দ্বারা নিরীশ্বরবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। উপনিষদে এক নিত্য চিন্ময় আত্মা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধেরা আসিয়া বলিলেন, এক নিত্য চিন্ময় আত্মা আবার কোথায়? আত্মা তো এই প্রকাশ পাইতেছে, এই আবার লুপ্ত হইতেছে,—আত্মা ক্ষণিক চৈতন্য মাত্র। আত্মার জ্ঞান ও চেষ্টা (Will) উভয়ই বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, দেখিবে জ্ঞানের মধ্যে একটী ক্ষণিক বোধপ্রবাহ মাত্র এবং চেষ্টার মধ্যে একটী ক্ষণিক বাসনাপ্রবাহ মাত্র আছে। এই ক্ষণিক বোধ ও ক্ষণিক বাসনাপ্রবাহই আত্মা। অন্তর বাহির দুই নাই,—বিষয় বিষয়ী দুই নাই, কেবল এক ক্ষণিক-চৈতন্যপ্রবাহ-মাত্র বর্ত্তমান। এই ক্ষণিক চৈতন্যপ্রবাহকে বৌদ্ধেরা আলয়বিজ্ঞান নাম দিয়াছেন। ইউরোপীয়

উপনিষদের যুগে প্রতিক্রিয়া—বৌদ্ধদর্শন ও সাংখ্যদর্শন

বৌদ্ধমতে নিত্য আত্মা নাই—আত্মা ক্ষণিক-চৈতন্যপ্রবাহমাত্র

দার্শনিক পণ্ডিত হিউম্ এবং মিলও বৌদ্ধদের ন্যায় ক্ষণিক-চৈতন্যবাদী (Subjective Idealist); কিন্তু দুইটী বিষয়ে ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। (১) হিউম্ ও মিল শুদ্ধ জ্ঞানের দিক হইতে চৈতন্যের ক্ষণিকত্ব দেখাইয়াছেন, এবং সম্প্রতি জর্ম্মানদেশীয় মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মুনেষ্টারবার্গ মিলের পন্থা অবলম্বন করিয়া চেষ্টার দিক হইতেও চৈতন্যের ক্ষণিকত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা জ্ঞান ও চেষ্টা উভয় দিক দিয়াই এই ক্ষণিকত্ব দেখাইয়া থাকেন; সুতরাং এবিষয়ে বৌদ্ধেরাই শ্রেষ্ঠ। (২) হিউম্ ও মিলের দর্শনে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তি একেবারে উড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু বৌদ্ধেরা কার্য্যকারণের মধ্যে এক নিত্য ও সত্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন।

হিউম্ এবং মিলও বৌদ্ধগণের ন্যায় ক্ষণিক-চৈতন্যবাদী; কিন্তু দুইটী বিষয়ে বৌদ্ধগণের শ্রেষ্ঠত্ব—(১) জ্ঞান ও চেষ্টা উভয় দিক দিয়া আত্মার ক্ষণিকত্ব প্রতিপাদন, (২) কার্য্যকারণ সম্বন্ধের সত্যতা স্বীকার

বৌদ্ধদের একটী বিশেষ মত বাসনা-সংক্রমণ। তাহার ভাব এই:—এই আমার চৈতন্য বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যে বাসনা করিল, পর মুহূর্ত্তে আমি যে অবস্থা প্রাপ্ত হইব, তাহা সেই পূর্ব্ব বাসনার—পূর্ব্ব অবস্থার ফলমাত্র। কিন্তু চৈতন্যের প্রত্যেক অবস্থাই তো ক্ষণিক,—পর অবস্থা প্রাপ্তির সময় অবশ্য পূর্ব্বাবস্থা বিনষ্ট হইয়া যায়। তবে বাসনা পূর্ব্ব অবস্থা হইতে পর অবস্থায় কিরূপে সংক্রমণ করে? বৌদ্ধেরা বলেন কুর্ব্বতরূপত্ব দ্বারা,—অর্থাৎ পূর্ব্ব অবস্থা যখন বিনষ্ট হয়, তখন সে একটী কুর্ব্বতরূপত্ব (অর্থাৎ পর অবস্থা উৎপত্তির একটী Process) রাখিয়া যায়। তাহা হইতেই পর অবস্থার উৎপত্তি হয়। এই কুর্ব্বতরূপত্ব হেতু বাসনা অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে সংক্রমণ করে এবং এই কুর্ব্বতরূপত্ব হেতুই খণ্ড খণ্ড ক্ষণিক চৈতন্য এক ক্ষণিক-চৈতন্যপ্রবাহের আকার ধারণ করে। আবার এই কুর্ব্বতরূপত্ব হেতু বাসনা-সংক্রমণ জন্য জীব স্বীয় কর্ম্মের ফলভোগ করে। বৈজিক গুণে যেমন পিতার ধর্ম্ম গিয়া পুত্রে বর্ত্তে—অথবা পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম গিয়া পরপুরুষে বর্ত্তে, সেইরূপ কুর্ব্বতরূপত্ব হেতু এই যে আমি তাহার ধর্ম্ম পরের আমিতে গিয়া বর্ত্তিবে। সুতরাং এখন আমি যে কর্ম্ম করিলাম, পরে আমি তাহার ফলভোগ করিব;—যেমন ইহজন্মে করি, বসেইরূপ

বৌদ্ধমতে কুর্ব্বতরূপত্ব হেতু বাসনা-সংক্রমণ এবং জন্মজন্মান্তরে কর্ম্মফলভোগ

জন্মজন্মান্তরেও করিব। কিন্তু যখন বাসনার নির্ব্বাণ হইবে, তখন কুর্ব্বত-রূপত্ব, বাসনা-সংক্রমণ ও ক্ষণিক-চৈতন্যপ্রবাহ, এ সমস্তের বিরাম হইবে,—কর্ম্ম ও কর্ম্মফলেরও বিরাম হইবে। নির্ব্বাণই পরামুক্তি—পরাশান্তি। বৌদ্ধমতে জীব যে কর্ম্মফল ভোগ করে তাহা সেই কর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়; কর্ম্মফলদাতা স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই।

বৌদ্ধমতে মুক্তি—বাসনার নির্ব্বাণ

বৌদ্ধমতে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর নাই

ইঁহাদের মধ্যে মাধ্যমিকেরা বলেন, বাহ্য বস্তুর কোনও সত্তা নাই—সবই শূন্য (Nihilism); যোগাচারেরা বলেন বাহ্য বস্তু মাত্রই অলীক (Subjective Idealism); সৌত্রান্তিকেরা বলেন বাহ্য বস্তু অনুমানসিদ্ধ (Cosmothetic Dualism like that of Browne and Arnauld); বৈভাষিকেরা বাহ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলেন (Natural Realism); কিন্তু এ প্রত্যক্ষও সেই ক্ষণিকচৈতন্যেরই প্রত্যক্ষ।

বৌদ্ধদর্শনের চারিটী শাখা

বৌদ্ধদর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের অনেক সাদৃশ্য আছে; একটী বিষয়ে খুব গুরুতর পার্থক্যও আছে। সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটী তত্ত্ব বুঝিলেই সে সাদৃশ্য ও সে পার্থক্য আমাদের নয়নপথে উদিত হইবে। সাংখ্য বলেন, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি পরিণাম হইতে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছেন, পরিণত না হইয়া ইনি ক্ষণকালও থাকেন না। কিন্তু চিন্ময় পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতির এই পরিণাম হয়। এই চিন্ময় পুরুষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু প্রকৃতি সগুণ, সক্রিয় ও পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং প্রকৃতি হইতে পুরুষ সম্পূর্ণ পৃথক্। পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হয় মহত্তত্ত্ব (সমষ্টি) বা বুদ্ধি (ব্যষ্টি); মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্বের পরিণাম একাদশ ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম পঞ্চভূত। একাদশ ইন্দ্রিয় যথা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় মন। সূক্ষ্মপঞ্চভূতের পরিণাম স্থূল পঞ্চভূত, যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি। সাংখ্য এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেন। এখন বৌদ্ধ দর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের সাদৃশ্য দেখ।

বৌদ্ধদর্শন ও সাংখ্যদর্শন

প্রকৃতি ও পুরুষ

প্রকৃতি পুরুষাদি সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব

বৌদ্ধদর্শনের সহিত সাংখ্য-দর্শনের সাদৃশ্য

সাংখ্যের নিয়তপরিণামশীল প্রকৃতি অনেকটা বৌদ্ধদের ক্ষণিক-চৈতন্যপ্রবাহের ন্যায়। পার্থক্য এই, বাসনা-সংক্রমণের সময় পূর্ব্ব অবস্থা একটী কুর্ব্বতরূপত্ব রাখিয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু সাংখ্যের পর পর পরিণাম পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিণামকে বিনাশ করে না। বৌদ্ধদের সঙ্গে সাংখ্যের আরও একটী বিষয়ে ঐক্যমত দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের ন্যায় সাংখ্যও বলেন যে জীব বাসনাহেতু স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে। কর্ম্ম হইতেই কর্ম্মফল উৎপন্ন হয়;—কর্ম্মফলদাতা স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই। সগুণ, সক্রিয়, পরি-

সাংখ্যমতে মুক্তি—প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান

ণামশীলপ্রকৃতি হইতে পুরুষ সম্পূর্ণ পৃথক্ এইরূপ জ্ঞান লাভ করা, অর্থাৎ পুরুষকে নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয় ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া জানা, এবং সেই জ্ঞানে অবস্থিত থাকাই সাংখ্যমতে মুক্তি। সাংখ্যের নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয়, চিন্ময় পুরুষে অবস্থান এবং বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি, এ দুইএর মধ্যেও বড় বেশী একটা পার্থক্য নাই। কিন্তু একটী বিষয়ে বৌদ্ধদর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের ঘোর

বৌদ্ধদর্শনের সহিত সাংখ্য-দর্শনের পার্থক্য

পার্থক্য লক্ষিত হয়। বৌদ্ধেরা এক ক্ষণিক-চৈতন্য-প্রবাহাতিরিক্ত কোন নিত্য আত্মা স্বীকার করেন না; কিন্তু সাংখ্য নিয়তপরিণামশীল প্রকৃতিতে এক নিত্য চিন্ময় পুরুষের

সাংখ্যের পুরুষ উপনিষদের এক অদ্বিতীয় আত্মা নহে—সাংখ্য বহু পুরুষবাদী

অধিষ্ঠান দেখেন। তবুও সাংখ্যের পুরুষ উপনিষদের নিত্য চিন্ময় আত্মা নহে। কারণ উপনিষদপ্রতিপাদ্য চিন্ময় আত্মা নিত্য এবং অদ্বিতীয় কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ অদ্বিতীয় নহে। সাংখ্যমতে যত মনুষ্যদেহ তত পুরুষ।

সাংখ্য দ্বৈতবাদী

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই মহাতত্ত্ব স্বীকার করেন বলিয়া সাংখ্যকে পণ্ডিতেরা দ্বৈতবাদী বলেন। সাংখ্য বেদশাস্ত্রকে আপ্তবাক্য

সাংখ্য বেদ ও বৈদিক কর্ম্মাদি মান্য করেন

বলিয়া মান্য করেন। বৌদ্ধগণের ন্যায় তিনি বেদবিহিত কর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী নহেন।

আদি উপনিষদের নিগুর্ণব্রহ্মবাদ এবং বৌদ্ধ ও সাংখ্যাচার্য্যগণের

পরবর্ত্তী উপনিষদের সগুণ-ব্রহ্মবাদ

নিরীশ্বরবাদাদির প্রতিকূলে পরবর্ত্তী উপনিষদে সগুণব্রহ্মবাদ প্রচারিত হয়। কিন্তু এ সগুণব্রহ্মবাদ দার্শনিক যুক্তির বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই। নির্ম্মলচিত্ত ঋষিগণ অধ্যাত্মযোগে দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সহজভাবে

সগুণব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। সুতরাং রূপক এখানে ঋষিদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সমস্ত রূপকের মধ্য দিয়া ঋষিরা এই একটী কথাই বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম যেমন সৃষ্টির অতীত, তেমনি তিনি সৃষ্টির অন্তর্ভূত। আদি উপনিষদে ব্রহ্ম সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু এখানে আবার সৃষ্টির সহিত তাঁহার গূঢ়যোগ সংস্থাপিত হইল। যিনি সর্ব্বাতীত, অরূপ, অব্যয়, অদ্বিতীয় পুরুষ, সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পদ; সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ; সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ; তিনি সমুদায় ব্যাপিয়া জগতে বাস করিতেছেন।" "তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই দীপ্তিমৎ নক্ষত্রাদি, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই প্রজাপতি।" "তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমিই কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমি জরাগ্রস্ত (হইয়া) দণ্ড হস্তে গমন কর, তুমি বিশ্বতোমুখ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" এই সগুণব্রহ্মবাদী ঋষিদের মতে চিত্তশুদ্ধির উপায় স্বরূপ বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। ইঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মও স্বীকার করিতেন। আদি উপনিষৎকর্ত্তাদের ন্যায় ইঁহারা গৃহস্থাশ্রমের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই।

পরবর্ত্তী উপনিষৎকর্ত্তারা বৈদিক কর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্

কিন্তু উপনিষদ্ ঋষিদিগের কতকগুলি সহজ উক্তি বলিয়া উপনিষদ্বাক্যের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি দোষ রহিয়া গেল। প্রথমতঃ, কতকগুলি শ্লোকে ব্রহ্মের নিরাকার, নির্গুণ ও বিশ্বাতীত যে দিক্, তাহা বিশদরূপে দেখান হইয়াছে; অন্যত্র আবার ব্রহ্মের সগুণ, সাকার ও বিশ্বান্তর্ভূত যে দিক্ তাহা উজ্জ্বল করা হইয়াছে। দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে, কোথাও ব্রহ্মের ব্রহ্মভাব দেখান হইয়াছে, কোথাও আবার তাঁহার ঈশ্বরভাব দেখান হইয়াছে;—কোথাও ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা তাঁহার তটস্থ লক্ষণের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে; কোথাও বলা হইয়াছে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, আবার কোথাও বলা হইয়াছে স্বভাব, মহৎ, কাল অথবা অন্য কিছু হইতে জগতের উৎপত্তি। একস্থলে বলা হইল মায়া অর্থাৎ ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি সৎ, অন্যত্র বলা হইল অসৎ। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও চেষ্টা-বর্জ্জিত একটী

উপনিষদ্বাক্য সকলের মধ্যে অসঙ্গতি

শূন্যাকার অবস্থাকে কোথাও মুক্তি বলা হইয়াছে, আবার কোথাও ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলা হইয়াছে। সমস্ত উপনিষদ্ এইরূপ অসঙ্গতি দোষে দূষিত বলিয়া বোধ হয়; অথচ এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম প্রতিপাদন করাই উপনিষদ্‌শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাদরায়ণ ব্যাস ইহা অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এজন্যই তিনি সমস্ত উপনিষদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানকে এক অটল ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে সচেষ্ট হন। ব্যাসদেবের এই সমন্বয় গ্রন্থের নাম ব্রহ্মসূত্র।

বাদরায়ণ ব্যাস কর্তৃক উপনিষদ্ সমূহের সমন্বয় —ব্রহ্মসূত্র

ব্রহ্ম কে? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস বলেন, "যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমৎ কারণ হইতে এই বিবিধ নাম ও রূপে প্রকাশমান অচিন্ত্য জগতের উৎপত্তি হয়, সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমৎ কারণই ব্রহ্ম। কিন্তু ব্যাসদেব ব্রহ্মকে কেবল প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া বিরত হন নাই। এই প্রাকৃতিক বিবর্ত্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর যে ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন, ব্যাসদেবের মতে তাহার কারণও ব্রহ্ম। ব্যাস বলিতেছেন, "সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের আকর যে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র তাহাদেরও উদ্ভব স্থান ব্রহ্ম।" কিন্তু ব্রহ্ম যে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এ কথা কেন বলিতেছ? ব্যাস তাহার উত্তরে বলেন, "সমন্বয়াৎ"—সমন্বয় হইতে। ব্রহ্মতেই সমস্ত উপনিষদ্‌শাস্ত্রের সমন্বয় দেখা যায়,—অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধি উপনিষদ্‌বাক্য সকলের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিলে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিশ্বের কারণ বলিয়া নিষ্পন্ন হন। এ জন্যই ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা বলা হইল। কিন্তু ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তারূপে দেখিলে, তাঁহাকে কেবল তটস্থ লক্ষণে—ঈশ্বর-রূপে দেখা হয়। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ কি? তদুত্তরে ব্যাস এই বেদান্তবাক্য বলিতেছেন—"ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, বিজ্ঞানঘন ও আনন্দ-ঘন।" কিন্তু বৃদ্ধি, ক্ষয় প্রভৃতি বিকারাদি দোষে দূষিত এই জগত দ্বারা তো ব্রহ্মের এই স্বরূপ নিষ্পন্ন হয় না। ব্রহ্মের এ স্বরূপ কোথায় পাইলে? ব্যাস বলিতেছেন, ধ্যানযোগে নির্ম্মল বুদ্ধিতে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

ব্যাসের ব্রহ্মতত্ত্ব। ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা—ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ—ঈশ্বরভাব

ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ

তবে কি, যে ব্রহ্মকে পূর্ব্বে জগতের : সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া লক্ষণা করা হইয়াছে তাহা হইতে এই নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন ব্রহ্ম পৃথক্ ? ব্যাস বলেন, "না, তাহা নহে। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় বস্তু।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের একত্ব

এক অদ্বিতীয় বস্তুকেই ভিন্ন দুই দিক হইতে দেখিয়া স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্ম এবং তটস্থ লক্ষণে ঈশ্বর বলা হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক। কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্টির আধার, সুতরাং সমস্ত গুণের—সমস্ত নামরূপের আধার। কিন্তু নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন ব্রহ্ম নির্গুণ ও নামরূপাদিবর্জ্জিত। সুতরাং ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়া ব্যাসদেব নির্গুণ ও সগুণ, নিরাকার ও সাকারের একত্ব স্বীকার করিলেন।

সুতরাং নির্গুণ ও সগুণের—নিরাকার ও সাকারের একত্ব

এখন ব্যাসের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ব্যাসের মতে ঈশ্বর জীবের কর্ম্মফলবিধাতা। কর্ম্মফলাদি ভোগেরদ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া জীবকে মুক্তিধামে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে, ঈশ্বর স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা মায়া-শক্তি দ্বারা জীবের ভোগের জন্য এই জগৎ উৎপন্ন করেন। জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ এই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। ঈশ্বর জীবের ভোগের জন্য এই জগৎ উৎপন্ন করেন বুঝিলাম; কিন্তু জীব উৎপন্ন হয় কিরূপে ? তদুত্তরে ব্যাস বলেন যে, জীবের চিদংশ ঈশ্বর কিম্বা ব্রহ্মেরই চিদংশ; উহা সৃষ্ট নহে। জীবের দেহাদি সৃষ্ট ও মায়া-জাত। কিন্তু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যে জীবাত্মার উদ্ভব কিরূপে হইল ?—এক কেন বহু হইল ? ব্যাস বলেন, মায়াবশে। মায়া অনির্ব্বচনীয়া ও দুস্তরনীয়া।—অর্থাৎ একের বহু হইবার যেন একটা প্রবৃত্তি আছে, এইমাত্র বলা যায়, আর কিছুই বলা যায় না। জার্ম্মান দার্শনিকগণও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

ব্যাসের সৃষ্টিতত্ত্ব—জগৎ ও জীবের উৎপত্তি

ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি মায়া অনির্ব্বচনীয়া

ব্যাসদেবের মতে ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি মায়া এবং মায়াজাত এই জগৎ সত্য এবং জীবের উপাধিও সত্য। কিন্তু উহাদের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা নাই।

ব্যাসের মতে মায়া, মায়া-জাত জগৎ ও জীবোপাধি সত্য কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত

উহারা ব্রহ্মাশ্রিত অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যে অধিষ্ঠিত সত্তা। সাংখ্যের

বহুপুরুষবাদী; কিন্তু ব্যাস সাংখ্যাচার্য্যগণের মত খণ্ডন করিয়া এক অদ্বিতীয় চিন্ময় পুরুষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিলেন এবং তিনি শক্তিমান্ ও শক্তির ন্যায়, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং তদীয় সৃষ্টিশক্তি মায়ার একত্ব স্বীকার করিলেন। এ জন্যই ব্যাসকে পণ্ডিতেরা অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন। সচরাচর আমাদের দেশের লোকেরা অদ্বৈতবাদ বলিলে অলীক-মায়াবাদ বুঝেন। যাঁহারা মায়াকে অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা বলেন তাঁহারই অলীক-মায়াবাদী। কোন কোন অদ্বৈতবাদী অবশেষে অলীক-মায়াবাদে গিয়া উপনীত হন সত্য; কিন্তু সকল অদ্বৈতবাদী অলীক-মায়াবাদী নহেন। ব্যাস মায়া ও মায়াজাত জগৎকে সত্য বলেন। যেখানে তিনি জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন—রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহার ইহা বলাই অভিপ্রায় যে, জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা নাই; সুতরাং ব্যাস অদ্বৈতবাদী হইয়াও অলীক-মায়াবাদী নহেন।

ব্যাস অদ্বৈতবাদী, অলীক-মায়াবাদী নহেন

ব্যাসের মতে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থানই মুক্তি; কিন্তু এ মুক্তিতে জীবের উপাধি অর্থাৎ জীবত্ব বিনষ্ট হইবে না।

ব্যাসের মতে মুক্তি—সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান

ব্যাসের পরে বৌধায়ন নামক কোন পণ্ডিত ব্রহ্মসূত্রের এক বৃত্তি লিখেন। এ জন্য তিনি বৃত্তিকার বৌধায়ন নামে পরিচিত। বৌধায়নবৃত্তি এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্ত্তী অনেক গ্রন্থে বৌধায়নের মতের উল্লেখ আছে। তাহা হইতে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে বোধ হয়, বৌধায়ন ও ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের একত্ব স্বীকার করিতেন। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের উপর—সৃষ্টির উপর—বিশিষ্ট সত্তার উপর অধিক জোর দিয়াছিলেন; এ জন্যই পরে রামানুজ বৌধায়নের মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আখ্যা প্রদান করেন।

বৃত্তিকার বৌধায়নের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

ইহার পর পতঞ্জলি তদীয় যোগসূত্র প্রণয়ন করেন। ব্যাসভাষ্য নামে উহার এক ভাষ্য, এবং ভোজবৃত্তি নামে উহার এক বৃত্তি আছে। সাংখ্যের ন্যায় পাতঞ্জলও প্রকৃতি পুরুষ স্বীকার করেন; কিন্তু পাতঞ্জলের মতে প্রকৃতি পুরুষের উপরে এক ঈশ্বর আছেন। এ জন্যই পাতঞ্জলদর্শন সেশ্বর সাংখ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পাতঞ্জলের ঈশ্বর অনেকটা বেদের

পাতঞ্জলদর্শন বা সেশ্বর সাংখ্য

আদিপুরুষ প্রজাপতির ন্যায়। করুণায় তিনি অতুল। সংসারাবদ্ধ জীবের প্রতি তাঁহার এত অনুগ্রহ যে সর্ব্বদা তিনি জীবকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাই-তেছেন। ঈশ্বর যেমন জীবের পরিত্রাতা, তেমনই তিনি আবার গুরু ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক। গুরুরূপে তিনি বেদাদি সমস্ত বিদ্যা প্রকাশ (reveal) করেন ; এবং সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে তিনি ধর্ম্মনিয়মাদি সংস্থাপন করিয়া জীবকে মুক্তির পথে লইয়া যান। পাতঞ্জল ঈশ্বরতত্ত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মের সগুণদিক্ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিশদ ও উজ্জ্বল করিলেন। করুণাময় পরিত্রাতা, সর্ব্ব-বিদ্যাপ্রকাশক গুরু, এবং ধর্ম্মসংস্থাপক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকরূপে ঈশ্বর এখন জীবের অনেক নিকটে আসিলেন। জীবও ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিতে শিক্ষা করিল। এইরূপে পাতঞ্জল দর্শন পরবর্ত্তী ভক্তি ধর্ম্মের সূচনা করিল। বেদের আদিপুরুষ প্রজাপতির মধ্যে আমরা অবতারবাদের বীজ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। পাতঞ্জল দর্শনে সেই বীজ আমরা অঙ্কুরিত হইতে দেখিলাম। আর এক পদ অগ্রসর হইলেই রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা অবতারবাদের মহা-বৃক্ষ দেখিতে পাইব।

পাতঞ্জলের ঈশ্বর করুণা-ময় পরিত্রাতা, সর্ব্ববিদ্যা-প্রকাশক গুরু এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপক সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক

পাতঞ্জলের যোগসূত্রে ভক্তি ধর্ম্মের সূচনা

বেদের প্রজাপতিতে অব-তারবাদের বীজ, পাত-ঞ্জলের ঈশ্বরে অবতার-বাদের অঙ্কুর এবং মহা-ভারত ও রামায়ণে অব-তারবাদের মহাবৃক্ষ

ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অথবা প্রকৃতির পালনী শক্তিই বিষ্ণু। সুতরাং বিষ্ণুরূপেই ঈশ্বর জীবের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সুতরাং মহাভারত ও রামায়ণে বিষ্ণু-অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের লীলাবর্ণনচ্ছলে ভগবানের জীবলীলার মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম উভয়েই পরম করুণা-ধার, উভয়েই ধর্ম্মের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের শাস্তিদাতা। নররূপে উভয়কেই আদর্শপুরুষ (Ideal man) বলিয়া কল্পনা করা হই-য়াছে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নরোত্তম, পুরুষোত্তম প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন। মহর্ষি বাল্মীকিও এক আদর্শ পুরুষ কল্পনা করিয়া তাঁহার মহাকাব্য আরম্ভ করিয়া-

মহাভারত ও রামায়ণে বিষ্ণুঅবতার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের লীলাবর্ণন—ভগবানের জীবলীলার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন

মহাভারত ও রামায়ণের আদর্শ পুরুষ

ছেন—"(যিনি) গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্য্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে (ক্ষত্রতেজে) কালানলের ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায়।" জগতের অনেক জাতি আদর্শ পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন।

আদর্শ পুরুষরূপে যীশুখৃষ্ট ও রাম

খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশুকে তদীয় শিষ্যেরা আদর্শ-পুরুষ বলিয়া জগতের সমক্ষে উপস্থিত করেন। তাঁহারা বলেন, এমন দুঃখী পাপীর বন্ধু আর কে আছে? কিন্তু উচ্চতা ও বিশালতায় খৃষ্টানগণের এ আদর্শ বাল্মীকির আদর্শের নিকট পরাভব মানে। রাম কেবল দুঃখী ও পাপীর বন্ধু বলিয়াই আদর্শপুরুষ নহেন। বাল্মীকি রামকে পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, স্বামিরূপে, সখিরূপে, প্রভুরূপে, রাজরূপে—জীবনের সমস্ত সম্বন্ধে আদর্শ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; জীবনের একটী মাত্র সম্বন্ধে তাঁহাকে আদর্শরূপে দেখাইতে প্রয়াস পান নাই। বাল্মীকির বিশেষ বিশেষ আদর্শের মধ্যে অনেক দোষ ও অপূর্ণতা লক্ষিত হয় সত্য বটে; কিন্তু আদর্শপুরুষের যে মূর্ত্তি তিনি তাঁহার মহাকাব্যে রাখিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীতে তাহা অতুলনীয়। লোকশিক্ষার জন্যই যদি আদর্শপুরুষের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে জীবনের সকল সম্বন্ধেই আদর্শ পুরুষের আদর্শ স্থানীয় হওয়া আবশ্যক। জীবনের সকল সম্বন্ধে আদর্শ স্থানীয় না হইলে আদর্শপুরুষ কথনও লোক-শিক্ষক হইতে পারেন না।

ব্যাস মহাভারতে এবং বাল্মীকি রামায়ণে অবতার ও আদর্শপুরুষের

অবতার ও আদর্শপুরুষের আকারে মহাভারত ও রামায়ণের সগুণব্রহ্মবাদ

আকারে সগুণব্রহ্মবাদ প্রচার করিলেন। এখান হইতেই বিষ্ণুর অবতার বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিল। তাহার পরেই গীতার সগুণব্রহ্মবাদ এবং জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের মহাসমন্বয়। * গীতাকার যখন প্রাদুর্ভূত হন

গীতার সময়ে ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্র

তখন ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে আমরা বিচিত্র মত ও পরস্পর-বিরোধী ভাবের সংঘর্ষ দেখিতে পাই। একদিকে বেদোক্ত সকাম কর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদিক দেবতার পূজা, হঠ যোগীদের হঠযোগ; অন্যদিকে বৌদ্ধ-

* গীতাপর্ব্ব মহাভারতের মধ্যে পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, এই মতানুবর্ত্তী হইয়া গীতাকে পৃথক্ স্থান প্রদান করা হইয়াছে।

গণের কর্ম্মসন্ন্যাস, সাংখ্য ও বেদান্তের জ্ঞানযোগ। অবতারবাদের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিধর্ম্মও এ সময় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। গীতাকার এই পরস্পর বিরুদ্ধ মতও বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি এমন এক দিব্য প্রতিভা লইয়া আসিয়াছিলেন যে তাহার বলে সমস্ত দ্বন্দ্ব—সমস্ত সংঘর্ষের ঊর্দ্ধে উঠিয়া তিনি এক মহা সমন্বয় দেখিতে পাইলেন।

বিশ্বরূপে গীতার মহা-সমন্বয়

প্রথমেই তিনি দেখিলেন, বিশ্বেশ্বরের সেই—"অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং" বিশ্বরূপ। সেই বিশ্বরূপের মধ্যে সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম সমস্ত এক হইয়া গেল। তখন

জ্ঞানযোগ

তিনি জ্ঞানযোগীকে বলিলেন, দেখ, কেই বা জ্ঞাতা আর কেই বা জ্ঞেয়; কেই বা ভোক্তা আর কেই বা ভোগ্য; কেই বা কর্ত্তা, কেই বা কার্য্য; কেই বা হন্তা, কেই বা হত; ঐ চাহিয়া দেখ, সবই সেই বিশ্বরূপ। কর্ম্মযোগীকে বলিলেন, চাহিয়া দেখ,

কর্ম্মযোগ

এ জগৎ সেই বিশ্বরূপেরই লীলা। তোমার সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি; জয়ই বা কি আর পরাজয়ই বা কি; সিদ্ধিই বা কি, অসিদ্ধিই বা কি; সবই সেই লীলাময়ের হস্তে। অতএব তাঁহার হস্তে সমস্ত সিদ্ধি অসিদ্ধির ভার রাখিয়া নিষ্কাম চিত্তে কর্ম্মযোগ সাধন কর। বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুরাগীকে বলিলেন, "ভগবান্ তোমাদের যাহাকে যে স্থানে—যে আশ্রমে রাখিয়াছেন সেই আশ্রমে থাকিয়া, ফলাফল চিন্তাবিবর্জ্জিত হইয়া, সেই আশ্রমের সমস্ত কর্ত্তব্য প্রাণপণে সম্পন্ন কর।—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" ভক্তিযোগীকে

ভক্তিযোগ

বলিলেন, তুমি ঐ বিশ্বরূপের অতুল শোভা দেখ, তাঁহাকে তনুমনপ্রাণ সমর্পণ কর এবং তাঁহারই প্রীতিকাম হইয়া তাঁহারই সেবায় জীবন যাপন কর—তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ কর। এইরূপে গীতাকার জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের এমন এক মহাসমন্বয় স্থাপন করিলেন যে তাহাতে সকল উপাসনা, সকল সাধন, সকল পন্থা স্থান প্রাপ্ত হইল। গীতার বিশ্বরূপ সগুণব্রহ্ম। অবতাররূপেও গীতা

গীতার সগুণব্রহ্মবাদ ও অবতারবাদ

সগুণব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গীতার অবতারবাদ অজ্ঞানীদের স্থূল অবতারবাদ নহে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন যে তিনি যোগযুক্ত না হইলে অর্জ্জুনের নিকট

পরমার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু গীতার প্রধান মাহাত্ম্য

গীতার প্রধান মাহাত্ম্য—কর্ম্মসন্ন্যাস নিরসন ও নিষ্কাম কর্ম্ম স্থাপন

কর্ম্মসন্ন্যাস নিরসন ও নিষ্কাম কর্ম্মস্থাপন। গীতাকার বলেন, কর্ম্ম পরিত্যাগও করিও না, আবার সকাম কর্ম্মও করিও না, কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম্ম সাধন কর। হিগেলের নীতি-বিজ্ঞানের (Ethics) চরম সিদ্ধান্ত এই যে,

হিগেলের মতে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মনীতি—স্বীয় পদের কর্ত্তব্য সাধন

সমাজ-শরীরের যে যে স্থানে—যে পদে অবস্থিত, প্রাণপণে সেই স্থানের—সেই পদের কর্ত্তব্য পালন করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনীতি। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানও হিগেলের এই মত সমর্থন করে; কারণ সমাজবিজ্ঞানের মতে

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানেরও সেই মত

মনুষ্য সমাজ-শরীরের এক একটী যন্ত্র বিশেষ। কোন একটী যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ থাকিলে সমাজের জীবনীশক্তি হ্রাস হয় এবং সমস্ত সমাজ হীনবল হইয়া পড়ে। গীতাকারও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আকারে হিগেলের সেই

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আকারে গীতাকারও সেই মহানীতি প্রচার করিয়াছেন

"স্বীয় পদের কর্ত্তব্যের" কথাই বলিয়াছেন। গুণ-কর্ম্ম হইতে জাতিভেদের উৎপত্তি হয়, এই উদার মত স্বীকার করিয়াও গীতাকার জাতির বন্ধন এবং তদানুষঙ্গিক আশ্রমের বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

গীতাকার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই

অন্যদিকে সকাম কর্ম্ম নিরসন করিয়া তিনি যাগ যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মবর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

প্রাচীন বর্ণাশ্রমবন্ধন টিকিতে পারে না

ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক জীবন প্রাপ্ত হইয়া আমরা অবশ্য প্রাচীন আশ্রমাদির এই সকল বন্ধনের মধ্যে কখনও থাকিব না, থাকিতে পারিব না;—কিন্তু তথাপি আমাদিগকেও প্রাণপণে স্বীয় স্বীয় পদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। কিন্তু গীতাকার হিগেলকে ছাড়াইয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, নিষ্কামভাবে স্বীয় পদের কর্ত্তব্য সাধন কর।

পদের কর্ত্তব্য;—গীতা ক্যাণ্ট ও হিগেল

কিন্তু গীতাকারের এ নিষ্কাম কর্ম্ম ক্যাণ্টের ভাবশূন্য প্রেমশূন্য শুষ্ক নিষ্কাম কর্ম্ম নহে,—কারণ গীতাকার আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া বলিতেছেন, তোমার সমস্ত কর্ম্ম সেই লীলাময় ভগবানের চরণে প্রীতির

সহিত সমর্পণ কর। ধন্য গীতাকার, যিনি এই মহাবাক্য প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন! ধন্য ভারত ভূমি, যেখানে এই মহাবাক্য প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল!

গীতারপরবর্ত্তী কালে কর্ম্মবাদ ও ভক্তিবাদের প্রাধান্য

গীতার পরবর্ত্তী কালে মীমাংসকগণের কর্ম্মবাদ ও ভক্তগণের ভক্তি-বাদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ সময়ে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড কুমারিল্ল ভট্ট ও প্রভাকরাদির ন্যায় জড়বাদী নাস্তিক মীমাংসকগণের হস্তে পড়িয়া একপ্রকার ঐন্দ্রজালিকবিদ্যা (Magic and Shamanism)-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অন্যদিকে নারদসূত্র, পঞ্চতন্ত্র ও শাণ্ডিল্যসূত্রে অবতারবাদ ও চতুর্ব্যূহবাদের সঙ্গে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থে ভক্তিধর্ম্মের সেবা ও আরাধনাঙ্গের বিশেষ উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, এই সকল গ্রন্থের লেখকগণ আলেক্-জাণ্ড্রিয়া কিম্বা সিরিয়া হইতে খৃষ্টধর্ম্মের ভাব প্রাপ্ত হইয়া এই সেবাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

জ্ঞানাভিমুখে প্রতিক্রিয়া —শঙ্কর

শঙ্করের সময়ে ধর্ম্মরাজ্যের অবস্থা

ইহার পরেই শঙ্কর আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু শঙ্কর প্রচারিত ব্রহ্মজ্ঞানের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে হইলে শঙ্করের সময় ধর্ম্মরাজ্যের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা দেখা একান্ত আবশ্যক। সচরাচর লোকের ধারণা এই যে বৌদ্ধ-গণের সঙ্গেই শঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, শঙ্করকে তৎকালীন হিন্দু বৌদ্ধ উভয়েরই বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। সত্য বটে বৌদ্ধ-গণের ক্ষণিক-চৈতন্যবাদ, শূন্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদ, এবং পরে বৌদ্ধসম্প্র-দায়ের অবনতির সময়ে বৌদ্ধগণের মধ্যে যে অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতা দেখা দিয়াছিল, সেই অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতা হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানাঙ্গকে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব করিয়াছিল; কিন্তু তবুও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে তৎকালীন হিন্দু-সমাজের স্থূল অবতারবাদ, তামসিক পৌত্তলিকতা এবং জটিল কর্ম্মকাণ্ডের জঞ্জালই ব্রহ্মজ্ঞানকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতবর্ষে তখন ঘোর অজ্ঞানতার রাজত্ব। মহাভারত ও রামায়ণের অবতারবাদ অতি স্থূল আকারে তখন হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়

সকল মূর্ত্তিপূজা ও বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডকেই আর্য্যধর্ম্ম বলিয়া আশ্রয় করিয়াছিল। শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতির শব্দে তখন লোকের কর্ণ বধির হইয়া যাইত। শিখা ও তিলকাদি ধারণই মুক্তির পরাকাষ্ঠা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ব্বমীমাংসার কর্ম্মকাণ্ড কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির হস্তে পড়িয়া এক প্রকার ঐন্দ্রজালিক-বিদ্যার আকার ধারণ করিয়াছিল। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক তখন একেবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন সময় শঙ্কর ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানকে আবার প্রজ্বলিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। শূন্যবাদ, ক্ষণিক-চৈতন্যবাদ, অবতার-বাদ, পৌত্তলিকতা ও বাহ্য ক্রিয়া কলাপ, ইহাদেরই সঙ্গে শঙ্করের সংগ্রাম; সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণকে উজ্জ্বল করা ভিন্ন তাঁহার আর উপায়ান্তর ছিল না। ক্ষণিক-চৈতন্যবাদ ও শূন্যবাদে যাহাদের চিত্ত ভ্রান্ত; অবতারবাদ, পৌত্তলিকতা ও অসার ক্রিয়া কলাপে যাহাদের চক্ষু অন্ধ; স্বরূপলক্ষণের সমস্ত মহিমার সহিত ব্রহ্মকে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত না করিলে কিরূপে তাহারা তাঁহাকে চিনিবে? (ক্রমশঃ)

শঙ্করের সংগ্রাম ভ্রান্তমতি বৌদ্ধএবং অজ্ঞান হিন্দুগণের সহিত

মিলনানন্দ।

বল দেখি, সখি, কোন্ শুভলগনে
মিলেছিনু তব সাথে?
কোথা ছিলে তুমি, আমি ছিনু কোথা,
কে জানিত কার প্রেমের বারতা,
আঁখির মিলন,—কবেকার কথা?
কোন্ ফুল্ল বাসন্তী রা'তে
ভেঙ্গে গেল ঘুম, দেখিনু চকিতে
তব হাত মম হাতে?

চারিদিকে হাসি, হরষের বাঁশি,
হুলু ধ্বনি, কত গান,
উৎসব ভবনে রাশি রাশি আলো,
কৌতুক ভরা আঁখি কালো কালো,

সে মধু নিশিতে লেগেছিল ভালো
তব, লাজ নত মুখ খান
নিখিলের সুখ অপরূপ সাজে
করেছিল অর্ঘ্য দান।

বহুদিন গত, এতকাল পরে
পড়ে কি সে কথা মনে?
মুখোমুখী মোরা চন্দ্রাতপ তলে;
মুক্ত চন্দ্রালোক কৌতুকে উছলে;
ফুল্ল ফুলহার সসঙ্কোচে গলে
তুমি পরাইলে যেই ক্ষণে,
আঁখিতে আঁখিতে মিলিল, অমনি
হাসিল রমণীগণে।

ফুলমালা ঘেরা আলোক সজ্জিত
উজল বাসর ঘরে,
প্রবেশিনু মোরা বিবাহের শেষে
লাল চেলী পরা বরবধূবেশে,
কৌতুকময়ী নারীদল এসে
হেসে, বড়ই বিদ্রূপ করে;
অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া মু'খানি
তুমি, বসিলে অদূরে স'রে।

পরদিন প্রাতে লাগিল বাজিতে
সানাইএ বিরহ গাথা,
সাজায়ে চৌপাল পুরাঙ্গনা দলে
বিদায় করিল নয়নের জলে,
ম্লান আঁখি মুছি বসন অঞ্চলে
বক্ষে লইয়া ব্যথা
এসেছিলে হেথা; সে কাহিনী আজও
হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা।

মনে পড়ে সেই ফুল শয্যা নিশি
শেজ খানি ঢাকা ফুলে,
আধঘুমে পিক উঠে কুহরিয়া,
সমীরণ ছোটে সুরভি বহিয়া,
নারী দল হাসে রহিয়া রহিয়া ;
গোপনে গবাক্ষ খুলে
মৃদু হাসি আমি পরাইয়া দিনু
ফুলহার তব চুলে।

ধীরে ধীরে তুমি তুলিয়া মু'খানি
চাহিলে একটি বার,
ছলছল আঁখি মলিন বয়ান,
নয়নের জলে ভাসে উপাধান ;
কি দুঃখ বিষাদে ব্যথিত পরাণ,
সুধানু কারণ তার।
বলিলে কাতরে, "মন বড় পোড়ে,
কথা মনে প'ড়ে মার।"

"তোমার দুখানি পায়ে ধরি বলি,
পাঠাও মায়ের কাছে ;
ভাই বোনে ছেড়ে এসেছি কোথায়,
কত লোকে আসে কত লোকে যায়,
করুণ নয়নে কেহ নাহি চায়,
(আমার) পরাণ নাহিক বাঁচে ;
মা বাপের মুখ দেখিবার তরে
(সদা) তৃষিত হৃদয় যাচে।"

অতিথির মত থাকি দুটি দিন
পিতৃগৃহে গেলে ফিরে।
ফেলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস,
চলে গেনু আমি সুদূর প্রবাস ;

আবার তোমারে দেখিবার আশা
রহিল হৃদয় ঘিরে।
কত ব্যাকুল দিবস, অশান্ত যামিনী,
কাটানু নয়ন নীরে।

কত বর্ষ পরে ফিরে এসে ঘরে
(তোমা) দেখিনু দ্বিতীয় বার,—
নব রূপ রাশি, যৌবন নব,
ঢাকিয়া ফেলেছে দেহ মন তব ;
কোথা হ'তে বহি বিশ্ব সৌরভ
—অনন্ত গৌরব তার,—
হৃদয়ের মাঝে ফুটায়ে রেখেছো
প্রেমের মাধুরী কার ?

সীমন্ত মাঝারে সিন্দুর রেখা
তরুণ অরুণ লেখা,
নয়নের কোণে কৌতুক রাশি,
স্ফুরিত অধরে প্রীতি মাখা হাসি,
তাপদগ্ধ হৃদি-অন্ধকার নাশি
কোথা হতে দিল দেখা,
হেন চঞ্চল মন-মন্থন গান
কোথায় তোমার শেখা ?

ভুলে গিয়ে তুমি আত্মপর সব
এসেছ আবার ঘু'রে ;
এবার তোমারে ছাড়িব না আর,
বাঁধিয়া রাখিব বক্ষ মাঝার,
শ্রান্ত হৃদয়ে ঢাল শান্তি ধার,
ভ্রান্তি যাউক দূরে ;
প্রেমের বিজয় গাহ সখি আজি,
হরষ সরস সুরে।

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়।

বিনিময়।

প্রেমের কুসুম-ডোরে
দু'টী প্রাণ আছে বাঁধা,
সংসারের শোক, তাপ,
ঘুচিয়া গিয়াছে, কাঁদা!

মাঝে অমৃতের নদী,
বহিতেছে ধীরে ধীরে,
দাঁড়াইয়া আছি আজ,
দুইজন দুই তীরে!

সুধাময়ী তরঙ্গিনী,
দুটী ছায়া ধরি বুকে,
ছুটিছে অনন্ত পানে,
আনন্দ-প্রবাহে সুখে!

সংসার-তপন-তাপে
তাপিত তৃষিত প্রাণ,
জুড়ায় পবিত্র সেই
সুধা-ধারে করি স্নান!

স্বার্থ-সুখ—অভিমান,
ভাসাইয়া পূত-ধারে,
সুখ, শান্তি নিয়া আছি
প্রেম প্রবাহিনী তীরে।

তোমার অনন্ত প্রেম,—
তোমার অনন্ত ঋণ,—
অনন্ত প্রীতির উৎস
স্নিগ্ধ করে চিরদিন!

হৃদয় ঢালিয়া দিয়া,
অতৃপ্ত রয়েছে প্রাণ,
অসম্ভব অভাগায়
তব প্রেম প্রতিদান!

জানি' আমি;—ত্রিদিবের
পঞ্চ উপাদান নিয়ে,
গড়েছে তোমায় বিধি
দেবতার হিয়া দিয়ে!

এ দগ্ধ হৃদয় সনে
করি চিত বিনিময়,
সত্যই দিয়াছ তুমি
দেবত্বের পরিচয়!

কাঁকরের বিনিময়ে
দিয়াছ সে কহিনুর,
রাখিব হৃদয়ে সদা,—
রবে হিয়া ভর-পূর।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

স্বভাব কবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ।

(২)

প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক ম্যাথিউ আরনল্ড বলিয়াছেন, যাঁহার কাব্যে মানবজীবনের গভীর সমস্যাগুলি সম্যক বিকাশ প্রাপ্ত হয়, যিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গূঢ় সমস্যাগুলি ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত কবিপদবাচ্য। সৌন্দর্য্য কাব্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। কিন্তু সত্যই ইহার প্রাণ। যাঁহার কাব্যে যত অধিক পরিমাণে সত্য অন্তর্নিহিত থাকে, তাঁহার কাব্য ততই স্থায়ী হয়। যিনি সৌন্দর্য্যের ছটায় চারিদিক আলোকিত করিয়া, সত্যের মহামন্ত্রে স্বীয় কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন

তিনিই অমর কবি। এহেন কবিই মানব সমাজের শিক্ষা গুরু। ইহা করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই হোমর (Homer), ভার্জ্জিল (Virgil), দান্তে (Dante), মিল্টন (Milton), কাব্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; ইহা করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই, সেক্ষপিয়র (Shakespear), ইউরিপাইডিস্ (Euripidis) ও সফক্লিস্ (Sophocles) প্রভৃতির আসন এত উচ্চ। ম্যাথিউ আরনণ্ড কাব্যের এই লক্ষণ অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডের কবিদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথা বলিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে নানা কারণে চসার (Chaucer), স্পেন্সার (Spenser), সেক্ষপিয়র ও মিল্টন, ইংলণ্ডের এই প্রথম শ্রেণীর কবি চতুষ্টয়ের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডের পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। বায়রণের কথা বলিতে যাইয়া, আরনণ্ড একটু গোলে পড়িয়াছেন। কিন্তু আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকেই তিনি জয়মাল্য প্রদান করিয়াছেন। বায়রণ (Byron), শেলি (Shelly), কীটস (Keats), কাউপার (Cowper), বারণ্স্ (Burns), স্কট (Scott), ক্যাম্পবেল (Campbell), টম্‌সন্ (Thomson) প্রভৃতি কেহই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে আসন পাইতে পারেন না। এ বিষয়ে সকলে আরনণ্ডের সহিত একমত হইতে পারিবেন কি না জানি না; কিন্তু আমরা মনে করি, যদিও এরূপ তুলনা অনেক সময় নিরপেক্ষ হয় না, তথাপি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কাব্যজগতে অতীব উচ্চ আসনের অধিকারী। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত কবিদিগের কাহারও অপেক্ষা তিনি ন্যূন নহেন।

সৃষ্টির প্রথম অবধি আজ পর্য্যন্ত একটী প্রশ্ন মানবের চিন্তার রাজ্য অধিকার করিয়াছে; জীবনের পরিণাম কি, এবং এই রহস্যপূর্ণ প্রহেলিকাময় জীবনের সমাধান কি। আজ পর্য্যন্ত এই গভীর সমস্যা মানবের মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছে। যাঁহারা প্রকৃত কবি, তাঁহারা সকলেই এই গভীর রহস্যের উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার প্রভাবে প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কবিগণ সৃষ্টির প্রধান দুইটী জিনিস লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছেন। "মানব" ও "প্রকৃতি" কাব্যের সর্ব্ব প্রধান উপাদান। ইংলণ্ডের কবি পোপের (Alexander Pope) সময় পর্য্যন্ত কাব্যজগতে কেবল মানব সঙ্গীতই গীত হইত; কিন্তু কাউপারের সময় হইতে ইংরেজী কবিতায় এক নূতন স্রোত প্রবাহিত হইল, "মানব" ছাড়িয়া কাউপার "প্রকৃতির"

সঙ্গীত গাইলেন। কাব্য জগতে এক অসাধারণ পরিবর্ত্তন সম্ঘটিত হইল। পূর্ব্বে মানবের মধ্য দিয়া প্রকৃতির ছবি প্রতিভাত হইত, কাউপার দৃশ্যমান প্রকৃতি, আকাশ, সমুদ্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া মানবকে দেখিতে লাগিলেন। কবির সম্মুখে এক নূতন জগতের দ্বার খুলিয়া গেল এবং প্রকৃতির সহিত মানবের সম্বন্ধ নূতন ভাবে নূতন সুরে গীত হইতে লাগিল। কাউপার ইংরেজী কাব্যে যে নূতন শক্তির প্রবাহ আনিয়াছেন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্যে সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিব, প্রকৃতি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্যে কেমন ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে।

Excursion ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কাব্য। ইহা নয় সর্গে বিভক্ত। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ "Recluse" নামক মহা কাব্য ৩ খণ্ডে রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়া Excursionকে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড করিবেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত "Recluse" শেষ করিতে পারেন নাই। 'মানব' 'প্রকৃতি' 'সমাজ' এই কাব্যের আলোচ্য বিষয়। Excursionএর ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন—

"On man, on Nature and on Human Life,
Musing in solitude, I oft perceive
Fair trains of imagery before me rise,
Accompanied by feelings of delight
Pure, or with no unpleasing sadness mixed."

এবং মানব প্রকৃতি ও মানব জীবনের গীতই কবি এই কাব্যে গাহিয়াছেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ জানিতেন, তাঁহার সমসাময়িক সকল লোকে তাঁহার কাব্যের মর্ম্ম বুঝিবে না এবং সার্ব্বজনিক যশঃ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না। তাই তিনিও বৃদ্ধ কবি মিল্টনের সুরে গাহিয়াছিলেন—"Fit audience let me find 'though few'." তিনি জানিতেন, যদি তাঁহার কাব্যে সত্য থাকে এবং ঐ কাব্য প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে কখন উচ্চে আরোহণ ও কখন নিম্নে অবতরণ করে, তাহা হইলে মহীয়সী, কোমলা বাগ্দেবী হাসিতে হাসিতে প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার কাব্য গ্রহণ করিবেন, এবং ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণ, যখন মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার কাব্য পাঠ করিবে, তখন পবিত্র যশোরাশিদ্বারা তাঁহার পুরস্কার করিবে:—

"Which, if with truth correspond and sink,
Or rise, as venerable Nature leads,
The nigh and tender Muse shall accept
With gracious smile, deliberately pleased,
And listening Time reward with sacred praise."

Excersion, Boak I.

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তিগণ তাঁহাকে তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু Excursion কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয় নাই। তাঁহার Recluse শেষ হয় নাই বলিয়া তাঁহার পরবর্ত্তিগণ দুঃখিত নহেন। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার মধুময় ঘ্রাণে কাব্য কানন আমোদিত হইয়াছে। তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতা-গুলির (Sonnets) গম্ভীর ঝঙ্কারে বনস্থলী পূর্ণ হইয়াছে। ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের যশ Excursionএ নহে—তাঁহার যশ তাঁহার রাশি রাশি ক্ষুদ্র কবিতায়।

ম্যাথিউ আরনল্ড ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ক্ষুদ্র কবিতাগুলির এক সুন্দর শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন ; যথাঃ—Narrative Poems, Ballad Songs, Lyrics, Sonnets এবং Reflective and Elegiac Poems. আমরা এ প্রবন্ধে এই শ্রেণী বিভাগেরই অনুসরণ করিব।

উপাখ্যান ঘটিত কবিতাগুলির (Narrative Poems) মধ্যে মাইকেল (Michael), রুথ (Ruth) ও "দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও স্বাতন্ত্র্য" "(Resolution and Independence)" নামক কবিতাগুলি অতীব সুন্দর। শেষোক্ত কবিতাটী কবির একটী সুন্দর চিন্তাস্রোত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করে। রজনীর ভীষণ ঝটিকার পর একদিন প্রভাতে কবি প্রান্তরে বেড়াইতে গিয়াছেন। সূর্য্য উজ্জ্বল হইয়া পূর্ব্বাকাশে দীপ্তি পাইতেছে, দূর বনানীতে পক্ষীর মনোহর কূজন শোনা যাইতেছে। বৃষ্টির ফোটা পড়িয়া ঘাসগুলি উজ্জ্বল হইয়াছে। আনন্দে শশকেরা প্রান্তরে ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে। কবির হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু কি জানি কেন হঠাৎ তাঁহার হৃদয়ে গভীর বিষাদের ছায়া পড়িল :—

"And Tears and Fancies thick upon me came ;
Dim sadness and blind thoughts I knew not,—
nor could name."

কবি ভাবিতে লাগিলেন—এ সুন্দর সংসারে মানবজীবন একটী হাসিয়া খেলিয়া কাটাইবার জিনিস। কবি এ যাবৎ হাসিয়া খেলিয়াই কাটাইয়াছেন—জীবন মনোরম নিদাঘের মত তাহার পক্ষে কাটিয়াছে। কি জানি যদি হঠাৎ তাঁহার শান্ত জীবনের স্রোত ফিরিয়া যায়—কি জানি অভাব ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাঁহার হৃদয় প্রহত হয়—কি জানি লোকের তাচ্ছিল্যে তাহার হৃদয় প্রসূন ম্লান হইয়া পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদিগের কথা তাঁহার মনে পড়িল। কবিরা ত হাসিতে হাসিতেই জীবনের লীলা আরম্ভ করেন; কিন্তু অবশেষে নৈরাশ্য ও মত্তা আসিয়া কোথা হইতে উপস্থিত হয়:—

"I thought of Chatterton, the marvellous boy,
The sleepless soul that perished in his pride ;
Of him who walked in glory and in joy
Behind his plough upon the mountain side,
By our own spirits are deified ;
We poets in our youth begin in gladness ;
But there of comes in the end Despondency and
madness."

কবি চিন্তা করিতেছেন—দেখিলেন সম্মুখে একজন বৃদ্ধ, তাহার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে; তাহার বৃহৎ শরীর ধনুকের মত বক্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহার হস্তে সুদীর্ঘ যষ্টি। বৃদ্ধ স্থির ভাবে পল্বলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। কবি আশ্চর্য্য হইয়া তাহার নিকট গেলেন। কবির সহিত বৃদ্ধের কথোপকথন হইল—বৃদ্ধের অতীত জীবনের ইতিহাস কবি শুনিলেন। জীবনে বৃদ্ধ কত ক্লেশ সহিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের বল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এখনও বৃদ্ধ এক পল্বল হইতে অপর পল্বলে যাইয়া জলৌকা অন্বেষণ করে—বৃদ্ধ আর কোন কাজ করিতে পারে না, ইহাতেই তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হয়। কিন্তু জলৌকা-আহরণই কি সহজ? কত ডোবা পার হয়, তবে বৃদ্ধ জলৌকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। বৃদ্ধের স্বাধীন জীবনের কাহিনী শুনিয়া কবি বিস্মিত হইলেন। তাহার লোকোত্তর ধৈর্য্য ও স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বৃদ্ধ অতীত জীবনের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আরও কত কথা বলিল। বৃদ্ধের কথাগুলি কি সুমিষ্ট ও কেমন

প্রীতির উচ্ছ্বাস পূর্ণ! তাহার কি সদয় ভাব! বৃদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে কবির হৃদয়ে এক শান্তির ছায়া পড়িল। এ বৃদ্ধ কি তাঁহার কল্পনার সৃষ্টি না সত্য সত্যই তাঁহার বিষণ্ণ হৃদয়ে বল দিবার জন্য আসিয়াছে? যখন বৃদ্ধের কথা শেষ হইয়াছে, তখন কবির নিজ হৃদয়ের দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ হইল:—

"and when he ended,
I could have laughed myself to scorn, to find
In that decrepit man so firm a mind.
"God" said I, "be my help and stay secure:
I'll think of the leech-gatherer on the lonely moor."

কবির নৈরাশ্য চলিয়া গেল।

ব্যালাড্ গীতি (Ballad Songs) গুলির মধ্যে Lucy grey, We are seven, The Pet Lamb, Alice Fell প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত কবিতাটী হৃদয়স্পর্শী। এই কবিতাটীর ভিতর কি মাধুর্য্য ও সরলতা ও কেমন গভীর অপার্থিব ভাব নিহিত। বালিকা "লুসি" (Lucy) এক জনহীন প্রান্তরে বাস করিত। তাহার খেলিবার সাথী কেহ ছিল না। একাকিনী সেই প্রশান্ত প্রান্তরে খেলা করিত। একদিন অপরাহ্নে বালিকার পিতা রজনীতে ঝটিকার আশঙ্কা করিয়া বালিকার মাতাকে বরফের উপর পথ দেখাইয়া আনিবার জন্য বালিকাকে লণ্ঠন হস্তে নগরে পাঠাইল। বালিকা হাসিতে হাসিতে চলিল। একটী একটী করিয়া বালিকা কত ক্ষুদ্র পাহাড় অতিক্রম করিল। তাহার পদতলে কত বরফরাশি বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু বালিকা নগরে পৌছিল না। সেই অন্ধকার রজনীতে ভীষণ ঝটিকায় বরফ রাশির ভিতর বালিকা কোথায় লুকাইল, কেহ জানিল না। বুঝি চির দিনের জন্য বালিকা বরফের শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িল। অথবা বুঝি "লুসি" (Lucy) এখনও জীবিত আছে। এখনও বুঝি নির্জ্জন প্রান্তরে তুমি "লুসি"কে দেখিতে পাইবে। এখনও তাহার বিজনসঙ্গীত তোমার কাণে পশিবে। Lucy Grayর শেষ কয়টী পংক্তি কি সুন্দর!

Yet some maintain that to this day
She is a living child;
That you may see sweet Lucy Gray
Upon the lonesome wild.

O'er rough and smooth, she trips along
And never looks behind ;
And sings a solitary song
That whistles in the wind.

এমন ভাবে অনন্ত জীবনের সঙ্গীত আর কোথাও শুনিয়াছ কি ?

"লুসি" (Lucy) নামটী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বড় প্রিয়। "লুসি"র উল্লেখ করিয়া ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ আরও তিনটী কবিতা লিখিয়াছেন। আমরা একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

She dwelt among the untrodden ways
Besides the springs of dove,
A maid whom there were none to praise,
And very few to love.
A violet by a mossy stone
Half hidden from the eye,
Fair as a star when only one
Is shining in the sky.
She lived unknown, and few could know
When Lucy ceased to be ;
But she is in her grave, and, oh,
The difference to me !

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

আমাদের দরিদ্রতা—পরিশ্রম।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, * জাতীয় ধনের উন্নতিকল্পে বাণিজ্যই প্রধান উপায়, এবং মূলধন ও পরিশ্রমই বাণিজ্যের প্রধান উপাদান। গত বারে মূলধন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, এবার পরিশ্রম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইবে।

---

* গত নবেম্বরের "দাসী"......৫৫৯—৬৫ পৃষ্ঠা।

পরিশ্রমকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; ১ম, শারীরিক, ২য়, মানসিক। এই দ্বিবিধ শ্রমের সাহায্যেই জাতীয় ধন বৃদ্ধি পায়। নিজের শারীরিক শক্তিসামর্থ্য দিয়া কার্য্য করাকে শারীরিক শ্রম বলে। এখানে শরীরই বিশেষ ভাবে কার্য্য করে বলিয়া শরীরের প্রাধান্য। এখন দেখা যাউক আমাদের দেশে সেই শরীরের সাধারণ অবস্থা কি প্রকার।

একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই পাঠকগণ বর্ত্তমান শ্রমজীবিশ্রেণীর দুরবস্থা বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গদেশে এমন কৃষক কয়জন আছে, যাহারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া সম্বৎসরের খোরাকী ধান্যের সংস্থান করিতে পারে। এই সম্বন্ধে সার চার্লস্ ইলিয়েট এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে "আমাদের কৃষকগণের প্রায় অর্দ্ধেক লোক জানে না, বর্ষের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহারা কি দিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবারণ করিবে।" ইহাদেরই দুরবস্থার জ্বলন্ত চিত্র মহাত্মা হিউম চিত্রিত করিতে গিয়া অশ্রুগদগদ স্বরে বলিলেন, "খাটুনি, খাটুনি, খাটুনি; ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা (যদিচ অনাহার নহে, অথবা অনাহার হইলে তাহাদের কষ্টকর জীবনের শেষ হইত)! ব্যাধি, যন্ত্রণা, দুঃখ। হায়! হায়! ইহাই তাহাদের দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবনের চিত্র। কে অস্বীকার করিবে যে এই পঞ্চাশ লক্ষ, বা তদধিক লোকের জন্মগ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র; এখনও গলদেশে প্রস্তর বন্ধন করিয়া ইহাদিগকে সলিল-গর্ভে ডুবাইয়া মারিলে, তাহাদের পরমোপকার হয়।" বঙ্গদেশের কৃষকের গৃহে যিনি একবার পদার্পণ করিয়াছেন, তিনি উহাদের অস্থি কঙ্কালসার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্র কন্যাগণের অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

এই হতভাগ্য শ্রমজীবীদের কেন এমন দুরবস্থা? বঙ্গদেশের কি উর্ব্বরা শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে? আমাদের দেশের কতকগুলি কুরীতি ও কুনিয়ম এবং গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি ব্যবস্থার দোষে ইহাদের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। ইহার সম্পূর্ণ বিচার এই সামান্য প্রবন্ধে অসম্ভব। বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত "ভারতের দারিদ্র্য সমস্যা" নামক গ্রন্থে এই বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের শ্রমজীবিগণ অনেক সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে কার্য্য পায় না বলিয়া তাহাদের উপার্জ্জন অল্প হয়। তাহাদের দরিদ্রতা দূর করিতে

হইলে নূতন নূতন কার্য্যক্ষেত্র খোলা আবশ্যক। বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যের কার্য্য আরম্ভ করিলে অনেক লোক কর্ম্ম পাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিলাতী দ্রব্য আমাদের দেশের অনেক টাকা বিদেশে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এখন আমাদের দেশে পরিশ্রম শস্তা, সুতরাং এদেশে যে সকল বিলাতী বস্তুর ব্যবহার অধিক, সেই সকল বস্তু তদ্রূপ সুন্দররূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে আমরা নিশ্চয়ই সেগুলি শস্তা দিতে পারিব, এবং আমাদের দেশের অনেক টাকা এখানে রক্ষিত হইতে পারিবে। কিন্তু, আমাদের রাজা বিলাতী, সুতরাং তিনি বিলাতের মহাজনেরই সহায়। আমরা যদি উঠিয়া পড়িয়া একটা বড় রকমের কারবার করিতে উদ্যত হই, যাহাতে বিলাতী মহাজনের হয়ত কিছু ক্ষতি হইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের রাজা আমাদের সহায়তা অনেক সময়ে না করিয়া বিলাতী মহাজনেরই পক্ষ অবলম্বন করেন। আমরা আর কাঁদিব কাহার নিকট? আমাদিগকে এ সমস্ত অসুবিধার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। যাহাতে শ্রমজীবিগণ অধিক কার্য্য পায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে অনেক পতিত জমি ও জঙ্গল আছে। সংগৃহীত মূলধন লইয়া ঐ সকল আবাদ করিবার দিকে আমরা যতই অগ্রসর হইতে পারিব, আমাদের শ্রমজীবিগণ ততই অধিক পরিমাণে কার্য্যলাভে সমর্থ হইবে।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের দুরবস্থার আর একটা কারণ, তাহাদের শ্রমলব্ধ শস্য অনেক পরিমাণে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে দেশে কেবল বিলাসিতার বস্তু জমিতেছে। পৃথ্বীশ বাবু তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকের একস্থানে প্রশ্ন করিয়াছেন,"কে কোথায় শুনিয়াছে যে, আহারীয় বস্তুর বিনিময়ে বিলাসিতার সামগ্রী গ্রহণ করিয়া কোন জাতি ধনী অথবা উন্নত হইয়াছে?" আমাদের শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থার কারণ এই প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, অথচ বিলাস-সামগ্রীর অভাববোধ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ইংরাজ জাতি নানা প্রকার শস্তা বিলাসিতার দ্রব্য প্রত্যহ প্রেরণ করিয়া আমাদের রক্ত শোষণ করিতেছেন, আর আমরা স্রোতে গা ঢালিয়া দিন দিন নিরন্ন, দুর্ব্বল ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি। বঙ্গদেশের কৃষক চিরদিন খোলা মাথায় লাঙ্গলের মুঠ ধারণ করিয়া, হল

চালন করিত, ধন্য বিলাতী শিক্ষা! ঐ দেখ, সেও এখন আট আনা মূল্যের একটা ছাতা মাথায় দিয়াছে! ইহাতে হইল এই, ছাতার আট আনা তো সোজা বিদেশে চলিয়া গেল, আবার বেচারার রৌদ্রে পুড়িয়া যে শ্রম করিবার শক্তি ছিল তাহাও চলিয়া গেল। সহসা দুরবস্থা হইলেও ঐ কৃষককে একটা ছাতা ভাঙ্গিলে, কর্জ্জ করিয়াও আর একটা ছাতা কিনিতে হইবে। যাহার পূর্ব্বপুরুষেরা কখনও এক জোড়া চটি জুতার মুখ দেখে নাই, এক্ষণে বৎসরে দুই তিন জোড়া জুতা মোজা না হইলে তাহার চলে না।

পূর্ব্বে গৃহস্থ কন্যার বিবাহে মোটামুটি কয়েক খানা রূপার গহনা দিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন, তাহার উপর যদি এক খানা সোণার গহনা হইত, তবে বিবাহটা বড় জাঁকাল বলিয়া চারিদিকে প্রচারিত হইত। আর এখন কন্যাকে সোণা দিয়া মুড়িয়া দিলেও, বরের মা বলেন, "এমন কি দিয়াছে?" শুধু কি তাই, এখন আবার কন্যাকে এক জোড়া সেমিজ, দুটা সাটিনের জ্যাকেট্ না দিলে ভাল দেখায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মফঃস্বলের জমিদার বাবুদের ছেলেরাই পিরাণ ব্যবহার করিতেন, জুতা পায় দিতেন; এখন দেখি অতি সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত একটা জামা গায় দিয়া হাটে লাউ বেগুন বিক্রয় করিতে যায়। আমরা যখন প্রথম পুরীতে যাই তখন দেখিয়াছিলাম সেখানকার বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রেরই শরীর ও পদ সম্পূর্ণ খোলা, কেবল দুই চারিটী বাঙ্গালির ছেলে পিরান ও জুতা পরিত। এই সময়ে আমার একজন আত্মীয় সেখানে দোকান খুলিলেন, এবং কলিকাতা হইতে খুব শস্তা জুতা ও পিরাণ আমদানি করিলেন। কয়েক মাস পরে দেখা গেল, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রের পায় জুতা, গায় জামা। এখন সেখানে দস্তুর মত সেলাইয়ের কল বসিয়াছে, জুতার দোকান হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিলাম! অবশ্য ইহাতে কতকগুলি শ্রমজীবীর অন্নসংস্থান হইতেছে বটে, কিন্তু দেশের নিরন্ন লোকের অভাব বাড়াইয়া কয়েক জন মাত্র শ্রমজীবীর অন্ন সংস্থান হওয়ায় দেশের অপকার ভিন্ন উপকার নাই। শুধু কি তাই? ইহাতে ও দেখা যাউক কত টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। লংক্লথ, সিট্, সূঁচ, সুতা, সেলাইয়ের কল, বোতাম, এ সকলই বিদেশীয়—একটা পিরাণের মূল্যে কতটুকু অংশ দেশে থাকিল?

কাজ কথা, দেশের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হইতেছে না।

অথচ বৃথা অভাব দিন দিন বাড়িতেছে। ইহাতে যে আমাদের দেশ কি পরিমাণে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, তাহা বলা যায় না। প্রকৃত দেশ হিতৈষীর উচিত, এক্ষণে দেশের খাদ্য দেশে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। এই যে চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে, ইহাতে কি চিন্তার বিষয় কিছুই নাই? আমাদের সংবাদ পত্রগুলি কেবল চীৎকার তুলিয়াছেন,—অমুক স্থানে রিলিফওয়ার্ক খোল, অমুক স্থানে অন্নক্ষেত্র খোল। কিন্তু কয়খানি সংবাদ পত্র ঝগড়া, পরনিন্দা, পরগ্লানি ত্যাগ করিয়া দেশের শস্য দেশে রাখিবার উপায় চিন্তা করিতেছেন? আমাদের গবর্ণমেণ্টের রিলিফওরার্ক কেবল গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা। আজ গবর্ণমেণ্ট বিদেশে শস্য প্রেরণ আইন দ্বারা বন্ধ করুন, কাল দেখিবেন এই অজন্মার বৎসরেও চাউলের দর কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া যাইবে। আমরা ভাতের কাঙ্গাল ও দুঃখী, আমরা ফ্রিট্রেড্ লইয়া কি করিব? এ দুর্দ্দিনে, এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের দিনে সংবাদ পত্র বল, কংগ্রেস বল, ধনী বল, নির্ধন বল, এস সকলে মিলিয়া শাসয়িতাকে বলি, "হে প্রভু! তোমা হ'তে আমরা অনেক সুখের মুখ দেখিয়াছি, তুমি দয়া করিয়া আমাদের ধন মান অনেক নিরাপদ করিয়াছ। তুমি বিদ্যা ও জ্ঞান দান করিয়া আমাদের চক্ষু ফুটাইয়াছ। সেই সাহসে ভর করিয়া আজ তোমার দ্বারে প্রার্থনা করি, আমাদের মুখের গ্রাসকে কাড়িয়া লইয়া বিদেশে পাঠাইও না। প্রভু! এই দুর্দ্দিনে আমাদিগকে রক্ষা কর।"

(ক্রমশঃ)

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত সর্ব্বাগ্রে ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য গত নবেম্বর মাসের কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

বর্ত্তমান মাসের রোগী ও আতুর সংখ্যা। ১। বাবুরাম, ২। দেবীরা, ৩। স্বর্ণ, ৪। ফুলমণি, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। নবদুর্গা, ৭। সুমিত্রা, ৮। অম্বিকা, ৯। রুক্মিণী, ১০। নিস্তারিণী, ১১। সখী, ১২। জুলী, ১৩। আনন্দ, ১৪। দয়া, ১৫। মাণিক, ১৬। নফর নন্দী, ১৭। কালীচরণ, ১৮। রামলাল, ১৯। রামজীবন, ২০। চন্দ্রদেবী, ২১। তপেশ্বরী, ২২। নলিনী, ২৩। ভগবতী, ২৪। রাধালক্ষ্মী, ২৫। লক্ষ্মী, ২৬। কালীদাসী।

জুলী এখনও পূর্ব্বের অবস্থায় আছে। বাক্‌শক্তিরহিত। এখনও খাওয়াইয়া দিতে হইতেছে, বোধ হয় নিজ হস্তে আর কখনও আহার করিতে সমর্থ হইবে না।

রামলাল। বয়স ২২ বৎসর। নিবাস জলপাইগুড়ী। দুই চক্ষু অন্ধ। চক্ষুর চিকিৎসার জন্য শান্তি-সম্প্রদায়ের একজন ভ্রাতা এখানে আনয়ন করেন। হাঁসপাতালে গ্রহণ না করাতে এখন এখানে থাকিয়াই চিকিৎসা চলিতেছে। আরোগ্য লাভের আশা অল্প।

রামজীবন। বয়স ৪০ বৎসর। জাতিতে গোয়ালা। ময়মনসিংহে

দুধের ব্যবসায় করিত। পক্ষাঘাত রোগে উত্থানশক্তিরহিত হইয়া সেখানকার টাউন হলের বারাণ্ডায় বিশেষ অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছিল। বাবু অশ্বিনীকুমার বসু ও বাবু চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার বিশেষ যত্ন-সহকারে এখানে আনয়ন করেন। অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে।

চন্দ্রদেবী। ব্রাহ্মণ কন্যা, বয়স আন্দাজ ৭০ বৎসর। রোগ পক্ষাঘাত। ইহার কোনও আত্মীয়ের গৃহে এতদিন ছিলেন। হঠাৎ সেই আত্মীয় রাখিতে অসমর্থ হওয়ায়, ইহাকে শিয়ালদহ হাঁসপাতালে প্রেরণ করেন। বাবু হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংবাদে দয়ার্দ্র হইয়া ইহাকে সেখান হইতে এখানে আনয়ন করেন। তাঁহার আত্মীয়গণ সর্ব্বদা সংবাদ লইতেন। অবশেষে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে পক্ষাঘাত বিস্তৃত হইয়া আহার বন্ধ হয়, এবং আস্তে আস্তে ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদেবী পরলোক যাত্রা করেন।

অপেশ্বরী। পুরুষ, ব্রাহ্মণ, বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসর। রোগ উদরী। শান্তি-সম্প্রদায়ের একজন ভ্রাতা ইহাকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পাইয়া দাসাশ্রমে দিয়া যান। রোগীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে দেখিয়া ইহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

নলিনী। বয়স আন্দাজ ১৮ বৎসর। জাতিতে তাঁতী, রোগ পুরাতন জ্বর প্রভৃতি। এই পাড়ায় বাবু ললিতমোহন শীলের বাসায় চাকরাণী ইহার একমাত্র আত্মীয়া। সে ললিত বাবুর সাহায্যে ইহাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে। বালকের অবস্থা একটু ভাল।

ভগবতী। বয়স আন্দাজ ৮০ বৎসর। জাতিতে আগুরী, নিবাস বর্দ্ধমান জেলায়। নিতান্ত অসহায় অবস্থা দেখিয়া বাবু আশুতোষ রায় ইহাকে আশ্রমে দিয়া যান। ভগবতী মাঝে মাঝে হঠাৎ লাফাইয়া উঠে ও কি জানি কাহার সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দেয়, এবং এ অবস্থায় দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়া যায় ও বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাহার জীবন রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া অবশেষে তাহাকে রেলিংএর সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছে।

রাধালক্ষ্মী। বয়স প্রায় ৩০ বৎসর। পণ্ডিত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ইহাকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া দাসাশ্রমে প্রেরণ করেন। রোগ বাত। অবস্থা পূর্ব্ববৎ।

লক্ষ্মী। বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। রোগ পক্ষাঘাত। উল্টাডিঙ্গির কোনও দয়ালু ভদ্রলোক ইহাকে নিতান্ত অসহায় দেখিয়া দাসাশ্রমে রাখিয়া যান।

কালোদাসী। এই অর্দ্ধক্ষিপ্তা অন্ধ স্ত্রীলোককে কলিকাতার অনেকেই তাহাদের বাটীর নিকটে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছেন। এ যাহা কিছু ভিক্ষা করিয়া আনিত, মঙ্গলা নামক আর একটা স্ত্রীলোক সে সমস্ত আত্মসাৎ করিত, এবং তাহার পরিবর্ত্তে এক মুঠা খাইতে দিত। ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবিল সোসাইটি হইতে ইহাকে ২৲ করিয়া দেওয়া হইত। সে টাকাও ঐ

স্ত্রীলোক আত্মসাৎ করিত। ইহা জানিতে পারিয়া উহার টাকা বন্ধ করার কথা হয়। তাহাতে কালীদাসী বলে যে সে টাকা চায় না, কোথাও তাহাকে রাখিয়া দেওয়া হউক। তদনুসারে উক্ত সভা তাহাকে এই আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন। এখানে থাকিয়া সে মনের সুখে দিবারাত্রি গান করে। মঙ্গলা দুই একবার তাহাকে পরামর্শ দিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল। মঙ্গলার প্রবেশ নিষেধ করা হইয়াছে।

দান প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

মাসিক চাঁদা।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেট সেপ্টেম্বর ১৲, কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ অক্টোবর ॥০, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা আশ্বিন কার্ত্তিক ১৲, A Lady C/o Babu Sreenath Das অক্টোবর ১৲, N. K. Bose Esqr. অক্টোবর ১৲, ২নং সরকার্স লেন মেস্ অক্টোবর।০, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্টোবর ১৲, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু অক্টোবর ১৲, বাবু করুণাদাস বসু নবেম্বর ॥০, বাবু নন্দকুমার দত্ত অক্টোবর ১৲, ডাঃ চুনিলাল বসু নবেম্বর ১৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু অক্টোবর ॥০, বাবু গৌরীশঙ্কর দে অক্টোবর ॥০ বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায় চৌধুরী অক্টোবর ১৲, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় কার্ত্তিক ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী কার্ত্তিক ১৲, District Charitable Society দুই জনের ৩৲ হিসাবে সাহায্য অক্টোবর নবেম্বর ৩৬৲, বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার অক্টোবর ২৲, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু নবেম্বর ১৲, R. N. Mukerjee Esqr নবেম্বর ১৲, বাবু কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী আশ্বিন।/০, ২১।১ নং পটুয়াটোলা মেস্ নবেম্বর।০, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত অক্টোবর ১॥০, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা অগ্রহায়ন ॥০, রায় পশুপতি নাথ বসু সেপ্টেম্বর অক্টোবর ২৲, বাবু যদুনাথ বরাট অক্টোবর নবেম্বর ২৲, বাবু ক্ষুদিরাম বসু সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১৲, বাবু কেদারনাথ দাস আগষ্ট হইতে নবেম্বর ১৲, বাবু মহেশচন্দ্র বারিক নবেম্বর ১৲, N. C. Baral Esqr. সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ২৲, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ধর আগষ্ট সেপ্টেম্বর ১৲, রাণী শ্যামাসুন্দরী ও উমাসুন্দরী চৌধুরাণী অক্টোবর ২৲, বাবু অভয়চরণ মল্লিক অক্টোবর ১৲, বাবু বিহারীলাল দে আশ্বিন ॥০, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী অক্টোবর নবেম্বর ২৲, ১২৬ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ নবেম্বর ॥০, বাবু হরিপদ ঘোষাল অক্টোবর।০, ২নং সরকার্স লেন মেস নবেম্বর।০, বাবু রামচন্দ্র মিত্র অক্টোবর নবেম্বর ২৲,

এককালীন দান।

শ্রীমতী সৌরভিনী ঘোষ ১৲, বাবু পরেশনাথ সেন ১৲, বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু ॥০ বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ।০, বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।০, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র

পাল ।০, বাবু প্রমথনাথ বসু ।০, বাবু বরদাকান্ত বসু ।০, বাবু শ্রীনাথ চন্দ ৮১, বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু ।০, বাবু ব্রজগোপাল ঘোষ ।০, বাবু শ্যামাচরণ রায় ॥০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৵০, বাবু অখিলচন্দ্র গুহ ॥০, বাবু অন্নদাচরণ গুহ ॥০, বাবু দুর্গানাথ চৌধুরী ॥০, বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্রের স্ত্রীর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫১, বাবু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১১, বাবু ফটিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।০, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫১, একজন ভদ্রলোক ৫১, ঢাকা অনাথার ঝুলি ফণ্ড মাঃ সুধীরচন্দ্র হালদার ১২৫১, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী দীক্ষার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২১, বাবু নিবারণচন্দ্র ঘোষাল ।০, বাবু ক্ষেত্রনাথ সিংহের স্ত্রী স্বর্গগত মনোরমা সিংহের প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধে ২১, কটকের একজন বন্ধু ৫১, বাবু প্রমথনাথ চৌধুরী ৵০, বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।০, ৪নং ছকুখানসামার লেন মেস ॥০, বাবু অশ্বিণীকুমার বসু ‹১০ বাবু মুক্তিনাথ দাস ৵০, বাবু শিশিরকুমার ঘোষাল ।৵০, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ।০, বাবু শশীকুমার সেন ।৵০, বাবু নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।০, ৮৯ নং হ্যারিসন্ রোড মেস্ ॥৵০, ৫০ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ ৵১৫, বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ ৵০, বাবু অমরেন্দ্রনাথ বসু ।০।

বস্ত্রাদি দান।

বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী গরম কোট ১, পড়িয়া পাওয়া মাঃ বাবু ফকিরচাঁদ সাধুখাঁ ঘটি ১, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, দীক্ষার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, স্ত্রী রোগীর জন্য নূতন গামছা ১৪, বাবু বিনোদবিহারী সেন, কাপড় ১, সার্ট ৪।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

মানিকদহের জমিদার বাবু বিপিনবিহারী রায়ের প্রজাদের নিকট হইতে সংগৃহীত ১৪॥৶০, কয়লার গুঁড়া বিক্রয় ৶১০, পড়িয়া পাওয়া ॥০, তাপসবালা বিক্রয় মাঃ বাবু বরদাকান্ত বসু ১॥০, বাক্সের দান ১১, রোগীর জমা প্রাপ্ত ॥৴৫, নানাবিধ পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় ৶১৫ দাসীর সাহায্য ।৵০।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়।

মাসিক চাঁদা ৭৪।৵০, এককালীন দান ১৮১।৵৫, অন্যান্য প্রকারে আয় ১৯৵১০, পূর্ব্ব মাসের হস্তে স্থিত ৯।৫, মোট জমা ২৮৪।০।

ব্যয়।

বাজার খরচ ১০৩৸৶১০, মেহতর ১১, আদায়কারীর খরচ ২৬॥৶১০, জিনিসাদি খরিদ ১॥৵০, ধোপা ২৵০, দুগ্ধ ১২৸১০, রাঁধুনী ৬১, বাটি ভাড়া (সেপ্টেম্বরের বাকী ৩০১ ও অক্টোবরের শোধ ৫০১) মোট ৮০১, রোগীর গাড়ী ভাড়া ৩৫, কর্ম্মচারীর বেতন ২৫১, কর্জ্জ দেওয়া যায় ৫॥০, মোট খরচ ২৭০॥৶১৫।

আয় ব্যয়।

মোট আয় ২৮৪।০, মোট ব্যয় ২৭০॥৶১৫, মোট হস্তেস্থিত ১৩॥৫।

বিশেষ ধন্যবাদ।

সিমলার ডাক্তার বাবু দেবেন্দ্রনাথ আইচ এল, এম, এস, কয়েক মাস হইতে দাসাশ্রমের রোগীদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেছেন। দাসাশ্রমের রোগীদের জন্য যখনই তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া যায় তখনই তিনি আসিয়া উপস্থিত হন। এই নিঃস্বার্থ চেষ্টা যত্নের জন্য আমরা তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

আমাদের মাসিক চাঁদাদাতা কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ দাসাশ্রমের পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত উত্থানশক্তি রহিত আতুর রুক্মিণীকান্ত সরকারকে বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেছেন। ইহাকে বিশেষ মূল্যবান ঔষধ, তৈল ও ঘৃতাদি ইনি বিনা মূল্যে দিতেছেন। এই রোগী নানা প্রকার হাঁসপাতালে অনেক দিন চিকিৎসিত হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কোনও ফল লাভ হয় নাই; কিন্তু ইঁহার এই অল্প কালের চিকিৎসাতেই রোগী লাঠির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। এই জন্য কবিরাজ মহাশয়কে আমরা অন্তরের সহিত বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

নবেম্বর মাসে এক সময়ে আমাদের এমন দুরবস্থা উপস্থিত হয় যে সে সময়ে এক মুষ্টি চাউল পর্য্যন্ত আমাদের ছিল না। পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে জানান মাত্র তিনি ২৫৲ টাকা প্রেরণ করিয়া আমাদিগের আতুরগণের বিশেষ অভাব মোচন করেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ঢাকায় এক সময়ে অনাথার ঝুলি নামক একটী সাহায্যসমিতি স্থাপিত হয়। তাহাতে ১২৫৲ উদ্বৃত্ত ছিল। ধনের রক্ষকগণ ঐ টাকা অবশেষে দাসাশ্রমের অনাথ আতুরগণের সেবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সেজন্য আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

আমাদের বিশেষ অভাব।

এবার চারিদিকে অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে মফঃস্বলস্থ দাসাশ্রমের অনুগ্রাহকগণের অনেকে বাধ্য হইয়া দান বন্ধ করিয়াছেন। এখন আমরা আর কাহাকে কি বলিব? সকলেই এই দুর্ব্বৎসরে আপনা লইয়া বিব্রত।

আমাদের অনুগ্রাহকদলে মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যাই অধিক, সুতরাং তাঁহারা যে আজকাল কত কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। আমরাও ২০। ২৫টি অন্ধ আতুর লইয়া এখানে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা পূর্ব্বে যে চাউল ৩।০ করিয়া খরিদ করিতাম, তাহাই এক্ষণে ৫।০ করিয়া খরিদ করিতেছি। এমন করিয়া দিন যাপন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। দানশীল ধনাঢ্য মহোদয়গণ দাসাশ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে এবার আর রক্ষা নাই।

দাসীর কথা।

ভগবানের কৃপায় দাসীর ৫ম বর্ষ শেষ হইল। এখনও মফঃস্বলে প্রায় ৩০০৲ টাকা এবং সহরে প্রায় ৫০৲ পাওনা আছে। এই টাকা পাইলে আর দাসীর ঋণ হইবে না, সুতরাং দাসীর গ্রাহকগণ সত্বর স্ব স্ব দেয় পাঠাইয়া "দাসী"র জীবন রক্ষা করিবেন। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী গ্রাহকগণকে বিশেষ অনুরোধ, তাঁহারা যেন সকলেই ৬ষ্ঠ বর্ষের দেয় দুই এক মাসের মধ্যে অগ্রিম পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন।

এজেন্ট—বাবু কুমুদবিহারী রায় আমাদের এজেন্ট নিযুক্ত হইয়া টাকা আদায়ের জন্য বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন। বাবু পরেশনাথ রায় কলিকাতার এজেন্ট থাকিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দাসাশ্রম ও দাসীর টাকা আদায় করিতেছেন।

শ্রীমৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী
দাসীর কার্য্যাধ্যক্ষ।

গীতা লেখক বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস, এম, এ, বি, এল প্রণীত "পলাশ-বন" বাহির হইয়াছে। দাসী কার্য্যালয় হইতে ঐ পুস্তক ক্রয় করিলে দাসাশ্রমের কিছু লাভ হইবে। ১৮৯৬ সালের দাসীর গ্রাহকগণ ঐ পুস্তক আমাদের নিকট হইতে লইলে ১৲ টাকায় পাইবেন।

শ্রীমৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী
দাসী কার্য্যাধ্যক্ষ।

দাসী

আমাদের দরিদ্রতা।

বিষয়টা নূতন না হইলেও বার বার আলোচনার উপযুক্ত বটে। কারণ, ইহার সহিত আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ। জাতীয় অর্থই জাতীয় উন্নতির বিশেষ উপাদান। যে জাতি কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সভ্যসমাজে পরিচিত হইবার নিতান্তই অনুপযুক্ত ছিল, সেই জাতি যে আজ জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত হইতে চলিয়াছে, বিশেষ চিন্তা করিলে, দেখা যায়, অর্থই তাহার মূলীভূত কারণ। একবার কাণপুরে আমার সহিত একজন আয়র্ল ণ্ডবাসীর পরিচয় হয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "যে জাতি অর্থে পৃথিবীর অর্দ্ধেক ক্রয় করিতে পারে, সে জাতির সহিত আমরা বিবাদ করিয়া কি করিব।" কথাটা শুনিবামাত্র আমারও মনে হইল, টাকা না হইলে কোনও জাতি দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের উন্নতির আশা কোথায়? দরিদ্রতায় আমাদের দেশ জর্জ্জরিত। সুতরাং কোনও কথা লিখিতে কি বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই আমার দরিদ্রতার কথা মনে পড়ে। দরিদ্রতায় মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, দারিদ্র্য মানুষের মধ্যে সহস্র প্রকার নীচতা আনয়ন করে। সুতরাং দরিদ্রতা আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় হওয়া আবশ্যক বোধে, এই প্রস্তাবের অবতারণা করা গেল। একটী প্রচলিত উদ্‌ভট শ্লোকে আছে।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

কথাটা বড় খাঁটি। বাণিজ্য ভিন্ন কখনও কোনও জাতি ধনলাভে সমর্থ হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে যে জাতির উন্নতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, দেখা যায়, ঐ জাতি বাণিজ্য-পথে বিচরণ করিয়াই তাহা লাভ করিতে

সমর্থ হইয়াছে। বাণিজ্যের উপাদান মূলধন ও পরিশ্রম। এই দুই উপাদানের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যাউক। মূলধন দ্বিবিধ, যথা—ব্যক্তিগত এবং একত্রিত। কোনও এক ধনবান লোক সমস্ত মূলধন নিজে দিয়া কোনও কারবার চালাইতে পারেন, অথবা দশ জনের অর্থ বলেও এক বা একাধিক লোকের কার্য্য সম্পাদনে কোনও কারবার চলিতে পারে। এই উভয়বিধ মূলধনের মধ্যে শেষোক্ত প্রকারের মূলধনই জাতির পক্ষে সহজ-প্রাপ্য এবং জাতির অন্তর্গত অনেক ব্যক্তির পক্ষে লাভজনক। লক্ষ লক্ষ টাকা একজন কারবারে দিতে পারেন, এমন লোক এক জাতির মধ্যে কয়জন থাকা সম্ভব? আর এক জনের কারবারে এক জনই লাভবান হইতে পারেন, তাহাতে জন সাধারণের লাভবান হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং উহাতে জাতীয় ধন বৃদ্ধি পায় না। অপর পক্ষে একজনের কারবারে লোকসান হইলে সে একবারে অধঃপাতে যায়। এই প্রকারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত কোনও জাতির ভিতরে ঘটিলে সেই জাতির অপর ধনী ব্যক্তিগণ কোনও কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে ভীত হন। সুতরাং ব্যক্তিগত মূলধন কোনও জাতির উন্নতি বিষয়ে বিশেষ ফলপ্রদ নহে। এখন দেখা যাউক, আমাদের দেশের ব্যক্তিগত মূলধনের অবস্থা কি প্রকার? আমাদের দেশে ধনীর সংখ্যা খুব অধিক নহে। তবে যাঁহারা ধনী আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের ব্যবসায়-বুদ্ধি অতি অল্প। ধনীর সন্তান বিলাস-পুত্তলিকা। তিনি চাটুকারপরিবৃত হইয়া অনায়াসলব্ধ টাকায় অনায়াসলব্ধ সুখ-ভোগকেই একমাত্র স্পৃহনীয় মনে করেন। ক্রমে দেখিতে দেখিতে টাকাগুলি একস্থান হইতে সহস্র স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। কতক শুণ্ডিকালয়ে, কতক বারাঙ্গনাগৃহে, কতক হার্ট বা কুকের আড়গড়ায়, কতক গ্রেট ইষ্টারণ হোটেলে, কতক এসেন্স ওয়ালার ঘরে, কতক কাপড়ের দোকানে। এই ভাবে, যে লক্ষ টাকায় একটা প্রকাণ্ড কারবার চলিতে পারিত, বিদেশের অর্থ দেশে আসিতে পারিত, দেশের অর্থ দেশে রক্ষিত হইতে পারিত, দশজন গরিবের চাকুরীর সংস্থান হইতে পারিত, সেই লক্ষ টাকা কয়েক বৎসর, মাস, এমন কি কয়েক দিনের মধ্যে সহস্র স্থানে বিভক্ত হইয়া পড়িল। হয়ত উহার বার আনা অংশ ইংরাজ বণিক আত্মসাৎ করিল। এই প্রকারে ধনবানের ধন এ দেশে দিবানিশি অপব্যয়িত হইয়া, দেশের ধনসমষ্টি হ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

আর এক প্রকারের ধনী আছেন, যাঁহারা গণ্ডগোলের মধ্যে যাইতে প্রস্তুত নহেন। কারবার জিনিসটাই কিন্তু গণ্ডগোলের। তাহাতে যেমন আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইবার আশা আছে, তেমনই আবার পথের ফকির হইবারও ভয় আছে। সুতরাং এই শ্রেণীর ধনিগণ কারবারের ঝঞ্ঝাটে যাওয়ার অপেক্ষা কোম্পানির কাগজের সুদ গণিতে ভাল বাসেন। সুবিধা বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট ৪৷৷০ হইতে ৪, পরে ৩৷০, এখন আবার ৩৲ টাকায় নামিয়াছেন। তাহাতেই বা কোম্পানির কাগজের দর নামিতেছে কৈ? বাজারে কাগজের ডিম্যাণ্ড কত? এই কোম্পানির কাগজে আমাদের দেশের কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে আবদ্ধ রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। আর এক শ্রেণীর ধনী লোক আছেন, যাঁহারা কোনও ব্যবসার গণ্ডগোলে যাওয়ার অপেক্ষা ঘরে বসিয়া ঋণ দিয়া সুদ গণিতে ভাল বাসেন। যদি দেখা যাইত এই টাকাগুলি ব্যবসাদারের হাতে যাইতেছে, তাহা হইলেও ঐ মূল ধনের সদ্ব্যবহার হইত। কিন্তু এই সকল সুদ-ভোগী ধনিগণ ব্যবসাদারদিগকে সহজে টাকা ধার দিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ তাঁহারা মনে করেন, দোকানী যদি ফেল হইয়া যায়, তবে আর টাকা আদায় হইবে না। ইহাঁরা প্রায় জমি-জমা-ওয়ালা কাপ্তেন খুঁজিয়া বেড়ান। সুতরাং টাকা ধার করে কাহারা? সেই পূর্ব্বোক্ত ওড়ম্বা ধনীর সন্তানগণ। সুতরাং তাহাদের পূর্ব্বোক্ত পিতৃধনেরও যে দশা, এই ধনিগণের ধনেরও সেই দশা। এ টাকাগুলিও একটি একটি করিয়া সেই শুঁড়ি, বারাঙ্গনা, ইংরাজ দোকানদারের ঘরে যাইতেছে। মহাজন অবশেষে ধনীর সন্তানের ঘরবাড়ী, বিষয়-আশয় বেচিয়া বড় মানুষ হইতেছেন, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বংশের আবার পূর্ব্বোক্ত ধনি-সন্তানের ন্যায় উৎসন্ন যাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতেছেন। আর এক দল লোক অনবরত টাকা কর্জ্জ করেন। ইহাদিগকে মকদ্দামা-বাজ বলিয়া সকলে জানেন। ইহাদের কিছু কিছু সম্পত্তি আছে। মহাজনগণ ইহাদিগকে টাকা ধার দেন বটে, কিন্তু তাহাতেও দেশের ধনবৃদ্ধি হয় না। যে টাকায় টাকা না আনে, সে টাকা ছড়াইয়া পড়ায় দেশের কোনও লাভ নাই। এখানেও ঐ টাকা ধনীর বাক্স হইতে বাহির হইয়া টাকা আনিতে সমর্থ হয় না। মকদ্দমাবাজ ঐ টাকা জলের মত খরচ করেন বটে, কিন্তু টাকাগুলি ষ্ট্যাম্প আকারে সরকারের ঘরে যায়, ফিস্ ও উপঢৌকনের আকারে উকিল, ব্যারিষ্টার,

মোক্তারের ঘরে যায়, ঘুসের আকারে সেরেস্তাদার, নাজির, পেস্কার, মহাফেজ, ও পিয়ন সাহেবদের ঘরে যায়, এবং মনরক্ষার জন্য কতকগুলি ব্যবসায়ী সাক্ষীর ঘরে যায়। এখন দেখা যাউক, এই যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ঘরে টাকাগুলি গিয়া প্রবেশ করিল, সেখানে গিয়াও কি সে টাকাগুলি দেশের ধনবৃদ্ধির সাহায্য করেতেছে? বারিষ্টার যদি বিলাতি হন, তবে টাকা ত সোজা বিলাতে গেল; যদি দেশীয় হন, তবেও নানা আকারে উহার অধিকাংশ টাকা বিলাত চলিয়া যাইতেছে, কারণ ইহাঁদের চাল-চলন বিলাতি, ইহাঁদের ব্যবহার্য্য জিনিস বিলাতী, ইহাঁদের ভ্রমণ স্থান বিলাত, ইহাঁদের বন্ধু বান্ধব বিলাতী, ইহাঁদের আয়াসের সামগ্রী, বিলাসিতার উপকরণ বিলাতী; সুতরাং ইহাদের উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই নানা আকারে বিলাতে যায়। উকিল মহাশয়দেরও টাকার কিয়দংশ বিলাতি দ্রব্য, বিলাতি মদিরা, বিলাতি সাজ গোজ ক্রয়ে ব্যয়িত হয়; কিয়দংশ কতকগুলি অপোগণ্ড অলস আত্মীয়ের ভরণপোষণে ব্যয়িত হয়; কতকগুলি কোম্পানির কাগজ ক্রয়ে ব্যয়িত হয়, আর কতকগুলি বারাঙ্গনার ঘরে যায়, অথবা স্বর্ণকারের গৃহে প্রবেশ করে। আর যে আমলা ফয়লাদের টাকা, সেতো তাহাদিগের পেট ভরিতেই ব্যয়িত হয়, তাহাতে দেশের ধনসমষ্টির উন্নতি কি প্রকারে সম্ভব? আর এক শ্রেণীর লোক কন্যার বিবাহ কিম্বা পিতামাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ঋণ করে। কত শত লোক এই প্রকারে আপনারা উড়িয়া যাইতেছে এবং দেশকে দরিদ্র করিয়া ফেলিতেছে, কে তাহার গণনা করে? বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার গলাটিপিয়া পণ আদায় করেন। তাই যদি সেই পণের টাকা গুলি একটা কারবারে খাটিত তাহা হইলেও বুঝিতাম টাকাটার সদ্ব্যবহার হইল। কিন্তু তাতো নহে। উহাও ভাগ ভাগ হইয়া কতকগুলি লোকের ঘরে গেল। কিয়দংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ঘরে গেল, তাঁহারা এই টাকার সদ্ ব্যবহার করিলেন না; কেবল উহা উদর পোষণে ব্যয় পূর্ব্বক অলস ভাবে জীবন যাপন করিয়া, দেশকে নিজের পরিশ্রম হইতে বঞ্চিত করিলেন। কিয়দংশ মহা কোলাহল করিয়া কাঙ্গালীগণ ভাগ করিয়া লইল এবং সহজ লভ্য অর্থে উদর পূরণ করিয়া অলস ভাবে জীবন যাপন করিল। কতক টাকা ময়রা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসাদারদের ঘরে গিয়া, যাহা হউক কিছু কিছু উপকার সাধনে সমর্থ হইল। এই প্রকারে দেখা যায় ধনী মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত নির্ধন, হইতেছে।

তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যব্যবসাদারদের ঘরে কিছু কিছু অর্থ জমিতেছে। কিন্তু তাহাতেই বা এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির কি উপকার? ময়রার পয়সা হইলেই তাহার পুত্রটিকে পড়িতে দিতেছে, অথবা বলা উচিত—আলস্য মন্দিরে প্রেরণ করিতেছে। ময়রার ছেলে দুপাত ইংরাজি পড়িয়া আর ময়রার কাজ করিতে চায় না। চাকুরী চাকুরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এবং বুড়ো ময়রা অনেক কষ্টে যে কয়টা টাকা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিল, চাকুরীর উমেদারী করিতে গিয়া কৃতিমান্ পুত্র তাহা উড়াইল। সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবার গুলিও ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া পড়িতেছে। এক কথায়, দেশে কোনও গতিকে টাকা জমিতেছে না।

যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য এখন ব্যক্তিগত মূলধন। বোধ হয়, আমাদের দেশের ব্যক্তি গত মূলধন যে বাণিজ্যে লাগিতেছে না তাহা দেখান হইয়াছে। এখন একত্রিত মূলধনের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ইহাকে ইংরাজিতে Joint Stock বলে। মনে করুন একটা রেলওয়ে খোলা হইবে, উহার জন্য এক কোটি টাকা আবশ্যক। এখন বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল, ১০০ টাকা করিয়া এক লক্ষ সেয়ার অর্থাৎ অংশ বিক্রয় হইবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানুসারে এক বা ততোধিক অংশ গ্রহণ করিল। এই প্রকারে এক কোটি টাকা একত্রিত হইল। রেলওয়েতে লাভ হইলে সেই লাভের অংশ শত শত লোক পাইল। আর লোকসান হইলে সকলের উপর দিয়া গেল বলিয়া, কাহারও বড় গায় লাগিল না। সকল দেশের সকল বণিক্ জাতির মধ্যে এই প্রকারের যৌথ কারবার প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। এই প্রথাতেই একটা জাতি ক্রমে ক্রমে ধনী হইতে পারে। এই প্রকারের বড় কারবারে যে শুধু অংশিগণ লাভবান্ হইতে পারেন তাহা নহে, ইহাতে অনেক নিরন্ন লোকের অন্নসংস্থানের উপায় হয়। এই যে কলিকাতার রাস্তায় ট্রামগাড়ী চলিতেছে, ইহা ইংরাজের কীর্ত্তি না হইয়া যদি বাঙ্গালীর কীর্ত্তি হইত, তাহা হইলে অপেক্ষা কৃত উচ্চবেতনের পদগুলি আর ইংরাজ অধিকার করিয়া টাকা গুলি বিদেশে লইয়া যাইত না। আমাদের দেশে মাড়োয়ারী পার্শি প্রভৃতির মধ্যে এই প্রকারের কতক কতক যৌথ কারবার প্রচলিত আছে বলিয়া, তাহারা বাঙ্গালীর অপেক্ষা ধনী। বঙ্গদেশেও কয়েক বৎসর হইতে যৌথ কারবারের চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না। ইহাতে অংশীদেরও দোষ আছে, কর্ম্মকর্ত্তাদেরও

দোষ আছে। লাভ হইল না,লাভ হইল না বলিয়া অংশিগণ চীৎকার করিয়া কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। তাঁহাদের জানা উচিত ব্যবসায়ে কখনও এক দিনে লাভ হয় না। বিশেষতঃ কর্ম্মকর্ত্তারা বড় বড় কার্য্যে এই প্রথম ব্রতী, সুতরাং প্রথম প্রথম তাঁহাদের ভুল ক্রটিত হইবেই। অংশিগণ ধীরভাবে অপেক্ষা করুন, দেখিবেন, কারবার ক্রমে ক্রমে উপযুক্ত পথে চালিত হইবে। আর কর্ম্মকর্ত্তাদিগকেও বলি, তাঁহারা অনেক সময়ে নিজেও দায়িত্ব বিস্মৃত হন। এ দেশের একটী যৌথ কারবারের কর্ম্মকর্ত্তা যদি কারবার নষ্ট করেন, তাহা হইলে যে কেবল অংশিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা নহে; উহাতে দেশের অসাধারণ অমঙ্গল সংসাধিত হয়; এ কথা যেন তাঁহারা কখনও বিস্মৃত না হন। বাঙ্গালির প্রতিষ্ঠিত একটা ব্যাঙ্ক, একটা ম্যাচ্‌ফ্যাক্‌টারী ফেল্‌ হইয়া লোকের মন ছোট করিয়া ফেলিয়াছে। আমার আর একটা কথা মনে হয়,ঠিক উপযুক্ত লোকের হস্তে কর্ত্তৃত্ব ভার প্রদত্ত হইতেছে না। লোক বাছিয়ার সময় আমাদিগকে সম্বন্ধজ্ঞান, সম্ভ্রমজ্ঞান, প্রভৃতি ভুলিতে হইবে। একজন সংবাদ পত্রে উত্তম যৌথ কারবারের প্রবন্ধ লেখেন বলিয়া যে তিনি রেলওয়ে কোম্পানির ম্যানেজার হইবার উপযুক্ত তাহার কোনও অর্থ নাই। একজন পুস্তক ব্যবসায়ী যে কল কারখানার বন্দোবস্তের উত্তম ম্যানেজার হইবেন,তাহার কোনও অর্থ নাই। যদি দেখা যায় যে, এক জন পুরাতন কার্য্যক্ষম লোক ও কার্য্যের উপযুক্ত লোক না লইয়া কেবল আপনার আত্মীয়, জামাই, ভাগিনেয় দিয়া আফিস্‌ পূর্ণ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি কার্য্যে বিজ্ঞ হইলে কি হইবে, তাঁহার স্বার্থপরতা সকল দিক নষ্ট করিবে। সুতরাং যৌথ কারবারের নেতৃত্ব যাহার তাহার হাতে দিলে,পরিণামে বিভ্রাট উপস্থিত হইবেই হইবে। বোর্ড অব ডিরেক্টার নেতা বাছিবার সময় খুব সাবধান হইবেন, কিন্তু নেতা এক বার নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হইবে, তাহা না হইলে কারবারের কখনও উন্নতি হইতে পারে না। প্রত্যেক কথায় কথায় যদি তাঁহার কমিটির মত লইয়া কার্য্য করিতে হয়, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনায় কমিটি যদি তাঁহার কার্য্যে বাধা দান করেন, তাহা হইলে কার্য্য কখনও সুশৃঙ্খলায় চলিতে পারে না। বাঙ্গালির কমিটির এই একটা প্রধান দোষ যে সভ্যগণ মনে করেন, তাঁহারা খুব বোঝেন। কিন্তু একবার বিবেচনা করা উচিত, যে লোকটা কাজের মধ্যে পড়িয়া কাজের সুবিধা অসুবিধা দুই

দেখিয়াছে, তাহার অপেক্ষা তোমার আমার অধিক বুঝিবার কোনও সুবিধা নাই। বাঙ্গালী সভ্য সকল বিষয়ে আপনার মত চালাইতে চান, এবং আপনার মতানুসারে কার্য্য না হইলে ভয়ানক চটিয়া যান এবং তখনই সভ্য পদ ত্যাগ করেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া কতক গুলি মসল্লাবাঁধা সংবাদ পত্রের সাহায্যে যৌথ কারবারের মিথ্যা বদনাম রটনা করিয়া অংশি গণকে বৃথা ভীত করেন। তখন অংশিগণ বৃথা ভয়ে ভীত হইয়া কর্ম্মকর্ত্তা গণকে উত্যক্ত করেন, অবশেষে সকলে মিলিয়া কারবারটির আদ্য শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করেন। যাঁহারা আমাদের দেশের নব প্রতিষ্ঠিত শিশু যৌথ কারবার গুলির পরিণাম আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। এখন বঙ্গ দেশের অবস্থা এমন হইয়াছে যে কোনও যৌথ কারবারের কথা উত্থাপন করিলে লোক আর বিশ্বাস করিতে চায় না। এ বড় ভাল লক্ষণ নহে। একথা মনে হইলেই আমার মনে হয়, এ দেশের উন্নতি ক্রমে দূরে যাইয়া পড়িতেছে। সভায় কি হইবে, সংবাদ পত্রে কি হইবে, কংগ্রেসে কি হইবে,দেশের অর্থ না বাড়িলে কিছুতেই কিছু হইবে না, দেশের লোকের স্বচ্ছল অবস্থা না হইলে কংগ্রেস্ চালাইবার টাকা কে দিবে, সংবাদ পত্র কে ক্রয় করিবে, খালি পেটে সভায় কে বক্তৃতা শুনিতে যাইবে? আমরা দেশেরমধ্যে যৌথকারবারে লক্ষ লক্ষ লোকের টাকা একত্রিত হইতে দেখিতে চাই।

এখন উভয়বিধ মূলধনের বিষয় আলোচনা করা হইল। আগামী বারে বানিজ্যের অপর উপাদান পরিশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচিত হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র।

সীতারাম।—দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম গ্রন্থদ্বয়ে একটা সম্বন্ধ আছে। উভয় গ্রন্থই ধর্ম্মভাব বিষয়ক; উভয় গ্রন্থেই গীতার উপদেশের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ গ্রন্থেই নৈতিক উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। সে দিনও বিখ্যাত উপন্যাসকার মিষ্টার গ্রাণ্ট অ্যালেন উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাসের (Novels with a purpose) কত প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম গ্রন্থদ্বয়ে উদ্দেশ্যে মাধুরী বিসর্জ্জিত হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনায় আমরা

বলিয়াছি, তাহা সম্ভবের রাজ্যে সংস্থাপিত ; দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম সম্ভবের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। প্রচারে সীতারাম যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ; তাহার পর সংস্করণে আরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, শতাধিক পৃষ্ঠা বর্জ্জিত হইয়াছে। বোধ হয় দুইবার পরিবর্ত্তনে গ্রন্থকার সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইহাতে গ্রন্থের মূলাংশের কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই।

গ্রন্থান্তর্গত প্রধান চরিত্র সীতারাম ; সে চরিত্র বুঝিতে হইলে আমাদিগকে গীতার সেই কথা মনে রাখিতে হইবে :—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তে যুপজায়তে।
সঙ্গৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধো হভিজায়তে॥
ক্রোধাভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

২। ৬২ ও ৬৪।

প্রথমেই সীতারাম স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে স্খলিত-পদ। তপ্ত কাঞ্চন শ্যামাঙ্গী নন্দাকে ও হিমরাশি-প্রতিফলিত-কৌমুদীরূপিণী রমাকে বিবাহ করিয়া সীতারাম শ্রীকে ভুলিলেন। হায় "out of mind as soon as out of sight!" ভ্রাতার জীবনরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে শ্রী তাঁহার নিকট আসিলে তিনি বলিলেন "তুমি শ্রী এত সুন্দরী!" দীর্ঘকাল পরে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের সময় কর্ত্তব্য-পালন-বিমুখ স্বামীর এই উক্তি। সীতারাম শ্রীকে দেখিলেন, ভাবিলেন :—

"Whence that completed form of all completeness?
Whence come that high perfection of all sweetness?"

কিন্তু তখনও কর্ত্তব্য জ্ঞানাপেক্ষা যেন রূপমোহটাই প্রবল বলিয়া বোধ হয়। প্রায় সেই সময় সীতারামের মনে আর একটা বাসনা উঠিল,— হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন বাসনা। সীতারাম শ্রীর ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিলেন ; কিন্তু শ্রীকে পাইলেন না। আপনার কোষ্ঠীফল শুনিয়া শ্রী যখন বিতত-বৃহবল্লিনবপল্লবঘন উদ্যানের অন্ধকার মধ্যে অন্তর্হিত হইল, তখন সীতারামের মনে হইল :—

"Apart we miss our nature's goal,
Why strive to cheat our destiuies?
Was not my love made for thy soul
Thy beauty for mine eyes?"

ইহার পর সীতারামের মনে দুই বাসনা জাগিতে লাগিল—এক শ্রীলাভ, অপর রাজ্য সংস্থাপন। রাজ্য সংস্থাপন হইল; কিন্তু শ্রীকে পাইলেন না। রাজ্য সংস্থাপন ও মুসলমানের পুর আক্রমণ, ইহার মধ্যে কেবল একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—তাহা রমার প্রতি সীতারামের বিরক্তি। রমা বড় ভীতা, কাজেই বীর সীতারামের উপযুক্ত পত্নী নহে; রমার উপর বিরক্তিতে সীতারামের শ্রীর প্রতি আসক্তি আরও বাড়িল। শ্রী ত তখনও দূরে—তাই তাহাকে সকল সুখ, সকল আশার আদর্শ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্বামী স্ত্রীর নিকট এবং স্ত্রী স্বামীর নিকট স্বভাবতঃই আপনার সকল সদনুষ্ঠানে সাহায্য প্রত্যাশা করেন; কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর মনোভাব বিপরীত হইলে হয় "স্বামী যেখানে ঝাঁঝাল সোডাওয়াটার চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল ডাবের জল এনে উপস্থিত করে।"

মুসলমান নগর আক্রমণ করিল। জয়ন্তী কর্ত্তৃক অদ্ভুত উপায়ে সংগৃহীত গোলাবারুদ প্রভৃতি লইয়া সীতারাম অব্যর্থ সন্ধানে শত্রুপক্ষ পরাজিত করিলেন। তাহার পর দুইটি ঘটনা ঘটিল—এক রমার বিচার, আর শ্রী-লাভ। সীতারামের অবনতি আরম্ভ হইল। সীতারাম যখন গঙ্গারামের কথা শুনিলেন, তখন "From his eye-balls flash'd the living fire." রাজ্য বাড়াইয়া, গঙ্গারামের শাস্তি বিধান করিয়া, সীতারাম শ্রীকে লইয়া সকল ভুলিলেন। সীতারাম যখন চিত্তবিশ্রামে আড্ডা গাড়িলেন, তখন তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকে পাইয়া তিনি যে কেবল নন্দা ও রমার প্রতি কর্ত্তব্যই বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এমন নহে; অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালনীয় প্রজার প্রতি কর্ত্তব্যও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সংসারে সকলেরই কর্ত্তব্য আছে, কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি হইলে, তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। সীতারামের অদৃষ্টাকাশে মেঘ সমাগম হইতে লাগিল। যে সীতারাম পত্নী শ্রীর নিকট এত প্রেম, এত সহানুভূতি আশা করিতেছিলেন, সেই সীতারামই মৃত্যুশয্যা শায়িতা অপরাপত্নী রমাকে দেখিতে না যাইয়া নন্দাকে বলিলেন—"আমি এত রাত্রে তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, বড় ক্লান্ত আছি; তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাও। তাহাকে আমি যেমন যত্ন করিতাম, তেমনই করিও।" এ ক্লান্তির প্রধান কারণ শ্রীর দর্শনলাভ প্রত্যাশা। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সীতারামের চিত্তবিকার বড় সহজ নহে—তাহার সম্মুখে আর

সব কর্ত্তব্য ভাসিয়া যাইতেছে। তখন হইতেই তিনি কর্ত্তব্য ভুলিতেছেন। স্বামীর যত্ন আর অপরের যত্ন রমণীর পক্ষে সমানই বটে !!! শ্রীকে পাইলেন ; কিন্তু শ্রী তখন পাষাণী। যে প্রেম, যে সহানুভূতি সীতারাম তাহার নিকট প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, মনোমন্দিরে তাহার মহিমামণ্ডিত যে মনোরম মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সীতারাম শ্রীর নিকট সে প্রেম, সে সহানুভূতি পাইলেন না। তাহাতে আবার সীতারামের প্রেমাপেক্ষা লালসাই প্রবল। গল্প আছে, কোন ভাস্কর নাকি পাষাণে মূর্ত্তি খোদিত করিয়া, সেই পাষাণ-প্রতিমার প্রেমস্বপ্নে জীবন কাটাইয়াছিল। সীতারামের প্রেম সেরূপ নহে। তাহাতে ইন্দ্রিয় কুহক প্রবল। চিত্তবিশ্রামে চিত্তবিকারগ্রস্ত সীতারামের চিত্তবৃত্তি দমিত না হইয়া, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শ্রী একদিন বলিল—"মহারাজ! তুমি ত সর্ব্বদাই চিত্তবিশ্রামে। রাজ্য করে কে?" সীতারাম বলিলেন—"তুমিই আমার রাজ্য। তোমাতে যত সুখ, রাজ্যে কি তত সুখ!" শ্রী তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের প্রতি কর্ত্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিল ; শেষ সীতারাম বলিলেন—"আমি রাজ্য ছাড়িব, তোমায় ছাড়িব না।" মৈশরীয় মোহেমুগ্ধ বীরবর অ্যাণ্টনিও একদিন এমনই বলিয়াছিলেন :—

> "Let Rome in Tyber melt ! and the wide arch
> Of ranged empire fall ! Here is my space."

সীতারামের আর রাজকার্য্যে সময় "অপব্যয়ের" ইচ্ছা বা অবসর রহিল না। তবুও শ্রী কাছে আসিল না, তবুও পাষাণে হৃদয় সঞ্চার হইল না। রাজ্য নষ্ট হইতে লাগিল।

এই সময় সংসারাতপতাপে ক্ষিণ্ন কুসুম রমা শুকাইয়া গেল। সীতারামের হৃদয় বোধ হয়, তখনও পাষাণে পরিণত হয় নাই। নন্দা ও চন্দ্রচূড় যখন তাঁহাকে রমার মৃত্যুর কারণ বলিলেন, তখন তিনি শিহরিয়া উঠিলেন ; সেই সঙ্গে তাঁহার বড় রাগ হইল। সে রাগ বজ্ররূপে কর্ম্মচারীদিগের উপর পড়িল। সীতারাম দেখিলেন "His word the law, and he the lord of all" তাই অ্যাগামেমননেরই মত তিনি ভাবিলেন—"Kings are subject to the gods alone." সীতারাম পূর্ব্বে ছিলেন :—

> "The hope of all who suffer,
> The dread of all who wrong."

এখন তিনি স্পেন্সারের ভাষায় "a bold bad man."

ইহার পর শ্রী চলিয়া গেল—জয়ন্তীকে সাজা দিয়া তিনি মনের রাগ মিটাইতে চাহিলেন। তাহাও হইল না, তখন রঘুর উনবিংশতি সর্গের অভিনয় আরম্ভ হইল—অগ্নিবর্ণের পাপ ইন্দ্রিয়বৃত্তিচরিতার্থকরণাভিনয় হইতে লাগিল।

> "O, it is excellent
> To have a giant's strength; but it is tyrannous
> To use it like a giant."

তাহার পর মুসলমান নগর আক্রমণ করিল। এতদিনে সীতারামের ঘুম ভাঙ্গিল—সুপ্তবীর্য্য জাগরিত হইল; কিন্তু এ যেন কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ—কেবল মৃত্যুর জন্য। সীতারামের তেজ জাগিল; কিন্তু তখন নগরে আর আছে কে? নগর তখন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে—বেতন না পাইয়া সেনাগণ কর্ম্মত্যাগ করিয়া গিয়াছে। রামায়ণে লিখিত আছে;— "অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যেরা স্বামীর প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং সেই কারণেই তাঁহার নানা অনিষ্ট উপস্থিত হয়।" (অযোধ্যাকাণ্ড)। মহাভারতে ও নারদ সভাপর্ব্বে, লোকপাল সভাখ্যান পর্ব্বাধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরকে সেই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি" নামক প্রবন্ধে সে কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। শেষকালে অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া, সীতারাম এক অদ্ভুত ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক সপরিবারে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সেনাসাগর পার হইয়া চলিয়া গেলেন। জয়ন্তী ও শ্রী পথ দেখাইয়া লইয়া গেল। জানি না— "—Like another Helen, fired another Troy." কিনা।

অনেকে বলেন, সীতারাম ঐতিহাসিক পুরুষ। বীরত্বে বাহুবলে সীতারাম বাঙ্গালীর গর্ব্ব, "সীতারামের ইতিহাস আমাদিগের গৌরবের ইতিহাস।" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে সেই বীরচরিত্রে কলঙ্কের যে গাঢ় কালিমা লেপিত হইয়াছে, তাহাতে হৃদয় বড়ই ব্যথিত হয়। সীতারামের ঐতিহাসিক পরিচয় পাইলে, আমাদের এ আক্ষেপ মিটিত। সীতারাম যদি সত্য সত্যই অত্যাচারী থাকিয়া থাকেন, তবে কেহ সত্যের অপলাপ করিয়া, তাঁহার চরিত্র মধুর উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতে বলিত না; আর যদি তিনি বীরোচিত গুণশালী থাকিয়া থাকেন, তবে সে তাঁহার স্বদেশীয়দিগের বড় আনন্দের, বড় গর্ব্বের কথা। কিন্তু সে আক্ষেপ মিটাইবার উপায় বোধ হয় নাই। আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র সীতারামের ইতিহাস উদ্ধা-

ষের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন ; * কিন্তু তাঁহাকেও অনেক স্থানে কিম্বদন্তির ভিত্তির উপর অট্টালিকা স্থাপন করিতে হইয়াছে। তবে যেখানে ঐতিহাসিক সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের উপায় নাই, সেখানে একজন ঐতিহাসিক বীরপুরুষের চিত্র নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত না করিলে, বোধ করি, কোন হানি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের সর্ব্বনাশের প্রধান হেতু কর্ত্তব্যাবহেলা ; তাহা ইন্দ্রিয়কুহক হইতে উৎপন্ন না হইয়া, প্রেমাতিশয্য হইতেও উৎপন্ন হইতে পারিত। এই প্রেমাতিশয্যহেতু কর্ত্তব্য হেলা হইতেই রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী"র বিক্রমদেবের রাজ্যে সর্ব্বনাশের প্রলয় বহ্নি শিখা উত্থিত হইতেছিল। প্রেমে যে পবিত্রতা আছে, পাশব ইন্দ্রিয় কুহকে তাহা নাই, বলিয়াই সীতারামের চিত্রের কালিমা সম্বন্ধে ইহা বলিতে হইয়াছে। সীতারামের মহতী চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, তাহা তাঁহার স্বদোষে কি না সন্দেহ। একেই "The evil, that men do, lives after them." তাই প্রমাণাভাবে কোন মৃত ব্যক্তির প্রতি কোন দোষারোপ দেখিলে বলিতে ইচ্ছা করে :—

"No farther seek his merits to disclose,
Or draw his frailties from their dread abode."

যে প্রেম "কর্কশকে মধুর করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে" সে প্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের দোষই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তাই মনে পড়ে :—

"Errors like straws upon the surface flow ;
He who would search for pearls must dive below."

সেই জন্যই দূরদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন "সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই।"

প্রফুল্ল ও শ্রী, প্রথমেই উভয়ের মধ্যে একটা বড় সাদৃশ্য লক্ষিত হয় ; উভয়েই পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, অথচ উভয়েই পতির প্রেমলাভাশায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। বহুদিন পরে ভ্রাতার বিপদের সময় শ্রী স্বামীর নিকটে গেল—সফল কাম হইয়া ফিরিয়া আসিল, তাহার কারণ চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।" পর দিবস যেখানে ভ্রাতার কবর হইবে, শ্রী সেখানে গেল। এইখানে শ্রীর চরিত্র সমাজের

* সাহিত্য (১৩০২)

সহিত খাপ খায় নাই। কয়জন হিন্দুমহিলা শোকসম্বরণ করিয়া, লজ্জা ত্যাগ করিয়া, অপরিচিত পরপুরুষের সহিত এক পাদপে উঠিয়া শত সহস্র অপরিচিত চক্ষুর কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিতে পারেন? তাহার পর হইতে পারে "Sweet is revenge—especially to women" তাই বলিয়া বঙ্গমহিলার অঞ্চলান্দোলনে সেনা চালনা সম্ভব বা শোভন কিছুই বলিতে পারি না। ইহার পর সীতারাম যখন পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, শ্রীকে গৃহে লইতে চাহিলেন; তখন শ্রী আপনার কোষ্ঠীফল শুনিয়া বলিল, "স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। সহবাসে থাকুক বা না থাকুক, স্বামীই স্ত্রীর প্রিয়। তুমি আমার চিরপ্রিয়—এ কথা লুকান আমার উচিত নহে। আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।"—'For you in my respect are all the world" মৃণালিনী চরিত্র সমালোচনায় আমরা বলিয়াছি "প্রেমের জন্য রমণী কতদূর করিতে পারে, এই চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন।" মৃণালিনী প্রেমিকের সন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, আর শ্রী আপনা হইতে স্বামীর অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া, আপনার সুখাশার জলাঞ্জলি দিয়া, চিরবাঞ্ছিত পতির আলিঙ্গনোদ্যত বাহুপাশ হইতে আপনাকে ছিন্ন করিয়া, স্বেচ্ছায় দুঃখ সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। এ আদর্শ আরও উচ্চ, আরও মহৎ; কিন্তু মৃণালিণীর পার্শ্বে শ্রী দিবাকরের পার্শ্বে ক্ষীণ-জ্যোতিঃ খদ্যোত। তাই আনন্দমঠ সমালোচনা কালে আমরা বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকান্তের উইলের পরবর্ত্তী উপন্যাস সকলে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার ম্লানতা অনুভূত হয়। যখন শ্রী সীতারামের নিকট হইতে চলিয়া গেল, তখনও সে ভাবিতেছে "I hunger for the kisses of your lips—the clasp of your arms." তাই যখন সে জয়ন্তীকে বলিল 'স্ত্রীলোকের পুণ্য একমাত্র স্বামি-সেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি—তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে?" আবার বলিল, "স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না।" শেষ বলিল "যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন; সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রি দিন ভাবিয়াছিলাম।" তাহার পর মনের আবেগে স্বামীতে সর্ব্ব বাসনা, সর্ব্ব কামনা সংস্থাপনের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল, তখন সংসারবিরাগিণী জয়ন্তীরও আঁখি ছল ছল করিতে লাগিল। ইহার পর কোমলতা হারাইয়া, কঠোরতা লইয়া, শ্রী হারাইয়া শ্রী স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিল। তখন মানবী পাষাণীকে

স্থান দিয়াছে। শ্রীও সীতারামকে স্পষ্টই বলিল, "যে দিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে।" শ্রী রমণীসুলভ কোমলতা পরিহার করিয়াছে; সে ভাবিল যে গঙ্গারামের জীবনরক্ষা করিয়া ও স্বামীকে দর্শন দিয়া সে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে !! কিন্তু এখনও অনেক রমণী মনে করেন :—

"রমণীর
ধর্ম্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্র রূপে !"

গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সপ্তম পরিচ্ছেদে শ্রীর হৃদয়হীনতাই পরিস্ফুট। শ্রী কিছুতেই সীতারামের হৃদয়ের কাছে আসিতে চাহিল না। সীতারামের সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া, সে একদিন বলিল—তোমরা পুরুষ, রমণীকে সকল সমর্পণ করিলে "কে রহিবে বহিবারে সংসারের ভার !" যখন শ্রী ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখনও বুঝি তাহার হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে পূর্ব্ব প্রেমের এতটুকু অবশেষ ছিল; এখন আর তাহার কিছুই নাই। শ্রী বুঝিতে পারিল, সে স্ত্রীর মত ব্যবহার করিলে সীতারামের সর্ব্বনাশ হয় না, তবুও সে পত্নীর কর্ত্তব্য সাধনে স্বীকৃতা হইল না। সীতারামের সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। জয়ন্তীকে শ্রী আপনার গমনেচ্ছার কথা জানাইয়া বলিল, "আবার কি ভালবাসার ফাঁদে পড়িব !" স্বামীর ভালবাসাটা নিতান্তই পাপ !!! জয়ন্তীর শিক্ষায় শ্রীর এমনই বিকৃতি ঘটিয়াছে! তাহার পর শ্রী চলিয়া গেল; আর সীতারামের যখন সর্ব্বনাশ হইল, তখন আপনার অমুষ্ঠেয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আসিল। সেই শ্মশানোপম স্থানে মুহূর্ত্তের জন্য পাষাণে প্রাণ সঞ্চারিত হইল; সীতারামকে শ্রী বলিল "এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?" কিন্তু তাহার পরই আবার সেই শ্রী সন্ন্যাসিনী বলিয়া, আপনার পরিচয় দিল। তাহার পর জয়ন্তী ও শ্রী ত্রিশূল হস্তে সেই সেনা সাগরের মধ্য দিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া গেল। এ যেন "সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড ! গোড়া নাই আগা !" শ্রী চরিত্রের শেষাংশে মাধুরীর লেশ মাত্র নাই।

জয়ন্তী-চরিত্র বড়ই কুহেলিকাচ্ছন্ন—কেবল কয়বার মাত্র অপহৃত কুহেলিকান্ধকার মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। জয়ন্তী চরিত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে

হইলে আমাদিগকে সীতারামের প্রথম সংস্করণে শেষ কয় ছত্র উদ্ধৃত করিতে হইবে :—"এখন যাও জয়ন্তী! প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী, দুইজনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ কর।" জয়ন্তীর জীবনের আদি বা অন্ত গ্রন্থে পাই না; তবে বোধ হয় সে সুখে সংসার ত্যাগ করিয়া যায় নাই। সংসারের সুখ দুঃখ স্বেচ্ছায় পদদলিত করিয়া যাইলে, শ্রী যখন খরবাহিনী নিম্নগা তীরে তাহার কেশরাশি তৈল দিয়া আঁচড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছিল, তখন জয়ন্তী বলিত না। "জন্মান্তরে হইবে—যদি মানবদেহ পাই।" এই কথায় যেন অপূর্ণ বাসনার কাতরধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে। নিশি ঠাকুরাণীর মত জয়ন্তীর সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে। অদ্ভুতভাবে গোলা বারুদ সংগ্রহ করিয়া জয়ন্তী সীতারামকে দিয়া, তঁহার নগর রক্ষা করাইল—তাহার পর সীতারামকে শ্রী দিয়া সে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার শিক্ষাগুণে এ শ্রী আর সীতারামের প্রেমময়ী শ্রী নহে—তাহার পাষাণহৃদয়শিষ্যা শ্রী। শেষ যখন প্রেমের ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রভাবে পাষাণে জীবন সঞ্চারের সম্ভাবনা হইতেছিল, যখন শ্রীর রমণীত্ব—কোমলত্ব পুনর্বিকশিত হইবার উপক্রম হইতেছিল, তখন জয়ন্তী আসিয়া, তাহাকে বলিল "রাজা বাঁচিল মরিল, তাতে তোমার কি? তোমার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত ব্যথা? এই কি সন্ন্যাস?" আশ্চর্য্য কথা—স্বামী মরিল আর বাঁচিল তাতে স্ত্রীর কি? জয়ন্তী নারী চরিত্রের কি বিকৃত আদর্শ!! কেন জয়ন্তী ত মনে করিতে পারিত "Love indeed is light from heaven" তাহার উদ্দেশ্য "To lift from earth our low desire" জয়ন্তীচরিত্রে যেটুকু মাধুরী সে কেবল যখন জয়ন্তী বেত্রাঘাতের সময় "খুব উঁচু সুরে বাঁধা" মন লইয়াও আপনার রমণীস্বভাবের বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না।

গঙ্গারাম মূর্ত্তিমান পাপ। তাহার সাহস ও উৎসাহ ছিল; তাই সৎপথে চালিত হইয়া, সে সীতারামের রাজ্যসংস্থাপনে অত সাহায্য করিতে পারিয়াছিল। সীতারাম আপনার জীবন বিপন্ন করিয়া, তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, আর সে একবারও ভাবিল না:—

> যেই তরু-ছায়া-তলে জুড়াই জীবন
> কেমনে সে তরুমূল কাটিব আবার?"

ভীতা রমা ভয়ে বুদ্ধি হারাইয়া, অবরোধের নিয়ম-ভগ্ন করিয়া তাহাকে

নগর রক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করিতে ডাকিয়া পাঠাইল, বলিল "আপনি আমার দাদা হন্—জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই।" গঙ্গারাম পাপচিত্তে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইল—তাহার ভীতির সুযোগ লইয়া, সে বার বার অবরোধে যাইতে লাগিল; শেষ তাহাকে পাইবার আশায়, প্রাণদাতার সর্ব্বনাশ করিতে সম্মত হইল। তাই মনে হয় "yea, many there be that have run out of their wits for women, and become servants for their sakes. Many also have perished, have erred, and sinned, for women...O ye men, how can't it be but women should be strong, seeing they do thus?" গঙ্গারামের এই মনোভাব প্রেম নহে—প্রেমের অবমাননা। তাহার পর প্রাণ পাইয়া, সে আবার মুসলমান সেনাসহ সীতারামের সর্ব্বনাশ সাধনোদ্দেশে আসিল। তাই বলিয়াছি গঙ্গারাম মূর্ত্তিমান পাপ।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন, রমা "বড় কোমল প্রকৃতি"—সে সীতারামের "সুখ"। কিন্তু রাজ্য সংস্থাপনের পর রমা সীতারামের অসুখের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সে কেবল তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া। সীতারাম তাহাকে সকল বুঝাইয়া বলিলে বোধ হয়, তাহা হইত না; কিন্তু সীতারাম তখন সলিলবিধৌত-শতদলোপম একখানি মুখের চিন্তায় বড় চঞ্চল। সীতারাম বড় বিরক্ত হইলেন। রমা যে তাঁহারই অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কারণ সীতারাম দিল্লী যাইলে মুসলমানের আগমনাশঙ্কা করিয়া রমা ভাবিল "এ সময়ে সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ সময় মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতারাম বাঁচিয়া গেলেন।" কিন্তু রমা-জননী; কবি সত্যই বলিয়াছেন:—

> "হায়রে, মায়ের প্রাণ; প্রেমাগার ভবে
> তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
> ভক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি!"

—সন্তান-স্নেহাধিক্য বশতঃই সে গঙ্গারামকে ডাকিয়া পাঠাইল—ভ্রম করিল। পাপিষ্ঠ গঙ্গারাম তাহাকে পাইবার আশায় প্রভুর সর্ব্বনাশ করিতে গেল। সব প্রকাশ পাইল—রমার বিচার হইল। সেই বিচার সভায় সমবেত প্রজামণ্ডলীর সমক্ষেও সীতারামের কথায় সে বলিল,

"যিনি গুরুর অপেক্ষাও আমার পূজ্য, যিনি মনুষ্য হইয়াও দেবতা অপেক্ষা আমার পূজ্য, সেই পতিদেবতা" বলিল "পতিসেবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর পুণ্য নাই" আবার "নারী জন্মে স্বামি-সন্দর্শনের তুল্য পুণ্যও নাই সুখও নাই।"

"Good name, in man and woman * *
Is the immediate jewel of their Souls"

সেই সুনাম রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়া সে সেই জনতা সমক্ষে আপনার কথা আদ্যন্ত বিবৃত করিল; কিন্তু রমার কোমল হৃদয়ে তত চাড় সহিল না—রমা শয্যাশায়িনী হইল। সীতারাম বোধ হয়, তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন; তবুও তিনি শ্রীকে লইয়া এতই ব্যস্ত যে, তাহার সংবাদ লইতেও আর তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তখন রাজ্য, নন্দা, রমা, সব গিয়াছে—আছে কেবল শ্রী। সীতারাম একটু যত্ন করিলে হয়ত রমা বাঁচিত। তাহা হইল না। মৃত্যু শয্যায় স্বামীর পদধূলি মস্তকে দিয়া সে বলিল, "এ জন্মের মত বিদায় লইলাম। আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই।" রমা প্রাণত্যাগ করিল—সীতারামের বিষবৃক্ষে ফুল ফুটিল। রমার পতিপ্রেম ক্ষুদ্র নহে। রমার কথায় বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য সুখ সম্বন্ধীয় একটি সুন্দর সত্য প্রকটিত করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, স্ত্রীপুরুষে পরস্পরে ভালবাসাই দাম্পত্যসুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা ইহাই দাম্পত্য সুখ।"

মধ্যাহ্ন তপনতাপতপ্ত মরু মধ্যে ওয়েসিসের মত, এই গ্রন্থ মধ্যে নন্দা। নন্দার প্রধান গুণ তাহার গৃহিণীপনা। সীতারাম দিল্লী যাইলে রমা যখন জিজ্ঞাসা করিল, "রাজা এখন কেন দিল্লী গেলেন?" নন্দা তখন বলিল, "রাজার কাজ রাজাই বুঝেন—আমরা কি বুঝিব বহিন!" তার পর রমার কলঙ্কের কথা শুনিয়া, সে রমাকে বলিল, "এখন আমাকে সতীন্ ভাবিস্ না—কালি চুন তোর গালে পড়ুক না পড়ুক, রাজারই মাথা হেট হয়েছে। তিনি তোরও প্রভু—আমাও প্রভু; এ লজ্জা আমার চেয়ে তোর যে বেশী তা মনে করিস্ না।" সে ভাবিল:—

"স্বামীর কলঙ্ক যার,　　নারীর কলঙ্ক তার,
ভাবি তাই সে কলঙ্ক ঘুচাব কেমনে।"

পাঠক একবার নন্দার সহিত শেষ জীবনে শ্রীর তুলনা করিয়া দেখিবেন হৃদয়বতীতে ও হৃদয়হীনায় কি প্রভেদ। প্রথমা রমণী, দ্বিতীয়া পাষাণী।

তাহার পর রমার হইয়া নন্দা সীতারামকে বুঝাইয়া রমার কলঙ্ক-ক্ষালনের চেষ্টা করিল। রমাকে বাঁচাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। শেষ রমার মৃত্যুকালে উদ্যোগী হইয়া সপত্নীর সহিত স্বামীর দেখা করাইয়া দিল। নন্দার সহিত যাহা কিছু সাদৃশ্য সে কেবল লবঙ্গলতার। দুই জনেরই গৃহিণীপনা ছিল; গৃহিণীর গৃহিণীপনা না থাকিলে সংসারে সুখ থাকে না। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মত অন্যত্র ব্যক্ত করিয়াছেন। সামান্য কয়টি মাত্র রেখা পাতে নন্দার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ সে চরিত্র অতি মধুর। সামান্য কয়টি মাত্র রেখাপাতে চিত্র ফুটাইবার বঙ্কিমচন্দ্রের এই অনন্য-সাধারণ ক্ষমতার বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বুঝাইবার ইচ্ছা রহিল।

চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কথা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। "আমরা আজিকার দিনেও এমন দুই একজন অধ্যাপক দেখিয়াছি যে, টোলে ব্যাকরণ সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, অশাসিত তালুকে দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত। চন্দ্রচূড়, সেই শ্রেণীর লোক।"

আর একটা কথা বলিলেই বর্ত্তমান গ্রন্থ সমালোচনা শেষ হয়। সৌন্দর্য্য-তত্ত্বজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্পের কথায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রিয়ল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমার সম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্প ছাড়িয়া, সাহেবের চিনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।" সত্যই কপালে আরও কি আছে বলিতে পারি না; কারণ এখনও আমরা কেবল অতীতের কথা স্মরণ করি, আর দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করি, এবং গর্ব্বও করি; সংশোধনের—উন্নতির কোন উপায় করিয়া, সমাজ শরীরে—জাতীয় শরীরে নবজীবন সঞ্চারের জন্য কখনও ব্যগ্র হই না। তাহার উপর এখনও যদি আমাদের কবি ও উপন্যাসকারগণ সংসারাসক্তি-শূন্যা জয়ন্তী ও শ্রীর মত আদর্শ সৃজন করিয়া আধ্যাত্মিক বাষ্পভরা বেলুনে তুলিয়া এ অলস জাতির স্বপ্ন কুহকাবিষ্ট হৃদয় মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তবে উন্নতির আশা আরও সুদূরপরাহত, সন্দেহ নাই।

"অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ননীতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন!"

এখন আমাদিগকে কেবল স্মরণ করিতে হইবে :—

"আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মোরে কিবা ফল ভাই!
আগে চল্, আগে চল্ ভাই!"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিদ্যার কিরূপ বিবর্ত্তন হইয়াছিল; সে বিবর্ত্তনের ক্রম কি; এবং কোন্ স্থানে আসিয়া সে বিবর্ত্তন চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; ব্রহ্মবিদ্যাকে জাতীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে,—জাতীয় ভাবে তাহার উত্তরোৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, আমাদিগকে সে বিবর্ত্তনের কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; এ সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, বিবর্ত্তনের নিয়ম অথবা প্রণালী কি সাধারণ ভাবে তাহার একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

বিবর্ত্তনের প্রণালী—স্পেন্সার ও হিগেল

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই সৌরজগতের মূল উপকরণ Nebula, অর্থাৎ এক প্রকার উত্তপ্ত সুতরাং গতিশীল বাষ্পাকার পদার্থ। ঐ বাষ্পাকার বস্তুরাশির মধ্যে কোনও প্রকার বৈচিত্র্য ছিল না—সমস্তটাই সমভাবাপন্ন ছিল। ক্রমে উহার এক এক অংশ ঘূর্ণিত হইতে হইতে সমষ্টি-দেহ হইতে বিযুক্ত হইল, এবং যতই উহার অভ্যন্তরস্থ তেজ বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ততই উহা ঘনীভূত হইয়া মণ্ডলাকার ধারণ করিল। এইরূপে যাহা এক সমভাবাপন্ন বস্তুরাশি মাত্র ছিল, তাহা হইতে বিচিত্র গ্রহ-নক্ষত্রাদি-সমন্বিত এই সৌরজগতের উৎপত্তি হইল,—এক হইতে বহুর অভিব্যক্তি হইল। কিন্তু Nebula রাশির মধ্যে যে একটী মৌলিক একত্ব ছিল,—যে আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ প্রভাবে Nebula এক অখণ্ড বস্তুরাশি হইয়াছিল, বহুত্ব প্রাপ্তির সময় সে একত্ব—সে আকর্ষণ কি

চলিয়া গেল? তাহা নহে। সৌরজগতের দিকে চাহিয়া দেখ, গ্রহ-নক্ষত্রাদির মধ্যে একটী অপরটীর সঙ্গে কেমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ,—সকলেরই অস্তিত্ব সকলের সঙ্গে বান্ধা। বাষ্পাকার Nebulaর দিকে চাহিলে আমরা কেবল একটা প্রকাণ্ড বস্তুরাশি মাত্র দেখিতে পাইতাম; সকলের মধ্যে এই যে অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ যোগ—এই যে নিগূঢ় একত্ব রহিয়াছে, তাহা কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, এক যেমন বহু হইল, বহুত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহার একত্বও পরিস্ফুট আকার ধারণ করিল। জড়জগৎ ছাড়িয়া জীবজগতে প্রবেশ করিলেও আমরা বিবর্ত্তনের ঠিক এই প্রণালীই দেখিতে পাই। একটী জীবকোষ দেখ, উহা সর্ব্বত্রই কেমন সমভাবাপন্ন। ক্রমে একটী জীব-কোষ খণ্ডিত হইয়া দুইটী দশটীতে পরিণত হইল। তখনও কেবল সংখ্যাগত বৈষম্য। ক্রমে ঐ কোষ-রাশির মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির রেখাপাত হইল; তাহার পর অঙ্গ বৈচিত্র্য দেখা দিল; ক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল বিকশিত হইল। তখন জীবের সম্পূর্ণ দেহটী পাইলাম। ঐ দেহের অঙ্গসমূহের মধ্যে—যন্ত্রসমূহের মধ্যে কি ঘনিষ্ঠ যোগ—কি নিগূঢ় একত্ব বর্ত্তমান। ফুস্‌ফুস্ কিম্বা পাকস্থলীতে সামান্য একটু বিকৃতি ঘটুক, সমস্ত দৈহিক যন্ত্রে তাহা গিয়া বাজিবে। কোন একটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বাহ্য বস্তুর একটু সামান্য সংঘাত হউক, সমস্ত দেহ তাহার সংবাদ লইবে। জীবকোষরাশির মধ্যে কখনও কি আমরা এই ঘনিষ্ঠ যোগ—এই নিগূঢ় একত্ব দেখিতে পাইতাম? এখানেও এক বহু হইবার সময়, বহুত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহার একত্ব স্ফুটতর আকার ধারণ করিল। চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্, প্রকৃতির যে কোন বিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সর্ব্বত্রই বিবর্ত্তনের এই একই নিয়ম—একই প্রণালী। স্পেন্সারের ভাষায় বলিতে গেলে, Homogeneity, Differentiation, Integration—সাম্য, বৈষম্য ও সংহতি। বৈষম্য ও একত্বের সমস্ত উপকরণই সাম্যাবস্থায় অব্যক্তরূপে বর্ত্তমান। সাম্যাবস্থার সেই অব্যক্ত বৈষম্য ও অপরিস্ফুট একত্বই, বিবর্ত্তন মুখে ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হয়। তত্ত্বের দিক হইতে হিগেল বিবর্ত্তনের এই প্রণালীকে Thesis, Antithesis, Synthesis বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা ভিন্ন হইলেও হিগেল ও স্পেন্সারের মূল ভাব এক। হিগেলের Thesis

Antithesis, Synthesisএর পরিবর্ত্তে আমরা সাম্য, বৈষম্য ও সমন্বয় এই তিনটী কথা ব্যবহার করিব।

ব্রহ্মবিদ্যার বিবর্ত্তনেও আমরা ঠিক এই সাম্য, বৈষম্য ও সমন্বয়ের প্রণালী দেখিতে পাই। ব্রহ্মবিদ্যার আলোচ্য তত্ত্ব প্রধানতঃ তিনটী—আত্মা, জগৎ ও ঈশ্বর; দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে, অহং, ইদং ও ব্রহ্ম। সাম্যাবস্থায় এই তিনটী তত্ত্বের মধ্যে একটী অভঙ্গ একত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তখন অহং ইদং হইতে অবিভক্ত—উভয়ই উভয়ের সহিত গ্রথিত ও জড়িত; এবং এই সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন অস্ফুট জ্ঞানের অন্তরালে ব্রহ্মতত্ত্ব লুক্কায়িত। কিন্তু অহং ও ইদংএর অবিরাম সংঘর্ষে এ সাম্যভাব অধিক কাল তিষ্ঠিতে পারে না। কালক্রমে সেই অভঙ্গ সমতার মধ্যে বৈষম্যের রেখা দেখা দেয়। অবশেষে অহংতত্ত্ব, ইদংতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া জ্ঞানের সমক্ষে নিজ নিজ স্বরূপ প্রকাশ করে। তখন এক ঘোর দ্বন্দ্ব—ঘোর বৈষম্য উপস্থিত হয়; যাহা অহং তাহা ইদং নহে এবং যাহা ইদং তাহা অহং নহে। অহং জ্ঞাতা, ইদং জ্ঞেয়; অহং ভোক্তা, ইদং ভোগ্য; অহং কর্ত্তা, ইদং কার্য্য—উভয়ই উভয়ের ঠিক বিপরীত। অন্য দিকে অহং ও ইদং উভয়ই সসীম সোপাধিক, সাকার ও সগুণ, বিশিষ্ট সত্তা; কিন্তু ব্রহ্ম অসীম, নিরুপাধিক, নিরাকার ও নির্গুণ, অদ্বৈত তত্ত্ব। অথচ এই অদ্বৈত (Universal) এবং এই বিশিষ্ট (Particular) উভয়ই জ্ঞানে প্রতিভাসিত—উভয় তত্ত্ব লইয়াই জ্ঞান। এজন্যই জ্ঞান এই তত্ত্ব-বিরোধ লইয়া থাকিতে পারে না। যেরূপেই হউক, অদ্বৈত ও বিশিষ্ট এতদুভয়ের মধ্যে জ্ঞান একটী মিলন—একটী সমন্বয় স্থাপন করিতে চাহে।

ব্রহ্মবিদ্যার আলোচ্য তত্ত্ব

তত্ত্বের সাম্যাবস্থা

তত্ত্বের সংঘর্ষ ও বৈষম্যাবস্থা

তত্ত্বের সমন্বয়

অদ্বৈত ও বিশিষ্টের মধ্যে এই সমন্বয় (তবেই অদ্বৈতের মধ্যে বিশিষ্টের পরস্পর সমন্বয়) স্থাপনের চেষ্টা হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি। যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই সমন্বয় সাধিত হইতেছে। এ জন্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্রহ্মবিদ্যা। এই সমন্বয় সাধন চেষ্টার কখনও বিরাম হইতে পারে না। জ্ঞান যদি এক সময়ে জগতের সমস্ত বিশিষ্ট তত্ত্ব

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন সমন্বয়—ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা

চিরকালের জন্য একটী চূড়ান্ত সমন্বয় হইতে পারেনা

আয়ত্ত করিতে পারিত,—অহং ও ইদংএর সমস্ত স্বরূপ একবারে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিতে পারিত ; এবং বিশিষ্টের এই পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতের পূর্ণ জ্ঞানও যদি তাহার করতলস্থ হইত, তাহা হইলে চিরকালের জন্য একটী সমন্বয় স্থাপন সম্ভবপর হইত। কিন্তু এই বিশ্বের তত্ত্বও অশেষ, এবং জ্ঞানও চিরবর্দ্ধনশীল। এজন্যই কোন যুগে একটী সমন্বয় সাধিত হইলে,—বিরোধ ও বৈষম্যের পর জ্ঞানের মধ্যে আবার মিলন, সমতা ও শান্তি সংস্থাপিত হইলে, জ্ঞান সেখানে বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারে না। বিশিষ্টের স্ফুটতর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আবার নব দ্বন্দ্ব—নব বৈষম্যের উদয় হয় ; এবং আবার একটী নব সমন্বয়ের প্রয়োজন হইয়া উঠে। এইরূপে এক যুগের সমন্বয় পরযুগের ঠিক সাম্যের স্থানীয় হইয়া, বৈষম্যের মধ্য দিয়া আবার একটী নব সমন্বয়ের পথ খুলিয়া দেয়। এইরূপ সাম্য, বৈষম্য ও সমন্বয় পরম্পরা হইতেই আমাদের বিশিষ্ট ও অদ্বৈতের জ্ঞান গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে।

এখন অদ্বৈত ও বিশিষ্টের সমন্বয় সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

অদ্বৈত ও বিশিষ্টের সমন্বয়
—নিগুর্ণ ব্রহ্ম—

কোন কোন পণ্ডিত অদ্বৈতকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, বিশিষ্ট আর তাহার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় না। তাঁহারা বলেন, যাহা কিছু বিশিষ্ট, অদ্বৈত তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশিষ্ট নয় বলিয়াই, অদ্বৈত অদ্বৈত। সুতরাং অদ্বৈতের মধ্যে আর বিশিষ্টের স্থান কোথায়? অদ্বৈত সর্ব্বতোভাবে বিশিষ্টের অতীত। বিশিষ্ট সসীম, সোপাধিক, সাকার ও সগুণ। অদ্বৈত অসীম, নিরুপাধিক, নিরাকার ও নিগুর্ণ। এই বিশিষ্টবর্জ্জিত অদ্বৈত, নিগুর্ণ ব্রহ্ম (Abstract Universal)। কিন্তু আর এক শ্রেণীর

অদ্বৈত ও বিশিষ্টের সমন্বয়
—সগুণব্রহ্ম—

পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা অদ্বৈতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া, বিশিষ্টকে বর্জ্জন করেন না। তাঁহারা বলেন, অদ্বৈতকে ছাড়িয়া বিশিষ্ট আবার কোথায় দাঁড়াইবে? বিশিষ্টের কি স্বতন্ত্র সত্তা আছে? সমস্ত বিশিষ্টই অদ্বৈতের আশ্রিত ; অদ্বৈতই বিশিষ্টের আশ্রয়—অদ্বৈতই বিশিষ্টের আধার। অদ্বৈত দেহী, বিশিষ্ট দেহ ; অদ্বৈত চিৎ, বিশিষ্ট তাহার সত্তা ; অদ্বৈত শক্তিমান, বিশিষ্ট তাহার শক্তি। সুতরাং বিশিষ্টকে ছাড়িয়াও অদ্বৈতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। বিশিষ্ট ও অদ্বৈত অনাদি-সম্বন্ধে অচ্ছেদ্যরূপে সম্বদ্ধ—

বিশিষ্টেই অদ্বৈতের অভিব্যক্তি—বিশিষ্টই অদ্বৈতের লীলাক্ষেত্র। বিশিষ্ট-ধারী এই অদ্বৈতই সগুণ ব্রহ্ম (Concrete Universal.)।

ধর্ম্ম জগতে আমরা নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও সগুণ ব্রহ্মবাদ উভয়ই দেখিতে পাই। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, সহজেই বুঝা যাইবে যে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ কখনই ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না। অদ্বৈত বিশিষ্টের অতীত; আমরা বিশিষ্ট, সুতরাং অদ্বৈত আমাদের জ্ঞানাতীত। যাহা জ্ঞানাতীত তাহার সত্তা সম্বন্ধে কাহার চিত্তে সন্দেহের উদয় না হয়? অনেকে তো জ্ঞানাতীত বলিয়া অদ্বৈতের সত্তা একেবারে অস্বীকার করিয়াই বসেন। আবার অনেক পণ্ডিতের মতে, জ্ঞানাতীত বিষয়ের অনুসন্ধান পণ্ডশ্রম মাত্র—জ্ঞানাতীত বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদের স্বাভাবিক গতি, অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnosticism), সন্দেহবাদ (Scepticism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism), এবং ঔদাসীন্যবাদের (Indifferentism) দিকে অনেক স্থলে এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদই আবার পৌত্তলিকতা, অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরুবাদ ও মধ্যবর্ত্তিবাদের প্রসূতি। ব্রহ্ম জ্ঞানাতীত, সুতরাং তাঁহার উপাসনা অসম্ভব; উপাসনার্থে সাকার মূর্ত্তি আবশ্যক। আবার ব্রহ্ম জ্ঞানাতীত, সুতরাং ব্রহ্মের একটী বিশেষ Revelation—বিশেষ প্রকাশ আবশ্যক, নতুবা ধর্ম্মের আর ভিত্তি কোথায়?—ভক্তিবৃত্তিরই বা চরিতার্থতা কি রূপে সম্ভবে? একবার ব্রহ্মের এই বিশেষ Revelation—বিশেষ প্রকাশ স্বীকার করিলেই অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরুবাদ ও মধ্যবর্ত্তিবাদে গিয়া পঁহুছিতে হইবে। ব্রহ্ম বিদ্যার ইতিহাসে আমারা ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ইউরোপ দেশে Doctrine of Relativity—শুদ্ধ বিশিষ্টবাদের পশ্চাতে যে নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব লুকায়িত ছিল—অথবা যে নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব হইতে শুদ্ধ বিশিষ্টবাদেরই জন্ম হইয়াছিল; সেই নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব হইতেই কালক্রমে একদিকে জড়বাদিগণের সন্দেহবাদ ও নাস্তিক্যবাদ, কোমতের ঔদাসীন্যবাদ, স্পেন্সার ও হক্সলীর অজ্ঞেয়তাবাদ; এবং অন্যদিকে ম্যান্সেল প্রভৃতি খৃষ্টান ধর্ম্ম সমর্থকগণের (Apologetics) বিশেষ Revelation

নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না

নির্গুণ ব্রহ্মবাদ হইতে নাস্তিক্যবাদাদির উৎপত্তি

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত—ইউরোপ—

বাদ, মধ্যবর্ত্তিবাদ ও অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ; এবং প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান মণ্ডলীর মধ্যে Tractarian, Ritualistic ও High Church Movementএর উৎপত্তি হইয়াছে। এ সকল Movementএর এক মাত্র উদ্দেশ্য প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসমাজকে বাহ্য ক্রিয়া কলাপ, আচার অনুষ্ঠানে রোমান কাথলিক ধর্ম্মসমাজের অনুরূপ করা। কিন্তু কার্ডিন্যাল নিউম্যান্ অবশেষে ইহাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়া এই উনবিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য ইউরোপ দেশে রোমান কাথলিক ধর্ম্মসমাজের প্রাধান্য—পোপের একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য কার্ডিন্যাল্ নিউম্যান্ একজন নির্গুণ ব্রহ্মবাদী।

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত—
—ভারতবর্ষ—

প্রাচীন ভারতেও দেখ, আদি উপনিষদ সমূহের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ হইতে এক দিকে যেমন বৌদ্ধগণের নাস্তিক্যবাদ, ক্ষণিক-চৈতন্যবাদ ও শূন্যবাদ এবং সাংখ্যের নিরীশ্বর-বাদের সৃষ্টি হইল; তেমনি অন্যদিকে প্রথমে বৌদ্ধগণের মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি পূজা—মহাপুরুষ পূজা, এবং অবশেষে হিন্দুগণের মধ্যে দেব দেবী পূজা, অসার ক্রিয়াকলাপপূর্ণ বাহ্য পূজার উৎপত্তি হইল। এপর্য্যন্ত নির্গুণ

নির্গুণ ব্রহ্মবাদ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম বিঘাতক

ব্রহ্মবাদের যে কয়েকটী সন্তান সন্ততির উল্লেখ করা গেল, তাহারা সকলেই জ্ঞান বিঘাতক। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মবাদে ধর্ম্মের অপর দুইটী অঙ্গ—ভক্তি ও কর্ম্মেরও কি চরিতার্থতা লাভ হইতে পারে? তাহাও নহে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা নাই—পূজা নাই, সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মবাদে ভক্তির দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? ভক্তি সর্ব্বদাই সগুণ ও সাকারমুখী; সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মে ভক্তির চরিতার্থতা একেবারেই অসম্ভব। নির্গুণ ব্রহ্মবাদ কর্ম্মেরও চিরবিরোধী। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বযুগেই নির্গুণ ব্রহ্মবাদী কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী। সেবাধর্ম্ম—গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্ম তাহার পক্ষে বন্ধন স্বরূপ। শঙ্করের দশ নামী সন্ন্যাসী এবং মধ্য যুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীগণ ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। তবেই দেখা যাইতেছে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ জ্ঞানবিঘাতক, ভক্তি-বিঘাতক, কর্ম্ম-বিঘাতক—উহা কখনও ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না।

এ জন্যই সর্ব্বদেশের ব্রহ্মবিদ্যার ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে,

সর্ব্বদেশে নির্গুণব্রহ্ম হইতে গতি সগুণ ব্রহ্মের দিকে

নির্গুণ ব্রহ্মবাদ হইতে যেমন এক দিকে নাস্তিক্য বাদাদি এবং পৌত্তলিকতাদির স্রোত প্রবাহিত

হইতে থাকে, তেমনি সেখান হইতে আর একটী প্রবলতর বিপরীত স্রোত বাহির হয়, যাহার গতি সগুণ ব্রহ্মের দিকে। ইহুদজাতির মধ্যে ফ্যারিসীগণের বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মকাণ্ডের সহিত যেমন স্যাডুসীগণের সন্দেহবাদ ও ইসিনীস্‌গণের জ্ঞানমূলক সন্ন্যাস ধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন যীশুখৃষ্ট সর্ব্বপ্রথমে ইহুদা জাতির মধ্যে সগুণব্রহ্মমূলক ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন। খৃষ্টের ভক্তিধর্ম্ম আসিয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া ইউরোপ খণ্ডে প্রবেশ করিলে গ্রীস ও আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার দার্শনিক চিন্তার সহিত উহার সাক্ষাৎ হয়। গ্রীসদেশে তৎকালে ইপিকিউরিয়ান্‌দের ভোগবাদের প্রতিকূলে ষ্টোইক ও স্কেপ্‌টিক্‌গণের শুদ্ধ-অন্তর-চৈতন্যবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং আলেকজাণ্ড্রিয়ায় নিওপ্লেটনিষ্ট্‌গণ নির্গুণব্রহ্মবাদ প্রচার করিতেছিলেন। যীশু অনুচর যোহন Logos অর্থাৎ শব্দব্রহ্মবাদে আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার দার্শনিক চিন্তার সহিত খৃষ্টের ভক্তিধর্ম্মের একটী সমন্বয় স্থাপন করেন। যোহনের এই Logos—শব্দব্রহ্মই সগুণব্রহ্ম। ইউরোপের এই সগুণব্রহ্মবাদ মধ্যযুগে সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রাধান্যের সময়েও অবতারবাদের আকারে বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে প্রোটেষ্টাণ্ট্‌ খৃষ্টানগণের মধ্যে গার্হস্থ্য ও সমাজ ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্দেহবাদ,নাস্তিক্যবাদও শূন্যবাদের প্রতিকূলে ক্যাণ্ট্‌,হার্ডার,সেলিঙ্গ্‌ প্রভৃতি জর্ম্মান্‌ দার্শনিক পণ্ডিতগণের দ্বারা সগুণ ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যাত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এখন আমরা হিগেলের দর্শনে তাহারই চরমোৎকর্ষ দেখিতেছি।

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত—পেলেষ্টাইন ও ইউরোপ

প্রাচীন ভারতেও বেদের কর্ম্মকাণ্ড, চার্ব্বাকগণের জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদ, আদি উপনিষদসমূহের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, ইহাদের মধ্যে যখন ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখনই পরবর্ত্তী উপনিষদসমূহে সগুণব্রহ্মবাদ দেখা দিল। উপনিষদের এই সগুণব্রহ্মবাদ বাদরায়ণ ব্যাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং বৃত্তিকার বৌধায়নের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া, পাতঞ্জলের ঈশ্বরবাদ, মহাভারত ও রামায়ণের অবতারবাদের মধ্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, অবশেষে গীতায় সগুণব্রহ্মে, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের মহাসমন্বয়ে পরিণত হয়। তৎপরে মধ্যযুগে শঙ্কর অদ্বৈতবাদ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রচার করিলে, রামানুজ, বল্লভ প্রভৃতি ভক্তিবাদী বৈষ্ণব আচার্য্যগণ শঙ্করের প্রতিকূলে সগুণব্রহ্মবাদের পুনরুদ্ধার সাধন

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত—ভারতবর্ষ

করেন। বৈষ্ণব আচার্য্যগণের এই সগুণব্রহ্মবাদই ভাগবতের ভক্তিবাদের মধ্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, পুরাণ, তন্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্রাদিতে আসিয়া, সগুণব্রহ্মবাদমূলক অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতার আকার ধারণ করে। সগুণব্রহ্মবাদকে স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এখন কেবল উহাকে পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদ হইতে মুক্ত ও পরিষ্কৃত করা অবশিষ্ট ছিল। আমাদের এই নবযুগের রাজা, রামমোহন ঠিক সেই কার্য্যটাই নিজ হস্তে লইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়া, সগুণ ব্রহ্মবাদকে এক অক্ষয় ভিত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

যুক্তিতেও নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে গতি সগুণব্রহ্মে

ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেও আমরা নির্গুণ ব্রহ্মবাদ হইতে সগুণব্রহ্মবাদে গিয়া উপনীত হই। যাহার অভাব দেখিয়া ধর্ম্ম নির্গুণব্রহ্ম হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে, সগুণব্রহ্মে আসিয়া সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। সগুণ ব্রহ্মে ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে; এজন্যই ধর্ম্ম চিরকাল সগুণব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে চাহে।

সগুণব্রহ্মে জ্ঞানের তৃপ্তি

সগুণব্রহ্মবাদের বিশিষ্ট ও অদ্বৈতের, সাকার ও নিরাকারের, সগুণ ও নির্গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে জ্ঞানের সমস্ত বিরোধ ভঞ্জন হয়—সমস্ত সন্দেহ ছেদ হয়। সগুণব্রহ্মবাদ জ্ঞানের সমক্ষে এক অনন্ত রাজ্য খুলিয়া দেয়। বিশিষ্ট যতই জ্ঞাত ও আয়ত্তীকৃত হইতে থাকে, অদ্বৈতের ধারণা ততই গভীর হইতে গভীরতর হয়; আবার অদ্বৈতের স্ফুটতর জ্ঞান হইতে বিশিষ্টের জ্ঞান আরও পরিপুষ্টি লাভ করে। এইরূপে সগুণ ব্রহ্মবাদে জ্ঞান পরম তৃপ্তি, পরম শান্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়।

সগুণ ব্রহ্মে ভক্তির তৃপ্তি

ভক্তি ও সগুণব্রহ্মে অনন্ত সম্ভোগের বস্তু প্রাপ্ত হয়। যিনি পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, সগুণব্রহ্মবাদী সৃষ্টির সর্ব্বত্রই সেই প্রিয়তম ব্রহ্মের প্রকাশ দেখিতে পান। "সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ" তিনি অধোতে, তিনি উর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে,— তিনি উত্তরে। সৃষ্টি যতদূর প্রসারিত, সগুণব্রহ্মবাদীর প্রেম ভক্তিও ততদূর প্রসারিত। ঐ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় জড়প্রকৃতিতে, ঐ জ্ঞান-প্রেম ও পুণ্যমণ্ডিত মানবপ্রকৃতিতে যাহা কিছু মাহাত্ম্য, যাহা কিছু সৌন্দর্য্য

ও মাধুর্য্য আছে সে সমস্তই সগুণব্রহ্মবাদীর সম্ভোগের বিষয়—ভক্তির বিষয়—প্রেমের বিষয়। সগুণ ব্রহ্মবাদীর, "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূরে"; সুতরাং সকল দেহই তাঁহার দেবমন্দির এবং সকল আত্মাই তাঁহার বিগ্রহ।

সগুণ ব্রহ্মে কর্ম্মের তৃপ্তি

কর্ম্মের পূর্ণ সাফল্যও সগুণব্রহ্মে। সগুণব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম জীবন্ত ও জাগ্রত। তিনি অনন্ত ক্রিয়াশীল, অনন্ত লীলাময় ভগবান্। এই জড়জগতের বিবর্ত্তন, এই চেতন জগতের—মানবসমাজের বিবর্ত্তন এ সমস্তই সেই লীলাময়ের লীলা। এই বিচিত্র বিবর্ত্তনের মধ্যে সগুণ ব্রহ্মবাদী এক মহতী জীবলীলা দেখিতে পান। সেই মহতী জীবলীলা এক পরমমাহাত্ম্যময় অত্যুজ্জ্বল মহাপরিণামের দিকে ছুটিয়াছে—"One great event towards which all creation tends". যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সুকৃতিবলে স্বীয় আত্মায় সেই মহাপরিণামের পূর্ব্বাভাস পাইয়াছে, সে কি আর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে? ঐ দেখ সে তাহার সুখ দুঃখকে পদদলিত করিয়া, ফলাফলচিন্তাবর্জ্জিত হইয়া, সিদ্ধি অসিদ্ধির ভার সেই লীলাময়ের হস্তে রাখিয়া, নিষ্কাম পরাক্রমে বুক বাঁধিয়া, লীলাক্ষেত্রে নামিয়াছে; জীবলীলার চরম সাফল্য লাভের জন্য সে তাহার শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু পাত করিবে। কিন্তু কেবল জ্ঞানও

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় সগুণ ব্রহ্মে—সগুণ ব্রহ্ম ধর্ম্মের চির অবলম্বন

ধর্ম্ম নহে, আবার কেবল ভক্তি কিম্বা কর্ম্মও ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম এ তিনের সমন্বয়—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়। এখন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের স্বরূপ বিচার করিয়া দেখিলে, আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে সগুণ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোথায়ও এ সমন্বয় সম্ভব নহে; এ জন্যই সগুণব্রহ্ম ধর্ম্মের চির আশ্রয়—চির অবলম্বন।

জ্ঞানের স্বরূপ—

জ্ঞানের স্বরূপ কি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জ্ঞান তত্ত্বার্থী। এই অনিত্যের মধ্যে যাহা নিত্য, এই জড়ের মধ্যে যাহা চেতন, এই ব্যষ্টির মধ্যে যাহা সমষ্টি, এই বিশিষ্টের মধ্যে যাহা অদ্বৈত, এই বাহিরের যাহা অন্তর, তাহাই জ্ঞানের বিষয়—তাহাই জ্ঞানের লক্ষ্য। সুতরাং জ্ঞান অন্তর্মুখি—নিরাকার ও নির্গুণমুখী। কিন্তু কর্ম্ম বহির্মুখি। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের

কর্ম্মের স্বরূপ—

অশেষ ও নিয়তবর্দ্ধনশীল অভাব পূরণই কর্ম্ম। ব্যক্তিগত জীবনই হউক, আর সামাজিক জীবনই

হউক ; বাহিরের সহিত সংঘর্ষ হইতেই তাহার সমস্ত অভাবের উৎপত্তি হয়। আবার বাহির হইতে উপকরণ আহরণ করিয়াই সমস্ত অভাব পূরণ করিতে হয়। কর্ম্মের ক্রম এই :—প্রথমে অভাব বোধ, তারপর অভাব পূরণের সঙ্কল্প, তারপর বহির্জ্জগতে সেই সঙ্কল্পের প্রকাশ। তবেই দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখি—সাকার ও সগুণমুখি। এখন এই অন্তর্মুখি,—নিরাকার ও নির্গুণমুখি জ্ঞানের সহিত, এই বহির্ম্মুখি,—সাকার ও সগুণমুখি কর্ম্মের সমন্বয় কোথায় হইবে? যেখানে অন্তর ও বাহির—সাকার ও নিরাকার—সগুণ ও নির্গুণ এক হইয়া গিয়াছে সেই সগুণ ব্রহ্মে।

জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় সগুণব্রহ্মে

ভক্তি আবার দেখ ভজনার্থিনী—পূজার্থিনী। এ পূজা বাহ্য পূজা নহে—হৃদয়ের পূজা। হৃদয়ে যত ভাব আছে, ভক্তি তত ভাবে পূজা করিতে চাহে,—দাস্যভাবে, সখ্যভাবে, বাৎসল্যভাবে ও মধুরভাবে পূজা করিতে চাহে। কিন্তু জন্ম-মরণশীল এই আমার প্রভু, সখা, পুত্র, কন্যা, পতি বা পত্নীতে সেই সচ্চিদানন্দ ভগবান্ প্রকাশিত না হইলে, এই সকল মূর্ত্তিতে তিনি মূর্ত্তিমান না হইলে, কিরূপে ইহারা ভক্তির বিগ্রহ হইবেন? তবেই দেখ, ভক্তিও চায় সগুণব্রহ্ম,—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় সগুণব্রহ্মে। এ অতি আশ্চর্য্য সমন্বয়। এ সমন্বয়ে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, তিনই তিনের সহায় হয়,—তিনই তিনকে তৃপ্ত করে, উজ্জ্বল করে, গভীর করে। বিশিষ্টের মধ্যে জ্ঞান যে অদ্বৈতকে দেখিতে পায়, ভক্তি গিয়া প্রিয়তম বলিয়া তাঁহাকেই গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে; এবং এই নিগূঢ় ভক্তিযোগ হইতে জ্ঞানচক্ষু আরও উজ্জ্বল হয়। এদিকে সেই বিশ্বেশ্বরের দর্শনে কর্ম্মেরও সমস্ত অন্ধতা, সমস্ত মলিনতা ঘুচিয়া যায়। এতদিন কর্ম্ম ছিল অর্থহীন মলিন সকাম কর্ম্ম; এখন সে তাহার স্বরূপ দেখিতে পাইল। এখন দেখিল, জীব সেই লীলাময় বিশ্বেশ্বরের দাসরূপে তাঁহারই লীলাক্ষেত্রে নিরন্তর খাটিতেছে। তাহার সুখ নাই, দুঃখ নাই; জয় নাই, পরাজয় নাই; সিদ্ধি নাই, অসিদ্ধি নাই; সকল কর্ম্মই সেই মহাপ্রভুর দাসত্ব। ভক্তি আসিয়া এ দাসত্বকে মধুময় করিয়া তুলিল। সে বলিল,

ভক্তির স্বরূপ—

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় সগুণব্রহ্মে

আশ্চর্য্য সমন্বয়—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম তিনই তিনের সহায়

"একি আবার দাসত্ব? এ যে আমার প্রিয়তমের সেবা।" কি অপূর্ব্ব সমন্বয়!

ব্রহ্মবিদ্যার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে যুগে যুগে এই সমন্বয় সাধিত হইতেছে। মুসার কর্ম্মকাণ্ড, গ্রীস ও আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার দার্শনিকগণের জ্ঞানকাণ্ড, এবং যিশুখৃষ্টের ভক্তিকাণ্ড, এ তিনের সমন্বয় হইল যোহনের Logos,—অর্থাৎ শব্দব্রহ্মে। যোহনের এই Logosবাদ কালক্রমে অবতারবাদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগের সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রাধান্যের পর ইউরোপ দেশে হিগেল দর্শনের সগুণ ব্রহ্মবাদে, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের এক শ্রেষ্ঠতর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। এ সমন্বয়ে সগুণব্রহ্ম অবতারবাদাদি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছেন এবং ইহাতে সংসারাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত— ইউরোপ

ভারতবর্ষেও আমরা ঠিক এইরূপ বিবর্ত্তন দেখিতে পাই। বেদের কর্ম্মকাণ্ড, বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ড, ভক্তিকাণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াই গীতার সগুণ ব্রহ্মবাদ-মূলক মহাসমন্বয়ে পরিণত হইল। তাহার পর ভারতবর্ষেও মধ্যযুগে সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করে; এবং জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের একটা নব সমন্বয় আবশ্যক হইয়া উঠে। রামানুজ, বল্লভ প্রভৃতি ভক্তিবাদী বৈষ্ণব আচার্য্যগণের বেদান্তভাষ্যে এই সমন্বয় আরম্ভ হয়; এবং পুরাণ, তন্ত্র ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব শাস্ত্রাদিতে আসিয়া উহা পূর্ণতা লাভ করে। পৌরাণিক যুগের এই সমন্বয়েও সগুণব্রহ্ম ও সংসারাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণ, তন্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত সগুণব্রহ্ম অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতাদি দোষে জড়িত। এজন্যই রাজা রামমোহন ঐ সকল শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করের বেদান্তভাষ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; এবং শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়া চিরকালের জন্য নিরাকার ও সাকার, জ্ঞান ও কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও সংসারের বিরোধ ভঞ্জন করেন। সত্য বটে, পুরাণ ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের অবতারবাদ, এবং বৈষ্ণব সমাজে কৃষ্ণলীলায় ব্যভিচারের প্রতিবাদ করিতে গিয়া রাজা পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রতি, বিশেষতঃ বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত ভক্তিধর্ম্মের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই; তথাপি একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, রাজা ভারতীয় সগুণ ব্রহ্মবাদকে অবতারবাদ ও

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত— ভারতবর্ষ

পৌত্তলিকতা হইতে মুক্ত করিয়া, উহার শেষ নির্ম্মলতা সাধন করিয়াছেন; এবং জ্ঞান,ভক্তি ও কর্ম্মের এক উজ্জ্বলতর সমন্বয়ের পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন।

রাজা ও হিগেল

রাজা একজন মহাকর্ম্মী ও সংস্কারক ছিলেন। এজন্য তিনি হিগেলের ন্যায় কোন সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন প্রণালীবদ্ধ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া যান নাই; তথাপি ইউরোপের জন্য হিগেল যাহা করিয়াছেন, ভারতের জন্য রাজা ঠিক তাহাই করিয়াছেন। হিগেল ও রাজা উভয়েরই সমন্বয়ে সগুণ ব্রহ্মবাদ অবতারবাদ হইতে চিরমুক্ত হইয়াছে এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম চিরকালের জন্য নিরাকৃত ও সংসারাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মানবজাতির আদিম অবস্থা—প্রাকৃতিক

মানবচিত্তে ঈশ্বরের ভাব কিরূপে প্রথমে উদিত ও বিকশিত হইল তাহা বুঝিতে হইলে, মনুষ্যকে তাহার আদিম অবস্থার মধ্যে গিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে। বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে একটী সর্ব্ববাদী সম্মত মত এই যে, মনুষ্য সামাজিক জীব। দলবদ্ধ—গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া জীবন ধারণ করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। বর্ত্তমান কালে আসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা খণ্ডে যে সকল অসভ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই ক্ষুদ্র বৃহৎ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বাস করে। পুরাকালে মানব জাতিও এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তখন আমাদের এই পৃথিবী এমন "সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা" ছিল না। তখন উহা কণ্টকময় ঘোরারণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত উত্তাপ, দাবাগ্নি ও বজ্র; ঝঞ্ঝাবাত ও শিলাবৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া বর্ব্বরগোষ্ঠী সকলকে বনে বনে বিচরণ করিতে হইত। কিন্তু বর্ব্বর মনুষ্যের এই সকল প্রাণঘাতিনী প্রাকৃতিক শক্তি অপেক্ষাও প্রবলতর ও ভীষণতর শত্রু ছিল। বনের অগণ্য হিংস্রজন্তু এবং স্বজাতীয় অসংখ্য বর্ব্বরের সহিত তাহাকে নিরন্তর প্রাণান্তকর সংগ্রাম করিতে হইত। বাহ্য প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম, হিংস্র জন্তুর সহিত সংগ্রাম, স্বজাতীয় শত্রুর সহিত সংগ্রাম, বর্ব্বর মনুষ্য কি নিঃসহায়! এই ঘোরতর জীবন সংগ্রামে যে তাহার সহায় হয়,—যে

বর্ব্বর কর্তৃক হিতকর, ভয়ঙ্কর ও সুন্দর বস্তুর পূজা

তাহার জীবন রক্ষা করে,বর্ব্বর সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাহাকে আশ্রয় করে,—তাহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহারই তুষ্টিসাধনে যত্নবান হয়,—

তাহাকেই পূজা করিতে আরম্ভ করে। বর্ব্বর যেমন নিঃসহায়, তেমনি সে ভীরু। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ন্যায় দুর্দ্দান্ত বর্ব্বরও অত্যন্ত ভীরু। এজন্য পৃথিবীতে যাহা কিছু ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়োদ্দীপক বর্ব্বর তাহারই নিকট জানু অবনত করে,—পূজাদি দ্বারা তাহারই তুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু বর্ব্বর প্রকৃতিও সম্পূর্ণরূপে সৌন্দর্য্য-বোধ-বিরহিত নহে। এজন্য সুন্দর বস্তু সকলও তাহার চিত্তকে মুগ্ধ করে এবং তাহার নিকট হইতে পূজা প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ু, মেঘ ও সূর্য্যের ন্যায় মনুষ্যজীবনের পক্ষে হিতকর বস্তু আর কি আছে? দাবাগ্নি ও মেঘগর্জ্জন, বজ্রপাত ও ঝঞ্ঝাবাত কাহার হৃদয়কে কম্পিত না করে? বিচিত্রবর্ণ মুক্তাকাশ ও নির্ম্মল-কান্তি উষার শোভায় কাহার চিত্ত মুগ্ধ না হয়? বর্ব্বরের চিত্তে অহং ও ইদংএর স্বরূপ-জ্ঞান আবার এত অস্ফুট যে প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুকেই সে ঠিক আপনার ন্যায় জীবন্ত ও শক্তিমন্ত বলিয়া মনে করে,—তাহার সামাজিক জীবনের সমস্ত অভিনয় সে বাহ্যপ্রকৃতিতে দর্শন করে। অগ্নি যেন এই তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার শিকারলব্ধ মাংসখণ্ডকে দগ্ধ ও আহারোপযোগী করিয়া দিল, অথবা তাহার শত্রুর বিনাশ সাধন করিয়া, তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেন ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ দাবাগ্নিরূপে তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল। মেঘ যেন এই বারি বর্ষণ করিয়া পরম বন্ধুর ন্যায় তাহার শস্যক্ষেত্র সিক্ত করিয়া দিল, কিন্তু এই আবার যেন ঘোর গর্জ্জন করিয়া তাহার মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল। বাহ্য প্রকৃতিতে বর্ব্বর নিরন্তর এই দেবলীলা দর্শন করে; এবং ভয়ে কম্পিত ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া করযোড়ে দেবতার প্রসাদ ভিক্ষা করে। কিন্তু বাহ্যপ্রকৃতি অপেক্ষা স্বীয় গোষ্ঠীর সহিত বর্ব্বরের জীবন অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। গোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রামের সহিত তাহার জীবন-সংগ্রাম একীভূত,—গোষ্ঠীর জয়ে তাহার জয়, গোষ্ঠীর পরাজয়ে তাহার মৃত্যু,—গোষ্ঠীর বৃহত্তর জীবনের মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র জীবন নিমজ্জিত। এজন্য গোষ্ঠীজীবনে নিরন্তর যে ভীষণ অভিনয় হয়, বর্ব্বরের চিত্তের উপর তাহার প্রভাব অতুল। এ অভিনয়ের প্রধান নায়ক গোষ্ঠী-পতি। তাহারই ইঙ্গিতে বর্ব্বরেরা যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হয়; তাহারই দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমে শত্রুদল ছিন্ন ভিন্ন হইলে তাহারা স্ত্রী ও ধনাদি লাভ করে। কত

বাহ্যপ্রকৃতিতে বর্ব্বরের দেবলীলা দর্শন—

মানবজাতির আদিম অবস্থা—সামাজিক

সময় তাহারই বাহুবলে গোষ্ঠীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করে। কিন্তু গোষ্ঠী-পতি যে কেবল বাহিরের শত্রু বিনাশ করেন তাহা নহে; নানাপ্রকার বিধি ব্যবস্থাদি স্থাপন করিয়া তিনি গোষ্ঠীকে আভ্যন্তরীণ বিপদ হইতেও মুক্ত রাখেন। এজন্যই বর্ব্বর রক্ষাকর্ত্তা, আশ্রয়দাতা ও নিয়ন্তা জানিয়া গোষ্ঠীপতির চরণাশ্রয় করে,—সর্ব্ব বিষয়ে তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে, সর্ব্ববিষয়ে তাহার তুষ্টি-সাধন করিতে সচেষ্ট হয়। জীবনে যিনি এমন সহায়, আশ্রয় ও অবলম্বন, মৃত্যু হইলে তাহার প্রেতাত্মার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা,—পূজাদি দ্বারা তাহার প্রেতাত্মার প্রীতিবর্দ্ধন করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এইরূপে বর্ব্বরগণের মধ্যে পিতৃপুরুষগণের—বীর ও ব্যবস্থাপক-গণের প্রেতাত্মারা দেবত্বলাভ করে।

বর্ব্বর কর্ত্তৃক বীর ও ব্যবস্থাপকগণের প্রেতাত্মার পূজা

কিন্তু বর্ব্বরতার অতি আদিম অবস্থায় এমন অনেক বর্ব্বরগোষ্ঠী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মধ্যে গোষ্ঠীপতি নাই,—দেবতারূপে গোষ্ঠীপতি কিম্বা গোষ্ঠীপতির প্রেতা-ত্মার পূজাও নাই। ঐ সকল গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও প্রকার উচ্চ নীচ ভেদ আরম্ভ হয় নাই; উহাদের মধ্যে সকলেই সমান। রং বিশেষের দ্বারা শরীর চিত্রিত করা, কিম্বা শরীরে অন্য কোন প্রকার বাহ্যচিহ্ন ধারণ করা, এইরূপ দুই একটী অতি সামান্য নিয়ম পালনই ঐ সকল গোষ্ঠীর একমাত্র বন্ধন। কিন্তু নিয়মগুলি অতি সামান্য হইলেও ঐ সকল গোষ্ঠীর বর্ব্বরেরা ধর্ম্মবুদ্ধিতে উহাদিগকে পালন করে, এবং এই সকল নিয়মের অথবা অনেকজন স্থাপয়িতা ছিলেন এইরূপ বিশ্বাস করে। এই অনির্দ্দেশ্য নিয়ন্তাই ঐ সকল গোষ্ঠীর ঈশ্বর স্থানীয়।

মানবজাতির অতি আদিম অবস্থা ও অনির্দ্দেশ্য নিয়ন্তায় ঈশ্বরবোধ—

তবেই দেখ, প্রাকৃতিক শক্তিতে, কোন অনির্দ্দেশ্য নিয়ন্তাতে কিম্বা বীর ও ব্যবস্থাপকগণের প্রেতাত্মাতেই মনুষ্যের প্রথম ঈশ্বরবোধ জন্মে।

মনুষ্যের প্রথম ঈশ্বরবোধ—প্রাকৃতিক শক্তিতে, অনির্দ্দেশ্য নিয়ন্তাতে, বীর ও ব্যবস্থাপকগণের প্রেতা-ত্মাতে

প্রাচীন হিন্দুগণের ন্যায় যে সকল জাতিশান্তিপ্রিয়,—যাহারা রাজ্যচিন্তার অপেক্ষা কৃষি বিষয়ক চিন্তায় ও সমাজ-বন্ধনের চেষ্টায় অধিক মনোভিনিবেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে

মোক্ষমূলর ও স্পেন্‌সারের একদেশদর্শিতা

প্রকৃতি পূজার প্রাধান্য লক্ষিত হইলেও, প্রেতাত্মার পূজা বিরল নহে। আবার ইউরোপের প্রাচীন সমরপ্রিয় জাতিগণের ধর্ম্মে বীরপুরুষদের প্রেতাত্মার পূজা প্রধান অঙ্গ হইলেও, তাহাতে প্রকৃতি পূজার অভাব নাই। সুতরাং মোক্ষমুলরের ন্যায় যে সকল পণ্ডিত কেবলমাত্র প্রকৃতি পূজা হইতে, এবং স্পেন্সারের ন্যায় যে সকল পণ্ডিত কেবলমাত্র প্রেতাত্মার পূজা হইতেই ঈশ্বর-জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ কল্পনা করেন, তাঁহাদের উভয় দলের মতই একদেশদর্শি ও ভ্রান্ত। মানব-চিত্তের উপর প্রকৃতি (Natural medium) অপেক্ষা সমাজের (Social medium) প্রভাব অধিক। মোক্ষমুলর সমাজের (Social medium) এই প্রভাব অস্বীকার করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। স্পেন্সার আবার সমাজের প্রভাবের উপর জোর দিতে গিয়া প্রকৃতির প্রভাব এক প্রকার অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সমাজের প্রভাব স্বীকার করিয়াও স্পেন্সার আর একটী বিষম ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। স্পেন্সার বলেন, এক-মাত্র গোষ্ঠীপতির প্রেতাত্মার পূজা হইতেই মনুষ্যের ঈশ্বরজ্ঞান বিকশিত হয়। তাঁহার এই সঙ্কীর্ণ মত স্বীকার করিলে, গোষ্ঠীপতি-বিহীন, গোষ্ঠী-পতির প্রেতাত্মার পূজা-বিহীন বর্ব্বরগোষ্ঠী সকলের ধর্ম্মজ্ঞানের কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

মোক্ষমুলরের একদেশ-দর্শিতাজনিত একটী ভ্রম

স্পেন্সারের একদেশ-দর্শিতাজনিত দুইটী ভ্রম

সভ্যতায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে বর্ব্বরদিগকে কয়েকটী অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতে হয়:—(১) বনকর্ত্তন ও পশুহননের অবস্থা, (২) পশুপালন ও পশুচারণের অবস্থা, (৩) ভূমিকর্ষণ ও শস্যোৎপাদনের অবস্থা। ঋগ্বেদ-সংহিতায় আর্য্যজাতির সহিত যখন আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন আর্য্যেরা বনকর্ত্তন ও পশুচারণের অবস্থা অতিক্রম করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অবশ্য তখনও আর্য্যদের মধ্যে বনকর্ত্তন ও পশুচারণ বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু ভূমিকর্ষণই তাঁহাদের প্রধান বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছিল। এজন্য জল, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি এবং সূর্য্য প্রভৃতি যে সকল প্রাকৃ-তিক বস্তু কৃষিকার্য্যের সহায় তাহাদের এবং তাহাদের আশ্রয়ীভূত আকাশের স্তুতিতে ঋগ্বেদ-

সভ্যতায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে মনুষ্যকে যে কয়ে-কটী অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়

ঋগ্বেদের সময় আর্য্যদের প্রধান বৃত্তি ভূমিকর্ষণ

এজন্য মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতির স্তুতিতে ঋগ্বেদ-সংহিতা পরিপূর্ণ

সংহিতা পরিপূর্ণ। দাবাগ্নি, কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তরজাত অগ্নির পূজা বহুকাল পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। ঋগ্বেদ-সংহিতার সর্ব্বপ্রথম স্তোত্রেই বলা হইতেছে—"অগ্নি পূর্ব্বে ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন।" কোন কোন মন্ত্রে বনকর্ত্তনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এক স্থানে বলা হইতেছে—"হে পৃথিবী! বিস্তীর্ণা, কণ্টকরহিতা ও নিবাসভূতা হও।" অনেক স্থলে এইরূপ গোচারণেরও উল্লেখ আছে।

অগ্নিপূজা অনেক পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল

বনকর্ত্তনের নিদর্শন

কিন্তু কৃষিকার্য্যের সহায় বলিয়াই অধিকাংশ দেবতার পূজা। কোন ঋষি ইন্দ্রের (মেঘদেবতার) মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিতেছেন—"ইন্দ্র অহি (মেঘকে) হনন করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, বহনশীল পার্ব্বতীয় নদীর পথ খুলিয়া দেন।" সরস্বতীর (নদীদেবতার) সম্বন্ধে বলিতেছেন—"সরস্বতী প্রবাহিত হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন," "গাভীরা জলপান করে," "আমরা জলে প্রবেশ করিতেছি।" অগ্নির সম্বন্ধে বলিতেছেন—"মনুষ্যের উপকারার্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ত্তমান অগ্নি কঠিন অন্নাদি নিজ শিখাদ্বারা পাক করেন, এবং তেজোদ্বারা স্থির দ্রব্য বিনষ্ট করেন।" মরুৎগণের (ঝড় দেবতার) সম্বন্ধে বলিতেছেন—"মরুৎগণ বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মেঘ সঞ্চালন করেন।" বরুণের (আকাশদেবতার) সম্বন্ধে বলিতেছেন—"তিনি সূর্য্যের গমনের পথ খুলিয়া দিতেছেন, তিনি বায়ুর পথও দেখিতেছেন, বরুণের আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয়।" দ্যুলোক ও ভূলোক সম্বন্ধে বলিতেছেন—"দ্যাবাপৃথিবী জলের দ্বারা আবৃতা, জলকে আশ্রয় করেন, তাহারা জল সংপৃক্তা, জলবর্ষয়িত্রী, বিস্তীর্ণা।" "মধুক্ষারয়িত্রী, মধুদুঘা, মধুব্রতা, দেবতাভূতা, এবং আমাদিগের যজ্ঞ, ধন, মহৎ যশ, অন্ন ও সুবীর্য্য দানকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে মধু দ্বারা সিক্ত করুন।" "পিতা দ্যুলোক ও মাতা পৃথিবী আমাদিগকে অন্নদান করুন।"

কৃষিকার্য্যের সহায় বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা

কিন্তু আর্য্যেরা এই সকল পদার্থকে কেবল যে হিতকর বলিয়াই পূজা করিতেন তাহা নহে। সূর্য্য উদিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ঘোর অন্ধকার বিনাশ করিতেছে; প্রচণ্ড দাবাগ্নি ও ভীষণ বাত্যা

ভয়ঙ্কর বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা ও তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা।

পৃথিবীতে ধ্বংস বিস্তার করিতেছে; মহাভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি ভূলোক ও দ্যুলোককে কম্পিত করিতেছে; বাহ্য জগতে নিরন্তর এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দেখিয়া আর্য্যেরা ভীত ও স্তম্ভিত হইতেন, এবং অনার্য্যদের সহিত সংগ্রামে অগ্নি, মরুৎ, ইন্দ্র প্রভৃতি রুদ্রতেজা দেবতাগণের অনুগ্রহ ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতেন। অগ্নিকে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—"অগ্নির দীপ্তি সকলের নাশ নাই, সুদর্শন অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ সকল সর্ব্বতঃ দ্যোতমান ও বিলক্ষণ বলশালী। নৈশ অন্ধকার নষ্ট করিয়া সর্ব্বদা জাগরুক ও জরারহিত অগ্নি-শিখাগণ কখনও কম্পিত হয় না"। "যেমন বায়ুর শব্দ, প্রবল রাজার সেনা, এবং দ্যুলোকোৎপন্ন অশনি কেহ নিবারণ করিতে পারে না; সেইরূপ যে অগ্নিকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না, সেই অগ্নি যোধদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণীভূত দন্তদ্বারা শত্রুদিগকে ভক্ষণ করেন ও বিনাশ করেন এবং বন সকলকে দহন করেন।" "হে অগ্নি! আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহে বিরত না হইয়া সর্ব্বদা অবহিত মঙ্গলকর ও সুখকর আশ্রয় প্রদান দ্বারা আমা-দিগকে রক্ষা কর।" ইন্দ্রকে বলিতেছেন—"হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুক্ষয়কারক বৃষ্টিপূর্ণ ত্বক্‌রূপ মেঘকে ভেদ করিয়া জল সেচন কর; এবং মর্ত্তের ন্যায় গমনশীল মেঘকে ধরিয়া বৃষ্টিশূন্য করিয়া ছাড়িয়া দাও।" "আমাদিগের যজ্ঞে ইন্দ্রকে কামনা করি; ইন্দ্র আমাদিগের সখা, সর্ব্বযজ্ঞগামী, শত্রুদিগের অবিভবকারী, এবং আমাদিগের সহায়ভূত; তিনি যজ্ঞ-বিঘ্নকারীদিগের পরাভব করেন; এবং মরুৎগণের সহিত মিলিত হন। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পালনার্থ (কর্ম্ম) রক্ষা কর। সংগ্রামে শত্রু তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না; তুমিই সমস্ত শত্রুকে নিবারণ কর।" "ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে দৃঢ়রূপে বজ্রধারণ করিয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য, উহা তীক্ষ্ণ হইলেও, (মন্ত্র-সংস্কার দ্বারা) জলকে যেমন তীক্ষ্ণ করে, সেইরূপ আরও তীক্ষ্ণ করিতেছেন, বৃত্রকে নাশ করিবার জন্য আরও তীক্ষ্ণ করিতেছেন। হে ইন্দ্র! বৃক্ষচ্ছেদক যেরূপ বনবৃক্ষকে (ছেদন করে) সেইরূপ তুমি আপন শক্তি, তেজ ও শরীর বলে বর্দ্ধিত হইয়া (আমাদের শত্রুদিগকে) ছেদন করিতেছ, যেন পরশু দ্বারা ছেদন করিতেছ।" "হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র! (বিরোধী) মনুষ্যেরা যেন আমাদের শরীরে আঘাত না করে; তুমি ক্ষমতাশালী, আমা-দের বধ নিবারণ কর।" ঋগ্বেদের ঋষিরা যে সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন, সমস্ত ঋগ্বেদই তাহার সাক্ষী। ঋগ্বেদের কবিত্ব মনকে মুগ্ধ ও হৃদয়কে উন্মত্ত করে। ঊষা-দেবী কবিকল্পনার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। (ক্রমশঃ)

ঋগ্বেদের ঋষিরা সৌন্দর্য্যের উপাসক, সুন্দর বলিয়া ঊষাদির পূজা

আয়ুর্ব্বেদ—ব্রধ্ন ও বিউবনিক প্লেগ্।(১)

চলতী মারী, মৃদুমারী ও মহামারী এই তিন আকারে মারী আত্ম প্রকাশ করে। কলিকাতা মেডিক্যালবোর্ড চল্‌তীমারীর মারীত্ব স্বীকার করিতে তত রাজি নহেন। ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। বাহ্য লক্ষণ পদে পদে আমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে চাহে। একটু উর্দ্ধে উঠিয়া বঙ্গীয়সমালোচক, মৃদু বম্বেমারীর অল্প আক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যা দর্শনে বিস্মিতচিত্তে বলিলেন—"একি তোমার মারী!" ইহাতেও আমরা বিস্মিত হই না। কোন নবাগত মধ্যপ্রদেশবাসী আলিপুর প্রাণিশালায় ভীমকায় শার্দ্দূলের সম্মুখস্থ লৌহশলাকাসংরক্ষিত জানালার অনেক দূরে সুদৃঢ়রেইলিংএ আবেশে অঙ্গ রাখিয়া হত ও আহতের সংখ্যা শুনিয়া লঘুদৃষ্টি প্রসারিত করিতে করিতে বলিতে পারেন, "একি তোমার বাঘ!" কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন আরও একগ্রাম উপরে উঠিয়া শাসন-কর্ত্তাদিগকে জানাইলেন ও জনসাধারণের নিকটে ঘোষণা করিলেন—এখন যাহাকে লোকে বলিতেছে বিউবনিক প্লেগ্, খ্রীষ্টীয় শকের শত শত বৎসর পূর্ব্বে কোন না কোন আকারে প্রাচীন আর্য্যদিগের নিকটে, সে ব্রধ্ন নামে পরিচিত ছিল; এ ব্যাধি বিশেষ বিপজ্জনক নহে। বিজয় বাবু চিকিৎসা ব্যবসায়ে খ্যাতিমান্, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁহার "বাগ্‌ভট্ট" সংস্করণে, মুদ্রণে ও দর্শনে ভারতে অতুল। তিনি সর্ব্ব প্রকার মারী—চল্‌তী মারী, মৃদুমারী, মহামারী—উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন,

---

(১) এটি দাসীর জন্য লিখিত মারী নামক প্রবন্ধের মধ্যভাগ। নানা কারণে মধ্য ভাগই প্রথমে প্রকাশ করিতে হইল। সুতরাং অস্পষ্টতা দোষ কিছু অধিক পরিমাণে ঘটিবার সম্ভাবনা; আশা করি পাঠকগণ সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

মারীর আলোচনায় জন সাধারণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। দাসী শুশ্রূষাকারিণী; তিনি উদাসীন থাকিতে পারেন না।

যাঁহারা সংস্কৃত বচন চাহেন, পাদটীকা তাঁহাদিগের জন্য। সেজন্য সংস্কৃত বাক্যের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল না। প্রবন্ধের সঙ্গে পাদটীকা পড়িবার প্রয়োজন নাই।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলের রচনা কাল এখন পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। তদ্বিষয়ক আলোচনায় পাঠক মহাশয়দিগকে সত্যানুসন্ধানের অনুরোধে একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

বর্ত্তমান লেখক বিগত ৫ই নবেম্বর কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের মত আলোচনা করিয়া, রিস্‌লি সাহেবকে যে পত্র লিখেন উপস্থিত প্রবন্ধাংশ তাহারই রূপান্তর মাত্র।

বিস্ময়ের কথা বটে। সুতরাং মারী বিষয়ক প্রবন্ধে বিজয় বাবুর মতের সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক।

বিজয় বাবু তিনটী সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন :—(১) বিউবনিক প্লেগ্ ব্রধ্ন ; (২) ব্রধ্ন নামে এই প্লেগ খ্রীষ্টীয় শকের শত শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বর্ত্তমান ছিল ; (৩) বিউবনিক প্লেগ বিশেষ বিপজ্জনক নহে। বিজয় বাবু তাঁহার সিদ্ধান্ত তিনটি প্রতিপাদন করিবার জন্য একটী মাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে বচন কোন্ গ্রন্থের, তাহার রচয়িতা কে—মূলই বা কি, বলেন নাই। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বিজয় বাবুর সিদ্ধান্তত্রয় কতদূর সমর্থন করে, আমরা অনুসন্ধান করিব। অনুসন্ধানপথে বিজয় বাবুর প্রামাণ্য-বচন গোপনবাস হইতে আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া পরিচয় প্রদান করিতে পারে।

অনুসন্ধানের সুবিধার্থে আমরা প্রথমে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটী গ্রহণ করিব—"বিউবনিক প্লেগ খ্রীষ্টের শত শত বৎসর পূর্ব্বে ব্রধ্ন নামে এদেশে বর্ত্তমান ছিল।" বিউবনিকপ্লেগ্ থাকুক্, ব্রধ্নব্যাধিটাও থাকুক, প্রথমে দেখিতে হইবে সেই প্রাচীনকালে লোকে ব্রধ্নশব্দে রোগই বুঝিত কি না। দেখিবার উপায় কি ? উপায় প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয়গ্রন্থ সকল।

প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলের মধ্যে চরক প্রাচীনতম। আর সকল গ্রন্থ তাহার পরবর্ত্তী। চরকে আয়ুর্ব্বেদ উৎপত্তির যে ইতিহাস আছে তাহাতে দেখি, শুধু প্রচলিত গ্রন্থের মধ্যে নহে, প্রচলিত অপ্রচলিত সকল গ্রন্থের মধ্যে চরক প্রথম। কেন না চরকসংহিতাপ্রণেতা অগ্নিবেশই প্রথম আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থপ্রণেতা। (২) অগ্নিবেশের সতীর্থ ভেলাদি অগ্নি-বেশের পরে গ্রন্থ রচনা করেন। (৩) বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রমাণে স্থিরীকৃত হয়, এই আদিগ্রন্থ খ্রীষ্টীয় প্রথম তিন চারি শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে, হারণ ও মান-সুরের সময়ে, আরবগণ চরক, সুশ্রুত ও নিদান আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠ করেন। নিদান সংগ্রহ গ্রন্থ। বাগ্‌ভটের অনেক শ্লোক ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। (৪)

---

(২) "তন্ত্রপ্রণেতা প্রথমমগ্নিবেশো যতোঽভবৎ"। চরক ১।১।৩০
এই শাস্ত্র যে চরকসংহিতা তাহারও প্রমাণ আছে—"ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরক প্রতিসংস্কৃতে বিমান স্থানে ত্রিবিধ কুক্ষীয়ং বিমানং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।" চরক, ৩।২

(৩) "অথ ভেলাদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বন্তন্ত্রং।" চরক, ১।১।৩১

(৪) বৃন্দাধিকার প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

বাগ্‌ভট, চরক ও সুশ্রুতের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন ; এই অঙ্গীকারে, প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতায় চরকের প্রাধান্ত লক্ষিত হয়। (৫) সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে, খ্রীষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর অনেকশতাব্দী পূর্ব্বে চরক-সংহিতা লিখিত ও প্রতিসংস্কৃত হয়। এদিকে দেখি, চরক ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধচৈত্য সম্মান করিতে বলিতেছেন। (৬) গ্রন্থখানি ঋষিসভার ফল এই সভায় সভ্য ছিলেন এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। (৭) কিন্তু পৌরাণিক যুগে যে আধুনিক দেবোপাখ্যানরূপমহাবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এই গ্রন্থে তাহার বীজ প্রাপ্ত হই। (৮) গ্রন্থকার প্রাচীন যাগযজ্ঞের ধর্ম্ম জাগাইতে চাহেন এবং দেবগণ দেশত্যাগ করিয়াছেন ভাবিয়া ক্ষোভে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। (৯) সংহিতাখানি পাঠ করিতে বসিলে এই ভাব লইয়া উঠিতে হয় যে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশের সর্ব্বত্র প্রবেশ করিয়াছে, হিন্দু ইহাঁকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেছেন, কিন্তু নানা শক্তি নির্জ্জনে অতিসঙ্গোপনে পৌরাণিকধর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছে। হিন্দু তপস্বিগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সহিত সদ্ভাবে মিশিয়া লোকহিতার্থে সৎকার্য্যে রত থাকিয়াও স্বধর্ম্মপুনরুত্থানের আয়োজন করিতেছেন। অশোকাদি সার্ব্বভৌম বৌদ্ধরাজগণ এত অধিককাল হইল সংসার-লীলা সাঙ্গ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের প্রতিবিম্ব কাল-স্রোতে ক্রমে লয় পাইয়াছে, চরকাদির সময় পর্য্যন্ত আসিয়া পহুঁছিতে পারে নাই। একথাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চরক সংহিতা নামে

---

(৫) "যদি চরকমধীতে তদ্ধ্রুবং সুশ্রুতাদি" ইত্যাদি ও "ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ" ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। বাগভট্ ২।৩।৪৭।৪৯,৫৩

(৬) চরকসংহিতা ১।৮

(৭) চরকসংহিতা ১।১।১—৩১

"পারিক্ষির্ভিক্ষু রাত্রেয়ো ভরদ্বাজো কপিষ্ঠলঃ।" চরক ১।১।৭

(৮) "ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধা শরণামমরেশ্বরম্।" চরক ১।১।১ "বুবুধেয়ং পিতামহঃ।" চরক ১।১।২২ "ততস্তাঃ প্রজাঃ গুর্ব্বাদিভিরভিশপ্তা ভস্মতা মুপযান্তি, প্রাগপ্যভূদনেক-পুরুষকুলবিনাশায়।" চরক ৩।৩।৪৮। আদিকালেঽদিতিসুতসমৌজসঃ পুরুষাঃ বভুবু রমিতায়ুষঃ।" চরক ৩।৩।৫১ "ভ্রশ্যতি তু কৃতযুগে" চরক ৩।৩।৫৩ "ততস্ত্রেতায়াস্তু × × " চরক ।৩।৩।৫৫ "ততস্ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদোঽন্তর্দ্ধানমগমৎ।" চরক ৩।৩।৫৬

"যুগে যুগে ধর্ম্মপাদঃ ক্রমেণানেন হীয়তে।

গুণপাদশ্চ ভূতানামেবং লোকঃ প্রলীয়তে।" চরক, ৩।৩।৫৯

(৯) আদিকালে প্রত্যক্ষদেবদেবর্ষিধর্ম্মযজ্ঞবিধিবিধানাঃ * * পুরুষা বভুবুরমিতায়ুষঃ। চরক ৩।৩।৫১

"ততস্তেঽন্তর্হিতধর্ম্মাণো দেবতাভিরভিত্যজ্যন্তে।" চরক, ৩।৩।৩৮

এখন যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহা চরক-কৃত প্রতি সংস্করণ মাত্র; মূল গ্রন্থের প্রণেতা অগ্নিবেশ (১০)। অগ্নিবেশ ঋষিসভার সভ্য আত্রেয়ের নিকটে ইহার তত্ত্বাবলি অবগত হয়েন (১১)। ভরদ্বাজ ঋষিসভার নিয়োগে ইন্দ্রের নিকটে এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া পুনরধিবেশনে সেগুলি আত্রেয়াদির নিকটে বিবৃত করেন (১২)। এই সকল একত্র করিয়া চিন্তা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, চরকসংহিতা খ্রীষ্টীয় শকের গণ্য-কালপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইতে পারে না। এদিকে আবার অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে কয়েক শতাব্দীর পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হওয়া চাই। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে যে গ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় প্রথম ২।৩ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয় এবং রচনার অল্প পরেই চরকের হস্তে ইহার বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য সকল গ্রন্থ চরকের পরে লিখিত।

সুতরাং বিউবনিক প্লেগ্ বা ব্রধ্ন রোগ তো দূরের কথা, খ্রীষ্টের শত শত বৎসর পূর্ব্বে ব্রধ্নশব্দ যেকোনএকটা রোগও বুঝাইত কিনা তাহাও জানিবার উপায় নাই। কবিরাজ মহাশয়ের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অমূলক প্রতিপন্ন হইল।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলে ব্রধ্ন শব্দের যে ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদনুসারে দেখা যাউক, তাঁহার প্রথম সিদ্ধান্ত—"ব্রধ্নই বিউবনিক প্লেগ্" কতদূর যুক্তিসঙ্গত।

আদি গ্রন্থ বলিতেছেন "যাহার বায়ু প্রকুপিত হইয়া শোথ জন্মায় ও

(১০) ২ সংখ্যক ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

(১১) অথ মৈত্রীপরঃ পুণ্যমায়ুর্ব্বেদং পুনর্ব্বসুঃ।
শিষ্যেভ্যো দত্তবান্ ষড়ভ্যঃ সর্ব্বভূতানুকম্পয়া॥
অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতুকর্ণঃ পরাশরঃ।
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্বচঃ॥" চরক, ১।১।২৮,২৯

আত্রেয়ঃ — কৃষ্ণাত্রিপুত্রঃ পুনর্ব্বসুঃ। (গঙ্গাধর)

(১২) ভরদ্বাজঃ......ঋষিভিঃ স নিয়োজিতঃ। স শক্রভবনং গত্বা * * দদর্শ বলহন্তারং॥ তস্মৈ প্রোবাচ * * আয়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ। ভরদ্বাজঃ ঋষিভ্যোঽনধিকন্তৎ শশাসানব শেষয়ন্।" চরক, ১।১।১৭—২৪

আত্রেয় যে এই ঋষি সমিতির অন্তর্ভূত তাহা সভ্যগণের নামের লিষ্ট দেখিলেই জানা যায়, যথা :—

"আত্রেয়ো গৌতমঃ সাংখ্যঃ পুলস্ত্যো নারদোঽসিতঃ।" চরক, ১।১।৬

* * * *

আত্রেয়ঃ — কৃষ্ণাত্রিপুত্রঃ পুনর্ব্বসুঃ। (গঙ্গাধর)

চলিতে চলিতে কুচ্‌কি হইতে ফল-কোষে যায়, তাহার ব্রগ্ন জন্মে।" (১৩) এস্থলে বলা হইল, ব্রগ্ন জন্মিলে প্রথমে কুচ্‌কিতে তৎপরে ফলকোষে শোথ ও বেদনা জন্মে। কিন্তু শোথযুক্ত অংশের অভ্যন্তরে কি থাকে বলা হইল না।

চরকের পরেই সুশ্রুত। চরকের অপেক্ষা সুশ্রুতে রোগ সকলের লক্ষণ, বিভেদ ও চিকিৎসা পূর্ণতার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। (ইহাও শেষোক্ত গ্রন্থের পরবর্ত্তিতার এক প্রমাণ)। সুশ্রুত অন্ত্রবৃদ্ধি নামে উরুগত ও ফলকোষগত ক্ষুদ্রান্ত্র বৃদ্ধিরকারণ, লক্ষণ ও অবস্থা পরিষ্কার ও নির্ভুল বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু চরকের প্রভাবে এই বর্ণনে কল্পিত হইয়াছে যে, উরুগত অন্ত্রবৃদ্ধি চিকিৎসাভাবে ফলকোষ-গত অন্ত্রবৃদ্ধিতে পরিণত হয়। (১৪) সুশ্রুতে ব্রগ্ন শব্দ পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সুশ্রুতের এই গদ্য বিবরণ প্রায় অবিকল পদ্যাকারে বাগভট্‌সঙ্কলিত অষ্টাঙ্গ হৃদয় নামক পরবর্ত্তী গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। (১৫) টীকাকার অরুণদত্ত অষ্টাঙ্গহৃদয়স্থ অন্ত্রবৃদ্ধি বিবরণের ব্যাখা শেষ করিয়া ঐ অন্ত্রবৃদ্ধি ব্রগ্নশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১৬) উরুগত ক্ষুদ্রান্ত্র বৃদ্ধিই সুশ্রুত ও

---

(১৩) "যস্তু বায়ুঃপ্রকুপিতঃ শোফশূলকরশ্চরন্।
বঙ্ক্ষণাৎ বৃষণৌ যাতি ব্রগ্নস্তস্তোপ জায়তে॥" চরকসংহিতা, ১।১৮

ভিষগাচার্য্য ভাষ্যকার গঙ্গাধরের সংস্করণে ব্রগ্ন স্থানে বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভাষ্যকার সর্ব্বত্র মূলে ধৃত পাঠ ভাষ্যে স্বীকার করেন নাই। বিমান স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে অনেক স্থলে মূলে অন্য সংস্করণের পাঠাপেক্ষা ভিন্ন পাঠ প্রদান করিয়াও ভাষ্য শেষে অন্য সংস্করণের পাঠই স্বীকার-করিয়াছেন, নিজধৃত পাঠ স্বীকার করেন নাই। সুতরাং ভাষ্যকারের পাঠ এতদূর নির্ভর যোগ্য নহে যে তদনুরোধে বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে অন্য সংস্করণের পাঠ অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে।

(১৪) "ভারহরণ * * আয়াসবিশেষৈর্ব্বায়ুরতিপ্রবৃদ্ধঃ প্রকুপিতশ্চ স্থূলান্ত্র স্রোতরস্য চৈকদেশং দ্বিগুণ মাদায়াধো গত্বা বঙ্ক্ষণ সন্ধিমুপেত্য গ্রন্থিরূপেণ স্থিত্বা২প্রতিক্রিয়মাণেচ কালান্তরেণ ফলকোশং প্রবিশ্য মুষ্কশোফমাপাদয়ত্যাধ্মাতোবস্তিরিবাততঃ প্রদীর্ঘঃ শোফোভবতি। সশব্দ মবপীড়িত শ্চোর্দ্ধমুপৈতি। বিমুক্তশ্চ পুনরাধমতি।" সুশ্রুত, ২।১২।২

(১৫) বাত কোপিভিরাহারৈঃ শীততোয়াবগাহনৈঃ।
ধারণেরণভারাধ্ববিষমাঙ্গপ্রবর্ত্তনৈঃ॥ ২৭॥
ক্ষোভণৈঃ ক্ষুভিতোহ ন্যৈশ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রাবয়বং যদা।
পবনো বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশাদ ধোনয়েৎ।
কুর্য্যাদ্ বংক্ষণ সন্ধিস্থো গ্রন্থ্যাভংশ্বযথুং তদা॥ ২৮॥
উপেক্ষ্যমাণস্য চ মুষ্কবৃদ্ধিমাধ্মান রুক্‌স্তম্ভবতীং স বায়ুঃ।
প্রপীড়িতোহন্তঃ স্বনবান্ প্রযাতি প্রধ্মাপয়ন্নেতি পুনশ্চ মুক্তঃ॥ ২৯॥
* * * অষ্টাঙ্গ হৃদয়,৩।১৩।১১।২৭—২৯

(১৬) "ব্রগ্নাখ্যব্যাধেরনন্তরং শোফ-সামান্যাদ্ গুল্মস্যাবসর ইতি তং লক্ষয়িতু মাহ রুক্ষেতি।" সর্ব্বাঙ্গসুন্দর টীকা,১।অ১১।৩১

বাগ্‌ভটের মতে মূল অন্ত্রবৃদ্ধি নামক ব্যাধি। কল-কোষ-গত ক্ষুদ্রান্ত্রবৃদ্ধি তাহার পরিণতি মাত্র। সুতরাং অরুণ-দত্ত প্রকারান্তরে বলিতেছেন, সুশ্রুত-ও-বাগ্‌ভটপ্রোক্ত উরুগত ক্ষুদ্রান্ত্র বৃদ্ধিই ব্রধ্ন। অরুণদত্তের ব্যাখ্যা যে ঠিক্, ব্রধ্ন যে মূলে বঙ্ক্ষণস্থ শোথবিশেষ, বাগ্‌ভটপ্রোক্ত ব্রধ্ন-চিকিৎসা দেখিলেই তাহা সুন্দর বুঝিতে পারা যায় (১৭)।

মাধবকর নিদানে বাগ্‌ভটের শ্লোকময়অন্ত্রবৃদ্ধিবিবরণ অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে বিবরণে নিজের বা অন্যের কোন মন্তব্য যোগ করেন নাই—বোধ হয় করা আবশ্যক মনে করেন নাই। নিদানে ব্রধ্ন রোগের বর্ণন নাই, উল্লেখ আছে। যে শ্লোকে আছে, তাহা অবিকল চরক হইতে গৃহীত (১৮)। বাগ্‌ভটেও ঐ বচনের প্রতিরূপ আছে। নিদানের অন্যত্র ব্রধ্নশব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে রোগার্থে নহে (১৯)।

চক্রপাণি দত্তকৃত চিকিৎসা সংগ্রহে ব্রধ্ন-চিকিৎসা আছে। বৈদ্যকুলের স্মৃতি ও চক্রদত্তের প্রণালী, এই উভয়ের সাহায্যে জানা যায় চক্রদত্ত মাধবের পরবর্ত্তী। চক্রপাণির পিতা, গৌড়াধিপতি নয়পাল দেবের অমাত্য ও রন্ধন-শালাধ্যক্ষ ছিলেন (২০)। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে পালবংশীয় রাজা-দিগের রাজ্য যায়; সুতরাং চক্রদত্ত তৎপরবর্ত্তী লোক হইতে পারেন না। চক্রদত্তের ২য় টীকাকার শিবদাসের পিতাও পালরাজার চিকিৎসক ছিলেন; সুতরাং চক্রদত্ত দশম শতাব্দীর দুইএকশতাব্দীপূর্ব্ববর্ত্তী লোক হওয়াই সম্ভব। ইনি, বৃদ্ধ্যধিকারের যে অংশে অন্ত্রবৃদ্ধির চিকিৎসা বিহিত হইয়াছে,

---

(১৭) বায়াদ্‌ব্রধ্নঃ নচেচ্ছান্তিং স্নেহরেকানু বাসনৈঃ।
বস্তিকর্ম্ম পুরঃকৃত্বা বঙ্ক্ষণস্থং ততোদহেৎ॥
অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ২।১।১৩।২৮

(১৮) "তত্র কোষ্ঠাশ্রিতে দুষ্টে নিগ্রহোমূত্রবর্চ্চসোঃ।
ব্রধ্নহৃদ্রোগ গুল্মার্শঃ পার্শ্বশূলঞ্চ জায়তে॥"
নিদান, বাতব্যাধি। চরক, ৬।২৮

(১৯) পৃথুব্রধ্ননিভাঃ কেচিৎ কেচিদ্ গণ্ডূপদোপমাঃ।
ক্রিমি নিদান॥ ৫॥

(২০) গৌড়াধিনাথরসবত্যধিকারিপাত্র-
নারায়ণস্যতনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনুপ্রথিতলোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী॥
চক্রদত্ত, উপসংহার শ্লোক, ১।

গৌড়াধিনাথঃ—নয়পাল দেবঃ। (শিবদাস সেন)।

তাহার শেষাংশে ব্রধ্নের চিকিৎসা ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোথাও অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্নের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা, কোথাও বা উভয়ের একই চিকিৎসা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। (২১) ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে চক্রদত্তের মতে অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্ন মূলে একই পীড়া, কিন্তু ব্রধ্নে এমন বিশেষ কিছু আছে যাহা সাধারণ অন্ত্রবৃদ্ধিতে নাই। ব্রধ্নশব্দের এই বিশিষ্টতর ব্যবহার দেখিয়া বুঝা যায় যে চক্রদত্তের সময়ে চিকিৎসকেরা রোগ সকলের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, পরস্পর প্রভেদ ও শ্রেণীবন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝিয়াছিলেন।

চক্রদত্তের দ্বিতীয় গণ্য টীকাকার (২২) শিবদাস সেনও দশম শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক নহেন। তাঁহার পিতা, গৌড়েশ্বর ও অবনীপালনামে খ্যাত কোন রাজার চিকিৎসক ছিলেন (২৩)। পাল রাজারাই তাম্রফলকে আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের কেহ কেহ সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তীর পদও পাইয়াছিলেন। শিবদাস বলেন, ব্রধ্নের লক্ষণ রুগ্‌বিনিশ্চয় অর্থাৎ নিদানে নাই, এই জন্য তিনি অন্য গ্রন্থ হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। (২৪) এই অন্য গ্রন্থ খানা কি, তিনি তাহা বলেন নাই। তাঁহার মন্তব্যের অর্থ এই যে সে সময়ে বিজয় রক্ষিতকৃতনিদানের টীকা ছিল না। রক্ষিতের টীকায় শিবদাসধৃতব্রধ্ন লক্ষণই দৃষ্ট হয়। শিবদাসের সময়ে ভাষায় সাধারণ লোকে ব্রধ্নকে বাউসী বলিত। (২৫)

---

(২১) চক্রদত্ত, ৩৭।১০—১২

(২২) অসদ্ব্যাখ্যানতমসা সুচ্ছন্নং চক্রসংগ্রহং।
প্রকাশয়িতু মস্মাভি র্নির্ম্মিতা তত্ত্বচন্দ্রিকা॥"
তত্ত্বচন্দ্রিকা, উপসংহার, ।১।
টীকা রত্নপ্রভা চক্রদত্তনির্ম্মিতসংগ্রহে।
যদ্যপ্যাস্তে তথাপ্যেষ সংক্ষেপায় মমোদ্যমঃ" ॥
ঐ, উপক্রমণিকা ।৩।

(২৩) মালঞ্চিকাগ্রামনিবাসভূমে
র্গৌড়াবনীপালভিষগ্বরস্য।
অনন্ত সেনস্য সুতো ব্যধত্তে
টীকামিমাং শ্রীশিবদাসসেনঃ॥
ঐ, উপসংহার ।৪।

(২৪) ব্রধ্নলক্ষণন্তু যদ্যপি রুগ্‌বিনিশ্চয়ে নাস্তি তথাপি তন্ত্রান্তরমনু সর্ত্তব্যম্। যথা, "অত্যভিষ্যন্দিগুর্ব্বন্ন— × × র্নির্দ্দিশেদিতি।' ত,চ, ৮।৩৭।১০।

(২৫) '× × × × × লোকে বাউসীতিখ্যাতঃ।' ত-চ ২৭।১০।

বিজয় রক্ষিত টীকার প্রারম্ভেই চক্রপাণিকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়াছেন। ব্রধ্নের লক্ষণ এ গ্রন্থে নাই ও গ্রন্থে নাই, বিজয় এরূপ কিছু বলেন নাই। তিনি অন্ত্রবৃদ্ধি ব্যাখ্যার উপসংহারে শিবদাসধৃত ব্রধ্ন লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, বলিয়াছেন ঐ লক্ষণ গ্রন্থান্তরে আছে; কোন্ গ্রন্থে আছে, কেই বা বচনটির রচয়িতা, উহার প্রামাণ্যই বা কি, কিছুই বলেন নাই (২৬)। ভাবমিশ্র, গোবিন্দদাস, বিনোদলাল সেন প্রভৃতি পরবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতারা বিজয় রক্ষিতের নিকট হইতে এই বচন গ্রহণ করিয়াছেন। কেহই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন নাই, কেহই বচনটির বীজ, উৎপত্তি, প্রামাণ্য ও প্রণেতার অনুসন্ধান করেন নাই। শেষ ঋণকর্ত্তা কবিরাজবিজয়রত্ন সেন। কিন্তু ইনি বচনটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্বপ্নেও প্রাচীন বা আধুনিক কোন চিকিৎসকের চিন্তায় উদিত হয় নাই। উহার (২৭) প্রকৃত অনুবাদ এই—

"অতিশ্লেষ্মজনক ও গুরুপাক অন্ন সেবনহেতু দোষ জমিয়া বঙ্ক্ষণ সন্ধিগুলিতে (কুচ্‌কিতে) গ্রন্থির মত শোথ জন্মায়। জ্বর, শূল ও অঙ্গাবসাদ বিশিষ্ট তাহাকে, ব্রধ্ন এই নামে নির্দ্দেশ করিবে।"

এই বচনটীর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি ও পরবর্ত্তি বচনগুলি পাওয়া যায় না। সুতরাং উহার প্রকরণগত অর্থ কি, নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। এজন্য কেবল ব্রধ্নশব্দের অতীত ইতিহাস এবং যে বিষয় ও যে যে বচনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলে এই বচন উদ্ধৃত দেখা যায় সেই বিষয় ও সেই সেই বচন অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে উদ্ধৃত বচন ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

---

(২৬) 'ব্রধ্নিদানন্তু তন্ত্রান্তরে পঠ্যতে, তদ্‌যথা অত্যভিষ্যন্দি......নির্দ্দিশেদিতি।' বৃদ্ধিনিদান।২।

(২৭) অত্যভিষ্যন্দিগুর্ব্বন্নসেবনান্নিচয়ং গতঃ।
করোতি গ্রন্থিবচ্ছোথং দোষো বঙ্ক্ষণসন্ধিষু।
জ্বরশূলাঙ্গসাদাঢ্যং তং ব্রধ্নমিতি নির্দ্দিশেৎ।২।

নিচয় = Accumulation, not generation গ্রন্থিবৎ = গ্রন্থি বা tumour এর মত।

ডাক্তার উদয় চাঁদের মতে various kinds of cystic tumourই আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থি। গ্রন্থিবৎ শব্দের অর্থ glandular = of glands = 'গ্রন্থির' হইতে পারে না।

জ্বর = সাধারণ জ্বর, কেননা অঙ্গপীড়াকৃত। এ জ্বর সন্নিপাত জ্বর হইতে পারে না।

বঙ্ক্ষণ সন্ধি—বঙ্ক্ষণস্থ সন্ধি বুঝাইতেছে, বঙ্ক্ষণ ও সন্ধি নহে। আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বত্র এ শব্দ কেবল বঙ্ক্ষণস্থ সন্ধির অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা, সুশ্রুত, ২।১২।২, বাগ্‌ভট, ১।৩২৮, অরুণদত্ত, ১।৩।২৮ বিজয় রক্ষিত, বৃদ্ধি নিদান ২, বাত ব্যাধি ৪। ইত্যাদি।

শ্লোকটির প্রথম ছত্রে রোগের কারণ বর্ণিত আছে। নিদানটীকার পরবর্ত্তী নানা গ্রন্থে এই ছত্রের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে চিকিৎসকগণ ব্রধ্নের কারণ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। আর, কোন পাঠেই কারণবর্ণন সুশ্রুতকৃত কারণবর্ণনের সহিত এক—এমন কি তৎসদৃশও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু লক্ষণবর্ণন সকল পাঠেই এক এবং প্রত্যেক গ্রন্থেই সমস্ত বচনটি অন্ত্রবৃদ্ধিপ্রসঙ্গে এবং অন্ত্র বৃদ্ধির সাধারণবিবরণের পরে উদ্ধৃত দেখা যায়। পূর্ব্বে ব্রধ্নের যে যে লক্ষণ পরিজ্ঞাত ছিল, এই বচন প্রণেতা তাহাতে জ্বর যোগ করিয়াছেন। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে বচনটির রচনাকালে ব্রধ্নশব্দ অধিকতর বিশিষ্ট অর্থে—আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যায় যাহাকে বলে প্রদগ্ধ, অসংযম্য,উরুগত অন্ত্রবৃদ্ধি তদর্থে—প্রযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্বর স্বরূপলক্ষণ, মনে করিলে, তর্কতঃ বঙ্ক্ষণস্থ অন্য কোন ব্যাধির সহিত ইহার গোলমাল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু কারণবর্ণনা নিতান্ত সাধারণও অস্পষ্ট; আর, পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ অন্ত্রবৃদ্ধির কারণ বর্ণনে সুশ্রুতকে অনুসরণ করিয়াছেন, সুতরাং এস্থলে সুশ্রুতোক্ত কারণগুলির অনুল্লেখ নিতান্ত বিস্ময়কর—ইদানীন্তন ইয়ুরোপীয় অস্ত্রচিকিৎসকগণ সুশ্রুতের সহিত প্রায় একমত। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে যে লক্ষণ অবলম্বন করিয়া ব্রধ্ন আনুষঙ্গিকজ্বরযুক্ত অন্যবিধ বঙ্ক্ষণশোথ হইতে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে, বচন প্রণেতা ও তাঁহার শিষ্যবর্গ সেগুলি জানিতেন না। সুতরাং কার্য্যতঃ ব্রধ্নপদটি সর্ব্ববিধ উরুগত অন্ত্রবৃদ্ধি, বঙ্ক্ষণগণ্ড, ক্রুরাল কেনালে সঞ্চিত স্বল্পবসা, সোয়াসস্ফোটক, স্যাফেনা ধমনীর শোথ—এই সকল বিভিন্ন রোগের সাধারণনামরূপে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে।

বচনটি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়, সুতরাং বাগীর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। বাগী ফিরঙ্গ রোগজাত। ফিরঙ্গ রোগ ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রাচীন মহাদ্বীপে প্রবেশ পথ পায় নাই। ভাবপ্রকাশ ফিরঙ্গরোগ বর্ণন করিয়াছেন; ইনিও অন্ত্র বৃদ্ধির প্রসঙ্গেই ব্রধ্নঘটিত উল্লিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, ফিরঙ্গরোগপ্রসঙ্গে করেন নাই। অফিরঙ্গ গণ্ড বা গণ্ডমালার সহিত ও ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। গণ্ডমালা চরকের অপরিজ্ঞাত ছিল না। পরবর্ত্তী গ্রন্থ সকলে

গণ্ডমালায় উত্তম বর্ণনা আছে ; কিন্তু সর্ব্বত্র অন্ত্র বৃদ্ধির—কেবল অন্ত্রবৃদ্ধির প্রসঙ্গেই বচনটি উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়, কোন স্থলেই সহস্র চেষ্টা করিয়াও গণ্ডমালার সহিত ব্রধ্নের বা ব্রধ্ন বর্ণনার সম্বন্ধ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিদারিকা, বিসর্প অগ্নিরোহিণী প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই যুক্তি সম্পূর্ণ খাটে।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত নিদানের বঙ্গানুবাদে টীকাচ্ছলে ব্রধ্ন শব্দের বাঙ্গালা বাগী লিখিয়াছেন। এই ভ্রমের অনুকরণে নিদানের নব সংস্করণে ব্রধ্নের ইংরাজি করা হইয়াছে বিউবো। পণ্ডিত বিজয়রত্ন বিউবো দর্শনে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ডাক্তার উদয়চাঁদের ভ্রম ভাবপ্রকাশ, ভৈষজ্যরত্নাবলি ও আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান প্রভৃতির বঙ্গানুবাদে নকল করা হইয়াছে। পূর্ব্বতন গ্রন্থ সকলের ন্যায় এই সকল গ্রন্থেও ব্রধ্নবর্ণন অন্ত্রবৃদ্ধি বর্ণনের পরিশিষ্টরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে।

অতএব কবিরাজ মহাশয়ের প্রথম সিদ্ধান্তও অমূলক। প্রাচীন বা আধুনিক, কোন অর্থেই ব্রধ্নের সহিত বিউবনিক প্লেগের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না।

প্রথম সিদ্ধান্ত অমূলক প্রমাণ হইলেই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তও মিথ্যা প্রমাণ হয় এবং এই উভয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় সিদ্ধান্ত—"বিউবনিক প্লেগ বিশেষ বিপজ্জনক নহে"—সঙ্গে সঙ্গে লয় পায়। কিন্তু প্রথম দুইটি আমরা স্বতন্ত্র পরীক্ষা করিয়াছি, তৃতীয়টিও করিব।

চরক প্রকৃতির ঋতুবিপরীত ভাব লক্ষ্য করিয়া পঞ্চালদেশে জনপদোদ্ধংসন ব্যাধির আবির্ভাব আশঙ্কা করিতেছেন (২৮) এবং বলিতেছেন বায়ু, জল, দেশ ও কালের বৈগুণ্য বা বিকৃতি এই রোগের কারণ। (২৯) ইহার আক্রমণে, একই রোগে বিভিন্ন প্রকৃতি, আহার, দেহবল, সাত্ম্য, অন্তঃকরণ ও বয়সের দেশ শুদ্ধ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। (৩০)

(২৮) চরক ৩।৩।১-৮। "জনপদ মণ্ডলে × ×প্রতীকার গৌরবং ভবতি।"

(২৯) "প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈ র্মনুষ্যাণাং যেঽন্যে ভাবাঃ সামান্যাঃ, তদ্বৈগুণ্যাৎ সমান কালাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়োঽভিনির্বর্ত্তমানাঃ জনপদমুদ্ধংসয়ন্তি। তেতু খল্বিমে ভাবাঃ সামান্যাঃ জনপদেষু ভবন্তি ; তদ্যথা, বায়ুরুদকং দেশঃ কাল ইতি × × ।" চরক, ৩।৩।১১—১৩

(৩০) "অপিচ খলু জনপদোদ্ধংসনমেকেন ব্যাধিনা যুগপদসমানপ্রকৃত্যাহার-দেহবল-সাত্ম্য-সত্ত্ব-বয়সাং মনুষ্যাণাং কস্মাদ্ভবতীতি।" চরক, ৩।৩।১০

এ রোগটি সংক্রামক সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী ভিষগাচার্য্য সুশ্রুত তাঁহার সময়ে জানা সংক্রামক রোগ সকলের তালিকা দিয়াছেন এবং কিরূপে উহারা দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয় তাহাও লিখিয়াছেন (৩১)। সে রোগগুলি এই—কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ ও ঔপসর্গিক রোগ (পাপজ ও ভূতোপসর্গজ রোগ)। এই ফর্দ্দে ওলাউঠা ও বসন্তের নাম পাওয়া যাইতেছে না। সুশ্রুত বর্ণিত মসূরিকা ক্ষুদ্ররোগ মাত্র (৫৫), এখনকার মারাত্মক বসন্ত নহে। এসিয়াটিক কলেরা তো আধুনিক ব্যাধি। বিশেষতঃ চরকের গ্রন্থে এই দুই পীড়ার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। সুতরাং এই দুইটিকে ফর্দ্দ হইতে বাদ দিতে হইবে। কুষ্ঠ ও নেত্রাভিষ্যন্দ জনপদীয় হইলেও বিশেষ অর্থে প্রাণহন্তা নহে। শোষ সংক্রামক হইলেও জনপদীয় নয়। আয়ুর্ব্বেদে ঔপসর্গিকব্যাধির যে আভাস পাওয়া যায় তাহাতে তাহার স্কন্ধে জনপদ বিনাশরূপ বৃহৎ ব্যাপারের আরোপ কোন প্রকারেই সম্ভবে না। সুতরাং বোধ হইতেছে যে এই ব্যাধি এক প্রকার জ্বর। চরক নিজেই এই মত সমর্থন করিতেছেন। জনপদোদ্ধংসনপ্রসঙ্গে তিনি ভ্রমপ্রলাপময় দাহজ্বর চিকিৎসায় বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন এবং উহাতে যে অস্ত্র হইতে রক্ত নির্গম বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহাও ইঙ্গিত করিতে ভুলেন নাই। (৩২)

গ্যালেন প্রভৃতি প্রাচীন প্রতীচ্যপণ্ডিতগণ জনপদোদ্ধংসন ব্যাধিমাত্রকেই মারী বলিয়াছেন। তদনুসারে চরক-নির্দ্দিষ্ট এই ব্যাধিমারী। কি প্রকার মারী, তাহাই বিবেচ্য। গণ্ডীরমারীর দুইটি লক্ষণ—দাহজ্বর ও রক্ত-পিত্ত—ইহাতে পাইতেছি। বাকি একটি লক্ষণ—গণ্ডমালা অনুমান করিবার কোন হেতু আছে কি? আছে। যে সময়ে চরকসংহিতা রচিত হইতে-ছিল, তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতে লিবিয়া, ইজিপ্ট ও সিরিয়া গণ্ডীরমারীর আক্রমণে উচ্ছন্ন যাইতেছিল। সেইপ্রাচীনকালহইতে গণ্ডীরমারী প্রাচীন মহাদ্বীপে মনুষ্য বধ করিয়া ফিরিতেছে। এ যে ঐতিহাসিক সময়েই

(৩১) "প্রসঙ্গাদ্ গাত্র সংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহ শয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানু লেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥
সুশ্রুত, ২। ৫। ২৯, ৩০।

(৩২) "উক্তেণ হি দাহজ্বর প্রলাপাতিসারা ভূয়োভিবর্দ্ধন্তে, শীতেনচোপশাম্যন্তীতি।"
চরক, ৩।৩।১৪-১০৪।

কত শত বার পৃথিবীর উপর দিয়া চলিয়া গেল, বলা যায় না। কিন্তু অন্ত-বিধ মারীর কেবল তিনটি উল্লেখযোগ্যআক্রমণের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (সে কথা পরে বলিব)। বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পর হইতে কোথাও উহার বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না। আবার ইহাও দেখা যায়, সেই প্রাচীনকালেই গণ্ডীয়মারী অন্তমারীঅপেক্ষা পঞ্চালের অধিকতর নিকটে আসিয়াছিল। সুতরাং চরকের মারী যে গণ্ডীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মারীতত্ত্ব ও ইতিহাস এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে, ১৮২৩ হইতে ৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন উত্তর পঞ্চালের আধুনিক নগর কেদারনাথে মারী রাজত্ব করিতেছিল। ১৮৪৯-৫২ খ্রীষ্টাব্দে মারী অত্যন্ত প্রবল হইয়া দক্ষিণদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার ফ্রান্সিস্ ও পিয়ার্সন কমিশনের সভ্যরূপে রোগের তথ্যানু-সন্ধানার্থে তথায় প্রেরিত হন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ঐ রোগ গণ্ডীয়মারী ব্যতীত আর কিছুই নহে। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে রক্ত-পিত্ত বর্ত্তমান ছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর ডাক্তারদ্বয় বলিয়াছেন, ব্যাধি অন্য স্থান হইতে আসে নাই, আক্রান্তস্থানের ভূমিতেই উহার বীজ ছিল। এই বীজ —এই জীবাণু কোথা হইতে আসিল? পৃথিবীর বর্ত্তমানঅবস্থায় অজীব হইতে জীব উৎপন্ন হইতে পারে না এবং অল্প সময়ের মধ্যে একবিধ জীব হইতে অন্যবিধ জীবের উৎপত্তি ও সম্ভব নহে। সুতরাং রোগ বীজ পঞ্চাল-দেশেই ছিল, অথবা অন্যদেশ হইতে আসিয়াছিল। ইদানীন্তনকালে বায়ুযোগে দেশান্তর হইতে বীজ আসিয়া পঞ্চালে গজাইয়া থাকিতে পারে, অথবা এ ঘটনা ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকিতে পারে। আমাদিগের নিকটে এই দ্বিতীয় পক্ষই যুক্ততর। চরকের ভাবি-আক্রমণ-শঙ্কা অতীতস্মৃতির ফল। ভিন্নদেশীয়মারী-স্মৃতির ফল হইলে, তাঁহার আশঙ্কা পঞ্চালে আবদ্ধ থাকিবে কেন? সুতরাং তাঁহার আশঙ্কা স্থানীয় অতীতআক্রমণস্মৃতির ফল। এই ব্যাখ্যার সহিত উনবিংশশতাব্দীর মারীবিবরণ ও চরকের কথা, উভয়ই সুসঙ্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। অন্য ব্যাখ্যায় তাহা হয় না—সমস্ত প্রাচীন ও ইদানীন্তন ঘটনা অসমঞ্জস থাকিয়া যায়। একমাত্র আপত্তি—যদি অত পূর্ব্বে বীজ আসিয়াছিল, শতাব্দীরপর শতাব্দী চলিয়া গেল, সময়ে সময়ে মারী দেখা দিল না

কেন? সঞ্চিত বীজে যুগযুগান্তরে মারীর আবির্ভাব সম্ভবে না। ইহার উত্তর এই, এ আপত্তি উভয় পক্ষেই খাটে। প্রথম পক্ষ গ্রহণ করিলেও মরণাতীতকালে পঞ্চালে রোগবীজ আনাইতে হয়। আপত্তিটি কিন্তু কোন কাজেরই নহে। সময়ে সময়ে যে সুদূর সমণ্ডলবাসী লোকদিগের অজ্ঞাতসারে মারী পঞ্চালে উৎপন্ন ও লীন হয় নাই, কে বলিল? সে বিজনপ্রায় উচ্চ ভূমির মারীকাহিনী এই উনবিংশ শতাব্দীতে ক্রমাগত ১১ বৎসর পর্য্যন্ত সদাউৎকর্ণ ব্রিটিশসিংহেরও কর্ণগোচর হয় নাই। পূর্ব্বেত যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত সে স্থান কেবল দাঙ্গা হাঙ্গামার স্থান ছিল, কে তাহার সংবাদ লইত?

ইদানীন্তন পঞ্চালমারীর বিবরণে একটি অদ্ভুত কথা জানিতে পাই—চুয়ান্ন বৎসরের মধ্যে সেমারী উত্তর পঞ্চালের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারত-বিহারে বহির্গত হইতে পারে নাই। আরও অদ্ভুত কথা এই যে মারীর প্রকোপ-কালে, কতলোক কেদারনাথ তীর্থে গিয়াছেন, কিন্তু যাত্রি-মধ্যে কেহ এই পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই বা কোন প্রকারে বীজ স্থানান্তরে লইয়া যান নাই। এখন যাতায়াতের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রিযোগে মারী বিস্তারের সুবিধা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক। তথাপি আধুনিক পঞ্চাল-মারী উত্তর পঞ্চালের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পঞ্চাল-মারীও জন্মভূমির একাংশেই আবদ্ধ থাকিত, অন্য প্রদেশ বাসীরা—বিশেষতঃ চরকের পরবর্ত্তী আর্য্য বৈদ্যগণ তাহার সংবাদ পাইতেন না, এজন্যই চরকের পরবর্ত্তী গ্রন্থ সকলে ইহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

আত্রেয়, অগ্নিবেশ, চরক বা অন্য কোন গণ্য হিন্দু বৈদ্য পঞ্চালের সে মারী প্রত্যক্ষ করেন নাই; করিলে, যে সকল গ্রন্থে জ্ঞাত রোগসমূহের লক্ষণাবলি যথাসাধ্য নিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেসকলে উক্ত মারীর লক্ষণাবলি সবিস্তর লিখিত থাকিত। পঞ্চালের আধুনিক মারীতে সন্নিপাত জ্বর গণ্ডমালা ও রক্তপিত্ত, এই তিনটী একত্র হইয়াছিল। প্রাচীন ও আধুনিক সকল লেখকই এই তিনটী গণ্ডীয় মারীর অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চরকে সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ সবিস্তর লিখিত আছে, ইহাও আছে যে সন্নিপাত জ্বরান্তে কর্ণমূলে শোথ হইলে রোগী কালপ্রাপ্ত হয়। (৩৩) গণ্ডমালার

(৩৩) চরক, ৩।৮, ১০।

কথাও চরক জানিতেন, কিন্তু সে কেবল গলগত ছিল। পরবর্ত্তী তোজাদির গ্রন্থে গণ্ডমালার সবিস্তর বিবরণ আছে; তাঁহাদিগের মতে এই রোগের লক্ষণ বাহুমূলে, গলদেশে মন্যাস্থলে ও কুঁচকিতে গণ্ড বা লসীকীয়গুটিকাবৃদ্ধি; কোন কোন গণ্ড পাকেও স্রাবিত হয়;—কিন্তু সঙ্গে পীনস, কাস, পার্শ্ব শূল, বমন ও জ্বর থাকিলে এই রোগ অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। (৩৪) চরকাদির গ্রন্থে রক্তপিত্তের বিবরণও সবিস্তর লিখিত আছে। কি অবস্থায় রক্তপিত্ত অসাধ্য হয় তাহাও এই সকল গ্রন্থকার লিখিতে ভুলেন নাই। (৩৫) কিন্তু প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলের মধ্যে কোথাও এমন কোন রোগের লক্ষণসমূহ লিখিত হয় নাই, যাহাতে এই তিন রোগের লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হয়।

অতএব জানপদস্মৃতির উপরে নির্ভর করিয়া চরক যে ব্যাধি জনপদধ্বংসকারী বলিতেছেন, কবিরাজ বিজয়রত্ন তাহাই বিশেষ বিপজ্জনক নয় প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় সিদ্ধান্তও অমূলক।

এই মীমাংসা যদি ঠিক হয়, চরক মারীর হস্ত এড়াইবার যে সকল উপায় ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করিয়াছেন, সে সকল অবলম্বন করা আমাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন, বায়ু, জল, দেশ ও কাল এই চারিটীর বৈগুণ্য বা বিকৃতি মারীর অব্যবহিত পূর্ব্ব কারণ, ইহারা বিগুণ না হইলে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। (৩৬) এই চারি কারণের কোনটীই প্রাচীনদিগের শাসনাধীন ছিল না। পূর্ব্বকালের বিচ্ছিন্নশাসনক্ষমতা এখন কেন্দ্রগত হইয়াছে, বহুলোকের একত্র মিলিয়া সমবেতভাবে একমতে যথেষ্টকাল কার্য্যকরিবার ক্ষমতা বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইদানীন্তন বিদ্যা ও সাধন স্বাস্থ্যবিধান, বায়ু, জল ও ভূমির উপরে মানবীয়শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে ঋতুর বৈগুণ্য অনেক পরিমাণে অতিক্রম করিবার অনেক প্রণালীও উদ্ভাবিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে পীড়িত লোকদিগকে জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার কোন বন্দোবস্ত বা সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং নির্জ্জন বাস বা দেশত্যাগ দ্বারা আত্ম-গোপন এবং স্বাস্থ্যকর দেশের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন মারীর হস্ত নিশ্চিত অতিক্রমের

---

(৩৪) মাধব ও বিজয়, গণ্ডমালা।

(৩৫) চরক, ২।৬। মাধব ও বিজয়।

(৩৬) "ইমানেবংদোষযুক্তাংশ্চতুরোভাবান্ জনপদোদ্ধ্বংসকরান্ বদন্তি কুশলাঃ, অতোঽন্যথা ভূতাংস্তু হিতানাচক্ষতে!" চরক, ৩।৩.২০

উপায়ও ছিল না। (৩৭) এখন স্বাস্থ্যবিধান সঙ্গত প্রণালী মতে রোগীদিগকে সুস্থ ব্যক্তিগণ হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার সুবিধা হইয়াছে। ইহাতে চরকাদির উদ্দেশ্য অধিকতর সফল হইবার সম্ভাবনা। বৈদ্যকুলপতি চরক যদি আজ বর্ত্তমান থাকিতেন, মারীর আগমন, স্থিতিলাভও বিস্তার নিবারণের জন্য শাসনকর্ত্তৃগণ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সে সকল সম্পূর্ণ অনু-মোদন করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেন, মারীর বৎসামান্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া জনপদ রক্ষাকর নিয়মগুলি রহিত করিতে অনুরোধ করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন, হিতোপচারের উপরেই জীবন নির্ভর করে, অহিতোপচার মৃত্যুর কারণ, মনুষ্য স্বদোষে অকালে দেহ ত্যাগ করে। ইহাও বিশ্বাস করিতেন, মারীর সমস্ত কারণ—বায়ু, জল, দেশ ও কালের বৈগুণ্য—বর্ত্তমান থাকিলেও উপযুক্ত প্রতীকারবলে লোকে রোগের আক্রমণ এড়াইতে পারে। (৩৮) অবশ্য এ অনুরোধ আমরাও করিয়াছি, কুলপতি চরকও করিতেন, যে, বিপদেরবিশের সম্ভাবনা না থাকিলে 'সম্ভব স্থলে যেন রোগীদিগকে নিজ নিজ পারিবারিক বাসগৃহেই স্বতন্ত্র রাখিবার সুবন্দোবস্ত করা হয়।

মাধবিকা। *

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের প্রবাসের পত্র সমালোচনা করিতে যাইয়া সাধনার কোন সমালোচক বলিয়াছিলেন, "পড়িয়া মনে হয়, যেন গোপন পত্র ভ্রমক্রমে প্রকাশ হইয়া গেছে।" বলেন্দ্র বাবুর মাধবিকার কবিতাগুলি পাঠ করিয়া মনে হয়, যেন লেখকের হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুর হইতে গুটিকতক অসূর্য্যম্পশ্যভাব ভাষার সূক্ষ্মআবরণমাত্রমণ্ডিতা হইয়া ভ্রমক্রমে রাজপথে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। কবিতাগুলিতে যেন বিদ্যা-সুন্দর ও বাসবদত্তার ছাপ বড় স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয়। কবিতাগুলিতে নূতন বড় কিছুই নাই। "উপমা" প্রভৃতি কবিতা কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণ।

---

(৩৭) " × × × গুপ্তিরাত্মনঃ।
হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামুপসেবনম্ " চরক, ৩।৩।২২, ২৩

(৩৮) "তস্মাদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতমতো বিপর্য্যয়া মৃ]ঃ।" চরক, ৩।৩,৮৪ "তথায়ু-রপি × × স মৃত্যুরকালে।" চরক, ৩।৩।১২, ১৩ "বিগুণেষপিতু খলু জনপদোদ্ধংসন করেষু ভাবেষু ভেষজেনৈ যোপপাদ্যমানানামভয়ং ভবতি রোগেভ্যঃ।" চরক, ৩।৩।২১

* মাধবী—শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজযন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বলেন্দ্র বাবু তাঁহার কবি ও সেন্টিমেণ্ট্যাল্ নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "কবির অভিনয়ই সেন্টিমেণ্টালের প্রধান লক্ষণ। সকলে কিছু আর কবির প্রতিভা লইয়া জন্মে নাই, অথচ কবি হইবার সাধ অনেকেরই আছে; সুতরাং আর কিছুতে হউক না হউক, কবির ভাব ভঙ্গীর এক প্রকার অসঙ্গত অনুকরণ করিয়াই তাঁহাদিগকে সাধ মিটাইতে হয়।" বলেন্দ্র বাবুর সংজ্ঞানুসারে তিনি স্বয়ং যেন সেন্টিমেণ্ট্যালের দলে পড়েন। রবীন্দ্র বাবু প্রাচীন কবিদিগের মধুররসমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, বলেন্দ্র বাবু সে রস গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কেবল গ্রহণের অযোগ্যাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাই তাঁহার কবিতায় যাহা আসা উচিত ছিল না, তাহা আসিয়াছে। তাঁহার রচিত ও আদিব্রাহ্মসমাজকর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে যাহাকে একটু অশ্লীলতা বলে তাহার ছায়া লোকে প্রত্যাশা করে নাই। এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত "কলবেদনা" নামক কবিতাটি গদ্যাকারে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। "কলবেদনা" লালসাপূর্ণ অন্তরের করুণগান। দেহের সঙ্গেই তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, শারীরিকললিতলাবণ্যেই তাহার অত্যন্ত অনুরাগ। আমরা একে 'সেন্টিমেণ্ট'রসেবঞ্চিত, তাহাতে আবার বাঙ্গালা সাহিত্য বিরহ-বিকারে, নিরাশার হাহাকারে ইতিপূর্ব্বেই কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং বলেন্দ্র বাবু তাঁহার এই 'দিব্য' ভাষা 'তামসী' কামনারবিলাস মন্দিরে ডালি দিতেছেন দেখিয়া, আমরা দুঃখিত হইয়াছি।" বাস্তবিক বলেন্দ্র বাবু তাঁহার শিল্প-কুসুম-কুন্তলা, লাবণ্যময়ী মোহিনী ভাষা তামসী কামনার বিলাস-মন্দিরে ডালি দিলে সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। মাধবিকার কবিতাগুলিতে লেখক প্রেমের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, তাহা না রাখিয়া দেহের সহিতই তাহার সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর করিয়া তুলিয়াছেন। মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে যে কবিতাটি সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দিত, বলেন্দ্র বাবুর "বৃথা গর্ব্বই" তাহার সমান। তাহার পর "স্নান", "কলবেদনা" প্রভৃতিতে সুর আরও একটু উঠিয়াছে, "বিষামৃত" ও "কুম্ভমেলা"র তাহা উচ্চতম গ্রামস্পর্শী। প্রতিভার ইচ্ছাকৃত এই সকল ছেলেমি প্রকাশিত করিয়া বলেন্দ্রবাবু কেন যে তাঁহার নবীন যশ কলঙ্কিত করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। মাধবিকার এই সকল কবিতায় রস বিশেষ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব আছে কি না আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। ছন্দোবদ্ধ রচনা মাত্রই কবিতা কি না

তাহা সন্দেহ স্থল। কবির সম্বন্ধে বলেন্দ্র বাবু আপনি বলিয়াছেন তিনি "আপন দুর্দ্দম্য ক্ষমতায় বিশ্ব রহস্য মন্থন করিয়া মানবের হৃদয়ে আনন্দ বিতরণ করেন।" কবি স্বভাবতঃই কবি, কবিত্বের জন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হয় না।

মাধবিকা বলেন্দ্র বাবুর রচনা বলিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম, কেন না তাঁহার নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক ভরসা করে। তাঁহার ক্ষমতার অভাব নাই।

"যার যত উচ্চশক্তি তত গুরুতর কর্ম্ম তার।"

বাঙ্গালা কবিতায় "নুপুর গুঞ্জন" আর "বলয় নিক্কন" মহিমাগীতির অভাব নাই।

"চুম্বন গুঞ্জন আর সরস বসন্ত
হয়েছে বিস্তর, হোক্ অন্ত
এবে সে সবের।"

বলেন্দ্র বাবু তাঁহার উড়িষ্যাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির মত প্রবন্ধ, সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনাগুলির মত সমালোচনা রচনায় মনোনিবেশ করিলে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার যশের অভাব হইবে না। তাঁহার ভাষা মধুর, তাঁহার গদ্য রচনা প্রাণস্পর্শী। তাঁহার পদ্য রচনায় আমরা যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার গদ্য রচনায় সে সকলের ছায়া পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। বলেন্দ্র বাবুর গদ্য রচনাপ্রণালী তাঁহার আপনার বিশেষত্ব। সাধনা উঠিয়া যাইবার পর এতদিনে বলেন্দ্রবাবু কই আর তেমন গদ্য রচনা প্রকাশিত করেন নাই। কবিতা ছাড়িয়া বলেন্দ্র বাবু তাঁহার স্নিগ্ধ গম্ভীর মধুময়ী ভাষায় গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করিয়া প্রতিভা ও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করুন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত সর্ব্বাগ্রে ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য অক্টোবর মাসের কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

বর্ত্তমান মাসের রোগী এবং আতুর সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। দেবীয়া, ৩। স্বর্ণ, ৪। ফুলমণি, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। নবদুর্গা, ৭। সুমিত্রা, ৮। অম্বিকা, ৯। রুক্মিণী, ১০।

নিস্তারিণী, ১১। সখী, ১২। দ্রবময়ী, ১৩। জুলী, ১৪। আনন্দ, ১৫। দয়া, ১৬। মাণিক, ১৭। নিফিকির, ১৮। বৈরাগী, ১৯। মোহনলাল, ২০। নফর নন্দী, ২১। কালীচরণ, ২২। বিনয়নাথ নাগ, ২৩। ফণিভূষণ মিত্র।

দ্রবময়ী, এই হতভাগিনী সেই হাতের পচা ঘায়ে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অবশেষে চিরশান্তিধামে গমন করিয়াছে। ভগবান্ তাহার আত্মার কল্যাণসাধন করুন।

জুলী। এই হতভাগিনী বৃদ্ধার এই এক রোগ ছিল যে সে সমস্ত দিন রাত্রি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। হঠাৎ একদিন মস্তকে আঘাত লাগিয়া অচেতন হইয়া পড়ে, এবং বহু যত্নের পর জীবনের আশা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সেই "ভাত দাও, পানি দাও, নাস্তা দাও" চীৎকার রব বোধ হয় চিরদিনের জন্য বন্ধ হইল। সেই দিন হইতে হঠাৎ তাহার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। এখন আহারাদি বেশ করিতেছে, তবে আমাদের খাওয়াইয়া দিতে হয়।

বৈরাগী। অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

নিফিকির। আরোগ্য লাভ করিয়া তাহার ভ্রাতার নিকট ফিরিয়া গিয়াছে।

মোহনলাল। বয়স ২৫ বৎসর। নিবাস জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত ভোয়ারা গ্রামে। ইহাকে কুলি করিয়া চা বাগানে চালান দিয়াছিল, কিন্তু অসুস্থ হইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিয়া আসে। অনাহারে মরণাপন্ন অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়াছিল, এবং আমাদের বন্ধু বাবু উমাপদ রায় ইহাকে দাসাশ্রমে দিয়া যান। কয়েক দিন আহারের পর বিশেষ বল লাভের পূর্ব্বেই দেশে যাই বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পর তাহাকে আমরা অতি শোচনীয় অবস্থায় রাস্তার ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। একদল লোক আছে তাহারা ভিক্ষার প্রলোভন কিছুতেই ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না।

নফর নন্দী। বয়স ৪৫ বৎসর। জাতিতে তাঁতী, নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত রাজবলহাট। রোগ পক্ষাঘাত। মেডিকেল কলেজ হইতে বিদায় প্রাপ্ত হয় এবং নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। রিলিফ্ ফ্রেটারনিটির একজন ভ্রাতা ইহাকে তদবস্থায় দাসাশ্রমে দিয়া যান। রোগী দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে।

কালিচরণ তেওয়ারি। বয়স ৫০ বৎসর। নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত ঠিকডাঙ্গা। রোগ বাত। শেয়ালদহ হাঁসপাতালে ছিল। সেখানে বিশেষ কোনও উপকার না হওয়ায় চলিয়া আসে এবং মরণাপন্ন অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকে। রিলিফ্ ফ্রেটারনিটির একজন ভ্রাতা দেখিতে পাইয়া তাহাকে দাসাশ্রমে দিয়া যান। এখন সে লাঠি ধরিয়া উপর নিচু করিতে পারে।

বিনয়নাথ সেন। বয়স ৪০ বৎসর। নিবাস কলিকাতা আলমবাজার। রোগ হাঁপকাস। একটু সুস্থ হইয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে।

ফণিভূষণ মিত্র। বয়স ১২ বৎসর। নিবাস যশোহর জেলায় বালকাট। ম্যালেরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি। তাহার ভ্রাতা নিতান্ত অক্ষম বলিয়া এখানে রাখিয়া যায়। অবস্থা বড় শোচনীয়। বাঁচিবার কোনও আশা নাই।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

মাসিক চাঁদা।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেপ্টেম্বর ১৲, R. N. Mukerjee Esqr. অক্টোবর ১৲, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু সেপ্টেম্বর ১৲, N. K. Bose Esqr. সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু হরিপদ ঘোষাল সেপ্টেম্বর।০, বাবু গৌরীশঙ্কর দে সেপ্টেম্বর ॥০, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত সেপ্টেম্বর ১॥০, বাবু বিহারীলাল দে ভাদ্র ॥০, ডাঃ চুনিলাল বসু অক্টোবর ১৲, বাবু বঙ্কুবিহারী মিত্র সেপ্তেম্বর।০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু অক্টোবর ১৲, বাবু করুণাদাস বসু সেপ্টেম্বর।০, ১২৬ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস অক্টোবর ॥০, বাবু তেজচন্দ্র বসু সেপ্টেম্বর ॥০, বাবু নন্দকুমার দত্ত সেপ্টেম্বর ১৲, ১৭ নং শঙ্কর ঘোষের লেন অক্টোবর ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র সেপ্টেম্বর, ১৲ ২১।১ পটুয়াটোলা মেস্ অক্টোবর।০, বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার সেপ্‌টেম্বর ২৲, বাবু নীরোদনাথ মুখোপাধ্যায় সেপ্টেম্বর অক্টোবর ৫৲, বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ১৲ Mrs. P. C. Sen জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর ২৪৲, A lady, C/o Babu Sreenath Das সেপ্টেম্বর ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, ভাদ্র আশ্বিন ২৲, বাবু সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বিন কার্ত্তিক ১০৲ B. S. Matheson Esqr. জুন হইতে আগষ্ট ৩৲, বাবু শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী, আগষ্ট।০।

এককালীন দান।

ছাত্রীনিবাসের জন্মদিন উপলক্ষে ব্রাহ্ম বালিকা বোর্ডিংএর ছাত্রীগণ ৬৲, ছোট কা ১৲, বাবু শীতলদাস রায়, নিশ্চিন্তপুর ১৲, Mrs. M. M. Bose ২৲, বাবু সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় খাওয়াইবার জন্য ১৭।০, বাবু রাধিকানারায়ণ ঘোষ ৬৲, শ্রীমতী সরোজিনী রায়।০, ২৯নং রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন।০, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲, ৬৭নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট মেস।০, বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, পড়িয়া পাওয়া।০, A Miss ✓০, বাবু কামিনীকুমার চন্দ, শিলচর ৬৲, বাবু হরচন্দ্র মজুমদার ১৲, বাবু হরকুমার সরকার ১৲, বাবু মহেশচন্দ্র বারিক ২৲, শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দেব ১৲, বাবু চারুচন্দ্র রায়ের মাতা ১৲, শ্রীমতী সৌরভিনী ঘোষ ১৲, একজন দাসাশ্রমের পুরাতন বন্ধু পুজার খাওয়াইবার জন্য ২০৲, ময়মনসিং ভক্তিসঞ্চারিণী সভা ১৲, বাবু গৌরলাল রায় কাকিনিয়া ২৲, একজন দাসাশ্রমের পুরাতন বন্ধু দাসাশ্রমের আতুরগণের পুজার নব বস্ত্রের জন্য ২০৲, বাবু জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ৩৲, বাবু ভূতনাথ ঘোষ, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে খাওয়াইবার জন্য ৫৲, বাবু জ্ঞানেন্দ্র-

নাথ বসু, লাহোর ৫৲, একজন পরিদর্শক ১৲, মিঃ দত্তের সন্তানগণ, বর্দ্ধমান ২৲, বাবু কীশোরীমোহন বসু, ধাপা ১৲, বাবু শরচ্চন্দ্র সেন, পুরুলিয়া ৫৲, A frend of Azimgunj ১৲, জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৲, বাবু হেমেন্দ্রলাল খাস্তগির ৫৲, বাবু মতিন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক ডিব্রুগড় হইতে সংগৃহীত ইন্‌জিনিয়ারিং আফিস ১৲, ঐ ঐ রেলওয়ে আফিস ১৸৹, Surgeon Major H. C. Bannurjee, সিলেট ৩৲, বাবু গিরিশচন্দ্র সোম, শ্রীমঙ্গল ॥৹, বাবু ঈশানচন্দ্র নন্দী, ফুলছড়া ॥৹

বস্ত্রাদি দান।

বাবু হরচন্দ্র মজুমদার কাপড় ১। বেথুন কলেজ হইতে ছোট প্যাণ্ট ১০, জ্যাকেট ২, বালিসের ওয়াড় ৩, ফ্রক ৩, ইজার বড়ি ৪, কোট ৩, ষ্টকিং পুরাতন ৮॥ জোড়া, পরদা ১। একজন ভদ্রলোক কাপড় ১, পিরাণ ১, কোট ১, গরম কোট ১।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় ৩৸৶৫, পুস্তক বিক্রয় ২৲, সুরাজমোহিনী ফণ্ডের সুদ ১০৲, বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের নিকট হইতে ২১ই জুনের গচ্ছিত আদায় ৫০৲। মোট ৬৫৸৶৫

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়—মাসিক চাঁদা ৬১৸৹, এককালীন দান ১৩২৶৹, অন্যান্য প্রকারে আয় ৬৫৸৶৫, পূর্ব্ব মাসের হস্তেস্থিত ১২৸৹। মোট ২৭২॥৵৫

ব্যয়—বাজার খরচ ৮৫।১০, পূজাদি উপলক্ষে খাওয়ান খরচ ৩৩॥৶১৫, রোগীর গাড়ী ভাড়া ১৸৶১০, কর্ম্মচারীর একজনের দুই মাসের ও একজনের এক মাসের বেতন ৩৫৲, চাকর দুই মাসের ৭৲, ব্রাহ্মণ ৬৲, আদায়কারীর খরচ ১৸৶১০, মেহতর শোধ দুই মাস ১২৸৶১০, ক্ষুদ্র জিনিস খরিদ ১৵৫, ধোপা ২৲, পূজা উপলক্ষে নব বস্ত্র খরিদ ১৯৶৹, বাটিভাড়া পূর্ব্ব মাসের ৩০৲, ও বর্ত্তমান মাসের ২০৲, দুগ্ধ ৬৲, অন্যান্য ১৲। মোট খরচ ২৬৩৵৹

আয় ব্যয়—মোট আয় ২৭২॥৵৫, মোট ব্যয় ২৬৩৵৹, মোট হস্তেস্থিত ৯।৫

বিশেষ ধন্যবাদ।

দাসাশ্রমের একজন পুরাতন বন্ধু গত পূজার সময়—যখন বঙ্গদেশের সকল লোক আনন্দে বিভোর ; তখন—সহস্র গোলমালের মধ্যে এখানকার নিরাশ্রয় অন্ধ আতুরগণকে বিস্মৃত না হইয়া ৪০৲ ব্যয় পূর্ব্বক তাহাদিগকে নববস্ত্র ও বিবিধ উপাদেয় আহারীয় দানে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। এ জন্য অনাথ অনাথাগণ তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। আমাদের ধন্যবাদ অপেক্ষা এই আশীর্ব্বাদের মূল্য অধিক।

বাবু সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, হাইকোর্টের এটর্ণি মহাশয় দাসাশ্রম দেখিতে আসিলে তাঁহার সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া এখানকার অনাথা-

গণ পিতার নিকট কন্যাগণ যেরূপ আবদার করে, তদ্রূপ তাঁহার নিকট আবদার করিয়া খাইতে চায়। তিনি স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া ১৭।০ খরচ করিয়া তাহাদিগকে দুইদিন নানাবিধ আহারীয় দানে তৃপ্ত করেন এবং মাসিক ৫৲ চাঁদা স্বাক্ষর করেন। এখনও মাঝে মাঝে তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বলেন "চলুন, ছেলে মেয়েগুলো কেমন আছে দেখে আসা যাক্।" বড়লোকের মুখে এমন আদরের কথা যে কি মধুর তাহা যিনি শুনিয়াছেন তিনিই মোহিত হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, এবং দীর্ঘায়ু করুন।

আমাদের বিশেষ অভাব।

এবার চারিদিকে অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে মফঃস্বলস্থ দাসাশ্রমের অনুগ্রাহকগণের অনেকে বাধ্য হইয়া দান বন্ধ করিয়াছেন। এখন আমরা আর কাহাকে কি বলিব? সকলেই এই দুর্ব্বৎসরে আপনা লইয়া বিব্রত। আমাদের অনুগ্রাহকদলে মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যাই অধিক, সুতরাং তাঁহারা যে আজকাল কত কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। আমরাও ২০। ২৫টি অন্ধ আতুর লইয়া এখানে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা পূর্ব্বে যে চাউল ৩।০ করিয়া খরিদ করিতাম, তাহাই এক্ষণে ৫৵০ করিয়া খরিদ করিতেছি। এমন করিয়া দিন যাপন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। দানশীল ধনাঢ্য মহোদয়গণ দাসাশ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে এবার আর রক্ষা নাই।

শীত পড়িয়াছে। এবার প্রচুর পরিমাণে গাত্রবস্ত্র, কম্বল ও মোটা চাদর আবশ্যক। আমাদের অনুগ্রাহক ও অনুগ্রাহিকাগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা যেন এ অভাবের সময়ে আমাদিগকে বিস্মৃত না হন।

দাসীর কথা।

ভগবানের কৃপায় দাসীর ৫ম বর্ষ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এখনও মফঃস্বলে প্রায় ৩০০৲ টাকা এবং সহরে প্রায় ৫০৲ পাওনা আছে। এই টাকা পাইলে আর দাসীর ঋণ হইবে না সুতরাং দাসীর গ্রাহকগণ স্বরায় স্ব স্ব দেয় পাঠাইয়া "দাসী"র জীবন রক্ষা করিবেন। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী গ্রাহকগণকে বিশেষ অনুরোধ তাঁহারা যেন সকলেই ৬ষ্ঠ বর্ষের দেয় ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অগ্রিম পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন।

এজেণ্ট—বাবু কুমুদবিহারী রায় আমাদের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়া টাকা আদায়ের জন্য বীরভূম, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন।

শ্রীমৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী
দাসীর কার্য্যাধ্যক্ষ।

দাসী

স্বভাবকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ।

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সংসারের কোলাহল ছাড়িয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতর ডুবিয়া থাকিতে ভাল বাসেন। জীবন সংগ্রামের কঠোরতা তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। সংসারের চিন্তা, লৌকিক উন্নতি ও উচ্চাভিলাষ তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাঁহারা সব ছাড়িয়া নীরবে নির্জ্জনে নিসর্গের কোলে বিশ্রাম করিতে ভাল বাসেন। প্রকৃতি তাঁহাদের প্রাণে অনন্ত শান্তি ঢালিয়া দেয়। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় প্রকৃতি তাঁহাদের হৃদয় মন গঠন করিয়া তুলে। সংসারের আবিলতা ও সমাজের কালিমা তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। নিসর্গের মহীয়সী শক্তি তাঁহাদের হৃদয় অনুপ্রাণিত করে। প্রবন্ধের শীর্ষদেশে আমরা যে মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তিনি একজন এই শ্রেণীর কবি। প্রকৃতিই তাঁহার শিক্ষাগুরু। তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকৃতির ছায়া পড়িয়াছে। তাঁহার কবিতার ভিতর গভীর আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত রহিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে এই মহাপুরুষের কবিতার সমালোচনা করিব।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির সুসন্তান। আজীবন প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত হইয়া প্রকৃতির প্রাণে তাঁহার প্রাণ মিশিয়া গিয়াছিল। ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ বলিয়াছেন—"The child is father of the man" বাল্যই মানবের ভবিষ্যৎ সূচনা করে। তাঁহার এই গভীর সত্যটি তাঁহার জীবনেই সম্যক্‌ প্রতিফলিত হইয়াছিল। সুদূর শৈশবেই তিনি প্রকৃতির কোলে ডুবিয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। সুদূর শৈশবে, বিদ্যালয়ে যাইবার কালে পার্ব্বত্য পথের উভয় পার্শ্বস্থ দৃশ্যগুলি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কেমন নাচিয়া উঠিত। উন্নত পর্ব্বত-চূড়া, গভীর অরণ্যানী, হরিৎ বৃক্ষপত্র, সুনীল আকাশ, চঞ্চলা নির্ঝরিণী, বিহঙ্গের মনোহর কূজন, শুষ্কপত্রের মর্ম্মর শব্দ—তাঁহার প্রাণে আনন্দের ফোয়ারা প্রবাহিত করিত। নিসর্গের সৌন্দর্য্য

তাঁহার প্রাণে কি এক মত্ততা আনিত। আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া শিশু কেবলই সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য পান করিত। বালক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ মত্ত হরিণের ন্যায় পর্ব্বতের উপর নাচিয়া বেড়াইতেন। গভীর নদী বা বিজন নির্ঝরিণীর পার্শ্বে, প্রকৃতি যেখানেই তাঁহাকে লইয়া যাইত, বালক উন্মত্ত হইয়া সেইখানে ছুটিত। জলপ্রপাতের সুমিষ্ট শব্দ তাঁহার হৃদয়ে আবেগময়ী প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দিত। প্রকৃতি তাঁহার কতই না প্রিয় ছিল। কবির নিজের লেখনী হইতে আমরা কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিব।

"Like a roe
I bounded over the mountains, by the sides
Of the deep rivers, and the lonely streams,
Wherever Nature led. * * *
* * * For Nature then
(The coarser pleasurers of my boyish days,
And their glad animal movements all gone by ;)
To me was all in all., I cannot paint
What then I was. The sounding cataract
Haunted me like a passion ; the tall rock,
The mountain, and the deep and gloomy wood,
Their colours and their forms, were then to me
An appetite : a feeling and a love,
That had no need of a remoter charm,
By thoughts supplied, or any interest
Unborrowed from the eye."

Tintern Abbey.

সুধু ইহাই নহে, প্রকৃতির মধ্যে তিনি বাল্যকালেই মহত্বের সত্তা ও শক্তি অনুভব করিতেন।

"While yet a child, and long before his time,
Had he perceived the presence and power
Of greatness." *Excursions, Book I.*

আমরা দেখাইব প্রকৃতির প্রতি তাঁহার ভালবাসা ক্রমশঃ কেমন গভীর হইতে গভীরতর হইয়া সমস্ত মানবজাতির উপর, সমস্ত সৃষ্টির উপর ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি-উপাসনার মধ্যে তিনটী স্তর আছে। প্রকৃতি বাল্যে তাঁহার আনন্দদায়িনী ছিল। নিসর্গের প্রত্যেক দৃশ্য তাঁহাকে মাতাইয়া তুলিত। তিনি ভাবিতেন প্রকৃতি সজীব। আমরা যেমন হাসি আমোদ করি, প্রকৃতিও তেমনি হাসে। আমরা যেমন কাঁদি, শোকে অভিভূত হই, অনন্তময়ী প্রকৃতিরও তেমনি একটা শোকের ছবি আছে। আমরা যেমন রাগদ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা বিচলিত হই, আমাদের হৃদয় যেমন স্নেহ দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, প্রকৃতির মধ্যেও তেমনি একটা ভীষণত্ব ও কমনীয়ত্ব আছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এ সকল বুঝিতেন এবং

প্রকৃতির প্রত্যেক বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেন। উষার স্নিগ্ধ চঞ্চলতা, সন্ধ্যার গম্ভীর ভাব, রজনীর স্তব্ধতা ও নক্ষত্রখচিত নীলিমাময় আকাশের অনন্ত প্রসার, তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয় কি এক অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা টানিয়া লইত। আবার ঝটিকার ভীষণ খেলা, বাত্যাতাড়িত নীলাম্বুর সংক্ষুব্ধ বারিরাশি, জলপ্লাবনের ভীষণ দৃশ্য তাঁহার প্রাণ কোথায় কোন্ দেশে লইয়া যাইত। ইংলণ্ডের দারুণ শীতে, রজনীতে যখন ঝটিকা বহিত, আকাশ পৃথিবী জুড়িয়া যখন তুমুল সংগ্রামের কোলাহল উঠিত, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ জানেলা খুলিয়া সেই ভীষণ ছবি দেখিতেন ও সেই মহীয়সী শক্তির নিকট প্রণত হইতেন। তাঁহার প্রকৃতি-পূজার ইহাই প্রথম স্তর।

ধীরে ধীরে শৈশব, বাল্য ও কৈশোর চলিয়া গেল। সংসারের সুখ দুঃখ তাঁহার জীবনে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই সংসারে, কে কবে অক্ষত শরীরে, অক্ষত হৃদয়ে কাটাইতে পারিয়াছেন? নিরবচ্ছিন্ন জ্যোৎস্না এ সংসারে কাহার ভাগ্যে কবে ঘটিয়াছে? ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শান্ত জীবন-স্রোত মাঝে মাঝে একটু প্রতিহত হইতে লাগিল। সংসারের শোক, প্রিয়জনের বিয়োগজনিত মর্ম্মন্তুদ যাতনা এবং সংসারের সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখগুলি তাঁহার হৃদয়ের উপর নূতন আধিপত্য বিস্তার করিল। প্রকৃতি আর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চক্ষুতে পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিভাত হইল না। প্রকৃতি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের হৃদয়ের দেবতা। আজ নূতন সাজে নূতন বেশে প্রকৃতি কবির সম্মুখে দেখা দিল। বাল্যের মত্ততা চলিয়া গেল। সেই মোহ, সেই চঞ্চলতার পরিবর্ত্তে কেমন গাম্ভীর্য্য আসিয়া কবির হৃদয় অধিকার করিল। চঞ্চলা প্রকৃতি এখন গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল। জীবনের গভীর শোকের ছায়া পড়িয়া প্রকৃতির বেশ পরিবর্ত্তিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কবির আধ্যাত্মিক জীবনে নূতন আলোক ফুটিয়া উঠিল। পূর্ব্বে প্রকৃতির মধ্যে তিনি যে মহত্ত্বের আবির্ভাব দেখিতে পাইতেন, এখন তাহা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল এবং নৈতিক জীবনের অবলম্বন হইয়া উঠিল। কবি লিখিয়াছেন :—

For I have learn'd
To look on Nature, not as in the hour
Of thoughtless youth ; but hearing often times
The still sad music of humanity,
Not harsh, nor grating, though of ample power
To chasten and subdue. And I have felt
A presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts ; a sense sublime

Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man :
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things. Therefore am I still
A lover of the meadows and the woods,
And mountains ; and of all that we behold
From this green earth ; of the mighty world
Of eye and ear, both what they half create,
And what perceive ; well pleased to recognize
In Nature and the language of the sense,
The anchor of my purest thoughts, the nurse.
The guide, the guardian of my heart, and soul
Of all my moral being." *Tintern Abbey.*

"'Tis so no more ;
I have submitted to a new control :
A power is gone, which nothing can restore ;
A deep distress hath humanized my soul.
Not for a moment could I now behold
A smiling sea, and be what I have been :
The feeling of my loss will never be old ;
This, which I know, I speak with mind serene."
Peele Castle.

তৃতীয় স্তরে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে। প্রকৃতিকে ভাল বাসিয়া,প্রকৃতির শক্তি দ্বারা অজ্ঞাতসারে অনুপ্রাণিত হইয়া, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সমগ্র জগৎকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন। জগতের অতি ক্ষুদ্রতম জিনিসও এখন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভালবাসার জিনিস।

"To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears"
Intimation of Immortality

এই ভালবাসায় মোহ নাই. চাঞ্চল্য নাই, আবিলতা নাই, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের হৃদয় এখন "নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।" আমাদের মনে হয়, নিসর্গের প্রতি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভালবাসা একটী নদীর মত। প্রথমাবস্থায় নদী নির্ঝরের সমষ্টি, চঞ্চলা, লীলাময়ী ও হাস্যযুক্তা। দ্বিতীয়াবস্থায় অনন্ত বক্ষঃ বিস্তার করিয়া অনন্ত দেশ ভাসাইয়া চলে। ইহাতে কেমন গাম্ভীর্য্য ও কেমন মহাপ্রাণতা। তৃতীয় অবস্থায় অসীম অনন্ত মহাসমুদ্রের ভিতর নিজের ক্ষুদ্রত্ব ডুবাইয়া দেয়। তাহাতে কি শান্তি! কি গভীর আত্মবিসর্জন।

আমরা এ প্রবন্ধে প্রকৃতির উপর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভালবাসা ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উপর প্রকৃতির প্রভাব বর্ণনা করিয়াছি। বারান্তরে তাঁহার কবিতার সমালোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

আধুনিক সূতা-কাতন।

(MODERN COTTON SPINNING)

(২)

সচরাচর ইংরাজীতে Cotton Spinning যে শুদ্ধ কাতন কার্য্যকেই বুঝায় তাহা নহে, ইহা তুলা ধোনা হইতে কাতন পর্য্যন্ত প্রায়ই সমস্ত কার্য্যকেই বুঝায়। আমরাও সেই অর্থে সূতা-কাতা শব্দদ্বয় ব্যবহার করিব, তাহাতে অনেক গোল মিটিয়া যাইবে।

সূতা-কাতন প্রক্রিয়া-সমূহ নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা :—

১ম—Ginning এবং baling জিনিং ও বেলিং।

২য়—Mixing বা মিশ্রন।

৩য়—Opening and scutching ধোনা এবং সাফ্ করা।

৪র্থ—Carding বা পেঁজা।

৫ম—Drawing বা সমান্তরাল করণ।

৬ষ্ঠ—Slubbing—স্লাবিং।

৭ম—Intermediate or Second Slubbing—পুনর্ব্বার স্লাবিং।

৮ম—Roving—রোভিং।

৯ম—Spinning—সূতা-কাতা।

যখন কার্পাস উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয়, তখন ইহাকে হাত দিয়া গাছ হইতে তোলা হয়। তাহার পর ইহাকে বস্তাবন্দি করিয়া জিনিংএর কারখানায় পাঠান হয়। জিন্ মানে—কার্পাস হইতে তুলা আলাদা করা ; এবং সেই প্রক্রিয়াকে জিনিং বলে। অতি প্রাচীনকালে ভারতে কার্পাস হইতে বীজ হাত দিয়া আলাদা করা হইত ; তাহার পর বীজকে চাপ দিয়া চূর্ণ করিয়া আলাদা করা হইত। কিন্তু এই উভয় উপায়েই অতি বিলম্বে কার্য্য হইত, সেজন্য ক্রমে দুইটি কাঠের রোলর-যুক্ত একপ্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ইহা ভারতে অনেক দিন হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং এখনও ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ইহার ব্যবহার আছে। কিন্তু প্রতিযোগিতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রের ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে ও বিলাতী জিনের

ব্যবহার বাড়িতেছে। ইহা বাষ্পীয় বল (steam-power) দ্বারা চালিত হয় এবং সকল বিষয়েই আদিম চরখা* হইতে শ্রেষ্ঠ।

হস্ত দ্বারা কার্পাস হইতে বীজ পৃথক করিতে হইলে, প্রথমে এক হাতে তারগুলিকে ধরিতে হয়, তাহার পর অন্য হাতে বীজগুলিকে টানিয়া আলাদা করিতে হয়। যন্ত্রের সাহায্যে ইহা করিতে হইলে, অতি সাবধানে ইহা করিতে হয়, নচেৎ তুলার তারগুলি ছিঁড়িয়া গুড়াইয়া যাইতে পারে।

একটি জিনিং মেষীন্ নিম্নলিখিত অঙ্গসমূহে বিভক্ত :—জিনের সামনেই একটি লম্বা চামড়ার রোলর, তাহার পার্শ্বেই একটি ইস্পাতের ফলক ; ইহা লম্বাভাবে চামড়ার রোলরের গায়ে গায়ে বসান ; ইহা এরূপ নিকটে বসান যে, তাহাদের মধ্য দিয়া কার্পাসের তার যাইতে পারে কিন্তু বীজ আটকাইয়া যায়। এই ফলকের নীচেই আর একটি ইস্পাতের ফলক ; ইহা পূর্ব্বোক্ত ফলকের গায়ে গায়ে লাগান ও একটি ক্রাঙ্ক রডের (crank rod) সাহায্যে একবার উপরে ও একবার নীচে আসা যাওয়া করে। এই দ্বিতীয় ফলকটির নিকটে একটি হস্তের ন্যায় কাষ্ঠফলক একবার অগ্রে, একবার পশ্চাতে আসা যাওয়া করে। এই কাষ্ঠখণ্ডের নিম্নে একটি রন্ধ্রযুক্ত লৌহফলক থাকে, ইহাকে সচরাচর "জালি" বলিয়া থাকে। এই সমস্ত অঙ্গসমূহের উপর একটি কাষ্ঠের ঢাকনা থাকে ; ইহার সামনের ভাগ ঢালু (sloping) এবং ইহা চামড়ার রোলর ও ইস্পাতের ছুরির কিছু নিকটে আসিয়াই শেষ হয়।

এই সকল অঙ্গকে চালাইবার জন্য একটি রড (rod) থাকে ; এই রডের এক প্রান্তে একটি পুলি (pully) ও অপর প্রান্তে দুইটি পুলি। প্রথম পুলির দ্বারা রড নিজে চালিত হয়, ও অন্য দুইটি পুলির দ্বারা জিনিং মেষীনের অন্যান্য অঙ্গসমূহকে চালায় ও ইহা নিজে উপরোক্ত ঊর্দ্ধ ও অধোগমনশীল ইস্পাতের ফলকটিকে চালাইয়া থাকে।

একটু চিন্তা করিলেই এই যন্ত্রের কার্য্য অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঢাক্‌নার ঢালুভাগের উপর কার্পাস নিক্ষেপ করিলে, তাহা ঘূর্ণ্যমান চামড়ার রোলরের উপর দিয়া পড়ে ; কার্পাসের তারগুলি চামড়ার আঁশের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের সহিত যাইতে থাকে, কিন্তু বীজগুলি রোলরের

---

* পশ্চিমে সচরাচর এই যন্ত্রগুলি চরখা নামে বিখ্যাত ; ইহার প্রধান অঙ্গ দুইটি রোলর, তাহা ঘুরাইলে কার্পাসের তার তাহাদের ভিতর দিয়া চলিয়া যায় কিন্তু বীজগুলি তাহাদের ভিতর দিয়া না যাওয়া হেতু তার হইতে পৃথক হইয়া যায়। [বঙ্গদেশে এই যন্ত্রটিকে কোথাও কোথাও "খাওয়াই" বলে। সর্ব্বত্র বলে কিনা জানি না। সূতা কাটিবার যন্ত্রের বাঙ্গলা নাম চরখা। সম্পাদক]

পার্শস্থ ইস্পাতের ফলকে লাগিয়া আটকাইয়া যায়, এমন সময়ে উর্দ্ধ-অধ-গমনশীল ফলকটি আসিয়া বীজগুলিকে তার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়; বীজগুলি তার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পর, পূর্ব্বোল্লিখিত জালিতে পড়ে ও তাহার রন্ধ্র দিয়া ভূমিতে পতিত হয়। চামড়ার রোলরের সাম্নে একটি কাষ্ঠের ফলি থাকে, যে সকল তুলা বীজ হইতে পৃথক্ হইয়া রোলরের সহিত চলিয়া আসে, তাহা এই ফলিতে লাগিয়া ভূমে পতিত হয়। এই সকল কার্য্য অনবরত চলিতে থাকে ও জিনিং মেষীনের একদিক দিয়া তুলা ও অপর দিক দিয়া বীজ অনবরত পড়িতে থাকে। যে ফলকটি রোলরের গায়ে গায়ে বসান তাহাকে fixed blade বলে, আর যে ফলকটি উর্দ্ধ-অধো-গমনশীল তাহাকে knocking off blade বলে, কারণ ইহাই বীজকে নক্ অফ্ করে। সচরাচর নকিং অফ্ ব্লেড্ দুইটি করিয়া থাকে, কারণ তাহাতে আদপে সময় নষ্ট হয় না। যখন একটি নামে, তখন আর একটী উঠে, ইহাতে কার্য্য অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতে থাকে।

আজকাল জিনিং ভারতের একটি প্রধান ব্যবসায় হইয়াছে; ইহা মধ্য-প্রদেশ, বেরার, হায়দ্রাবাদ, মান্দ্রাজ ও পশ্চিম ভারতের অনেক স্থান ছাইয়া ফেলিয়াছে; ইহা একটি স্বতন্ত্র ব্যবসায়, ইহার সহিত সূতা-কাতন কার-খানার অধিক সম্বন্ধ নাই। কারণ যেখানে কার্পাস জন্মায়, প্রায় সেই থানেই ইহা প্রচলিত। আর সূতা-কাতন যেখানে বাজার ভাল, সেই খানেই হইয়া থাকে। তবে ইহা না হইলে, সূতা কাতনের কার্য্য চলে না, সেই জন্য ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

কার্পাস জিন হইলে পর, তাহাকে গাঁট বাঁধা হয়; গাঁট বাঁধাও আজ কাল জল-যন্ত্রের (Hydraulic press) দ্বারা হইয়া থাকে। জিনিং ও গাঁটের ব্যবসায় প্রায়ই এক সঙ্গে চলিয়া থাকে, কারণ তুলা চাপিয়া না গাঁট বাঁধিলে, গাঁটের আকার বড় থাকে ও তাহাতে অন্যত্র পাঠাইবার সময় ভাড়া বেশী দিতে হয়।

তুলা জিনিং ও গাঁটবন্দী কার্য্যে বিলক্ষণ আয় আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, ও ভারতের অন্যান্য কার্পাসোৎ-পাদক প্রদেশ সমূহে জিনিং একটি প্রধান ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মূলধন অধিকাংশ দেশীয়দিগের অর্থাৎ মাড়্ওয়ারী, ভাটিয়া, খোজা কিম্বা পার্শিদিগের, বাঙ্গালিদের নহে। অনেক ইংরাজ সওদাগরেরও এই সকল

অঞ্চলে অনেক জিনিং কারখানা আছে, তাহাতে বাঙ্গালি অধিকৃত ও পরিচালিত কোন জিনিং ফ্যাক্টরি আছে কিনা, জানি না। যদি থাকে সুখের বিষয়, নচেৎ বঙ্গবাসী ধনবানগণের এ বিষয়ে নজর করিলে তাঁহাদেরও লাভ এবং অপরেরও লাভ। এই ব্যবসায়ে এত লাভ যে ৭০ কিম্বা ৮০ হাজার টাকা দিয়া একটি জিনিং ফ্যাক্টরি খুলিলে, প্রথম বৎসরেই ২৫ হাজার টাকা আয় হইতে পারে, দ্বিতীয় বৎসর আরো বেশি (৩০ হাজারের উপর) হইয়া থাকে; তবে চালাইবার উপায় জানা চাই। ইহার জন্য অনেক শিক্ষা * ও অধ্যবসায় প্রয়োজন, এই জিনিং ও বেলিং কার্য্যে মধ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী খাটিয়া খাইতেছে। শত শত মধ্যশ্রেণীর লোক জিনিং-ফিটর বা মিস্ত্রিরূপে নিযুক্ত আছে এবং অনেক ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও পার্শি ভদ্রলোক † ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজার রূপে নিযুক্ত আছেন। ইহাঁদের অবস্থা আমাদের দেশীয় অনেক সরকারি চাকুরে হইতে ভাল। তবে ইহাতে দশটা চারিটা নাই। বৎসরের মধ্যে নয় মাস জিনের কার্য্য প্রায় দিন রাত চলিয়া থাকে; ভাল সিজ্‌ন্ (season) হইলে এঞ্জিন, বয়লার সাফ করিবার সময় পাওয়া যায় না, কেবল হাটের দিন সপ্তাহে একবার ৪।৫ ঘণ্টা বন্ধ হয়। কাজেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে নাইতে খাইতে বসিতে শুইতে অন্ ডিইটি (on duty) থাকিতে হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্কিমচন্দ্র।

দেবী-চৌধুরাণী—আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলিকে যেরূপ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি, তাহাতে দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম এক স্বতন্ত্র ভাগান্তর্গত। এই গ্রন্থ দুইখানি ধর্ম্মভাববিষয়ক। ধর্ম্মচিন্তার জন্য জাগতিক সর্ব্বচিন্তা বিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত হিন্দুজাতির মত অন্য কোন জাতিই দেখাইতে পারিবেন না। আমাদিগের বর্ত্তমান জাতীয় অবনতির কারণও কতকটা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের সাংসারিক সকল বিষয়ে উপেক্ষার ফল। হিন্দুর নিকট ইহকাল কেবল পরকালের জন্য সুখ সঞ্চয়েই ব্যয়িত হইবে। বৈষয়িক ব্যাপারের তরঙ্গাভিঘাততাড়িত হইয়া আজও সেই আধ্যাত্মিকতা-প্রবলতা শেষ সংগ্রাম করিতেছে—তাহার

* এ শিক্ষা মানে পরীক্ষা পাস করা নয়।

† যদি পাঠকের মেকানিকদের ভদ্রলোক বলিতে বাধা না থাকে।

ফল হিন্দুপুনরুত্থান। পুনরুত্থান সম্বন্ধে তাঁহার মত বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন; এখানে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্ক আমাদিগের অভিপ্রায় নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মভাববিষয়ক গ্রন্থদ্বয় আশানুরূপ সুন্দর হয় নাই।

বন্যকুসুমসুরভিসমাকুল পবনসেবিত কৌমুদীস্নাত রজনীতে বর্ষা-বারিরাশিপ্রমথিতা ত্রিস্রোতার বক্ষে তরণীর ছাদে বসিয়া বহুরত্ন মণ্ডিতা, রূপবতী দেবী যখন বীণাবাদনে নিযুক্তা, তখনকার কথায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, দেবীর বীণায় কত মিঠে রাগিণী, কত গম্ভীর রাগিণী, কত জাঁকাল রাগিণী বাজিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বীণাতেও সেইরূপ কত মিঠে রাগিণী, কত গম্ভীর রাগিণী, কত জাঁকাল রাগিণী বাজিয়াছে, কিন্তু সব সুরের আলাপ সমান মিষ্ট হয় না—এখানেও হয় নাই। গিরিচূড়া যেমন ক্রমে উঠিয়া সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে যাইয়া আবার নিম্নগামী হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভাও তেমনই দুর্গেশনন্দিনী হইতে কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহার সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে যাইয়া, আবার নিম্নগামী হইয়াছে। দেবীচৌধুরাণীর রাগিণী জাঁকাল; কিন্তু প্রাণস্পর্শী নহে।

গ্রন্থমধ্যে বিশ্লেষণোপযোগী চরিত্র—দেবী। আর সেই চরিত্রে প্রমাণিত হইয়াছে—Home is the woman's proper sphere. প্রচারে "নিষ্কামকর্ম্ম" লেখক বলিয়াছেন, "এই দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থ বাহির হইবার পর হইতেই একটি বাক্য আমাদের সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। কথাটি পুরাতন * * * * কথাটি নিষ্কামকর্ম্ম।"* কর্ম্মযোগী বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থ মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে "সর্ব্বগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ" বলিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন:—

> "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
> শরীর যাত্রাপি চতেন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥" ৩।৮।

আবার

> "সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তু মযোগতঃ।
> যোগযুক্তোমুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥" ৩।৬।

কিন্তু

> "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতেসঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥" ২।৪৭।

* প্রচার (তৃতীয় খণ্ড)।

কারণ

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা:করোতি যঃ।
লিপ্যতে:ন সপাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" ৫।১০।

এই যে পরমেশ্বরে কর্ম্ম সকল সমর্পণ, ইহারই কথায় দেবী বলিয়াছে "আমার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম।" পরমেশ্বর হইতে এই যে শ্রীকৃষ্ণে পরিণতি, ইহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।" শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় তর্ক ছাড়িয়া এখন আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। কিন্তু গীতার এই উপদেশ কাহাকে দিতে হইয়াছিল? যে অর্জ্জুন উর্ব্বশীঘটিত ব্যাপারে ইন্দ্রিয়জয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, দেবগণকেও::মোহিত করিয়াছিলেন, যে অর্জ্জুন অনবদ্যাঙ্গী উত্তরাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, পরন্তু স্নুষাত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন,—সেই অর্জ্জুনকে নিষ্কামধর্ম্ম বুঝাইতে ও নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে কৃষ্ণের বহুক্ষণ লাগিয়াছিল। নাইন্‌টিস্থ সেন্‌চুরী পত্রে ম্যাথু আর্ণল্ডের পত্র সমালোচনা করিতে যাইয়া, জন মর্লি বলিয়াছেন যে, মেকলের সকল পত্র এরূপ সাহিত্য প্রিয়তাপূর্ণ ও এরূপ মানবজীবনসঙ্গী সাহিত্যের মহিমাপূর্ণ যে সে সকল পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ লেখনী লইয়া সেইরূপ কিছু লিখিতে পাঠকের ইচ্ছা হয়; সেইরূপ একজন রমণীকে এত সহজে নিষ্কামকর্ম্মপরায়ণা দেখিলে কার্য্যটা এত সহজ বলিয়া বোধ হয় যে, পাঠকের মনে হয় যে পুস্তকখানা রাখিবার পূর্ব্বেই আমি নিষ্কামধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ করি। অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ:—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বনিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥" ২।৪৫।

ইহা কি বড় সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হয়? দেবীও ইহা সর্ব্বাংশে পালন করিতে পারে নাই। তবে—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো নবিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ॥" ২।৪০।

গীতা হইতে এই নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বুঝাইয়া আমরা এক্ষণে দেবী-চরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। গীতার উপদেশ পাঠ না করিলে দেবী

চৌধুরাণীর সম্যক্ মর্ম্ম গ্রহণ সম্ভব নহে; কারণ ইহাতে গীতার উপদেশই বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু উপন্যাসে তাহা হয় নাই, হইতে-পারেও না।

প্রফুল্ল ধনীর পত্নী, দরিদ্রের কন্যা। পাপ সমাজের ষড়যন্ত্রে সে পতিগৃহে স্থান পায় নাই। প্রথম পরিচ্ছেদেই গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, প্রফুল্ল যে ঋণ শোধ করিবার সম্ভাবনা নাই বুঝে, সে ঋণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিতা—সে তদপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। আবার সে আপনার অধিকার পাইবার জন্য সকল অপমান সহ্য করিতে পারে। "ভিক্ষা করিও না, যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না, সেরূপ ঋণে বদ্ধ হইও না এবং আপনার ধন যদি পরের নিকট থাকে, তবে সেই ধন চাহিয়া লইয়া ভোগ করিতে লজ্জিত হইও না—নিষ্কামকর্ম্ম যিনি অভ্যাস করিতে চান, তাঁহাকে এই কয়টি কথানুসারে কার্য্য করিতে প্রথম শিখিতে হইবে। নিজের ধন অর্থাৎ নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিতে কখনও সঙ্কুচিত হইও না, কেননা কর্ম্মফল ভোগ করিয়া কর্ম্ম ক্ষয় করাই নিষ্কাম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। পরের ধন অর্থাৎ পরের কর্ম্মের ফল উপভোগ করিতে যেন কখনও প্রবৃত্তি না হয়, কেননা, তাহা হইলে তোমাকে নূতন ঋণে বদ্ধ হইতে হইবে এবং যতদিন সেই ঋণমুক্ত না হও, ততদিন তোমার মুক্তি হইবে না।" ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদের "আধ্যাত্মিক" ব্যাখ্যা।—প্রফুল্ল শ্বশুরালয়ে গেল, যে প্রফুল্ল অন্ন গ্রহণ করিতে এত অপমান বোধ করে, সেই প্রফুল্ল শাশুড়ীকে বলিল, "মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?" আবার "হলেম যেন আমি অজাতি—কত শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কি?" প্রফুল্লের সম্মানজ্ঞানও অসীম; বিনয়ও অসীম। কিন্তু সে বিনয়ের নিকট আত্মসম্মান বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নহে।

তাহার পর পিতার আজ্ঞায় ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে তাড়াইতে আসিয়া তাহার অশ্রুপ্লাবিত বিকশিত-সরসিজ ললিত মুখ চুম্বন করিল। সেই "Humid seal of soft affections" চুম্বনে তাহার হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইল। সেই যে

"গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটী ভালবাসা,
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে!"

প্রফুল্ল ভাবিল "বুঝি এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম্ম ইহজগতে কখনও কেহ করে নাই।" সে আসিয়াছিল অন্নের ভিখারিণী, গেল ব্রজেশ্বরকে তাহার প্রেমের ভিখারী করিয়া; তাহার হৃদয় তখন প্রেমের লীলাক্ষেত্র। তাহার পর তাহার জননীর মৃত্যু হইলে কোন জমীদারের লোক সেই জমীদারের পাশব লালসা তৃপ্তির জন্য প্রফুল্লকে ধরিয়া লইয়া গেল। বনমধ্যে তাহারা দস্যুভয়ে পলাইল, বনপথের অস্পষ্ট রেখানুসরণ করিয়া সে একটি জীর্ণ অট্টালিকায় উপস্থিত হইল। সে দুর্দ্দিনে বৈষ্ণবী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এক বৈষ্ণব মরিতেছিল; সে প্রফুল্লকে অর্থের সন্ধান বলিয়া দিয়া মরিল। ঘটনা-স্রোত প্রফুল্লকে তাহার অদ্ভুত জীবনপথে উপনীত করিল। প্রফুল্ল একাকী তাহার সৎকার করিল! তাহার পর সে ঘড়া ঘড়া ধন পাইল; সম্ভোগী না হইয়া প্রফুল্ল যক্ষের ধন রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু অর্থ আহার করা যায় না, যাইলেও পরিপাক হয় না, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না; কাজেই আহারীয় সন্ধানে প্রফুল্ল হাট খুঁজিতে চলিল। পথে ভবানী পাঠকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ঠাকুর জহুরীলোক, বুঝিলেন "এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্ত।" তিনি তাহাকে দলের রাণী করিবেন বলিয়া শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভবানী পাঠক তাহার নিকট "বামনশূন্য বামনী" নিশি ঠাকুরাণীকে পাঠাইলেন। নিশির সহিত প্রফুল্লের মিল হইতে পারে না; কেন না একের "সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে" অপরের সর্ব্বস্ব হৃদয়দেবতা পতিতে; নারী জীবনের কোন আদর্শ অধিক বাঞ্ছনীয় পাঠক তাহা বিচার করিবেন। এদিকে প্রফুল্লের শিক্ষা চলিতে লাগিল—প্রথম অধ্যয়ন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত কিনা; আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত।" নানা পুস্তকের পর প্রফুল্ল "সর্ব্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কামধর্ম্মোপযোগী অন্যান্য শিক্ষাও চলিতে লাগিল। অশন, বসন, ভূষণ, শয়ন সম্বন্ধে প্রফুল্ল সকল প্রকারই ভোগ করিল। এ সকলের মন্দেও তাহার কষ্ট ছিল না, কারণ মাতৃগৃহে সকল সময় সে মন্দ ত জুটিত না। এতক্ষণে বুঝা গেল কেন প্রথমে সে দারিদ্রের কশাঘাতপ্রপীড়িতা হইয়াছিল; সে কেবল তাহাকে এই সকল সহ্য করিতে শিক্ষা দিবার জন্য। শেষ প্রফুল্লকে মল্ল-

যুদ্ধ (!!) শিখিতে হইল; কারণ "ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে টেকচাঁদ "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাসে ব্যায়ামের উপযোগিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তবে সে পুরুষে, এ রমণীতে। ব্যায়াম অবশ্যই উপকারী; কিন্তু রমণীর পক্ষে পুরুষের সহিত মল্লযুদ্ধই কি উপযোগী? "চতুর্থ বৎসরে, ভবানী নিজ অনুচরদিগের মধ্যে বাছা বাছা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেন; প্রফুল্লকে তাহাদিগের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে বলিতেন। প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে তাহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিত।" একথাটা বড়ই কেমন ঠেকে, কেন ঠেকে তাহার উত্তর আমরা আনন্দমঠে শান্তি চরিত্র সমালোচনায় দিয়াছি। রমণীগণকে পুরুষ বহু ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে—তাঁহাদিগকে কোন ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। তবে যাঁহারা মনে করেন যে, সংসারে সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রীপুরুষের অধিকার সমান, তাঁহাদিগের নিকট এ দীন লেখক মতভেদ ভিক্ষা করে। স্ত্রীপুরুষে স্বাভাবিক বৈষম্য বিদূরিত হইবার নহে। সভ্যতার বিস্তার বশতঃ জীবনসংগ্রাম দিন দিন কঠোর হইতে কঠোর তর হইয়া দাঁড়াইতেছে; ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ক্রমে রমণীগণকেও বোধ হয় সে সংগ্রামে যোগ দিতে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া রমণীর বিশেষত্ব বিলোপ করিবার প্রয়োজন কি? পুরুষের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া যদি রমণীগণকে ইন্দ্রিয়জয় শিক্ষা করিতে হয়, তবে তাহাতে তাঁহাদিগের স্বভাবসুলভ শালীনত্যের যে হানি হয়, তাহা কি সামান্য? কঠোর সংসার-সংগ্রামক্লান্ত মানব স্বভাবতই গৃহে যে সুখ, যে শান্তি, পত্নীর নিকট যে স্নেহ, যে কোমলতা প্রত্যাশা করে, রমণীকে পুরুষভাবাপন্ন করিয়া তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া কাজ নাই। জগৎ কঠোরতাময়,—জীবন মরু-ময় করিয়া কাজ নাই। রমণী, তুমি

"সরস শ্যামল
কর সংসার অন্তর।"

রমণী

"When pain and anguish wring the brow,
A ministering angel thou!"

প্রেমময়ী, স্নেহময়ী, কোমলতাময়ী রমণীকে পুরুষভাবাপন্ন করিতে কে চাহিবে? সংসার-সঙ্গিনীর নিকট কোন্ কর্ম্ম-ক্লান্ত পুরুষ না কোমলতা প্রত্যাশা করে? (তবে বঙ্গাঙ্গনাগণ দেবীর মত হইলে সুবিধা এই হইবে

যে, পত্নীকে সংসার-সংগ্রামে পুরোবর্ত্তী করিয়া দিয়া স্বামী তাঁহার অঞ্চলের অন্তরালে মূর্চ্ছা যাইবার অবসর পাইবেন।) বঙ্কিমচন্দ্র নব্যাদিগকে লজ্জাহীনা বলিয়াছেন, কেননা তাঁহারা দিবাভাগে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন; কিন্তু কোন নবীনাই যে পুরুষের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে স্বীকৃতা হইতেন না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। লজ্জাহীনতা কিসে অধিক প্রকাশিত হয়—পুরুষের সহিত মল্লযুদ্ধে, না দিবাভাগে স্বামী সন্দর্শনে? এ নিষ্কামধর্ম্ম কি পুরুষকে দিয়া পালন করাইলে হইত না? অধিকাংশ উপন্যাসিকই পুরুষ অপেক্ষা নারী-চরিত্রের আদর্শ সৃজনে অধিক চেষ্টিত হয়েন। গর্ব্বান্ধ পুরুষ আপনাকে রমণীর অপেক্ষা অনেক উচ্চে স্থাপিত মনে করে, তাই সে পদে পদে আপনার প্রভুত্বের চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চাহে; যেন পুরুষের আদর্শের প্রয়োজন নাই, আর রমণীর জন্য যত উপদেশ, যত বিধান, যত নিষ্ঠুর আদেশ। ইহারই ফল সকল-প্রাচীন-আচার-বিরোধী, নরনারীর (New woman) আবির্ভাব। গর্ব্বান্ধ পুরুষ সম্বন্ধে সেই প্রাচীন প্রবাদ "Physician heal thyself" প্রযুজ্য। বঙ্কিমচন্দ্র দেবী-চরিত্র সৃজন না করিয়া, আর একটি অমরনাথ বা প্রতাপ সৃজন করিলে উপকার হইত।—তাহার পর শিক্ষা সমাপ্ত হইলে প্রফুল্ল দেবী নাম গ্রহণ করিয়া ভবানী ঠাকুরের দস্যুদলের দেবী হইয়া, কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া পরোপকারব্রত সাধনে প্রবৃত্তা হইল। গ্রন্থকার বলিলেন, "এখন আমরা প্রফুল্লকে জীবন-তরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়া আরও পাঁচ বৎসর ঘুমাই। * * (প্রফুল্লের) কর্ম্ম শিক্ষা হউক।" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শেষ হইল।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রার মত দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রান্তে যখন আমরা চক্ষুরুন্মীলন করিলাম, তখন দেনার দায়ে ব্রজেশ্বর সাগরের পিতার কাছে টাকা ধার করিতে আসিয়াছে। টাকা না পাইয়া, শ্বশুরের সহিত বাদানুবাদে ক্রুদ্ধ জামাতা পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা কাতরা পত্নীর বাহুবন্ধন হইতে আপনার পদ মুক্ত করিতে এতটা বলপ্রয়োগ করিল যে, বরাঙ্গনা সাগর বীর স্বামীর সে ক্রিয়াটাকে পদাঘাত জ্ঞান করিল। উচ্ছ্বসিত অভিমানে সাগর স্বামীর সহিত বাদানুবাদ করিল; শেষ ব্রজেশ্বর যখন বলিল, "পাল্‌টে লাথি মারিবে নাকি?" তখন সাগর বলিল, "আমি তত অধম নহি। কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—" পশ্চাৎ হইতে দেবী বলিয়া দিল, "আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।" এ শিক্ষা

প্রফুল্ল দিতে পারিত না, কারণ বঙ্গগৃহের গৃহিনীর মুখে এ কথা স্বাভাবিক নহে—ইহা দেবীরই উপযুক্ত। আবার দেবীর নাম শুনিয়া দাসী ভয় পাইয়া শব্দ করিলে দেবী তাহাকে তাড়া দিল, "চুপ্ রহো, হারামজাদি, খাড়া রহো।" প্রফুল্ল এখন আর দুর্গাপুরের অন্নের কাঙ্গাল প্রফুল্ল নহে; দস্যুদলের দেবী হইয়া সে এখন দস্যুসেনা চালনা করে—সে তাহার কোমলতা হারাইয়াছে। ইহা দেবীমূর্ত্তি না রাক্ষসী মূর্ত্তি! ব্রজেশ্বরের নিকট হইতে পা টেপার ঋণ সুদ শুদ্ধ আদায় করিয়া দিতে দেবী সাগরকে সঙ্গে লইয়া গেল। তাহার পর ব্রজেশ্বরকে ধরিবার দিন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশীথে বজরার ছাদে বীণাবাদন-ব্যাপৃতাদেবী; ত্রিস্রোতার কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত জলস্রোতের মত সেই ফেনিলোচ্ছল যৌবনময়ী গম্ভীর; সেই তটিনীসলিলে তরঙ্গে তরঙ্গে চন্দ্রকর জ্বলিতেছে, আর সেই রূপলাবণ্যসম্পন্না মোহিনীর রত্নাভরণ হইতে আলোক ঠিকরিয়া পড়িতেছে। মূর্ত্তিমতী বীণাপাণিবৎ দেবী বীণাবাদনে ব্যাপৃতা। তাহার কুঞ্চিত কুন্তল হইতে কুসুম সুরভি পবনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে—তাহার বীণা হইতে মধুর সুর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে যেন উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া তারায় তারায় এক স্বপ্নকুহক ব্যাপ্ত করিতেছে।

> "A lady so richly clad as she
> Beautiful exceedingly."

কিন্তু ব্রজেশ্বরকে ধরিতে পাঠাইয়া দেবীর বীণা বেসুরা বাজিল; আবার ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহিতে দেবীর গলা ধরিয়া আসিল—ইহাই দেবীর নারীসুলভ কোমলতার অবশেষ। ব্রজেশ্বরের সহিত দেখা করিবার সময় দেবী ভাবিল, "ছি! ছি! ছি! কি করিয়াছি, ঐশ্বর্য্যের ফাঁদ পাতিয়াছি!" আরও একদিন সে এমনই ভাবিয়াছিল। শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় মা চুল বাঁধিয়া দিতে চাহিলে, মেয়ে ভাবিয়াছিল, "থাক্। সেজে শুজে কি ভুলাইতে যাইব? ছি!" তাহাই ভাবিয়া সে বেশভুষার পারিপাট্য ত্যাগ করিল। তাহার পর দেবী ব্রজেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিল, ব্রজেশ্বর আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাকে চুম্বন করিল; সেই চুম্বন "left her woman" ব্রজেশ্বরকে বিদায় দিয়া তক্তার উপর লুটাইয়া দেবী কাঁদিল; দেখিয়া নিশি বলিল, "তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।" দেবী উত্তর দিল, "সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এপথে আসিতাম না।" প্রেম আছে বলিয়াই এখনও দেবীর রমণীর ধন কোমলতা একেবারে যায় নাই। দেবীর প্রেমস্রোতে তাহার সন্ন্যাস ভাসিয়া গিয়াছে। এই স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে আর

একটা কথার উল্লেখ করিব। শ্বশুরালয়ে গমনকালে প্রফুল্লের বয়স আঠার বৎসর; কিন্তু তাহার দশ বৎসর পরে বজরার ছাদে দেবীর বর্ণনায় গ্রন্থকার বলিতেছেন, "পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না।" যাহা "কোথাও" পাওয়া যায় না, তাহা দেবীতে পাওয়া গেল; দেবী কি সৃষ্টি ছাড়া কিছু? দেবীর কি "সকলি বিচিত্র?" ব্রজেশ্বরের সহিত সাক্ষাতের পর দেবী ভবানী ঠাকুরকে বলিল, "আমাকে অব্যাহতি দিন— আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নাই।" সে তাহার ধন দান করিতে চাহিল। দেবী অখ্যাতির ভয় কাটাইতে পারিল না, সে নিষ্কাম ধর্ম্ম ভুলিল। এতদিন দেবীর অখ্যাতির ভয় ছিল না—ব্রজেশ্বর তাহাকে ডাকাইতনী বলিয়া জানিল বলিয়াই আজ এ লজ্জা—এ লজ্জার মূল, সকল মাধুরীর সার প্রেম। দরবারে যাইবার কথায় দেবী বলিল, "এবার চলিলাম। কিন্তু আর আমি এ কাজ করিব কি না সন্দেহ। ইহাতে আর আমার মন নাই।" কিন্তু হয় ত বা বহুদিনের অভ্যাস সহজে ত্যাগ করা যায় না বলিয়া, হয় ত বা

> "The love of praise, howe'er concealed by art,
> Reigns more or less and glows in ev'ry heart"

বলিয়া দেবী আবার দরবার করিয়া ঘড়া ঘড়া টাকা বিলাইল। বজরার যে বর্ণনা পাইয়াছি, এ দরবার সেই বজরাবাসিনীর উপযুক্ত বটে; তাই আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবীচৌধুরাণীর রাগিণী জাঁকাল বটে। এইখানে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হইল।

তৃতীয় খণ্ডে দেবী কোথাও আসিবে জানিয়া যে পিতার সম্বন্ধে ব্রজেশ্বর সর্ব্বদা ভাবিয়াছে;—

> "পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
> পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

সেই ব্রজেশ্বরের পিতা ঋণশোধার্থ তাহাকে ধরাইয়া দিতে আসিলেন। তাহা জানিয়াও দেবী ব্রজেশ্বরের দর্শনাশায় অভিসারিকা হইয়া আসিল; কেন না—

> "Love rules the court, the camp, the grove,
> And men below and saints above.

দিবা ও নিশির সহিত দেবীর ঈশ্বরসম্বন্ধীয় তর্কের সহিত লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞান শীর্ষক প্রবন্ধ তুলনা করিয়া দেখিবেন। তাহার কথা শুনিয়া ব্রজেশ্বর যখন তাহাকে ঘরে লইয়া যাইতে চাহিল, তখন দেবী বলিল "হায়!

এ কথা কাল শুনি নাই কেন ?" শিক্ষার প্রভাব দেবীকে ভোগ করিতে হইয়াছিল ; তাই দেবী ভাবিল "আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই।" এ কথায় শিক্ষা ভিন্ন আরও কিছুর প্রভাব দৃষ্ট হয়—তাহা দেবীর নবপ্রত্যাবর্ত্তিত রমণীত্ব ; নহিলে ত ;

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্রনমুহ্যতি ॥ (গীতা ১২।১৩)

সংযম শিক্ষাবশতঃই দেবী শ্বশুরের চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইবার আজ্ঞার কথা বলিল না।

ইহার পর একটা অদ্ভুত কথা আছে—গগন প্রান্তে একখানা মেঘ দেখিয়া দেবী বুঝিল আর ভয় নাই। তাহার পর দেবী যখন দিবাকে দেবী বলিয়া দেখাইল, তখন সেই মিথ্যা কথাটার সমর্থনার্থ গ্রন্থকার পাশ্চাত্য কর্ম্ম-প্রণালীকে গালি দিয়া বলিলেন, "দেবীর পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, আর সত্য-বাদের ভান নাই। ভানই ভয়ানক মিথ্যাবাদিতা। সরল নীতিশাস্ত্র ও জটিল কর্ম্মকৌশলের একত্র সমাবেশ হইতে জগদীশ্বর মানব জাতিকে রক্ষা করুন।" এ যেন তাড়া দিয়া বিশ্বাস করান। একথা বলায় দেবীর পুত্র স্বার্থ ছিল—হরবল্লভকে বজরায় আনাই প্রয়োজন। তথাপি কি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, নিষ্কামকর্ম্মরতার এ মিথ্যাকথা বলাও দোষের নহে! তাড়া খাইয়া যদি শ্বেতকে কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, তবে আমরা নাচার। মিথ্যা চিরদিনই মিথ্যা।

তাহার পর দেবী স্বামীগৃহে গেল। দেবীর বিসর্জ্জন, প্রফুল্লের পুনরুত্থান। যখন দেবী নিশিকে বলিল যে, স্ত্রীলোকের স্বামীই সকল আভরণের ভাল, যখন সে সাগরকে বলিল "এই ধর্ম্মই (সংসার-ধর্ম্মই) স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম।" তখন দেবী প্রকৃত রমণী, তখন সে মাধুরীময়ী। যখন সে বলিল "দেবী মরিয়া গিয়াছে।" তখন সংসারাশ্রমে সে

"পুরান পত্রাপগমাদনন্তরম্
লতেব সন্নদ্ধ মনোজ্ঞ পল্লবা"

শোভা পাইতে লাগিল। মানব যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র গ্রহণ করে, দেবী তেমনই নব জীবন গ্রহণ করিল। যাও প্রফুল্ল "Grow

green again, tender little parasite round, the rugged old oak to which you cling." রামায়ণ ও মহাভারতে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে, যে আশ্রম সকলের মধ্যে সংসারাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। যদি রমণী-গণকে নিতান্তই গীতার উপদেশের মত করিয়া গঠিত করিতে হয়, তবে সংসারে থাকিয়া কেমন করিয়া তাহা সম্ভব, তাহা দেখাইলেই প্রকৃত উপকার হয়। পুরুষের সহিত মল্লযুদ্ধ ও ডাকাইতি করিয়া ইন্দ্রিয় জয়াস্তে সংসার প্রবেশ সম্ভবের সীমা অতিক্রম করে। রমণীগণ দেবীর আদর্শে গঠিতা না হইয়া ভ্রমরের আদর্শে গঠিতা হইলেই জাতীয় মঙ্গল। ইহকাল অপেক্ষা পরকালের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়াই এ জাতির অধঃপতন; এখন আবার পুনরুত্থানের প্রভাবে যেন মনে হইতেছে রাতারাতি সত্য-যুগের কুশাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া পথিকের অনভ্যস্থ পদতল পীড়িত করিতেছে। জাতীয় উন্নতিকল্পে আমাদের বাস্তবের দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। কর্ম্ম বা পরকাল চিন্তা অবজ্ঞার উপযুক্ত, এমন কথা বলি না, তবে ইহ-কালেও কিছু কর্ত্তব্য আছে। জাতীয় জীবনে, সাংসারিক জীবনে ভ্রমর ও কমলমণিরই আদর অধিক।

ব্রজেশ্বরের চরিত্রে বিশেষ কিছু নাই। সে প্রথমে লোকনিন্দা ভয়ে পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিল, শেষে পিতার আজ্ঞায় তাহাকে তাড়াইতেও গিয়াছিল। সেক্স্‌পীয়ার পত্নীর নিকট পতির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন:—

> "One that cares for thee,
> And for thy maintenance; commits his body
> To painful labour, both by sea and land;
> To watch the night in storms, the day in cold,
> While thou liest warm at home, secure and safe."

পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য আছে সত্য; কিন্তু পত্নীর প্রতিও পতির কর্ত্তব্য আছে; সে কর্ত্তব্যপথে ব্রজেশ্বর খলিত-পদ। পত্নীকে তাড়াইতে আসিয়া ব্রজেশ্বর তাহার মুখচুম্বন করিল, তাহার পর সে তাহার ভরণ-পোষণের ভার লইতে চাহিল; কারণ তখন ব্রজেশ্বর কেবল পতি নহে, পরন্তু পতি এবং প্রেমিক। অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "প্রণয় এইরূপ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।" এই চকিতে প্রেমোদয়ের কথায় ফ্রায়ার লরেন্স বলিয়াছেন:—

> "Young men's love then lies
> Not truly in their hearts, but in their eyes."

ইহার পর শ্বশুরালয় হইতে ফিরিবার পথে দেবীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ইতিপূর্ব্বে ব্রজেশ্বরের হৃদয়ে প্রেমোদ্রেকের পর প্রফুল্লের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ব্রজেশ্বর দুর্ব্বল হইয়াছে, "শেষ ব্রজেশ্বর বাঁচে না বাঁচে।" তথাপি তাহার পিতৃভক্তি অচলা ছিল। ডাকাইতের হাতে তাহার একটা গুণ-প্রকাশ পাইল—সেটা সাহস; কিন্তু ডাকাইতের হাতে পড়িয়া বুঝি অতটা রসিকতা করিবার মত মনের অবস্থা থাকে না। দেবীর সহিত সাক্ষাতের সময়, সে কেবল সাগরের রাঙ্গা পা দুখানি টিপিয়া আসিয়াছে, ব্রজেশ্বর সেকালের ছেলে, তিনটার উপর আর একটা বিবাহ, তাহার পক্ষে বোঝার উপর শাকের আঁটি; সে দেখিল দেবী সুন্দরী, তাহার কণ্ঠস্বর কুসুমকুলান্দোলনকারী মধুর পবনাপেক্ষাও মধুর; রসপিপাসু জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর তাহার মুখচুম্বন করিল। তাহার প্রফুল্লের প্রতি প্রেমের মূলেও রূপজমোহ ছিল। দেবী যে প্রফুল্ল একথা শুনিয়া সে ব্যথিত হইল। শেষে দেবীর বিপদকালে তাহার মুখে সকল কথা শুনিয়া সে বলিয়াছিল "আমি তোমার স্বামী—বিপদে আমিই ধর্ম্মতঃ তোমার রক্ষাকর্ত্তা। আমি রক্ষা করিতে পারিব না—তাই বলিয়া কি বিপদ্‌কালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?" প্রেমের বলে মানব সবই করিতে পারে—তাই প্রাচীর লঙ্ঘনের কথায় রোমিয়ো বলিয়াছিলেন "With love's light wings did I o'er-perch these walls." আর ব্রজেশ্বর যে সাহসী, সে কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাহার পর নিশি ঠাকুরাণীর দেবতায় অসমর্পিত দুষ্টামির বলে সে প্রফুল্লকে ঘরে লইয়া গেল। দেবীর পার্শ্বে ব্রজেশ্বর ছায়া মাত্র। ব্রজেশ্বর যেন গ্রন্থকারের একালের উপর রাগজনিত সৃষ্টি—সে গোটাতিন বিবাহ করিতে অসম্মত নহে, পিতার আজ্ঞায় কর্ত্তব্য পথ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। আবার তাহার নীতিশাস্ত্রে লেখে যে, স্থানবিশেষে বাপের কাছে ভাঁড়াভাঁড়িতে দোষ নাই। তাহার কথায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "ব্রজেশ্বর সেকেলে ছেলে—একটা "Lie direct" সম্বন্ধে অবস্থা বিশেষে তাহার আপত্তি ছিল না।" এটাও যেন একটা গৌরবের কথা! এও যেন এ কালের উপর একটা আঘাত!! বৃদ্ধ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র এ কালের উপর বড় চটা। সেকাল ভাল ছিল, এ কাল মন্দ; আর এ কালের লোকেরা অর্থাৎ তাহার পাঠক সম্প্রদায়ও মন্দ। এ কালের মেয়েরা বেহায়া,

প্রমাণ তাঁহারা দিবাভাগে স্বামী সন্দর্শন করেন!! এ কালের ছেলেরা খারাপ, প্রমাণ তাহারা যে যত বড় মূর্খ, পিতৃসমক্ষে সে তত বড় লম্বা প্যাঁচ ঝাড়ে!!! কি সর্ব্বনাশ!!! দাম্পত্য সম্বন্ধটাকে আমরা নিতান্তই নিন্দনীয় মনে করি—নিশীথে নিতান্ত গোপনে ভিন্ন স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্তই নিন্দনীয় ভাবি, স্বামীর গৃহকর্ম্ম করা-ও জননী হওয়া ভিন্ন স্ত্রীর যে অন্য কার্য্য থাকিতে পারে, তাহা আমাদের কল্পনার মধ্যেই আইসে না। পিতা পুত্রে সম্বন্ধটায় মধ্যে যে একটু ভালবাসা থাকিতে পারে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। কাজেই আমাদের গৃহ, সুখ ও আরামহীন কারাতুল্য। বৈরাগ্য সম্বন্ধে মত ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু মানব যে স্বভাবতঃই একটু আরামের প্রত্যাশা করে ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। যেখানে গৃহে পিতা এমন কি জ্যেষ্ঠও যমতুল্য, মৃত্যুকালেও স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ নিন্দনীয়, সেখানে মানব যে সময় সময় তাহার স্বাভাবিক আরামপ্রিয়তাবশতঃ গৃহের বাহিরে আরাম অন্বেষণ করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিতে পারে এ সম্ভাবনা কি অসম্ভব?

থ্যাকারে স্থানে স্থানে পাঠকদিগের প্রতি একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কারণ ছিল। তাঁহার মত হতাশ গ্রন্থকারের সংখ্যা অল্প। অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের অধীশ্বর হইলেও তখন ডিকেন্সের যশের নিকট তাঁহার যশ ম্লান ছিল। আর আজ মিষ্টার লিলি বলেন যে, শিক্ষিত সমাজে ডিকেন্সের প্রভাব কমিতেছে, আর প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক আইয়ান ম্যাকল্যারেন বলেন যে, থ্যাকারের প্রভাব কখনও কমিতে পারে না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সে কারণ ছিল না। সৌভাগ্যই হউক আর দুর্ভাগ্যই হউক, আমরা এ কালের লোক; আর দায়িত্বহীন কবিকুলকল্পিত Golden age অপেক্ষাও আমরা আমাদের কালকে ভালবাসি। জগৎ উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে; সে কাল অপেক্ষা একালে চরিত্র, জ্ঞান, সভ্যতা সকলই উন্নত। তাই কমলমণি চরিত্র স্রষ্টার মুখে একালের এ নিন্দা বড়ই কেমন ঠেকে। টেনিসন বলিয়াছেন :—

"The past will always win
A glory from its being far;"

"Regrets are the natural property of gray hairs." বুঝিবা বার্দ্ধক্যসুলভ বাক্যাধিক্য প্রিয়তা হইতে গালিও উৎপন্ন হয়; তাই যে বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতগণকে গালি দেওয়ায় প্রথম বয়সে বঙ্গদর্শনে বিদ্যাসাগরকে

এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলে যে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে সে প্রবন্ধের তীব্রাংশ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্রই বৃদ্ধ বয়সে কৃষ্ণচরিত্রের মত এক খানা সারবান পুস্তক গালিতে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।

নিশিঠাকুরাণীর "সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে"। তিনি বলিতেছেন "শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে, কেন না তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।" কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম-সোপান।" এই গ্রন্থমধ্যেও তিনি বলিয়াছেন "অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী, ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।" পুরুষ রমণীর পরকালের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, তাঁহাকে দিয়া আপনার পদপূজা করাইয়াছে কিনা, সে তর্ক এখানে তুলিয়া কাজ নাই। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক বাবু পূর্ণচন্দ্র বসুর কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। "সতী পতিভক্তিতে যে আত্মোৎসর্গ অভ্যাস করেন, তাহাই ভগবদ্ভক্তির নিদান। ভগবানে ততই আত্মোৎসর্গ না করিলে ভগবৎ প্রেম লাভ করা যায় না। * * * সীতা ও রাধিকা এই দ্বিবিধ প্রেমের আদর্শ, অথচ দুইজনেই পরস্পরের প্রতিবিম্ব। প্রভেদ এই, সীতার পতিপ্রেম অতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত—এত উজ্জ্বল বর্ণে যে, তাহাতে দেব ভক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; রাধিকায় ভগবৎপ্রেম এত উজ্জ্বল যে, তাহাতে পার্থিব পতিপ্রেম প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পতিপ্রেম ভগবৎপ্রেমে আরোহণ করিয়া রাধিকাসুন্দরীর প্রেম ভক্তি। প্রেমের এই ক্রম আর্য্যসাহিত্যে, আর্য্যসমাজেও এই ক্রম।" পতিপ্রেম নহিলে ভগবৎপ্রেম হয় না, আমাদের এ বিশ্বাস নাই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহারই সহিত নিশি চরিত্র খাপ্ খায় না। নিশি সিঁড়ি না ভাঙ্গিয়াই স্বর্গে গিয়াছে।

ভবানীঠাকুর পণ্ডিত, কার্য্যোদ্ধারপর। ভ্যায়াসনদিগের সহিত তাঁহার তুলনা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। তাঁহার এক হস্তে গীতা, অপর হস্তে সেকালের পীনালকোড-লাঠি। আইনানুযায়ী কার্য্য না করিয়া, ডাকাইতি

করিয়া পরোপকার সমাজের পক্ষে হিতজনক নহে। তাঁহার সপক্ষে এইটুকুমাত্র বক্তব্য, যে তাঁহার উদ্দেশ্য মন্দ নহে।

জমীদারবিদ্বেষীগণ বলিবেন যে হরবল্লভ "জমীদারি মিণ্টে ঢালা আদৎ মডেল।" আমরা বলি হরবল্লভ অতি নীচহৃদয়, পাপাত্মা। যাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নাই, তাহার মত নীচ আর কে?

নয়ানতারার কথা অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে যাহারা এইরূপ এককালে একাধিক বিবাহ করিয়া থাকে, তাহাদের সবগুলি পত্নীই নয়নের মত হইলে বোধ করি ভাল হয়।

গ্রন্থমধ্যে সাগরের চরিত্রই সর্ব্বোপেক্ষা মধুর। দেবীর পার্শ্বে সাগর—অদ্ভুতের পার্শ্বে, মাধুরীময় বাস্তব; কুহেলিকাচ্ছন্ন সাগরের পার্শ্বে, চলমলয়-বনপবনান্দোলিত বীচিময়ী, রবিকরসমুজ্জ্বলা নিকুঞ্জপ্রহ্লাদিনী স্রোতস্বিনী। সাগরের প্রণয়ে "সোহাগ হিল্লোল, স্নেহ নিরমল নীর।" কিছুরই অভাব নাই। সাগরের হৃদয় বড় স্নেহে ভরা। তাহার যেটুকু অদ্ভুত সে কেবল দেবীর স্পর্শে—ব্রজেশ্বরের নিকট পণ, দেবীর সহিত পলায়ন ইত্যাদি। অসম্ভবের পার্শ্বে সম্ভবের মত দেবীর পার্শ্বে এই চঞ্চলামূর্ত্তি বড় ফুটিয়াছে।

দেবী চৌধুরাণীতে যত হাসাইবার চেষ্টা আছে, তত হাসি নাই। ইহাতে আশ্চর্য্য ঘটনারই প্রাচুর্য্য। ঘাড়ের উপর দিয়া নৌকা গেল—কেহ মরিল না; নৌকা টলিলে মানুষগুলা গড়াগড়ি গেল—কেহ কাহারও পায় পড়িল, কেহ কাহারও নাগরায় আটকাইল—তবুও আলোকাদি ঠিক রহিল। তাহার পর দেবীর নৌকা ঝড়বাহন; দানবের মৎস্যাহরণ বর্ণনা করিতে হইলে যদি বলিতে হয়:—

> "His angle-rod made of a sturdy ook ;
> His line a cable which in storms ne'er broke ;
> His hook he baited with a dragon's tail,
> And sat upon a rock and bobbed for whale.

তবে দেবীর নৌকা ঝড়বাহন হইবে না কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য পুস্তকের সহিত তুলনায় দেবী চৌধুরাণী তেমন উৎরায় নাই। গীতার উপদেশ উপন্যাসে দিতে যাইয়া উপদেশও মনে বসে না, উপন্যাসও তেমন ভাল লাগে না।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের যে ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে ধূলিমুষ্টি সুবর্ণ মুষ্টিতে পরিণত হইত, সে স্পর্শ দেবী চৌধুরাণীর অনেকস্থলেই অনুভূত হয়। দেবী

চৌধুরাণীতে বর্ণনাগুলি অতীব সুন্দর। আর যেখানে যেখানে দেবীর অভ্যাসের কঠোর আবরণ মধ্য হইতে তাহার রমণী প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে, সেখানে সেখানেই মাধুরী উছলিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মৃদ্‌ভোজী জাতি।

আমেরিকার 'বরো অব এথনোলজী' নামক সভার নবম বার্ষিক রিপোর্টে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মনুষ্যজাতি কত রকম অদ্ভুত পদার্থ ভক্ষণ করে, তাহার এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল ভোজ্য পদার্থের মধ্যে মৃত্তিকা অথবা কর্দ্দমই সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র। রিপোর্টে প্রকাশ—এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীতেই মৃত্তিকা ভক্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর অনেক অসভ্য দেশে এখনো ইহা অক্ষুন্ন অবস্থায় প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। কোন কোন দেশে ইহা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রথারূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত গিনি প্রদেশের নিগ্রোগণ পীতবর্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ করে; তাহারা এই মৃত্তিকাকে 'কাউয়াক' বলে। 'কাউয়াকের' গন্ধ এবং আস্বাদন তাহাদের নিকট যৎপরোনাস্তি প্রীতিকর। এই মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া কখন তাহাদিগকে পাক-যন্ত্র-সম্বন্ধীয় পীড়া ভোগ করিতে হয় না; অনেকে ইহাতে এরূপ অভ্যস্ত যে এই মৃত্তিকা খাইতে না পাইলে তাহারা এক দিনও থাকিতে পারে না। ইহার ব্যবহার নিষেধ করা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার গুরুতর দণ্ড।

কালিফর্ণিয়ার অধিবাসিগণ রুটী সুমিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ময়দার সঙ্গে লোহিত বর্ণের এক প্রকার মৃত্তিকা ব্যবহার করে। ম্যাকেঞ্জী নদীর উভয় তীরে যে সকল অসভ্য আমেরিকানের বাস, তাহারা দুর্ভিক্ষের সময় তৈলাক্ত মৃত্তিকা আহার করিয়াই জীবন ধারণ করে, অন্যান্য সময় ইহারা পানের ন্যায় তাহা চর্ব্বণ করিয়া, বিশেষ আরাম বোধ করে। এই মৃত্তিকার আস্বাদন অনেক পরিমাণে দুগ্ধের ন্যায় এবং তাহাদিগের নিকট তৃপ্তিকর।

উত্তর আমেরিকার আপেস্‌ নামক অসভ্যজাতি বন্য আলুর কটুরস দূর করিবার জন্য রন্ধনকালে তাহার সহিত মৃত্তিকা সংমিশ্রিত করে।

জুনি এবং তাসিমান জাতিও মৃত্তিকা ভক্ষণে অভ্যস্ত। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে অরিনকো নদীর তীরবর্ত্তী এবং বলিভিয়া ও পেরুর পার্ব্বত্য প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে মৃদ্‌ভক্ষণের প্রচলন দেখা যায়।

আফ্রিকার গিনি প্রদেশের নিগ্রোজাতি যখন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দাসরূপে নীত হইত, তখন তাহারা পথের মধ্যে সমারোহ পূর্ব্বক মৃত্তিকা ভোজন করিত। এই দ্বীপপুঞ্জে আসিয়াও তাহাদের মৃত্তিকা ভক্ষণের লোভ নিবৃত্ত হয় নাই, কিন্তু এই স্থানের মৃত্তিকা তাহাদের স্বদেশীয় মৃত্তিকার ন্যায় সহজে পরিপাক হইত না; সুতরাং সকলেই কঠিন অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাই অবশেষে তাহারা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে মার্টিনিক প্রদেশের বাজারে এক প্রকার লোহিত মৃত্তিকা বিক্রয় হইত, কিন্তু ফরাসী ঔপনিবেশিকগণের প্রাদুর্ভাবে এ প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। এসিয়ার পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমান কালেও এই প্রথা প্রচলিত দেখা যায়।

যাভা দ্বীপের পল্লীসমূহে লাল চতুষ্কোণ মৃৎপিষ্টক সমূহ বিক্রয় হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ইরেনবর্গ এই সকল মৃৎপিণ্ড বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখিয়াছিলেন যে স্বচ্ছ জলে যে সকল অণুপ্রমাণ কীট এবং উদ্ভিজ্জ দেখা যায়, তাহা বহুল পরিমাণে এই মৃত্তিকায় বর্ত্তমান ছিল। সুসভ্য জাপানেও কোন কোন স্থানে মৃদ্‌ভক্ষণের প্রথা প্রচলিত আছে। ডাক্তার লভ নামক জনৈক পণ্ডিত কিছুদিন পূর্ব্বে আইনোদিগের ব্যবহৃত কর্দ্দম বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সাধারণ্যে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করেন; যেশোর উত্তর উপকূলে সিটোনিয়া পর্ব্বতের অধিত্যকায় এই কর্দ্দমস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার বর্ণ পাতলা ধূসর। স্থানীয় অধিবাসিগণ এই কর্দ্দমের সহিত একপ্রকার সুগন্ধি পত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করে। ইহারা কর্দ্দম সেবনের বিশেষ কোন আবশ্যকতা অনুভব করে না। তাহাদের বিশ্বাস ইহা যথেষ্ট উপকারী। এই কর্দ্দম গুলিয়া ইহারা ঝোলের ন্যায় পান করে। অনেক সময় কর্দ্দমের সহিত পদ্মমূল মিশাইয়া অগ্নিতে জ্বাল দেওয়া হয়। সেই মূল সিদ্ধ হইলে তাহা কর্দ্দমের মধ্যে চটকাইয়া লয়, আইনোগণের মতে এই পানীয় অতি মুখরোচক।

হিমালয় পর্ব্বতের প্রান্তবর্ত্তী শিকিম প্রদেশে 'রঞ্জিৎ ভ্যালি' নামক উপত্যকার অধিবাসিগণ গলগণ্ড রোগের প্রতিষেধস্বরূপ এক প্রকার

লোহিত মৃত্তিকা তাম্বুলের সহিত চর্ব্বণ করে। "Smith's aborigines of Victoria" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসিগণ মৃত্তিকার সহিত 'মেন' নামক বৃক্ষমূল চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে। উত্তর য়ুরোপের বিশেষতঃ সুইডেন দেশের উত্তরাংশে গাড়োয়ানেরা প্রচুর পরিমাণে মৃত্তিকা চর্ব্বণ করিয়া থাকে, ফিনল্যাণ্ডে রুটীর সহিত মৃত্তিকা মিশ্রিত হয়।

সাইবিরিয়ার কোন কোন জাতি পর্য্যটনকালে মৃত্তিকাপূর্ণ থলিয়া সঙ্গে লয়; তাহাদের বিশ্বাস এই মৃত্তিকার আস্বাদ গ্রহণ করিলে বৈদেশিক উপদেবতাদিগের মন্দ দৃষ্টির দ্বারা অপকারের কোন সম্ভাবনা নাই। য়ুরাল পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসিগণ রুটীর সহিত চা-খড়ি মিশাইয়া ভক্ষণ করে। তাহারা মনে করে, ইহাতে খাদ্যদ্রব্য মুখপ্রিয় এবং স্বাস্থ্যকর হয়। জর্ম্মণীরাজ্যের উত্তর ভাগেও অনেক সময়—বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে কিম্বা কোন নগরের দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের সময়,—মৃত্তিকা ভক্ষণ পূর্ব্বক জঠরানল নিবৃত্ত করিবার প্রথা দৃষ্টিগোচর হয়।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

পোষ্টমাষ্টার।

(১)

ভাই বিনয়,

তুমি পূজার ছুটীতে যখন বাড়ী আসিয়াছিলে, তখন আমার দুঃখের কথা সমস্তই তোমাকে বলিয়াছিলাম। তুমি নানা কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক, বোধ হয় সে সকল কথা তোমার মনে নাই। আমার দুঃখ অপার; সে দুঃখকাহিনী কাহারো কাছে প্রকাশ করিয়াও কোন ফল নাই। তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার দুঃখ কষ্ট তুমি হৃদয় দিয়া অনুভব কর, তাই মনে হইতেছে, তোমার কাছে আমার কষ্টের কথা কতক কতক প্রকাশ করিয়া একটু শান্তি লাভ করিব। তোমার মত বন্ধু আমার আর কে আছে? তুমি ত ভাই জান, তোমাদের গ্রামে পোষ্টমাষ্টারি করিয়া আমি মাসে কুড়ি টাকার বেশী বেতন পাইনা; টিকিট বিক্রয়ের কমিশন আর কত হইবে?—দু টাকার বেশী হয় না। আর এই বাইশ টাকা। পরিবারে তিনটি মেয়ে একটি ছেলে আর আমরা স্ত্রীপুরুষ; বাইশ টাকা আয়ে আজ কাল এতগুলি

পরিবার প্রতিপালন করা যে কি কঠিন তা আমিই জানি। না হয়, ছেলে মেয়ে কটিকে তুবেলা তুমুটো খাইতে দিয়া আমরা স্ত্রী পুরুষে এক বেলা খাইয়াই থাকিলাম; ঘরের মধ্যে কি করি না করি তার খোঁজ কে লইবে? আর আমরা অৰ্দ্ধাসনে দিনপাত করিতেছি, তাহা অন্তে জানিলেই বা কি ক্ষতি? তুবেলা যাহার আহার যোটে না, তাহার সে চক্ষুলজ্জা নিষ্প্রয়োজন। সে যাহাই হউক, এখন ঘোর বিপদে পড়িয়াছি তাহা হইতে কিরূপে উদ্ধার হই? বড় মেয়েটি তের বৎসর পার হইয়া চোদ্দয় পড়িয়াছে; মেজ মেয়েটিও বার বৎসরে পা দিয়াছে; মেয়ে যে আর ঘরে রাখিতে পারি না। তুমি ত ভাই জান, আমার হাতে একটি পয়সাও নাই, এমন আত্মীয় নাই যাহার কাছে এ তুঃসময়ে সাহায্য চাহিয়া কিছু পাইবার আশা করিতে পারি; স্ত্রীর গায়ে এমন একখানিও গহনা নাই যাহা বিক্রয় করিয়া তু পয়সা সংগ্রহ করি। এখন উপায় কি? আমার যে জাতি যায়! কলিকাতায় অনেকের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় আছে, বিনা পয়সায় কি আমার মেয়ে তুটিকে কেহ গ্রহণ করিবে না? তুমি একটু বিশেষ চেষ্টা দেখিও; আমি বড় কষ্টে পড়িয়াছি। এমন কেহ আপনার লোক নাই যাহার উপর পাত্র খুঁজিবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি; কাজ ছাড়িয়া নিজেরও নড়িবার যো নাই। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, তোমার উপর উষা ও নিশার বিবাহভার দিতেছি, তাহারা তোমাকে নিজের কাকা বলিয়াই মনে করে, কাকার যাহা কর্ত্তব্য, করিও, ভাই। আমরা শারীরিক ভাল আছি, তুমি কেমন আছ লিখিও।

হতভাগ্য রজনী।

(২)

মাষ্টার মহাশয়,

আপনার পত্র পাইলাম। কলিকাতায় নানা রকম বিষয় কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি সত্য, কিন্তু সে জন্ত আপনার কথা ভুলি নাই; আপনার উষা ও নিশার কথা যখন তখনই মনে হয়। আমি অনেক মেয়ে দেখিয়াছি, কিন্তু উষার মত মেয়ে আমার চক্ষে কম পড়িয়াছে। তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব এবং স্বভাব তুই অতি সুন্দর; আপনাকে কষ্ট দিবার জন্তই বুঝি ভগবান্ এমন কন্তারত্ন আপনার ঘরে পাঠাইয়াছেন। এমন লক্ষ্মীর মত সুন্দরী, ধীর শান্ত মেয়ে কি যার তার হাতে সঁপিয়া দেওয়া যায়?

আমি যদিও আজ তিন বৎসর হইল কালেজ ছাড়িয়াছি, তথাপি আমার সমপাঠী অনেকে আজও কালেজে পড়িতেছেন। দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য, বালিকা-বিবাহ রহিত করিবার নিমিত্ত, সামাজিক কুরীতি এবং কুসংস্কার নিবারণের জন্য যাঁহাদের সঙ্গে একত্রে সভাসমিতি করিতাম, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতাম, প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতাম, তাঁহাদের অনেকেই এখনও কালেজে পড়িতেছেন। সে দিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাদের দেশোদ্ধার দলের চাঁই একটি বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম; তিনি এম্, এ পাশ করিয়া এখন আইন পড়িতেছেন; এখন পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই; আমাদেরই জাতি, উপাধি ঘোষ, বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসর, ঊষার সঙ্গে বেশ মানায়। তাঁর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হইল, কথায় কথায় দেশোদ্ধার, জাতীয় মহাসমিতি, ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি লইয়া অনেক আন্দোলন চলিল। তাহার পর আসল কথা পাড়িলাম। বিবাহের কথা উঠিলে, তিনি যে রকম মেয়ে চান ঊষা ঠিক সেই রকম মেয়ে, তাহা বলিলাম, এবং রূপ গুণ, লেখা পড়া প্রভৃতিতে ঊষা তাঁহাকে বেশ সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহাও তাঁহাকে জ্ঞাত করিলাম। পরে মনে হইল এই সঙ্গে আপনার পরিচয়টাও দেওয়া ভাল। কাজেই তাঁহাকে বলিলাম আপনি কুড়ি টাকা মাহিয়ানায় পাড়াগাঁয়ে পোষ্টমাষ্টারি করেন। শুনিয়া তিনি অনায়াসে বলিয়া বসিলেন "তাইত, তেমন respectable লোক নন। আমার বিশেষ আপত্তি না থাক্‌লেও বাবা যে এ কাজে স্বীকার হবেন তা বোধ হয় না।"—ইচ্ছা হইল আমাদের 'ছাত্রসমিতি'তে পঠিত প্রবন্ধের তাড়া হইতে তাঁহারই লিখিত 'পাশ করা বরের অত্যাচার' শীর্ষক প্রবন্ধটি বাহির করিয়া এখন একবার তাঁহাকে পড়িতে দিই। আপনি সামান্য পোষ্টমাষ্টার, তাই আপনাকে শ্বশুর বলিতে তাঁহার আপত্তি। তাঁহার পিতার কাছে এ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, তিনি যে ফর্দ্দ বাহির করিতেন তাহাতে অনেক রাজা মহারাজকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইত, অথবা পাগলের প্রলাপ বলিয়া কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন।

যাহা হউক এই এম্, এ পাশগ্রস্ত ভদ্রলোকটির কাছ হইতে বিদায় লইয়া, আমি অপেক্ষাকৃত অল্প পাশওয়ালা একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করিলাম। এ ছেলেটি আমার বড়ই বাধ্য ছিল, গত বৎসরে এল্, এ পাশ করিয়া, এখন মেডিকেল কালেজে ডাক্তারি পড়িতেছে; অবস্থা মন্দ নয়।

শুনিয়াছিলাম এ ছেলেটির বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, একটি ভাল মেয়ে হইলেই হয়, টাকা কড়ির দিকে দৃষ্টি নাই, তাই তাহার কাছে গিয়াছিলাম; তাহাকেও সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। সে সম্মত হইল; কিন্তু টাকা কড়ি কিছু পাইবার আশা নাই শুনিয়া বলিল, "আমার কোন আপত্তি নাই বটে, কিন্তু মা বাপের অমতে ত কিছু করিতে পারি না, আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই ত আছে, "পিতাস্বর্গ পিতাধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ", পিতার অসম্মতিতে আমার কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই।" বুঝিলাম ইনিও সেই দলের। মাষ্টার মহাশয়, কলিকাতার ছাত্রদলের মধ্যে আপনার কন্যার বিবাহের আশা ত ছাড়িয়া দিয়াছি; নগদ পাঁচ হাজার, অভাব পক্ষে তিন চারি হাজার টাকার কমে কালেজের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া অসম্ভব। আমি কি করিব কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না, অথচ শীঘ্র বিবাহ দেওয়া চাই। আপনি বড় দাদাকে এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিয়া বলিবেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মধ্যে তাঁহার অনুগত অনেক লোক আছে। তিনি যদি চেষ্টা করেন ত কৃতকার্য্য হইবার যথেষ্ট আশা আছে। আমি ভাল আছি। আপনারা কেমন আছেন? ঊষা ও নিশাকে আমার ভালবাসা জানাইবেন। ইতি।

আপনার স্নেহের বিনয়।

(৩)

ভাই বিনয়,

আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, পাশ করা ছেলেদের দিকে যাইও না। তুমি আমাকে কতবার বলিয়াছ, পাশ করা ছেলেরা কি এতই নিষ্ঠুর? তুমি নিজের মত সকলকেই দেখ; তুমি বিবাহ করিয়া এক পয়সাও লও নাই, তাই মনে করিয়াছিলে, তোমার সঙ্গে মিশিয়া যাহারা স্বার্থপরতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হৈচৈ করিত, সকলেই সেই রকম করিবে; তাই ঊষা ও নিশার জন্য পাত্র খুঁজিতে গিয়া তোমাকে ভগ্নপ্রয়াস হইতে হইয়াছে। সংসারের বাহিরে যেমন দেখা যায়, ভিতরটাও যদি সে রকম হইত, তবে আর দুঃখ ছিল কি? লোকে মুখে যাহা বলে, কাজেও যদি তাহা করিত, তাহা হইলে কি আর ভাবিতে হইত? কলিকাতা সহর খুঁজিয়া দেখিও, কালেজের পাশের খাতা লইয়া বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করিও; দেখিবে, ধন মানের দিকে না চাহিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত, এমন ছেলে শতকরা একটি মেলা কঠিন। আমার মত কুড়ি টাকা বেতনের পোষ্ট-

মাষ্টারকে শ্বশুর বলিয়া পরিচয় দিতে একজন এম, এ, পাশ করা বাবুর লজ্জা হওয়াই উচিত; বরং তাহা না হওয়াই আজকালের দিনে আশ্চর্য্য। উদরান্ন জুটাইতে পারি না, চার পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পাইব ভাই? তোমার দাদা অনুগ্রহ করিয়া এই বিপদে আমাকে তিন শত টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাই আমার সম্বল। তিন শত টাকায় যে রকম বর পাওয়া যায়, তাহারই সন্ধান করিও। তোমার দাদাও চারিদিকে অনুসন্ধান করিতেছেন। কি বলিয়া তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিব? ভগবান্ তোমাদের চিরসুখী করুন,—তোমরা বিপন্নের বান্ধব।

হতভাগ্য রজনী।

(৪)

প্রিয়তম বিনয়,

তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, রজনীবাবুর দুই মেয়ের বিবাহের জন্য আমি পাত্র ঠিক করিয়াছি; মেয়ে যেমন, ছেলে দুটি তেমন হইল না; কি করিব বল, চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। রজনী বাবুর মেয়ে দুটি সত্য সত্যই রাজার পুত্রবধূ হইবার যোগ্য; যদি আমার আর ছোট ভাই থাকিত, তবে উষাকে আমাদের ঘরে আনিয়া ঘর আলো করিতাম। আমাদের হরিপুরের তহবিলদার রাজকৃষ্ণ মিত্রকে তুমি চিনিতে। গতবৎসর তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহার বড় ছেলে হরেকৃষ্ণকে আমি সেই কাজ দিয়াছি; ছেলেটি বেশ শান্ত শিষ্ট, বেশ বুদ্ধিমানও বটে, তবে লেখাপড়া ভাল জানে না। এ এক বৎসর কাজ কর্ম্মও বেশ করিতেছে। খুব বিশ্বাসী। আমার বিশ্বাস, তাহার সঙ্গে বিবাহ দিলে উষা কখনও খাওয়া পরার কষ্ট পাইবে না। হরেকৃষ্ণের ছোট ভাই মাইনর স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছে, বয়স সতের বৎসর; মাইনরটা পাশ করিলে, আমি মনে করিতেছি, তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া ক্যাম্বেলস্কুলে ডাক্তারি পড়াইব, নিশার সঙ্গে তাহার এক রকম মানাইবে। ইহারা আমার বিশেষ বাধ্য বলিয়াই আমার কথায় সম্মত হইয়াছে। সেদিন পোষ্টমাষ্টারকে ডাকাইয়া সকল কথা বলিয়াছি। তিনি ছেলে দুটিকেও দেখিয়াছেন, এ বিবাহে তাঁহার অমত নাই। খরচ পত্রের একটা ফর্দ্দ ধরিয়া দেখা গেল, মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিলাম, সাড়ে ন শ টাকার কমে কিছুতেই দুই মেয়ে পার করা যায় না। আমি তিনশ টাকা দিতে চাহিয়াছিলাম, মা বলেন, স্বজাতির ছেলে কন্যাদায়ে

পড়িয়াছে, বিশেষ আমাদের বড় অনুগত লোক, আরো কিছু বেশী সাহায্য করা উচিত, ইহা অপেক্ষা পুণ্যের কাজ আর কিছুই নাই। মার বড় দয়া। আমি মনে করিতেছি, চার শ টাকা দেব। তুমি কি বল? তুমি বিবাহের সময়ে বাড়ী আসিও, তাহা হইলে রজনীবাবু বড়ই সুখী হইবে।

এইমাত্র তোমাদের বড় বৌ আসিয়া বলিলেন, যে ছোট বৌমার ইচ্ছা দানের জিনিষগুলিও আমরা দিই; তোমাকে সে কথা লিখিতে বলিলেন। দয়াবতী ছোট বৌমার কথা আমি অমান্য করিতে পারিব না, তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি বলিয়া দিয়াছি দান সামগ্রী যাহা যাহা দেওয়া প্রয়োজন তিনি তোমাকে লিখিবেন, তিনি যেমন যেমন জিনিষের ফরমাইস দিবেন তাহাই আনিবে, আমার মতামতের অপেক্ষা করিও না। এখানকার সব মঙ্গল; বিনোদ বিপিন, খোকা ভাল আছে। তোমার শরীর কেমন? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

শ্রীবিজয়কুমার মিত্র।

(৫)

ভাই বিনয়,

তোমাদের দয়ায় এবার আমি কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইতে চলিলাম। শনিবারে উষা নিশার বিবাহ সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তুমি অন্ততঃ শুক্রবারে অবশ্য অবশ্য এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। নানা কারণে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করা নিতান্ত দরকার। তোমরা যাহা সাহায্য করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর যে তিন চারি শত টাকা লাগিবে, তাহা আমি অন্যস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তোমার সঙ্গে দেখা হইলে সমস্ত বলিব, অবশ্য অবশ্য আসিও।

হতভাগ্য রজনী।

(৬)

শ্রীচরণকমলেষু,

দাদা, আজ বুধবার; শনিবারে রজনীবাবুর মেয়েদের বিবাহ। আপনি যাইতে লিখিয়াছিলেন, রজনীবাবুও যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, বাড়ী হইতেও পত্র পাইয়াছি, কিন্তু আমার যাওয়ার বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত। শনিবারে Oriental Tea Companyর মীটিং; কোম্পানির কাজ কর্ম্মের বিশৃঙ্খলতার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এই মীটিং‌এ

হিসাব পত্র পরীক্ষা ও ভবিষ্যতের কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত স্থির হইবে। আমার সে সভায় উপস্থিত থাকা নিতান্ত দরকার। যদি আপনি এখানে থাকিতেন, তাহা হইলে আমি যাইতে পারিতাম। এই পত্রপাঠ আপনি চলিয়া আসিয়া শনিবারের মীটিংএ উপস্থিত থাকিলে চলিতে পারে বটে, কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম আমি বাড়ী গিয়া রজনীবাবুর মেয়ের বিবাহের কিছুই বন্দোবস্ত করিতে পারিব না, আপনি ত জানেন, ও সকল কাজে আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং আমার এখানকার কাজ লইয়াই থাকা ভাল। বিবাহে আপনি যাহা সাহায্য করিতেছেন, তাহা বেশ হইয়াছে। বাড়ীর মেয়েরা যেন বিবাহের দিন রজনী বাবুর বাড়ীতে যান, নতুবা তিনি মনে করিবেন, গরীব বলিয়া উপেক্ষা করিয়া বাড়ীর বৌ ঝিরা তাঁহার বাড়ীতে গেলেন্ না। দানের জিনিষ পত্রগুলি আমি নিজে দেখিয়া কিনিয়াছি, আজ রাত্রে সেগুলি রেলোয়ে পার্শেলে রওনা করিব। ইতি—

সেবক শ্রীবিনয়কুমার মিত্র।

পুঃ—পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে আর পৃথক পত্র লিখিলাম না, আপনিই তাঁহাকে সকল কথা বলিবেন। আর একটা কথা—তিনি অবশিষ্ট তিন চারি শত টাকা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন?

বিনয়।

(৭)

প্রিয়তমে,

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার চিঠি, তাহার উপর দাদার হুকুম! এক হুকুমেই রক্ষা নেই, তা আবার ডবল; নিজে বাজারে বাজারে ঘুরিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তোমার বরাতি দানের জিনিষগুলি কিনিয়াছি, এখন তোমার পছন্দ হইলেই সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। তবে কিনা তোমার মন জিনিষটি বড়ই দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু তাই বলিয়া ভরসা করি, এ পক্ষের সাধনার ত্রুটি নাই।

রহস্য পরিহাসের কথা এখন থাক্। পোষ্টমাষ্টারের পরিবারের প্রতি তোমার দয়া দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইয়াছি; পোষ্ট মাষ্টারের ন্যায় দরিদ্র পরিবার যথার্থই করুণার পাত্র। দুঃখী দরিদ্রের প্রতি তোমার যেমন দয়া আমি যেন তাহার অনুকরণ করিতে পারি। ঊষা ও নিশার জন্য কেমন সুন্দর কাপড় কিনিয়াছি দেখিও, দেখিয়া তোমার মুখ আনন্দে

ভরিয়া উঠিবে। বড় দুঃখ যে তোমার মুখের সেই ভাবখানা দেখিতে পাইলাম না। কি করিব বল? হঠাৎ এমন কাজ পড়িয়া গেল যে বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও কিছুতে বাড়ী যাইবার যো নাই। মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আর দুঃখ ছিল কি?

উষা ও নিশার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে গিয়া যে কষ্ট পাইয়াছি তাহা বলিবার নহে। ছেলে পাশ করিলে আর রক্ষা নাই, ছেলের মা বাপ অর্দ্ধ-রাজ্য ও এক রাজকন্যা চাহিয়া বসে, ছেলে খোঁজ করে মেয়েটি ডানাকাটা পরী কিনা এবং সে লেখাপড়াতে কি রকম পরিপক্ক। তোমারও ত একটি ছেলে হইয়াছে, তাহার বিবাহের সময় যেন তুমি সোনার ঘড়া, রূপার খাট চাহিয়া বসিও না। গরীবের ঘর হইতে উষার মত একটি পরমা সুন্দরী ক'নে আনিয়া তোমার পুত্রবধূ করিয়া দিব, তখন যেন তত্ত্বের জন্য বেয়ানকে গা'ল পাড়িও না। পোষ্টমাষ্টারের অবস্থা দেখিয়া মনে যে কষ্ট হইয়াছে, তাহা যেন মনে থাকে।

আমি যাইতে পারিলাম না, তোমাকে একটা কাজের ভার দিতেছি। তোমাকে আমার একটিনি করিতে হইবে; পারিবে ত? আমি জানি তুমি অতি সুন্দররূপে সকল কাজ করিতে পারিবে; কেবল আমার মত মুখে চুরট গুঁজিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে আর বাজে ইয়ারকি দিতে পারিবে না। যাহা হউক আসল কাজের তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। তুমি সেদিন একা দশজনের কাজ করিও, সকলে যেন দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায় যে, বড় মানুষের মেয়েতেও সংসারের সকল কাজ করিতে পারে। তাহাদের বুঝিতে দিও যে অহঙ্কার করিয়া বসিয়া থাকা, কি নাক তুলিয়া পরের নিন্দা করা পৃথিবীর সকল বড় মানুষের মেয়ের স্বভাব নয়। বিবাহ শেষ হইয়া গেলে আমাকে সংবাদ লিখিও, আর তুমি কেমন কাজ কর্ম্ম করিয়াছ তাহা লিখিয়া জানাইও। সত্য বলিতেছি, তোমার প্রশংসা শুনিতে পাইলে আমার মনে বড় আনন্দ হয়। খোকাকে সেখানে লইয়া যাইও না, কতকগুলো মিষ্টি খাইয়া অসুখ করিতে পারে। আমি ভাল আছি।

তোমার বিনয়।

(৮)

প্রিয়তম বিনয়,

সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পোষ্টমাষ্টার গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে! গত কল্য

বেলা দুই প্রহরের সময় বর কনে বিদায় হইয়া গিয়াছে, রাত্রে এই ঘটনা; এখনো পুলিস আসিয়া উপস্থিত হয় নাই; ব্যাপার কি আমি ত এখনো কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। সবিশেষ পরে লিখিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক বিজয়।

(৯)

ভাই বিনয়,

কাল যখন তুমি এই পত্র পাইবে তখন আর আমি এ জগতে থাকিব না; দরিদ্রের জীবন ধারণে ফল কি তাই?

তোমাকে অনেক কথা বলিবার ছিল, সেই জন্যই তোমাকে অবশ্য অবশ্য আসিতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতি বিধাতা বিমুখ, তুমি ইচ্ছা সত্বেও আসিতে পারিলে না। আমার সময় অতি অল্প,মন ঠিক অবস্থায় নাই; যে সকল কথা বলিব মনে করিয়াছিলাম তাহা আর বলা হইল না, সকল কথা গুছাইয়া লিখিতে পারিব সে আশাও নাই। কন্যার বিবাহ দিতে বসিয়া যে অন্যায়, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি, রাজদণ্ডে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে কিনা, জানি না। কিন্তু আমি আপনাকে ক্ষমা করিবারও যোগ্য নহি; যে মহাপাপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি, তাহার আর ইহকাল পরকালে প্রায়শ্চিত্ত নাই। চিরজীবন দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিয়াছি, পরলোকেও অনন্ত নরক যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, ইহাই আমার অদৃষ্টে ছিল, ইহাই বিধিলিপি।

তোমরা আমার জন্য যাহা করিয়াছ, নিতান্ত প্রিয়তম আত্মীয়েও তাহা অপেক্ষা অধিক করিতে পারে না। তোমাদের সে ঋণ পরিশোধ করা আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত; প্রত্যুপকারের আশাতেও তোমরা এ হতভাগ্যের উপকার কর নাই। তোমাদের দেবহৃদয়, দরিদ্রের দুঃখে দয়ার্দ্র হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল তাই আমার জন্য এতটা করিয়াছ; আমার কন্যার বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পাঁচ শত টাকা সাহায্য করিয়াছ, কিন্তু নয় শত টাকার কমে এ বিবাহ-কার্য্য সমাধা হয় না। গরীব কুড়ি টাকার কেরাণী বাকি চারিশত টাকা কোথায় পাইব, নিরুপায়! অবশেষে যে উপায় ছিল তাহাই অবলম্বন করিলাম। আমার হাতে যে সরকারী ক্যাশ ছিল, তাহা হইতেই চারিশত টাকা লইয়া কোন প্রকারে কাজ শেষ করিলাম, আজ আমি স্বাধীন, আজ কতকটা নিশ্চিন্ত মনে মরিতে

পারিব। আর যাহারা রহিল, যাহাদের মায়ার বাঁধন এ অন্তিম মুহূর্ত্তেও ছিঁড়িতে পারিতেছি না, তাহাদের ভার তোমাদের দুই ভাইয়ের হাতেই দিয়া যাইতেছি, জানি তোমরা তাহাদের ভার গ্রহণে কাতরতা প্রকাশ করিবে না, তাই মরিতে আমার দুঃখ নাই। তুমি হয়ত বলিবে কেন মরিতেছি? তহবিল ভাঙ্গিয়া ত কাহাকেও চিরজীবন রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয় না, দুই চারি বৎসর পরে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিব, আবার স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখিয়া শান্তিলাভ করিব। কিন্তু ভাই এ হীন কলঙ্কিত জীবন লইয়া কে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে চায়? জীবনের প্রয়োজন কি এতই বেশী? যদি সুনাম হারাইলাম, রাজদ্বারে বিশ্বাসঘাতক, চোর বলিয়া দণ্ডিত হইলাম, সমস্ত সাধু লোকের সহানুভূতি হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম, তবে আর জীবনে কাজ কি? ইহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।

সেই জন্যই আজ মরিব স্থির করিয়াছি। চিরজীবন চোর বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিতে হয় করিও, কিন্তু ভাই, আমার অপরাধের জন্য আমার স্ত্রী পুত্রকে পথে বসাইও না। আমি আর তোমাদের একবিন্দুও অনুগ্রহের পাত্র নই, কিন্তু তোমাদের করুণা ভিন্ন আমার স্ত্রী পুত্র অনাহারে মরিবে। তাহাদের তুমি যে স্নেহ করিয়া আসিতেছ, এই হতভাগ্যের অপরাধে তাহাদিগকে সে স্থান হইতে বঞ্চিত করিও না।

ইহার পূর্ব্বে আমি একদিনও একটি পয়সা সরকারী তহবিল হইতে লইয়া খরচ করি নাই, কতদিন পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই, তথাপি সরকারী তহবিলে হাত দিই নাই, স্বামী স্ত্রীতে দারিদ্র্যের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া উপবাসে দিন কাটাইয়াছি; কিন্তু কন্যাদায় উদ্ধারের আর উপায় দেখিলাম না, নিজ হস্তে নিজের বুকে ছুরি দিলাম, সরকারী ক্যাষ ভাঙ্গিলাম। মনে মনে এই দুঃসঙ্কল্প স্থির করিয়াইত সরকারী তহবিল ভাঙ্গিয়াছি, এ কয়-দিন এই বিষ আমার হৃদয় মন জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি আমি প্রকাশ্যভাবে হাসিয়াছি। কেহ কি বুঝিয়াছে বুকের মধ্যে কি সমুদ্র লুকাইয়া আমি এ কয়দিন কি ভাবে কাটাইয়াছি?

আবার বলিতেছি ভাই, রসিক বিমলা রহিল, দুঃখিনী স্ত্রী রহিল, হায়, আমার মৃত্যুতে কি সে আর বাঁচিবে? তথাপি যে কদিন বাঁচে, সে কয়দিন তাহাদের মুখের দিকে চাহিও, তোমার হাতেই তাহাদের সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছ,

তোমার মা, দাদা, স্ত্রী এতদিন ধরিয়া, আমাদের প্রতি যে দয়া করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে আমার বিশ্বাস, আমার স্ত্রী তোমাদের দাসীবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইতে পারিবে। আমি চলিলাম, যে দেশে মেয়ের বিবাহ দিতে টাকা লাগে না, সেই দেশে চলিলাম। নরক হইলেও যে স্থান এই নরমাংস বিক্রয়ের স্থান হইতে অনেক ভাল, সেই স্থানই আমার প্রার্থনীয়। নরকে যমরাজের কাছে আমি ছেলে বিক্রয়কারীদের নামে নালিশ করিব; পৃথিবীতে গরীবের বিচার হইল না।

বিনয়, আমার আর একটা অনুরোধ; ছেলের বিবাহ দিয়া টাকা লইও না। গরীব লোক, যে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে না, সে যখন বিবাহ করিতে যাইবে, তখন তাহার হাতে ধরিয়া নিষেধ করিও। আমার পরিণাম দেখাইও।

মা ঊষা, নিশা, বাবা রসিক, স্নেহের পুত্তলি রাশি, প্রিয়তমে জনম-দুঃখিনী, কি বলিয়া আজ তোমাদের কাছে বিদায় লইব? একদিনও তোমাদের সুখী করিতে পারি নাই। সে আমার দুরদৃষ্ট, এ অধমের সকল অপরাধ ক্ষমা করিও; জন্মের মত আজ চলিলাম, বিদায় দেও।

ভাই বিনয়, একটি অপদার্থ, অকিঞ্চিৎকর জীবন পৃথিবী হইতে অপহৃত হইল; আজ বিদায়, চির বিদায়।

তোমার হতভাগ্য রজনী।

শ্রীজলধর সেন।

জাতীয় জীবন ও নাট্যশালা

আমাদের দেশে আজ কাল নাট্যশালার অভাব নাই। অনেক স্থলে ইহা একটা পয়সা উপার্জ্জনের পন্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শত শত নরনারী আমোদ উপভোগ করিবার জন্য নাট্যশালায় অভিনয় দর্শন করিতে গিয়া থাকেন। নাট্যশালায় অভিনয় দর্শন করিয়া, আমরা যে আমোদ উপভোগ করি তাহা বিশুদ্ধ আমোদ কি না, সে আমোদ জাতীয় জীবনে কোন স্থায়ী ভাব বিস্তার করে বা করিতে পারে কি না, এবং এই আমোদ বিতরণ ছাড়া জাতীয় জীবনের সহিত নাট্যশালার অন্য কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

নাট্যশালা অর্থে আধুনিক থিয়েটারই বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে আমাদের

দেশে এরূপ নাট্যশালা ছিল না—আধুনিক নাট্যশালা ইংরাজ অনুকরণে নির্ম্মিত। আমাদের দেশে এখনও পূর্ব্ব প্রচলিত যাত্রার দল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বের মত যাত্রা শুনিতে যাইবার জন্য লোকের তত আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না; এখন সে আগ্রহটুকু থিয়েটরের দিকে গিয়াছে। বাহ্যিক আড়ম্বরই থিয়েটরের এই আকর্ষণী শক্তির কারণ।

বিশুদ্ধ আমোদ যে শরীর ও মনে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করিয়া দেয়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অশ্লীলতাবর্জ্জিত নাটক যদি সুচারুরূপে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ আমোদ প্রদান করিতে পারে। আধুনিক থিয়েটরের কার্য্যপ্রণালী দেখিলে, ইহাই প্রতীতি হয় যে, ইহা হইতে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ হয় না। বেশ্যাভিনীত নাটক হইতে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগের আশা কোথায়? অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনীত হইলে যত সুন্দর হয়, পুরুষের দ্বারা হইলে তত হয় না। অবশ্য স্বীকার্য্য যে পুরুষ স্ত্রীলোকের অংশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অভিনয় করিতে পারে না, কিন্তু তাই যদি একেবারে পারিবে না তাহাও ত নয়। যাত্রার দলে অনেক সময় দেখা গিয়াছে, চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষের বালকেরা সীতা প্রভৃতি চরিত্র এমন সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছে, যে তাহাদের অভিনয় দর্শনে এবং শ্রবণে লোকে এত অভিভূত হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা যে পুরুষ একথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই—তাহারা যে চরিত্র অভিনয় করিতেছে, তাহারা যেন সত্য সত্যই নিজে সেই চরিত্র; লোকের মনে বরং এইরূপ ভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছে। আধুনিক থিয়েটরকে বিশুদ্ধ আমোদের স্থান করিতে হইলে ইহাকে স্ত্রীলোক অভিনেত্রী বর্জ্জিত করিতে হইবে। শুধু ইহাই নহে, যে সকল বিষয় অভিনীত হইবে, তাহাও বিশুদ্ধ আমোদের উপযোগী হওয়া চাই। অভিনেয় নাটক অশ্লীলতা বা কুরুচি শূন্য হইবে। নিমাই সন্ন্যাস, হরিশ্চন্দ্র নাটক প্রভৃতি বিশুদ্ধ আমোদের উপযোগী।

নাট্যশালা যদি এইরূপভাবে পরিচালিত হয়, যদি বিশুদ্ধ আমোদ দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য হয়, যদি কতকগুলি লোকের নীচপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এবং তদ্দ্বারা পয়সা উপার্জ্জনের আশায় কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ বিষয় সকল বারবনিতাগণ দ্বারা অভিনীত না হয়, তাহা হইলে ইহা জাতীয় জীবনে একটা স্থায়ীভাব সঞ্চার করিতে পারে। সাংসারিক কার্য্যে; অর্থ

চিন্তায় পীড়িত মানব যদি মধ্যে মধ্যে একটু আমোদ উপভোগ করিতে না পায়, তাহা হইলে তাহার জীবন মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া যায়। একঘেয়ে কোন জিনিষ কাহারও ভাল লাগে না। প্রতিদিন আলুভাতে ভাত খাইয়া কয়জন থাকিতে পারে? বেশী তরকারি করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, একদিন আলুভাতের পরিবর্ত্তে ডালভাতে খাইবার তাহার ইচ্ছা হয়। যাহারা চিরকাল একঘেয়ে ভাবে জীবন কাটায় তাহাদের মনে বা শরীরে স্ফূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে এবং শরীরে স্ফূর্ত্তি না থাকিলে কর্ত্তব্য কার্য্যে আলস্য আসিয়া পড়ে এবং মানুষ জড়ের মত অবস্থান করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ আমোদ মানবজীবনে অতীব প্রয়োজনীয়। শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত" নামক পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—"ইংরাজ অধিকারে আমরা প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত লুপ্তরত্ন পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতেছি, জাতীয় নাট্যশালা তাহার মধ্যে অন্যতর। যাঁহারা মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষের সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, যে তাহাতে জাতীয় গৌরবের উপযুক্ত একখানিও নাটক নাই। কিন্তু মুসলমানদিগের আগমনের বহুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নাটক রচনায় এবং নাটকাভিনয়ের এরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, যে বোধ হয় এক গ্রীকজাতি ভিন্ন অপর কোনও প্রাচীন জাতির মধ্যে সেরূপ হয় নাই। জাতীয় গৌরব এবং জাতীয় নাট্যশালা এক সময়েই ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজার অনুরাগ এবং উৎসাহ প্রাপ্ত না হইলে কোন বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের মুসলমান সম্রাটগণ সুশিক্ষার অভাবে এবং তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষেধ বশতঃ নাট্যামোদের অনুরাগী ছিলেন না। ইহার উপর দীর্ঘকালের পরাধীনতায় এবং নির্য্যাতনে হিন্দু সন্তানগণ ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া পড়িতেছিলেন। জাতীয় রঙ্গভূমি জাতীয় সজীবতার নিদর্শন স্বরূপ; জাতীয় জীবনে এই সজীবতার অভাব ঘটিলে যদিও অন্যান্য বিষয়ে চিন্তাশীলতার উন্মেষ হইতে পারে, কিন্তু যাহা আমোদানুসঙ্গী, সেরূপ কোন বিষয়ে স্ফূর্ত্তি হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারক, উৎকৃষ্ট দার্শনিক এবং উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা-লেখক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কোনও উৎকৃষ্ট নাটককার জন্ম গ্রহণ করেন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা

জাতীয় জীবনে আবার নূতন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করিতেছে; হয়ত আবার শকুন্তলা এবং উত্তর রামচরিত রচিত হইবার দিন আসিতে পারে।”

এই নাট্যশালাই জগতে মহাকবিগণের অক্ষয় কীর্ত্তির কারণ হইয়াছে। যদি নাট্যশালা না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, সেক্সপিয়রের ন্যায় মহাকবির কথা আমরা শুনিতে পাইতাম না, তাঁহার অমৃতময় লেখনীপ্রসূত অমূল্য নাটক রত্ন সকল জগতের সাহিত্য-ভাণ্ডার আলোকিত করিত না। যদি নাট্যশালার ন্যায় একটা কিছু না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, জর্ম্মাণ কবি গেটে ভারতের অমর কবির অক্ষয় কীর্ত্তি শকুন্তলার গুণগান করিতে অবসর পাইতেন না। যদি নাট্যশালার ন্যায় একটা কিছু না থাকিত, তাহা হইলে প্রাচীন পণ্ডিতগণ “উত্তর রামচরিতে ভবভূতির্বিশিষ্যতে” এই কথা বলিয়া গভীরপাণ্ডিত্যশালী নাটককার ভবভূতিকে নাটক-লেখা বিষয়ে কালিদাস অপেক্ষা উচ্চাসনে উপবেশন করাইবার সুযোগ পাইতেন না। যদি নাট্যশালা না থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গীয় অমর কবি মধুসূদন বোধ হয় আজ লোকের নিকট এত পরিচিত হইতেন না—আজ গৌড়জন তাঁহার রচিত মধুচক্রের সুধাপানে বঞ্চিত হইত। বঙ্গদেশে যখন প্রথম ইংরাজ অনুকরণে নাট্যশালা স্থাপিত হয়, তখন মধুসূদন বাঙ্গালায় কোন গ্রন্থই লেখেন নাই। বঙ্গদেশে প্রথম স্থাপিত বেলগাছিয়া থিয়েটার নামক বাঙ্গালা নাট্যশালার সংস্রবে আসিয়া মধুসূদনের জীবনের লক্ষ্য ফিরিয়া গেল। স্বর্গীয় রামনারায়ণ তর্করত্ন শ্রীহর্ষ প্রণীত রত্নাবলী নাটিকা অবলম্বন করিয়া বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য একখানি নাটক রচনা করেন। সাহেবদিগের বোধার্থে মধুসূদনকে সেই নাটকখানির ইংরাজি অনুবাদ করিতে হয়—এই ঘটনাই মধুসূদনের ভাবী অমর কীর্ত্তির সূত্রপাত করিয়া দেয়। “একদিন রত্নাবলীর অভিনয়াভ্যাস (Rehearsal) দেখিতে দেখিতে মধুসূদন গৌরদাসবাবুকে বলিলেন, “দেখ কি দুঃখের বিষয় যে, এই একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য রাজারা (রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর) এত অর্থ ব্যয় করিতেছেন।” গৌরদাস বাবু শুনিয়া বলিলেন, “নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর তাহা আমরাও জানি; কিন্তু উপায় কি? বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নাটক আমরা অভিনয় করি, ইহা অবশ্যই তোমার ইচ্ছা নয়। ভাল নাটক পাইলে আমরা রত্নাবলী অভিনয় করিতাম না; কিন্তু ভাল নাটক বাঙ্গালা ভাষায় কোথায়?” মধুসূদন

বলিলেন, "ভাল নাটক? আচ্ছা আমি রচনা করিব।" এই কথোপকথনের পরদিন হইতেই মধুসূদন তাৎকালিক কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক এবং সংস্কৃত নাটক পাঠ করিতে লাগিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক রচনা করিয়া ফেলিলেন। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় পত্র লিখিতে হইলে যে মধুসূদনের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইত, যে মধুসূদন পৃথিবী লিখিতে "প্র—থি—বী" লিখিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় নাটক রচনা করিয়া ফেলিলেন এবং এমন নাটক রচনা করিলেন যে, তাহা তৎকালপ্রসিদ্ধ সমুদয় নাটক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইল। এখন হইতে মধুসূদনের পথ পরিষ্কৃত হইল—ক্রমে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিলেন, তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি "মেঘনাদ বধ" রচিত হইল। তাই বলিতেছিলাম, যদি নাট্যশালা না থাকিত তাহা হইলে শুধু মানবের মন ও শরীর কেন, কবির কল্পনাও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইত না, বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারও আজ এত অমূল্য রত্নপরিপূর্ণ হইতে পারিত না। যদি নাট্যশালা না থাকিত, তাহা হইলে গিরীশচন্দ্রের নাটক রচনার অদ্ভুত ক্ষমতা অঙ্কুরেই বিলয় প্রাপ্ত হইত। তিনি ম্যাকবেথের যে অতি সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন, যে অনুবাদ তাঁহার বঙ্গভাষায় অদ্ভুত অধিকারের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা আজ বঙ্গ-সাহিত্যের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিত না। আজ কাল যে সকল রাশি রাশি নাটক নাটিকা রচিত হইতেছে, নাট্যশালাই তাহার কারণ। তাহাদের মধ্যে যদিও অনেকগুলি কদর্য্য এবং কুরুচির পরিপোষক,তথাপি মোটের উপর ধরিতে গেলে বঙ্গ-সাহিত্য যে তাহাদের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎও পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

কেবল ইহাই নহে। নাট্যশালা আমাদের একপ্রকার শিক্ষক। ইহা সমাজের জলন্ত ছবি, আমাদের নেত্রপথে উপস্থাপিত করে। সমাজের দোষ দেখাইয়া দেয় এবং গুণের প্রশংসা করে। তবে অনেক সময় দেখা যায়, আমাদের আধুনিক নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ, বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য এবং তাঁহাদের বিকৃত রুচির পুষ্টিসাধনার্থ সমাজের দোষ গুণকে অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলেন এবং অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর অবতারণা করেন। ইহার দৃষ্টান্ত অমৃতবাবুর "তাজ্জব ব্যাপার।" দু এক স্থল ছাড়া "বিবাহ-বিভ্রাটে" সমাজের জলন্ত চিত্র স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিশেষ অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। "বিবাহ-বিভ্রাটে"র ন্যায় নাটক সমাজকে শিক্ষা দিতে পারে। এমন অনেক সুন্দর নাটক আছে,

যাহার অভিনয় দেখিয়া সাধুজনেরা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা মনোমোহনবাবু প্রণীত "হরিশ্চন্দ্র" নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন আছেন, যাঁহাদিগকে অশ্রুপাত করিতে হয় নাই?

গত ফাল্গুন মাসের "ভারতী"তে ইংরাজি ও বাঙ্গালা নাট্যশালা শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহাতে লেখক একস্থলে বলিয়াছেন,—"ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নাটক যদি দস্তুরমত ও উপাদেয়রূপে অভিনীত হয়, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। থিয়েটরে কেহ ধর্ম্ম আলোচনা করিতে যায় না, আমোদ করিতে যায়; থিয়েটর ধর্ম্ম-মন্দির নহে, এ কথা সত্য। এবং থিয়েটরে গিয়া যে কেহ পারমার্থিক-তত্ত্ব বা মূল্যবান ধর্ম্মোপদেশ সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহাও আমার বিশ্বাস নহে। কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সৌন্দর্য্যগুলিতে আকৃষ্ট সকলকেই হইতে হয়; এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য, চৈতন্যের স্বার্থত্যাগ ও মধুর ধর্ম্মভাব, সাবিত্রীর অতুল পতিভক্তির বিষয় পড়িয়া যদি চিত্ত উদ্বেলিত ও মুগ্ধ হয়, তাহা সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখিলে, তাহা আরও প্রকৃত বোধ হয়। অতএব চিত্ত তাহাতে আরও উদ্বেলিত ও মুগ্ধ হইবার কথা।" থিয়েটর যে ধর্ম্ম-মন্দির নহে, তাহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া বলিতে পারি না যে, থিয়েটর-গৃহ হইতে কোন শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায় না। যদি আধুনিক থিয়েটর কুরুচির পোষকতা করে, তাহা হইলে তাহা থিয়েটরের দোষ নহে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষদিগের, নাটককারের এবং শ্রোতৃবর্গের দোষ বলিতে হইবে। যখন লেখক বলিতেছেন যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় সকল অভিনীত হইতে দেখিলে, তাহাদের সৌন্দর্য্যে সকলকেই আকৃষ্ট হইতে হয়,-এবং চিত্ত উদ্বেলিত ও মুগ্ধ হয়, তখন তাঁহাকে আরও এক পদ অগ্রসর হইতে হইবে এবং বলিতে হইবে যে, ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলেই লোকের মনে ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হইবে। ইহা কি শিক্ষা নহে? যে ধর্ম্মানু-রাগ আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল, তাহা আমাকে ধর্ম্মকার্য্যে প্রণোদিত করিতে পারে। হয় ত কোন অধার্ম্মিক ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ধার্ম্মিক হইয়া যাইতে পারে।

অনেকে থিয়েটরের নাম শুনিলে চটিয়া যান। থিয়েটরকে তাঁহারা একটা জঘন্য স্থান বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এরূপ মনে করিবার অবশ্য অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ, থিয়েটরে বারবনিতাগণ অভিনেত্রীর কার্য্য করে; দ্বিতীয়তঃ, উহাতে অনেক সময় কুরুচিপূর্ণ বিষয় সকল অভি-

নীত হয়। কিন্তু বাস্তবিক ধরিতে গেলে, এ সকল থিয়েটারের দোষ নহে—এ সকল, থিয়েটার যাঁহারা চালান, তাঁহাদের দোষ। অত্যন্ত অর্থলোভে তাঁহারা থিয়েটারকে সজ্জনের চক্ষে একটা জঘন্য পদার্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। এ প্রবন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা মনোযোগ করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে বস্তুতঃ থিয়েটার খুব ভাল জিনিস, তবে চালাইবার দোষে ইহা বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। এডিসন তাঁহার সময়ের ইংরাজি নাট্যশালার অধঃপতনের বিষয় লিখিতে গিয়া এক স্থলে বলিয়াছেন, "যদি ইংরাজি নাট্যশালা এথিনীয় নাট্যশালার ন্যায় পরিচালিত হইত, তাহা হইলে তাহার ন্যায় উহা লোকের মনে স্বদেশীয় ধর্ম্ম, রাজা এবং সাধারণ-উপাসনার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার করিয়া দিতে পারিত। যদি আমাদের অভিনয় সকল উপযুক্ত তত্ত্বাবধান এবং নিয়মের বশীভূত হইত তাহা হইলে আমরা শুধু যে আমাদের বিশ্রামকালের কতক সময় বিশিষ্ট আমোদে অতিবাহিত করিতে পারিতাম, তাহা নহে, আমরা অভিনয় দেখিয়া উঠিবার সময় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান্ এবং অধিক ভাল লোক হইতে পারিতাম।" * এডিসনের এ কথাগুলি আমাদের আধুনিক নাট্যশালা সম্বন্ধেও বেশ খাটে।

শ্রীঅধরচন্দ্র মিত্র।

নানা কথা।

(বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ—তুলার ইতিহাস—সর্ব্বোচ্চ আরোহণ—সংক্রামক পীড়ার নিদান-স্বরূপ অণুজীবের উৎপত্তি স্থল—বিবর্ত্তনবাদ।)

গত মাসের দাসীতে প্রকাশিত "বরফ" নামক প্রবন্ধটি পড়িয়া একটা প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। বরফ খাইতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু যে আকারে সম্মুখে ধরা হইয়াছে, তাহাতে ইচ্ছা যেন ইচ্ছাতেই শেষ হইতেছে। লেখক মহাশয় ক্ষমা করিবেন। ইংরাজি বরং বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরে ভলেটাইল, ভ্যাকুয়াম, ফ্রিজিং পয়েন্ট, রিফ্রিজিরেটর ইত্যাদি গলাধঃ করিতে বাষ্পোদ্গমন ঘটিতেছে।

---

* "If the *English* stage were under the same Regulations the *Athenian* was formerly, it would have the same effect that had in recommending the Religion, the Government, and public worship of its country. Were our plays subject to proper Inspections and Limitations, we might not only pass away several of our vacant Hours in the highest entertainments : but should always rise from them wiser and better than we sat down to them."—*Addison.*

বাঙ্গালা ভাষা অসম্পূর্ণ, একথা ঐ মাসের দাসীতেই তিন জন লেখক বলিতেছেন। "আমাদের উন্নতির" লেখক বলিতেছেন, "শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাব-রাজ্যের উপর এত দখল জন্মিয়াছে যে, তার সমান ভাব প্রকাশ করিতে গরিব বাঙ্গালা ভাষা অক্ষম। কাজে কাজেই তাঁহাকে ইংরাজী ভাষার আশ্রয় লইতে হয়, এবং বাঙ্গালা বলিবার সময় তাহার সঙ্গে ইংরাজী বুকনি মিশাইতে হয়।" "বরফ" লেখক বলেন যে "বরফসেবীদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী জানেন, অতএব এই প্রবন্ধে যদি ইংরাজী technical expressions ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না।" "আধুনিক সূত্র-কাতন" প্রবন্ধ লেখক বলেন যে, "বঙ্গভাষার অসম্পূর্ণতা হেতু মিশ্রিত ভাষার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।"

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাটা আমাদের ; সম্পূর্ণই হউক, অসম্পূর্ণই হউক, সেই ভাষা লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। সাহেবেরা আসিয়া তাহার অসম্পূর্ণতা দূর করিবেন না। সম্পূর্ণ করিতে হইলে আমাদিগকেই করিতে হইবে। অসম্পূর্ণতার জন্য দুঃখ প্রকাশ দেখিলাম, কিন্তু দুঃখ মোচনের চেষ্টা দেখিলাম না। কালে বরফ প্রবন্ধের ন্যায় মিশ্রিত ভাষা দেখিতে লেখক মহাশয় ইচ্ছা করেন কি না, বলিতে পারি না। একে, আমাদের মধ্যে বৃত্তিশাস্ত্রজ্ঞ লোকের অত্যন্ত অভাব। তার উপর যাঁহারা আছেন, তাঁহারা বৃত্তিশাস্ত্র বাঙ্গালার শিক্ষিত (বা অশিক্ষিত) দিগের জন্য না লিখিলে আশা কোথায় ?

কোন বিদেশীয় ব্যবসায়ের পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালায় রচনা করা দুরূহ, সন্দেহ নাই। এবং এরূপ বাঙ্গালা শব্দ রচনা সম্ভব হইলেও, তাহা কার্য্যকালে বৃথা হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু একথা কেবল সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যতীত অপর শব্দ সম্বন্ধে বলা চলে না। "ভলেটাইল", আর "ভ্যাকুয়াম" যদি পারিভাষিক শব্দ হয়, তাহা হইলে সমুদয় ইংরাজি শব্দই পারিভাষিক।

বস্তুতঃ "আধুনিক সূত্রকাতন" লেখক ঠিক বলিয়াছেন। অনেক সময় ভাব যুটিলেও ভাষা যোটে না। এই জন্যই ত ভাষা একটা শিক্ষার বিষয় হইয়াছে। আবার একটা না একটা কথা যুটিলেও হয় না, ঠিক কথাটি বলা চাই। নতুবা আমার মনে ভাবটা যেরূপ লাগিয়াছে, অপরের মনে ঠিক সেই রকম লাগে না। এই জন্যই ত লেখক বা বক্তা বা কবি কিছুই হইতে পারা গেল না।

কিন্তু লেখক মহাশয় সোজাসুজি সূতা কাটা ছাড়িয়া কেন যে সূত্র-কাতন শব্দ আনিয়াছেন, বুঝা গেল না। হিন্দিতে বা অপর ভাষায় "কাতন" শব্দ চলিত কি না, জানি না। কিন্তু চলিত ভাষায় চরকা ও টেঁকোর সাহায্যে সূতা কাটা, নলীতে সূতা জড়ান, তুলা পাট করা, পেঁজা, থাওয়াইতে কাপাস থাওয়ান, তুলার আঁশের টান ইত্যাদি বলিয়া থাকি।

সে যাহা হউক, লেখক মহাশয় বলেন যে, "অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে তুলার আঁশ ফাঁপা বাঁশের মত দেখায়, তাহার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে।" ——কিন্তু বাস্তবিক তাই কি? তুলার আঁশ ফাঁপা বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকোষ্ঠ কই? বস্তুতঃ আঁশের সমুদয়টা একটা দীর্ঘ-কোষ মাত্র। ঐ কোষের নীচের দিকটা মোটা হইয়া উপর দিকটা ক্রমশঃ সরু। ভিতরে ফাঁক অল্প, এমন কি চেপটা বলিয়া ফাঁক আছে বুঝাই কঠিন। যাহা হউক, এটা অবান্তর কথা।

প্রবন্ধের শেষ ভাগে পড়িলাম, ভারতীয় তুলা, সকল তুলার অধম। হায়, ভারতীয় তুলার এ দুর্দ্দশা কেন হইল। কার্পাস বস্ত্রের সঙ্গে সভ্য জগতের ইতিহাস জড়িত। যখন কোন দেশের সভ্য লোকেরা কার্পাস গাছ দেখে নাই, তখন এদেশে ইহার চাষ, ইহার তুলা হইতে বস্ত্র বয়ন প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ঋগ্‌বেদে তন্তুবয়নের উল্লেখ আছে। যেমন মূষিক তন্তু-বায়ের সূতা কাটিয়া ফেলে। কাপড় বুনিবার পূর্ব্বে সূতায় মণ্ড মাখাইতে হয়। সেই মণ্ডের লোভে মূষিকের দৌরাত্ম্য। সে আজ অন্ততঃ চারি হাজার বৎসরের পুরাতন কথা।

মনুর সময়ের ত কথাই নাই। মনু কার্পাসসূত্র অপহরণকারীর সূতার দ্বিগুণ মূল্য দণ্ড করিয়াছেন। মসৃণ শাল্মলী ফলকে রজক ধীরে ধীরে বস্ত্র ধৌত করিবে; একের বস্ত্র অন্যের বস্ত্রসঙ্গে মিশাইবে না, কিম্বা কাহাকেও পরিধান করিতে দিবে না। তন্তুবায় দশ পল সূত্র লইলে বস্ত্র বয়ন করিয়া এগার পল দিতে হইবে। অর্থাৎ যখন মনু মণ্ডের জন্য দশ পল সূত্রের এগার পল বস্ত্র দিবার বিধান করিয়াছিলেন, তখন মাঞ্চেষ্টার কোথায়? যখন গ্রীকেরা ভারতে প্রথমে আসিয়াছিল, তাহারা কার্পাস গাছ দেখিয়াই অবাক্। ভেড়ার লোমে তুলা হয়, ভারত এমন দেশ যেখানে গাছে তুলা হয়। আশ্চর্য্যের কথা, ভারতের সঙ্গে চীনের কত পূর্ব্বকালের পরিচয়। তখনি চীনেরা ৭ম। ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার জানিত না।

চীনের সম্রাট সখ করিয়া আদরের সহিত একটা কার্পাস গাছ নিজের প্রমোদ কাননে রোপণ করিয়াছিলেন।

ভারত হইতে পশ্চিম দেশে তুলার ব্যবহার যায়। ১২শ শতাব্দীতে দেখা যায়, ইটালী ও স্পেন দেশে প্রথমে সূতা কাটা ও কাপড় বোনা আরম্ভ হয়। ১৭শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড তুলার সংবাদ পায়। ঐ সময়ে এ দেশের ছিট ইংলণ্ডের চোখে ধাঁধা জন্মাইয়া দেয়। উহার এত আদর হইল যে, তথাকার লোমজ বস্ত্রের কাটতি কম পড়ে। দেশ মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লমেণ্ট একটা আইন জারী করিলেন। বলিলেন, যে ব্যক্তি ছিট বিক্রয় বা পরিধান করিবে, তাহার ২০০ পৌণ্ড দণ্ড হইবে। ইতিমধ্যে ভারতীয় ছিটে ইংলণ্ডের লোকেরা এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, স্বদেশে ছিট তৈয়ার করিবার কারখানা হইল। দেশ মধ্যে হাহাকার উপস্থিত। লোমবস্ত্র ব্যবসায়ীর অন্ন হওয়া ভার। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লমেণ্ট আবার আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হয়েন।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্বকালে আমেরিকার অসভ্য লোকেরা তুলার ব্যবহার জানিত। কলম্বস্ আমেরিকায় তুলার কাপড় পরিতে দেখিয়াছিলেন।

এদেশে প্রথমে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বম্বেতে সূতার কল স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশেও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে একটা কল বসে। প্রথম সূত্রপাত হইতে এক্ষণে ৪৫ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তদবধি এ বিষয়ে কত দূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা আপনার পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। স্বায়ত্ত শাসনও চাই, আর শিক্ষিত তন্তুবায়ও চাই।

* * * * *

গত মাসের দাসীতে প্রকাশিত দুই একটা প্রসঙ্গ সম্বন্ধেও একটু প্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি। "বেলুনে ছয় মাইল ঊর্দ্ধে" প্রসঙ্গ পড়িয়া দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আজ কাল, এদেশে নাই হউক, পশ্চিম দেশে বেলুন-যাত্রীর অভাব নাই। কিন্তু বেলুনে চড়িয়া উচ্চ আকাশে মেঘনাদের ন্যায় বিচরণ করিতে বড় একটা শুনা যায় না। তাই ছয় মাইল উচ্চে উঠিতে শুনিয়া প্রথমে লোকটাকে, জানিবার ইচ্ছা হয়। খ্রীঃ ১৮৬২ অব্দের ৫ সেপ্টেম্বর গ্লেশার এবং কক্সবেল (Messrs. Glaisher and coxwell) আকাশে উঠিয়া যে নাম রাখিয়াছেন, তাহা সকলেই

শুনিয়াছেন। তাঁহারা ন্যূনাধিক সাত মাইল উচ্চে উঠিয়াছিলেন। ব্যাপার বড় সহজ নহে। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গেরও প্রায় ১॥০ মাইল উপরে উঠা, যার তার কর্ম্ম নহে।

তার পর গত ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর দিবসে জর্ম্মাণ ডাক্তার বার্সন (Dr. A. Berson) উচ্চ আকাশে উঠিয়াছিলেন। তিনি যত উচ্চে উঠিয়াছিলেন,তত আর কেহ উঠিতে পারে নাই বলিয়া বার্সন সাহেব প্রথমে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কি জানি কেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে গ্লেশার সাহেব ২৭, ৯০০ ফুট উচ্চে মাত্র উঠিয়াছিলেন। বার্সন সাহেব কিন্তু ৩০,০০০ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৫৸০ মাইলের বেশী উপরে উঠেন নাই। ইংলণ্ডের লোক স্বদেশীয়ের পরাজয় স্বীকার করিবে কেন? অবশ্য কোন কোন লোক বার্সন সাহেবের উক্তির প্রতিবাদ করিতে ছাড়ে নাই।

আপনার প্রসঙ্গ লেখকের ডাঃ পারসন এবং এই ডাঃ বার্সন এক ব্যক্তি কি না, তদ্বিষয়ে প্রথমে একটু সন্দেহ হয়। নামের প্রভেদ, তার উপর বেলুনে উঠিবার সময়ের উল্লেখ নাই। কিন্তু কয়েকটি বিবরণ মিলাইতে গিয়া সে সন্দেহ গিয়াছে। প ব এর অভেদ ঘটে কি না, বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমি যে কাগজে উক্ত বেলুন-যাত্রার কথা পড়িয়াছিলাম, তাহাতে বেলুন-যাত্রী পারসন পরিবর্ত্তে বার্সণ দেখাইয়াছিলাম। ডাঃ বার্সণের বেলুনের নামও "ফিনিক্স'। কিন্তু তিনি চারি হাজার ঘন হাত "জলজান বাষ্পে" বেলুন পূর্ণ না করিয়া, অত খানি জলের গ্যাসে * পূর্ণ করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, প্রসঙ্গ লেখক লিখিয়াছেন যে, সাহেব ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চে উঠিয়াছিলেন, অর্থাৎ "হিমালয় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘারও প্রায় হাজার ফিট উর্দ্ধে।" কিন্তু হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি, কাঞ্চনজঙ্ঘা?

প্রমত্ত মুদ্রাকরের নিকট সকলই সম্ভব। যদি ১৬ হাজার ফুট উচ্চে বায়ুর উষ্ণতা—১৮°শ হয়, তাহা হইলে ২৬ হাজার ফুট উচ্চে উহা কখনও ৩৯°শ হইতে পারে না। ৩৯°শ এবং—৩৯°শ উষ্ণতার মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, তাহা না বুঝিয়া প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছে।

* Water gas এর বাঙ্গালা করা গেল। উত্তপ্ত অঙ্গারের উপর দিয়া জলীয় বাষ্প চালিত করিলে এই গ্যাস জন্মে। উহা কেবল "জলজান" অর্থাৎ Hydrogen নহে।

বোধ হয়, এইরূপে সমশীতোষ্ণ শব্দের সমটুকু কাটিয়া শীতোষ্ণমণ্ডল করিয়াছে। বার্সণ এইরূপে পারসনে পরিণত হইয়াছেন কিনা, বলিতে পারি না।

* * *

"সংক্রামক পীড়ার নিদান" প্রসঙ্গটি পড়িয়া মনে হইল, ডাক্তার সাহেব নিজের দিকে একটু বেশী টানিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে বলিয়া রাখি যে, যে ডাক্তারি কাগজে ডাক্তার সাহেব নিজের মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা আমি দেখি নাই। এ সম্বন্ধে নীচে যাহা কিছু বলা গেল, তাহা দাসীতে প্রকাশিত প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়াই বলা গেল। একে ডাক্তারের মত, তার উপর ডাক্তারি কাগজ হইতে অনুদিত হইয়াছে। এস্থলে হয়ত আমার আলোচনা ধৃষ্টতা বোধ হইবে। তথাপি সামান্য বুদ্ধিতে মত সম্বন্ধে কেমন খট্‌কা বোধ হইতেছে।

ইনি বলেন যে, সংক্রামক পীড়ার কারণ, "প্রবল কীটাণুর আধিক্য।" সেই সকল কীটাণুর "উৎপত্তি অর্থাৎ স্থান" এই পাঞ্চভৌতিক পৃথিবীতে নহে, সুদূর "নক্ষত্রলোকে।" কিন্তু সেখান হইতে মর্ত্তধামে আসে কিরূপে? "হাজার হাজার টন উল্কাপিণ্ড এবং ধূলি বৎসর বৎসর পৃথিবীর বহির্দ্দেশ হইতে পৃথিবীর উপর আসিয়া সঞ্চিত হয়। * * কেহ কেহ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই সকল পদার্থ বহুল পরিমাণে জীবাণুর (life germ) সহিত সংহত হয়।"

অনুবাদক কীটাণু ও জীবাণু শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন কিনা, জানি না। পরে দেখিলাম, কীটাণু বলিতে বাক্‌টিরিয়া বা উদ্ভিজ্জাণুর উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজি animalcule বাঙ্গালায় কীটাণু হইয়াছে। জীবাণু দ্বারা ইংরাজি Protista বুঝা যায়। বাক্‌টিরিয়া নামক উদ্ভিদবর্গকে আজ কাল microbes বা অনুজীব বলা যায়। ডাক্তার সাহেব ঐ তিন প্রকার ইংরাজী নাম ব্যবহার করিয়াছেন কিনা, বলিতে পারি না।

যে নামই হউক, প্রবল এবং অপ্রবল কীটাণুর অর্থ বুঝিলাম না। অধিকাংশ ডাক্তারের মতে কয়েকটি সংক্রামক পীড়ার কারণ, বিভিন্ন জাতীয় অনুজীব বটে। কিন্তু ঐ সকল অনুজীব যে নক্ষত্র লোক হইতে আমদানি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কই? কোন নক্ষত্রে এরূপ অনুজীবের অবস্থ সম্ভাবনা নাই। কেন না, জ্যোতির্ব্বিদেরা নক্ষত্র গুলাকে এক একটা

জলন্ত সূর্য্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। "নক্ষত্র লোক" অর্থে নক্ষত্র সমূহের অন্তর্গত দেশ বুঝিলেও গোলযোগ মিটে না। কেন না, সে দেশে জীবাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ কই ?

যদি বলেন, উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে জীবাণু আসিয়া থাকে। কিন্তু যে কারণে সূর্য্যে বা নক্ষত্রে আমাদের জ্ঞাত কোন জীব বা জীবাণু থাকিতে পারে না, সেই কারণে ভূপতিত উল্কাপিণ্ডেও আসিতে পারে না। শতাংশিক উষ্ণতামানের ১০০ অংশের অধিক উষ্ণতায় কোন জীব জীবিত থাকিতে পারে, একথা জীব বিজ্ঞানবিদগণ স্বীকার করেন না *। না করিবার কারণ এই যে, যাবতীয় জীব-দেহের প্রধান উপকরণ protoplasm বা জীবনাধার। ঐ পদার্থটা ঐ উষ্ণতার পূর্ব্বেই ডিম্ব-শ্বেতাংশের ন্যায় জমিয়া কঠিন হয়। উল্কাপিণ্ড সমূহ পৃথিবীর দিকে আসিবার সময় ভূবায়ুর ঘর্ষণে এত উত্তপ্ত হইয়া পড়ে যে, তৎসমুদয় হইতে আলোক নির্গত হইতে থাকে। বস্তুতঃ উল্কাপিণ্ডের উষ্ণতায় আমাদের জ্ঞাত জীবাণুসমূহ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

ধূলির আকারে পৃথিবীর বহির্দ্দেশ হইতে জীবাণু আসিতে পারে বটে। কিন্তু একটা পদার্থ শূন্য হইতে পড়িলেই যে, তাহা পৃথিবীর বাহিরের নক্ষত্র লোক হইতে আসিয়াছে, এমন বলিতে পারা যায় না। ভূ-বায়ুর উর্দ্ধ সীমা কোথায়, তাহা জানা নাই কিম্বা জানিবার উপায়ও নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় বলবান্ বোধ হইল না। দারবিন সাহেবের প্রমাণ বড় একটা কাজে আসিল না। কেন না, তিনি "এক আশ্চর্য্য ভৌতিক পদার্থের বর্ষণ" বর্ণন করিয়াছেন। ভৌতিক পদার্থের সঙ্গে ভৌমিক জীব থাকিবে না কেন ?

সেইরূপ, আকাশ হইতে পতিত পীতবর্ণ তুষারে কিম্বা রঙ্গীন বরফে জীবাণু থাকা বিচিত্র নহে। ভূ-বায়ুতে জীবাণু প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কে বলিল যে, তুষারে বা বরফে পরিদৃষ্ট জীবাণু এই পৃথিবীর নহে।

ভূ-বায়ুর উর্দ্ধেস্থিত আকাশে কিম্বা সেই আকাশস্থিত কোন জড় পদার্থে অনুজীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা অভিনব মত বলা হইয়াছে। "যাহাদের সহিত অগ্নির কোন সম্বন্ধ আছে, সেই সকল ভিন্ন অন্য সমস্ত পার্থিব পদার্থই জীবাণুতে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই জড় পদার্থের স্বরূপ অভিন্ন,

---

* দুই একটা ১২০শ উষ্ণতাতেও বাঁচিয়া থাকিতে শুনা গিয়াছে। কিন্তু সে গুলা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার মাত্র।

অতএব ব্যাক্টেরিয়া বা উদ্ভিজ্জাণু যে অন্যান্য গ্রহ এবং গগন বিলম্বী মেঘসমূহ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, এ কথা অতি সহজেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে।"

দুঃখের বিষয়, প্রত্যেক কথাই বিশ্বাস করা সহজ হইল না। জীব সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু জ্ঞান, তাহা এই পৃথিবীরূপ গ্রহস্থিত জীব লইয়াই। এই সকল জীবের জীবন ক্রিয়ার বিচার করিলে দেখা যায় যে, জীব সকল কতকগুলি নিয়মের অধীনে থাকিয়া জীবিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খাদ্য, বায়ু উষ্ণতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। জীব বিশেষের নিমিত্ত খাদ্য বায়ু উষ্ণতার তারতম্য লক্ষিত হইলেও জীবন ক্রিয়ার নিমিত্ত কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। সেই নিয়ম বা অবস্থার বাহিরে পড়িলেই জীবন বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই জড় পদার্থের স্বরূপ অভিন্ন, একথা স্বীকার করিলেই সর্ব্বত্রই উদ্ভিজ্জাণুর অস্তিত্ব মানিতে হইবে কেন? এই পৃথিবীতেই উহার কত দৃষ্টান্ত আছে। কোন দুই দূরবর্ত্তী দেশের জল বায়ুর অবস্থা এক হই-লেই উভয় দেশে এক প্রকার জীব দেখা যায় না। ষাটি সত্তরটা মূল পদার্থ লইয়া এই পৃথিবীতে অসঙ্খ্য পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবী ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্র যে সেই প্রকার অসংখ্য বিভিন্ন পদার্থ নাই, এ কথা বলিবার ক্ষমতা মানুষের হয় নাই।

* * * * *

আপনার কোন কোন পাঠক হয়ত আপত্তিটার গুরুত্ব সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। পৃথিবীর বহির্দ্দেশ হইতে কোন জীবাণু আসিয়াছে বা আসিতে পারে, স্বীকার করিলে পৃথিবীতে জীবসৃষ্টি বুঝিবার কতকটা সাহায্য পাওয়া যায়। পৃথিবীটা নিত্য অনাদি নহে; অসঙ্খ্য সৃষ্ট জীব পৃথিবীর প্রথমাবস্থা হইতে বাস করিয়া আসিতেছে না। অতি পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে কোন জীব ছিল না। উহা তখন প্রচণ্ড উত্তাপের আধার ছিল। ক্রমে শীতল হইয়া জীবের বাসোপযোগী হইলে ইহাতে বহুবিধ জীবের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে। এক সময়ে না এক সময়ে, পৃথিবীতে কোন জীব ছিল না, ইহা সকলকেই মানিতে হইবে। যদি ছিল না, আসে কোথা হইতে! শূন্য আকাশ হইতে আসিয়াছে, না, এই খানেই সৃষ্ট হইয়াছে? যদি সৌরজগতের বা কোন নক্ষত্র জগতের গ্রহ হইতে প্রথমে আসিয়া থাকে, সেখানেই বা আসিল কি প্রকারে? প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লর্ড

কেলবিন মনে করিয়াছিলেন যে, অন্য জগৎ হইতে প্রথম জীব আনিতে পারিলেই কথাগুলা সহজ হইয়া পড়িবে*। কিন্তু যদি অপর জগতে জীব সৃষ্টি হইতে পারে, তবে এ জগতে, এ পৃথিবীতে না পারিবে কেন? পৃথিবী যে কারণে জীবশূন্য ছিল, অন্য জগৎও ত সেই কারণে প্রথমে জীবশূন্য ছিল।

এ প্রশ্নের উত্তর কেহ জানে না। তবে অনুমানের ত্রুটি নাই। কিন্তু অনুমান করিতে পারিলেই সত্যের আবিষ্কার হয় না। পরে ইহার দুই একটা অনুমানের কথা বলা যাইবে। এখন এ প্রশ্ন ছাড়িয়া অপর প্রশ্ন করা যাক। এখন যে সমুদয় জীব পৃথিবীতে দেখা যাইতেছে কিম্বা পূর্ব্বে ছিল বলিয়া তাহাদের নষ্টাবশেষ স্বরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছে? ইহার উত্তর সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। (১) যত প্রকার জীব দৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকটির পুং স্ত্রী, কিরূপে জানি না, সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার জীব পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট হইয়াছে। (২) যত প্রকার জীব দৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয় কয়েকটি অপরিস্ফুট জীব-দেহের বিবর্ত্তনে জাত হইয়াছে। অর্থাৎ অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্ট না হইয়া দুই একটি মাত্র ক্ষুদ্র জীব হইতে এক্ষণে দৃশ্য বহুবিধ জীবের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

প্রথম মতকে পৃথক্ সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় মতকে বিবর্ত্তন সৃষ্টি বলা যাইবে। প্রথম মতাবলম্বীকে জীবস্রষ্টা স্বীকার করিতেই হইবে। নচেৎ এক মনে জীব আসে। দ্বিতীয় মতাবলম্বী জীবস্রষ্টা প্রত্যক্ষতঃ স্বীকার না করিলেও পারেন। স্রষ্টার অপ্রয়োজন, একথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। কিন্তু স্পষ্টতঃ না বলিলেও এবং বিশ্বস্রষ্টার প্রয়োজন থাকিলেও, ইহাঁদের মতে পৃথিবীর জীবস্রষ্টা কেহ না থাকিলেও চলে। কোন কোন মনুষ্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থের ইহা বিরোধী মত। সুতরাং ধর্ম্মগ্রন্থের কথা বড় না বিবর্ত্তবাদীর অনুমান বড়, এই তর্কে পড়িয়া অনেকে শেষোক্ত মতকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারেন না।

তাঁহারা নাই পারুন, বিবর্ত্তনবাদ না মানিলে জীবসৃষ্টির কিছুই বুঝা যায় না। মানিলেই যে সমস্ত স্পষ্ট হইয়া যায়, এমন নহে। তবে, পৃথক্ সৃষ্টি কল্পনা করিতে যতটা গোলযোগ ঠেকে, ইহাতে ততটা ঠেকে না।

---

* বোধ হয়, প্রসঙ্গ লেখক ডাক্তার কেলবিনের প্রাচীন মতের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়াছেন।

অনেক লোকে, বানর হইতে মানুষ হইয়াছে, এই কথাটাকে বিবর্ত্তনবাদের সার মনে করেন। তাঁহারা অন্ততঃ এরূপে মানুষ হন নাই, এই ভাবিয়া সহজে আত্মপ্রসাদ ভোগ করেন। কিন্তু এক কথায় বলিতে গেলে, ইহারা বিবর্ত্তনবাদের কিছুই জানেন না। আধুনিক বিবর্ত্তনবাদ একথা বলে না যে, বানর হইতেই মানুষের উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক জীবের আবির্ভাবের প্রকার বিষয়ে তোমার আমার মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে এবং এই প্রকার মতভেদ বিবর্ত্তনবাদিগণের মধ্যে আছে। কিন্তু সে মতভেদ এক কথা, আর বিবর্ত্তনের মূল উপহাস দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া আর এক কথা।

পৃথক্ সৃষ্টি যতটা কল্পনা করা, যাঁহারা সহজ মনে করেন, তাঁহারা ব্যাপারটা ভাবিয়া দেখেন নাই। তাঁহাদের নিমিত্ত একটা কথার উল্লেখ করিতেছি। ইহা আমার নিজের কথা নহে। "ফ্রি রিভিউ" নামক কাগজে "নোয়ার জাহাজের" একটা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সেই বিবরণের কিয়দংশ পাঠকগণকে শুনাইতেছি। ইহা হইতে পৃথক্‌সৃষ্টির অযোগ্যতা কতকটা বুঝা যাইবে।

"পুরা কালের মেষপালক নোয়া কি প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। সহস্র সহস্র প্রকার জীব সংগ্রহ করিয়া কি অসামান্য অধ্যবসার প্রদর্শন করিয়াছেন। সুমেরু পরিদর্শন করিতে লোক কেন এত গণ্ডগোল করে? চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মেরু প্রদেশে গিয়া নিশ্চিত নোয়া তথাকার ভল্লুক এবং বলরস্ (walrus) আনিয়া তাঁহার জাহাজে পুরিতে পারিয়াছিলেন। উক্ত প্রাচীন প্রাণিবিদ্ উত্তর আমেরিকার অরণ্য হইতে মহিষ, কালিফর্ণিয়ার উত্তরাংশ হইতে ঈষৎ ধূষর ভল্লুক, মাটাবিলি প্রদেশ হইতে আফ্রিকার হস্তী সংগ্রহ করিয়া এবং মরুভূমি ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া একমাত্র নিরাপদ স্থান আরারাট পর্ব্বতে নির্ব্বিঘ্নে আনিয়াছিলেন। * * * সর্ব্ব সমেত জাহাজে নিম্নলিখিত সংখ্যক প্রাণী ছিল। কীটাদি ৭৫৫০০০, পক্ষী ৮৭৭২৪, শম্বুকাদি ৯২০০, পশু ৬১২৮, সরীসৃপ ৯১৪। সমুদায় ৮৫৩৯৬৬ প্রাণী। এতদ্ভিন্ন, অবশ্য নোয়া এবং তাহার পুত্রাদি পরিবার ছিলেন। এই সকল প্রাণীর জন্য উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জাহাজে সঞ্চয় করিতে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। "ইত্যাদি

এই বিবরণ হইতে পৃথিবীর প্রাণিসংখ্যা সম্বন্ধে কতকটা অনুমান

করিতে পারা যাইবে! নোয়া জোড়া জোড়া প্রাণী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব প্রায় কুড়ি লক্ষ প্রকার প্রাণী আছে বলা যাইতে পারে। ইহাদের সঙ্গে উদ্ভিদবর্গ ধরিলে তাহাতে অন্ততঃ তিন লক্ষ হইবে *। অতএব ২৩। ২৪ লক্ষ প্রকার জীবের পৃথক্ সৃষ্টি মানিতে হইবে। বিবর্ত্তনবাদ লক্ষের কয়টা শূন্য কমাইয়া দিতে চায়।

বিবর্ত্তন ক্রমে যেন অসংখ্য জীবের উদ্ভব ঘটিয়াছে। কিন্তু আদি জীব কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তর কেহ দিতে পারেন না। লর্ড কেলবিনের অনুমান পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। টিণ্ডাল প্রমুখ কয়েকজন বলেন যে, অত গণ্ডগোলে কাজ কি? যদি কেলবিনের অনুমান্ অনুসারে অপর গ্রহ বা নক্ষত্রে জীব সঞ্চার সম্ভবিতে পারে, তবে এই পৃথিবীতেই না পারিবে কেন? বস্তুতঃ অজৈব পদার্থের রূপান্তরে জৈব পদার্থের উদ্ভব, স্বীকার না করিলে গত্যন্তর নাই। এক সময়ে না এক সময়ে, কোথাও না কোথাও, অজীব জড় হইতে জীব জাত হইয়াছে। তাহা না হইলে জীব আসিল কোথা হইতে?

তবে, অজৈব পদার্থ হইতে জীব হইতে পারিলে, আমরা এখন হইতে দেখি না কেন? পরীক্ষা দ্বারা কেবল এই প্রমাণ হইতেছে যে, জীব হইতেই জীবের জন্ম, অজীব হইতে নহে। ইহার উত্তর এই যে, যে প্রাকৃতিক অবস্থায় অজীব পদার্থের রূপান্তরে জীব জন্মিয়াছিল, সে অবস্থা এখন বর্ত্তমান নাই। কেবল বর্ত্তমান নাই নহে, সে অবস্থা আমরা জানিও না। জানিতে পারিলে বিজ্ঞানমন্দিরে কৃত্রিম উপায়ে জীবনাধার পদার্থটা প্রস্তুত করিতে পারা যাইত এবং একবার জীবনাধার করিতে পারিলেই তাহা হইতে প্রাকৃতিক নিয়ম ক্রমে ক্রমশঃ উন্নতর জীব সৃষ্টির সম্ভাবনা হইত।

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এই আকার দেখিয়া অনেকে ম্রিয়মাণ হন। তাঁহারা ভাবেন, তবেই ত ঈশ্বরের স্রষ্টা নাম থাকে কই? স্রষ্টাই বা থাকেন কোথায়? প্রত্যেক কাজে ঈশ্বরের হাত দেখিয়া মনে যে শান্তি ও আশার সঞ্চার হয়, তাহার বিলোপ করিতে চাও? যখন বিলোপ সহ্য করিতে পারি না, তখন নিশ্চিত তিনি জীবন্তরূপে বিদ্যমান। তোমার বিবর্ত্তনবাদ কখন সত্য নহে, কেননা তাহাতে জীব স্রষ্টা ও পাতা থাকেন না। বানর

* প্রাণী বা উদ্ভিদ্ কত প্রকার আছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। উপরে যে সংখ্যা দেওয়া গেল তাহা নিতান্ত স্থূল অনুমান বুঝিতে হইবে।

হইতে মানুষ হয় নাই, কেন না তাহা হইলে মানুষের মানুষত্ব বিশেষত্ব থাকে কই। ইত্যাদি।

আশা করি আপনার পাঠকগণের মধ্যে এমন অপরিণামদর্শী কেহ নাই। বিবর্ত্তনবাদ বিশ্ব-স্রষ্টার মহিমা কতগুণে বাড়াইয়াছে, তাঁহারা যেন চিন্তা করেন। বরং আমার মনে হয় যে, যাঁহারা পৃথক্ সৃষ্টিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে যান, তাঁহারা ভগবানের অসীম ক্ষমতা, অসীম জ্ঞান, অসীম মহিমার লাঘব করেন। বিবর্ত্তনবাদে প্রত্যেক জড়কণায়, প্রত্যেক জীবাণুতে প্রত্যেক জীবদেহে ও জীবনে ভগবানের হস্ত প্রত্যক্ষ করায়। প্রত্যক্ষ করায় বলিয়াই বিবর্ত্তনবাদ সত্য, একথা বলিলে বেশী দোষ হইবে কি?

শ্রীসত্যকাম।

কামনা।

সারাদিন শুধু তাহারে ভাবিয়া
কাটিয়া যায়।
রাত্রি আসিয়া সে সুখ আমার
রাখে না হায়।
চেতনা, নিদ্রা; আলোক, আঁধার;
দিবস, যামিনী;—সম অধিকার;
তবে কি আমার অর্দ্ধ জীবন
যাবে বৃথায়?
তারে না ভাবিয়া নিশ্বাস লওয়া
—সে ত মিছায়।
চেতনা আমার আছেই তাহার
অনুক্ষণ
সুপ্তিও চাহি করিতে মাত্র
তার স্বপন।
কোন্ দেবতার কোন্ প্রকরণে
কতকাল ধরি নিরত-পূজনে

আমার আকুল মনের বাসনা
হবে পূরণ?
—জীবন হবে কিছু—না—কেবল—
তার—স্মরণ!

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ভগবানকে বার বার নমস্কার করিয়া, সাধারণের জ্ঞাতার্থ সেপ্টেম্বর মাসের কার্য্যবিবরণ প্রদান করিতেছি।

বর্ত্তমান মাসের রোগী ও আতুর সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। দেবিয়া, ৩। স্বর্ণ, ৪। ফুলমণি, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। নবদুর্গা, ৭। সুমিত্রা, ৮। অম্বিকা, ৯। রুক্মিণী, ১০। সরস্বতী, ১১। নিস্তারিণী, ১২। সখী, ১৩। ব্রজময়ী, ১৪। ঈশ্বরী, ১৫। রামদাস, ১৬। শরৎ, ১৭। জুলী, ১৮। হরিচরণ, ১৯। আনন্দ, ২০। দয়া, ২১। মাণিক, ২২। নিকিকির, ২৩। বৈরাগী।

সরস্বতী—এই পক্ষঘাতাক্রান্তা হতভাগিনী পক্ষাঘাত রোগে ভুগিয়া অবশেষে আস্তে আস্তে শান্তিধামে গমন করিয়াছে। ভগবান তাহাকে তাঁহার অনন্ত শান্তি ক্রোড়ে গ্রহণ করুন।

ব্রজময়ী—তাহার হাতের ঘা পচিতে আরম্ভ হওয়ায় ও এখানে উহার নিয়ম মত চিকিৎসার সুবিধা না হওয়ায় তাহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। আমাদের লোক দুই তিন বার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। অবস্থা শোচনীয়, এ যাত্রা রক্ষা নাই।

ঈশ্বরী—আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে।

রামদাস—"ভিক্‌সা করকে কাশিজি চলা যায়ে গা, আর হঁয়া বহৎ ভিক্‌সা মিলে গা" এই কথা বলিয়া রামদাস মহানন্দে হাবড়ার দিকে চলিয়া গিয়াছে।

শরৎ—আরোগ্যলাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছে।

হরিচরণ—হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে, কারণ তাহার রোগ দুরারোগ্য।

দয়া—বয়স ৬০ বৎসর, হিন্দু কন্যা। ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করিত। বাবু হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ইহার দুর্দ্দশা দেখিয়া ইহাকে দাসাশ্রমে দিয়া যান। গলায় গলগণ্ড, দুই চক্ষু অন্ধ, এবং কর্ণেও ভাল শুনিতে পায় না; তবে সে যে কর্ণে শুনিতে পায় না এ কথা সে বিশ্বাস করে না, এবং বলিলে রাগ করে। স্থায়ী ভাবেই থাকিবে।

মাণিক—বয়স প্রায় ৫০ বৎসর, অন্ধ ও অনাথ। ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিত। বারসাই গ্রামের বাবু তারানাথ রায় প্রভৃতি ইহাকে প্রায় দুই বৎসর কাল প্রতিপালন করেন; অবশেষে তাঁহাদেরই যত্নে এখানে প্রেরিত হইয়াছে। তাহার এখনও বিশ্বাস তাহার বাবু শীঘ্র আসিয়া তাহাকে দেশে লইয়া যাইবে।

মিকিকির—জ্বরাক্রান্ত হইয়া বিশেষ অসহায়ভাবে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় পড়িয়াছিল। আমাদের মাসিক চাঁদা দাতা বাবু ক্ষুদিরাম বসু ও বাবু গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বিশেষ যত্ন সহকারে লোক দিয়া গাড়ী করিয়া এখানে প্রেরণ করেন।

বৈরাগী—বয়স ৩৫ বৎসর, রোগী পক্ষাঘাতে পঙ্গু। অতি অসহায় অবস্থায় বগুড়াতে এক স্থানে পড়িয়াছিল। সেখানকার কতিপয় স্কুলের ছাত্র বিশেষ যত্ন সহকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইহাকে আমাদের কার্য্যকারক বাবু বনমালী বসুর সহিত এখানে প্রেরণ করেন।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ভগবান দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মাসিক চাঁদা।

শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, আষাঢ়,শ্রাবণ ২৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, আগষ্ট ১৲, A lady C/o Babu Sreenath Das, আগষ্ট ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আগষ্ট ১৲ বাবু তেজচন্দ্র বসু আগষ্ট ॥০, ডাঃ চুনিলাল বসু, সেপ্টেম্বর ১৲, N. K. Basu Esqr আগষ্ট ১৲, বাবু গৌরীশঙ্কর দে, আগষ্ট ॥০, বাবু নন্দকুমার দত্ত, আগষ্ট ১৲, বাবু যদুনাথ বরাট, সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার, আগষ্ট ২৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত, আগষ্ট ১॥০, বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেট, আগষ্ট ১৲, R. N. Mukerjee Esqr, সেপ্টেম্বর ১৲, কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ, আগষ্ট ॥০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু, সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু বঙ্কুবিহারী মিত্র, আগষ্ট।০, বাবু অমরেন্দ্রনাথ বসু, জুন ও জুলাই ॥০, বাবু নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সেপ্টেম্বর ৵০, বাবু বনবিহারী বসু, জুলাই, আগষ্ট ॥০, ৬৮।১ নং বেচুচাটুর্জ্জির ষ্ট্রীট মেস, আগষ্ট।০, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ ৩৲, District Charitable Society ৬ জন আতুরের মাসিক সাহায্য, সেপ্টেম্বর, ১৮৲, বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আগষ্ট ।০, বাবু কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, ভাদ্র।/০, ৩৮।৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট মেস, আগষ্ট ॥০, বাবু করুণাদাস বসু, সেপ্টেম্বর।০, বাবু বিপিনবিহারী রায়-চৌধুরী, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ২৲, নবাব সৈয়দ আবদুল শোভান চৌধুরী, আগষ্ট ১৲, বাবু হরিপদ ঘোষাল, আগষ্ট ।০, বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, সেপ্টেম্বর ১৲, ৪২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট মেস, সেপ্টেম্বর।০, বাবু প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, সেপ্টেম্বর /০, বাবু বিহারী লাল ঘোষ, ভাদ্র, আশ্বিন ১৲, বাবু মনমোহন বসু চৌধুরী, ভাদ্র, আশ্বিন ২৲, বাগডোঙ্গা ষ্টেট, ৩ তরফের দঃ, ভাদ্র ও আশ্বিন ৬৲, বাবু যুগলকিশোর ত্রিপাঠি, সেপ্টেম্বর ৵০, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, আগষ্ট সেপ্টেম্বর।০, বাবু শরৎকুমার বসু, সেপ্টেম্বর ৵০ বাবু হেমন্তকুমার পাল, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ॥০, ১২৬নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস, সেপ্টেম্বর ॥০, বাবু জ্ঞানদা প্রসাদ দত্ত, জুলাই ৵০, বাবু পিয়ারীমোহন ভড়, আগষ্ট ।০, বাবু অভয়চরণ মল্লিক, সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু কীরণচন্দ্র বসু, সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর ১৲, রাণী শ্যামাসুন্দরী ও উমাসুন্দরী চৌধুরাণী সেপ্টেম্বর ২৲, রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর, আগষ্ট ১৲, শ্রীমতী

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, ভাদ্র ১৲, N. C. Baral E-qr জুলাই, আগষ্ট ২৲, ২নং সরকার্স লেন মেস্ সেপ্টেম্বর ।০, বাবু কামিনীকুমার গুহ, জুলাই, আগষ্ট ২৲, অনারেবল মোহিনীমোহন রায়, শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন ৩৲, বাবু কেদারনাথ ঘোষ, আগষ্ট ।০, P. D. Basu Esqr সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু ক্ষুদিরাম বসু, আগষ্ট ৷০, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস, আগষ্ট ১৲, কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ, সেপ্টেম্বর ৷০।

এককালীন দান।

বাবু সুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পিতৃশ্রাদ্ধে ১৲, ৬০ নং ওল্ড বৈঠকখানা মুসলমান মেস্ ।০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৲, ময়মনসিংহ সিটি ইস্কুলের ছাত্রগণ, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুদিন উপলক্ষে ১৷৴০, A Hindu Lady, কন্যার বিবাহে ৪৲, বাবু জগৎচন্দ্র দাস ৬৲, ২১।১ পটুয়াটোলা মেস্ ৵০, বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু ।৵০, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী, হুগলী ৫৲, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট মেস্ ।০, A friend ১৲, ৪৯ বেচুচাটুর্জ্জির ষ্ট্রীট মেস ।০, R ।০, বাবু শশিভূষণ সেন ১৲, বাবু গৌরলাল রায়, কাকিনিয়া ৩৲, বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু বিনোদবিহারী ঘোষ ⁄০, বাবু মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মাঃ বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ১০, বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী, সিলং কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ১৲, বাবু কালিপ্রসন্ন দাস ৵০, বাবু যোগজীবন গোস্বামী ৫৲, শ্রীমতী কুসুমকামিনী দেবী ২৲, অজ্ঞাতদাতা ৫০, বাবু কিশোরী মোহন বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১৷০, ভবানীপুরের জনৈক বন্ধু, থাকার জন্য ৫৲, রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব, দিনাজপুর ৫৲, বাবু মানিকচন্দ্র কবিরাজ ৷০, বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র নিয়োগী ।০, বাবু গিরিজাকান্ত বাগচী ।০, বাবু যোগেশচন্দ্র কবিরাজ ৷০, বাবু কেশবচন্দ্র ঘটক ১৲, বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র রায় ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র রায় ৷০, বাবু পুলিনচন্দ্র সাহা ৷০, বাবু গোপীনাথ সাহা ৷০, বাবু অঘোরনাথ ঘোষ ১৲, শ্রীমতী রোহিনীমণি দাসী ১০, শ্রীমতী আতরমণি দাসী ১৷০, বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ ৵০, বাবু হেমচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত ।০, ২১ নং রাধানাথ মল্লিক্ লেন মেস ৷০, ৮৯নং হ্যারিসন রোড মেস ১৲, ৫০নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস ৵১০, বাবু নীলকণ্ঠ দে ।০, বাবু নিমাই চরণ ঘোষ ১৲, Well wishr ১৲, বাবু কালিচরণ দাস, মুর্শিদাবাদ ১৲, ময়ূরভঞ্জের সার্ভে অফিসের আমলাগণ, মাঃ বাবু কৈলাশচন্দ্র প্রধান ৬।০, A friend ।০, বাবু ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।০, দান্যা অনামিক ১৲, বাবু দুর্গানাথ মজুমদার ।০, বাবু বেনীমাধব ঘোষ ৷০, বাবু গিরিশচন্দ্র সরকার ৵০, বাবু গোপালচন্দ্র সিংহ ।০, বাবু রজনীকান্ত দাস ১৲, বাবু টঙ্কনাথ চৌধুরী ৷০, বাবু জানকীনাথ মজুমদার ১৲, বাবু গৌরাঙ্গসুন্দর মজুমদার ১৲, বাবু বলরাম দাস ১৲, জনৈক হিতৈষী ১৲, বাবু কার্ত্তিক প্রসাদ কর ৷০, বাবু সারদাচরণ সেন ১৲, বাবু যাদবচন্দ্র মিত্র ।০, জনৈক হিতৈষী ৵০, বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুহ ১৲, বাবু শশিভূষণ স্থানপতি ৷০, বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তী ।০, বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ ।০, বাবু বামনচন্দ্র সেন ১৲, বাবু বেণীমাধব চাকী ৷০, বাবু বরদাকান্ত তালুকদার ৷০, বাবু যোগেশচন্দ্র মজুমদার ১৲, বগুড়া জেলা ইস্কুলের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক আতুর আনার জন্য সংগৃহীত ৯৵১০, বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।০, ৪৭।২ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট মেস ।⁄০, ৩৭নং শিবনারায়ণ দাস মেস্ ১৲, সেবালয় দর্শক, ২রা সেপ্টেম্বর ৫৲।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

দাসীর সাহায্য ৩৮৲, সম্পাদকের নিকট হইতে গচ্ছিত ফেরত গ্রহণ ফেব্রুয়ারী ৭০৲ এপ্রেল ২০৲ ও কর্জ্জবাবৎ আদায় ফেব্রুয়ারী ১০৲ মোট আদায় ১০০৲, পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় ১৲। মোট ১৩৯৲।

বস্ত্রাদি দান।

বাবু নীরোদ নাথ মুখোপাধ্যায়, গরমকোট ১, গরম প্যাণ্ট ১, গরম চাপকান ২। বাবু পার্ব্বতীচরণ দত্ত, তোয়ালে ১, কোট ২, বালিসের ওয়াড় ১, ছেঁড়া সার্ট ১, প্যাণ্ট ১, ওয়েষ্টকোট ১, ছেঁড়া মোজা ৩।০ যোড়া।

জমা।

মাসিকচাঁদা ৭২৸৶০, এক কালীন দান ৯৯৷৶১৫ অন্যান্য প্রকারে আয় ১৩৯৲, পূর্ব্ব মাসের অন্তে হস্তেস্থিত ১৯৷/০, মোট জমা ৩৩০৸৶১৫।

খরচ।

ডাক্তারের গাড়ী ৫৲, মেহতর ১২৷৶১০, রাঁধুনী ৩৷৶১৫, ঔষধ ১৸৶০, দুগ্ধ ১০৲, রোগী আনার খরচ ১১৷৶১০, দাহ খরচ ৫৷৶০, আদায় খরচ ৩৬৷১৫, সংসার খরচ ৮১৷/১০, ধোপা ৩৷১০, ডাকখরচ ১৸০, কর্ম্মচারীর বেতন ১০৲, পূর্ব্ব বৎসরের হ্যাণ্ডনোটের বাবৎ দেনা শোধ ১০০৲ ঐ দেনার সুদ শোধ ১০৲, বাটিভাড়া ২০৲ জিনিস খরিদ ।৶১৫, অন্যান্য ৩৲ ছাপা খরচ ১৲, ট্রাম ৶১০। মোট খরচ ৩১৮৶১৫।

আয় ব্যয়।

মোট জমা ৩৩০৸৶১৫, মোট খরচ ৩১৮৶১৫, মোট হস্তেস্থিত ১২৸০।

দাসী

একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবন-চরিত।

আমি একদিন রাত্রে আহারের পর রাস্তার ধারে বারান্দায় ঈজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় আল্‌বোলার নলটি মুখে দিয়া ঢুলিতেছিলাম। দারুণ গ্রীষ্মকাল, কিন্তু সে দিন সন্ধ্যা হইতে ঘণ্টা দুই বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাওয়াতে কিছু ঠাণ্ডা ছিল। পল্লীগ্রাম,—অধিকরাত্রি হইবার বহুপূর্ব্বেই পথে লোক-চলাচল বন্ধ হইয়াছে। হালদারদের বাগানের ভিতর একটা নারিকেল গাছে দুইটা পেচক বাসা করিত, তাহারাই মধ্যে মধ্যে ঝঙ্কার দিতেছিল, আর সব নিস্তব্ধ। ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ যেন মনে হইল, আমার মুখনলটা আস্তে আস্তে বলিতেছে—"বলি শুনিতেছ? এত ত লেখ, আমার জীবনের ইতিহাসটা লিখিয়া ছাপাইয়া দাও না; বেশ একটা গল্প হইবে।" আমি ঘুমের ঘোরে বলিলাম,—"তুমি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে পার না—অচেতন পদার্থ, তোমার আবার ইতিহাস কি?" সে বলিল,—"আমি এখনই অচল হইয়াছি, চিরদিনই কি এমন ছিলাম? যখন জীবিত ছিলাম, তখন আমি যেমন দ্রুত ও নিয়ত একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতাম, তেমন তোমার জীবজন্তুর কেহ পারে না কি?" আমি বলিলাম, "ভাল, তুমি না হয় সচলই ছিলে, তা বলিয়া তোমার ইতিহাস আবার কি?" মুখনল এক মুখ হাসিয়া উত্তর করিল,—"বৃথা এতকাল তোমায় ধূমপান করাইয়াছি! মানুষেরই বুঝি সুখ দুঃখ, বিপদ্-সম্পদ, সোনারূপার বুঝি সে সব কিছুই নাই? তবে আমার জীবনের কাহিনী শ্রবণ কর, তাহার পর বিচার করিয়ো।" বলিয়া আরম্ভ করিল:—

আমার জন্মদিনটা ঠিক মনে নাই, বৎসরটা গায়ে লেখাছিল, দেখিয়াছিলে কি? আশ্বিনমাস—শীঘ্রই পূজার বন্ধ হইবে বলিয়া টাঁকশালে কাযের ভারি ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। দিবারাত্রি যন্ত্রের ঘট্‌ঘট্ শব্দে মনে হইত, চিরবধির হইয়া জন্মিতাম সেই ভাল ছিল। আমার জন্মের তিন

চারি দিন পরেই বড়বাজারের এক মাড়য়ারি মহাজন বড় বড় থলি করিয় দশ হাজার টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়া গেল—আমাকেও সেই সঙ্গে যাইতে হইল। আমি তখন সংসারের ব্যাপার কিছুই জানি না; মনে করিলাম, ভারি মহাজনের দোকানে যাইতেছি, দোকানে বসিয়া কত কি দেখিতে পাইব, শুনিতে পাইব, কত আমোদ হইবে। ও মহাশয়, গাড়ি হইতে নামিয়া দুষ্ট মহাজন দুইজন ভৃত্যের সাহায্যে থলিগুলা একটা অন্ধ-কূপের মত ঘরে লইয়া গিয়া মেঝেতে দমাদ্দম্ করিয়া ফেলিল, তাহার পর ক্যাঁচকড়াৎ করিয়া একটা শব্দ হইল, তাহার পর ঘটাং করিয়া আর একটা শব্দ হইল, তাহার পর বলিল, "লে আও।" তাহার পর এক এক করিয়া থলিগুলার নিম্নকর্ণ দুইটা ধরিয়া লোহার সিন্দুকে হড়্ হড়্ করিয়া ঢালিতে লাগিল। আমাদের শরীরটা শৈশব হইতেই কিছু কঠিন, নচেৎ সেই পতনেই, বিয়োগান্ত নাটকের পঞ্চমাঙ্কে রাজা বা রাণীর ন্যায়, মৃত্যু অনি-বার্য্য হইত।

মহাজন যখন সিন্দুক বন্ধ করিয়া, চাবি দিয়া, চলিয়া গেল, তখন আমরা সকলে নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। সকলেই ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই জানি না। বাঙ্গালীর ঘরের কচিমেয়ে শ্বশুরবাড়ী আসিলে তাহার যে কি মনে হয়, তাহা অন্তরে অন্তরে বেশ অনুভব করিতে পারিলাম। যাহা হউক, সকলে মিলিয়া নীরবে আপনাপন অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছি, এমন সময় মহাজন আসিয়া সিন্দুক খুলিল। একমুঠা টাকা বাহির করিয়া গণিয়া দেখিল, আরও তিনটা লইল, লইয়া সিন্দুক বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। তখন পূজার বাজার, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা বারোটা অবধি দোকানে ক্রেতাগণের অবিশ্রাম কোলাহল শুনিতে পাইতাম। অধিকাংশ লোকই নোট লইয়া আসিত, তাহাদের বাকী টাকা ফিরাইয়া দিবার সময় সিন্দুক খোলা হইতে লাগিল, এবং মুঠা মুঠা টাকা বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের আশা হইল, এ অন্ধ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ হইবে,—শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক। দুই দিন পরে আমি বাহির হইলাম। পল্লীবাসী এক বৃদ্ধ তাঁহার পুত্রবধূর জন্য একখানি ঢোবাই শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্রাদি ক্রয় করিলেন, পঞ্চাশ টাকার একখানি নোট ছিল, ফেরৎ টাকার সঙ্গে আমি তাঁহার হাতে গিয়া পড়িলাম।

কিন্তু বৃদ্ধের নিকট আমাকে বহুক্ষণ থাকিতে হইল না। বড়বাজার

ছাড়াইবার পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি কাঁচি দিয়া তাঁহার পিরাণের পকেট ছিন্ন করিল এবং সেই সুদ্ধ আমাদের লইয়া সরিয়া পড়িল। বোধ করি, বাসায় ফিরিয়া তিনি আমাদের বিরহে অনেক অশ্রুপাত হা হুতাশ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার কোনই সংবাদ পাই নাই। আমরা দুর্গন্ধময় গলির ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া একটি খোলার চালের ঘরে নীত হইলাম এবং সেখানে কিছুদিন রহিলাম। সমস্ত দিন ঘরে কেহ থাকিত না; সন্ধ্যা ৮টার পরে সহসা বহুলোকের সমাগম হইত, বোতল বোতল মদ আসিত, গান বাজনা হইত, অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প চলিত—তাহারা সমস্ত দিন কেমন করিয়া কৌশলে লোককে ঠকাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহারই কাহিনী তাহারা একভাগ সত্যের সহিত তিনভাগ মিথ্যা মিলাইয়া বলিত, শুনিয়া বিস্ময়ে আমি স্তম্ভিত হইয়া থাকিতাম। একদিন টাকা ভাগ হইল, আমি যাহার ভাগে পড়িলাম সে আমাকে লইয়া যাইতে যাইতে পথে এক দোকানে আমাকে দিয়া এক যোড়া জুতা কিনিয়া লইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে ভাড়ার টাকার মধ্যে আমি জুতা বিক্রেতার বাড়ীওয়ালার হাতে গিয়া পড়িলাম।

যাঁহার বাড়ী, তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, নিজে চাকরি করেন, দুইটি পুত্র চাকরি করে, আর দুইটি বিবাহিতা কন্যা, তাহার মধ্যে ছোটটি পিত্রালয়ে ছিল, সেই আমাকে অধিকার করিল। বাড়ীভাড়া আদায় করিয়া আসিয়া বাবুটি টাকাগুলি বাক্সে রাখিবার সময় দেখিলেন, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা নূতন ও উজ্জ্বল। মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন,—"চারু, একটা জিনিষ নিবি?"

"কি বাবা!"

"এই দেখ," বলিয়া তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যে আমাকে ধরিয়া হাসিতে হাসিতে ঘুরাইতে লাগিলেন। মেয়ে বলিল,—"দাও বাবা, দাও বাবা, দাও!"

"রোজ কিন্তু আমার পাকা চুল তুলে দিতে হবে।"

"তা দোব।"

"তবে এই নে"—মেয়েটি আমাকে পাইয়া ভারি খুসী—বারবার উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিতে লাগিল, দেখা শেষ হইলে সিন্দূরের কৌটার ভিতর আমাকে রাখিয়া দিল।

তাহার সিন্দূরের কোটার ভিতর আমাকে অনেক মাস থাকিতে হইয়া-

ছিল। মধ্যে মধ্যে সেই নোলকপরা ছোট মেয়েটি আমাকে বাহির করিয়া দেখিত, আছি কি নাই। আমি কি পালাই? পা ত নাই, সুতরাং একথা বলা আমার সাজে না; কিন্তু যদি থাকিত, তবে শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি পলাইতাম না। তত সুখ, তত যত্ন আর কোথায় পাইতাম? আমি তখন দেখিতে কি সুন্দরই হইয়াছিলাম; যন্ত্র হইতে সদ্য বাহির হইয়াছি; ঝক্‌মক্ করিতেছি; দেহে স্থানে স্থানে সিন্দূর মাখা; এমন অতি অল্প টাকারই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

একদিন বাড়ীতে কোলাহল শুনিতে পাইলাম,—"জামাই এসেছে, জামাই এসেছে।" দুদিন খুব লোকজন, হাস্যপরিহাসে বাড়ী গুলজার্ রহিল; তাহার পর দিন ক্রন্দন; মেয়েটিও ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। জামাইটার উপর ভারি রাগ হইল; মনে হইতে লাগিল, যদি আমি উহার হইতাম, তবে এই দণ্ডেই হারাইয়া যাইতাম। যেন হারাইয়া যাওয়াটা সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তাধীন! তোমার পাঠকেরা বোধ হয় এ কথায় কেহ আপত্তি করিবেন না; তাঁহারা কি শতবার সহস্রবার এমন ইচ্ছা করেন নাই যাহা তাঁহাদের পক্ষে এমনই অসম্ভব? সে কথা যাক্। ঘোড়ার গাড়ী, তাহার পর রেলের গাড়ী, তাহার পর ষ্টীমারে চড়িয়া আমি অনেকদূর গেলাম; ক্রমে মেয়েটির শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিলাম। বিবাহের পর বধূ এই প্রথম "ঘরবসত" করিতে আসিল। দেখিলাম, তাহার শ্বশুর শাশুড়ী দরিদ্র; ছেলেটি গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করে, গুটিকত টাকা বেতন পায় তাহাতেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসারটি চলিয়া যায়। ছেলের মা-টি রুগ্না, মাসের মধ্যে পনেরো দিন তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। চারু আসিয়া, রন্ধনশালায় তাঁহার "প্রবেশ নিষেধ" করিল। যে চারু কলিকাতায় অট্টালিকায় বাস করিত, মায়ের "কোলপোঁছা" মেয়েটি, কত আদরের, তিনি কখনও তাহাকে একটি কাজ করিতে দেন নাই, সেই চারু সকালে উঠিয়াই চৌকাঠে জল দিতে লাগিল, ঘর বারান্দা অঙ্গন পরিষ্কার করিতে লাগিল. দেখিয়া আমার যেমন দুঃখ হইত, তেমনই আহ্লাদও হইত। একটি ঠিকা ঝি ছিল, সেই বাসন মাজিয়া কাপড় কাচিয়া দিয়া যাইত; চারু ধুচুনি করিয়া পুকুরের ঘাট হইতে চা'ল ধুইয়া আনিয়া, তরকারি কুটিয়া, মসলা বাঁটিয়া, দশটার সময় স্বামীর "স্কুলের ভাত" প্রস্তুত করিয়া দিত। চারু তাহাদের পরিবারে আসিয়া যত খোতা করিল, তত কাজ করিল, তত সহও করিল। তাহার স্বামীটিও

দেখিলাম বেশ আমুদে, অর্দ্ধরাত্রি অবধি তাহাদের কত গল্প হইত, কত হাসিখুসি হইত, কোনও কোনও দিন প্রদীপ লইয়া দুজনে তাস খেলিতে বসিত। কিন্তু তাহাদের এ সুখ অধিক দিন রহিল না। তাহার স্বামী জ্বরে পড়িল, তিন মাস মাহিনা পাইল না; সংসারে দীনদশা ঘিরিয়া আসিল। পিতার নিকট চারু সাহায্য প্রার্থনা করে নাই—নিজের যতগুলি টাকা ছিল, সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছে; শেষে একদিন বাক্স খুলিয়া আমার থাকিবার কৌটাটি বাহির করিল। আমাকে লইয়া আমার গায়ের সিন্দুর বস্ত্রে ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিল, তার পর জলে ধুইয়া ফেলিল, যখন দেখিল কোথাও সিন্দুরের আর চিহ্নমাত্রও নাই, তখন দাসীহস্তে দিয়া চাউল কিনিতে পাঠাইল। একটু দুঃখ করিল না, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল না, অকাতর-চিত্তে আমাকে বিদায় দিল। তাহা দেখিয়া প্রথমটা আমি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়াছিলাম, পরে ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের জাতিটাই বড় খারাপ; আমাদের যে অধিক ভালবাসে, সেই নিন্দার পাত্র হয়। চারু যদি আমার বিদায় দিবার সময় অশ্রুপাত করিত, তবে সে কার্য্যটা নিতান্ত অচারু হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি সে রাত্রি মুদির তহবিল বাক্সে যাপন করিলাম।

পরদিন প্রভাতে বাক্সে বসিয়া বেচাকেনা, দরদস্তর, তাগাদা স্তোক-বাক্যের বিচিত্র কোলাহল শুনিতে লাগিলাম। যত বেলা হইতে লাগিল, ততই খরিদ্দার বাড়িতে লাগিল। বেলা ৯টার পর ক্রমে কমিয়া আসিল, ঘণ্টা দুই পরে দোকান একেবারে নিস্তব্ধ। কেবল মধ্যে মধ্যে পথে দুই একখানা গোরুর গাড়ীর চাকার ক্যাঁচকোচ এবং চালকের জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বেলা যখন দ্বিপ্রহর, তখন মাথার গামছা বাঁধিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে মুদির ছেলে আসিয়া বলিল, "বাবা, খেয়ে আসগে, আমি দোকান আগলুই।" মুদি তহবিল বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া চাবির গোচ্ছা ঘুনসিতে বাঁধিয়া লইল; ছেলেকে বলিল, "দেখিস্ যেন খদ্দের ঠকিয়ে না যায়—আর বেশী টাকার জিনিস চায় ত বলিস, বসো, তামুক খাও, বাবা এল বলে।" মুদি চলিয়া গেল; অল্পক্ষণ পরে গুন্ গুন্ করিয়া মুদিপুত্র গান ধরিল—

প্রাণপতি করি এই মিনতি,
আমার জীবন রামকে বনে দি-ই-ই-ওনা।

একবার পথে নামিয়া দেখিয়া আসিল, বাবা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। তখন সে আপনার ঘুনসি হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া তহবিল বাক্সটি খুলিয়া ফেলিল। তৈলোজ্জ্বল কৃষ্ণমুখমণ্ডলে শুভ্রদন্তপংক্তির শোভা বিস্তার করিয়া বলিল—"এঃ, আজ আর মেলা নেই; বেশী নিলে বাবা শালা টপ্ করে ধরে ফেল্‌বে"—বলিয়া আমাকে তুলিয়া লইল, আর একটা আধুলি লইল, লইয়া কোঁচার খুঁটে বাঁধিল, বাঁধিয়া সমস্তটা পেট কাপড়ে গুঁজিয়া রাখিল। বাক্স বন্ধ করিয়া, তখন আবার পূর্ব্ববত ঘাড় কাঁপাইয়া তাহার সঙ্গীতচর্চ্চা চলিতে লাগিল—

জীবন রামকে সঙ্গে করে, না হয় খাব ভিক্ষা করে,
অযোধ্যা পুরে।
জীবন রামকে বনে দিলে,
জীবনে জীবন রবে না—আ-আ-আ। ইত্যাদি।

তাহার আচরণ দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম; ভাবিলাম, দেখ একবার, কলিকালে বাপ বেটায় বিশ্বাস নাই, অন্য লোকের মধ্যে থাকিবে কি করিয়া? সেই দিন বৈকালে তাহার পেটকাপড় হইতে একটি ময়লা ছিটের থলির মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া একটি ভাঙ্গা টিনের পেটরায় বদ্ধ হইলাম। এ অবস্থায় আমার মাস দুই থাকিতে হইয়াছিল।

এক দিন শুনিলাম, মুদিপুত্র মামার বাড়ী যাইতেছে। যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল; যাত্রা করিবার সময় আমার থলিটি চুপে চুপে বাহির করিয়া লইয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে পিতৃদত্ত সদুপায়ে অর্জ্জিত আরও কয়েকটি টাকা থলির ভিতর রাখিয়া দিল। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, কৃষাণ, রাস্তামেরামতকারী কন্‌ট্রাক্টর মিস্ত্রী প্রভৃতি বহুলোকের নিকট হইতে কলিকা লইয়া তামাক খাইতে খাইতে, কখনও উচ্চৈঃস্বরে কখন গুণ্ গুণ্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে, সহচারী লোকদিগের নাম ধাম, গন্তব্যস্থান, পিতৃপুরুষের পরিচয় সম্বন্ধে সহস্র অনর্থক প্রশ্ন করিতে করিতে, বগলে ছাতা, বামহস্তে জুতা ও দক্ষিণে পুঁটুলি লইয়া অবশেষে ষ্টেশনে উত্তীর্ণ হইল। টিকিট কিনিবার সময় আমাকে ছাড়িয়া দিল, আমি সেই দুর্গন্ধময় বস্ত্রকারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম।

টিকিট বাবু আমাকে পাইবামাত্র একবার ঠং করিয়া টেবিলে আছাড় দিলেন—আমি ভাবিলাম, "বাবা, বহুনি হইল মন্দ নয়, এইরূপে বারকতক

সম্ভাবিত হইলেই ত গিয়াছি।" যতক্ষণ টিকিট বিক্রয় চলিতে লাগিল, ততক্ষণ আমি চিৎ হইয়া টেবিলের উপরই পড়িয়া রহিলাম। আমার উপরে, পার্শ্বে, ঝন্‌ঝন্ করিয়া আরও টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, পয়সা আসিয়া পড়িতে লাগিল। বিক্রয় শেষ হইলে, বাবু ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের মুদ্রা আলাদা করিয়া গণিয়া সাজাইয়া ক্যাশ মিলাইতে লাগিলেন। শেষ আলমারি বন্ধ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে পুনরায় টিকিটের ঘণ্টা বাজিল। আবার আলমারি খুলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে টিকিটবাবুর একটি কার্য্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আলমারির একটি কোণে একটি টাকা একাকী পড়িয়া ছিল; বেশ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম, বুঝিতে পারিলাম সেটি অভিজাত বংশীয় নহে,—অর্থাৎ তোমরা যাহাকে বল মেকি টাকা। টিকিট বাবু এক ব্যক্তির নিকট টাকা লইয়া, সাঁ করিয়া সেই মেকি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে ফিরিয়া দিলেন, বলিলেন, বদ্‌লাইয়া দাও; এটা চলিবে না। সে বেচারী তাঁহার জুয়াচুরি ধরিতে পারিল না; বলিল, "দোহাই হুজুর, আর আমার একটিও টাকা নাই, এই দ্যাখেন আমার কাপড় চোপড়। যেমন করে হোক্, দ্যান আমায় নিব্বাহ করে কত্তা।" বাবু রূঢ়স্বরে বলিলেন—"একি কর্ত্তার বাবার ঘরের কথা? কি ক'রে তোমায় নিব্বাহ ক'রে দোব? যখন আমার মাইনে থেকে কেটে নেবে তখন কোন বেটাকে ধর্‌বো?" লোকটা যত কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল, বাবু মহাশয় ততই সপ্তমে চড়িতে লাগিলেন। তিনি অনায়াসেই সেই টাকা পরে অন্য কাহারও স্কন্ধে চালাইতে পারিতেন, কিন্তু কি জানি কেন তিনি রণে ভঙ্গ দিতে চাহিলেন না। বাবু অবশেষে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহার বাকী টাকা পয়সা গুলি মুঠা করিয়া হুহুঙ্কারের সহিত সেই গরীবের গায়ে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন; সে ব্যক্তির আর যাওয়া হইল না। আহা, আবার বোধ হয় তাহাকে পাঁচ সাত ক্রোশ হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিয়া একটি ভাল টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইয়াছিল।

সেই দিন রাত্রে ডাকগাড়ীর পূর্ব্বে এক সাহেব আসিয়া বোম্বাইর টিকিট চাহিলেন। নোট দিয়া তাঁহার যে টাকা ফিরিল, তাহার সহিত আমাকেও যাইতে হইল। আমি সুকোমল অনিব্যাগে বদ্ধ হইয়া সাহেবের পকেটে বাসা করিলাম। পথে যাইতে যাইতে কথায় বার্ত্তায় জানিতে পারিলাম, তিনি নূতন মাজিষ্ট্রেট হইয়া ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিলেন,

সম্প্রতি ছুটি লইয়া পরিবার আনিতে যাইতেছেন। আমি মনে করিলাম, এই সুযোগে একবার বিলাতটা বেড়াইয়া আসা হইবে; আশায় উৎফুল্ল হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না; সাহেব জলরথে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে যে হোটেলে পানাহার করিলেন, তথায় আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি হোটেলের ক্যাশবাক্সে এবং ক্যাশবাক্স হইতে আয়রণচেষ্টে স্থান প্রাপ্ত হইলাম।

আমি এই সময়ে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম,—"ওহে তোমার গল্প যে ক্রমশ "ডল" হইয়া পড়িতেছে; আমার পাঠকেরা যে বিরক্ত হইয়া উঠিবেন; তাহা ছাড়া তোমার জীবনের প্রতি ঘটনা এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর যে নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে—সম্পাদক মহাশয় আমাকে লাঠি নিয়া তাড়া করিয়া আসিবেন। তুমি বরং তোমার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বলিয়া যাও।" মুখনল বলিল, —"বটে? আচ্ছা তাহাই হইবে। আর আমার জীবনের বেশী বাকীও নাই, কিন্তু আসল ঘটনাগুলিই বাকী রহিয়াছে। উঃ—আমি এত সহ্য করিয়াছি, এত সুখভোগ করিয়াছি যে তোমরা হইলে আতিশয্যে দম ফাটিয়া মরিয়া যাইতে। মন দিয়া শুন।"

হোটেলের আয়রণচেষ্টে প্রতিদিন টাকা যাহা জমা হয়, পর দিন সমস্ত ব্যাঙ্কে গিয়া পৌঁছে—কিন্তু আমাকে ব্যাঙ্ক যাইতে হইল না। হোটেল-সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রটি অত্যন্ত শিকারপ্রিয়। সে সেইদিন বহু বন্ধু সমভি-ব্যাহারে দূরদেশে শিকার করিতে চলিল। পথখরচের জন্য একখানা নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা লইল, তাহার মধ্যে আমি পড়িয়া গেলাম। সাহেবতনয়-গণ বোম্বাই ষ্টেশনে গাড়ী চড়িয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টার পর এক স্থানে অবতরণ করিল; ষ্টেশনের কিছু দূরে তাম্বু ফেলিল; তাহার পর হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে নাদে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। দুম্‌দাম্ বন্দুকের আওয়াজ, বিজাতীয় চীৎকার, কখনও ধীরপদে গমন, কখনও ধাবন, কখনও লম্ফন, এইরূপ করিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সকলে তাম্বুতে ফিরিল। এই-রূপ সাহেবের পকেটে থাকিয়া প্রতিদিন শিকারে যাইতে লাগিলাম। একদিন একটা কৃষ্ণসারজাতীয় হরিণ সাহেবদের লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া একটা গভীর জঙ্গলে লুক্কায়িত হইল। সে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে সাহেবরা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পথ খুঁজিয়া পাইল না। সেই স্থানে একটি

কাঠুরিয়াদের ছোট মেয়ে কাঁসার মল পরিয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল, সে বলিল,—"সাহেব লোক, আমি প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিতে পারি, আমায় কি দিবে আগে বল।" আমার সাহেব, মনিব্যাগটি খুলিয়া আমাকে বাহির করিয়া মেয়েটিকে দেখাইলেন; দেখাইয়া মনিব্যাগটি, তৎপশ্চাৎ আমাকে খোলা অবস্থায় পকেটে ফেলিয়া দিলেন। মেয়েটি আগে আগে চলিল, সাহেবরা তাহার অনুগমন করিল; শেষে মেয়েটির দর্শিত পথে এক স্থানে খুব ঝুঁকিয়া দুই হাতে ডালপালা ঠেলিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। মেয়েটি তখন প্রতিশ্রুত পুরস্কার চাহিল; সাহেব বন্দুক উঁচাইয়া বিকৃত মোটাগলায় বলিলেন, "ব্যা—গো"। সে বেচারী সুবিধা নয় দেখিয়া সরিয়া পড়িল। সাহেবের এই আচরণ দেখিয়া আমার বড় লজ্জা হইতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই দুরাচারের কাছ হইতে হারাইয়া যাই; এবার আমার অভীষ্ট সফলও হইল, এবং আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের কাল আরম্ভ হইল। সাহেবগণ হরিণের জন্য অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া জঙ্গল হইতে বাহিরে আসিল। যখন সন্ধ্যা হয় হয়, মোটা ঘাসগুলি বেশ দেখা যাইতেছে, সূক্ষ্মগুলি ভাল দেখা যাইতেছে না, তখন সাহেবরা এক অনতিউচ্চ প্রস্তরবেদীর উপর উঠিল, সেখানে খালের ধারে বন্যহংস চরিতেছিল। সাহেবরা তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিল। একটা বৃক্ষের স্থূলবক্রশাখার উপর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার সাহেব যখন নিশানা করিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহার বুকপকেট হইতে ঠুন্ করিয়া পড়িয়া গেলাম। সাহেব আমার পতনশব্দ বোধ হয় শুনিতে পাইলেন, কারণ তাঁহার মুখে একটা "ইণ্টর্জেক্সনে"র অস্ফুটধ্বনি শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি যেমন নিশানা করিতে-ছিলেন, তেমনি করিতে রহিলেন। আমি এই অবসরে পাথরের উপর দিয়া, ঘাসের উপর দিয়া, বালির উপর দিয়া, গড়াইয়া ঠিকরাইয়া একটা গাবভেরাণ্ডার ঝোপের পাশে গিয়া পড়িলাম। সাহেবের বন্দুক সে বার বিশ্বাস রাখিল, পাখীর ঝাঁক উড়িয়া গেল কিন্তু দুইটা পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সাহেব মত্ত হইয়া সেইদিকে ছুটিলেন, আমার কথা আর খেয়াল হইল না।

সাহেবেরা চলিয়া গেল, আমি মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত বাতাসে পড়িয়া রহিলাম। আজ আমার জীবনের বড় শুভরাত্রি। এমন আরাম, এমন স্বাধীনতা জন্মের পর এই আমার প্রথম ঘটিল। সে রাত্রি অতি

আহ্লাদে আমি নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, মৃদুমন্দ বাতাস বহিতে লাগিল, দূরে কাছে ঝোপে ঝাপে বনপুষ্প ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার গন্ধ একপ্রকার নূতনতর, আমি বাক্সে বাক্সে আতর গোলাপ বিলাতী এসেন্স, বাগানে বাগানে গোলাপ, বেলা, রজনীগন্ধা, কত পুষ্পের আঘ্রাণ পাইয়াছি, কিন্তু এমনটি আর কোথাও পাই নাই—সে অতি অপূর্ব্ব।

আমি বলিলাম,—"ভুল; তোমার ওটি ভুল। সৃষ্টির আদিকালে বাগানের ফুলও বনে ফুটিত, কিন্তু যে সকল ফুলকে শোভায় সৌরভে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানুষ বিবেচনা করিল, তাহাদিগকেই তুলিয়া আনিয়া বাগান সাজাইল। বাগানের ফুল অপেক্ষা বনফুলকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া আধুনিক কবিদিগের একটা ফ্যাসান হইয়াছে বটে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অবিচার।"

মুখনল বলিল,—"আমি ত আর কবি নহি, কোনও আধুনিক কাব্যও পাঠ করি নাই, তবে আমার সে গন্ধ এত ভাল লাগিয়াছিল কেন?"

আমি অধ্যাপকোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলাম,—"উহার ভিতর একটু মনস্তত্ত্বঘটিত জটিলতা আছে। যখন তুমি আতর, এসেন্স, বেলা, গোলাপের গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অনুভব করিয়াছিলে, তখন তুমি পরাধীন। এখন তুমি স্বাধীন; তখন ভালও মন্দ লাগিবার কথা, এখন মন্দও সুধাবৎ লাগিবে। সেই শ্লোকটা জান না?"

মুখনল বলিল,—"থাম, থাম, অত বিদ্যা আমার নাই। আচ্ছা না হয় তোমার থিওরিই মানিয়া লইলাম। শুনিয়া যাও, বৃথা তর্ক করিয়া রসভঙ্গ করিও না। হাঁ, কি বলিতেছিলাম, চারিদিক্ হইতে ফুলের গন্ধ আসিতেছিল, আকাশে দুইটি একটি করিয়া শত সহস্র নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠিল, জীবজন্তুর কোথাও আর কোনও চিহ্ন দেখা গেল না, কেবল অনেক রাত্রে একটা নেকড়ে বাঘ জল খাইতে আসিয়াছিল, তাহার পা লাগিয়া একটা প্রস্তর গড়াইয়া আমার অতি নিকট দিয়া নীচে গড়াইয়া গেল। রাত্রি গভীর হইল, আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রখণ্ড ভাসিয়া উঠিল, শিশির পড়িতে লাগিল,—সে কি স্নিগ্ধ! প্রাণমন শীতল হইল; ভাবিলাম, এই ভারতবর্ষের সাম্রাজ্ঞীর মুখমণ্ডল-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া, কত কোটি কোটি আমার স্বজাতীয়গণ বিচরণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়জন এমন করিয়া শিশির জলে স্নান করিতে পাইতেছে? সকলে আয়রণ চেষ্টে, না হয় কাঠের বাক্সে,—

না হয় চর্ম্মপেটকে বা রুমালে, নয় ত দেশী লোকের কাপড়ের কিম্বা চাদরের খুঁটে, ট্যাঁকে এবং অবস্থাবিশেষে কক্ষে, আবদ্ধ আছে, ভাল করিয়া নিশ্বাসও ফেলিতে পাইতেছে না। আমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে কোনও বৃহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই সুকৃতির বলে আমার এই সুখলাভ হইল। যদি কেহ লোকালয়ে পথে ঘাটে দৈবাৎ পড়িয়াও থাকে, তবে সেও আমার ন্যায় এমনি আরামে আছে বটে, কিন্তু সে তাহার কতক্ষণ? প্রভাত হইতে না হইতেই কোনও উষাচারী পথিক তাহাকে কবলিত করিয়া পকেটে ফেলিবে, আবার যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা! আর আমি দিনের পর-দিন, রাত্রির পর রাত্রি এই খানে পড়িয়া বিশুদ্ধতম বনবায়ু সেবন করিব, শিশিরে অঙ্গধাবন করিব, পাখীর গান শুনিয়া ঘুমাইয়া পড়িব, মুখে প্রভাতের রৌদ্র আসিয়া লাগিলে জাগিয়া উঠিব। আহা, যদি চলিতে পারিতাম, তবে ঐ স্ফটিকস্বচ্ছ ঝরণার জল একটু পান করিয়া আসিতাম, আর গোটাকত ঐ ফুল তুলিয়া আনিয়া বিছাইয়া শয়ন করিতাম, আর ঐ কি একটা লাল টুকটুকে ফল পাকিয়া রহিয়াছে, উহার রস দিয়া মুখটি একটু রাঙাইয়া লইতাম। বাসনার এইরূপ নিস্ফল আবেগ প্রতিনিয়ত আমার বক্ষঃপঞ্জরে আঘাত করিত, তথাপি বড় সুখে ছিলাম। কিন্তু প্রতিদিন আমার উপরে ধূলিস্তর জমা হইতে লাগিল। দেখিলাম, ক্রমেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছি। একটু দুঃখ হইল, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। মাসের পর মাস চলিয়া গেল, আমি সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া গেলাম। আর পাখীর গান শুনিতে পাই না, ফুলের গন্ধ পাই না, নবরৌদ্ররাগে রঞ্জিত প্রভাতগগনের শোভা দেখিতে পাই না, আমি যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিলাম। কতকাল পরে বলিতে পারি না, একদিন কিঞ্চিত শীতলতা অনুভব করিলাম। দেখিলাম, আমার দেহের আবরণমৃত্তিকা সিক্ত হইতেছে; ক্রমে তাহা গলিয়া ধৌত হইয়া গেল; আমার যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল; দেখিলাম, পাংশুবর্ণ মেঘে আকাশটা পূরিয়া গিয়াছে, মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে. আমার এমন সুখবোধ হইল যে, সে আর তুমি কি বুঝিবে? তোমরা বৃষ্টির সময় ছাতা, ওয়াটারপ্রুফ্ ব্যবহার কর, প্রকৃতিদত্ত একটা মহাসুখ হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া থাক, তোমাদের কথাই স্বতন্ত্র। আমি দেখিলাম, বনের সমস্ত গাছপালা উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, যেন কতদিনকার তৃষ্ণা আজ সাগ্রহে মিটাইতেছে। আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক দিতে লাগিল; সেই

এক চমৎকার ব্যাপার, একবার করিয়া বিদ্যুৎ চমকে, আর আমি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকি—যতক্ষণ মেঘ না ডাকিবে, ততক্ষণ নিশ্বাস ফেলিব না। সে একটা খেলামাত্র, তাহার কোনও বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ছিল না। ক্রমে জল ছাড়িয়া গেল; পূর্ব্বদিকে রামধনু দেখা দিল; ক্রমে সন্ধ্যায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। বর্ষাকাল, প্রায়ই এইরূপ জল হইত; ক্রমে বর্ষা ছাড়িয়া শরৎ আসিল, হেমন্ত আসিল, আমি আবার ঢাকা পড়িয়া দুরন্ত শীত হইতে আত্মরক্ষা করিলাম। আবার বর্ষাকালে সহসা একদিন বাহির হইলাম। এইরূপ প্রতিবৎসর হইতে লাগিল; ক-বৎসর কাটিয়া গেল, তাহার কোনও হিসাব রাখিতে পারি নাই; একদিন আমার অবস্থার আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিল।

ডিটেক্‌টিভ্-পুলিশের এক দেশীয় কর্ম্মচারী অশ্বারোহণে সেই বনে প্রবেশ করিয়া, যেখানে আমি পড়িয়াছিলাম তাহার অতি নিকট দিয়াই যাইতেছিলেন। যাই আমাকে দেখিতে পাওয়া, অমনি অশ্ব হইতে লম্ফ দান, এবং বাক্যব্যয়মাত্র না করিয়া আমাকে পকেটে গ্রহণ।

তুমি আমার জীবনচরিত সংক্ষেপে বলিতে বলিয়াছ; সুতরাং কেমন করিয়া আমি পুলিস্‌কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে পোষ্ট আফিসে, এবং তৎপর দিন সেভিংস্‌ব্যাঙ্কের টাকার সহিত স্কুলের হেডমাষ্টারের নিকট ও ক্রমে ক্রমে ফল বিক্রেতা, সাহেবের খানসামা, মৎস্য-বিক্রেতা, বস্ত্র বিক্রেতা, আয়কর কর্ম্মচারী, গভর্ণমেণ্ট ট্রেঝরি, এবং তথা হইতে বহুলোকের হস্ত অতিক্রম করিয়া মিরজাপুরের এক শিবমন্দিরের পূজারীর হস্তে আসিয়া পড়িলাম, তাহার সবিস্তার বর্ণনায় আর প্রয়োজন নাই। পূজারী মহাশয় আমাকে ট্যাঁকে গুঁজিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতেছিলেন, কম্পিত স্বরে উচ্চারণদুষ্ট সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন এবং বিরলকেশ সুমসৃণ মস্তক খানিতে সঘন করসঞ্চালন করিতে করিতে ডুবের পর ডুব দিতেছিলেন, হেনকালে তাঁহার নীবিবন্ধ শিথিল হইল, আমি তাঁহার ট্যাঁকচ্যুত হইয়া অতি কোমল মৃত্তিকা শয়ন লাভ করিলাম। স্নানান্তে তীরে উঠিলে তিনি জানিতে পারিলেন আমি হারাইয়াছি। আবার জলে নামিয়া দুই দণ্ড ধরিয়া ডুব পাড়িয়া পাড়িয়া অনেক ব্যর্থ অন্বেষণ করিলেন; আমার আশে পাশে তাঁহার হস্ত আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু আমি যেখানকার সেই খানেই রহিলাম। স্রোতে স্রোতে চুল পরিমাণ সরিয়া সরিয়া সমস্ত দিবা-

রাত্রে যেখানে পড়িয়াছিলাম সেখান হইতে দুই হস্ত পরিমিত দূরে গিয়া পড়িলাম। সেখানে মগ্ন জল, সুতরাং পরদিন স্নানের বেলা কেহই সেখানে আসিল না। আমি জলের ভিতর দিয়া জলতলবিহারী প্রাণীদের আহার ক্রীড়া যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত উদ্যম দেখিতে লাগিলাম। সে রাজ্য সম্পূর্ণ অরাজক। সবল দুর্ব্বলের প্রতি অবাধে নির্ভয়ে অত্যাচার করে; কেহ তাহার প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হয় না। কুম্ভীর, রাজার মত গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; আর করিবেনই বা কাহার সঙ্গে? কেহ তাঁহার নিকট ঘেঁসিতেই সাহস করে না। মৎস্যগণ খুব আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে। চুনা পুঁটিরা কিছু চপল প্রকৃতির, প্রপিতামহ রোহিতের স্কন্ধে পুচ্ছে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে। কর্কটকুল আপন আপন বিবরে বসিয়া দাড়া নাড়িতেছে। এইরূপ জল-বাসে আমার অনেক মাস অতিবাহিত হইল। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে গঙ্গা আপনার জল সরাইয়া সরাইয়া এক দিন আমাকে স্বীয় কুক্ষি হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু আমার উপর কিয়দংশ কর্দ্দমের আচ্ছাদন রাখিয়া গেলেন, বোধ হয় আশা ছিল, আবার শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সময় ভাল হইলে আমাকে অধিকার করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। একটী প্রৌঢ়াদাসী তীরে বসিয়া কটাহ মাজিতে মাজিতে অঙ্গুলি দিয়া মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতে-ছিল, সে আমাকে দৈবধন বলিয়া ললাটে স্পর্শ করিয়া উত্তমরূপ ধৌত করণনান্তর অঞ্চলবদ্ধ করিল।

অনেক রাত্রি হইয়াছে, তোমাকে আবার প্রভাতে গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে যাইতে হইবে, সুতরাং গল্প শেষ করি। সেই দাসীর হস্ত হইতে ক্রমে আমি বহুলোকের হস্ত অতিক্রম করিয়া ভিজিট্‌ স্বরূপ কেমন করিয়া তোমার হাতে আসিয়া পড়িলাম, সে কথায় আর কায নাই; বিশেষতঃ, উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমন কিছুই ঘটে নাই। একবার কেবল এক দুই বৎসরের শিশু কর্ত্তৃক তাহার মাতার অজ্ঞাতে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিলক্ষণ বিপদে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু হায় হায়, তাহার পর যে বিপদ ঘটিয়াছে, তুলনা করিলে ভাতের হাঁড়ির সেই উত্তাপকে শীতলতাই বলিতে হয়। তুমি যখন গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা নূতন মুখনল গড়াইবার জন্ম স্বর্ণকার ডাকিয়া খুকীর মলের ভগ্নাংশের সহিত আমাকে অর্পণ করিলে, তখনি আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল! তাহার পর সেই

সদ্যরচিত মৃৎপাত্র হাফরে রাখিয়া বাঁশের চোঙায় ফুৎকার দিতে দিতে, যখন আমার সাক্ষাৎ যমরূপী কৈলেস সেকরা আমাকে তাহাতে ফেলিল, তখন উঃ—

আমি বলিলাম, ভাই আর কায নাই; কিন্তু আমাকে অপরাধী কর কেন? আমার দোষ কি?

মুখনল বলিল, তোমার আর দোষ কি? অদৃষ্ট ভিন্ন পথ নাই। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। আমার জীবনী জনসমাজে প্রচার করিয়া তোমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ো।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গালা ভাষা।*

আজ কাল একটা সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার স্থান হওয়া উচিত এই বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আন্দোলনকারীরা অবশ্যই বাঙ্গালার কথা আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের আন্দোলনের ফল অন্যান্য দেশীয় ভাষার সম্বন্ধেও ফলিবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কোন দেশীয় চলিত ভাষার স্থান নাই বলিলেই হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত, পারস্য, আরব্য, প্রভৃতি ভাষার স্থানে বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি লওয়া চলে বটে, কিন্তু যাহারা ভারতীয় কোন চলিত ভাষা লয় তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দ্ধতন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। এফ-এ, কিম্বা বি-এ, পরীক্ষায় কোন চলিত দেশীয় ভাষার স্থান নাই। কাজে কাজেই যে প্রবেশিকায় দ্বিতীয় ভাষার স্থলে বাঙ্গালা কি হিন্দী লইল তার পক্ষে এফ-এ পরীক্ষার দ্বার রুদ্ধ বলিলেই হয়। আজ কাল আমরা কেহ কেহ বুঝিতেছি যে এরূপ হওয়া উচিত নয়। দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার স্থান না থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। যে শিক্ষা দেশীয় ভাষা ও ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহা চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবেক। আমরা ইংরাজীর যতই চর্চ্চা করি না কেন, কখনই সাহেব হইতে পারিব না; এবং যদিও হইতে পারি, সাহেব হওয়া আমাদের পক্ষে ভাল কি না; সমাজের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত দল যদি সাহেব হইয়া যায়, তাহা

---

* সম্প্রতি এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালাভাষার যে পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। সম্পাদক।

হইলে নিম্নস্তরের লোকদিগের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, এবং উর্দ্ধস্তরের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, এ সব ভাবিবার কথা। যে শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান নাই, তাহা অঙ্গহীন, যে সমাজে মাতৃভাষার আদর নাই সে সমাজের উন্নতি অসম্ভব। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, বিলাতের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির স্থান নাই, তাহাতে বিলাতের কি ক্ষতি হইয়াছে? ক্ষতি হইয়াছে কি না, সাহেবরাই বলিতে পারেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে বিলাতের ও বাঙ্গালার অবস্থা এক নয়। এক জন সাহেবের পক্ষে ইংরাজি চর্চ্চার যত সুবিধা এক জন বাঙ্গালীর পক্ষে কি বাঙ্গালা চর্চ্চার তত সুবিধা? বিলাতে সাধারণতঃ শিক্ষা প্রদানের ভাষা ইংরাজি, এবং সেখানে জাতীয় সমস্ত কার্য্য ইংরাজিতে সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে কি তাই? তদ্ভিন্ন বিলাতের যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষার স্থান নাই সেই স্থলে ইংরাজি প্রচলনের জন্য যে কত চেষ্টা হইতেছে, এবং চেষ্টা যে কতক অংশে ফলবতী হইয়াছে, তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। বিলাতে দেশীয় ভাষার বহুল প্রচলন ও চর্চ্চা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে উহার প্রচলনের চেষ্টা আমাদিগকে এক মহতী শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

বাঙ্গালা পক্ষপাতীদের কেহ কেহ আর একটী জিনিস চান। তাঁহারা বলেন, "ইংরাজি ছাড়া প্রবেশিকার অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা বাঙ্গালায় হইলে ভাল হয়।" ভাল যে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছোট ছোট বালকদিগকে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণী হইতেই ইংরাজিতে শিখিতে হয়। এই সব বিদেশীয় ভাষায় শিখা সুশিক্ষার যে কত দূর অন্তরায়, যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন। মনে করুন এক জন ১০।১১ বর্ষীয় বালককে একটী ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষিতে হইবেক। অঙ্কটী অবশ্য ইংরাজিতে। অঙ্ক কষিবার পূর্ব্বে প্রথম তাহাকে উহার অর্থ বুঝিতে হইবেক। অনেক সময় দেখা যায় বালকেরা অর্থ বুঝিতে না পারায় অঙ্ক কষিতে পারে না। বাঙ্গালায় অর্থ বুঝাইয়া দেও অমনি অনেকে অঙ্কটী কষিতে পারিল। পাটীগণিত সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, বীজগণিত, জ্যামিতি ও ভূগোল প্রভৃতির সম্বন্ধেও তাহা খাটে। ভাষার ব্যাঘাত না থাকিলে অনেকেই এ সব বিষয় সহজে শিক্ষা করিতে পারে, এবং ভাষার ব্যাঘাত আছে বলিয়া অধিকাংশ বালকদের এ সব বিষয়ে জ্ঞান অতি অল্পই জন্মায়। শিক্ষক মাত্রেই জানেন,

ছোট ছোট ছেলেরা অনেক স্থলে অর্থগ্রহণ না করিয়া ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি মুখস্থ করে মাত্র। প্রবেশিকার কথা দূরে থাকুক, অনেক সময় দেখা যায় যে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি ইংরাজিতে শিখিতে হয় বলিয়া এফ-এ ও বি-এ শ্রেণীর ছাত্রদেরও অসুবিধা হয়। অনেকে বলেন এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মৌলিকতা বড় কম। উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে প্রথমতঃ—মৌলিকতা জগতে নিতান্ত সুলভ নয়; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের শিক্ষা হয় অতি সামান্য, এরূপ সামান্য শিক্ষায় মৌলিকতা আশা করা দুরাশা মাত্র; তৃতীয়তঃ,ইংরাজীর উত্তাপে যাহা কিছু মৌলিকতা থাকে তাহা শুকাইয়া যায়। ইংরাজীস্কুলে প্রবেশ করা হইতে এম্,এ,পরীক্ষা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রই ইংরাজী লইয়া ব্যস্ত, তাহাকে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা করিতে হয়, অঙ্ক কষিতে হয় ইংরাজীতে, ইতিহাস শিক্ষা করিতে হয় ইংরাজীতে, বিজ্ঞানাদি অনুশীলন করিতে হয় ইংরাজীতে, চিন্তা করিতে শিখিতে হয় ইংরাজীতে, মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অভ্যাস করিতে হয় ইংরাজিতে। ইহার উপর যদি ইংরাজীতে দোষ হইল, তাড়না ও সাহেবদের বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। একজন লোকের পায়ে বেড়ী দিয়া তাহাকে একটা ঘোড়ার সঙ্গে ছুটীতে বলা যতদূর যুক্তি-সঙ্গত, আমাদের কাছে অধিক পরিমাণে মৌলিকতা প্রত্যাশা করা ততদূর যুক্তিসঙ্গত। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন অনেক টোলের ছাত্রের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধিক শিক্ষা হইত না, সেইরূপ আজ কাল আমাদের অনেকেরই কিঞ্চিত ইংরাজী ছাড়া আর কিছুই শিক্ষা হইতেছে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি জ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইলে আমাদের কিছুই হইতেছে না বলিতে হইবেক। সকলকেই ইংরাজী লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, এবং ইংরাজীর প্রতিই বেশী মনোযোগ দিতে হয়; অন্য কিছু শিক্ষা আর অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই সব দেখিয়া শুনিয়াই অনেকে বাঙ্গালার দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা প্রবেশিকায় অঙ্ক, ইতিহাস প্রভৃতির পরীক্ষা গ্রহণ বাঙ্গালায় দেখিতে চান, তাঁহাদের প্রথম উদ্দেশ্য কোমলমতি বালকদিগের শিক্ষার ভার কমান; দ্বিতীয়, নামে মাত্র না হইয়া, যাহাতে যথার্থই তাহাদের কিছু শিক্ষা হয়, তাহার উপায় করা। উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ এবং সাধিত হইলে যে বহুল মঙ্গলোৎপাদক হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা পক্ষপাতীদের দুইটী অভিলাষ,—(১) বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার স্থান হওয়া; (২) প্রবেশিকায় গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের

পরীক্ষা বাঙ্গালায় গৃহীত হওয়া। এখন দেখা যাউক বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হওয়া কতদূর সম্ভব। আমাদের বিবেচনায় সকল দিক দেখিতে গেলে, এখন তাঁহাদের অভিলাষ সম্পন্ন হওয়া একরূপ অসম্ভব। কেন, তাহা নীচে দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বাঙ্গালা ছাড়া আরও অনেকগুলি ভারতীয় চলিত ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার তৃতীয় দিনের অপরাহ্নিক প্রশ্ন পত্রিকায় দেশায় ছাত্রদের নিমিত্ত, কোন দেশায় চলিত ভাষার অনুবাদের জন্য, যে ইংরাজি রচনা থাকে; তাহা নিম্নলিখিত ভাষা সকলে অনুবাদিত হইতে পারে; বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া, মারহাট্টী, ব্রাহ্ম, উর্দ্দু, পার্ব্বতীয়, আসামী, তেলুগু, গুজরাটী, খাসিয়া ও তামিল। এই তালিকায় অন্য ভাষা যোগ করিবার ক্ষমতা সিণ্ডিকেট সভার আছে। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দ্ধতন পরীক্ষায় বাঙ্গালাকে স্থান দিতে হয়, তাহা হইলে অপর ভাষা সকলকে স্থান কেন না দেওয়া হইবেক, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। অতএব ধরিয়া লইলাম উহাদিগকেও স্থান দেওয়া হইবে। এখন কথা হইতেছে দেশীয় ভাষা সমূহের সাহিত্যের কি এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে তাহাদিগের হইতে এফ, এ, ও বি,এ'র পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করিতে কোন অসুবিধা হইবেক না? বাঙ্গালায় দুই চারি খানি ভাল কাব্য ও উপন্যাস এবং দুই একখানি ভাল প্রবন্ধপুস্তক হইয়াছে ঠিক। ধরিয়া লইলাম হিন্দি, উর্দ্দু, গুজরাটী প্রভৃতি সাহিত্যের অবস্থা বাঙ্গালার সমান উন্নত না হউক অনেকটা উন্নত হইয়াছে। কিন্তু উড়িয়া, ব্রাহ্ম, পার্ব্বতীয়, আসামী এবং খাসিয়া ভাষার অবস্থা যে কত হীন তাহা বুঝাইবার আবশ্যক আছে বলিয়া বোধ হয় না। এখন যদি বাঙ্গালার ন্যায় উন্নত ভাষাকে স্থান দিতে হয়; অন্য ভাষা সকলের সম্বন্ধে কি করিতে হইবেক? অন্যভাষীয় পরীক্ষার্থীদিগকে অবশ্য জোর করিয়া বাঙ্গালা লওয়ান কাহারও মত হইবেক না। তাহা অত্যন্ত অন্যায় হইবেক, ও তাহাদের উপর এরূপ গুরুভার চাপাইতে বোধ হয় সেনেট সভা কখনই রাজী হইবেন না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই অধিক। অন্য পরীক্ষার্থীর জন্য তাহাদিগকে মাতৃভাষা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা অনুচিত। অন্যের জন্য তাহাদের শিক্ষা অঙ্গহীন হইবেক কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালী ছাত্র সংখ্যা

যে ঢের বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কি অল্পভাষী পরীক্ষার্থীদিগকে ছাঁটিয়া ফেলিতে পারেন? তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও তাহাদের উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্য। উপরে বলিয়াছি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলার বিশ্ববিদ্যালয় নয়।

আর একটুকু কথা আছে। ধরিয়া লইলাম যে, যে সকল দেশীয় চলিত ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকায় স্থান দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির সাহিত্যের অবস্থা এরূপ উন্নত হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্য হইতে এফ, এ, ও বি, এ'র পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করিতে কোন অসুবিধা হইবেক না। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে উর্দ্ধতন পরীক্ষায় দেশীয় চলিত ভাষা কি সংস্কৃত বা অন্যান্য প্রাচীন ভাষার পরিবর্ত্তে লওয়া চলিবে, না, উহারা শিক্ষা ও পরীক্ষার এক নূতন বিষয় হইবেক? সংস্কৃতাদির পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা লওয়ার পক্ষে অনেকের আপত্তি হইতে পারে। অন্যান্য ভাষার কথা ছাড়িয়া দিয়া সংস্কৃতের কথাই ধরা যাউক। যাহা ইহার পক্ষে খাটে তাহা অন্য প্রাচীন ভাষার পক্ষেও অনেক পরিমাণে খাটে। সংস্কৃত ভারতীয় অনেক চলিত ভাষার প্রসূ। সংস্কৃত না জানিলে অনেক চলিত ভাষায় ভালরূপ অধিকার জন্মে না! সংস্কৃত দেশের অতীতের ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষরূপে জড়িত, হিন্দুদের শাস্ত্রাদি সব সংস্কৃতে, অতএব ইহার চর্চ্চা কমিয়া যাওয়া বোধ হয় উচিত নয়। একেত ইহার চর্চ্চা কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য পূর্ব্বে ইহা যে ভাবে চর্চ্চিত হইত, এখন আর সে ভাবে চর্চ্চিত হইতে পারে না। এখন শিক্ষার বিষয় এত হইয়াছে যে, সংস্কৃতের যথার্থ গুরুত্ব নাই কমুক, ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার চর্চ্চা যে দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যাইবেক, তাহা বোধ হয় কোন দেশহিতৈষীর ইচ্ছা নয়। দেশের কতক লোকের ইহা ভাল করিয়া শিক্ষা করা উচিত, এবং সকল শিক্ষিত লোকের ইহার সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা কর্ত্তব্য। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দেশের অতীত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া ভাল নয়। ইহা ছাড়া আর একটু কথা আছে। সংস্কৃত পৃথিবীর একটী শ্রেষ্ঠ ও কঠিনতম ভাষা। ইহার আলোচনা বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনার এক প্রকৃষ্ট উপায়, এবং বুদ্ধি পরিচালনা অভ্যাস শিক্ষার এক প্রধান উদ্দেশ্য। যে কারণে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গ্রীক লাটীনের চর্চ্চা হইয়া থাকে, সেই কারণেই ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সংস্কৃতাদির

চর্চ্চা হওয়া আবশ্যক। একটী উৎকৃষ্ট ও কঠিন প্রাচীন ভাষা চর্চ্চা মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ও কোমল মনোবৃত্তি সমূহের পরিচালনার এক বিশেষ সহায়। সংস্কৃতাদি কঠিন বলিয়াই অনেকে ভয় করেন যে যদি ইহাদের পরিবর্ত্তে কোন চলিত ভাষা লইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে অনেক ছাত্রই চলিত ভাষা লইবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাচীন ভাষা সকল উঠিয়া যাইবে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, যদি চলিত ভাষা প্রচলন হেতু সংস্কৃতাদি উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে জোর করিয়া উহাদের রাখার দরকার কি? যদি শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতাদি শিখিতে না চায়, তবে কেন তাহাদিগকে ঐ সব ভাষা শিখিতে বাধ্য কর? উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে, ছাত্রদিগের মত লইয়া শিক্ষার বন্দোবস্তের সময় আজও আইসে নাই। সমাজের নিয়মই হইতেছে জোর করিয়া অনেককে কাজ করান। শিক্ষামাত্রেই জোর। "গোপালের" ন্যায় "সুবোধ" ছেলে ছাড়া আর কেহই ইচ্ছা করিয়া লেখাপড়া শিখিতে চায় না। অতএব জোর করিয়া কিঞ্চিৎ সংস্কৃত পড়াইলে ছাত্রসম্প্রদায়ের স্বাধীনতায় একটু হাত দেওয়া হয় বটে, কিন্তু বোধ হয় তাহাতে তাহাদের পরকাল একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। অনেকে বলিবেন যে দেশীয় চলিত ভাষা শিক্ষার ও পরীক্ষার নূতন বিষয় হউক, প্রাচীন ভাষা শিক্ষা যে একেবারে উঠিয়া যাইবেক তাহা হইতে পারে না। *ছাত্রেরা ইংরাজী ও একটী প্রাচীন ভাষার সঙ্গে তাহাদের মাতৃভাষা শিক্ষা করুক। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের অনেক স্থলে ছাত্রদিগকে দুইটী প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, এবং সে দুইটীই কঠিন ভাষা। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে মাতৃভাষা ছাড়া আর দুইটী ভাষার পরীক্ষা দিতে হয়। তবে আমাদের দেশের ছাত্রেরা ইংরাজী ও সংস্কৃতাদি ছাড়া আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে অপারগ হইবে কেন? বুদ্ধিতে বাঙ্গালী বালক ও যুবকেরা অন্য দেশীয় বালক ও যুবকদিগের অপেক্ষা হীন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা অন্যে পারে, তাহা তাহারা পারিবে না কেন? প্রস্তাবটী নিতান্ত মন্দ বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু ইহার বিপক্ষেও এক গুরুতর আপত্তি উঠিয়াছে। অনেক বিজ্ঞলোকে বলিতেছেন ইংরাজীতে শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয় শিখিতে হয় বলিয়া ছাত্রদিগের ভার বড় গুরু হইয়া পড়িয়াছে, ইহার উপর ভার বাড়াইলে তাহাদিগকে প্রাণে মারা হইবেক। এখনই এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে ছেলেরা খেলাইবার

সময় পায় না। আপত্তি যে গুরুতর তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। যাঁহারা শিক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে ইংরাজী অতি কঠিন বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রতি যে কত অধিক সময় দিতে হয়, তাহা বলা যায় না। ইহার জন্যই ছাত্রদিগকে অনেক আবশ্যকীয় নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ব শিক্ষা দিবার সময় পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে, নূতন কিছু বলার আবশ্যক দেখি না। এই মাত্র বলিতে চাই যে আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহে চলিত ভাষাকে স্থান দিবার সম্বন্ধে এই দ্বিতীয় আপত্তি সামান্য বলিয়া বোধ হয় না।

এখন বাঙ্গালা পক্ষপাতীদের দ্বিতীয় অভিলাষের প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ দেওয়া যাউক। তাহা এই, প্রবেশিকায় গণিত ইতিহাস ভূগোল ও বিজ্ঞানের পরীক্ষা বাঙ্গালায় গৃহীত হউক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই অভিলাষের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে বড় ভাল হয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস বর্ত্তমান অবস্থায় অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব। কেন, তাহা দেখাইবার প্রয়াস করা যাইতেছে। নিম্নে যে তালিকাটী দেওয়া গেল তাহা হইতে ১৮৯২, ১৮৯৩ এবং ১৮৯৪ সালে প্রবেশিকায় কত পরীক্ষার্থী পরীক্ষার প্রথম দিবসের অপরাহ্নের প্রশ্ন পত্রিকা সম্বন্ধে কোন কোন চলিত ভাষা লইয়াছিল, ইহা বুঝা যাইবে।

সাল	১৮৯২	১৮৯৩	১৮৯৪
মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	৫২০৮	৫৭১৯	৫৩৯২
বাঙ্গালা	৩৬১১	৪০০৯	৩৭৬৬
হিন্দি	৩৬২	৩৭৪	৩১১
উড়িয়া	৮২	৮০	৯২
উর্দ্দু	৫৭৭	৫২৮	৫৩৩
মারহাট্টি	১৯৩	২৪২	২২২
ব্রাহ্ম	৮২	৭৭	১০৭
পার্ব্বতীয়	২	৩	৩
আসামী	২৯	৪৯	৩৬
তেলুগু	১	৯	৪
গুজরাটী	৪	৪	৫
খাসিয়া	৬	৬	৫
তামিল	১৪	২৩	৩৯
আর্ম্মানী	—	৪	—
ইংরাজী	২৪৫	৩১১	২৫৯

১৮৯২ সালে ৫২০৮ জন পরিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৬১১ বাঙ্গালা, ও ১৫৯৭ জন অন্যান্য ভাষা ১৮৯২ সালে ৫৭১৯ জনের মধ্যে ৪০০৯ বাঙ্গালা, ও ১৭১০ জন অন্যান্য ভাষা, এবং ১৮৯৪ সালে ৫৩৯২ জনের মধ্যে ৩৭৬৬ জন বাঙ্গালা, ও ১৬২৬ জন অন্যান্য ভাষা, লইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বাঙ্গালী ছাত্র সংখ্যা বেশী হইলেও অন্যান্য ছাত্রদিগকে ছাঁটিয়া ফেলা যায় না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বাঙ্গালা ভাষার প্রতি কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে পারেন না। তাহা হইলে তাঁহাকে পক্ষপাত-দোষ দূষিত হইতে হইবেক। এখন দেখা যাউক গণিত ইতিহাসাদির পরীক্ষা দেশীয় চলিত ভাষায় গৃহীত হইলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে। তালিকা হইতে যদি পার্ব্বতীয়, তেলুগু প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র ভাষাগুলি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও ৮।৯টী বৃহৎ ভাষা বর্ত্তমান থাকিবে। পরীক্ষা-কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইবেক? এখন প্রত্যেক প্রশ্ন পত্রিকার জন্য ৭।৮ জন পরীক্ষক নিযুক্ত হন, এবং তাঁহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য, ও যতদূর সম্ভব তাঁহাদিগকে একভাবে চালাইবার জন্য, প্রত্যেক বিষয়ে একজন করিয়া প্রধান পরীক্ষক থাকেন। নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে কি হইবে? ধরুন ইতিহাস। আজ কাল পরীক্ষা ইংরাজীতে গৃহীত হয়, প্রত্যেক বৎসর ইহার জন্য ৮ জন পরীক্ষক ও ইতিহাস ভূগোলাদির জন্য একজন প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হন। যদি প্রধান পরীক্ষক কার্য্যক্ষম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হন তাহা হইলে তিনি তাঁহার নিম্নস্থ ইতিহাসের পরীক্ষকদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন, এবং নিদান কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদিগকে একভাবে চালাইতে পারেন। যদি ইংরাজীতে না হইয়া দেশীয় চলিত ভাষায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার জন্য নিদান ৫ জন, ও হিন্দি, উর্দ্দু, মারহাট্টি, উড়িয়া, ব্রাহ্ম, আসামী, তামিল, ও ইংরাজীর জন্য এক একজন পরীক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবেক। ক্ষুদ্র ভাষাগুলি ছাড়িয়া দিলাম। পরীক্ষক ত নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু প্রধান পরীক্ষকের লোক কোথায় মিলিবে? বপ্‌ ও ম্যাক্সমুলারের অপেক্ষা কম-দরের লোক এ কঠিন কার্য্য সম্পাদন করিতে অক্ষম; এবং সাহেব বা দেশীয় লোকদের মধ্যে তেমন দরের লোক কয়জন আছেন? এখনই পরীক্ষার্থীর এবং সেই জন্য পরীক্ষকের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে, যে পরীক্ষার সমতা রক্ষা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেই হয়। প্রশ্ন

বিভ্রাট ত লাগিয়াই আছে, তাহার উপর ভাষা বিভ্রাট উপস্থিত হইলেই সোনায় সোহাগা হইবে। ইতিহাসের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, গণিত ভূগোলাদির প্রতিও তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রযুজ্য। আমাদের বোধ হয়, যদি ইতিহাসাদির পরীক্ষা দেশীয় চলিত ভাষায় লওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হয়, তাহা হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

ইহা ছাড়া আর একটী কথা আছে। যদি প্রবেশিকায় গণিত ভূগোলাদি দেশীয় ভাষায় লিখান হয়, উর্দ্ধতন পরীক্ষার সময় কি হইবে? হয় ইংরাজী ভাষা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সমস্ত পরীক্ষা দেশীয় ভাষায় গ্রহণ করিতে হইবে, নয় বালকদিগকে গণিত প্রভৃতির পরিভাষাদি আবার নূতন করিয়া ইংরাজীতে শিখিতে হইবে। বাঙ্গালা পক্ষপাতীরা আজও উর্দ্ধ পরীক্ষা সকল দেশীয় ভাষায় গৃহীত হইবার কথা তুলেন নাই। এখনও সকল দেশীয় ভাষাতেই গণিত, বিজ্ঞান, ও দর্শনাদির পুস্তকের সমূহ অভাব। ধরিয়া লইলাম, আবশ্যক হইলেই উচ্চ দরের পুস্তক লিখিত হইবেক। কিন্তু উপরে প্রবেশিকা সম্বন্ধে যে আপত্তি করা গিয়াছে, অন্যান্য পরীক্ষার সম্বন্ধেও সে আপত্তি সম্পূর্ণরূপে খাটিবে। যাহা হউক যখন প্রশ্ন এখনও উঠে নাই, ইহার বিশেষ আলোচনার দরকার নাই। ধরিয়া লইলাম যেন প্রবেশিকায়ই দেশীয় ভাষার প্রচলন হইল। তাহা হইলে এফ,এ, পরীক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে গণিত প্রভৃতির পরিভাষাদি আবার নূতন করিয়া ইংরাজীতে শিখিতে হইবে। ছাত্রেরা যত উপরে উঠে, শিক্ষণীয় বিষয় এবং তাহাদের উপরে চাপও তত পড়ে। এফ, এ, শ্রেণীতে কতকগুলি বিষয় যদি তাহাদিগকে নূতন করিয়া ইংরাজীতে শিখিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের কষ্ট ও অসুবিধা কি পরিমাণে বাড়িবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

এখানে একটী কথা স্মরণ করাইয়া দেই। যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভাষা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা দেশীয় চলিত ভাষায় দেওয়া চলিবে, এরূপ নিয়ম হয়। এ নিয়মানুযায়ী কতদিন কাজ হইয়াছিল, বলিতে পারিলাম না, কিন্তু কিছুদিন পরে এ নিয়ম রদ হইয়া যায়। নিশ্চয়ই নিয়মের অসুবিধা উপলব্ধি করিয়াই ইহার রদ হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অতীতে যাহা হয় নাই, তাহা যে বর্ত্তমানে হইবে না, বা হইতে পারে না, ইহা কেমন

কথা ; আমরা তাঁহাদের হইতে ভিন্ন মত নই। অতীতের দোহাই দিয়া বর্ত্তমান উন্নতির পথ বন্ধ করা, আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এইমাত্র বলি যে অতীতের বহুদর্শিতা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রচলিত ও পরে রদ্ হয়, তাহা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অনেক বিভিন্ন। তখন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঢের কম ছিল, এবং পরীক্ষা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় নাই। পূর্ব্বে যে নিয়ম অচলনীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, এখন যে তাহা সহজে চলনীয় হইবে, এরূপ মনে করা ভুল।

এ পর্য্যন্ত ৩টী বিষয় বুঝাইবার প্রয়াস করা গিয়াছে। (১) ইংরাজীতে অনেক বিষয় লিখিতে হয় বলিয়া আমাদের বড় অসুবিধা। (২) বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পরীক্ষা সকলে দেশীয় চলিত ভাষার স্থান দিবার সময় আসিয়াছে কি না সন্দেহ। (৩) বর্ত্তমান অবস্থায় প্রবেশিকার ভাষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা দেশীয় চলিত ভাষায় গ্রহণ করা অসম্ভব। মোটের উপর বলিতে গেলে আমাদের শিক্ষাবিভ্রাট উপস্থিত। এ বিভ্রাট নিবারণের কি কোন উপায় আছে? নিম্ন হইতে দেখা যাউক।

প্রবেশিকায় দেশীয় ভাষা। উপরে দেখাইয়াছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রবেশিকায় গণিত, ইতিহাসাদির পরীক্ষা দেশীয় ভাষায় গ্রহণ একরূপ অসম্ভব, এবং সম্ভব হইলেও যতদিন উর্দ্ধতন পরীক্ষা ইংরাজীতে গৃহীত হইবে ততদিন অত্যন্ত অসুবিধাজনক। অসুবিধার কথা ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাউক কি করিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় ইহার একমাত্র উপায় আছে। উপায়টী আপা-ততঃ আকাশ-কুসুমবৎ মনে হইতে পারে, কিন্তু আজি যাহা অসম্ভব, কালি তাহা সম্ভব হইতে পারে বলিয়াই আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব। উপায় হইতেছে প্রবেশিকা পরীক্ষার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংশ্রব ত্যাগ এবং ইহাকে প্রাদেশিক বা বিভাগীয় পরীক্ষায় পরিণত করণ। প্রত্যেক প্রদেশ বা বিভাগে এখন দুই একটা করিয়া কলেজ আছে। যেখানে একটি কলেজ আছে সেখানে সেই কলেজ হইতে একটী সমিতি গঠিত হউক। যে বিভাগে একাধিক কলেজ আছে তাহাতে সকল কলেজ লইয়া এক যুক্ত সমিতি হউক। সমিতিতে বাহিরের ২।৪ জন শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির স্থান থাকুক। প্রত্যেক প্রাদেশিক বা বিভাগীয় সমিতির উপর সেই প্রদেশের বা বিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষা

গ্রহণের ভার অর্পিত হউক। এরূপ হইলে যেখানে যে ভাষা প্রবল সেখানকার প্রবেশিকা সেই ভাষায় গৃহীত হইতে কোন অসুবিধা হইবেক না। বিহারের ন্যায় প্রদেশে হিন্দি ও উর্দ্দুর ন্যায় একাধিক ভাষা প্রবল হইতে পারে। এরূপ স্থলে দুই ভাষার পরীক্ষা গ্রহণের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। এমনও হইতে পারে যে কোন এক ভাষা-বিশেষ-প্রধান বিভাগে কতকগুলি অন্যভাষী পরীক্ষার্থী থাকিবে। এরূপ স্থলে ঐ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা তাহাদের ভাষা যে স্থানে প্রবল সেই বিভাগের ছাত্রদের সঙ্গে হইতে পারে। তাহাদের যে সেই বিভাগে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হইবে ইহা আমরা বলিতেছি না। নিজেদের বিভাগেই থাকিয়া বিভাগান্তরের প্রশ্ন পত্রিকা দ্বারা তাহারা পরীক্ষিত হইতে পারিবে। কেহ কেহ বলিবেন এরূপ হইলে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষার মধ্যে বড় তারতম্য হইয়া পড়িবে। ইহা কিন্তু কতক পরিমাণে বন্ধ করিবার উপায় আছে। এই সমস্ত পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে গৃহীত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজী সংস্কৃতাদি সাধারণ বিষয়ের পাঠ্য নির্ব্বাচন করিবেন এবং অন্যান্য বিষয়ে কতদূর জ্ঞান আবশ্যক তাহা স্থির করিয়া দিবেন। সকল বিষয়ের প্রশ্ন পত্রিকাও এক হইবেক। ইহাতে পরীক্ষার তারতম্য অনেকটা কমিবার সম্ভাবনা। বাকী যেটুকু থাকিবে তাহার জন্য বিশেষ কিছু আইসে যাইবে না। এখন যেমন শিক্ষাবিভাগের কতকগুলি পরীক্ষা কেবল বিভাগীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, প্রবেশিকাও সেইরূপ হইবে। এক বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রেরা অবশ্য অন্য বিভাগের কলেজে পড়িতে পারিবে, এবং সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্, এ, পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে সমান অধিকারী হইবে। আমাদের প্রস্তাব কতদূর যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভাব্য তাহা নির্ণয় করিবার ভার পাঠকদের উপর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় দেশীয় ভাষার স্থান। উপরে দেখাইয়াছি বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা হইতে পারে না। যদি কখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গ্রাহ্য অন্যান্য দেশীয় ভাষার অবস্থা বাঙ্গালার ন্যায় কতকটা উন্নত হয়, তাহা হইলে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। বাঙ্গালার অবস্থা যে বিশেষ উন্নত, তাহা আমাদের মনে হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রগুলির কথা ছাড়িয়া দিয়াও অপর ভাষা সকলের অবস্থা বাঙ্গালার ন্যায় হওয়ারও ঢের দেরী। বাঙ্গালার স্থান হইবার আর এক উপায় আছে। যদি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

ক্রমে এত হইয়া পড়ে যে বিশ্ববিদ্যালয় আর সামলাইয়া উঠিতে পারিবেন না, এবং বাঙ্গালী ছাত্রদের পরীক্ষাগ্রহণই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট কাজ হইয়া দাঁড়াইবে, তখন পরীক্ষাসমূহে বাঙ্গলার স্থান হইবার প্রধান অন্তরায় বিদূরিত হইবে। অর্থাৎ যদি কখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, তখন পরীক্ষায় বাঙ্গালার স্থান অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। এ অবস্থাও যে খুব শীঘ্র হইবে, এমন বোধ হয় না। যাহাতে ইহা শীঘ্র শীঘ্র আসে, বাঙ্গালাপক্ষপাতীদের তাহার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

যখন আমাদের নিজেদের একটী বিশ্ববিদ্যালয় হইবে; যখন তাহাতে আমাদের মাতৃভাষার স্থান হইবে; এক কথায়, যখন আমরা সত্য সত্যই এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইব, তখন পরীক্ষার ভাষা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিবার সময় আসিবে। তখন শিক্ষা প্রদানের ভাষার কথা উঠিতে পারিবে। ইংরাজী অবশ্য আমরা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব না; ইংরাজী না থাকিলে আমাদের চলিবে না। সুধু আমাদের কেন ভারতের সকল জাতির সম্বন্ধেও ইহা ঠিক। যতদিন আমরা ইংরাজাধীন থাকিব, ততদিন ইংরাজী আমাদের চাই ই। কিন্তু যদি বাঙ্গালায় এক স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হয়, তাহা হইলে পরীক্ষার ভাষা ক্রমে বাঙ্গালা হইবে, এবং ইংরাজী ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ের শিক্ষাপ্রদান পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় হইবে। বাঙ্গলা ভাষায় এখন অবশ্য ইতিহাস, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞানাদির উচ্চ অঙ্গের পুস্তক নাই। হইবেই বা কি করিয়া? ঐ সব বিষয় বাঙ্গালায় শিক্ষা হয় না। যাহার আবশ্যক নাই, তাই তাহার দরকারও নাই। কতদিনে যে অবস্থান্তর হইবে, তাহা বলা যায় না। এখন শিক্ষার অবস্থা যেরূপ তাহাতে উহা সুদূর। শিক্ষার অবস্থা বর্ত্তমানাপেক্ষা অনেক উন্নত হইলে পর উহা সম্ভব হইবে। এখনও বিদ্যার উচ্চ শাখা সকল শিক্ষার জন্য আমাদিগকে ইংরাজ অধ্যাপকের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। যতদিন তাঁহাদের সাহায্য আবশ্যক হইবে ততদিন শিক্ষাদান বাঙ্গালায় হইতে পারিবে না। বাঙ্গলাপক্ষপাতীদের উদ্দেশ্য সফল হইতে হইলে, চাই, প্রথম বাঙ্গলায় স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয়, শিক্ষার এতদূর উন্নতাবস্থা যে বিদেশ হইতে অধ্যাপক আমদানীর অপ্রয়োজন, এবং তৃতীয়, বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। প্রথম দুইটী সম্ভাব্য হইলে শেষোক্তটির জন্য যে বিশেষ অসুবিধা হইবেক এরূপ বোধ হয় না; অথবা উহারা সংশোধিত হইবার পর সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কথা ভাবিবার সময় আসিবে।

দ।

পলাশ বন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই আমরা আমাদের গৃহ-সংলগ্ন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মেজবৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো, বনের মধ্যে ভাল পথ আছে তো?"

আমি বলিলাম, "মানুষের তৈয়েরী পথ নাই। তবে গাছের মধ্যে এরূপ ফাঁক আছে, যা'র ভিতর দিয়ে অনায়াসেই যাওয়া আসা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে কাঁটা গাছ আছে, তোমরা কাপড় চোপড় একটু সাবধানে গুটিয়ে যাবে, যেন কাঁটাতে কাপড় না লাগে।"

যতীন পথ দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইল। বালকবালিকারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের পশ্চাতে চলিল। আমি চলিলাম সর্ব্ব পশ্চাতে। মতিলালই কেবল তাহার দাসীর ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিল।

মেজবৌদিদি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরপো, বনেতো কিছু ভয়ের কারণ নেই? তোমরা কি ক'রে বনের মধ্যে বেড়াও ভাই! এ যে গাছ বই আর কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চে না! ঐ ঝোপগুলো এরই মধ্যে যে অন্ধকার হ'য়ে এসেচে! ওদের ভিতর তো কিছু লুকিয়ে থাকে না? ওমা, এযে দিনের বেলাতেই বনে সন্ধ্যে হ'য়ে এলো!"

আমি বলিলাম, "মেজবৌদিদি, ভয় কি তোমাদের? কিছু ভয় থাক্‌লে, আমরা কি তোমাদি'কে এদিকে নিয়ে আস্‌তুম? সুশীলারা তো রোজই এই দিক দিয়ে ফুল তুল্‌তে যায়! কি সুশীলা, তোমার ভয় পাচ্চে?"

সুশীলা হাসিয়া বলিল, "ভয় পাবে কেন? কিসের ভয়? আমিতো কতবার এক্‌লাই এই পথে ফুল তুল্‌তে যাই;"

মেজবৌদিদি বলিলেন, "তোমার না হয় যতীন রয়েছে ভাই। তোমার দিদিরও জন্যে না হয় ঠাকুরপো র'য়েচে। তোমাদের তো কোন ভয় নেই; যত ভয় আমাদেরই হচ্চে। মঙ্গলা ঠাকুজ্ঝি ফিরে যাবি?"

মঙ্গলার মুখ শুকাইয়া আসিতেছিল। সে বলিল, "ওগো, আমার মনে

ছিল না গো। বগলাপিসী আমাকে বনের মধ্যে যেতে অনেকবার মানা ক'রেছিল গো।" তাহার পর ঈষৎ অনুচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ও বৌদিদি, বনে বাঘ ভালুক নেই বা থাক্‌লো? বনে যে কত ঠাকুর দেবতা থাকে গো?"

মঙ্গলার এই কথা শ্রবণমাত্র স্ত্রীলোকেরা সহসা নিশ্চল হইল। যোগমায়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। যতীন্দ্র বালকবালিকাদিগকে লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিল। সে মঙ্গলার এই সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতে পায় নাই। রাজুদিদি ভয়সূচক স্বরে যতীনকে ডাকিয়া বলিল,"ওরে যতীন, ফিরে আয়; আর বনে বেড়াতে যেতে হ'বে না।"

যতীন উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তোমরা চ'লে এস না, আমরা দিব্যি ফাঁকা জায়গায় এসেচি।"

কে যতীনের কথা শুনে! মঙ্গলা ও রাজুদিদি বাড়ী ফিরিয়া যাইবার মত করিল। মেজবৌ বড়বৌ ও তাঁহাদের দাসীদ্বয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মতিও তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া যেন ভয় পাইয়াছিল। সে বলিল, "মা, তুই কোলে নে।" এই বলিয়া দাসীর ক্রোড় হইতে মাতৃক্রোড়ে গেল। যোগমায়ার অবশ্য কিছুই ভয় হয় নাই। সে রাজুদিদিকে মৃদুস্বরে বলিতেছিল, "বনে কিছু ভয় নেই, ঠাকুর্জি, তোমরা এস।"

মঙ্গলাকে যত অনর্থপাতের মূল দেখিয়া আমি বলিলাম, "মঙ্গলা, ঠাকুর দেবতার নাম ক'রে তুই সকলকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস্। আচ্ছা যা, মনে ক'রে দেখ্, যদি কেউ কোথাও ঠাকুর দেখ্‌তে যায়, আর অর্দ্ধেক পথ থেকে ফিরে আসে, তা হ'লে তার কি হয়! বনের ঠাকুরদের বনই মন্দির; এই মন্দির থেকে সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্চিস্, আচ্ছা যা। এর পর মজাটি দেখ্‌তে পাবে।"

মঙ্গলা ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওমা, আমি কি যেতে মানা কচ্চি? বৌরা যে আপনারাই যেতে চাচ্চে না গো?"

আমি বলিলাম, "বৌদিদি, তোমরা এস; কিছু ভয় নেই।" এই বলিয়া সকলের অগ্রসর হইলাম।

গৃহে ফিরিয়া যাইলে কোনও অমঙ্গল হইতে পারে, এই মনে করিয়া স্ত্রীলোকেরা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় আমার অনুবর্ত্তিনী হইল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে আমরা একটী পরিষ্কৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

প্রায় দুই বিঘা পরিমিত স্থান একেবারে বৃক্ষশূন্য; কিন্তু তাহার চারিদিকেই বন। বৈকালিক রৌদ্রপাতে সেই স্থানটি আলোকিত। বালকবালিকারা সেখানে দৌড়াদৌড়ি ও কোলাহল করিতেছে। কেহ নিকটবর্ত্তী আরণ্য পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতেছে। যতীন্দ্র ভায়া একটী বৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরের উপরে বসিয়া আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা বনের ভিতর হইতে সহসা এই পরিষ্কৃত ও আলোকিত স্থলে উপনীত হইয়া যেন বিস্মিত আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইল। কাহারও মুখমণ্ডলে একটুও ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল না। মেজবৌদিদি বলিয়া উঠিলেন, "আহা, কি সুন্দর জায়গা ঠাকুরপো! আমি মনে করেছিলাম, বুঝি কেবলই গাছ। ওমা, বনের মধ্যে এমন জায়গা আছে বলে কে জানে? ওখানে ও কি? গরু চ'রে বেড়াচ্চে না কি, ঠাকুরপো? ঐ ছোট মেয়েটি একলাই এই বনের ভিতর গরু চরায় না কি? রাজুঠাকুজ্জি, ঠাকুরপো সত্যিই ব'লছিল, বনের মধ্যে কিচ্ছুরই ভয় নেই। আমরা ভাই সহরে লোক; বন তো কখনও দেখিনি; তাই ভয়ে ম'রে যাচ্ছিলুম।"

আমি বলিলাম, "এই দেখ না, এই শালগাছের তলায়, এই ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে রোজই আমি বই পড়ি। আজও সকালে এইখানে এসেছিলাম।"

বড়বৌদিদি বলিলেন, "বেশ জায়গাটি। এইখানে আমরা একটু বসি।" এই বলিয়া তিনি ভূমিতে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি অপর সকলেই বসিল। মেজবৌদিদি ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ও ঠাকুরপো, ওটা কি গো! ঐ লম্বা লম্বা কান! ঐযে গো, ঐ দেখ, ঐ বনের মধ্যে ঢুকে গেল!"

বৌদিদির কথা শুনিয়াই মঙ্গলা ভয়সূচক-স্বরে চীৎকার করিয়া সলম্ফে আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি রাগান্বিত হইয়া বলিলাম, "করিস্ কি, পোড়ারমুখি, তোকেই আগে খেয়ে ফেল্লে না কি?" অপর সকলে মঙ্গলার ভাব দেখিয়া ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, "বৌদিদি, ওটা খরগোশ। নিরীহ জীব। কারুর অপকার করে না। বেচারী আগাছার কচি কচি পাতাগুলি খেয়ে বেড়াচ্ছিল, এখন তোমাদের ভয়েই গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে গেল। মানুষ যে ওদের শত্রু; মারিয়া ওদের মাংস খায়!

বড়বৌ বলিলেন, "ওমা সেই যে কথামালাতে খরগোশ ও কুকুরের গল্প আছে, সেই খরগোশ !"

আমি বলিলাম, "হাঁ"।

স্ত্রীলোকেরা আবার নিশ্চিন্তমনে সেই স্থানে উপবেশন করিল। যাহারা খরগোশটি দেখিতে পায় নাই, তাহারা খরগোশ দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিল, যদি আবার বাহির হয়। বনের ভিতর হইতে সুকণ্ঠ পক্ষীদের শ্রুতিমধুর গান শুনা যাইতেছিল, সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি সকলকেই সাধ্যমত উত্তর দিলাম। সহসা দূর বনে একটা ময়ূর ডাকিয়া উঠিল। সকলেই ভীত ও চকিত মুখে আবার আমার দিকে চাহিল। আমি স্ত্রীলোকদের আকার প্রকার দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, "তোমাদের কিছু ভয় নাই, বনে ময়ূর ডাক্‌চে।"

যাহারা ইতঃপূর্ব্বে কখনও কোথাও ময়ূরের ডাক শুনিয়াছিল, তাহারা আমার কথার সমর্থন করিল।

যতীন বলিল, "এখানে ব'সে থাক্‌লে তো চল্‌বে না; চল আমরা পাহাড় দেখে আসি।"

যতীনের কথায় আবার সকলে উঠিলাম। স্ত্রীলোকদের বনভ্রমণের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া যতীনকে বলিলাম, "ভায়া, যমুনা নদীর ধার দিয়ে যাওয়া যাক্‌। নদীর ধারে বন নাই, বেশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন; আর রৌদ্রও আছে।" যতীন আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই দিকেই চলিল।

যমুনার ক্ষীণ স্রোত কোথাও একটী স্থূল রৌপ্য রেখার ন্যায় প্রলম্বিত ছিল; কোথাও কুল কুল শব্দে প্রস্তরময় উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া শ্বেত ফেনপুঞ্জ উদ্গীরণ করিতেছিল; কোথাও বা বক্রগতি ধারণ করিয়া বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। বালক বালিকারা তটিনী-গর্ভে সুগোল সুচিক্কণ বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরখণ্ড সকল সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইল; এবং কোলাহল করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া যাইতে লাগিল। নদীর বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে এবং নানা প্রকার অদ্ভুত বিষয়ের গল্প করিতে করিতে আমরা পরিশেষে কৃষ্ণকায় সিন্দুরে পাহাড়ের পাদমূলে উপনীত হইলাম।

পাহাড়ের ভীম সৌন্দর্য্য দর্শনে স্ত্রীলোকদের মনে কিরূপ ভাব হইল, তাহা

সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমি বলিলাম "মেজবৌদিদি " এই দেখ, সিন্দুরে পাহাড়। উপরে উঠিবে চল।"

কথা শুনিয়াই সকলের বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল। আমি বলিলাম, "কিছু ভয় নাই। উঠ্‌তে কোনই কষ্ট হবে না। এই নদীর দিকে পাহাড়টা সমান ভাবে খাড়া হয়েচে বটে; কিন্তু এদিক্ দিয়ে আমরা উঠ্‌ব না। পূর্ব্বধারে চল।"

সকলকে পাহাড়ের অপর পার্শ্বে লইয়া গেলাম এবং ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম। সোপান পরম্পরা সংযোগে দ্বিতলগৃহে উঠিতে যেরূপ কোনই কষ্ট হয় না, সেইরূপ পাহাড়ের লম্বিত, আনত, কৃষ্ণ দেহ ভাঙ্গিয়া তাহার শিখরদেশে উপনীত হইতে কাহারই কিছু মাত্র কষ্ট বা শ্রমবোধ হইল না। পাহাড়ের গাত্র প্রশস্ত ছিল; সুতরাং তাহা যেন একটী বিস্তৃত, ঈষৎ আনত, কৃষ্ণ প্রস্তরের প্রাঙ্গন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। পাহাড়টি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বিত ছিল।

স্ত্রীলোকরা ও বালকবালিকারা যথেচ্ছ উপবেশন করিয়া পাহাড়ের উপর হইতে সবিস্ময়ে চারিদিকের দৃশ্য দেখিতেছিল। পাহাড়ের পশ্চিম-ভাগে তাহার পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া যমুনাতটিনী বিসর্পিত গতিতে অনন্ত অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইতেছিল। নদীটি উত্তর পূর্ব্ব দিক্ হইতে আসিয়া পাহাড়কে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতেছিল। বৈকালিক সূর্য্যের রশ্মিমালা বনের সুচিক্কণ হরিৎ-পত্ররাজির উপর বিকীর্ণ হইয়া মনোহর শোভার সৃষ্টি করিতেছিল। পাহাড়ের পূর্ব্ব দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত পলাশ-বৃক্ষের অন্তরালে কৃষ্ণ প্রস্তর স্তূপ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিন্যস্ত হইয়া সেই স্থানের ভীষণতা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিতেছিল। স্ত্রীলোকদের মুখাবলোকন করিয়া বুঝিতেছিলাম, তাহারা এই ভীমসৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে কিছুমাত্র সমর্থ হইতেছিল না। পাহাড়ের অব্যবহিত দক্ষিণ দিক্‌টি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত। বন এক প্রকার নাই বলিলেও চলিতে পারে। সেই দিকে চাহিতে চাহিতে নীরো বলিয়া উঠিল, "মা, ঐ দেখ, বনের মধ্যে কাদের বাড়ী।" সকলেই সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মেজবৌদিদি বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সত্যি তো! ও কাদের বাড়ী ঠাকুরপো?" আমি হাসিয়া বলিলাম "কাদের বাড়ী, তোমরা দেখ নাই না কি?" সুশীলা একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বলিল, "ও হো এ যে তোমাদের বাড়ী গো!

ঐ যে আমাদের গ্রাম!" স্ত্রীলোকেরা অবাক্ হইল। মেজবৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুর পো এত নিকটে আমাদের বাড়ী? কই এদিকে তো বেশী বন নাই? তবে তো আমাদিকে আর বনের ভিতরের রাস্তা দিয়ে ফিরে যেতে হবে না?" আমি হাসিয়া বলিলাম, 'না।'

মেজবৌদিদি অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আঃ বাঁচলুম ভাই। তোমাদের বন বেড়ানোকে দণ্ডবৎ করি। আমি তো দিশে হারা হ'য়ে গেছ্‌লুম। কোন্ দিক্ দিয়ে এলুম, কোন্ দিক্ দিয়ে বেরুলুম, আর কোন্ দিক্ দিয়ে যে যাব, তা তো আমি কিছুই ঠিক্ কর্‌তে পারি নি; বাড়ীর দিকেই এতক্ষণ আমার মনটা পড়েছিল। বাড়ীটে দেখে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হ'লো।

আমি হাসিয়া বলিলাম "মেজবৌদিদি, বন জঙ্গল তোমাদের জন্য নয়। তোমাদের জন্য ঘর সংসারই উপযুক্ত স্থান। বনের মধ্যে তোমাদের মনের স্ফূর্ত্তি হয় না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেবল সীতা দেবীই তাঁর স্বামীর সঙ্গে গভীর অরণ্যের মধ্যেও নির্ভীকচিত্তে বেড়াতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। তিনি কিরূপ নারী ছিলেন, যোগমায়ার কাছে শুন্‌বে।"

মেজবৌদিদি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ভাই তাই হ'বে; ভটচায্যি মশায়কে এখন জিজ্ঞেস করে জানবো।—যতীন, তুমি কি এই পাহাড়ের সম্বন্ধেই কবিতা লিখেচো? কই, আমাদের তা শোনাও দেখি?"

যতীন বলিল, "আগে এইখানে এসে একটি ফাট দেখে যাও।"

আমরা সকলেই গিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের উত্তরাংশটী আমূল ফাটিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। ফাটটি এরূপ প্রশস্ত যে, তাহা লাফাইয়া পার হইতে শঙ্কা হয়। তাহার নিম্নদেশ অন্ধকারময় ও লতাকীর্ণ। স্ত্রীলোকেরা তাহাকে কোনও ভীষণ বন্যজন্তুর নিভৃত আবাস-স্থান বলিয়া শঙ্কিত হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

যতীন সকলকে বসিতে বলিয়া নিজেও একটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিল এবং গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল:—"বহুকাল পূর্ব্বে এই পলাশবন গ্রামে একটী সতী স্ত্রীর বাস ছিল। সেই সময়ে এই পাহাড়ের

কন্দরে একটা বড় অজগর সাপও বাস করিত। (কথা শুনিয়াই স্ত্রীলোকেরা সকলে শিহরিয়া উঠিল)। সেই সাপটা একদিন সেই সতীর স্বামীকে পাহাড়ের ধারে পাইয়া গ্রাস করিয়া ফেলিল। (স্ত্রীলোকদের ভয়সূচক অস্ফুট চীৎকার)। সতী ঘরে বসিয়া সিন্দুরের কৌটা হইতে সিন্দুর লইয়া মাথায় সিন্দুর পরিতেছিল, এমন সময়ে সে তাহার স্বামীর বিপদের কথা শুনিল। শুনিয়াই সে কৌটা-হাতেই পাহাড়ের ধারে ছুটিয়া আসিল এবং তাহার স্বামীকে ও সাপকে বাহির করিয়া দিবার জন্য পাহাড়ের অনেক স্তবস্তুতি করিল। কিন্তু পাহাড় সতীর কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন সতী রাগে আগুন হইয়া পাহাড়ের গায়ে হাতের সেই কৌটার বাড় মারিল। পাহাড়ের গায়ে যেমন কৌটা লাগিল, অমনি পাহাড় ভয়ঙ্কর কড়কড় শব্দে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। সাপ মরিল এবং সাপের পেট হইতে সতীর স্বামী জীবন্ত দেহে বাহির হইয়া আসিল। সতী পাহাড়কে সিন্দুরের কৌটা মারিয়াছিল বলিয়া পাহাড়ের নাম হইল, "সিন্দূরে পাহাড়।"

গল্প শুনিতে শুনিতে স্ত্রীলোকেরা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যোগমায়া তাহার আয়ত চক্ষুদুটি যতীনের দিকে স্থির করিয়া সবিস্ময়ে একমনে এই গল্প শুনিতেছিল। বালকবালিকারাও নিশ্চল হইয়া গল্প শুনিতেছিল এবং যতীনের বাক্য শেষ না হইতে হইতে ভয়াকুলিতচিত্তে স্ত্রীলোকদের মাঝখানে আসিয়া বসিল। মেজবৌদিদি ভীতিব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"যতীন, আমরা তো তবে পাহাড়ের উপরে উঠে ভাল কাজ করি নি!"

যতীন বলিল,—"উঠেচো তো কি হ'বে! এখানকার মেয়েদি'কেও তো আমি পাহাড়ের ধারে আস্‌তে দেখেচি। একদিন এই পাহাড়ে এসে সতীর পূজো দিয়ে যেও, তা হ'লেই হ'বে।"

"তাই ক'র্‌বো" এই কথা বলিয়া মেজ বৌদিদি পাহাড় ও সতীকে প্রণাম করিবার উদ্দেশে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি ঈষৎ আনত করিয়া মস্তকে স্পর্শ করিলেন। অপর স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকারাও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। মতি কিছু করিল না দেখিয়া দাসী তাহার ঘাড় নোয়াইয়া দিল।

যতীন বলিল,—"এখন সকলে স্থির হইয়া কবিতা শোন। শুনিলে নিশ্চিত আনন্দিত হইবে।" এই মুখবন্ধের পর সে কবিতা-পাঠ আরম্ভ করিল:—

"সিন্দুরে পাহাড়।

"নগ্নদেহ কৃষ্ণকায় সিন্দুরে পাহাড়,
এক ভাবে, এক ধ্যানে,
কত কাল এই স্থানে,
ব'সে আছ, যোগী হেন, নিস্পন্দ অসাড়—
ধ্যানমগ্ন মহাযোগী, সিন্দুরে পাহাড়।

"রুক্ষদেহ, শুষ্কপ্রাণ, ভ্রূকুটী ভীষণ
হেরিয়া তোমার পাশে
নরনারী নাহি আসে,
দূরে দূরে থাকি ক'রে তোমার পূজন—
সিন্দুরে পাহাড়, তুমি ভীমদরশন।"

যতীন এই পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, এমন সময়ে মেজ বৌদিদি তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই দেখ, যতীন, তুমি তো নিজেই লিখেচো, পাহাড়ের পাশে কেউ আসে না! আমাদের তবে এখানে আন্‌লে কেন? কোন তো অপরাধ হ'বে না?"

যতীন বিরক্ত হইয়া বলিল,—"কি আপদ! তুমি ভয় পাচ্চ কেন? কবিতাতে ওরূপ না লিখ্‌লে কি চলে? তোমরা মন দিয়ে শুনে যাও; আমাকে পড়ার সময় বাধা দিও না।" এই বলিয়া আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিল:—

"নগ্নদেহ কৃষ্ণকায় সিন্দুরে পাহাড়,
এক ভাবে, এক ধ্যানে,
কত কাল এই স্থানে,
ব'সে আছ, যোগী হেন, নিস্পন্দ অসাড়—
ধ্যানমগ্ন মহাযোগী, সিন্দুরে পাহাড়।

"রুক্ষদেহ, শুষ্কপ্রাণ, ভ্রূকুটী ভীষণ
হেরিয়া তোমার পাশে
নরনারী নাহি আসে,
দূরে দূরে থাকি ক'রে তোমার পূজন—
সিন্দুরে পাহাড় তুমি ভীম দরশন।

"অজর অমর তুমি, অতি পুরাতন—
জানি না যে কোন্ কালে
উঠিয়াছ মাথা তুলে,
ভেদি ধরণীর এই দৃঢ় আবরণ,
কে করে তোমার শৈল, কাল নিরূপণ?

"না জানি কতই যুগ তুমি শৈলেশ্বর,
আপন জনম হ'তে
হেরিয়াছ এ ভারতে,
কত ভাঙ্গা গড়া কত যুগ যুগান্তর,
অনন্ত কালের সাক্ষী, তুমি গিরিবর।

"নীরব তোমার ভাষা, প্রাণ-উন্মাদিনী!
বসি তব পদতলে
শুনি শৈল, কুতূহলে,
কত-না পুরাণ কথা, অপূর্ব্ব কাহিনী,
কতবার অশ্রুজলে ভিজাই ধরণী!

"সতীর মহিমা তুমি করিছ প্রচার,
নীরব গম্ভীর স্বরে,
এ জগৎ চরাচরে,
অবলা নারীর কাছে অচলের হার,
তুমি হে জীবন্ত সাক্ষী সতী-মহিমার।

"সতীর পবিত্র ধনে ভীম অজগর
গ্রাসিতে যবে হায়,
ঠাঁই দিলে তুমি তায়
তোমার কন্দরে, নাহি ভাবি পূর্ব্বাপর—
ভাবিলে না সতীতের কিরূপ প্রখর।

"পতির দুর্দ্দশা শুনি সতী অতঃপর
অশনি-তাড়িত প্রায়!
সহসা সে বেগে ধায়
মুহূর্ত্তে সন্বিৎ লভি, বাঁধিয়া আঁচল।
ছুটিলা যথায়, তুমি আছহে অচল।

"পতি সোহাগিনী সতী মনের হরষে
সুবেশ রচনা করি,
ভালেতে সিন্দুর পরি,
সিন্দুরের কৌটা হাতে গৃহে ছিলা ব'সে,
আহা, প্রিয় প্রাণপতি আগমন আশে।

"হাতে কৌটা ছিল যথা, ছুটিলা তেমনি,
উত্তরিলা তব পাশে
প্রাণপণে উর্দ্ধশ্বাসে,
আলু থালু বেশ কেশ যেন পাগলিনী—
পতিহীনা অভাগিনী মণিহারা ফণী।

"পতি তরে মুগ্ধা বালা চারিদিকে চায়;
পতিধনে নাহি হেরি,
পতিনাশ শঙ্কা করি,
মুক্তকণ্ঠে কাঁদে আহা, কুররীর প্রায়—
পতিশোকে সতী নারী ধরণী লুটায়।

"স্থাবর জঙ্গম স্তব্ধ সতীর রোদনে,
যমুনার স্বচ্ছ জল,
সতী শোকে অচঞ্চল,
প্রকৃতি বিষাদময়ী সতীর কারণে,
হাহাকার ধ্বনি শুধু পশিল শ্রবণে।

"উন্মাদিনী সতী নারী তোমায় অচল,
কতই বিনয় ক'রে
সেই কাল অজগরে
নিঃসারিতে বলিলা হে, হইয়া বিকল,
পাষাণ হৃদয় তবু হ'লো না তরল।

"তবে সতী রোষে অতি আপনা হারায়;
নয়নে অনল ছুটে;
কটীতে বসন আঁটে,
কৌটাসহ বাহু তুলে মহাবেগে ধায়,
দেখি সে মুরতি সবে ত্বরসা পলায়।

"বলে সতী উচ্চৈঃস্বরে শুনহে তপন,
তুমি সকলের গতি,
যদি আমি হই সতী,
কায়মনোবাক্যে যদি পতির পূজন
কথনও ক'রে থাকি
তা হ'লে থাকিবে সাক্ষী,
কৌটার আঘাতে গিরি করিব ছেদন,
উদ্ধারিব আজি আমি প্রিয় পতিধন।"

"জ্যোতির্ম্ময়ী বালা যেই এতেক বলিয়া,
তদোপরি কৌটা হানে;
কড় কড় মহাস্বনে,
ফাটিলে, কঠোর গিরি, দুখান হইয়া—
মহানাদে জীব জন্তু উঠে চমকিয়া।

"অজগর বুক ফেটে ত্যজিল পরাণ;
অক্ষত শরীরে পতি
বাহিরিলা শীঘ্র গতি;—
অমনি দুন্দুভিধ্বনি, সতী যশোগান—
চারিদিকে আনন্দের উচ্ছ্বাস মহান্।

"ছুটিল যমুনা জল কুলু কুলু তানে,
সতীত্ব মহিমা কথা
মর্ম্মরিল বৃক্ষ লতা;
প্রকৃত হাসিলা পুনঃ সতীর সম্মানে;
দশ দিক্ পূর্ণ হ'ল আনন্দের গানে।

"এদিকে লভিয়া পতি হরষিত মনে
তোমার চরণ-মূলে,
পতিসহ কুতূহলে
প্রণতি করিলা সতী সলজ্জ নয়নে,
তুষিলা তোমায়, গিরি, মধুর বচনে।

"আশীর্ব্বাদ করি তারে বলিলে তখন :—
'প্রসন্ন তোমার প্রতি,
হ'য়েছি গো আমি, সতি,
তোমার সতীত্ব-যশ ঘোষিবে ভুবন।
যাবৎ এ চরাচর,
তারা, শশী, দিবাকর,
তাবৎ তোমার কীর্ত্তি করিব ঘোষণ,
সতীত্ব-প্রতাপ-চিহ্ন করিব ধারণ।'

" 'সিন্দুরে পাহাড়' তেঁই তব অভিধান।
সতীত্বের কীর্ত্তি ব'লে,
যমুনা তরঙ্গ তুলে
তব পদ ধৌত ক'রে আনন্দে অজ্ঞান—
কল কল নাদে ধায় পতি-সন্নিধান।

"এখনো কৃষাণ-বালা চারু মধু মাসে,
করযোড়ে তব আগে,
পতিব্রতা-বর মাগে
পতি সোহাগিনী হ'তে তব কাছে আসে;
এখনো পূজয়ে তোমা পতিসুখ আশে।"

"বালবধূ পতিগৃহ গমনের কালে,
তোমার চরণ-তলে,
করে নতি কুতুহলে,
ভিজায় চরণ তব তপ্ত অশ্রুজলে,
তোমার পবিত্র দেশ ছাড়িবার কালে।"

"এখনো প্রাবৃট্‌কালে মেঘাবৃত দিনে,
যবে বরিষার ধারা,
বুক পাতি লয় ধরা,
ঠাকুমার কাছে বসি যত শিশুগণে,
শুনে সতী-কীর্ত্তি কথা অবহিত মনে।"

"অদূরে কৃষক গ্রামে যদি কোন নারী,
যৌবনের মত্ততায়,
পথি ভ্রষ্ট হ'তে চায়
তোমার ভ্রুকুটী দেখে ভয় হয় তারি,
সিন্দুরে পাহাড় তাহা মহিমা তোমারি।"

কবিতা পাঠ শেষ হইলে, স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে একটী বিস্ময় ও আনন্দের অস্পষ্টধ্বনি সমুখিত হইল। আমিও যতীন ভায়ার কবিতাটির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যতীন তাহার কবিতার প্রশংসা শুনিয়া যেন ঈষৎ হৃষ্ট হইল এবং বলিতে লাগিল "কিন্তু এই পাহাড়ের উপরে ব'সে কবিতাটি পাঠ না ক'র্‌লে ইহার তত সৌন্দর্য্য থাকে না।"

আমি বলিলাম,—"তুমি যথার্থ ব'লেচো।"

সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইবার প্রায় উদ্যোগ করিতেছিলেন। পাহাড়ের কাল ছায়া ধীরে ধীরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতেছিল। অদূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে একটী অস্পষ্ট কলরব উত্থিত হইতেছিল। রাখাল বালকেরা গো মহিষাদি লইয়া একে একে বনের ভিতর হইতে বাহির হইতেছিল এবং কখন কখন সুমধুর কণ্ঠে দুই একটী গান গাহিয়া সুস্বরলহরীতে আকাশমণ্ডল পূর্ণ করিতেছিল। বিহঙ্গম-কুলের কোলাহলে বনস্থলী শব্দায়মান হইতেছিল এবং বৃক্ষপত্র মর্ম্মরিত করিয়া সুশীতল সান্ধ্য সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল। সায়ংকালের এই রমণীয় দৃশ্যটি স্ত্রীলোকদের মনেও একটী অস্পষ্ট অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার করিয়া থাকিবে; যেহেতু অনেকক্ষণ কেহ একটীও কথা কহিল না এবং বালকবালিকারাও নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মেজবৌদিদি যেন ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিলেন,—"ঠাকুরপো, এ যে সন্ধ্যে হ'য়ে এল; চল বাড়ী যাই। মা আবার ভাব্‌বেন।"

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিলাম এবং সকলের সহিত ধীরে ধীরে পাহাড় হইতে অবতরণ করিলাম। স্ত্রীলোকেরা কিন্তু নামিয়াই পাহাড়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিল।

বাড়ী আসিতে আমাদের অধিক সময় লাগিল না। আমাদের প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া জননী কেশবকে আমাদের অনুসন্ধানে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। বৌ-

দিদিরা ও বালক বালিকারা জননী ও মাসীমার সহিত বন-ভ্রমণের গল্প করিতে আরম্ভ করিল। সুশীলা ও ভূদেব তাহাদের দিদির নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিল। আমরা বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপবেশন করিলাম।

পর দিন প্রভাতে জননী ও মাসীমা বলিলেন,—"দেবু-যতীন, আমরাও এক দিন সন্তীর পাহাড় দেখে আসবো।"

যতীন বলিল,—"সেই দিন অমনি পূজো দিয়েও এসো।"

মহাযাত্রা।

শুনিয়াছি ভক্তিমার্গ বড়ই সরল,
নিতান্ত নিশ্চিত।
নাহি দস্যুভয়, অতি কোমল, মসৃণ,
কুসুম-বাসিত।
দিনে দিনে পথিকের পথ হয় শেষ,
আসে না যামিনী;
নাহি শ্রান্তি, নাহি ক্লেশ, অবসাদ-দ্বেষ,
নিরাশা-নাগিনী।
নিদাঘ-অনল নাহি, শিশির তুষার,
বরষা-কর্দম;
শুধু সুখ, শুধু শান্তি, অপার বিশ্বাস,
আশা অনুপম।
কিন্তু হায়, নয়ন মুদিয়া
ওপথে চলিতে ভয়; তাহা নাহি চাহি।
হই নাই ধৈর্য্যহীন, অত শীঘ্র তাঁরে
প্রয়োজন নাহি।
সুবিশাল, সুকঠিন, দুরারোহ ঐ
জ্ঞানমার্গ, ও পথে যাইব;
আজি কালি নাহি পাই, এক দিন তাঁরে
অবশ্য পাইব।

আমি শুধু চাহিনা তাঁহারে,
তাঁর মহিমাও আমি চাহি জানিবারে।
পূর্ণ হয় যদি সে বাসনা,
হয়ত তাঁহারে আমি আর চাহিব না।
বারিবিন্দু দিয়া যদি
সমুদ্র তুলনা করি—
প্রিয়ারে আমার দেখ নাহি চাহি তত
যত তার ভালবাসা হৃদয়ে রেখেছি ভরি।
এ বিপুল বিশ্ব-রচনায়
অণুতে অণুতে আমি অন্বেষিব তাঁরে;
প্রতিদিন মুগ্ধ হব তাঁহার দয়ায়,
তাঁর স্নেহ, মহিমার নব নব আবিষ্কারে।
প্রতি পুষ্প, প্রতি তারা, প্রতি গান, প্রতি পাখী
প্রতি জননীর মুখ, প্রতি প্রেমিকের আঁখি,
প্রতি মেঘ, বৃষ্টিকণা, প্রতি বিজলীর খেলা,
প্রতি রামধনু, প্রতি সিন্দূর-মেঘের মেলা
প্রতিদিন রূপ-গুণ কহিবে তাঁহার

অনন্ত অপার।
নদ-নদী, জলস্তম্ভ, সিন্ধু, হিমাচল,
গাইসর্, আগ্নেয়-গিরি, উষ্ণপ্রস্রবণ,
ধূমকেতু, চন্দ্রসূর্য্য, পূর্ণিমা, অরোরা;
মনোজগতের মহাতত্ত্ব অগণন;
সকলের এক ভাষা, এক তান, এক লয়—
"আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্ত মহিমাময়।"
যুগ যুগান্তর ধরি,—কল্পান্ত অবধি
সে মহাসঙ্গীত যদি নাহি শুনিলাম,
নাহি যদি ধন্য হইলাম;
কেমনে জানিব তাঁরে, কেমনে বাসিব ভাল,
কেমনে করিব পূজা, হৃদয় করিব আলো?
এইরূপে প্রতিদিন হইব মহান

দেবতা সমান।
সৃজন করিয়াছেন তিনি যে আমারে,
সার্থকতা কোথা হ'ল তার,
মাণিক্য না হইলাম যদি
উজ্জ্বল করিয়া এই সৃষ্টি-পারাবার?
নাহি জানি কত লক্ষ কত কোটি যুগ হ'ল,
বায়ুভরে উড়িতাম তৃণ, শুষ্কপাতা;
আজি দেখ কি পরিবর্ত্তন!

আজি জানি কে আমার অস্তিত্ব-বিধাতা।
কত লক্ষ লক্ষ কত কোটি কোটি যুগ পরে,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সর্ব্বত্র করিয়া বাস,
এই আমি দাঁড়াইব তাঁর সিংহাসন-তলে,
তিনি হাসিবেন সুখে স্নেহসম্ভাষণহাস।
তবে না সম্পূর্ণ হবে উদ্দেশ্য তাঁহার
সেই তৃণ সৃষ্টি করিবার!

তাই আমি নাহি যা'ব চক্ষু কর্ণ রোধ করি
নাম-জপ-তরণীতে ভক্তি-নদী বাহি;
হে কাণ্ডারী গুরুদেব, চরণে প্রণাম করি,
অত শীঘ্র অধমের মোক্ষে কায নাহি।
এস সখী স্বাধীনতা—সাথে লয়ে এস
জ্যোতিষ বিজ্ঞান রাশি, সাহিত্য দর্শন আদি,
দুই জনে জ্ঞানপথে পরম কৌতুকে
চলি দিবারাতি।
মহাসৌন্দর্য্যের মাঝে ডুবিয়া ডুবিয়া
হয়ে যাব পরম সুন্দর;
মহা-মহিমার ছবি দেখিয়া দেখিয়া
প্রতি দিন হব মহত্তর।
প্রতি দিন সুদুর্জ্জয় বাড়িবে শকতি

পদে পদে বাধাবিঘ্ন দলি ;'—
স্বপ্নাতীত যাহা, তাহা ঘটিবে সহজে,
শকতির সীমা যাবে চলি।
একদিন পথ শেষ হবে,
দাঁড়াইব সম্মুখে তাঁহার ;
যবে হয় আসিবে সে দিন,
পথেও ত আনন্দ অপার।

১২ই কার্ত্তিক, ১৩০১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কেরল।

(৩)

দিবাবসানে অর্ণাকোলম্ সাগরতীরে ভ্রমণ করিতে গিয়া একদা দুইটি বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ লাভ করি। আনন্দের সহিত তৎসমভিব্যাহারে ইউরোপীয় পান্থনিবাসে যাইয়া বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। গতবার ভ্রমণকালে বরদায় মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবার রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদককে পাইলাম। রাজপ্রসাদ লাভেচ্ছায় আগমন করিয়া, তাঁহারা উভয়স্থানে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ডাক বাঙ্গালার সম্মুখে সুদূরব্যাপী হট্টের পথ; পার্শ্বে বিবিধ পণ্যশালা; কচিৎ মলয়ারি খৃষ্টানদিগের ভোগার্থ বংশনালীর ছাঁচে ঢালা তণ্ডুলের পিষ্টক বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে। এতদ্দেশে রজক ও নরসুন্দরের কার্য্যক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত। একখানি বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য এক আনা ও ক্ষৌরকার্য্যের জন্য প্রত্যেককে দেড় আনা দিতে হয়। চোলমণ্ডল উপকূলের ন্যায় মলয়ার উপকূল সমশীতোষ্ণ প্রদেশ। ঋতুভেদে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। রাত্রে শয়ন কালে স্থূলবস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় মাত্র।

বাঙ্গালায় বসন্তকালে যে দক্ষিণ বায়ু বহিতে থাকে, বাঙ্গালী কবি তাহাকে মলয়ানিল কহেন। উহাতে কেরলে শীতগ্রীষ্মের সাম্য ব্যক্ত হয়। মলয়ার স্বায়ত্ত-প্রেমের রাজ্য; বিয়োগবিধুর ব্যক্তি সুতরাং তৎসংস্পর্শে পরিতপ্ত হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি! কথিত আছে—

"স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তেহভোগা
দিষ্টে বস্তুন্যপচিতরসাঃ প্রেমরাশি ভবন্তি।"

কিন্তু আমরা পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, বাল্যবিবাহপরায়ণ, চির-সম্মিলিত দম্পতি কিরূপে সে উগ্রসুখের অধিকারী হইব ?

দেশভেদে রুচি বিভিন্ন ; তদনুসারে সৌন্দর্য্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এক স্থানে যাহা সুন্দর, অন্যত্র তাহা কদর্য্য বলিয়া পরিগণিত। জীবমিথুন পরস্পরকে আকৃষ্ট করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত সুন্দর হইতে চেষ্টা করে। সৌন্দর্য্যবিহীন হইলে সহচর দুষ্প্রাপ্য হয়। কেরলিগণ "কল্যাণম্" (বিবাহ) বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃতিক যৌন নির্ব্বাচন বিসর্জ্জন দেন না ; বোধ হয় সেইজন্য তাঁহারা দ্রাবিড় প্রতিবাসী অপেক্ষা সুরূপ। রূপজ মোহ প্রেম-নামের যোগ্য না হইলেও প্রেমের নিদান বটে ; ইহাতেও অন্যের সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে। গুণজনিত প্রণয় ভিন্ন স্থায়ী স্নেহ জন্মে না, এজন্য রূপলালসাকে পাশব-প্রেম বলে। যুবক উচ্চ আদর্শমত সংসারে গুণের অন্বেষণ করিতে গিয়া অকারণ-দুঃখ রোগে আক্রান্ত হইতে পারেন। রূপ পুরাতন হয়, গুণের নিত্য নববিকাশ থাকে ; কিন্তু সকলেরই এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন উপলব্ধি হইতে থাকে, "জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে।" উপস্থিত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন সুখের অন্য উপায় নাই ; কিন্তু সুবিধা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাই পুরুষার্থ, এবং যথাসাধ্য যোগ্যতর বিষয় বা যোগ্যতর প্রাণী ভিন্ন রক্ষা পাইতে পারে না। মলয়ালিদিগের পক্ষে রূপগুণ বিবেচনা করিয়া যৌন সম্বন্ধ স্থির করা সুসাধ্য ; প্রণয়াস্পদকে ভর্ত্তা হইতে হয় না, প্রেয়সী কেবল সঙ্গিনী মাত্র। হৃদয়ে একটি ভাব প্রবল হইলে তদ্বিপরীত স্থান পায় না। মানবকে ভক্তি, বাৎসল্য বা বৈরাগ্যের চক্ষে দেখা অভ্যাস করিতে পারিলে যৌনভাব সমুপস্থিত হইবে না। অভ্যাসের দ্বারা স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়।

মলয়ায় প্রেম-সরোবরে এখনকার কালে গুরুজন-জ্বালা যে নাই এমন নহে। যদৃচ্ছা ভোজন যেমন স্বাস্থ্যকর নহে, তেমনি স্বৈরাচার পরিণাম-শুভকর নহে। উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে শিক্ষা দেওয়া সমাজের উদ্দেশ্য। লোকের কল্যাণের জন্য সমাজ বা শাসন সৃষ্ট হইয়াছে। যুবতী স্বয়ং "গুণদোষকার" (নায়ক) বরণ করিতে অধিকারিণী নহেন, যুবক বা উভয়পক্ষীয় কর্ত্তার দ্বারা উক্ত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। দ্রাবিড় সীমান্তস্থ পালঘাট অঞ্চলে নায়ক প্রথম দিন বরযাত্রীর মত আত্মীয় সমভিব্যাহারে "সম্বন্ধকারীর" (নায়িকার) গৃহে "কড়কা কল্যাণম্" (শয্যাবিবাহ)

অনুষ্ঠান করিতে গিয়া থাকেন। যুবক বস্ত্র ও তৈল লইয়া উপস্থিত হইলে গৃহস্বামিনী পাদ্যঅর্ঘ্য প্রদানে তাঁহাকে সম্মানিত করেন। কর্ত্তার হস্ত হইতে বরবর্ণিনী ঐ দ্রব্য গ্রহণ করিবামাত্র "পোডমরি" ব্যাপার সম্পন্ন হইল। কেরলের অন্তত্র কে কাহার নায়ক সাধারণে পরিজ্ঞাত থাকে না, ব্রাহ্মণ নায়ক মিলিলে কোন অঙ্গনা অপরকে বরণ করেন না। নায়িকা অন্যের অনুবর্ত্তিনী হইলে পূর্ব্ব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। নায়ক স্বজাতীয় হইলে প্রণয়িনীর গৃহে নিশাকালে অন্ন গ্রহণ করেন, এবং সম্ভব হইলে অলঙ্কার আদি প্রদান করিতে ত্রুটি করেন না। এতদ্দেশে পূর্ব্বে উচ্চ বর্ণের মধ্যে একাধিক নায়ক নিয়োগের নিয়ম ছিল। ব্রাহ্মণ হইলে দণ্ড, নায়ার হইলে অস্ত্র গৃহদ্বারে রক্ষা করত প্রবেশ করিতেন, তদ্দৃষ্টে অন্যে গৃহাভ্যন্তরে যাইতে বিরত হইত। অধুনা সে উদ্দালকের রাজ্য নাই; সভ্যতার উদ্রেকে দাম্পত্যধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার কোন বন্যজাতিতে রমণী ব্যক্তিবিশেষের অনুবর্ত্তিনী বলিয়া গণ্য নহে। জন্তুবিশেষ সন্তানোৎপাদন-ঋতুতে বিযুক্তমিথুন হয় না; বানরকে বহুকাল যুগ্মতা রক্ষা করিতে দেখা যায়। কথিত বন্য মানব, সহোদর সহোদরায় মিলিত হইতে কুণ্ঠিত হয় না, উহাদের সন্তানের পিতা কে নির্ণীত হইবার উপায় নাই। অন্য রমণী সন্তান প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করায়, কদাচিৎ মাতার স্থিরতা হয় না; কেবল সে অমুক জাতীয় ব্যক্তি এইমাত্র তাহার পরিচয়ের স্থল। মাতৃবংশ প্রায়শঃ নিশ্চিত থাকে ও তদনুসারে পরিচিত হয়। কোন বনচর জাতিতে বহুপুরুষসহবাসিনী ললনা অতি সম্মানিতা।

আদিম অবস্থায় মনুষ্য সন্তানের ভরণপোষণে অক্ষম ছিল, এজন্য শিশুহত্যা করিতে হইত। পুত্র জীবন যাত্রায় সাহায্য করিতে পারে, কন্যা কেবল ভার মাত্র; ইহাতে শৈশবে বহু বালিকাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়; অপিচ কথিত আছে ভ্রূণ অধিকতর পুষ্ট হইলে কন্যাত্ব লাভ করে। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের শারীর যন্ত্রের আধিক্য তাহার প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে। বোধ হয় সেই কারণে স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে কন্যার আধিক্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং আদিম কালে পুত্র সন্তানের ভাগ অধিক ছিল। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক হওয়ায় বহুজন এক নারীতে উপগত হইতে থাকে। নীলগিরিনিবাসী তোডা

জাতি ও ত্রিহুতের লামারদিগের বহুস্বামী প্রথা আছে। তিব্বতীয় লাসা নিবাসিনী একটী মহিলা, জ্যাকেটের বহুপত্নী প্রথা শ্রবণ করতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বহুপত্যাত্মক মর্য্যাদা কি সুবিধাজনক? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহেন ভগিনী গৃহের কর্ত্রী ও ভ্রাতৃধনাধিকারিণী। স্বামিগণ তাঁহাকে অতি স্নেহ করেন। যথায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধনাধিকারী হইতে পারে না, সেখানে পৃথক্ স্ত্রীবরণ করা দুষ্কর। ভ্রাতৃসমবায়ের এক স্ত্রী হইলে ব্যয়লাঘব হয়। কুন্তী ভিক্ষা বণ্টন করিয়া লইতে আজ্ঞা দেন। ভুটানে বহুস্বামী প্রথা আছে, কয়েক ভ্রাতা মিলিত হইয়া এক দার পরিগ্রহ করে। নেপালউপত্যকানিবাসিনী নেওয়ার কুমারীকে প্রথমতঃ বিল্ব ও গুবাক ফলের সহিত বিবাহিত হইতে হয়, তদনন্তর তিনি পর্য্যায়ক্রমে পাঁচটি পর্য্যন্ত পতিবরণ করিতে অধিকারিণী। পত্যন্তর গ্রহণের অভিপ্রায় না থাকিলে, বিল্বফল বারিমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া বৈধব্য গ্রহণ করা বিধেয়। পূর্ব্বে ইহাদিগের এক সময়ে বহুস্বামী গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। খাসিয়া ও গারো জাতিতে অদ্যাপি উক্ত ব্যবহার অব্যাহত আছে, তজ্জন্য পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে কামরূপে পাতিব্রত্যের গৌরব আরম্ভ হয় নাই।

বহুস্বামী প্রথা যেমন অকারণে প্রাদুর্ভূত নহে, বহুস্ত্রী প্রথা তদ্রূপ আবশ্যকীয় প্রয়োজনে উৎপন্ন। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের ভাগ অল্প হইলে, এক নরে বহু নারী উপগত হইবে, তাহা কেহ নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন। তবে পুংজাতির ক্ষমতাধিক্য প্রযুক্ত বহুপত্নী গ্রহণ কুত্রচিৎ প্রচলিত আছে। সিংহলবাসী বাদিয়া জাতীয় প্রধান লোকের একাধিক সীমন্তিনী না থাকিলে অপমানের বিষয়। বাঙ্গালায় কুমারীদের জন্য পাত্র নির্ব্বাচন করা দুষ্কর হইয়াছে, সুতরাং সমাজ-সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ কি করিয়া প্রচলন করিবেন?

কেরলে "নায়ক" বরণের পূর্ব্বে যে নিষ্ফল বিবাহের অনুকরণ করা হয়, তাহাকে তালি-বন্ধন কহে; এ পদ্ধতি যজমানের ক্রিয়াবাহুল্য করিবার জন্য পুরোহিতের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। ত্রাবিঙ্ক সধবা উভয় পদের মধ্যমাঙ্গুলিতে রৌপ্য অঙ্গুরীয় দ্বয় ও গলে মালাদ্বয় ধারণ করেন। ঐ মালাকে তালি কহিয়া থাকে, উহার এক গাছি পিতার, অপরটি স্বামী কর্ত্তৃক উদ্বাহকালে প্রদত্ত হয়। বৈষ্ণবের বিষ্ণুমূর্ত্তি ও শৈবের মাল্যে শিব-চিহ্নাঙ্কিত সুবর্ণ আবরণ প্রদত্ত থাকে। কেরলি-বিবাহে তজ্জন্য কন্যার গলে তালি-

সূত্রে আবদ্ধ করিতে হয়। বর দিনত্রয় অবস্থান করতঃ বিবাহ-পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া প্রস্থান করেন; তদবধি পাত্রীর সহিত সম্পর্ক রহিত হইল।

জেমরিন্ রাজবংশীয়া কন্যার কোন ব্রাহ্মণের সহিত তালি বন্ধন হইলে পশ্চাৎ অন্য নম্বুরিকে বরণ করিয়া থাকে।* নায়ার কুমারী বয়স্থা হইবার পূর্ব্বে তালিবন্ধন করিবে, তদনন্তর নায়ক স্থিরীকৃত হয়, পুরুষের পক্ষে তালিবন্ধন সংস্কার অনাবশ্যক। কোন নায়ার রমণী তীর্থ ভ্রমণ ব্যতীত, মলয়ার সীমান্তে কোরপুজা নদের পর পারে যাইতে অধিকারিণী নহেন; সেইজন্য "সম্বন্ধকারণের" সহিত বিদেশ যাত্রা করিতে অক্ষম। দ্রবিড়ে নাট কোট চেট্টীজাতীয়া রমণী ও কাশ্মীরে স্ত্রীজাতি স্বদেশের সীমা অতিক্রম করেন না। মলয়ারি গ্রাম্য শিক্ষক পত্তুপত্তর জাতীয়া ননন্দা, বধূর গলে তালিবন্ধন করিয়া দেয়। ভার্য্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে পতিগৃহে বাস করে, পুত্র জন্মিলে বিধবাবস্থায় পত্যন্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ। গ্রহাচার্য্য কণিয়ার ও পনিক্কর জাতিতে ভ্রাতৃগণ সমবেত হইয়া এক নারী গ্রহণ করিয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত সূত্রধর, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কাংস্যকার প্রভৃতি জাতিতে বহুস্বামী প্রথা আছে। নারিকেলি-আসব ব্যবসায়ী থিয়ার জাতি, এখানকার প্রথম উপনিবেশী। তাহাদের দম্পতীকে জীবন-সংগ্রামে একত্র থাকিতে হয় না। আতিপুরের থিয়ার ভ্রাতৃগণ এক স্ত্রী মনোনীত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে মিলিত হয়।

মলয়ার স্বাধীন প্রেমের দেশ বলিয়া সন্তান পোষণের ভার মাতার উপর ন্যস্ত থাকে, তজ্জন্য ধনের উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে সাম্যনীতি প্রচলিত। "তারায়াদ" (একান্নবর্ত্তী পরিবার) মধ্যস্থ কোন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তদীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তি, পারিবারিক সাধারণ ধনের সহিত মিলিত হইবে। সাধারণ সম্পত্তির বণ্টন নাই। স্বোপার্জ্জিত বা পৃথকীকৃত ধনের দান বিক্রয় নিষিদ্ধ নহে। পরিবারস্থ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা নারী "কর্ণবন্" (কর্ত্তা) হইয়া ক্ষমতা সঞ্চালন করেন। তাঁহার আচরণ গর্হিত হইলে পরিবারস্থ লোকে অপরকে অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারে। কর্ত্তা দায়াদগণের সম্মতিক্রমে স্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে অধিকারী। তিনি স্বকীয় প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করিলে পারিবারিক বিষয় তজ্জন্য দায়ী নহে। মৃত ব্যক্তির ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য ভাগিনেয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্বকীয় পরিচয় স্থলে মাতুলের নাম লয়, কাহারও ভগিনীর অভাব হইলে

দত্তক ভগিনী গ্রহণ করিবে। সমুদ্র পরিবারে আবশ্যক হইলে, সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্ত সেই পদে একটি বালককেও দত্তক গ্রহণের রীতি আছে। পুত্রের স্থায় কন্যা মাতার এক উদরে জন্মগ্রহণ করেন, তজ্জন্ত সে পরিবারের মধ্যে স্থান পাইতে অধিকারিণী।* মলবারে স্ত্রী অতি আদরণীয়া ও তাঁহার সন্ততি রক্তের সহিত প্রতিপালনীয়; অতএব তাঁহার উত্তরাধিকারী পদবাচ্য; তজ্জন্ত রাজপরিবারে তাঁহাদের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাজকন্যা বা পরিবারস্থ অপর কেহ তাঁহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বর্তমান থাকিলে, "তারবাদ" নিয়মানুসারে তিনি রাজ্য অধিকার করেন।

কেরলের দায়ভাগ সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থ নাই। এই বিষয় কেবল পরম্পরাগত ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতেছে। অন্ধ্র, কর্ণাট ও দ্রবিড়ে তিনখানি স্মৃতি প্রচলিত। ১ম খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত, দেবানন্দ ভট্টের স্মৃতি-চন্দ্রিকা; ২য়, চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্যের রচিত পরাশরমাধব্য নামক পরাশর সংহিতার টীকা; ৩য়, উক্ত শতাব্দীর বরঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্র কৃত সরস্বতী বিলাস। ইহাতে কেরল দায়াধিকার নিবদ্ধ হয় নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে দেশাচার নিয়মিত করা যায় না, দেশাচারকে আদর্শ করিয়া স্মৃতি রচিত হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের প্রমাণ না পাইলে স্মার্ত্তগণ শ্রুতি কল্পনা করেন; তজ্জন্য মিথ্যাবাদ অপকর্ম্ম বিবেচিত হয় না। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বমত স্থাপনের জন্ত বহু প্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক কি না কেহ অনুসন্ধান করেন না। সভাস্থলে বিদ্যার্থিগণ পূর্ব্বপক্ষ ও অধ্যাপকেরা উত্তর পক্ষ গ্রহণ করেন। সত্যনির্ণয়, বিচারের উদ্দেশ্য না হইয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করা অভিপ্রেত বিষয় হইয়া থাকে। নবদ্বীপের কুশদহ সমাজান্তর্গত ইছাপুর নিবাসী কোন স্মার্ত্ত কাশীধামে অধ্যাপনা কালে কহিয়াছিলেন যে, তিনি যৌবনকালে এক প্রাচীন সভায় মত বিশেষ স্থাপন কালে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হইয়া বাসস্থানে প্রত্যাগমন করত তদুপযোগী একটি শ্লোক রচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের একটি পত্র পরিবর্ত্তিত করত, উক্ত শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত করেন, সেই পত্রের নবীনত্ব অপনোদনের জন্ত গোময়ের মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল; পর দিন সভাস্থলে তৎ-প্রদর্শন করিয়া জয়বাদ করিলেন। স্বাধীন মত সাধারণে গৃহীত হইবে না বলিয়া শাস্ত্রীয় টীকাকার আপন উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া মূলগ্রন্থ ব্যাখ্যা করেন; উহা অধিকতর উপযোগী হয়, ইহাতে যাজ্ঞবল্ক্য অপেক্ষা মিতাক্ষরা

সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মলয়ারে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের অনভ্যস্ত বলিয়া কেরল গার্হস্থ প্রণালী শাস্ত্রীয়তা প্রাপ্ত হয় নাই। মলয়ারে যখন নব ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে, কালক্রমে ভাগিনেয়াধিকার সংস্কৃত গ্রন্থে স্থান পাইবে। পয়ন্থুর গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণবংশে "মরুমকতয়ম্" (ভাগিনেয়ের দায়াধিকার) প্রচলিত।

পূর্ব্বকালে কেরলে ভূস্বত্ব সম্বন্ধে উদার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ভূমি সমাজের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত। পর্য্যায়ক্রমে শস্যবপন প্রথা ও সাময়িক বিভাগের নিয়ম অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। পশ্বাদি জীবকেও পরস্পর সাহায্য করিতে দেখা যায়; মানব মণ্ডলীতে সহায়তার জন্যই সমাজের উৎপত্তি। জন্ম গুণে বা ঘটনা পরম্পরায় আনুকূল্যে কেহ বিপুল ধনাধিকারী ও অপরে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইবে, ইহা সমাজনীতি বিরুদ্ধ হওয়া উচিত। ভরণ পোষণের অতিরিক্ত সম্পদে সাধারণের স্বত্ব আছে। ইউরোপ সার্ব্বজনিক সমৃদ্ধি প্রিয়তার জন্য ধন্য। সে কালে ইউরোপ খণ্ডে সাধারণের জন্য বাণিজ্য হইত। ব্যবসায়ের উপযোগিতা এই যে প্রকৃতির কল্যাণে স্থান বিশেষে কোন দ্রব্য সুলভে উৎপন্ন হইয়া, অন্যত্র অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ করিয়া দিলেও তত্রত্য লোকের সুবিধা থাকে, সেই সুবিধার মূল্যকে লভ্য কহা যায়। এই লভ্য ইউরোপে জানপদগণকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। তদুপলক্ষে গ্রামান্তরবাসী সার্থবাহ আসিলে পৌরগণের অতিথিরূপে পরিগণিত হইতেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া অধুনাতন ইউরোপীয় শ্রমজীবিদলের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, বণিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, সাম্রাজ্য কর্ত্তৃক বাণিজ্য পরিচালিত হউক। তাহারা শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, সাম্রাজ্যের রাজকোষ তাহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিবে। যে আলস্যবশতঃ কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, চৌরবৎ দণ্ডনীয় হইবে। পাশ্চাত্য সমাজ সাধারণতাপ্রবণ বলিয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে সম্ভূয়সমুত্থানের প্রাবল্য দেখা যায়। আমরা পরার্থপরতায় যে স্বকীয় হিত আছে, তাহা না বুঝায় সমবেত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি নাই।

নব উপার্জ্জিত স্থানে উপনিবেশিগণ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলে, তাহারা সে অবস্থায় সকলেই সমকক্ষ; ইহাতে যোদ্ধৃতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ করিবার অগ্রে মলয়ার প্রদেশে সর্ব্বাদীন যোদ্ধৃশাসন

প্রচলিত হইয়াছিল। কয়েকখানি "দেশম্" (গ্রাম) এক "দেশবলীর" অধীন থাকিত। অনেকগুলি গ্রাম লইয়া "নাদ" গঠিত হইত, সেগুলি যাঁহার অধীন তিনি "নাদবলী" বা স্থানীয় নিয়ন্তা, তিনি "কোবিলগম্"এর (রাজার) অধীন ছিলেন। উত্তরাধিকারিবিহীন ভূমি, ভোগস্ব ভূমি, দ্রব্যজাত ও বিদেশীয়ের নিকট শুল্ক গ্রহণ প্রভৃতির আয় হইতে "কোবিলগম্" অর্থ সংগ্রহ করিয়া কর্ণাটের চের সম্রাটকে প্রদান করিতেন। এই কর সংগ্রাহক রাজা জনসমাজ কর্তৃক নিয়োজিত ও তদধীনে কার্য্যকারক ছিলেন।

তৎকালে শূদ্রদিগের যে পল্লীসমাজ স্থাপিত হয়, তাহা "তর" নামে অভিহিত। ভূমির সাধারণ অধিকার তদধীন ছিল, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ উক্ত সংসদের নেতা ছিলেন। তাঁহাদিগকে "কুত্তং" (সভা) আহ্বান করিয়া কর্তব্য আলোচনা করিতে হইত, কালে রাজা পরাক্রান্ত হইলে তিনি পল্লীসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন; ইহাতে সামাজিক বল হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। ইদানীং পূর্ব্বতন পল্লীসমাজ একান্নবর্ত্তী পরিবারের পরিজন-তন্ত্ররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালায় পূর্ব্বে যে পল্লীসমাজের অস্তিত্ব ছিল, মণ্ডলপতি, কোষ্ঠপাল ও পট্টলেখকের পদ দৃষ্টে তাহা অনুমিত হইবে।

মলয়ারে ভূমির সাধারণ স্বামিত্ব, মহান্ গ্রামস্বত্ব হইতে সংকীর্ণ পারিবারিক সত্বে উপনীত হইলে পর, ব্যবহারিক বিষয়গুলি সামন্তবলের অধীন করিবার উপক্রম হইতে লাগিল। ইহাতে রাজা ও স্থানীয় নিয়ন্তাদিগের সহিত জনসমাজের ভোগস্ব সম্পর্ক উদ্ভূত হয়। পরিজনতন্ত্র সম্পত্তির উপর প্রাদেশিক নিয়ন্তা ব্যক্তিগত সত্ব প্রাপ্ত হইলেন, ইহার ফলে সংগ্রামের সময় সেনাপতিকে যে অর্থ সাহায্য করিতে হইত, ক্রমে তাহা ভূমির কর হইয়া দাঁড়াইল। দেবস্ব ভূমির কৃষক ও ব্রাহ্মণ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে ক্ষতি রহিল না। করসংগ্রাহক ও শাসনকর্তা ভূম্যধিকারিত্ব লাভ করিলেন। নায়ারগণ প্রজারূপে পরিগণিত হইল; তদবধি তাহারা স্থিরিসত্ত্ববান হইয়াছে। যতকাল ভূমির উৎকর্ষ সাধনে বিরত না হয় ও কর প্রদানে সক্ষম থাকে, তদীয় স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রহিবে।

বৃটিষ মলয়ারে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের ন্যায় ভূম্যধিকারীর সহিত রাজস্বের চিরস্থায়ী নিয়ম হইয়াছে। সম্প্রতি ইংরাজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া প্রজার অধিকার বৃদ্ধি করিতে উৎসুক হইতেছেন। "বেরুম্ পাট্টাম্"

দখের প্রজা, শস্য উৎপাদনের ব্যয় গ্রহণ করতঃ উৎপন্ন সামগ্রী ভূম্যধিকারীকে দিয়া থাকেন। ভূম্যধিকারী প্রায়শঃ উৎপন্ন বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া কৃষকের নিকট একতৃতীয়াংশ অর্থ গ্রহণ করেন। "কানম্ পাট্টম্" প্রজা ভূস্বামীর নিকট কিঞ্চিৎ ধন বা ধান্য গচ্ছিত রাখিয়া অনধিক দ্বাদশ বৎসরের জন্য ভূমি গ্রহণ করে। তাহারা উৎপাদন ব্যয় ও বীজের মূল্য বিয়োগ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ ভূম্যধিকারীকে প্রদান করে, এবং স্বীয় গচ্ছিত অর্থের কুসীদ গ্রহণ করিয়া থাকে। যে ভূমির উপস্বত্ব আধমন রক্ষা করিয়া ঋণ গ্রহণ করা হয়, তাহা "তট্টি" নামে অভিহিত, এই অর্থ ব্যবহারে কলাবৃদ্ধি নাই। ভূমি বিক্রীত হইলে উত্তমর্ণ সর্ব্বাগ্রে ক্রয় করিতে অধিকারী। হস্তান্তর করণের উপরিউক্ত বিধিত্রয়ের কোনটি অগ্রে অবলম্বিত না হইয়া বৃটিষ কেরলে ভূমি বিক্রয় হয় না। পুরস্কার বা কোন কার্য্যের বেতন স্বরূপ চিরস্থায়ী স্বত্বে যে ভূমি প্রদত্ত হয়, তাহার উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে দাতা পুনঃপ্রাপ্ত হন। দেবস্ব সম্পত্তি পূর্ব্বে রাজকীয় তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ছিল, ইংরাজ রাজশক্তি গ্রহণ করিলে, তদধীন হইয়াছে। কুচ্চি বৃটিষ মলয়ার ভুক্ত নহে, অত্রত্য ভূস্বত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে।

আমরা সুদূর ভারত সীমান্তে সাম্যের বিবিধ আকার পরিদর্শন করতঃ অতিমাত্র আনন্দ অনুভব করিতেছি। সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক অবস্থায় মনুজ মাত্রে সমান। নৈসর্গিক প্রকৃতি ও সম্পত্তির অধিকারিত্বে তাবৎ লোক সমভাবাপন্ন। সভ্যতা বৃদ্ধি হইলে বৈষম্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অনিষ্ট দেখিলে বন্দোবস্ত প্রীতিপ্রদ বিবেচিত হইয়া থাকে। কখনও সাম্য, কদাচিৎ বৈষম্য উন্নতিজনক। সাম্যের অবস্থায় বৈষম্য, এবং বৈষম্যের অবস্থায় সাম্যের জন্য আন্দোলন হয়।

শ্রীদুর্গাচরণ ভুক্তি।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

রসলীলা। ভক্তিযোগ-প্রকাশক শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।/০। রচয়িতার নাম নাই;— কেবল, "প্রকৃতি গায়িকা", এইমাত্র লেখা আছে।

এখানি গানের পুস্তক। মানবাত্মা নায়িকা, পরমাত্মা নায়ক, এই ভাব হইতে গানগুলি রচিত। তাহা ছাড়া "শিশিরকণা" ও তণ্ডুলকণা শীর্ষক দুইটি গদ্য রচনা আছে; এগুলি পরস্পর সম্পর্ক-বিরহিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (আকারে 'ক্ষুদ্র' বলিতেছি) ভাবের গ্রন্থন।"

প্রকাশক ভূমিকায় বলিতেছেন—"গ্রন্থকার কবিতাগুলি রচনা ও গান করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন; কোন দিন যে নিজে উদ্যোগী হইয়া পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিবেন, এ বাসনা তাঁহার কখনও ছিল না। নিতান্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কবিতাগুলি ও তণ্ডুলকণাগুলি তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।" সাহিত্য সৃষ্টি করা আমাদের এই গীতকর্তার উদ্দেশ্য নহে; তিনি ভক্ত, সাধনার অবস্থায় স্বীয় মনোভাবগুলি গীতাকারে পরিণত করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং এই গ্রন্থে সাহিত্য হিসাবে যে অল্প স্বল্প দোষ বা ত্রুটি আছে, তাহার আলোচনা হইতে আমরা বিরত থাকিব।

আমাদের দেশে বৈষ্ণবকবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনার ছলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার বিরহমিলন বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী কবি শ্রীমতী গায়ন ঈশ্বরকে প্রতি সম্বোধন করিয়া অনেক কবিতা রচনা করিয়াছেন। পারসী সাহিত্যেও হাফিজ্ এবং আবু সৈয়দ (যিনি আবুল খায়েরের পুত্র; আরও 'আবু সৈয়দ' আছে) প্রভৃতি কবিগণ এই ভাবে অনুপ্রাণিত। কিন্তু ইহার মধ্যে কথা আছে। আমাদের বৈষ্ণবকবিতা ও হাফিজের কবিতা যে ভাবের, আবু সৈয়দ এবং শ্রীমতী গায়নের কবিতা সে ভাবের নহে। বৈষ্ণবকবিতার আধ্যাত্মিক-ভাবটা আধিভৌতিক-ভাবের গাঢ়কৃষ্ণযবনিকায় এমন সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন, যে কাহারও সাধ্য নাই তাহার অন্তর্ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক ভাব অনায়াসে প্রত্যক্ষ করে। এই বিরহমিলনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রাধা জীবাত্মা এটা যদি আমি স্বীকার করিলাম, তবেই ভাল; নচেৎ তর্ক করিয়া প্রমাণ করা সহজ নহে। হাফিজের কবিতাও তাহাই;—তাঁহার শত্রুপক্ষেরা আধ্যাত্মিক ভাব আদৌ স্বীকারই করে না; আবার, যাহারা তাঁহার ভক্ত, তাহারা তাঁহার শব্দাবলীর এক আধ্যাত্মিক অভিধান প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে, যথা 'মদ্য' অর্থে 'আত্মসমর্পণ,' 'নিদ্রা' অর্থে 'ভগবচ্চিন্তা,' 'সুগন্ধ' অর্থে 'ঈশ্বরকৃপায় আশা' 'চুম্বন' ও 'আলিঙ্গন' অর্থে 'ধার্ম্মিকের পুলকমত্ততা,' 'শৌণ্ডিকালয়' অর্থে 'নিভৃত বক্তৃতালয়' 'শৌণ্ডিক' অর্থে 'শিক্ষাগুরু,' 'পৌত্তলিক,' 'অবিশ্বাসী,' 'ব্যভিচারী' অর্থে 'পরম ধার্ম্মিক

পুরুষ' ইত্যাদি*। শ্রীমতী গায়ন ও আবু সৈয়দের কাব্যে আধিভৌতিকের কোনও আবরণ নাই। তাঁহারা নিজেই বক্তা; ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই আপন আপন প্রেমসঙ্গীত গাহিয়াছেন। রসলীলার গানগুলিও এই শ্রেণীর। সুতরাং ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যে এই পুস্তকের মন্তব্যে লিখিয়াছেন (এই মন্তব্য পুস্তকের আবরণেই মুদ্রিত আছে) —"এ প্রকার গানের অপব্যবহার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এ প্রকার গানের অপব্যবহার হইতেই নেড়ানেড়ির দলের সৃষ্টি হইয়াছে।"—আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এ আশঙ্কার তত কারণ নাই। বৈষ্ণব-কবিতার অগ্নি মৃত্তিকা-গোলকে আবৃত আছে বলিয়াই নেড়ানেড়িরা তাহা লইয়া নিরাপদে ভাঁটা খেলাইয়াছে।

যে মহান্ প্রেমধর্ম্ম হইতে এই সকল কবিতার উৎপত্তি, তাহার কোন প্রকার আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে; এবং তাহার জন্য যে প্রচুর ক্ষমতার প্রয়োজন, তাহাও হয় ত আমাদের নাই। আমরা শুধু গান-গুলির আলোচনা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব।

এ পুস্তক আর কাহাকে উপহৃত হইবে? বাগীশ্বরী রাগিণীতে ভক্তকবি গাহিতেছেন:—

পাগলিনী-নাথ তুমি, পাগলিনী আমি তব।
তোমারি সোহাগে, নাথ, ফুটে ফুল নব নব॥
গাঁথি বন ফুল মালা, সাজা'য়ে বরণ-ডালা,
এসেছি তোমার কাছে—কেন—কেন—কি তা কব!

গ্রন্থারম্ভে কতকগুলি সুন্দর "উদ্বোধন"-সঙ্গীত আছে;—তাহার মধ্য হইতে দুইটি এখানে তুলিয়া দিতেছি।

(সারঙ্গ—ঝাঁপতাল)

মহিমা মন্দির মাঝে বিরাজেন বিশ্বপতি,
পুলকে নিখিল বিশ্ব সসম্ভ্রমে করে নতি।
মহান্ সমাধি মাঝে
মহা শূন্য সদা রাজে,
বক্ষে কোটি রবি চন্দ্র নির্ভয়ে করিছে রতি।
অসীম রহস্যধাম, ছুটে কাল অবিরাম,
জন্ম মৃত্যু সঙ্গে ধায়, সকলি নিগূঢ় অতি।
ঘন অবিদ্যার মাঝে,
মহাজ্ঞান সদা রাজে,
লীলাময় রসধাম স্বপ্রকাশ মহা জ্যোতিঃ।

(পরজ ঝাঁপতাল)

তোমারে বুঝিতে গেলে অবোধ হইয়ে যাই;
আপনি বুঝালে তুমি তখনই তোমারে পাই।

---

* এগুলি Asiatic Society of Bengal সম্পাদিত Thomas William Beale সাহেব প্রণীত Oriental Biographical Dictionary হইতে গৃহীত হইল।

তোমারে ছাড়িয়ে পথে আপনি চলিতে চাই—
যেতে না যেতেই পথে অমনি পথ হারাই।
তোমারে ছাড়িলে পাপ নিজে না দেখিতে পাই ;
বসিলে তোমার কাছে কাঁপে পাপ দেখি তাই।
মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, বনিতা, ভগিনী, ভাই,
তোমা ছাড়া হলে দেখি আজি আছে কালি নাই।
তোমারে পাইলে নাথ তোমাতে সকলি পাই ;
ভাবিলে ঝরে গো আঁখি তোমারই তুলনা নাই।

তাহার পর "পূর্ব্বরাগে"র বর্ণনা। অন্তরের নিভৃতকেন্দ্রে বসিয়া কে যেন বাঁশী বাজাইয়া প্রেমিকা মানবাত্মাকে আহ্বান করিতেছে। সেই বংশীধ্বনি তাহাকে মুগ্ধ করিল, পাগল করিল। সে পথ জানে না, কোথায় যাইলে তাহাকে পাইবে! ক্রমে সেই আহ্বানকারী

আসি দীনবেশে হৃদি দ্বারদেশে
আঘাত করে গো।

প্রেমধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের এইখানেই পার্থক্য। তিনি যেমন আমার প্রার্থনীয় ধন, আমিও সেইরূপ তাঁহার কাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাই আমি তাঁহাকে ভুলিলেও, তিনি আমাকে ভুলিতে দেন না।

(ওগো) শুনি সে যে বিশ্ব— ভুবনের নাথ
লুটায় পায়ে নিখিল ;
(তবে) ভিখারীর দ্বারে ভিখারীর বেশে
কেন গো দাঁড়াইল ?

এ বড় সমস্যা! একেই ত আমিই ভিখারী ;—আমার অশেষ অভাব, অনন্ত দারিদ্র্য—আমাকেও তাঁহার এত প্রয়োজন!

প্রেমিক ধরা দিল—"সম্ভোগ" আরম্ভ হইল। তাঁহার মধুর করস্পর্শে প্রেমিকার শিরায় শিরায় রসের লহরী ছুটিল। প্রেমিকা তখন আত্মহারা হইয়া গাহিল :—

স্বরগের সুধারাশি মরতে কি নামিল!
বসন্ত কি নবসাজে বসুধা সাজাইল!
রস গন্ধ ভাষা গান, পুণ্য প্রেম ভাব প্রাণ
কি কুহকে একেবারে সব ফুটে উঠিল।
এত আলো মাঝে কেন কিছু না দেখিতে পাই
আশা আনন্দে কিরে নয়নেতে জ্যোতি নাই!
আয় বঁধু আয় আয় বুকের মাঝারে আয় ;
হেরিতে ও মুখ কেন জলে আঁখি ভরিল।

অন্যত্র, কেমন গভীর তন্ময়ত্ব—

ফুলময়! ফুলময়!! হেরি সব ফুলময়!!!
আবেশে অবশ অঙ্গ সহজে গলিয়া রয়,
আবেশে অবশ আঁখি সহজে মুদিয়া রয় ;
আয় মণি দূরে কেন, আয় কাছে, আয় আয়।

নয়নের নীর দিয়ে চরণ ধোয়াইব,
নিবিড় কুন্তলদামে যতনে মুছায়ে দিব ;
যেমেতে শ্রীমুখ, ঘন চুম্বনে চুমিয়ে নিব,
গভীর আঁখির কথা আঁখিতে শুষিয়ে নিব।
মরমের পুঁথি খানি খুলে দেখ সখা গো
পাতে পাতে আঁখিজলে কি আছে লেখা গো!
জীবন মরণ মাখা কত ব্যথা আছে আঁকা
চার চিকুরে গাঁথা সযতনে রাখা গো।

"সম্ভোগে"র অন্তর্গত এইরূপ অনেকগুলি গানে রসতরঙ্গ বহিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, হাফিজের কবিতায় মদ্যপান অর্থে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ; ইহার একটি গানেও সেই মদ্যপানের কথা বর্ণিত আছে :—

মন মদিরা পানে মাতোয়ারা
আলু থালু নিশিদিন!
লোকে যত বলে
ততই আরও ঢালে
একি পণ সুকঠিন।
লাজ ভয় গেল, পাগল ভেল ;
লোকের গঞ্জনা আর ত বাজে না,
পিয়ে পিয়ে দিশাহীন।
* * *
(ও তার) দিধি কিবা ;
রক্তিম বিভা,
ঢালে আর খায়
খায় আর ঢালে
তবু তৃষা নয় ক্ষীণ।

যাহার একবার নেশা চড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে আর কে ফিরাইবে? লোকের গঞ্জনা, অন্য প্রকার সহস্র বাধাবিঘ্ন, তাহাকে নিবৃত্ত করা দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর উত্তেজিতই করিবে।

এইবার "বিরহ"। প্রকাশক মহাশয় ভূমিকায় বলিয়াছেন—"ভগবান মানবাত্মায় প্রথম দর্শন দিয়া তাঁহার সঙ্গসুখরস আস্বাদনের সুবিধা দেন ; তাহার পর অদৃশ্য হইয়া যান। ইহাতেই অনুরাগ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠে।" একদিন সহসা প্রেমিকা অন্ধকার দেখিল—হৃদয়নাথ অদৃশ্য হইয়াছেন। তখন কাঁদিয়া গাহিল—

কোথা গেল রে,
আমায় এমন করে' পাগল করে'?
যখন জান্‌তাম না চিন্‌তাম না তারে গো,
তখন সে কতই ব্যাকুল আমার তরে।
যখন চিন্‌লাম তারে আপন বলে' গো,
তখন ফাঁকি দিয়ে গেল চলে'।

আবু সৈয়দও কাঁদিয়াছেন—

In Thine own house Thou gavest me a p'ace,
And with sweet intercourse my soul didst grace :

With all thy charms Thou didst excit my love,
Then turned, and to the desert set thy face.*

—তুমি স্বীয় গৃহে আমাকে স্থান দিয়াছিলে, মধুর সঙ্গসুখে আমার আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলে, অশেষ প্রকারে আমার প্রণয় উত্তেজিত করিয়া এখন অদর্শন হইয়াছ!

এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত দিন কাটিয়া গেল, তবু ভগবানের দর্শন নাই—

পথপানে চেয়ে জীবন গোঁয়ানু;
বঁধু আমার কেন এল না?
আশা প্রপাতে হৃদয় ক্ষরিল,
এ আশা কেন গেল না?
প্রাণমাঝে কেন ফোটে এ ফুল,
কি মনোমদে পরাণ আকুল।
যতনে সাজান হৃদয় কুটীর
ভাঙিল, তবু এল না।
পায়েরি শব্দ শুনিব বলিয়া,
থাকি গো নীরবে নিশ্বাস রোধিয়া
ঘুমাই স্বপনে দেখিব বলিয়া,
এ নেশা কেন ছুটিল না?

যত দিন যায়, ততই সন্দেহ হয়, তাঁহার সে প্রেম ছলনা নহে ত?

শঠতা মাখান আঁখি পীরিতির রঙে ঢাকি,
মরম ভেদিতে গেল রাখিয়া।

যেখানে প্রণয়, সেইখানেই সন্দেহ। শ্রীমতী গাইনও এইভাব প্রকাশ করিয়াছেন:—

Is this the joy so promised? this the love,
The unchanging love, so sworn in better days*?

* ইংরাজ-কবি Cowper কর্ত্তৃক অনূদিত।

—কত যে সুখের কথা বলিয়াছিলে, তাহা কি এই? তোমার ভালবাসা কি এই? তুমিই না সে সব দিনে বলিতে, তোমার প্রণয়ে কখনও অন্ত ভাব হইবে না!

"বিরহ"-সঙ্গীতেই গানগুলি শেষ হইয়াছে। মিলনটা বাকী রাখা ভাল হয় নাই। একটা প্রবাদ আছে, যদি রামায়ণে "লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন" পড়া যায়, তবে সেদিন "প্রাণদান" পর্য্যন্ত পড়া চাই-ই;—নহিলে পাপ হয়। প্রকাশক মহাশয় অনায়াসেই বহিখানি মিলনান্ত করিতে পারিতেন। "সম্ভোগে"র অন্তর্গত এমন কতকগুলি গান আছে, যাহা এই কাজে লাগান যাইতে পারিত; যথা—"একি আজ ফিরে আইল ফিরে সখা আমারি," "আমার ঘরে আজ (ও) কি শোভারে, আমার সোণার সখা আজ এসেছে,"

* Mr. E. H. Whinfield কর্ত্তৃক অনূদিত।

"এতদিন পরে এলি ফিরে ঘরে," "প্রাণপতি আর ছেড় না, আর ছেড়ে যেওনা"। এগুলি সম্ভোগের মধ্যে অপবিন্যস্ত হইয়াছে। "পূর্ব্বরাগে"র পরই যখন "সম্ভোগ," তখন সেটা প্রথম মিলন বলিয়াই বুঝায়; সুতরাং তাহাতে ফিরিয়া আসিবার কথা, আর না ছাড়িয়া যাওয়ার প্রার্থনা, কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে?

সুরসংযোগ করিলে তবে গানের প্রাণসঞ্চার হয়। প্রকাশক মহাশয় পাদটীকায় গানগুলির সুর ও তাল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আশা করি, সঙ্গীতজ্ঞ-পাঠকগণ এ বহিখানি অধিকতর মাত্রায় উপভোগ করিতে পারিবেন। শ্রীঃ—

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্য বিবরণ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ভগবানকে সর্ব্বাগ্রে নমস্কার করিয়া, সাধারণের অবগতির জন্য আগষ্ট মাসের কার্য্যবিবরণ প্রদান করিতেছি।

বর্ত্তমান মাসের রোগী এবং আতুর সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। দেবিয়া, ৩। স্বর্ণ, ৪। ফুলমণি, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। নবদুর্গা, ৭। সুমিত্রা, ৮। অম্বিকা, ৯। রুক্মিণী, ১০। সরস্বতী, ১১। নিস্তারিণী, ১২। সখী, ১৩। রাজেশ্বরী, ১৪। ব্রহ্মময়ী ১৫। রাজেশ্বরী ২য়, ১৬। ঈশ্বরী, ১৭। রামদাস, ১৮। শরৎ, ১৯। নিস্তার, ২০। মণি, ২১। জুলি, ২২। মহাবীর, ২৩। হরিচরণ, ২৪। আনন্দ।

এ মাসেও অনেকেই জ্বর ও কাশীতে বিশেষ ভুগিয়াছে।

রাজেশ্বরী আরোগ্যলাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

রাজেশ্বরী ২য়। বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসর। নিবাস ঘাঁটালের অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে। একটি ভদ্রলোক ইহাকে রাস্তায় পাইয়া এখানে দিয়া যান। ইহার রোগ বড়ই সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ইহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

ঈশ্বরী। ইহার বিশেষ বিবরণ দাসীতে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বৃদ্ধা আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে যায়, কিন্তু নিজের অত্যাচার বশতঃ আবার রোগাক্রান্ত হয়।

রামদাস। বয়স ২১ বৎসর। নিবাস বেনারস জেলাস্থ তাম্বাগড় গ্রামে। এই দরিদ্র আশ্রয়হীন অন্ধ বালক রাণিগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় ভীক্ষা করিয়া খাইত। একদিন হঠাৎ গাড়ী চাপা পড়িয়া বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হয়। তথাকার দয়ালু সেরেস্তাদার বাবু রজনী নাথ রায় তাহাকে বিশেষ অসহায় ও দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছেন।

শরৎ। বয়স ২২ বৎসর। এক যাত্রার দলে রাঁধুনী বামনের কার্য্য করিত। সে জ্বরে একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়ে॥ এই সময়ে যাত্রার দলে বায়না হয় বলিয়া ইহাকে তাহারা রাস্তার ধারে নামাইয়া দিয়া চলিয়া যায়, বলিয়া আমরা সংবাদ পাই এবং ভর্ত্তি করিয়া লই।

নিস্তার। বয়স ৩০ বৎসর। নিবাস হাওড়ার পেয়ারা বাগানে। এ নিতান্ত অসহায় ও মরণাপন্ন অবস্থায় ডুবলহাটীর রাজার হ্যারিসন রোডস্থ বাসার সম্মুখে পড়িয়াছিল। ঐ বাসায় কয়েকটি দয়ালু ভদ্রলোক উহাকে বাবু সোমনাথ রায়কে দিয়া আশ্রমে প্রেরণ করেন। পরে শুনা যায় যে, এই স্ত্রীলোকের ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতা প্রভৃতি আছে। তাহা-

দের সহিত ঝগড়া করিয়া ক্যাম্বেলে যাইবে বলিয়া পলাইয়া আসে। হাসপাতাল পর্য্যন্ত পৌঁছুবার পূর্ব্বেই নিতান্ত অশক্ত হইয়া রাস্তায় শুইয়া পড়ে। আমরা গাড়ী করিয়া লোক দিয়া তাহাকে বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া আসিয়াছি।

মণি। বয়স ৩৫ বৎসর। নিবাস আজিমগঞ্জ জেলার সুধার গ্রামে। চাকর ছিল; জ্বর ও উদরাময় রোগে শয্যাগত হওয়াতে নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়ে। তখন দয়ালু হৃদয় বাবু জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ইহাকে আশ্রমে দিয়া যান। অনেক আরোগ্য লাভ করাতে তাহার দেশের লোক আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়।

জুলি। বয়স ৮০ বৎসর। নিবাস ফরিদপুর জেলাস্থ লক্ষ্মীপুর গ্রামে। এই বৃদ্ধ অন্ধ এবং একান্ত অসহায়। জাতিতে মুসলমান। ফরিদপুরের রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া খাইত। ফরিদপুরের বাবু দিনেশচন্দ্র সেন উহাকে বিশেষ যত্ন সহকারে আনিয়া দাসাশ্রমে দিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধা কেবল দিবারাত্রি চীৎকার করিতে থাকে "নাস্তা দাও, ভাত দাও, জল দাও, তামাক দাও।" তাহার চীৎকারে সকলেই ব্যতিব্যস্ত। সে বরাবরই থাকিবে।

মহাবীর। বয়স ৪৫ বৎসর। নিবাস সুলতানপুর জেলাস্থ কোটিয়া গ্রামে। ইহার স্ত্রী বিয়োগ হওয়াতে হতভাগ্য দুইটি শিশু সন্তান লইয়া এমন ব্যতিব্যস্ত হয় যে সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া অবশেষে শিশু দুটিকে ঘাড়ে করিয়া ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। সে যখন তাহার বুকের উপর শিশু দুটি রাখিয়া নিদ্রা যাইত তখন তাহা দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হইত। মায়ের অবর্ত্তমানে শিশুর কি যন্ত্রণা, ইহা তাহার জলন্ত চিত্র। কলিকাতা ডিস্‌ট্রিক্ট চ্যারিটেবিল সোসাইটি ইহাকে এখানে প্রেরণ করেন, ও অবশেষে টাকা দিয়া ইহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

হরিচরণ দে। বয়স ৫০ বৎসর। নিবাস যশহর জেলাস্থ পোলতানোয়াটা। এখানে কার্য্য করিত। হটাৎ হাঁপ কাশ রোগে শয্যাগত হওয়াতে একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হয় এবং সেবার অভাবে মরণাপন্ন অবস্থা হয়। তাহার বাসাস্থ কয়েক জন স্ত্রীলোক যত্ন করিয়া এখানে রাখিয়া যায়।

আনন্দ। বয়স ৬৫ বৎসর। নিবাস মেদিনীপুর জেলাস্থ কাশিয়াড়ী গ্রামে। বাবু চারুচন্দ্র সরকার ইহাকে দাসাশ্রমে দিয়া যান। ইহার এক সহোদরা আছে। সে লোকের বাড়ী চাকরাণীর কার্য্য করিয়া যাহা পায় তাহাতে ইহার খরচ চালাইতে পারিত না। সে অনেক লোককে অনুরোধ করে যে তাহাকে এক বেলা খাইতে দিয়া যদি কেহ তাহার ভগিনীকে একবেলা খাইতে দেয় ও একটু থাকিবার স্থান দেয়। কিন্তু কিছুতেই কোনও উপায় করিতে না পারিয়া অবশেষে চারুবাবুর পরামর্শানুসারে এখানে দিয়া গিয়াছে।

দান প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দান গুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ভগবান দাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মাসিক চাঁদা।

S. K. Lahiri Esq. ৯৬ সালের আগষ্ট হইতে ৯৭ সালের জুলাই ৬৲, বাবু প্রসাদ দত্ত আগষ্ট ৵০, R. N. Mukrjee Esqr. আগষ্ট ১৲, ৩৮।৫ সুকীয়া ষ্ট্রীট মেস, জুলাই ।০, ডাঃ প্রাণধন বসু, আগষ্ট ১৲, ডাঃ সতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আগষ্ট ।০, বাবু অভয়চরণ মল্লিক, আগষ্ট ১৲, বাবু শ্রীশ চক্রবর্ত্তী জুলাই ।০, বাবু অনাথনাথ দেব, জুলাই, আগষ্ট ২৲, বাবু কেদারনাথ দাস জুলাই ।০, বাবু কেদারনাথ ঘোষ, জুলাই ।০, বাবু যদুনাথ বরাট, আগষ্ট ১৲, বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জুলাই ।০, বাবু গৌরীশঙ্কর দে, জুলাই ।০, বাবু পিয়ারীমোহন ভড়, জুলাই ।০, A lady C/o Babu Sreenath Das, জুলাই ১৲, বাবু নন্দকুমার দত্ত, জুলাই ১৲, বাবু পশুপতিনাথ বসু, জুলাই ১৲, বাবু নন্দবিহারী মিত্র,

জুলাই ।০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু, আগষ্ট ১৲, ডাঃ চুনিলাল বসু, আগষ্ট ১৲, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস, জুলাই ১৲, N. K. Bose Esqr., জুলাই ১৲, বাবু করুণাদাস বসু, আগষ্ট ।০, বাবু তেজচন্দ্র বসু, জুলাই ৷৹, A Son C/o Babu Girindra Nath Ghose. ফেব্রুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর ২৲, বাবু খুদিরাম বসু, জুলাই ৷৹ R C. Dutt Esqr, জুলাই হইতে ডিসেম্বর ৬৲, কলিকাতা ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি, কলিকাতার ৬৪ জনের সাহায্য বাবৎ আগষ্ট ১৮৲, বাবু যোগেশচন্দ্র সিংহ, আগষ্ট ১৲, ২নং সরকার্স লেন মেস্, আগষ্ট ।০, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা, ভাদ্র ৷৹, বাবু নীরোদনাথ মুখোপাধ্যায়, আগষ্ট ৷৹, বাবু বেণী ভূষণ রায়, আগষ্ট ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, জুলাই ১৲, কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ, জুলাই ৷৹ বাবু পৃথিশ্বর রায়চৌধুরী আগষ্ট ১।

এক কালীন দান।

কোনও বন্ধু. পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, একজন বন্ধু, শিবপুর ১৲, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ২৲, গরীব হিতকারিণী সভা ২৲, বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান ৵০, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, প্রচারক ৩৲, বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ ৵০, বাবু তারিণীমোহন দে কর্ত্তৃক কুচবিহার হইতে সংগৃহীত ১।০, বাবু হারাণচন্দ্র রায়, পুত্রের জাতকর্ম্মে ১৲. বাবু রামচন্দ্র রায় ।০, বাবু বিনোদবিহারী বন্দোপাধ্যায় ।০, বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু ৷৹, ২৭।১ ঝামাপুকুর মেস্ ।০, A. C. Sen Esqr, বৰ্দ্ধমান ৫৲. বাবু শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী ১৲, বাবু শিবচন্দ্র চৌধুরী ১৲, বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কাপড় খরিদের জন্য ১০৲, ১৮নং আমহাষ্ট ষ্ট্রীট মেস্ ৷৹, ৪৭।১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট মেস্ ৴০, A friend. ।০, A friend, ।০, ১০৮ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ ৵১০ ৫০ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ ৵০, বাবু হেমন্তকুমার পাল ৷৹, বাবু কিরণচন্দ্র বসু ৷৹, বাবু সত্যেন্দ্রনাথ আঢ্য ।৵০, বাবু শরৎকুমার বসু ৵০, বাবু শ্রীপতি দত্ত ।০, বাবু অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার ৵০, বাবু বনবিহারী বসু ।০, বাবু যুগলকীশোর ত্রিবেদী ৷৹, বাবু শিশিরকুমার ঘোষাল ৵০, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ৵০, বাবু নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৵০, বাবু শশিকুমার সেন ৵০, বাবু রমেশচন্দ্র হাতি ৵০, A friend ।০, A well wisher of Dasasram ২৲, ৬৫ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট মেস ।০, ২১।১নং পটুয়াটোলা মেস্ ।০, বাবু বেণীমাধব বসু ৫৲, ১৭নং কানাইলাল ধর মেস্ ৴০, ১৩।১নং হ্যারিসন্‌রোড মেস্ ৷৹, S. C. Mukerjee Esqr. ।০, রাণী হেমন্তকুমারী দেবী ৫৲, বাবু গঙ্গাধর বন্দোপাধ্যায় ৷৹, বাবু কামিনীকুমার মজুমদার ।০, ১২৬ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ ৷৹, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ১৷৹, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ।০, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ১৲, A friend ১৲, বাবু চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲, বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র আইচ ১৲, বাবু উপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ২৲, বাবু হরিনাথ সেন ৷৹, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ৷৹, বাবু চন্দ্রনাথ মৈত্র ১৲, G. C. Ghose Esqr. ৫৲, বাবু শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৲, বাবু হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ।০, Miss Bidhu Mukhi Bose M. B. ১৲, বাবু ব্রজদুর্লভ হাজরা ২৲, বাবু প্রকাশচন্দ্র রায়, বাঁকিপুর, স্ত্রীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, ৫৫ নং পঞ্চানন তলা মেস ৷৹, বাবু বীরেন্দ্রনাথ রায় ৴০, বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ১৲, A friend ৴০, বাবু ফণিভূষণ ঘোষ ।০, বাবু হেমচন্দ্র রায় ৷৹, বাবু উপেন্দ্র নারায়ণ দে ১৲, শ্রীমতী চারুবালা দেবী ১৲, শ্রীমতী কান্তমোহিনী বসু, বাক্সের জন্য ১৲, শিবপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ ১৷৴১০, "জননী" ।০, রাণী হেমন্তকুমারী দেবী ২৲, বাবু রোহিনী কুমার দাস ১৲, বাবু কিশোরী মোহন বসু কর্ত্তৃক রংপুর হইতে সংগৃহীত ১৷৴০ ভুবন বাবুর পুত্র কন্যাগণ ।৫, বাবু শশীভূষণ সরকার ১৲, বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডেপুটি ৫৲, বাবু যোগেন্দ্রনাথ দে ১৲, বাবু বৈদ্যনাথ রায় ১৲, বাবু শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী ৷৹, খোজা বকস খাঁ ১৲, বাবু দুর্গামোহন বসু ১৲, শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী রায় ২৲, বাবু ছত্রনাথ চৌধুরী ৷৹, বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, অনেক বন্ধু ১০, বাবু অপর্ণাচন্দ্র দত্ত ৩৲, বাসিবন নিবা- সিনী শ্রীমতি কামিনী দেবীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, শ্রীমতী মোক্ষদা সুন্দরী মিত্র, মাতৃশ্রাদ্ধ

উপলক্ষে ১৲, অজ্ঞাতদাতা ।/০ শ্রীমতী প্রিয়দা সুন্দরী দত্ত ১৲, বাবু প্রিয়নাথ দত্ত, নসীপুর ।০, বাবু প্রসন্নচন্দ্র মৌলীক ২৲, বাবু চন্দ্রভূষণ মৌলিক ১৲, বাবু সীতানাথ মৌলীক ১৲, বাবু আশুতোষ মৌলীককর্ত্তৃক পূর্ব্ব সংগৃহীত ২৵০, বাবু মহিমাচন্দ্র রায় ।০, বাবু চুনিলাল সীল ২৲, পড়িয়া পাওয়া মাঃ রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ ৶০, বাবু চারুচন্দ্র বসু ৫৲, বাবু সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৲, বাবু নিবারণচন্দ্র দে ১৲, বাবু যদুনাথ সরকার ১৲, বাবু উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ২৲, বাবু নন্দলাল ঘোষ ৫৲,।বাবু অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় ২৲, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৲, বাবু প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত ৫৲, Excise office, পুরুলিয়া ২॥০, বাবু কৃষ্ণ-দত্ত ।০, বাবু বেচোরাম নন্দী ১৲, বাবু অঘোরনাথ সিংহ ৫৲, বাবু শশধর ভট্টাচার্য্য ১৲, বাবু রাখাল দাস সরকার ১৲, English office পুরুলিয়া ১৲, বাবু লালবিহারী সরকার ।০, বাবু অযোধ্যা নাথ সেন ।০, বালাচাঁদ সিংহ ১৲, মুনসিখানা, পুরুলিয়া ২৲, বাবু রামতারক রায় ২৲, বাবু রামগোপাল বক্সি ৯৫ সালের বার্ষিক চাঁদা ১৲, বাবু বিপিনবিহারী সিংহ ১৲, বাবু জগবন্ধু রায় ।০, বাবু মহেন্দ্রনাথ হাজরা ।০, বাবু অধরচন্দ্র বসু ॥০, বাবু রামবিষ্ণু অধিকারী ॥০, বাবু অক্ষয়কুমার সরকার ॥০, বাবু মহানন্দ চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীমতী শরৎকুমারী সরকার ৫. R. Chatterjee Esqr. ॥০, বাবু ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় ॥০, বাবু সুধর সিংহ ৫ বাবু গঙ্গানারায়ণ ঘোষাল ২, বাবু মোগলচাঁদ মাড়োয়ারী ৫, বাবু জগন্নাথ মাড়োয়ারী ৫, বাবু বরদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় ১, বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ১, বাবু শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী ১, বাবু লোকচাঁদ মাড়োয়ারী ১, বাবু যজ্ঞেশ্বর ঘোষ ১, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥০, অযাচিত দান ৶০ বাবু রণ ছোড় ১ পোষ্ট মাষ্টার ১ বাবু ভুপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ॥০ বাবু রজনীনাথ রায় ১ শ্রীমতী গিরিবালা মল্লিক ॥০ District Charitable Society একজন প্রেরিত আতুরের খোরাক বাবৎ ১ ২৯নং রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন মেস ॥০ ১০ নং পটলডাঙ্গা মেস, ॥০ ৬১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট মেস ৶০ প্রসন্ন কমল সিংহ পুত্রের আরোগ্যার্থে ১।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

ফেরৎ জমা মাঃ দাসাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ গত মাসের জের হইতে ৫৸৴১২॥০ তাপসমালা বিক্রয় মাঃ জগৎচন্দ্র দাস ৩৵০ রুপার চুড়ি বিক্রয় ২৷৴১০ মাণিক দহের জমিদার বাবু বিপিনবিহারী রায়ের প্রজাগণ ৮৸৴৫ বাক্সের দান ।/১০ বস্ত্রাদি বিক্রয় ॥৫।

স্থানাভাববশতঃ বস্ত্রাদির দানপ্রাপ্তি স্বীকার এবারে হইল না

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়—মাসিক চাঁদা ৫৫৵০, এককালীন দান ১৯৫৵১০, অন্যান্য প্রকারে আয় ২১।২॥, পূর্ব্বমাসের হস্তেস্থিত ৫৶০, মোট আয় ২৭৬॥৶১২॥।

ব্যয়—খাই খরচ ৭৭॥৶১২॥, রাঁধুনী ৪॥/১০, চাকর ৬৷৶০, মেহতর ৭৷৴১০, বাটীভাড়া ৫০৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৩৪, রোগীর ও ডাক্তারের গাড়ী ভাড়া ১৪/১০, দুগ্ধ ৮, ধোপা ১৸০, আদায় খরচ ৩২৲১৫, ঔষধ ৫।৵০, কাপড় ৯॥০, বাক্স ১, সুদ ২, মিস্ত্রী ৸৵০, অন্যান্য ২৸১৫। মোট ব্যয় ২৫৭।৵১২॥।

আয় ব্যয়—মোট আয় ২৭৬॥৶১২॥০, মোট ব্যয় ২৫৭।৵১২॥০, হস্তেস্থিত ১৯।/০।

দাসী

ন্যায়পরায়ণ

রাম শাস্ত্রী।

(১৭৫৯ খৃঃ—১৭৯০)

যে পুণ্য-শ্লোক মহাত্মার নামে এই প্রবন্ধের শিরোলেখ ভূষিত করা হইয়াছে, তিনি চতুর্থ পেশওয়া মাধব রাওয়ের সময়ে মহারাষ্ট্র দেশের "মুখ্য ন্যায়াধীশ" (Chief Justice) ছিলেন। রাজ্যের যাবতীয় বিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসার ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল। প্রজাগণের মধ্যে কোন কারণে বিবাদ বিসংবাদ সংঘটিত হইলে, তাহারা প্রথমতঃ স্থানীয় গ্রামাধিকারী ও বাদী-প্রতিবাদীর নির্ব্বাচিত পঞ্চায়তের * সাহায্যে তাহাদিগের বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করিত। তাঁহাদিগের মীমাংসা মনোনীত না হইলে, যথাক্রমে মামলেদার (Collector of Revenues) ও সুভেদারের নিকট তাহার আপীল চলিত। তাঁহারাও পঞ্চায়তের সাহায্যে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সেখানে বাদীর অভীষ্টসিদ্ধি না হইলে, তাহাকে মুখ্য ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীর নিকট আবেদন করিতে হইত। রামশাস্ত্রী সর্ব্বদা মহারাষ্ট্র রাজধানী পুণায় থাকিতেন। তিনি বার্ষিক দুই সহস্র টাকা বেতন পাইতেন। তদ্ভিন্ন পাল্‌কী খরচের ও পোষাক পরিচ্ছদের জন্য তাঁহার বার্ষিক ১২ শত টাকা বরাদ্দ ছিল। তাঁহার সহায়তার জন্য, কয়েকজন ধর্ম্মভীরু ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিয়োজিত ছিলেন। মুখ্য ন্যায়াধীশ ও তাঁহার সহকারিগণ বিচারকালে (গুরুতর মোকদ্দমা হইলে), স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। তারপর যেরূপ প্রণালীতে বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন হইত, তাহা বর্ত্তমানকালের হাই কোর্টের জুরী প্রথার সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিল।

---

* পঞ্চায়তের সভ্য-সংখ্যা, বিচার্য্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে, কখনও কখনও পাঁচ হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইত।

(১৭৬১ খৃঃ—১৭৭২ খৃঃ)

মহারাষ্ট্রপতি চতুর্থ পেশওয়ে মাধব রাও স্বয়ং যেরূপ ন্যায়পরায়ণ ও প্রজারঞ্জক ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁহার অনুরূপ ন্যায়াধীশ পাইয়াছিলেন। ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীর ন্যায় প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা, তীক্ষ্ণধীমত্তা, অপরিমেয় ধর্ম্মশীলতা, কঠোর ন্যায়নিষ্ঠতা, তথা অপূর্ব্ব নির্ভীকতা, নিরপেক্ষতা ও নির্লোভতা প্রভৃতি দেবোপম গুণ, পৃথিবীর যে কোনও দেশে, অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা রামশাস্ত্রী, পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রবিচারে, তদানীন্তন প্রায় সমস্ত পণ্ডিতেরই অজেয় ছিলেন। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে, তিনি অতি কূট চক্রান্তেরও মর্ম্মভেদে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মশীলতা, নির্লোভতা ও সদাচরণ, তৎকালের মহারাষ্ট্র-জনসমূহের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। তাঁহার কঠোর ন্যায়নিষ্ঠতা দর্শনে স্বয়ং মহারাষ্ট্রপতিও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি এরূপ তেজস্বী, স্পষ্টবাদী ও ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন যে, অন্যায় আচরণ করিলে, স্বয়ং নরপতিও তাঁহার তীব্র তিরস্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না;—তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও তাঁহার নিকট বিন্দুমাত্র অন্যায় অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশা করিতেন না। উপযুক্ত দোষ পাইলে, তিনি স্বীয় প্রভু, নরপতিরও প্রাণদণ্ডের আদেশ বিধান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার এই সকল দেবোচিত গুণের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, তাঁহাকে ততই মহৎ হইতে মহত্তর বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এই কারণে, আমরা মহারাষ্ট্র ইতিহাস হইতে এই মহাপুরুষের জীবনের কতিপয় অলৌকিক ঘটনা বঙ্গীয় পাঠকের সমক্ষে প্রকাশ করিলাম।

রামশাস্ত্রী সাতারা (Satara) জেলার অন্তঃপাতী "মাহুলী" নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে, বারাণসী গমনপূর্ব্বক তথায় বহু বর্ষ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমনের বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই, তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও নিঃস্পৃহতা প্রভৃতি অলৌকিক গুণের সৌরভ সমস্ত মহারাষ্ট্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রপতি বালাজী বাজীরাও (মহারাষ্ট্রীয়গণের নিকট নানাসাহেব পেশওয়ে নামে পরিচিত *) তাঁহার গুণগ্রাম শ্রবণে এতদূর

* ইনি কানপুরের হত্যাকাণ্ডের সহিত সংসৃষ্ট নানাসাহেব হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬১ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি মহারাষ্ট্রদেশে শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন। ইঁহার সময়ে পাণিপথের সুপ্রসিদ্ধ তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ১৭৫৯ খৃঃ মহারাষ্ট্র রাজ্যের তদানীন্তন "মুখ্য ন্যায়াধীশ" (Chief Justice) বিসাজী (বিশ্বনাথজী) কৃষ্ণ মহোদয়ের মৃত্যু ঘটিলে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামশাস্ত্রীকে ঐ মহাগৌরবকর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও পরিচয় সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না।

বিনা প্রার্থনায় রাজ সরকারে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াও, রামশাস্ত্রী ক্ষণকালের জন্যও কখন মনে মনে অহঙ্কার বোধ বা কোনও প্রকারে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। তাঁহার আচরণ যৎপরোনাস্তি সরল ও ধর্ম্মানুগত ছিল। তিনি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, প্রাচীনকালের কামক্রোধবিবর্জ্জিত, লোকহিতব্রত দরিদ্র ব্রাহ্মণগণের ন্যায় অতিশয় সামান্য ভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার শান্তিময় কুটীরে বিলাস বা বিষাদের ছায়া কেহ কখনও দর্শন করেন নাই। তিনি কখনও এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতেন না। তাঁহার এইরূপ নিয়ম ছিল যে, তিনি মাত্র দৈনন্দিন ব্যয়ের উপযুক্ত দ্রব্যাদি গৃহে রাখিয়া, অবশিষ্ট সমস্তই দরিদ্রগণকে বিতরণ করিয়া দিতেন। পরদিবসের জন্য কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া রাখা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি অতীব শ্রদ্ধার সহিত ও যথাসাধ্য সম্পূর্ণভাবে তৎসমুদায়ের আচরণ করিতেন।

তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহার এতদূর ধর্ম্ম-সঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত ছিল যে, তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অপেক্ষা, তাঁহার আচরণে মহারাষ্ট্রবাসিগণ অধিকতর শিক্ষা ও উপকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অকৃত্রিম হিতৈষণার আশ্চর্য্যফলে, তিনি তাঁহার স্বদেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।* তিনি ধার্ম্মিকের একমাত্র বন্ধু ও দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণের পক্ষে যমস্বরূপ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মাধিকরণের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া, দেশের কোনও কোনও গণ্যমান্য ও ধনশালী ব্যক্তি দু-একবার তাঁহাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত

* Grant Daff সাহেবও একথা স্বীকার করিয়াছেন। His (Ram Shastri's) conduct and unwearied zeal had a wonderful effect in improving the people of all ranks. Vol. I pp. 668.

করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হওয়ায় এবং এইরূপ গর্হিত উপায় অবলম্বনে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হওয়ায়, আর কেহই শাস্ত্রী মহোদয়কে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতেও সাহসী হন নাই। শাস্ত্রীমহোদয়ের প্রণীত নিয়মাদি ও তাঁহার কৃত বিবাদের মীমাংসাদি এখনও মহারাষ্ট্রদেশে সর্ব্বত্র ভ্রান্তি ও পক্ষপাত শূন্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

রামশাস্ত্রী যখন ন্যায়াধীশের পদ প্রাপ্ত হন, তখন পেশওয়ে মাধব রাওয়ের বয়ঃক্রম ১৫শ বৎসর মাত্র ছিল। ইহার তিন বৎসর পরে, ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পেশওয়ে বালাজী বাজীরাওয়ের মৃত্যু হইলে, ১৮শ বর্ষবয়স্ক মাধব রাও মহারাষ্ট্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রামশাস্ত্রী এই তরুণ-বয়স্ক নরপতিকে প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন বিষয়ে নানা সময়ে নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিতেন। মাধব রাওও শাস্ত্রী মহাশয়কে গুরুতুল্য ভক্তি ও সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিতেন। ক্রমে মাধব রাওয়ের বয়োবৃদ্ধির সহিত, তাঁহার রাজ্য ও ক্ষমতা প্রভৃতির বিস্তার হইলে, তাঁহাকে উপদেশ দ্বারা সৎপথে চালিত করা রাম শাস্ত্রীর পক্ষে অনেক সময় বড় কষ্টকর হইয়া উঠিত। মাধব রাও, সময়ে সময়ে, কাহারও উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কখনও কখনও বা অপরের উপদেশে পরিচালিত হইয়া, রাম শাস্ত্রীর সাহায্য গ্রহণে অবহেলা প্রকাশ করিতেন। একদা কয়েকজন যোগপন্থী ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন করিয়া, মাধব রাওয়ের মন সহসা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি রাজকার্য্যে অমনোযোগিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বদা "দেবারাধনা ও জপ, ধ্যান" প্রভৃতিতে নিমগ্ন থাকিতে লাগিলেন। বলা অনাবশ্যক যে, ইহার ফলে অল্প দিনেই রাজকার্য্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। রাম শাস্ত্রী দেখিলেন, সাধারণ উপদেশের দ্বারা মাধব রাওয়ের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে গেলে, তাঁহার সহিত মনো-মালিন্য ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। মাধব রাওয়ের অসন্তোষে তাঁহার প্রিয় পাত্র ও সহচরগণেরও সহিত অকৌশল ঘটা অবশ্যম্ভাবী। এই সকল ভাবিয়া রাম শাস্ত্রী বিষম বিপদে পড়িলেন। কিন্তু মাধব রাওকে সদুপদেশ দিয়া রাজ কার্য্যে মনোযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করিতে তিনি ক্ষান্ত হইলেন ন'।

একদিন রামশাস্ত্রী কোনও কার্য্য উপলক্ষে মাধব রাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তিনি মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক জপে নিযুক্ত আছেন। রামশাস্ত্রী তাঁহার জন্য অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া গৃহে প্রতি-গমন করিলেন। অনন্তর আহারাদি কার্য্য সমাপন ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি একটী অশ্বে স্থাপন পূর্ব্বক, পুণা পরিত্যাগের উদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গমন কালে একবার স্বীয় প্রভু মাধব রাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজসভায় গমন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট, ন্যায়াধীশ পদ পরিত্যাগের ও বারাণসী গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মাধব রাও ভাবিলেন, যে, তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত যথাসময়ে সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতেছেন। এই কারণে তিনি স্বীয় ব্যবহারের অন্যায্যতা স্বীকার করিয়া শাস্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাহিলেন।

শাস্ত্রী বলিলেন। মহারাজ, জপ ও তপস্যা অবলম্বন করায়, রাজকার্য্যে ও প্রজাগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং আর এ রাজ্যে থাকা উচিত নহে।

মাধব রাও। ব্রাহ্মণের পক্ষে জপ, তপস্যা ও পূজা অতিশয় প্রশস্ত ও শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম নয় কি?

রাম শাস্ত্রী। নিশ্চয়ই প্রশস্ত, একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আপনি যখন ব্রাহ্মণধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনরূপ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তখন উক্ত ধর্ম্ম পালনে অযত্ন করিলে, আপনাকে পাপভাগী হইতে হইবে। নরপতির পক্ষে প্রজাগণের দুঃখ মোচন ও তাহাদিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম আর নাই। এক প্রজাপালনের দ্বারা আপনি জপ, তপ ও পূজা ধ্যান প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার শ্রেয়স্কর কার্য্যের ফল লাভ করিতে পারিবেন। তবে যদি আপনার শাস্ত্রবিহিত ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম পালনের আন্তরিক ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে, তবে এই সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া—সংসারের মোহপাশ ছেদন করিয়া, আমার সঙ্গে আসুন। উভয়ে গঙ্গাতীরে বাস পূর্ব্বক জপ, পূজা ও তপস্যাদি শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পরম শান্তি লাভ করিব।

মাধব রাও এই উপদেশপূর্ণ ভৎর্সনার ন্যায্যতা স্বীকার করিলেন; এবং

সেই দিন হইতে জপ, পূজা ও তপস্যাদির মাত্রা হ্রাস করিয়া রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানে পূর্ব্ববৎ মনোযোগী হইলেন।

পেশওয়ে বংশীয় নরপতিগণ প্রতিবৎসর শ্রাবণ মাসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দক্ষিণা বিতরণ করিতেন। প্রথম বাজীরাওয়ের সময়ে, ১৭৩১ খৃঃ এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত পাঁচদিন ব্রাহ্মণ ভোজন ও তৎপরে দুইদিন দক্ষিণা বিতরণ হইত। শাস্ত্রানুরাগী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা গুণানুসারে ২০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দক্ষিণা পাইতেন। যজ্ঞোপবীত মাত্রধারী ব্রাহ্মণগণকে সাধারণতঃ ২৲ টাকা মাত্র প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে এই "শ্রাবণ মাসীয় দক্ষিণা-সমারোহ" এতদূর প্রসর লাভ করিয়াছিল যে, মিথিলা, কাশী ও রামেশ্বর প্রভৃতি অতিদূরবর্ত্তী প্রদেশের পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাও দক্ষিণাগ্রহণের জন্য পুণায় আগমন করিতেন। প্রতি বৎসর প্রায় ৩০।৪০ সহস্র ব্রাহ্মণের সমাগম হইত; এবং পেশওয়ের রাজকোষ হইতে ৩।৪ লক্ষ টাকা এই উৎসবে ব্যয়িত হইত। কথিত আছে, মাধব রাওয়ের পিতার সময়ে (নানাসাহেব পেশওয়ের সময়ে) একবার এই উৎসবের জন্য ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল।

এই শ্রাবণ মাসীয় দক্ষিণা বিতরণের ভার ন্যায়াধীশের প্রতি সমর্পিত ছিল। নানাফড়ণবীস (রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাব পত্র পরীক্ষক সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী) টাকার তোড়া লইয়া নিকটে বসিয়া থাকিতেন এবং ন্যায়াধীশ রাম শাস্ত্রী ব্রাহ্মণগণকে গুণানুসারে দক্ষিণা প্রদান করিতেন। একদা দক্ষিণা বিতরণ কালে, রামশাস্ত্রীর সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দক্ষিণাগ্রহণের জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্পর্কে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেও, তিনি বিদ্যাবুদ্ধিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, সামান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের অপেক্ষাও হীন ছিলেন। নানাফড়ণবীস তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ২০৲ টাকা দক্ষিণা দিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। রাম শাস্ত্রী এই ন্যায়বিরুদ্ধ অনুরোধে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ভিন্ন অপর কেহ ২০৲ টাকা পাইবার অধিকারী নহে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, একারণে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ যাহা কিছু দিতে হয়, তাহা আমিই স্বয়ং অন্য সময়ে দিব। কিন্তু এই ধর্ম্মার্থ উৎসৃষ্ট অর্থ (দক্ষিণার টাকা) তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিলে, আমাকে, ঐ অর্থের

অপব্যয় ও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি পক্ষপাত জনিত পাপের ফলভাগী হইতে হইবে। অতএব ইঁহাকে সাধারণ প্রথানুসারে ২৲ টাকাই প্রদত্ত হউক।” নানাফড়ণবীস শাস্ত্রী মহাশয়ের এই রূপ নির্লোভতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন। রাম শাস্ত্রী অম্লানবদনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দুইটী মাত্র টাকা দিয়া বিদায় করিলেন।

জেষ্ঠভ্রাতার ন্যায়, রাম শাস্ত্রী মহাশয়ের গোপাল নামে এক অতিশয় স্থূল-বুদ্ধি ও মূর্খ পুত্র ছিল। তিনি তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহার জ্ঞানলাভ হয় নাই। গোপাল বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলে, একদা পেশওয়ে মাধব রাও, তাহার জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় সংকুলনার্থে, তাহাকে জায়গীর স্বরূপ কিছু ভূমি প্রদান করিবার ইচ্ছা-প্রকাশ করিলেন। রাম শাস্ত্রী ইহা অবগত হইয়া মাধব রাওকে বলিলেন, “মহারাজ! এই মূর্খকে জায়গীর দিয়া কি হইবে? ইহাকে না দিয়া অপর কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে দিলে অনেক কাজ হইতে পারে। আমাদের গোপাল মহারাজের শাগির্দ্দগণের (ব্রাহ্মণ ভৃত্যগণের) সহিত প্রাসাদে থাকিয়া, জলোত্তোলন প্রভৃতি কার্য্য করিবে, এবং তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ দুবেলা পেট ভরিয়া ভোজন করিবে। এতদপেক্ষা অধিকতর অনুগ্রহ প্রাপ্তির যোগ্যতা গোপালের আছে বলিয়া আমি মনে করি না।” পেশ-ওয়ে মাধব রাও রাম শাস্ত্রীর এইরূপ নিরপেক্ষতা ও নির্লোভতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। শাস্ত্রী মহোদয় জীবিত থাকিতে, গোপাল কোনও রূপ রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হন নাই। ১৭৯০ খৃঃ শাস্ত্রী মহোদয় ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র গোপাল (তখন গোপাল শাস্ত্রী নামে পরিচিত!) স্বর্গীয় রাম শাস্ত্রীর পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ রাজকোষ হইতে বার্ষিক ৩২ শত টাকা পাইতে লাগিলেন।

রাম শাস্ত্রীর ন্যায়পরতা ও নির্লোভতার ন্যায়, তাঁহার নির্ভীকতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রী মহাশয় ন্যায়াধীশের কার্য্য করিতেন বলিয়া রাজ সরকার হইতে তিনি পাল্‌কী ও “আব্‌দাগীর” (ছত্র) প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। প্রত্যহ সেই পাল্‌কী আরোহণে তিনি রাজসভায় যাইতেন। বহু দিনের ব্যবহারে, পাল্‌কীটী পুরাতন ও কিয়ৎপরিমাণে জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে নানাফড়ণবীস পেশওয়ের মন্ত্রিত্ব পদে উন্নীত হইয়া-ছিলেন। তিনি রাম শাস্ত্রীর শিবিকা জীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহাকে

একটী নূতন শিবিকা পাঠাইয়া দিলেন। নানাফড়ণবীসের অনুচরেরা ঐ শিবিকা লইয়া শাস্ত্রীর গৃহে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনুচরেরা বলিল যে, "নানাসাহেব আপনার জন্ম এ শিবিকা প্রেরণ করিয়াছেন।" এস্থলে বঙ্গীয় পাঠকগণের অবগতির জন্ম ইহা বলা আবশ্যক যে, মহারাজ মাধব রাওয়ের পিতা পেশওয়ে বালাজী বাজীরাও (রাজ্য কাল খৃঃ ১৭৪০—১৭৬১) "নানাসাহেব পেশওয়ে" নামে মহারাষ্ট্রীয়গণের নিকট পরিচিত ছিলেন। এবং মহারাষ্ট্রদেশের তাৎকালিক প্রথানুসারে পেশওয়েগণ ও তাঁহাদিগের আত্মীয়বর্গ ভিন্ন অপর কাহারও নামের সহিত "সাহেব" এই সম্মানসূচক উপাধি ব্যবহৃত হইত না। এই কারণে, নানা ফড়ণবীসের নামের সহিত "সাহেব" উপাধিযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া, রাম শাস্ত্রী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইলেন। এবং নানার গর্ব্ব-চুর্ণ করিবার জন্ম অনুচরবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কি? নানা সাহেব, এই পাল্‌কী পাঠাইয়া দিয়াছেন? নানা সাহেব কে? তিনি ত অনেক দিন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন!" এই বলিয়া তিনি শিবিকাটী ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিলেন; এবং আজীবন তাঁহার সেই পুরাতন প্রভুর প্রদত্ত জীর্ণ শিবিকাটী ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই গেল এক শ্রেণীর নির্ভীকতা। আর এক শ্রেণীর নির্ভীকতার কথা বলিতেছি। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, ইংরাজী শিক্ষার গুণে, ভারত-বাসীর মন বহুলপরিমাণে সংস্কৃত হওয়ায়, তাঁহারা অনেক পরিমাণে স্বাধীন-চিন্ততা শিক্ষা করিয়াছেন। তথাপি লোকাচারের বা শাস্ত্রকারগণের বিরুদ্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে গিয়া সময়ে সময়ে কিরূপ বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাম শাস্ত্রী এ বিষয়ে যেরূপ স্বাধীনচিন্ততা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিলে হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।

একদা কোনও বৈষ্ণবী রাজপ্রাসাদে সঙ্কীর্ত্তন ও কথকতা করিতে-ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে, কলিযুগের রমণী সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মতের উল্লেখ করিয়া, বৈষ্ণবী রাম শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—"কলিযুগের রমণীগণ বহুভোজিনী ও অধিকতর রিপুপরবশা হইবে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা তাহাদিগের নিন্দা করিয়াছেন, অথচ বর্ত্তমান যুগে, পূর্ব্বযুগ প্রচলিত বিধবা-বিবাহাদি প্রথারও প্রতিষেধ করিয়াছেন। ইহার কারণ কি?" বৈষ্ণবীর

মুখে এই অদ্ভুত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সকলেই রাম শাস্ত্রীর উত্তর শুনিবার জন্ত ব্যগ্রভাবে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে স্বাধীন-চিত্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—"মা! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি যথার্থ। বস্তুতঃ এ বিষয়ের কোনও সরল মীমাংসা নাই। তবে আমার বিশ্বাস, শাস্ত্রকারগণ পুরুষ ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা স্থলে স্থলে রমণীগণের অযথা নিন্দা ও তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পুরুষগণের সুবিধা মত নিয়মাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। শাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মধ্যে যদি কেহ রমণী থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শাস্ত্রমধ্যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে অনেক অনুকূল নিয়ম পাওয়া যাইত!" রাম শাস্ত্রীর ন্যায় ধর্ম্ম-নিরত, ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণের মুখে এই সরল সত্য, শাস্ত্রকারগণের সম্বন্ধে এই সুতীব্র মন্তব্য, শ্রবণ করিলে, তাঁহার নির্ভীকতা ও স্বাধীনচিত্ততা সম্বন্ধে কোনও রূপ সন্দেহ থাকে না।

শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ সময়ে ও যেরূপ সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় কঠোর সত্যপ্রিয়, নিরপেক্ষ ও নির্লোভ ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ এরূপ লৌকিক বিশ্বাস-বিরোধী সত্য স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেন না। যিনি এরূপ সত্যদর্শী ও নির্ভীক, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ মত ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। একদা পেশওয়ে মাধব রাওয়ের জনৈক ব্রাহ্মণ-সেনাপতি সর্দার পরশুরাম ভাউ'র অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা বিবাহের চতুর্থ দিবসে বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইলে, 'ভাউ' রাম শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ইহাকে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিতে, অথবা অপর স্বামীর পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ করেন? এ বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় কিরূপ?" শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্র আলোচনা করিয়া উত্তর দিলেন,—"আমার বিবেচনায় শাস্ত্রানুসারে ইহার দ্বিতীয় বার বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।" অনন্তর এই অশ্রুতপূর্ব্ব মতের মীমাংসার জন্য রাজ-প্রাসাদে পণ্ডিতগণের সভা আহূত হইয়াছিল। সভার সমস্ত পণ্ডিতগণের বিচারে রাম শাস্ত্রীর মতই শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হইল। নানা ফড়নবীসের পরামর্শ অনুসারে এ বিষয়ে কঙ্কণের ব্রাহ্মণ সমাজের ও বারাণসীর পণ্ডিতগণের মতও গৃহীত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের মীমাংসার বিরুদ্ধে কেহই মত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এইরূপে বহুজনসম্মতি-ক্রমে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণিত হইলেও বোধ হয় কঙ্কণবাসী

সামাজিকগণের অনিচ্ছাহেতু ও অপর কতিপয় কারণে সে সময়ে আর পরশু রাম ভাউর কন্যার পুনর্ব্বিবাহ ঘটিয়া উঠে নাই।

রাম শাস্ত্রীর জীবনের আর একটী ঘটনার—তাঁহার জীবনের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্ব প্রধান ঘটনার—উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পেশওয়ে মাধবরাও ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে অকালে রাজযক্ষা রোগে প্রাণত্যাগ করিলে, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'নারায়ণ রাও' সিংহাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। 'রঘুনাথ রাও' নামক নারায়ণ রাওয়ের এক পিতৃব্য ছিলেন। তিনি মাধব রাওয়ের পিতা বালাজী বাজী রাওয়ের মধ্যম সহোদর। এই কারণে বালাজী বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর হইতেই তিনি মহারাষ্ট্র রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পাইবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। মাধব রাও যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন রঘুনাথ রাওয়ের আশা পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে নারায়ণ রাওকে অল্প বয়স্ক ও দুর্ব্বল দেখিয়া, তাঁহাকে বন্দী পূর্ব্বক তিনি স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের স্ত্রী দুষ্টমতি আনন্দীবাই স্বামীর সিংহাসন প্রাপ্তির সহায়তাকল্পে এক অতীব জঘন্যতম পৈশাচিক উপায়ের অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সুমের সিংহ ও খড়্গা সিংহ নামক দুই জন সেনানীর সাহায্যে নারায়ণ রাওকে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজ্যলুব্ধ রঘুনাথও পরোক্ষ ভাবে এই কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন। তার পর যেরূপ নিষ্ঠুর ভাবে বালক নারায়ণ রাওকে সহসা হত্যা করা হইয়াছিল, তাহা গত বর্ষের "সাহিত্য" পত্রে প্রকাশিত "নারায়ণ রাওয়ের বখর" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিবরণের সহিত বর্ত্তমান প্রস্তাবের কোনও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই বলিয়া, এ স্থলে তাহার বর্ণনায় ক্ষান্ত থাকিলাম।

নারায়ণ রাও নিহত হইলে, নানা ফড়নবীস প্রভৃতি সচিবগণ রঘুনাথ রাওকে 'রক্তের তিলক' পরাইয়া সিংহাসনে বসাইলেন। রঘুনাথ রাওয়ের প্রতি অনেকের সন্দেহ থাকিলেও, তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে বাধা দিবার চেষ্টা করেন নাই। ন্যায়াধীশ রাম শাস্ত্রীও এ বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত করেন নাই। কিন্তু তিনি বিশেষ পরিশ্রম সহকারে গোপনে এই ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রায় ৬ সপ্তাহ কাল সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধানের পর, তিনি রঘুনাথ রাওয়ের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট

প্রমাণাদি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রঘুনাথের লিখিত এই ঘটনা সংক্রান্ত চিঠি পত্রের আবিষ্কার করিয়া রঘুনাথ রাওকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। রঘুনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আংশিক দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন যে 'সঙ্গদোষে আমি অকারণ জনাপবাদের ও অভিশাপের ভাগী হইয়াছি। এজন্য আমার কি প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত?' রঘুনাথ রাও সচিবমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসন হইতে শাস্ত্রী মহাশয়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নির্ভীকহৃদয় রাম শাস্ত্রী তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্য সভায় রঘু-নাথের দোষোল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন,—"প্রাণদণ্ড ভিন্ন আপনার পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। কারণ ভবিষ্যতে আপনি আর কখনই কোনও প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না। আপনার নিজের অথবা আপনার রাজ্যেরও উন্নতি কখনই হইবে না। আর আপনি যত দিন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, ততদিন আমি আর এই পাপ রাজ্যে পদার্পণ করিব না।" এই বলিয়া ন্যায়পরায়ণ রাম শাস্ত্রী রাজ কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, সপরিবারে পুণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণা নদীর তীরবর্ত্তী কোনও নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া বসতি করিলেন; এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ পরমার্থ সাধনে অতিবাহিত করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

"নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ।"

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

একটা কথা—চরিত্রানুমান বিদ্যা।

গত মাসের আমার কথায় কেহ বা সন্তুষ্ট,—কেহ বা আমার বন্ধুর মত নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। ঘনিষ্ঠ-বন্ধুদিগের মধ্যেও কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটিতে পারে, এ কথাটা অনেক লোকে ভুলিয়া যান। কোন বিষয়েই মতভেদ না হওয়াই বিচিত্র, এবং এরূপ না হওয়ার অর্থ এই যে, সে বিষয়ে আমরা রীতিমত মনোযোগ করি নাই। প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণন করিতে গেলেই যখন মতভেদের সম্ভাবনা, তখন বিবাদবস্তুর সত্যতার বিচারে মতভেদ অনিবার্য্য। আপনার শিক্ষা ও সংসর্গ অনুসারে আপনার মনের গতি হইবে, আমার শিক্ষা ও সংসর্গ অনুসারে আমার মনের গতি হইবে।

যে প্রমাণ আপনি যৎসামান্য মনে করিবেন, হয় ত তাহাই আমার নিকট যথোচিত বলিয়া বোধ হইবে।

* * *

এই মতভেদ অনেকে সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, যখন মতেই মিলিল না, তখন বন্ধুতা কিসের? আমি সরল মনে তাঁহার মতের ঠিক বিপরীত মত পোষণ করিতে পারি, এ কথা বলিলে তাঁহারা আশ্চর্য্য বোধ করেন। কিন্তু বিষয় অনুসারে মতভেদ না হওয়ার অর্থ—ঔদাসীন্য, প্রবল স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশের বা বুদ্ধি চালনার অভাব মাত্র। আপনার 'রায়ে' সায় দিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইব, কিন্তু আপনার মনস্তুষ্টির জন্য যদি নিজের বুদ্ধি বিবেচনা জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে।

* * *

এই দীর্ঘ ভূমিকার উদ্দেশ্য এই যে, আজও একটা বিবাদবস্তু সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আজ কাল চরিত্রানুমান বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথাটার ইংরাজী অনুবাদ করিলে science of reading character হয়। বিদ্যা শব্দটা science বই আর কিছু নয়। কিন্তু আপনার কোন কোন পাঠক উহাকে বিজ্ঞান শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে দেখিলে মর্ম্মাহত হইবেন। হয়ত তাঁহারা পূর্ব্ব সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মনে মনে শাকুন শাস্ত্র, পঞ্চপক্ষী, রমল যামল প্রভৃতি টানিয়া আনিবেন। কিন্তু এসকলের সহিত চরিত্রানুমান বিদ্যার আকাশ পাতাল প্রভেদ।

* * *

বস্তুতঃ চরিত্রানুমান বিদ্যাটা তত দুর্লভ নহে। বরং বিলক্ষণ সুলভ। কেন না, কোন নূতন লোক দেখিলেই সকলে তাহার একটা না একটা ভাল মন্দ চরিত্র খাড়া করিয়া ফেলেন। 'অমুক লোকটির মুখ দেখিলেই তাহাকে সরল-স্বভাব বলিয়া মনে হয়,' 'অমুকের স্বর শুনিলেই তাহাকে ক্রূর বলিয়া বোধ হয়,' 'সে ব্যক্তির মনে মুখে এক নয়,' ইত্যাদি নানা প্রকার চরিত্রানুমান আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি। কিন্তু কথায় বলি আর মনে ভাবি, এগুলা চরিত্রানুমান বই অপর কিছু নহে। মুখের ভঙ্গীতে, নাসিকার বিস্ফারণে, নেত্রের দৃষ্টিতে; ভ্রূদ্বয়ের ঊর্দ্ধ গতিতে, ললাটের

আকুঞ্চনে, অধরোষ্ঠের দৃঢ়তায় লোকের মনের গতি প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

* * *

কিন্তু সকল সময় আমাদের অনুমান ঠিক হয় না। মুখ দেখিয়া যাহাকে অত্যন্ত সরল-প্রকৃতি মনে করিয়াছিলাম, কার্য্যকালে হয়ত সে বিপরীত ভাব দেখাইয়াছে। কত লোককে বিশ্বাস করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এইরূপে প্রতারিত হইতে কেহ ইচ্ছা করে না; পরন্তু প্রতারিত হইলে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে। এই বিস্ময় প্রকাশেই জানা যাইতেছে যে, মুখ দেখিয়া লোকের চরিত্র অনুমান করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ সবিশেষ অভ্যস্ত ও সাবধান না হইলে মনের ভাব মুখে প্রকাশ নিবারণ করিতে পারা যায় না। যাঁহারা দৌত্য কার্য্যে নিপুণ, তাঁহাদিগকে মনের ভাব মুখে গোপন করিবার ক্ষমতা অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। মনে মুখে এক না দেখানই তাঁহাদের ব্যবসায়। কিন্তু এটা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার মাত্র।

* * *

লোকের মুখ দেখিয়া সহজে তাহার চরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। কেন না, লোকের মুখ আমরা যত দেখি, অন্য অঙ্গ তত দেখি না। এক মুখেই কত স্থানে কত প্রকার কুঞ্চন লক্ষিত হয়। কুঞ্চনের রূপান্তর মনের ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে। প্রেমিক প্রণয়িনীর একটু দৃষ্টিতে কত কথা বুঝিতে পারে। এমন কি, কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত লোক বুঝিয়া চীৎকার করে। লোকের চলন, বসা, দাঁড়ান প্রভৃতি লইয়া আমরা কত সময়ে উপহাস করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, লোকটিকে আমরা যেমন প্রকৃতির দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহার অঙ্গ-চালনায় সে প্রকৃতির অন্যথা দেখিতে পাই। লোকে কথায় বলে, যে যাহাকে দেখিতে পারে না, সে তাহার চলন বাঁকা দেখে। অর্থাৎ যাহার সোজা চলন তাহার মন ভাল, যাহার মন ভাল নয় তাহার বাঁকা বই সোজা চলা ঘটিবে কেন?

* * *

ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি আছে? আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চেষ্টিত মনের গতির উপর নির্ভর করে। মনের বিভিন্ন ভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অবস্থা ঘটে। সুতরাং এই সকল চেষ্টিত দেখিয়া মনের ভাব অবগত হইতে পারা-যায়। লোকে যখন শোকে কাতর হয়, কেহ বা বুক

চাপড়ায়, মাথা কুটিতে থাকে, হাতে হাত ঘষিতে থাকে। রাগের সময় লোকে ভূমিতে পদাঘাত করিতে থাকে। 'অমুকের কথা যেন খেতে আসে,' 'সে রাগে গর গর করিয়া হাত কামড়াইতে লাগিল,' ইত্যাদি কত প্রকারে আমরা চরিত্রানুমান-বিদ্যার পরিচয় পাই।

* * *

কেবল তাহাই নহে। আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যে সকল কাজ করিয়া থাকি, তৎসমুদয়েও মনের ভাব অল্প বিস্তর প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হাতের লেখার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলমের চালক হাত বটে, কিন্তু হাতের চালক মন। সুতরাং মনের অবস্থানুসারে হাত চলিতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে লেখার রূপান্তর ঘটে। তাড়াতাড়ি লেখার আর ধীর সুস্থির চিত্তে লেখার মধ্যে কত প্রভেদ, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি লেখার অর্থ মনের অস্থিরতা। সেইরূপ ক্রূর ব্যক্তির লেখা এক প্রকার, সরল স্বভাবের লেখা অন্য প্রকার; অসহিষ্ণু লোকের লেখা এক প্রকার, আর ধীর শান্ত পুরুষের লেখা অন্য প্রকার। বাস্তবিক বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের লেখা সবিশেষ পরীক্ষা করিলে লেখা দেখিয়া চরিত্র অনুমান করিতে পারা যায়। এইরূপে বিলাতে graphology বা লেখন-বিদ্যা বলিয়া একটা চরিত্রানুমান-বিদ্যা হইতেছে।

* * *

আর একটু অগ্রসর হওয়া যাক্। চলন দেখিয়া লোকের চরিত্র অনুমান করিতে পারা যায়। গরবের চলন, চিন্তিতের চলন, মাতালের চলন, স্থির-প্রতিজ্ঞের চলন, এ সকল কাহাকেও শিখাইতে হয় না। সুতরাং লোকের জুতার কোন্ অংশ কি প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাও দেখিয়া তাহার চরিত্র অনুমান করিতে পারা যায়। সমান ভারী দুইজন লোকের জুতা ঠিক একই সময়ে ছিঁড়ে না। পা টিপিয়া চলার, আর বালকের ন্যায় চঞ্চল চলার জুতা সমান টিকিবে কেন? বালকের ও বৃদ্ধের বস্ত্রাদি সমান টিকিলে উভয়ে এক হইয়া পড়িবে।

* * *

তবেই দেখুন, চরিত্রানুমান বিদ্যাটা কত সুলভ। কোন এক বিষয় লইয়াই লোকের ভাল মন্দ চরিত্র অনুমান করিতে পারা যায়। মনের তেজঃ দেহে ফুটিয়া বাহির হয়। তেজীয়ান্ পুরুষের লক্ষণ ও কাপুরুষের

লক্ষণ এক নহে। ক্ষীণ ও মেদল দেহের প্রকৃতি এক নহে। দুর্ব্বল ও মাংসল ব্যক্তির নিকট একই প্রকার ব্যবহার আশা করা যায় না। 'অমুক লোকটার বুকের ছাতি দেখ,' এ কথায় অনেক সত্য লুকান আছে। আমাদের মস্তক, বক্ষঃ প্রভৃতি অঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রস্থাদির পরিমাণ লইয়া Bertillon সাহেব মানব-চরিত্র অনুমান করিবার সন্ধান বাহির করিতেছেন। পুরুষ লক্ষণে দেখা যায়,—

সমবক্ষসোঽর্থবন্তঃ পীনৈঃ শূরাস্ত্বকিঞ্চনাস্তনুভিঃ।

যে পুরুষের বক্ষঃ সমান অর্থাৎ উচ্চনীচ নহে, সে ধনবান্। যাহার বক্ষঃ পুষ্ট সে বীর, যাহার ছোট সে অকিঞ্চন অর্থাৎ পুরুষার্থ হীন।

* * *

সে দিন কোন বিলাতি কাগজে দেখিতেছিলাম, এক ব্যক্তি আমাদের আঙ্গুলের নখ দেখিয়া চরিত্র সম্বন্ধে অনুমান করিবার কয়েকটা নিয়ম বাহির করিতেছেন। বাস্তবিক একটু সন্ধান ধরাইয়া দিলে, মানুষের নখেও তাহার চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ, phrenology বা মস্তিষ্ক-বিদ্যার আলোচনায় যাঁহারা নিপুণ, তাঁহারা নাকি মস্তকের অংশ বিশেষের পরিপুষ্টি দেখিয়া আমাদের অভিরুচি বা দক্ষতা, সমুদয় বলিতে পারেন। সকল লোকের সকল প্রকার কাজে মন যায় না, কিম্বা সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষা হয় না। বুদ্ধি বিবেচনার আধার আমাদের মস্তিষ্ক। সুতরাং মস্তিষ্কের পরিপুষ্টির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ কাজে নিপুণতার সম্বন্ধ পাওয়া যাইতে পারে। আবার, আমরা যে অঙ্গ সর্ব্বদা চালনা করি, তাহার পুষ্টি ঘটিয়া থাকে। আমি যদি বীর পুরুষ হই, তাহা হইলে আমার হস্তাদি অঙ্গ বিশেষের চালনা সর্ব্বদা আবশ্যক হয়। সুতরাং হাতের গঠন, আঙ্গুলের বিন্যাস, দৈর্ঘ্য, স্থূলতা প্রভৃতির দ্বারা বিচক্ষণেরা পুরুষ নির্ণয় করিতে পারেন। এইরূপ প্রায় সকল অঙ্গেই অল্প বা অধিক লক্ষণ বর্ত্তমান। তদ্বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি থাকিলে চরিত্রানুমান-বিদ্যা অভ্যাস হইয়া পড়ে।

* * *

অবস্থান্তর বা মনের ভাবান্তর ঘটিলে মুখের শ্রী বিলক্ষণ পরিবর্ত্তিত হয়। বৃদ্ধের ললাট-কুঞ্চনের মধ্যে কত চিন্তা লুকান থাকে। যাঁহারা চিত্র-বিদ্যা জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, কত সহজে 'হাসি হাসি' মুখকে 'কাঁদ কাঁদ' করিতে পারা যায়। কেবল মুখের পাশের দুইটা রেখা নীচের দিকে বা

উপর দিকে বাঁকাইয়া দিলেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ফটোগ্রাফে অনেকে নিজের বা বন্ধুর মুখ ঠাওরাইতে পারে না। না বুঝিয়া অনেক সময় ফটোগ্রাফারের দোষ দেয়। আলোক ও ছায়ার তারতম্যে আমার মুখের ছবি অপরের মুখের মত দেখাইতে পারে বটে, কিন্তু আমি যেমন মুখ করিয়া থাকিব অর্থাৎ ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় আমার মনে যে ভাবের উদয় হইবে তদনুসারে ছবি উঠিবে। তাহা ছাড়া, দীন ব্যক্তির টাকা আসিতে থাকিলে বা সুখীর দুঃখ ঘটিলে মুখের কত পরিবর্ত্তন ঘটে। চোর ডাকাতকে জেলখানায় পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহাব মুখের ফটোগ্রাফ রাখা হইত। উদ্দেশ্য এই যে, পরে অন্য দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিল কি না, তাহা সেই ফটোগ্রাফ দেখিয়া স্থির করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ফটোগ্রাফ বড় কঠোর সাক্ষ্য দেয়। অবস্থান্তর বা মনের ভাবান্তর ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে ফটোগ্রাফ বদলাইতে হয়। অর্থাৎ ফটোগ্রাফের সাক্ষ্য ভ্রমে ফেলিতে পারে।

* * *

এজন্য আজ কাল জেলখানার কয়েদীদিগের হাতেব আঙ্গুলের রেখার ছাপ রাখা হইয়া থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দেখিয়া মানুষ ঠাওরাইতে পারা যায়। তবেই মুখের বা অন্যান্য অঙ্গের পরিবর্ত্তন হইলেও হাতের রেখাগুলির বক্রতা যেমন তেমনই থাকে। তবেই এক এক ব্যক্তির হাতের রেখাগুলি তাহার আমরণ সহচর। ইহাই সামুদ্রিক শাস্ত্র। উহা একটা সত্য বিদ্যা কিনা, এবং সেই বিদ্যার পরিসরই বা কত, সে বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে। এখন দেখা যাইতেছে, করতলের রেখাগুলির সঙ্গে আমাদের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। যদি আমার আঙ্গুলের রেখা অপর কাহারও মত না হইল, তবে সেই রেখা দেখিয়া আমাকে চিনিতে পারিবেন না কেন? আমার মুখ দেখিয়া যদি আমাকে চিনিতে পারেন, আমার আঙ্গুলের রেখা দেখিয়া চিনিতে পারিবেন না কেন? মুখের বরং পরিবর্ত্তন হয়, করতলের রেখার নাকি পরিবর্ত্তন নাই।

* * *

কিন্তু করতলের রেখার সঙ্গে আমার জীবনের সম্বন্ধ আছে, একথা ভাবিতে পারি না। উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। যদি এমন প্রশ্ন হইত যে, আমার করতলে এই প্রকার রেখা আছে, আমি কি কর্ম্ম করি বা আমার সাংসারিক

অবস্থা কিরূপ ? এ কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ হাতের রেখা দেখিয়া ভূত ঘটনা বলা সম্ভব হইলেও, ভবিষ্যৎ ঘটনার অনুমানও করিতে পারিব কেন ? যাঁহারা সামুদ্রিকের পক্ষপাতী, তাঁহারা উত্তর দেন যে, "উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, ইহাই বলিতে পারি। কেন এরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা জানি না। কিন্তু প্রত্যক্ষ ফলে অবিশ্বাস করিব কেন ? শূন্যে স্থিত লোষ্ট্র ভূমিতে পতিত হয় ; ভূমির সহিত লোষ্ট্রের কেন সম্বন্ধ আছে, তাহার উত্তর জানি না।"

*   *   *

কিন্তু এই খানেই বিবাদ। হাতের রেখার সঙ্গে ভাগ্যের সম্বন্ধ বাস্তবিক দেখা যায় কি ? অনেকে গণককে হাত দেখাইয়াছেন এবং গণকের অন্ততঃ দুই চারিটা কথা যে সত্য, হয়ত তাহাও বলিবেন। তাঁহারা বলিবেন যে, "যে দুই চারিটা গণনা মিলে না, তাহা গণকের দোষ বা সামুদ্রিক শাস্ত্রের অসম্পূর্ণতার দোষ। সামুদ্রিক শিক্ষা করুন, উহার উন্নতি বিধান করুন, দেখিবেন যে তদ্দ্বারা লোকের চরিত্র, ভাগ্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম, পুত্রকলত্র, আয়ুঃ প্রভৃতি সমুদয় বলিতে পারা যায়।" বলা বাহুল্য, এরূপ যুক্তি করগণনা ও জাতকগণনা, উভয়ের পক্ষেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

*   *   *

যাঁহারা এরূপ গণনার বিরোধী, তাঁহারা বলেন যে, "যদি বিধাতা এরূপ লক্ষণ দিয়াই আমাদিগকে সংসারে পাঠাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের নিজের নিজের কৃতিত্ব থাকে কই ? যদি আমাদের ভাগ্য বিধাতা বাঁধিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত আমরা কলের পুতুল মাত্র। আমার চেষ্টা, অধ্যবসায়, উদ্যম প্রভৃতির কোন ফল নাই কি ? বিধাতার এ প্রকার নিয়ম সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।"

*   *   *

কিন্তু এ যুক্তি তত বলবতী নহে। আমার আকাঙ্ক্ষার সহিত কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ঐক্য হইল না বলিয়া নিয়মটা উল্টাইয়া যাইবে কেন ? এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে না বলা ধৃষ্টতা মাত্র। যে সকল ব্যাপার অবলম্বন করিয়া তুমি তোমার কৃতিত্ব দেখিতেছ, সেগুলি হয়ত ঠিক ধরা হয় নাই। বিধাতার নিকটে সকলের ভাগ্যই বাঁধা আছে। বিধাতা কপালে

যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা উল্টাইয়া দিবার সাধ্য কি? কূপমণ্ডুকের ন্যায় কূপটাকেই বিশ্বচরাচর ভাবা উচিত নহে।

* * *

বাস্তবিক সামুদ্রিক বিশ্বাস করিতে হইলে অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করিতে হয়। শিক্ষা ও সংসর্গ গুণে কেহ বা বিশ্বাস করিবেন, কেহ বা তাহা কুসংস্কার বলিয়া ত্যাগ করিবেন। আমার বোধ হয়, সকল বিদ্যারই যেমন একটা সীমা আছে, সেইরূপ অপরাপর চরিত্রানুমান বিদ্যার ও সামুদ্রিকেরও একটা সীমা আছে। অপরাপর বিদ্যার সীমার বাহিরে গেলে যেমন গণনা মিথ্যা হইয়া পড়ে, সামুদ্রিক সম্বন্ধেও তাই। জ্ঞানের বাহিরে গেলেই ঠকিতে হয়। সামুদ্রিক শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা যদি অধিক আস্ফালন না করেন, তাহা হইলে কোন কথাই থাকে না।

শ্রীসত্যকাম।

বারুণী-স্নান।

প্রতি বৎসর বারুণীর দিনে "মাধবে" বহু লোকের সমাগম হয়। আমাদের এখান হইতে মাধব দশ এগার মাইল ব্যবধান।

আমরা কয়েক জন শেষরাত্রে উঠিয়া পদব্রজে মাধব দর্শনে যাত্রা করিলাম। রাত্রি শেষ প্রায়, দুই একটী মাত্র ঝিঁঝিঁর শব্দ শুনা যাইতেছিল। প্রকৃতি প্রশান্ত—নিস্তব্ধ, অতি ধীরে নৈশ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে; দুই একটি জোনাকী রাস্তার ধারে তৃণ আস্তরণে ঝিকিমিকি করিতেছে; দূরবর্ত্তী গ্রামে কচিৎ কুকুরের দুই একটী ডাক শুনা যাইতেছে।

এই সময়ে মনে প্রায়ই পবিত্র ভাবোদয় হয়, কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র গতিশীল দলের মধ্যে কখন কখন হাসির কল্লোল উঠিতেছিল। বিস্তৃত মাঠের মধ্যে, সেই নিস্তব্ধ সময়ে, এই হাস্য পরিহাস পৈশাচিক কিলিবিলির ন্যায় বোধ হইতেছিল। অদূরে নদী,—পার হইতে হইবে।

তখন উষা প্রভাসিতা, পূর্ব্বদিকে সমুজ্জ্বল শ্বেতাভা প্রকাশিত হইয়াছে। নদীর তীরে বৃক্ষতলে দূরাগত যাত্রিগণ নিশিযাপন করিতেছে। নিদ্রা যায় নাই, আগুন জ্বালিয়া গান গাহিতেছে, আনন্দ করিতেছে। নিরাশাদগ্ধ

ব্যক্তির মুখমণ্ডলের ন্যায় সে অগ্নির আর দীপ্তি ছিল না। উৎসবান্তে পরিশ্রান্ত ভগ্নকণ্ঠ ব্যক্তির বাক্যের ন্যায় সে অসাময়িক গীতও সুখশ্রাব্য ছিল না।

অদূরে ক্ষুদ্র পাহাড়, যোগমগ্ন পুরুষ যেন স্থির হইয়া ধ্যানে বসিয়া রহিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে আমরা জঙ্গলাকীর্ণ পথে আসিয়া পৌছিলাম। রাত্রি তখন প্রভাতপ্রায়। একটী বৃক্ষঝোপ অতিক্রম করিয়া ৩০।৪০টী মণিপুরী স্ত্রীলোক যাত্রীর সঙ্গ পাইলাম। ইহাদের অধিকাংশই অবিবাহিতা কুমারী, মণিপুরীদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। ইহাদের সঙ্গে রক্ষক স্বরূপ ৫।৭ জন মাত্র পুরুষ।

প্রকৃতি-সন্তান মণিপুরী বালারা সোৎসাহে সেই পার্ব্বত্য পথে চলিতেছে। ইহাদের সরল স্বভাব ও পরিপাটিবিহীন বেশভূষাদি তাহাদের বাহুল্য-বর্জ্জিত রূপশোভারই ন্যায় নির্ম্মল—পবিত্র। কর্ত্তিতাগ্র কুন্তলগুলি তাহাদের শুভ্র ললাটে নৃত্য করিতেছে; তাহাদের যৌবনসুলভ অনাবৃত হাস্য-লহরী সুললিত সৌকুমার্য্যের লীলাস্থল, ক্ষণে ক্ষণে তাহা পাহাড়তল কম্পিত করিতেছিল। সে হাস্যে কোন কাপট্য নাই—মলিনতা নাই, তাহাদের নগ্নরূপেরই ন্যায় তাহা শুভ্র—পবিত্র।

মণিপুরী রমণীগণ দৌড়াদৌড়ি করিয়া সেই সঙ্কীর্ণ পথে পরমানন্দে যাইতে লাগিল; কখন বা বন্য কুসুম সাগ্রহে সংগ্রহ করিতে লাগিল;—দৃশ্য মন্দ নহে। শীঘ্রই আমরা ইহাদিগকে পশ্চাৎ ফেলিয়া চলিলাম।

সম্মুখে পাহাড়, নবীন সূর্য্যকিরণের সহিত আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। কখন ৫০।৬০ হাত উপরে উঠিতেছি, কখন বা তত নীচে নামিতেছি। কখন কখন আমাদিগকে পর্ব্বতপ্রবাহিতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত অতিক্রম করিতে হইতেছে। এইরূপে আমরা একটী অত্যুচ্চ টিলার উপর উঠিলাম, তাহার উচ্চতা প্রায় চারিশত হস্ত হইবে। ইহার উপর হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, বড় সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হয়। টিলার তল হইতেই বংশ কানন প্রসারিত। অতি রমণীয় শোভা। ঈষৎ হরিদ্রাভ নবনধর শ্যামল পত্রাবলী বিশোভিত বংশাবলী সতেজতা ও সৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্যের জীবন্ত ছবি। ক্রোশের পর ক্রোশ—দৃষ্টি যতদূর চলে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, অনন্ত জলধির ন্যায় চলিয়াছে। নিবাত—নিষ্কম্প, একটী পাতাও নড়িতেছে না, একটী শব্দও শুনা যাইতেছে না। দেখিতে দেখিতে দর্শকের মনে অজ্ঞাতে ভাব-তরঙ্গ সমুত্থিত হয়, দেখিতে দেখিতে তাহাকে

আত্মহারা করিয়া ফেলে। বিস্তৃত মাঠে অবিচ্ছিন্ন ধান্য তরঙ্গের শোভা মোহনীয় বটে, ইহা ততোধিক সুন্দর—ততোধিক মনোরম।

এই স্থানে আমরা কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। সম্ভবতঃ শত হস্ত নীচে নামিয়াই একটী পার্ব্বত্য স্রোত ধরিয়া চলিলাম। জলের গভীরতা অর্দ্ধ হস্তের অধিক হইবে না। বলা বাহুল্য, এই স্রোত পাহাড়ের উপরেই প্রবাহিত, ভূপৃষ্ঠ হইতে তাহা অনেক উচ্চে।

দুই দিকে উচ্চ পাহাড়, বড় বড় নানাজাতি বৃক্ষ; আমরা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। যাইতে যাইতে ঘন বনপ্রদেশে উপস্থিত হইলাম। সূর্য্যের তেজ সেখানকার ঘন পত্রাবলী ভেদ করিতে অল্পই সক্ষম। ক্ষুদ্র স্রোতটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণখণ্ড বুকে করিয়া অশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে। ক্ষুদ্র স্রোতটীর বক্ষে কোথাও বা বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড জল আটকাইয়া রাখিতে সমুদ্যত, জল যথাসাধ্য বলে চীৎকার করিয়া সেই প্রেম-বন্ধন হইতে পলাইতেছে—পথ করিয়া লইতেছে। কতকদূর অগ্রসর হইয়া আমরা পর্ব্বতপ্রমাণ বৃহৎ একটী পাষাণ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কেহ কেহ সোৎসাহে উহার উপরে উঠিলেন। আমাদের অনুসঙ্গী ভারবাহী এই কার্য্যে আমাদিগকে নিষেধ করিল, এবং সে স্বয়ং ভক্তিভরে এই পাষাণকে প্রণাম করিল। তাহার এই ভক্তি দেখিয়া, গীতার—

"যদ্‌যদ্বিভূতি মৎসত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ॥"

শ্লোকটী মনে পড়িল।

পাষাণ খণ্ডের সম্মুখে পাষাণের গায়ে লাগিয়া একটী কুণ্ড, পরিসর বৃহৎ নহে কিন্তু গভীর, সুচিকণ নীল জল টলমল করিতেছে। এইরূপ আমরা ক্রমশঃ ছয়টী কুণ্ডই প্রাপ্ত হইলাম। তৎপর সপ্তম কুণ্ড, উপর হইতে পাহাড়ের নীচে দেখিতে পাওয়া গেল। পূর্ব্বে যে স্রোতটীর উল্লেখ করা গিয়াছে, পাথরের উপরে দ্বিভাগিত হইয়া, এই স্থান হইতে তাহা হঠাৎ পাহাড়ের নীচে পড়িয়া গিয়াছে। পাহাড় আশ্রয় করিয়া পড়ে নাই, পাহাড় যেন সম্মুখে নত হইয়া রহিয়াছে; তাহার উপর হইতে জলরাশি সলম্ফে শূন্য দিয়া পড়িতেছে। আন্দাজ ৩০০ শত হাত উপর হইতে মহাশব্দে সবেগে নীচে পড়িতেছে।

যে স্থানে জল পড়িতেছে, তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ পাহাড়, মধ্য-দেশ একটী

গুহা বিশেষ। দীর্ঘ প্রস্থে অর্দ্ধ মাইলের অধিক হইবে না। ইহার কতকটা স্থান ব্যাপিয়া কুণ্ড। ইহাই "মাধব।"—একটা ক্ষুদ্র জল-প্রপাত মাত্র। বারুণী দিনে সাধারণ লোকে এখানে স্নান তর্পণ করিয়া থাকে। আমরা উপর হইতে দেখিলাম, সে স্থানটি লোকে পূর্ণ—ছিদ্র নাই। স্থান না পাইয়া লোকে পাহাড়ের গায় গায় বসিয়াছে,—দৃশ্য সুন্দর বটে। কিন্তু বারি-পতন শব্দের সহিত লোককোলাহল মিশিয়া যে অদ্ভুত শব্দ উৎপন্ন হইতেছিল, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এবং আপতিত জল হইতে কণারাশি চতুর্দ্দিকে উড়িয়া এবং তাহাতে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া যে শোভার ভাণ্ডার সৃষ্ট হইতে-ছিল, তাহার তুলনা নাই।

আমরা বৃক্ষ লতা অবলম্বনে বড় কষ্টে নীচে আসিলাম। লোকের ঠেলা-ঠেলিতে কুণ্ডের কাছে যাওয়া কষ্টকর।

এইবার আমাদের সাধ মিটিল, মাধবকুণ্ডে ঝাঁপ দিলাম। কোন কোন সাহসী ব্যক্তিকে আমরা ধারার তলে যাইতে দেখিয়াছিলাম। আমাদেরও সে সাধ জন্মিল। কিন্তু কুণ্ডটী বৃহৎ, আর জল অতি শীতল, এই যা বাধা। বাধা কোন ক্রমে অতিক্রম করিয়া সেই ক্ষুদ্র ধারাতলে উপস্থিত হইলাম। এখানে পাহাড়ের গায়ে একটী পাথর আছে, আমরা বুকজলে সেই পাথরে দাঁড়াইলাম। ধারা অবিশ্রান্ত শিরে পড়িতেছে। অধিক দাঁড়ান অসম্ভব, এই ক্ষুদ্র ধারাটির পতনবেগেই ঘাড় শুদ্ধ মাথাটা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, বোধ হইতে লাগিল। তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলাম। তীরে আসিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিলাম, কিন্তু শীত আর যায় না।

অল্পদূরে অগ্নিশিখা দেখিয়া সেদিকে গেলাম। একটা গুহার ভিতরে অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ একত্র বসিয়া অগ্নি সেবন করিতেছে। উপরে প্রস্তর, যেন প্রস্তরের একখানি একচালা ঘর বহুযত্নে মানুষে নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছে। এই গুহায় এককালে শত লোকের বসিবার স্থান স্বচ্ছন্দে হইতে পারে। ইহাকে "কাপ" বলে।

অতঃপর ইতর লোকেরা স্থানে স্থানে যেসব অদ্ভুত আকৃতির দেবতা স্থাপন করিয়া পয়সা ও তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে আমরা পাহাড় হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। মাধবের বাজারে যাইবার পথ একটী চা-বাগানের ভিতর দিয়া। সুশ্রেণীবদ্ধ সতেজ চা-গাছ, নানা কল কারখানা, কুলিনিবাস দেখিতে দেখিতে ও কুলিদের অভিশপ্ত দীন জীবন

আলোচনা করিতে করিতে মাধব বাজারে উপস্থিত হইলাম। বারুণী উপলক্ষে সকাল হইতেই সুবিস্তৃত শূন্য মাঠে বাজার বসে। বাজারে স্ত্রী-লোকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদের উৎসাহ—ক্রয়-প্রণালী প্রভৃতি—অধিক মূল্য দিয়া আক্ষেপ, কখনবা শস্তা হইয়াছে বলিয়া আনন্দ, এরূপ প্রত্যেক দৃশ্যই বড় তৃপ্তিকর বোধ হইল।

সন্নিকট গ্রামবাসী একটী কুটুম্ব আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। অগত্যা আমরা তখন সেই আড়ম্বরশূন্য দৃশ্যাবলী ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম।

সেই কুটুম্বের আলয়ে আমরা একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের অনুসন্ধান পাইলাম। দেখিলাম; পুথিখানি জীর্ণ, বঙ্গীয় ১১৫০ সনের লিখিত প্রতিলিপি খানি আমরা প্রাপ্ত হইলাম। ইহা একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের অস্তিত্ব আমরা অবগত নহি। অদ্য ইহাই উপহার দিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম।*

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

আধুনিক সূত্র-কাতন।

[MODERN COTTON SPINNING]

(১)

অতি দুঃখের বিষয় যে বঙ্গ-ভাষায় বৃত্তি-শাস্ত্র (Technology) বিষয়ক গ্রন্থের অত্যন্ত অভাব। ইহা কতকটা লেখকের অভাবে ও কতকটা বঙ্গবাসীর বৃত্তি শিক্ষায় অমনোযোগ-হেতু। যাহা হউক, নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি বঙ্গীয় পাঠকগণের জন্য লিখিত হইল; যদি তাঁহাদিগের ইহা ভাল লাগে (আর যদি আমার বিদ্যায় কুলাইয়া উঠে), তাহা হইলে সূত্র-কাতন ও বয়ন বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও লিখিবার বাসনা রাখি। কিন্তু পাঠকগণকে এই বেলা বলিয়া রাখা ভাল যে, তাঁহারা যেন আমার কাছে অধিক প্রত্যাশা না করেন, কেন না আমি একজন সামান্য Cotton Spinner মাত্র, লেখা পড়ার

---

* বিশ্বকোষ সম্পাদক বন্ধুবর নগেন্দ্র বাবুকে গ্রন্থখানি দিয়াছি। বিশ্বকোষে "বাঙ্গালা ভাষা" শব্দে ইহার আলোচনা থাকিবে বলিয়া এখানে ঐ গ্রন্থ হইতে নমুনা উদ্ধৃত হইল না।

বেশি ধার ধারি না। তাই অনেক সময়ে ভাব যুটিলেও কথা যোটে না। মেকানিকের সকলেই মূর্খের দলে।

সূত্র-কাতন বিষয়ে কিছু লিখিবার আগে উপকরণ (Raw material) বিষয়ে কিছু লেখা নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব প্রথম পরিচ্ছেদটি কার্পাস বিষয়ে লিখিত হইল। বঙ্গভাষার অসম্পূর্ণতা হেতু মিশ্রিত ভাষার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কার্পাস বৃক্ষ—প্রধানতঃ চারি জাতিতে বিভক্ত; যথা—Gossypum Herbecum, Gossypum Arborium, Gossypum Hirsutum এবং Gossypum Barhadense. প্রথম জাতীয় বৃক্ষ ৩॥০ হাত হইতে ৩৸০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহা ভারত, চীন, তুর্কিস্থান, আরব্য ও মিশর দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় জাতীয় বৃক্ষ গড়ে ১০ হাত উচ্চ হয়। ইহা ভারতের কোন কোন স্থানে, চীন ও মিশর দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় জাতীয় বৃক্ষ উচ্চে চার হাত, ইহা আমেরিকাতেই অধিক জন্মে। চতুর্থ জাতীয় উচ্চে ৭ হাত লম্বা; ইহা কেবল ফ্লরিডা ও জর্জ্জিয়া দেশেই পাওয়া যায়। এই শেষ জাতীয় হইতেই "সমুদ্র দ্বীপ জাত" (Sea Island) তুলা উৎপন্ন হয়। উপরে যে জাতিগত নাম দেওয়া হইল, তাহা উদ্ভিদ শাস্ত্র প্রদত্ত। কিন্তু তদ্ভিন্ন তুলার বাণিজ্যগত (Commercial) নাম আছে, যথা,—সমুদ্র দ্বীপ জাত, মিশর দেশীয় (Egyptain), ব্রেজিলীয় ও পেরুদেশীয়, (Brazilian and Peruvian), মার্কিন (American), সুরাট * অর্থাৎ ভারতীয় তুলা। কাতকগণ (spinners) তুলার বাণিজ্যগত নামই ব্যবহার করিয়া থাকেন; সেজন্য আমরাও সেই নাম ব্যবহার করিব। এই সকল নাম তুলার জন্মস্থানের বা তদ্দেশীয় কোন প্রধান বন্দরের নামানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে।

কার্পাস বৃক্ষ অনেক গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বিনা চাষে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সকল বৃক্ষের ফসল হইতে সুন্দররূপে সূতা কাতা যাইতে পারে না। অতি যত্নের সহিত আবাদ করিলেও কাতকের মনোমত অর্থাৎ কাতন-প্রক্রিয়া সহন-শীল ভাল তুলা পাওয়া কঠিন।

অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে তুলার আঁশ বা তারকে (fibre, technically

* মুসলমান রাজত্ব কালে সুরাট ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। এদেশীয় তুলা সেই বন্দর হইতে দেশদেশান্তরে রপ্তানি হইত। সেজন্য আজিও ভারতীয় তুলা বণিকদিগের মধ্যে "সুরাট" নামে বিখ্যাত।

called staple) * ফাঁপা বাঁশের মতন দেখায় ; তাহার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। ইহার পরিধি একেবারে গোল নহে, ঈষৎ বাদামি ভাবে চেপ্টা ; উত্তমরূপে বর্দ্ধিত ও সুপক্ক তার পেঁচের ন্যায় মোড়া (Convoluted or spirally twisted) ; তুলার পক্ষে ইহা একটি মহাগুণ, কারণ ইহাতে এই উপকার হয়, যে সূতা কাতিলে একটি আঁশ তৎপার্শ্বস্থিতটিকে উত্তমরূপে জড়াইয়া ধরে, ইহাতে সূতা অধিক শক্ত হয়। তুলার তারের ব্যাস আগার ভাগ অপেক্ষা গোড়ার ভাগে (অর্থাৎ যে ভাগ বীজে লাগিয়া থাকে) অধিক দীর্ঘ। এই আধিক্য সমুদ্রদ্বীপজাত তুলায় ১১৫৬২ ইঞ্চ ও ভারতীয় তুলায় ১১৮৫ ইঞ্চ। তুলার আঁশের দীর্ঘতা ও সবলতা তাহাদের জাতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সবলতা সম্বন্ধে ভারতীয় তুলাই প্রথম, সমুদ্র-দ্বীপ-জাত তুলা অধম ও মিশর দেশীয় তুলা মধ্যম। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে তুলার গুণাগুণ তাহার বলের উপরই নির্ভর করে না, কারণ যে তুলার মোড়নে সমতা নাই, সেই তুলাই মোটা ও শক্ত হয়। মোড়নে সমতাই তুলার প্রধান গুণ ; যে তুলার তার দীর্ঘ, সমভাবে মোড়া ও শক্ত সেই তুলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু কোনও তুলাতেই ঐ সকল গুণ একত্রে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত গুণ কতক পরিমাণে মিশর দেশীয় তুলায় দেখিতে পাওয়া যায়, সেজন্য ইহার আদরও অধিক। তুলার তারের উপর মোমের আবরণের ন্যায় একটি আবরণ আছে। সেজন্য নূতন সূতা কিম্বা কাপড় শীঘ্র জলে ভিজে না। সাদা কাপড় কিম্বা সূতায় ইহা থাকিলে হানি নাই, কিন্তু কাপড় কিম্বা সূতা রং করিবার সময় ইহাকে আগে ধুইয়া ফেলিতে হয়, নচেৎ রং প্রবেশ করে না।

তুলার এই সাধারণ বিবরণের পর বোধ হয় জাতিগত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে।

১ম—সমুদ্রদ্বীপ-জাত তুলা—(sea Island)। এই জাতীয় তুলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার তার দীর্ঘ, মিহি, নমনশীল (flexible), এবং ইহার মোড়ন সমভাবাপন্ন। যদি ইহা খুব সাবধানে জিন (Gin)† করা হয়,

* বঙ্গের কাতকগণ staple কে "তার" বলিয়া থাকে।

† কার্পাস হইতে বীজ আলাহিদা করিবার প্রক্রিয়াকে জিন্ করা বলে। পাঠকগণকে এই খানে বলিয়া রাখা ভাল যে বোম্বে অঞ্চলে ও মধ্য প্রদেশে বীজ শুদ্ধ তুলাকে কাপ্সা অর্থাৎ কার্পাস বলে এবং বীজ বিহীন তুলাকে তুলা বা রুই বলে ; আমরাও সেই অর্থে উক্ত শব্দদ্বয় ব্যবহার করিব।

তাহা হইলে ইহা হইতে অতি উত্তম ও মিহি নম্বরের * সূতা কাতা যাইতে পারে। এই জাতীয় তুলার তার ২·২০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার দৈর্ঘ্য গড় পড়তা ১·৮ ইঞ্চ। কেবল ফ্লরিডায় যাহা জন্মায় তাহাই ২·২০ ইঞ্চ লম্বা, নচেৎ অন্যত্র কম। যথা—পেরু ১·৫৬ ইঞ্চ, ফিজি ১·৮৭ ইঞ্চ এবং অষ্ট্রেলিয়া ১·৬৫ ইঞ্চ। এই জাতীয় তুলা রেশমের ন্যায় ঈষৎ মলিনাভ; এই গুণ আর কোন তুলায় নাই।

২য়—মিশর দেশীয় তুলা (Egyptian cotton) দৈর্ঘ্যে, বর্ণে ও অন্যান্য গুণে পরস্পর বিভিন্ন। গালিনি জাতি বর্ণে সোনার মত, তার কড়া, শক্ত এবং মোড়ন অসম; ইহা দীর্ঘে গড়ে ১॥ ইঞ্চ। মিশর দেশে আর এক প্রকার তুলা পাওয়া যায় তাহার বর্ণ পিঙ্গল (brown), দীর্ঘ গালিনির মত, কিন্তু তার গালিনির মত কড়া ও শক্ত হইলেও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট, ও মোড়নে সমতা আরও কম, গড়ে ১·৪ ইঞ্চ লম্বা হইয়া থাকে; ইহার ব্যাস ১/৬৩২ ইঞ্চ, ইহা বর্ণের নামেই বিখ্যাত। মিশর দেশে আরও এক প্রকার তুলা জন্মায়, তাহা তদ্দেশীয় তুলার মধ্যে বর্ণে ও অন্যান্য গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহা বর্ণে ঈষৎ স্বর্ণাভ, ইহার তার শক্ত এবং নমনশীল কিন্তু ইহার মোড়ন অতি অল্প, সে জন্য ইহা হইতে যে সূতা হয় তাহা ওজনে সমান হইলেও, অন্য তুলা-জাত সূতা অপেক্ষা ব্যাসে মোটা হয়। ইহা শ্বেত তুলা বলিয়া বিখ্যাত ও ইউরোপে অত্যন্ত আদৃত। কেন না ইহা অন্য জাতীয় তুলার সহিত মিশাইলে তাহার গুণ বর্দ্ধন করে ও অন্য তুলায় সে গুণ বেশী নাই (অর্থাৎ কাতন প্রক্রিয়া সহনশীলতা) ইহা তাহা দান করে, কারণ ইহা অত্যন্ত নমনশীল।

৩য়—ব্রেজিল ও পেরু দেশীয় তুলা—পর্ণাম্বুকো প্রদেশ-জাত তুলা ঈষৎ স্বর্ণাভ এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন; তন্নিমিত্ত ইহা কাপড়ের টানায় উপযুক্ত; ইহা ১·০ ইঞ্চ দীর্ঘ। মারানহাম প্রদেশজাত তুলার বর্ণ সোনার মত; ইহা মার্কিন তুলার সহিত সুন্দররূপে মিশ্রিত হয়। পেরু দেশজাত তুলা কড়া, আবর্জ্জনা শূন্য ও শক্ত; বর্ণ ঈষৎ মলিন, মোড়নে সমতা নাই, দীর্ঘ গড়ে ১·৩ ইঞ্চ।

৪র্থ মার্কিন তুলা—অনেক জাতিতে বিভক্ত ও প্রদেশগত নামে প্রসিদ্ধ।

* Different sorts of yarn are known by their counts or number fixed according to their weight.

যুক্ত রাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশে এই তুলা জন্মায়। দীর্ঘে অর্লিন্স তুলাই প্রথম, এই জাতীয় তুলা সমভাবে দীর্ঘ, সাফ ও বেশির ভাগ নির্ম্মল শ্বেত বর্ণের। অর্লিন্স তুলা কাতকের (spinners) বড় আদরের ধন, কেন না ইহা অত্যন্ত নমনশীল ও প্রক্রিয়া সহিষ্ণু; ইহা অত্যন্ত সমভাবে মোড়া ও দীর্ঘে ১ ইঞ্চ। টেকসস্ প্রদেশীয় তুলা বর্ণে আর্লিন্স অপেক্ষা ময়লা ও সেরূপ নমনশীল নহে এবং প্রায়ই অবর্দ্ধিত তার বিশিষ্ট; দীর্ঘ প্রায় আর্লিন্সের ন্যায়। অন্তর্গত (up-land) প্রদেশ সকলের তুলা অতি পরিষ্কার ও আবর্জ্জনা রহিত। ইহা হইতে সুন্দর পড়েনের সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে, কারণ ইহা কোমল ও নমনশীল। অবিমিশ্র ভাবে ব্যবহার করিলে ইহা হইতে ৪২ নম্বরের সূতা প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু মিশর দেশীয়ের সহিত মিশাইলে আরো মিহি সূতা হইতে পারে। মোবাইল তুলা বর্ণে আর্লিন্সের মত ও বলে অন্তর্গত প্রদেশীয়ের মত, কিন্তু ইহাদিগের ন্যায় মিহি কাযের উপযোগী নহে, কারণ ইহাতে অনেক আবর্জ্জনা আছে ও তার অপেক্ষাকৃত চেপ্টা।

৫ম সুরাট বা ভারতীয় তুলা—পৃথিবীতে যত প্রকার তুলা জন্মায় ভারতীয় তুলা তন্মধ্যে সকলের অধম।* ভারতীয় তুলায় আদপে মোড়নে সমতা নাই, দৈর্ঘ্যেও সেইরূপ। ভারতীয় তুলার এই অসমতা এত অধিক যে একই বৃক্ষের একই কোয়ার তুলায় তারের সমতা অতি কষ্টে পাওয়া যায়। ভারতীয় তুলার মধ্যে হিঙ্গনঘাটের তুলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু ইহারই মোড়নে সমতা আছে; কিন্তু ইহাতে তারের ব্যাস ও দীর্ঘতার সামঞ্জস্য আদপে নাই, হিঙ্গনঘাট গড়ে ১·০৩ ইঞ্চ লম্বা। হিঙ্গনঘাটের নীচেই ভড়োচ প্রদেশীয় তুলা। ইহার বর্ণ হিঙ্গনঘাটের ন্যায় সাদা নহে, ঈষৎ স্বর্ণাভ; বৃক্ষের পত্র ও অকাল মৃত তার ইহাতে অনেক পাওয়া যায়, তবে ইহা মন্দের ভাল এই মাত্র; দীর্ঘ ·৯ ইঞ্চ; ইহাতে হিঙ্গনঘাট অপেক্ষা দৈর্ঘ্যের কিছু সমতা আছে কিন্তু মোড়ন নিতান্তই খারাপ। ঢলেরা প্রদেশের তুলা বর্ণে শ্বেত ও পড়েনের সূতা হইবার উপযোগী। অমরাবতী প্রদেশের তুলা ঈষৎ মলিনাভ, তার ছোট কিন্তু শক্ত; ইহাতে আবর্জ্জনা অনেক কিন্তু মোড়ন অপেক্ষাকৃত ভাল। মান্দ্রাজ টিনিভলি তুলার জন্ম স্থান, ইহার বর্ণ অমরাবতীর ন্যায়, তার শক্ত কিন্তু নমনশীল। বঙ্গীয় তুলা জগতে সর্ব্ব নিকৃষ্ট। সাধারণতঃ ভারতীয় তুলা মাত্রেই খারাপ, তাহা অগ্রে

* ইহা ভারতবর্ষীয় কৃষকগণের পক্ষে একান্তই শ্লাঘার বিষয় বটে।

বলা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গীয় তুলা সকলের সেরা খারাপ। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে বঙ্গদেশ মস্‌লিনের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, যে বঙ্গদেশ হইতে অতি পুরা কালেও পারস্য তুরস্ক রুম প্রভৃতি দেশের সুলতানগণের সুন্দরীবর্গের মনোরঞ্জনার্থ হাওয়ার ন্যায় মিহি মস্‌লিন যাইত, সেই বঙ্গদেশের তুলা সর্ব্ব নিকৃষ্ট। ইহা যে মাটির গুণে তাহা নয়, ইহা বাঙ্গালী জাতির অলসতার ফল, আর ইহা বাঙ্গালী জাতির পরমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করিতেছে। কারণ বিদেশীয় তুলা ভিন্ন, বঙ্গদেশীয় তুলার সূতায় কখনও ঢাকাই, শান্তিপুরি, ফরেশডাঙ্গার ন্যায় কাপড় হইতে পারে না। আজও মেঞ্চেষ্টারে এ সকলের ন্যায় কাপড় কদিচ হইতেছে; কিন্তু আর বেশী দেরী নাই। আমরা মূর্খের ন্যায় "স্বায়ত্ব শাসন" * "স্বায়ত্ব শাসন" করিয়া চেঁচাইতে থাকি আর বিদেশীয়েরা গালে চড় মারিয়া মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া যাউক। পুরাকালে ভারতের মাঠে মাঠে তুলার চাষ হইত ও ঘরে ঘরে সূতা কাতা হইত। ভারতের সুখের দিনে অর্দ্ধেকেরও অধিক লোক সূতা কাতিয়া কাপড় বুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অন্য দেশ হইতে, এমন কি অন্য গ্রাম হইতে কাপড় ক্রয় করা কি তাহারা তাহা জানিত না। মধ্য প্রদেশ, বেরার, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি প্রদেশ নিচয়ে অতি সহজেই কার্পাস জন্মিয়া থাকে। সাধারণ কৃষকেরাই এই ব্যবসায় করিয়া থাকে, সে জন্য ফসলও ভাল হয় না; যদি কোন উদ্যমশীল ধনবান আধুনিক প্রথানুসারে ইহার চাষ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভারতীয় তুলার অনেক উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

আমাদের উন্নতি।

দেশে কতকগুলি লোক জন্মিয়াছেন, যাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কিছুই ভাল দেখিতে পান না, কোন উন্নতির লক্ষণই তাঁহাদের নয়নগোচর হয় না। ইহাদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল প্রাচীনত্বের গোঁড়া, ইহাদের ধুয়া, দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, সনাতন আর্য্য রীতি নীতি

---

* যাহা আমরা কোন পুরুষে জানি না, আর জানিব কি না সন্দেহ।

লোপ পাইতে বসিল, লোকের এখন আর দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি নাই, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি উঠিয়া গেল, সাহেবদের চর্ব্বিত চর্ব্বণে সকলেই ব্যস্ত। অপর দল "সাহেবী"—আনার গোঁড়া। ইহাঁরা বলেন দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, ইংরাজী শিক্ষাভিমানীরা পর্য্যন্ত আজও মাদুরে বসেন, ধুতি পরেন, সম্পূর্ণ ইংরাজীতে কথা কন না, স্ত্রী স্বাধীনতা দেন নাই, এবং মেয়েদের সাড়ী পরিতে দেন। আমরা অদ্য দেখাইতে চেষ্টা করিব যে অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে কোন দলেরই হতাশ হওয়ার কারণ দৃষ্ট হয় না।

আর্য্যকুলধুরন্ধর প্রাচীন ঋষিরা সকল বিষয়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। আধ্যাত্মিকতার কথা আর কি বলিব! পুরাকালের কথা না তুলিয়া, বর্ত্তমান পতিত হিন্দুরাও পূর্ব্বপুরুষ-প্রসাদাৎ আধ্যাত্মিকতায় আজও জগতে অদ্বিতীয়। এখনও ঐ সম্বন্ধে—

"কোন জাতি মোদের সমান?"

এখনও ঐ সম্বন্ধে আমাদের

"পদ চিহ্ন ধরে অন্য জাতি দম্ভ করে।"

পার্থিব বিষয়েও আর্য্য ঋষিরা জগতের অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহাদের দর্শন, তাঁহাদের বেদ ইত্যাদি তাহার সাক্ষ্য। বৈদ্যশাস্ত্র, জ্যোতিষ, পাটীগণিত, বীজগণিতাদি সমস্ত শাস্ত্র অন্য জাতিরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে চুরি করিয়াছে। ঋষিরা অঙ্কিও পাটীগণিত জানিতেন, মাধ্যাকর্ষণ জানিতেন, এবং বিজ্ঞানের এখন বিলুপ্ত অন্য অন্য কূটতত্ত্ব সকল জানিতেন। প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যসন্তানগণ তাড়িত বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহাদেরই ব্রহ্মাস্ত্র, তাঁহাদেরই আগ্নেয়াস্ত্র, তাঁহাদেরই বরুণাস্ত্র, তাঁহাদেরই পুষ্পক রথ। উহাদের নিগূঢ় তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া আজ কালকার ভ্রান্ত নর উহাদিগকে কাল্পনিক মনে করে। বাহুল্য ভয়ে অনেক কথার উল্লেখ করা গেল না। কালের করাল স্রোতে আজ সেই আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত, এবং সেই সঙ্গে সেই বৈজ্ঞানিক উন্নতিও অস্তমিত। আজ কিনা সাহেবরা আমাদিগকে ধর্ম্ম শিখাইতে আসেন, এবং তাঁহাদের সামান্য কলের গাড়ীর ও ম্যাকৃশিম কামানের ও টেলিগ্রাফের বড়াই করেন; এবং আমরা পূর্ব্ব গৌরব ভুলিয়া তাঁহাদিগকে বাহবা দিই! কিন্তু আজ কাল একটু সুর ফিরিয়াছে। পূর্ব্বাবস্থা আর হইবে না, বলিতে তাহা অসম্ভব। ঊর্দ্ধবাহু

হইলেও আমরা বামন। কিন্তু জনকত মনিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু আচার ব্যবহারের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, ব্যখ্যা শুনিয়া আজ ইংরাজীশিক্ষাহেতু বিকৃতমস্তিষ্ক বাঙ্গালীও চকিত, স্তম্ভিত ও ভক্ত্যাপ্লুত। আমরা আমাদের পূর্ব্বগৌরব বুঝিতেছি ও পুরাকালের আধ্যাত্মিকতা নিদান কিয়দংশ পাইবার চেষ্টা] করিতেছি। ক্রমে আরও উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে অন্যান্য উন্নতি আপনি আসিয়া পড়িবে। দেবদ্বিজে ভক্তি বাড়িলে কমলা ও বাগেদবী সদয়া হইবেন। তাই বলি বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে রক্ষণশীল দলের নিরুৎসাহ হইবার কারণ দেখা যায় না। যেরূপ চেষ্টা করিতে তাঁহারা আরম্ভ করিয়াছেন, একাগ্রতার সহিত তাহা করিতে রহুন, সফল মনোরথ হইবেনই হইবেন। তাঁহাদের ভরসার আর একটী বিশেষ কারণও আছে। সংস্কৃতের আলোচনা বাড়িতেছে, গীতাদি গ্রন্থ অনেকেই পাঠ করিতেছেন, শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম অবগত হইতেছেন, এবং যাঁহারা সংস্কৃত রসে বঞ্চিত, তাঁহাদের জন্য ধর্ম্মগ্রন্থ নিচয়ের সুন্দর ও সুলভ বঙ্গানুবাদ বাহির হইতেছে। কিছু দিনের মধ্যে ধর্ম্মালোক যে দেশময় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে আমাদের ত তাহাতে অনুমাত্র সংশয় হয় না।

এখন অপর দলকে দুই একটা কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। আমাদের স্থানাভাব, বেশী কথা অবশ্য বলিতে পারিব না। প্রথমতঃ ধরুন শিক্ষা ; উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হু হু করিয়া হইতেছে। ১৮৫৭সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা গৃহীত হয়। তাহাতে কেবলমাত্র ২৪৪ জন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়। ১৮৫৮ সালে ৪৬৪ জন প্রবেশিকা ও ১৩ জন বি,এ, পরীক্ষা দেয়, এবং একজন ও এম, এ, পরীক্ষা দেয় না। ১৮৯৪ অব্দে প্রবেশিকায় ৫৩৯২ জন, বি,এ, ১৪৩০ জন, এবং এম,এ, পরীক্ষায় ১৪৮ জন উপস্থিত হয়। অপরে যাহাই বলুন আমরা ইহাকে সামান্য উন্নতি বলিতে প্রস্তুত নই। এই হারে বৃদ্ধি পাইলে বৎসর কয়েক পরে উচ্চ শিক্ষার ঢেউ কিরূপ প্রবল হইবে, একথা ভাবিয়া দেখুন দেখি। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে যে সব লোক উচ্চ শিক্ষা পাইতেছে তাহাদের সব বাঙ্গালী নয়। স্বীকার করিলাম। অধিকাংশ যে বাঙ্গালী তাহাতে কি কিছু সন্দেহ আছে? ১৮৯৪-৯৫ সালে মধ্যম শিক্ষা পাইয়াছে ২০৬৯৮৯ জন, তার পূর্ব্ব বৎসর ঐ] শিক্ষা ১৯৮৭৩৬ জন বই পায় নাই। এই দুই ও পরবর্ত্তী দুই সংখ্যা অবশ্য

বঙ্গবিহার ও উড়িষ্যার জড়াইয়া, কিন্তু ইহা হইতে বাঙ্গালার মধ্যম ও নিম্ন শিক্ষার একটা আভাস পাওয়া যায়। প্রায় বার আনা ছাত্র বাঙ্গালী। তারপর নিম্ন শিক্ষা। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের রিপোর্টে জানা যায়—১৮৯৪-৯৫ সালে ১২০৬১৩১ জন নিম্ন শিক্ষা পাইয়াছে। তার পূর্ব্ব বৎসর উহাদের সংখ্যা ছিল ১১৩০২২৮। নিম্ন শিক্ষার বিস্তারের দিকে গতি খুব প্রবল না হইলেও অপ্রতিহত। এই হারে বৃদ্ধি পাইলে ৪।৫ শত বৎসরের মধ্যে দেশে আর অশিক্ষিত পুরুষ থাকিবে না। বৎসরের সংখ্যা দেখিয়া কেহ কেহ হতাশ হইতে পারেন। তাঁহাদের বুঝা উচিত জাতীয় জীবনে ৪।৫ শত বৎসর অতি সামান্য সময়। শেষ স্ত্রী শিক্ষা। ইহারও বিস্তার হইতেছে মন্দ নয়। বিথুন কলেজে মহিলারা উচ্চ শিক্ষা পাইতেছেন। দেশের মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়ও কম নয়। ১৮৯৪-৯৫ সালে শত করা ২ জন বালিকা শিক্ষা লাভ করিয়াছে। তার পূর্ব্ব বৎসর শত করা ১·৯ জন শিক্ষা পাইয়াছিল। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার আশানুরূপ হইতেছে না বলিয়া যাঁহারা দুঃখ করেন, তাঁহাদিগকে বলি এত উতলা হইলে চলিবে কেন? ২৫ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রী শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল একবার ভাবুন। এখানে একটী মাত্র ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করিতে চাই। তাহা আইন। দেশ আজ কাল সুবিদ্বান দক্ষ ব্যবহারাজীবে পরিপূর্ণ। সমাজের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে ইহাঁরাই আমাদের সমাজের নেতা। কি চরিত্র-বলই বলুন, কি ন্যায়পরতাই বলুন, ইহাঁরা দুইয়েতেই সর্ব্ব প্রধান। পরোপকারই ইহাঁদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে ইহাঁরাই প্রধান সহায়। মিথ্যা হইতে সত্য বাছিয়া বাহির করাই ইহাঁদের প্রধান কাজ। কি নৈতিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, যে কোন উন্নতিই বলুন না কেন ইহাঁরা সবই সাধন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। যে দেশে এমন চরিত্রবান, হৃদয়বান, ধর্ম্মপ্রাণ কার্য্যতৎপর, দেশ হিতকর ব্রতে রত, উৎসাহী ও দক্ষ উকীলদল সৃষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন, সে দেশের যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অবশ্যম্ভাবী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাঁরা সকলেই বৃষস্কন্ধ, দেশের ভার ইহাঁদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায়।

শিক্ষা বিস্তার কিরূপ হইতেছে তাহা উপরে দেখান গেল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক উন্নতিরও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গিয়াছে। নৈতিক

কলই প্রধান ফল, এবং সকলকেই স্বীকার করিতে হইবেক যে আজ কাল কার শিক্ষিত বাঙ্গালী নেশা ভাঙ্ ব্যভিচারাদি হইতে এক প্রকার বিরত, সত্যব্রত ও কর্ম্মনিষ্ঠ; সামাজিক কোন দোষ দৃষ্ট হইলেই তাঁহারা সভা করিয়া তার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন। "সমাজ-শৃঙ্খল মালা নবসূত্রে" গাঁথিতে তাঁহারা কত উৎসুক। তাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী, বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী। অধিক আর কি বলিব, শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বতঃ পরতঃ আজ দেশহিতে রত, এবং নৈতিক উন্নতি না হইলে প্রকৃত দেশোন্নতি হয় না বলিয়া যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় সেই চেষ্টাই একরূপ তাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই দশজন শিক্ষিত ব্যক্তি দেখা যাইতে পারে যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী ও বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী নন। ইহাতে কিন্তু দুঃখিত হইবার কারণ নাই। উন্নতিশীল সমাজে মতভেদ থাকিবেই। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থার ও এক্ষণকার মতভেদে একটু সামান্য প্রভেদ আছে। এখনকার মতভেদে উচ্ছৃঙ্খলতার আমেজ মোটে নাই। যিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী ও বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী তিনিও যেমন শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতেছেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরাও সেইরূপ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতেছেন। এ দৃশ্য যে কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতিপ্রদ তাহা ক্ষুদ্র লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এইরূপ উন্নতি ত হইবারই কথা! হিন্দু নীতির চেয়ে আর নীতি নাই, এবং এত দিনের পর শিক্ষিত হিন্দু সন্তানের সনাতন নীতির প্রতি যখন মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন আর ভাবনা কি? আবার দেখুন দৈহিক বলের অনাবশ্যকতা আজও মনুষ্যসমাজে হয় নাই। আমরা তাহাও বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। হিন্দু আচার ব্যবহার অবশ্য সম্পূর্ণরূপে দৈহিক বল বৃদ্ধির সহকারী। দিন কতক ধাঁধায় পড়িয়া আমরা ও সব কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন চারিদিকে ব্যায়াম চর্চ্চার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এমন কি যে সব বড় লোক কস্মিনকালে এক পা হাঁটেন নাই তাঁহারাও ব্যায়ামের উপকারিতা এতদূর বুঝিয়াছেন যে যখনই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জেলায় ব্যায়ামের উৎসাহ দিবার অর্থে চাঁদা তুলেন, তাঁহারা অকাতরে মোটা মোটা চাঁদা দিয়া থাকেন। অনেক পিতামাতা আজ কাল যে স্কুলে ব্যায়মের চর্চ্চা নাই সে স্কুলে ছেলে পাঠাইতে বিরত হইতেছেন।

আমাদের কার্য্য-কুশলতা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু না

বলিয়া থাকা গেল না। রেলওয়ে নির্ম্মাণ ও পরিচালনা এক দুরূহ ব্যাপার। এ হেন দুরূহ ব্যাপারেও বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ নন। বাঙ্গালী জগতকে দেখাইয়াছেন যে রেলওয়ে নির্ম্মাণ ও পরিচালনায় তাঁহারা কোন জাতি অপেক্ষা হীন নন। তাঁহাদের পথে যে কত বিঘ্ন ইহা যিনি ভাবিয়া না দেখিয়াছেন তিনিই কেবল বলিবেন যে বাঙ্গালী যাহা দেখাইয়াছেন তাহা কিছুই নয়। বাঙ্গালীরা দেশলাইএর কল করিয়াছেন, তেলের কল ও ময়দার কল চালাইতেছেন, শীঘ্র বোধ হয় কাপড়ের কলও করিবেন, এবং ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত স্থাপিত করিয়া জগৎকে দেখাইয়াছেন যে কাজ যতই কঠিন হউক না কেন বাঙ্গালীরা চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের কাছে তাহাকে অবনতমস্তক হইতে হইবে। চা, রেশম ও নীলের কাজে বাঙ্গালী আছেন এবং ইহাঁরা খনি হইতে পাথুরিয়া কয়লা পর্য্যন্ত তুলিতেছেন। ভরসা আছে ক্রমে বিদেশীয়গণ এই সব এবং এখানে স্থানাভাবে উল্লেখ করা গেল না এমন আরও সব কঠিন ব্যবসা হইতে বিদূরিত হইবেন। যে দিন লর্ড রিপন আত্মশাসন আইন জারি করেন সে দিন কত লোকে কত কথা বলিয়াছিল! বাঙ্গালীর শত্রুরা কতই না হাসিয়াছিল! অনেকে বলিয়াছিল, অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী যাঁহারা ভাজা মাছখানাও উল্টাইয়া খাইতে জানেনা, তাহাদের হাতে আত্মশাসন! আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সেই ঘৃণিত বাঙ্গালী মিউনিসিপাল সভায় ও জেলা বোর্ডের অধিনেতৃত্ব করিয়া আসিতেছেন। জেলায় শিক্ষা, রাস্তা ঘাট, স্বাস্থ্য প্রভৃতি এখন তাঁহাদের হাতে। দেশের ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল নগরগুলিরই তাঁহারা হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এই সব গুরুতর কার্য্য তাঁহারা যে কিরূপ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, এক কথায় তাহা বুঝাইয়া দিব। সকলেই জানেন প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনর ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের মত বাঙ্গালী বিদ্বেষী আর জগতে আছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালী বাবুকে গালি দেওয়াই তাঁর প্রধান কাজ। মিউনিসিপালিটি ও বোর্ডগুলির কার্য্য এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে যে কখন কখন ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেবের কলমকেও গালাগালির বেগ সংহার করিতে হয়। বাঙ্গালীর ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? বাঙ্গালীরা যদি এইরূপ শীঘ্র পদে উন্নতির দিকে ধাবমান হন, তাহা হইলে ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেব ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আরও জন কয়েক সাহেব শীঘ্র ঈর্ষায় ফাটিয়া মরিয়া যাইবেন।

একবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক্। বাঙ্গালীরা বেশ বুঝিয়াছেন যে, পরের উপর দেশ রক্ষার ভার দেওয়া ভালনয়। সেই জন্য তাঁহারা ভলণ্টিয়র হইবার আশায় গভর্ণমেণ্টের দ্বারে নিয়ত আঘাত করিতেছেন। অপর আর যাহা দোষ থাকুক না কেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু বোকা নন। মুখে যাহাই বলুন না কেন, ইংরাজ রাজপুরুষগণ বাঙ্গালী-দিগকে চিনেন, এবং একটু ভয়ও করেন। তাঁহারা মনে করেন বাঙ্গালীকে ভলণ্টিয়র হইতে দেওয়া ভারত হারাইবার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় হইবে। সেই জন্য বোধ হয় বাঙ্গালী শীঘ্র ভলণ্টিয়র দলে প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহাতে বর্ত্তমানে বাঙ্গালীদের স্বদেশ হিতৈ-ষিতা বা শৌর্য্য বীর্য্যের কোন লাঘব হইতেছে না। অপর দিকে দেখুন, বৃটিশ ভারত ও ভারতসভাপ্রমুখ রাজনৈতিক সভা বাঙ্গলায় যত হিন্দু স্থানের আর কোন প্রদেশে তত দৃষ্ট হইবেক না। জাতীয় জীবন যে কত তেজোপূর্ণ তাহার ইহা অপেক্ষা উত্তমতর প্রমাণ আর দেওয়া যাইতে পারে না। যেখানে এক আধটী রাজনৈতিক সভা নাই, এমন সহর দেশে খুব বিরল, এবং প্রত্যেক সভাই সজীব। প্রত্যেক রাজনৈতিক প্রশ্ন এই সভাগুলি কর্ত্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয়, এবং ইহারা দেশের জ্ঞান বৃদ্ধির এক প্রধান সহায়। তারপর দেখুন বাঙ্গালী পরিচালিত বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদ পত্র। সভ্য দেশে সংবাদ পত্র এক প্রধান ক্ষমতা, এবং লোক-শিক্ষার এক বিশেষ উপায়। আমাদের সংবাদ পত্র সমূহ যে খুব দক্ষতার সহিত চালিত, তাহা কি শত্রু কি মিত্র সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। ইহাদের দলাদলি আছে, কিন্তু ইতরতা নাই, তীব্র সমালোচনা আছে, কিন্তু গালাগালি নাই, ওজস্বিতা আছে, কিন্তু রূঢ়তা নাই, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আছে, কিন্তু অন্ধতা নাই, ক্ষমতা আছে কিন্তু অপব্যবহার নাই। সংবাদপত্র দেশে নূতন, কিন্তু উন্নতি দেখিয়া বোধ হয় যে অল্প দিনের মধ্যেই ইহাদের সমকক্ষ পাওয়া যাইবেক না। এ প্রসঙ্গে আর একটী কথা মাত্র বলিতে চাই। ভারতের রাজনৈতিক গগনে আজ কংগ্রেস উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। এ হেন কংগ্রেস বাঙ্গালীর সৃষ্ট। শুনিতে পাই না কি একজন স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী উকীল ইহার জন্মদাতা। যে কংগ্রেসের নামে আজ ইংরাজ চকিত, যার খ্যাতি আজ ইউরোপ মহাখণ্ডে প্রতিধ্বনিত, বাঙ্গালীই সেই কংগ্রেসের প্রাণ, একজন বাঙ্গালী উকীল সেই কংগ্রেসের জন্মদাতা, একথা

ভাবিতে গেলে যুগপৎ আনন্দিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার পর যে বলিবে—

"ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি,"

সে হয় ভয়ানক হিংসুক, নয় নিরেট বোকা। কেহ কেহ মনে করেন কংগ্রেস হইতে কোন উপকার হইতেছে না। আমরা বলি যখন কংগ্রেসে শিক্ষিত লোক আছেন তখন ইহা দ্বারা প্রভূত উপকার সাধিত হইবেই। তাহার সম্ভাবনা না থাকিলে আমাদের দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ন্যায় কাজ-পাগল ও কার্য্যদক্ষ সম্প্রদায় কখনই ইহাতে যোগ দান করিতেন না। ইঁহারা যোগ দেওয়াতে পরিণামে কংগ্রেসের সফলতা আমাদের কাছে জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় জ্ঞান হয়। জাতীয় উন্নতির আর দুইটি চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

(১১) শিক্ষিত বাঙ্গালীর পোষাক। সভ্য জগতে পোষাকই সব। ইহাই সভ্যতাব্যঞ্জক, ও তাহার মাত্রার পরিচায়ক। একজন ইংরাজীতে প্রগাঢ় পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছি কার্লাইল নামে জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থকার পোষাক সম্বন্ধে এক বই লিখিয়াছেন, এবং তাহাতে বলিয়াছেন পোষাকই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। পোষাক খুলিয়া লও, রাজা প্রজার কোন প্রভেদ থাকিবেক না। একবার এক সভাস্থলে আমাদের দেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মহোদয় বলিয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারেন না শিক্ষিত বাঙ্গালী কি করিয়া ধুতি চাদর পরিয়া বেড়ান। শিক্ষিত বাঙ্গালী এত দিনের পর তাঁর ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন, পোষাকের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন। যাঁহারা বিলাত পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, তাঁরা ত সভ্য জগতের পোষাকই অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহারা বোম্বাইয়ের অধিক যান নাই তাঁহারাও ধুতি দেখিলে শিহরিয়া উঠেন। সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর পোষাক যে ক্রমে সভ্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে, তাহা, যাঁহারা পোষাকতত্ত্ব আলোচন তৎপর, তাঁহারা বেশ বুঝিতেছেন। মহিলারাও মাথায় বনেট দিতেছেন। এখন পরিবর্ত্তনের সময় নানা মুনির নানা মত। প্রত্যেক শিক্ষিত পুরুষ বা স্ত্রীলোকের পোষাকে একটু না একটু পার্থক্য লক্ষিত হয়, পোষাক দেখিলেই হঠাৎ বাঙ্গালী বুঝা যায় না, কিন্তু এমন সময় শীঘ্র আসিবে যখন পুরোহিত ঠাকুর হইতে মেথর পর্য্যন্ত সকলকেই একই বিলাতী ছাঁচে ঢালা পোষাকে আবৃত দেখিতে পাওয়া যাইবে, এবং কাজে কাজেই জাতীয়

উন্নতি চরম সীমায় উঠিবে। পরিবর্ত্তনের দিক ও গতি দেখিয়া সকল দেশ-হিতৈষীই এরূপ আশা করিতে পারেন। (২) শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাষা। একজন অল্পদৃষ্টি লোক একবার বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা, ইংরাজী না জানিলে বুঝা যায় না। শাদা বাঙ্গালারই সম্বন্ধে যখন এই মত, তখন তিনি ইংরাজী কথা বা বাক্যের দ্বারা অলঙ্কৃত সাধারণ কথোপকথন শুনিলে যে কি বলিতেন বলিতে পারি না। বস্তুতঃ কিন্তু এইরূপ ইংরাজীমিশ্রিত বাঙ্গালা জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক। বিস্তীর্ণ ইংরাজী ভাষায় যত ভাব প্রকাশ করা যায় সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় তাহা যায় না। শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাব-রাজ্যের উপর এত দখল জন্মিয়াছে যে তার সমান ভাব প্রকাশ করিতে গরিব বাঙ্গালা ভাষা অক্ষম। কাজে কাজেই তাঁহাকে ইংরাজী ভাষার আশ্রয় লইতে হয়, এবং বাঙ্গালা বলিবার সময় তাহার সঙ্গে ইংরাজী বুকনি মিশাইতে হয়। এই কারণে বাধ্য হইয়া চিঠি পত্রও তাঁহাকে ইংরাজীতে লিখিতে হয় ও বক্তৃতা আন্দোলনাদি ইংরাজীতে করিতে হয়। মনোভাবের সংখ্যার তারতম্যই সভ্যতা অসভ্যতা, এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অবস্থার প্রভেদ। বাঙ্গালী যতই উন্নত হইতেছেন ততই তাঁহার মনোভাবের সংখ্যা বাড়িতেছে, ততই তাঁহাকে বাঙ্গালা হইতে অন্তর হইতে হইতেছে। এ উন্নতির শেষ সীমা দেশ হইতে বাঙ্গালা উঠিয়া যাওয়া। কে বলিতে পারে ফলে তাহা ঘটিবে না ?

আমাদের উপপাদ্য বিষয় আমরা একরূপ খাড়া করিয়া তুলিলাম বলিয়া মনে হইতেছে। রক্ষণশীলতার দিক হইতেই দেখ আর পরিবর্ত্তনশীলতার দিক হইতেই দেখ বাঙ্গালীর উন্নতি হইতেছে। সকল দিকেই যে সমান বেগে হইতেছে তাহা বলি না, কিন্তু মোটের উপর চারি দিকেই উন্নতি হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। যদি এমন কেহ থাকেন, যিনি এ প্রবন্ধ মনোযোগের সহিত পাঠ করেন নাই; তিনি একটা আপত্তি তুলিতে পারেন। তিনি হয়ত বলিবেন প্রবন্ধ অসঙ্গতি দোষে দুষ্য। প্রবন্ধের প্রথমে প্রমাণ করা হইয়াছে, ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের চর্চ্চা আমাদের মধ্যে বাড়িতেছে, এবং পরে যে আরও বাড়িবে এরূপ আশা করা হইয়াছে। লোক যে ক্রমে অধিকতর হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবেন এ কথাও বলা হইয়াছে। প্রবন্ধের শেষ ভাগে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ক্রমে ইংরাজী চাল চলনের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন, এবং দেশ যত

অগ্রসর হইবে ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী পোষাক দেশে তত প্রবল হইয়া উঠিবে। এ দুইটী বস্তু পরস্পরের বিরোধী, এবং একটী সত্য হইলে অপরটী সত্য হইতে পারে না। এই আপত্তির উপরে আমরা বলি যে প্রবন্ধে যে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতে পারে, তাহা বাহ্যিক, আভ্যন্তরিক নয়। বস্তুতঃ মনোভাবের সঙ্গে পোষাক চাল চলন বা ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। হিন্দুভাব পোষাকের সঙ্গেও জড়িত নয়, চাল চলনের সঙ্গেও নয়, এবং ভাষার সঙ্গেও নয়। আপনারা কি কেহ এরূপ লোক দেখেন নাই যিনি বাহিরে সম্পূর্ণ সাহেব, ইংরাজী ছাড়া কথা কন না, অথচ সম্পূর্ণ হিন্দু? যদি দেখিয়া না থাকেন, এরূপ লোকের কথা শুনেনও নাই কি? যদি দেখিয়া বা শুনিয়া না থাকেন বা কল্পনাতেও আনিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনারা কৃপার পাত্র আপনাদের অদৃষ্ট মন্দ। দেশীয় পোষাক উঠিয়া গেলে জোর এই হইবে যে আমাদিগকে সাহেবী মতে শোক প্রকাশ করিতে হইবে; এবং দেশীয় ভাষা উঠিয়া গেলে না হয় বেদ বেদান্তাদির ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিতে হইবেক, না হয় দর্শন ভগবদ্গীতা, সাহিত্য ও সংহিতাদি রোমান অক্ষরে পাঠ করিতে হইবেক। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মাচরণের যে কি ব্যাঘাত হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। কত খাস সাহেব যে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছেন, এবং দুই চারি পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ হিন্দু হইয়া পড়িবেন, ইহা কি আপনাদের জানা নাই? এত কথার পরও যদি কেহ বলেন যে প্রবন্ধের অসামঞ্জস্য দূরীভূত এবং দূর হইবার নয়, তাঁহার প্রতি এইমাত্র বক্তব্য, আমরা যুক্তি দিতে পারি, বুদ্ধি দেওয়া আমাদের ক্ষমতাতীত।

দ

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নাসা-বৈচিত্র্য।

মস্তিষ্কতত্ত্ববিদ্‌গণ মস্তকের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিয়া মানব প্রকৃতির নির্দ্দেশ করেন, করচিহ্ন দ্বারাও কোন কোন দেশে জীবনের শুভাশুভ নির্ণীত হয়। 'পামিষ্ট' পত্রিকায় জনৈক লেখক লিখিয়াছেন যে মানবচরিত্র নাসিকার গঠনের উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নাসিকার গঠনের মধ্যে কিছু না কিছু বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় কিন্ত

মানব নাসিকাকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কাহারও নাসিকার মূলদেশ, কাহারো মধ্যভাগ এবং কাহারো অগ্রভাগ স্ফীত বা উচ্চ দেখায়; প্রথম শ্রেণীর নাসিকাকে 'মিলিটারী,' দ্বিতীয় শ্রেণীর নাসিকাকে 'রোমাণ্টিক' এবং তৃতীয় শ্রেণীর নাসিকাকে 'সেলফিষ' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। যাহাদের নাসামূল উচ্চ তাহাদের চরিত্রে প্রবল কার্য্যকুশলতা, অসাধারণ বল এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রকাশ পায়, এই প্রকার নাসিকাকে অনেকে 'ওয়েলিংটনীয়' এই আখ্যা প্রদান করেন। সেনাপতি ওয়েলিংটনের নাসিকা এই জাতীয় নাসিকার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হইত; 'প্যালেশ থিয়েটারের' সুযোগ্য অধ্যক্ষ মিঃ চার্লশ মর্টনের নাসিকা বর্ত্তমান কালে 'মিলিটারী' নাসিকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

রোমান এবং গ্রীসিয়ান নাসিকা।

যাহাদের রোমাণ্টিক শ্রেণীর নাসিকা, অন্যের সহিত সখ্যতা লাভের ইচ্ছা তাহাদের অত্যন্ত অধিক। তাহারা উৎপীড়কের হস্ত হইতে আর্ত্তকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করে এবং নিতান্ত স্বার্থশূন্যভাবে অন্যের উপকারে প্রবৃত্ত হয়। 'সেলফিষ' শ্রেণীর নাসা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থাৎ যাহাদের নাসিকার অগ্রভাগ স্ফীত বা উচ্চ তাহারা স্বতঃপরতঃ স্বার্থানুসন্ধানে ব্যস্ত; স্বার্থই তাহাদের জীবনের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য, নিজের স্বার্থ-সাধনের জন্য তাহারা অন্যের সুবিধা অসুবিধা বা ক্ষতি লাভের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। নাসিকার অগ্রভাগ উপরের দিকে ঘুরান হইলে মানুষ অত্যন্ত কুটিল, রসিক এবং বিদ্রূপ-পরায়ণ হয়, এই বিদ্রূপ ও রসিকতায় অনেকেই মর্ম্মে আঘাত পায়। এই প্রকার নাসাধারিগণের কলহ-প্রবৃত্তিও অত্যন্ত অধিক; ক্ষমতা না থাকিলেও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যেক কাজে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা তাহাদের বিশেষ প্রবল। যে সকল স্ত্রীলোকের নাক এই প্রকার তাহারা সাধারণতই কলহপ্রিয় হয়।

যে সকল নাসিকার উপরিভাগ উচ্চনীচ নহে, ঠিক সমতল, তাহাদিগকে গ্রীসিয়ান নাসিকা কহে। যাহাদের এই প্রকার নাসিকা তাহাদের কিছু-মাত্র চরিত্রবল নাই, তাহারা সুরুচিসম্পন্ন এবং আরামপ্রিয়।

নাসিকার আকার।

নাসিকার আকার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হইয়াছে। যে সকল লোকের নাসিকা দীর্ঘ এবং নাসাগ্র নিম্নগামী, তাহারা ধূর্ত্ত, সন্দিগ্ধচিত্ত,

সতর্ক, ষড়যন্ত্রপ্রিয় এবং মতলব-বাজ লোক। ইহুদীদিগের মধ্যে নাসিকার এই বৈচিত্র বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। এই প্রকার নাসিকা থাকায় তাহারা সহজেই বুঝিতে পারে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কিঞ্চিৎলাভ হওয়া সম্ভব। যাহাদের এই শ্রেণীর নাসিকা আইনেও তাহাদের যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখা যায়। লর্ড চীফজষ্টিস্ রসেল, তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত।

নাসিকার আয়তন ক্ষুদ্র হইলে মানুষ চঞ্চলচিত্ত হয়, তাহাদের চরিত্রবল থাকে না, ইহা সর্ব্বত্র অবিসম্বাদিতরূপে সত্য নহে; কোন কোন ইংরেজ লেখক বলেন 'যাহার নাক যত বড় সে ব্যক্তি তত গুণবান।' কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ক্ষুদ্র নাসিকাধারী অনেক ব্যক্তিকেও প্রধান্য লাভ করিতে দেখা যায়। যাহাদের নাসারন্ধ্র অত্যন্ত বিস্তৃত তাহারা দরিদ্র এবং জ্ঞানানুসন্ধিৎসু হইয়া থাকে; যাহাদের নাসারন্ধ্র সংকীর্ণ তাহারা ধনবান হয় বটে কিন্তু অমিতব্যয়িতা দোষে তাহারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না।

নাসাগ্র।

যাহাদের নাসাগ্র স্থূল, তাহারা অত্যন্ত বচনবাগীশ হয়। তাহারা গৃহস্থালী সম্বন্ধে বা অন্য কোন সামান্য বিষয় লইয়া এমন উৎসাহের সহিত গল্প আরম্ভ করে যে সহজেই শ্রোতার সহিষ্ণুতা নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু তাহাদের বাক্যস্রোত বন্ধ হয় না। এইরূপ নীরস গল্পে তাহারা অনায়াসেই দুই এক ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে পারে এবং গল্পের মধ্যে হাস্যরসের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না থাকিলেও বক্তার মুখবিবর হইতে ক্ষণে ক্ষণে প্রচুর হাস্যরস উদ্গত হইয়া অসহিষ্ণু শ্রোতাদিগকে অস্থির করিয়া তুলে।

যাহাদের নাসাগ্র সরু তাহারা সতর্ক এবং গম্ভীর। যাহাদের নাসিকার অগ্রভাগ অত্যন্ত অধিক সুঁচল, তাহাদিগকে জীবনের অনেক সুবিধাই হারাইতে হয়। রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকের নাসিকা এই শ্রেণীর। সামান্য বায়ুর শব্দেও তাহারা ভয় চঞ্চল হইয়া সাবধানতা অবলম্বন করে।

সংক্রামক পীড়ার নিদান।

সময়ে সময়ে এক এক স্থানে সংক্রামক পীড়া আবির্ভূত হইয়া তত্রত্য বহুসংখ্যক অধিবাসীকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে; জলে বা বায়ুমণ্ডলে

প্রবল কীটাণুর আধিক্যই ইহার কারণ বলিয়া বর্ত্তমান যুগের ভৈষজ্যতত্ত্ববিৎগণের বিশ্বাস হইলেও সংক্রামক রোগের প্রকৃত কারণ আজও রহস্যসঙ্কুল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এরূপ ভূরি প্রমাণ কীটাণু কোথা হইতে আসে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া ডাক্তার টমাস ব্লেয়ার 'মেডিক্যাল নিউস' নামক পত্রিকায় এক অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "পার্থিব বায়ুমণ্ডলের বহির্দ্দেশে তাহাদের উৎপত্তি, অর্থাৎ তাহাদের স্থান প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রলোকে। আমরা উক্ত ডাক্তারের লিখিত প্রবন্ধের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক অংশটির অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"হাজার হাজার টন উল্কাপিণ্ড এবং ধূলি বৎসর বৎসর পৃথিবীর বহির্দ্দেশ হইতে পৃথিবীর উপর আসিয়া সঞ্চিত হয়। এই সকল সঞ্চিত পদার্থ যে বহুবিধ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কেহ কেহ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই সকল পদার্থ বহুল পরিমাণে জীবাণুর (life germ) সহিত সংহত হয়। ডারউইন সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন যে একবার দশ লক্ষ বর্গমাইল ভূখণ্ডের উপর এক আশ্চর্য্য ভৌতিক পদার্থ বর্ষিত হইয়াছিল। ইহা যে ভূবায়ুমণ্ডলের বহির্দ্দেশস্থ পদার্থ তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। জার্ম্মাণীতে পেকেলো নামক স্থানে একবার পীতবর্ণ তুষার ধারা বর্ষিত হইয়াছিল। ওয়েবার নামক একজন পণ্ডিত তাহাতে পুঞ্জীকৃত কীটাণু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ইটালীর উত্তরভাগে একবার ভৌতিক পদার্থের বর্ষণ হয়, তাহাতে ছয় শত বর্গমাইল ভূখণ্ড একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, এবং আল্প পর্ব্বত নয় ফিট পুরু রঙ্গীন বরফে আবৃত দেখা গিয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফরাসীদেশে এক প্রকার আণবিক (microscopic) পদার্থ বর্ষিত হইয়াছিল, তাহারা প্রায় শতাধিক বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট; ইরেনবর্গ নামক জনৈক পণ্ডিত গণনার দ্বারা স্থির করেন যে, ইহার সহিত পঁয়তাল্লিশ টন কীটাণু বর্ষিত হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইটালীদেশে, এবং ইহার দশ বৎসর পরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কালেব্রিয়াতেও এক প্রকার কীটাণুবর্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। আর একবার প্যালেষ্টাইনে এবং পশ্চিম কেণ্টকীতে এই ঘটনার পুনরাভিনয় হয়। এ সমস্ত যে পার্থিব পদার্থ তাহা অনুমান করা কঠিন। আধুনিক পর্য্যবেক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে রঞ্জিত তুষার সমূহ কীটাণুপুঞ্জে পরিপূর্ণ এবং মেরুপ্রদেশস্থ তুষারে তিনশত বিভিন্ন প্রকারের

জীবাণু বর্ত্তমান আছে। ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ুমণ্ডলে এই সকল জীবাণুর উদ্ভব সম্ভবপর নহে বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন।

যাহাদের সহিত অগ্নির কোন সম্বন্ধ আছে সেই সকল ভিন্ন অন্য সমস্ত পার্থিব পদার্থই জীবাণুতে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই জড় পদার্থের স্বরূপ অভিন্ন, অতএব ব্যাক্টেরিয়া বা উদ্ভিজ্জাণু যে অন্যান্য গ্রহ এবং গগনবিলম্বী মেঘসমূহ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, একথা অতি সহজেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর বহির্ভাগস্থ অসংখ্য কীটাণুর অধিকাংশই মৃত অবস্থায় পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছে, কারণ তাহাদিগকে অতি শৈত্যময় শূন্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু কীটাণু ও উদ্ভিজ্জাণুর জীবন শীঘ্র বিনষ্ট হয় না। তুষার রাশির মধ্যেও অনেকে সজীব অবস্থায় থাকে; আবার অনেক উদ্ভিজ্জাণু কালক্রমে অধিক উত্তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা লাভ করে। কোন কোন জাতীয় কীটাণু কিছুকাল জীবিত থাকিয়া অবশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ইহারা যে সংক্রামক রোগের উৎপত্তি করে, ইহাদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই রোগও অন্তর্হিত হয়।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে 'ব্ল্যাক প্লেগ" নামক মড়কে পৃথিবীর পাঁচ কোটী অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। রোগ-কীটাণু দ্বারাই যে এই সংক্রামক ব্যাধি স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। বাণিজ্যোপলক্ষে এক দেশের সহিত অন্য দেশের সংশ্রবে এই রোগ এত শীঘ্র বিস্তৃত হইতে পারিত না। জলে স্থলে সর্ব্বত্রই ইহার প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। এই রোগ বিস্তার উপলক্ষে একখানি প্রাচীন পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল—"দূষিত বায়ু যখন মৃত্যুভার বহন করিয়া আসিত, তখন তাহা প্রকৃতই দৃষ্টিগোচর হইত, আকাশ ভয়ানক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত।" অনেক সময় কোন কোন বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত মেঘ সংক্রামক পীড়ার বীজ বহন করিয়া আনে। পৃথিবীতে 'ব্ল্যাক প্লেগের' আবির্ভাব এবং তিরোভাবের কারণ কি—এই প্রশ্ন লইয়া তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক মহলে বিশেষ আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল— অবশেষে স্থির হয় যে রোগ-কীটাণুর বিস্তারই ইহার কারণ। পৃথিবী—তাহার আবর্ত্তনপথে শূন্যমণ্ডলের এইরূপ কীটাণুপূর্ণ স্তরে আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার ঘুরিতে ঘুরিতে সেই অংশ অতিক্রম করিলেই পৃথিবী হইতে রোগ

বিদূরিত হইয়া গেল, পৃথিবীর জলবায়ু এই রোগাণুর অনুকূল না হওয়াতে তাহারা অধিক দিন পৃথিবীতে স্থায়ী হইতে পারে নাই। 'পটেড্ ফিভার' নামক এক প্রকার জ্বরের আবির্ভাবেরও ইহাই কারণ। এই জ্বরের কথা এখন অনেকেই অবগত নহেন এবং এই পীড়া পৃথিবী হইতে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ১৮৬৬।৬৭ খৃষ্টাব্দের black deathএর ন্যায় এক সময় ইহা অত্যন্ত ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। অন্যান্য সংক্রামক পীড়ারও আবির্ভাব এবং হটাৎ তিরোভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু প্রচলিত 'থিওরি' দ্বারা তাহাদের কার্য্যকারণ নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া নিষ্ফল।

ডাক্তার ব্লেয়ার তাঁহার মতকে অভ্রান্ত বলিতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন ইহা দ্বারা একটি অভিনব চিন্তার পথ প্রশস্থ হইবে; এবং এ সম্বন্ধে গভীর পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার ব্লেয়ারের এই নূতন আবিষ্কার (আমরা ইহাকে আবিষ্কারই বলিতেছি) চিত্তাকর্ষক এবং কৌতুকো-দ্দীপক। ইহাদ্বারা একদিন জগতের প্রকাণ্ড অভাব নিরাকৃত হইতে পারে।

বেলুনে ছয় মাইল উর্দ্ধে।

ডাক্তার এ. পারসন নামক একজন গগনবিহারী জর্ম্মণীয় ষ্ট্রাটগার্ট নগরে 'ফিনিক্স নামক বেলুনে আরোহণ করিয়া উর্দ্ধাকাশে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার এই আকাশ বিহার বৃত্তান্ত 'দি জর্ণাল অব দি এরোনটিক্স্' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের কৌতুহল দূর করিবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিলাম:—

এই বেলুন দুই হাজার কিউবিক মেটার জলজান বাষ্পে পরিপূর্ণ করা হয়; এবং আকাশস্থ বায়ুর গতি, চাপ ও শীতোষ্ণতা পরীক্ষা করিবার জন্য ইহাতে বায়ুমান যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রাদি লওয়া হইয়াছিল। বেলুন আকাশে উঠিবার পনেরো মিনিট মধ্যে ইহা ছয় হাজার পাঁচশত ফিট উর্দ্ধে উঠিল। ঠিক এক ঘণ্টা হইলে দেখা গেল ইহা ১৬ হাজার ফিট উচ্চে উঠিয়াছে, সেথানে তাপমান যন্ত্রের পরিমাণ—১৮° সিণ্টিগ্রেড্। দুই ঘণ্টার মধ্যে বেলুন ২৬ হাজার ফিট উর্দ্ধে উঠিল; অর্থাৎ তথন বেলুন এক হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ ব্যতীত পৃথিবীস্থ সমুদয় পর্ব্বত শৃঙ্গের উর্দ্ধে বিচরণ করিতেছিল; এথানে তাপমান যন্ত্রের পরিমাণ ৩৯° সেণ্টিগ্রেড। ডাক্তার পারসন পূর্ব্ব হইতে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন; তাহাতে উর্দ্ধস্থ বায়ুমণ্ডলের লঘুতা এবং নিদারুণ শৈত্য তাঁহার কোন অপকার

করিতে পারে নাই; বায়ু অত্যন্ত পাতলা হইয়া আসিলে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অম্লজান বাষ্পের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য অম্লজান বাষ্পপূর্ণ ব্যাগের সাহায্যে নিশ্বাস গ্রহণ না করাতে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন,মস্তক ঘুরিতে লাগিল এবং দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া আসিল। কিন্তু অম্লজান বাষ্পের পুনঃ পুনঃ শ্বাস গ্রহণে এত-উর্দ্ধেও তাঁহার কোন বিপদ ঘটে নাই। বেলুনে আরোহণের আড়াই ঘণ্টা পরে ডাক্তার ত্রিশ হাজার বারো ফিট উচ্চে উঠিলেন, এখন তিনি হিমালয় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘারও প্রায় হাজর ফিট উর্দ্ধে। ডাক্তার পারসন এখানে বায়ুমান যন্ত্রে দেখিলেন বায়ুর চাপ দুইশত একত্রিশ মিলিমেটার। এখানে তাপমান যন্ত্রের পরিমাণ—৪৭.৯০ সেণ্টিগ্রেড। ডাক্তার আরও কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বেলুন চালিত করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার অঙ্গুলী অসাড় হইয়া আসিল এবং তিনি অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বেলুন ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিল। ডাক্তার পারসন স্থুরেনওয়াস্ত নামক স্থানে এক শস্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। উর্দ্ধস্থ বায়ু মণ্ডলের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সত্য তিনি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। শীতোষ্ণমণ্ডলে পাঁচহাজার ফিট উচ্চ হইতে ত্রিশ হাজার ফিট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ুর বেগ এবং শৈত্যের পরিমাণ বিস্ময়জনক ক্রমে পরিবর্ত্তনশীল।

ফরমোজা।

চীনযাপান যুদ্ধের সালে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার সহিত ফরমোজাদ্বীপের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায় এই দ্বীপ সহসা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। চীন সম্রাট এই দ্বীপ যাপানের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা লাভ করিয়া যাপানের বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং ইহাতে যাপানের প্রাধান্য আরও বর্দ্ধিত হইবে। চীন ভাষায় এই দ্বীপের নাম তাই,—ওয়ান; ইহা চীনের কো-কিন প্রদেশ হইতে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত। ফরমোজা দ্বীপ ২৪৫ মাইল দীর্ঘ, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতির পরিমাণ একশত মাইল। আকারে সিংহল দ্বীপের অর্দ্ধাংশেরও অধিক, পরিমাণ ফল ১৪৯৮২ বর্গ মাইল। ইহার লোক সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। এই দ্বীপের পশ্চিম অংশ কো-কিন প্রদেশের শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল, এবং পূর্ব্বাংশ অসভ্য বন্যজাতির অধিকার ভুক্ত ছিল। এক

সুদীর্ঘ পর্ব্বত শৃঙ্খলে এই দ্বীপকে দীর্ঘ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, এই পর্ব্বত অল্প উচ্চ নহে, ইহার কোন কোন শৃঙ্গ বার হাজার ফিট উচ্চ। অধিকাংশ শৃঙ্গই শুভ্র তুষার মণ্ডিত। পর্ব্বতের সানুদেশ সুদীর্ঘ সুন্দর বৃক্ষ-রাজীতে ও তৃণপূর্ণ শ্যামল গোচারণ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। সমুদ্র হইতে এই পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্টিত দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর এবং জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে বহুসংখ্যক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, গন্ধক ও কেরোসিন তৈলের খনি অপর্য্যাপ্ত; আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতও মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। চীনের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের সহিতই প্রধানতঃ এই দ্বীপ বাণিজ্যব্যাবসায়ে লিপ্ত। প্রধান পণ্যদ্রব্য চাউল, তদ্ভিন্ন কর্পুর, চিনি পাথুরিয়া কয়লা, কাষ্ঠ, চা প্রভৃতি দ্রব্যও অল্লাধিক পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। ফরমোজার অরণ্য প্রদেশে ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ এবং নেকেড়ার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। কিলঙ নামক স্থানের নিকট পাথুরিয়া কয়লার খনি আছে। আদিম অসভ্য অধিবাসিগণের আকার দীর্ঘ, বর্ণ কটা, ইহারা মস্তকে সুদীর্ঘ চুল রাখে এবং দন্তে কৃষ্ণবর্ণ মাজন ব্যবহার করে। এই অসভ্য জাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; কোন কোন সম্প্রদায়ে লেখাপড়ার চর্চ্চা আছে। ইহারা সত্যবাদী, ন্যায়বান, কিন্তু অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। য়ুরোপীয়গণ বহুদিন হইতে ইহাদিগের আবাস-স্থানে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই দ্বীপের চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অংশ চারিটি জেলায় বিভক্ত। তামসুই এবং কিলং প্রধান বন্দর, এতদ্ভিন্ন আরও দুইটি বন্দরে বৈদেশীকগণ পণ্যদ্রব্য আমদানী করিতে পারিতেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বরফ।

কলিকাতা ও অন্যান্য সহরবাসী অনেকেই বরফ "আহার"* বা বরফজল পান করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলে এই প্রাণ-মন-মুগ্ধকারী, গ্রীষ্ম-ক্লেশ-নিবারণ-কারী, হুইস্কি-পেগ-শীতল-কারী দ্রব্য যে কিরূপে প্রস্তুত করা হয় তাহা বোধ হয় জানেন না। অনেকের জানিবার ইচ্ছা থাকিতে পারে;

* বাঙ্গালায় সকলেই জল "খাইয়া" থাকেন কদিচ কখনও পুস্তকে "পান করিয়া" থাকেন।

সেজন্ত এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল। বরফসেবীদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী জানেন, অতএব এই প্রবন্ধে যদি ইংরাজী technical expressions ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না।

কৃত্রিম বরফ, অর্থাৎ যে বরফ সচরাচর বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা কৃত্রিম শীত সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই শীত কার্বনিক এসিড, জল, এমোনিয়া, সালফিউরাস এসিড ও ইথর প্রভৃতির সাহায্যে পাওয়া যায়। অনেক কারণে আজকাল ইথরের বেশী ব্যবহার ও আদর, অতএব এক্ষণে ইহারই বিবরণ দেওয়া যাক্।

ইথর অত্যন্ত ভলেটাইল (volatile)* সচরাচর (অর্থাৎ under atmospheric pressure) ইহা ৯০° (Fahr) গরমে বাষ্প হইয়া যায়, কিন্তু ভ্যাকুয়ামে (vacuum) ইহা ফ্রিজিং পয়েণ্টের (freezing point) অনেক ডিগ্রি নীচে বাষ্প হয়। এইরূপ শীঘ্র বাষ্পোদগমন (rapid evaporation) হেতু ইথর হইতে অতি সহজে শীত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইথর-বরফের কল নিম্নলিখিত অঙ্গ সকলে বিভক্ত, যথা—একটি বাষ্প-পম্প (vapour-pump), একটি শীতোৎপাদক বাক্স (refrigerator), একটি বাষ্প-তরল-কারক যন্ত্র (Condensor), একটি জলের পাম্প, আর একটি লবণ-জলাধার (Brine-box) ও কতিপয় বরফের ছাঁচ্ (Ice vessel or mould), উপরি উক্ত দুইটি পাম্প চালাইবার জন্ত একটি এঞ্জিন আর এই এঞ্জিন চালাইবার জন্ত একটি বয়লারের আবশুক।

এই সকল অঙ্গের কার্য্য "নামেন পরিচিয়তে।" বাষ্প-পাম্পের কাজ হইতেছে শীতোৎপাদক† বাক্স হইতে ইথরের বাষ্প নিকাশ করা। ইথর ইহার শোষক (suction) মুখ দিয়া বাষ্প হইয়া প্রবেশ করে এবং নির্গমনের (discharge) মুখ দিয়া condensorএ যায়। শীতোৎপাদক বাক্সের কাজ হইতেছে লবণ-জলকে শীতল করা। এই যন্ত্রের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া নল (pipe) গিয়াছে; তাহার ভিতর দিয়া লবনজল সর্ব্বদা পম্প সাহায্যে বহমান।

বাষ্প তরলকারক যন্ত্রের কাজ হইতেছে ইথর বাষ্পকে পুনর্ব্বার তরল

---

*Volatileএর বাঙ্গালা জানি না; অভিধানে দেখিলাম ইহার মানে উড্ডয়নশীল; পাঠক তাহাতে ইহার মানে পক্ষীই বুঝুন আর অল্প গরমে বাষ্প হইয়া যায় এমন কোন তরল পদার্থই বুঝুন, যাহা হয় বুঝিয়া লইবেন।

† এই বাক্সের অর্দ্ধেকের কিঞ্চিৎ অধিক তরল ইথরে পূর্ণ।

ইথর করা; ইহাতে সর্ব্বদা ঠাণ্ডা জল পড়িতেছে ও আপনার কাজ করিয়া অন্তদিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। জল সমান পরিমাণে আসা যাওয়া হেতু এই যন্ত্র সর্ব্বদা জলে পরিপূর্ণ থাকে; এই জলের ভিতর দিয়া ইথর বাষ্প যাইবার জন্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া পাইপ গিয়াছে; ইথর এই পাইপের ঠাণ্ডা গায়ে লাগিয়া পুনরায় তরল হইয়া যায়।

জলের পাম্প—ইহা একটি ছোট দমকলের ন্তায়; ইহা লবণজলের আধার হইতে শীতোৎপাদক বাক্সের মধ্য দিয়া লবনজল টানিয়া পুনরায় ইহাকে লবণজলাধারে পাঠাইয়া দেয়।

লবণজলাধারে সারি দিয়া নির্ম্মল জল পূর্ণ ধাতু নির্ম্মিত বরফের ছাঁচ সকল রাখা হয়, এই ছাঁচের ভিতরকার যে জল তাহাই জমিয়া ভক্ষনীয় বা পানীয় বরফ তৈয়ার হয়।

বরফের কলের উপরি উক্ত অঙ্গ সকলের কাজ নিম্নলিখিতরূপে চলিয়া থাকে—বয়লারের ষ্টীম এঞ্জিনকে চালায়, এঞ্জিন বাষ্প পাম্পকে চালায়, এই পাম্প রিফ্রিজরেটরস্থ ইথর হইতে ভ্যাকুয়ম (vacuum) সাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করিয়া আকর্ষণ করে; সেই বাষ্প এই পাম্পের নির্গমন পথ (discharge side) দিয়া তরল-কারক (condensor) যন্ত্রে যায়; সেখানে যাইয়া ইথর বাষ্প পুনরায় তরল হইয়া পশ্চাদস্থিত বাষ্পের ধাক্কায় পুনরায় রিফ্রিজিরেটরে যায়। ইহাতে এই কার্য্য সাধিত হয় যে—রিফ্রি-জিরেটরস্থ তরল ইথর শীঘ্র বাষ্পোদ্গমন (rapid evaporation) হেতু অত্যন্ত শীতল হইয়া যায়; এই শীতকেই কাজে আনা হয়; ইহার দ্বারাই জল জমান হইয়া থাকে। রিফ্রিজিরেটরস্থ ইথর অতি অল্পই খরচ হইয়া থাকে, কারণ তাহা বাষ্পাবস্থা হইতে পুনরায় ইথর হইয়া রিফ্রিজিরেটরে যাইয়া পুনরায় কার্য্য করে। ইথর-বাক্সের কার্য্য অবিরতভাবে চলিতে থাকে, সেজন্ত শীতও অবিরতভাবে জন্মিতে থাকে।

ইথরের শীত নিম্নলিখিত ভাবে কাজে আনা হয়।—বরফের কলের অন্ত পাম্পটিও এঞ্জিন দ্বারা চালান হয়। তাহার শোষক নল (suction pipe) রিফ্রিজিরেটরের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া লোনাজলের আধারে যোগ হইয়াছে, এই নল দিয়া পম্প লবণ-জলাধারস্থিত জলকে আকর্ষণ করে; এই লোনাজল রিফ্রিজিরেটরস্থিত পাইপের ভিতর দিয়া যাইবার সময় শীতল ইথরের সংস্পর্শে আসিয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়; এই শীতল

লোনাজল পম্পের নির্গমন পথ দ্বারা পুনরায় ব্রাইন-বক্সে প্রেরিত হইয়া থাকে; সেখানে যাইয়া এই শীতল জল বরফের ছাঁচের গায়ে লাগিয়া ফিরিয়া পুনরায় রিফ্রিজিরেটরে গিয়া ঠাণ্ডা হইয়া পুনরায় এই বাক্সে আসে। এইরূপ অবিরত শীতল লবণজল বরফের ছাঁচের গায়ে লাগার জন্য ছাঁচের ভিতরস্থিত নির্ম্মল জল শীত সংস্পর্শে ক্রমে জমিয়া বরফ হইয়া যায়।

এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈয়ারি হয়। বরফ জমিতে সচরাচর প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগিয়া থাকে; অত্যন্ত গরমের সময় আরো অধিক সময় লাগে; শীতকালে কিছু কম সময়ে জমিয়া যায়। বৃহৎ চাঙ্গড় জমাইতে হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে।

বরফের কলের উপ-অঙ্গও অনেক আছে; কিন্তু সে সব ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্যের জানিবার আবশ্যক নাই। বরফের ছাঁচ সচরাচর পাঁচ হইতে ছয় ইঞ্চ পর্য্যন্ত চওড়া হয়, কারণ তিন ইঞ্চের অধিক বরফ জমাইতে অনেক অধিক সময় লাগে; ছাঁচ পাঁচ ছয় ইঞ্চ হইলে দুধার হইতে বরফ জমিয়া বেশ নিরেট চাঙ্গড় জন্মে। এই ছাঁচ সকলের গায়ে ঠাণ্ডাজল উত্তমরূপে লাগা উচিত; সেজন্য ব্রাইন-বাক্সের ভিতর কাঠের বাঁধ ও ব্রেকার (breaker) প্রভৃতি অনেক দেওয়া থাকে যাহাতে শীতল জলের স্রোত সুন্দররূপে ছাঁচের চারিধারে লাগিতে পারে। বরফের কলে লোনা জলের সাহায্য লওয়া হয়, কারণ ইহা কখনও জমে না, ইহার টেম্পরেচর প্রায় ২০° (Fahr) নিম্নে, আর ৩২° ডিগ্রিতে জল জমে অতএব খালি জল হইলে ব্রাইন-বাক্সস্থিত জল রিফ্রিজিরেটরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় জমিয়া যাইত, সেজন্য লোনা জল ব্যবহার করা হয়।

আজকাল বরফের কলে বেশ দুপয়সা লাভ আছে। কারণ বরফ খাইতে লোকে জাতিভেদ মানে না; সকলেই খাইয়া থাকে সেজন্য বরফের কাটতিও অধিক। সহর ও মফস্বলে বরফের কাটতি আরো বাড়িতে পারে, যদি দাম আরো সস্তা করা হয়। নিজ কলিকাতা সহরে আরো দুইটি বরফের কল উত্তমরূপে চলিতে পারে। হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দননগরের মধ্যে একটি দুই-টন বরফের কলে বেশ লাভ হইতে পারে। বর্দ্ধমানেও একটি দুইটন অন্তত এক টনের-কল চলিতে পারে। এইরূপ সাহেব ফিরিঙ্গী ও বাবু লোক প্রধান মফস্বলস্থ সহর সমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের কলে বেশ লাভ হইতে পারে। আমাদের দেশের বড়লোক ও ব্যবসায়ীদিগের এবিষয়ে মনযোগ হইলে,

তাঁহাদিগেরও বিশেষ দুপয়সা আসিতে পারে আর অনেক গরিব লোকেও তাঁহাদের আশ্রয়ে খাটিয়া খাইতে পারে, এবং অনেক পাড়াগেঁয়েও বরফ খাইয়া সভ্য হইতে পারে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

৺ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

"স্বর্ণলতা"-প্রণেতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। আজ পাঁচ বৎসর হইল তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কোথাও এক ছত্র লেখা বাহির হইল না,—ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। অনেকের মতে স্বর্ণলতা বাঙ্গলার একখানি অতি উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস। "কলিকাতা রিভিউ" এই পুস্তক সমালোচনায় বলিয়াছিলেন,—"উপন্যাস বল ত স্বর্ণলতাই বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস; বঙ্কিমের বহিগুলি ত উপন্যাস নহে—সেগুলি কাব্য।" স্বর্ণলতাই তারক বাবুর প্রথম উদ্যম; স্বর্ণলতা লিখিয়াই তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন; কিছু অর্থাগমও হইয়াছিল। স্বর্ণলতার মুনাফা হইতে তারক বাবু গৃহিণীকে কিছু স্বর্ণালঙ্কার গড়াইয়া দিয়াছিলেন—তাই তিনি সর্ব্বদা স্বামীকে তাগাদা করিতেন—"বই লেখ না—আরও বই লেখ না।" কিন্তু স্ত্রীর প্রবর্ত্তনায় বা তাড়নায় স্বর্ণলতার পর আর যাহা কিছু তারক বাবু লিখিলেন, তেমনটি আর হইল না। যাহা হউক, একা স্বর্ণলতার অনুরোধে বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে তাঁহার জীবনচরিত রক্ষিত হইতে পারে। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, তিল কুড়াইয়া তাল হয়; তারক বাবুর জীবনীর গুটিকতক তিল "দাসী" মারফৎ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিলাম; দেখা যাউক ইহা কুড়াইয়া কখনও কেহ তাল গড়িতে চেষ্টা করেন, অথবা Oblivion-পক্ষী আসিয়া তাহার সুদীর্ঘ চঞ্চুপুটের সাহায্যে এগুলিকে লইয়া আপনার জঠরানলে আহুতি দেয়।

তারক বাবুর নিজের কথায়, তাঁহার জন্ম ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার বাঘ-আঁচড়া গ্রামে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে তাঁহার জন্ম হয়। কলিকাতা অঞ্চলের লোক যশোহর জেলার লোককে "যশুরে বাঙ্গাল" বলিয়া বিদ্রূপ করে জানিয়া তিনি সর্ব্বদা কিছু সশঙ্কিত থাকিতেন। "আপনার বাড়ী কোন জেলায়?" জিজ্ঞাসা করিয়া অনেকেই এই

প্রকার উত্তর পাইয়াছেন—"আমাদের গ্রামটা চিরকালই নদীয়া জেলার ভিতর ছিল হে, সম্প্রতি যশোর হয়ে গেছে।" গ্রামের গুরুমহাশয়ের নিকট কিছুদিন বিদ্যা ও বেত্র সেবন করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন। ভবানীপুর এল, এম, এস, ইনষ্টিট্যুশনে ইংরাজী পড়া আরম্ভ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৮৲ বৃত্তি লইয়া উত্তীর্ণ হন। তাহার পর মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। যথাসময়ে মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইয়া কিছুদিন মেট্রপলিটানে রসায়ন-অধ্যাপকের কার্য্য করেন। তৎপরে ১০০৲ বেতনে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ভ্যাক্‌সিনেসন্‌ ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন। এই সরকারী কার্য্যে তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্য্যটন করিতে হইত এবং এই সময়ই স্বর্ণলতা রচিত হয়। পল্লীগ্রামে ঘোড়ার গাড়ী যোটে না, সুতরাং গোরুর গাড়ীই ভরসা। মধ্যাহ্নে পথিমধ্যে কোনও বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কিয়দ্দূরে তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ সদ্য-নির্ম্মিত ইষ্টকের চুল্লীতে হাঁড়ি চাপাইয়াছে। ডাক্তার বাবু গোরুর গাড়ীর তলায় শতরঞ্চ বিছাইয়া বসিয়া স্বর্ণলতা লিখিতেছেন। স্বর্ণলতার অধিকাংশ এইরূপে গোরুর গাড়ীর তলায় রাজপথের উপর রচিত হইয়াছিল।

পুস্তক খানি ক্রমশঃ জ্ঞানাঙ্কুর নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। তখন উহা সাধারণ পাঠক কর্ত্তৃক কিরূপ ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা জানা নাই। জ্ঞানাঙ্কুরে, সরলার পীড়ার বর্ণনায় এরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবতারণা করিয়াছিলেন যে, পড়িলে সহজেই মনে হইত গ্রন্থকর্ত্তা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার সময় সেইজন্য সেগুলি কতক ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

মনে মনে তারক বাবুর বিশ্বাস ছিল, স্বর্ণলতার মত উপন্যাস বাঙ্গলায় আর নাই। বঙ্কিমের উপর তিনি অত্যন্ত চটা ছিলেন। কেহ যদি বঙ্কিমের নিন্দা ও স্বর্ণলতার সুখ্যাতি করিল, ত মহাখুসী। তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পোলাও কালিয়ার বন্দোবস্ত করিতেন। তিনি বলিতেন —"বঙ্কিমের উপন্যাস গুলা প্রায়ই ফেলিয়োর্—অস্বাভাবিক।" বলিতেন —"বঙ্কিমের মত লেখকের দুই তিন খানির অধিক উপন্যাস লেখা উচিত ছিল না; কতকগুলা লিখিতে গিয়া অধিকাংশই রাবিব্ হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে Fieldingকে অনুসরণ করাই উচিত। Fielding অধিক উপন্যাস

লেখেন নাই; যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।” নিজেকে স্বর্ণলতা-প্রণেতা বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। একবার আমার এক আত্মীয় তাঁহার সহিত রেলে এক কক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন। দুইজনে আলাপ হইলে, একথা সেকথা পাঁচ কথার পর তারক বাবু বলিলেন—“স্বর্ণলতা পড়েছেন কি? সে খানি আমার লেখা।” বলা বাহুল্য, কথাটা সম্পূর্ণ অনাহূত ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল।

পান দোষটা তাঁহার কিছু প্রবল ছিল। বক্‌সারে অবস্থানকালে, কোনও রেলওয়ে কর্ম্মচারীর পুত্রের কলেরা হয়। অনেক রাত্রিতে বিপন্ন পিতা আসিয়া বহু চেষ্টায় ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া তারক বাবুকে লইয়া গেলেন; তারক বাবু রোগী দেখিয়া প্রেশ্‌ক্রিপ্‌ষ্যন্‌ লিখিয়া দিয়া আসিলেন। প্রভাতে যখন সে ব্যক্তি ডাক্তার বাবুর কাছে পুনরায় উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা কিছুমাত্র স্মরণ করিতে পারিলেন না। “গিয়েছিলাম? প্রেশ্‌ক্রিপ্‌ষ্যন্‌ লিখে দিয়ে এসেছি? কিছু ত মনে নাই;—একবার আন দেখি, সেখানা দেখি।” প্রেশ্‌ক্রিপ্‌ষ্যন্‌ আনা হইল, দেখিয়া বলিলেন,—“ঠিকই লিখেছি।” গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়া ক্রমে তাঁহার ২৫০্ বেতন হইয়াছিল বটে, কিন্তু চিকিৎসক বলিয়া তিনি সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। বাহিরের লোক শীঘ্র তাঁহাকে ডাকিত না। রোগীর প্রতি বিশেষ একটা যে যত্ন বা মনোযোগ, তাহা কখনও তাঁহার দেখা যায় নাই। তিনি নিজ মুখেই বলিতেন, যাহাকে কালে ঘিরিয়াছে, সেই যেন আমাকে ডাকে।

অনেক প্রতিভাশালী লেখকের কেশ বেশের প্রতি যে অমনোযোগ শুনা যায়, তারক বাবুর তাহার লেশমাত্রও ছিল না। বর্ত্তমান লেখক বাল্যকালে এক দিন তাঁহার কাছে বসিয়া ছিলেন। তারক বাবুর পকেট ঘড়িটা বিগ্‌ড়াইয়া যাওয়াতে এক ঘড়িওয়ালাকে ডাকিয়া আনা হইয়াছিল। ঘড়িওয়ালা বলিল, মেরামত করিয়া পরশ্ব দিয়া যাইবে। তারক বাবু বলিলেন—“বিলক্ষণ! কাল Jailer বাবুর মেয়ের বিবাহ; আমি কি ঝুলাইয়া যাইব? কালই সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘড়ি চাই।”

তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। হিন্দুসমাজের গণ্ডীর ভিতর তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। নিষিদ্ধ পক্ষীবিশেষের মাংস না হইলে তাঁহার রাত্রিভোজন সম্পন্ন হইত না। এক হিন্দু সহিস

ছিল, সে বেচারী চাকরীর দায়ে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ষ্টেশনের কেল্‌নার্ ভট্টা-চার্য্যের বাড়ী হইতে এক প্লেট "কারি" আনিয়া দিয়া গঙ্গাস্নান করিত। অনেক লোক আছেন, যুবা বয়সে কিছু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির থাকেন, বয়স একটু চলিয়া আসিলেই সন্ধ্যা-আহ্নিকটা আরম্ভ করেন; তারক বাবু? আরে রামঃ—সে দিক দিয়াও যান নাই। তিনি বলিতেন,—"যিনি প্রাতঃ-কাল করেছেন, তিনিই 'সন্ধ্যা' করিবেন, আমাদের ও হাঙ্গামায় কায কি?" চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। কেহ এ বিষয়ে অনুরোধ করিলে বলিতেন—"ক্ষেপেছ; বুড়ো বয়সে কি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ তৈয়ারি করে যাব?" মুগ্ধবোধ ব্যাকরণটা কি রকম জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া আওড়াইতেন:—

মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া।

তিনি বড় বড় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী অপেক্ষা সামান্য বেতনভোগী কেরাণী প্রভৃতির প্রতি সমধিক অনুরক্ত থাকিতেন। বলিতেন, ডেপুটি, মুনসিফ্, সবজজ্ প্রভৃতি শ্রেণীর লোক বড় অহঙ্কারী। "হরিষে বিষাদে" ডাক্তার বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রিতা মহিলা-মহলে এক কোন্দল বাধিয়াছে। মুনসিফ্ বাবুর স্ত্রী বলিতেছেন,—"ডেপুটি আবার হাকিম্; আরসুলা আবার পাখী—আ আমার পোড়া কপাল!"

বর্দ্ধমানের উকীল বিখ্যাত লেখক বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তারক বাবুর সহপাঠী ছিলেন। তিনি তাঁহার বাল্যকালের অনেক সংবাদ দিতে পারেন। ভাগলপুর সেণ্ট্রাল্ জেলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেককাল তারকবাবুর সঙ্গে বন্ধুভাবে বক্‌সারে কাটাইয়াছেন। তিনিও সম্ভবতঃ তাঁহার জীবনের অনেক কথা অবগত আছেন। তারক-বাবুর আর আর আত্মীয় বন্ধু যাঁহারা জীবিত আছেন, সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিলে তাঁহার জীবনীর উপাদান অনায়াসেই সংগৃহীত হইতে পারে। ইন্দ্রনাথ বাবুই কেন তাঁহার বন্ধুর একখানি জীবনচরিত প্রণয়নের ভার গ্রহণ করুন না?

গ্রন্থ-সমালোচনা।

মাধবিকা। শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র হইতে শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য।৵০।

নাম দেখিয়াই অনেকে বুঝিতে পারিবেন এখানি কবিতা-পুস্তক। বলেন্দ্র বাবু সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত;—গদ্য-লেখক বলিয়াই সুপরিচিত; কবিতা তিনি অধিক লেখেন নাই। যাহাও দুই চারিটি মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা এ পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট করেন নাই। কাব্যে সুতরাং এই তাঁহার প্রথম উদ্যম;—আমরা নবকবিকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।

গদ্য রচনায় বলেন্দ্র বাবু যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। সাধনায় উড়িষ্যার কনারক মন্দিরের তিনি যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেরূপ ললিত-সুন্দর ভাষা আজ কাল প্রায় পড়িতে পাই না। তাঁহার অধিকাংশ গদ্যই গদ্যচর্ম্মাবৃত কবিতা; এবার ছন্দ ও মিল সেই আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। মাধবিকার অধিকাংশ কবিতাই সনেট্। ভাবের নূতনত্ব আছে। আজ কালকার অধিকাংশ নব্যকবির রচনার ন্যায় অর্থশূন্য হা হুতাশে পূর্ণ নহে। এক একটিতে তিনি বিলক্ষণ রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, নিম্নে দুইটি নমুনা তুলিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

মূঢ়তা।

রমণী প্রলয়ঙ্করী বলেছে যে কেহ
বিষম সাহস তার নাহিক সন্দেহ,
বুদ্ধি কিছু কম, নহিলে সে মূঢ়মতি
এক বাক্যে হারায় কি সকল সম্পতি!
বৈকুণ্ঠে আছেন লক্ষ্মী, কৈলাসে ভবানী,
ইন্দ্রালয়ে শচীদেবী, মর্ত্ত্যে সুনয়ানী
ঘরের গৃহিনী মহাদেবী;—হে অজ্ঞান
কোথা হবে ঠাঁই তব? করিবে প্রয়াণ

কোন্ রসাতল পুরে নাহি নাগবালা
যেথা নাহি অনুক্ষণ দিতে বিষজ্বালা
শিরায় শিরায় তব? জেনেছিলে মনে
প্রলয় লুকান যদি ঐ আঁখি কোণে,
ফুৎকারে জাগালে কেন তাহা? মর দহি'
তুষানলে পলে পলে রহি' রহি' রহি'।

বৃথা গর্ব্ব।

নরজাতি অস্ত্রহীন অক্ষম অগতি,
নারীদল সর্ব্ব-অঙ্গে মায়া অস্ত্রমতী।
বল, হে মন্মথ, তব কারে পক্ষপাত—
কার প্রতি খরতর তব শরাঘাত?
আপন জাতির কিছু রাখ কি খাতির,
অথবা তাহারে হান বাছা বাছা তীর
নারীর যৌবন-দুর্গে লুকাইয়া বসি'!
এই কি গৌরভ তব, হে মহা সাহসী,
যে জন মরিয়া আছে নুপুর তাড়নে,
জর্জ্জর নির্জ্জীব বন্দী মেখলা বন্ধনে—
পঞ্চত্বের বাকি নাই, পঞ্চশর তার?
যে মরেছে মৃগলোচনের মৃগয়ায়
সে মৃগ বধের গর্ব্ব তুমি কর কে হে
তব নামাঙ্কিত শর বিঁধি তার দেহে!

বাঙ্গালা ভাষার কোন কোনও কবি আসরে অবতীর্ণ হইয়া যাই দুই চারিটী রাগিণী একটু ভাল করিয়া গাহিয়াছেন, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে মুষল ধারায় প্রশংসা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাহার পর সেই যে তাঁহারা অন্তর্ধান হইয়াছেন, আর দেখা নাই। দৈবাৎ কখনও মাসিকপত্রের আড়াল হইতে একবার উঁকি মারেন, কিন্তু সে মানুষ বলিয়া আর চেনা যায় না। তাই নবকবিকে ভয়ে ভয়ে প্রশংসা করিতে হয়। আমরা বলেন্দ্র বাবুর কবিতার উত্তরোত্তর বিকাশ দেখিতে পাইলে সুখী হইব। *

---

* এই সমালোচনা সম্পাদকীয় নহে।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

যাঁহার কৃপায় দাসাশ্রম জীবিত থাকিয়া আপনার উদ্দেশ্যপথে আর এক মাস অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল, সেই দয়ার সাগর ভগবানকে বার বার নমস্কার করিয়া আমরা জুলাই মাসের কার্য্য বিবরণী সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

বর্ত্তমান মাসের রোগী এবং আতুর সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। দেবিয়া, ৩। স্বর্ণ, ৪। ফুলমণি, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। নবদুর্গা, ৭। সুমিত্রা, ৮। অম্বিকা, ৯। রুক্মিণীকান্ত সরকার, ১০। গঙ্গা, ১১। ঘামন, ১২। বুঝাওন, ১৩। সরস্বতী, ১৪। নিস্তারিণী, ১৫ সখী, ১৭। রাজেশ্বরী, ১৮। দ্রবময়ী, ১৯। বিধুকাহার, ২০। নবিসেখ, ২১। সুখময়ী, ২২। আশাবিবি, ২৩। সোণামণি।

এই মাসে এই সকল আতুরগণের মধ্যেই অনেকেই জ্বর ও কাশিতে ভুগিয়াছে।

গঙ্গা। গঙ্গার অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া পড়ে এবং বেড্‌সোর হইয়া শয্যাগত হয়। ক্রমে ক্রমে তাহার আহার একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়াতে তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে। সেখানে গিয়া তাহার অবস্থা একটু ভাল হইয়াছে। আবার জীবনের আশা হইয়াছে। মাঝে মাঝে তাহার সংবাদ লওয়া হয়। আর একটু ভাল করিয়া আরোগ্য হইলেই আবার ফিরাইয়া আনা হইবে।

ঘামন। আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

বুঝাওন। অনেক চেষ্টাতেও বিশেষউপকার না হওয়ায় হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিধুকাহার। রোগবিশেষ গুরুতর দেখিয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

নবিসেখ। বয়স ১২, মুসলমান। নিবাস যশোহর জেলাস্থ খালকুলি গ্রামে। রোগ পচা ঘা। চলিয়া যায়।

সুখময়ী। বয়স আন্দাজ ৪৫, হিন্দু, নিবাস কলিকাতায়। ডিস্‌ট্রিক্ট চ্যারিটেবেল সোসাইটির সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্রমিত্র ইহাকে অসহায় অবস্থায় পাইয়া দাসাশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে স্থায়ীভাবেই থাকিবে বলিয়া তাহার বাসা ছাড়িয়া দিয়া কাপড়াদি আনিতে যাইবে বলিয়া ঐ মর্ম্মে এক চিঠি লইয়া ঈশ্বর বাবুর নিকট যাই বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু আর ফিরিয়া আসে নাই।

আশাবিবি। নিবাস নিল্‌ফামারি। তথাকার দয়ালু মোক্তার বাবু বিশ্বেশ্বর সেন ইহাকে আয়োজন করিয়া প্রেরণ করেন। বয়স ১২ বৎসর, মুসলমান কন্যা, রোগ গলিত-কুষ্ঠ। শুনা গেল তাহার বাপ আছে, কিন্তু তাহাকে রাখিতে প্রস্তুত নহে। যাহাদের সঙ্গে আশ্রমে আসে, তাহাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলা হয়, কিন্তু তাহারা বারাণ্ডায় ফেলিয়া দিয়া সরিয়া পড়ে। আমাদের আশ্রমে কুষ্ঠ রোগী থাকিবার নিয়ম নাই। তখন আমরা বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া, বহুকষ্টে ও অনেক আয়োজনের পর কলিকাতা কুষ্ঠাশ্রমে তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাকে দেখিতে যাওয়া হইয়াছিল, সেখানে বেশ আছে। তাহার ঘা বেশ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে সে তাহার বাপের সংবাদ পাই-বার জন্য বড় ব্যস্ত। হায়রে মায়া, যে বাপ সন্তানকে ফেলিয়া দিল, সন্তান সেই বাপের মায়ায় অশ্রুবিসর্জ্জন করে।

সোণামণি। বয়স ৮৫ বৎসর। হিন্দু, নিবাস বরিসাল জেলায় সোরকুল। অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় আলিপুরের রাস্তায় পড়িয়াছিল। তথাকার দয়াশীল মাজিষ্ট্রেট তাহাকে লোক দিয়া গাড়ী করিয়া দাসাশ্রমে প্রেরণ করেন। এই বৃদ্ধার ভয়ানক উদরাময় পীড়াহয়। তাহাকে কিছুতেই ঔষধ খাওয়ান যাইত না, অথবা ভাত না দিলে সে কিছুতেই থাকিতে চাহিলনা। আমরা বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া তাহাকে অবশেষে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিয়াছি।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। ভগবান দাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মাসিক চাঁদা।

শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী জ্যৈষ্ঠ ১৲, বাবু কেদারনাথ দাস জুন।০, বাবু নন্দকুমার দত্ত জুন।০, বাবু পিয়ারীমোহন ভড় জুন।০, A lady C/o Babu Sreenath Das জুন ১৲, বাবু গৌরীশঙ্কর দে জুন ॥০, বাবু শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এপ্রেল হইতে জুন ৸০, বাবু যদুনাথ বরাট জুলাই ১৲, বাবু নবীনচন্দ্র বড়াল জুন ১৲, বাবু বঙ্কবিহারী মিত্র জুন।০, বাবু তেজচন্দ্র বসু জুন ॥০, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জুন ১৲, N. K. Bose Esqr. জুন ১৲, বাবু শ্যামাদাস কবিভূষণ জুন, ॥০, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মে হইতে জুলাই ৸০, ৪।২ নং ছকুখানসামা মেস জুন জুলাই ৸০, বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জুন।০, বাবু রামচরণ মিত্র জুন ১৲, বাবু নন্দলাল দত্ত, মে হইতে জুলাই ৩৲, বাবু করুণাদাস বসু, জুলাই।০, বাবু কুঞ্জবিহারী রায় মে ॥০, ৬৮।১ নং বেচু চাটুর্জ্জির ষ্ট্রীট জুন।০, বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, জুন ॥০, District Charitable Society for 6 Calcutta inmates ১৮৲, বাবু ভূতনাথ ঘোষ জুন।০, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় বৈশাখ ১৲ বাবু প্রমথনাথ দাস, এপ্রেল হইতে জুন ৬৲ বাবু হরিপদ ঘোষাল, জুলাই।০ বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় জুলাই ॥০, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী জুলাই ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র জুলাই ১৲, বাবু পশুপতিনাথ বসু জুন ১৲, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা, শ্রাবণ ॥০, বাবু অভয়চন্দ্র মল্লিক জুলাই ॥০, বাবু কেদারনাথ ঘোষ জুন।০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু, জুলাই ১৲, ডাঃ চুনিলাল বসু জুলাই ১৲, বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায় চৌধুরী জুলাই ১৲।

এককালীন দান।

বাবু গৌরীলাল রায় কাকিনিয়া ১৲, বাবু ইন্দুভূষণ রায়, পড়িয়া পাওয়া ৵০, শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ, আম্রের জন্য ১৲, বাবু শীতলদাস রায় ১৲, বাবু চন্দ্রকান্ত গুহ মৌলীক ॥০, বাবু রসিকলাল পাল ১৲, বাবু রজনীকান্ত ঘোষ ॥০, বাবু কৃষ্ণনাথ বসু।০, বাবু চন্দ্রভূষণ রায়।০, বাবু চারুচন্দ্র সরকার।০, বাবু কান্তিভূষণ বিত্র।০, বাবু রামচন্দ্র ভাদুড়ী।০, বাবু কেদারনাথ ঘটক।০, বাবু বঙ্কবিহারী কর্ম্মকার।০, বাবু উমেশচন্দ্র সমাদ্দার।০, বাবু গতিনাথ সরকার।০, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ কাঞ্জিলাল।০, বাবু বিপিনবিহারী সেন।০, বাবু অমৃতলাল কর।০, বাবু কালিকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।০, বাবু কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ⁄০, বাবু গতিনাথ মৈত্র।০, বাবু শশীভূষণ ঘোষাল।০, বাবু লোকনাথ ঘোষ।০, বাবু লালবিহারী বসু।০, বাবু দুর্গাদাস ভাদুড়ী।০, ফজনদ্দি বিশ্বাস।০, বাবু সন্তোষচন্দ্র রায়।০, বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র।০, বাবু মহিমাচন্দ্র দত্ত।০, বাবু তারিণীচরণ মৌলীক ১৲, বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।০, বাবু পঞ্চানন মৌলিক।০, বাবু সত্যচরণ বসু।০, বাবু পরেশনাথ মজুমদার ⁄০, বাবু ইন্দ্রচন্দ্র কর্ম্মকার ⁄০, কুটির দেওয়ান ৵০, সেকেন্দার চৌকীদার ৴১০ দাসাশ্রমের হিতৈষী ভদ্রলোক ॥০, পড়িয়া যাওয়া ৴১০, বাবু শ্রীদামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৵০, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ⁄০, বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্ত।০, বাবু গৌরহরি সাহা ⁄০, বাবু আদ্যনাথ সাহা ⁄০, বাবু চুনিলাল আগরওয়ালা।০, বাবু জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ⁄০, বাবু কেদারনাথ রায়।০, বাবু গদাধরকুণ্ডু ৵০, বাবু নকড়ি ঘোষ ৵০, বাবু প্রসন্নকুমার প্রামাণিক ৸০, বাবু ক্ষুদিরাম ধর।৵০, বাবু যদুনাথ কর্ম্মকার।০, বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।০, বাবু রামলাল সরকার ৵০, বাবু হীরালাল পান।০, কুন্দিকুমারনী ৴১০, শ্রীমতী বিধুবণী দাস্তা ৴১০, মুনসী কারাও খাঁ ১৲, বাবু বনচারী প্রামাণিক ১৲, বাবু পূর্ণচন্দ্র মৌলীক ॥০, বাবু হীরালাল মৌলীক ৵০, বাবু গোপাল সাহাজী ॥০, বাবু শ্রীরামচন্দ্র প্রামাণিক।০, বাবু দীননাথ কুরি।০, বাবু কেশবলাল কুরি।০, বাবু রামচরণ কুরি ৵০, বাবু হরিনাথ মজুমদার।০, বাবু রতিকান্ত চক্রবর্ত্তী ৵০, বাবু প্রাণনাথ সর্দ্দার ⁄০, বাবু গোপীনাথ মণ্ডল ⁄০, বাবু হরিনাথ মণ্ডল ⁄০, বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র সর্দ্দার ⁄০, বাবু কালিচরণ বিশ্বাস ৵০, বাবু ভীমচন্দ্র সর্দ্দার ৴৫, শ্রীমতী সুশীলা বসু মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, বাবু চারুচন্দ্র গুপ্ত, পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৲, বাবু সারদাকান্ত সেন ১৲, বাবু বিহারীলাল ঘোষ ১৲, ১৭ নং কানাইলাল ধরের মেস্ ⁄০, বাবু শশীভূষণ ঘোষ ১৲, ২১ নং পটুয়াটোলা

মেস্ ।•, Abdul Rahim Esqr. ২৲, মৌলভী সিরাজউল ইস্লাম বাহাদুর ৫৲, ৪ নং ছকু খানসামা মেস্ ॥•, ১০৭ নং ওল্ডবৈঠকখানা মেস্ ৵•, ৬৭ নং ওল্ডবৈঠকখানা মেস ৶১৫, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ।৵• বাবু ক্ষেত্রগোপাল সরকার ৷৷•, বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু ১৲, বাবু নিমাইচরণ ঘোষ ১৲, শ্রীমতী দেবী চৌধুরাণী ॥•, ১২৬নং ওল্ডবৈঠকখানা মেস॥•, বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।•, বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার ২৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ১॥•, ৬৫ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট মেস্ ।•, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ১৲, বাবু হেমন্তকুমার পাল ॥•, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু ১৲, বাবু কালিশঙ্কর শুকুল ।•, বাবু হেমেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ১০৲, Dr. U. Bannerjee ১৲, বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৲, ১১৮ নং ওল্ডবৈঠকখানা মেস্ ৵•, শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ২৲, বাবু ললিতকুমার গুহ ১৲, এক জন শুভাকাঙ্ক্ষী ২৲, ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাসার বালকগণ ১৵•, বাবু ভূতনাথ ঘোষ ৶১৫, ২নং সরকার্স লেন মেস্ ॥• বাবু অক্ষয়কুমার দাস গুপ্ত ॥•, বাবু সুরেন্দ্রকুমার সেন ।•, বাবু গোরাচাঁদ দাস বরিশাল ২৲, ৮৫ নং হ্যারিসন রোড মেসের জিনিস বিক্রয় ৩৲ বাবু শরৎচন্দ্র মজুমদার কন্যার বিবাহ ১৲ শ্রীমতী নিতম্বিনী দেবী ।•, বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ৫৲, বাবু পরেশনাথ সেন ১৲, বাবু নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ১৲, জনৈক দাসাশ্রমের বন্ধু মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে মাঃ নবদ্বীপচন্দ্র দাস ৪৲, বাবু বিনোদবিহারী পাল ১৲, বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে ১৲, A friend ৶•, বাবু নির্ম্মলচন্দ্র বসু ৶•, বাবু প্রিয়নাথ রায় ॥•, বাবু রামচন্দ্র রায় ।•, বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষ ১৲, ৪।৩ ছকুখানসামা মেস্ ।•, ৩৮।৪ সুকীয়াষ্ট্রীট মেস্ ।•, বাবু হেমচন্দ্র মিত্র ১৲, বাবু কালিচরণ সোম ১৲, বাবু কুমুদনাথ মজুমদার ৪৲, A sympathiser of Chinipothy ২৲, বাবু শ্যামাচরণ হাজরা ১৲, বাবু শিশির কুমার ঘোষাল ।৶•, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সরকার ৫৲, ১০ নং পটলডাঙ্গা মেস ॥•, বাবু জগদীশচন্দ্র সেন গুপ্ত ॥•, বাবু অমরেন্দ্রনাথ বসু ।•, বাবু বনবিহারী ঘোষ ।•, বাবু অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার ৶•, বাবু শশীকুমার সেন ।৵•, বাবু শরৎকুমার বসু ।৵•, বাবু ইন্দুভূষণ মুস্তফি ।৵•, ৮৫ নং হ্যারিসন রোড মেস্ ১৲, বাবু ব্রজলাল বসু ৵•, ৫৮ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট মেস ।•, ২২ নং রাধানাথ মল্লিক লেন মেস ॥•, বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেট ১৲, ৯নং পঞ্চানন তলা মেস ৵•, বাবু প্রভাচন্দ্র সিংহ ২৲, ৭নং কাশিঘোষের মেস ৶৫, বাবু কালিশঙ্কর শুকুল ।•, বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১৲, Mrs. A. M. Bose ৫৲, Mrs. Nilratan Sirkar ২৲, বাবু যদুনাথ ঘোষ ২৲, একজন দাসাশ্রমের বন্ধু ২০৲, বাবু সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী ১৲, জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা ১৫টা গ্লাসের মূল্য বাবৎ ৪৲. বাবু সতীশচন্দ্র সিংহ ১৲, বাবু নরেশচন্দ্র মজুমদার স্বর্গীয়া স্ত্রীর স্মরণার্থ১৲, বাবু সতীশচন্দ্র রায় ১৲, বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু ১৲, বাবু রমেশচন্দ্র হাতী /•, বাবু নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৵• বাবু বিহারীলাল দে, জুলাই ॥•, বাবু কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ।/•।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

পুস্তক বিক্রয় ৩॥•, বাবু বিপিনবিহারী রায়ের প্রজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ১২।৵১০, দাসীর সাহায্য ২৲, মোট ১৭৷৷৵১০।

বস্ত্রাদি।

বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শল্পি ১, সার্ট ১, কোট ১, জ্যাকেট ৪, কম্ফর্টর ১, চাদর ২। বাবু নির্ম্মলচন্দ্র বসু মিঠাকুমড়া ২।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়।

মাসিক চাঁদা ৫০॥•, এককালীন দান, ১৫১।•, অন্যান্য প্রকারে আয় ১৭৷৷৵১০, গতমাসের হস্তেস্থিত ৫৷৷৵১০, মোট আয় ২২৫॥/•।

ব্যয়।

খাই খরচ ৬৪।৵১৫, রাঁধুনী ও চাকর ১০৷৷•, মেহতর ৮॥৶৯, বাটিভাড়া ৫০৲, কর্ম্মচারীর

বেতন ৩৬৲, রোগী আনার গাড়ীভাড়া ১৩৷৶১০, দুগ্ধ ৪৸/১৫, ধোপা ২।০, আমানিত ১৻১৫, গাড়ীভাড়া অন্যান্ত ৩৷৶১৫ আদায় খরচ ১৯।/১০, বিবিধ ১।/৫, ঔষধ।৶০ আসবাব ১।১৫, মোট ব্যয় ২১৭৷০ ।

আয় ব্যয়।

মোট আয় ২২৫৷/০, পূর্ব্বমাসের দাসাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষের হস্তেস্থিত ৩/১২৷, মোট ২২৮৷৶১২৷ মোটখরচ ২১৭৷০, দাসাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষের বর্ত্তমান মাসের হস্তেস্থিত ৫৸৶১২৷, মোট খরচ ২২৩৷৶১২৷, মোট হস্তেস্থিত ৫৶০।

বিশেষ ধন্যবাদ।

বাবু মহেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত তাঁহার পুত্রের শুভবিবাহ উপলক্ষে ১০৲ দানের জন্ত আমরা বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

একজন দাসাশ্রমের পুরাতন বন্ধু মাসকাবারে আমাদের ২০৲ বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে শুনিবামাত্র ২০৲ এককালীন প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ চিন্তার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেজন্ত তাঁহাকে আমরা অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবিল সোসাইটির নেটিভ সেক্‌সনের সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র সি, এস, বিশেষ চেষ্টা করিয়া ছয় জন কলিকাতাস্থ আতুরের মাসিক ৩৲ হিঃ ১৮৲ সাহায্য মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা উক্ত সোসাইটিকে এবং উক্ত মহাত্মাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দাসাশ্রমের বিশেষ অভাবেব জন্ত আমরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি দানশীল মহাত্মা এবং দানশীলা মহিলাগণ আমাদের অভাব ত্বরায় দূর করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবেন।

প্লেট অথবা থালা ১৫, বাটি ২০, বড় বাটী বা ছোট গামলা ৪, পট ১০, পিকদানি ১০, জল গরমের কেট্‌লি ১, লেপ, কাঁথা, কাঁচি, অয়েল ক্লথ, চামচ, বড় ছুরি ১, হারিকেন ২, ওয়াল ল্যাম্প ৪।

টাঙ্গাইলের একজন মুসলমান মহিলা দয়া করিয়া আমাদের গ্লাসের সকল অভাব দূর করিয়াছেন। হাইকোর্টের উকিল বাবু দুর্গামোহন দাস এবং বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বিশেষ দয়া করিয়া আমাদের আপাততঃ কাপড়ের অভাব একেবারে দূর করিয়াছেন। কিন্তু থালার অভাবে রোগীদিগকে পাতে ভাত দিতে হইতেছে। বড়বাটি ও গামলার অভাবে ভাত ব্যঞ্জন পরিবেশনের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

পূজার ছুটিতে অনেকের ঠিকানা পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হয় বলিয়া, বৎসর বৎসর দুই মাসের কাগজ একত্রে বাহির হয়। তদনুসারে এ বৎসরও সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের অর্দ্ধেক আগামী মাসে বাহির হইবে।

দাসী

একটা কথা।

যোগবল।

সেদিন রণ্টনের (Rontgen) আবিষ্কৃত তাড়িতের রূপের কথা পড়িতেছিলাম। সবে ৫।৬ মাস মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহারই মধ্যে উহা বিজ্ঞান-জগৎকে বিলোড়িত করিয়াছে। নিবিড় অন্ধকারের ভিতর হইতে কত কি ক্ষীণ আলোকের কিরণ দেখা যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হার্জ (Hertz) সাহেব তাড়িতের অন্য এক রূপ দেখাইয়াছিলেন। এখন আর এক। এই রূপের আলোকও তত অপ্রতুল নহে। আমাদের অজ্ঞাত ছিল বলিয়া রণ্টেনের আলোক এত বিস্ময় জন্মাইয়াছে। আবার সেদিন দেখিতেছিলাম ফ্রান্সের বঁ সাহেব (M. be Bon) সামান্য কেরোসিন আলোকের এক বিচিত্র গুণ আবিষ্কার করিয়াছেন। লোহা ও সীসের পাতে মোড়া ফটোগ্রাফ তুলিবার কাচে ঐ আলোক ছবি অঙ্কিত করিতে পারে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কেন, এখনও ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় গাঢ় অন্ধকার আবশ্যক হয়। কিন্তু অন্ধকার বলিয়া জিনিসটাই বা কই? লোহার, সীসার পাত যখন আলোক বন্ধ করিতে পারিল না, তখন ফটোগ্রাফির জন্য আর কাল কাপড়ে কি করিবে? There are more things……

এই সকল ব্যাপার চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় আমার এক নব্য বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বন্ধু। কি ভাব্‌ছেন?

আমি। ভাবছিলাম, আমাদের পুরাতন শাস্ত্রে যে সকল যোগবলের কথা লেখা আছে, সে গুলা কি সব মিথ্যা? সে গুলা খাঁটি কল্পনা, না মূলে কিছু সত্য আছে?

বন্ধু। (ঈষৎ হাস্যে) দেখ্‌ছি আপনিও যে একজন শাস্ত্র-চূড়ামণি হ'তে বসেছেন। যেটা superstition, সেটার জন্য মাথা ঘামান কেন?

আমি। আপনি কি সে গুলা superstition বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন? কোন প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখেছেন, বা কোন...

বন্ধু। সব কথাই কি পরীক্ষা করিতে হয়? যেটা palpably absurd, তাকে লইয়া পরীক্ষা করিতে হইলে নিজেকে fool বলিয়া প্রমাণ করিতে হয়।

আমি। এ ত মন্দ argument নয়! কোন বিষয় না দেখিয়াই, না শুনিয়াই একটা সিদ্ধান্ত করিতে পারা, বড় সহজ কথা নয়। তার উপর পাছে লোকে fool বলে, এই আশঙ্কায় সকল বিষয়ে নাস্তিকতা প্রকাশ করাটা আরও ভাল।

বন্ধু। (কিঞ্চিৎ কুপিত স্বরে) তা বলিয়া আপনার মত আর্য্যামি দেখানও ভাল নয়। আজকাল কি একটা হাওয়া উঠেছে, সে হাওয়া এত সংক্রামক বলিয়া জানিতাম না। সকল বিষয়েই "আমাদের শাস্ত্র" "আমাদের শাস্ত্র"। যেন শাস্ত্রের ভিতর কত কি অমূল্য ধন স্তূপাকার হইয়া আছে।

আমি। যাহা হউক, শাস্ত্রগুলা আমাদের ত? অত বিরক্ত হলে চলিবে কেন?

বন্ধু। না হইয়া থাকিতে পারি কই? সোজা কথা গুলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কত কি ব্যাখ্যা বাহির হইতেছে। কেহ ভাবে না যে, যোগবলের ভিতর যদি কিছু সত্য থাকিত, তাহা হইলে তাহা এতদিন লুকান থাকিত না! এখন nineteenth centuryর শেষভাগ যাইতেছে, মনে রাখিবেন। Dark ages অনেক দিন গত হয়েছে। আপনি যে তখনকার গাঁজাখুরীর কথা আন্দোলন করিতেছেন, তাই বিস্ময়ের বিষয়। আর বিস্ময়ই বা কি? কত generationএর superstition আমাদের রক্তমাংসের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, তা কি দুই চারি দিনের লেখা পড়ায় ঘুচে? আরও এক century না গেলে আমাদের educationএর কোন ফল হবে না। সহরের "ভাগ্য গণনা আফিস" "অদৃষ্ট পরীক্ষালয়" গণিয়া দেখেছেন; বাঙ্গলা কাগজে "সন্ন্যাসী দত্ত মহৌষধ" "স্বপ্নলব্ধ আশ্চর্য্য ঔষধ," প্রভৃতির কতগুলা বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে, একবার ভেবে দেখেছেন? বিধাতা এ দেশটাকে charlatanদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

আমি। আমাদের beginningটা বড় ভাল হল না। কথাটাও বড়

diffuse হ'য়ে প'ড়ল। বাস্তবিক, যোগবলের কথাগুলা কি একেবারে মিথ্যা মনে হয়?

বন্ধু। আচ্ছা, যোগবলের ব্যাপারটা কি, আমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারেন?

আমি। না জানিয়াই বুঝি, হাসিয়া উড়াইতেছিলেন। তা যাক্। এটা আপনার দোষ নয়, দেশের হাওয়ার দোষ। যে দেশের শিক্ষিত লোক অম্লানবদনে বলিতে পারে যে, "যদি এটা সত্য হইত, তাহা হইলে কি জানিতে বাকি থাকিত, সে দেশে নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনের অনেক বিলম্ব। আমি নিজে যোগসাধন কখনও করি নাই। যা শুনেছি, তাতে বোধ হয় যে, যোগসাধন দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ আপনার আমার কাছে যাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, যোগীদের নিকট তাহা সম্ভব। যোগসাধন দ্বারা ভৌতিক জগতের উপর ক্ষমতা বিস্তৃত হয়।

বন্ধু। কি! মাছি অপেক্ষা ক্ষুদ্র হওয়া, আকাশ অপেক্ষা বড় হওয়া, বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা হওয়া, এই সব বুঝি যোগের ক্ষমতা?

আমি। শুধু ও সব কেন, আরও অনেক ক্ষমতার বর্ণনা পাওয়া যায়। মোটের উপর, আমাদের অনেক অজ্ঞাত বিষয় যোগিগণের নিকট প্রত্যক্ষ বোধ হয়।

বন্ধু। ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য বাড়াইতে ইচ্ছা থাকে ত বিজ্ঞান শিখুন। চোখ বুজে ঘুমাইলে চলিবে না, Edisonএর Laboratoryতে গিয়া apprentice হউন!

আমি। কথাটা কতক সত্য। কিন্তু মনে হয়, একটা স্থানে যাবার কি দুইটা পথ থাকিতে পারে না? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মনকে জড়ের পরিণাম বলিতে প্রয়াস পাইতেছে। এজন্য Psychologyকে Physiologyর একটা শাখা বলিয়া গণনা করে। কিন্তু আর্য্যগণ অন্য পথে গমন করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, মনই জড়ের চালক। এজন্য তাঁহারা জড়কে একেবারে ত্যাগ করিতেন না, কিন্তু উহা যন্ত্র ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাঁহারা ভাবিতেন; যন্ত্রী নইলে যন্ত্র চালায় কে? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যন্ত্র লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছে। যন্ত্রটা সবিশেষ শিক্ষা করিলে যন্ত্রীর কথা কতকটা জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু একেবারে যন্ত্রীকে অনুসন্ধান করাও চলে।

বন্ধু। কথাটা মন্দ নয়! মন বলিয়া একটা জিনিস যাকে ধরিতে

ছুঁইতে পারা যায় না, যেটা দ্বারা পৃথিবীর একটা রেণুও নড়ে না, সেটাকে অনুসন্ধান করিতে যাওয়া আর গঞ্জিকার টানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব অবগত হওয়া এক কথা।

আমি। উপহাস না করিয়া একটু ভাবিতে দোষ কি? চক্ষুকর্ণাদি পাঁচটা ইন্দ্রিয় আমাদের যত কিছু জ্ঞান গরিমার পুঁজি। মনে করুন যেন, যোগসাধন দ্বারা সেই সকল্ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসীমা বাড়িয়া যায়। এরূপ ঘটিলে, যাহা আপনার আমার কাছে অসম্ভব, তাহা তখন কতকটা সম্ভব হইবে। যোগ শব্দটায় যদি আপত্তি থাকে, ভৌতিক বিদ্যা বলুন, না হয় বিজ্ঞান বলুন।

বন্ধু। (ব্যগ্রভাবে) বিজ্ঞানের সঙ্গে সেগুলা জড়াইবেন না। আর, পাঁচটা ইন্দ্রিয় না বলিয়া ছয়টা sense organ বলুন। Tactual senseএর সঙ্গে muscular sense মিশাইলে দোষ পড়ে। যাহা বলিবেন, তাহা যেন বিজ্ঞানসম্মত হয়। নতুবা বৃথা তর্কে ফল নাই।

আমি। যাক্ আপনার এভাব দেখিয়া একটু ভরসা হ'ল। দেখুন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বলে যে, তাপ আলোক তাড়িত প্রভৃতির বাহ্য কারণ ঈথরের কম্পনবিশেষ। সেই ঈথরের কম্পনবিশেষ চক্ষুর স্নায়ুকে উত্তেজিত করে ও তৎসঙ্গে বাহ্য বস্তুর দৃষ্টিজ্ঞান হয়। সেই ঈথরের কম্পনবিশেষে তাপ, তাড়িত, চুম্বকত্ব, সব ঘটিতেছে। শুধু তাই নয়, একক অন্যে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। যেমন ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর ক্ষুদ্র তরঙ্গ এবং ঝঞ্ঝাবিক্ষোভিত সাগরের ঊর্ম্মি বস্তুতঃ এক, অথচ রূপে ও কার্য্যে কত প্রভেদ, তেমনই তাপ আলোক তাড়িত প্রভৃতির কারণ এক, কেবল রূপে ও কার্য্যে প্রভেদ। ঈথরের নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে, কতকগুলি আমাদের শরীরের কোন কোন অংশের বিকাশ জন্মাইতেছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের এক এক বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে। পুষ্করিণীর ক্ষুদ্র তরঙ্গে নৌকা বিচলিত হইবে না, কিন্তু সাগর-তরঙ্গে প্রকাণ্ড জাহাজ ওলট্পালট্ হইয়া যায়। সেতারের তার আল্‌গা করিয়া বাঁধিয়া তারে আঘাত করুন, তার নড়িবে বটে কিন্তু কোন শব্দ শুনিতে পাইবেন না। আবার সেই তার খুব টান করিয়া বাঁধিয়া তারে আঘাত করুন, তার নড়িবে কিন্তু শব্দ শুনিবেন না। তবেই, যখন তারের কম্পনসংখ্যা এক একটা সীমার মধ্যে থাকে, তখনই আমাদের শব্দ জ্ঞান হয়। সেই সীমা অতিক্রম করিলে

তার নড়িলে কি হইবে, আমাদের কাণ তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমাদের অপরাপর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও তাই। মনে করুন যেন, কোন উপায়ে আমার চক্ষু কর্ণের স্নায়ুকে অত্যন্ত দ্রুত বা অত্যন্ত মৃদু কম্পন গ্রহণ করিবার যোগ্য করিলাম। তাহা হইলে আপনি যে বস্তু দেখিতে পাইবেন না বা যে শব্দ শুনিতে পাইবেন না, তাহা আমি পাইব। আপনার কাছে যাহা অজ্ঞাত, তাহা আমার কাছে জ্ঞাত হইবে। দেওয়ালের আড়ালে বা দূরে কেহ থাকিলে তাহা আমি দেখিতে পাইব, আপনি পাইবেন না। মনে করুন, এইরূপে আপনাতে আমাতে কত প্রভেদ হইয়া পড়িবে।

বন্ধু। আপনি যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ব্যস্ত হইয়াছেন! বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দোকানে দেশটা ভরিয়া গিয়াছে। আবার কেন?

আমি। একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক বলিয়া সকল গুলিই কি ভুল? তা ছাড়া, যোগসাধন দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশের একটা rationale খুজিতে ছিলাম। তাই এই রকম একটা ব্যাখ্যা করিতে হইল। এইটাই যে ঠিক, অবশ্য তা আমি বলি না। কিন্তু এই রকম একটা না একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন করিয়া হউক, আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসীমা বাড়াইতে পারিলে আমাদের জ্ঞান কত বাড়িতে পারে, তাহারই আভাস দিতেছিলাম। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু কর্ণই প্রধান। ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা ইন্দ্রিয় বটে। কিন্তু একটা রসাস্বাদ, একটা গন্ধ ঘ্রাণ বা একটা স্পর্শসুখ আমাদের কত দিন বা মনে থাকে? যাহা হউক, সংসারে যে এই পাঁচটী মাত্র ইন্দ্রিয় আছে, অপর ইন্দ্রিয় নাই, এমনও মনে করিতে পারা যায় না। যদি আমাদের আর একটা ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে আমাদের আরও কত কি জ্ঞান হইত!

বন্ধু। আপনি কল্পনার চোখে অনেক ব্যাপার দেখিতেছেন। এই কল্পনা-বলেই আপনি যোগ-বলের পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। মনে রাখিবেন, দূরবর্ত্তী লোকের মূর্ত্তি দেখিতে বা তাহার কথা শুনিতে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন। সেই সকল যন্ত্র ব্যতীত আমাদের ইন্দ্রিয় ঐ ঐ বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। কল্পনাকে একটা ইন্দ্রিয় মধ্যে গণিতে পারিলে আপনার কথা কতকটা সত্য হইত। আমাদের ছয় সাতটা কেন, ছয় সাত ডজন ইন্দ্রিয় আছে মনে করিতে পারিলে কত জ্ঞান বৃদ্ধি হইত।

আমি। কেন? কোন কোন নিকৃষ্ট প্রাণীর অপর একটা স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়

স্পষ্ট না থাকিলেও, যে কয়টা আছে, তাহাদের কার্য্য ক্ষমতা অধিক বলিয়া মনে হয়। আমরা আলোকের কতটুকুই বা গ্রহণ করিতে পারি? সূর্য্য-কিরণের যতখানি spectrum হয়, তাহার প্রায় ৭ ভাগের ১ ভাগ মাত্র আমাদের চক্ষুর গ্রাহ্য। আমরা spectrum এর violet বর্ণের পর আর কিছু দেখিতে পাই না। পিপীলিকা তাহার কিয়দংশ দেখিতে পায় বলিয়া বোধ হয়। আমরা যে শব্দ শুনিতে পাই না, কোন কোন কীট তাহা শুনিতে পায়।

বন্ধু। তাতে কি? কোন্ প্রাণীর কি প্রকার দর্শনশক্তি আছে, তাহার বিচারে আমাদের যোগসাধন হবে না।

আমি। বোধ করি আপনি Darwin, Hæckel প্রভৃতির Theory of Evolution এ বিশ্বাস করেন?

বন্ধু। খুব বিশ্বাস করি। অমন grand doctrine আর আছে কি?

আমি। আপনি সেই Italian Abbeর নিষ্ঠুর পরীক্ষার বিষয় পড়িয়াছেন কি! তিনি ঘরের কড়ি হইতে কতকগুলা দড়ি ঘরের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। পরে কয়েকটা বাদুড়ের চোখ কাণ নষ্ট এবং নাক বন্ধ করিয়া সেই ঘরে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বাদুড় গুলা সেই ঘরের ঝুলান দড়িগুলার মাঝে এমন উড়িতে লাগিল যেন তাদের কোন ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হয় নাই। একগাছি দড়িও তাদের গায়ে ঠেকিল না, বাঁকিয়া বাঁকিয়া যেখানে যেমন, তেমনই ভাবে ঘুরিয়া অক্লেশে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

বন্ধু। ইহা দ্বারা কি প্রমাণ করিতে চান?

আমি। ইহাতে এই জানা যায় যে, বাদুড় গুলার চক্ষু কর্ণ ব্যতীত হয়ত তাদের অপর একটা ইন্দ্রিয় আছে, হয় ত তাদের চর্ম্মময় পক্ষে ঈথর তরঙ্গের কম্পন আলোক-জ্ঞান বা বস্তুজ্ঞান জন্মাইতে পারে। আরও একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। পুং ও স্ত্রী দুইটি গুটিপোকার ডিম্ব জাপান হইতে আমেরিকার চিকাগো নগরে আনা হয়েছিল। তখন সে নগরে সে রকম গুটিপোকা আর ছিল না। দুইটি ডিম্ব প্রায় দেড় মাইল অন্তরে রাখা হয়েছিল। ডিম্ব ফুটিবার পর দিন দেখা গেল যে, দুইটি পোকা একত্র বসিয়া আছে। এখানে কি বলিবেন? দূরে থাকিয়া কোন ক্রমে তাহারা পরস্পর মনের ভাব জানিতে পারে, স্বীকার করিতে হইবে।

বন্ধু। স্বীকার করি, না করি, এ সব দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমাদের তর্কের সম্বন্ধ কি?

আমি। সম্বন্ধ বিলক্ষণ আছে। নিকৃষ্ট প্রাণীর ক্রমবিকাশ দ্বারা যদি মানুষের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে মানিতে হইবে যে নিকৃষ্ট প্রাণীর যে সকল গুণ বা ক্ষমতা ছিল বা আছে, তৎসমুদয় আমাদেরও আছে। তবে কোন কোনটা latent বা potentially আছে আর কোনটা বা প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। তাহা হইলেই দেখুন, আমাদের ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যসীমা বৃদ্ধি করা একেবারে অসম্ভব হইল না।

বন্ধু। বহু, বহু পূর্ব্বকালে কোন্ প্রাণীর কি ক্ষমতা ছিল, আর আমাদের উৎপত্তির সময় কতগুলি ইন্দ্রিয় কি ভাবে কাজ করিত, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। আপনি imaginationকে basis করিয়া যা তা সম্ভব অসম্ভব বলিতে পারেন।

আমি। আপনার কথাটা বিজ্ঞানসম্মত হইল না। আপনি Darwin এর grand doctrine এ কথায় বিশ্বাস করেন কিন্তু তার consequences এ বিশ্বাস করিতেছেন না। এখানে কোন কল্পনা দেখিতে পাই না। যাহা হউক, আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের কোন কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-সীমা বৃদ্ধি করা একেবারে অসম্ভব বলিতে পারেন না। তা ছাড়া, আরও আছে। অন্ধ ব্যক্তিদিগের কাজকর্ম্ম দেখিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। যখন কোন অন্ধ নির্জ্জন নিঃশব্দ ঘরে একা বসিয়া থাকে, তখন সেই ঘরে কেহ প্রবেশ করিলে, সে তাহা কখন কখন টের পায়। কখন কখনও অন্ধকার ঘরে আমরাও বুঝিতে পারি যেন কেহ সেখানে আছে। বোধ হয় ব্যবহার অভাবে আমাদের নিকৃষ্ট প্রাণী হইতে প্রাপ্ত কোন কোন ইন্দ্রিয় একেবারে লুপ্ত না হইলেও পূর্ব্বের ক্ষমতা হারাইয়াছে। কলিকাতা সহরে short sighted ছেলের সংখ্যা কেমন বাড়িয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন?

বন্ধু। আপনি যতই প্রমাণ প্রয়োগ করুন, আসল কথাটা যেমন তেমনই রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি যোগবলের সত্যতা প্রমাণ করিতে চান, তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণে আসুন।

আমি। সকল বিষয়ই কি আপনি প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বাস করেন?

আপ্তবাক্যে বিশ্বাস না করিয়া আপনি কি দুই দণ্ড চলিতে পারেন? আমরা কেবল কথায় বলি, "প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ;" কিন্তু কাজের বেলায় আপ্তবাক্যই সম্বল।

বন্ধু। কিন্তু যার তার কথাকে আপ্তবাক্য বলা যাইতে পারে না। আপনার রামা শ্যামার কথা আর বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের কথায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। সচরাচর যে ব্যাপার দেখা যায় না, এমন বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইতে কি প্রকার প্রমাণ আবশ্যক, তাহা ত আপনি জানেন। জলের উপর দিয়া কোন ব্যক্তি রাত্রে খড়ম পায়ে দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। এ কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু বিলক্ষণ কঠোর প্রমাণ চাই। নতুবা তাহা বিকারে রোগীর প্রলাপ মাত্র জানিবেন।

আমি। আচ্ছা, আপনি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের কথা আপ্তবাক্য বলিয়া জ্ঞান করেন কি?

বন্ধু। এক শ বার জ্ঞান করি।

আমি। আপনি জানেন, অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অলৌকিক ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তাঁহারা অনেক কথা বলেন বা মানেন, যাহা আপনি মানেন না বা মানিয়া চলেন না। সুতরাং দেখুন, কোন্ বিষয়ে কাহার কথা মানিব, তাহা আমরা নিজে নিজেই ঠিক করিয়া লই। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, এ বিষয়ে আমাদের বিবেক বুদ্ধিই একমাত্র সম্বল।

বন্ধু। (বিরক্ত হইয়া) আপনি ঠিক main lineএ থাকিতে পারেন না। কথায় কথায় personality না আনিয়া যা বলিবার থাকে বলুন।

আমি। আমরা মুখে অনেক কথা বলি। বলি এটা বিশ্বাস করি, ওটা superstition। কিন্তু যখনই কাজে দেখিতে যাই, তখন অনেক বিষয়ে অন্যথা দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিকের আপ্তবাক্যে আপনার কতদূর আস্থা, তাই জানিবার জন্য দৃষ্টান্তটা দিয়াছিলাম। আমরা আপ্তপ্রমাণে বিলক্ষণ বিশ্বাস করি। তবে কোন্‌টা আপ্ত বলিয়া মানিব, তাহা আমাদের শিক্ষা ও রুচি অনুসারে ঠিক করিয়া লই। অমুক বিলাতী সাহেব বা অমুক দেশী সাহেব যোগের কথা বিশ্বাস করেন না, সুতরাং......

বন্ধু। আপনি আমাকে convince করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। আপনি সহস্র কথা বলিলেও, যেগুলা gross superstition, সেগুলাকে

মানিতে পারিব না। একটা সত্য ঘটনা বলি। সে দিন কোন এক ব্যক্তি এক জন যোগী সম্বন্ধে বলিতেছিলেন। কয়েকজন শিক্ষিত শ্রোতা জুটিয়াছিল। তিনি seriously বলিলেন যে, "সেই যোগী গাঁজার একটানে পিত্তলের একটা কলিকা ফাটাইয়া ফেলিয়াছেন।" শ্রোতারা অমনই বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, আপনি সেই কলিকাটা নিজে দেখিয়াছেন? উত্তর হইল, 'নিজে দেখেছি বই কি—নইলে কি বলিতাম? এমন মোটা পিতল, এত বড় কলিকা." ইত্যাদি। আমি থাকিতে না পারিয়া বলিলাম, "মহাশয়, একথাটা কি seriously বল্‌ছেন?" লোকটা বলিল কি,—"আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, তবে যে দোকানে আর একটা নূতন কলিকা কিনিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সে সব জানে।" লোকটার কি সুন্দর power of observation! কি সুন্দর inductionএর জ্ঞান!

আমি। আমি কি বল্‌ছি যে, যে গাঁজা খায়, সেই যোগী?

বন্ধু। আপনি না বলুন, দেশের লোকগুলা ত ভড়ং দেখে, গাঁজা টান দেখে যোগে বিশ্বাস করে।

আমি। দেশের লোকে অনেক কথা বলে। শুধু আমাদের দেশ কেন, যেখানে Huxley Tyndallএর জন্ম, যেখানে Edison বিরাজ করিতেছেন, সে দেশের লোকদের মধ্যেও এই রকম জ্ঞান দেখ্‌বেন। আর, supernatural power সম্বন্ধে যদি dark ages হইতে এ পর্য্যন্ত সকল দেশে বিশ্বাস আছে, তাহা হইলে তাহার মূলে কিছুই নাই, বলিতে পারেন কি? কোন বিষয়ে universal belief থাকিলে তাহা একেবারে উপহাস করিয়া উড়াইবার উপযুক্ত নয়। বহু পূর্ব্বকাল হইতে আমাদের দেশের লোকেরা যোগবলে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। আমাদের কোনও শাস্ত্রে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা পাই না।

বন্ধু। ও সব wholesale জুয়াচুরী।

আমি। পিতৃপুরুষদিগকে ওরকম কথা বলায় পাপ আছে।

বন্ধু। সত্য কথা বলিতে পাপ নাই।

আমি। কথা বলিতে পাপ নাই, যদি কথাটা সত্য হয়। এ সব শিক্ষার গুণ। যাহা হউক, যার আসল নাই, তার নকল হইতে পারে কি? যদি ভণ্ডযোগী দেখিয়া থাকেন, তবে আসল যোগী নাই বা ছিল না কি?

বন্ধু। ও সব কেবল কথার মার পেঁচ। কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে?

কোন observant এবং trustworthy লোক কখনও যোগবলের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখেছেন ?

আমি। সাহেবদের সাক্ষ্য চান ? হরিদাস সাধুর বিষয় ইতিহাসে দেখুন। একজন নয়, দু জন নয় ; কতজন সাহেব ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আমি একটা ঘটনা দেখেছি। যদিও তাহা যোগে হয় নাই, তথাপি সেটা ভাবিবার বিষয় বটে।

বন্ধু। আপনার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু আপনাকে biased দেখিতেছি। আর আপনিও deceived হইয়া থাকিতে পারেন।

আমি। আমি যাহা দেখেছি, তাহা একবার একজন বাজীকর দেখাইয়াছিল। অনেক দিনের কথা বটে, কিন্তু এখনও আমার কাছে প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতেছে।

বন্ধু। যোগের কথা আর ভেল্কি বাজীর কথা এক না কি ? হ'তেও পারে। হয়ত যাকে যোগবল বলে, তাহা ভেল্কি মাত্র।

আমি। ভেল্কি কি না, তাহা পরে বুঝিবেন। কি দেখেছি, আগে বলি। সকাল বেলা ৯।১০ টার সময় ৮।১০ হাত দূর হইতে দেখেছি। একটি ১০।১১ বৎসরের মেয়েকে একখান কাপড় দিয়া ঘেরিয়া ২।৩ মিনিট পরে বাজীকর কাপড়খান তুলিয়া লইল। তখন দেখা গেল, মেয়েটি পদ্মাসন করিয়া তিনটি কাঠির উপর উপবিষ্ট। কাঠি তিনটি প্রায় এক হাত লম্বা ; মাটিতে গর্ত্ত করিয়া পোঁতা ছিল না। দুই জানুর নীচে দুইটি কাঠি ও অপরটি পশ্চাদ্ভাগে লাগান ছিল। মেয়েটি নিস্তব্ধ ও নিমীলিত নেত্র। ক্রমে ক্রমে একটি জানুর নীচের কাঠিটি রাখিয়া অপর দুইটি সরাইয়া লইল। মেয়েটি একটি কাঠির উপর জানু রাখিয়া ৮।১০ মিনিট কাল বসিয়া রহিল। কোমরে কৌপিন মাত্র পরা ছিল ; কোন প্রকার কল কব্জা লোহার পাত ইত্যাদি ছিল না। ধরিয়া নামাইবার পর দেখা গেল যে, মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে।

বন্ধু। কুম্ভকযোগ না কি ? যাহা হউক, এর ত বেশ explanation আছে। শরীরটা stiff করিয়া একটা কাঠির উপর equilibrium করিয়া ছিল।

আমি। নামে কিছু আসে যায় না। আর, explain ও করিতে পারা যায় না। আপনার laws of equilibrium এ explained হয় না।

অবশ্য, সকল ব্যাপারেরই একটা না একটা explanation আছে। কেবল কোনটার বা আমরা জানি, কোনটার বা জানি না।

বন্ধু। যাহা হউক, ওটা আর ভাবিবার কথা কি! বোধ হয়, চোকে ভেল্কি লাগিয়া থাকিবে। বাস্তবিক এখন বোধ হইতেছে, ভেল্কিই উহার যথার্থ explanation।

আমি। আপনি ভেল্কিতে বিশ্বাস করেন?

বন্ধু। সত্য বিষয় বিশ্বাস করিব না? ভেল্কি কথাটা hypnotismএর বাঙ্গালা বই ত নয়। বোধ হয় আপনাকে hypnotise করিয়া ফেলিয়াছিল। Hypnotism by suggestion একটা ভয়ানক জিনিস আবিষ্কার হয়েছে।

আমি। Hypnotismএর মূলকারণ যাহাই হউক, তাহা আপনিও জানেন না আর আপনার পাশ্চাত্য ডাক্তারগণও জানেন না। ফলে দাঁড়ায় একই। আপনারা যাকে mesmerism, hypnotism বলেন, তাহাকে আমাদের দেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে মন্ত্রশক্তি বলিয়া আসিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে আপনাদের পণ্ডিতগণ মন্ত্রে বিশ্বাস করিতেন না।

বন্ধু। কথাটা উঠিবামাত্রই ত বিশ্বাস করা যায় না। প্রমাণ চাই। যাই হউক, hypnotismএর বাঙ্গালা মন্ত্রশক্তি বলিতে আমি রাজী নই।

আমি। কেন, Mesmer একশ সওয়া শ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার mesmerism প্রকাশ করেন। তিনিও আবার Paracelsusএর পদানুসরণ করেন। তা যাক্। পাশ্চাত্য দেশে animal magnetism, mesmerism, hypnotism, thought-transference প্রভৃতি লোকে আর অবিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। আমি বলিতেছিলাম, এসব গুলা বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এদেশে জানা ছিল। ইহারই প্রকারান্তর স্পর্শ দ্বারা রোগ-চিকিৎসা বহু পূর্ব্বকালে চীনদেশেও ছিল। য়ুরোপেও কোন কোন ডাক্তার এইরূপে রোগ চিকিৎসা করিতেন।

বন্ধু। Charlatan and impostor সকল দেশেই সম্ভবে।

আমি। কথাটা বোধ হয়, না ভাবিয়াই বলেছেন। যাহা হউক, চুম্বক সাহায্যে রোগশান্তি যদি সম্ভব হয়, আর আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানের যদি চুম্বক-ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে অনেক কথা বুঝিবার আশা করা যায়। আর, একটা explanation দিতে পারা যাক্ আর নাই যাক্, প্রত্যক্ষ ফলে

কখনও অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। বেশী দিনের কথা নয়। ৺ সীতানাথ ঘোষ এই কলিকাতায় চুম্বক সাহায্যে রোগ নিবারণ করিতেন। এখনও অনেকে magnetic belts ব্যবহার দ্বারা উপকার পাইয়া থাকেন। Electropathy বলিয়া একটা নূতন চিকিৎসা প্রণালীর সূচনা হইতেছে।

বন্ধু। কি কথা হইতে কি কথায় আসিতেছেন?

আমি। বেশী দূর যাই নাই। এই সকল ঘটনা হইতে জানা যায় যে, আমাদের শরীরে চুম্বকের ধর্ম্ম আছে এবং তাহা চুম্বক দ্বারা বশীভূত হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিবেন, চুম্বকের গুণটা ঈথরের কম্পনবিশেষ জনিত। আবার, আলোক Electromagnetic rays বলিয়া পণ্ডিতেরা ঠিক করিতেছেন। তবেই আমাদের শরীর দ্বারা ঈথরে কম্পন বিশেষ উৎপাদন করিতে পারা যায় কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। এই একটা বিষয় সত্য হইলে অনেক রহস্য জানিতে পারা যাইবে। এক রণ্টেনের আবিষ্কারে possibilities কত বাড়াইয়াছে মনে করুন, তার উপর শরীর যন্ত্রের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের কথা।

বন্ধু। আপনি কেবল possibilitiesই দেখছেন। কিন্তু কাজের কথা একটাও হ'ল না? যোগীদের যদি এতই বিদ্যা আছে, কাহাকেও একটু বিদ্যা দান করিয়া বিদ্যার নমুনা দেখাতে আপত্তি কি? তাঁরা না কি হিমালয়ে বাস করেন বা করিতেন। পৃথিবীর উপর দিয়া, আমাদের দেশের উপর দিয়া কত বিঘ্ন বিপত্তি চলিয়া যাইতেছে, একটু আসিয়া বাঁচাইতে পারেন না। যোগীদের ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহারা যে পূরা selfish তা স্বীকার করিতে হইবে।

আমি। অমুকে কেন এ কাজ করে না, তাহার জবাব আমি কি দিব? আর, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন যোগীকে আমি এপর্য্যন্ত দেখি নাই কিম্বা দেখিলেও চিনিতে পারি নাই। আমাদের কথাটাও এ ভাবের হ'য়ে আসে নাই। তা যাক্। আপনি Baron Reichenbach's researches গুলা একেবারে অবিশ্বাস করিবেন কি? তিনিই medical magnetism এর দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই পরীক্ষাটি করিয়াছিলেন। বহুবিধ লোক, শিক্ষিত অশিক্ষিত, রোগী নীরোগ, স্ত্রী পুরুষ, একটা অন্ধকার ঘরে বসাইয়া তাহাদের হাতের নিকট তাঁহার নির্ম্মিত চুম্বক ধরিতেন। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে তাহারা আলোক ছটা বহির্গত হইতে

দেখিত। সুতরাং এমন একটা পদার্থ আছে, যাহা চুম্বক দ্বারা ক্রিয়াবান্ হয় এবং তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। কোন কোন স্ফটিকের এই গুণ আছে, কোন কোন ব্যক্তির দেহের এই গুণ আছে। তদ্দ্বারা আলোক নির্গত করা যাইতে পারে।

বন্ধু। আপনি ক্রমে ক্রমে Theosophyর astral matterএ আসিতেছেন। যোগের কথাগুলা কোন Theosophyর কাগজে পাঠাইয়া দিবেন। আদর করিয়া ছাপা হইবে।

আমি। তাতে কি? ঐ পদার্থটাকে আকাশ বলুন, ether বলুন আর astral matter বলুন, নামে কিছু আসে যায় না। হক্সলি, টিণ্ডাল এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই বলিয়া, ইহা নাই, এমন নয়। আর, এও বলি, এ বিষয়ে তাঁহারা কিছু বলেন নাই বলিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তিরও লাঘব হয় না। যিনি যে বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সেই বিষয়ই বলিতে পারেন। অন্য বিষয়ে তিনিও যেমন প্রমাণ আপনি আমিও তেমনই হইতে পারি। মন্ত্রশক্তি শব্দ ব্যবহার করিতে আপনার অভিমত নাই। কিন্তু নামে যাহাই হউক, উহার আধুনিক প্রকাশিত ক্ষমতার সম্বন্ধে পূর্ব্বকালের অনেক কথার ঐক্য দেখা যায়।

বন্ধু। মন্ত্র মন্ত্র করিলে পাছে আবার উচাটন বশীকরণ মনে আসে, এজন্য hypnotism বলিতে বলি।

আমি। আপনি তবে hypnotismএর সমুদয় ক্ষমতা শুনেন নাই। তদ্দ্বারা উচাটন ও বশীকরণের সহস্র প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এমন কি, Parliamentএ এবিষয়ে একটা Bill হবার কথা শুনিতেছি। যে সে লোক যাকে তাকে hypnotise করিলে সমাজ রক্ষা হইবে না, এই আশঙ্কায় অনেকের মন ব্যাকুল হইয়াছে। উচাটন সম্বন্ধে Parisএর Dr. Charcotএর hospitalএর report পড়িবেন।

বন্ধু। মারণ সম্বন্ধেও প্রমাণ যোগাড় করেছেন না কি?

আমি। যোগাড় করিতে হয় না, অমনই প্রমাণ আসিয়া পড়ে। Anna Kingsford,—Her Life, Letters Diary and Work by E. Maitland পড়িবেন। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ গত জানুয়ারি মাসের Review of Reviewsএ আছে।

বন্ধু। ব্যাপারটা কি? বাণ মারার কথা না কি?

আমি। ব্যাপারটা এই। Parisএ Anna, Claude Bernardকে মারণমন্ত্র দ্বারা হত্যা করে। আবার ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে Anna যখন ইংলণ্ডে, সেখান হইতেই ফ্রান্সে Paul Bertকে হত্যা করে। এই মেয়েটা নাকি Pasteurকেও বাণ মারিতে চেয়েছিল।

বন্ধু। মেয়েটা নিশ্চয়ই ডাইনী ছিল!

আমি। ডাইনী কিনা, জানিনা। কিন্তু তাহার চরিতলেখক লিখিয়াছেন, I refer to the record of the assassinations which she deliberately planned. I call them assassinations because they were attempts to murder—murder not by dynamite or by dagger, but by the determined exercise of a vengeful and concentrated will.

বন্ধু। কি জানেন, সব সময় সব কথা বুঝিতে পারা যায় না।

আমি। এতক্ষণ আমি তাই বলিতেছিলাম। অমুক ব্যাপারটা আপনি দেখেন নাই বলিয়া যে তাহা ঘটিতে পারে না, একথা বলিতে পারা যায় না। অবশ্য একেবারে বিশ্বাসও করিতে বলি না। আপনি Huxley's Possibilities and Impossibilities খানি মনোযোগ করিয়া পড়িয়াছেন কি?

বন্ধু। আমি ভাবছি, যোগবলরূপ এমন একটা ভয়ানক ব্যাপার রহিয়াছে, অথচ কেহ তার সন্ধান পেলে না? আশ্চর্য্য বটে!

আমি। কেহই সন্ধান পায় নাই, বলায় একটু দোষ পড়িতেছে। সে দিন আমার—বন্ধু এক সাহেব ডাক্তারের একখান ইংরাজি বহির কথা বলিতেছিলেন। আমার বন্ধুটি যোগ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর পড়িয়াছেন। তিনি ইংরাজি বহিখানি পড়িয়া বলেন যে, এখানি পূর্ব্বকালের হঠযোগের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। অর্থাৎ সেই ডাক্তার যে সকল প্রক্রিয়ার কথা লিখেছেন, সে গুলি পড়িলে মনে হয় যেন তিনি আমাদের শাস্ত্রের হঠযোগ আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া লিখিয়াছেন।

বন্ধু। এইটুকু বাকি ছিল। যাহা হউক, আজ অনেক কথা জানা গেল। অনেক কথার আভাস পাওয়া গেল। আবার হবে।

এই বলিয়া আমার বন্ধুটি চলিয়া গেলেন। বোধ হয় ভাবিতে ভাবিতে গেলেন যে লোকটা কি fool!

শ্রীসত্যকাম।

দুইটি সঙ্গীত।

(১)

প্রিয় মাধবী, ও মাধবী গো—
তোর বদন খানি হেরি,
হ'ল নয়ন কেন ভারী।—
পরশ-লতা তুমি সই গো পতি-পাগলিনী;
(আছ) পতি-অঙ্গে মিশে রঙ্গে দিন যামিনী।

(মরি, মরি কিবা শোভা গো, যুগলরূপ মাধুরী হেরি)
শ্যাম তনু খানির শোভা গো, শ্যামল প্রসূনে,
স্বামীর সোহাগ-রাগে শোভে শত গুণে।
(প্রেম উছলিয়ে যায় গো, অনন্ত ফোয়ারায়)
সোহাগ-পুতলী সই গো, অনিল হিল্লোলে
বাসর তরঙ্গে ভাসি তনুখানি দোলে
হেরে আঁখি (নীরে) ভরিল, কি জানি কি মনে হ'ল।
সই বল না,　　　সে কি সাধনা
　　যায় পূরালে মনস্কামনা।
মরমের টানে,　　　ও সই প্রাণে প্রাণে
　　রব জড়িত হ'য়ে দু জনে।—
　　(সই গো তোমার মত)—
(তখন) দিঠে দিঠি (দিঠি) বাঁধা রবে ;
　(মুখের) কালো আঁধার ঘুচে যাবে,
　(প্রাণের) কালো জলে চাঁদ খেলিবে,
　(তখন) লতা পাতায় ফুল ফুটিবে,
　　(ও সই তোমার মত)
　(তখন) অলি আসি গুঞ্জরিবে
　(তখন) তখন দিয়ে পিয়ে বিভোর হবে।
　(তখন) তখন আপনারে হারাইবে।

(২)

নিশীথ শয়নে একাকিনী
কার লাগি আঁখি নীরে ভাসি ! !
উ—উ—উ উ বুক ফেটে যায়
কোথা নাথ,—দেখ মরে তব দাসী
নিশীথ ঘুমের সোহাগ ভুলিনু
কুহকী আশার টানে,
পিয়াসার ঘোরে,
ধৈরজ না ধরে

* আলেয়া কীর্ত্তন—লোফা।

মরমে হানিয়ে মুরছা ডাকে
ক্ষণেক ভুলিতে তারে ;
বুক ভাঙ্গি চাহে উদ্দাম হৃদয়
ছুটিতে গো কার পানে ;
হ'ল এ হৃদয়, অনল নিলয়,
যার তরে ; কোথা বল সে হইয়ে উদাসী।
আকাশের তারা বৃথাই চাহে গো
ভুলায়ে রাখিতে মোরে।
নিশার আঁধার বৃথাই চাহে গো
ঘুমায়ে রাখিতে ঘোরে ;
জ্বালাময়ী স্মৃতি, না পায় নিবৃতি,
ঘুমন্ত জ্ঞানে জাগায়ে তুলি গো পোড়ায় রতি রতি ;
মানের গরবে— মরিব নীরবে
আঁখির নীরে তর্পণ করিবে
অন্তিমেতে আসি। *

প্রকৃতি গায়িকা।

পলাশ বন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কথা আর ছাপা থাকিল না। এক কাণ, দুই কাণ হইতে হইতে গ্রামশুদ্ধ লোক বিবাহের কথা শুনিল। শুনিয়া অবশ্য সকলে যার পর নাই আনন্দিত হইল। যোগমায়া তো বাড়ী হইতে বাহির হওয়া অনেক দিন বন্ধ করিয়াছিল ; আমাকেও বাধ্য হইয়া গ্রামের মধ্যে গতায়াত বন্ধ করিতে হইল। সকলেই আমার মতিগতির প্রশংসা করে, যোগমায়ার রূপগুণের কথা পাড়িয়া প্রাচীন উপমাটির উল্লেখ করে এবং গোস্বামী মহাশয়ের চিন্তাভার লাঘবের কথা মনে করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। গ্রামবাসীদের ভাবে প্রকারে ইহাই বোধ হইতে লাগিল, যোগমায়াকে

---

* কাফিসিন্ধু—ঢিমে একতালা অথবা চৌতাল।

বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া আমি শুধু গোস্বামী মহাশয়কে নহে, যেন তাহাদিগকেও চিরকালের জন্য কিনিয়া রাখিতেছি! দেখিলাম, বিষম বিপত্তি! এই বিপত্তিতে পড়িয়া আমি গৃহ হইতে আর বহির্গত না হইবার সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু তাহাতেও সুবিধা দেখিলাম না। সময়ে অসময়ে গ্রামের বালিকা, যুবতী ও প্রৌঢ়ারা দলে দলে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া জননীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। বালিকা প্রৌঢ়াদের কথা দূরে থাকুক, অবগুণ্ঠনবতী যুবতীরাও অকুতোভয়ে ও দুর্জ্জয় সাহসে দ্বিতলে উঠিয়া আমার পাঠগৃহে উঁকি মারিতে লাগিলেন। যাঁহারা নিত্য আমায় দেখিতেছিলেন, তাঁহাদেরও দিদৃক্ষা অসম্ভবরূপে বলবতী হইয়া উঠিল। আমি দেখিলাম, বাড়ীতে তো তিষ্ঠান ভার। আমার মত অবস্থাপন্ন লোকের বনবাসই শ্রেয়স্কর। এই সিদ্ধান্ত করিয়া আমি কতিপয় দিবস প্রত্যূষ হইতে প্রদোষ পর্য্যন্ত বনের মধ্যেই অতিবাহিত করিলাম; কেবল আহারাদির প্রয়োজন বশতঃই এক একবার বাড়ীতে আসিতাম মাত্র। কিন্তু বন সর্ব্বক্ষণ ভাল লাগিবে কেন? স্বেচ্ছায় বনবাস, আর অনিচ্ছায় বনবাস, ইহাদের মধ্যে যে কি প্রভেদ, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। কি করি, আর কাহাকেই বা দুঃখের কথা বলি, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। একদিন কোনও প্রয়োজনবশতঃ বনরূপ দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সশঙ্কচিত্তে, মৃদুপদসঞ্চারে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি, সৌভাগ্যক্রমে সেখানে কোনও প্রতিবাসিনী রমণী নাই; কেবল জননীদেবী মঙ্গলাকে লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে একাগ্রচিত্তে কলাইয়ের বড়ি দিতেছেন। আমি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বড়ি দেওয়ারূপ কার্য্যটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম এবং বাল্যকালে এই সদ্যজাত অশুষ্ক বড়ি ভক্ষণে কেন এত অনুরাগ প্রকাশ করিতাম, কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সহিত তদ্বিষয়েও চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই নিকৃষ্ট বিষয়ের চিন্তা হইতে গর্ব্বিত মন মহাশয় শীঘ্রই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। আমি জননীদেবীকে একটী কথা বলিবার অভিপ্রায় করিতেছিলাম; সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিলাম—"মা, বড়ি তো দিচ্চ, আমার একটী কথা শুনবে?"

জননী অমনি বড়ি দেওয়া বন্ধ করিয়া পিষ্ট কলাই হস্তে ব্যাকুলনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি কথা বাবা? তোমার আবার কথা শুনবো না?"

আমি বলিলাম,—"বেশী কিছু নয়; বলি,আমাকে কি এত শীঘ্রই বনবাস কর্‌তে হ'বে?"

প্রশ্ন শুনিয়াই মা চমকিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "বনবাস কি রে? বনবাস তুমি কেন কর্‌তে যাবে, বাবা? শত্রুকেও যেন কখনও বনবাস কর্‌তে না হয়!"

আমি বলিলাম,—"তা তো ঠিক্ কথা! কিন্তু আমার যে সত্যি সত্যিই বনবাস হ'য়েচে। তুমি কি কোন খবর রাখ? কেবল না'বার খাবার সময়েই তুমি আমাকে বাড়ীতে দেখ্‌তে পাও; তারপর সমস্ত দিনটা যে আমি কোথায় থাকি, তা কি তুমি জান? তুমি তো বড়ি দিতে, আর কলাই ভাঙ্গতে, আর বিয়ের উদ্যোগ ক'র্‌তে ভোর থেকে রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাক। আমার কোন খোঁজ খবর রাখ কি? আমি যে বাড়ীতে দুই দণ্ড তিষ্ঠিতে পার্‌চি না? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল বনবাসই আশ্রয় ক'রেছি। যদি বিয়ের আগেই বনবাস ক'র্‌তে হলো, তবে বিয়ে আর কে ক'র্‌বে।"

"কেন বাবা কি হ'য়েচে? তুমি বাড়ীতে থাক না কেন? তোমাকে তো সত্যি আমি সমস্ত দিন দেখ্‌তে পাই না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌তে হ'লে, কোথাও খুঁজে পাই না। তুমি বনের মধ্যে একলা কেন থাক, বাবা? আমি তো তোমায় অনেক দিন মানা ক'রেচি?"

আমি বলিলাম,—"তা তো ক'রেচ, সত্য। কিন্তু আমি যে পাড়ার মেয়েগুলোর জ্বালায় অস্থির হলুম। যারা বার মাস ত্রিশ দিন আমায় দেখ্‌চে, তারাও যে ওপরে উঠে আমার ঘরে উঁকি মার্‌চে! বলি, হাঁ মঙ্গলা, বিয়ের কথা হচ্চে ব'লে আমার চেহারা খানারও কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়েচে না কি? পাড়ার মেয়েগুলো আমায় দেখবার জন্তে এত উঁকি ঝুঁকি মারে কেন, তা বল্‌তে পারিস্?"

বস্! আমার কথা শেষ না হইতে হইতে মঙ্গলা দাসী হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রন্দনের স্বরে বলিতে লাগিল,—"যত দোষ, নন্দ ঘোষ! পাড়ার মেয়েরা ওপরে উঠে ওঁ-কে দেখ্‌তে যায় কেন, তারও কৈফিয়ৎ আমায় দিতে হবে। মা বুঝ্‌তে পার্‌চ দাদাঠাকুরের কথা? আমিই যেন ওঁ-কে বনবাসী করেচি। আমিই যেন পাড়াশুদ্ধ মেয়েকে ডেকে এনে ওঁ-র ওপরের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্চি। জানি নে আমার উপর বাদ সাধচে কোন্

পোড়ার মুখো! মা গো, তুমি শীগ্গীর আমাদের ও বাড়ীতে চল; আমি এখানে আর থাক্‌তে পার্‌বো না। হেঁ গো, এক মাস হ'য়ে গেল, বাবা যে এখনও বাড়ী এলেন না! আজকে যে চিঠি এসেচে, তা'তে বাবা কি লিখেচে গো?"

চিঠির কথা শুনিয়া মা বলিলেন,—"সত্যি তো; কই চিঠিখানা তুই দেবুকে দিস্ নেই? তোকে যে দিয়ে আস্‌তে বল্লুম?"

"বল্লে তো,কিন্তু বনের ভিতর কে একলা যাবে, বাবা? কেশ্‌বা ছোঁড়াও সেই যে কখন হাটে গেছে, এখনও তো ফিরে আসে নি! আমি ঐ বালিশের নীচে চিঠিখানা রেখে দিয়েচি।"

আমি বলিলাম,—"বেশ করেচো। আহা, তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ে কি আর ভূ-ভারতে আছে? দেখ্‌লে চোখ জুড়োয়?"

এতক্ষণ গর্জ্জন হইতেছিল, অতঃপর সত্য সত্যই বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল।

আমি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িয়া ফেলিলাম। মা বলিলেন, "কি লিখেচেন?"

আমি বলিলাম,—"সংবাদ ভাল; বাবা কাল সকালে এখানে এসে পৌঁছিবেন। সঙ্গে বড় বৌ, মেজ বৌ ও ছেলেরা আসচে! বড় দাদা এখন ছুটী পাবেন না, সুতরাং তাঁরই কেবল আসা হচ্চে না। মেজ দাদা বিয়ের কাছা কাছি দুই চারি দিনের ছুটী নিয়ে আস্‌বেন। আর যতীনও আস্‌বে। কিন্তু মাসীমাকে আন্‌তে এখান থেকে লোক পাঠাতে হ'বে। দেখ মা, বাবা বুঝি সেখান থেকে আমার বিয়ের সম্বন্ধে গোস্বামী মশাইকে চিঠিপত্র লিখেছিলেন? এই শোন না বাবা কি লিখচেন:—'শুভ পরিণয় কার্য্য যাহাতে এই ফাল্গুন মাসেই সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত জিদ্ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমারও বিবেচনায়, আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই। তোমার গর্ভধারিণীকে বলিবে, তিনি যেন উদ্যোগ আয়োজন করিতে তৎপর হন। আমিও শীঘ্র যাইতেছি, ইত্যাদি।'

বৃষ্টি পড়িতে পড়িতে রৌদ্র উঠিল। অশ্রুমুখী মঙ্গলা এই শেষোক্ত কথাগুলি শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিয়া উঠিল,—"দাদাঠাকুর, তুমি আমার দোষ দিচ্ছিলে? এই দেখ না, বাবাই ওদের পত্র লিখেচেন! তাই তো আর যোগজায়া আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে চায় না!"

আমি মঙ্গলাকে চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া নীরব হইতে বলিলাম এবং তৎপরেই বলিলাম,—"তুই ব'কে মর্‌চিস্ কেন? এখন শীগ্‌গীর বড়ি দেওয়া শেষ করে, ঘর দুয়োর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্‌গে যা। বৌদিদিরা আস্‌চে,— যতীন আস্‌চে—জানিস্ তো যতীন ধুলো ময়লা দেখতে পারে না—আবার যতীনের মুখ খেয়ে ম'র্‌বি?"

মঙ্গলা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"ইস্, আমার যতীন ভাই তেমন ছেলে নয়, যতীন আমাকে বড় বোনের মতন ভক্তি করে। যেমন মাসী-মা তেমনি যতীন। যাই হো'ক্, তুমি সত্যি ব'লেচো, আমার ঢের কাজ আছে। মা, তুমি বাপু একলাই বড়ি দেওয়া সাঙ্গ কর। আমি সব গুছিয়ে গাছিয়ে রাখি গে। বৌরা কেউ এই বাড়ীখানা দেখে যায় নি। আমার কোন দোষের জন্যে যদি তারা এই বাড়ীর নিন্দা করে, তবে তা ভাল দেখাবে না, বাছা। দাদাঠাকুর, তুমি কেশবকে ডেকে বাইরের ঘর আর উঠোন পরিষ্কার করতে বল গে। আমি ভেতরের সব দেখ্‌চি। ওগো, তুমি কলকেতা থেকে যে ছবিগুলি এনেচো, সেগুলি ওপরের নীচের ঘরে টাঙ্গিয়া দাও না? কখন আর টাঙ্গাবে? আমি সব নিকিয়ে পুছিয়ে ঠাকুর ঘরের মতন পরিষ্কার ক'র্‌বো। মঙ্গলার যে কেউ দোষ ধর্‌বে, তা তো প্রাণ থাক্‌তেও সহ্নি হবে না, দাদা।" এই বলিয়া মঙ্গলা বড়ি দেওয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি পিষ্ট কলাইয়ে লেপিত থাকিলেও বাম হস্তে মার্জ্জনী ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্ত প্রক্ষালন করিতে গমন করিল।

জননী-দেবীর অবশ্য আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী এবং ভগিনী-পুত্র আসিতেছে শুনিয়া তিনি বড়ি দিতে দিতেই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি মঙ্গলার উপদেশক্রমে উপরের ও নীচের ঘরে যথা স্থানে ছবিগুলি টাঙ্গাইবার উদ্যোগ করিতে গেলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বৌদিদিরা তাঁহাদের পুত্রকন্যা ও দাসীদের সহিত পিতৃদেবের সমভিব্যাহারে পলাশবনে উপস্থিত হইলেন। যতীন্দ্রও আসিল। আবার যথাসময়ে মাসিমা ও রাজুদিদিও (আমার মাস্‌তুতো ভগিনী) আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। বড় দাদার কন্যা অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা নীরদা ও মেজ দাদার পুত্র-দ্বয় চুনী ও মতির আনন্দ কোলাহলে গৃহ সর্ব্বক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহার উপর গ্রামের বালক বালিকা ও যুবতী প্রৌঢ়াদের নিয়ত গমনাগমনে ও কথোপকথনে গৃহ যেন হাটে পরিণত হইয়া উঠিল। আমার তো আর গৃহে তিষ্ঠিবার যো ছিল না। আনন্দময়ী মেজ বৌ দিদি অবসর ও সুযোগ পাইলেই বিদ্রূপ ও উপহাস দ্বারা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। আমি তাঁহার ভয়ে আমার বনরূপ দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলাম। যে দিন তাঁহারা পলাশবনে আসিলেন, সেই দিন গৃহে পদার্পণ করিয়াই তিনি আমাকে কিরূপ অপ্রতিভ করিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

মেজ বৌ দিদি আমাকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন, "তবে ঠাকুরপো, আমাদের কিসের জন্যে নেমন্ত্রণ করা হ'য়েচে? বলে ছিলে না এজন্মে কখন বিয়ে কর্‌বে না? মনে আছে, আমি বলেছিলুম, বেঁচে থাকি তো দেখ্‌বো! আমার কথা সত্যি হ'লো কি না দেখ। বলি, ক'নে মনে ধ'রেচে তো? কোথায় ক'নের বাড়ী? আমরা একবার দেখ্‌তে পাব না?"

আমি বলিলাম,—"এত ব্যস্ত কেন, বৌ দিদি? আগে ব'স, ঠাণ্ডা হও; দুদিন থাক; তার পর বিয়ে হোক। বিয়ে হ'লে যত ইচ্ছে, তত দেখো।"

"ও ভাই, তোমার কথায় আমি ভুল্‌চি না। বিয়ে হ'লে, আমরা বুঝি আর ইচ্ছেমত দেখ্‌তে পাব। আমাদের বুঝি আর কাযকর্ম্ম নেই। আর তখন আমরা দেখ্‌ব, না তুমি দেখ্‌বে? উঁহুঁ, তা হ'বে না। বলি, ও মঙ্গলা ঠাকুজ্জি, তুই বুঝি ক'নেকে এনে রাখ্‌তে ভুলে গেছিস্। আমরা যে আস্‌চি, তা বুঝি তুই মনের মাথা খেয়ে ভুলে গেছিস্?"

মঙ্গলা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আস্‌তে তর নাই ভাই, গাল্ দিতে আরম্ভ ক'র্‌লে? দেখ্‌চি, বিয়েবাড়ীতে আমাকে আর লুচিমণ্ডা খেয়ে পেট ভরাতে হ'বে না। তোমার গাল্ খেয়েই আমার পেট ভ'রে যাবে! কিন্তু সত্যি বল্‌চি, ভাই, তোমার গাল্ লুচিমণ্ডার চেয়েও মিষ্টি। আজ অনেক দিন তোমার গাল্ খাই নি। বলি, বৌ দিদি, আমাদের কি এমনি ক'রেই ভুলে থাক্‌তে হয়? দাদাঠাকুর তো বেশ ভাল আছে?"

"ভাল আছে বই কি? এই এল ব'লে; দুদিন পরেই তাঁকে দেখ্‌তে পাবি। এখন তুই ক'নে আনার কি কচ্চিস্ বল দেখি? নীগুপীর গিয়ে

একবার ক'নেকে ধ'রে নিয়ে আয়। ক'নেকে বল্‌গে যা, ঠাকুরপো একবার দেখ্‌তে চেয়েচে।"

আমি বলিলাম,—"বল কি, বৌ দিদি? তুমি যে মুস্কিল ক'র্‌লে?"

"মুস্কিল কিসের? আমরাই বুঝি একলা দেখবো আর তুমি চোখ্‌ বুজে থাক্‌বে! তোমার দেখাই দেখা; আমরা তো কেবল চোখেই দেখ্‌'ব; তুমি যে চোখে ও মনে দুইয়ে মিলিয়ে দেখ্‌বে!"

"তা তো আমি অনেকবার দেখেচি আর নিত্যিই দিখ্‌চি। এখন তুমি দেখ্‌তে চাও, সে স্বতন্ত্র কথা।"

"আচ্ছা তাই হ'বে। আমরাই দেখবো, কিন্তু দেখো, ভাই, ক'নে এলে তুমি যেন উঁকি ঝুঁকি মেরো না। আমি মঙ্গলা ঠাকুজ্‌জিকে কড়াকড় পাহারা দিতে ব'লে দেবো। ঠাকুর ব'ল্‌ছিলেন, তুমি ঐ বনের মধ্যে কোন্‌ খানে দিন রাত ব'সে থাক; তুমি সেইখানেই যাও। আ আমার পোড়া মন,— ঠিক্‌ কথাই তো, তুমি যে আজকাল বনের মানুষ বনমানুষ হয়েচো। তোমার আবার ক'নে দেখা কি? তুমি কতকগুলো বই নিয়ে সেইখানে শুয়ে শুয়ে পড়্‌গে, যাও।"

"ইস্‌, বৌ দিদি যে ভারি পণ্ডিত হ'য়ে এসেচ দেখ্‌চি।"

"হব না কেন? যার ঠাকুরপো পণ্ডিত, তার বৌ দিদি পণ্ডিত হ'বে না?" "ঠাকুরপো তো বনমানুষ, ঠাকুরপোর মতনই বুঝি বৌদিদি পণ্ডিত?"

"তা কাযেকাযেই। এখন মঙ্গলা ঠাকুজ্‌জি, তুই ক'নে আন্‌তে যাচ্চিস্‌?"

মঙ্গলা বলিল, "যাব না কেন? এই চল্লুম। কিন্তু ক'নে যদি আসে, তা হ'লেই তো? আজ পনর দিন সাধ্যিসাধনা ক'রে তাকে তো একটীবারও এ বাড়ীতে আন্‌তে পাল্লুম না।"

"আচ্ছা, তুই ক'নেকে ব'ল্‌গে যা, আমাদের এখানে জুজুর ভয় নেই। আর জুজু থাক্‌লেও, দিনের বেলায় সে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তবে তার আর ভয় কিসের? তাকে আরও বলিস্‌ সে যে সম্পর্কে আমার বোন্‌ হয়! যোগমায়ার মা আমার হরপিসীর সাক্ষাৎ জা রে! আমি ঠাকুরের কাছে যোগমায়ার বাপের কথা শুনে তখনি সব সম্পর্ক ব'লে দিয়েছিলুম।"

মঙ্গলা বলিল,—"বটে? সত্যি না কি?" কিন্তু সংবাদ শুনিয়াই সে জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ওমা মা, আর শুনেছ, যোগমায়া যে আমাদের মেজ বৌ দিদির কি রকম বোন হয় গো!"

জননী তো মঙ্গলার কথা তিন চারি বারেও শুনিতে পাইলেন না। মতি তাঁহার কোলে চাপিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। জননী দেবী তাহাকে জোর করিয়া কোলে রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু সে কোন-মতেই কোলে থাকিবে না। মতির চীৎকারে, মঙ্গলার উচ্চস্বরে, ও জননীর ভর্ৎসনা শব্দে গৃহখানি শব্দায়মান হইতেছিল। আমিও সুযোগ বুঝিয়া মেজ বৌ দিদির বিদ্রূপবাণ হইতে মুক্তি লাভের আশায় বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আসিয়াই দেখি, নীরদা ও চুনী ভিত্তিবিলম্বিত চিত্রপটগুলি মনোযোগ সহকারে দেখিয়া বেড়াইতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "নেরো, চুনী, ভাল আছিস্?"

আমার স্বর শুনিয়াই দুইজনে দৌড়িয়া আসিয়া আমার দুই হাত ধরিল এবং অতিশয় বিনয় ও ব্যগ্রতা সহকারে বলিতে লাগিল, "কাকাবাবু, আমাদের একবার ঐ বনের মধ্যে নিয়ে চল না। যতীনকাকা ওর মধ্যে বেড়াতে গেল; আমরাও যাচ্ছিলুম, কিন্তু যতীনকাকা আমাদের যেতে দিলে না; বল্লে, বিকেল বেলায় তোদের নিয়ে যাব। কাকাবাবু, তুমি এখনি একবার আমাদের বন দেখিয়ে নিয়ে এস না?"

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা, আয় আমার সঙ্গে।" এই বলিয়া দুইজনকে দুই হাতে ধরিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।"

নীরো ও চুনীর নানা প্রকার অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমি তাহাদিগকে বনের কিয়দংশ দেখাইয়া লইয়া আসিলাম। পরে গৃহমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে দেখিতে পাইলাম, একটী ছায়াসমন্বিত মনোরম স্থানে, কতিপয় পুষ্পিত শাল বৃক্ষের তলে এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপরে যতীন্দ্র ভায়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে। যতীনকে দেখিয়াই বলিলাম, "কি, যতীন, বাড়ীতে না গিয়ে সোজাসুজিই যে বনের মধ্যে ঢুকেচো! মুখ হাত ধুলে না, স্নান কল্লে না, কিছু খেলে না?"

"এই যাচ্ছি; এখনও তত বেলা হয় নাই; আর একটু দেরী হ'লেও তত ক্ষতি নাই। কিন্তু যা' হো'ক, দাদা, বড় সুন্দর যায়গাতেই আপনি বাড়ী ক'রেচেন। আমি তো এমন মনোরম স্থান কোথাও দেখি নাই। এতবার এ দেশে এসেচি, কই একবারও তো পলাশ বনটা দেখে যাই নাই। এত নিকটে যে এমন স্থান থাক্‌বে, তা তো আমি একটী দিনও ভাবি নাই।

আমি ঐ পাহাড়টার উপরে উঠেছিলাম। আহা, ওর উপর থেকে কি সুন্দরই শোভা! একটী ছোট নদী ওর তলে ব'য়ে যাচ্ছে। আমি সেই নদীটি ধ'রে বনের মধ্যে অনেক দূর বেড়িয়ে এলাম। আমার তো এখান থেকে উঠ্‌তে মন যাচ্ছে না।"

"হাঁ, জায়গাটি খুব মনোরম বটে; তুমি এখানে কিছুদিন থাক; তোমার সঙ্গে দিনকতক খুব সুখে কাল কাটানো যাবে। এখানে আমার বড় একলা একলা ঠেকে। কারুর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতে পাই না; কেবল মাঝে মাঝে বই পড়ি আর এদিক্ ওদিক্ বেড়িয়ে বেড়াই। তোমাদের বি, এ, পরীক্ষার ফল এখনও বেরোয় নাই?"

"না; শীগ্‌গীর বেরুবে। পাশ হ'বার তো অনেকটা আশা করি। তবে এখন কি রকম হয়, তা বল্‌তে পারি না।"

"হ'বে আর কি? ভালই হ'বে। এখন চল বাড়ী যাওয়া যাক্। এই ছেলে-গুলো এসে অব্‌ধি এখনও কিছু খায় নাই। আর তুমিও কিছু খাবে চল।"

যতীন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া আমার সঙ্গে চলিল।

পথিমধ্যে কেশবের সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল "মহাশয়, আমি তো আপনাকে খুঁজে খুঁজে হায়রান হলাম। ঘণ্টা খানেক আপনার, যতীনবাবুর ও এই ছেলে দুটীর তল্লাসে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ইনারা এখনও কিছু খায় নাই। আর মা কিসের তরে তো আপনাকে ডাক্‌চেন। মঙ্গলা বল্লেক, তিনি উপরে আপনার পড়বার ঘরটাতে বসে আছেন।"

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিলাম। পড়িবার ঘরে গিয়া দেখি, সেখানে মা নাই; কিন্তু এক ঘর মেয়ে ছেলে। মেজ বৌদিদি, বড় বৌদিদি, তাঁহাদের দাসীদ্বয়, আমাদের শ্রীমতী মঙ্গলা, প্রতি-বাসিনী দুই একটী নবীনা, ভূদেব, সুশীলা, ভাবিনী ও যোগমায়া! সর্ব্বনাশ! সব মেজবৌদিদির চাতুরী! আমাকে দেখিয়াই মেজবৌ, বড়বৌ হাসিয়া উঠিলেন। মঙ্গলা ও দাসীদ্বয়ও সেই হাস্যে যোগদান করিল। আমি ব্যাপার দেখিয়া চম্পট দিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; কিন্তু মেজবৌদিদি আমার ভাবভঙ্গী বুঝিতে পারিয়া নিমেষের মধ্যে আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আ ঠাকুরপো, যাও কোথায়? এমন শোভা দেখ্‌তে মন যায় না? একবার চোখ খুলে দেখ দেখি! কেবল বন জঙ্গল আর পাহাড় দেখে কি কখন এমন চোখ জুড়োয়? এই দেখ

না, খোকাবাবু (মতি) এরই মধ্যে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেচে। যোগমায়াকে দেখে খোকা বল্লে,—"মা এ কে ?" আমি বল্লুম,—"তোর কাকী মা ?" "মা আমি কাকীমার কোলে তাপ্‌বো।" এই দেখ মা, খোকা বাবু সেই অবধি তার কাকীমার কোল দখল ক'রে বসেচে। ছেলে নারায়ণ, আপনার লোক দেখেই চিন্তে পেরেচে।—বলি ঠাকুরপো, তুমি তো আর মেয়েমানুষ নও ; তুমি এত লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ কেন ?"

আমি বল্লুম,—"নীরো ও চুনীকে বন দেখাতে নিয়ে গেছ্‌লুম।"

বৌদিদি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া যোগমায়াকে বলিল,—"ও ভাই, তুমিও একবার চোখ দুটী তোল দেখি। ঠাকুরপো আমার বনমানুষ নয়, জুজুও নয় ; কার্ত্তিকের মতন ছেলে। বিদ্যের জাহাজ। এক দণ্ডের তরেও যে তুমি এঁকে চোখের আড়াল ক'র্‌বে না, তা তো বুঝ্‌তেই পাচ্চি। এখন একবার আমাদের সাম্‌নে ওঁকে শুভদর্শন কর দেখি ? দেখে একবার আমাদের পোড়া চোখ জুড়িয়ে যাক্।"

আমি বৌদিদির হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম ; কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতেছিলাম না। সহসা এই সময়ে পিতৃদেবের আহ্বান শুনিতে পাইলাম।

পিতৃদেবের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র, বৌদিদি হাত ছাড়িয়া দিলেন। আমিও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম এবং তদ্দণ্ডেই ঊর্দ্ধশ্বাসে নীচে পলাইয়া আসিলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনেরা প্রায় সকলেই আসিয়া পঁহুছিলেন। আসিলেন না কেবল বড় দাদা ও বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ। বড়দাদা ছুটী পান নাই বলিয়া আসিতে পারিলেন না। আর সত্যেন্দ্র শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসিল না। সত্যেন্দ্র না আসাতে আমি বড় দুঃখিত হইলাম। তাহার উপর আমার একটু অভিমানও হইল। কিন্তু তাহার পত্রখানি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলাম, সে বাধ্য হইয়াই আসিতে পারিল না। আজ প্রায় ছয় মাস কাল সত্যেন্দ্র ম্যালেরিয়া জ্বরে কষ্ট পাইতেছে ; তাহার শরীর এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। ডাক্তারেরা তাহাকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তাই সে

এক বৎসরের অবকাশ লইয়া কিছুদিন এলাহাবাদে ও কিছুদিন অন্যত্র বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। সত্যেন্দ্র অবকাশের জন্ত প্রার্থনা করিয়াছে। এখনও প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। পূর্ণ হইলেই সে এলাহাবাদ যাত্রা করিবে। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, সত্যেন্দ্রের এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। সুরমারই সহিত তাহার বিবাহ হইবার কথা বার্ত্তা স্থিরতর হইয়া আছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রের শরীর অসুস্থ এবং কিছুদিন পূর্ব্বে সুরমারও জননী-বিয়োগ হওয়াতে, তাহাদের বিবাহ কিয়ৎকালের জন্ত স্থগিত আছে। যাহা হউক, সত্যেন্দ্র বিবাহ বাড়ীতে উপস্থিত হইতে না পারিলেও, পত্রে হৃদয়ের সহিত নবদম্পতীর সুখ ও মঙ্গল কামনা করিয়াছিল এবং যোগমায়ার ও আমার জন্ত যথাযোগ্য উপহার প্রেরণ করিয়াছিল।

বিবাহের লগ্ন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; অবশেষে একদিন আসিয়া পড়িল এবং যোগমায়াকে ও আমাকে পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ করিয়া নিমেষের মধ্যে অতীতের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। যোগমায়ার সহিত পরিণীত হইয়া আমার মনে হইতে লাগিল, যোগমায়া যেন আমার কত কালের পরিচিতা; যোগমায়া যেন আমার কতকালের পরিণীতা পত্নী; যোগমায়া যেন চিরকালই আমার ছিল; তাহার জীবনের সহিত আমার জীবন যেন কোন্ দূর-সুদূর-স্মরণাতীত যুগে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে; সে গ্রন্থি যেন এখনও তেমনই অটুট ও দুশ্ছেদ্য! ব্যাপার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সবই যেন মায়ার ক্রীড়া, সবই যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেহের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম যোগমায়াতে ও আমাতে যেন কিছু মাত্র প্রভেদ নাই—আমরা উভয়েই অভিন্নদেহ! মনের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম আমরা উভয়েই একমন! আত্মার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম আমরা উভয়েই অভিন্নাত্মা! আশ্চর্য্য ব্যাপার! অদ্ভুত কাণ্ড! যোগমায়ার সহিত আমার এই বিস্ময়কর মিলন একদিনে—এক মুহূর্ত্তে কিরূপে সংঘটিত হইল, তাহা কোন মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

বিবাহের পর বরবধূর বিদায়। কন্যাবিদায়-রূপ স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন ব্যাপার গৃহে গৃহে নিয়তই অনুষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে নূতন কথা আর কি বলিব? তবে এই স্থলে এই মাত্র উল্লিখিত হইতে পারে যে, কন্যা বিদায় করিবার কালে গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় সংযতচিত্ত ব্যক্তিও বালকের মত রোদন করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং যখন সকলেই নয়নজলে

ভাসিতেছিল, তখন ভূদেব ভায়া বিজ্ঞের ন্যায় আশ্বাসসূচক স্বরে পিতা-মাতাকে বলিয়াছিল, "মা, বাবা, তোমরা কাঁদ্‌চ কেন? আমি দিদির সঙ্গে যাব। তোমাদের ভাবনা কি?" বালকের এই কথা শুনিয়া অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "দুঃখের উপর হাসি" যাহাকে বলে, ভূদেব ভায়া তাহারই অভিনয় করিয়াছিল।

বধূকে লইয়া আমি গৃহে উপস্থিত হইলাম। জননীদেবীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহার মনের সাধ এত দিনে পূর্ণ হইল। তিনি প্রায় সর্ব্বক্ষণই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে কতিপয় দিবস আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা বগলাপিসীও নিমন্ত্রিতা হইয়া পলাশবনে আসিয়াছিলেন। তিনি বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই মাকে বলিয়াছিলেন,—"দেখ্‌লে বৌ, আমার কথা সত্যি হলো কি না? আমি বলেছিলুম, তুমি দেবুর জন্য ভাবচো কেন? দেবু তো তোমার তেমন ছেলে নয়; অত লেখাপড়া শিখেচে; জ্ঞানমান হ'য়েচে; ও কি কখন তোমার মনে কষ্ট দিতে পারে? আহা, দেবু বড় শান্ত শিষ্ট ছেলে গো। আমাদের সকলকেই বড় ভক্তি করে।"

কথা শুনিয়া আমি মনে মনে বলিয়াছিলাম,—"তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু, বাপু, আগে যোগমায়াকে দেখে দেবু এই পলাশবনে নিশ্চিত ঘর ফাঁদায় নাই।"

বৌদিদিদের জ্বালাতনে আমি সর্ব্বদাই অস্থির হইতাম। কিন্তু আমি তাঁহাদের বিদ্রূপ বাণের ভয়ে বনরূপ দুর্গে আর আশ্রয় লইতাম না। যোগমায়াকে দেখিবার ও তাহার সহিত কথোপকথন করিবার সুযোগ আমি সর্ব্বদাই খুঁজিয়া বেড়াইতাম। দেখার সুযোগ প্রায়ই ঘটিত; কিন্তু কথোপকথনের সুযোগ বড় একটা ঘটিত না। এই কারণ অনেক সময় বড় ক্ষুব্ধ হইয়া থাকিতাম।

বিবাহের গোল ক্রমে কমিতে লাগিল। দূরস্থিত আত্মীয় কুটুম্বেরা একে একে বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। যোগমায়াও মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে যাইয়া দুই চারি দিবস থাকিত। আবার আমাদের বাটী আসিত। আমি অল্পে অল্পে যোগমায়ার অন্তরের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। কিন্তু সে পরিচয়ে প্রথমে ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বিবাহের পর আমাদের দেশে প্রেম জন্মে। সুতরাং বিবাহ করিয়াই কেহ বলিতে

পারেন না, তিনি দাম্পত্য সুখের অধিকারী হইবেন কি না। এই সুখ অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত, সকলকেই সংশয়দোলায় দুলিতে হয়। এই সংশয়ের কালটি বড়ই যন্ত্রণাজনক। তবে আশাটুকু মাত্র সুনিপুণ শিল্পী হইলে আমরা মনোমত দেবতা গড়িয়া লইতে পারি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মাসী-মা ও রাজু দিদি স্বদেশে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু জননীদেবীর বিশেষ অনুরোধ ক্রমে তাঁহারা পলাশবনে আরও কিছুদিন থাকিতে সম্মত হইলেন। যতীন্দ্র ভায়া তো পরীক্ষার ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত আমার নিকটে থাকিতে স্বীকৃতই হইয়াছিল। কিন্তু ভায়াকে গৃহে বড় একটা দেখিতে পাইতাম না। ভায়া আমার বনের মধ্যে পাহাড়ের উপরে ও নিকটস্থ কৃষকগ্রাম সমূহে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত এবং নীরো, সুশীলা, ভূদেব প্রভৃতি বালকবালিকাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সখ্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে নানা স্থান দেখাইয়া লইয়া বেড়াইত। নীরো ও সুশীলার মুখে আমি তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রতিদিনই শুনিতে পাইতাম এবং সে বনের মধ্যে বসিয়া তাহাদিগকে পেন্সিলে যে সকল সুন্দর সুন্দর পশু পক্ষী, পুষ্প ফল, বৃক্ষলতার ছবি আঁকিয়া দিত এবং ছোট ছোট সরল কবিতা লিখিয়া দিত, তাহাও আমি দেখিতে পাইতাম। যতীন্দ্র এইরূপে বাহিরে বাহিরেই প্রায় সমস্ত দিন কাটাইত; প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ীর মধ্যে বড় একটা আসিত না।

একদিন বৈকালে, আমি পাঠ-গৃহে বসিয়া পাঠে নিমগ্ন আছি, এমন সময়ে যোগমায়া কি প্রয়োজন বশতঃ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুশীলা এবং ভূদেবও আসিয়া উপস্থিত হইল। ভূদেব ও সুশীলাকে দেখিয়া আমি বলিলাম, "কি গো, খবর কি?"

সুশীলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "খবর আর কি! এই একবার দিদির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এলুম।"

আমি বলিলাম, "বেশ ক'রেচো। আজ যতীনের সঙ্গে তোমরা কোন্ দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে।"

সুশীলা বলিল, "আজ আমরা বেশীদূর যেতে পারি নি। ঐখানে ব'সেছিলুম।"

"কেন? যতীন আর কি কচ্ছিল?"

"যতীনবাবু আজ আমাকে একটা ছবি এঁকে দিয়েচেন, আর ভূদেবের জন্তে একটী কবিতা লিখে দিয়েচেন।" এই বলিয়া সুশীলা ভূদেবের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "কিসের কবিতা? আর কি ছবি দেখি।"

সুশীলা ছবি ও কবিতা দেখাইবার পূর্ব্বে হাতের মধ্যে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া, বলিতে লাগিল "আজ, ভূদেব, তোমার গোলাপ গাছের একটী বড় ফুল তুলে তার পাপ্ড়ীগুলি নষ্ট ক'রেছিল। তাই 'না দেখে যতীনবাবু বল্লে 'ভূদেব, তুমি ফুলটি নষ্ট করে ভাল কর নি। এস আজ তোমার জন্তে একটী কবিতা লিখে দি।' এই বলে তিনি একটী গাছের তলায় ব'সে এই কবিতাটি লিখ্লেন। আমি বল্লুম, 'যতীনবাবু আমায় একটী ছবি এঁকে দাও না?' তাই শুনে যতীনবাবু তোমার ফুলগাছের ও ভূদেবের এই ছবিটী এঁকে দিয়েচেন।" এই বলিয়া আনন্দময়ী সুশীলা হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে সেই ছবি ও কবিতাটি দেখাইল।

আমি বলিলাম, "বেশ ছবি হয়েচে। কিন্তু ভূদেবের চুলগুলো এই রকম উস্কো খুস্কো না কি?"

সুশীলা ও যোগমায়া ছবি দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। ভূদেব অপ্রতিভ হইয়া তাহার বড়দিদির পশ্চাতে আশ্রয় লইল।

আমি বলিলাম "সুশীলা, ছবি তো দেখ্লাম, এখন যতীন কি কবিতা লিখেচে পড় দেখি শুনি।"

সুশীলা পড়িতে আরম্ভ করিল :—

"ফুলের উক্তি।"

১

ওহে শিশু ভাই,
ভালবাস তুমি মোরে,
কাঁদহ আমার তরে,
একবার মোরে পেলে
নাচ দুই হাত তুলে;
বড় প্রীতি পাই।

২

কিন্তু ওহে যবে,
গাছের ডালেতে বসি,
মনের আনন্দে হাসি,
কেন মোরে তুলে ফেলে
ছিঁড়িয়া আমার দলে,
নাশ হাসি তবে?

৩

ভাই হে তোমার,
হাসিটি কাড়িয়ে ল'য়ে,
তার স্থানে কান্না দিয়ে,
যদি কেহ মজা দেখে,
ভাল কি বাসিবে তাকে,
বল দেখি সার ?

৪

তবে, ভাই, কেন,
বেচারী ফুলের প্রাণ,
কর তুমি খান খান,
হাসিটি কাড়িয়ে লও,
তার স্থানে কান্না দাও ?
ভাল কিহে হেন ?"

সুশীলার মুখে কবিতাটি শুনিয়া আমি সানন্দচিত্তে বলিলাম, "যতীন তো বেশ কবিতা লিখেছে, সুশীলা ?"

সুশীলা কিছুই উত্তর দিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে যেন ঈষৎ ভাবিয়া বলিল,—"আচ্ছা, দেবেন বাবু, তবে আমরা যে রোজ ঠাকুর পূজোর জন্যে ফুল তুলি, তা তো দোষ ?"

আমি এ প্রশ্নের যে কি সদুত্তর দিব, সহসা ঠিক করিতে পারিলাম না। একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, "ঠাকুর দেবতার পূজোর জন্যে ফুল তোলা দোষের নয়। ফুল তুলে মিছেমিছি নষ্ট করাই দোষ। এই শোন না, আমাদের দেশের একজন কবি বলেচেন :—

'কিন্তু রে কুসুম, আর্য্যসুতগণে,
দিয়াছে তোমারে দেবতা চরণে,
সেই সে তোমার ঠিক্ ব্যবহার,
এই কথা আমি ভাবি মনে মনে
এমন সুন্দর এমন কোমল
দেবপদ ভিন্ন কোথা যাবে বল।'

আমার উত্তর শুনিয়া সুশীলার মুখ যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

সুশীলার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার আর কোনও বিষয় নাই দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম,—"সুশীলা তোমার দিদির তো একটী বর জুটে গেল,—এখন তোমার একটী রাঙ্গা বর জুটলেই আমরা বড় সুখী হই।"

সুশীলা তাই শুনিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া হাসিতে হাসিতে আমার হাত ধরিয়া মৃদু মধুর অস্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল,—"কেন আমি যতীন বাবুকে বিয়ে ক'র্‌বো।"

কথা শুনিয়াই যোগমায়া ও আমি আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ে চমকিত

হইয়া উঠিলাম। আমি প্রফুল্লমুখে বলিলাম, "অ্যাঁ, যতীন তোমাকে কিছু বলেচে না কি, সুশীলা ?"

"বলেচে বই কি ? যতীনবাবু আমাকে বল্‌ছিল, 'সুশীলা আমায় বে' কর্‌বি ?' আমি বল্লুম, 'ক'র্‌ব'।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যতীনকে তোমার বেশ পছন্দ হ'য়েচে ?"

সুশীলা বলিল, "হয়েচে।"

এই কথা শুনিবামাত্র আমি সুশীলাকে সবলে তুলিয়া বারাণ্ডায় বাহির হইয়া বলিলাম, "ওমা, ও মাসিমা, ওগো, আর একটী আমাদের বৌ হ'য়েচে গো। সুশীলা যতীনকে বিয়ে ক'র্‌বে ব'লেচে, শুন্‌বে এস।" এই আকস্মিক ও অসম্ভাবিত বিপৎপাতে সুশীলা অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া আমার হস্ত-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আশায় প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পরিশেষে কোনও রূপে কৃতকার্য্য হইয়া আলুলায়িত বেশে ও বিগলিত কুন্তলে হস্ত হইতে নিপতিত সেই কবিতা ও ছবিটি পর্য্যন্ত তুলিয়া লইবার অবসর না পাইয়া, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল। ভূদেব ভায়া ভগিনীকে কোনও গুরুতর বিপত্তিতে বিপন্না মনে করিয়া তৎপূর্ব্বেই বেগে চম্পট দিয়াছিল। ভায়ার বোধ হয় এইরূপ কোনও নীতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকিবে :—"যঃ পলায়তে, স জীবতি।"

হাসিতে হাসিতে আমাদের তো দেহের বন্ধন খসিবার উপক্রম হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মা, মাসিমা, বড়বৌ, মেজবৌ, রাজুদিদি প্রভৃতি উপরে আসিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সেই ছবি ও কবিতা দেখাইয়া সমস্ত ব্যাপার বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া মা গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা, কি আশ্চর্য্যি মিলন গো ! এই যে এই মাত্তর দিদির সঙ্গে আমি এই বিষয়ে কথা কচ্ছিলুম !"

মেজবৌদিদি তাহা শুনিয়া বলিলেন, "মাসিমা, আর কি দেখ্‌চো বাছা, তোমার ছেলের বে'তে লুচিমণ্ডা না খেয়ে আমরা আর যাচ্চি না।"

মাসিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাই হোক্ মা, তাই হোক্ মা; এত আনন্দেরই কথা।"

এই গোলমালের সময় বাবা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমিও কালবিলম্ব না করিয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম।

———

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মেজবৌদিদি যতীন ভায়াকে লইয়া কতিপয় দিবস আবার খুব হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতীন সহজে অপ্রতিভ হইবার ছেলে ছিল না। দুই জনে সমানে সমানে পড়িয়াছিল। একদিন যতীন ও আমি পড়িবার ঘরে বসিয়া সাহিত্যালাপ করিতেছি, এমন সময়ে মেজবৌদিদি, যোগমায়ার সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। যতীন যোগমায়াকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল; কিন্তু আমি তাহাকে নিবারণ করিলাম, তাহা দেখিয়া মেজবৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো, তুমি যতীনকে আট্‌কিয়ে রাখ্‌বে কেন? ওর যে সময় নষ্ট হবে।"

যতীন বলিল, "কি রকম?"

মেজবৌদিদি বলিলেন, "কি রকম! ন্যাকা আর কি! ভাই আমার যেন কিছুই জানেন না! সুশীলা, ভূদেব এসেচে যে, সুশীলার সঙ্গে বেড়াতে যাবে না।"

"যাব বই কি? কিন্তু কেবল সুশীলারই সঙ্গে তো আর বেড়াই না। সুশীলা, ভূদেব আর আমাদের বাড়ীর ছেলেরা সকলেই তো সঙ্গে যায়।"

"তা তো যায়; কিন্তু সুশীলারই সঙ্গে আজ কাল আসল বেড়ানোটা হ'চ্চে।"

"কি রকম?"

"কি রকম! যেন কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চেন না! বলি, ছেলেমানুষ পেয়ে ফুস্‌লে ফাস্‌লে বে কর্‌বার যোগাড় করাটা তোমাদের পৌরুষের কায না কি? এই তোমার দাদা তো একটী মেয়েকে ফাঁদে ফেলে নিজস্ব ক'রে ফেল্‌লেন। তুমিও দাদার ভাই কি না, তাই তুমিও আবার আর একটীর যোগাড়ে ব'সেচো।"

আমি বলিলাম, "তুমি আমায় এমন কথা বলো না, বৌদিদি! এই তোমার সাম্‌নেই তো যোগমায়া র'য়েচে। একে জিজ্ঞাসা কর দেখি, বে' হবার আগে একটী দিনও আমি যোগমায়ার সঙ্গে কখনও কথা ক'য়েছিলাম? যোগমায়া তো বে' হ'বার আগে কতবার আমাদের বাড়ী এসেছিল? কই একদিনও আমি যোগমায়াকে দেখেছিলাম? আমি বনের মধ্যেই তো সমস্ত দিন থাক্‌তাম।"

মেজ বৌ দিদি বলিলেন, "না, যোগমায়ার সঙ্গে কোন কথা কও নেই;

আর যোগমায়াও তোমার সঙ্গে কোন কথা কয় নেই। তা সকলই সত্যি বটে। কিন্তু গাছের তলায় তুমি ঘুমিয়ে পড়্‌লে যোগমায়া এসে তোমায় উঠিয়ে দিত। তোমার মুখ ধোবার জন্যে বাড়ী থেকে জল এনে দিত আর তুমি ঘাম্‌তে আরম্ভ কর্‌লে আঁচল দিয়ে বাতাস দিত। কথা ক'বার দরকার্ কি ভাই? কথা নেই বা কইলে?"

যোগমায়া অপ্রতিভ হইয়া অঙ্গুলি দ্বারা মেজবৌদিদির গা টিপিতে লাগিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তুমি তাই শুনেচো বুঝি?"

"যাই শুনি; বলি এখন নেই তোমাদের বে' হ'য়ে গেচে। যা হ'বার তা তো হ'য়েচে; এখন আর কেউ তার দোষ ধ'র্‌বে না। কিন্তু যতীন ভাই, তুমি যে সুশীলাকে বে' ক'র্‌বে বলেচো, ফুস্‌লে ফাস্‌লে তার মনটি কেড়ে নিয়েচো, যদি কোনও গতিকে সুশীলার সঙ্গে তোমার বে' না হয়, তা হ'লে তো মেয়েটার মাথা খেয়ে ফেল্‌চো দেখ্‌চি।"

যতীন বলিল, "বে' হবে না কেন? এক শ বার হ'বে! আমি সুশীলাকে বে' কর্‌বো; আর সুশীলাও আমাকে বে' কর্‌বে বলেচে।"

"কিন্তু ছেলেমানুষের মন, যদি তার মন ঘুরে যায়?"

"যায় তো যাবে; তার জন্যে আর ভাবনা কি? আমার মন তো ঠিক্ থাক্‌লেই হ'লো। সুশীলা যদি বে' কর্‌তে চায়, আমি পেছ্‌পা হ'ব না।"

"বেশ, বেশ। খুব কবিতা লিখ্‌তে শিখেছিলে যাই হো'ক্। তোমার মতন আর গোটা কতক কবি এ অঞ্চলে থাক্‌লে দেখ্‌চি আইবুড়ো মেয়েদের মা বাপকে পাত্র খুঁজে খুঁজে হায়রান্ হতে হ'ত না। বেশ ভাই শিগ্‌গীর বে'টা ক'রে ফেল; আমরাও দেখে যাই। আমাদের তো আর বেশী দিন থাক্‌বার যো নেই। কই তুমি একদিন আমাদের বন জঙ্গল পাহাড় দেখিয়ে নিয়ে এলে না? আমরা চ'লে গেলে, দেখাবে না কি? আর তুমি যে কোন্ সতীর বিষয়ে কি একটা কবিতা লিখেচো ব'ল্‌ছিলে? সে দিন আমাদের অপ্‌সর ছিল না বলে তোমার কবিতা শুন্‌তে পাল্লুম না। তা' আমাদের আর শোনানো হ'বে না, না কি?"

যতীন বলিল,—"বেশ কথা আজই তোমরা বেড়াতে চল। আজই তোমাদের সব দেখিয়ে আন্‌বো আর সেই পাহাড়ে ব'সে সেই কবিতাটীও শোনাবো।"

মেজবৌদিদি যোগমায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি ভাই, আজই যাবে? বিকেল বেলাতেই যাওয়া যাক্, চল। ঠাকুর এখন বাড়ীতে নেই। আর সকাল বেলাতে কাজের ঝঞ্ঝাটে আমাদের তো মরবারও অপ্‌সর থাকে না! চল, রাজু ঠাকুজ্জি ও বড়দিদিকে বলি গে।" এই বলিয়া মেজবৌ-দিদি, যোগমায়ার সহিত নীচে গমন করিলেন।

আমি বলিলাম "কি বিষয়ের কবিতা লিখেচো, যতীন?"

"সিন্দুরে পাহাড় সম্বন্ধে।"

"সিন্দুরে পাহাড়? সিন্দুরে পাহাড় কোথায়?"

যতীন বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সিন্দুরেপাহাড় জানেন না? কি আশ্চর্য্য! এই যে আপনার বাড়ীর উত্তরে ছোট কাল পাহাড়টা, যার নীচে যমুনা নদী ব'য়ে যাচ্চে।"

"ওটার নাম সিন্দুরে পাহাড় না কি? কে জানে ভাই অত? আমি জানি একটা কাল পাহাড়। রোজই তো ওর উপরে বেড়িয়ে আসি; কিন্তু নাম টাম তো একদিনও শুনি নাই। তুমি নাম শুন্‌লে কোথায়?"

"কেন এই পলাশবনেরই লোকের কাছে।

ঐ পাহাড় সম্বন্ধে একটী সতীর অতি সুন্দর গল্প আছে। আমি সেই গল্প শুনে ঐ পাহাড়ের উপরেই ব'সে, এক কবিতা লিখেচি। মেজ বৌদিদি সেই কবিতারই কথা বল্‌ছিলেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তুমি দেখ্‌চি আমাদের ওয়ার্ড-স্বার্থ। ওয়ার্ড-স্বার্থও এই রকম বেড়াতে বেরিয়ে মনের মধ্যে কোনও ভাবের উদয় হ'লে পকেট থেকে কাগজ পেন্‌শিল বা'র করে কবিতা লিখ্‌তে বস্‌তেন। তাঁর অনেকগুলি কবিতা এই রকম ক'রে ঘরের বাইরেই লেখা হ'য়েছিল।"

"হাঁ, তা জানি। কিন্তু কার সঙ্গে কার তুলনা ক'র্‌চেন! ওয়ার্ডস্বার্থ ছিলেন স্বর্গের কবি। জগতের মধ্যে একমাত্র তিনিই আদর্শ কবি-জীবন যাপন করেচেন।"

"তিনি যে আদর্শ কবি-জীবন যাপন ক'রেচেন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে জগতের মধ্যে তিনিই একক ন'ন।"

যতীন্দ্র কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "আর কে?"

আমি বলিলাম "আমাদের দেশে, এই ভারতবর্ষেই এরূপ কবি ছিলেন।"

"আমাদের দেশে ছিলেন? কে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম "কবিকুলগুরু মহর্ষি বাল্মীকি।"

"বাল্মীকি!"

যতীন্দ্রের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "তুমি কি মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ পড় নাই?"

যতীন্দ্র বলিল "ছেলে বেলায় তো একবার কৃত্তিবাসের রামায়ণ প'ড়েছিলাম। তা'তে তো লেখা আছে, বাল্মীকি রত্নাকর ডাকাত ছিলেন। পরে রাম নাম ক'রে তার পাপক্ষয় হওয়াতে ব্রহ্মা এসে তাঁকে রামায়ণ লিখ্‌তে বলেন।"

আমি বলিলাম,—"মহর্ষির মূল রামায়ণে রত্নাকরের কোনই উল্লেখ নাই। তিনি রত্নাকর ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহও আছে। আর যদিই ধর, তিনি প্রথম জীবনে কুকর্ম্মী রত্নাকর ছিলেন, তা হ'লেও মনে রাখ্‌তে হ'বে, আমি রত্নাকরের কথা ব'ল্‌চি না। আমি মহর্ষি বাল্মীকিরই কথা ব'ল্‌চি।"

"আচ্ছা, বাল্মীকি কি প্রকার জীবন যাপন ক'রেছিলেন?"

"বাল্মীকি মহর্ষির জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি সেই সত্য, সুন্দর, মহান্, এক ও অদ্বিতীয় মহাপুরুষের ধ্যানধারণায় জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাপন করিয়া গিয়াছেন। লোকালয়ের বহির্ভাগে, মহারণ্যের মহান্ সৌন্দর্য্যের মধ্যে, শান্তিপূর্ণ আশ্রমে বাস করিয়া, কতিপয় অনুরূপ শিষ্যের সহবাসে, তিনি কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে যে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের লীলা হইয়াছিল, তাহা আমি মুখে প্রকাশ করিতে অক্ষম। সেই সৌন্দর্য্যের কণিকা মাত্র ধারণ করিতে গিয়া আমার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। জগৎপূজ্যা সীতাদেবী যাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, মহাত্মা রামচন্দ্র, ধীমান্ লক্ষ্মণ ও ভ্রাতৃভক্ত ভরত যাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভাবলে আজিও ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্যে জাজ্বল্যমান থাকিয়া সমানভাবে পূজ্য হইতেছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যজ্ঞানের কথা কি আর বলিতে হয়? রামায়ণ কিরূপে প্রথমতঃ রচিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা তো তুমি জান?"

"না।"

"তবে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মহর্ষি স্বভাবকবি ছিলেন। সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও পূর্ণ পবিত্রতার একমাত্র আধার মহান্ পরমেশ্বরের আরাধনা

করিতে করিতে, জগতে তাঁহার এই পূর্ণতার অভিনয় দেখিবার জন্ত, মহর্ষির হৃদয়ে স্বভাবতঃই এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। জগতের সমস্ত মহা-কবিরই হৃদয়ে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু জগৎ অপূর্ণ; বোধ হয়, সেই পূর্ণ মহাপুরুষের ইচ্ছাই এই প্রকার। কিন্তু অনেকে জগতে অপূর্ণতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হয় এবং সতর্ক না হইলে জগৎবিদ্বেষী ও মানববিদ্বেষী হইয়া পড়ে। মহর্ষিরও জীবনে এক সময়ে এই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সংসারের মধ্যে কোথাও পূর্ণতা না দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবর্ষি ত্রিলোক ভ্রমণ করিতেন; সুতরাং বাল্মীকি ইহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভগবান, আপনার তো কোন স্থান অগম্য ও অবিদিত নাই; আপনি বলিতে পারেন, জগতে এমন কোনও ব্যক্তি আছেন, যিনি পূর্ণ, আদর্শস্থানীয় ও সর্ব্বগুণোপেত।' নারদ বাল্মীকির মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'মহর্ষে, আপনি যেরূপ পুরুষের কথা বলিলেন, জগতে তদ্রূপ পুরুষ একান্ত দুর্লভ। কিন্তু বর্ত্তমান কালে, এইরূপ এক মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র। তিনি অযোধ্যার রাজা ও মহারাজ দশরথের পুত্র। এই বলিয়া তিনি রামচন্দ্রের জন্ম হইতে তাৎকালিক ঘটনা পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত করিলেন। ভগবান রামচন্দ্র এই সময়ে লঙ্কা হইতে সীতা সমুদ্ধার পূর্ব্বক অযোধ্যার রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া প্রজাপালন করিতেছিলেন।

"দেবর্ষি নারদের মুখে রামচন্দ্র ও সীতাদেবী প্রভৃতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাল্মীকির ক্ষুব্ধ হৃদয় আনন্দ ও উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে এক অলৌকিক দীপ্তি নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি এই সংসারক্ষেত্রে যেন স্বর্গরাজ্যের অভিনয় দেখিতে পাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবর্ষি নারদ স্থানান্তরে গমন করিলেন। বাল্মীকিও প্রাত্যহিক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মানুরোধে প্রিয়শিষ্য ভরদ্বাজের সমভিব্যাহারে তমসার স্বচ্ছজলে অবগাহন করিতে গমন করি-লেন। কিন্তু বাল্মীকির হৃদয়ে তখনও বীণার অমৃতময় ঝঙ্কারের নিবৃত্তি হয় নাই। তিনি মহাভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। জগতের প্রত্যেক পদার্থেই তিনি অলৌকিক পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেছিলেন।

তমসার স্বচ্ছ জল দেখিয়াই তিনি উল্লাসে ভরদ্বাজকে বলিলেন,—"বৎস,দেখ, দেখ, তমসার জলরাশি সাধু ব্যক্তির হৃদয়ের ন্যায় কিরূপ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল।" স্বচ্ছজল দেখিয়াও তাঁহার হৃদয় যেন পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ভরদ্বাজকে বলিলেন,—"বৎস, তুমি আমার বল্কল দাও; আমি এই নদীতীরবর্ত্তী অরণ্যে একবার পর্য্যটন করিয়া আসি। এই বলিয়া তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন———"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াছি, এমন সময়ে নীরো, চুনী, সুশীলা, ভূদেব প্রভৃতি একদল বালক বালিকা আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "আমি যাব, আমি যাব।"

আমি বলিলাম,—"কোথায় রে ?"

নীরো বলিল,—"এই যে মা, কাকীমা,রাজুপিসী, মঙ্গলাপিসী সবাই কাপড় প'রে তোমাদের সঙ্গে কোথায় বেড়াতে যাচ্চে। আমাদেরও নিয়ে চল না, কাকাবাবু। মা আমাদের নিয়ে যেতে চাচ্চে না। তোমরা যদি না নিয়ে যাও, তবে আমরাও তোমাদের পেছু পেছু যাব।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, যাবি। গোল করিস্ নে, থাম্।"

এই কথা বলিতে বলিতে ক্ষুদ্র মতিও উপরে উঠিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার পর আমার কোঁছা ধরিয়া ও মুখপানে চাহিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, ব্যাকুলভাবে, তাহার স্বর্গীয় ভাষায় বলিতে লাগিল "কাকাবাবু আমিও দাব; আমিও দাব।"

আমি বলিলাম,—"আচ্চা যাবি; আমার কোলে ওঠ।"

বাল্মীকির বৃত্তান্ত আর আমার শেষ করা হইল না। বৌদিদিরা, যোগমায়া, মঙ্গলা, রাজুদিদি, বৌদিদিদের দাসীদ্বয় সকলে পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেজ বৌদিদি আসিয়াই বলিলেন, "কই, ঠাকুরপো, যতীন্দ্র,—তোমরা চল।"

আমি সকলের পরিচ্ছদের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "মেজ বৌদিদি, তোমরা কোথাও নেমন্ত্রণ খেতে যাচ্চ না কি ? আমরাও দুই একটা মেঠাই সন্দেশ পাব তো ?"

"তা পাবে বই কি ? আমরা কি আর একলা খাব ?"

আমি বলিলাম,—"যতীন্দ্র ভায়া ওঠ; আর দেখ্‌চো কি ? অন্য কোনও সময়ে আবার বাল্মীকি সম্বন্ধে গল্প করা যাবে।"

এই বলিয়া আমরা সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। গৃহে কেবল জননী, মাসীমা ও কেশব রহিল। মেজ দাদা বাবার সঙ্গে কোথায় গিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

দেশীয় বস্ত্র।

(১)

গত ফেব্রুয়ারী মাসে তুলাজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক সম্বন্ধে যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টের চিরকালই অর্থের টানাটানি হইবারই কথা। আয় বুঝিয়া ব্যয় করা গবর্ণমেণ্ট ইতরতা বোধ করেন। যেমন একজন ধনী লোকের আব্‌দেরে ছেলে থাকিলে কাজে কাজেই তাঁর ব্যয়বাহুল্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ আমাদের গবর্ণমেণ্টের অনেক আব্‌দেরে ছেলে থাকায় কিছুতেই ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না। আয় বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে সেই জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে আমদানী ও কতকগুলি মোটা ধাতুর বস্ত্র ছাড়া কলে প্রস্তুত দেশীয় বস্ত্রের উপর শতকরা ৫৲ টাকার হিসাবে কর লওয়া ধার্য্য হয়। ইহাতে মাঞ্চেষ্টারে মহা গোলযোগ পড়িয়া যায়। জিনিসের উপর কর লইলেই তাহার দাম বাড়ে, এবং দাম বাড়িলেই প্রায় কাট্‌তি কমিয়া যায়। মাঞ্চেষ্টারের গণ্ডগোলের এই এক কারণ। দ্বিতীয় কারণ দেশীয় কতকগুলি মোটা বস্ত্রের উপর শুল্ক না লওয়া। যদিও ওরূপ বস্ত্র বিলাত হইতে আমাদের দেশে আমদানী হয় না, এবং উহা শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় মাঞ্চেষ্টারের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি মাঞ্চেষ্টার বুদ্ধিমান বলিয়া ইহা জানে যে যতদিন দেশীয় কলকয়টা বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন তার উদ্‌বেগের কারণও বর্ত্তমান থাকিবে, এবং তাহাদের উচ্ছেদ সাধন না করিতে পারিলে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। এই দুই কারণের জন্য তুলাজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপনের পূর্ব্বোক্ত আইন পাশ হওয়ার দিন হইতেই মাঞ্চেষ্টার আন্দোলন আরম্ভ করে। মাঞ্চেষ্টারের ভোট অনেক, সুতরাং বিলাতের প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তাহাকে ভয় করিয়া চলেন। মাঞ্চেষ্টার ভারত সেক্রেটেরির নিকট ঘন ঘন প্রতিনিধি পাঠাইতে লাগিলেক। প্রথম দিন কয়েক সেক্রেটেরি মহাশয় ভারতের

অর্থের অনটনের কথা তুহিয়াছিলেন। কিন্তু মাঞ্চেষ্টার নাছোড়বান্দা। এ দিকে মন্ত্রীসম্প্রদায়ও পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বর্ত্তমান মন্ত্রীসম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রীসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তনের প্রাক্কালে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মাঞ্চেষ্টারকে আশা দিতে কখন অবশ্য ভুলেন নাই। ইহারা ক্ষমতা পাইলেই সে ইহাদিগকে চাপিয়া ধরিল। ফল এই হইল যে কিছু দিনের মধ্যে বিলাত হইতে বস্ত্রশুল্ক পরিবর্ত্তনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের হুকুম আসিল। কাজেই গত ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব্ব আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থির হইল যে আমদানী ও কলে প্রস্তুত সমুদায় বস্ত্রের উপর শতকরা ৩৷৷০ টাকার হিসাবে মাশুল লওয়া হইবেক, এবং সকল প্রকারের আমদানী তুলা মাশুল হইতে অব্যাহতি পাইবে। এই ব্যবস্থায় কি কি ফল হইল? (১) মাঞ্চেষ্টার সন্তুষ্ট হইল। ইহাতে যে বর্ত্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায়ের কি সুবিধা হইল তাহা যাঁহারা বিলাতী রাজ্য-শাসন-নীতির উপর দৃষ্টি রাখেন তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। পার্লেমেণ্টের আগামী সভ্য নির্ব্বাচনের সময়ে বর্ত্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায়ের ইহাতে বিলক্ষণ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। (২) মাঞ্চেষ্টারের সন্তোষ সাধনোদ্দেশে ভারতের ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আয় পরিত্যাগ। ভারতের যদি সচ্ছল অবস্থা হইত তাহা হইলে যাহাই হউক না কেন, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ আয় ত্যাগ যে কতদূর অন্যায় ও অযৌক্তিক তাহা বুঝাইবার প্রয়াস অনাবশ্যক। লবণ করের মত পীড়ক কর আর আছে কিনা সন্দেহ। যদি ইহা উঠাইতে বা কমাইতে বল তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট অনটনের দোহাই দিবেন বা ভ্রূ কুঞ্চন করিবেন। যে ব্যক্তির বার্ষিক ৫০০৲ টাকা আয় তাহাকে প্রতি টাকায় ৪ পাই করিয়া আয় কর দিতে হয়; এ বিষয়ে যদি গবর্ণমেণ্টকে বিবেচনা করিতে বল; সেই এক কথা। অথচ মাঞ্চেষ্টারের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা আয় ছাড়িয়া দিতে কোন উচ্চ বাচ্য হইল না। (৩) দরিদ্র নিপীড়ন। পূর্ব্বে কতকগুলি মোটা ধাতুর কাপড় শুল্ক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। ফল এই হইয়াছিল যে কতকগুলি গরীব লোকের সস্তায় বস্ত্র পাইবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এখন এই দাঁড়াইল ধনী হও, দীনই হও, একখানা কাপড় কিনিতে হইলেই মাঞ্চেষ্টারের খাতিরে কাপড় খানা পিছু ৪টা পয়সা করিয়া সেলামি দিতে হইবে। (৪) আমদানী সূতার উপর মাশুল উঠিয়া যাওয়াতে উক্ত সূতায় প্রস্তুত হস্তে নির্ম্মিত দেশীয় বস্ত্রের

দাম কিছু কমিতে পারে। যদি হস্তনির্ম্মিত দেশীয় বস্ত্রের দাম কমে, তাহা হইলে তাঁতিদের কিছু সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে প্রতি বস্ত্র খানার কত দাম কমিতে পারে? তাঁতিদের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, দেশীয় কাপড়ের অবস্থা যেরূপ হইয়া পড়িয়াছে, কাপড়খানা পিছু সম্ভবতঃ দুই চার পয়সা দাম কমিলেও কোন পক্ষের যে বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

অনেকে ভারতগবর্ণমেণ্টের এইরূপ ব্যবহারে বিস্মিত হইলেন। কেহ কেহ বড় সহজেই বিস্মিত হন অথবা তাঁহারা বিস্মিত হইয়াই আছেন বলিলে হয়। বস্তুতঃ ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই দেখা যায় না। ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন স্বাধীনতা নাই। ভারত সেক্রেটেরির আদেশ প্রতি-পালনই ইহাদের কার্য্য। তাঁহার নাম হুকুম, ইহাদের নাম তামিল। উপরে যে যে কথা বলা হইল ইহা কল্পিত নয়। ভারতীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন কোন সদস্য আইন সভায় বসিয়া ঈদৃশ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতএব ভারত সেক্রেটেরি যদি কোন আদেশ করেন, তাহার অন্যথা করি-বার ক্ষমতা ভারত-গবর্ণমেণ্টের নাই। আর এক কথা, মাঞ্চেষ্টার হইল প্রভূত ক্ষমতাশালী ইংরাজ বণিক ও শ্রমজীবি সম্প্রদায়, আর আমরা হইলাম প্রাণশূন্য নিশ্চল ভারতবাসী। প্রবলের আব্দারের কাছে দুর্ব্বলের মঙ্গলা-মঙ্গলের কথা টেকিতে পারে না। প্রবলের জয় ও দুর্ব্বলের পরাজয় হই-তেছে প্রাকৃতিক নিয়ম। এ নিয়মের বিপরীতে মস্তকোত্তলনের চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। হইতে পারে এমন সময় আসিবে, যখন প্রবলের জয় ও দুর্ব্বলের পরাজয় না হইয়া প্রবলের পরাজয় ও দুর্ব্বলের জয়ই নিয়ম হইবে। কিন্তু যতদিন এ বিপর্য্যয় না ঘটিতেছে, ততদিন বর্ত্ত-মান নিয়ম শিরোধার্য্য করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। আর একটু কথা আছে। মাঞ্চেষ্টার দল হইল জেতা, আমরা বিজিত। তাহাদের স্বার্থ আগে না আমাদের স্বার্থ আগে? ভারত সেক্রেটেরি বা ভারত গবর্ণমেণ্ট যে নিজেদের জাতীয়দের মঙ্গলের কথা পাঁকে পুতিয়া কিম্বা তাহাদের স্বার্থের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, আমাদের দিকে তাকাইবেন, এরূপ আশা করা যে অধিকতর বাতুলতা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইবার, কিম্বা ইহাদিগকে গালি দিবার পূর্ব্বে আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ইহাদের অবস্থায় পড়িলে আমরা কি করিতাম।

যাউক, এ সব কথা এখন যাউক। আমাদের কথা পাড়া যাউক। বস্ত্র-শুল্ক আইন পরিবর্ত্তিত হইবার পর মধ্য-প্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে দুই চারিটি সভা হইয়া গেল। সভার লোকে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদূর সম্ভব বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার ত্যাগ ও দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবেন। বাঙ্গালীরা আজ কাল দেশের মধ্যে অগ্রণী—তাঁহারা ছাড়িবেন কেন? তাঁহারাও দুই একটী সভা করিলেন। সভায় হইল কি? প্রথম বিশ পঞ্চাশ জন লোকের আগমন। দ্বিতীয় বাঙ্গালায় কিম্বা ইংরাজীতে দুই একজন বক্তার স্বদেশানুরাগোদ্দীপক ইংরাজ-নিন্দা মিশ্রিত বক্তৃতা। "দেশের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে; ইংরেজেরা তার বিধিমতে সহায়তা করিতে বসিয়াছেন, দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায় আজ লুপ্তপ্রায়; অন্নাভাবে আজ তাঁতীদের ঘরে হাহাকার। আমরা যদি দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি, এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইবেক; দেশীয় শিল্পীদের উপকার ও ইংরাজদের অপকারসাধন। খতাইয়া দেখিলে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিলে মোটের উপর লাভ বই অলাভ নাই; দেশীয় বস্ত্র টেঁকে বেশী। যতদিন ব্যবসায়ের উন্নতি না হইতেছে, ততদিন দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারে কিছু লোকসান হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশের খাতিরে আমাদের সে লোকসান সহ্য করা উচিত। অতএব ভাই সকল আসুন, আমরা যতদূর সম্ভব দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। সর্ব্বশেষ বহুল পরিমাণে দেশীয় বস্ত্র প্রচলনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

বোম্বাই কিম্বা মধ্য-প্রদেশের অবস্থা বিশেষ অবগত নই। বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার ত্যাগের প্রতিজ্ঞা সেখানে কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বলিতে পারি না। কিন্তু উক্ত প্রদেশদ্বয়ের লোকেরা ঠিক বাঙ্গালী নয়। দুই দশটা কাপড়ের কল তাহারা করিয়াছে ও চালাইতেছে। উহাদের "মরদ্ কি বাত" হইতে পারে।

আমাদের কি হইল? ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদাৎ আমাদের মুখ ফুটিয়াছে। কোন একটা উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে আমরা মনে করি, যদি একটা সভা আহ্বান করিয়া উদ্দেশ্য সাধনের উপায়াবলম্বনার্থে একটা সমিতি গঠিত করিয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত না হউক উদ্দেশ্যটার যে নিদান সাড়ে বার আনা আন্দাজ কাজ সাধিত হইল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সমিতি গঠিত হইয়া বস্ত্রসভা সকল সন্ধ্যার পরেই ভঙ্গ হয়।

সমিতির সদস্যগণ অবশ্য রাত্রে নিদ্রা গিয়াছিলেন। আজও তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। যদি তাঁহাদের কখন নিদ্রা ভাঙ্গে, তাহা হইলে তাঁহারা সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য কতদূর সফল করিয়া তুলিতে পারিবেন দেখা যাউক।

(২)

দেশীয় বস্ত্র উঠিল কেন? ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বিলাতী বস্ত্রের প্রচলন খুব কমই ছিল। বেশ মনে হয়, ছেলে বেলায় আমরা আটপহুরে দেশী কাপড় ব্যবহার করিতাম। দেখিতে দেখিতে উহার ব্যবহার কমিয়া আসিতে লাগিল, এবং বিলাতী কাপড়ের কাট্‌তি বাড়িয়া গেল। এখন বোধ হয় কম লোকই আছেন যাঁহারা আটপহুরে দেশী কাপড় ব্যবহার করেন। অনেকে পোষাকী কাপড়ও দেশী তুলিয়া দিয়াছেন। আর একটী কথা আছে, আজকাল তাঁতে বোনা যে সকল দেশীয় বস্ত্র প্রচলিত তাহাদের অধিকাংশই বিলাতী সূতায় তৈয়ারি। ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার প্রায় উঠিয়া আসিল কেন তাহার কারণানুসন্ধানে বেশী দূর যাইতে হইবেক না। ইহার কেবল একই মাত্র কারণ আছে। বিলাতী কাপড় দেশী অপেক্ষা ঢের সস্তা। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কেহই বিলাতী কাপড় ধরিত না। ১৷৷০ টাকা দামের এক জোড়া বিলাতী ধুতি যেরূপ কাপড় হইবে সেইরূপ এক জোড়া দেশী ধুতি যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে ২৷৷০ টাকা ৩৲ টাকার কম পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। বোধ হয় হাতে বহরে সেইরূপ এবং সেইরূপ জমিওয়ালা দেশী কাপড় খুব বিরল। এ কথা নিশ্চয় যে, যে সময় বিলাতী কাপড় প্রচলন আরম্ভ হয়, সে সময় এক জোড়া বিলাতী কাপড় যে দরে পাওয়া যাইত, তদ্রূপ এক জোড়া দেশী কাপড় সেই দরে কিম্বা তাহা অপেক্ষা কম দরে কখনই পাওয়া যাইত না। আজকাল যে দেশী কাপড়ের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে তাহা ত বোধ হয় না। উহার কাট্‌তি যেরূপ কম অবনতি হইবারই সম্ভাবনা। লোকের যখন কাপড় দরকার হয় তখন তাঁহারা দেশী বিলাতী ভাবিবার অবসর পান না। প্রথমতঃ সস্তা খুঁজেন এবং দ্বিতীয়তঃ যে দাম দিতে তাঁহারা সক্ষম সেই দামে যতদূর ভাল কাপড় পাওয়া সম্ভব তাহাই খুঁজেন। যাঁহারা তাঁতে বোনা দেশী কাপড়ের পক্ষপাতী তাঁহারা তিনটী কথা বলেন;—(১) দেশীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা হাহাকার করিতেছে, তাহাদের অন্ন জুটিতেছে না, দেশের একটী

শিল্প নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং দেশের ধন দেশ হইতে বাহির হইয়া গিয়া বিদেশী লোকের উদর পূর্ণ করিতেছে। এরূপ হইতে দেওয়া কখনই উচিত নয়, অতএব নিদান দেশ-হিতৈষিতার খাতিরে আমাদের দেশী বস্ত্র যতদূর সম্ভব ব্যবহার করা উচিত। (২) দেশী কাপড় আপাততঃ কিছু মহার্ঘ হইলেও দামের পক্ষে উহা সস্তা। (৩) চেষ্টা করিলে বিলাতী কাপড় যে দরে পাওয়া যায় অনেক সময় সেই দরে সেইরূপ দেশী কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। উৎসাহ নাই বলিয়া আর দেশে আবশ্যক মত নানাপ্রকার কাপড় তৈয়ারি হইতেছে না, এবং অনেক হাত ফিরে বলিয়া সময়ে সময়ে দেশী কাপড়ের দর অকারণ বৃদ্ধি হয়। তিনটী কথারই পর পর আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) এ স্থলে স্বদেশ-হিতৈষিতার দোহাই বৃথা। দোষই বলুন আর গুণই বলুন মনুষ্য স্বভাব হইতেছে সস্তা পাইলে আর কেহ অধিক দাম দিয়া জিনিস কিনিতে যায় না। ইহা যে সুধু আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম বলবৎ। স্থলবিশেষে ও সময় বিশেষে ইহার অন্যথার কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। মনে করুন একজনের এক জোড়া কাপড়ের দরকার। ১৷৷° টাকা হইলে তিনি তাঁর পছন্দসই এক জোড়া বিলাতী কাপড় পান। ধরিয়া লইলাম ঠিক সেইরূপ এক জোড়া দেশী কাপড় দুই টাকায় পাওয়া যায়। তিনি কি তখন ভাবেন যে ১৷৷° টাকা দিয়া কাপড় জোড়াটা কিনিলে একজন বিদেশীয়ের উপকার করা হয়, কিন্তু ২৲ টাকা দিয়া কিনিলে একজন স্বদেশীয়ের উপকার করা হইবে, অতএব আমার দুই টাকা দিয়া দেশী কাপড় জোড়াটাই কেনা উচিত। হয়ত কোন মহাপুরুষের মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইতে পারে, কিন্তু জগতে মহাপুরুষ বড় বিরল। সচরাচর লোকের মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় না। আর এক কথা, এরূপ ভাব মনে উদয় হইলেও কয়জন লোক ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম? প্রত্যেক গৃহস্থকে তাঁর পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্ততঃ বৎসরে ৩।৪ জোড়া কাপড় কিনিতে হয়। উড়ানি পিরাণ প্রভৃতি ধরিলাম না, কারণ অনেক দরিদ্র গৃহস্থকে সাধারণতঃ ঐ সকল জিনিসের ব্যবহার হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এরূপ গৃহস্থের যদি নিজেকে লইয়া ৫।৬ জন পোষ্য থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে বৎসরে অন্ততঃ

১৫।২০ জোড়া কাপড় কিনিতে হইবেক। অর্থাৎ যদি তাঁর দেশী কাপড় ব্যবহারের সখ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে অন্ততঃ বৎসরে ৮।১০ টাকা অধিক ব্যয় করিতে হইবেক। জিজ্ঞাসা করি দেশে এরূপ কয়জন গৃহস্থ আছেন যাঁহারা এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারেন? যে হিসাবটা উপরে দেওয়া গেল তাহা সকল দিকেই কম করিয়া ধরা তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ১ জোড়া ১॥০ দামের বিলাতী কাপড় অপেক্ষা এক জোড়া দুই টাকা দামের দেশী কাপড় ঢের নিকৃষ্ট। অনেক গৃহস্থের ৫।৬টার উপর পোষ্য এবং প্রত্যেকের প্রতি বস্ত্রের অঙ্কে সুধু ৩।৪ জোড়া কাপড়ের দামের অপেক্ষা অনেক অধিক খরচ হয়। একজন ২০।২৫ টাকা মাহিনার কেরাণীকে বা একজন সামান্য কৃষককে সুধু দেশ-হিতৈষিতার খাতিরে অধিক ব্যয় করিতে বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত বলিতে পারি না। আর যাহারা অতি কষ্ট করিয়াও নিজেদের মোটা ভাত মোটা কাপড় যোগাইয়া উঠিতে পারে না তাহাদিগকে এরূপ করিতে বলা বিদ্রূপ ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন আমরা "যতদূর সম্ভব" দেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—অনেকে তাহা করিতেছেন। অনেকে আজও পোষাকী কাপড় দেশী ছাড়া ব্যবহার করেন না। অনেকে কানপুর, নাগপুর ও অন্যান্য স্থানের জিন প্রভৃতি মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বোম্বাই মিলের পরণের কাপড় অত্যন্ত মোটা বলিয়া বাঙ্গালায় তার ব্যবহার কম। দেশ-হিতৈষিতায় খালি ২।১০ জন হয়তঃ উহা ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণকে সুধু দেশ-হিতৈষিতার জন্য রুচি ও স্বচ্ছন্দ জ্ঞান পরিত্যাগ করিতে বলা, কিম্বা তাহারা ঐরূপ করিবে আশা করা, অথবা তাহারা ঐরূপ না করিলে তাহাদিগকে গালি দেওয়া কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়।

(২) দেশী কাপড় আপাততঃ কিছু মহার্ঘ হইলেও দামের পক্ষে সস্তা। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। এক জোড়া রেলির ৪৯ নং ধুতি বা সাটী ২।০ সিকা হইতে ২।৵০ আনায় পাওয়া যাইতে পারে। ঐরূপ এক জোড়া কাপড়কে সময়ে সময়ে এক বৎসরেরও অধিক যাইতে দেখা যায়। উহার দেড়া কিম্বা দুনা দাম দিয়া যদি এক জোড়া দেশী কাপড় কেনা যায়, কেহ কি বলিতে পারেন যে উহা দুই বৎসর

পর্য্যন্ত যাইবে? দুই বৎসর না যাইলে আর দেশী কাপড় ব্যবহারে লাভ নাই। দুই বৎসরেও ঠিক লাভ হয় না। বিলাতী এক জোড়া ১৷৷০ টাকা দামের সাটী যদি ৬ মাস যায় এক জোড়া ২৲ টাকার দেশী কাপড়কে ৮ মাসের কিছু উপর যাওয়া চাই। কিন্তু ধরিয়া লইলাম দেশী কাপড় দামের পক্ষে সস্তা। তাহাতে আসিয়া গেল কি? অনেকের পক্ষে একেবারে বেশী টাকা বাহির করা কঠিন। সকলেই জানেন যে চাউল খুচরা না কিনিয়া যদি বেলিয়াঘাটার কোন আড়ত হইতে পাইকেরি দরে বেশী কিনিয়া আনা যায় তাহা হইলে অনেক লাভ হইতে পারে। কিন্তু কলিকাতা সহরের মধ্যে কয়জন তাহা করিতে পারেন? আমরা জানি যদি ৩৲ টাকার এক জোড়া থেলো জুতা না কিনিয়া ৫৲ টাকা দিয়া এক জোড়া টেঁকসই জুতা কেনা যায় তাহা হইলে মোটের উপর লাভ বই লোকসান হয় না। কিন্তু এই জ্ঞান সত্ত্বেও কয়জন জুতা কিনিবার সময় এক দমে ৫৲ টাকা খরচ করিতে পারেন। পয়সার অভাবে অনেক সময়ে লোককে থেলো জিনিসে সন্তুষ্ট হইতে হয়। মনে করুন, একজন গৃহস্থের এক মাসে ৪ জোড়া কাপড় আবশ্যক। দেড় টাকা করিয়া হইলে ৪ জোড়া বিলাতী কাপড়ে ৬৲ টাকা লাগিবে। যদি ২৲ টাকা দিয়া বিলাতী অপেক্ষা টেঁকসই দেশী কাপড় পাওয়া যায় তাহা হইলে তাঁহাকে ৮৲ টাকা খরচ করিয়া ৪ জোড়া দেশী কাপড় কিনিতে হইবেক। দেশের মধ্যে কয়জন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থ এইরূপ ব্যয় করিতে সক্ষম তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

(৩) যাঁহারা বলেন চেষ্টা করিলে দেশী কাপড় বিলাতীর দরে পাওয়া যায় তাঁহাদিগকে বলি, সর্ব্বসাধারণ এরূপ চেষ্টা করিতে অপারগ; তাঁহারাই কেন চেষ্টা করিয়া যাহাতে লোকে সুলভ মূল্যে অর্থাৎ বিলাতীর দরে তদ্রূপ দেশী কাপড় পাইতে পারেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করুন না? যদি সাত হাত ফিরিয়া দেশীর মূল্য অকারণ বৃদ্ধি হয় ঐরূপ সাত হাত ফেরা বন্ধ হয় না কেন? যখন বিলাতীর মূল্যে তদ্রূপ দেশী পাইয়া লোকে শেষোক্ত কাপড় ব্যবহার না করিবেন তখন তাঁহাদিগকে দুই কথা শুনাইবার সময় হইবেক। কিন্তু একটা কথা উঠিতে পারে। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ত দেশীই ছিল। তখন ত উৎসাহের অভাব ছিল না। তবে দেশী উঠিল কেন? বিলাতীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়াই দেশীকে পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছে।

(৩)

যাঁহারা বস্ত্র সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সস্তায় লোককে কাপড় যোগাইবার কোন উপায় করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আন্দোলনের কোন ফল হইবে, নতুবা কেবল উহা অরণ্যে রোদন মাত্র। হস্ত কখন কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, কাপড়ের কল হয় ত ভাল, নতুবা ম্যাঞ্চেষ্টারের মুখাপেক্ষা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। কল যে বলিলেই হয় তাহা নয়। তাহা হইলে দেশে এত দিন কল ছাইয়া পড়িত। বিলাতে কল এক দিনে হয় নাই। কল চালাইতে হইলে শিক্ষা চাই, অধ্যবসায় চাই, মূলধন চাই, বিশ্বাস চাই। মুখে আমরা যতই বলি না কেন, আমাদের মধ্যে এ সমস্তরই অভাব। ভারতের অন্যান্য স্থানে দুই দশটা কল হইয়াছে বটে কিন্তু সে সব কলের অধিকারীরা বাঙ্গালী নয়। বাঙ্গালীরা ইংরাজী শিখিয়াছেন, গলাবাজী করিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু ইহা ছাড়া যে আর কিছু শিখিয়াছেন তাহার প্রমাণাভাব। অন্যান্য স্থানে যে কয়টী কল হইয়াছে তাহাদের বিলাতী কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে কত কষ্ট হইতেছে তাহা উহাদের স্বত্বাধিকারীরাই জানেন। পরিণামে ফল কি দাঁড়াইবে তাহা কেহ বলিতে পারেন না। আমাদের দেশে পরিশ্রম সস্তা এবং তুলাও অনেক জন্মিয়া থাকে ও আবশ্যক হইলে আরও অধিক উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু পরিশ্রম সুলভ হইলেই, কাঁচা মাল যথেষ্ট হইলেই হইল না। শ্রমিকের নিপুণতা ও কার্য্যকারিতা, ব্যবসায়ীর বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও অধ্যবসায়, মূলধনের বহুলতা এ সব সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আমাদের দেশ এখনও অনেক দূরে। ব্যবসায়ের লাভালাভ অনেক পরিমাণে ইহাদের উপরই নির্ভর করে।

যদি কোন একটা শিল্প এক দেশে অধিক কাল ধরিয়া প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে সেই শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন পক্ষে সেই দেশের ক্রমে ক্রমে অনেক সুবিধা হইয়া উঠে। সেই দেশের শ্রমিকেরা ঐ শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ নিপুণতা লাভ করে, ঐ সম্বন্ধীয় কল কারখানার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়, যাঁহারা ঐ শিল্পে আপনাদের মূলধন নিযুক্ত করেন, নানা বিষয়ে তাঁহাদের ঐ সম্বন্ধে বিস্তর অভিজ্ঞতা জন্মায়। অতএব সেই দেশে ঐ শিল্পজাত দ্রব্য যত সস্তায় উৎপাদিত হইতে পারে, এক নূতন দেশে তাহা

সম্ভব নয়। অনেক বৎসর হইতে বিলাতে কলে কাপড় প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। তবে বস্ত্র-বুনন প্রথা প্রথম প্রচলিত করিবার সময় অবশ্য অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। আজ কাল কিন্তু সে সমস্ত অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমাদের যদি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবেক। অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব কি না তাহা ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত। কোন দেশে একটা নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত করা এত কঠিন বলিয়াই অনেক সময় সে দেশের গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় আমদানী দ্রব্যের উপর মাসুল লইয়া থাকেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য দেশে নূতন শিল্প প্রচলনে উৎসাহ দেওয়া। ইহার দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ায় বিস্তর পশম জন্মে। পূর্ব্বে ঐ পশম প্রায় সমস্তই বিলাতে রপ্তানী হইত। পশমী বস্ত্র উৎপাদন শিল্প বিলাতের এক প্রধান শিল্প। এ দিকে অষ্ট্রেলিয়াকে অনেক পশমী বস্ত্র কিনিতে হয়। কিছুদিন পরে লোকে দেশেই পশমী বস্ত্রের কল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নূতন দেশ ও নূতন শিল্প। বিলাতী পশমী বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করা সহজ নয় বুঝিয়া অষ্ট্রেলিয়ার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সকল আমদানী পশমী বস্ত্রের উপর শুল্ক স্থাপন করিলেন। ফলে এই হইল যে, বিদেশীয় বস্ত্রের দাম বৃদ্ধি হইল এবং দেশীয় বস্ত্রকারকগণ বিদেশীয়দের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইল। আমেরিকাতেও ঠিক ঐরূপ হইয়াছে। অনেক বিষয়ে খুব সুবিধা সত্বেও আমেরিকা নূতন দেশ। দেশীয় শিল্প স্থাপন ও সংরক্ষণের জন্য আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট অনেক বিদেশজাত দ্রব্যের উপর মাসুল লইয়া থাকেন। কথা হইতেছে এ প্রথা ভাল কি মন্দ। চিরস্থায়ী হইলে ইহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হয় এবং দ্রব্য উৎপাদকদের খাতিরে দ্রব্য ব্যবহারকদের ঘাড় ভাঙ্গা হয়। কিন্তু যদি এই প্রথা দ্বারা এক নূতন শিল্প স্থাপনের সহায়তা হয় মাত্র, এবং শিল্পটী স্থাপিত হইলে ইহা রদ করা যাইতে পারে, তাহা হইলে দিনকতক শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহারকদিগের অসুবিধা হইলেও পরিণামে ইহা দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। দেশে নূতন শিল্প যতই প্রচলিত হয় ততই তার মঙ্গলের বিষয়; ততই লোকের অন্ন সংস্থানের সুবিধা হয়। কিন্তু যদি কোন দেশে কোন শিল্পজাত

দ্রব্য সম্বন্ধে কিছুদিন পরে এই উপায় রদ করিবার অসম্ভাবনা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবেক সেই শিল্পটী সে দেশের উপযোগী নয়। দেশের মূলধন ও পরিশ্রম ঐ শিল্পে নিয়োজিত না হইয়া শিল্পান্তরে নিয়োজিত হওয়াই ভাল। অনেক সময় শিশুকে হাঁটান শিখাইবার জন্ত কৃত্রিম সহায় আবশ্যক হয়, কিন্তু সে বড় হইয়াও যদি কৃত্রিম সহায় ব্যতীত হাঁটিতে না পারে, তাহা হইলেই বুঝা গেল তার পায়ের দোষ আছে, ও সে কখনই আপনি হাঁটিতে পারিবেক না। তদ্রূপ যে শিল্পকে কৃত্রিম উপায় দ্বারা চিরকাল খাড়া করিয়া রাখিতে হয় তাহাতে দেশের কাহারও উপকার হয় না। যাহারা ঐ শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করে তাহাদিগকে বেশী দাম দিয়া উহা কিনিতে হয়। যদি বল যে, মূলধনের ও শ্রমিকদিগের উপকার হয়, তাহাও নয়; কারণ যে ধন ও শ্রমিকগণ এই শিল্পে নিয়োজিত উহা না থাকিলে তাহারা শিল্পান্তরে নিয়োজিত হইতে পারিত। এ স্থানে ইহা বলা উচিত যে আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট যখন দেখিতেছেন, যে শিল্পবিশেষ দেশে বদ্ধমূল হইয়া পড়িতেছে তখন তাঁহারা সেই শিল্পজাত বিদেশীয় দ্রব্যের উপর মাস্থল কমাইয়া বা উঠাইয়া দিতেছেন।

এখন কথা হইতেছে উপরে যে প্রথার বিষয় উক্ত হইল উহা আমাদের দেশে অবলম্বিত হইতে পারে কিনা। না, উহা পারে না। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিলাতস্থ ভারত সেক্রেটারির অধীন। ভারতের উপকার সাধনো-দ্দেশে ইহারা বিলাতের অপকার করিতে পারিবেন না। আমেরিকা স্বাধীন, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা প্রভৃতি নামে মাত্র বিলাতের অধীন—ইহারা মাতৃভূমির তোয়াক্কা রাখেন না। ভারতের অবস্থা যে সেরূপ নয় বুঝাইবার প্রয়াস অনাবশ্যক। পূর্ব্বোলিখিত বস্ত্রশুল্ক-আইনের পরিবর্ত্তন ইহার জলন্ত প্রমাণ। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যখন অষ্ট্রেলিয়ান, আমেরিকান প্রভৃতিরা দেশের মঙ্গলের জন্ত উচিত মূল্যাপেক্ষা বেশী দিয়া অনেক দ্রব্য কিনিতেছেন তখন আমরা কেন আবশ্যক হইলে বেশী দাম দিয়া দেশীয় বস্ত্র কিনিতে পারিব না? ইহাদের বুঝা উচিত যে, অষ্ট্রেলিয়ান প্রভৃতিরা বেশী দাম দিতেছেন পরম্পরা সম্বন্ধে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নয়। এ উভয়ের প্রভেদ অনেক। জিনিস কিনিবার সময় তাঁহারা অনেক সময় ভাবিয়া দেখেন না যে, বেশী দাম দিতেছেন, এবং ভাবিয়া দেখিলেই বা হইবে কি? বেশী দাম দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু আমাদের অবস্থা অন্যরূপ। সস্তা বিলাতী

ও মহার্ঘ দেশী বস্ত্র আমাদের সম্মুখেই থাকে, এবং কোনটী লইব তাহা স্থির করিবার স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপ করে না। এখন দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেশে বস্ত্রশিল্পের পুনর্জীবন দান করা কত দুরূহ ব্যাপার। প্রথম বিলাতের ন্যায় শিল্পকুশলী দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দ্বিতীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্য অভাব। অনুকুলাচরণ করা দূরে থাকুক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রতিকুলাচরণেরই সম্ভাবনা।

এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় বুঝাইবার প্রয়াস করা গিয়াছে (১) দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে যে একটু সামান্য আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহার মূল ভুল। দেশ-হিতৈষিতার দোহাই দিয়া দেশজাত বস্ত্র ব্যবহার প্রচলন অসম্ভব। (২) যদি লোককে আমরা দেশজাত বস্ত্র পরাইতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে আজকালকার দিনে কল প্রচলন ছাড়া উপায়ান্তর নাই। দেশী কলের কাপড় বিলাতী কাপড়ের ন্যায় সস্তা হওয়া চাই। (৩) বিলাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা বড় কঠিন, এবং ইহাতে আমরা গবর্ণমেণ্টের কোন সাহায্য পাইব না। আমরা বাঙ্গালী এবং নিজেদের জাতিকে বেশ চিনি। সমস্ত স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বাধা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালীরা যে কখন স্বদেশীয়দিগকে দেশের কলজাত বস্ত্র পরাইবেন এরূপ আশাত হয় না—তবে বলা যায় না।

দ।

রবীন্দ্র বাবুর

সোনার তরী।

বহুবার শুনিয়াছি বাসন্তীর সালে
কোয়েলার প্রেমগীতি; জ্যোৎস্না নিশীথে
পাপিয়ার "পিউ কাঁহা" নভোনাট্যশালে;
দূরাগত বীণার ঝঙ্কার, যাহা চিতে
অপূর্ব্ব উল্লাসমধু দিয়াছে ঢালিয়া;
রজনীতে শৈলশিরে সেই গ্রীষ্মাবাসে
সুশীতল উপাধানে মস্তক রাখিয়া

দূর কল্লোলিনী মৃদু শঙ্কাপূর্ণ ভাবে
শুনেছি ক্রন্দন করে "হৃদি চূর্ চূর্।"
প্রকৃতির বিশাল প্রাঙ্গন তলে যারা
ঢালিতেছে স্বাভাবিক সঙ্গীতের ধারা
শতবার শুনেছি সে সকলের সুর ;
কিন্তু মম প্রিয়তম-কণ্ঠস্বর ছাড়া
আর কিছু শুনি নাই অমন মধুর।

শ্রীসৌদামিনী গুপ্তা।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

নানা বিঘ্ন বিপত্তি এবং অভাবের মধ্য দিয়া যাঁহার করুণা নিরন্তর দাসাশ্রমকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে মাসান্তে সেই অনাথনাথ দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

বর্ত্তমান মাসের রোগী এবং আতুর সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। দেখিয়া, ৩। স্বর্ণ, ৪। ফুলমণি, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। নবদুর্গা, ৭। সুমিত্রা, ৮। অম্বিকা, ৯। রুক্মিণীকান্ত সরকার, ১০। বামন, ১১। বুঝাওন, ১২। গঙ্গা, ১৩। সরস্বতী, ১৪। নিস্তারিণী, ১৫। গোবিন্দবালা, ১৬। খুবলাল দোসাদ, ১৭। ফণীন্দ্রনাথ দাস, ১৮। বিধু প্রামাণিক, ১৯। ভুলো, ২০। কৃষ্ণনাথ বসু, ২১। সখী, ২২। বাবুলাল, ২৩। রাজেশ্বরী এবং ২৪। ভবময়ী।

বাবুরাম। এবার বেচারা, ভয়ঙ্কর জ্বর ও প্লুরিসি হওয়ায় সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবলে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছে। প্রায় /২। সের জল বাহির করিয়া তাহাকে রক্ষা করা গিয়াছে। এইজন্ত আমরা বিশেষভাবে ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, মহোদয়কে ধন্ত-বাদ দি।

রুক্মিণীকান্ত সরকার,বাড়ী নদীয়া জেলায়। পশ্চিমে রেলওয়েতে চাকরী করিতেন। নানা প্রকার কঠিন রোগে একেবারে অবসন্ন এবং চলৎ শক্তি রহিত হওয়ায় দ্বারভাঙ্গার সহৃদয় ডাক্তার বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে এখানে আনীত হয়। রোগ কঠিন দেখিয়া ইঁহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হয়। কিছুদিন পরে একদিন নিজে একখান পালকি করিয়া এখানে পুনরাগমন করিয়াছেন।

গোবিন্দবালা। জ্বর ও বাতশ্লেষ্মা রোগে এই ভগবৎভক্তি পরায়ণা বৃদ্ধা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। ইহার প্রকৃতি অতি সুন্দর ছিল। যতদিন জ্ঞান ছিল, আপন জপমালা কখনও পার্শ্বচ্যুত করে নাই। ভগবান ইহার আত্মাকে আপনার অমৃতকোলে স্থান দিন ইহাই আমাদের অন্তিম প্রার্থনা।

খুবলাল দোশাদ। ইহার রোগ অত্যন্ত কঠিন বলিয়া হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

ফণীন্দ্রনাথ দাস। ইনি একটী স্কুলের ছাত্র এবং নিতান্ত নিরাশ্রয়। ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরের পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। মেডিক্যাল কলেজ হাঁষপাতালে গ্রহণ যোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় ইনি একেবারে নিরুপায় ও নিরাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন ঘটনাক্রমে একটী স্কুলের ছেলের সঙ্গে ইঁহার পথে সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারই উপদেশ ক্রমে ইনি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে আসিয়াই জ্বর হইয়াছিল। এখন অনেক ভাল আছেন।

বিধু। জ্বরাক্রান্ত হইয়া পথে পড়িয়া ছিল। একটী ভদ্রলোক উদ্যোগী হইয়া পাঠাইয়া দেন। আরাম হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

ভুলো। ম্যালেরিয়া জনিত প্লীহা রোগে পা ফুলিয়া গিয়াছিল। হাঁসপাতালে যাইতে হইবে শুনিয়া, 'ভাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি' বলিয়া চলিয়া যায়। আর আসে নাই।

কৃষ্ণনাথ বসু। বাড়ী পাবনা জেলা; বয়স ২৫ বৎসর। একমাত্র বৃদ্ধা জননী জীবিত। রোগ কঠিন দেখিয়া হাঁসপাতালে পাঠান হয়। ডাক্তারেরা হতভাগ্যের জীবনের আশা করেন না।

সখী। বাড়ী সারাঘাট, বয়স ৩৫, বিধবা রংপুরে স্বামীর সহিত প্রবাসী হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর কোন প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। পায়ে ক্ষত হইয়া পা পচিয়া যায়; এইজন্য সেখানকার ডাক্তার সাহেব তাহার পা খানি কাটিয়া ফেলিয়া দিতে বাধ্য হন। বাবু হরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে এখন সে দাসাশ্রমে আনীত হইয়াছে।

বাবুলাল। ভয়ানক চক্ষুর পীড়াও মাথার যন্ত্রণা। দাসাশ্রমে চক্ষু রোগ চিকিৎসার উপযোগী উপকরণাদি না থাকায় তাহাকে চক্ষুরোগ চিকিৎসার হাঁসপাতালে পাঠাইবার কথা হয়। ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

রাজেশ্বরী। হৃদ্‌রোগ; পূর্ব্বে একবার আরাম হইয়া চলিয়া গিয়াছিল কিন্তু পরে অত্যাচার করিয়া আবার মৃত্যুদশাপন্ন হইয়া আসিয়াছে। এখন অনেকটা ভাল আছে।

ব্রহ্মময়ী। বাড়ী যশোর জেলার আড়ুয়া কান্দি গ্রামে। কনজ কায়স্থের কন্যা। জরা জীর্ণ অবস্থায় লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কোন প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। শেষে একেবারে অন্ধ হওয়ায় চলৎ শক্তি রহিত হইয়া যায়। এ অবস্থায় বাবু আশুতোষ মৌলিক মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে দাসাশ্রমের একজন কর্ম্মচারী গিয়া তাহাকে আশ্রমে লইয়া আসেন।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দান সমূহ স্বীকার করিতেছি। ভগবান দাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মাসিক চাঁদা।

বাবু ভূতনাথ ঘোষ মে ।০, বাবু কামিনীকুমার গুহ মে, জুন ২৲, বাবু বঙ্কুবিহারী মিত্র মে ।০, বাবু প্রসন্নকুমার বসু মে, জুন ॥০, বাবু রাধানাথ দেব এপ্রেল ॥০, বাবু তেজচন্দ্র বসু মে ॥০, বাবু শ্যামাদাস কবিভূষণ মে ॥০, নবাব সৈয়দ আবদুল শোভান চৌধুরী মে, জুন ২৲, বাবু অশ্বিনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ১৲, বাবু যদুনাথ বরাট জুন ১৲, বাবু পিয়ারীমোহন ভড় মে ।০, বাবু নন্দকুমার দত্ত মে ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মে ১৲, N. K. Bose Esqr. C. S. মে ১৲, A lady C/o Babu Sreenath Das. মে ১৲, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস, মে, জুন ২৲, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী জুন ১৲, বাবু রাধা-গোবিন্দ সাহা আষাঢ় ॥০, বাবু হরিপদ ঘোষাল, জুন ।০, বাবু গৌরীশঙ্কর দে মে ॥০, Hon. Mohini Mohun Ray বৈশাখ হইতে আষাঢ় ৩৲, বাবু ক্ষুদিরাম বসু, মে, জুন ১৲, বাবু রাধানাথ দেব এপ্রেল, মে ১৲, বাবু অভয়চরণ মল্লিক জুন ॥০, বাবু অনাথনাথ দেব মে, জুন ২৲, বাবু পশুপতি নাথ বসু মে ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ মে, জুন ২৲, বাবু নবীন চাঁদ বড়াল মে ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী ফাল্গুন হইতে বৈশাখ ৩৲।

এককালীন দান।

বাবু রুক্মিণীকান্ত নিয়োগী ॥০, বাবু দ্বারকানাথ বসু ২৲, ওয়াজেদ আলি খাঁ, জমিদার ২৲, বাবু চন্দ্রকান্ত দে ১৲, বাবু প্রসন্ননাথ ভাদুড়ী ॥০, বাবু মনমোহন হালদার ।০, বাবু রজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ।০, বাবু গোবিন্দচন্দ্র নিয়োগী ॥০, ডাঃ ভারতচন্দ্র ধর ১৲, বাবু রুদ্রচন্দ্র মিত্র ১৲, বাবু কৈলাশচন্দ্র বসু ১৲, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সরকার ১৲, বাবু তারকচন্দ্র রায় ১৲, বাবু নীলকান্ত বসু ॥০, বাবু দীননাথ চন্দ ।০, বাবু দ্বারকানাথ পোদ্দার ।০, বাবু গিরিশ চন্দ্র মজুমদার ॥০, বাবু সুন্দরচন্দ্র দে ১৲, বাবু চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০, বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ ১৲, A friend ৶০, বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥০, বাবু মথুরানাথ গুহ ১৲, বাবু প্রসন্নচন্দ্র গুহ ১৲, হরশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ।০, ছলিমদ্দিন ॥০, বাবু জয়শঙ্কর গুপ্ত ১৲, বাবু শ্যামাশঙ্কর মিত্র ॥০, বাবু শশীকুমার বসু ৶০, শ্রীমতী কান্তমোহিনী বসু আশ্রমের জন্য ১৲, বাবু শশীভূষণ তালুকদার ১৲, বাবু বিহারীলাল রায় ১৲, বাবু জানকী নাথ ভট্টাচার্য্য ৫৲, বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন ১৲, বাবু শ্যামাচরণ সেন ॥০, বাবু লালমোহন সাহা ২৲, বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ ১৲, ১ম শ্রেণী সিটিস্কুল ১৸১০, বাবু শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য ১৲, বাবু তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲, W. C. Ghose Esqr. ২৲, আবগারী মহলের আমলাগণ ১৵০, একজন মহিলা মাঃ বাবু নবদ্বিপচন্দ্র দাস আম ও দুধের জন্য ৪৲, ভারত মহিলা সমিতি ঘড়ির জন্য ১৲, একজন ভদ্রমহিলা শ্যামবাজারের গাড়ী ভাড়া ।০, বাবু মাধবরাম বড়দলুই ॥০, বাবু কালিনারায়ণ গুপ্ত পত্নীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫০৲, S. C. Mukerjee Esqr. ।০, বাবু সারদাপ্রসাদ ঘোষ ২৲, A friend of Dasasram ১৲, বাবু প্রমথনাথ দত্ত ২৫৲, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার বসু ১৲, বাবু নগেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৲, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৲, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ধর জুন, জুলাই ১৲, বাবু লালমাধব মুখোপাধ্যায় ২৲, বাবু বেণীমাধব বসু, পিতৃ শ্রাদ্ধে ৫৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ১॥০, A friend of Dasasram ১৲, বাবু কালিনারায়ণ সান্যাল ১৲, বাবু নবীনচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় মে ।০, বাবু শ্যামলাল নাগ ১৲, বাবু অম্বিকাচরণ বসু ২৲, ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় পুত্রের জন্মদিনে ১৲, একজন দাসাশ্রমের বন্ধু মাঃ বাবু দ্বারকানাথ সরকার ৫৲, বাবু রজনীকান্ত সেন ধুবড়ী ৪৲, বাবু শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী বাবু অন্নদাচরণ সেনের মাতৃশ্রাদ্ধে ২৲, বাবু সোমনাথ রায় ১৲, জমিদার পান্নালাল সিংহ ১৲, জমিদার রাধারমন মজুমদার ১৲, বাবু কৈলাশগোবিন্দ দাস ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ১৲, সবডেপুটী মৌলবী সুজাতালী আহম্মদ ॥০, পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ॥০, জনৈক ভদ্র মহিলা ॥০, ডাঃ হরিনাথ সিংহ ১৲, স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে রংপুর ১৲, বাবু শ্রীগোবিন্দ সেন ৸৴১০, বাবু অনিলচন্দ্র বসু জন্মদিনে ১৲, বাবু হরনাথ ঘোষ ১৲, শ্রীমতী তারামণি দাসী ।২৫, ২১১ পটুয়াটোলা মেসের ছাত্রগণ ॥০, ডাঃ মতীলাল মুখোপাধ্যায় ১৲, শ্রীমতী ক্ষীরোদা মিত্র ১৲, বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।০, বাবু প্রিয়নাথ দত্ত, কন্যার বিবাহে ২৲, বাবু কালিশঙ্কর শুকুল ॥০, বাবু মুক্তিনাথ সেন।০, R. N. Sett Esqr. ১৲, বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু ১৲, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ২৲, A friend of Dasaram ৪৲, বাবু রাখালদাস ঘোষ ১৲, Prosad Lodge Charity Box ।০, বাবু অঘোরনাথ মিত্র, বি, এল পুত্রের অন্নপ্রাশনে ৫৲, সেবালয় দর্শক ৵০।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

পুস্তক বিক্রয় ১০৸৴১০, বাক্সের দান ।৵০, মৃত গোবিন্দের জমা ।/০, খুচরা দান, রংপুর শুদ্ধ ৭৸৴১০, ভুলক্রমে জমা ১০৲, মোট ২৯॥০।

বস্ত্রাদি দান।

একজন বিধবা মৃত কন্যার স্মরনার্থ আম্র ও চাউল। বাবু বিপিনবিহারী সেন, কাপড় ১, বাবু উমাপদ রায় বেডপ্যান ২, বাবু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দোয়াত ১, বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাস ধুতি ২, বাবু সুরেশচন্দ্র দাস কাপড় ২, বেথুন কলেজ মেরুনা ফ্রক ১, বডিস্ ২, সাদা ফ্রক ৯, ইজার বডি ৩, গরম মোজা ১২ জোড়া, পেনিফ্রক ১, সাদামোজা ২ জোড়া, পরদা ২, চাদর ১। J. C. Dutt Esqr Rev J. W. Douglass কাপড় ১ ও চাদর ১।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়।

মাসিক চাঁদা ৩১॥০, এককালীন দান ২১৩৷৴০, অন্যান্য প্রকারে আয় ২৯॥০, গত মাসের হস্তেস্থিত ৩২৸৴৫, মোট আয় ৩০৭৷৴৫।

ব্যয়।

গত মাসের গচ্ছিত শোধ ২০৲, আদায় খরচ ৩০৸৴১০, কর্জ্জদান দাসীকে ৪৲, জিম্মা শোধ ১৷৵০, ভুলক্রমে দুইবার জমায় শোধ ১৸০, খাইখরচ ৬০৷১২॥০, রাঁধুনী ৭৸৵০, মেথর ১০৸৵০, বাটী ভাড়া ৫০৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৩০৲, রোগীর গাড়ী ভাড়া ১৪॥৵৭॥, আসবাব খরিদ ৪৴২॥০, দুগ্ধ ৯৷৴১২॥০, দাহ খরচ ৪৷১০, ধোপা ১৷৵৩, ঔষধ ॥/০, বিবিধ ।৶০, মোট ৩০১॥১৫।

আয় ব্যয়।

মোট আয় ৩০৭।৶৫, পূর্ব্ব মাসের কার্য্যাধ্যক্ষের হস্তেস্থিত ৩৶১২॥০, মোট ৩১০॥১৭॥০, মোট ব্যয় ৩০১॥১৫, বর্ত্তমান মাসের কার্য্যাধ্যক্ষের হস্তেস্থিত ৩/১২॥০, মোট ৩০৪॥৶৭॥০, মোট হস্তেস্থিত ৫৸৶১০।

বিশেষ ধন্যবাদ।

বাবু কালিনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার পত্নীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। সে জন্য আমরা তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

বাবু প্রমথনাথ দত্ত ২৫৲ টাকা এককালীন দান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীমতী তারামণি দাসীর ২৫৲ টাকা বিশেষ দানের জন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বাবু আশুতোষ মল্লিক বিশেষ যত্নসহকারে দ্রবময়ীকে পল্লীগ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া, এবং গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া তাহার পাথেয় সংগ্রহ পূর্ব্বক দাসাশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দাসাশ্রমের বন্ধুর নিকট আমরা চির কৃতজ্ঞ। ভগবান তাঁহার সহৃদয়তার জন্য তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বাবু হরেন্দ্রনাথ ঘোষ অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পাথেয় সংগ্রহ পূর্ব্বক সখীকে আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দাসাশ্রমে সম্প্রতি নিম্নলিখিত জিনিষগুলির নিতান্ত প্রয়োজন। যেগুলি আছে, সমস্ত অত্যন্ত পুরাতন ভগ্ন বা ছিন্ন, সেগুলির দ্বারা আর কাজ চলে না।

প্লেট ১৫ বাটী ২০ গেলাস ১৫ ডাল প্রভৃতি ঢালিবার জন্য বড় বাটী ৪ পট ২০ পিকদানি ২০ জল গরমের কেটলি বড় ১ লেপ কাথা, কাপড়, কাঁচি ১ গজ করিয়া অইল ক্লথ ৪ খানা চামচ বড় ছুরী ১ হারিকেন ২টা এবং ওয়াল ল্যাম্প ৪টা।

যাঁহারা অনাথ নিরাশ্রয় রোগী ও আতুরদিগকে একটু সচ্ছন্দে থাকিতে দেখিলে আনন্দ লাভ করেন আশা করি তাহারা এ সময় উদাসীন থাকিবেন না। এখনও কয়েকটী পুরুষের স্থান খালি আছে।

"দাসী"র মূল্য প্রাপ্তিস্বীকার।

(১০ই মার্চ্চ হইতে ২৬শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত)

১৩৯৩ দামোদর দত্ত ২৲, ৯৬৬ শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী ২৲, ৬১৬ উপেন্দ্রনাথ সেন ২৲, ৬১৭ মনীন্দ্র প্রসাদ বিশ্বাস ২৲, ১০৭ মানসকুমার রায় ২৲, ১১৪৪ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲, ১৩১৫ পরেশরঞ্জন রায় ২৲, ৪৭ দিননাথ গাঙ্গুলী ২৲, হরেন্দ্রনাথ সামন্ত ২৲, ১৯৪৭ নৃসিংহমুরারী পাঞ্জা ২৲, ৩৪২ মহিমচন্দ্র দত্ত ২৲, ১৯৪৮ সুকুমার হালদার ২৲, ১৯৪৯ অবিনাশ চন্দ্র মিত্র ২৲, ১৯৫০ সজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ২৲, ১৯৫৪ রাজচন্দ্র দত্ত ২৲, ৪২ হরিদাসী দেবী ২৲, ১৯৫৬ শ্রীনাথ মজুমদার ২৲, ১৩৭০ শ্রীনাথ চন্দ ২৲, ১৮২৮ তারকনাথ মিত্র ২৲, ১৪৫৪ গুরুদয়াল সিংহ ২৲, ৭০৭ রতিকান্ত মজুমদার ২৲, ১৫৫২ উপেন্দ্রনাথ সেন ২৲, ৫৫১ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ১৪৬৭ কৈলাসচন্দ্র ঘটক ২৲, ২৭৫ নাথমাল চাড়ালিয়া ২৲, ১১৩৯ শশীভূষণ সেন ২৲, ২৯২ প্রমথনাথ সরকার ২৲, ২৯৪ রাজেন্দ্র লাল লাহিড়ী ১৯৬ পুরণচাঁদ ছহ্নার ২৲, ১৫২১ মহেন্দ্রনাথ সেন ২৲, ১৯৬০ সম্পাদক, প্রয়াগ পাঠ-মন্দির ২৲, ১৩৫২ বরদাকান্ত রায় ২৲, ৩৪১ রামরতন গুপ্ত ২৲, ১৭৩৮ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৲, ৪৯ শশীভূষণ তালুকদার ২৲, ১৯৩১ বিহারী লাল সরকার ২৲, ১৯৩২ রাজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার ২৲, ১২৫১ প্রসন্নকুমার গুহ ২৲, ৪৮৬ সম্পাদক, কেদারপুর লাইব্রেরী ২৲, ৯৬৯ সরযূবালা দাসগুপ্ত ২৲, ৯৪৩ রাজেন্দ্রচন্দ্র গুহ ২৲, ১০৮৪ ডাঃ পি, এম," গুপ্ত ২৲. ৭৯ কুমুদিনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ৮৪৪ শিবনাথ সিংহ ২৲, ১১১০ পরেশনাথ অচোর্য্য ২৲, ১৮২৫ কুমার বলভদ্র দেব ২৲, ১৭১২ চিদানন্দ চৌধুরী ২৲, ১৬২৪ উমাচরণ উপাধ্যায় ২৲, ৫১ শ্রীমতী সুভদ্রা দেবী ১৲, ২৩৮ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ২৲, ৩৫৬ ঈশানচন্দ্র বেরা ২৲. ১৯৩৪ সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী ২৲, ৮৪ কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ২৩ কৈলাসচন্দ্র প্রধান ২৲, ৯৪৫ B. N. Dey Esqr. ২৲, ১২৪৭ কালীকুমার রায় ২৲, ৭০৬ শ্রীমতী জ্ঞানদা প্রভা দে ২৲, ১৬৭৮ রাধারমণ সিংহ ২৲, ১৯৩৩ বৈকুণ্ঠনাথ দেব ২৲, ৮২৪ রাধানাথ দেব ১৲, ১৯৬৩ P. L. Roy Esqr. ২৲, ৯১৯ প্রফুল্লচন্দ্র

সেন ২৲, ১৫৫৬ কুমুদনাথ মজুমদার ২৲, ১৫০০ ডাঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲, ৮৬৩ অখিলচন্দ্র বিশ্বাস ১৲, ১৪২৭ ভুবনমোহন বিশ্বাস ৷৷০, ১৩৯২ Mrs. P. Mitter ২৲, ১২৭১ ডাঃ বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ২৲, ১৪৮২ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ১১৪৫ নরসিংহ বসু ৷৷০, ১২৯২ দেবেন্দ্র বিজয় বসু ২৲, ১৭৫৪ বিপিনবিহারী সেন ২৲, ১৫৬০ পূর্ণচন্দ্র দে ২৲, ১৪৬৫ শরৎচন্দ্র দত্ত ১৲, ১৯৬৪ হেমমোহন রায় ২৲, ১৯৬৫ অম্বিকাচরণ মিত্র ২৲, ১৯৬৬ দেবেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ২৲, ১৪৫৯ ধরণীধর মজুমদার ১৲, ১৯৬৭ জগদীশচন্দ্র গোস্বামী ২৲, ১১৬৯ অম্বিকাচরণ দাস ১৲, ১০৮৬ হারাধন বসু ১৲, ১৬৭৫ দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ ১৲. ১৭৬৩ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ১৩৮৬ কুলদাকিঙ্কর রায় ২৲, ১৩০৯ চন্দ্রশেখর রায় ১৲, ১০৯৮ গিরিশচন্দ্র চৌধুরী ১৲, ১৯৬১ দক্ষিণা-প্রসাদ বসু ২৲, ১৩৫৯ S. P. Sinha Esqr. ২৲, ১৩৮২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৲, ১৯৬২ জ্যোতিন্দ্রনাথ সিংহ ২৲, ১৬৩০ শিশিরকুমার দত্ত ১৲, ১৭৯৯ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৲, ১৬৭০ ললিতমোহন শীল ১৲, ১৫৯৩ ডাঃ বিহারীলাল বসু ২৲, ১৮০৫ নন্দলাল দত্ত ২৲, ১৮০০ দয়ালচন্দ্র বসু ২৲, ১৫২৪ চারুচন্দ্র বসু ২৲, ১৪৪৬ গোপালচন্দ্র বসু ২৲, ১১৬০ ডাঃ নীলরতন সরকার ২৲, ৪৩৭ শরৎচন্দ্র রায় ২৲, ক্রমশঃ

দাসী

অমৃতে গরল।

ভারত গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় ও পৃষ্ঠপোষকতায়, এই হতভাগ্য পরাধীন দেশের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিবিহীন কোন কোন সংস্কারকদিগের বাহাবায়, এবং সর্ব্বোপরি আপনাদিগের অমিত উৎসাহে বলীয়ান হইয়া, বুথ সাহেবের মুক্তিফৌজদল সম্প্রতি এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন যে, আমাদিগের দেশের দরিদ্র কৃষকদিগের উন্নতিকল্পে ইঁহারা তাহাদিগের উত্তমর্ণ হইবেন। টাকা, বীজ, আবাস-গৃহ প্রভৃতি যাহা চাহি, তাহাই দিয়া কৃষকদিগের উপকার করিবেন। চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে যখন এই ঘোষণা সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়া অবগত হই, তখন দুঃখে এবং ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, অবশ্যই বুদ্ধিমান্ দেশহিতৈষিগণ এই হিতব্রতের অন্তরালে যে ভবিষ্যৎ অহিত নিহিত রহিয়াছে, তাহা দেশের লোককে বুঝাইয়া দিবেন এবং যাহা হয় একটা প্রতিকারের বিধান চেষ্টা দেখিবেন। কিন্তু কই? দেশহিতৈষীদিগের দৃষ্টি সুধুই আকাশে! কংগ্রেস্, ভড়ং এবং ফাঁকা আওয়াজ লওয়াই সকলে ব্যস্ত; এই ধূলিময় ক্ষুদ্র পৃথিবীর সুখ দুঃখের কথা তাঁহাদের ভাবিবার অবকাশ নাই।

একথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই যে, ঋণবদ্ধ এবং কৃতজ্ঞতাবদ্ধ কৃষকগণ দিন দিন স্বদেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয়দিগের বাধ্য হইয়া উঠিবে, এবং ধীরে ধীরে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাম যদু প্রভৃতির পরিবর্ত্তে জোহন সামুয়েল হইয়া আমাদিগের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া পড়িবে। খ্রীষ্টিয়ান হইলেই যে আমাদিগের সহিত সম্পর্কশূন্য হইবে, এ কথার প্রমাণ কই? প্রমাণ আছে। আমি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা রমাবাই প্রভৃতির কথা বলিতেছি না; কারণ শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে মতভেদ বা ধর্ম্মভেদে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যেখানেই খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেই যে রাজনৈতিক মহানিষ্ট সাধিত হইয়াছে, ইহা আমি বহু স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নানা কারণে

সকল কথা খুলিয়া লেখা গর্হিত; বিশেষতঃ যাঁহারা ইঙ্গিত মাত্রে এ সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না, আমি তাঁহাদের জন্ত এ প্রবন্ধ লিখিতেছি না।

উপমাকেই যুক্তি বলিয়া মনে করিয়া খ্রীষ্টিয়ানেরা বলিয়া থাকেন যে, পুরাতন বোতলে নূতন সুরা রাখিলে যখন বোতল ফাটিয়া যায়, তখন খ্রীষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার আয়োজন স্বরূপে প্রাচীন শরীরমনও পরিবর্ত্তন করাইবার প্রয়োজন। এই পরিবর্ত্তনের ফল এই হয় যে, দেশের প্রাচীনতা এবং গৌরবের প্রতি খ্রীষ্টিয়ানগণ হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন; এবং কাজেই স্বদেশীয় সকল জিনিষকেই ঘৃণা করিতে শিক্ষা করেন। খ্রীষ্টিয়ানদিগের আদর্শ সর্ব্বদাই ফিরিঙ্গিয়ানা; তবে পয়সায় যতদিন না কুলায়, ততদিন নরসিংহ কোন প্রকারে মেষ চর্ম্মাবৃত হইয়া বাস করেন, এই মাত্র। হুঁকার নল্‌চে এবং খোল দুইই পরিবর্ত্তিত হয়, অথচ জোহন নামে প্রাচীন হলধর বাগ্‌দিকে আমাদিগকে চিনিয়া লইতে হয়। যাঁহারা কোন সাঁওতালদিগের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত, তাঁহারাই জানেন যে, এই সকল অসভ্যনামখ্যাত সরল সত্যনিষ্ঠ জাতিয়েরা মাদলের বাদ্যে অধীর হইয়া নৃত্যগীত করিয়া কি প্রকার পবিত্র আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু কোলদিগকে যেখানে খ্রীষ্টিয়ান করা হইয়াছে, সেখানেই তাহাদের খোল ও নল্‌চের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, ইহারা ইহাদিগের একটি সঙ্গীতে গাইয়া থাকে, যে "ঐ শোন মাদল বাজাইয়া শয়তান আমাদিগকে ডাকিতেছে, আর অন্তদিকে ঘণ্টা (গির্জ্জার) বাজাইয়া পরমেশ্বর আমাদিগকে ডাকিতেছেন।" সর্ব্বত্র যখন নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা এইরূপে স্বজাতীয় লোকের প্রতি হীনশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং দেশের গৌরবময় ঐতিহাসিকতার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর বলিতে হইবে কি, যে দেশের কোন সৎকার্য্যে আমরা এই খ্রীষ্টিয়ান-দিগের কোন সহায়তা প্রাপ্ত হইতে পারিব না?

নিম্নশ্রেণী আমাদের সমাজের স্তম্ভ-স্বরূপ; যদি সেই স্তম্ভ ক্ষীণবল বা অপসারিত হয়, তবে আর ভারত সমাজ কি প্রকারে রক্ষা পাইবে? এই আসন্ন বিপদের সময় কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? কোথায় পুনরুত্থান-কারী দল, কোথায় তোমরা? অসার এবং মিথ্যা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা আপনাদের যুক্তিযুক্ত মূর্খতা আর কত দেখাইবে? এ সময়ে ফাঁকা আওয়াজ ছাড়িয়া ভারতের কৃষক জাতির উদ্ধার সংকল্পে কিছু করিতে পার কিনা,

তাহার চেষ্টা দেখিবে কি? কৃষক জাতি আমাদের হাতছাড়া হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। কোথায় ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহপূর্ণ শব্দপ্রিয় বক্তৃতাকারিগণ? লোকে বলে যে একদিন খ্রীষ্টিয়ানীর রাক্ষস করাল হইতে তোমরা শিক্ষিত দলকে উদ্ধার করিয়াছিলে। আজ কোথায় তোমরা? সহরে সহরে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইবার পক্ষে সুবিধা ও সুখ বিলক্ষণ আছে; কিন্তু এই মহাদুর্দ্দিনে আপনার সুখ সুবিধা ভুলিয়া, কৃষকদিগের হৃদয় যাহাতে দেশের সহিত সংযুক্ত থাকে, তাহার জন্য চেষ্টা করিবে কি? সমাজ-ভিত্তি ধসিয়া পড়িলে কলিকাতার কীর্ত্তিস্তম্ভ কোথায় থাকিবে? আর কোথায় তোমরা জমিদারগণ? তোমাদের আশ্রিত হইয়াও যাহারা তোমাদের আশ্রয়, তাহাদের উদ্ধার কামনায় তোমরা কি নিরস্ত থাকিবে? যে কার্য্য বিদেশীয়েরা করিবে বলিয়া অগ্রসর হইতেছে, এ কার্য্যে যদি আজি তোমরা অগ্রসর হও, তবে কাহার সাধ্য যে দেশের ধ্বংস সাধন করে? নিষ্ফল প্রার্থনা হইলেও তোমাদিগের নিকট যুক্তকরে নিবেদন করিতেছি, "হে বুধপ্রমুখ মুক্তিফৌজদল, তোমরা কৃষকদিগের প্রতি অনুগ্রহ কোরে, এই কোরো, অনুগ্রহ কোরো না তাহারে"।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পলাশ-বন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আমি বিবাহ করিতে সম্মত হইলে, জননীদেবীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহার আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আমারও হৃদয় প্রসন্ন হইল। দুই তিন দিন পরে পিতৃদেব কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিলেন; আমরাও পলাশবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জননীদেবী পলাশবনে কিয়দ্দিন বাস করিবেন, এই সংবাদ শ্রবণে গ্রামের মহিলারা অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। প্রায় প্রত্যহই প্রবীণা ও নবীনারা অবসর ক্রমে আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সেই সময়ে আমি সচরাচর বাটীর সংলগ্ন শালবনে প্রবেশ করিয়া একটী মনোরম স্থানে সুকোমল তৃণ-শয্যায় শয়ন করিয়া পুস্তকপাঠে নিমগ্ন থাকিতাম। সেখানে অন্য কোনও জনপ্রাণী আসিত না; কেবল কেশব মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমায় দেখিয়া যাইত

মাত্র। সেই দিনের ঘটনা হইতে কেশব আমার গতিবিধির উপর বিশেষ-রূপে লক্ষ্য রাখিত এবং বনের মধ্যে একাকী শয়ন করিয়া থাকিতে আমাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিত।

আমি পিতৃদেব ও জননীদেবীকে যে এক মাস কাল আমার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তাহার কতিপয় বিশিষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ, আমি এতদিন বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা গম্ভীরভাবে চিন্তা করি নাই। সুতরাং বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য-পথ নির্ণয়ার্থ একটু সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, আমি মনে করিয়াছিলাম, যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহের কথা রাষ্ট্র হইলে, আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রত্যহ গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে যাইতে পারিব না এবং যোগমায়াও আমার সাক্ষাতে কদাচ বাহির হইবে না। এইরূপ ব্যাপার যে, আমার কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তৃতীয় কারণ এই যে, যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহ দিতে আমার জনকজননী মনস্থ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণমাত্র যোগমায়াকে ভাল করিয়া দেখিবার ও জানিবার ইচ্ছাটা আমার মনে স্বতঃই বলবতী হইয়া উঠিল। যোগমায়াকে যে ইতঃপূর্ব্বে দেখি নাই, তাহা নহে। কিন্তু কি জানি কেন সে দেখাটা আমার নিকট যেন "ভাল করি পেখন না ভেল" বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। বিবাহের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, এই "দেখা"র সুবিধা না ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা ছিল।

এইরূপ নানা কারণে, পিতামাতার নিকট আমি উক্ত প্রকার প্রস্তাব করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা আমার ঐ প্রস্তাবের কিরূপ অর্থ বুঝিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমার দূরদর্শিতার ফল আমি সদ্য সদ্যই দেখিতে পাইলাম। জননী পলাশবনে আসিয়া দুই চারি বার গোস্বামী মহাশয়দের বাটী গিয়াছিলেন; গোস্বামী মহাশয়ের পত্নী পুত্রকন্যা সহ দুই চারিবার আমাদের বাটী আসিয়াছিলেন। তাহার পর সাংসারিক কার্য্যাদি নিবন্ধন মার কিম্বা গোস্বামী-পত্নীর প্রায়ই পরস্পরের গৃহে যাওয়া আসা ঘটিত না; কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রকন্যাদের তৎ-সম্বন্ধে সেরূপ কোনও বাধা বিঘ্ন ছিল না। তাই তাহারা প্রায় প্রত্যহই আহারাদির পর আমাদের বাটীতে আসিত। জননীদেবী তাহাদিগকে ত স্বভাবতঃই ভাল বাসিতেন; এক্ষণে সেই ভালবাসা নানা কারণে বর্দ্ধিত

হইয়া উঠিল। বালকবালিকারাও জননীদেবীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল। তাহারা নিয়তই আমাদের বাটীতে যাতায়াত করিত। যদি কোনও দিন কোনও কারণে না আসিতে পারিত, জননীদেবী তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আনয়নের জন্য মঙ্গলাকে প্রেরণ করিতেন। আমি দ্বিপ্রহরের সময় গৃহে বড় একটা থাকিতাম না। আমি সচরাচর এই সময়ে বনমধ্যে সেই তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে শয়ন করিয়া ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতা পাঠ করিতাম।

একদিন গ্রামের মহিলারা চলিয়া গেলে, আমি গৃহে প্রবেশ করিয়া পাঠাগারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, আমার পুস্তকগুলি কে অতিশয় সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। কেশব পুস্তকগুলি প্রত্যহ ঝাড়িয়া রাখিত বটে; কিন্তু সে তাহাদিগকে যথোপযুক্তরূপে বিন্যস্ত করিতে পারিত না। কিন্তু আজ তাহাদিগকে সাজানো গোছানো দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম এবং কৌতূহলপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ মঙ্গলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মঙ্গলা আজ আমার বইগুলি কে এমন ক'রে সাজালে?"

মঙ্গলা একটু গম্ভীরভাবে বলিল, "যার কাজ দাদাঠাকুর, সেই সাজিয়েছে।"

আমি বলিলাম, "কই, কেশব ত একদিনও এমন ক'রে বই সাজিয়ে রাখ্‌তে পারে না? তবে কি তুই সাজিয়েছিস্?"

মঙ্গলা বলিল, "না দাদাঠাকুর, আমরা কি ওসব কাজ ক'র্‌তে পারি? ভাল করে ঘর ঝাঁট্ দিতে বল, আনাজ কুট্‌তে বল, বাসন মাজতে বল, কাপড় কাচ্‌তে বল, তা এমন ক'রে ক'রবো যে, কেউ চোখের মাথা খেয়ে একটুও খুঁৎ ধরতে পার্‌বে না। কিন্তু দাদাঠাকুর, আমরা মুখ্যু সুখ্যু লোক, আমরা কি তোমার বই গুছিয়ে রাখ্‌তে পারি? যে সংস্ক জানে, ভট্‌চাযিার মতন পড়্‌তে পারে, আর লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত, সে নইলে কি আর কেউ ওসব কাজ ক'র্‌তে পারে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কে সাজালে? মা ত এ ঘরে আসেন নাই? সংস্ক কে জানে? ভট্‌চাযিা কে?"

মঙ্গলা বলিল, "তাইত মা তো পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গল্পেই মত্ত ছিলেন; ওঁর অপ্‌সর কোথায়? আর অপ্‌সর থাক্‌লেই কি উনি তোমার বই এমন করে সাজিয়ে রাখ্‌তে জানেন?"

আমি ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া বলিলাম, "তবে কি ভূতে বই সাজিয়া গেল?"

মঙ্গলা বড় ভূতের ভয় করিত!

ভূতের নামে সে শিহরিয়া উঠিল; তার পরেই বলিতে লাগিল, "আঃ আমার পোড়া কপাল। ভূতে সাজাবে কেন গো? তোমার কি ধারার কথা গো? ভূতেই এই সব কাজ করে না কি?"

আমি আরও একটু চড়িয়া বলিলাম, "তবে কে সাজালে রে, পোড়ার-মুখি, তাই খুলে বল্ না?"

মঙ্গলার মুখখানা মেঘের মত হইল। চক্ষু দুটি যেন ছল ছল করিতে লাগিল; সে বলিল, "দাদাঠাকুর, তুমি গাল দিচ্ছ, দাও; আমি কিন্তু কিছু জানি টানি নে। আমি নিজের কাযেই ব্যস্ত; কে তোমার বই সাজালে, কে তোমার কি কল্লে, অত শত, খবর আমি রাখি নে; আর রাখ্বার আমার অপ্সরও নেই।" এই বলিয়া মঙ্গলা গমনোদ্যতা হইল।

আমি বলিলাম, "বেশ কথা, যাও। কিন্তু দেখো, এঘরে আর একলা এস না। ঐ যে জানালার কাছে চাঁপা গাছটি দেখ্চো,—যার ডাল এসে জানালার ভিতর উঁকি মার্চে,—ঐ গাছে একটী ব্রহ্মদৈত্যি আছে। সেই মাঝে মাঝে এসে আমার বইগুলি গুছিয়ে টুছিয়ে যায়। আজও ভর্ত্তি দুপুর বেলায় সে নিশ্চয়ই এসে থাক্বে। আমি বামুন কিনা; এই পৈতে দেখে কিছু বলে না। কিন্তু তুই সুদ্দুরের মেয়ে—খপরদার এ ঘরে একলা আসিস্ না; একলা দেখ্তে পেলেই তোর ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত চুষে খাবে। এইটী বুঝে শুঝে কাজকর্ম্ম করিস্।"

ব্রহ্মদৈত্যের কথা শুনিতে শুনিতে মঙ্গলা ভয়ে চক্ষু মুদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে নামিতে কেশবের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। বৈকালের সময় সিঁড়ি প্রায় অন্ধকারময় হইয়াছিল। কেশব যে উপরে আসিতেছিল, তাহা মঙ্গলা দেখিতে পায় নাই। ভয়ে তাহার কিছু দেখিতে না পাইবারও কথা। যেমন মঙ্গলা কেশবের ঘাড়ে গিয়া পড়িয়াছে, অমনি কেশব আহত হইয়া ক্রোধে তাহাকে এক চড় মারিয়াছে। মঙ্গলা তাহাকে সত্য সত্যই ব্রহ্মদৈত্য মনে করিয়া, "বাপ্ রে ম'লাম রে; বেহ্মদৈত্যিতে খেলে রে", এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে তিন চারিবার আছাড় খাইয়া নীচের বারাণ্ডায় গিয়া পড়িল। তাহার চীৎকার শুনিয়া জননী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'লো, মঙ্গলা? কি হ'লো, মঙ্গলা?"

আর কি হ'লো মঙ্গলা! মঙ্গলা কি আপনাতে আপনি আছে যে, সে উত্তর দিবে? মঙ্গলা কেবল চীৎকার করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কান্দিতে কান্দিতে বলিল, "ও, মা গো—আমায় ব্রহ্মদৈত্যিতে ধ'রে ছিল গো—আমি এখনি ম'রে ছিলুম গো"—

জননী বলিলেন, "ব্রহ্মদৈত্যি কি লো? ব্রহ্মদৈত্যি কোথায় লো?"

"ও গো, সিঁড়িতে গো!"

মা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সিঁড়িতে কি লো? এই যে কেশব উপরে যাচ্ছিল! তা'কেই তো আমি উপরে পাঠালুম! দেখ্, ছুঁড়ি, তুই চোখে দেখ্‌তে না পেয়ে বুঝি তারই ঘাড়ে প'ড়েচিস্?"

মঙ্গলা ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া বলিল, "ওমা, কেশব হ'বে কেন গো? ওমা, বেহ্মদৈত্যিটা যে কাল ঢেঙ্গা মুস্কো জোয়ানটার মতন গো! ওমা, আর একটু হ'লেই যে সে আমার ঘাড়টা মট্‌কে ফেলেছিল গো!"

মঙ্গলার কথা শেষ না হইতে হইতে কেশব নীচে গিয়া বলিল, "মা ঠাকুরা'ণ, সত্যি বটে, আর একটুকু হ'লেই আমি ইয়ার ঘাড়টা মচড়ে ফেল্‌ত্যম। আমার নাকের উপরে এমন জোরে মাথা ঠুকেছিল যে এখনও নাকটা ঝন্‌ঝনাচ্চে।"

মঙ্গলা তখন দাঁড়াইয়া বলিল, "হেঁ রে ছোঁড়া, তুই আস্‌ছিলি, তা আমায় ব'ল্‌তে নেই? আর তোর হাত কি শক্ত রে? হেঁ রে এমনি জোরেই চড় মার্‌তে হয়?—মা গো—আমি তোমায় গড় কর্‌চি গো—তুমি আমায় ছেড়ে দেও গো—আমি আর তোমাদের বাড়ীতে থাক্‌ব না গো—বাপরে, আমায় একটা চাকরের হাতেও মার খেতে হ'লো? বগলা ঠাক্‌রোন আমায় এখানে আস্‌তে সত্যিই মানা ক'রে ছিল গো! দাদা ঠাকুরের কেশবা এক বেহ্মদৈত্যি; আবার তার সত্যিকার একটা বেহ্মদৈত্যি আছে গো। সে নাকি জানালার ধারে ঐ চাঁপাগাছে থাকে! মা গো, তোমরা বামুন গো, তোমাদের সে কখনও কিছু কর্‌বে না গো। আমি শুদ্দুরের মেয়ে, সে কোন্ দিন আমারই প্রাণটা বধে ফেল্‌বে গো। সে দাদাঠাকুরের সঙ্গে কথা কয় এবং তার বই সাজিয়ে দিয়ে যায়। আজ নাই যোগমালা ও আমি বই সাজিয়েছিলাম, কিন্তু সে যে নিত্যই বই সাজিয়ে দিয়ে যায় গো। যদি কেশ্‌বার হাতে বাঁচি, তা হ'লে তার হাতে যে রক্ষে নেই গো! হায়, হায়, মা গো—শেষকালে বেহ্মদৈত্যির হাতে আমার মরণ

ছিল ?” এই কথা বলিতে বলিতে মঙ্গলা দাসীর শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। সে পা ছড়াইয়া, সপ্তমে স্বর তুলিয়া, মৃত জননীকে উদ্দেশ করিয়া দস্তুরমত ক্রন্দন করিতে বসিল। সেই ক্রন্দনে গীতির অনেকগুলি করুণ পদ ছিল ; কিন্তু তাহার প্রধান ধুয়ার অর্থ এই প্রকার :—“মঙ্গলা দাসীর অভাগিনী জননী তাহাকে কি বেহ্মদৈত্যির হাতে মারিবার জন্যই গর্ভে ধরিয়াছিল ?”

মঙ্গলা দাসীর অভাগিনী জননী আজ বাঁচিয়া থাকিলে অবশ্যই আদরিণী কন্যার এই প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক উত্তর দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিত। কিন্তু তদ্বিষয়ের কোনও সম্ভাবনা না থাকায়, অগত্যা আমার জননীদেবীই মঙ্গলাকে তাহার প্রশ্নের একটা সদুত্তর দিয়া ক্রন্দন সম্বরণ করিতে বলিলেন ; কিন্তু তাহাতে মঙ্গলা দাসীর কণ্ঠস্বর নিবৃত্ত না হইয়া অপ্রত্যাশিতরূপে দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া জননীদেবী অবিচারিতচিত্তে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন।

মঙ্গলা বাষ্পজলে সমাচ্ছন্ন থাকায় এতক্ষণ চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে, ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া দেখিল, তাহার নিকটে কেহই নাই! মঙ্গলা তবে এতক্ষণ অরণ্যে রোদন করিতেছিল! ঠিক্ এই সময়ে কেশবচন্দ্র মঙ্গলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, “ও মঙ্গলা, তুই অত কাঁদ্‌চুস্ কেনে ? বেহ্মদৈত্যি কুথায় যে, তোর ঘাড় মোচাড়বেক্ ? বেহ্মদৈত্যি থাক্‌লে আমাকে এত দিন রাখ্‌তোক্ না কি ? আমি যে কত দিন এক্‌লাই এই ঘরে শুয়েছিল্যাম।”

কেশবকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া মঙ্গলা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিল, “ওরে, ডাংপিটে, সর্ব্বনেশে ছোঁড়া তুই বকিস্‌নে, পালা আমার সাম্‌নের থেকে—ওরে ছোঁড়া বেহ্মদৈত্যি তোর আর কি কর্‌বে ? ম’লে তুইও যে বেহ্মদৈত্যি হবি রে ?”

কেশব বলিল, “আচ্ছা, এখন গাল দিচ্চু্‌স্ দে ; রেতের বেলায় দেখা যাবেক্। হে বেহ্মদৈত্যি ঠাকুর, তুমি সব শুনে রাখ্‌বে।” এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মঙ্গলার বড় ভয় হইল। কেশব চলিয়া গেলে সে আস্তে আস্তে উঠিয়া জননীর নিকট গমন করিল এবং অনুচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল :—“মা, দাদাঠাকুরের শিগ্‌গীর বিয়ে দিবে তো দাও, আমি আর এখানে থাক্‌তে পার্‌বো

না। দাদাঠাকুর বউ নিয়ে এখানে থাকুক। আমরা আমাদের বাড়ীতে যাই চল। বন জঙ্গলে আমাদের কাজ নেই ; আমাদের সেই বাড়ীই ভাল। ওগো যেমনি দাদাঠাকুর, বউটিও তেমনি হ'বে দেখ্‌চি। বউ কত লেখাপড়া সংস্ক জানে, ভট্টচায্যি ঠাকুরের মতন মন্তর পড়ে, আবার দাদাঠাকুরের মতন বনে বেড়া'তেও ভাল বাসে। সে আইবুড় মেয়ে, রোজ রোজ বনে ফুল তুল্‌তে যায়। হেঁগা, বলি, আইবুড় মেয়ের কি যখন তখন ফুলের গাছ ছুঁতে আছে ? ফুলগাছে ঠাকুর দেবতা কত কি থাকে। কখন্ কি হবে, তার ঠিক্ কি ? এদের কারুর সঙ্গেই আমার ব'ন্‌বে না বাছা। আবার চাকরটিও তেমনি হ'য়েচে। বাবা বাড়ী এলেই দাদাঠাকুরের শীগ্‌গির বিয়ে দিয়ে দাও। আমি আর এখানে থাক্‌তে পার্‌বো না। আমি গরীবের বাছা ; কোন্ দিন ভূতের হাতে আমার পরাণটা যাবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মঙ্গলা চুপ করিল। বোধ হয়, ভূতের হাতে মরণের কথা ভাবিয়া তাহার চক্ষে আবার জল আসিয়াছিল।

জননী বলিলেন, "তুই ছুঁড়ি কেঁদে মরিস্ কেন ? ভূত দেখা দূরে থাক্, ভূতের নাম শুনেই যে ম'লি ! দেবুর সঙ্গে তুই লাগিস্, তাইতো দেবু তো'কে ভয় দেখায় ?"

মঙ্গলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হেঁ, আমিই লাগি বুঝি ? তুমি তো সব জান ? আগে বিয়ের নামে জ্ব'লে যেত, এখন একশ বার যোগমালার কথা জিজ্ঞেস করা হ'চ্চে ! আমি মেয়ে মানুষ, অত মার পেঁচ কি বুঝ্‌তে পারি ? আর ওঁর মত বেহায়াপনাও আমি ক'র্‌তে পারি না।"

আমি দেখিলাম, তামাসা মন্দ নয়। ঈষৎ ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে ডাকিলাম, "মঙ্গলা।"

মঙ্গলার কণ্ঠস্বর একেবারে নিস্তব্ধ হইল। সেই বৃহৎ বাটী খানিতে অনেকক্ষণ আর মানব-কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মঙ্গলার প্রকৃতিই এইরূপ। মঙ্গলা মিথ্যা কথার একটী বৃহদায়তন ঝুড়ি। মঙ্গলা যাহাকে বুঝিতে পারে না, তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করে এবং সুযোগ পাইলেই তাহার পৃষ্ঠে বিষদন্ত বসাইয়া দেয়। মঙ্গলার দংশনে

প্রাণের কোন আশঙ্কা হয় না বটে, কিন্তু তাহার জ্বালা বড়ই তীব্র এবং সেই জ্বালা ক্ষণস্থায়িনী হইলেও যারপরনাই অসহ্য। আধ্যাত্মিক অর্থে, বগলা সুন্দরী ও মঙ্গলাদাসী উভয়েই সহোদরা; কেহ কেহ বলেন, যমজ-ভগিনী। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবও যথেষ্ট ছিল। এই কারণে সকলেই ইহাদিগকে ভয় করিত; আমিও করিতাম।

মঙ্গলা যতক্ষণ প্রসন্ন থাকে, ততক্ষণ সে মঙ্গলময়ী। কোনও কারণে অপ্রসন্না হইলে, সে মূর্ত্তিমতী চণ্ডী। যাহার উপর মঙ্গলার ক্রোধ হয়, সুযোগ পাইলে মঙ্গলা তাহাকে নিজ হলাহল দ্বারা জর্জ্জরিত করিবেই করিবে। কিন্তু ক্রোধের নিবৃত্তি হইয়া গেলে, মঙ্গলা নিজের উপর উৎপীড়ন, আক্রোশ ও প্রতিহিংসার আশঙ্কা করিতে থাকে। এই কারণে সে যতক্ষণ অপকৃত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মনে আর কিছুতেই শান্তি থাকে না। তোষামোদ, ক্রন্দন, অসরল অপরাধ স্বীকার যেরূপেই হউক, সে অপকৃত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট না করিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইবে না। মঙ্গলার প্রধান ভয়, পাছে কেহ শত্রুতাচরণ করিয়া তাহাকে কোনও ভৌতিক ব্যাপারে ফেলিয়া দেয়! মঙ্গলা মৃত্যু অপেক্ষাও ভূতকে অধিকতর ভয় করিত! এই ভূতভীতিই মঙ্গলাকে মানবীর পদে অবিচ্যুত রখিয়াছিল। নতুবা সে যে কি হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা হউক, অপকৃত ব্যক্তিকে কোনও রূপে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই মঙ্গলার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মঙ্গলা অপর এক ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিয়া বসিত। এইরূপে প্রায় দেশশুদ্ধ লোকেরই সহিত মঙ্গলার বিবাদ হইত, আবার দুই দিন পরে অক্লেশে সেই বিবাদ মিটিয়াও যাইত। বিবাদ মিটিয়া যাইত বটে, কিন্তু কেহই তাহাকে দুইটী চক্ষে দেখিতে পারিত না।

আমাদের গৃহেও মঙ্গলা প্রচুর অশান্তি আনয়ন করিত। মঙ্গলা জনক-জননীহীন এবং অল্প বয়সে বিধবা হইয়া অনাথা হইলে, জননীদেবী তাহাকে আমাদের গৃহে আশ্রয় দেন। সেই অবধি সে আমাদের গৃহে, যেন আমাদের কোনও আত্মীয়ার ন্যায়, বাস করিতেছে। আমরা কেহই তাহাকে একটী দিনও দাসী বলিয়া ভাবি নাই। জননীদেবী তাহাকে মাতৃস্নেহে পালন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার সমস্ত "জ্বালা"ই অম্লান-বদনে সহ্য করিতেন। আমরাও তাহাকে আমাদের ভগিনীর তুল্য মনে

করিতাম। আমি যখন বালক ছিলাম, তখন মঙ্গলা আমাকে মধ্যে মধ্যে কঠোর ভাবে তাড়না করিত। আমিও সেই কারণে তখন তাহাকে বড় ভয় করিতাম। এখন আমি বড় হইয়াছি; বড় হইয়া আমি নিজের ইচ্ছামত কার্য্যাদি করিতেছি। কার্য্যগুলি আমার মনোমত হইলেও মঙ্গলা অনেক-গুলির অনুমোদন করিত না। সেই কারণে, সে আমার উপর মনে মনে অতিশয় অসন্তুষ্টা থাকিত। অসন্তুষ্টা থাকিত বটে, কিন্তু আমার সাক্ষাতে সে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিত না। তবে আমার উপর কোনও দিন রুষ্টা হইলে, সে অসাক্ষাতে আমার যথেষ্ট নিন্দা করিত। অদ্যও তাই আমার উপর অপ্রসন্না হইয়া, সে জননীর সমক্ষে একটু বিষ উদ্গীর্ণ করিয়া ফেলিল। আমি কিন্তু তাহাকে বিষোদ্গীরণ করিতে দেখিলাম; এবং আমি যে তাহা দেখিয়াছি, ইহা তাহাকে জানাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। মঙ্গলা ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইল। আড়ষ্ট হইবার একটী প্রধান কারণ ছিল—তাহা ব্রহ্মদৈত্যের সহিত আমার তথাকথিত সখ্য বা সাহচর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সে দিন মঙ্গলার মনে ঝড় বহিতে লাগিল। মঙ্গলা আমার নিকট অপ-রাধিনী ছিল; সুতরাং সে দিন সে আমার আর সম্মুখীন হইতে পারিল না। আমি কিন্তু বাস্তবিক তাহার উপর রাগ করি নাই। এইরূপ একটী না একটী ঘটনা প্রায় নিত্যই উপস্থিত হইত। এমত স্থলে কতই আর রাগ করা যাইবে? মঙ্গলার ভাব গতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি একটী কথা কহিলেই সে যেন কৃতার্থ হইয়া যায়। সুতরাং পরদিন প্রাতঃকালে মঙ্গলা যখন গৃহমার্জ্জন করিতে আমার পাঠগৃহে উপস্থিত হইল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম, "কি মঙ্গলা, কাল বড্ড লেগেছিল না কি?"

মঙ্গলা বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিল, "লাগে নি আবার দাদাঠাকুর? কেশ্‌বা ছোঁড়া এমন জোরে চড় মেরে ছিল যে, আমার গালে পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ ব'সে গেছল। আর কাল এমন মাথাও ধ'রেছিল যে আমি সারারাত্রির মধ্যে একটীবারও মাথা তুল্‌তে পারি নি। আর প'ড়ে গিয়ে আমার হাঁটু টাটুও ছ'ড়ে গেছে। আজ পায়ে ভারি বেদনা হ'য়েচে।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু হইতে দুই চারি বিন্দু অশ্রু পড়িল।

আমার সহানুভূতির উদ্রেক করাই মঙ্গলার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবিক তাহার অবস্থা দেখিয়াও আমি বড় দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম।

আমার মনে হইল, মঙ্গলাকে ভূতের ভয় দেখাইয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। গত কল্যই আমার মনে অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক মঙ্গলার অবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমি বলিলাম, "মঙ্গলা, আমি বড় লজ্জিত হ'য়েচি। তুমি যে প'ড়ে গিয়ে এত কষ্ট পাবে, তা আমি ভাবি নাই। যা' হোক তুমি কিছু মনে ক'রো না। আর কেশব ছোক্‌রাও বড় গোঁয়ার দেখ্‌ছি। লাগ্‌লোই বা তার নাকে। তা ব'লে কি মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুল্‌তে হয়? তুমি কিছু মনে ক'রো না. মঙ্গলা। আমি তাকে সাবধান ক'রে দেবো।"

এই সহানুভূতি বাক্যে মঙ্গলার অশ্রুপাত আরও প্রবল হইয়া উঠিল। নীরবে মঙ্গলা অনেকক্ষণ কাঁদিল, তার পর ঈষৎ সংযত হইয়া বলিল, "দাদা-ঠাকুর, অভাগিনীর উপর কি তোমাকে রাগ কর্‌তে হয়? আমি রাগের মাথায় কখন কি বলে ফেলি, তার ঠিক থাকে না। তুমি আমার উপর রাগ টাগ ক'রো না। আমার গদাই ভাইয়ের চেয়েও তুমি আপনার। তোমরা আছ ব'লে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তা নইলে অকূলপাথারে আজ কোন্ দিক ভেসে যেতাম। যে ক'দিন বেঁচে থাকি, তোমরা আমায় পায়ে ঠেলো না।"

আমি বলিলাম, "মঙ্গলা, তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন? আমরা কি কখন তো'কে কিছু বলি? কাল তুই মা'কে কত মিথ্যে কথা বল্‌লি। ভাব্‌লুম, রাগের মাথায় যা বল্‌চে বলুক গে। তোর কথায় আমি আদবে রাগ করি নাই।"

মঙ্গলা অম্লানবদনে বলিল, "আমি কাল কি বলেছি, দাদা, তা আমার মনে নেই। তুমি কিছু মনে টনে ক'রো না। আমার পোড়া কপাল, তাই আমি তোমার সঙ্গে হাসি তামাসা কর্‌তে গেছ্‌লুম। যোগমায়া আর আমি কাল তোমার বই সাজিয়েছিলুম্। সে সব কথা তোমাকে পরে বল্‌ব মনে ক'রেছিলুম। কিন্তু তুমি বেহ্মদৈত্যি ঠাকুরের যে ভয় দেখালে!— হেঁ দাদা ঠাকুর, সত্যি এই চাঁপা গাছে ঠাকুর আছে?"

প্রশ্ন করিতে করিতেই মঙ্গলার গায়ে কাঁটা দিল এবং সে করজোড়ে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "দূর্ পাগ্‌লি, বেহ্মদৈত্যি আবার কোথায়? ও সব ঠাকুর টাকুর মিছে কথা; আমি তোকে ভয় দেখাচ্ছিলুম।"

মঙ্গলা আমার কথায় যেন অবিশ্বাস, করিয়া বলিল, "না দাদাঠাকুর, তুমি আমায় ভোলাচ্চ।"

আমি বলিলাম, "আমি তোকে সত্যি বল্‌চি, চাঁপাগাছে ব্রহ্মদৈত্যি নাই। ভয় কর্‌লেই ভয় হয়। আমি তোকে একটী কথা বলে দিচ্চি, সেইটী মনে রাখিস্‌। তোর যখনই ভয় হ'বে, তখনই তুই ভগবান্‌কে মনে কর্‌বি। তা হ'লে আর তোর ভয় হ'বে না।"

মঙ্গলা বলিল, "আচ্ছা, রাম নাম কর্‌লেও তো ভূতের ভয় হয় না?"

আমি বলিলাম, "সে একই কথা। রাম নামই কর্‌বি।"

মঙ্গলা যেন কিছু আনন্দিত হইয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, তুমি যে আমায় স্নেহ কর ও আমার মঙ্গল ভাব, তাকি আমি জানি না? যোগমায়ার কথা আমি যা যা জেনেছি, তোমায় এক সময় সব ব'লব। ঐ শোন, মা কি জন্যে ডাক্‌চে, একবার শুনে আসি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "যা"। ভূতের ভয় তিরোহিত হইল, আমিও প্রসন্ন হইলাম। মঙ্গলার আর আনন্দ দেখে কে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যোগমায়া সম্বন্ধে মঙ্গলা কি জানিয়াছে, তাহা অবগত হইবার জন্য আমার একটু ঔৎসুক্য জন্মিল। জননীর মুখে শুনিলাম, যোগমায়ারা তিন চারি দিন আমাদের বাড়ী আসে নাই। মঙ্গলা তাহাদিগকে ডাকিতে গেলেও যোগমায়া আমাদের বাড়ী আর আসিতে চায় না! কথা শুনিয়া একটু বিস্মিতও হইলাম। ব্যাপার কি, তাহা অবগত হইবার জন্য একদিন মঙ্গলাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মঙ্গলা, যোগমায়া আর আমাদের বাড়ী আসে না কেন? তুই আজ তা'দের ডাক্‌তে গেছ্‌লি?"

মঙ্গলা বলিল, 'এই তো আমি ওদের বাড়ী থেকে আস্‌চি দাদা। যোগ-মায়া কোন মতেই আস্‌তে চায় না।"

"কেন?"

"তা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌ব? ওর মা ওকে আমার সঙ্গে আস্‌তে কতবার বল্লে। কিন্তু সে না এলে আমি কি ক'র্‌বো?"

"তবে তুই কিছু ব'লেছিস্‌ না কি?"

আর মঙ্গলা যায় কোথায়? এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র অকপট-হৃদয়া মঙ্গলা দাসী কাঁদিয়া দেশ গোল করিবার উদ্যোগ করিল। মঙ্গলা

এই তিন চারি দিনের মধ্যে ব্রহ্মদৈত্য ঠাকুরের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্ব স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। মঙ্গলার ভাবগতিক দেখিয়া আমার মনোমধ্যে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। হয়ত সে যোগমায়াকে আমার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিয়াছে, তাই সে আমাদের বাড়ীতে আর আসিতে চায় না। আর এই কারণেই হয়ত আজ ক'এক দিন তাহাকে গোস্বামী মহাশয়ের ভাগবত পাঠের সময়ও দেখিতে পাইতেছি না! সন্দেহটা উপস্থিত হইবামাত্র মনের ভাব গোপন করিয়া মঙ্গলাকে বলিলাম, "তুই মিছেমিছি চেঁচিয়ে দেশ গোল ক'চ্চিস্ কেন, মঙ্গলা? ভাল চাস্ তো চুপ্ কর্।"

মঙ্গলা কিন্তু নীরব হইল না। সে অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্গদকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তোমার ও কি কথা, দাদাঠাকুর? আমি কি সে কথা বল্তে পারি?"

আমি বলিলাম, "কি কথা?"

মঙ্গলা আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। বলিল, "এই যে, সেই কথা—যে কথা তুমি ব'ল্‌তে মানা ক'রেছ—আমি কি সে কথা কখন পেকাশ ক'র্‌তে পারি, দাদাঠাকুর? এই সেদিন তুমি আমাকে তোমার বই সাজানো নিয়ে কত কথা জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লে। কই, আমি তোমাকে কিছু ব'লে-ছিলুম?"

শ্রীমতী মঙ্গলা দাসী তাহার বাক্য গোপন করিবার শক্তিটি যে আমার উপরেই প্রয়োগ করিবেন, তাহা আমি প্রথমে তত ভাবি নাই। যাহা হউক মঙ্গলার উত্তরটা আমার নিকট ঠাকুর গৃহে কদলী-ভক্ষণ-সম্বন্ধীয় অস্বীকারের ন্যায় বোধ হইল। সন্দেহ ক্রমেই বিশ্বাসে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। মঙ্গলাই যে সেদিন যোগমায়াকে আমার বিবাহের কথা বলিয়া দিয়াছে ও সেই কারণেই যে যোগমায়া আমাদের বাড়ী আর আসিতে চাহিতেছে না, ইহাই আমার নিকট খুব সম্ভবপর বোধ হইল। আমি কথাটি রাষ্ট্র করিতে তাহাকে ও জননীদেবীকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম। মঙ্গলা এই কথা প্রকাশ করিয়া আমার নিকট অপরাধিনী হইয়াছে; সুতরাং সে যে সহজে সত্য কথা বলিবে বা অপরাধ স্বীকার করিবে, তাহা বোধ হইল না। অগত্যা আমিও চতুরতা অবলম্বন করিয়া কৌশলক্রমে তাহার নিকট হইতে সত্য কথা বাহির করিয়া লইতে তৎপর হইলাম।

আমি বলিলাম, "যোগমায়ার বই সাজানোর কথা তুই আমাকে সেদিন বলিস্ নাই, তা সত্যি বটে। কিন্তু যোগমায়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'বার কথাটা তুই তা'কে ব'লে থাক্‌লেও থাক্‌তে পারিস্। আর বলাই সম্ভব। যখন আর দু'দিন পরেই তার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে যাচ্চে, তখন বলার আর দোষ কি ?" এই বলিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুই যোগমায়াকে কি ব'লেছিলি, আর যোগমায়াই বা কি ব'ল্লে ?"

আমি যদি গাছের তলে তলে ভ্রমণ করি, মঙ্গলা গাছের আগায় আগায় ফিরিতে থাকে। আমার প্রশ্ন শুনিয়াই মঙ্গলা সাক্ষাৎ সরলতা ও নির্দ্দোষিতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিস্ময়সূচক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওমা, তোমার কি ধারার কথা গো! ওমা, আমি কোথায় যাব গো! এ সব মিছে কথা তোমায় কে লাগাচ্চে গো! বুঝেছি, পোড়ার মুখো কেশবাই আমার উপর বাদ্ সাধ্‌চে!"

আমি দেখিলাম, এ ভাবে চলিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাই তাহাকে বলিলাম, "কেশবকে তুই অকারণ গাল দিচ্চিস্ কেন ? সে আমায় কিছুই বলে নাই। আর ও কথা নিয়ে তোকে অত ব্যাকুল হ'তে হবে কেন ? তুই কিছু বলিস্ নাই তো বলিস্ নাই। আর যদি ব'লেই থাকিস্, তাতেই বা কি হ'বে ? যাক্—যোগমায়া আমার পড়্‌বার ঘরে ব'সে সেদিন সংস্কৃত পড়্‌ছিল না ?"

"সংস্ক মংস্ক অত কে জানে, দাদা। যোগমায়া তোমার সেই বড় বইখানা টেনে পাতা গুলো উল্টে পাল্টে পড়্‌ছিল।"

"ভট্‌চার্য্যি ঠাকুর যে রকম পুঁথি পড়ে, সেই রকম ক'রে পড়্‌ছিল, বল্‌ছিলি না ?"

"হাঁ, তা বই কি ? আমার তো ভারি হাসি পাচ্ছিল।"

"তার পর ? যোগমায়া কিছু বল্লে ?"

"বল্লে বই কি। যোগমায়া বই গুলোর দুরবস্থা দেখে, কেশ্‌বার নিন্দে ক'র্‌ছিলো। আমি বল্লুম, না হয় তুমিই বোন্ সাজিয়ে দাও। আমি নিজে বই সাজাতে জান্‌লে কি এমন হ'য়ে থাকে ? আমার কথা শুনে যোগমায়া বইগুলি গুছিয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌লো, আর আমি ধূলো ঝেড়ে দিতে লাগ্‌লুম। যোগমায়ার স্বভাবই ঐ রকম ; কোথাও একটু অপরিষ্কার বা ময়লা দেখ্‌তে পারে না। যোগমায়া যখনই আমাদের বাড়ী আসে, তখনই মার বাসনপত্র

সাজিয়ে দিয়ে যায়; আল্‌নার একখানি কাপড় বেমানান হ'য়ে থাক্‌লে তখনি সেটি ঠিক্ ক'রে দেয়। মা তো যোগমায়াকে দেখে আনন্দে আটখানা হন। মা বলেন, যোগমায়া আমার যেন কত আপনার। যোগমায়া বৌ হবে, এই কথা মনে হ'লে মার তো আর আনন্দ ধরে না।"

"আচ্ছা, তা নাই হ'লো। তার পর যোগমায়াকে তুই কি ব'লেছিলি?"

মঙ্গলা ঝটিতি আত্মরক্ষায় তৎপর হইল। সে বলিল "ওমা আমি আবার কি বল্‌বো গো? তোমার ঐ এক কি ধারার কথা গো?" আমি দেখিলাম, মঙ্গলাকে সহজে আঁটিয়া উঠিতে পারিবার যো নাই। তাই ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলাম, "আচ্ছা মঙ্গলা, ভেবে দেখ্, আর দুদিন পরেই তো যোগমায়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে যাবে। তখন তো আর কোন কথা ছাপা থাক্‌বে না? সবই জান্‌তে পার্‌বো। তবে আর লুকোচুরিতে কাজ কি? ভাল মানুষের মতন সব কথা ব'লে যা।"

মঙ্গলা আমার কথা শুনিয়া যেন কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল। তার পর সে বলিল, "দাদাঠাকুর, তবে বলি শুন; রাগ ক'রো না। আজ কাল্‌কের মেয়েগুলো বড় সেয়ানা; মুখ ফুটে কিছু বলে না, তাই। তা নইলে মনের ভাব আর বুঝ্‌তে পারা যায় না?"

আমি বলিলাম, "তুই যোগমায়ার মনের ভাব কি বুঝেছিস্, বল্।"

"কিছু হো'ক্ বুঝেছি।"

"কি বুঝেছিস্, তাই খুলে বল্ না।"

"আচ্ছা, দাদাঠাকুর, সুশীলা তোমার কথা উঠ্‌লে 'দেবেন বাবু, দেবেন বাবু' বলে। কিন্তু যোগমায়া কেন একটী দিনও তোমার নাম করে না?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "নাম করে না তো তা'তে কি হ'লো? যোগমায়া আমার নাম ক'র্‌বার কোনও দরকার দেখে না, তাই সে নাম করে না। মিছেমিছি একটা ভদ্রলোকের নাম করার ফল? সুশীলা ছেলেমানুষ, যার তার কাছে, তার ছোট বড় সকল লোকেরই নাম ধ'রে কথা কয়। কিন্তু যোগমায়ার বুদ্ধিশুদ্ধি হ'য়েচে, সে তা কর্‌তে যাবে কেন?"

"আচ্ছা, দাদাঠাকুর, তা নাই হ'লো। কিন্তু এই কথাটা ধর দেখি। যোগমায়ার সই ঘোষালদের ভাবিনী শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেচে। ভাবিনী তোমার এই বাড়ী তৈয়ের হ'তে দেখে যায় নি; তাই সে এ বাড়ীতে এসে যোগমায়ার সঙ্গে সব ঘর দেখে বেড়াচ্ছিল। তুমি ওপরে আছ মনে ক'রে?

যোগমায়া ছম্‌ছম্ ক'র্‌ছিল। ভাবিনী অনেকবার বলাতেও যোগমায়া ওপরে উঠ্‌তে চায় নি। তাই দেখে আমি ব'ল্লুম, 'এস না, ওপরে যাই, কেউ নেই। দাদাঠাকুর এখন ঐ বনের মধ্যে আছে। এখন আর বাড়ীতে আস্‌বে না।' আমার কথা শুনে যোগমায়া আর ভাবিনী ওপরে উঠ্‌লো। আমরা তিন জনেই ওপরের সব ঘর দেখে বেড়াতে লাগ্‌লুম। তোমার পড়্‌বার ঘরে এসে যোগমায়া তোমার বইগুলো দেখে কেশ্‌বার নিন্দে ক'র্‌তে লাগ্‌লো। সে কথা তো তোমায় ব'লেছি। যোগমায়া আর আমি বই সাজাচ্ছিলুম, এমন সময় ভাবিনী চাঁপাগাছের ধারে সেই জানালাটা খুলে মুখ বাড়িয়ে বন দেখ্‌তে লাগলো। সে বন দেখেই আমাকে বল্লে, 'হেঁ গা, তোমার দাদাঠাকুর কি এই বনের মধ্যেই আছে?' আমি বল্লুম 'হাঁ'। তুমি বনের মধ্যে কি কর, ভাবিনী তাই আমায় জিজ্ঞেস্ করলে; আমি বল্লুম 'পড়ে শুয়ে থাকে, কত কি ভাবে।' তাই না শুনে ভাবিনী বল্লে, 'হেঁ গা, তোমার দাদাঠাকুরকে তোমরা বনের মধ্যে গাছতলায় একলা শুয়ে থাক্‌তে দাও কেন? কোন্ দিন যে বিপদ হ'বে।' কথা শুনেই আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম, বল্লুম 'সে কি কথা গো; বিপদ কেন হ'তে যাবে?' ভাবিনী বল্লে, 'বিপদ না হ'লেই তো ভাল। আমরা কি আর বিপদ হোক্ বল্‌চি। কিন্তু কেশবকে জিজ্ঞেস্ করগে দেখি, ভাগ্যে সে দিন আমার সই ছিল, তাই রক্ষে হ'য়েচে।' আমি বল্লুম,'বল কি গো! কই কেশ্‌বা ছোঁড়া তো আমাদের কিছুই বলে নি। কি হ'য়েছিল, তোমরাই বল না, শুনি।' ভাবিনী সব কথা ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু যোগমায়া তা'কে চোখ্ টিপে দিলে, তাই সে আর কিছু ব'ল্লে না। দেখে শুনে আমার বড্ড রাগ হ'লো। আমি যোগমায়াকে বল্লুম, 'অত চোখ্ টেপাটেপিতে কায কি ভাই? আর দু'দিন পরেই তো তুমি আমার দাদাঠাকুরের রক্ষক হ'বে, তা আর অত লুকোচুরিতে ফল কি?' কথাটা ব'লে ফেলেই দাদাঠাকুর আমি মুখ সাম্‌লে নিলুম। কিন্তু ভাবিনী বড় চতুর; সে আমায় সব কথা খুলে ব'ল্‌তে বল্লে। আমি কিন্তু কিছু ভাঙ্‌লুম না। তোমার সেই কথাটা মনে প'ড়ে গেল।"

আমি বলিলাম, "ভাঙ্‌তে তো বড় বাকী রেখেছিস্! আচ্ছা, যা ক'রেচিস্, ক'রেচিস্। এখন যোগমায়ার মায়ও কাছে তুই কিছু শুনেচিস নাকি?"

"যোগমায়ার মাও, দাদা, এই কথা জেনেচে। কিন্তু তাকে কে কে বলে তা আমি জানি না। কথা কতক্ষণ চাপা থাকে বল? কথা পাঁচকাণ হ'লেই ঢাকের বাদ্যির মতন বেরিয়ে পড়ে। আহা, মাগী কিন্তু বড় ভাল মানুষ। আমি গেলেই আমাকে জিজ্ঞেস্ করে। 'হেঁসা সত্যি তোমাদের কত্তা গিন্নি মত করেচে? আমার কি এমন ভাগ্যি হবে মা? যোগমায়ার ভাগ্যে কি এমন বর ঘট্‌বে মা? এমন তপস্যা কি ও ক'রেচে"—

মঙ্গলাকে বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "থাক্, থাক্, ঢের করেচে। ঢের হয়েচে। তোকে আর কিছু বল্‌তে হবে না। তুই বাড়ীর ভেতর গিয়ে কাজকর্ম্ম দেখ্‌গে যা।"

মঙ্গলা বাড়ীর ভিতর গেল। আমিও কিয়ৎক্ষণ পরে আমার পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া সুসজ্জিত পুস্তকগুলির দিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ বাল্মীকি-রামায়ণের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। মঙ্গলার কথা সত্য হইলে এই পুস্তকখানিই যোগমায়া পাঠ করিয়াছিল। যোগমায়া তবে সংস্কৃত পড়িতে জানে! যোগমায়া তবে এই পবিত্র দেবভাষা বুঝিতে পারে! চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা সংস্কৃত ভাষা পাঠ করিতেছে ও বাল্মীকি বুঝিতে পারিতেছে, ইহা আমার নিকট বড়ই বিস্ময়কর বোধ হইল। মঙ্গলার কথায় সহজে প্রত্যয় হইল না। সন্দেহ নিরাকরণার্থ তাহাকে একবার উপরের ঘরে আসিতে বলিলাম। সে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহাকে বলিলাম, "যোগমায়া কোন্ বইখানি পড়্‌ছিল, মঙ্গলা?"

মঙ্গলা বলিল, "দাদাঠাকুর, আমি কি সে বই খুঁজে বার কর্‌তে পার্‌বো? তোমার সেই ডাগর বইখানা। এই টে!" এই বলিয়া মঙ্গলা বৃদ্ধ বাল্মীকিকেই টানিয়া বাহির করিল।

আমার আর কোনই সন্দেহ রহিল না। কিন্তু আমি মঙ্গলাকে মনে ও মুখে বিস্তর গালি দিতে লাগিলাম। আমি তাহাকে তিরস্কারমিশ্রিত আবদারের স্বরে বলিলাম, "মুখ্‌পুড়ি, পোড়ারমুখি, তুই যদি এখন সব কথা না ভাঙ্গতিস্, তা হ'লে হয় ত কোনও দিন আমার ভাগ্যে যোগমায়ার সংস্ক পড়া শোনা ঘট্‌তো। কিন্তু তোর পেটে আর কথা থাক্‌ল না। থাক্‌বেই বা কেমন করে? যুধিষ্ঠিরের অভিশাপ যে তা হ'লে মিথ্যে হয়ে যায়।"

আমার তিরস্কারবাক্যে মঙ্গলা যেন কিছু কুণ্ঠিত হইল। সে বলিল, "দাদাঠাকুর, আমার যা দোষ হ'য়েচে তা তো তোমায় ব'লেচি। আমার

আর বক্‌লে কি হবে ? আচ্ছা, তোমায় যদি একদিন যোগমায়ার সঙ্গে পড়া শুনিয়ে দিই, তা হ'লে ত হবে ?"

আমি বলিলাম, "কেমন করে শোনাবি ?"

"যেমন করেই হোক্।"

আমি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলাম, "না, আর আমি শুন্‌তে চাই না; যোগমায়ার সঙ্গে তুই যে কোন চাতুরী খেলবি, তা আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। যোগমায়া সরলা; তার সঙ্গে প্রতারণা কর্‌লে, তোকেও প্রতারিত হ'তে হবে।"

আমার কথা শুনিয়া মঙ্গলা দাসী গৃহান্তরে গমন করিল। যাইবার সময় সে নিজ অঞ্চলে ঈষৎ মুখাবরণ করিল। বোধ হইল, আমার ভাব গতিক দেখিয়া তাহার হাসি পাইতেছিল।

৺ হরিনাথ মজুমদার।

(কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকির)

একজন চিন্তাশীল কবি মানবজীবনকে জল-বুদ্‌বুদের সমান বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলে সত্য সত্যই ইহা জল-বুদ্‌বুদ ভিন্ন আর কি ? তেমনি ক্ষণস্থায়ী, হয় ত বা তেমনিই অসার, কিন্তু সেই অচিরস্থায়ী বুদ্‌বুদোপম মানবজীবনে কখন কখন এমন একটি বিশাল শক্তি, উজ্জ্বল আলো, জ্ঞান-ভক্তি-মহত্বের এমন একটি হিল্লোল ফুটিয়া উঠে যে, সকলে চলিতে চলিতে বিস্ময়মগ্ন দৃষ্টিতে সেই সকল দেবপুরুষের দিকে চাহিয়া দেখে, তাঁহাদের চরণতলে বসিয়া আপনাদিগের রৌদ্রতপ্ত মরুময় জীবন শীতল করে, এবং যখন তাঁহারা নিয়তিক্রমে মাটির দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য-ধামে প্রস্থান করেন, তখনও তাঁহাদের গুণ ভুলিতে পারে না; তাই কবি উচ্চকণ্ঠে তাঁহাদের বিজয়গীতি গান করেন, কর্ম্মযোগী তাঁহাদের অমর নাম স্মরণপূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন, এবং তাঁহাদের পবিত্রস্মৃতি বহুদিন ধরিয়া অপরিণামদর্শী, অপূর্ণ মানবকে জীবনের অম্লান সার্থকতার কনক-মন্দিরের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। আমরা আজ এই প্রকার একজন স্বদেশহিতৈষী, পরোপকারে-উৎসর্গীকৃত-জীবন, পরমার্থপরায়ণ প্রেমিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী "দাসী"র পাঠকবর্গের নিকট কীর্ত্তন করিব। তিনি আপ-

নাকে অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র কাঙ্গাল বলিয়া জানিতেন, অনেকে তাঁহাকে সামান্ত বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু ভস্মের অন্তরালে যে জীবনী-বহ্নি নিহিত ছিল, যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহারাই জানিত, অত্যাচার এবং পাপ সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া কিরূপে ভস্ম হইয়া যাইত।

নদীয়া জেলার কুমারখালী একখানি সম্পন্ন ভদ্রপল্লী। আজ কাল গোয়াড়ী, কুষ্টিয়া, রাণাঘাট প্রভৃতি নগর নদীয়া জেলার প্রধান স্থান বলিয়া সাধারণ্যে প্রথিত, কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন এই সকল স্থানের নাম কেহ জানিত না, তখন রাণাঘাট 'রাণা' নামক দস্যুসম্প্রদায়ের 'ঘাটি' বা আড্ডা ছিল, কৃষ্ণনগরের উত্তর অংশ খড়িয়ার তীরবর্ত্তী গোয়াড়ী বিশাল জঙ্গলে পূর্ণ ছিল,—সুপ্রসিদ্ধ দস্যুপতি 'বিশ্বনাথ' বাবু ও তাহার অনুচর বৈদ্যনাথ প্রভৃতির ভয়ে এ দিকে লোক যাতায়াত করিত না, দুই একজন সামান্ত লোক, যাহারা কুটীর বাঁধিয়া বাস করিত, তাহারা বড় একা দস্যুভয় করিত না, কারণ দস্যুতে তাহাদের কি লইবে? কিন্তু বাঘ ভালুকের ভয়ে তাহারা একপ্রহর বেলা থাকিতে গৃহদ্বার বন্ধ করিত,—কুষ্টিয়াতে আজ আড়াই দিন রেল হইয়াছে, রেল হওয়ার পর এখানে আদালত স্থাপিত হইল, স্কুল হইল, স্বাস্থ্যকর স্থান, তাহার উপর নদী-তীরবর্ত্তী বলিয়া ব্যবসা বাণিজ্যেরও বিশেষ সুবিধা, নানাদিক হইতে নানা শ্রেণীর লোক দলে দলে আসিয়া এখানে বাস করিতে লাগিল; কুষ্টিয়া একটা বড় কারখানার মত, জলে স্থলে চারিদিকেই মহা ধুমধাম চলিতেছে—হাটবাজার, দোকান-পাট, সর্ব্বত্র লোকের ভীড়, নদীতীরে অসংখ্য নৌকা; সকল সময়ই হট্ট-গোল লাগিয়া আছে; কিন্তু বুনিয়াদি অধিবাসী এখানে একটীও নাই, রেল স্থাপনের পূর্ব্বে একটিও ছিল না, কেবল মহাদুর্দ্দান্ত কুঠিয়াল কেরি সাহেব তাহার প্রকাণ্ড কুঠি এবং অসংখ্য লাঠিয়াল লইয়া এই জনবিরল স্থানের দরিদ্র অধিবাসিগণের উপর সভ্যতাসঙ্গত ডাকাইতি করিত। মেঘের মত ঘন সন্নিবদ্ধ নীলবন শত শত বিঘা জমীর উপর বায়ুভরে দুলিত, আর দূর-বিস্তৃত নদীর বাতাহত বক্ষ হইতে দিবারাত্রি অস্ফুট কল্লোল ফুটিয়া উঠিত।

এই সময়ে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের খ্যাতি প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল; কৃষ্ণনগরই নদীয়া জেলার রাজধানী। ধরিতে গেলে, কৃষ্ণনগর তখন লক্ষ্মীর কুঞ্জবন, আর নবদ্বীপ সরস্বতীর কমলকানন আখ্যা লাভের উপযুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, জ্ঞান এবং ভক্তিতে তখন নবদ্বীপ ভাগাভাগি

হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টোল, টিকি, ছাত্র এবং নস্য, ব্যবস্থা ও ব্যাকরণের চোটে নবদ্বীপের এক অংশ যেমন মধুকরগুঞ্জিত মধুচক্রের ন্যায় সর্ব্বদা মুখরিত হইত, অন্য দিকে সেইরূপ নিমাই পণ্ডিতের শুরুমারা চেলাদিগের মহাধূম ছিল; মালা, তিলক, ঝোলা, খোল করতাল সেবা-দাসী এ সকলের আর অন্ত ছিল না। কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপের পর শান্তিপুর ও বীরনগর (উলা) তখন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এখনো যেমন, তখনো তেমন; শান্তিপুর চিরকালই নদীয়া জেলার 'কেসানের' রাজধানী, শান্তিপুর, আমাদের নদীয়া জেলার ফ্রান্স; আমার শান্তিপুরবাসী বন্ধুগণ ক্ষমা করিবেন, এই নগরটির উপর পূর্ব্বাপরই কন্দর্প ঠাকুরের একটু 'নেক-নজর' আছে, শান্তিপুরে কাপড় হইতে শান্তিপুরের সৌন্দর্য্য, সকলের সঙ্গেই খানিকটা সখ মিশানো; শান্তিপুরে মেয়েদের পাতলা কাপড় পরা ছাড়া-ইবার জন্য নামজাদা ডেপুটি ঈশ্বর বাবুর অধ্যবসায়ের গল্প পল্লী অঞ্চলে অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। বাহুবল ও লাঠির কৌশলের জন্য বীরনগর স্বনামধন্য ছিল। মেহেরপুরের মহাপরাক্রান্ত জমীদার বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত, তাঁহার লাঠির চোটে দুর্দ্দান্ত নীলকর মেহেরপুরের ত্রিসীমানায় ঘেঁসিবার সাহস করিত না। লোকে জমীদারের চাকরী করিত, না হয়, চাষ বাস করিয়া খাইত, জমীদার-বাড়ীতে যাত্রা পাঁচালী শুনিত, কবির লড়াই শুনিয়া স্ত্রীপুরুষে আমোদ পাইত, জমীদার বাড়ীতে বারো মাসে তের পার্ব্বন লইয়া ধুমধাম করিত;—খাইয়া শুইয়া যে টুকু সময় বাঁচিত, তাহা দলাদলী,লোকের জাতি-মারা এবং নিন্দা কুৎসাতেই কাটিত। লোকের সাধারণ অবস্থা মন্দ ছিল না বটে, কিন্তু প্রকৃত জীবনের লক্ষণ কিছু ছিল না,—সমস্ত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, এবং সর্ব্বত্র আধ্যাত্মিক শান্তি বিরাজ করিতেছিল।

এই সময় কুমারখালী নদীয়া জেলার 'মাঞ্চেষ্টার' ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অসংখ্য তাঁতি নানা রকম বস্ত্র প্রস্তুত করিত, এবং ইহার নাম সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত পরিচিত ছিল; এখানে মাননীয় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের কুঠী ছিল, এবং 'কুমারখালী মার্কা' রেশম অধিক মূল্যে বিলাতের বাজারে বিক্রীত হইত, কুমারখালীর নীলপেড়ে কাপড়ের পাকা নীল রঙের জন্য সাহেব সওদাগরদিগেরও মনে লোভ সঞ্চার হইত। কুমারখালীতে এখন আর রেশমের কুঠী নাই, কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়, এখনো 'কুমার-

খালী মার্কা' রেশম আছে ; যাহা হউক এই রেশমের কুঠী উপলক্ষে এখানে অনেক লোক সম্পত্তিপন্ন হইয়া উঠে, অনেকে অন্যত্র হইতে এখানে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে এখন এখানেই বাস করিতেছেন। তিলি জাতি বহুকাল হইতে কারবারের জন্ম বিখ্যাত, রেশমের কুঠী উপলক্ষে অনেক তিলি বহুপূর্ব্ব হইতে কুমারখালিতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, এবং নানাপ্রকার ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া প্রভূত ধনের অধিকারী হন। এই জাতির মজুমদার বংশে ১২৩৫ সালে হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্য-জীবনের কথা, তাঁহার স্বলিখিত 'আত্মপরিচয়' নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তাঁহার সম্পাদিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র ১২৮৫ সালের ১৩ই আষাঢ় তারিখের সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন :—

"যখন আমার বয়স এক বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন মাতৃদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমি মাতৃহীন হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় যে কত কাঁদিয়াছি, তাহা কে বলিতে পারে ? খুল্লপিতামহী আমাকে প্রতিপালন করেন। আমার পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু বোধ হয় তন্নিমিত্তই সংসারে উদাসীন ছিলেন। তিনি বিষয়কার্য্যে তাদৃশ মনোযোগ বিধান না করায়, পৈত্রিকসম্পত্তি যাহা ছিল, তৎসমুদায়ই নষ্ট হয়। সুতরাং মাতৃ-বিয়োগ হইতেই সাংসারিক দুঃখ যে আমার সহচর হইয়াছে, সে কথা বলা বাহুল্য। বাল্যখেলার সময় অন্য বালকেরা ক্রীড়োপযোগী বস্তু পিতা-মাতার নিকটে সহজে পাইয়া আনন্দ করিয়াছে, আমি তন্নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া মাটি ভিজাইয়াছি ; এই অবস্থায় কতকদিন গত হয়। পরে বিদ্যাভ্যাসের সময় উপস্থিত হইল। পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া কত কাঁদিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময় কুমারখালী-বাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয় একটী ইংরাজিস্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের নিমিত্ত তাহাতে প্রবেশ করিলাম। খুল্লতাত শ্রীযুক্ত নীলকমল মজুমদার মহাশয় পুস্তকাদির ব্যয় ও স্কুলের বেতন সাহায্য করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কর্ম্ম গেল। অর্থাভাবে আমারও লেখা পড়া বন্ধ হইল। স্কুলের হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন বাবু বিনা বেতনে কতকদিন শিক্ষা দিয়াছিলেন ; কিন্তু অন্নবস্ত্রের ক্লেশ ও পুস্তকাদির অসদ্ভাবে আমাকে অধিক দিন বিদ্যালয়ে তিষ্ঠিয়া থাকিতে দিল না।"

সুতরাং বলা বাহুল্য, পড়া শুনা বন্ধ হইয়া গেল। হরিনাথের শরীরে বিশেষ বল ছিল, বল ও সাহসে তিনি সেকালের ছেলেদের মধ্যে গ্রামে অদ্বিতীয় ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সাহস মহত্ত্বে পূর্ণ ছিল, দুর্ব্বল বালকদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া তিনি বলের অপব্যবহার করিতেন না, বরং দুর্ব্বল এবং অপরের হস্তে লাঞ্ছিত বালকদিগকে তাঁহার সবল বাহুদ্বয়ের দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন। প্রতিভা-সম্পন্ন বালক লেখা পড়া ছাড়িয়া দিলে তাহার জীবনের গতি যেমন কিঞ্চিৎ উদ্দাম হইয়া উঠে, তাঁহারও তাহাই হইয়াছিল। তিনি সমস্ত দিন শুধু মাঠে মাঠে দৌড়িয়া ও খেলা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তিনি কিছু লেখা পড়া শিখুন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার একজন ধনবান আত্মীয় তাঁহাকে কয়েকখানি বাঙ্গলা পুস্তক পড়িতে দিলেন; তিনি তিন দিনের মধ্যে তাহা শেষ করিয়া ফেলি-লেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়—একে পিতৃমাতৃহীন বালক, তাহাতে জ্যেষ্ঠতাতের গলগ্রহ. "তের চৌদ্দ বছরের ছেলে শুধু দুবেলা খাবে, কাজ কর্ম্মের নাম নাই"—ইত্যাদি অনেক কটু কাটব্য তাঁহাকে প্রতিদিন শুনিতে হইত। এই অবস্থায় তিনি একটি ভদ্রলোকের জন্য রামমোহন রায় প্রণীত 'চূর্ণক' নামক পুস্তকখানি এক রাত্রে নকল করিয়া দিয়া একখানি নববস্ত্র উপার্জ্জন করেন। হরিনাথ কতদিন আমাদের কাছে এই দারিদ্রের গল্প বলিয়াছেন, এই নূতন কাপড়খানি লাভ করিয়া তাঁহার মনে কি আনন্দ হইয়াছিল—সে কথা শেষ জীবনেও তাঁহার মনে ছিল।

কুমারখালীতে প্রচুর কাপড়ের দোকান ছিল, এখনো এই সকল দোকানের সংখ্যা কম নহে। হরিনাথ অবশেষে একখানি কাপড়ের দোকানে হিসাব পত্র লেখা শিখিতে নিযুক্ত হইলেন। কথা ছিল, তিনি মাহিয়ানা বাবদ কিছু পাইবেন না, সম্বৎসরের উপযুক্ত কাপড় পরিতে পাইবেন। কিছুদিন এই ভাবে গেল। একদিন সেই দোকানদার একজন পাওনাদারের নামে কিছু টাকার জন্য নালিশ করে। দোকানদার হরিনাথকে নূতন করিয়া এক মিথ্যা হিসাব প্রস্তুত করিতে বলিল; মকদ্দমায় কৃতকার্য্য হইলে হরিনাথ যে উত্তম পুরস্কৃত হইবে, দোকানদার হরিনাথকে তাহাও জানাইল। অন্য সাধারণ বালক হইলে মনিবের এই প্রস্তাবে সে অতি উৎসাহের সঙ্গে নূতন জমা খরচ প্রস্তুত করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু হরিনাথের হৃদয়ের উপাদান স্বতন্ত্র ছিল। এই নিরক্ষর, দরিদ্র, গ্রাম্য বালক দোকান-

দায়ের কুঅভিপ্রায় শুনিয়া আপনার বিপদ ও কষ্টের কথা মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা না করিয়া, নির্ভীকচিত্তে সতেজে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না, এরূপ কথা শুধু বালকদিগের নীতিপুস্তকের পৃষ্ঠাতে মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়। হরিনাথ ঘৃণার সহিত দোকানদারকে বলিলেন, "না খাইয়া মরিতে হয় তাহাও স্বীকার, এমন অধর্ম্ম করিতে পারিব না।"— দোকানদার বালককে দোকান হইতে দূর করিয়া দিল, বলিল, হরিনাথ কোন কালে কাজের লোক হইতে পারিবে না। শুধু দোকানদার নহে, বাড়ীর এবং পাড়ার সকলে হরিনাথের উপর বিরক্ত হইলেন। যে জ্যেষ্ঠতাত এক মুঠা অন্ন দিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন, তিনিও অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এমন জেঠা ছেলেও ত কখন দেখিনি, ধর্ম্মের অবতার আর কি?"— হরিনাথের এই কার্য্য সেকালের স্ত্রীপুরুষের নিকট বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ইহাতে সেকালের লোকের নৈতিক আদর্শ কিরূপ ছিল, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

বাড়ীতে এই রকম অবস্থা। গ্রামে না আছে লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা, না আছে অন্ন সংস্থানের কোন উপায়। কেহ তাঁহাকে নির্ব্বোধ ভাবে, কেহ এঁচোড়ে পাকা জ্যাঠা বলিয়া বিবেচনা করে, সমস্ত গ্রামবাসীর চক্ষে তিনি একটা দুগ্রহের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। এই অবস্থা বড়ই শোচনীয় এবং যে বয়সে সাধারণের আদর, সহানুভূতি এবং প্রীতি লাভের ইচ্ছা হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলে, সেই বয়সে যদি সকলের বিরক্তি ও উপেক্ষাই জীবনের অবলম্বন হয়, তাহা হইলে জীবন বড় দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। অনেক মহৎ ব্যক্তির বাল্য জীবন এইরূপ ক্লেশকর হইতে শুনা যায়। সংসারের সঙ্গে বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার বাল্য জীবনের সেই যুদ্ধক্লান্তি পরিণত বয়সেও তাঁহার ললাটে অঙ্কিত ছিল। গ্রামে কোন উপায় হইল না দেখিয়া, হরিনাথ লেখাপড়া শিখিবার সংকল্প লইয়া কলিকাতায় চলিলেন। তখন রেল হয় নাই, নদীপথে দশ বারো দিনে কলিকাতা যাইতে হইত; কলিকাতাতেও কোন সুবিধা হইল না, আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা আর হইল না। সেকালে পল্লীগ্রামে দুই একখানির অধিক পুস্তক পাওয়া যাইত না, সংবাদ পত্রের মধ্যে "প্রভাকর" পড়িতে পাইতেন। ইহা পড়িয়াই তাঁহার ভাষা শিক্ষা

হইল। হরিনাথ "সংবাদ প্রভাকরে" প্রথম প্রথম কবিতা লিখিতেন, সেকালের কবিতা আর একালের কবিতাতে অনেক তফাৎ, সেকালের কবিতা-সুন্দরী অনুপ্রাসের লৌহবর্ম্মে নিতান্ত পীড়িতা, ভাব থাক না থাক ভাষার ঝঙ্কারে অস্থির; গুপ্তকবি সেই কবিতায় 'ওস্তাদ' ছিলেন, হরিনাথও অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার উপযুক্ত 'সাকরেদ' হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সংবাদ পত্রে কবিতা লেখা অপেক্ষা লেখনী সার্থক করিবার আরো বিষয় ছিল। স্বদেশের হিতকামনা তাঁহার যুবক-হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। এখন আমরা গ্রামে গ্রামে 'ভারত উদ্ধারের' সভা করি, বক্তৃতা করি, দেশে আজ কাল ম্যাটসিনীর সংখ্যাও অগণ্য, কিন্তু হরিনাথের বয়স যখন ১৮।১৯ তখন এদেশে রাজনৈতিক সভাসমিতির অস্তিত্বও ছিল না। দেশের এবং দশের সেবা করা একটা কাজ বলিয়া পল্লী অঞ্চলে কেহই জানিত না। সহরে দুই একজন দেশহিতব্রতধারী মহাত্মাকে দেখা যাইত। তখন দেশ এ রকম ছিল না, জমীদারের হস্তে প্রজার লাঞ্ছনা সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল, নীলকর সাহেবেরা রাজ-ক্ষমতা হস্তে লইয়া দরিদ্র কৃষকের সর্ব্বস্ব শোষণ করিতেছিল, এমন কি, শিক্ষিত শ্রেণীও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য জীবন বহন করিত; মেয়েরা শুধু ঝুমুর পাঁচালী শুনিতে ভাল বাসিত, পুরুষেরা তরজা ও কবির লড়াইয়ে আমোদ উপভোগ করিত এবং যখন সাহিত্য আলোচনা হইত, তখন ঈশ্বর গুপ্ত ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের অপাঠ্য কুৎসাকথান্বিত কবিতা পাঠ পূর্ব্বক তাহারা জীবন ধন্য মনে করিত। দুঃখের বিষয় এই, কবির লড়াই আমাদের সাহিত্য জগৎ হইতে একেবারে উঠিয়া যায় নাই, তবে এখন আর সে কুরুচি কবিতায় ধ্বনিত হয় না, এখন তাহা গদ্য সাহিত্যরূপে প্রতি সপ্তাহে মুদীখানার দোকানে প্রচারিত হয়।

পল্লীগ্রামের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন হরিনাথ তাঁহার স্বগ্রামের অভাব অত্যাচার, প্রজাপীড়ন প্রভৃতি কাহিনী প্রভাকরে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন নিঃসহায় যুবকের এইরূপ সাধুসংকল্প দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইলেন।

এই সময়ে হরিনাথের মনে আর এককথা উঠিল। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় কয়েকদিন পাঠ করিয়া তাঁহার বিদ্যা শেষ হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইল, দেশের লোক ভাল

করিয়া বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করে; গুরুমহাশয় যে নিয়মে পাঠশালায় লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন, সে ভাবে না গিয়া তিনি সাধারণকে শুধু বই পড়ান দরকার মনে করিলেন, এবং সেই অনুসারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কুমারখালী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অতি সুন্দর ভাষা শিক্ষা হইত; হরিনাথ কেমন করিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহা তাঁহার কথায় লিখিতেছি—"আমার বাল্যসখা মথুরানাথ মৈত্র পাবনা ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, তিনি অবকাশ উপলক্ষে যখন বাড়ী আসিতেন, তখন আমি তাঁহার নিকট ক্ষেত্রতত্ব, অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিতাম। * * * বন্ধু যখন কুমারখালী ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকতা স্বীকার করিলেন, তখন আমার পড়ার ও পড়াইবার সুবিধা হইল।" স্বর্গীয় মথুরানাথ মৈত্র মহাশয়ের সহিত হরিনাথের প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। মথুরানাথ মৈত্র মহাশয় একজন সাধু ব্যক্তি ছিলেন, রাজসাহী ব্রাহ্মসমাজ ও কুমারখালীর 'দরিদ্র ভাণ্ডার' তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী; মথুরানাথ অনেক বিষয়েই হরিনাথের উপযুক্ত বন্ধু ছিলেন।

ইংরাজী বিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, হরিনাথ বঙ্গ বিদ্যালয়েও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন; সেকালে পাঠশালে ছাপা বই পড়িবার নিয়ম ছিল না, বালকেরা যথাক্রমে তালপাত, কলাপাত ও কাগজে লিখিত এবং হিসাব শিখিত। চিঠিপত্র এবং দলিল দাখিলা লেখায় সাধারণ জ্ঞান হইলেই চলিত। হরিনাথের নূতন ধরণের শিক্ষা প্রচলন দেখিয়া, উড্রো, মার্টিন প্রভৃতি ইনেস্‌পেক্টরগণ এই বাঙ্গালা স্কুল পরিদর্শনে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন; পূর্ব্বে বঙ্গবিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইত না, এই অভিনব শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হরিনাথের বাঙ্গালা স্কুল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ করে। বর্ত্তমান কালের এই প্রদেশস্থ অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই হরিনাথের ছাত্র; আমরা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্নেহের ক্রোড়ে লালিত; মধ্যে মধ্যে অবসরকালে যে সামান্য সাহিত্য সেবা করি, হরিনাথ তাহার আদি গুরু, তিনি হাতে ধরিয়া আমাদিগকে লিখিতে শিখাইয়াছেন, শেষ জীবনেও লেখা সম্বন্ধে তিনি নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন। ভারতীতে যে ভাবার ও ভাবে আমি আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করি,—সে সম্বন্ধে আজ আট নয় মাস হইল তিনি লিখিয়াছিলেন, "তুমি সেটাকে এমন করিয়া ফেলিলে কেন? পড়িতে

বেশ মিষ্ট বটে, কিন্তু তুমি কি মনে কর বঙ্গসাহিত্যকে তোমরা ঐ পথে লইয়া যাইবে। স্বীকার করি তোমরা যে ভাষায় লেখ, তাহাতে ভাব প্রকাশের সুবিধা হয়, কিন্তু ভাষার গাম্ভীর্য্য ও বাঁধুনী নষ্ট হইয়া যায়। এ শিক্ষা তুমি কোথায় পাইলে?" এ বিষয়ে হরিনাথের সঙ্গে আমার অনেক তর্ক বিতর্ক হয়, আমি আমার মত বজায় রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি দেখিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "তা তোমরা যাহা ভাল বোঝ কর, আমরা আর কদিন, যে কয়েক দিন বাঁচিব, দীর্ঘ সমাসের ঝোঁক ত্যাগ করিতে পারিব না।"

এখনকার মত সেকালে এত পাঠ্য পুস্তক ছিল না, এই জন্য হরিনাথ নিজে কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন; 'বিজয় বসন্ত' তাহার মধ্যে প্রধান। এই 'বিজয় বসন্তে'ই হরিনাথের নাম বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত। এখন ছাপাখানার কল্যাণে, এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনে উপন্যাস এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ গল্পে বাঙ্গলা দেশ ঢাকিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু যে সময় হরিনাথের বিজয় বসন্ত ছাপা হয়, সে সময় উপন্যাসের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল, এমন কি বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী বোধ হয় বিজয় বসন্ত প্রকাশের অল্পদিন পূর্ব্বে বা পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গসাহিত্যের উচ্চ আদর্শ হিসাবেও বিজয় বসন্ত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; এখানি ব্যতীত তিনি আরো কতকগুলি গদ্য এবং পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, সেই সকল গ্রন্থ একালের ছাঁচে ঢালা না হইলেও তাহার মধ্যে যে একটি সরল মাধুর্য্য এবং গ্রন্থকারের নিজস্ব মৌলিকতা আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

বাঙ্গলাস্কুল যখন বেশ চলিতে লাগিল, তখন তাঁহার দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। প্রথম হইতেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার না হইলে নানা বিষয়ে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে; কিন্তু কিরূপে এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপন করা যায়, সেই চিন্তায় তাঁহার অনেক দিন অতিবাহিত হইল। অবশেষে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি কয়েকটি বালিকা লইয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয় পাঠশালার শিক্ষাদান ভার তাঁহার জনৈক সুশিক্ষিত প্রিয় ছাত্রের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এইরূপ করিবার একটা বিশেষ অভিপ্রায় ছিল। সে সময়ে পল্লী অঞ্চলে বালিকা

বিদ্যালয়ের প্রচলন হয় নাই ;—ঘরের মেয়েদিগকে বাহিরে আনিয়া শিক্ষা দানের জন্ত তাহাদিগকে অপরিচিত যুবকের হস্তে সমর্পণ করিতে অনেক পিতাই অস্বীকার করিতেন, এমন কি,—ইহাতে হরিনাথের সংকল্পও ব্যর্থ হইতে পারে। তাই তিনি স্বয়ং এই গুরুভার গ্রহণ করিলেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করিলে বিদ্যালয়ে কন্তা পাঠাইতে কাহারও আপত্তি হইবে না ; এই বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি যে প্রণালীতে শিক্ষা দান করিতেন, তাহা বালিকাগণের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর ছিল। ভাল ভাল পুস্তক পাঠ, সামান্ত হিসাব রাখা ও সূচীকার্য্য শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা ছিল ; এমন কি, বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অর্দ্ধেকের অধিক সময় তিনি সূচী কার্য্যের জন্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। আমরা হরিনাথের ছাত্র, শিক্ষকতা কার্য্যে বেশ পরিপক্ক হইয়া আসিল, অনেক স্থানে এ পর্য্যন্ত অনেক শিক্ষক দেখিয়াছি কিন্তু হরিনাথের ন্তায় শিক্ষাদানে নিপুণ, ক্ষমতাশালী শিক্ষক এ পর্য্যন্ত একজনও দেখিলাম না। কিরূপ ভাবে শিক্ষা দিলে একটি নূতন বিষয়ও বালকবালিকাগণের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইতে পারে এবং তাহা সহজে তাহাদের আয়ত্ত হয়, তাহা তিনি অতি উত্তম জানিতেন। ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশ হইলে তিনি শিক্ষক-শ্রেষ্ঠ স্পেনসারের সমান সম্মান এবং খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু আমাদের দেশে মানুষ মানুষকে চিনিতে পারে না। প্রতিভার পূজা এদেশে অনেক বিলম্বে আরম্ভ হয় এবং যখন মানুষ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে পূজা করিতে আরম্ভ করে, তখন তাঁহাকে দেবতা বা অবতার করিয়া ফেলে। সুতরাং যাঁহারা পরের সেবার জন্ত এদেশে খাটিতে আসেন, তাঁহারা স্বর্গচ্যুত হইয়া এই দুরন্তর প্রবাসে একাকী আজীবন অতিবাহিত করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন সেকালে যখন দেশের মধ্যে আলোক ও জীবন সঞ্চার করেন, তখন তিনি একাকী ছিলেন। এই শিক্ষিত, উর্ব্বর-মস্তিষ্ক বঙ্গযুবক প্লাবিত একালেও যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের এবং সমাজের হিতসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তখনও তিনি একাকী! ভক্তবীর হরিনাথ এইরূপ নীরবে একাকী কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়টি এখনও বর্ত্তমান আছে এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথেই তাহা পরিচালিত হইতেছে ; আমরা জানি এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ সূচীকার্য্যে এমন পারদর্শিনী হইত, যে তাহারা গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া অবসর সময়ে সূচীকার্য্যের দ্বারা গৃহস্থের

অনেক সাহায্য করিত। একটি বালিকা অল্প বয়সেই বিধবা হইয়াছিল, হরিনাথ তাহাকে দুই তিন বৎসর ধরিয়া শিক্ষা দান করেন, অবশেষে সে সূচীকার্য্যে এরূপ অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিল যে, তদ্দ্বারা যথেষ্ট উপার্জ্জন পূর্ব্বক দরিদ্র পিতামাতার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিত। কুমারখালি অঞ্চলে এরূপ বিধবার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে এবং তাহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে হরিনাথের নিকট ঋণী।

অতঃপর আমরা হরিনাথের মহদ্‌ব্রতের উল্লেখ করিব। হরিনাথ পরম ধার্ম্মিক এবং পরম জ্ঞানী ছিলেন। সেই জ্ঞান ও ধর্ম্ম তিনি তাঁহার হৃদয়ের দুর্ল্লভ অন্তঃপুরটির মধ্যেই সংগুপ্ত রাখেন নাই, তিনি বাউলের গানে ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া দেশ মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সরল, মধুর ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া পাষাণহৃদয়ও গলিয়া যাইত। হরিনাথের সহিত আলাপ করিলে তাঁহার শিশুর ন্যায় সরলতার সহিত পাণ্ডিত্য এবং পবিত্র ভাব দেখিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিত। দেশে কিন্তু হরিনাথ অন্য নামে পরিচিত ছিলেন, হরিনাথ বলিলে তাঁহাকে কেহই চিনিত না, সকলেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রশ্নকারীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিত—"কোন হরিনাথ?"—"কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ" বলিলে অনেকে চিনিত, কিন্তু "এডিটার মহাশয়" বলিলে তিন বৎসরের শিশু পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিত, হরিনাথের কথা বলা হইতেছে। দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঈশ্বরচন্দ্র বলিলে লোকে হা করিয়া থাকিত, 'বিদ্যাসাগর'—তাঁহার সার্ব্বজনিক নাম। 'এডিটার মহাশয়' ও সেইরূপ হরিনাথের সার্ব্বজনিক নাম ছিল। হরিনাথ 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার' সম্পাদক ছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'এডিটার' মহাশয় বলিত।

বাঙ্গলা ১২৭০ সালে তিনি গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; সে সময় সোমপ্রকাশই বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ছিল। গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ করিবার সময় তাঁহার মনোভাব এবং সংকল্প তাঁহার স্বলিখিত লিপি হইতে এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"এই গ্রামে বিদ্যাবুদ্ধি ও অর্থসম্পন্ন কত লোক আছেন, তাঁহারা মনে করিলে গ্রামবার্ত্তার ন্যায় কত পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারেন। এত লোক থাকিতে আমি বিদ্যাবুদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাশূন্য দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া এরূপ মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম কেন? এ কথার উত্তর কে

করিবে? তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, কুমারখালীবাসী সম্ভ্রান্ত মহাজনগণ একবার জমীদারকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া যারপরনাই অপমানিত হন এবং কয়েক হাজার টাকা ঋণ দান করেন; তখন আমার বয়স ১২।১৩ বৎসরের অধিক নহে। আমি স্বচক্ষে নির্দ্দোষ মহাজনগণের অপমানজনিত অশ্রুপাত দেখিয়া, ইহার কোন প্রতিকারের পথ আছে কিনা সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু কে যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতে লাগিলেন, "সংবাদপত্র ব্যতীত এরূপ অত্যাচার নিবারণের আর উপায় নাই"—কিন্তু সংবাদপত্র কি? কিরূপে তাহার কার্য্য চালাইতে হয়, ইহার কিছুই জানি না। বিদ্যা সম্বলের মধ্যে কুমারখালীর ইংরাজী বিদ্যালোক-দাতা বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয়ের দয়া বিতরিত-কাষ্ট নম্বর রিডারের দুই চারিটি গল্প ও তিন চারিখানি বাঙ্গালা পুস্তকের উপদেশ। কি করি, কি করি, কিরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে বুঝিতে পারি না, অথচ যিনি হৃদয়ে বসিয়া উপদেশ দিতেছেন, তিনি ছাড়েন না। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর কুমারখালীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিলেন, অনেকে 'খাতাই' ব্রাহ্ম হইলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দয়াল চাঁদ শিরোমণি উপাচার্য্য হইয়া কুমারখালী আসিলেন, তাঁহার নিকট পড়িতে আরম্ভ করিলাম, কিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান হইল, প্রথম খণ্ড হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট যত খণ্ড ছিল, তৎসমুদয় পাঠ করিলাম। পূর্ব্বে কেবল স্বভাবতঃ পদ্য লিখিতে জানিতাম, এক্ষণে গদ্যও লিখিতে শিখিলাম। সংবাদ প্রভাকর গতিকে সতিকে আনাইয়া সংবাদপত্র কি এবং তাহা কিরূপে সম্পাদন করিতে হয়, তাহাও দেখিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে লিখিয়া পরিশেষে প্রভাকরের একজন সংবাদদাতা বা লেখক মধ্যে গণ্য হইলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে নীলকুঠীতে ও মহাজনদিগের গদিতে ছিলাম, জমীদারের সেরেস্তা দেখিয়াছিলাম, এবং দেশের অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছিলাম; যেখানে যত প্রকার অত্যাচার হয়, তাহা আমার হৃদয়ে গাঁথা ছিল। দেশীয় সংবাদপত্রের অনুবাদক রবিন্সন সাহেব যখন অনুবাদ কার্য্যালয় খুলিলেন, আমিও সেই সময় গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ করিলাম।"

গ্রামবার্ত্তায় তিনি অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিতে

কোন দিন কুণ্ঠিত ছিলেন না, এজন্ত তাঁহাকে অনেক সময়ই বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, এমন কি দুই এক সময় তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কা পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল, কিন্তু তিনি কর্ত্তব্যচ্যুত হন নাই। সেই সকল কাহিনী বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করিতে হইলে ক্ষুদ্রকায়া দাসীতে স্থান সংকুলান হইবে না, সুতরাং অগত্যা আমরা সে সকল বিবরণ বর্ণন করিতে বিরত হইলাম, বিশেষতঃ যোগ্যতর লেখকগণ অন্ত পত্রিকায় সকল কথার উল্লেখ করিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে। অতএব হরিনাথের সম্বন্ধে অবশুজ্ঞাতব্য আরও দুই চারিটি কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বিদ্যালয়ের পরিশ্রম, গ্রামবার্ত্তার গুরুতর সম্পাদনভার, তাহার পর অন্নচিন্তা, এ সমস্ত অনিয়ম তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহসী বীরের ন্তায় সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু মানুষের সহ্য করিবারও একটা সীমা আছে, তাঁহার ঋণভার ক্রমে বাড়িয়া উঠিল—শরীর রোগে জীর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি অগত্যা গ্রামবার্ত্তার সম্পাদনভার আমাদের অযোগ্য হস্তে সমর্পণ-পূর্ব্বক ১২৯০ সালে কিঞ্চিৎ কালের জন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

তখন বঙ্গে নূতন স্রোত প্রবাহিত, নগরে বড় বড় সংবাদ পত্র, বড় বড় লেখক, প্রবল উৎসাহ, প্রচণ্ড কোলাহল, তখন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের কথা কে শুনিবে? গ্রামবার্ত্তায় জীবন থাকিল না, ২২ বৎসর কাল স্বদেশের সেবা করিয়া ১২৯২ সালে গ্রামবার্ত্তা খানি উঠিয়া গেল। বৃদ্ধ হরিনাথ স্বদেশের পরিচর্য্যা করিয়া জীবন বিপদ-সঙ্কুল করিয়া, ঋণভার মস্তকে লইয়া, ভগ্ন-হৃদয়ে, জরাজীর্ণ দেহে, গৃহপ্রাঙ্গণে বসিলেন। দেশের জন্ত তিনি যে এত খাটিলেন, এজন্ত কেহ তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত করিল না। এত দিন পরে শ্রীযুক্ত রামগোপাল সান্যাল মহাশয় তৎপ্রণীত Bengal Celebrities নামক গ্রন্থে হরিনাথের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

দেশের জন্ত যাহা করিবার সাধ্যানুসারে হরিনাথ তাহার ত্রুটী করেন নাই। অতঃপর তিনি ধর্ম্মালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়নিহিত ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। এতদিন রাজ-নীতি ক্ষেত্রে তাহার বিকাশ শুধু ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এক্ষণে সে ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তিনি বাউলের গান লইয়া পড়িলেন, কাঙ্গাল ফিকির চাঁদের গানের পরিচয় দেওয়ার স্থান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংকুলান হইতে পারে না। হরিনাথের 'ব্রহ্মাণ্ড বেদ' এক অপূর্ব্ব

সামগ্রী—তাহা মাসিক আকারে খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রকাশিত হইত, জ্ঞানী ধর্ম্ম পিপাসুগণ 'ব্রহ্মাণ্ড বেদে' অনেক অমূল্য রত্ন লাভ করিতেন; কিন্তু অর্থাভাবে তাহারও কিয়দংশ ছাপা হইল না, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি 'ব্রহ্মাণ্ড বেদ' লিখিয়াছেন।

হরিনাথ স্বভাবকবি ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। সেকালে কুমারখালীতে বড়ই সংকীর্ত্তনের ধুম ছিল, অনেকে সুন্দর সুন্দর পদ প্রস্তুত করিয়া গান করিতেন, কিন্তু হরিনাথের রচিত পদগুলি মহাজনবিরচিত পদাবলী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; আমরা হরিনাথের সমস্ত সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি। আমরা শুনিয়াছি, একদিন একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা একটি গান রচনা করিয়া কিছুতেই শেষ চরণ মিলাইতে পারিতেছেন না; অনেক চিন্তা করিতেছেন কিন্তু শেষ চরণটি মনের মত হইতেছে না, বালক হরিনাথ সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন, স্বীয় প্রতিভাবলে বালক এমন সুন্দর ভাবপূর্ণ শব্দ যোজনা করিয়া শেষ চরণটি মিলাইয়া দিলেন যে, সকলে অবাক্ হইয়া গেল। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি শুনিয়া অনেকে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার সংকীর্ত্তনে অনেকের চক্ষে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহার বাউলের গানে এক সময় বঙ্গের অনেক স্থান মাতিয়া উঠিয়াছিল, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের আবালবৃদ্ধ তাঁহার বাউলের গানের সহিত পরিচিত; এখনো রাখাল বালক সন্ধ্যাকালে ক্লান্তদেহে গোচারণ ক্ষেত্র হইতে ফিরিতে ফিরিতে উচ্চকণ্ঠে চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া স্তব্ধ সান্ধ্য আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিতে থাক;—

"বাঁশের দোলাতে উঠে, কেহে বটে,
শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে।"

এবং বর্ষার রাত্রে কুলপ্লাবী পদ্মার বিশালবক্ষে উন্মত্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল ক্ষুদ্র ডিঙ্গিখানিতে বসিয়া মাছ মারিতে মারিতে জেলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এক একবার গাহিয়া উঠে;—

"মন আমার টোপাপানা, ডুবতে চায় না,
সেই ভাবনা রাত্রি দিনে।"

চরাচর হইতে তাহার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি উঠিয়া যেন ক্ষণকালের জন্য তাহার অন্তরের মানুষটিকে জাগাইয়া তুলে। অনেকের সঙ্গীতে বিশ্বের

অনেক সুখ দুঃখ ধ্বনিত হইয়াছে—কিন্তু হরিনাথের বাউল সঙ্গীতে হৃদয়ের মধ্যে যেমন নির্বেদ,যেমন অনাসক্ত ভাব জাগাইয়া তুলে এমন আর কিছুতেই নহে। রূপের গর্ব্ব, ঐশ্বর্য্যের অভিমান, বাসনার বহ্নি হইতে ক্ষুদ্র নরহৃদয়কে রক্ষা করিবার পক্ষে হরিনাথের সঙ্গীত এক অমোঘ বর্ম্ম স্বরূপ। বর্ত্তমান জীবনী-লেখক হরিনাথের সঙ্গে অনেক সময় অনেক স্থানে এই বাউল গান উপলক্ষে গিয়াছেন। ঢাকা, ফরিদপুর, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার অনেক লোক হরিনাথকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। ঢাকায় যখন হরিনাথ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রমে অতিথি হন, তখন ঢাকা সহর হরিনাথের বাউল-সঙ্গীত-স্রোতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। অনেকে অনেকদূর হইতে হরিনাথকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ইহাতে হরিনাথ নিজেকে মহা অপরাধী জ্ঞান করিতেন—তিনি এত আলোক সহিতে পারিতেন না। অপরের অলক্ষ্যে থাকিয়া কাজ করাই তাঁহার কামনা ছিল। প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় পত্রান্তরালে থাকিয়া, সৌরভ বিকাশ করাই তিনি মহাব্রত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাই, যদি কোন সময় তাঁহার কোন কথা স্মরণার্থ নোট করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইত, তাহা হইলে তিনি অপ্রতিভ ভাবে বলিতেন, "তোমরা কি আমাকে পাগল করিবে? নীরবে কাজ কর, গোলমালে কাজ নাই।"—তিনি জগৎ হইতে কার্য্য করিবার প্রণালী শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। প্রতিদিন সূর্য্য উঠিতেছে, পৃথিবীর গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে নীরবে এক বালুকাকণাবৎ বীজ হইতে প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ উৎপন্ন হইতেছে; তিল তিল করিয়া বাড়িয়া প্রকৃতি-মাতার কোমল ক্রোড়ে কিরূপে অভ্রভেদী-কানন-শ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে;—কোন প্রকার শব্দ নাই, অসন্তোষ নাই; অখণ্ড সহিষ্ণুতা, অনন্ত শান্তি;—আমরা কেন অসহিষ্ণু, অশান্ত হইব? আমাদের ক্ষুদ্র কাজে কেন উচ্চ কলরব উঠিবে? ইহাই তাঁহার প্রদর্শিত শিক্ষা ছিল; তিনি জীবনে কখন এই পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই।

বার্দ্ধক্যকালে হরিনাথ সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। সংসার-চিন্তা অন্নকষ্ট কিছুই তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না। পরের উপকার করা তাঁহার জীবনের কার্য্য ছিল, অন্তিম মুহূর্ত্তেও তিনি সেই পরম পবিত্র ব্রত পালনে উদাসীন ছিলেন না। দুঃখী, তাপী, অনাথ, অসহায়, রোগী, শোককাতর ব্যক্তি সকলেই কাঙ্গালের স্নেহ পাইত। তিনি পিতৃহীনের

পিতা, মাতৃহীনের মাতা, বিপন্নের বন্ধু, সম্পন্ন ব্যক্তির সুপরামর্শ-দাতা, এবং কুপথগামী জনগণের সুপথ-প্রদর্শক ছিলেন। দাসের ন্যায় তিনি অনাথের সেবা করিতেন। বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিরুদ্বেগ হইত। যৌবনকালে হরিনাথ অত্যাচারীর যম ছিলেন। ধনী জমীদার, প্রতাপশালী নীলকর, দুর্দ্দান্ত মহাজনদিগের সহিত তিনি একাকী অসহায় হইয়াও বিধাতার চিরমঙ্গল আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, অক্লান্ত ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে তিনি রোগী ও তাপীর সান্ত্বনার স্থল ছিলেন। উত্থানশক্তি-রহিত মৃতকল্প চিররোগী তাহাদের এই দেবহৃদয় বন্ধুটিকে দেখিয়া একবার সসম্ভ্রমে উঠিবার চেষ্টা করিত, পারিত না; শুধু জ্যোতিহীন দুইটি দীন নেত্র হইতে অবসাদপূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞদৃষ্টি প্রেরণ করিত। হরিনাথ ধীরে ধীরে রোগীর মস্তকপ্রান্তে আসন গ্রহণ করিয়া তাহার শিরস্পর্শ করিতেন, কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, কত আশার কথা বলিতেন; শুনিতে শুনিতে সেই মৃতপ্রায় দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইত। রোগীর শয্যাপার্শ্বে তাঁহার সেই তেজঃপূর্ণ, উন্নত সুগৌর দেহ, শ্বেত শ্মশ্রু, গৈরিক বস্ত্র, নগ্নপদ এবং পৃষ্ঠ-বিলম্বিত শ্বেতবর্ণ রুক্ষ কেশভার দেখিলে মনে হইত স্বর্গ হইতে বিধাতা বুঝি কোন দেবদূতকে এই রোগীর সেবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন।

হরিনাথের জীবনী প্রকাশের ভার কোন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমার ন্যায় অযোগ্য লেখকের দ্বারা তাঁহার মহৎ চরিত্রের কাহিনী যথাযথরূপে বর্ণিত হইতে পারে না; কিম্বা আমি চরিত্র-সমালোচকের আসনও গ্রহণ করি নাই; তাঁহার সদ্‌গুণ সমূহ স্মরণপূর্ব্বক আমার শোকাবেগ লাঘব করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম। হরিনাথের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনীর অনেক কথা জানি না, যাহা জানি তাহাও সকল বলিতে পারি নাই, এবং যাহা বলিয়াছি তাহাও যেমন করিয়া বলা উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। হরিনাথ আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন, আমরা তাঁহার কিছুই করিতে পারি নাই। কিন্তু হায়! যদি তাঁহারই নির্দ্দেশমত দেশের জন্য—আর্ত্ত, পীড়িত, বিপন্নের জন্য কিছুও খাটিতে পারিতাম! তাঁহারই দিকে চাহিয়া যদি বলিতে পারিতাম—

"তোমারই চরণ করিয়ে স্মরণ চলেছি তোমারই পথে,
তোমারই ভাবেতে হইব বিভোর ধরি এই মনোরথে।"

শ্রীজলধর সেন।

কবিতা সুন্দরী।

মম ক্ষুদ্র তৃষিত চঞ্চল চিত্তে
সঞ্চর সদা
কেন, ওগো কবিতা সুন্দরী ?
আমার, জীর্ণ, বিদীর্ণ হৃদয় কুটীরে
তোমায়, বরিব কেমন করি ?
সুখ হেথা নাই, নাহিক শান্তি
মরীচিকা ঘেরা অনন্ত ভ্রান্তি
দিগন্ত হ'তে আনিছে ক্লান্তি
আমার শ্রান্ত বক্ষ-তরি,
আমার, জীর্ণ, বিদীর্ণ হৃদয়ে, গো দেবি,
তোমায়, বরিব কেমন করি ?

কোন্ অনন্ত দূরে বাস তব দেবি,
আমি ধূলির মাঝারে পড়ি !
আশাহীন প্রাণে সংশয় লয়ে
আগে পাছে চাই সঙ্কোচ ভয়ে,
বহ্নিরূপিণী হে চিত্তহারিণি,
তুমি আলোক অঞ্চল ধরি
চঞ্চলা সম লঘু পদ-ভরে
সঞ্চর সদা দিক্ আলো ক'রে
কি আছে কি দিয়ে পূজিব তোমারে
বুঝিতে নারি,
তাই, বিকল চিন্তার অন্ধ আবেগে
ঘুরিয়া মরি,
ওগো, বিকল চিত্ত মাঝারে তোমারে
কেমনে বরি ?

তুমি কখন আকাশে, কখন পাতালে
কভু জ্বল তুমি অরুণের ভালে,
নাচ গঙ্গার মাঝে বজ্রের তালে
অয়ি, অব্যক্ত আনন্দময়ি,
তুমি এস মম হৃদে
তোমার প্রসাদে
হইব পৃথিবীজয়ী।
আমার আঁধার হৃদয় আলো-করা ধন,
এই অনাথ-বাঞ্ছিত-দুর্লভ-রতন,
ভরি থাক দেবি এ মরুজীবন
আমি অজর, অমর হই ;
আমি জগৎ ভুলিয়ে তব প্রেমসুধা
অঞ্জলীপুরে লই।

পাখী যবে গাছে গান করে সুখে
মেলিয়ে পুলকে পাখা
প্রভাতের কালে, উষার আলোকে
কাঁপায়ে তরুর শাখা,
অথবা সন্ধ্যায় গগনের কোলে
দেখি জলদেরে বায়ুভরে দোলে
চিত্রিত চারু পাখাখানি মেলে
যবে রামধনু দেয় দেখা ;
আমি, তাহাদের মাঝে পাইগো দেখিতে
তব মুখখানি হাসিমাখা,
রমণীর মুখে, প্রকৃতির বুকে,
দেখি, তোমারই মাধুরী আঁকা।

তুমি রূপহীন রূপে বিশ্বের মাঝে
বিরাজিত দিন রাতি,
নিশীথ গগনে ধরে তারাগণে
তোমারই স্নিগ্ধ ভাতি ;
নিবিড় কৃষ্ণ তব কেশপাশ,
নিশার আঁধার করিছে প্রকাশ,
চন্দ্রে তোমার হাসির আভাস
চকোর-চিত্ত মাতি,
অঙ্গের তব সুরভি গন্ধ
বহে, চম্পক যূথি যাতি।

কোন কালে, দেবি, তব সাথে মম
হয়েছিল নাকি দেখা ?
পারনি ভুলিতে, এতকাল পরে
এসেছ আবার নারীরূপ ধ'রে,
নয়নে কৌতুক, মধুর অধরে
হাসির সরস রেখা,
বুঝি গো ও হাসি, জানি আঁখি কোণে
রয়েছে কি কথা লেখা।

যদি এসেছ, গো দেবি, যেয়োনাকো চলি,
গাও করুণ কোমলস্বরে,
আমি, ব্যথিতের ব্যথা, আর্ত্তের গান,
টানিয়া আনিব ভরি মন প্রাণ,
করিব তোমারে উপহার দান,
দেবি যেয়োনাকো চলে দূরে
আমার চির সাধ ভেঙ্গে চুরে ;
শুধু, বিশ্বের সুধা, আকণ্ঠ পিয়াও
নিতি প্রীতি অঞ্জলী পুরে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শেষ দান।

মনে পড়ে সাধের সে গেহ,
—আহা কত সুখের আলয় ;—
ক্রমে ক্রমে সে দিন আসিল
যে দিনেতে না আসিলে নয়।
নয়নের নিবে গেল জ্যোতি
অধরের হাসি গেল ঝরে' ;—
গৃহ ছাড়ি রহিতে হইবে
পরদেশে দীর্ঘকাল ধরে'।
স্নেহময়ী জননী আমার,
তাঁর পায়ে প্রণাম করিয়া
রাজপথে বাহির হইনু
আঁখিজলে নয়ন ভরিয়া।

শুকতারা তখনো ডোবেনি,
গাছপালা তখনো আঁধার ;
বেশী দূর আসি নাই আমি,—
শুনিলাম পদশব্দ কা'র।
দেখিলাম—পশ্চাতে জননী
আসিছেন কিসের লাগিয়া ;
কই ? কিছু, মনে ত পড়ে না,
এসেছি কি ফেলিয়া রাখিয়া ?

মা আমার কহিলেন—"বাছা
আপনার ইষ্টদেবতায়
যে ফুলেতে পূজা করিয়াছি,
সেই ফুল দিলাম তোমায়।
সাথে সাথে রাখিয়ো সর্ব্বদা,
অকুশল আসিবে না কাছে ;
পাপ দূরে পলাইয়া যাবে,
সে দেশেতে বড় ভয় আছে।"
সেই ফুল ধরিয়া হৃদয়ে
চলিলাম দীর্ঘপথ বাহি ;
আজিও তা রয়েছে হৃদয়ে,
নিশিদিন তারি পানে চাহি।

স্নেহময়ী প্রকৃতি-জননী
—ওগো মহা জননী আমার !
আসিয়াছি পৃথিবী প্রবাসে,
সাথে লয়ে সে ফুল তোমার।
ভাগ্যে মাতা দিয়েছিলে ইহা,
তাই ত মা রয়েছি বাঁচিয়া ;
এখানে যে শত্রু পদে পদে
ফিরিতেছে রাক্ষস সাজিয়া।
এ যে হেথা মরুভূমি মাগো,
সে আমার সুধা নির্ঝরিণী ;
এ যে মহা ব্যাধির নরকে
সে আমার মৃতসঞ্জীবনী।
মূর্ত্তিমতী বিবেকসুন্দরী
সে আমার এ পাপ নিলয়ে,
সে আমার সুখ, সে সন্তোষ,
সেই আশা, উৎসাহ হৃদয়ে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র।

আনন্দমঠ।—আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়ভাব-বিষয়ক উপন্যাস। গ্রন্থের বিষয় কিছু জটিল হইলেও গল্পাংশে বা চরিত্রে জটিলতা নাই। গ্রন্থের বিষয় নূতন এবং প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র তাহা নূতন ভাবে ব্যবহার করিতেই প্রয়াস পাইয়াছেন ; কিন্তু এই গ্রন্থে প্রতিভার ম্লানতা অনুভূত হয়—ইহাতে নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রভূত চেষ্টা সত্ত্বেও যেন বোধ হয়, যে জীবনব্যাপী গুরুতর পরিশ্রমে কর্ম্মক্লান্ত নানাবিষয়োদ্ভাবিনী প্রতিভা বিশ্রাম চাহিতেছে। যখন অশোক,

বকুল প্রভৃতি তরুরাজীর ঘনবিন্যস্ত পত্রাবরণে শতখণ্ডে বিভক্ত উষালোক উজ্জ্বলতর হইয়া, নদীতীরে শ্যামপুষ্পোপরিস্থ শিশিরবিন্দুর উপর জ্বলিতে আরম্ভ করে, তখন যেমন বিহগের প্রভাতী সঙ্গীতে একটু ক্লান্তির স্বর শ্রুত হয়,—আনন্দমঠেও সেইরূপ কিছু ক্লান্তির লক্ষণ দৃষ্ট হয়। উপমার পুনরাবৃত্তি ও ভাবের পুনরাবৃত্তি এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। হয়ত ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভূত পর্য্যবেক্ষণের অভাব হইতে উৎপন্ন। যাঁহারা বহু ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ইংরাজী ঔপন্যাসিক এক একটা অধ্যায় রচনায় কত চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণের পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু এই ম্লানতার অন্য কারণও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে,—এই গ্রন্থ রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে যে অত্যুজ্জ্বল কিরণময় ধর্ম্মচিন্তার উদয় লক্ষিত হয়; তাহার আলোকে অন্য চিন্তার উজ্জ্বল কিরণও ম্লান পরিদৃষ্ট হওয়া বিস্ময়কর নহে। এই ধর্ম্মচিন্তার বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম গ্রন্থদ্বয়ে।

এই গ্রন্থান্তর্গত প্রধান চরিত্র, শান্তি ও জীবানন্দ, কল্যাণী ও মহেন্দ্র, ভবানন্দ এবং সত্যানন্দ।

আনন্দমঠের সকল চরিত্রই অল্পাধিক পরিমাণে রহস্যকুহেলিকাচ্ছন্ন। তাহার কারণ, আমরা সম্পূর্ণরূপে কাহাকেও দেখিতে পাই না। মেঘ মধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় সকলকে অল্পক্ষণের জন্য দেখিতে পাই, যতটুকু দেখিতে পাই, তাহাতে সেই অন্ধকার-চিত্রপটে তাঁহাদিগের উজ্জ্বলতা অনুভূত হইলেও, সে দর্শন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। আনন্দমঠে তাঁহারা যতক্ষণ এবং আনন্দমঠে তাঁহাদিগের যতটুকু, আমরা প্রায় কেবল ততক্ষণ তাঁহাদিগের ততটুকু মাত্র দেখিতে পাই। শান্তিরও প্রায় তাহাই। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণ সকলে শান্তির জীবন আরও রহস্যাবৃত ছিল—পরে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রথম জীবনের একটা ইতিহাস দিয়াছেন। তাহাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছে এমন মনে হয় না। বরং এখানে বলিয়া রাখি যে, পরবর্ত্তী সংস্করণে, গ্রন্থে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে শান্তি-চরিত্রের মাধুরী একটু বিনষ্ট হইয়াছে, ইহাই বলিতে হইবে। শান্তিচরিত্র আদ্যোপান্ত বিস্ময়কর—অদ্ভুত। অতি শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া শান্তি পিতার ছাত্রদিগের সহিত মিশিয়া কতকটা পুরুষভাবাপন্না হইয়াছিল;—ব্যাঘ্র সহবাসে থাকিয়া মানবশিশু ব্যাঘ্র ভাবাপন্ন হয়, শান্তির পুরুষ ভাবাপন্ন হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বিবাহের পর

সেই বন্ধনবিরোধিনী বালিকার গৃহত্যাগ ও তাহার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত দেশে দেশে ভ্রমণ বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। বন্ধনবিরোধিনী বালিকার হৃদয়ে প্রেমোদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক—বিশেষ শান্তি যখন সন্ন্যাসী সাজিয়া পলাইতে পারিয়াছিল, তখন আর শান্তি শিশু নহে। * কিন্তু শান্তি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত দেশে দেশে ঘুরিয়া, শেষে অবস্থাচক্রের আবর্ত্তনে পতির নিকট ফিরিয়া আসিল। বিবাহের পর প্রেমের ভার প্রজাপতির উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াই পুষ্পধন্বার উচিত; কারণ বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর প্রেমে যে পবিত্রভাব থাকে, বিবাহের পূর্ব্বে তাহা থাকে না। গ্র্যাণ্ট অ্যালেনের The Woman who didএর কার্য্যে পরিণত হইবার সময় যে এখনও আইসে নাই, তাহা নিশ্চিত। গৃহে ফিরিয়া জীবানন্দকে দেখিয়া শান্তি ভাবিল:—

"শিখে' পুরুষের বিদ্যা, পরে' পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এত দিন
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে, সেই
আপনাতে আপনি অটল মূর্ত্তি হেরি'
সেই মুহূর্ত্তেই জানিলাম মনে নারী
আমি।"

সেই সাক্ষাতের সময় উভয়েই মনে করিল:—

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য আকুল;
মাঝে তুমি শতদল ফুটে ছিলে ঢল ঢল
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

তাহার পর গৃহত্যাগী সন্তান-সম্প্রদায়ভুক্ত জীবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইতে শান্তির জীবন অদ্ভুত। তাহার সন্তান-সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদিগকে সাহস প্রদান করা, লিণ্ডলের অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়ন করা—সকলই অদ্ভুত। শান্তির এই রণাঙ্গনা বেশে অশ্বারোহণের অদ্ভুতত্ব বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ গীতিকবি বাবু দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেন, "ধুতি চাদর পরিয়া ঘোড়ায় চড়ার হাস্যকরত্ব সম্বন্ধে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই এবং বোধ

---

* শ্রদ্ধেয় বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "সমাপ্তি" নামক গল্পে এইরূপ একটি বন্ধন-বিরোধিনী বালিকার হৃদয়ে প্রেমোদ্রেক সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। লেখক।

হয় কাহারও নাই। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার অপেক্ষাও হাস্তকর ব্যাপার ‘শান্তি’ নাম্নী বীরবঙ্গনারীর সাড়ী পরিয়া অশ্বারোহণ ও মলের গুঁতা দিয়া অশ্ব পরিচালনার কিম্ভূতত্ব বঙ্কিম বাবুর ন্যায় এক জন সুনিপুণ সৌন্দর্য্যতত্বজ্ঞ ‘আর্টিষ্টে’র হৃদয়ঙ্গম হইল না। মলের গুঁতায় অশ্ব চলিতে পারে বটে, কিন্তু বাঙ্গালী রমণীর মত (বেসেলাই) সাড়ি পরিয়া পুরুষের মত করিয়া দুই দিকে পা ঝোলাইয়া ঘোড়ায় চড়া ও সাড়ি পরিধানের সার্থকতা রাখা কিরূপে সম্ভব, তাহা আমার চক্ষুর ও মনেরও অগোচর। এই সব কল্পনা উক্ত গ্রন্থকারের শেষ বয়সে বিকৃত মস্তিষ্কের চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।" * কেবল শেষকালে যুদ্ধক্ষেত্রে, যখন সকল ভুলিয়া শান্তি, "সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, তখনই শান্তি প্রকৃত শান্তি। সত্যই তারকাকুন্তলা সন্ধ্যার স্বচ্ছান্ধকারময় গগনে যেমন উষালোক ভাল লাগে না, তেমনই শান্তির চরিত্রে এই কঠোর বীরভাব ভাল লাগে না। শান্তিচরিত্র আমাদিগের ভাল লাগে না, তাহার কারণ প্রচলিত আচার ও ব্যবহার ফলে যে সকল ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, সে সকলের আঘাত-সহনীয়তার একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রান্ত হইলেই গোল বাধে। দেশকালপাত্রভেদে আবার সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতায় আমরা এখন কতকাংশে অভ্যস্থ হইলেও কাশীদাসের সুভদ্রার অনুকরণে সূর্য্যমুখীর গাড়ী হাঁকানটা অনেকের ভাল লাগে না। বর্ত্তমান সময়ের একটা দৃষ্টান্ত লইলে কথাটা পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার সুবিধা হইতে পারে। ইংলণ্ডে রমণীর অধিকার সম্বন্ধীয় শত বাদ প্রতিবাদ সত্বেও যে নরনারীর আবির্ভাবে ইংরাজী সাহিত্য এখন কলুষিত, যে নরনারীর প্রভাব বর্দ্ধিত হইলে ইংলণ্ডে বিবাহ-প্রথা যদি বিলুপ্ত না হয়, তবে কেবল দীর্ঘকেশশালী পুরুষগণ হ্রস্বকেশশালিনী রমণীগণকে বিবাহ করিবে, আর রমণীগণ ফুটবল খেলিয়া, দ্বিচক্ররথ চালাইয়া কাল কাটাইবে এবং সভাস্থলে সমবেত হইয়া তীব্র ও কদর্য্য ভাষায় সন্তানের জন্মের অনাবশ্যকতা এবং অন্যায় ভাব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে, ইংলণ্ডে সেই নরনারী এখনও ঘৃণিত। শান্তি, আমাদিগের বহুকালের ধারণা এবং প্রচলিত আচার নিষ্ঠুর ঘৃণার চক্ষে দেখে বলিয়াই আমাদিগের নিকট তাহার চরিত্রের মাধুরী রক্ষিত হয় না। এই বিস্ময়কর চরিত্রে একমাত্র সুন্দরভাব—প্রেম।

* ভারতী—চৈত্র ১৩০২।

প্রেমহীন মানব-হৃদয় সাগরমধ্যস্থ পাদপহীন, জীববাসের অযোগ্য মরুময় দ্বীপের সহিত তুলনীয়। প্রেমহীন নারীচরিত্র আমরা দেখিতে পারি না, তাই আজকালকার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Benson সৃজিত Dodo চরিত্র বা Iotaর A yellow Aster নামক গ্রন্থে Gwer এর চরিত্রের প্রথমাংশ রাক্ষসীর চরিত্র বলিয়া বোধ হয়। রমণীর প্রেমই রমণীর মাধুরী, সৌন্দর্য্য, কোমলতা, সর্ব্বস্ব। ইংরাজ কবি বলিয়াছেন,—

"Man's love is of man's life a thing apart,
'Tis woman's whole existence."

কুরুক্ষেত্রের কবি বলিয়াছেন, "রমণীর প্রেম আহা, রমণীর প্রাণ।" অস্মদ্দেশীয় কোনও গীতিকবি আরও উচ্চে উঠিয়া বলিয়াছেন ;—

"প্রণয় রমণী জীবন,
ইহকাল পরকাল।"

যখন শান্তি সত্যানন্দকে বলিল, "আমি আর আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল, সবই বলিব;" যখন সে বলিল, "ইহলোকে স্ত্রীর পতিসেবা, কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম্ম দেবতা— আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড় ;" তখন সে সত্যসত্যই তেজো-গর্ব্বিতা বঙ্গরমণী। আবার যখন সে জীবানন্দকে বলিল, "তুমি আমায় ভাল বাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে!" তখন সে সত্য সত্যই রমণী। তাহার হৃদয়ে এই প্রেম আছে বলিয়াই বিচিত্রচরিত্রা সন্ন্যাসিনীর সুখ দুঃখের কথা আমরা শুনিতে পারি। তাহার হৃদয়ে এই প্রণয় না থাকিলে শান্তি এই বীর্য্য সত্ত্বেও কোনরূপেই আমাদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিত না।

"নির্ব্বাপিত-অরুণ-লাবণ্য-লেখা
উষার মতন যে রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে' থাকে;
বীর্য্য-শৈল-শৃঙ্গ-'পরে নিত্য একাকিনী"

সেই প্রেমহীনার চিত্র আমাদিগের ভাল লাগে না।

জীবানন্দ অসাধারণ চরিত্র নহে। যে দিন জীবানন্দ সমাজের ভয়ে বিবাহিতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই, সেই দিন তাঁহার

মানসিক বলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহার পর আর সে কর্ত্তব্য-পরায়ণ নহে। সন্তানসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া সে শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ম চলিয়া গেল, তাহার "রমণীতে নাহি সাধ" সত্য নহে। পতি হইয়া—পত্নীত্যাগী পতি হইয়া—কোন্ মুখে জীবানন্দ শান্তিকে বলিল, "তোমার ত খাইবার পরিবার অভাব নাই।" !! পতি-দর্শন-সুখও যে রমণীর ভাগ্যে নাই, সে কি খাইলে পরিলেই সুখী হয়? মূর্খ জীবানন্দ তখনও পত্নীকে চিনে নাই, পত্নী যে পতির সকল কার্য্যে সহায় তাহা বুঝে নাই। সত্যই "নারী জানা, মণি কেনা দুর্ঘট ঘটনা।" তবে তাহার মনে তখনও ভালবাসা ছিল, নহিলে সে কাঁদিত না। তাহার পর তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শান্তি তাহার প্রেম বর্দ্ধিত করিয়াছিল; নহিলে যখন "সন্তান"গণকে উৎসাহিত করিবার সময় সহসা ইংরাজের বজ্রনাদী কামানের শব্দ শুনিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "Arm ! Arm ! it is —it is the cannon's opening roar !" তখন জীবানন্দ কাতর দৃষ্টিতে পার্শ্বস্থিতা পত্নীর দিকে চাহিত না। জীবানন্দের সাহস ছিল; হৃদয়ে বলও ছিল, নহিলে সে শত্রুনাশ ও আত্ম জীবননাশোদ্যোগ করিতে পারিত না। জীবানন্দের দোষও ছিল, গুণও ছিল।

কল্যাণী কয়বার মাত্র পাঠককে দেখা দিয়াছেন। তাঁহার সেই মধ্যাহ্ন-সূর্য্যদীপ্তগগনে মেঘচ্ছায়ার ন্যায় বিষাদময় হৃদয়ের দৃঢ়তার মাত্র পরিচয় পাইয়াছি। দুইবার সে দৃঢ়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়—একবার যখন তিনি বিষপান করিয়াছিলেন—আর একবার যখন তিনি ভবানন্দকে বলিয়াছিলেন—"(তোমাকে) ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব।" (পাঠক! ইহার সহিত অমরনাথের প্রতি লবঙ্গলতার কথা তুলনা করুন।) কিন্তু কল্যাণীকে দূর করিবার জন্ম সেই স্বপ্নের আবির্ভাব কেন? কল্যাণীকে ওরূপে দূর করা কি নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল? কল্যাণী ভাবিয়াছিলেন যে ছোট ছোট ধর্ম্মে স্ত্রী স্বামীর সহায়; কিন্তু বড় বড় ধর্ম্মে কণ্টক। গ্রন্থ-কারও বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন, 'বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়।" বলিতে ক্ষতি নাই যে আমরা এখনও বুঝি নাই বাঙ্গালীর স্ত্রী কেন অনেক সময় বাঙ্গালীর প্রধান সহায় নহে। কল্যাণী বলিয়াছেন, "যার বুকে কাদাপোরা কলসী বাঁধা সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে?" আমরা বলি পত্নীকে যদি কলসী বলি-

তেই হয়, বল ; কিন্তু কাষাপোয়া বলিও না, কলসীটা লইয়া হয়ত সময় সময় একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়, কিন্তু সংসারসমুদ্রে সাঁতার দিতে সেই কলসীর মত সহায় আর নাই। গ্যারিবল্ডীর পার্শ্বে অ্যানিটা, অর্জ্জুনের পার্শ্বে দ্রৌপদী না থাকিলে বীরগণের বাহুতে অতিশক্তি হয়ত সঞ্চারিত হইত না। পত্নীর সাহায্য—অন্ততঃ সহানুভূতি পাইলে অনেক প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত না। আমরা হীন, তাই মনে করি "Woman is the lesser man !" আশ্চর্য্যের বিষয় যে মহাভারতে দেখিয়াছি "কামিনীদিগের নিকট, বিবাহ স্থলে এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলেও পাতক নাই।" (দ্রোণপর্ব্ব)। আবার স্ত্রীর নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও পাপাবহ নহে। (শান্তিপর্ব্ব)। প্রকৃত প্রস্তাবে "ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ, পরমবন্ধু এবং ত্রিবর্গ লাভের মূল কারণ। ভার্য্যাবান লোকেরাই ক্রিয়াশালী হয় ; ভার্য্যাবান লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয় ; ভার্য্যাবান লোকেরাই সর্ব্বদা সুখী হয় এবং ভার্য্যাবান লোকেরাই সৌভাগ্য-সম্পন্ন হয়। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা অসহায়ের সহায়স্বরূপ, ধর্ম্মকার্য্যে পিতাস্বরূপ, আর্ত্তব্যক্তির জননীস্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রামস্থান স্বরূপ।" (আদিপর্ব্ব)। শান্তি সত্যানন্দকে বুঝাইয়াছিলেন যে সে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতেই আসিয়াছিল। সে বলিয়াছে "অর্জ্জুন যখন যাদবীসেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিল, কে তাহার রথ চালাইয়াছিল ? * দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে, পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত ?

শান্তি বলিয়াছে :—

"পুরুষের বামা বন্ধু, বামা মন্ত্রী তার,
বীরের একাই সেই সহায় রমণী।"

মহেন্দ্রের হৃদয়ের বল তেমন অধিক নহে। তাহা অধিক হইলে সে অত সহজে সন্তান সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে সম্মত হইত না। যে সম্প্রদায়ের

---

* সুভদ্রার রথ চালানার কথার উল্লেখ "বিষবৃক্ষেও" পাইয়াছি। কিন্তু মূল মহাভারতে তাহা নাই। বঙ্কিমচন্দ্র আপনি 'কৃষ্ণচরিত্রে বলিয়াছেন—অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদবসেনার সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হইল, সুভদ্রা তাঁহার সারথী হইয়া গগনমার্গে তাঁহার রথ চালাইতে লাগিলেন—এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে, কিন্তু মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নাই। ইহা কাশীরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাঁহার সৃষ্টি কি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কথকদিগের সৃষ্টি, তাহা বলা যায় না।" (২২৫ পৃষ্ঠা)। তবে শান্তির মুখে কথকের কথা বা কাশীদাসের কথাই শোনা যায়। লেখক।

জন্ত সে কল্যাণীকে হারাইয়াছে, সহজে সে সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে চাহিত না।

ভবানন্দের গ্রন্থ মধ্যে বিশেষ উপযোগিতা নাই। তবে বিচিত্র সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু বিরহমিলনময় গৃহ, চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন শিশুর হাস্য, সংসারের সুখ হৃদয়ের বন্ধন পত্নী, সকল হইতে দূরে আসিয়া মানবকে প্রকৃতির বিরোধী কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে তাহার অধঃপতন যে সহজেই হয় এই চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা যেরূপে ভবানন্দকে পাইয়াছি, তাহাতে তাহার "Every inch that is not fool is rogue." কল্যাণী সম্বন্ধে তাহার—

"But to see her was to love her,
Love but her, and love for ever."

কিন্তু তাই বলিয়া এই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর এই চিত্তচাঞ্চল্য, এই বাসনা-নিবৃত্তি-ক্ষমতাভাব নিতান্ত অমার্জ্জনীয়। জীবানন্দ যখন "বন্দেমাতরম্" গাহিতে গাহিতে প্রাণত্যাগ করিল; তখন গ্রন্থকার বলিলেন, "হায়! রমণী রূপলাবণ্য! ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক্।" বহুকাল হইতে,—

"The light that lies
In woman's eyes"

সংসারে নানা অনর্থের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। সীতার রূপানলে রক্ষোরাজের,—

"কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলি-তেজে
উজ্জলিত নাট্যশালাসম"

সুন্দরীপুরী, বিরাটবংশ, বিচিত্রবল, সকলই ভস্মীভূত, হেলেনের রূপ বহ্নিতে ট্রয় ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিন্তু আমরা কাহাকে ধিক্কার দিব—রমণীরূপ-লাবণ্যকে না পুরুষের মনকে! শোভাময়ী প্রকৃতির অনন্ত শোভার মধ্যে রমণীও এক শোভা, কিন্তু পুরুষ সংযত এবং কর্ত্তব্যবোধী হইলে তাহা হইতে কুফল উৎপত্তির কোনই সম্ভাবনা থাকে না। পুরুষ সকল সময় বুঝে না,

"যে বিদ্যুৎ ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।"

আমরা বলি পুরুষের আত্মসংযম চেষ্টাভাব, তোমাকেই ধিক্।

ভবানন্দের সম্বন্ধে কেবল বলিবার আছে :—

"Nothing in his life
Became him, like the leaving it."

সত্যানন্দ ও সন্তান-সম্প্রদায় বড় বিজড়িত। সত্যানন্দের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে; কিন্তু তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন। যখন "মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।" তখন জনকতক লোকের পক্ষে দলবদ্ধ হইয়া গোটাকতক তিতুমিরের লড়াই কতে করা বিস্ময়কর নহে। কিন্তু যে সম্প্রদায় মানবকে সকল সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যের সার প্রেম হইতে দূরে রাখে, যে সম্প্রদায় পতিকে পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য, পিতাকে সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতে বলে সে সম্প্রদায় স্থায়ী হইতে পারে না। "পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ"? সন্তান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মোন্মত্ততা ছিল না। ধর্ম্মোন্মত্ততায় মানব যাহা করিতে পারে, তাহা আর কিছুর জন্য করিতে পারে না। ক্রিশ্চিয়ানের ক্রুসেড, মুসলমানের দিগ্বিজয় তাহার পরিচয়। যখন মুসলমান "করালকৃপাণ মুখে ধর্ম্মের বিস্তার" করিতে অগ্রসর হইয়া বাহুবলে প্রাচীন ভূভাগ কম্পিত করিয়াছিল,—যখন মুসলমান রোমনগরীতে সেণ্টপিটার্সের বেদীর উপর আপনার তুরঙ্গকে ওট ভোজন করাইবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তখন সে কেবল ধর্ম্মোন্মত্ততায় তাহা করিয়াছিল। মুসলমানের যে অসীম বলশালী নিষ্ঠুরতার অনলশিখা এখনও অতীতের অন্ধকার মধ্যে দেদীপ্যমান তাহা এই ধর্ম্মোন্মাদ হইতেই উদ্ভূত। এই ধর্ম্মোন্মত্ততা থাকিলে সন্তানসম্প্রদায় অত সহজে বাত্যামুখে শুষ্কবৃক্ষের পত্রের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইত না। সন্তান সম্প্রদায়ের বল ছিল না।

দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, দেবীচৌধুরাণী বা আনন্দমঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে আনন্দমঠের আলোচনায় প্রয়োজন দেখি না। (সন্ন্যাসীবিদ্রোহের কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠক পরিশিষ্টে পাইবেন।) বিশেষ সন্ন্যাসীবিদ্রোহ ঐতিহাসিক উপন্যাসের উত্তম ভিত্তিই নহে। তবে সন্ন্যাসীবিদ্রোহ যদি মুসলমানের হস্ত হইতে ইংরাজের হস্তে এ দেশের শাসনভার অর্পণে কিছু সাহায্যও করিয়া থাকে তবে যে সন্ন্যাসীবিদ্রোহে এ দেশের প্রভূত উপকার হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আনন্দমঠের শেষ কথা—"বন্দেমাতরম্।" শ্রদ্ধেয় বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সব ভারতসন্তান" উহাতে একটি সুন্দর কোরাস থাকা প্রযুক্ত সভাস্থলে বা বৃহৎ বৃহৎ সমাগমে গীত হইবার বিশেষ উপযোগী। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় যে বঙ্গভাষায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র গেয় জাতীয় সঙ্গীত-গুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" এবং রবীন্দ্রবাবুর "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। "বন্দেমাতরম্" জননী জন্মভূমির পূজার পবিত্র মন্ত্র। কোনও সভাস্থলে একবার "বন্দেমাতরম্" গীত হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে যে ভাবময় হাস্য ফুটিতে দেখিয়াছিলাম আজিও তাহা ভুলিতে পারি নাই। "বন্দেমাতরম্"এর মত জাতীয় সঙ্গীত যে কোন ভাষাতেই হউক দুর্ল্লভ। এখন জাতীয় মহাসমিতির কৃপায় আমরা শিখিয়াছি ;—

"আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,—
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
পুণ্য-প্রেমের বাতাসে।"

আশা করি জাতীয় মহা সমিতিতে যে জাতীয় ভাব এখন পূর্ব্বাকাশে শুকতারা রূপে উদিত হইয়াছে, যখন তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে আমাদিগের জাতীয় জীবন উদ্ভাবিত হইবে, তখন গৃহে গৃহে গীত হইবে :—

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণা শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সত্যধর্ম্ম ও সমাজ।

(৫)

আমি এযাবৎ ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি যে বিজ্ঞানই ধর্ম্মের মূল এবং ধর্ম্ম বিজ্ঞানের চরম। যে ধর্ম্মের মূল বিজ্ঞানাবিষ্ট নহে, তাহাকে সত্যধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না; বিজ্ঞান জগৎকার্য্যের বিধান প্রকটন করিতেছে, অতএব যাহা বিজ্ঞানবিরোধী তাহা জগৎকার্য্যের বিধান-বিগর্হিত। আবার বিজ্ঞান প্রকৃতির কুটিল ক্রিয়াকলাপ হইতে সত্যোদ্ধার করিতেছে, অতএব যাহা বিজ্ঞান-বিরোধী তাহা সত্য নামে বাচ্য হইতে পারে না। এস্থলে কেহ হয়ত বলিবেন যে, বিজ্ঞান কি সমস্ত সত্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে যে বিজ্ঞান যাহাকে সত্য বলিবে না, তাহা জগতে সত্য নামে বাচ্য হইতে পারিবে না? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, যাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে তাহাই বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইতেছে;—অতএব ইহা বুঝা যাইবে যে বিজ্ঞান যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতেছে না, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। এইরূপে দেখা যায় যে, সত্য যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয় তবে বিজ্ঞানই তাহার একমাত্র আশ্রয় এবং অবলম্বন। প্রথম প্রস্তাবে ইহা সূচিত হইয়াছে যে সত্যের সম্মাননা ও অসত্যের অবমাননাকে ধর্ম্ম কহা যায়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে—অসত্যের নির্ব্বাসন ও সত্যের অভিষেক বিজ্ঞানের কার্য্য। এ কারণ ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে সত্যধর্ম্মের মূল বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন ও সাধন বিষয়ে বিজ্ঞানই প্রকৃষ্ট উপায়।

যে সমাজে বিজ্ঞানচর্চ্চা বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, এবং বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের মূল ও ধর্ম্মকে বিজ্ঞানের চরম বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে, অধিকন্তু যে সমাজে ঐরূপ বিজ্ঞানচর্চ্চাকে ধর্ম্মসাধনের সোপানরূপে পরিগণিত করা হয়, সেই সমাজে উপরোক্ত প্রকার বিজ্ঞান চর্চ্চার অবশ্যম্ভাবী ফল ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন।

পূর্ব্বে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, সমাজ গঠিত হইলেই তাহাতে "সংস্কার" জন্মাইতে আরম্ভ করে। যে সমাজে বিজ্ঞানকে ধর্ম্মসাধনের সোপান বলিয়া পরিগণিত করা হয়, সে সমাজে ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কার বিজ্ঞান-মূলক হইয়া প্রতিভাত হয়, অতএব তাহা সত্যাশ্রিত সুসংস্কাররূপে জন্ম গ্রহণ

ও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের নিকট এই মত এত পরিস্ফুটরূপে উপলব্ধ হইয়াছিল যে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ কবি জ্যোতিষকে ধর্ম্মার্থকাম ও যশোলাভের একমাত্র হেতু প্রতিপন্ন করিতে গিয়া এইরূপ গাহিয়াছিলেন :—

"তস্মাদ্দ্বিজৈরধ্যয়নীয়মেতৎ
পুণ্যং রহস্যং পরমঞ্চ তত্ত্বম্।
যো জ্যোতিষং বেত্তি নরঃ স সম্যগ্
ধর্ম্মার্থকামান্ লভতে যশশ্চ ॥"

তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক বিদ্যাই "বেদাঙ্গ" বলিয়া গণ্য হইত এবং প্রত্যেক জ্ঞানই ব্রহ্মলাভের সোপান বলিয়া অধীত হইত। নিদান, জ্যোতিষ, শব্দশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, উক্ত, নিরুক্ত যাহা কিছু বিদ্যা আছে, হিন্দুর নিকট সমস্তই ধর্ম্মসাধনের অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগের প্রাচীন মতের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে ;—এক আঘাতেই আমাদের শিক্ষাকে ধর্ম্মসাধন হইতে মূলতঃ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। আমাদের যাহা কিছু পূর্ব্বার্জ্জিত জরাজীর্ণ সংস্কার সম্বল ছিল, তাহা অবিদ্যাসমাশ্রিত হইয়া ঘোরকৃষ্ণ কুসংস্কারে পরিণত হইয়া গিয়াছিল ; এক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ সংস্কারবর্জ্জিত অসামাজিক সমাজের অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া ফেলিয়াছে।

এক্ষণে আমাদের শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য লোপ পাইয়াছে এ কারণ আমাদের মধ্যে ধর্ম্মসংস্কার জন্মাইতে পারিতেছে না। ধর্ম্মবিষয়ে আমাদের পরস্পর মতের সমন্বয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, একারণ আমরা সমাজ গঠন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। উপরন্তু বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সহিত আমাদের ধর্ম্মমতকে সম্মিলিত করিয়া পরস্পরের একীকরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, একারণ আমাদের ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে। এইরূপ সময়ে এবং এবম্বিধ অবস্থাতে ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ সত্যধর্ম্মের প্রচারে ব্রতী ;—এই ধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা" গ্রন্থে বলিয়াছেন, জগতে যাহা কিছু নূতন সত্য যে কোন সময়ে আবিষ্কৃত হইবে তাহা সমস্তই ব্রাহ্মধর্ম্মের মত এবং অঙ্গীভূত হইবে! এই মত ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিসর পর্য্যন্তদূর কত বিস্তৃত করিয়া দিতেছে এবং

ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি পরিমাণে সত্য ও বিজ্ঞানমূলক ধর্ম্মের পদবীতে সমারূঢ় করিয়া দিতেছে, তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই চিন্তনীয়।

রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধোক্ত সত্যধর্ম্মের সহিত তাহার বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, একারণ আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে সত্যধর্ম্ম আখ্যা প্রদান করিতে সাহসী হইতেছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এই মতকে সমর্থন এবং কার্য্যতঃ তাহাকে ধর্ম্মমতরূপে গ্রহণ করিতেছেন কি না, তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্মরূপে পরিগণিত না হয়, তবে জগতে তাহা কি পর্য্যন্ত সাফল্য লাভ করিবে তাহাও বিবেচনাসাপেক্ষ। আমরা প্রথম প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজ নূতন সমাজ, একারণ তাহাতে এ পর্য্যন্ত সংস্কার জন্মাইতে পারে নাই। ব্রাহ্মসমাজে যে একেবারেই সংস্কার নাই তাহা অবশ্য বলা যায় না; কারণ অধিকাংশ ব্রাহ্মই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ হইতে সমাগত। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রকোপে তাঁহাদের পূর্ব্ব সংস্কার বহু পরিমাণে বিনষ্ট হইলেও একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। যদি নূতন সমাজে আশু সংস্কার জন্মাইবার প্রয়াস না দেখা যায়, তবে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, অনতিবিলম্বে তাহাতে পূর্ব্ব সংস্কারের প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ করিবে। ইহা সমাজের পক্ষে শুভ কিম্বা অশুভকর তাহা সমাজের নেতাগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত; এবং যখন যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিজ্ঞানই ব্রাহ্মধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বন। বিজ্ঞান বলিতে কেবল যন্ত্রসমন্বিত শিক্ষা বুঝাইবে না; কার্য্যপর্য্যবেক্ষণ ও তাহার কারণানুসন্ধানে মনোনিবেশ করাকেই বিজ্ঞানচর্চ্চা বলা যাইবে। এইরূপ চর্চ্চা ব্রাহ্মের ধর্ম্মসাধনের মুখ্যাঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থিতি এবং ক্রমোন্নতি যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিবেন যে, জ্ঞানার্জ্জনই ব্রাহ্মের পক্ষে প্রকৃষ্ট ধর্ম্মসাধন। ব্রাহ্মবালকবালিকাগণ বাল্যকাল হইতে মাতৃদুগ্ধের সহিত যেমন কুসংস্কার বর্জ্জিত মত সকল অন্তরস্থ করিতে শিক্ষা করিবে, তেমনই বিদ্যাশিক্ষাকে ঈশ্বরোপাসনার সোপান এবং মিথ্যাকথন, পরদ্রব্যাপহরণের ন্যায় বিদ্যার্জ্জনে অবহেলা ও জ্ঞানলাভে অরুচিকে পাপ-

কার্য্য বলিয়া ধারণা করিতে শিক্ষা করিবে। প্রাচীন ঋষিকুমারগণ যেরূপ বেদাধ্যয়ন ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ মনে করিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া থাকিতেন, ব্রাহ্মসন্তান সেইরূপ জ্ঞানার্জ্জনকে ধর্ম্মসাধনের মুখ্য সোপান বলিয়া গণ্য করিতে শিক্ষা করিবে। বিদ্যালয়ে যে সকল বিষয় শিক্ষা করা হয়, তাহা ব্রাহ্মসন্তানের নিকট প্রকৃষ্ট ধর্ম্মশিক্ষা বলিয়া ধারণা হইবে। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়া ব্রাহ্মসন্তানের নিকট অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে।

বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মসন্তানের একটী বিশেষ শিক্ষা দরকার; তাহা বিজ্ঞানবিষয়ক। বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন এবং বিজ্ঞান চর্চ্চাতে তৎপর না হইলে ব্রাহ্মের সন্তান ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত হইবে না। ব্রাহ্মের নিকট বিজ্ঞান গ্রন্থগত বিদ্যা না হইয়া প্রত্যক্ষতঃ ধ্যান ও ধারণার বস্তু হইবে। এইরূপ জ্ঞানসাধনকে ব্রাহ্মের ধর্ম্মসাধনের মূলে প্রতিষ্ঠিত করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে সত্যধর্ম্মরূপে চিরজীবী হইয়া থাকিবে এবং ব্রাহ্মসমাজ জগতে আদর্শ-সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আমাদের দেশে শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম ও জীবনের সমবায় নাই বলিয়া আমরা "বাপের ছেলে" খুব কম দেখিতে পাই। ইয়ুরোপে শিক্ষা ও জীবন ওতঃপ্রোত ভাবে সমন্বিত হইয়া যায় বলিয়াই তথায় এক ব্যক্তির সুশিক্ষার ফল তিন পুরুষেও মলিনতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ঐরূপ শিক্ষার ফলে ডারুইনের পুত্রগণ সকলেই জগদ্বিখ্যাত ডারুইন; হর্শেলের বংশধরগণ সকলেই জগতে সত্যের প্রতিষ্ঠাতা ও আবিষ্কর্ত্তা; (এই বংশে মেয়ে পর্য্যন্ত জ্যোতিষিক আবিক্রিয়াতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন!)

অনেক পিতামাতা সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াই শিক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন; অনেকে অপরের সন্তানের শিক্ষাতে অধিকতর নিবিষ্ট থাকিয়া আপন সন্তানকে অবহেলা করেন। সন্তানকে জ্ঞানদান করা যে একটী অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মানুশাসিত কার্য্য তাহা ভাবেন না। অনেকে আবার কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য যত অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত, তাহার অংশবিশেষ পুত্রকন্যা দিগের শিক্ষাতে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত,—কারণ তখন তাঁহাদের অর্থাভাব মনে উদয় হয়। ইঁহারা এইটী ভাবেন না যে কন্যার বিবাহদান পিতামাতার যত অবশ্য কর্ত্তব্য নহে, শিক্ষাদান তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক কর্ত্তব্য। ইহার একমাত্র কারণ সমাজে এখনও জ্ঞান ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ-বিরোধ। প্রত্যেক পিতামাতা ইহা স্মরণ রাখিবেন যে সন্তানের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্মকাল হইতে তাহার জ্ঞানার্জ্জনের দায় অধিক পরিমাণেই পিতামাতার উপর নির্ভর করে। ব্রাহ্মসমাজে যে পর্য্যন্ত জ্ঞানার্জ্জন ও বিজ্ঞানচর্চ্চা ধর্ম্মসাধনের মূল বলিয়া গণ্য না হইবে এবং সন্তানদিগকে জ্ঞানদান পিতামাতার ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত বলিয়া ধারণা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়িত্ব ও ক্রমোন্নতি সুদূরপরাহত।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

প্রতিবাদ।

"দাসী" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় যে "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়কৃত "রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

উমেশ বাবুর কথার অসত্যতা প্রমাণার্থ অঘোর বাবু সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছেন যে "নগেন্দ্র বাবু সবিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছেন," কিন্তু কিরূপ অনুসন্ধান তাহার উল্লেখ করেন নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে অঘোর বাবু নগেন্দ্র বাবুর অনুসন্ধানের বিষয় কিছুই অবগত নহেন। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তাহাতে তো বোধ হয় যে, সেই গ্রামস্থ বৃদ্ধগণের মুখে শুনা কথাই অনুসন্ধানে জানা কথা। কারণ এতদ্ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা সেই মহাত্মার জীবনের বিষয় অবগত হওয়া অসম্ভব। অতএব আমার বিবেচনায় বৃদ্ধদিগের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান। কিন্তু আবার অঘোর বাবুর বিশ্বাস দেখিতেছি বিপরীতরূপ। তাঁহার মতে 'বৃদ্ধদিগের কথা বিশ্বাস্য নহে,' কেন তাহা বলিতে পারি না। অবশ্য বৃদ্ধেরা সামান্য বিষয়কে গুরুতর করিয়া তুলে, কিন্তু তাহার মূলে যে সত্য আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রায় ও বটব্যাল বংশে যে পূর্ব্ব হইতেই বিবাদ ছিল, তাহা অঘোর বাবুও স্বীকার করিবেন ও ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার যে সেই বিবাদের পুনরারম্ভের কারণ তাহাও সম্ভব, ও বোধ হয় তাহারই প্রতিশোধ স্বরূপ রামজয় রামমোহনের উপর অত্যাচারের সূত্রপাত করে। কিন্তু এই সামান্য অত্যাচার হইতে কথাটি বাড়াইয়া বাড়াইয়া বৃদ্ধগণ ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে ও বোধ হয় সেই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া নগেন্দ্র বাবু সেই ভীষণ অত্যাচারের কথা লিখিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু যদি এতদ্ভিন্ন কোন কথার উপর নির্ভর করিয়া এই কথা লিখিয়া থাকেন ও তাহার সত্যতা যদি প্রমাণ করিতে পারেন, তবে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক "দাসী" বা "সাহিত্য" পত্রিকায় আমার কথার প্রতিবাদ করেন।

অঘোর বাবু একস্থানে বলিয়াছেন যে রামজয় বোধ হয় মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছিল ও রামমোহন কোন যত্ন করেন নাই তাই বাদী ডিগ্রী পাইয়াছিলেন। হঠাৎ মোকদ্দমা মিথ্যা প্রমাণ করিতে প্রয়াস করা নির্বুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে। তিনি রামমোহনের চরিত্র সমর্থন করিতে গিয়া কি সকলকেই নিতান্ত হীন বলিয়া জ্ঞান করেন? তিনি কি বিশ্বাস করেন না যে চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে? তিনি কি নগেন্দ্র বাবুর ভুলে বিশ্বাস করেন না? তাঁহার কি জ্ঞান নাই যে "Even Homer sometimes nods ?"

অন্যত্র অঘোর বাবু মোকদ্দমার কথা মিথ্যা সপ্রমাণ করিবার জন্য উমেশ বাবুর প্রকাশিত মোহরযুক্ত ফয়সলার নকল মিথ্যা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রামমোহন রায় সিলেক্ট কমিটিতে যে যে উত্তর

দিয়াছেন, তদ্দ্বারা সেই ফয়সলার নকল মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করায় তিনি হাস্তাস্পদ হইয়াছেন। সেই উত্তরের প্রথমটি হইতে আমরা জানিতে পাই যে "Generally তাঁহারা পারস্ত ভাষায় জমানবন্দী লিখেন" Generally শব্দ হইতেতো আমরা সাধারণতঃ বুঝি; অঘোর বাবুর মত পোষণার্থ কি "সর্ব্বতঃ" বুঝিতে হইবে? আবার এক স্থানে আছে যে "Some of the judges" এস্থানে Some অর্থ কি "সমস্ত" বুঝিতে হইবে? অঘোর বাবু নিশ্চয়ই "generally অর্থে "সর্ব্বতঃ" ও "Some" অর্থে "সমস্ত" বুঝিয়াছেন, নতুবা এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি উমেশ বাবুর মোহরযুক্ত ফয়সলার নকল মিথ্যা বলিবেন কেন? অঘোর বাবুর প্রমাণের কাছে ইংরেজী ভাষা হারি মানিল।

ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে কোন কোন স্থানে বাঙ্গালা ভাষায় জমানবন্দী লওয়া হইত, কিন্তু বোধ হয় সেই জমানবন্দীর পারস্ত অনুবাদ সদর আদালতে প্রেরিত হইত। যাহা হউক উমেশ বাবুর ফয়সলার নকল যে মিথ্যা নহে, হুগলী আদালতের মোহর হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। মোকদ্দমা যে মিথ্যা নহে, তাহাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে, কিন্তু মহাত্মা যে এ বিষয়ে কতদূর দোষী তাহা বলা যায় না। কারণ অঘোর বাবু এক স্থানে বলিয়াছেন যে "মহাত্মা" এই সময়ে কলিকাতায় বাস করিতেন ও হয়ত তাঁহার কর্ম্মচারিগণ রামজয়ের অত্যাচারের প্রতিশোধার্থ তাহার বাড়ী লুট তরাজ করিয়াছিল। এই হেতু মোকদ্দমা হয় ও মহাত্মা সত্যের পোষণার্থ সেই মোকদ্দমায় হস্তার্পণ না করায় রামজয় ডিক্রি পায়।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে উভয় পক্ষের কেহই কাহারও প্রতি ভীষণ অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু এক গ্রামে দুইজন প্রধান লোকে যেরূপ বিবাদ সম্ভব, তাহাই হইয়াছিল। ইহা বাড়াইয়া যেরূপ কথা করা হইয়াছে, তাহাতে রামমোহনের স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় লোকদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ হওয়ার অসম্ভাবিতা নাই।

আর এক কথা, অঘোর বাবু পরিশেষে উমেশ বাবুকে যেরূপ বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিতান্ত অন্যায়; কারণ, তিনি যেন Helpsএর কথা মনে রাখেন যে,—

"Another rule for living happily with others is to avoid stock subjects of disputations, for he adds "there is a tendency in all minor disputes to drift down to it."

এই কথাটি মনে করিয়া তাঁহার উমেশ বাবুর পূর্ব্বের কার্য্যের বিষয় উল্লেখ করা উচিত ছিল না ও যদিও Helps এই কথাটি এক সংসারবাসী মনুষ্যকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, তথাপি আমার মতে এই নিয়ম সমস্ত পৃথিবীর জনগণের মধ্যে প্রচলিত হওয়া উচিত। আর অঘোরবাবু যে বলিয়াছেন উমেশ বাবু বটব্যাল বলিয়া এইরূপ বলিয়াছেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না, কারণ তাঁহার লিখনভঙ্গী দর্শনেই বোধ হয়, তাঁহার এরূপ লিখিবার কারণ এই যে তিনি অতিরঞ্জনের পক্ষপাতী নহেন। শ্রীনরেশচন্দ্র সেন।

প্রতিবাদের উত্তর।

প্রতিবাদকারী আসল কথায় কোন উত্তর দিতে চেষ্টা করেন নাই। অপিচ প্রকারান্তরে স্বীকারই করিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার যে সেই বিবাদের পুনরারম্ভের কারণ তাহাও সম্ভব, ও বোধ হয়, তাহারই প্রতিশোধ স্বরূপ রামজয় রামমোহনের উপর অত্যাচারের সূত্রপাত করে।" কিন্তু শ্রীযুক্ত উমেশ বাবুর ধারণা এই যে, "প্রকৃতপক্ষে রামজয় রামমোহনের উপর উৎপাত করা দূরে থাকুক, রামমোহনই তাঁহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন।" (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩ জ্যৈষ্ঠ)। রামজয়ের সহিত রামমোহনের বৈষয়িক বিবাদের কথা আমি অস্বীকার করি নাই। আমি লিখিয়াছিলাম যে, "রামকান্ত রায়ের সহিত রামজয় বটব্যালের বিবাদের কথা সত্য বলিয়া অবধারণ করিলেও, রামজয় বটব্যাল যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উপলক্ষে রামমোহনের প্রতি কথিত প্রকার অত্যাচার করেন নাই, একথা সপ্রমাণ হয় না। অপিচ, এই উপলক্ষে রামমোহন রায়ের প্রতি উৎপীড়ন করিয়া রামজয় বটব্যাল যে রামকান্ত রায়ের সহিত শত্রুতার প্রতিশোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,একথাও বলা যাইতে পারে।" উমেশ বাবু রামজয়কে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামমোহনের মস্তকেই সমস্ত অপরাধ সংস্থাপন করিয়া ব[illegible]য়াছেন যে, "রামমোহনই তাঁহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন।" উমেশ বাবুর এই একদেশদর্শিতা দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া আমি যে মাসের দাসীতে প্রতিবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সুখের বিষয় এই যে, নরেশ বাবু উমেশ বাবুকে সমর্থন করিতে অগ্রসর হইয়া প্রকারান্তরে আমাকেই সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং নরেশ বাবুর সমর্থন সম্বন্ধে উমেশ বাবু বলিতে পারেন, "Save me from my friends !"

নগেন্দ্র বাবু গৃহে বসিয়া কল্পনা করিয়া রামমোহনের প্রতি রামজয়ের ভীষণ অত্যাচারের উল্লেখ করেন নাই। উমেশ বাবুর ন্যায় তিনিও "স্থানীয় বৃদ্ধগণের মুখে" এবং রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ও তাঁহার সহিত সংসৃষ্ট বহু লোকের মুখে অবগত হইয়াই লিখিয়াছেন। তবে উমেশ বাবুর কথা যথার্থ যে, নগেন্দ্র বাবু অমর্য্যাদার সহিত রামজয়ের নামোল্লেখ করিয়া ভাল করেন নাই। নগেন্দ্র বাবুর "রামমোহন রায়ের জীবন চরিত" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। আশা করি তিনি স্বীয় গ্রন্থে এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করিবেন।

উমেশ বাবুর কথিত ফয়সালা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মোহরযুক্ত ফয়সালার সকল উমেশ বাবু প্রকাশিত করেন নাই। ফয়সালার যে অংশ তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। নরেশ বাবুর মতে "কোন কোন স্থানে বাঙ্গলা ভাষায় জমানবন্দী (?) লওয়া হইত কিন্তু বোধ হয় সেই জমানবন্দীর পারস্য অনুবাদ সদর আদালতে প্রেরিত হইত।" "বোধ হয়" রূপ অকাট্যযুক্তির সাহায্যে নরেশ বাবু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নরেশ বাবু বোধ হয় আদালতের কার্য্য-

প্রণালীর সহিত সুপরিচিত নহেন, নতুবা জবানবন্দী ও ফয়সালাকে এক মনে করিতেন না। সদর আদালতে পারস্য অনুবাদ থাকার কথা প্রতিবাদকারী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, এবং উমেশ বাবুও লিখিয়াছেন, "এই মকদ্দমায় জজ আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে বাদী ডিক্রী পাইয়াছিলেন।" সুতরাং নরেশ বাবুর কথানুসারেই আমি বলিতেছি যে সদর দেওয়ানী আদালতের পারস্য ভাষায় লিখিত ফয়সালার নকল উপস্থিত করা আবশ্যক। সিলেক্ট কমিটীতে রামমোহন রায়ের সাক্ষ্যের বাঙ্গালা অনুবাদ আমি প্রকাশিত করি নাই, সুতরাং generally শব্দের অর্থ লইয়া বিদ্যা প্রকাশ করার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। সেই সময়ে পারসী যে "Court language ছিল, তাহাই প্রতিপাদন করিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি। নরেশ বাবু বলিতেছেন, ইহা "হইতে আমরা জানিতে পাই যে, generally তাঁহারা পারস্য ভাষায় জমানবন্দী লিখেন।" Proceedings of the courts বলিলে কেবল জবানবন্দী বুঝায় না। নরেশ বাবু ইহা স্মরণ করিবেন।

নরেশ বাবু একস্থানে বলিয়াছেন, "মোকদ্দমা যে মিথ্যা নহে, একথাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে।" কি জন্য? রামজয় ডিক্রী পাইয়াছিলেন বলিয়া কি? প্রতিবাদ-প্রবন্ধে আমি এ কথার যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় নরেশবাবু তাহার কিছুমাত্র উত্তর দিতে চেষ্টা করেন নাই।

নরেশ বাবুর প্রবন্ধের একটী স্থল পাঠ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলাম। আমি লিখিয়াছিলাম "রাজা রামমোহন রায় এই সময়ে বিষয়ব্যাপার হইতে এক প্রকার অবসর লইয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে কলিকাতায় বাস করিতেন। তিনি এই মোকদ্দমার বিষয়ে মনোযোগ না করায় কর্ম্মচারিগণের তদ্বিরের ত্রুটিতেই বোধ হয় এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারেন নাই।" কিন্তু নরেশ বাবু লিখিতেছেন—"অঘোর বাবু একস্থানে বলিয়াছেন যে মহাত্মা এই সময়ে কলিকাতায় বাস করিতেন ও হয়ত তাঁহার কর্ম্মচারিগণ রামজয়ের অত্যাচারের প্রতিশোধার্থ তাহার বাড়ী লুটতরাজ করিয়াছিল। এই হেতু মোকদ্দমা হয় ও মহাত্মা সত্যের পোষণার্থ সেই মোকদ্দমায় হস্তার্পণ না করায় রামজয় ডিগ্রি পায়।" নরেশবাবু আমার উক্তি বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকগণ দেখিবেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নরেশ বাবু কি এই প্রকারে সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পাঠকসাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন?

নরেশ বাবু পুনর্ব্বার বলিয়াছেন, "আমার বক্তব্য এই যে উভয় পক্ষের কেহই কাহারও প্রতি ভীষণ অত্যাচার করেন নাই। ইত্যাদি।" সুতরাং উমেশ বাবুর এই কথাটি অর্থাৎ "প্রকৃত পক্ষে রামজয় রামমোহনের উপর উৎপাত করা দূরে থাকুক, রামমোহনই তাঁহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন।" এই কথাটি নরেশ বাবুই খণ্ডন করিতেছেন। অতএব উমেশ বাবু নরেশ বাবুর সমর্থন সম্বন্ধে পুনর্ব্বার বলিতে পারেন, "Save me from my friends!"

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

যাঁহার অশেষ করুণায় আর এক মাস নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল সেই দীন দুঃখী অনাথদিগের দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

বর্ত্তমান মাসের রোগীর সংখ্যা।

১ বাবুরাম, ২ দেবিয়া, ৩ স্বর্ণ, ৪ ফুলমণি, ৫ দুর্গাতারিণী, ৬ নবদুর্গা, ৮ ঈশ্বরী, ৯ সুমিত্রা, ১০ অম্বিকা, ১১ চিন্তামণি, ১২ রুক্মিণীকান্ত সরকার, ১৩ যামন, ১৪ বুধাওন, ১৫ সারদা, ১৬ গঙ্গা, ১৭ সরস্বতী, ১৮ নিস্তারিণী, ১৯ শোভনকাহার, ২০ গোবিন্দবালা।

ঈশ্বরী।—উদরী রোগে শেষ অবস্থাপন্ন হইয়া দাসাশ্রমে আসিয়াছিল। হাত পা ফুলিয়া গিয়াছিল এবং নিশ্বাস প্রবল ও ঘন হওয়ায় হাঁফাইতে হাঁফাইতে যখন উপস্থিত হইল তখন মুহূর্ত্তের জন্যও আশা করিতে পারা যায় নাই যে সে আবার ফিরিয়া বাড়ী যাইবে। হাঁসপাতালে পাঠাইবার নামে একেবারে নারাজ। অগত্যা তাহাকে আশ্রমে রাখিয়াই চিকিৎসাদি করাইতে হয়। যাহা হউক দীনবন্ধুর কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

চিন্তামণি।—অবস্থা বেশ আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

রুক্মিণীকান্ত সরকার।—কঠিন পীড়াক্রান্ত, হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

যামন।—পায়ের ক্ষত অনেক আরাম হইয়াছে, ভয়ানক দুর্ব্বল।

বুধাওন—বাতরোগে একেবারে পঙ্গু হইয়া উঠিবারমত হইয়াছিল। অনেক ভাল হইয়াছে।

সারদা—এই হতভাগিনীর তারকেশ্বরের নিকট বাড়ী; কোলে একটী ৪ বৎসর বয়স্ক সন্তান। হাড়ির মেয়ে; বাত হইয়াছিল বলিয়া কোন চিকিৎসা করে নাই। তাহার আত্মীয়েরা তালপাতার ঘর করিয়া কোন মতে এক মুঠা ভাত দিয়া আসিত। যখন যাতনা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, হাত পা সব কঙ্কালসার হইয়া উঠিল, সেই সময়ে বাবু উমাপদ রায় মহাশয় অনেক কষ্টে নিজের খরচে কলিকাতায় আনিয়া দাসাশ্রমে পাঠাইয়া দেন। দেখিবামাত্র ডাক্তার মহাশয়েরা হাড়ের মধ্যে টিউমার হইয়াছে এবং একেবারেই চিকিৎসার বা'র হইয়া গিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। হতভাগিনী যে কটা দিন জীবিত ছিল রোগের বিষম যন্ত্রণায় ও ছেলেকে দেখিবার জন্য দিবানিশি চীৎকার করিত। কিন্তু এহেন যাতনারও শেষ আছে এবং মৃত্যুই সেই অমৃত স্বরূপের শেষ অমৃত বিধান। অভাগিনী ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত করিয়া সমস্ত যন্ত্রণা চিরদিনের মত বিস্মৃত হইল। যাইবার সময় ছেলেটীর সম্বন্ধে কিছুই বলিয়া যাইতে পারে নাই।

গঙ্গা।—তাঁতির মেয়ে বর্দ্ধমান জেলায় পূর্ব্বনিবাস। শ্রীপুরগ্রামে দাসীবৃত্তি করিয়া, পরে গরু পুষিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। হঠাৎ চক্ষুর পীড়া হওয়ায় চিকিৎসার জন্য আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করে কিন্তু চক্ষু আর পাইল না। এই অবস্থায় একটী সদাশয় ভদ্রলোকের বাড়ী,বাসনাদি মাজিত ও তিনিও খাইতে পরিতে দিতেন। শেষে ভয়ানক বাতশ্লেষ্মাগ্রস্ত হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় ও উন্মাদগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় বাবু শৈলেন্দ্রনাথ বসু খরচ পত্র দিয়া দাসাশ্রমে রাখিয়া গিয়াছেন।

সরস্বতী।—নদীয়া জেলার মধ্যে শিবিরপুর গ্রামে ইহার বাড়ী। প্রায় দুই বৎসর হইল পক্ষাঘাত রোগে ইহার বাম অঙ্গ একেবারে পতিত হইয়া গিয়াছে, উঠিবার শক্তি একেবারে নাই। বাবু আনন্দচন্দ্র গুঁই মহাশয়ের পত্র পাইয়া ইহাকে আনিবার জন্য দাসাশ্রম হইতে একজন কর্ম্মচারী পাঠান হয়। এখন ইহার অবস্থা ভাল নয়। তিনিই ইহার পাথেয় দেন।

নিস্তারিণী।—রেভারেণ্ড এ, সিমস্ মহোদয় মুরশিদাবাদের কোন রাস্তায় ইহাকে পাইয়া নিজের বাড়ীতে আনিয়া প্রায় মাসাবধি ইহাকে রাখেন। পরে দাসাশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

গোজানকাহার।—অনেক দিন হইতে আমাশয় ও জ্বর হওয়ায় শোথ হইয়া পড়ে। ইহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

গোবিন্দবালা।—বাড়ী চাঁপাতলা। বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। বাবু অধরচন্দ্র মজুমদার ইহার ঘোরতর দুর্দ্দশা দেখিয়া দাসাশ্রমে পাঠাইয়া দেন। এখানে আসিয়া ভয়ানক জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানসমূহ স্বীকার করিতেছি। ভগবান দাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মাসিক চাঁদা।

কেদারনাথ দাস এপ্রেল ও মে ৷৷•, A lady co Babs Sreenath Das, এপ্রেল ১৲, তেজচন্দ্র বসু এপ্রেল ৷৷•, ত্রিপুরাকান্ত বসু এপ্রেল ৷•, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর এপ্রেল ১৲, নন্দকুমার দত্ত এপ্রেল ১৲, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এপ্রেল ১৲, N. D. Bose Esqr. এপ্রেল ১৲, পিয়ারীমোহন ভড় এপ্রেল ৷•, শ্যামাদাস কবিভূষণ এপ্রেল ৷৷•, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মার্চ্চ ৷•, ১৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট মেস মার্চ্চ ৷৷•, বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী এপ্রেল ১৲, অভয়চরণ মল্লিক এপ্রেল ৷৷•, যদুনাথ বরাট, এপ্রেল ১৲, নবীনচন্দ্র বড়াল মার্চ্চ ১৲, কালীশঙ্কর সুকুল মার্চ্চ ১৲, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী চৈত্র ১৲, অভয়চরণ মল্লিক মে ৷৷•, রামচন্দ্র মিত্র মে ১৲, বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী মে ১৲, রাধাগোবিন্দ সাহা চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ ১৷৷•, রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর এপ্রেল ১৲, বঙ্কুবিহারি মিত্র এপ্রেল ৷•. যদুনাথ বরাট মে ১৲. নবীনচন্দ্র বড়াল এপ্রেল ১৲, প্রসন্নকুমারী বসু জানুয়ারী হইতে এপ্রেল ১৲, হরিপদ ঘোষাল এপ্রেল ৷•, রাখালদাস মিত্র জানুয়ারী হইতে এপ্রেল ৷৷•, হরিপদ ঘোষাল মে ৷•. মহেন্দ্রনাথ দাস এপ্রেল ১৲, প্রমথনাথ দাস মার্চ্চ ২৲, মোট—২৫৷৷•।

এককালীন দান।

ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ডিব্রুগড় ১৲, বীরেশ্বর সেন গৌহাটী ২৷•, A Das of Dasasram ৷৷•, দেবেন্দ্রনাথ বসু কৃষ্ণনগর ৬৲, ৯নং পঞ্চাননতলার ছাত্রগণ ১৷•, শ্রীমতী শরৎকুমারী গুপ্তা ২৷৶•, A friend Mithapur ৷৷৶•, শরৎকুমার বসু ৶•, কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী ৷৶•, ক্ষেত্রপাল সিংহ রায় চৌধুরী ১৲, চন্দ্রকালী ঘোষ ১৲, Sympathisers. Grey Street ৷৷•, নগেন্দ্রনাথ সরকার ২৲, Messrs H. C. Ganguli & Co ৷৷•. বসন্তকুমার মল্লিক ১৲, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এপ্রেল ১৲, A Debtor ৯৲, বেণীমাধব বিশ্বাস ৷৷•, নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ৷•, চারুচন্দ্র সরকার ১৲, ক্ষুদিরাম বসু এপ্রেল ৷৷•, সৈয়দ আবদুল জব্বর চৌধুরী ২৲, হরিশচন্দ্র নিয়োগী ১৲, Rev. A. Sims ১০৲, শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী ১৲, নবীনচন্দ্র দত্ত দ্বারভাঙ্গা রোগী পাঠানর জন্য ১৫৲, K. G. Gupta Esq মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৫৲, শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী খাওয়াইবার জন্য ২৲, কালীপ্রসন্ন দে ২৲, কবিরাজ সীতানাথ গুপ্ত ১৲, তারিণীচরণ সেন ১৲, সতীশচন্দ্র ঘোষ ৷৷•, শ্রীচন্দ্রদাস ৬•, হরেন্দ্রলাল রায় এম, এ, বি এল ১০৲, জিতেন্দ্রিয় ভট্টাচার্য্য ৫৲, গোবিন্দচন্দ্র দাস এম-এ বি-এল ১৲, শ্রীমতী প্রভাবতী মল্লিক ১৲, দেবীচৌধুরাণী ১৲, দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ বি-এল ২৲, রায় কালিদাস চৌধুরী বাহাদুর ২৲, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ১৲, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ৪৲, Proprietor Druggist Hall ২৲, রাধাকিশোরি ঘোষ ২৲, A friend of Dasasram ৷•, R. N. Sett Esqr ১৲, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৫৲, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, সত্যানন্দ বসু এম-এ বি-এল ২৲, পুলীনচন্দ্র কুণ্ডু নাতির বিবাহ উপলক্ষে ২৲, P. C. Paul Esq ২৲, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৲, গোপালচন্দ্র সিংহ ১৲, S. C. Mukerjee Esq ৷•, ১২৩ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ ৷•, গরীব হিতসাধিনী সভা ৩৲, উপেন্দ্রনাথ সেন ১৲, মহীতোষ বিশ্বাস ৷৷৫, ত্রিপুরাকান্ত দাস গুপ্ত ৫৲, রমাসুন্দরী ঘোষ ২৲, সেখ সুবাজি মহম্মদ সা ৷•, মুন্সী আসি-

রুক্মিন ৵০, মধুসূদনচন্দ্র দাস /০, জগন্নাথ বেজ বড়ুয়া ৵০, উমেশচন্দ্র গুহ ৵০, লক্ষ্মীকান্ত খারগড়িয়া /০, হারাণচন্দ্র দে /০, অডিট আফিস ডিব্রুগড় ১৷/০, কাকিনিয়া মধ্যশ্রেণী ইংরাজী ইস্কুলের ছাত্রগণ ১৷০, রাধানাথ ঘোষ ১৲, কৈলাসচন্দ্র মিত্র।০, দুর্লভনারায়ণ বিশ্বাস ৵৫, কালীপ্রসন্ন আচার্য্য।০, মহম্মদ ছলিম ৵০, আদিনাথ নিয়োগী /০, শ্রীনাথ বিশ্বাস ১৲, রেবতীমোহন সেন ৷১০, মহেশচন্দ্র সাহা /০, কৃপানাথ চৌধুরী ।০, জগচ্চন্দ্র ঘোষ ৷০, হরিনারায়ণ রায় ।০, টাঙ্গাইল সবরেজিষ্টারস্ আফিসের আমলাগণ ৷০, বিনোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲, শশিভূষণ তালুকদার ২৲, হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, মহিমচন্দ্র দে।০, দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী ২৲, শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস ৷০, প্রসন্নহরি মিত্র ১৲, টাঙ্গাইল স্কুলের ছাত্রগণ।৵০, জনৈক ভদ্রলোক ৵০, দুর্গাচরণ সান্তাল।০, B. S. Matheson Esqr ২৲, দীনবন্ধু নন্দী ২৲, দুর্গানন্দ ঘোষ ২৲, রজনীকান্ত চৌধুরী।/০ শ্রীমতী মাতঙ্গিনী মিত্র।৶০, আনন্দগোপাল গুই রোগী আনার জন্ত ৩৲, কামিনীকান্ত গুপ্ত ১৲, A Hindu lady ১০৲, মানসকুমার রায়।০, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ১৲, রাধারমণ সাহা ২৲, কবিরাজ এন্, এন্ সেন কন্তার বিবাহ উপলক্ষে ১০৲, সুরেন্দ্রনাথ সরকার ২৲, A lady of Burdwan পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে মাং বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী ৫৲, কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী।/০, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩/০, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর ভাওয়েলের রাজা ১০০৲, শ্রীমতী জীবনবালা দত্ত পুত্রের আরোগ্য উপলক্ষে ২৲, হীরালাল দত্ত ১৲, সতীশচন্দ্র দাস।/০, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কন্তার জন্মদিন উপলক্ষে ১৲, রমণীকান্ত দাস পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, মোট——৩১৯৸৵০।

অন্তান্ত প্রকার আয়।

পুস্তক বিক্রয় ২।৶০, বেতন জমা ১।৶০, পুরাতন জিনিস বিক্রয় ২।০, বাক্সে প্রাপ্ত ৩১৫, ঋণশোধ বাবৎ প্রাপ্ত ৫৲, গচ্ছিত জমা ২০৲, কর্ম্মচারী খোরাকবাবৎ প্রাপ্ত ১৷৶১০, ফেরৎজমা মাং ইন্দুভূষণ রায় ১৲, পূর্ব্বমাসের কার্য্যাধ্যক্ষের স্থিত।/১০ মোট——৩৪/১৫।

বস্ত্রাদি দান।

চন্দ্রনাথ চৌধুরী নূতন কাপড় ১। পুরাতন কাপড় ১। কুঞ্জবিহারী সেন নূতন কাপড় একজোড়া। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র পড়িয়া পাওয়া রূপার বোতাম ১। Rev. A. Sims নূতন কাপড় এক। সত্যচরণ সেন সতরঞ্চি ১ লেপ ৩ বালিস ৪ বিছানার চাদর ১ থালা ১ টীনের গ্লাস ১ রেকাব ১ বড়বাটী ১। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী চাউল ১মণ। সত্যচরণ সেন মোটা চাদর ১ সরুচাদর ১ বালিসের ওয়াড় ১ হাফমোজা ১জোড়া, চাকু ১ আয়না ১ ব্রাস ১। বিপিনবিহারী রায় ঘড়ি ১। শ্রীমতী প্রভাবতী মল্লিক কামিজ ১ প্যাণ্টালুন ১। ত্রিপুরাকান্ত দাস গুপ্ত কোট ১। কালীপ্রসন্ন দত্ত মোজা ৩, পিরাণ ১ মসারি ১ চাদর ১ র‍্যাপার।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়।

মাসিক চাঁদা ২৫৷০ এককালীন দান ৩১৯৸৵০ অন্তান্ত প্রকারে আয় ৩৪/১৫ পূর্ব্বমাসের হস্তেস্থিত ২৸/০ মোট জমা ৩৮২।১৫।

ব্যয়।

খাইখরচ ৪৩/১৫ রাঁধুনী ৭৲, চাকর ৪।০, মেহতর ৭৷/০ কর্ম্মচারীর বেতন ৫৪৶১৫ রোগীর গাড়ী ভাড়া ৫৶০ আসবাব খরিদ।/০ গোয়ালা ১২৸১২৷ দাহ খরচ ১১।৶০ ধোপা ১৷০ ঔষধ।/০ রোগী আনার খরচ ১৯৷৶০ কর্জ্জদেওয়া যায় ৫৫৲ যন্ত্রাদি খরিদ ৫৲ আদায়কারীর খরচ ৩৪৷১০ বাটীভাড়া ৫০৲ ঋণটাকার সুদ ২৲ রিপোর্টছাপার কাগজ ৩০৲ অতিরিক্ত জমা শোধ ৷৶০ দাসাশ্রমের অধ্যক্ষের হস্তে স্থিত ৩৶১২৷ অন্তান্ত খরচ ১৷/৫ মোট ব্যয় ৩৪২/১০। মোট আয় ৩৮২।১৫ মোট ব্যয় ৩৪৯।/১০ মোটহস্তে স্থিত ৩২৸৶৫।

দাসী

মহাত্মা রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল।

(প্রতিবাদ।)

বিগত ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যক "সাহিত্য" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের লিখিত "রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত গ্রন্থে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রামনগর গ্রামে রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যক্তি চারি পাঁচ হাজার লোক লইয়া এক প্রধান দলপতি হয়। রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন বলিয়া সে ব্যক্তি তাঁহাকে নানা প্রকার কষ্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বটব্যালের লোক সকল অতি প্রত্যূষে আসিয়া রামমোহন রায়ের বাটীর নিকট ক্রমাগত কুক্কুটধ্বনি করিত এবং সন্ধ্যার পর তাঁহার অন্তঃপুরে গোহাড় প্রভৃতি পদার্থ নিক্ষেপ করিত" ইত্যাদি।

উমেশ বাবু সমালোচ্য প্রবন্ধে এই কথার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উপরি উক্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে স্থানীয় বৃদ্ধগণের মুখে যাহা শুনা যায়, তাহাতে উল্লিখিত চিত্রটি নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হয়। রায় বংশের সহিত বটব্যাল বংশের দলাদলির অনেক কথা * * *। রাজা রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায় বর্দ্ধমান রাজসংসারে ইজারা ইত্যাদিতে অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হয়েন। রামজয় বটব্যাল তৎকালে রাজসংসারে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকায় ঐ টাকা আদায়ের তদ্বিরের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। ঐ টাকা আদায়ের যত্ন করায়, এবং ইজারা হইতে অপসৃত করায়, রামজয়ের প্রতি রায় বংশের ক্রোধ জন্মে। এই সময়েই প্রথমে রায় ও বটব্যাল বংশের মধ্যে শত্রুতার

সূত্রপাত হয়। বৃদ্ধগণের মুখে ইহাই প্রকৃত কথা বলিয়া শুনা যায়। রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়া দলাদলির সূত্রপাত হয় নাই।”

বটব্যাল মহাশয় “বৃদ্ধগণের মুখে” যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই “প্রকৃত” আর নগেন্দ্র বাবু সবিশেষ অনুসন্ধানে যাহা জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহাই “নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক”, ইহা অতি অপূর্ব্ব মীমাংসা সন্দেহ নাই। বটব্যাল মহাশয়ের লিখিত দলাদলির সূত্রপাতের কথা—অর্থাৎ রামকান্ত রায়ের সহিত রামজয় বটব্যালের বিবাদের কথা সত্য বলিয়া অবধারণ করিলেও, রামজয় বটব্যাল যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উপলক্ষে রামমোহনের প্রতি কথিত প্রকার অত্যাচার করেন নাই, একথা সপ্রমাণ হয় না। অপিচ এই উপলক্ষে রামমোহন রায়ের প্রতি উৎপীড়ন করিয়া রামজয় বটব্যাল যে রামকান্ত রায়ের সহিত শত্রুতার প্রতিশোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, একথাও বলা যাইতে পারে। কিন্তু উমেশ বাবু পুনশ্চ বলিতেছেন,—

“রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যালের মধ্যে কে কাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, হুগলীর বিচারাদালত সমূহের নথি অনুসন্ধান করিলে তাহার কতক কতক নিদর্শন আজিও পাওয়া যাইবে।”

অনন্তর উমেশ বাবু স্বমত পরিপোষণের জন্ত একখানি ফয়শলার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রামমোহন রায় এক শতের অধিক লাঠিয়াল লইয়া রামজয় বটব্যালের আবাদী ধান্ত ফসল, আম্র ও বৃক্ষাদি লুটতরাজ করিয়া তাঁহাকে জমি হইতে বেদখল করিয়াছিলেন। এই ঘটনা সত্য বলিয়া পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্ত লেখক বলিতেছেন, “এই মোকদ্দমায় জজ্ আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে বাদী ডিক্রী পাইয়াছিলেন।”

রামমোহন রায় জমিদার ছিলেন। হইতে পারে রামজয় বটব্যালের সঙ্গে তাঁহার বৈষয়িক বিবাদ ছিল। এই বিবাদ নিবন্ধন রামজয় বটব্যাল মিথ্যা মোকদ্দমাও উপস্থিত করিতে পারেন। পরন্ত রামজয় ডিক্রী পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার আরজীর বিবরণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। বরং তদ্বির ও মিথ্যা সাক্ষীর জোরে আদালতে অধিক সময় সত্য মিথ্যা হয়, মিথ্যা সত্য হইয়া যায়। উমেশ বাবু নিজে বিচারক হইয়া

একথা বিলক্ষণ বুঝেন। রাজা রামমোহন রায় এই সময়ে বিষয় ব্যাপার হইতে এক প্রকার অবসর লইয়া,ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে কলিকাতায় বাস করিতেন। তিনি এই মোকদ্দমার বিষয়ে মনোযোগ না করায় কর্ম্মচারিগণের তদ্বিরের ত্রুটিতেই বোধ হয় এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারেন নাই। রামজয় বটব্যাল লুটতরাজ প্রভৃতি গুরুতর ফৌজদারী অপরাধে রামমোহন রায়কে অভিযুক্ত করিয়া কেবল ২০৯২৲ টাকার খেসারত পাইবার জন্ত দেওয়ানী আদালতে নালীশ করিয়াছিলেন। তিনি ডিক্রী পাইয়া থাকিলে টাকারই ডিক্রী পাইয়াছিলেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা লুটতরাজ সপ্রমাণ হয় না। আর রামমোহন রায় এই মোকদ্দমায় কি জবাব দিয়াছিলেন, লেখক মহাশয়ের তাহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য ছিল।

আর এক কথা, উমেশ বাবু যে ফয়শলার নকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। এই সময়ে আদালতে পারসী ভাষা প্রচলিত ছিল। আদালত সমূহে পারসী ভাষার প্রচলন থাকায় বাদী প্রতিবাদী, সাক্ষী ও বিচারক সকলেরই অতিশয় অসুবিধা ঘটিত; এজন্ত রামমোহন রায় ইংলণ্ড গমন করিয়া ১৮৩১ সালে বিলাতের পার্লেমেন্টের সিলেক্‌ট্ কমিটীতে সাক্ষ্য প্রদান কালে আদালত সমূহে পারস্তের পরিবর্ত্তে ইংরাজি ভাষা প্রচলন করিতে কমিটিকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমরা এ স্থলে সেই প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিতেছি;—

"8. *Q.* In what language are the proceedings of the courts conducted?

A. They are generally conducted in Persian, in imitation of the former Mohammedan rulers, of which this was the court language.

9. *Q.* Are the judges, the parties, and the witnesses sufficiently well acquainted with that language to understand the proceedings readily?

A. I have already observed that it is foreign to all those parties. Some of the judges, and a very few among the parties, however, are conversant with that languages.*

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্তকতা নাই। উমেশবাবুর বাঙ্গালা

---

* Vide English works of Raja Rammohun Roy: Vol. II. P. 525. Exposition of the Judicial and Revenue systems of India.

ফয়শলা প্রমাণস্থলে গণ্য হইতে পারে না। পারসী ফয়শলা দেখাইতে না পারিলে এ বিষয় তর্কস্থলে উপস্থিত হইতে পারে না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উমেশ বাবু ইতঃপূর্ব্বে মহাত্মা রূপসনাতনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী জুয়াচোররূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে সাহিত্য পত্রিকায় আর একটী প্রবন্ধাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কেও দাঙ্গাহাঙ্গামাকারী বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে, মহাপুরুষগণকে অযথা আক্রমণ করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করেন। রামজয় বটব্যাল মহাশয়ও একজন "বটব্যাল" এবং উমেশ বাবুও একজন "বটব্যাল" এই জন্যই কি তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ?

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র।

কৃষ্ণকান্তের উইল—আমরা কৃষ্ণকান্তের উইলকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস বলিয়া বিবেচনা করি। ইহাতে লেখকের পরিণত প্রতিভা পরিস্ফুট। "বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধে বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন "স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর নিজের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর, কৃষ্ণকান্তের উইল তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।" যে গুণের জন্য থ্যাকারের Vanity Fair গ্রন্থের এত আদর সে গুণ কৃষ্ণকান্তের উইলে দৃষ্ট হয়—ইহার সকল চরিত্রগুলি সজীব। বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত হইতে রূপো চাকর পর্য্যন্ত সকলেই সজীব। আজিও অশ্বত্থ, কদম্ব, আম্র, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ শোভিত সুগ্রাম তটের মধ্য দিয়া উরগের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চিত্রা বহিতেছে, আজিও রূপজমোহে কত যুবক গুণ ছাড়িয়া রূপের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া কণ্টকবিক্ষতাঙ্গ ভৃঙ্গের মত যাতনা ভোগ করিতেছে, আজিও পাপ প্রণয়ের ভীষণ ফল ফলিতেছে, আর আজিও কত গুণবতী ভার্য্যা পতির দুর্ব্যবহারে অকাল জলদোদয়ে সদ্যবিকশিত নলিনী যেমন শুকাইয়া যায় তেমনই শুকাইয়া যাইতেছেন। কৃষ্ণকান্তের উইল সম্ভবের রাজ্যে সংস্থাপিত।

গ্রন্থে তিনটি চরিত্র প্রধান—গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী।

প্রথমে গোবিন্দলাল কর্ত্তব্যবোধী। তখন তাহার দাম্পত্যজীবন অসুখের নহে, কিন্তু সে কি কখন ভ্রমরকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছিল? সাধারণ স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা,—কাহারও সংসারের ভাবনার জ্বালা নাই; প্রথমে মনে হয় গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বড় ভাল বাসিত। কিন্তু সেই প্রেম-বন্ধন জানি না কোথায় একটু শিথিল; একটু শিথিল না হইলে রোহিণী আসিতে পাইত না। "যে কখন ভাল বাসিয়াছে, তাহার ভালবাসার সামগ্রী তাহার নিকট হইতে দূরে যাইতে পারে না। জাগ্রতাবস্থায়ও যেমন, স্বপ্নেও তেমনই, সম্মুখে যেমন অন্তরালেও তেমনই, সে হৃদয় পূর্ণ করিয়া বর্ত্তমান থাকে;—অন্তরে বাহিরে যে প্রাণময় তাহাকে হারাইবার সম্ভাবনা কোথায়! সকলই পরিপূর্ণ করিয়া যেন সে বিরাজিত।" এই ভালবাসা যদি গোবিন্দলালের থাকিত তবে "প্রথম বর্ষার মেঘ দর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া" উঠিত না। ভ্রমর বলিয়াছে "যে যাকে ভালবাসে সে তাকেই ভাবে।" গোবিন্দলাল যদি সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহাকে ভাল বাসিত তবে রোহিণী তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। যখন গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইল তখন বোধ হইল :—

তাবত অলি গুঞ্জরে　　　　যাই ফুল ধুতুরারে
যাবত ফুল মালতী নাহি ফুটে।"

যেদিন কুসুমিত উপবনে বিহগকুলতান মুখরিত সায়াহ্নে অস্তমান রবির মত রোহিণীর বিষাদক্লিষ্ট মুখচ্ছবি গোবিন্দলাল দেখিল, সেই দিন তাহার অদৃষ্টাকাশে মেঘ সমাগম আরম্ভ হইল। সে দিন সে রোহিণীকে দয়া করিল—বিষাদ ভারাক্রান্তার উপর এই জটিল দয়া অনেক সময় রূপজমোহের এবং সময় সময় প্রেমেরও পূর্ব্বলক্ষণ; কারণ "Pity melts the mind to love." জগতলশায়িতা রোহিণীর মৃত-প্রায় দেহে প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া গোবিন্দলাল যখন হর্ম্ম্যতলে লুণ্ঠিত হইয়া জগতাতীত কোথাও হইতে বল প্রার্থনা করিল তখনই বুঝা গেল যে তাহার হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আসিয়াছে। এখন একবার গোবিন্দলাল ভাবিল "মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রম-রের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না।" ডুবিবার পূর্ব্বে মগ্নপ্রায় ব্যক্তি যেমন তীরের দিকে চাহে, গোবিন্দলাল তেমনই কর্ত্তব্যের দিকে চাহিল; সে বিদেশে গেল। কিন্তু মন যে সঙ্গে সঙ্গে যায়। যদি সে রোহিণীর সকল

কথা,সেই রজনীর কথা সকল ভ্রমরকে বলিত; তবে ভ্রমর কখনই রোহিণীকে বিশ্বাস করিত না, গোবিন্দলাল প্রথমে রোহিণীর ভালবাসার কথা ভ্রমরকে বলিয়াছিল—এবার সে তাহা বলিতে পারিল না; গোবিন্দলালের এই দুর্ব্বলতার কারণ রোহিণীর রূপজমোহ। তাহারপর বিদেশে গোবিন্দলাল ভ্রমরের পত্র পাইল—অগ্নি জলিল। গৃহে ফিরিয়া গোবিন্দলাল দেখিল, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে—সে একবারও ভাবিল না যে হয় ত ভ্রমরের দোষ নাই—অবস্থা বিশেষে পড়িয়া সে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছে। বুঝিল না যে অবস্থার পরিবর্ত্তনে:—

"The hottest horse will oft be cool
The dullest will show fire;
The friar will often play the fool
The fool will play the friar."

তাহার পর সে একবারও ভ্রমরের নিকট সকল কথা শুনিল না, আত্মসমর্থন করিল না। ভ্রমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া সব শুনিলেই সে বুঝিত যে ভ্রমর ভুল বুঝিয়াছে; পত্নী ভুল বুঝিলে পতি ভিন্ন আর কে তাহার ভুল সংশোধন করিয়া দিবে? সকল শুনিলে সে বুঝিত যে ভ্রমরের রাগ অভিমান নহে; তাহা তাহার আদর্শবিকৃতিজনিত যাতনার আর্ত্তনাদ। স্বামীর উপর ইহা তাহার অভিমান নহে। ভ্রমর আপনার হৃদয়ে পুণ্য মহিমামুকুট মণ্ডিত গোবিন্দলালের যে মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিল গোবিন্দলালের কলঙ্ককাহিনী যখন সেই মূর্ত্তিকে পদাঘাতে স্থানচ্যুত করিয়া গেল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার রাগ অভিমান নহে, যাতনা *। গোবিন্দলাল রোহিণীর তীব্র রূপ সাগরের ফেনিল উচ্ছ্বাসে সকল ভাবনা, যাতনা ডুবাইতে চাহিল; হৃদয়-মন্দিরে ভ্রমরের স্থানে রোহিণীকে বসাইল—তখন

"When the cat is away
The mise will play"

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর স্ত্রীর মাসহারা খাইব না বলিয়া যে অভিমান, সেটা ছুতা মাত্র। পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা বনিতার প্রতি তাহার দয়া হইল না, সে ভাবিতেছিল "এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি,

* ভারতীতে "ত্রিধারা" সমালোচনায় বাবু যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও কথাটী এইভাবে বুঝাইয়াছেন।—লেখক।

এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব।” সে ভাবিল “Who will not change a raven for a dove?” তাহার পর পাপের উপর পাপ বাড়িতে লাগিল, রূপজমোহ বিরক্তিকর হইয়া আসিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া সুখে থাকিবে আশা করিয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিল,—

“পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।”

এই সময় চিত্রাতীরে নিশাচরের সহিত রোহিণী সাক্ষাৎ করিল। রোহিণীর সহিত গোবিন্দলালের যে সম্বন্ধ তাহাতে সদাই অবিশ্বাস, সদাই আশঙ্কা; গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা শুনিল, ভাবিল—“So young, so fair, so fawning and so false!” গোবিন্দলালের হৃদয়ে নরকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, আর “বালনখরবিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ” রোহিণীর গত-প্রাণ দেহ ভূমিতলে লুটাইল। হৃদয়ে এই নরকাগ্নি জ্বলিলে হৃদয়ে অতীতের স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তখন গুণের কথা মনে পড়িল, “জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত যে ভ্রমর” তাহাকে মনে পড়িল। কিন্তু সে কেবল অতীতের সুখস্মৃতি। এখন যাতনা ভুলিবার কিছু রহিল না; গোবিন্দলাল পুড়িতে লাগিল কিন্তু বাঁচিতে চাহিল। অন্নাভাবে কৃষ্ণকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র ছয় বৎসর পরে পত্নীকে পত্র লিখিল;—একদিন সে ভ্রমরের সম্পত্তি ও তাহার সম্পত্তি ভিন্ন ভাবিয়াছিল—আজিও সে তাহাই ভাবিল,—ভাবিয়া হরিদ্রা গ্রামে ভ্রমরের গৃহে স্থান চাহিল। ভ্রমর যখন বুঝিয়াছিল যে স্বামী তাহার সম্পত্তি ও আপনার সম্পত্তি ভিন্ন ভাবিতেছে, সেই দিন সে তাহার সকল সম্পত্তি স্বামীকে দিয়াছিল। যে দুর্দ্দিনে গোবিন্দলাল স্বামীস্ত্রীর সম্পত্তি ভিন্ন ভাবিয়াছিল, সেই দুর্দ্দিনে আপনার সর্ব্বস্ব আপনাকে ও স্বামীকে সমর্পণ করিয়া আবার ভ্রমর লৌকিক ভাবে তাহার সম্পত্তি গোবিন্দলালকে দিয়াছিল। তখন অহঙ্কারী গোবিন্দলাল তাহা লয় নাই—আজিও সে পত্নীর পত্র পাইয়া হরিদ্রা গ্রামে যাইতে চাহিল না। পত্রে সে স্পষ্ট করিয়া ক্ষমা চাহিতে পারে নাই, এখনও সে ক্ষমার কথা ভাবিতে পারিল না!! কিন্তু এইবার গোবিন্দলাল যাতনা অনুভব করিল, সে হৃদয়ে শতবৃশ্চিক-দংশন-যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। এইবার সে বুঝিল যে, সে আপনার দোষে সকল হারাইয়াছে। তাহার পর বিষাদক্লিষ্টা পত্নীর মৃত্যুশয্যার প্রান্তে গোবিন্দলাল—রোহিণীর মরণের হেতু গোবিন্দলাল ভ্রমরেরও

মরণের হেতু গোবিন্দলাল। গোবিন্দলাল দাঁড়াইয়া দেখিল মধ্যাহ্ন তপন-তাপতপ্ত মরুময় সংসারে যে তাহার পক্ষে—"ধন্বন্তরি ভাণ্ডনিঃসৃতসুধা" সেই ভ্রমর তাহারই দুর্ব্যবহারে তাহার পদধূলি মস্তকে লইয়া অকালে মরিল—ফুটিতে ফুটিতে কোমলা অপরাজিতা শুকাইয়া গেল। এইবার গোবিন্দলালের ভীষণ অনুতাপানল জ্বলিল। নগেন্দ্র দত্ত ও গোবিন্দলাল উভয়েই সংসারে সুখ বই দুঃখ জানিত না; সংসারের খেয়ার তুফান দূরে থাকুক, তাহারা কখনও উজান বাতাসও ভোগ করে নাই, তাই প্রথম ঝড়েই নৌকা ডুবি হইয়াছে। তাহারা প্রথম প্রলোভন জয় করিতে পারে নাই। যদি তাহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান দৃঢ় করিত, তবে আত্মসংযম তাহাদিগের পক্ষে কঠিন হইত না।

বঙ্গদর্শনে কৃষ্ণকান্তের উইল প্রকাশিত হইবার কয় মাস পূর্ব্বে, বঙ্কিম-চন্দ্র দ্রৌপদী চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়া-ছিলেন, "কি প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমল প্রকৃতি সম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্য্যসাহিত্যের আদর্শ স্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধবাল্মীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনক দুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্য্যনায়িকা (!) সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে, যদি বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও নায়িকাকে দ্রৌপদীর তেজগর্ব্বে ভূষিতা করিয়া থাকেন, তবে সে ভ্রমরে। স্থান দোষে, সম্বন্ধ দোষে, ক্ষমতার অপ্রাচুর্য্যে বিমলায় সে চেষ্টা সফল নহে। সীতা বা সূর্য্যমুখীর অপেক্ষা দ্রৌপদী বা ভ্রমরের পতিপ্রেম অল্প নহে। সীতা বা সূর্য্যমুখীর আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, দ্রৌপদী বা ভ্রমরের তাহা আছে—এইখানেই প্রভেদ, এইখানেই মাধুরী। সূর্য্যমুখী স্বামীর কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে চাহিতেন না, ভ্রমর জানিত স্বামীর কার্য্য সমালোচনায় স্ত্রীর অধিকার আছে; স্বামীকে পাপপথ হইতে ফিরাইতে, পুণ্যপথে লইতে স্ত্রীর মত অধিকার আর কাহারও নাই। প্রথমারম্ভে ভ্রমর হাস্যময়ী, প্রেমময়ী, তাহার যৌবনসুলভ চাঞ্চল্য হইতে আনন্দালোক কিরণ বিস্ফুরিত হইয়া গৃহ আলো করিতেছে। যখন গোবিন্দলাল ভাবিল রোহিণী উইল চুরি করিতে আসে নাই, তখন ভ্রমরও তাহাই ভাবিল; "গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।" ভ্রমরের বিশ্বাসে—প্রেমে কোথাও মালিন্য নাই।

ভ্রমরে দাম্পত্যসুখের আদর্শ। তাহার পর অন্ধকার আসিল—উজ্জ্বল আলোক ম্লান হইয়া আসিল। ভ্রমর স্বামীকে লিখিল, "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস।" একথা সূর্য্যমুখী লিখিতে পারিতেন না, ইহা ভ্রমরেরই উপযুক্ত কথা। এই পত্র লইয়া কোন কোন সমালোচক ভ্রমরের নিন্দা করিয়াছেন—ইহা "হিন্দু পত্নীর" উপযুক্ত নহে। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন নাই যে, যে অবস্থায় পড়িয়া ভ্রমর রোহিণীর কথা বিশ্বাস করিয়াছিল, সে অবস্থায় বিশ্বাস করা অসম্ভব নহে; এদেশের অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীগণ বহির্জগতের কিছুই জানেন না, কাজেই সহজে কোন কথা বিশ্বাস করা তাঁহাদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আর গোবিন্দলাল প্রথমে কথা গোপন করিয়াই সন্দেহ আনিয়াছিল, দোষ ভ্রমরের নহে। রোহিণী আসিবার পূর্ব্বেও ভ্রমর ধূলাবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, "তুমি এখানে নাই, আজি আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহভঞ্জন হইল না।" প্রেম ও ভক্তি সতন্ত্র দ্রব্য—ভক্তি সকলের প্রাপ্য নহে, কিন্তু ভ্রমর কি কখন স্বামীকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিয়াছে? ভ্রমর গোবিন্দলালকে ক্ষমা করিয়াছেন "কেন না রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী, রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া" সত্যই

"ধাতার করুণা মর্ত্তে নারী অবতার
নরহৃদি বেদনা বারিতে।"

এখন একবার গোবিন্দলালের "আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতাকে" মনে করিলে বুঝা যাইবে ভ্রমর কি অসীম আবেগের সহিত স্বামীকে ভাল বাসিত। তবুও গোবিন্দলাল ফিরিয়া চাহিল না। ভ্রমর বলিল, "আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুতুল।" গোবিন্দলাল বুঝিলনা পত্নী পতির,

"গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথ
প্রিয়শিষ্যা ললিতেকলাবিধৌ।"

তাহার পর বিদায় কালে ভ্রমর বলিল, "আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসানুদাসী—তোমার কথার ভিখারী—আসিবে না কেন?" কিন্তু গোবিন্দলাল পাষাণে বুক বাঁধিয়াছিল! শেষ "অবিকম্পিত

কষ্টে” ভ্রমর বলিল “তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর। কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও একদিন আমার জন্ত তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও এক দিন তুমি খুঁজিবে এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়। * * * তুমি আমারই, রোহিণীর নও।” বড় দুঃখে বড় কষ্টে ভ্রমর এত কথা বলিল। কোপ-প্রেম-গর্ব্ব-স্ফুরিতাধরা ভ্রমর কর্ত্তব্য সাধন করিল। এ সকল কথা ভ্রমরেরই উপযুক্ত। তাহার অন্তরের তীব্র যাতনায় ভ্রমর প্রপীড়িতা হইতে লাগিল, “অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।” অসুস্থ শরীরে ভ্রমর পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে আসিল, “যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।” তাহার পর মোকদ্দমার কথা শুনিয়া সে পিতাকে বলিল, “দেখিও আমি আত্মহত্যা না করি।” এখন ভ্রমরের পতিপ্রেম এতটুকু মলিন নহে। গোবিন্দলালের উপর তাহার রাগ যে অভিমান নহে—যাতনা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ষষ্ঠ বৎসরে অন্ন কষ্টে পড়িয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে লিখিল “পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?” ভ্রমর যদি অতীত ভুলিয়া আজি স্বামীকে পূর্ব্বের মত আসিতে বলিত, তবে বুঝিতাম বৃথা ভ্রমর এতদিন একটা উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে—সে তাহার ভণ্ডামি মাত্র। ভ্রমর লিখিল,—“আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হই-বার সম্ভাবনা নাই।” ভ্রমর জানিত এখন সে আর গোবিন্দলালকে ভক্তি করিতে পারিবে না, এখন দুইজনে একত্র বাস না করিলেই উভয়ের মঙ্গল। এইখানে ভ্রমরের যে মাধুরী প্রকাশিত হইল—তাহার যে নৈতিক তেজ বিকশিত হইল তাহা অসামান্য। যে কর্ত্তব্যজ্ঞান ভ্রমরের মেরুদণ্ড তাহা দৃষ্ট হইল—এ অগ্নিপরীক্ষা হইতে ভ্রমর অক্ষুণ্ণ গৌরবান্বিতা হইয়া আসিল। নগেন্দ্র দত্ত ও গোবিন্দলালের পক্ষে প্রথম জীবনে “all went merry as a marriage bell” তাই তাহারা পাপ প্রলোভনে পতিত হইয়াছিল, আর ভ্রমর রমণী হইয়াও কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বামী সন্দর্শনের প্রবল বাসনা রোধ করিল। ভ্রমর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান এমনই প্রবল করিয়াছিল। যাহাতে নগেন্দ্র দত্ত বা গোবিন্দলাল কর্ত্তব্য ভুলিল, সে কেবল হৃদয়ের দৃঢ়তার অসীম অভাব। তাহার পর মৃত্যু শয্যায় ভ্রমর—বাসন্তী জ্যোৎস্নালোক কক্ষ প্লাবিত করিয়াছে, আজি মরিবার সময় পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া ভ্রমর শয্যার উপর বিকচ কুসুম রাশি ছড়াইয়া কুসুমশয়ন রচনা করিয়া তাহাতে

শয়ন করিয়াছে। আজ তাহার শুষ্ক অশ্রুর উৎস হইতে অশ্রু বহিল—তাহার হৃদয়ে পতি-সন্দর্শন-লালসা প্রবল হইয়া উঠিল। ভ্রমর ভগিনীকে বলিল, "আজিকার দিনে—মরিবার দিনে, দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম্! একদিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম।" ভ্রমরের ভালবাসা কি গভীর!! আজ মরণের কূলে তাহার বাসনা-সাগরে উচ্ছ্বাস উঠিল—নিবিবার পূর্ব্বে প্রদীপ জ্বলিল। গোবিন্দলাল কক্ষে প্রবেশ করিল। শীর্ণ হস্ত বাড়াইয়া ভ্রমর স্বামীর চরণযুগল স্পর্শ করিল, পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। আর বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।" বড় ব্যথা বহিয়া অক্ষুণ্ণ সৌরভে কুসুমকলিকা শুকাইয়া গেল। যাও ভ্রমর তোমাকে

"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে॥"

ভ্রমরে পত্নীত্বের আদর্শ বিকাশ। ভ্রমর বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজিত নারী-চরিত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। শ্রদ্ধেয় বাবু চন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, "বঙ্কিম বাবুর সূর্য্যমুখী আদর্শ অনুযায়ী হিন্দু পত্নী এবং তাঁহার ভ্রমর ঠিক আদর্শানুরূপ না হইলেও খাঁটি হিন্দুপত্নী বটে।" ভ্রমর আদর্শ হিন্দুপত্নী কিনা সে বিষয় লইয়া শ্রদ্ধেয় লেখকের সহিত মতভেদ প্রকাশ করা বৃথা; কারণ লোকের রুচির সহিত আদর্শ প্রভেদ হইয়া থাকে; একজন আদর্শ হিন্দুপত্নী বলিলে যাহা বুঝিবেন, আর একজনের তাহা না বুঝা আশ্চর্য্য নহে। আমাদিগের মতে আদর্শ পত্নী হিসাবে সূর্য্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমরের স্থান অনেক উচ্চে। ভ্রমর নারীচরিত্রের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। ভ্রমরের চরিত্রে যে সার্ব্বজনীন আদর্শোপযোগিতা আছে, তাহাকে কোন সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া তাহার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিলে কবির কল্পিত আদর্শ মহিলা-চরিত্রের উপর পাশব অত্যাচার করা হয়। হায় এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আজিও কি শুনিতে হইবে যে পতির কোনও কার্য্যে পত্নীর অধিকার নাই।" তপনতাপে ছত্রে, কর্দ্দমে পাদুকায় বা স্বামীর ইষ্টানিষ্ট দর্শনে রমণীর কি কোনই অধিকার নাই!!! যে জাতি রমণীদিগকে নিতান্ত হীন ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে বরং তাঁহাদিগের অধীনতা, অজ্ঞানতা এবং যাতনার বন্ধন দৃঢ় করিতে চাহে, যে জাতি রমণীর প্রতি সম্মান দেখাইতে জানে না, সে জাতির উন্নতির আশা কোথায়?

যখন "তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্ত প্রভাশালিনী, প্রভাত শুক্রতারারূপিণী রূপতরঙ্গিনী, চঞ্চলা রোহিণী" প্রথম পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তাহার উদ্বেলিত হৃদয় লালসায় তরঙ্গসঙ্কুল। তখন তাহার ভরা যৌবন, অসামান্ত রূপ, সে

"যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই ॥"

সে বালবিধবা, কিন্তু সে চিত্তবৃত্তি দমন করিতে শিখে নাই, ইহাই তাহার অধঃপতনের হেতু (বিষবৃক্ষে হীরারও অধঃপতনের কারণ আত্মসংযমাভাব) হরলাল তাহার স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে তাহাকে মিথ্যা আশা দিল, রোহিণী, মুগ্ধা রোহিণী সহজেই তাহার কথায় বিশ্বাস করিল। হরলাল তাহার নব মুকুলিত আশা পদদলিত করিয়া গেল—রোহিণী জ্বলিতে লাগিল। তখন ঢালুদিকে জলের মত, তাহার প্রেম প্রথম অবলম্বন গ্রহণ করিল। সে জল আনিতে বারুণী পুষ্করিণীতে গেল। সেই বিচিত্র বর্ণবৈচিত্রবহুল বিকচ কুসুম, শোভাময় উদ্যান, সেই মৃদু মধুগন্ধ, সেই গগনতলপ্লাবী বসন্ত পবন-বাহিত কোকিলের কুহু তান, সেই বারুণীর কাল জলে রবিকরের খেলা, আর সেই মূর্তিমান স্কন্দবীরের ন্যায় গোবিন্দলাল—রোহিণীর হৃদয়ে বসন্তের সাড়া পড়িল, হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জ-নিকেতনে কোকিলের স্বর শ্রুত হইল, রাশি রাশি কুসুম বিকশিত হইল, রোহিণী মজিল, সে ভাবিল !—

"পত্রপুষ্প-গ্রহ-তারাভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে কি মূর্ত্তি আঁকিলে প্রাণে,
কি ললাট, কি নয়ন, কি শান্ত অধর !"

"গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়-পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত হইতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট উজ্জ্বল চিত্র ! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল।" সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা হইয়া উইল বদলাইতে গেল, ধরা পড়িল। সেই সময় "কলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ হইল।" কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া গোবিন্দলাল বলিল, "রোহিণী, মৃত্যুই বোধ হয়, তোমার ভাল।" রোহিণীর বড় আশায় ছাই পড়িল। ভ্রমরের কথা মত সে বারুণীর জলে ডুবিল। গোবিন্দলাল যাইয়া দেখিল "স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে

শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।” রোহিণী প্রাণে বাঁচিল। একদিন সে “আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না?” এই ভাবিয়া কলঙ্ক বহিয়াও সে হরিদ্রা গ্রাম ছাড়িতে চাহে নাই, আর আজ সে বাঁচিয়া বলিল, “আমাকে কেন বাঁচাইলেন।” স্পষ্টই বলিল, “চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল।” রোহিণীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিয়াছে—হৃদয় দগ্ধ হইতেছে! গোবিন্দলাল জমীদারী দেখিতে গেল, রোহিণীর হৃদয়ে গোবিন্দলাল-লাভলালসা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। এই সময় গ্রামে তাহার কলঙ্কের কথা রটিল, আর রোহিণীর পাপপুণ্য জ্ঞান রহিল না, তাহার হৃদয়ে ভীষণতম সঙ্কল্প স্থির হইল। এইবার সে ভাবিল, ঐ যে ভ্রমর আমার সুখের পথে কণ্টক, আমার আনন্দের অন্তরায়, ঐ কুরূপা আপনার কালোরূপে আমার রূপশিখা ঢাকিয়াছে, নহিলে এতদিনে গোবিন্দলাল পতঙ্গ তাহাতে পড়িত, আমার যে কলঙ্ক হইবার তাহা ত হইয়াছে, এখন উহাকে আমার পথ হইতে অপসৃত করি। সে ভ্রমরকে বুঝাইয়া গেল যে, সত্যই তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে; ভ্রমর তাহাই বুঝিল। কয় বৎসর পরে যে দিন আত্মীয়স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে কলনাদিনী নিম্নগাতীরে প্রসাদপুরের “অশোক বকুল কুটজ কুরুবককুঞ্জ” মধ্যস্থিত প্রাসাদতুল্য ভবনে হর্ম্ম্যতলে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে গতপ্রাণা রোহিণী “বালকনখর বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ” লুটাইবে, আজ সেইদিন বর্ষণ জন্য রোহিণীর অদৃষ্টাকাশে করালকাদম্বিনীকুল সমাগত হইতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল ও রোহিণী পাপসুখরত তখন নিশাকর সেখানে গমন করিলেন। রোহিণী দেখিল, “মনুষ্য মধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান।” রোহিণীর অদৃষ্টাকাশে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল; কিন্তু তখনও তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প, “গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না।” স্বচ্ছান্ধকারময় চিত্রাতীরে দাঁড়াইয়া রোহিণী নিশাকরকে বলিল,—“একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।” এই স্থানে রোহিণীর চরিত্রে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। যে রোহিণী অল্প আশায় হরলালকে হৃদয়দানের ইচ্ছা করিয়া আবার সে চলিয়া গেলেই তাহাকে ভুলিতে পারিয়াছিল, ইহা সেই রোহিণীর উপযুক্ত কথা; কিন্তু যে রোহিণী গোবিন্দলালকে দেখিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা

হইয়া উইল বদলাইতে গিয়াছিল, যে রোহিণী গোবিন্দলালের দর্শন লাভাশার কলঙ্ক বহিয়াও হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করিতে সম্মতা হয় নাই, যে রোহিণী গোবিন্দলালের প্রেম প্রতিদানের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বারুণীর জলে ডুবিতে পারিয়াছিল, যে রোহিণী গোবিন্দলালকে বলিতে পারিল ;—

"এস তবে প্রাণ সখে ; দিনু জলাঞ্জলি
কুল মানে তব জন্যে, ধর্ম্ম, লজ্জা ভয়ে ;
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন পথে ধর আসি তীরে।"

যে রোহিণী এখনও গোবিন্দলালের নিকট বিশ্বাসহন্ত্রী হইবে না স্থির করিল, যে রোহিণী মরিবার পূর্ব্বেও ভাবিল "ইঁহাকে (গোবিন্দ-লালকে) যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইঁহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে মনে করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা। মরিব কেন?" ইহা সে রোহিণীর উপযুক্ত নহে। যে রোহিণীর হৃদয়পটে গোবিন্দলালের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, সে রোহিণী কেমন করিয়া ভাবিল "নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে?" যে রোহিণী গোবিন্দলালের জন্য এত করিল, সে রোহিণী কেমন করিয়া ভাবিল "স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য।"! রোহিণী পাপ করিয়াছিল—সে ধর্ম্ম ও নীতির, সমাজের পবিত্রতার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিল, সে গোবিন্দ-লালকে পাপে ডুবাইয়াছিল, সে ভ্রমরের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, সে সুখ শান্তিময় একটা সংসার ছারখার করিয়াছিল; কিন্তু তাহার শাস্তির জন্য এত সত্বর তাহার মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে যে তাহার পূর্ব্ব চরি-ত্রের সহিত তাহা মিশ খায় না। রোহিণী-চরিত্রে এই সামান্য অসামঞ্জস্য, এই সামান্য দোষ।

মাধবীনাথ ও নিশাকর সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই—দুই বন্ধুই বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন, চতুর। কিন্তু "নক্ষত্রচ্ছায়া প্রদীপ্ত চিত্রাবারি" তীরে নিশা-করের চিন্তা সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে। বন্ধুর উপকারের জন্য রোহিণীর সর্ব্বনাশ সাধন পর তিনি বাঁকা পথ লইয়াছেন বুঝিয়াছেন। যদি তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ হয় তবুও এ স্থানে

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

বলিয়া আত্মপ্রবোধ বড়ই কেমন। ইহা বলিয়া ত সকলেই আপনাপন কার্য্য সমর্থন করিতে পারে!!! সামান্য বেতনে দারিদ্রের কশাঘাৎ প্রপীড়িত হইয়া অনেক সময় লোকে কিরূপে প্রলোভনে পড়ে, পোষ্ট মাষ্টারে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সংসারের অদ্ভুত বা অসাধারণ কিছু লইয়া ডিকেন্স প্রভৃতির মত পুস্তকে সন্নিবেশিত করেন নাই, তাই "মল পায়ে" চাকরাণীর চিত্র আশ্চর্য্য নূতন বোধ হয়।

কি চরিত্র সৃজনে, কি ঘটনা সন্নিবেশে—দেখিতে গেলে কৃষ্ণকান্তের উইল নিশ্চয় বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভ্রমরের মৃত্যুর পরেই প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থ শেষ হইল—তাহার পরবর্ত্তী উপসংহারের বিশেষ উপযোগীতা নাই। যাঁহারা প্রসিদ্ধ লেখক কিংস্‌লির Yeast নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থ শেষ হইলে গ্রন্থের তৎপরস্থ অংশ পাঠ করা কষ্টকর কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভার গুণে কৃষ্ণকান্তের উইলের শেষ অংশও সুন্দর। কৃষ্ণকান্তের উইল ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে, ইহা কেবল লেখকের নহে পাঠকেরও সৌভাগ্য বলিতে হইবে। অনুবাদে শ্রীমতী নাইট অনেকগুলি ভীষণ ভ্রম করিয়াছেন; একে ত অ্যাণ্ড্ল্যাং সত্যই বলিয়াছেন "The art of translation has never been discovered." তাহাতে আবার লেখিকা অনেক স্থলে ভাব বুঝিতে পারেন নাই। তাহা সত্বেও ইংরাজী পাঠক যে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ মহিলা-চরিত্র (ভ্রমর) দেখিয়া আনন্দিত হইবেন আমাদের এ বিশ্বাস আছে।

জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত অসীম অম্বরতলে ম্লান তটচ্ছায়া বুকে ধরিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া, মৃদুকলনাদে চিত্রাবারি যেমন বহিয়া যায়, কৃষ্ণকান্তের উইলে ঘটনাস্রোত তেমনই বহিয়া গিয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে আলোক জাগাইয়া, কলগীতিতে শ্রবণ বিমোহিত করিয়া সে স্রোত বহিতেছে; তীরে দাঁড়াইয়া সেই শোভা দেখিলে, সেই কলকল গদগদ নাদ শ্রবণ করিলে এক অলস মাধুরীর স্বপ্ন হৃদয় ছাইয়া ফেলে—যেন গগনতল-প্লাবিত করিয়া, শ্রবণে অমিয় ঢালিয়া দূরাগত ললিত-মধুর গীতস্বর মন মোহিত করিতেছে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

অতিথি।

(অনুবাদ)

নীরব দুঃখ আমার সঙ্গে
বসিয়া ছিল।
নিবেছে প্রদীপ, কক্ষ আঁধার ;
বৃষ্টি ভাঙ্গিছে শাসি জানালার,
ঘোর দুর্য্যোগ ;—দুয়ারে কে আসি
আঘাত দিল।
মধুর স্বরে
কহিল, এসেছি অতিথি হইতে
তোমার ঘরে।

কহিলাম আমি—ত্বরায়, দুঃখ,
জ্বালিয়া বাতি,
বস প্রফুল্ল করি' মুখ খানি ;
আমি তবে যাই, অতিথিরে আনি,
তুমি রাখ তার বসিবার তরে
আসন পাতি।
ছুটিয়া দ্বারে
"স্বাগত পথিক, অতিথি দেবতা"
কহিনু তারে।

আসিল পথিক, তখনো আঁধার,
দেখিনি তায়।
বসিল আসনে, জানিনি কে লোক ;
ক্ষণ পরে যাই জ্বলিল আলোক,
দেখিনু আমার জীবন ধন্য
সে দিন, হায় ;
প্রভু আমার
আসিয়াছিলেন, বর্ষিতে হৃদে
অমৃত-ধার'।

চিত্রা।*

প্রথম হইতেই বলিয়া রাখি, আমার এই প্রবন্ধটি সমালোচনা নহে। একখানি নূতন উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ সম্প্রতি বাহির হইয়াছে, সেইখানি পড়িয়া যাহা মনে হইতেছে, তাহাই লিখিব। ছয় রিপুর উপর সপ্তম রিপু—অর্থাৎ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন, তাহার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়া হয়ত চিত্রার এক চতুর্থাংশ এইখানেই উঠাইয়া ফেলিব—কিছুমাত্র সংযমের চেষ্টা করিব না। তাহাতে পাঠকের লাভ আছে, বিনামূল্যে চিত্রার অনেকটা পড়িয়া লই-বেন; আমার লাভ আছে, আমার এই কুলিশ-কঠোর গদ্য টুকরা টুকরা হইয়া থাকিবে, এবং পরতে পরতে কাব্যরসে ভিজিয়া নিতান্ত বৃদ্ধ ছাড়া আর সকলেরই দন্তে উত্তমরূপে চূর্ণ হইতে পারিবে। হয়ত এমন কথা বলিব, যাহা স্বয়ং কবিই কখনও ভাবেন নাই; এমন স্থানে সংশয় করিব যাহা নিতান্তই সরল, এমন স্থানে অভিভূত হইয়া পড়িব যেখানে অন্যে ছন্দ ও মিল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না, এবং এমন স্থান ছাড়িয়া দিয়া যাইব যাহার প্রশংসা করিবার জন্য ভাষার অনটন পড়িয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ এখন বঙ্গের একমাত্র জীবিত ও যুবক কবি। উকীল হেম-চন্দ্র মাথায় শাম্‌লা বাঁধিয়া দিব্য ওকালতী করিতেছেন, কিন্তু কবি হেম-চন্দ্রের বহুদিন যাবৎ ৺ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। কবি নবীনচন্দ্র কথঞ্চিৎ জীবিত থাকিলেও গীতা গীতা করিয়া আপনার বার্দ্ধক্য ঘনাইয়া তুলিতেছেন। বর্ত্তমান কালে ফুলের গন্ধ, মলয় বাতাস, প্রেমসঙ্গীত, প্রিয়ার চাহনি, উচ্চ-মিষ্টহাস্য কেবল রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই পাওয়া যায়। আরও দুই একখানা গ্রন্থে এবং মাসিক পত্রের দুই এক সংখ্যায় একটু আধটু পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা এমন খাঁটি নহে, এমন প্রাণভরাও নহে।

রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন রচনার সঙ্গে পূর্ব্বের রচনাগুলি তুলনা করিলে দেখা যায়, মূলতঃ এক থাকিলেও অন্তরংশে ও বহিরংশে দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বের কবিতা লঘু গোলাপের মত ছিল, এখন সুবিকসিত পদ্মটীর মত হইয়াছে; কিশোরী বালিকার মত ছিল, এখন জিম্‌ন্যাষ্টিকের পূর্ণাবয়ব যুবকের মত হইয়াছে।

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র হইতে শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১॥০।

যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন দুইটি দল। একদল রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে, একদল বিপক্ষে। প্রথম দলের অধিকাংশই সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি নব্য যুবক;—ইহারা সকলেই প্রায় এক প্রকারের লোক। দ্বিতীয় দলে অনেক প্রকারের লোক—মনুষ্যের চিড়িয়াখানা। (ক) বৃদ্ধ—তাঁহাদের কাণে দাশুরায়ের অনুপ্রাস, ভারত-চন্দ্রের শব্দ পারিপাট্য এমনি লাগিয়া আছে, যে অপর কিছু একেবারে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে কেহ কেহ মাইকেল অবধি নামেন, আর নহে। তাহা ছাড়া তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক মহাদোষে দোষী—তিনি অল্পবয়স্ক। যাহাকে এখন উলঙ্গাবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখিতেছি, আমি বৃদ্ধ হইলে এবং সে যুবক হইলে যদি কেহ আসিয়া আমাকে বলে—দেখুন অমুক এমন হইয়াছে; হয়ত আমি বলিব,—কে অমুক? আরে না না; ও সব বাজে কথা। বৃদ্ধের কাছে যাহা পুরাতন তাহাই প্রাণপ্রিয় মনে হয়, নূতন (তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ভিন্ন) কিছুই ভাল লাগে না। সুতরাং নব্যকবির রচনা কেমন করিয়া ভাল লাগিবে? তাহা আশা করাই অন্যায়। মানুষের যৌবনের স্মৃতি সঙ্গীতের মত মৃত্যুক্ষণ অবধি মনে জাগিয়া থাকিয়া তাহাকে মোহিত করিয়া রাখে। তখন সে দিনগুলি যত না মিষ্ট, যত না সুন্দর ছিল, এখন দূর হইতে সেইগুলিই শতগুণ মিষ্ট ও সুন্দর মনে হয়। তখন যে দেশকে, যে দৃশ্যকে, যে রাগিণীকে, যে কবিকে সে বলিয়াছে "আহা" সেই দেশ, সেই দৃশ্য, সেই রাগিণী এবং সেই কবিই মৃত্যুদিন অবধি তাহার আহা থাকিবে। এইটি মনুষ্যহৃদয় সম্বন্ধে একটি অব্যর্থ নিয়ম। (খ) প্রৌঢ়—এখনকার প্রৌঢ়েরা একদিন কাব্যে, সাহিত্যে ভারি মাতিয়া-ছিলেন—সেই বঙ্গদর্শনের সময়। ইহারা অনেকে হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" আবৃত্তি করিয়া বয়সকালে অনেক হা হুতাশ করিয়া-ছিলেন, যদিও এখন তাহা কোন ক্রমেই স্বীকার করেন না। ইহারা এখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাহার কারণ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ইহাদের হৃদয়বীণার যে তন্ত্রীগুলিতে আঘাত করিয়া টুংটাং শব্দ বাহির করিয়াছিলেন, সেই তন্ত্রীগুলিই এখন এমন ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের আঘাতে ছড়্ ছড়্ শব্দমাত্র করিয়া থামিয়া যায়। (গ) যুবকের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি। একটি ইংরাজি প্রবচন আছে, ব্যর্থকাম গ্রন্থকারেরা সমা-

লোচক (এখানে সমালোচক অর্থে নিন্দুক) হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা যাহা হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে না পারিয়া, যে হইয়াছে তাহার প্রচুর নিন্দা করিয়া সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। মানুষ যখন প্রতিযোগীতায় হারিয়া যায়, তখন যে জিতিয়াছে, তাহার প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ, বিরক্তি, আক্রোশ ও ঘৃণা হইয়া থাকে,—এটা নিতান্ত স্বাভাবিক। ইহারা অনেকে বিদ্বান, কৃতী, সম্ভ্রান্তশ্রেণীর; ইহাদের আবার যাহারা ধামাধরা আছে তাহারা শুনিয়া শুনিয়া বলিয়া থাকে, রবিঠাকুর আবার কবি! সত্য সত্য আমি এমন লোকের মুখে এ কথা শুনিয়াছি, যে কস্মিন্‌কালে রবীন্দ্রনাথের একখানি গ্রন্থ, এমন কি একটিও কবিতা পাঠ করে নাই।—আমাদের কলেজের কতকগুলি যুবক অকালে নিতান্ত জেঠা হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করে। এই সকল যুবককে চিনিবার জন্য কতকগুলি লক্ষণ এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি। (১) তাহারা অশ্লীল কথা কহিয়া মনে করে ভারি রসিকতা করিলাম। (২) পথে ঘাটে ভদ্রলোকের মেয়েছেলে দেখিলে আপনা আপনির মধ্যে কুৎসিৎ হাসি তামাসা করে। (৩) কোনও নূতন ভাল বিষয়ে কাহারও চেষ্টা দেখিলে তাহাকে বিদ্রূপ করে। (৪) কোনও বিষয় পুরাতন হইলে, যদি নিতান্ত মন্দও হয়, তথাপি তাহার জন্য খুব লড়িয়া থাকে—ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, প্রথম দল অপেক্ষা দ্বিতীয় দলের লোক সংখ্যা অধিক। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা রবি-ভক্তের দল এখন অনেক বাড়িয়াছে—এ বৃদ্ধি "রাজা ও রাণী" প্রকাশিত হইবার পর হইতে। তাঁহার চমৎকার ক্ষুদ্র গল্পগুলিতেও শত্রুপক্ষের অনেকে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

এটা আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, যাহারা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, তাহারা ভারি গোঁড়া। কেহ যদি রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে একটি কথা বলিল, অমনি রণংদেহি রণংদেহি বলিয়া তাহারা গর্জ্জন করিয়া উঠে। বোধ হয় এই কারণেই, যাহারা বিপক্ষে, তাহারাও ঘোরতর বিপক্ষে। অনেক ছাত্রাবাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়া শেষকালে শত্রুপক্ষে মিত্রপক্ষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে শুনিয়াছি। অনেকে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যুদ্ধ করিতে এতই প্রস্তুত, যে সহসা মনে হয়, লোকটা এই ম্যানিয়াগ্রস্ত। ইহার কারণ কি? বঙ্গের আর কোনও লেখকের ত এরূপ দৃঢ়বিভক্ত শত্রুপক্ষ মিত্রপক্ষ নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমুদ্রের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। যদি কাহারও হৃদয়বাঁধে

একটু ছিদ্র থাকে, সেই পথ দিয়া অল্পে অল্পে জলপ্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ছিদ্র আরও বড় আরও বড় আরও বড় হইয়া পড়ে, তখন হৃদয়টা জলপ্লাবিত হইয়া যায়। আর, যাহার হৃদয়বাঁধে ছিদ্রই নাই, তাহার কোনও ল্যাঠাই নাই; তাহার ভিতরে এক ফোঁটা জলও প্রবেশ করিতে পায় না; এমন লোক তর্ক করিয়া সেই সমুদ্রের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা ত করিবেই!

এইবার গৌরচন্দ্রিকা ছাড়িয়া বহিখানাতে হাত দিই। চিত্রা দেখিতে বেশ, কিন্তু প্রথম সংস্করণ সোনার তরীর মত হয় নাই। যাহারা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, তাহারা প্রায়ই বাছা বাছা; তাহারা অনায়াসেই দেড় টাকার স্থলে দুই টাকা দিয়া চিত্রা কিনিতে প্রস্তুত ছিল, যদি চিত্রা দেখিতে আরও ভাল হইত। কেহ কেহ বলেন, ভাল পুস্তকের খুব ভাল কাগজ, ভাল বাঁধাই, ভাল মলাট না-ই হইল। আমরা বলি—তা' ত বটেই, তবে কি জান?—ইত্যাদি। অর্থাৎ বেশ সন্তোষজনক একটা কৈফিয়ৎ দিতে পারি না, তথাপি ইচ্ছা করি বহিখানি দেখিতে খুবই সুন্দর হয়। চিত্রার কবিতাগুলি একটি ছাড়া সবই সোনার তরীর পরে লেখা। শেষ কবিতাটির তারিখ ২০ ফাল্গুন,১৩০২। কবিতাগুলির তারিখ দেখিয়া দেখিয়া একটা তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি,—"সাধনা" থাকিতে রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পই লিখিয়াছেন। চিত্রার সমস্ত কবিতাগুলি দুই বৎসরে লেখা, কিন্তু অর্দ্ধাংশের কিছু কম, সাধনা বন্ধ হইবার পর এই তিন মাসে রচিত। রবীন্দ্রনাথের লেখনীর ক্ষিপ্রগতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই তিন মাসে রচিত অধিকাংশ কবিতাই তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনাগুলির মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। অতএব পাঠকগণ এখন চিত্রা পাইয়া সাধনার মৃত্যুশোক বিস্মৃত হউন। এই প্রসঙ্গে এখানে একটা সংবাদ দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয় নাটক "রাজা ও রাণী" রচনা করিতে, সংশোধন করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে রবীন্দ্রনাথের এক মাসের অধিক লাগে নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তিনি যত ক্ষিপ্র রচনা করেন, লেখা ততই ভাল হয়। এটা সামান্য প্রহেলিকা নহে।

প্রথম কবিতা—"চিত্রা"। আরম্ভ হইয়াছে

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্র রূপিণী!

এই "তুমি"টি যে কে, তাহা কবিতাটি পড়িয়া ধরিবার যো নাই। হয়ত অভিধানে সে নাম নাই। হয়ত ইনি সোনার তরীর "মানস সুন্দরী," কবির হৃদয়ের জাগ্রত দেবতা। কবি তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি

একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয় বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম হৃদয়-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।

তাহার পর "সুখ"—রবীন্দ্রনাথের নূতন ধরণের পয়ারে লিখিত। ইহার পর হইতে দ্বাদশটি কবিতা সাধনায় ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়াছিল; কিন্তু "প্রেমের অভিষেক" নামক কবিতাটির বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া হয়ত অনেকে মর্ম্মাহত হইবেন। সাধনার কবিতায় সমস্ত উক্তিটি একটি ক্ষুব্ধ লাঞ্ছিত দরিদ্র কেরাণীর মুখে দেওয়া হইয়াছিল, চিত্রায় সে কেরাণীটিকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে একটি শাদাসিধে মানুষকে বসান হইয়াছে। বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে তাহার "অপোগণ্ড সাহেব শাবক" মনিবটিকেও অন্তর্ধান হইতে হইয়াছে। কিন্তু এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কেহ কেহ সাধনার সেই কবিতা পাঠ করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন'—"আফিসের কেরাণীর সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণ ভাবে আত্মহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিলে, প্রেমের মহিমা অধিক সরল, উদার, উজ্জ্বল এবং বিশুদ্ধভাবে দেখান হয়।" সাহেবের দ্বারা অপমানিত, অভিমান-ক্ষুণ্ণ, নিরুপায় কেরাণীর মুখে এ কথা গুলা যেন অধিক মাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মত শুনায়।—আমি কিন্তু এ যুক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আস্ফালন নহে ত কি? আস্ফালনই বটে। যে অপমানিত, ক্ষুধিত, সর্ব্বজনের উপেক্ষিত, সে যখন বলিবে—আমার কিছু নাই, কেবল প্রেম তুমি আছ—তাহাতেই আমি রাজার অপেক্ষা অধিক সুখী;—সেই প্রেমের যথার্থ মূল্যবান সার্টিফিকেট। আর যাহার কোনও কষ্ট নাই, চাকরি করিবার প্রয়োজন নাই, দিব্য আহার করিয়া নাদুস্ নুদুস্ চেহারাটি, তাহার মুখে "তুমি মোরে করেছ সম্রাট, তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব মুকুট" তেমন শুনায় কি? প্রেমের মহিমায় মহীয়ান্ ছবিটির পাশের ছবিটি যত ম্লান হইবে, প্রথমটি সেই পরিমাণে উজ্জ্বল দেখাইবে। এই Law of Contrastএর জন্য চিত্রায় ছবিটির উজ্জ্বলতা অনেক হ্রাস হইয়াছে।

পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনাগুলি ছাঁটিয়া ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের "কড়ি ও কোমলে" শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রগুলি নাই। কিন্তু সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে এই পত্রগুলির তুলনা নাই। শ্রদ্ধাস্পদ নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয় প্রথম সংস্করণ "কড়ি ও কোমল" সমালোচনা কালে এই পত্রগুলি প্রকাশ করাতে দোষ দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এ গুলি "কড়ি ও কোমলে" না দিয়া এইরূপ কবিতার জন্য একখানি বহি করিলেই হইত। বোধ হয় এই সকল আলোচনাদি শ্রবণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ নূতন সংস্করণে পত্রগুলি বাদ দিয়াছেন। নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয়ের মতে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা থাকিলেও এটি আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই—অনেকেই পারেন নাই। যে পুস্তকে গম্ভীর বিষয়ের সমাবেশ থাকিবে, তাহাতে লঘু বিষয়, হাসির বিষয় থাকিতে পাইবে না, এ নিয়মটা বড় ভাল বোধ হয় না। এ কেমন, না কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন আগাগোড়া পোলাও খাওয়ান, অন্য দিন আগাগোড়া চাট্‌নি খাইতে দেওয়া। দ্বিতীয় সংস্করণ "রাজা ও রাণী"তেও অনেক পরিবর্ত্তন ও ব্যবকলন হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—

বলেছি যে কথা, করেছি যে কাজ,
আমার সে নয়, সবার সে আজ;

সুতরাং প্রকাশিত কবিতাগুলিতে তাঁহার আর অধিকার নাই। তবে তিনি কি হিসাবে প্রকৃত অধিকারীর বিনা অনুমতিতে সে গুলিতে কাঁচি চালান? এ অপরাধটা আইনের ভিতর আনিতে পারিলে তাঁহার নামে নালিশ চলিত, কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন আমরা (অগত্যা) বিনীতভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি, যেন তৃতীয় সংস্করণে "কড়ি ও কোমল," "রাজা ও রাণী" অবিকল প্রথম সংস্করণের মত করিয়া মুদ্রিত হয়; দ্বিতীয় সংস্করণ চিত্রার যেন "প্রেমের অভিষেক" কবিতাটি সাধনায় প্রকাশিত কবিতার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে।

"অন্তর্য্যামী" কবিতাটি বড় কৌতূহলের বিষয়। যাত্রা শুনিতে শুনিতে একবার সাজঘরে উঁকি মারিবার জন্য বাল্যকালে বড় আগ্রহ হইত। এই যে রাম, এই যে রাবণ, হনুমান, বিভীষণ, এত যুদ্ধ করিতেছে, বক্তৃতা করিতেছে, ইহারাই সাজঘরে ঢুকিয়া হাসে, গল্প করে, রাবণের হাত হইতে

হুঁকাটি লইয়া রাম তামাক খায়, দেখিয়া বড়ই বিস্ময় ও আমোদ জন্মিত। "অন্তর্য্যামী" কবিতাটির ভিতর দিয়া, একবার কবির সাজঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, রাণীর মত সজ্জিত একটি মহিমাময়ী নারী-মূর্ত্তি স্বর্ণের সিংহাসনে বসিয়া আছেন; তাঁহার সম্মুখে আমাদের কবিটি নতজানু হইয়া বলিতেছেন—"তুমি কে আমার বলিয়া দাও। আর আমায় অন্ধকারে ঘুরাইয়া মারিও না। তুমি যে বাঁশী দিয়াছ, আমি তাহাতে কেবল ফুঁ দিই;—কি কল করিয়া রাখিয়াছ, তাহা হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীত উৎপন্ন হয়। লোকে ভাবে আমি বাজাই, কখনো কখনো আমারই ভ্রম হয়, বুঝি আমিই বাজাই, কিন্তু আমি ফুৎকার দিই মাত্র। আমি যে কথা কখনও ভাবি নাই, সেই কথা কেমন করিয়া বাঁশী দিয়া বাহির হয়? যে ব্যথা বুঝি না, সে ব্যথা কেমন করিয়া হৃদয়ে জাগিয়া উঠে? আমার ভিতরে কি জন্য তুমি অসীম বিরহ, অপার বাসনা গোপনে বসিয়া রচনা করিতেছ? তোমার লীলা যখন অবসান হইবে, তখন কি আমাকে ফেলিয়া রাখিয়া, আমার বাঁশীটি ফিরিয়া লইয়া, তোমার রহস্যপুরীতে লুকায়িত হইবে? যে দিন আমার মৃত্যু হইবে, সেই দিন কি বুঝিতে পারিব এই সকলের উদ্দেশ্য কি, তাৎপর্য্য কি?" আমরা ত শুনিয়া অবাক্। আমরা মনে করিতাম, কবি গাহেন আমরা শুনি, কিন্তু ইহার ভিতর যে এত রহস্য আছে তাহা কে জানিত? এই কবিতাটি এমন চমৎকার প্রণালীতে রচিত এবং স্থানে স্থানে ভাষা এত মনোহর, যে পড়িলে মনে হয়, ভাগ্যে আমি বাঙ্গালা জানিতাম!

"সাধনা" কবিতাটি দেবী বীণাপাণির প্রতি কবির আত্ম নিবেদন। কবি বলিতেছেন,

দেবি, আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি ছিন্ন তন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণা খানি।

জগতের সমগ্র যন্ত্রীর সঙ্গীতের মধ্যে এ গানগুলির কোথায় স্থান হইতে পারে বলিতে পারি না, কিন্তু বাঙ্গালার এ ক্ষুদ্র আসরে ত ইতিপূর্ব্বে কখনও এমন শুনা যায় নাই। "পুরাতন ভৃত্য"—হাস্যরসের সহিত করুণরসের অপূর্ব্ব মিশ্রণ। এই কবিতাটী যাঁহাদের অপঠিত, তাঁহারা বোধ হয় সহজে ধারণা

করিতে পারিবেন না, এই দুইটি বিপরীত প্রকৃতির রস কেমন করিয়া একত্র করা যাইতে পারে ;—বাস্তবিক, বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও এমন নাই। "দুই বিঘা জমি" কবিতাটিও এই ধরণের। ইহার গল্পাংশ নিতান্তই সাধারণ। ইহা যে কবিতায় রচিত হইতে পারে, এ সম্ভাবনাও অন্যের মস্তকে উদয় হওয়া কঠিন হইত। উপেনের দেশে ফিরিবার সময় জন্মভূমির যে স্তোত্রটি কবি তাহার মুখে বসাইয়াছেন তাহা বড় সুন্দর—

> নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
> গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি !
> অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি,
> ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
> পল্লব ঘন আম্রকানন, রাখালের খেলা গেহ।
> স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল নিশীথ-শীতল স্নেহ।

আবার আমতলায় বসিয়া তাহার পূর্ব্বস্মৃতি কেমন মধুর, স্বপ্নময় !

> সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
> অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
> সেই সুমধুর স্তব্ধ-দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,—
> ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন !

সাহিত্যক্ষেত্রে প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌-সম্প্রদায় সর্ব্বদা কবিদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, কবি "শীতে ও বসন্তে" কবিতায় প্র্যাটিক্যালগণকে খুব এক হাত লইয়াছেন। যাহার মনোদেশটা শীত-প্রধান, সে বলে ইতিহাসের কাঠ কাটি, বিজ্ঞানের পাথর ভাঙ্গি, সমালোচনার কামান গড়ি। আবার যাহার মনোদেশে বসন্ত ঋতুটা প্রবল, সে বলে নাটকের ফুলগাছ তৈয়ারি করি, কবিতা-ফুলের মালা গাঁথি। সুবিধা পাইলেই পরস্পর পরস্পরকে গালি দেয়। "নগর-সঙ্গীত" কবিতা খানা যেন এক খণ্ড জ্বলন্ত লৌহ, তাহার চারিদিক হইতে যুক্তাক্ষরের স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়া বাহির হইয়াছে।

"পূর্ণিমা"—কবি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন ; সেখানি পণ্ডিতের লেখা।

> সমালোচনার তত্ত্ব ; পড়ে হয় শেখা
> সৌন্দর্য্য কাহারে বলে—আছে কি কি বীজ
> কবিত্ব-কলায় ; *

---

* এক প্রকার কলা হয় তাহা বীজে ভরা। মানুষ তাহা খাইতে পারে না ; কিন্তু আশা করি বানরসম্প্রদায়ের কোনও প্রকার অসুবিধা হয় না।—ইতি লেখক।

পড়িতে পড়িতে কবির হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠিল; মনে হইল, কবিত্ব, কল্পনা, সৌন্দর্য্য, সুরুচি, রস সব মিথ্যা—সমস্ত কেবল "শব্দ মরীচিকা-জাল।" অনেক রাত্রে দিক্ হইয়া বই ফেলিয়া যাই তিনি আলো নিবাইয়া দিলেন, অমনি।

উচ্ছ্বসিত স্রোতে,
মুক্তদ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দ্দিক হতে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবন বিপ্লাবিনী মৌন সুধা হাসি।

—অর্থাৎ অনন্ত আকাশভরা পূর্ণিমা তাঁহার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া নিঃশব্দে সকৌতুকে উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিল। যেন বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া কবিকে আসিয়া বলিলেন—বাতি জ্বালাইয়া, বহির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কোথায় তুমি আমার অন্বেষণ করিতেছিলে! আমি যে তোমারি দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। বাস্তবিক, আকাশের চন্দ্র নক্ষত্রের নীলিমায়, ধরণীর পুষ্পে পল্লবে, পর্ব্বতে সমুদ্রে এত সৌন্দর্য্য, তাহা আপনার চক্ষু দিয়া যে দেখিতে পায়, তাহার পক্ষে ডাইডেন বা রস্কিন্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সৌন্দর্য্যতত্ত্ব উদ্ধার করিবার দুশ্চেষ্টা অতি হাস্যকর বটে। কিন্তু সকলের চক্ষের জ্যোতি ত সমান প্রবল নহে; যাহাদের দৃষ্টি নিস্তেজ তাহারা এইরূপ পুস্তকের ভিতর দিয়া অণুবীক্ষণ না করিয়া আর করে কি?

"উর্ব্বশী"—পৌরাণিক উর্ব্বশীর নাম অবলম্বন করিয়া কবি যাঁহাকে স্তব করিয়াছেন, তাঁহাকে অনেক কবি অনেক দিন হইতেই স্তব করিয়া আসিতেছেন। গেটে যাঁহাকে বলেন The Eternal Woman—Ewige weibliche, উর্ব্বশীমূর্ত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবি তাঁহাকেই পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। আদর্শরমণীকে দুই ভাগ করিলে, একভাগে The Beautiful আর একভাগে The Good পড়ে। উর্ব্বশী কবিতায় প্রথমোক্তার স্তবগান। ইহার পরের কবিতা, "স্বর্গ হইতে বিদায়" তাহার একস্থানে দ্বিতীয়ার একটি চমৎকার ফোটো আছে, তাহা ক্রমে উদ্ধৃত করিব। একব্যক্তি "বর্ষ লক্ষশত" স্বর্গে বাস করিয়াছে, আজ তাহার পুণ্যবল শেষ হইল, তাহাকে স্বর্গ হইতে বিদায় লইতে হইবে। সে আশা করিয়াছিল, যাইবার দিন স্বর্গের দেবতারা তাহার জন্ত দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিবেনই।

কিন্তু এখন দেখিতেছে, তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপও নাই। যে ব্যক্তিটা তাহাদের মধ্যে লক্ষশত বর্ষ বাস করিল, সে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে কাহারও প্রাণে বিষাদের লেশমাত্র নাই! কেমন করিয়া থাকিবে? স্বর্গে ত শোক নাই, অশ্রু নাই; সুতরাং হৃদয় নামক একটা ব্যাপারের অস্তিত্বই নাই। তাই সে যাইবার দিন আক্ষেপ করিতেছে—

অশ্বত্থ শাখার
প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শত শত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মত
মুহূর্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হতে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যু স্রোতে।

অনাথিনী বিধবার বালক পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া, লেখা পড়া শিখিবার জন্য কোনও ধনী আত্মীয়ের প্রাসাদে অবস্থানকালীন, সেখানে যদি স্নেহ না পায়, তবে তাহার মনের ভাবটা ঠিক এইরূপ হয়। মার ঘরে সেই সব ছিল, এখানে লোকজন দাসদাসীপূর্ণ পরিবারের মধ্যে সে একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। এখানে সে উত্তম আহার পায়, উত্তম শয্যা পায়, হর্ম্মশিখরে বাস করে, গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে পায়, সকলই সুখ, সকলই সুবিধা, কেবল একটি জিনিষের অভাব। সেই একটি জিনিষের অভাবে লবণহীন ব্যঞ্জনের ন্যায় এত আয়োজন সব ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে। যাইবার দিন স্বর্গহারা নর তাই অভিমান করিয়া বলিতেছে—

থাক স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্তভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে!
যত ক্ষুদ্র যত ক্ষীণ যত অভাজন
যত পাপী তাপী, মেলি' ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—

ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তবে বহুক অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি!

তাহার পর স্বর্গের অপ্সরীগণকে বলিতেছে—তোমরা সুখে থাক, আমি ত চলিলাম। কিন্তু যেখানে আমি যাইতেছি সে দেশ এমন হৃদয়-হীনতার রাজ্য নহে; সেখানে

দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো এক গ্রাম প্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থ ছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমার লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্ত্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপ খানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চ্চিত ভালে রক্ত পট্টাম্বরে
উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দ্দিনে, কল্যাণ কঙ্কন করে
সীমন্ত সীমায় মঙ্গল সিন্দূর বিন্দু
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে!

কি সুন্দর! এই বর্ণনার কেমন করিয়া প্রশংসা করিব! ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছু পড়িয়াছি কি?—রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িয়া অনেক স্থানে এই কথাই বলিতে হইয়াছে। এ যেন আর্য্য-ঋষির প্রণীত দেবদেবীর

স্তবের মত হইল। যখন যে দেবতার স্তব হইতেছে, তখন তাঁহাকেই বলা হইতেছে—তুমিই গতি, তুমিই মুক্তি, তুমিই সর্ব্বসারভূত। আর একটা নীচু দরের উপমা দিই ;—এক ব্যক্তি বলে, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ ভাল কি মিহিদানা ভাল, কখনও স্থির করিতে পারিলাম না। যখন যেটা খাই, তখন সেইটাই সেরা মনে হয়।

"সান্ত্বনা"—রবীন্দ্রনাথের সকল বিশেষত্বই ইহাতে বর্ত্তমান। এটি স্ত্রী-উক্তি,—চমৎকার রচনা। বিজয়িনী চিত্রার মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট কবিতা ; গল্পাংশ তিন কথার অধিক নয়। অচ্ছোদ সরোবরে রূপসী স্নান করিতেছেন ; তীরে শ্বেত প্রস্তর গঠিত সোপানে তাঁহার ত্যক্ত বস্ত্রালঙ্কার পড়িয়া রহিয়াছে। মদন ধনুঃশর লইয়া এক বকুলগাছের আড়ালে মোতায়েন আছেন, যুবতী উঠিলেই তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিবেন। রমণী স্নানান্তে তীরে উঠিলেন, অমনি অনঙ্গদেব তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু বাণ ত্যাগ করা হইল না ,

সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখ পানে
চাহিল নিমেষ হীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি পরে
জানু পাতি' বসি, নির্ব্বাক্ বিস্ময় ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশর ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণশূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

এই কবিতাটি আগাগোড়া বর্ণনার বিচিত্র ফুলে খচিত। একটা অংশ এখানে তুলিয়া দিই। রমণীর স্নানের সময়

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিনী
জলে স্থলে নভস্থলে ; সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়া রৌদ্র করে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে
বসন্ত দিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে

চমকে ঝলকে। যেন আকাশ বীণার
রবি-রশ্মি-তন্ত্রীগুলি সুর বালিকার
চম্পক অঙ্গুলিঘাতে সঙ্গীত ঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া।

"গৃহশত্রু"—চারিটি শ্লোকের একটি কবিতা। একটু তুলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন খানটা তুলিব স্থির করিতে না পারিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। "উৎসব"—এটি তেমন হয় নাই;—রবীন্দ্রনাথের অন্য কবিতার সঙ্গে তুলনা করিয়াই বলিতেছি, তেমন হয় নাই। নতুবা বঙ্গসাহিত্যের শত শত কবিতার মধ্যে ফেলিলে এটিরও মৃত হস্তীর ন্যায় লক্ষ টাকা মূল্য হইবে। বাল্যগ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় পুস্তক "নদী"র উৎসর্গ পত্র পড়িলে জানা যায়, "উৎসব" রচনার দিন কবির বাড়ীতে একটি বিবাহ ছিল। সেই উপলক্ষে রচিত বলিয়াই কি ইহা এমন প্রাণহীন হইয়াছে? অবশ্য কবিতায় গার্হস্থ ঘটনার উল্লেখ মাত্র নাই, কিন্তু তবুও দুই স্থানে ফাঁক বহিতেছে—

তুমি কি বয়েছ আজি
নটবর বেশে সাজি?

অপিচ

তোমারি কি পট্টবাস
উড়িছে সমীরে?

"জীবন দেবতা"—কবির মনে যাহাই থাকুক, এটি সাধারণে একটি স্ত্রী উক্তির কবিতা বলিয়াই গ্রহণ করিবে। "রাত্রে ও প্রভাতে"—ইহাতে একটি বড় পুরাতন কথা লিখিত হইয়াছে। যে দিন জগতে প্রথম নর নারীর মধ্যে প্রণয় ঘটিয়াছিল, সেই দিন হইতেই পুরুষ একটা বিষয় লক্ষ্য করিতেছে—কিন্তু সে কথা, এই বোধ হয়, কবিতায় প্রথম ব্যক্ত হইল। টকটকে খোপার নূতন অলঙ্কারের রঙ, প্রভাতে দেখিবে এক রকম, মধ্যাহ্নে অন্য রকম, সন্ধ্যা বেলায় আবার তৃতীয় প্রকারের। প্রেমিক প্রেয়সীর দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পান। রাত্রে একরূপ, দিবসে অন্যরূপ। এই কবিতা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া চিত্র দুইটি স্পষ্ট করি;—

কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
কুঞ্জ কাননে সুখে

ফেনিলোচ্ছল যৌবন সুরা
ধরেছি তোমার মুখে।

*　　*　　*

আজি　　নির্ম্মল বায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে
স্নান অবসানে শুভ্র-বসনা
চলিয়াছে ধীরে ধীরে!

*　　*　　*

রাতে　　প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি　　এসেছ প্রাণেশ্বরি,
প্রাতে　　কখন্ দেবীর বেশে
তুমি　　সম্মুখে উদিলে হেসে!

"১৪০০ সাল" শত বর্ষ পরের কল্পিত পাঠককে সম্বোধন করিয়া লিখিত। এক স্থলে আছে

আজি হতে শতবর্ষ পরে
এখন্ করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে?
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।

"সিন্ধু পারে" এইটি শেষ কবিতা। মৃত্যু সিন্ধুর পারে, প্রেমিকের সহিত তাহার প্রিয়ার নূতন করিয়া বিবাহ হইল। মৃত্যু রজনীতে অবগুণ্ঠিত মুখী অশ্বারোহিণী এক রমণী আসিয়া পুরুষকে ডাকিল। সঙ্গের দ্বিতীয় অশ্বে তাহাকে বসাইয়া সিন্ধু পারে লইয়া গেল। রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরুষ একটি গিরিগুহায় প্রবেশ করিল। ভিতরে অপূর্ব্ব খোদিত বহুকক্ষযুক্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ। রমণী এক পালঙ্কে বসিয়া পুরুষকে পার্শ্বে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিল। দশ দিকে বীণা বেণু বাজিতে লাগিল—ক্রমে বিবাহ হইল। বিবাহের বর্ণনাটি বড় চমৎকার।

বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ হুলু কলরব সাথে,
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্য দূর্ব্বা হাতে।
পশ্চাতে তার বাঁধি দুই সার কিরাত নারীর দল

কেহ বহে মালা কেহ বা চামর কেহ বা তীর্থজল।
নীরবে সকলে দাঁড়ায়ে রহিল,—বৃদ্ধ আসনে বসি
নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কসি'।
আঁকিতে লাগিল কত না চক্র কত না রেখার জাল,
গণনার শেষে কহিল, "এখন হয়েছে লগ্ন কাল।"
শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্র-চালিত মত।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়াল একটি কথা না বলি,
দোঁহাকার মাথে ফুল দল সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিষ করিয়া দোঁহে,—
কি ভাষা কি কথা কিছু না বুঝিনু দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল—শিহরিয়া কলেবর—
হিমের মতন মোর করে, তার তপ্ত কোমল কর।

পুরুষ, মন্ত্র চালিতের মত বিবাহ করিয়া গেল, কিন্তু তখনও জানে না, রমণী কে? পরে কাকুতি মিনতি করিয়া যখন মুখ দেখিতে পাইল, দেখিল সেই! তখন প্রেমিক প্রেয়সীর "অমল-কোমল-চরণ-কমলে" চুম্বন করিল। ব্যাকুল-অশ্রু বাধা না মানিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; এবং

অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশি।
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি।

সত্যধর্ম্ম ও সমাজ।

(৪)

গত বারে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে সকল কার্য্যেরই একটা কারণ অনুমিত হইলেও ঐ সকল কারণ স্থল বিশেষে কুত্রাপি হেতুগত এবং অপরত্র অহেতুক হইতে পারে। দুইটী পদার্থ খণ্ডকে পরস্পর সন্নিহিত করিলে তাহাদের মধ্যে আকর্ষণের আবির্ভাব লক্ষিত হইবে; কোন হেতু কিম্বা উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সচরাচর ইহা ঘটিয়া থাকে। এইরূপ অহেতুক কার্য্যকে সাধারণতঃ স্বভাবজ বলা যাইতে পারে। জগৎ পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে যে, যে সকল কার্য্য স্বভাবজ তাহা উদ্দেশ্যবিরহিত।

একারণ তাহাদের বিধান দৃষ্টে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে তাহাদের এক-জন বিধাতা রহিয়াছেন। যেমন নিদ্রা জীবের স্বভাব, তাই কোন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কেবল নিদ্রা আসে বলিয়াই সাধারণতঃ জীব সকল নিদ্রা যায়। ইহাকে শারীরিক গ্লানির একটী অবশ্যম্ভাবী ফল বলা যাইতে পারে; তাহার জন্য একজন বিধাতা মানিয়া লইতে হয় না। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা মানুষের স্বভাব নহে; কোন প্রকার মানবিকতাই জীবকে উদ্দেশ্য ব্যতি-রেকে আপনা আপনি বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত করে না। বিদ্যাশিক্ষা উদ্দেশ্যগত কার্য্য; ইহার উদ্দেষ্টা স্বয়ং শিক্ষাকর্ত্তা। একারণ উদ্দেশ্যের মাত্রানুসারে শিক্ষাকার্য্যের উৎকর্ষাপকর্ষতা ঘটিয়া থাকে।

এই যুক্তি সাধারণভাবে বোধগম্য হইলে আমরা জগৎকার্য্য পর্য্যা-লোচনাতে অনায়াসে ইহা প্রয়োগ করিতে সক্ষম হই। জগতের সৃষ্টিকার্য্যে অশেষবিধ কৌশলের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই সকল কৌশল জড়জগতের স্বভাবজ অর্থাৎ উদ্দেশ্য-বিরহিত কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক,—গণনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আমাদের রাত্রিমান যদি দ্বাদশ ঘটিকার পরিবর্ত্তে ৪৮ ঘটিকা পরিমিত হয়, তবে এক রাত্রিতে সমগ্র পৃথিবী এত শীতল হইয়া যাইবে যে, তাহার কুত্রাপি জীব কিম্বা উদ্ভিদ জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। ইহাতে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ-বিধানকে বিশ্বরচনার একটী আশ্চর্য্য কৌশল বলা যাইতে পারে এবং জীব-প্রবাহ সংরক্ষণকে ইহার উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু অপর দিকে ইহা দেখা যাইবে যে সূর্য্য ও পৃথিবী এক্ষণে যে অবস্থায় অবস্থাপিত আছে, এবম্বিধ যে কোন দুইটী গোলককে এমতাবস্থায় স্থাপিত করিলে তাহাদের মধ্যে দিবারাত্রির পরিমাণ ঠিক বর্ত্তমানের অনুরূপ হইবে। পৃথিবীতে দিবারাত্রির পরিমাণ, তাহার ঘূর্ণন-বেগের উপর নির্ভর করে; এবং ঐ ঘূর্ণনবেগ পৃথিবী ও সূর্য্যের পরস্পর আকর্ষণজনিত এবং আকর্ষণ জড়পদার্থের স্বভাব। অতএব ইহা সপ্রমাণিত হয় যে পৃথিবী ও সূর্য্য জড়পিণ্ড বলিয়াই তাহাদের আকর্ষণ বলে ধরাপৃষ্ঠে দিবারাত্রির পরিমাণ বিধান ঘটিতেছে! গণনা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া দিবারাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া যাইতেছে; কালে রাত্রিমান ৪৮ ঘণ্টা হইতেও অধিক হইয়া পড়িবে। ইহা হইতে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে পৃথিবীতে দিবা-

রাত্রির পরিমাণ বিধান সূর্য্য ও পৃথিবী এবং অপর সকল গ্রহের স্বভাবজ,—জীবপ্রবাহ সংরক্ষণ তাহার উদ্দেশ্য নহে! এইরূপে লক্ষিত হয় যে, সাধারণের নিকট যাহা প্রত্যক্ষতঃ হেতুগত কার্য্যরূপে অনুভূত হইয়া থাকে তাহার অনেকস্থলে বৈজ্ঞানিকের নিকট ঐ সকল কার্য্য অহেতুক বা স্বভাবজ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহাই বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মের বিরোধের একটী প্রধান কারণ। ধর্ম্মবিশ্বাসী যখন এবম্বিধ একটী কার্য্যকে হেতুগত ভাবিয়া তাহার হেতুভূত বিধানের অনুষ্ঠাতা বা বিধাতাকে অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যদি বৈজ্ঞানিক আসিয়া তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে বলিয়া দেন যে, ঐ কার্য্য বস্তুতঃ একটী অহেতুক কারণসম্ভূত, তখন তিনি উক্ত বৈজ্ঞানিককে নাস্তিক নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

জ্যোতির্ব্বিদাগ্রগণ্য লাপ্লাশ যখন জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করিয়া গ্রহমণ্ডলীর গতিবিধি আবিষ্কার ও জগতে প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়ন ফরাসি দেশের সম্রাটপদে বরিত হইয়া সিংহাসনারোহণ করেন। একদা রাজসভাতে সম্রাট নেপোলিয়ন লাপ্লাশকে উপলক্ষ করিয়া উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে "শুনিতে পাই, তুমি বিমানবিহারী জ্যোতিষ্কবর্গের গতিবিধি আবিষ্কার করিয়া তদ্বিষয়ে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছ কিন্তু সেই গ্রন্থের কুত্রাপি বিমানেশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তার নামোল্লেখ মাত্র কর নাই?" লাপ্লাশ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে "আমি একজন সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার্য্য বা স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া বিমানরাজ্যের কার্য্য পর্য্যালোচনা করি নাই; পরন্তু কার্য্যদৃষ্টে কারণানুসন্ধানে তৎপর রহিয়াছি। গণনা দ্বারা যদি সৃষ্টি কর্ত্তা প্রতিপাদিত না হন তবে আমি তজ্জন্য নিজকে দায়ী মনে করিব না!" লাপ্লাশের এই উত্তর কয়েক জন ফরাসি বৈজ্ঞানিকের নিকট বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিচায়ক হইলেও জগতের সমক্ষে তিনি নাস্তিক বলিয়া পরিচিত হইলেন। আমরা তাঁহার সম্পাদিত কয়েকটী গণনফল সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি; তাহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, লাপ্লাশের উপরোক্ত উত্তরের তাৎপর্য্য কি?

সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া গ্রহগণ স্ব স্ব অবক্ষেত্রাকার (Elliptical) কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ তাহাদিগকে ঐ কক্ষ হইতে "ভ্রষ্ট" করিয়া নিরত বিপথে পরিচালিত করিতেছে। এইরূপে গ্রহদিগের কক্ষ স্থূলতঃ অবক্ষেত্রাকার হইলেও তাহার ক্ষেত্র-পরিমাণেতে

ধারাবাহিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হইতেছে; এবং কালে সৌরজগতের এরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে যে ক্ষেত্র ও গতিপর্য্যায়ের সমতা ভঙ্গ হইয়া এক কিম্বা ততোধিক গ্রহ কক্ষচ্যুত হইয়া 'ধ্বংস' দশাপন্ন হইবে। এই সকল গণনা অতিশয় ভীতিপ্রদ; কারণ ইহাদ্বারা বিধাতার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হওয়া দূরে থাকুক বরং প্রচুর অমঙ্গলের কারণ লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রহ-কক্ষ অবক্ষেত্রাকার; ঐ সকল ক্ষেত্রের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিকার (Eccentricity) আছে; তাহাদের স্ব স্ব "দণ্ড" (axis) পরিমাণ আছে; প্রত্যেক কক্ষই কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সমতলের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বক্রতাতে অবস্থিত: প্রত্যেক গ্রহের স্ব স্ব কক্ষে ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত্তনকাল আছে। এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় পরিমাণ সমূহের পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে বিপর্য্যয় সংঘটিত হওয়াতে গ্রহজগতের আশু ধ্বংসপ্রাপ্তি সূচিত হইতেছে। সৌরজগতের যদি একজন সৃষ্টিকর্ত্তা বিদ্যমান থাকেন, তবে এইরূপ ধ্বংসশীল জগৎ সৃষ্টি করাতে তাঁহাকে মঙ্গলময় বিধাতা বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু সংরক্ষণই বিধানের ধর্ম্ম, অতএব ধ্বংস-শীলতার জন্য বিধাতা মানিতে হয় না। কিন্তু লাপ্লাশের মহাগ্রন্থ ইহা ব্যক্ত করিতেছে যে, সৌরজগতের ধ্বংসশীলতা নিরোধ করণার্থ যথেষ্ট কৌশল বর্ত্তমান আছে। তিনি প্রত্যক্ষ গণনা দ্বারা ইহা দেখাইয়াছেন যে, গ্রহ-কক্ষের বিকার বিপর্য্যস্ত হইলেও তাহার "গুরু (বা স্থূল) দণ্ড" (Major axis) সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। ইহা সৌরজগতের ধ্বংসাবসানের একটী অন্তরায় হইলেও তাহা যথেষ্ট নহে; কারণ গ্রহ-কক্ষের বিকার হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে অবক্ষেত্র বৃত্তক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে, তাহা হইলে গ্রহের অবস্থা বিষম সঙ্কটাপন্ন হইবে। এস্থলে লাপ্লাশ আবার খড়ি পাতিয়া সৌরজগতের অদৃষ্ট গণনা করিতে বসিয়াছেন—তিনি বলিতেছেন, "প্রত্যেক গ্রহের জড়মানকে (Mass) যথাক্রমে তাহার কক্ষের গুরু ব্যাসের বর্গমূল এবং কক্ষবিকারের বর্গফল দ্বারা গুণ করিয়া সমস্ত গ্রহমণ্ডলীর উক্ত গুণফল একত্রে যোগ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নিয়ত অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।" এস্থলে কক্ষবিকারকে একটী বন্ধনীর অভ্যন্তরে ফেলিয়া দেওয়াতে তাহার স্বেচ্ছানুক্রমিক বিপর্য্যয়ের অধিকার লোপ করা হইয়াছে। এই বিধান বলে বিকারকে কোন দুই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যবর্ত্তী থাকিতে হইবে, অতএব এতদ্দ্বারা গ্রহকক্ষের আকৃতি কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহার প্রকৃতি-বিপর্য্যয়ের কোন সম্ভাবনা থাকিতেছে না।

ইহাতে এক দিক রক্ষা হইল বটে কিন্তু অপর দিকে নির্ভর হওয়া যাইতেছে না। কক্ষসমূহের পরস্পর বক্রতা পরিমাণ বিপর্য্যস্ত হইতেছে; একারণ তাহাদের অবস্থিতির তারতম্যানুক্রমে আকর্ষণের মাত্রাভেদ ঘটিবে। ইহাতে এরূপ ঘটনা হওয়া অসম্ভব নহে যে, কোন সময়ে সকল গ্রহ এক সমতলেতে বিরাজ করিবে; তখন পরস্পরের আকর্ষণের ব্যত্যয়ে প্রত্যেক গ্রহের স্থিতি ব্যত্যয় এত অধিক হইয়া পড়িবে যে, তাহাতে প্রলয় সংঘটনের সম্ভাবনা থাকিবে। লাপ্লাশের গণনাতে আবার অপর এক অঙ্ক ফুটিয়া উঠিল তাহার ফলে কক্ষসমূহের বক্রতা-বিপর্য্যয় স্বেচ্ছানুক্রমিক না হইয়া কোন দুই নির্দ্দিষ্ট সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিবে। এই সকল ফল পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, গ্রহগণ কদাপি কক্ষচ্যুত হইয়া শূন্যে অপগমন করিবে না। কিন্তু ইহাতেও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। গ্রহের গতিবেগ মন্দ হইতে থাকিলে তাহার কেন্দ্রফল পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে; ইহাতে কালে গ্রহের সৌরদেহে সম্পাতের সম্ভাবনা থাকিবে। তাই লাপ্লাশ আবার গণনা করিয়া বলিতেছেন যে, গ্রহদিগের কক্ষাবর্ত্তন কাল অল্লাধিক পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহা গড়ে অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

এই চারিটী ফল সৌরজগতের স্থিতি-শীলতার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছে। সৌরজগৎ সংরক্ষণ বিষয়ে এই চারিটী বিধান প্রয়োজনীয় এবং শুভঙ্কর। কিন্তু ইহারা হেতুগত কিম্বা স্বভাবজ তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। লাপ্লাশ আবার গণনা করিতেছেন; তিনি দেখাইয়াছেন যে, যে কোন পদার্থ-মালাকে সৌরজগতের অবস্থাপন্ন করিয়া স্থাপিত করিলেই তাহাদিগের মধ্যে উক্ত বিধান চতুষ্টয় প্রকটিত হইবে না। লাপ্লাশ আরও গণনা করিয়াছেন যে, ইহার কোন এক বিধান হইতে অপর সকল কিম্বা কোন একটী বিধানও সকলিত হইতে পারে না; অর্থাৎ ইহারা পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ অসম্বদ্ধ স্বতন্ত্র বিধান। কাজেই ইহাদের কোন একটী বিধান কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থ-মালাতে ঘটনাক্রমে প্রকটিত হইলেই অপর কোন একটী বিধান আপনা আপনি তাহাতে প্রকাশ পাইবে না। অতঃপর লাপ্লাশ নীরব! ইহাই লাপ্লাশের নাস্তিকতা!! আমরা এ স্থলে লাপ্লাশের গণনা সম্বন্ধ করিয়া দেখিব কি ফল লাভ করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে,যে সকল বিধান স্বভাবজ নহে; তাহাদিগকে হেতুগত বিধান বলা যাইবে। কোন বিধানের উদ্দেশ্য আয়ত্ত হইলেই

তাহার একজন উদ্দেষ্টা স্বীকার করা যায়। যদি কোন এক বিধান হইতে অপর সকল বিধানের সমুদ্ভবের সম্ভাবনা প্রতিপন্ন হইত, তবে ইহা স্বীকার করা যাইতে পারিত যে, কোন একটী বিধান ঘটনাক্রমে বা অহেতুক সমুৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে অপর সকল বিধান স্বভাবতঃ প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু যখন পরস্পর স্বতন্ত্র চারিটী বিধান একই উদ্দেশ্যে পরস্পর হইতে স্বতন্ত্রভাবে প্রকটিত হইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট মাঙ্গল্যের দিকে পরিচালিত হইতেছে তখন তাহাতে এক মঙ্গলময় বিধাতার হস্ত ভিন্ন অপর কিছুই উপলব্ধ হয় না।

পাঠকগণ এক্ষণে দেখিতে পাইতেছেন যে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক; যদি বাস্তবিক কোন বিরোধ থাকে তাহা কেবল অপূর্ণজ্ঞান বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং অন্ধবিশ্বাসী ধার্ম্মিক-দিগের স্থূলদর্শিতার ফলমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মই বিজ্ঞানের চরম এবং বিজ্ঞান ধর্ম্মের মূল। এবম্বিধ ধর্ম্মকে কিরূপে সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহা আগামী বারে আলোচিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

পলাশ বন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রিতাবস্থায় একটী ভীষণ স্বপ্ন দেখিলাম। আমার মনে হইল, আমি যেন গৃহে জননীর সন্নিধানে বসিয়া আছি। কিন্তু জননীদেবী রুগ্না ও রোগশয্যায় শায়িতা। তাঁহার দেহ শুষ্ক ও শীর্ণ; মুখমণ্ডল মলিন ও নিষ্প্রভ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কালিমাময়। রীতিমত চিকিৎসা হইতেছে বটে, কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁহার এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছেন। তাঁহার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া অগ্রজ ভ্রাতারা গৃহে আগমন করিয়া-ছেন; জননীদেবী আমাদের সকলকেই তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া কঠোর রোগযন্ত্রণার মধ্যেও যেন সুখ ও আনন্দ অনুভব করিতেছেন। কখনও তাঁহার শুষ্ক গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, আবার কখনও বা তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায় হইতেছে। জননীর

আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া আমি যারপরনাই কাতর হইলাম। হৃদয় শোকে অবসন্ন হইলে চক্ষু বাষ্পপূর্ণ ও কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল এবং চতুর্দ্দিকে যেন ঘোর অমঙ্গলজনক উৎপাত সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল যেন কালরজনী মুখ ব্যাদন করিয়া আমাদের সকলকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। কাহারও মুখে একটীও বাক্য নাই; সকলেই বিষণ্ন, নীরব ও শোকপীড়িত। সকলেরই মুখমণ্ডলে নৈরাশ্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত এবং সকলেই অসহায়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট। কাল-বৈশাখী অপরাহ্নে ভীম ঝঞ্ঝাবাত বহিবার পূর্ব্বে প্রকৃতির যেরূপ অবস্থা ঘটে, আমাদের গৃহেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। শোকমেঘে গৃহ অন্ধকার-ময় হইল; ঘোর বিপদাশঙ্কারূপ তড়িৎপ্রকাশে আমরা ক্ষণে ক্ষণে চমকিত ও শিহরিত হইতে লাগিলাম এবং করালকালের ভীষণ হুঙ্কাররূপ গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে সকলে স্তম্ভিত হইতে লাগিলাম। জননীর শেষাবস্থা দেখিয়া আমি শোকাবেগ আর সংযত করিতে পারিলাম না; সকলের নিবারণ সত্ত্বেও ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহান্তরে গমন করিলাম।

সহসা আমি আহূত হইলাম। আহ্বান শুনিবামাত্র আমি জননীর গৃহে প্রবেশ করিলাম। সকলে আমাকে জননীর সমীপে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। আমি তাঁহার নিকটে বসিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কাতরস্বরে ডাকি-লাম "মা"। মা চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং আমাকে আরও নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিয়া সাশ্রুলোচনে ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "বাবা—আমার—উদ্—দাসীন—হইও না—আম্—মি—তোর মুখ্ দেখ—লাম—না আম্—মি তোর বিয়ে—এই পর্য্যন্ত বলিয়া কণ্ঠরুদ্ধ হইল। হতভাগ্য আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম এবং ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে হইতে অচেতন হইয়া পড়িলাম।

সহসা বোধ হইল, কে যেন আমায় তুলিয়া ধরিল এবং "জল, জল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমি যেন ঈষৎ সংজ্ঞা লাভ করিলাম এবং একবার চক্ষুও উন্মীলিত করিলাম; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমার মস্তক যেন বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং আমি যেন পুনর্ব্বার সংজ্ঞা-হীন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইলাম। কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না; কিন্তু ধীরে ধীরে চেতনা সঞ্চার হইবার উপক্রম হইলে, আমি যেন কাহার ভয়সূচক কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। একটী কোমল বালিকা কণ্ঠও

উৎকণ্ঠাসূচক স্বরে যেন বলিয়া উঠিল "দিদি, ভাল ক'রে বাতাস দে, বাতাস দে।" তৎপরেই আমি যেন মুখমণ্ডলে অঞ্চল-বিধূনিত মৃদুমন্দ বায়ু সঞ্চালন অনুভব করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই চক্ষু খুলিলাম; খুলিয়াই দেখিলাম—কেশব ও উপরিভাগে নিবিড় হরিৎপত্র রাজি। কেশবের উরু-দেশে আমার মস্তক রক্ষিত রহিয়াছে, এবং আমার মস্তক ও কপোল বহিয়া জলবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। ভাবিলাম এ কি? আমি কোথায়? এখানে আমায় কে আনিল? জননীর সদ্য মৃত্যুচ্ছবি তখনও আমার মানস-চক্ষুর সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান; তখনও শোকোত্থিত উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার নাসারন্ধ্র ও ওষ্ঠপুটে স্ফুরিত হইতেছিল। তাই সহসা কিছু স্থির করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কেশব আমায় বাধা দিয়া বলিল, "আপুনি একটু স্থির থাক, ওরূপ ব্যস্ত হবেন না। এমন ক'রে একলা এখানে শুয়ে থাক্‌তে হয়?" স্বপ্নের ঘোর এখনও আমায় সম্পূর্ণরূপে পরি-ত্যাগ করে নাই; সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার বুঝিবার জন্য আমি কেশবের কথা অতিক্রম পূর্ব্বক উঠিয়া বসিলাম। বসিয়াই দেখিলাম, আমি পলাশ-বনে আমার গৃহের অনতিদূরে একটী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট এবং আমার সম্মুখে যোগমায়া, সুশীলা ও ভূদেব—অর্থাৎ গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র কন্যারা এক একটী পুষ্পপূর্ণ পুষ্পাধার হস্তে দণ্ডায়মান। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইলাম। আ ছিঃ ছিঃ, স্বপ্ন দেখিতেছিলাম! আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইলাম। ভাবিলাম, এই বালক বালিকারা আমায় স্বপ্নের ঘোরে কাঁদিতে দেখিয়া নিশ্চিত কেশবকে ডাকিয়া আনিয়াছে। এরূপ প্রকাশ্যস্থলে শয়ন করাটা ভাল হয় নাই। যাহাই হউক, উপস্থিত দুরবস্থা হইতে কোনও রূপে মুক্তি লাভের আশায় আমি একটু হাস্যের অভিনয় করিয়া যোগমায়া ও সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তোমরা বুঝি, ফুল তুলে ফিরে আস্‌বার সময় আমাকে এই গাছের তলায় শুয়ে থাক্‌তে দেখে ভয় পেয়েছিলে; তাই বুঝি কেশবকে ডেকে এনেচ?" যোগমায়া ব্রীড়ায় চক্ষুদুটী অবনত করিয়া আমার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিল না; কিন্তু সুশীলা আমার কথার যেন প্রতিবাদ করিয়া বলিল 'তা কেন? আমরা বনে ফুল তুলে এই পথে বেড়িয়ে আস্‌চি, আর দেখ্‌লুম, আপনি এখানে শুয়ে ঘুমুচ্চেন, আর এক একবার হাত ছুড়চেন, আর ফুকুরে ফুকুরে কেঁদে উঠচেন! তাই না দেখে,

দিদি আর আমি থম্‌কে দাঁড়ালুম। ভূদেব আপনার কাছে গিয়ে "দেবেন বাবু, দেবেন বাবু" ব'লে দু তিন বার ডাক্‌লে। কিন্তু আপনার কোনই সাড়া পেলে না। আবার আপনি 'মা মা' ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। তাই দেখে, আমি ভয় পেয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়ে যাচ্ছিলুম; কিন্তু দিদি বল্লে "ওরে থাম, যাস্‌ নে; কেশবকে ডেকে আনি।" তাই আমরা তিন জনে দৌড়ে গিয়ে কেশবকে ডেকে আন্‌লুম। ভূদেব দৌড়াতে দৌড়াতে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেল—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুশীলা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; সুশীলার সরল হাস্য দেখিয়া আমারও হাসি পাইল। সুশীলা সেইরূপ হাসিতে হাসিতে আবার বলিতে লাগিল "ভূদেব যেমন পড়েচে, অমনি ওর সাজিসুদ্ধ ফুল মাটীতে উল্টে গেছে; আমি বল্লুম 'ওরে আর কুড়োস্‌ নে, আর কুড়োস্‌ নে, তোর ফুল ঠাকুর পূজোয় লাগ্‌বে না।" কিন্তু ভূদেব আমার কথা না শুনে, ঐ দেখুন, সব ফুল কুড়িয়ে এনেচে।"

এই বলিয়া সুশীলা আবার হাসিতে লাগিল। বেচারা ভূদেব সুশীলার উচ্চহাস্যে অপ্রতিভ হইয়া যোগমায়ার পশ্চাদ্ভাগে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নিষ্ঠুর হৃদয়া সুশীলা তাহাতেও বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল 'ওরে ভূদেব দেখিস্‌ আমাদের সাজির সঙ্গে তোর সাজি ঠেকাস্‌ নে, তা হ'লে সব ফুল নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

ভূদেবকে বিপন্ন দেখিয়া আমি তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলাম। সুশীলার মুখে তাহার পতনের কথা শুনিয়া আমি দুঃখ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই ভূদেব, তোমার তো কোথাও লাগে নাই?" ভূদেব স্ফূর্ত্তির সহিত মাথা নাড়িল। আমি বলিলাম 'আহা, তোমার ফুলগুলি সব নষ্ট হয়ে গেল!' ভূদেব তৎক্ষণাৎ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল, "নষ্ট হ'বে কেন? আমি এই ফুলে আমার নিজের ঠাকুর পূজো কোর্‌বো।"

ভূদেবের কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। যোগমায়া ঈষৎ হাসিয়া ভূদেবের দিকে মুখ ফিরাইল। সরলপ্রাণা সুশীলা উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে আবার বলিতে লাগিল "দেবন বাবু, ভূদেবের ঠাকুর দেখেছেন? একটা মাটীর পুতুল! মা ওকে পুতুলটা খেলা কর্‌তে দিয়ে-ছিলেন; ভূদেব সেইটেকে ঠাকুর বানিয়ে রোজ রোজ পূজা করে। নিজের খাবার থেকে কিছু রেখে দিয়ে ঠাকুরকে তারই ভোগ দেয়, আর বাকে আমাকে আর দিদিকে পেরসাদ দেয়।"

সুশীলার কথা শুনিয়া ভূদেবের মুখখানা বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় হইল। তাহা দেখিয়া আমি বলিলাম "না, সুশীলা, তুমি জান না; ভূদেব সত্যি করে ঠাকুর পূজো করে।" এই বলিয়া অন্য কথা পাড়িবার ইচ্ছায় সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, তোমরা কেশবকে ডেকে আন্‌লে; তার পর কি হ'ল?" সুশীলা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কেশব বলিল, "আজ্ঞা, আমি এসে দেখ্‌লাম, আপুনি অত্যন্ত ঘাম্‌চো, হাত মাথা নাড়্‌চো, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেল্‌চো, আর এক একবার কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চো। তাই দেখে আমার বড় ভয় হ'লো। আমি তোমাকে তিন চারি বার ডাক্‌লাম; গা নাড়া দিলাম; কিন্তু কোন উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, আপনি কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌লে। তাই দেখে আমি যোগমায়াকে ব'ল্‌লাম, দিদি ঠাকুরাণ, আমাদের ঘর থেকে শীগ্‌গীর এক ঘটী জল নিয়ে আস্‌তে পার?" দিদি ঠাকুরাণ জল আন্‌লে আমি সেই জল তুমার মাথায় ও মুখে দিলাম; আর দিদি ঠাকুরাণ আঁচল দিয়ে তুমাকে বাতাস করতে লাগ্‌লো। খানিক পরেই আপনি জেগে উঠ্‌লে; যাই হোক, ভাগ্যে তো দিদি ঠাকুরাণ আজ এই-দিকে ফুল তুল্‌তে আস্‌ছিল, আর আমাকে ডেকে দিয়েছিল; তা না হোলে কি হ'ত্তোক্?" এই বলিয়া কেশব আমাকে তিরস্কারমিশ্রিত নানাপ্রকার উপদেশের কথা বলিতে লাগিল।

যোগমায়াকে গমনোদ্যত দেখিয়া আমি সুশীলাকে বলিলাম, "সুশীলা, তুমি তো আমায় দেখে ভয় পেয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়ুচ্ছিলে; ভাগ্যে তো তোমার দিদি ছিল, তাই কেশবকে এখানে ডেকে এনেছিল। আজ যোগমায়া না থাক্‌লে হয়ত আমার কোন বিপদ ঘট্‌তো?"

সুশীলার মুখখানা একটু গম্ভীর হইল। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, "কেন? আমি বাড়ী গিয়ে বাবাকে ব'ল্‌তুম, আর বাবা এসে আপনাকে দেখ্‌তেন?"

সুশীলার কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাহার পর তাহার ও যোগমায়ার দিকে চাহিয়া একটু কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিলাম "গত রাত্রিতে আমি ভাল ঘুমুতে পারি নাই, তাই এই গাছের তলায় শু'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা কুস্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম; আর এই ভাবে শুয়ে থাক্‌লে বড় কুস্বপ্নও দেখ্‌তে হয়। যাই হোক আমাকে দেখে তোমরা যে বড় ভয় পেয়েছিলে এই জন্ত আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্ত

কেশবকে ডেকে এনে তোমরা যে আমার উপকার ক'রেচ, তা আমি কখনও ভুলতে পার্‌বো না। গোস্বামী মশাই মহাত্মা ব্যক্তি; তাঁর পুত্র-কন্যাদের এইরূপ উপযুক্ত কাজই বটে। আমি আজ্‌কের এই ঘটনার কথা গোস্বামী মশাইকে স্বয়ং ব'লে আস্‌বো। মাও এই কথা শুনে যারপর নাই আনন্দিত হবেন। ভগবান্ এইরূপ ছেলেমেয়েদের মঙ্গল করেন। তিনি তোমাদিগকে সুখে রাখুন।" এই বলিয়া আমি ভূদেবকে বলিলাম, "ভূদেব ভায়া, তুমি কিন্তু পড়ে যাওয়াতে আমি বড় দুঃখিত হ'য়েচি। আর ফুলগুলি——" আমার কথা শেষ না হইতে হইতে আনন্দময়ী সুশীলা ভূদেবের দিকে চাহিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। ভূদেব, বোধ করি, বেগতিক দেখিয়া এবং তাহার যে কোথাও লাগে নাই, ইহাই দেখাইবার জন্য, সাজি-হস্তে ঘরের দিকে দৌড় মারিল এবং খানিক দূর গিয়া আমার দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "দেবন বাবু, এই দেখুন, আমার কোথাও লাগে নাই।" এই বলিয়া আবার দৌড় মারিল। সুশীলা হাসিতে হাসিতে তাহার দিদির সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিল এবং "ওরে, দৌড়িস্‌নেরে, থাম্; আবার প'ড়ে যাবি" এই কথা বার বার বলিতে লাগিল। কিন্তু কে কার কথা শুনে? সুশীলা যত চীৎকার করে, ভূদেব তত দৌড়িতে থাকে। এইরূপ করিতে করিতে তাহারা ধীরে ধীরে চক্ষুর অদৃশ্য হইল।

যতক্ষণ তাহারা নয়নগোচর হইতেছিল, ততক্ষণ আমি একদৃষ্টিতে এই কৌতুক দেখিতেছিলাম এবং তাহাদের কথা চিন্তা করিয়া আনন্দিত ও চমৎকৃত হইতেছিলাম। দেবরূপিণী যোগমায়ার দেব-হৃদয়ের কথা মনে করিতে করিতে আমার চক্ষুতে জল আসিল এবং তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল; সরলপ্রাণা সুশীলার কথা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল এবং দেবশিশু ভূদেবের বীরত্বব্যঞ্জক স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আমি কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই বালক-বালিকাগুলির পবিত্র আকারে আমি যেন দেবরাজ্যের ছায়া দেখিতে পাইলাম। বহুদূরে গিয়া যোগমায়া ছলনাক্রমে একবার আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল; কিন্তু আমরা একদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছি, ইহা বুঝিতে পারিয়া আর ফিরিয়া চাহিল না। তাহারা দৃষ্টি-পথের অতীত হইলে, আমি সানন্দমুখে কেশবের দিকে চহিলাম। কেশবের মনেও

ঐরূপ কোনও চিন্তা হইতেছিল; যেহেতু সে আমাকে বলিতে লাগিল, "যেমন আমাদের প্রভু, তেমনই প্রভুর ছেলেগুলি। আহা, প্রভুর বড় কন্তা যোগমায়াটি যেন সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী। যেমন মিষ্টি কথা, তেমনই ব্যবহার। অহঙ্কার নাই, ঘিন্না নাই, সকলের ছেলেকেই কোলে নিচ্চেন, আদর ক'চ্চেন, ঘরকে নিয়ে গিয়ে খেতে দিচ্চেন। এইরূপ করেন ব'লে, আমরা গ্রামশুদ্ধ লোক কত ডরাই। বলি, একে প্রভু কন্তে, তায় আবার যেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী। বাপরে, শূদ্দুরের ছেলে কি ওঁর কোলে উঠ্‌তে পারে? আহা, দিদি ঠাকুরাণের বিয়ার জন্তে প্রভু কত ভাব্‌চেন। প্রভুর ভাবনা দেখে, আমাদেরও ভাবনা হয়। কিন্তু এক একবার ভাবি, "দিদি ঠাকুরাণ চ'লে গেলে, আমাদের পলাশ-বন গ্রাম যেন আঁধার হ'য়ে যাবেক, দিদিঠাকুরাণ যেন গ্রামের আল।"

কেশবের এই কথা শুনিতেছি, এমন সময়ে দেখি, বাড়ী হইতে ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে এ সময়ে হঠাৎ আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, "মা ঠাকরোণ কি জন্ত আপনায় শীগ্‌গীর ডাক্‌চেন।" আমি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর দিকে চলিলমাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জননী আমায় অসময়ে কি জন্ত স্মরণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ভৃত্যকে অনেক প্রশ্ন করিয়াও কিছু জানিতে পারিলাম না। সুতরাং আমি অনন্ত মনে দ্রুতপাদক্ষেপে বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, পিতৃদেব বহির্ব্বাটীতে বসিয়া বৈষয়িক কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অতএব, তাঁহার নিকট আর না দাঁড়াইয়া একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, জননীদেবীও গৃহকার্য্যে নিযুক্তা; কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল বিষন্ন ও চিন্তাভারাক্রান্ত; কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তিনি রোদনও করিয়াছেন, তাহা চক্ষু দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। তিনি গৃহের কার্য্যাদি করিতেছেন বটে; কিন্তু তাহাতে যেন তাঁহার চিত্ত সংলগ্ন নাই। না করিলে নয়, এইরূপ ভাবেই যেন তিনি গৃহ কর্ম্মাদি করিতেছেন। আমি ব্যাকুল মনে চিন্তিত হৃদয়ে তাঁহার সন্নিহিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আমি এই অচিন্তনীয়

ব্যাপারে যারপরনাই কাতর ও উদ্বিগ্ন হইলাম এবং তাঁহাকে বারম্বার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, আরও রোদন করিতে লাগিলেন এবং আমার মস্তক ও চিবুক স্পর্শ করিয়া হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি আমার ভ্রাতাদের কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া চিন্তিত হইলাম এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অদ্য কোনও পত্র আসিয়াছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া মঙ্গলা দাসী গৃহান্তর হইতে আসিয়া আমায় বলিতে লাগিল "দাদাঠাকুর, তুমি অত উতলা হ'চ্চ কেন? সকলেই ভাল আছে; আজ কোথ্‌থেকেও কোন পত্র আসে নি। মা আজ সকাল থেকে উঠে অবধি তোমার জন্যেই কেঁদে কেঁদে আকুল হ'চ্চেন। ভোরের সময় স্বপন দেখেছিলেন, তুমি যেন সন্নিসি হ'য়ে কোথায় চলে গেছ। ভোরের স্বপন মিথ্যে হয় না কি না; আর মা উঠে তোমায় আজ দেখ্‌তেও পান নি; সেই অবধি কেবল কাঁদ্‌ছেন আর কাঁদছেন। বাপ রে ওঁর কান্না তো আমি আর দেখ্‌তে পারি না। যখন তখন কেবল তোমারই কথা নিয়ে কান্না হচ্চে। বলি, হেঁগা দাদাঠাকুর, তুমি এত লেখাপড়া শি'খেচ; বলি লেখাপড়া শিখে কি মা'কে এম্নি ক'রেই কাঁদাতে হয়? তোমার শরীরে কি একটুও দয়া মায়া নেই? দেখ্‌চো না, মা কেবল তোমারই জন্যে ভেবে ভেবে আধখানা হ'য়ে গেছেন? আর মাকে কাঁদিয়ে তোমার সুখ হয় নাকি? খেষ্টানী বিদ্যেকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দণ্ডবৎ বাবা। আমরা তো মায়ের চোখে জল দেখ লে একেবারে ম'রে যেতুম। অত কথাতেই কাজ কি? এই ধর না, আমি তো ভগ্নী; আমারই চোখে একটু জল দেখ্‌লে আমার দাদাই ভাই যেন অস্থির হ'য়ে যেতো!" মঙ্গলার এই তিরস্কারসূচক বাক্যের শেষ না হইতে হইতে পিতৃদেব অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আমিও তাঁহাকে দেখিয়া একটু ব্যস্ত সমস্ত হইলাম। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "কিসের আবার গোল হ'চ্চে, মঙ্গলা?" মঙ্গলা গৃহমার্জ্জনা করিতে করিতে মার্জ্জনী একবার জোরে আছাড়িয়া বলিল, "কিসের আবার গোল! যে গোল চিরদিনই হয়, আজও তাই হ'চ্চে।" এই বলিয়া সে আবার সজোরে মার্জ্জনী সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিন্তু যে স্থানে তাহার মার্জ্জনী আছাড় খাইতেছিল, তাহা এরূপ পরিষ্কৃত যে, সেখানে একবিন্দু সিন্দুর পড়িলেও অনায়াসে তাহা খুঁটিয়া লওয়া যাইত! মঙ্গলার ভাবগতিক

দেখিয়া আমি মনে করিলাম, তাহার শক্তি থাকিলে আজ সে আমার বিষ ঝাড়িয়া ফেলিত।

পিতৃদেব আর বাক্য ব্যয় না করিয়া তামুকু খাইতে খাইতে একখানা বেঞ্চের উপর বসিলেন এবং আমাকেও বসিতে বলিলেন। আমি অদ্যকার ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অবহিতচিত্তে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, "দেবু, তুমি এতদিন বালক ছিলে; তাই তোমায় কিছু বলি নাই। কিন্তু এখন বলিবার সময় আসিয়াছে। তুমি জ্ঞানবান্ ও বিদ্বান্ হইয়াছ। তোমার বিদ্যাশিক্ষার প্রশংসা শুনিয়া আমরা সকলেই গৌরবান্বিত হই। দেশ শুদ্ধ লোক একমুখে তোমার স্বভাব চরিত্র ও জ্ঞানের প্রশংসা করে। তুমি যে কোনও চাকরী বা কাজকর্ম্ম করিলে না, তজ্জন্য আমি দুঃখিত নই। তুমি যে উদ্দেশ্যে পলাশবনে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা অতীব সাধু এবং আমিও তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কিন্তু আমি কোন মতেই তোমার একটী সঙ্কল্পের অনুমোদন করিতে পারিতেছি না;—তুমি যে আজীবন অবিবাহিত থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, আমার বিবেচনায় তাহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন নহে। সংসারী না হইলে মানুষের প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয় না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া এতদিন বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ। অতঃপর গৃহী হইয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর। গৃহধর্ম্ম পালন করিতে করিতে ভগবানের মহিমা ও কৃপা আরও বুঝিতে পারিবে। তুমি শান্তিপ্রিয়, তাহা আমি জানি। তুমি সংসারের কোলাহল, অশান্তি, বিপদ্ আপদ্ প্রভৃতি চিন্তা করিয়া হয়ত তন্মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা করিতেছ না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, পরমেশ্বর মানুষের মঙ্গলের জন্যই তাহাকে বিপদ আপদের মধ্যে ফেলিয়া থাকেন। স্বর্ণে নিকৃষ্ট ধাতু থাকিলে, অগ্নি দ্বারা তাহা শোধিত হয়; সেইরূপ বিপদ আপদের মধ্যে পড়িলে মানুষের অহঙ্কার অভিমানাদি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে নির্ম্মল ও একাগ্রচিত্তে ভগবানের আরাধনা করিতে সমর্থ হয়। বিপদ্, অশান্তি ও স্বজন-বিয়োগের আশঙ্কা করিয়া সংসার হইতে দূরে থাকা পৌরুষের চিহ্ন নহে, বরং কাপুরুষেরই লক্ষণ। এতদ্দারা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণই করা হয়। দেখ, সংসারী হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করাই জগতের নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা সাধ্যপক্ষে উচিত নহে। স্থলবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা দোষের না হইতে পারে; কিন্তু তুমি যে সেরূপ

সুখ নও, ইহা বলাই বাহুল্য। ভগবান্ সংসারে তোমাকে সুখই দিন আর দুঃখই দিন, দুইই মাথা পাতিয়া লইবে। সংসার নিরবচ্ছিন্ন সুখের স্থান নহে; সুখের নিত্য সহচর দুঃখ। সুখ দুঃখ দুইয়ের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। দুঃখ দেখিয়া ভয় পাইও না, অরণ্যে পলাইবার চেষ্টা করিও না। ভগবান না করুন, কিন্তু কখনও যদি তোমার ভাগ্যে দুঃখ বা বিপদ্ ঘটে, তবে তাহা বিধাতার বিধান ও ইচ্ছা বলিয়াই জানিবে। দুঃখে, বিপদে অধীর না হইয়া তৎসমুদয় সহ্য করিবে। তুমি সকলই বুঝিতে পারিতেছ; তোমাকে এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর একটী কথা আমি তোমাকে কর্ত্তব্য বোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমার নিজের সম্বন্ধে হইলে, তাহা বলিতাম না; কিন্তু তোমার গর্ভধারিণীর মুখ চাহিয়া আমাকে তাহা বলিতে হইতেছে। তুমি বিবাহ না করায় তোমার জননী যার পর নাই দুঃখিতা। ইনি তোমাকে সংসারী দেখিলে নিরতিশয় আনন্দিতা হন। তুমি অবশ্যই ইহা জানিতেছ ও মনে মনে বুঝিতেও পারিতেছ। জননীর সন্তোষ-বিধান করা তোমার একটী অবশ্য কর্ত্তব্য এবং আমার বিবেচনায় একটী প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্মও বটে। পরের মঙ্গল ও সুখ সাধন করা যখন তোমার জীবনের একটী প্রধান ব্রত, তখন গর্ভধারিণী জননীর দিকে চাহিবে না, এ কিরূপ কথা? আত্মত্যাগ না করিলে কখনও পরের উপকার করা যায় না এবং কোনও মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। বিবাহ করিলে যদি তোমার সুখের ব্যাঘাত ঘটে আর তোমার জননীর আনন্দ হয়, তাহা হইলেও তোমার বিবাহ করা কর্ত্তব্য। নিজে কষ্ট না সহিলে কি কখনও পরের সুখ সাধন করা যায়? কিন্তু বিবাহ করিলে, তোমার সুখের ব্যাঘাতই বা কিসে হইবে? যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার সহধর্ম্মিণী তোমার মনোমত না হন, তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া কালযাপন করিবে। সক্রেটীশের কথা তুমি সবিশেষ অবগত আছ; তিনি কিভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাহা একবার স্মরণ কর। কিন্তু তোমার তত দূরও আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। আমি তোমার জন্য একটী উপযুক্তা পাত্রী স্থিরীকৃত করিয়াছি। পাত্রীটি তোমারই অনুরূপা এবং সর্ব্বপ্রকারে তোমারই যোগ্যা। বালিকাটিকে দেখিয়া অবধি আমার মনে হইয়াছে, ভগবান্ তাহাকে তোমারই জন্য এবং তোমাকে তাহারই জন্য অভিপ্রেত করিয়াছেন। আর তাঁহার এই মঙ্গলময় অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে বলিয়াই বুঝি তিনি তোমাদিগকে

পরস্পরের নিকটে আনয়ন করিয়াছেন। আমি কাহার কথা বলিতেছি, বুঝিতে পারিতেছ—গোস্বামী মহাশয়ের কন্যা যোগমায়া।"

এই বলিয়া পিতৃদেব আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি আর কি উত্তর দিব? উত্তর দিবার আমার মুখ ছিল না। নিজের সুখান্বেষণ করিতে গিয়া আমি জননীদেবীর সুখ দুঃখের দিকে দৃক্‌পাত করি নাই, পিতৃদেবের স্নেহমিশ্রিত এই মৃদু মধুর তিরস্কার বাক্যে আমি যারপরনাই লজ্জিত ও ম্রিয়মাণ হইলাম। আমি মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, ভণ্ড আমি, নরাধম আমি, স্বার্থপর আমি—এইরূপেই কি আমি ধর্ম্মজীবন লাভ করিব? প্রাণ দিলেও যাঁহাদের ঋণের পরিশোধ করা যায় না, বিবাহ করিলে যদি তাঁহাদের যৎসামান্য সন্তোষ সংসাধিত হয়, তবে সে বিবাহ আমি করিব না? তৎক্ষণাৎ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যোগমায়া যদি নরকের কীটও হয়, তথাপি আমি তাহাকে বিবাহ করিব এবং বিবাহ করিয়া যদি আমি প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে শতবৃশ্চিক যন্ত্রণাও অনুভব করি, তথাপি একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন জগতের আর কেহই তাহা জানিতে পারিবে না। আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া, পিতৃদেব বলিলেন, "দেবু, তুমি আমার কথায় কি বল?"

আমি বলিলাম, "আপনার কথার প্রত্যুত্তরে আমার কিছুই বলিবার নাই। আপনার ও জননীর আদেশ ও ইচ্ছা আমার অবশ্য পালনীয়। যোগমায়াই হউক, আর যেই হউক, যাহার সহিত আমার বিবাহ দিবেন, তাহারই সহিত আমার বিবাহ হইবে। কদাপি ইহার অন্যথা হইবে না। কিন্তু যোগমায়ার সহিত বিবাহ দেওয়া যদি আপনাদের মত হয়, তবে এক মাস কাল এ সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করিবেন না, ইহাই আমার প্রার্থনা। এক মাস পরে, যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন। আমি আপনার নিকট এক মাসের সময় প্রার্থনা করিতেছি।"

পিতৃদেব আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে; আর এক মাস কাল আমিও এখানে থাকিতে পারিতেছি না। কোনও বিষয় কার্য্যোপলক্ষে আমায় স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে। তোমার গর্ভধারিণীর ইচ্ছা, ইনি এই এক মাস কাল তোমার কাছে পলাশ-বনেই বাস করেন। মঙ্গলাও কাছে থাকিবে। ভৃত্য এই বাটীর রক্ষণা-বেক্ষণ করিবে। তুমি কি বল?"

আমি বলিলাম, "এ অতি সুন্দর প্রস্তাব। মা পলাশ বনে থাকিলে, আমাকে আর নিত্য দুই বেলা এখানে গতায়াত করিতে হয় না।" তারপর জননীর দিকে চাহিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিলাম, "কিন্তু মা, গোস্বামী মশাইয়ের মেয়ের সহিত আমার বিয়ের কথা তুমি বা মঙ্গলা কা'কেও ব'লো না বা জান্‌তে দিও না। যদি এই কথা হঠাৎ রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে ওখানে বিয়ে হওয়া সম্বন্ধে গোলযোগ হ'বে, তা ব'লে রাখ্‌ছি।"

জননী দন্তে দন্তে জিহ্বা পেষণ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তা কি আমি ব'ল্‌তে পারি? আর তুমি যখন মানা ক'রচ, তখন ব'ল্‌ব কেন?"

মঙ্গলাও বলিয়া উঠিল, "দাদাঠাকুর, তুমি বুঝি, আমাকে তাই মনে করেচো। মঙ্গলার পেটের কথা বা'র করে, সংসারে তো এমন কা'কেও দেখি নি।" এই বলিয়া মার্জ্জনী রঞ্জিত হস্তা মঙ্গলা দাসী সগর্ব্বে চঞ্চল-পাদবিক্ষেপে অন্যত্র গমন করিল।

বেলা হইয়াছে দেখিয়া, জননীর অনুরোধ ক্রমে পিতৃদেব ও আমি স্নানের উদ্যোগ করিতে গেলাম।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

ঝরণার পাশে।

দেবি   আমি প্রতিদিন এমনি সময়ে
    থাকিব হেথায় আসিয়া,
ওই   ঝরণার পাশে কঠিন পাথরে
    বসিয়া,
এই   ম্লান জ্যোছনা-কর-মাখা আঁধারে
    তোমারি পথপানে চাহিয়া।

তুমি   সারাদিন পরে গৃহকাজ সারি
    কলসি তুলি কাঁখেতে,
ওই   কালো কেশগুলি পড়িবে এলায়ে
    পিঠেতে,
আসি   সন্ধ্যাটির মত ধীরে ধীরে, রেখো
    কলসি আমার পাশেতে।

ওগো তুমি একটিও কথা বলিও না,
লজ্জারাগ মুখে মাখিয়ে
শুধু ওইখানে থেকো ছবিটির মত
দাঁড়িয়ে,
ওই ঝরণার জল পড়িয়ে আসিয়া
চরণের কাছে ছড়িয়ে,
যাবে সান্ধ্য পবনে পুষ্পিত শাখা
অধরের পাশে দুলিয়ে।

আমি একবার শুধু দেখিব চাহিয়া
ওই লজ্জা-নত মু'খানি,
দেব নির্ঝরিণী জলে কলসি ভরিয়া
তখনি,
তুমি আপনার ঘরে যেয়ো চলে যেন
আমারে কখনো দেখনি।

দেবি ওই শাখাটির পরে ভর রাখি
আধ-আলো আধ আঁধারে
আমি দেখিতে থাকিব কলসি কাঁখেতে
তোমারে,
ওগো ও মুখানি তব মিশে যাবে ধীরে
অদূর গ্রামের মাঝারে।

মধু জল কলরোলে পাহাড়ের কোলে
নির্জ্জন কুটীরে শয়নে
ধীরে মুদে যাবে আঁখি, দেখিব তোমারে
স্বপনে,
ওগো সারাদিন ধরে গড়িব তোমারে
মনের মতন যতনে,
সাঁঝে আসিব গো পুন তোমারি আশায়
এখানে।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জগদ্রাম রায়ের সময় নিরূপণ।

গত ৪র্থ সংখ্যক দাসীতে জগদ্রাম রায়ের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা দেখিলাম। পড়িয়া মনে হইল, যেন সময় নিরূপণ সম্বন্ধে গোলযোগ টানিয়া আনা হইয়াছে। জগদ্রাম কৃত "দুর্গাপঞ্চরাত্রি ও অদ্ভুত রামায়ণে" ঐ ঐ পুস্তক রচনাকাল স্পষ্ট লেখা আছে। সুতরাং পুস্তক রচয়িতার কালও সহজে জানা যায়। দাসীর সম্পাদক মহাশয় তর্ক-বিতর্কের একটী মীমাংসা নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করিয়াছেন দেখিয়া, নিম্নে দুই একটী কথা বলিতে সাহসী হইলাম।

প্রথমে বলা আবশ্যক যে, ঐ দুই পুস্তকের কোন খানিই আমি দেখি নাই। এ বিষয়ে দাসীতে যতটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাই আমার মূল।

দুর্গাপঞ্চরাত্রির শেষে লেখা আছে,—

ভুজরন্ধ্র রসচন্দ্র শক পরিমাণে।
মাধব মাসেতে শুক্লপক্ষ শুভ দিনে॥
ষোড়শ দিবস প্রতিপদ গুরুবারে।
কৃত্তিকা নক্ষত্র যোগ সৌভাগ্য সুন্দরে॥

এখানে দেখা যাইতেছে যে, ১৬৯২ শকে ১৬ বৈশাখ বৃহস্পতি বার প্রতিপদ্ তিথিতে দুর্গাপঞ্চরাত্রি রচনা সমাপ্ত হয়। রন্ধ্র বা ছিদ্র শব্দ দ্বারা চিরকালই ৯ বুঝিয়া থাকি। শূন্য, আকাশ ও তাহার যাবতীয় প্রতিশব্দ দ্বারা ০ বুঝায়। বস্তুতঃ ১৬৯২ শক বুঝিতে কোন গোলযোগ নাই!

কিন্তু ঐ দিবস বৃহস্পতিবার ও শুক্লপ্রতিপদ্ ছিল কি? বার তিথি নক্ষত্র না মিলিলেওবা শক সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিত। কিন্তু গণনা দ্বারা জানা যায় যে, ১৬৯২ শকের ১৬ বৈশাখ বৃহস্পতিবার শুক্ল প্রতিপদ্ কৃত্তিকা নক্ষত্র হইয়াছিল।

এরূপ গণনা করিবার অনেক সংক্ষিপ্ত নিয়ম আছে। সকলের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনায় একটী সহজ নিয়ম দেওয়া যাইতেছে। আশা করি পাঠকবর্গ এজন্য আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

প্রায় ৩৬৫·২৬ দিনে আমাদের এক বর্ষ হইয়া থাকে। উহাকে ৭ (সপ্তাহ) দিয়া ভাগ করিলে ১·২৬ দিন অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ প্রতিবর্ষে ১·২৬ দিন করিয়া বারে বৃদ্ধি হয়। এখন ১৮১৮ শক যাইতেছে। ১৬৯২ হইতে ১৮১৮ শক পর্য্যন্ত ১২৬ বৎসর। সুতরাং

অত বৎসরে ১৫৮ দিন বারে বাড়িয়া আসিয়াছে। ৭ দিয়া উহাকে ভাগ করিলে ৪ অবশেষ থাকে। ১৬ বৈশাখ এবৎসর সোমবার ইহা হইতে ৪ দিন পিছাইয়া গেলে বৃহস্পতিবার হয়। অতএব জানা যাইতেছে যে, ১৬৯২ শকের ১৬ বৈশাখ বৃহস্পতিবার হইয়াছিল।

ঐ দিবসে শুক্ল প্রতিপদ্ হইয়াছিল কি? দেখা যায় যে,এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রায় ২৯·৫৩ দিন এবং প্রতিবর্ষে ১২টী অমাবস্যা হইয়া ১০·৮৯ দিন অতিরিক্ত থাকে। সুতরাং এ বৎসর যে যে দিন অমাবস্যা হইল, আগামী বর্ষে সেই সেই দিন হইতে ১০·৮৯দিন পিছাইয়া অমাবস্যা হইবে এবং গতবর্ষে অতদিন পরে অমাবস্যা হইয়াছিল। ১৬৯২ হইতে ১৮১৮ শক পর্য্যন্ত ১২৬ বৎসর। অতএব বর্ত্তমান শক হইতে ১৬৯২ শকে ১৩৭২ দিন বাড়িয়াছিল। উহাকে চান্দ্রমাস পরিমাণ ২৯·৫৩ দ্বারা ভাগ করিলে ১৩ অবশেষ থাকে। অর্থাৎ জানা গেল যে এ বৎসর যে যে মাসের যে যে দিন অমাবস্যা প্রতিপদ্ ইত্যাদি ঘটিয়াছে, ১৬৯২ শকের সেই সেই মাসের সেই সেই দিনের ১৩ দিন পরে অমাবস্যাদি হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ৩রা বৈশাখ প্রতিপদ্ গিয়াছে। সুতরাং ১৬৯২ শকে ১৩+৩ =১৬ বৈশাখ প্রতিপদ্ হইয়াছিল। ১৬ বৈশাখ প্রতিপদ্ তিথি পাইলেই সেই দিবসের নক্ষত্র ও যোগ মোটামুটী গণনা করিতে পারা যায়। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করা গেল না। যাহা হউক দেখা গেল যে,দুর্গাপঞ্চরাত্রির রচনাকাল সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নাই।

পুনশ্চ, অদ্ভুত রামায়ণের শেষে লেখা আছে,

সপ্তদশ শতাব্দ দ্বাদশ যুক্ত তাথে।
ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে॥
ঊনত্রিশ দিবস বারেতে বৃহস্পতি।

"শতাব্দ" লইয়া একটু গোলযোগ আছে। সম্ভবতঃ "শকাব্দ" লিখিতে ভ্রমক্রমে "শতাব্দ" হইয়াছে। যাহা হউক, গণনা দ্বারা জানা যায় যে, ১৭১২ শকাব্দের ২৯ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ও শুক্লপঞ্চমী ছিল। অতএব "শতাব্দ" লইয়া তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখি না। পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে "সম্বৎ" অব্দানুসারে বৎসর গণিত হইত কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক শতাব্দ অর্থে সম্বৎ, এ স্থলে কিছুতেই হইতে পারে না।

কিন্তু যদি জগদ্রাম ১৬৯২ শকে দুর্গাপঞ্চরাত্রি এবং ১৭১২ শকে অদ্ভুত রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তবে নিম্নের ভণিতাটীতে এরূপ লেখা কেন? দাসীতে উদ্ধৃত ভণিতাটী এই,—

পিতা জগদ্রাম মোর রাম পরায়ণ।
যেঁহ কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ॥
তা' পর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম।
দুর্গা প্রীতে কাব্য কৈলা অতি অনুপাম॥

যেরূপ আকারে "তা' পর" বাণীতে ছাপা হইয়াছে, তাহাতে "তা পর" অর্থে "তার পর" অর্থাৎ অদ্ভুত রামায়ণের পরে দুর্গাপঞ্চরাত্রি রচিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন। অথচ পূর্ব্বে ঐ ঐ পুস্তক প্রণয়নের যে কাল লিখিত আছে, তাহাতে দুর্গাপঞ্চরাত্রি প্রথমে লেখা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু "তা পর" অর্থে "তার অপর" বুঝা অন্যায় নহে। আমার বোধ হয় অদ্ভুত রামায়ণ খানি দুর্গাপঞ্চরাত্রি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্ততঃ জগদ্রামের পুত্র ঐরূপ মনে করিয়া প্রথমে প্রধান পুস্তকখানির নাম করিয়া থাকিবেন। যাঁহার নিকট ঐ দুই পুস্তক আছে, তিনি অনায়াসে এই অনুমানের সত্যাসত্য বিচার করিতে পারিবেন।

কিন্তু আরও একটা কথা আছে। বাণী পাঠে জানা যায় যে, জগদ্রাম রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এখন বর্ত্তমান। বিলাতি সাহেবেরা ৩ পুরুষে ১০০ বৎসর গণিয়া থাকেন। আমাদের দেশে ৩ পুরুষে ১০০ বৎসর হয় কি? অবশ্য এ সকল গণনা নিতান্ত স্থূল এবং অনেক পুরুষের সময় জানিতে গেলেই এরূপ গড় হিসাবে সময় কতকটা নিরূপণ করিতে পারা যায়। যাহা হউক নানা কারণে আমাদের দেশের লোকের মধ্য আয়ুষ্কাল ৩৩ বৎসর অপেক্ষা অনেক কম। ২৫ বৎসর ধরিলে বড় একটা দোষ হইবে না।* এই হিসাবে ৫ পুরুষে ১২৫ বৎসর থাকে। বলা বাহুল্য দুই চারি পুরুষ লইয়া এরূপ গণনা করিলে ভ্রম অধিক হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, এই হিসাবেও জগদ্রাম রায় ২৫০ বৎসরের পূর্ব্বে কবি না হইয়া একশ সওয়াশ বৎসরের পুরাতন হন!

শ্রীসত্যকুমার রায়।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্য বিবরণ।

দাসাশ্রম ভগবানের কৃপায় আর এক মাসকাল আপনার ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হইয়াছে। রোগী ও স্থায়ী আতুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে তথাপিও এখনও আরও কতকগুলি পুরুষের স্থান খালি আছে। দাসাশ্রমের বন্ধুগণ অনুগ্রহ করিয়া কোথাও কোন অনাথ আতুর দেখিলেই পাঠাইবার সুবিধা করিতে পারিলে আমাদিগকে সংবাদ দিবেন।

---

* জীবন বিমার কাগজ পত্র দেখিলেও কথাটার যাথার্থ বুঝা যাইবে।

বর্ত্তমান মাসের রোগীর সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। গোপালচন্দ্র নন্দী, ৩। সেবীয়া, ৪। স্বর্ণ, ৫। ফুলমণি, ৬। দুর্গামণি, ৭। নবদুর্গা, ৮। হীরামণি, ৯। রাজেশ্বরী, ১০। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ১১। ঈশ্বরী, ১২। রামচরণ, ১৩। কৃষ্ণভাবিনী, ১৪। কেদারনাথ সার মাতা, ১৫। সুমিত্রা, ১৬। অম্বিকা, ১৭। চিন্তামণি, ১৮। ভোলানাথ রজক।

গোপালচন্দ্র নন্দী আপাততঃ দাসাশ্রম হইতে বিদায় লইয়া কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছেন। হীরামণি—প্রায় আরোগ্যলাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। রাজেশ্বরী—আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—আরোগ্যলাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। রামচরণ—অবস্থা পুনরায় শোচনীয় হওয়ায় হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণভাবিনী—বয়স ৩০ বৎসর। নিবাস ফরাসডাঙ্গা। সাত বৎসর হইতে চক্ষুর পীড়া হইয়া অন্ধ হয়। কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ কোনও ধনবান দয়ালু ব্যক্তির সদাব্রতে প্রতিপালিত হইত। সম্প্রতি প্রায় ১২ দিন জ্বর ও নিউমোনিয়ায় ভোগার পর বাবু নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার কর্ত্তৃক দাসাশ্রমে আনীত হয়। পৃথিবীতে হতভাগিনীর আপনার বলিবার কেহ ছিল না। অশেষ প্রকারের যন্ত্রণাভোগ করিয়া অবশেষে ১২ই এপ্রেল ইহ সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। কেদারনাথ সার মাতা—নানাপ্রকার স্ত্রীরোগে অনেক দিন হইতে কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসার্থ এখানে তাঁহার পুত্র আনয়ন করেন, কিন্তু হাঁসপাতালের বড় বড় ডাক্তার রোগ একান্ত অসাধ্য বলাতে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। পাবনার বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচী ইঁহাকে প্রেরণ করেন। সুমিত্রা—জাতি কায়স্থ, বয়স ৭৫, অন্ধ, নিবাস ঢাকা জেলায়। অতি কষ্টে ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করিত। বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য যখন ঢাকায় যান তখন ইহাকে আনয়ন করেন। অম্বিকা—জাতি স্বর্ণবণিক, বয়স আন্দাজ ৮০, অন্ধ, ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে জীবনাতিপাত করিত। রাণিগঞ্জের দয়াশীল সেরেস্তাদার বাবু রজনীনাথ রায় বিশেষ উদ্যোগ করিয়া ইঁহাকে দাসাশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন। অম্বিকা এখানে আসিয়া প্রথমতঃ নাম পর্য্যন্ত বলিতে অস্বীকার করিয়াছিল। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে যেন একেবারে বিমর্ষ হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? দিবারাত্রি হরিনাম গান করিতেছে। চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়—রক্তে ব্রাহ্মণ, বয়স ২২ কতকগুলি ঝি ইহাকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পীড়িত দেখিয়া ইহাকে এখানে আনয়ন করে। রোগ জ্বর, কাশি ও উদরাময়। এখন একটু ভাল, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই।

ভোলানাথ রজক—জাতি ধোপা বয়স ৩৫।৩৬, নিবাস বটতলা। রোগ নানাপ্রকার। চিকিৎসার সুবিধা হইবে বলিয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

দানপ্রাপ্তি।

গত মাসে নিম্নলিখিত দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা দাতাগণকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

মোট আয়।

বাবু হরিপদ ঘোষাল মার্চ্চ ।০, বাবু কেদারনাথ দাস মার্চ্চ ।০, নবাব সৈয়দ আবদুল শোভান চৌধুরী, মার্চ্চ, এপ্রেল ২৲, বাবু দীনেশচন্দ্র চৌধুরী এপ্রেল ॥০, বাবু পিয়ারীমোহন ভড় মার্চ্চ ।০ বাবু নন্দলাল ঘোষ জানুয়ারী হইতে এপ্রেল ৪৲, বাবু রাজেন্দ্রনাথ শেঠ ফেব্রুয়ারী ১৲, কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ, মার্চ্চ ॥০, বাবু নন্দকুমার দত্ত মার্চ্চ ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র চন্দ্যোপাধ্যায় মার্চ্চ ১৲, A lady C/o babu Sreenath Das মার্চ্চ ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত মার্চ্চ ।০, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর মার্চ্চ ১৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু মার্চ্চ ॥০, ৪। ২ নং ছকুখানসামার মেস মার্চ্চ, এপ্রেল ৸০, ৪০।১ কলুটোলা মেস মার্চ্চ ॥০, বাবু বঙ্কবিহারী মিত্র মার্চ্চ ।০, বাবু অনাথনাথ দেব, মার্চ্চ এপ্রেল ২৲, বাবু পশুপতিনাথ বসু মার্চ্চ ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ মার্চ্চ ও এপ্রেল ২৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, এপ্রেল ১৲, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ ২৲, একজন ভদ্র মহিলার মাসিক চাঁদা ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী মার্চ্চ ১৲, মোট ২৫৲।

এককালীন দান।

শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী রায় চৌধুরাণী পাঙ্গাশিয়া ।১০, শ্রীমতী মহামায়া দাসী ১৲, কুমার ত্রিদেবেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মণঃ ১৲, আজিম উদ্দিন আহম্মদ ৩৲, বাবু দেবীশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১৲, বাবু উমাচরণ সেন ১৲, বাবু কুঞ্জবিহারী রায় ॥০, বাবু গিরিশচন্দ্র সেন ১৲, একজন বন্ধু ১৲, বাবু কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০, বাবু দীনবন্ধু সেন ১৲, বাবু গণেশচন্দ্র দাস ১৲, বাবু পার্ব্বতীনাথ ঘোষ ॥০, বাবু অশীতকুমার গাঙ্গুলী ১৲, বাবু কাশীশ্বর নাগ ॥০ বাবু কালীপ্রসন্ন গুহ ১৲, বঙ্কবিহারী বক্সী ১৲, বসন্তকুমার গুপ্ত ১৲, বাবু কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৲, Monk Khijari Esqr. ২৲, বাবু হরিপদ দত্ত ।০, বাবু কেদারনাথ মিত্র ॥০, Dr. S. P. Sharbadhikari ২৲, বাবু নীলমাধব বসু ১৲, বাবু শ্রীপতি দত্ত ।০, বাবু অমরেন্দ্রনাথ বসু ।০, বাবু হেমন্তকুমার পাল ।০, বাবু শিশিরকুমার ঘোষাল ৶০, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ৶০, বাবু ক্ষেত্রগোপাল সীকদার ।০, Mrs. G. Ghose ১৲, বাবু কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ।/০, ১৬ নং মুসলমানপাড়া মেস্ ।০, ১২৬ নং ওল্ডবৈঠকখানা মেস ।০, ৩০ নং ওল্ডবৈঠকখানা মেস ।/০, বাবু সূর্য্যকুমার রায় চৌধুরী ২৲, শ্রীমতী সুশীলা দাসী ২৲, বাবু হিরন্‌কুমার দাসগুপ্ত ৶০, বাবু রমেশচন্দ্র /০, বাবু ব্রজলাল বসু ৶০, বাবু কুঞ্জবিহারী রায় ॥০, বাবু শশীকুমার সেন ॥০, বাবু আশুতোষ দত্ত ॥০, বাবু নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৶০, বাবু গদাধর দাস ।০, বাবু বিভূতিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় /০, বাবু শশীভূষণ মল্লিক ॥০, ১০০।২ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট মেস ১৲, ৬৩।১ নং মেছুয়াবাজার মেস ॥০, বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম, এ ৫৲, ৪০ পঞ্চাননতলা মেস ।০, ৮।১ নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন মেস ॥০, Jetta Joychand Esqr. ২০৲, বাবু সত্যেন্দ্রনাথ আঢ্য ৶০, বাবু ইন্দুভূষণ মুস্তফী ৶০, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ১৲, ২০ নং পটুয়াটোলা মেস ॥০, বাবু মুকুন্দলাল রায় ১৲, ৪০।১ পঞ্চাননতলা মেস ।০, বাবু দুলালহরি ঘোষ ৸০, বাবু যতীন্দ্রমোহন দত্ত ।০, বাবু শরৎচন্দ্র রায় ।০, বাবু বনবিহারী বসু ।০, বাবু অপূর্ব্বকুমার গাঙ্গুলী ৶০, বাবু বসন্তকুমার রায় ৶০, ৪।১

ছকুখানসমার লেন মেস ৵০, বাবু জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৵০, বাবু রমেশচন্দ্র শীল ৵০, বাবু বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ৵০, ডাক্তার হীরালাল ঘোষ ৪৲, ৭ নং কাশিঘোষের লেন মেস ৷০, ৪২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট মেস ।০, ৬৫ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট মেস ।০, বাবু উপেন্দ্র মহাপাত্র ।০, বাবু নবগোপাল দত্ত ১৲, বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ ১৲, বাবু অধরচন্দ্র মজুমদার ৷০, K. G. Gupta Esq. পুত্রের আরোগ্যলাভ উপলক্ষে ১০৲, বাবু অনন্তরাম ঘোষ ২৲, বাবু রাধাচরণ সেন ১৲, শ্রীমতী উর্ম্মিলাবালা দেবী ৷০, বাবু দেবেন্দ্রকুমার রায় ।০, বাবু মোহিনীমোহন বসু ।০, শ্রীমতী শশীমুখী নাথ ১৷০, শ্রীমতী সুনীতিবালা রায় ১৲, ১৬৩ নং বাঙ্গালা বাজার মেস ৷৷০, শ্রীমতী অন্নদা গুপ্ত ২৲, ঢাকা ৩৲, শ্রীমতী সরলা দাস ৫৲, বাবু দুর্গাদাস রায় কনিষ্ঠ পুত্রের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫৲, নববিধান সমাজের একজন বন্ধু ১৲, ১২৩ নিক্ বাজার মেস ৷০, K. P. Bose Esq. ১৲, ৯০ পাতলা খাঁর গলি মেস ১৵৫, ২৯২ বাঙ্গালাবাজার মেস ।০, সোনারঙ্গ মেস ৷/০, ১৭ নং লালচাঁদ মেস ৷০, বাবু বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী ১৲, Lily cottage ২৲, বাবু দীনবন্ধু মজুমদার ৷০, ১৪ নং বালিটোলা মেস ৷০, ৮১ নং কামারন গড় মেস ।/০, দিক্‌বাজার মেস ১৲, সার্ভে বোর্ডিং ১৲, বাবু অদ্বৈতপ্রসাদ দে ২৲, A. B. Chatterji Esqr. ১৲, Justice Gurudas Baunerji ৫৲, বাবু ইন্দ্রচন্দ্র দুধোরিয়া ৫৲, ২৮১ পটুয়াটোলা মেস ।০ বাবু ভোলানাথ লাহিড়ী ১৲, বাবু বনমালী চক্রবর্ত্তী ৩৲, বাবু জানকীনাথ মজুমদার ১৲, বাবু গৌরীশঙ্কর দে ১৲, বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু ।০, শ্রীমতী সৌদামিনী গুহ ২৲, I. C. Bose Esqr. ১৲, বাবু রাজকুমার চট্টোপাধ্যায় ।০, বাবু শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।০, বাবু প্রমথনাথ চৌধুরী /০, বাবু যুগলকৃষ্ণ ত্রিপাঠী ৵০, বাবু গোপালচন্দ্র ত্রিবেদী ৵০, ১ নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট মেস ।০, A sympathiser ১৫১০ বাবু প্রিয়নাথ বসু ১, S. N. Dutt Esqr. ২৲, শ্রীমতী সুলোচনা সিংহ ৷০, বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, বাবু তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী ২৲, শ্রীমতী থাকমনি ঘোষ মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, শ্রীমান ভোলানাথ দাস ও বিপিনবিহারী সর্দ্দার কাটোয়া ১৷৷, বাবু বঙ্কবিহারী দাস ৷০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু বেণীমাধব মিত্র (সবজজ) ১৲, বাবু উপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম,এ ৪৲, হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রগণ বাবু বসন্তকুমার দাস দ্বারা সংগৃহীত ৷৷৵১০, বাবু ঈশানচন্দ্র দে ১৲, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী গুপ্তা পতিপুত্রের মঙ্গলার্থে ২৲, বাবু পার্ব্বতীচরণ সরকার ১৲, বাবু শ্রীনাথ বসু ।০, বাবু শ্রীপতিচরণ দত্ত ৷০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷০, বাবু হারাধন মিত্র ৷০, বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।০ বাবু গোঁসাইদাস দাস ।০, বাবু অমরনাথ রায় ।০, বাবু ঈশানচন্দ্র গুপ্ত ।, অনাথবন্ধু সমিতি ১৲, বাবু লক্ষণ সিংহ ১, ৬৩ নং হ্যারিসন রোড মেস ৷৵০ ছাত্রগণ ২৲, পাবনার জনৈক ভদ্রলোক ১৲, ছাত্রগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাঃ হেমচন্দ্র সরকার ৫৷৵০, মোট ১৭৬।/১৫ ।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

সুরাজমোহিনী ফণ্ডের সুদ ২০৲, বাটীভাড়া প্রাপ্ত ৫।/০, ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের বকেয়াবাকী ৷৵০, পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় ১১৵১০, দাসীর সাহায্য ৩০৷০, খুচরা দান সংগ্রহ ৩৷৷/১২৷৷, সুধীরচন্দ্র হালদারের জিম্মাশোধ ১৷৵০, মোট ৭২৷৷/২৷৷ ।

মোট আয়।

মাসিক চাঁদা ২৫৲, এককালিন দান ১৭৬৷/১৫, অন্যান্ত প্রকারে আয় ৭২৷৷/২৷৷, পূর্ব্ব-মাসের স্থিত ১৫৲, হিসাব গরমিল ১৷৷৶১৫, মোট আয় ২৯০৷৷৶১২৷৷।

ব্যয়।

খাই খরচ ৩৬৶২৷৷, রাঁধুনী ৭৲, চাকর ৬৸০, মেথর ৮৷/১০, বাটী ভাড়া ৫০৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৫২৷৵০, রোগী ও আতুরের গাড়ীভাড়া ১৪৲১০, দাহ খরচ ১২৲, ধোপা ২৷০, পূর্ব্ব-মাসের গচ্ছিত শোধ মাং ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ২৫৲, গচ্ছিত রাখা যায় মাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ২০৲, ঔষধ ২৲, ভুলক্রমে দুইবার জমা ৸৶০ আদায়কারীর খরচ ৩২৷৶১৫ বিবিধ ২৷৷৶১৫ খুচরা জমা মাঃ ম্যানেজার ৯৶৫ মোট খরচ ২৮৭৸/১২৷৷।

আয় ব্যয়।

মোট আয় ২৯০৷৷৶১২৷৷ মোট ব্যয় ২৮৭৸/১২৷৷ মোট হস্তে স্থিত ২৸/০

বিশেষ ধন্যবাদ।

এবার K. G. Gupta Esqr. কে তাঁহার ১০৲ দানের জন্য ও বাবু বিপিনবিহারী রায় মানিকদহের জমিদারকে তাঁহার ঘড়ি দানের জন্য ও রাণিগঞ্জের সেরেস্তাদার বাবু রজনীনাথ রায়কে তাঁহার রোগী পাঠাইবার জন্য ক্লেশ স্বীকারে আমরা অন্তরের সহিত বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

"দাসী"র মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

১০৩৯ বঙ্কুবিহারী বসু ১৲, ১৮৬১ বঙ্কুবিহারী দত্ত ১৲, ১৮০১ অমৃতনাথ মুখোপাধ্যায় ২৲, ২৯ নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ২৲, ৬০ শ্রীমতী মৃনালিনী দেবী ২৲, ১৫৬৯ তারিণীশঙ্কর ঠাকুর ২৲, ১৯১১ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ১৪৮৩ ডাক্তার তারিণীচরণ পাল ২৲, ১৯১২ শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲, ১৩১২ অতুলচন্দ্র বসু ২৲, ১৩৬০ শ্রীমতী অমুজানন্দিনী রায় ২৲, ১৩২২ রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর ২৲, ১৭৮৯ বিপিনবিহারী রায়চৌধুরী ২৲, ১৬৮০ যোগেন্দ্রনাথ ঘটক ২৲, ১২৪১ ডাক্তার কেদারনাথ দত্ত ২৲, ৫৪ মিস্ লাবণ্যপ্রভা বসু ২৲, ৮৯৪ মিস্ হেমপ্রভা বসু ২৲, ১১৭১ মহেন্দ্রনারায়ণ সেন ২৲, ১৩৫ গৌরিলাল রায় ২৲, ১৩৭ কাকিনিয়া ব্রাহ্মসমাজ ২৲, ১৪০৯ সুরেন্দ্রনাথ সরকার ২৲, ২০৬ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ২২ কুমুদবন্ধু বসু ২৲, ১৬০৯ হরিপদ সামন্ত ২৲, ৯৩২ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲, ৬২৮ সতীশচন্দ্র সিংহ (সাবেক) ১৷৷০, ১০১৬ বিষ্ণুপদ ঘোষাল ২৲, ১৫২ শ্রীমতী সুশীলা বসু ২৲, ১৭৫৯ কুঞ্জবিহারী সেন ২৲, ৪৭১ ললিতমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ১৮৯২ সূর্য্যকুমার সেন ২৲, ১৮৯৭ L. M. Paulit ২৲, ১৮৯৮ ডাঃ মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র ২৲, ৮৯৫ পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় ২৲, ১৮৯১ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ২৲, ১৯০০ শ্রীমতী সরলতা ঘোষ ২৲, ১৯০১ কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র ২৲, ১৯০২ ভুবনেশ্বর মিত্র ২৲, ১১৯৫ বিজয়সিংহ দুধোরিয়া ২৲, ১৯০৩ মুনিলাল বোথরা ২৲, ৪০৩ শরচ্চন্দ্র গোস্বামী ১৲, ১৯২ মুলচাঁদ রায় ২৲, ১১৩৭ পলমার্থান খ্রীষ্টীয়ান ২৲, ৮০৩ হেমচন্দ্র ঘোষ ২৲, ১১০১ নারায়ণচন্দ্র সরকার ১৲, ১৯১৩ যোগেশপ্রসন্ন ভাদুড়ি ২৲, ১৭৯৪ হরিচরণ সরকার ২৲, ১১৫৫ বামাচরণ ঘোষ ১৲, ১১৫৩ হিরালাল ঘোষ ২৲, ১৭৬৫ রাধিকানাথ চট্টোপাধ্যায় ১৲, ১৭৯৮ করুণাদাস বসু ২৲, ১৪৯৩ নগেন্দ্রনাথ মিত্র ২৲, ১৪৪২ অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲, ১৪৯৯ মহিতচন্দ্র বসু ২৲, ১৯১৪ নবকৃষ্ণ গুহ ১৲, ১৯১৫ কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় ১৲, ১১৩২ অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৲, ১২৫৫ প্রসাদদাস বড়াল ২৲, ১৩৪০ নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ২৲, ১৪৩১ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲, ৮৮৮ সম্পাদক পরিবহিতসাধিনী সভা ২৲, ১১০৫ বিনয়ভূষণ সেন ১৲, ১০৪২ ডাঃ নন্দলাল ঘোষ ১৲, ২১০।১ শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী রায় ২৲, ৯০১ যোগেশচন্দ্র দত্ত ২৲, ১৮৩৬ উপেন্দ্রনারায়ণ দে ২৲, ৮০৪ আনন্দচন্দ্র মিত্র ২৲, ১৫১৭ ডাঃ আদ্যনাথ বসু ২৲, ১৯১৬ অন্নদাপ্রসাদ মিত্র ২৲, ১৩৬৯ শ্রীমতী অরুণময়ী দাসী ২৲, ১২৯৭ শ্রীমতী ক্ষিরোদবাসিনী রায় ২৲, ১৬৭২ কালিদাস রায় চৌধুরী ২৲, ১৯১৭ Mother, C/o of Moti Lall Bose ১৲, ১৯১৮ জগৎকিশোর আচার্য্য ২৲, ১১৭০ শরৎচন্দ্র খাঁ ২৲, ১৮১২ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত ২৲, ১২৫৪ ডাঃ ক্ষিরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৲, ১৬৭৬ দেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জ ২৲, ১৫৯৬ যোগেন্দ্রনাথ শ্রীমানী ২৲, ১১৫০ প্রমথনাথ কর ২৲, ১৮১৭ শ্রীমতী মহামায়া দেবী ২৲, ১৪১৪ অমৃতলাল রায় ১৲, ১০৭২ পূর্ণচন্দ্র দত্ত ২৲, ৮৯৭ আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৲, ১৭৫২ কেদারনাথ মল্লিক ২৲, ১৬৮৪ বেচারাম মল্লিক ২৲, ১০২৪ অন্নদাপ্রসাদ মল্লিক ২৲, ১৪৫৭ প্রমথলাল সেন ১৲, ১৯১৯ অক্ষয়কুমার সেন ১৲, ১৬৮৬ বেনীমাধব ভড় ২৲, ১৯২০ কুমারকৃষ্ণ দত্ত ২৲, ৮৯৬ ডাঃ কেদারনাথ দাস ২৲, ১০৩১ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার ২৲, ১৭৩৪ বরদাকান্ত বসু চৌধুরী ২৲, ১২৪৮ রায় গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর ২৲, ৬৩১ উমেশচন্দ্র পাল ১৲, ১২১০ সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী ২৲।

ক্রমশঃ।

সৌর জগতের গতি।

এই নানা বর্ণবিশিষ্ট, বহুবিধ রত্ন সন্নিভ, দীপ্তিমতী তারকাদি জ্যোতিষ্ক প্রত্যুপ্ত সুশোভন বাসব-সভা-বিতানের বিন্যাস-ভঙ্গী কি চিরকাল সমভাবে রহিয়াছে? এবং উত্তরকালেও কি এই ভাব পরিলক্ষিত হইবে? নিশীথিনীর ললাম-ভূত শুভ্রকান্তি মৃগব্যাধ কি চিরকাল প্রশ্বনামা বিশ্বকদ্রু সমভিব্যাহারে যজ্ঞরূপ মৃগানুসারী হইয়া রহিয়াছে? ঐ কোহিনুর-বিনিন্দিত শ্বেতাভ-পরিপ্লুত অভিজিৎ কি সৃষ্ট্যবধি মরালক সমীপে শৃঙ্গাটকের মধ্যে অনন্তরূপে বিরাজ করিতেছে? দিগ্‌দক্ষিণার কবরীকুন্দ, সূর্য্যসখা* শরৎসূচক অগস্ত্য কি পূর্ব্বাবধি পোতোপরি সমাহিত আছেন? পদ্মরাগ দ্যুতিমতী বৃষভাসনা রোহিণী কি কোন কালে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করেন না? নষ্টসপ্তমিকা,† ষণ্ময়ী কুমার ধাত্রী কৃত্তিকা কি কোনরূপে বিচলিতা হন না? সারুন্ধতী বশিষ্টাদি সপ্তর্ষি কি শিশুমার পুচ্ছাধিষ্ঠিত ঔত্তানপাদ পরিতঃ সমভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন? হরিচরণ ধ্যানের ন্যায় একান্ত কেন্দ্রসেবাতৎপরতা প্রযুক্ত যিনি প্রথিম মহিম ধ্রুবনাম ধারণ করিয়াছেন তাঁহার কি আবহমান্ কাল ধ্রুবত্ব থাকে? ঐ গগনাঙ্গনার কল্হার রূপিনী, দ্বিবেণী, দুগ্ধফেণসম স্বচ্ছতোয়া মন্দাকিনী কূলে সিকতাস্থলে স্তূপীকৃতা হীরককণা কি পূর্ব্বাপর সমভাবে সঞ্চীভূত রহিয়াছে?

আপাততঃ শ্রবণ মাত্রই এবম্ভূত প্রশ্ন সকল নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ

---

* অভ্রভেদী বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করিতে সূর্য্যদেবের কষ্ট হয় তজ্জন্য তিনি বিন্ধ্যের গুরু অগস্ত্যকে অনুরোধ করেন, যে গিরিবরকে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইতে বলেন। অগস্ত্যকে দর্শন করিবার মাত্র বিন্ধ্য দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। মহর্ষি বলিলেন, যাবৎ না আমি দক্ষিণ দেশ হইতে আসি তাবৎ এই অবস্থায় থাক। অগস্ত্য আর আসিলেন না, বিন্ধ্যও গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন ভয়ে উঠিতে পারিতেছেন না।

† কৃত্তিকাতে পূর্ব্বে ৭ তারা ছিল; একের লোপ হইয়াছে।

হইবে। কারণ সামান্যতঃ সকলেই জানেন যে রবি, চন্দ্র, পঞ্চতারাগ্রহ, তদূর্দ্ধে বরুণ, ইন্দ্র, ইহাদিগের অনুচর উপগ্রহ সকল ভূমি ভৌমের অন্তর্গত খমেখলার রত্নীভূত নবাবিষ্কৃত বিশতাধিক ক্ষুদ্রগ্রহ, অসীম শ্যামসাগরে ভাসমান সকচ, বিকচ ধূমকেতুরূপী সৌরজগতের অপ্রতিম অতিথিগণ এবং অতত্ত্বদর্শীর নেত্রে ইন্দ্রালয়ের কৃতসংস্কার বর্ত্তিকার অলস্ত দশান্তরূপে প্রতিভাত খধূপ, সেরম্মদ অশনি প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ আকাশপথে বিচরণ করিতেছে এবং তজ্জন্যই এ সমস্ত খেটপদ বাচ্য। কিন্তু তারাগণের গতি নাই, তজ্জন্য এ সকল জ্যোতিষ্কদিগকে স্থিরতারা বলে। অতএব কে না বলিবেন যে যেখানকার যে তারা সে সেইখানেই চিরকাল আছে? সত্য বটে শত বর্ষে সহস্র অযুত লক্ষ বর্ষেও তারাদিগের গতি চর্ম্মচক্ষে অনুভূত হয় না। গণেশ দৈবজ্ঞ নভোমণ্ডলে যে সকল তারা যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, বরাহ মিহিরও আকাশের তদবস্থা অবলোকন করিয়া থাকিবেন। আর্য্যভটের গগন ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষ প্রণেতা গর্গের গগন প্রায় একভাবাপন্ন ছিল। অদ্য নভোমণ্ডলে তারানিচয় যে ভাবে অবস্থিত দেখা যাইতেছে, হিপ্পারকস্ বা স্বলমির আকাশের দৃশ্য প্রায় এইরূপ ছিল।

সত্য বটে বশিষ্ঠাদি ঋষি এবং ভাস্করাদি আচার্য্যগণ কেবল নলিকাদি যন্ত্রাশ্রয়ে তারাগণের শত বার্ষিকী বা সহস্র বার্ষিকী গতি অনুভূত করিতে পারিতেন না; পরন্ত এক্ষণে ইউরোপীয় ও আমেরিকীয় বেধালয়স্থ অপূর্ব্ব, অনুপম, ও বিচিত্র কৌশলে বিরচিত দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, বর্ণবীক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যোপযোগী বিবিধ যন্ত্র সহকারে তারা সকলের বৎসরে বা দশবৎসর মধ্যে যে স্থানচ্যুতি ঘটে তাহা অতি সূক্ষ্মরূপে পরিমিত হইয়া থাকে।

এই প্রস্তাবে শত সহস্র বা অযুত বর্ষে নভোমণ্ডলের ভাব ভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের পরিসীমা দেখিবার অভিপ্রায় নহে। দীর্ঘতর কালে ভসন্নিবেশে কি মহতী অনবস্থিতি ঘটে, তাহাই সমালোচিত হইবে। শৈলস্তর নিহিত প্রস্তরীভূত জীবাস্থি পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্ অবধারিত করিয়াছেন যে, ভগবতী ভূতধাত্রী দশলক্ষ বৎসরাবধি জীবের বাসোপযোগিনী হইয়াছেন। এই নিযুত বর্ষপরিমিত সুদীর্ঘকালে নভস্তলে সম্ভাব্য বিপর্য্যয়ের তত্ত্বানুসন্ধান অতীব রহস্যের বিষয়। মৃন্ময়ীর স্তরনির্ম্মাণকালমধ্যে খগোলে যে সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা অবলম্বিষ্যমান্ যুক্তি-সমূহ দ্বারা প্রচুর পরিমাণে প্রমাণীকৃত হইবে। এই অখণ্ড দণ্ডায়মান কালবৎ প্রবল নিযুত বর্ষ দ্বারা

অবনীপৃষ্ঠের যদ্রূপ বিস্ময়াবহ রূপান্তর নিষ্পাদিত হইয়াছে, তারাসংস্থানেও তদ্রূপ নিদারুণ পরিবর্ত্তন সমাপন্ন হইয়াছে।

মনে কর কোন তারা বা অন্য কোন দিব্যবিগ্রহ অবিরত ভাবে প্রতি সেকণ্ডে বিংশতি মাইল পরিমাণে প্রধাবিত হয়। প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল তারা পক্ষে আদর্শ-গতি বলিয়া ধরা যাইতে পারে; কারণ অনেক তারারই এতাবতী গতি; এবং অনেকের গতি ২০ মাইলেরও অধিক; পৃথিবীর গতি অবশ্য এত অধিক নহে। বহু তারার গতি ইহার দ্বিগুণও আছে। জ্যোতি-র্ব্বিদ্‌গণের সুপরিচিত গ্রুমব্রিজের ১৮৩০ সংখ্যক তারার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ মাইল! অতএব ২০ মাইলকে বক্ষ্যমান গণিতের ভিত্তি স্বরূপ ধরিলে অসঙ্গত অনুমান দোষে দূষিত হইতে হইবে না। এই মূল ধরিয়া তত্ত্বানু-সন্ধান করিলে পরিদৃশ্যমান নভোমণ্ডলে অতি দীর্ঘকালে কি পরিমাণে রূপান্তর ঘটে তাহার পর্য্যাপ্ত রূপ আসন্ন ফল লাভ হইতে পারে। এক সেকেণ্ডে ২০ মাইল, মিনিটে ১২০০ মাইল, ঘণ্টায় ৭২,০০০ মাইল অহো-রাত্রে ১৭,২৮,০০০ মাইল এবং বর্ষে ৬৩০৭,২০,০০০ মাইল; অতএব স্বীকৃত গতি অনুসারে গণিত করিলে ১০ লক্ষ বর্ষে তারার গতি ষষ্ঠ সাগর সংখ্যক (৬০০০০০০০০০০০০০০) মাইল হয়।

অতি দীর্ঘ কালান্তর তারাগণের যথাক্রমভাবে প্রত্যক্ষীভূত হওয়া সম্বন্ধে এরূপ গণিত প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক প্রায় সমালোচনা হয় না। বিগত দশলক্ষ বর্ষ মধ্যে নভোমণ্ডল যে অত্যন্ত রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা উক্ত গণিতাগত অঙ্ক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। যে যে তারার গতির সমালোচনা করা যায় সেই সেই তারা পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে তাহা জানিতে পারিলে উপস্থিত তত্ত্বের দূরতর-গূঢ়তর প্রদেশে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। কিন্তু অনেক স্থলে এই অভিবাঞ্ছিত মৌলিক উপাদানটি অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। যাহা হউক অন্ততঃ উদাহরণ জন্য একটী তারার দূরত্ব পাইলেও তদাশ্রয়ে বিষয়টি বিশদীকৃত করা যাইতে পারে। যথাসাধ্য বেধসহকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে তারাগণের মধ্যে উত্তর খগোলের মরালকের ৬১ সংখ্যক তারা পৃথিবী সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট; যদিও এই তারার দূরত্ব বিষয়ে জ্যোতির্ব্বিদদিগের মধ্যে ঐক্যমত দৃষ্ট হয় না, তথাপি তারাটী যে সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকৃষ্ট তাহার সংশয় নাই। মরালকের ৬১র দূরত্ব পঞ্চ পদ্ম (৫০০০০০০০০০০০০০০) পরিমিত মাইল ধরিলে অসঙ্গত বোধ হয় না। এতাবৎ দূরত্বের সঙ্গতি

স্বীকার পূর্ব্বক প্রস্তাব যুক্তি প্রয়োগ করা যাউক। এখন দেখুন যদি কোন তারার প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল গতি হয়, তবে দশলক্ষ বর্ষ মধ্যে সৌর-জগৎ হইতে মরালকের ৬১র যত দূরত্ব তারা তাহার দ্বাদশ গুণ দূরে গিয়া পড়িবে। এ স্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে তারার গতি নিরূপণ কালে সৌর-জগৎ গতিহীন বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। সৌরজগতের গতি বস্তুতঃ যদি তারার গতির সমান ও সমান্তর হয়, এবং সৌরজগতের গতি জানা না থাকে, তবে তারার গতি নিদ্ধারণ করা অসাধ্য। অতএব এ স্থলে সৌরজগৎকে স্থির কল্পনা করিয়া তারার সাপেক্ষিক গতিমান লইয়া বিচার করা যাইতেছে।

সূর্য্য হইতে তারা যতদূরে আছে, তথা হইতে যদি ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ গুণ অন্তরে চলিয়া যায়, তবে ঐ তারার দৃশ্যমান জ্যোতিতে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিবে। সূর্য্য হইতে তারা যদি অবক্র ভাবে অপসৃত হয় তবে জ্যোতিষ্ক-দ্বয়ের ব্যবধান ১৩ : ১ অনুপাত অনুসারে বৃদ্ধি পাইবে; আর যদি বিপরীত দিকে অর্থাৎ সূর্য্যাভিমুখে আইসে, তবে পৃথিবী হইতে উহার দূরত্ব অপেক্ষা-কৃত ন্যূন হইবে এবং সৌরজগৎ হইতে উহার দূরত্ব ১১ : ১ অনুপাতী হইবে; পক্ষান্তরে তারা যদি স্বস্থান হইতে সৌরজগতে লম্বরেখানুক্রমে পর্য্যটন করে, তবে তারা ও সূর্য্যের ব্যবধান পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বাদশগুণে অধিক হইবে।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তারা যে দিকে চলুক না কেন, দশ লক্ষ বর্ষান্তরে সৌরজগৎ হইতে উহার দূরত্ব যদিও ঠিক দ্বাদশ গুণে না হউক, প্রায় দ্বাদশ গুণে বর্দ্ধিত হইবে; তবে পরিদৃশ্যমান নভোমণ্ডলের স্থায়িত্ব আর কি প্রকারে রক্ষা পাইবে? দৃষ্টিবিজ্ঞানের নিয়মই এই যে, আলোক দূরত্বের বর্গের বিলোমানুপাতী। আর অন্তর যদি দ্বিগুণ হয়, তবে উহার ঔজ্জ্বল্যের পাদ মাত্র দেখা যাইবে। তারা যদি তিন গুণ দূরে চলিয়া যায়, তবে দীপ্তির নবাংশের একাংশ মাত্র দৃষ্টিগোচর হইবে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, তারা এক্ষণে যতদূরে আছে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট কালক্রমে বার গুণ দূরে গিয়া পড়ে, তবে উহার আদ্যালোকের একশত চোয়াল্লিষ ($\frac{1}{144}$) ভাগের এক ভাগ থাকিবে; অর্থাৎ দেখা যাইবে।

এই যুক্তি সহকারে প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে তারাকে এক্ষণে অন্ত-রীক্ষের কোন স্থানে দেখা যাইতেছে সে যদি প্রাগুক্ত কল্পিত বেগ অনুসারে অবিচ্ছেদে দশ লক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত কোন দিকে অপসৃত হইতে থাকে, তবে তাহার আদ্যাদীপ্তি ১৪৪ অংশে অল্পীভূতা হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য যে,

উজ্জ্বলতার এতাবতী অপচিতি নিবন্ধন বহু সংখ্যক তারা যে সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টি-গোচর হইবে তাহার সন্দেহ নাই। অপিচ আলোকের এতাদৃশী ক্ষতি জন্য কেবল অসাধারণ দীপ্তিমতী তারাগণ আলোকবিন্দুমাত্রে পরিণত হইয়া যন্ত্রনেত্রে প্রতিভাত হইতে পারিবে।

এতাবতী বিচারণা দ্বারা কতিপয় অপূর্ব্বফল লাভ হইতেছে। তারাগণের স্বকীয়া গতির মধ্যম বেগমান মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং প্রমেয় অদোষদুষ্ট। এখন দেখুন, যদি কোন তারাদ্বয় যুগলরূপে প্রতিভাত হয়, অথচ সে দুইটী কোন প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত সংশ্লিষ্ট না হয় তবে এতাবৎ সুদীর্ঘকালে (১০ লক্ষ বর্ষে) তাহাদিগের প্রণয় পাশ অবশ্য ছিন্ন হইবে অর্থাৎ তাহাদের যুগল ভাব, সন্নিকর্ষতা কোনরূপে রক্ষা পাইবে না। ইহার একটি সুসঙ্গত উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

অনেকগুলি জাহাজ স্ব স্ব বন্দরাভিমুখে গমন করিতেছে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক খানি জাহাজ অপর কয়েক খানি জাহাজকে দেখিতে পাইল; কিন্তু যখন কোন জাহাজই স্থির নাই সকলেই চলিতেছে তখন তাহাদের পরস্পরের অন্তর ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে, এবং দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সে গুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িবে, এবং অচিরে আর কোন খানিই ক্ষিতিজের ঊর্দ্ধে দেখা যাইবে না, অথচ তৎকাল মধ্যে কতিপয় অপর পোত দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইবে।

ভূতত্ত্ববিৎ পৃথিবীর স্তর নির্ম্মাণরূপ দুর্বিজ্ঞেয় প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহ সম্পাদনার্থে যে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে তাহার যে পরিমাণের পরিচয় দেন, তাহা ধ্যানপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত যুক্তি প্রয়োগ করিলে, প্রতিপন্ন হইবে যে, শূন্য সাগরে তারা তরি সমূহ নঙ্গর করা নহে,—তাহারা অনবরত চলিতেছে,—তাহাদের অপায়ী ভাব। যদিও তর্কের সৌকার্য্যার্থে সংখ্যা-বিশেষ পরিগৃহীত হইয়াছে, এবং সময় বা অবস্থা বিশেষ স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি আগামী দশ লক্ষ বর্ষ মধ্যে যে তারাময় গগনাজিরে যে মহান্ বিপর্য্যয় ঘটিবে তাহা যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা সুনিশ্চিত হইতেছে। সদৃশী যুক্তি আশ্রয়ে অনায়াসে উপলব্ধি হইবে যে দশ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বের খচিত্র বর্ত্তমান খচিত্র অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। সেই সুদূর-অতিবাহিত কালে যখন অঙ্গারে পরিণত হইবার পূর্ব্বে ফলপুষ্পভারাবনত সুবিশাল বৃক্ষময় অরণ্য সকল ভূপৃষ্ঠে বিরাজিত ছিল, যদি কল্পনা প্রভাবে সেই কালে কেহ

উপনীত হন, তবে তিনি এই সুনীল-গগন-রঞ্জনা তারা রত্নের মধ্যে কতিপয় মাত্র দেখিতে পান্ কি না সন্দেহ। অর্থাৎ অঙ্গার যখন জীবন্ত বৃক্ষরূপে বিদ্যমান ছিল, তখন যে কোন তারা লক্ষিত হইত না, তাহা নহে, বরং ইহাই সম্ভব্য যে এখন আকাশ যেমন বিবিধ তারারত্নে বিভূষিত তখনও তেমনই অলঙ্কৃত ছিল; কিন্তু এখনকার আকাশের যে ভাব ভঙ্গি তখনকার আকাশের সে ভাব ভঙ্গি ছিল না, এখন যে সকল তারা দেখা যাইতেছে, তখন সে সকল তারা দেখা যাইত না। ভূতত্ত্ববিশারদদিগের কালকলনা অনুসারে অঙ্গারারণ্যের অবস্থিতি কাল দশ লক্ষ বর্ষাপেক্ষা প্রাচীন-তর। দশ লক্ষ বর্ষেরও পূর্ব্বে অরণ্যানী যে অঙ্গারভূত হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না, কারণ এ পূর্ব্বপক্ষের বিরুদ্ধে কোন তথ্য দৃষ্ট হয় না, কাল যতই পুরাতন হইবে, দৃশ্যমান দিব্যবিগ্রহে ততই রূপান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমরা এই মাত্র জানি যে অতি পুরাতন কালের তারাগণ বর্ত্তমান কালের তারাগণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিসদৃশ; এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের সম্বন্ধে আর কিছুই জানা নাই। অনেক দৌরবীক্ষণিক নীহারিকার ও তারাসংঘাতের দূরত্ব তারার মধ্যম দূরত্ব অপেক্ষা অত্যধিক; তজ্জন্য অনুমান হয় যে বহু লক্ষ বর্ষান্তরেও তাহাদিগের কান্তি, বিন্যাস ও আকারে এতাদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই যে তারা নিরীক্ষণে চতুর চক্ষে তাহাদিগের বিম্ব পতিত হইলে তাহার দর্শকের অনভিজ্ঞাত থাকিতে পারে। ভূবাসিদিগের সম্বন্ধে তারাগণের বাহ্য প্রকৃতি গত যে আত্যন্তিক অন্যথা ভাব ঘটে তাহার কোন সংশয় নাই। কিন্তু জীবলোকের পরম কল্যাণ নিধান সবিত্র মণ্ডলের কোন রূপ ব্যত্যয় উপলভ্য হয় না। বরং তদানীন্তন অঙ্গারাত্মক উদ্ভিদের বৃদ্ধি-বাহুল্য দর্শনে প্রতীয়মান হইতেছে যে তেজোময় ভগবান্ মরীচিমালী চির-কাল সমভাবে তাপ ও আলোক বিতরণ করিতেছেন। বিলুপ্ত প্রাণীকুলের চক্ষুষ্মত্তাই এ তথ্যের বিচিত্র উদাহরণ।

বস্তুতঃ অতীত যুগের কতিপয় প্রস্তরীভূত জন্তুর দর্শনেন্দ্রিয়ের শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ভূতত্ত্ব বিষয়ক কৌতুকাগারে প্রবিষ্ট হইয়া কিংকৃকলাশ * নামা পাষাণীভূত ত্বগাস্থিক জন্তুর বিষালাক্ষি নিরীক্ষণ করিলে

* কিংকৃকলাশ শব্দটী গড়া। ইহা কিংশুক কিন্নর ইত্যাদীয় জাতীয়। অর্থ কৃকলাশ কি বস্তু। ক্রোড়পত্রে ইহার ইউরোপীয় নাম পাইবেন।

অনির্ব্বচনীয় চিত্তবিনোদ অনুভূত হয়। এই অপূর্ব্ব দর্শনেন্দ্রিয়ে, একটি চমৎকার অস্থিময় যন্ত্র আছে। বোধ হয় নেত্রকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত অস্থিময় যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব ঝসোরগের অনুপম দর্শনেন্দ্রিয়ের আত্যন্তিকী শক্তি ও উপযোগিতার অবশ্যই কোন বিশিষ্ট কারণ থাকিবে; সে কারণ যে কি তাহা বলা অসাধ্য, সুতরাং তাহা কেবল কল্পনার বিষয়। অদ্ভুত দৃগ্‌যন্ত্র সম্পন্ন এই অপূর্ব্ব জীব সম্বন্ধে নভোমণ্ডল না জানি কি বিচিত্র ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। এই বিরূপাক্ষ যে দিবা শোভা সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া তদীয় পর্য্যালোচনায় বিরত থাকিত ইহা সম্ভাব্য বোধ হয় না; তাহার পক্ষে জীবিকান্বেষণরূপ যে গুরুতর ব্যাপার তাহাতেই অবশ্য ব্যাপৃত থাকিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের সফলতা লাভ করিত। অবকাশ অনুসারে কিংকৃকলাশ একবার উন্নেত্র হইলে আকাশের কি অনুপম সৌন্দর্য্য উপভোগ করিত!

প্রভাকর অধুনাতনী মেদিনীতে যে পরিমাণে আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, কিংকৃকলাশের সেই পুরাতনী পৃথ্বীতে সেই পরিমাণেই অস্মো-দকোপম জীবের ঐ উভয়বিধ উপজীব্য বিতরণ করিতেন। অবশ্য রবিমণ্ডল তৎকালে কিঞ্চিৎ বৃহত্তর ছিল, কিন্তু দীপ্তির আধিক্যের সম্ভাবনা ছিল না; স্থূলতঃ ভাস্কর এখন যেমন তেজস্বান তখনও তেমনি তেজস্বান্ ছিলেন; কিন্তু এখানকার মণ্ডলের মত তখনকার মণ্ডল দীপ্তিমান যন্ত্রে (Photometerএ) ঠিক সমান উজ্জ্বল দেখাইবার সম্ভাবনা ছিল না। এস্থলে অযুক্তিভাস সত্ত্বে ইহা বিশ্বাসের অভূমি নহে যে চণ্ডরশ্মির তাপের ক্রমাপচিতি হইলেও তদীয় কিরণকলাপ কিঞ্চিৎ তীব্রভাবে বিস্ফুরিত হইয়া উজ্জ্বলতর এবং উষ্ণতর হইতেছে। ফলিতার্থ এই যে সৌরমণ্ডলের বাহ্যিক লক্ষণে কোন বিশিষ্ট ভেদ ছিল এরূপ মনে করিবার কিছুমাত্র কারণ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং আমরা যদ্রূপ দেখিতেছি কিংকৃকলাশও তদ্রূপ দেখিয়া থাকিবে।

সেই সুদূর অতিবাহিত যুগে চারুকান্তি কলানিধির কলা সকল প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যথাক্রমে দৃষ্টিগোচর হইত। পৃথিবীর এই চির সুহৃদ্ পূর্ব্বকালে যে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটে ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই, এবং তন্নিবন্ধন চন্দ্রমণ্ডল কিঞ্চিৎ বৃহত্তর দেখাইত এবং চান্দ্রমাসের পরিমাণও কিঞ্চিন্ন্যূন ছিল। কিংকৃকলাশ যুগে অর্থাৎ ত্রেতায় চতুর্থ পাদে চন্দ্রমণ্ডলের আলামুখ পর্ব্বত সকলের বহ্ন্যুদ্গীরণী শক্তি নিঃশেষিতা হয় নাই। তত্রত্য

আগ্নেয়গিরি সকল এখন সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। জাজ্বল্যমান গিরিশোভিত দৌরবীক্ষণিক চান্দ্রচিত্র না জানি কতই অপরূপ দেখাইত!

তারাগ্রহ সম্বন্ধে অধুনাতন্ আর প্রাক্‌তন্ কালে কোন নির্দ্দেশই ভেদ ছিল না। লাবণ্যময়ী উষার প্রসাধনভূত শুভ্রকান্তি শুক্র এখন যেমন প্রত্যূষে পূর্ব্ব আকাশে উদিত হইয়া বিবিধরূপে রূপান্তর ধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎ কালানন্তর নিশামুখে পশ্চিম কপালে "দিক্ সুন্দরী বদন চন্দন বিন্দু" রূপে আবার আবির্ভূত হন, তখনও তাঁহার উদয় অস্ত ইত্যাদি ভাব এইরূপেই ঘটিত। এক্ষণে জ্যোতির্বীর নেত্রে বার্হস্পত্য গগন যেরূপে প্রকটিত হয়, প্রাক্‌কালে সেইরূপেই প্রতিভাত হইত। সেই চন্দ্র চতুষ্টয়, সেই মেখলাবলী, সেই কক্ষা কোনটিতেই সাদৃশ্যের অভাব লক্ষিত হইত না। শনৈশ্চর জগতে সামান্য বিষয়ক ক্রমপরিবর্ত্তন সম্ভাব্য; তদীয় উষ্ণীষের ভিন্ন ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ত্রেতাবসানে অরুণাভ মঙ্গল কি অবস্থাপন্ন ছিলেন, তাহার ভাব মনোমধ্যে উদিত হয় না। বোধ হয় ভৌমবিম্ব আমরা যেমন দেখিতেছি পূর্ব্বে তেমন ছিল না। তদীয় কক্ষায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শিশু এবং শিশু-সৌন্দর্য্য।

প্রীতিভাজনেষু।

তোমার উপর রাগ করিয়া এতদিন চিঠি লিখি নাই; তাহার কারণ ছিল। তোমার ছেলে জন্মিয়াছে, তুমি এতদিন তাহা আমাকে জানাও নাই; তুমি স্বার্থপর, তোমাদের কোলে যে আশীর্ব্বাদ-কুসুমটী পতিত হইয়াছে, তাহার উপর কি আমার কিঞ্চিন্মাত্রও দাবী ছিল না—তাই মনে করিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে চিঠিপত্র বন্ধ করিব। কিন্তু, আর পারিতেছি না, এখন আপন মান আপনি ভাঙ্গিতে হইল। তোমাকে চাহিয়া নহে, ওই শিশুটিকে চাহিয়া! তোমাদের দুইটি হৃদয়ের মধ্যস্থলে অভিনব আনন্দবন্ধনের মত, স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যস্থলে রহস্যময় ছায়াপথের মত, যে মায়া-কুসুমটি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বরূপ কল্পনা করিয়া আমার কুতূহল এমন বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, পরিশেষে আমার সমস্ত অভিমান-বুদ্ধি

তাহাতে ভাসিয়া গিয়াছে! তুমি শিশুকে কি ভাবে দেখ জানি না, শিশুর প্রতি আমার চিরদিন এক আশ্চর্য্যকর অনুরক্তি এবং ভক্তি আছে। শিশু সম্পর্কে তোমাকে আজ কিছু বলিব মনে করিয়াছি। তুমি যে জিনিষটি পাইয়াছ, তাহার দিকে তোমার মনোযোগ আকৃষ্ট করাই আমার উদ্দেশ্য। আমরা প্রতিদিন 'সুখ' 'সুখ' করিয়া যাহাদিগকে পদদলিত করিয়া যাই, তাহাদের অধিকাংশই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগকে সুখ দিতে পারে—

প্রত্যহের পথে
চরণে দলিত যারা তারাই সুন্দর!

তুমি সংসারে প্রবেশ করিয়াছ; সুখ চাও ত সুখ গৃহের ভিতরই রহিয়াছে, ইহার বাহিরে নাই।

ছেলেটির কি নাম রাখিয়াছ? এখন বেশ হাসিতে পারে ত? মানুষের ছেলের নিকট এক স্বর্গীয় জিনিষ আছে, তাহা ওই হাসিটি! যে স্থানে ইহ-পরকাল মিশিয়াছে, শিশু সেই রহস্যময় সন্ধিস্থলের অতি নিকটে দাঁড়াইয়া! তাই মনে হয়, শিশু বুঝি আমাদের অপেক্ষা জগতের রহস্য বেশী জানে; তাই সদ্যঃপ্রসূত শিশুর হাসি দেখিলে মনে হয় কোন জগদতীত আনন্দ প্রবাহের লহরী আসিয়া যেন ইহাকে স্পর্শ করিতেছে! সেই আনন্দ তর্কে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, জ্ঞানে তাহার আভাবও পাওয়া যায় না; শিশুর মত সরল কোমল হৃদয় হইলেই বুঝি সেই অতীন্দ্রিয় কিরণকম্পের অনুভূতি মাত্র আনন্দাহত হওয়া যায়! অনেক নবজাত শিশুর হাসিতে আমি ওই আনন্দ যেন অনুভব করিয়াছি; বিদ্যুতের মত হঠাৎ কি যেন একটা মনের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, তাহাকে ভালরূপে ধরিতে পারি না। ধরিতে পারি না বলিয়াই তাহা অপার্থিব বলিয়া বিশ্বাস করিতে ভালবাসি।—

কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ আরও উর্দ্ধে উঠিয়া বিশ্বাস করিতেন। আমাদের মায়াবাদিরাও অবান্তরভাবে এই মতের পরিপোষণ করেন। "শিশু পরম জ্ঞানী; শিশু অভ্রান্তনেত্রে জগতের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করে। তাহার আত্মা সবেমাত্র জগৎ-রহস্যের মহাসমুদ্রে ডুব দিয়া আসিয়াছে, জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইতে, আপনার সমস্ত মহত্ব, দেবত্ব বিমাতা ধরণীর ধূলি মৃত্তিকার সঙ্গে বিনিময় করিতে করিতে সে উহার পরিহীয়মান কল কল্লোল শ্রবণ করে। ক্রমে শ্রুতিশক্তি ক্ষীণ এবং স্থূল হইয়া আইসে, এবং পঙ্কিল-সংসার-কোলাহলের ভিতর স্বর্গসংগীত তেজোহীন এবং বিলীন হইয়া পড়ে।"

তাই বুঝি মহাত্মা যীশু বলিতেন—"ওই শিশুকে আমার নিকট আসিতে দাও, শিশু পৃথিবীর নহে; শিশু পৃথিবীতে স্বর্গের অধিবাসী।"

শিশুর মুখে আর একটা অপার্থিব জিনিষ আছে, তাহা ওই মধুময় পিতৃ মাতৃ সম্বোধন। এ কোথা হইতে আসিল! কে ইহাকে শিখাইল! সকল দেশের সকল কালের শিশুর মুখেই ওই এক কথা। মানব শিশুর ইহাই প্রথমোচ্চারিত ভাষা। এই ভাষায় ইংলণ্ডের শিশুতে আর ভারতের শিশুতে দেশকালের বন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এক হইয়া যায়। এই ভাষা মানব জন্মাবচ্ছিন্নে ভুলে না, মানবশিশু বড় হয়, সংসারের ধূলিমৃত্তিকাকে প্রকৃত জিনিষ বলিয়া জড়াইয়া ধরে, শৈশবের সমস্ত কিছু হারাইয়া ফেলে; কিন্তু এই বিষয়ে সে চিরকালই শিশু। এই ভাষার দ্বারা মানব মানবের সহিত আশ্চর্য্য হৃদয়বন্ধনে আবদ্ধ হয়; এই ভাষায় মানব স্বর্গের সহিতও এক অপূর্ব্ব স্নেহতন্তুর ঘনিষ্ঠতা বিস্তার করে। তাই আমি কাণ ভরিয়া মানবশিশুর এই ভাষা শুনি, আর ভাবি "এ কোথা হইতে আসিল!" তোমাকে বলিলাম—তুমি আমাপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারিবে; কারণ এখন তোমাতে ও শিশুতে অনেক নিকট সম্পর্ক ঘটিয়াছে। "পতির্জ্জায়াং প্রবিশতি"; একভাবে তুমিই শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তাহার প্রত্যেক হাসিতে তুমি এক অননুভূতপূর্ব্ব হৃদয়স্পন্দন এবং আত্মীয়তা অনুভব করিতে পারিবে, তাহার প্রত্যেক সম্বোধনে তুমি আমাপেক্ষা সহস্রগুণ তন্ময়তা অনুভব করিবে।

শিশুর আর একটা সৌন্দর্য্য আছে, তাহা অনেক পরিমাণে আপেক্ষিক। শিশু একে সুন্দর, মাতৃক্রোড়ে শিশু ততোধিক সুন্দর; ইহাপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য আমি জগতে কুত্রাপি দেখি নাই। ফুল সুন্দর, কিন্তু ফুল বুকে করিয়া ফুলের দিন দিন ম্রিয়মাণ দলগুলি ততোধিক সুন্দর। ফুলের হৃদয় নাই, আমরা আপন হৃদয়ের আলোকেই ইহাকে সুন্দর করি। কিন্তু মাতৃক্রোড়ারূঢ় শিশুর প্রতি একবার অবহিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিও, একদিকে শিশুর মুখে সেই স্বর্গীয় হাসি আর মধুমাখা "মা" সম্বোধন; অন্যদিকে দেব দেবের বরণীয়, জগৎসৃষ্টির ললামভূত, উচ্ছ্বাসতরঙ্গিত মাতৃহৃদয় এবং সেই কোমলতাময় সারল্যময় ত্রিতাপহারিণী স্নেহদৃষ্টি! দেখিও আর ভাবিও জগতে ইহাপেক্ষা সুন্দরদৃশ্য আর আছে কিনা।

সৃষ্টির পূজনীয় আত্মোৎসর্গ—রমণী এই আত্মোৎসর্গের প্রতিমূর্ত্তি! "রমণী

মায়ের জাতি—রমণী জননী” কথাটি যে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিবে সে চিরকাল নারীজাতির প্রতি গভীর ভক্তি এবং বিস্ময়ে গদগদ হইয়া থাকিবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একসময়ে নারীমাত্রকে বিশ্বজননীর প্রতিরূপ বলিয়া জ্ঞান করিতেন,"স্ত্রিয়ঃসমস্তাঃ সকলা জগৎসু," মহাপুরুষ একসময়ে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের হৃদয় এত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে যে এখন ইহার মর্ম্মার্থও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

যদি আত্মোৎসর্গের পূর্ণমূর্ত্তি দেখিতে চাও, সন্তানলাঞ্ছিতা প্রসূতির প্রতি অভিনিবেশ কর। জগতে খাদ্যখাদক ভাব আছে, সৃষ্টি ব্যাপিয়া এক নির্ম্মম হিংসানীতি প্রচলিত আছে, মঙ্গলময়ের রাজ্যে এক জীব আর একটিকে ভক্ষণ না করিলে চলে না কি?—এই প্রশ্ন বহুকাল ধরিয়া জ্ঞানিগণের হৃদয় সমানভাবে আন্দোলিত করিয়া আসিতেছে কারণ এই হিংসানীতিই সৃষ্টির কলঙ্ক,জগতের সৌন্দর্য্য বোধ করি পূর্ণ হইয়া যায়, যদি এই হিংসা না থাকে। একদিকে দুর্ব্বল আত্মরক্ষা অন্যদিকে প্রবল জিঘাংসা—এই কুৎসিৎ ভীষণ যুদ্ধে এবং আত্ম-কোলাহলে জগতের দেবমন্দির পশুভূমিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। বোধ করি জগৎ এত অসুন্দর হইত না যদি ইহাতে উদ্ভিদের মত, ফুলের মত, সূর্য্যকিরণের মত প্রাণিজগতে সেই নীরব অক্লিষ্ট এবং অযাচিত আত্মদান থাকিত, সর্ব্বশেষ, জগৎ বোধকরি নিরবচ্ছিন্ন সেই কল্পনাপুর স্বর্গে পরিণত হইত, যদি ইহাতে সর্ব্বত্র জননীর মত স্নেহময়, অকাতর, এবং উদার আত্মহত্যা থাকিত!

এক সৌন্দর্য্য-সারময়ী নব যুবতী দেখিয়াছিলাম,অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত জ্যোৎস্না-প্রবাহের মত সেই দেহের উদ্দাম লাবণ্যোচ্ছ্বাস আমাকে যুগপৎ শান্ত, বিস্মিত, এবং মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। মনে মনে বলিলাম "দেবি! অমনই থাক; ভগবান্ তোমাকে নিরাপদে রাখুন, এই উমার মূর্ত্তিতে এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে চিরকাল আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন কর।" বহুদিনের পর বিদেশ হইতে ফিরিয়া সেই আনন্দময়ীর বাড়ী গিয়াছি—তাঁহাকে দেখিয়া প্রথম চিনিলাম না। এই কি সেই! অতীতে ও বর্ত্তমানে এক বিষম বিদ্রোহ বাঁধিয়া গেল! সেই অপরিসীম সৌন্দর্য্যতরঙ্গ কোথায়? সেই জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তিটি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এবং চলনে ভঙ্গীতে, দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত শৈথিল্য আসিয়া পড়িয়াছে; বিস্মিত হইয়া চাহিয়া আছি, এমন সময় নিতান্ত আলোকতরঙ্গের মত কে আসিল, দেখিলাম;—দেখিয়া

গিয়াছিলাম উমামূর্ত্তি, আসিয়া দেখিলাম গণেশজননী! জননীর সমস্ত অবসাদ, সমস্ত শৈথিল্য কোথায় উড়িয়া গেছে; দু'নয়ন আলোক পূর্ণ করিয়া ভুজবল্লী সাগ্রহে প্রসারিত করিয়া তিনি ছেলেকে কোলে তুলিলেন;—তুলিয়া চিবুক উন্নমিত করিয়া বারম্বার একটী সুমধুর জিজ্ঞাসা সূচক ভঙ্গী পূর্ব্বক স্মিতমুখে চাহিতে লাগিলেন এবং শিশুটি নির্ঝর কলকলের মত সুতরল উচ্চহাস্যে এবং কোমল করযুগলের অবিরল প্রহারে তাঁহার হৃদয়কে আহত এবং প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। আমি বুঝিলাম কোন্ ইষ্টসাধনে ওই অপরূপ নন্দন বনের আহুতি হইয়াছে। এই জগৎপূজ্য পবিত্র আত্মহত্যা—জননী আপনার যথা-সর্ব্বস্ব সন্তানে অর্পণ করিয়া, দিন দিন আপনার হৃদয়শোণিত সন্তানের শরীরে প্রবাহিত করিয়া, সানন্দমনে শীতের পত্রপুষ্পহীন লতার মত শুকাইয়া যাইতেছেন, কোন হৃদয়বান ব্যক্তি ইহা বুঝিয়া ভক্তিতে গদগদ না হইয়া থাকিতে পারে! মাতৃক্রোড়ে শিশু—সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য হৃদয় ভরিয়া দেখিয়া লইও। কেন এত সুন্দর জানি না, সৌন্দর্য্যের স্বরূপ কে জানে—জানিলে হয়ত একজন মহাজ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হইতাম। তবে এইটা জানিও যে সেই সৌন্দর্য্য শিশুরও নহে, মায়েরও নহে; উভয়ের সম্মিশ্রনে এই অপার্থিব মায়াকুহেলিকার সৃষ্টি হয়। জলবিন্দু সমূহে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া আমাদের সম্মুখে যেই অদ্ভুত দৃশ্য প্রতীয়মান করে, তাহা যেমন জলবিন্দুরও নহে সূর্য্যকিরণেরও নহে, তাহা একটা অপার্থিব শক্তির, তাহা ইন্দ্রিয়ের, সেইরূপ এই দৃশ্যটিও একটী অপার্থিব শক্তির অপরূপ ছায়াভাস বলিয়া মানিয়া লইও।

তোমাকে এত কথা কেন লিখিতেছি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—তুমি আমাপেক্ষা ভাল বুঝিবে। বুঝিলে তোমার সেই জ্ঞানের অংশ পাইব, তোমারও সংসার জীবন সুখের হইবে। পৃথিবীতে অনেক লোক বড় দুঃখী; কারণ তাহারা সুখও বুঝে না, জীবনও বুঝে না। জীবনে দুঃখের অপেক্ষা সুখের ভাগ অধিক, জীবনেচ্ছাই ইহার প্রমাণ, আবার, শক্তি এবং নৈপুণ্যগুণে দুঃখকেই সুখ বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়। তবু, অনেক লোক এখন অসুখী যে তাহারা সুখকেও সুখ বলিয়া বুঝিয়া উঠিতে এবং অনুভব উপভোগ করিতে পারে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক প্রকৃত সুখকে আমরা আলস্যে, মূর্খতায় এবং ঔদাসীন্যে পদদলিত করিয়া যাই; আমরা সম্মুখের অগাধ সলিলা স্রোতোস্বায় বীতস্পৃহ হইয়া মৃগতৃষ্ণায়

প্রণয়বান হই। আমরা সুখ ধরিয়া রাখিতে পারি না, সুখ চলিয়া যায় ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়। যখন সহস্র চেষ্টায়ও তাহা আবার প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার নহে, তখন আমরা তাহার মূল্য বুঝি, সহসা যেন তাহার অভাবটা প্রাণময় অনুভব করিয়া উঠি, এবং জীবনময় তাহার জন্য নিস্ফল হাহাকার করিয়া বেড়াই। অনেক বৃদ্ধ বড় অসুখী, যুবকদের দ্বারা, শিশুদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকে বলিয়াই অসুখী; কারণ, তাহারা এক অতি কঠোর নির্ম্মম স্মৃতির ভিতরেই যেন জাগিয়া থাকে, যুবকদের প্রত্যেক চলনে ভঙ্গীতে তাহারা নিজেদের অপগত যৌবন, এবং অতর্কিতপ্রস্থিত সুবিধা ও সৌভাগ্য ভাবিয়া ভাবিয়া সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাসে কাল কাটাইয়া যায়। তোমার তেমন কিছু হইবে না; আমার বিশ্বাস; কারণ তোমার বুঝিবার শক্তিও আছে উপভোগ করিবার শক্তিও আছে। জীবনের সমুদায় নিভৃত প্রকোষ্ঠগুলিকে পর্যাপ্ত জ্ঞানে এবং চৈতন্যে উদ্ভাসিত করিয়া লও; দুঃখের কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গারগুলি পর্য্যন্ত হৃদয়াগ্নি সহযোগে জ্যোতিষ্মান্ হউক; জীবনের কোন অঙ্কে যেন অনুমাত্র দৈন্য অতৃপ্তি অথবা শূন্য না থাকিয়া যায়।

আমরা জীবনে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি; শৈশবের মধুর স্মৃতি সুদূরাগত সমুদ্র কল্লোলের মত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। তবু যখন আঙ্গিনায় শিশুগুলি চিন্তাহীন বিঘ্নহীন পরমানন্দে খেলা করিতেছে দেখি; প্রভাতে, সায়াহ্নে নিস্তব্ধ প্রান্তর কি নদীতীর হইতে পল্লীবালকের হৃদয় দ্রবকর তীব্র সঙ্গীত শুনি; অমনি এক মুহূর্ত্তে সেই শৈশব, সন্ধ্যাকাল, মায়ের হাস্তমুখ, ভাইবোনের গলাগলি সজাগ হইয়া উঠে, এবং মনের কোন লুক্কায়িত প্রকোষ্ঠ হইতে যেন একটা অজানা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া সমস্ত জগৎ পূর্ণ করিয়া ফেলে—তাহার কারণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। বুঝি, এই সঙ্কটময় সমরময় কর্ম্মজীবন অপেক্ষা শিশুর ওই বোধ কলুষ আমোদ ক্রীড়া, এবং হিন্দোলবর্দ্ধিত সুষুপ্তিই সমধিক আগ্রহনীয়! বুঝি জীবনের এই কঠোর জ্ঞানের এবং অজ্ঞানের বোঝা দূরে ফেলিয়া শিশুর মত একবার ওইরূপ সরল প্রাণে নৃত্য করিতে পারিলেই জীবনের অনেকটা শূন্য পূর্ণ হইয়া যাইত! যাহা গিয়াছে তাহা আর পাওয়া যাইবে না, তাহার উপর মানবের একটা অপরিতৃপ্তি থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান যদি গোলাপ-ফুলের মত মধুর এবং আনন্দকর হয়, তবু তাহাতে কাঁটা আছে; কিন্তু যখন ইহা আমাদের মুষ্টিচ্যুত হইয়া ক্রমে দূরে অপসৃত হইতে থাকে, আমরা

কণ্টক দংশন ভুলিয়া যাই, তখন উহা নিষ্কণ্টক এবং নিরাময় হইয়া চির-কাল আমাদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। একটা কথা আছে সত্যযুগ কখনো বর্ত্তমান ছিল না, উহা চিরকাল অতীতের জিনিষ। মানবের তৃষ্ণাতুর দৃষ্টি চিরকাল এইরূপ মরীচিকার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। ইহা আমাদের স্বভাব ; আমরা বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীতের বেশী আদর করি। বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট হইতে গেলে শক্তি এবং নৈপুণ্যের আবশ্যক ; জ্ঞান চাই, সাধনা চাই। এখন তুমি যৌবনের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান, ওই জ্ঞান এবং ওই সাধনা তোমার হউক ; জীবনের অপরাহ্নে দাঁড়াইয়া যেন আবার এই মধ্যাহ্নের প্রতি ও হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে না হয়।

রঘুবংশ পড়িয়াছ,—বল দেখি কোন শ্লোকটি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে ?—আমি বলিতাম সেইটি যেখানে মহাকবি বলিয়াছেন দিলীপ ও সুদক্ষিণার পরস্পরের প্রতি যে স্নেহ ছিল সন্তানটি মাঝে পড়িয়া তাহার ভাগ লইলেও কমিল না। বরং বাড়িয়া গেল। কালিদাসের কবিতা স্বভাবতঃ তরল। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত মহাকবির ন্যায় কালিদাসের ভিতরও একটা অনায়াসসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য আছে। সেই গাম্ভীর্য্য উপরে ভাসিয়া বেড়ায় না। তাই সাধারণ লোক কালিদাস পড়িয়া যায় আর ভাবে যেন সব বুঝিয়া গেল। কিন্তু আমার মতে কালিদাসের কবিতাই সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ; কারণ সংস্কৃত ভাষার কোন কবিকে বুঝিতে আমার তত অভিনিবেশের দর-কার হয় নাই, বরং সহস্র অভিনিবেশ সত্ত্বেও কালিদাস বুঝিবার অনেক বাকী আছে। উপরে যে কবিতার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার অপরিসীম ভাব গাম্ভীর্য্য চিরকাল আমাকে বিস্মিত করিয়া রাখিয়াছে, কালিদাস জানিতেন, দম্পতির প্রথম প্রেম চিরকালই সৌন্দর্য্যমোহে আকৃষ্ট হয়, স্ত্রী পুরুষের সৌন্দর্য্যে এবং পুরুষ স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে প্রথমতঃ মধুকর ও ফুলের মত আবদ্ধ হইয়া যায়। পুরুষের সৌন্দর্য্য স্ত্রীসৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী ; কারণ সন্তান পালনরূপ মহাযজ্ঞে স্ত্রীলোককে আপনার সমস্ত রূপ-যৌবনের ডালি আহুতি প্রদান করিতে হয়। সুতরাং সৌন্দর্য্যে উপচীয়-মান পুরুষ সৌন্দর্য্যে হীয়মানা রমণীকে যে পূর্ব্বাপেক্ষা বিতৃষ্ণার সহিত দেখিবে তাহা কিছু অস্বাভাবিক নহে ; এবং রমণীও যে ক্রমে স্বামীর সোহাগ শৈথিল্য বুঝিয়া, এবং কথঞ্চিৎ হৃদয়ের টানে আকৃষ্ট হইয়া, নিজের অঙ্কের ধনকে দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত আপনার করিতে চাহিবে, এবং স্বামীর

প্রতি ন্যূনাধিক শৈথিল্য দেখাইবে, তাহাও সম্পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ। কালিদাস বুঝিলেন সন্তান জন্মিয়া এই দম্পতির প্রেম স্থৈর্য্য এবং সংসার চলন বিষয়ে এক অভিনব অন্তরায় উপস্থিত করিল। কিন্তু কালিদাসকে আদর্শ দম্পতির সৃষ্টি করিতে হইবে। তাই তিনি লিখিলেন—তাঁহার সেই সিদ্ধ হস্তের অনায়াস গাম্ভীর্য্য এবং সুমধুর তারল্য মল্লিকাসুরভির মত হৃদয় অভিভূত করে—

"এই পরস্পরাশ্রয় অদ্ভুত ভাব-বন্ধনের মধ্যস্থলে একটা নূতন লোক আসিয়া দাঁড়াইল! সে আসিয়া জোর করিয়া উভয়ের থালা হইতে অমৃত বিভাগ করিয়া লইল; এবং এক অবিশ্রাম আমোদহাস্যে গৃহ পূর্ণ করিয়া আপন মনে তাহাই ভোগ করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই অতর্কিত এবং অবিসংবাদিত লুণ্ঠনের পরেও উভয়ের ভাগে কিছুমাত্র কম পড়িল না, বরং বাড়িয়া গেল!"

এই শিশু তোমাদের দুই হৃদয়ের স্নেহতন্তু, আনন্দসেতু! এই শিশু তোমাদের প্রেমতরুর ফল। ফল হইলেই তরুর গৌরব বাড়ে। শরতের প্রারম্ভে শস্যক্ষেত্রের অপরূপ শ্যামশোভা নয়ন মন মুগ্ধ করে, হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে; তবু আমরা আশা করি না যে উহাই চিরকাল বর্ত্তমান থাকুক; আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বলি এই লীলা, এই আবেশ, এই তরঙ্গ আশু পরিপক্ক এবং ঘনীভূত হইয়া স্বর্ণশীর্ষ ফলভারে আনমিত হউক; তবেই সমস্তের সার্থকতা হইল! দম্পতির প্রথম প্রেম অনেকটা সংসার ছাড়াইয়া উঠে; তাহাতে অনেকটা ছায়া অনেকটা অতৃপ্তি মত্ততা এবা জাগ্রত স্বপ্ন থাকে; দুইটী হৃদয় যেন আকাশ কুসুম লইয়া কাড়াকাড়ি করে; চিরবাঞ্ছিত অমৃত ধারা অধরের নিকট আসিয়াই নির্দ্দয়ের মত সরিয়া পড়িতেছে বোধ হয়। কালে ছায়া সরিয়া পড়ে; সমস্ত বিফল, দুর্দ্দমনীয় আবেগ কমিয়া আসিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত জীবনের মর্ম্মদেশ অধিকার করে। কবি ভবভূতির ভাষায়, তখন প্রেমের সমস্ত মোহ আবরণ অপগত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় প্রশান্ত এবং কল্যাণকর স্নেহনীরে পরিণত হয়; কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখনি স্বামী ধন্য হয়; কবি হেমচন্দ্রের ভাষায় তখনি স্ত্রী আপনার সমস্ত সৌন্দর্য্য উৎসঙ্গে ধরিয়া দেবসৌন্দর্য্যে দেবীপ্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

শ্রী শঃ।

আমাদের অবস্থা।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

দেশের ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকদের সম্বন্ধে গুটিকতক স্থূল স্থূল কথা বলা গিয়াছে। কিন্তু দেশের অবশিষ্ট লোকের তুলনায় ইঁহাদের সংখ্যা অতি সামান্য। পোনের আনার উপর লোক কৃষক বা শ্রমজীবী। ইঁহাদের অবস্থা আজ কাল কিরূপ দেখা যাউক। প্রথম কৃষক ;—দুইটী কারণে কৃষকদিগের অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। (১) দেশের বাণিজ্য বিস্তার,—কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের আজ কাল বিদেশে রপ্তানি খুব। বহু দিনের কথা নয়, অবস্থা এরূপ ছিল যে, অনেক কৃষক উচিত মূল্যে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বেচিতে পারিত না। ক্রেতার অভাব বিলক্ষণ ছিল। অনেক সময় এমনও হইত যে এক জেলায় অন্নকষ্ট উপস্থিত, নিকটবর্ত্তী আর এক জেলায় ফসল প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। কিন্তু রাস্তা ঘাট প্রভৃতি না থাকায় শেষোক্ত জেলা হইতে চাউল লইয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত জেলায় অন্নকষ্ট নিবারণ করিতে পারা যাইত না। এখন আর সে অবস্থা নাই। রাস্তা ঘাট রেল খাল অনেক হইয়াছে ; দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে যাইতেছে। অন্তর্বাণিজ্যের বিস্তার হেতু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এবং নগর হইতে নগরান্তরে কৃষিজাত দ্রব্য চালান হইতেছে। কৃষককে আর ফসল কোলে করিয়া কাঁদিতে হইতেছে না। সে তার ফসলের ও পরিশ্রমের উচিত মূল্য পাইতেছে। বাণিজ্য বিস্তারের নিমিত্ত সে অনেক সময় পুরাতন ফসল ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত নূতন লাভজনক ফসল উৎপাদন করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে বহুল পরিমাণে পাটের চাষ ইহার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত। অধিকাংশ কৃষিজাত দ্রব্যের দাম যে কত বাড়িয়াছে তাহা সকলেরই জানা আছে। বাণিজ্য বিস্তার হেতু ফসলের মূল্য বৃদ্ধি ও মূল্যবান ফসলের চাষ কৃষকের অবস্থোন্নতির এক প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (২) প্রজাস্বত্ব আইনের অবতারণা। গবর্ণমেণ্ট যখন দশশালা বন্দোবস্ত করেন তখন কেবল নিজের স্বার্থ ও তাহার অনুরোধে জমিদারদিগের স্বার্থের প্রতিই তাকাইয়া ছিলেন। ক্রমে গবর্ণমেণ্ট নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন, এবং জমিদার যাহাতে নিষ্ঠুররূপে প্রজা শোষণ করিতে না পারেন তাহার উপায় উদ্ভাবনে মন দিলেন। দশশালা বন্দোবস্তে জমীদারদের দেয় খাজনা নিরূপিত হইয়া-

ছিল, কিন্তু প্রজার উপর জমিদারের ক্ষমতা বরং বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ বন্দোবস্তের পর অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর চলিয়া গেলে বুঝা গেল, যে প্রজার উপর জমীদারের অসীম ক্ষমতার কিছু খর্ব্বতা না হইলে আর প্রজার নিস্তার নাই। সেই সময় হইতেই অল্প অল্প চেষ্টা হইতে লাগিল, যাহাতে প্রজা যে জমী ভোগ করে তাহার উপর তাহার কিছু স্বত্ব জন্মায়। ঐ চেষ্টার শেষ ফল বর্ত্তমান প্রজাস্বত্ব আইন। ঐ আইনের অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য যে মহৎ এবং উহা দ্বারা প্রজার যে প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবেক।

উপরে যে দুইটী কারণের উল্লেখ করা গেল তাহা হইতে বঙ্গদেশীয় কৃষকের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন কয়েকটী কারণ আছে যাহা ঐ উন্নতির পক্ষে বিশেষ বিঘ্নস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। অতি সংক্ষেপে তাহাদের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতেছে। (১) কৃষকদিগের নিরক্ষরতা—এই নিরক্ষরতা নিবন্ধন তাহারা অনেক সময় কিসে অবস্থার উন্নতি হইবে, কিসে ফসলের উন্নতি হইবে প্রভৃতি বিষয় বুঝিতে পারে না। ইহা ছাড়া, মূর্খ বলিয়া ইহারা পদে পদে প্রতারিত হয়, ও আপনাদের স্বত্ব বুঝিয়া লইতে পারে না। মূর্খ বলিয়াই ইহারা অনেক সময় দুর্ব্বল। (২) জমীদারের উৎপীড়ন—ইহাকেও এক প্রকার কৃষকের মূর্খতার ফল বলিলেও বলা যায়। সকল জমীদার যে উৎপীড়ক এ কথা আমি বলিতেছি না। ভাল জমীদার অনেক আছেন। কিন্তু প্রজাপীড়নে আনন্দ অনুভব করেন এরূপ জমীদার বড় বিরল নন্। প্রজার উন্নতি কল্পে আইন করিলে কি হয়! আইনের মর্ম্ম কয়জন প্রজা বুঝে, এবং বুঝিলেও কয়জন আইন সাহায্যে আপনাকে জমীদারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে ক্ষমতাবান্! জমীদারের চাপন অনেক স্থলে গাঁটকসার চাপনের চেয়ে অধিক। অনেক জমীদার আছেন যাঁহারা প্রজার নিকট হইতে শুষিয়া কর আদায় করিতে কৃপণতা করেন না, এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে হায়রান করেন। (৩) মোকদ্দমা প্রিয়তা—অনেক কৃষককে আজকাল বড় মোকদ্দমাপ্রিয় দেখা যায়। মোকদ্দমাপ্রিয়তা একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। নিজের ন্যায্যগণ্ডা পাইবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য দোষের নহে, কিন্তু মোকদ্দমার জন্য মোকদ্দমা করা একটা কুৎসিত ও ব্যয়সাপেক্ষ নেশা বই আর কিছুই নয়। বাঙ্গালার অনেক স্থানের, বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলের

কৃষকদের যে মোকদ্দমাপ্রিয়তা সম্বন্ধে বড় অখ্যাতি আছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এইজন্য কত সময় ও অর্থ নষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অন্যায় জিদ বড় ভয়ানক দোষ। আমার মন আমাকে স্পষ্ট বলিতেছে যে, আমি যাহা করিতে চাহিতেছি তাহা ন্যায় সঙ্গত নয়, কিন্তু বলিলে কি হয়, অমুককে জব্দ করিতে হইবেই, তাহাতে সর্ব্বনাশ হইতে হয় সেও স্বীকার। আমার বোধ হয় দেশের বারআনা মোকদ্দমার মূলে জিদ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। (৪) অমিতব্যয়—ইহা কৃষকদের এক পুরাতন ব্যাধি। উহাদের মধ্যে এমন লোক অনেক আছে যাহারা ধার করিয়া, শ্রাদ্ধাদি দূরে থাকুক পৌষ-পার্ব্বণে ঘটা করে। ভবিষ্যৎ ভাবনা অনেক সময় ইহাদের মনে স্থান পায় না। আজ কাল আবার ইহাদের পিতৃ পৈতামহিক অমিত-ব্যয়িতার উপর একটু বিলাসিতার আমেজ আসিয়া পড়িয়াছে। সহরে আসিলে অনেক চাষাকে ইংরাজী জুতা, বিলাতী ছাতা, ও ধোয়া জিনের কোট কিনিতে দেখা যায়। বিলাসিতা সম্বন্ধে বিস্তর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নূতন কিছু বলিবার আবশ্যক দেখি না। (৫) সন্তানোৎপাদন—মধ্যবিত্ত লোকেদের পক্ষে এ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে কৃষকদের সম্বন্ধে তাহার অনেকটা প্রযোজ্য। অনেকে বিস্তর সন্তান সন্ততি লইয়া বড় কষ্ট পায়। তবে যেখানে কৃষিকার্য্যের সুবিধা আছে, সেখানে চাষার ছেলেরা বড় হইলে তাহাদের পিতামাতার ভার অনেকটা কমিয়া যায়। কিন্তু এ সুবিধা ক্রমে যে অন্তর্হিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন শিক্ষিত লোকদিগকে অধিক অপত্য উৎপাদন বন্ধ করার বিষয়ে পরামর্শ দিবার সময় আজিও আইসে নাই বলিয়া বোধ হয়, তখন কৃষকদিগকে সে সম্বন্ধে কিছু বলা "উলুবনে মুক্তা ছড়ান" মাত্র। (৬) ম্যালেরিয়া জ্বর—যে সব স্থানে ইহার প্রাদুর্ভাব সে সব স্থানে ইহা হইতে চাষার বিশেষ অনিষ্ট হয়। কোন একটা চাষা-গ্রামে প্রবেশ করিলেই প্রথমে কতকগুলি রুগ্ন ও বিষণ্ণ ছেলে মেয়ে দেখা যায়। যুবক যুবতীরাও ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত এড়াইতে সক্ষম নয়। ইহা হইতে কত ক্লেশ, অর্থনাশ ও জীবন নাশ ঘটে! যখন শিক্ষিত ব্যক্তিরা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম জানিয়া এবং কিয়ৎপরিমাণে সেই নিয়ম প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করিয়াও কালোপম ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে আপনাদিগকে ও আপনাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না তখন নিরক্ষর কৃষকগণ

ইহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে? পূর্ব্বে যে প্রণালী অবলম্বন করিলে শরীর সুস্থ থাকিত, জোর তাহারা তাহার কতকটা অবলম্বন করিতে পারে। পূর্ব্বের অনেক নিয়ম কিন্তু আর দেশে খাটে না, এবং অনেক স্থলে চাষা লোকের আর দুরবস্থার সীমা নাই। (৭) নেশা—দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার নেশার প্রচলন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। আবকারি বিভাগের রিপোর্ট দেখিলে ইহা অনেকটা বুঝা যায়। সেকালে চাষাদের মধ্যে নেশার সামগ্রী ছিল গাঁজা, চরষ ও তাড়ী।—আজ কাল ইহাদের উপর কিয়ৎপরিমাণে দেশীয় মদ জুটিয়াছে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের বিশ্বাস ছিল আব্‌কারি আয় বৃদ্ধি দেশের লোকের অবস্থোন্নতির পরিচায়ক। আমরা বিবেচনা করি তাহা না হইয়া ইহা অবস্থার অবনতির অন্যতম কারণ। (৮) ঋণ—কৃষক শ্রেণীর উন্নতির যে সব বিঘ্ন উল্লিখিত হইয়াছে অল্প বিস্তর তাহারা সকলে মিলিয়া এই শেষ বিঘ্নটা উৎপন্ন করিয়াছে। অনেক কৃষক ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। যে একবার মহাজনের চক্রের ভিতর প্রবেশ করিল তাহার বহির্গমন অসম্ভব। আসল ও "সুদের সুদ তস্য সুদ" তার ঘাড়ে চাপিল। শুনিয়াছি নীলের দাদন কখনও শোধ যায় না। মহাজনের টাকা যে কখনও শোধ যায় তাহাও শুনি নাই। চাষার অবস্থার উন্নতির জন্য অনেকে মাথা ঘামাইতেছেন, কিন্তু কি করিয়া তাহাকে মহাজনের হস্ত হইতে রক্ষা করা যাইবে তাহার উপায় আবিষ্কার করিতে এ পর্য্যন্ত কেহ সক্ষম হন নাই। যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন চাষার অবস্থার উন্নতি বহুদূরে। আমি যে মহাজনের দোষ দিতেছি তাহা যেন কেহ মনে না করেন। বর্ত্তমান অবস্থায় মহাজন অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান মহাজনী প্রথা ভাল বলিতে প্রস্তুত নই।

৫

শ্রমজীবী সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। এখানে শ্রমজীবীর অর্থ সামান্য দোকানদার, ব্যবসাদার, শিল্পকর, ও মুটে মজুর চাকর ইত্যাদি। সামান্য দোকানদার ও ব্যবসাদারদের অবস্থা মোটের উপর মন্দ নয়। যদি তাহারা শ্রমশীল ও বুদ্ধিমান হয়, এবং বেশী লাভ করিবার আশায় অত্যধিক পরিমাণে ধারে বিক্রয় না করে, তাহা হইলে তাহারা একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

অধিকাংশ সহর ও গণ্ডগ্রামে দোকানী পসারীর অবস্থা সচ্ছল বলিয়া বোধ হয়। সামান্ত মুদীর বা ময়রার দোকান করিয়া অনেককে দুই পয়সা সংস্থান করিতে দেখা গিয়াছে। সামান্ত ব্যবসাদার ও কারিকরদিগের অবস্থাও মন্দ নয়। একজন ভাল কামার আজ কাল চেষ্টা করিলে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে, এবং অনেক স্থলে করিয়াও থাকে। কুমার প্রভৃতির অবস্থাও সাধারণতঃ মন্দ কি? বড় বড় সহরে এমন অনেক ভাল নাপিত আছে, যাহারা মনে করিলে রোজ ১৲ টাকার উপর উপায় করিতে পারে। ছোট সহরেও এমন নাপিত অনেক আছে যাহারা প্রত্যহ ৫।৬ আনা রোজগার করে। ধোবা, ছুতার, দরজী, সেকরা প্রভৃতির দর খুব চড়া। তোমার বাড়ীতে যদি একটু সামান্ত ছুতারের কাজ দরকার হয় দেখিবে দুনা দাম দিয়াও তুমি অনেক সময় লোক পাইবে না। ইহাতেই বুঝা যায়, ছুতারের কত কাজের ভিড়। দেশে বিলাসিতা ও পরিচ্ছন্নতার জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে ধোবা ও দরজীর কাজেও দর বেশ পড়িয়া গিয়াছে। গৃহলক্ষ্মীদের অলঙ্কারপ্রিয়তা খুব বলবতী আছে, তাহার উপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফ্যাসনের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সুতরাং সেকরাদের আজ কাল "পাথরে পাঁচ কিল।" "পুঁথি বাড়াইবার" ইচ্ছা নাই, নহিলে অনেক কথা বলা যাইত। মোটের উপর ইহা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবেক না যে, দোকানদার ও কারিকরগণ আজ কাল বুদ্ধিমান ও নিপুণ হইলে অনায়াসে দুই পয়সা রোজগার করিতে পারে। একশ্রেণীর লোকের প্রতি কিন্তু এই কথা খাটে না—তাহারা তন্তুবায়। সৌখীন ধুতি ও সাটীর কথা বলিতেছি না, কিন্তু পূর্ব্বে যাহারা মোটা কাপড় প্রস্তুত করিত, বিলাতী প্রতিযোগিতায় তাহারা একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছে। অনেককেই ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যাহারা আজও পুরাতন ব্যবসা ছাড়িতে পারে নাই তাহারা জীবিত আছে মাত্র।

দেশে কিয়ৎপরিমাণে কলকারখানার অনুষ্ঠান হওয়াতে কতকগুলি কারিকর ও শিল্পিশ্রেণীর লোকের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছে। যেখানে কাগজ বা পাটের কল হইয়াছে সেখানে কতকলোক বেশ কাজ পাইতেছে, এবং পরম্পরা সম্বন্ধে তাহাদের অন্ত অন্ত অন্ত ব্যবসায়েরও দর বাড়িয়াছে। কলিকাতা সহরে ও অন্ত অন্ত দুই এক স্থানে ময়দা ও তেলের কলেও কতকগুলি লোক প্রতিপালিত হইতেছে। রেলওয়ে প্রচলিত হওয়ায় অনেক

কারিকর ও শিল্পীর একরূপ অন্নের সংস্থান হইয়াছে। কিন্তু দেশে কল-কারখানা আজও এত কম যে, তাহাদের ফল দেশব্যাপী হইতে অনেক বিলম্ব আছে। কলকারখানার যেমন কতকগুলি সুফল তেমনি কতকগুলি কুফলও আছে। কিন্তু এখানে তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার দরকার নাই।

যে শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হইতেছে, তাহাদের অবস্থার সাধারণতঃ কতকটা উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলি কারণ উন্নতির পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (১) কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের মূল্য বৃদ্ধি—যে লোক এখন একটা কাজ করিয়া রোজ ৷৷০ আট আনা উপায় করিতেছে ৬০ বৎসর পূর্ব্বে তার পিতামহ হয় ত সেই কাজ করিয়া ৵০ আনার বেশী উপায় করিতে পারিত না; কিন্তু তখন যে চাউলের মণ ১৷০ ছিল তাহার মণ যদি এখন ৩৲ টাকা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান আয় বৃদ্ধি কেবল নাম মাত্র। কার্য্যতঃ উহা কিছুই নয়। অনেকস্থলে যে ইহাই ঘটিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। (২) অত্যধিক প্রতিযোগিতা—প্রতিযোগিতা সভ্যতার একটী চিহ্ন, কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় ইহা উপকারী নয়। অপরিমিত প্রতিযোগিতা উপকার না করিয়া অপকারই করে। একটী ক্ষুদ্রগ্রামে আমার একখানি মুদীর দোকান আছে। হয় ত এক খানির বেশী সেখানে চলিতে পারে না। তুমি দেখিলে, তোমার অন্নের সংস্থান হইয়া উঠিতেছে না, আমি একপ্রকার সুখে আছি। অনেক চেষ্টায় তুমি কিছু মূলধন জুটাইয়া আমার দোকানের পার্শ্বে আর একখানি মুদীর দোকান খুলিলে; লাভের মধ্যে এই হইল, তোমার দুঃখ ঘুচিল না এবং আমার দুঃখ বাড়িল। এরূপ প্রতিযোগিতা দূষণীয়। উদরান্নের সংস্থান যত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, এইরূপ প্রতিযোগিতা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশে দারিদ্র্য খুব। কাজে কাজেই লোকে অনন্যোপায় হইয়া অনেকস্থলে এইরূপ প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতেছে। (৩) অমিতব্যয় ও বিলাসিতা। (৪) ম্যালেরিয়া জ্বর। (৫) বহু সন্তানোৎপাদন। এই কয়টী বিষয়ের উপর ইতিপূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখানে আর বেশী কিছু না বলিলে চলে। যে শ্রেণীর কথা আলোচনা করা যাইতেছে তাহার অনেকেই অপরিণামদর্শী, অমিতব্যয়ী এবং অনেকেরই বাবুয়ানার দিকে ঝোঁক হইয়াছে। যেখানে ম্যালেরিয়া আছে তথায় ইহার হাতে প্রায় কাহারও নিস্তার নাই। বহু-সন্তানোৎপাদন আমাদের সকলেরই এক প্রধান কাজ। সন্তানোৎপাদনের

জন্তই বিবাহ এবং যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের সকলেরই বিবাহ হইয়া থাকে। (৩) নেশা—ইহার কথাও পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। যে শ্রেণী আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় আব্‌কারিকরের ইহারা আজ কাল এক প্রধান সহায়। পানদোষ কৃষকের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কারিকর ব্যবসাদার প্রভৃতির মধ্যে এই দোষ বিশেষ প্রবল। ইহার জন্ত অনেকে রীতিমত পরিশ্রম করে না, এবং অনেকের অনন্তাশ্রয় পরিবারবর্গ অনাহারে অর্দ্ধেক সময় অতিবাহিত করে।

মুটে মজুর প্রভৃতি শ্রমিকদের অবস্থা সাধারণতঃ বড়ই হীন। অনেক স্থলে ইহারা দিন ৩। ৪ আনার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না। যে সব স্থানে কলকারখানা আছে সেখানে ইহাদের উপায় কিছু বেশী হয় বটে, কিন্তু সেরূপ স্থান দেশে কত? যেখানে টাকায় ৩টা ঘরামি বা ৫টা জোগাড়ে সেখানে ইহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। এমন স্থান ঢের আছে যেখানে একজন ঘরামির পক্ষে ।/০ আনা, ও একজন জোগাড়ের পক্ষে ৵০ আনা রোজগারও অসম্ভব। শরীর সবল থাকিলে ৵০ আনার বেশী উপায় করিতে পারে না প্রতিগ্রামে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এবং আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া প্রসাদাৎ যে গ্রামে একজন মজুর বা অন্তরূপ শ্রমিককে মাসের মধ্যে ৫। ৭। ১০ দিন জ্বরে ভুগিতে হয় সেরূপ গ্রামের নিতান্ত অপ্রতুল নাই। আমার একজন পরিচিত ডাক্তার আছেন তাঁহার এক গরীব পল্লীর নিকট বাস, এবং অনেক গরীব ব্যক্তিকে তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে হয়। তিনি বলেন, "স্ত্রীপুত্র লইয়া ৫। ৭টী পোষ্য এবং নিজে রোগে ভুগিতেছে, এমন যে কত শ্রমিক দেখিতে পাই তাহা আর কি বলিব।" ইহারা প্রায় সকলেই রোজ ৵০ আনার বেশী কিছুতেই উপার্জ্জন করিতে পারে না, এবং যখন সুস্থ ও সবল থাকে তখন যে ভবিষ্যতের জন্ত কিছু সঞ্চয় করিতে পারে ইহা অসম্ভব। স্ত্রীপুত্রাদিকে যে একবেলা পেট-পুরিয়া আহার দিতে অক্ষম সে যে কিছু সঞ্চয় করিবে বাতুল ভিন্ন অন্ত কেহ তাহা ভাবিতে পারে না। যেরূপ দরিদ্রতার কথা উল্লেখ করা গেল, ইহা কি দেশে বড় বিরল? আহার্য্য দ্রব্যের আজ কাল কি দর তাহা সকলেরই জানা আছে? যাহার রোজ ৵০ আনা আর ৫। ৬টী পোষ্যের শুধু ভাত যোগানই তার ক্ষমতার বাহিরে। তাহার উপর নিজের ও পরিবারবর্গের কাপড় আছে। ব্যায়ামও নিত্য বস্তুর মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে

প্রকার লোকের কথা বলা যাইতেছে, আমাদের দেশে ইহারা কেহই অবিবাহিত থাকে না। বংশবৃদ্ধি ইহাদের বেশ। যে সব সন্তান জন্মায় সকলেই যে বাঁচিয়া থাকে তাহা নয়। কতকগুলি শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা বলিয়া কষ্ট পাইবার ও কষ্ট দিবার লোকের অভাব হয় না। অধিকন্তু এই সব লোকের মধ্যে নেশাখোর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের অবস্থা এইরূপ তাহাদের নিকট আত্মসংযম আশা করা অন্যায়। যখন আত্মাভিমানী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মসংযমীর সংখ্যা বেশী বলিয়া বোধ হয় না, তখন নিরক্ষর দুঃখদগ্ধ মুটে মজুর যে সংযমী হইবে, তাহা হইতে পারে না। অনেক শ্রমজীবী আছে, যাহারা সন্ধ্যার সময় সমস্ত দিনের কষ্টলব্ধ উপার্জ্জনের অধিকাংশ এক তাড়ীওয়ালার কিম্বা দেশীয় মদবিক্রেতার দোকানে দিয়া টলিতে টলিতে নিরানন্দে বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়।

গৃহস্থদের অত্যাবশ্যকীয় ঝী চাকরদের অবস্থা কি কেহ কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? তাহারা গৃহস্থের বাড়ী খায় পরে এবং ঝী হইলে জোর ২৲ টাকা ২॥• টাকা, এবং চাকর হইলে জোর ৩। ৪ টাকা মাহিয়ানা পায়। ঝীকে হয় ত বৃদ্ধা মা, নিজের বা মৃত ভাই কিম্বা ভগিনীর ২। ৩টী সন্তান প্রতিপালন করিতে হয়। চাকরটীর ত গৃহস্থালীর সমস্ত সামগ্রীই আছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহাদের মাহিয়ানা কিছু বাড়িয়াছে বটে (অবশ্য যৎকিঞ্চিৎ) কিন্তু তাহাতে হইল কি? ২৲ টাকার স্থলে ২॥• টাকা কিম্বা ৩৲ টাকার স্থলে ৪৲ টাকা হওয়াতে ইহাদের যে বিশেষ উপকার হইয়াছে তাহা মনে করা এক বিষম ভ্রম। এই অবস্থার উপর আবার কতকটা অবস্থাপন্ন লোকের সংসর্গে থাকায় ইহাদের অনেক সময় চাল বিগড়াইয়া যায়। অনেক চাকরকে ইংরাজী জুতা ও কোট পরিতে, ও অনেক ঝীকে নিজের নববিবাহিতা পুত্রবধূর জন্য ৭। ৮ টাকা দামের বোম্বাই সাটী, ও রাঁধুনী ঠাকুরাণীকে ছেলে কিম্বা ভাইয়ের জন্য ৭। ৮ টাকা দামের র‍্যাফার কিনিতে দেখিয়াছি। কোন কোন স্থলে ঝী চাকরের একটু টান পড়িয়াছে বটে, তাহা একটা সুলক্ষণ বলিয়া বোধ হয়। ইহার অর্থ যাহাদের পূর্ব্বে ঝী বা চাকর হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না তাহারা বেশী পয়সা পাওয়া যায় এমন কাজ পাইতেছে। কিন্তু এরূপ স্থলের সংখ্যা বড় কম।

এই খানে প্রবন্ধ শেষ করা গেল। বাহুল্যভয়ে অনেক কথা বলা গেল না। অজ্ঞতানিবন্ধন অনেক কথা বলিতে পারিলাম না। পাঠক পাঠি-

কার যদি "আমাদের অবস্থার" প্রতি মন আকর্ষিত হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট। দ।

পলাশ বন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

কিরূপস্থলে বাটী নির্ম্মিত হইল, তাহার একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাউক। পিতৃদেব যে স্থানটী বসবাসের জন্ম মনোনীত করিয়াছিলেন, সেইস্থান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটী বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে। এই ভূখণ্ডের উত্তর ভাগে কৃষ্ণপ্রস্তরের একটী অনুচ্চ শৈল। শৈলের উপরে দুই একটী পলাশ বৃক্ষ ও আরণ্যলতা ভিন্ন আর কোনও উদ্ভিদ্ নাই। বোধ হয়, বহুপূর্ব্বে শৈলটি একটী অখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর ছিল; কিন্তু তাহা কোনও নৈসর্গিক কারণে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। এই শৈলের পাদমূলে ও চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ কৃষ্ণপ্রস্তররাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে; দেখিয়া বোধ হয় যেন কোন সুনিপুণ শিল্পী স্থানটির শোভাবর্দ্ধনের জন্ম অতিশয় যত্নসহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রস্তর-খণ্ড ও কৃষ্ণপ্রস্তর স্তূপ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া সেই স্থানের সৌন্দর্য্যে ভীষণতা আনয়ন করিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন, আরণ্য হস্তিযূথেরা যদৃচ্ছাক্রমে শয়ন ও উপবেশন করিয়া সেই স্থানে বিশ্রামসুখ-লাভ করিতেছে। সেই স্থানে পলাশবৃক্ষ ভিন্ন প্রায় অন্ম জাতীয় বৃক্ষ নাই। একটী ক্ষুদ্র তটিনী কোন এক অজ্ঞাত নিভৃত স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই শৈলের পাদমূল প্রক্ষালন করিতে করিতে অদূরে শ্যামল অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ জলধারা উল্লাসে প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে লম্ফপ্রদান করিতে করিতে এক মধুর সঙ্গীতের সৃষ্টি করি-তেছে। শৈলের পাদমূল হইতে ভূখণ্ডটি আনত হইয়া দক্ষিণদিকে প্রসারিত হইয়াছে। এই ভূখণ্ড বনাচ্ছন্ন; কিন্তু বন নিবিড় নহে, এবং বৃক্ষাদির মধ্যে শালবৃক্ষের সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য আরণ্য বৃক্ষও বিস্তর। অপেক্ষা-

কৃত পরিষ্কৃত স্থলে কতকগুলি শাখাপ্রসারী প্রগাঢ় ছায়া-সম্বলিত বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমগ্র ভূখণ্ডের পরিমাণ প্রায় চারি শত বিঘা। ইহার উত্তরদিকে পূর্ব্বোক্ত শৈল ও পলাশবৃক্ষরাজি; পশ্চিমদিকে যমুনা তটিনী ও নিবিড় বন; দক্ষিণদিকে যমুনা ও গুল্মাচ্ছন্ন ভূমি; পূর্ব্বদিকে একটী গ্রাম্য রাজপথ; এই পথের অব্যবহিত পূর্ব্বভাগেই পলাশবন গ্রাম, যাহার কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।

গ্রাম্য রাজপথের পশ্চিম ভাগে প্রায় পঞ্চাশ বিঘা ভূমি বনাচ্ছন্ন নহে। পূর্ব্বে অবশ্য এখানে বন ছিল; কিন্তু তাহা কর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল কতকগুলি প্রয়োজনীয় সুন্দর বৃক্ষই যদৃচ্ছাক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই বৃক্ষগুলি কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া স্থানটিকে মনোরম করিয়াছে। আমি এই স্থানটিই মনোনীত করিয়া তন্মধ্যে আবাসবাটী প্রস্তুত করাইলাম। আবাসবাটীর বামভাগে অদূরে গ্রাম্য রাজপথ ও পলাশবন গ্রাম; দক্ষিণভাগে কতিপয় হস্ত দূরেই শালবন; সম্মুখে কিয়দ্দূরে যমুনাতটিনী ও গুল্মাবৃত ভূমি; তটিনীর পর পারে আবার শ্যামল বন। পশ্চাতে শালবন ও শৈল। বাটীর অব্যবহিত তিন দিকেই বৃহৎবৃক্ষ শোভিত পরিষ্কৃত ভূমি, কেবল পশ্চিম দিক্‌টিই শালবনের সহিত একেবারে সংলগ্ন।

বাটীটি ইষ্টক নির্ম্মিত হইল। একটী বৃহৎ পরিবার যাহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে পিতৃদেব তদুপযুক্ত গৃহ প্রস্তুত করাইলেন। আমি কিন্তু এত বড় গৃহের পক্ষপাতী ছিলাম না। দ্বিতলেও কতিপয় গৃহ নির্ম্মিত হইল। এরূপ উচ্চ ভূমিতে দ্বিতল গৃহেরও কোন আবশ্যক ছিল না; কিন্তু কেবল চতুর্দ্দিকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্যই ঈদৃশ গৃহ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা মনে করিয়াছিলাম। দ্বিতলের একটী গৃহ পাঠগৃহে পরিণত হইল। ইংরেজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তকাবলী সেখানে স্তরে স্তরে সজ্জিত করিলাম। তিন দিকের গবাক্ষ উন্মোচন করিলে, সেই গৃহের মধ্যে বসিয়াই প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দেখিতে পাইতাম। কত অজ্ঞাতনামা সুকণ্ঠ আরণ্য পক্ষী বাটীসংলগ্ন বৃক্ষ-শাখায় উপবেশন করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে অমৃতধারা বর্ষণ করিত। আরণ্য-কপোতের কূজনে সেই স্থান প্রায় সর্ব্বক্ষণই প্রতিধ্বনিত হইত। কখন একটি হরিণশিশু সহসা নয়নপথে পতিত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে অদৃশ্য হইয়া যাইত; কখনও বা শশকেরা নির্ভয়ে বিবর হইতে বহির্গত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের সুকোমল পত্রগুলি চর্ব্বণ

করিত। দূরস্থিত নিবিড় অরণ্য হইতে কখন কখন ময়ূরের কেকারবও শুনিতে পাইতাম। বলা বাহুল্য, পলাশবন বা তাহার সন্নিহিত স্থান সমূহে হিংস্র জন্তুর তাদৃশ ভয় ছিল না। হিংস্র জন্তুরা অরণ্যে থাকিলেও লোকালয়ের সন্নিকটে প্রায় আসিত না। আমি বহুকাল মৃগের ন্যায় অরণ্যে বিচরণ করিয়াছি; কিন্তু কখনও কোনও হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়ি নাই।

আমার আবাসবাটীর কথা বলিলাম; এক্ষণে পলাশবন গ্রাম সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা যাউক। জনসমাজমধ্যে বাস করিবার প্রবৃত্তি মানব হৃদয়ে এরূপ প্রবল যে, অতীব নির্জ্জনতাপ্রিয় হইলেও, আমরা লোকসমাজ হইতে দূরে থাকিতে ভাল বাসি না। মানবের মুখমণ্ডলে যে একটী অপূর্ব্ব আত্মীয়তা ও সমবেদনার ভাব অঙ্কিত আছে, তাহা জড়, উদ্ভিদ্‌ বা নিকৃষ্ট প্রাণিজগতে সহস্র চেষ্টা ও অন্বেষণ করিয়াও পাওয়া যায় না। নিকৃষ্ট জীবেরাও স্ব স্ব শ্রেণীতে দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভাল বাসে। আমি যেখানে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিলাম, তাহার সন্নিধানে যদি গ্রাম না থাকিত, তাহা হইলে আমি ঐ স্থানে কখনও একাকী বাস করিবার সঙ্কল্প করিতাম কি না সন্দেহ স্থল। যাহা হউক, এই গ্রামের নিকটে বাস করিয়া আমি যার পর নাই সুখে কালযাপন করিতেছি ও নানাপ্রকারে উপকৃত হইয়াছি। গ্রামের নিরীহ কৃষকদের সহবাসে আমি যে আনন্দ-ভোগ করিয়াছি, বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয়, অনেক শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি ব্যক্তির সহবাসেও তাহা ভোগ করিতে সমর্থ হই নাই। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমাকে যেরূপ স্নেহ, দয়া ও বিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ যোগ্য নহি। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ই পলাশবনের প্রাণস্বরূপ। তাঁহার উদারচরিত্র, উন্নত ধর্ম্মজীবন ও গভীর জ্ঞানের যথোচিত তুলনা হয় না। তাঁহার গৃহিণী একটী আদর্শ গৃহিণী ও তাঁহার পুত্রকন্যারা আদর্শ পুত্রকন্যা। যথাসময়ে পাঠকবর্গ ইঁহাদের সহিত পরিচিত হইবেন। ইঁহারাই কৃষক ও অন্যান্য পরিবারবর্গের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের সামান্য কুটীরে যে জ্ঞান, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার অস্পষ্ট ছায়াও যে কখন আমার গর্ব্বিতচূড় ত্রিতলগৃহে দেখিতে পাইব, তাহার আশা করিলাম না। এই অজ্ঞাতনামা পলাশবনে যে শেষে আমার বিদ্যাভিমান ও জ্ঞানগরিমা চূর্ণবিচূর্ণ হইবে, ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। সকলই ভগবানের লীলা। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত

পরিচিত হইয়া অবধি, আমি কি জন্ত পলাশবনে আসিয়া বাস করিলাম, তাহা কাহাকেও পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতাম।

বঙ্কিমচন্দ্র।

রজনী—রজনী ক্ষুদ্র কিন্তু আদ্যোপান্ত সুন্দর। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা, প্রভূত উজ্জ্বল চিন্তা, স্থিরীকৃত ধারণা এবং যৌবনাবেগ ও উৎসাহের অরুণরাগ সম্মিলিত হইয়াছে। এই পুস্তক রচনায় গ্রন্থকার একটু নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে উপন্যাসের অংশ-বিশেষ নায়ক বা নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে যে সুবিধা হয় তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার আপনিই বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন। "এই প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়।" ইহাতে গ্রন্থের আকর্ষণীশক্তি ও মাধুরী আরও বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে পাঠকের সুবিধা, কিন্তু গ্রন্থকারের অসুবিধা, ইহাতে তাঁহার বিপুল ক্ষমতাপ্রয়োগ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কারণ ইহাতে প্রত্যেক চরিত্রের চরিত্রগত বিভিন্নতার সহিত ভাষাগত বিভিন্নতাও রক্ষা করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের বলিবার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হওয়া চাই; ইহা বড় সহজ নহে। উইল্‌কি কলিন্স বা বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষমতা সকলের থাকে না—তাই এই প্রণালীতে রচিত উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এ বিষয়ে কলিন্সের ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষমতাকে পরাভূত করিয়াছে। "The Woman in white" ও "Moonstone" গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়; যিনি দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থে কুমারী ক্ল্যাকের বর্ণনাকৌশল আদ্যোপান্ত সমান রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতা যে অসাধারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থে প্রধান চরিত্র রজনী, লবঙ্গলতা, অমরনাথ ও শচীন্দ্র। চন্দ্রশেখরের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে গ্রন্থদ্বয়ান্তর্গত কয়টী চরিত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় একটু আছে। প্রতাপকে ভাল বাসিয়াও শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করিল, আর অন্ধ রজনী সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়া "মাথার উপর দেবতা আছেন" এই ভরসা করিয়া গৃহত্যাগ করিল—শেষ অসহায় যুবতী প্রভাতবায়ু তাড়িত গঙ্গাজল-প্রবাহ

মধ্যে নিমগ্না হইল। প্রতাপ শৈবলিনীকে ভাল বাসিয়াও আর একজনকে বিবাহ করিলেন, অমরনাথ পরোপকার বৃত্তির উত্তেজনায় পরের মঙ্গল কল্পে আপনার হৃদয় আপনি পদতলে নিষ্পেষিত করিলেন—হৃদয়ে অগ্নি জ্বালিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রতাপ বরাবর ঐশ্বর্য্যশালী, তথাপি ইন্দ্রিয়জয়ী, কিন্তু অমরনাথ অবস্থার পরিবর্ত্তনে মনঃসংযম করিতে পারিয়াছিলেন।* প্রতাপের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এখানে অমরনাথের কথা বলিব। শেষ তুলনা শৈবলিনীতে ও লবঙ্গলতায়।

রজনীর ভাষায় আদ্যোপান্ত একটা সংযম এবং স্থানে স্থানে মধুর হাস্যরসসিঞ্চন দৃষ্ট হয়। গ্রন্থের মধ্যে আদর্শ চরিত্র অমরনাথের মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটি কথা বলাইয়াছেন—তাহা বিবেচ্য, তিনি রচিত গ্রন্থসকল মধ্যে প্রকারান্তরে বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির একরূপ অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন "জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজি নহি, আমি ততদূর আজিও সুশিক্ষিত হই নাই। আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক, এবং যে গালি শিরোমণি মহাশয় দিলে নিঃশব্দে সহিব, ঝাড়ুদারের কাছে তাহা সহিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমার জাতি থাকুক।" সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে একথা কেন? বঙ্গদর্শনে রজনী ও সাম্য এক সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের "ব্রাহ্মণাপবাদ"; আছে; তিনি সেই লোকবিশ্রুত জ্ঞানগরিমাময় ব্রাহ্মণকুলে জন্মহেতু গর্ব্বিত একথাও প্রকারান্তরে মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে পঠিত এক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মহাগ্রন্থ সাম্যে বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন বর্ণ বৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। * * * * এই গুরুতর বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল।" এক লেখকের মুখে দুই কথা কেমন শুনায়; সেইজন্য বলিয়া রাখা ভাল যে, রজনীর বিজ্ঞাপনে তিনি বলিয়াছেন "এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে, যে ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে।" আবার মত পরিবর্ত্তন হেতু তিনি সাম্য পুনর্মুদ্রিত করেন নাই। বঙ্গদর্শনে প্রকাশকালে রজনীতে উদ্ধৃত অংশ বোধ হয় ছিল না।

* সাধনা—(তৃতীয়বর্ষ দ্বিতীয়ভাগ)।

এই জাতিভেদ, এই বর্ণগত বৈষম্য আজিও একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন এক দলের মত এই যে, এই বৈষম্য লোপ না করিলে সামাজিক উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইবে না এবং কবে ভবিষ্যতে মানবহৃদয় ইহার উপযোগিতা অনুভব করিবে তাহার জন্ত অপেক্ষা করা অনুচিত। তাঁহারা বলেন :—

"Know ye not,
Themselves must strike the blow who would be free ?"

যেখানে মৃদুতায় চলে না, সেখানে মৃদুতা পরিহার করিতে হইবে; যেখানে বিপ্লব প্রয়োজন সেখানে বিপ্লব উৎপন্ন করিতে হইবে। আর একদল বলেন যে, ইহা হিন্দুসমাজের ভিত্তি; এই বৈষম্যের দৃঢ়গঠিত দুর্গের বাহিরে আনিলে হিন্দুসমাজ ছারখার হইয়া যাইবে। সকল সমাজেই ইহা প্রয়োজন। হার্বার্ট স্পেনসার প্রমুখ দার্শনিকগণ দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডে একপ্রকার ভেদ উৎপন্ন হইতেছে। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এক ব্যবসায় অবলম্বন করায় ইংলণ্ডেও একপ্রকার তন্তুবায়, কর্ম্মকার প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে। যে ইংলণ্ডের দোহাই দিয়া উদারনৈতিক দল কার্য্য করিতে চাহেন, সে ইংলণ্ডেও এই অবস্থা! আবার একদল মধ্যবাদী বলেন যে, প্রতীচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে আমাদিগের সামাজিক আকাশে যে বাষ্প সঞ্চিত হইতেছে, তাহাই কালে করাল-কাদম্বিনী-কলেবর-পরিগ্রহ করিয়া বিপ্লব-ঝটিকা আনয়ন করিবে। পরিবর্ত্তনের পবন এখনই বহিতেছে। ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই—আপনিই পরিবর্ত্তন আসিবে। এই সকল মতের সত্যাসত্য, সারত্বাসারত্ব বিবেচনা করিবার স্থান এ নহে। বঙ্কিমচন্দ্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই এখানে বলিলাম; তিনি প্রায় মধ্যমতাবলম্বী।

যখন ক্ষুদ্র মেঘাবরণাবৃত পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের মত অন্ধ-রজনীকে গ্রন্থকার পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলেন, তখন পাঠকের মনে পড়িল রজনীর সেই গীতের একটি চরণ ;—

"এত সাধের প্রভাতে ফুটলো নাকো কলি—"

এ কোরক ফুটিতে পাইল কই? রজনীর হৃদয়ের দৃঢ়তা অপরিসীম, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, রূপ অসামান্ত; কিন্তু সে অন্ধ—"পরশমণি" তাহার নাই। তাহার মনশ্চক্ষুতে বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—বাহ্য চক্ষুতে তাহা নাই কেন? চন্দ্র কি নিষ্কলঙ্ক হয় না? পাঠকের মনে রজনীর উপর অসহায়ের জন্ত স্নেহোদ্রেক করাইয়া গ্রন্থ-

কার আরম্ভ করিলেন। অন্ধ যুবতী অন্নের জন্য নবদম্পতীর গৃহে ফুল যোগাইত —সেই প্রাচীন নবীনের মিলন-সুখ-সমুজ্জ্বলগৃহে সে ফুল যোগাইত। কিন্তু—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়
সলিল বহে যায় নয়নে!"

কুসুমরাশির মধ্যে বসিয়া কুসুমকোমলা রজনী খেলা করিত; সে জানিত না যে জগতে সহসা "হৃদয় পড়ে আসি বাঁধনে!" একদিন তাহার হৃদয়ে যৌবনপ্রভাতে প্রেমের কুসুম ফুটিয়া উঠিল, প্রেমের সৌরভে যৌবন বসন্ত ভরিয়া গেল, এখন বাহিরের কুসুম অপেক্ষা অন্তরের কুসুম সুন্দর বোধ হইল। শচীন্দ্রকে পাইবার আশা সে কেমন করিয়া করিবে! তবুও সে ভাল বাসিল—

"রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী
আপনি টুটিয়া যায়
সুখ পায় তায় সে।
চির-কলিকা-জনম কে করে বহন
চির-শিশির রাতে!"

কবি গুরু সেক্‌স্‌পীয়ার বলিয়াছেন:—

"Love looks not with the eyes, but with the mind,
And therefore is wing'd Cupid painted blind."

তাই অন্ধ রজনীর হৃদয়ে তাহার অব্যর্থ কুসুমশর প্রবেশ করিল—আঁধার হৃদয় সহসা জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। সে শচীন্দ্রের অমৃতময় কণ্ঠস্বর শুনিল, তাহার পর শচীন্দ্রের স্পর্শ; তাহার মনে হইল যেন:—

"সহসা পূরিল সৌরভে,
দশ-দিশ; পূর্ণচন্দ্র আভা জিনি আভা,
উজলিল চারিদিক।"

সে ভাবিল—

"সহসা ফুটিল
নব কুমুদিনীসম এ পরাণ মম,
উল্লাসে—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে।"

তাহার পর রজনীর চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পরিদর্শিত হইয়াছে। প্রথমে রজনী আপনার অবস্থা লইয়া সন্তুষ্ট ছিল ; এমন কি গর্ব্বিতাও ছিল। তাহার চক্ষু ছিল না ; কিন্তু সে বলিয়াছে "অনেক অপাঙ্গরঙ্গরঙ্গিনী, আমার চিরকৌমার্য্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে 'আহা আমিও যদি কাণা হইতাম!'" যখন শচীন্দ্রের করস্পর্শে সেই অন্ধের হৃদয় সর্ব্বাঙ্গে কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন একবার সে কাঁদিয়া প্রকৃতির নিকট দৃষ্টি চাহিয়াছিল। উইল্‌কি কলিন্স কৃত Poor Miss Finch নামক উপন্যাসের নায়িকা অন্ধ লুসিলাও অস্‌কারকে দেখিবার জন্য এমনই ব্যগ্র হইয়া দৃষ্টি চাহিয়াছিলেন। সে আবার লবঙ্গলতাকে বলিয়াছে "ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি ?"

রজনীর হৃদয়ে প্রেম ও বল বর্ণনাতীত সুন্দরভাবে মিশ্রিত। সে শচীন্দ্রকে ভাল বাসে ; তাই সে প্রেমের অপমান সহিতে সম্মত হইল না—হৃদয়কে বুঝাইল :—

"আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের অপমান সহে শত অপমান
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে
তোমারো চেয়ে সে যে মহীয়ান্।"

তাই সেই গভীর রজনীতে অন্ধযুবতী একাকিনী প্রেমের ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া গৃহত্যাগ করিল। পথে সে হীরালালের লাঠি ভাঙ্গিয়া লইল—সে তাহার মনের বলেরই পরিচায়ক। নানা দুঃখকষ্টে তাহার প্রেমের পরিপাক হইতে লাগিল। শেষকালে সে লবঙ্গলতাকে বলিয়াছিল "সেদিন গঙ্গার জলে আমি ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলাম—ডুবিয়াছিলাম, লোকে ধরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্য। তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব—আমি তাহা চাহিতাম না—আমি শচীন্দ্র চাহিতাম। শচীন্দ্রের অপেক্ষা এ জগতে আর কিছুই নাই—আমার প্রাণ তাঁহার কাছে দেবতার কাছে ফুলের কণিমাত্র—শ্রীচরণে স্থান পাইলেই সার্থক।"

রজনী বুদ্ধিমতী—জনহীনা রাত্রিতে গঙ্গার কলকল জলকল্লোল শুনিতে শুনিতে তাহার চিন্তা গভীর বুদ্ধির পরিচায়ক। তাহার পরও কতবার তাহার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি। তাহার কৃতজ্ঞতা অসাধারণ। অমরনাথের প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা কি এই স্বার্থপরতাময় জগতে সহজপ্রাপ্য ?

অমরনাথের যৌবনে কৃত পাপের কথা শুনিয়াও সে বলিয়াছিল "আপনি যদি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকেন—আপনি যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনি আমার কাছে দেবতা।" কিন্তু এই কৃতজ্ঞতাধিক্যই তাহার দৌর্ব্বল্য—সেইজন্যই সে অমরনাথকে বিবাহ করিতে প্রথমে সম্মত হইয়াছিল। রজনী বঙ্গসাহিত্যে নূতন ও সুন্দর সৃষ্টি। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে লিটন সৃজিত নিদিয়া চরিত্র স্মরণে রজনী সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু লিটন সৃজিত চরিত্রবিশেষ বা কলিন্স সৃজিত চরিত্রবিশেষ * স্মরণে যদিও রজনী সূচিত হইয়া থাকে, তথাপি যে দর্পে মিল্টন পূর্ব্বে ত্রিদিবচ্যুতিসম্বন্ধীয় কয়খানি গ্রন্থ রচিত হইলেও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে তিনি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন সে সকল "Things unattempted yet in prose or rhyme", সেই দর্পে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে পারিতেন যে রজনীচরিত্র মৌলিক।

রজনী নবীনা লবঙ্গলতা নবীনা ও প্রবীনার সঙ্গমস্থল; রজনীর চাঞ্চল্য লবঙ্গলতায় নাই, রজনীর ব্যস্তভাব, লবঙ্গলতায় ধীরতা। রজনী সৌন্দর্য্যের একটা কাল্পনিক আদর্শ, লবঙ্গলতা সৌন্দর্য্যের একটা বাস্তব চিত্র, সৌন্দর্য্যের সাংসারিক সংস্করণ। রজনীর শোভায় আশ্চর্য্য হই, লবঙ্গলতার শোভায় মুগ্ধ হই। সংসারাতপতাপ রজনী ভোগ করে নাই, লবঙ্গলতার মাধুরী খাঁটি মাধুরী, অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের মত তাহা সংসার সংঘর্ষে নির্ম্মলতার শেষসীমা পাইয়া টিকিয়া আছে। সেইজন্য রজনীর চরিত্র হইতেও লবঙ্গলতার চরিত্র চিত্তাকর্ষক। লবঙ্গলতার গুণ অপরিসীম; তাঁহার প্রেম দৃঢ়, নহিলে বৃদ্ধ রামসদয় তাঁহার "ষোল আনা গৃহিণীর" প্রেমে জগতে স্বর্গসুখ ভোগ

---

* শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর কোন বঙ্গীয় লেখক এই কথা রটাইতেছেন যে উইল্‌কি কলিন্সকৃত Poor Miss Finch গ্রন্থের নায়িকার চরিত্র হইতে বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর চরিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের উৎসর্গে লিখিত আছে যে উহার পূর্ব্বে উপন্যাস ও নাটকে একাধিক অন্ধ বালিকার কথা বিবৃত হইয়াছে। লিটন রচিত Last Days of Pompeii গ্রন্থ উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিন্স সৃজিত চরিত্রের সহিত রজনীর বিশেষ সাদৃশ্য নাই। সামান্য সাদৃশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে আশ্চর্য্য নহে। বিখ্যাত হোমরের কোন বিখ্যাত গ্রন্থের সহিত শুনিতেছি বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত কোন চীনদেশীয় গ্রন্থের প্রভূত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। হোমর অবশ্য সে গ্রন্থ দেখেন নাই। এরূপ রটনায় বঙ্কিমচন্দ্রের যশের হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে কেবল যাঁহারা রটনা করেন তাঁহাদিগের মনোভাব ব্যক্ত হয়। লেখক।

করিতে পারিতেন না। লবঙ্গলতার হৃদয়ে ভালবাসা প্রবল। কয়জন সপত্নীকে ভগিনীর মত ভালবাসিতে পারে? কয়জন সপত্নীপুত্রকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত মাতৃস্নেহের নিবিড়সুখতপ্ত পক্ষপুটে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে? কয়জন জগতকে আপনার করিয়া লইতে পারে? সকলকে এত ভাল বাসিতেন, এত আপনার ভাবিতেন বলিয়াই লবঙ্গ সকলকে অত গালি দিতেন। লবঙ্গলতা পাকা গৃহিণী। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; এই গৃহিণীপনা, এই সংসারজ্ঞানই তাঁহার চরিত্রে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। থ্যাকারে একস্থানে বলিয়াছেন "To be skilful in domestic duties was surely one of the most charming of woman's qualities." সংসার শিক্ষাই লবঙ্গলতার চরিত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লবঙ্গলতার হৃদয় কোমল, তিনি সকলের দুঃখে কষ্টে ব্যথিত। তাই অমরনাথের কলঙ্কের ছাপের জন্য তিনি দুঃখিত। আবার তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল; তিনি অমরনাথকে বলিয়াছিলেন, "যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।" লবঙ্গলতা কাঁদিলেন। লবঙ্গলতার এতগুলি গুণ দেখিলে তবে বুঝিতে পারা যায়, কেন তাঁহার প্রেমস্রোতে বৃদ্ধ রামসদয় নবীনত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যখন এতগুলি গুণের অবতার লবঙ্গলতার চিত্র মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বিভাসিত হইয়া উঠে, তখন টেনিসনের সেই সুন্দর চরণটি মনে পড়ে;—

"She stood, a sight to make an old man young."

লবঙ্গলতা গৃহিণীর ও পত্নীর উচ্চ আদর্শ। সেই সঙ্গে তাঁহার দয়ার উল্লেখ করিতে হয়। রজনীকে ডবল পয়সার সঙ্গে টাকা দেওয়া ভুল নহে—দয়ামাত্র।

আকাশে চন্দ্রের মত এই গ্রন্থমধ্যে অমরনাথ। কাব্যসুন্দরী-প্রণেতা বলিয়াছেন, "প্রতাপ সংসারী, অমরনাথ ঋষি।" যেমন করিয়া ঈশ্বরের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া জেকব জয়ী হইয়াছিলেন, তেমনই করিয়া দ্বন্দ্ব করিয়া প্রতাপ বাসনা জয় করিয়াছিলেন। অমরনাথ রজনী গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে একবার অসংযমের পরিচয় দিয়াছিলেন—তাহার পর তিনি সংযত।

সংসারে প্রতাপের আদর্শ বড় উচ্চ। নূতন সংসার-প্রবিষ্টদিগের শিক্ষার জন্য অমরনাথ আপনার জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—"দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।" অমরনাথের চরিত্রে একটিমাত্র দোষ দৃষ্ট হয়—সে দোষ সাধারণ নহে, তাই তাহার প্রায়শ্চিত্তও হইয়াছিল গুরুতর। কিন্তু বোধ হয় অত সদ্‌গুণের মধ্যে পতিত হইয়াছিল বলিয়াই উহা অত দৃষ্টিপথে পতিত হয়, কারণ "The smallest speck is seen on snow"। কবি বলিয়াছেন ;—

"সন্দেহ হইত কি না রাবণ ঘৃণিত,
রামের ছায়ায় যদি না হতো চিত্রিত।"

এ কথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিকরূপে সত্য বটে। যৌবনের আকুলতায় অমরনাথ না বুঝিয়া দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন—তাঁহার পবিত্র চরিত্রে তাহা বড়ই কালিমাময় বোধ হয়। দেবেন্দ্র দত্তের শত পাপের মধ্যে এরূপ একটা পাপ তেমন দৃষ্টি-আকর্ষক হইত না। সেই দুষ্কার্য্যের জন্য অমরনাথ চিরদিন পরিতপ্ত ; শেষকালেও তিনি লবঙ্গলতাকে বলিয়াছিলেন, "উচিত দণ্ড করিয়াছিলে,—তোমার অপরাধ নাই।" গ্রন্থারম্ভকালে তাঁহার মনের অবস্থা তত ভাল নহে ; তখনও তাঁহার হৃদয় সেই দুষ্কার্য্যের জন্য বড়ই ব্যথিত, বড়ই লজ্জিত। "কালের শীতলপ্রলেপে সেই হৃদয় ক্ষত, ক্রমে পুরিয়া আসিতে লাগিল।" তাহার পর "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে"—অমরনাথের হৃদয়ে প্রেম জাগিল। শেষ অমরনাথ যখন বলিলেন, "এ ভবের হাট হইতে, আমার দোকানপাট উঠাইতে হইল। আমার অদৃষ্টে সুখ বিধাতা লিখেন নাই—পরের সুখ কাড়িয়া লইব কেন? শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখদুঃখের অতীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।" তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নের সম্মুখে অমরনাথের মহামহিমামণ্ডিত দিব্যালোকবিভাসিত মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে।

শচীন্দ্র সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই। তিনি ইংরাজীশিক্ষিত বঙ্গবাসী ; তাঁহার বিশ্লেষণ তাঁহার আপনার কথায়। মূর্ত্তি বড় সজীব। তাঁহার প্রেম—

"was like a lava-flood
That boils in Ætna's breast of flame"

এই গ্রন্থ মধ্যে আর একটি চরিত্র আছে। প্রথমে তাঁহাকে প্রধানভাবে পাই না; কিন্তু ঘটনাস্তূপ তাঁহাকে আপনার উপর স্থাপন করিয়া বড় উর্দ্ধে তুলিয়াছে। তিনি পাকা দার্শনিক, বিজ্ঞানের রহস্যময় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক, জগতে মিশিয়া মানব-চরিত্র জ্ঞান-সম্পন্ন। ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। বরং জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার মত দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হয়; তিনি বলেন, "কিছু ইংরেজে জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না; ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই।" কিন্তু আবার স্বপ্ন আসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসীর আজ্ঞায় স্বপ্ন দাসের মত শচীন্দ্রকে যে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসে তাহাকে দেখাইল। গ্রন্থের সৌন্দর্য্যহানি হইল। উপন্যাসের কল্পনা-রাজ্যে এই সকল প্রহেলিকা সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন বুঝিতে পারি না। কিন্তু এখানেই সন্ন্যাসীর ক্ষমতার শেষ নহে, তিনি অন্ধ রজনীর চক্ষু ফুটাইলেন। গ্রন্থকার সেই কলিকাকে ফুটাইলেন, কিন্তু গ্রন্থখানি নিতান্ত আষাঢ়ে গল্পের মত শুনাইয়া আসিল। অমরনাথও বলিয়াছেন, "না দেখিলে আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না।" গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বেই সন্ন্যাসীকে দিয়া আমাদিগকে ভৎর্সনা করাইয়াছেন—আমরা মনে করি, "যাহা ইংরেজে জানে না তাহা অসত্য।" আমরা এ সম্বন্ধে কতিপয় বিখ্যাত চিকিৎসকের মত লইয়াছি। চিকিৎসা-শাস্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থায় রজনীর ন্যায় অন্ধের চক্ষু ফুটান সম্ভব নহে। যদি কখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়া ইহা সম্ভব হয়, তখন লোকে সাহিত্যাবতার বঙ্কিমচন্দ্রকে ভবিষ্যৎ-বক্তা বলিয়া প্রশংসা করিবে; দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন আমরা গ্রন্থের শেষাংশ অসম্ভব ভিন্ন কিছু বলিতে পারি না। বোধ হয় সাহিত্যপ্রভাতে রচিত না হইয়া মধ্যাহ্নে রচিত হইলে এ গ্রন্থের এত আদর হইত না।

রজনীতে কতকগুলি সুন্দর সত্য প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ।

অন্তর বা দৈর্ঘ্য মাপিবার নিমিত্ত পূর্ব্বকালে হাত পা ব্যবহৃত হইত। হাত পা আঙ্গুল, আমাদের স্বভাবিক মানযন্ত্র। এখনও আমরা হাত পা দ্বারা অন্তর মাপিয়া থাকি।

দুইটি স্থানের অন্তর বুঝাইতে হইলে, দুই দণ্ডের পথ, পাঁচ দিনের রাস্তা, দশ দিনে যাওয়া যায় ইত্যাদি সময়ে সময়ে বলিয়া থাকি। এক দিনে হাঁটিয়া দশক্রোশ পথ যাওয়া যায়। সুতরাং এক দিনের পথ বলাও যা, দশক্রোশ বলাও তা। কালক্রমে এখন ইঞ্চ গজ মাইল এ দেশে প্রচলিত হইতেছে।

কিন্তু এখন আর দুই দশ দিনের পথ, বা একশত দুইশত মাইল দূর, তত বেশী বোধ হয় না। এখন রেল গাড়ীর প্রভাবে পূর্ব্বকালের দূরবর্ত্তী স্থান সকল নিকটস্থ হইয়াছে। এখন দূরবর্ত্তী দুইটি স্থানের অন্তর বুঝাইতে হইলে আমরা রেলে এক ঘণ্টার বা এক দিনের পথ ইত্যাদি বলিয়া থাকি।

বহু পূর্ব্বকালে লোকে পৃথিবীটা মাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। যে কৌশলে আর্য্যগণ পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন ঠাওরাইয়াছিলেন, সেই কৌশল সূক্ষ্মরূপে লাগাইয়া আজকাল আমরা পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল জানিতেছি।

তবেই পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়া একটা সুড়ঙ্গ করিতে পারিলে তাহা ৮০০০ মাইল দীর্ঘ দেখা যাইবে। ঐ সুড়ঙ্গের দুই প্রান্তে দুইজন লোক দাঁড়াইলে তাঁহারা পরস্পর ৮০০০ মাইল দূরে থাকিবেন। পূর্ব্বকালে নাকি কেহ কেহ এইরূপ সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পাতালে যাইতেন।

কিন্তু কলিকালে এরূপ সুড়ঙ্গের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পৃথিবীর উপর দিয়াই ঘুরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু উপর দিয়া মাপিয়া গেলেও পাতালে যাইতে ১২৫০০ মাইল পথ মাত্র যাইতে হইবে। আমরা যেখানেই থাকি, ইহা অপেক্ষা বেশী দূরে থাকিতে পারি না। তবেই দুইজন লোক যত দূরেই যান, ১২৫০০ মাইলের বেশী দূরে যাইতে পারেন না।

কিন্তু এটা আর তত বেশী পথ কি? আমাদের দেশেও ত রেলগাড়ী

ঘণ্টায় ৩০ মাইল পথ যায়। রেল পাতিয়া গাড়ীতে চড়িয়া গেলে ১৭।১৮ দিনেই পাতালে যাইতে পারা যায়। আমেরিকায় রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল বেগে যাইয়া থাকে। সুতরাং তথাকার লোকেরা ৮।৯ দিনের মধ্যেই পাতালে পঁহুছিতে পারেন। পৃথিবীটা পূর্ব্বে কত বড় দেখাইতেছিল!

যাহা হউক, পৃথিবীতে অধিক দূরে যাইতে পারা যায় না। পৃথিবীর পরেই চন্দ্রলোক। আজকাল সেকালের তপঃপ্রভাব নাই, নতুবা চন্দ্রলোকটা কত দূরে একবার দেখিয়া আসা যাইত। কিন্তু সে কালের তপঃপ্রভাব না থাকিলেও আজকাল অন্য প্রকার তপঃ প্রভাবের অভাব নাই। জ্যোতির্ব্বিদেরা এখানে থাকিয়াই ব্রহ্মাণ্ডের খবর রাখিতেছেন। এখান হইতে চন্দ্র কত দূরে, তাহা তাঁহারা মাপিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, এখান হইতে চন্দ্র প্রায় ২৪০০০০ মাইল দূরে।

কিন্তু এখানে একটা কথা উঠিতেছে। পৃথিবীতে থাকিয়া তাঁহারা কিরূপে চন্দ্রের দূরত্ব মাপিলেন? যে উপায়ে নদীর এ পারে থাকিয়া উহার বিস্তার মাপিতে পারা যায়, হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গের উপরে না উঠিয়াও উহার উচ্চতা মাপিতে পারা যায়, সেই উপায়েই চন্দ্রের দূরত্ব জানা গিয়াছে। ইহা আজকার কথা নহে, বহু পূর্ব্বকালেও লোকে এই প্রকারে চন্দ্রের দূরত্ব মাপিয়াছিলেন। কিন্তু সে উপায়টা কি?

যখন নৌকাযোগে নদী দিয়া যাওয়া যায়, কূলের গাছগুলাকে বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতে দেখি। ঐ যে বটগাছটা এখন আমাদের ঠিক দক্ষিণে দেখিতেছি, কিছুদূর সোজা নৌকা বাহিয়া গেলে তাহাকে আমাদের পশ্চাদ্‌দিকে দেখিব। অবশ্য গাছটা সরিয়া যায় না, কেবল ঐ দুই স্থান হইতে দেখিলে গাছটা অত অংশ কোণে সরিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু বট গাছটার সোজা বহুদূরে যে অশ্বত্থ গাছটা ছিল, সেটাকেও বটগাছের মত বেশী সরিয়া যাইতে দেখা গেল না। দুই তিন ক্রোশ চলিয়া আসা গেল, কই অশ্বত্থ গাছটা ৫।৭ অংশের অধিক সরিয়া গেল না। যত অংশ বাঁকিয়া যাইতে দেখা গেল, তাহা এবং অতিক্রান্ত পথ বলিয়া দিলে গণিতজ্ঞগণ অবশ্য গাছটার দূরত্ব বলিয়া দিবেন। দূরবর্ত্তী দুইটি স্থান হইতে কোন বস্তু দেখিলে তাহাকে যত অংশ বাঁকিয়া যাইতে দেখা যায়, তাহাকে ইহারা লম্বন বলেন। তবেই আমাদের দৃষ্টান্তের অশ্বত্থ গাছটার লম্বন ৫।৭ অংশ।

এখন মনে করুন যেন কোন ব্যক্তি চাঁদকে ঠিক তাঁহার মস্তকের উপরে দেখিলেন। আর এক ব্যক্তি পৃথিবীর চতুর্থাংশ দূরে আছেন। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ঠিক সেই সময়ে চাঁদকে ঠিক তাঁহার মস্তকের উপরে দেখিবেন না। প্রথম ব্যক্তি চাঁদকে যে দিকে দেখিবেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার ৫৭ কলা দূরে দেখিবেন। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করা যাউক।

যদি কোন ব্যক্তি পৃথিবীর কেন্দ্রে থাকিয়া সুড়ঙ্গ দিয়া চাঁদকে দেখেন, এবং অপর ব্যক্তি ঠিক তাঁহার দক্ষিণে পৃথিবীর উপরে থাকিয়া দেখেন, তাহা হইলে উভয়ের দৃষ্টি-পথের মধ্যে ৫৭ কলা পরিমিত কোণ দেখা যাইবে। অথবা ঐ দুই ব্যক্তি দুইগাছি সূত্র লইয়া চন্দ্র-বিম্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিলে, সেই সূত্রদ্বয়ের মধ্যে ৫৭ কলা কোণ উৎপন্ন হইবে।

পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ জানা আছে, এখন ঐ ব্যাসার্দ্ধে চন্দ্রের লম্বনও জানা গেল। এখন ত্রিকোণমিতি লাগাইলে দেখা যাইবে যে পৃথিবী হইতে চন্দ্র প্রায় ২৪০০০০ মাইল দূরে। পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল, সুতরাং চন্দ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর সারি বসাইতে হইলে ৩০টা পৃথিবী আবশ্যক হইবে।

লম্বনের অর্থটা আর একটু স্পষ্ট করা যাউক। চন্দ্র হইতে কোন ব্যক্তি পৃথিবীটা দেখিলে আকাশে আমাদের নিকট চাঁদ যেমন দেখায়, তেমনই তাঁহার নিকট পৃথিবীটা বোধ হইবে। কিন্তু আমরা চাঁদকে যত বড় দেখি, চন্দ্রবাসী পৃথিবীটাকে তদপেক্ষা ৩.৪ গুণ বড় দেখিবেন। ৮০০০ মাইল ব্যাসযুক্ত পৃথিবীকে যখন চন্দ্র হইতে এত ছোট দেখাইতেছে, তখন চন্দ্র অনেক দূরে আছে, বলিতে হইবে। কিন্তু বেশী দূরে থাকিলেও ৩০টা পৃথিবী দিয়া চাঁদ পর্য্যন্ত রাস্তা করিতে পারা যায়। দ্রুতগামী রেলের গাড়ীতে চড়িয়া গেলে ৮।৯ মাসেই চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইতে পারা যায়। তবে চন্দ্র আর বেশী দূরে কি ?

চন্দ্রের পরেই সূর্য্যের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সূর্য্য কত দূরে ? ইহাও জ্যোতির্ব্বিদেরা নির্ণয় করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, সূর্য্যের লম্বন দুই চারি কলা নয়, ৮।৯ বিকলা মাত্র। অর্থাৎ সূর্য্য হইতে দেখিলে পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধটা ৮।৯ বিকলা এবং সমস্ত পৃথিবীটা ১৬।১৭ বিকলা মাত্র বড় দেখাইবে। তবে বাস্তবিকই পৃথিবী হইতে সূর্য্য বহু দূরে অবস্থিত। সূর্য্যের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও, আমাদের মধ্যে নয় কোটি ত্রিশ মাইল ব্যবধান! এই অন্তরটা বলা যত

সহজ, মনে করা তত সহজ নহে। এখান হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত পৃথিবীর সারি বসাইয়া গেলে কতগুলা পৃথিবী লাগিবে? পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল। সুতরাং সহজেই দেখা যায় যে এ জন্য প্রায় ১১৬০০টা পৃথিবী আবশ্যক হইবে। চন্দ্র বহুদূরে অবস্থিত মনে হইয়াছিল, কিন্তু চন্দ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর সারি বসাইতে হইলে মোটে ৩০টা পৃথিবীর প্রয়োজন হয়।

সূর্য্যমণ্ডল এখান হইতে কত দিনের পথ দেখা যাউক। এক দিনের পথ দশ ক্রোশ, এই হিসাবে এখান হইতে সূর্য্য ১২৭০০ বৎসরের পথ! লোকে বলে বেদও ৫।৬ হাজার বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। তবেই বৈদিক ঋষিগণ সূর্য্যাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিয়া থাকিলে অদ্যাবধি অর্দ্ধেক পথও যাইতে পারেন নাই। অতএব হাঁটিয়া যাওয়া বৃথা। বোধ হয় রেলের গাড়ীতে গেলে তাঁহারা জীবদ্দশাতেই সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইতে পারিতেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে গেলেও তাঁহাদিগের ৩৬০ বৎসর লাগিত! শব্দ নাকি খুব দ্রুত যায়? প্রতি সেকেণ্ডে উহা প্রায় ১১০০ ফুট বেগে ধাবমান হয়। কিন্তু শব্দে চড়িয়া গেলেও সূর্য্যে পঁহুছিতে ১৪।১৫ বৎসর লাগিয়া যাইবে। অর্থাৎ এখনই যদি সূর্য্যে একটা ভীষণ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা আমরা ১৫ বৎসর পরে টের পাইব! তবে শব্দও বড় মৃদু গমন করে। আলোক অপেক্ষা দ্রুতগামী আর কিছুই নাই। প্রতি সেকেণ্ডে উহা ১৮৬০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। কিন্তু আলোকে চড়িয়া গেলেও সূর্য্যে পঁহুছিতে প্রায় ৫০০ সেকেণ্ড বা ৮ মিনিট সময় লাগিবে। মনে রাখিবেন, এক সেকেণ্ডে আলোক আমাদের পৃথিবীটা প্রায় চারিবার ঘুরিয়া আসিতে পারে। তবেই এখনই যদি সূর্য্যটা নিবিয়া যায়, আট মিনিট পরে আমরা অন্ধকার দেখিব! কি বিষম দূরে বিধাতা সূর্য্যকে বসাইয়াছেন! আবার অতদূরে থাকিয়াও সূর্য্য আমাদিগকে পোড়াইয়া মারেন।

কিন্তু অত দূরে থাকিলেও সূর্য্যবিম্বটা প্রায় ৩২ কলা বড় দেখায়। সূর্য্য দেহটা কত বড়? উহা এত বড় যে চন্দ্র সহিত পৃথিবীটা সূর্য্যের উদরে প্রবেশ করিলেও চন্দ্রের চারিদিকে প্রায় ৬০০০০০ মাইল পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদর বিস্তৃত থাকিবে। বাস্তবিক সূর্য্যদেহের প্রকৃত ব্যাস প্রায় ৮৬৬০০০ মাইল। বিধাতা সূর্য্যকে নিতান্ত বিশাল দেহ দিয়াছেন।

তবেই ১০৯টা পৃথিবী সূর্য্যের উদর মধ্যে থাকিতে পারে। কিন্তু তা

বলিয়া ১০৯টা পৃথিবী ভাঙ্গিয়া একটা সূর্য্য গড়িতে পারা যাইবে না। বাস্তবিক সূর্য্যের মত একটা গোলা প্রস্তুত করিতে হইলে তের লক্ষটা পৃথিবী ভাঙ্গিতে হইবে! ইহার তুলনায় চাঁদটা কত ছোট! পৃথিবীর ৫০ ভাগের এক ভাগ পাইলেই একটা চাঁদ গড়িতে পারা যায়। অথচ আকাশে চাঁদ যত বড় দেখায়, সূর্য্যও প্রায় তত বড় দেখায়। সূর্য্যের দেহটা নিতান্ত প্রকাণ্ড, নচেৎ অত দূরে অবস্থিত হইয়াও সূর্য্য চাঁদের মত বড় দেখাইবে কেন?

আমাদের পৃথিবীটা কি ক্ষুদ্র! কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও উহা বৎসরে যে পথটা ঘুরিয়া আসে, তাহা চিন্তা করুন। সূর্য্য হইতে পৃথিবী নয়কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তবে আজ আমরা শূন্য আকাশে যেখানে আছি, ছয় মাস পরে সেখান হইতে নয়কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলের দ্বিগুণ অর্থাৎ আঠার কোটী ষাটি লক্ষ মাইল দূরে যাইয়া পড়িব। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় ৬৬০০০ মাইল করিয়া আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কত পথই বেড়াইতেছি! কিন্তু এত দূরে চলিয়া যাইতেছি, কই কখনও ত কোন তারা বা গ্রহ বা অপর কোন জ্যোতিষ্কের পাশ দিয়াও গেলাম না। বিধাতা বড় ফাঁক ফাঁক করিয়া তাঁহার রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন।

তবে অন্ধকার রাত্রে অত তারা দেখা যায় কেন? মনে হয় বরং নদীর বালি গণিয়া দিতে পারি, তথাপি আকাশের তারা সংখ্যা করিতে পারি না। এত অসংখ্য তারায় আকাশ পরিপূর্ণ, তথাপি আঠার কোটি মাইল গেলেও তারাগুলাকে ক্ষুদ্র জ্যোতিঃকণা বই বড় দেখি না। হয় ত তারাগুলা বহু বহু দূরে আছে কিম্বা তারাগুলার দেহ বাস্তবিক ক্ষুদ্র।

সূর্য্য হইতে দেখিলে পৃথিবীটাকে ১৬।১৭ বিকলা দেখায়। কিন্তু তারাগুলা হইতে দেখিলে উহা কত বড় দেখাইবে? কি ভয়ানক! তারাগুলা হইতে দেখিলে পৃথিবীটা যে একবারে ০ হইয়া যায়! আট হাজার মাইল, অথচ বিষম দূরত্বের তুলনায় কিছুই হইল না। পৃথিবীর দুই মেরু হইতে দুইটা সূত্র কোন তারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিলে, সূত্রদ্বয় পৃথক্ না দেখাইয়া একটা হইয়া গেল! সূর্য্য বহু দূরে অবস্থিত বটে, তবুও ত তথা হইতে দেখিলে পৃথিবীটার কিছু না কিছু আকার থাকে। তারাগুলা কি এতই দূরে যে তথা হইতে আট হাজার মাইল ব্যাসযুক্ত পৃথিবীটা একবারে ০ হইয়া যায়?

কিন্তু পৃথিবীটা যেন নিতান্ত ক্ষুদ্র হইল। পৃথিবীর ভ্রমণ পথটা ত বড়! পৌষমাসে আমরা আকাশের যেখানে আছি, আষাঢ়মাসে সেখান হইতে আঠার কোটি মাইল দূরে যাইয়া পড়ি। মনে করুন যেন পৃথিবী ও সূর্য্য হইতে দুই গাছি সূত্র কোন তারার সহিত সংলগ্ন করা গেল। ঐ দুই সূত্রের মধ্যে কিছু না কিছু ফাঁক পড়িতে দেখা যাইবে। কেন না নয়কোটি মাইল ব্যবধানটা ত অল্প নহে।

কিন্তু কি ভয়ঙ্কর কথা! তারার দূরত্বের তুলনায় নয় কোটি মাইল ব্যবধান যে প্রায় শূন্য হইয়া গেল! দুই গাছি সূত্র যে এক দেখাইতে লাগিল! কোন তারাকে এখান হইতে দেখিলেও যে দিকে, নয় কোটি মাইল দূরে সূর্য্য হইতে দেখিলেও যে সেই দিকে দেখা গেল!

বোধ হয়, সূক্ষ্ম যন্ত্র অভাবে আমরা দুই সূত্রের মধ্যবর্ত্তী কোণ টা পরিমাণ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তাই বা কেমন করিয়া বলি। আজ কাল এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে যে এক অংশের ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক বিকলা পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা পরিমাণ করিতে পারা যায়। এইরূপ সূক্ষ্মযন্ত্র সাহায্যে জ্যোতির্বিদেরা ঐ দুই সূত্রের মধ্যস্থ কোণ পরিমাণ করিতে নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ঐ কোণ এত সূক্ষ্ম যে কোনক্রমে পরিমাণ করিতে পারিতেছেন না।

তবে বিস্তর পরিশ্রম করিয়া নানা উপায়ে দুই চারিটা তারা পাইয়াছেন। তন্মধ্যে যে তারাটা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে, তথা হইতে পৃথিবী হইতে সূর্য্যের অন্তরটা এক বিকলাও দেখায় না। মনে করুন যেন উহা এক বিকলাও পাওয়া গেল। এই এক বিকলার কি অর্থ শুনিবেন? ইহার অর্থ এই যে, এখান হইতে সূর্য্য যতদূরে, তাহার দুই লক্ষ এগার হাজার গুণ দূরে সেই তারাটি অবস্থিত! পরিচিত মাইল হিসাবে শুনিতে চান? উহা কুড়ি লক্ষ কোটি মাইল দূরে! যদি অঙ্কে প্রকাশ করিতে চান, তবে দুই এর পরে তেরটা শূন্য বসাইয়া যান। মনে রাখিবেন এক এর পরে সাতটা শূন্য বসাইলেই এক কোটি হয়।

তবে যে তারাটি হইতে ভূরব্যান্তর এক বিকলাও দেখায়, তাহার দূরত্ব মাইল হিসাবে ব্যক্ত করা বৃথা। কেন না, দুই এর পর দশটা শূন্য বসাইলেও যা মনে হয়, তেরটা বসাইলেও তাই মনে হয়। পৃথিবীর মধ্যে এমন কি দীর্ঘ স্থান আছে যে, তাহাকে তারার দূরত্ব মাপিবার মাপকাঠি করিতে পারা

যাইবে? পৃথিবীটা নিজেই মোটে ৮০০০ মাইল। পৃথিবী ও সূর্য্যের অন্তরটাও ত মোটে নয় কোটি মাইল। সুতরাং ইহাকেও তারার দূরত্ব মাপিবার মাপকাঠি করা বৃথা।

এজন্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জ্যোতির্বিদেরা আলোকের একটা মাপকাঠি করিয়াছেন। কিন্তু আলোকের আবার মাপকাঠি কিরূপে হইবে? প্রতি সেকেণ্ডে আলোক এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল যায়। অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে উহা পৃথিবীটার চারিদিক প্রায় চারিবার ঘুরিয়া আসিতে পারে। অর্থাৎ দশ দিনে শব্দ যত পথ যায়, এক সেকেণ্ডে আলোক তত পথ যায়। এমন দ্রুতগামী আলোক এক বৎসরে যত পথ যায়, তারাগুলার দূরত্ব মাপিবার মাপকাঠিটি তত বড়। এই অদ্ভুত মাপকাঠিটির নাম "আলোক বর্ষ" রাখা গিয়াছে।

এই মাপকাঠিটি কত বড় জানিতে চান? এত বড় যে তাহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে হইলে দ্রুতগামী রেলের গাড়ীর এক কোটি বৎসরেরও অধিক সময় প্রয়োজন হইবে। এত বড় যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্য যত দূরে, তত দূরে দূরে তেষট্টি হাজারটা সূর্য্য বসাইয়া গেলে সেই মাপকাঠির একটার সমান হইবে।

অনেক তারার দূরত্ব মাপিবার চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন পরিমাণই ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। যে দুই চারিটা তারা আমাদের নিকটস্থ বলিয়া মনে হয়, তাহাদেরও অন্তর পরিমাণে অল্পাধিক ভুল আছে। কিন্তু ভুল থাকিলেও তাহাদের দূরত্ব মোটামুটি নিরূপণ করিতে বিঘ্ন নাই। যে তারাটিকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ বলিয়া মনে হয়, তাহার দূরত্ব এই আলোক-বর্ষ মাপকাঠির তিন চারিটা। অর্থাৎ সেই তারা হইতে এখানে আলোক আসিতে ৩।৪ বৎসর লাগিয়া যায়! অথবা, যে আলোকে সেই তারাটি এই মাত্র দেখিলাম, তাহা ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে এদিকে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল!

কোন জিনিস কুড়ি ইঞ্চের বদলে একুশ ইঞ্চ লম্বা বলিলেই তাহা লইয়া আমরা কত ঝগড়া করিয়া থাকি। এখানে দুই চারি শত, দুই চারি কোটি মাইলকেও আমরা গণনার মধ্যে আনিতেছি না। নিকটস্থ তারার দূরত্ব তিন বা চারি আলোক বর্ষ বলিয়া কত কোটি মাইল অগ্রাহ্য করিতেছি। কি বিষম দূরত্বের কথাই হইতেছে!

আমাদের নিকটস্থ তারাটির নাম শুনিতে হয়ত অনেকের ইচ্ছা হইবে। উহার বিলাতি নাম "আল্‌ফা সেন্‌টরি" ; বাঙ্গালায় উহার নাম "কিন্নর" রাখা গিয়াছে। কিন্তু এ সকল নামে বস্তু পরিচয় ঘটে না। যাহা হউক, কিন্নর তারার পর যে তারাটি আমাদের নিকটস্থ বলিয়া জানা গিয়াছে ; তাহার আলোক আসিতে ৭। ৮ বৎসর লাগিয়া যায়। আমাদের পরিচিত মাইল হিসাবে বলিতে হইলে বলা যায় যে, তাহা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কোটি মাইল দূরে। লুব্ধক তারাটি অনেকেই চিনেন। আজ কাল সন্ধ্যার পর পূর্ব্ব আকাশে উহাকে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতে দেখা যায়। উহা কত দূরে শুনিবেন ? এখান হইতে সূর্য্য যত দূরে, তাহার আট লক্ষ গুণ দূরে। 'আলোক বর্ষ' মাপকাঠির ১২।১৩টা দূরে ঐ লুব্ধক অবস্থিত। উত্তর দিকস্থ ধ্রুবতারাটি এত দূরে যে, বোধ হয়, তাহার আলোক আসিতে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক সময় লাগে !

আর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। যে তারাটি আমাদের নিকটস্থ বলিয়া জানা গিয়াছে, সেই কিন্নর তারার কিন্নর সকল, না জানি, আমাদের সূর্য্যকে কত বড় দেখিতেছে। বাস্তবিক সূর্য্য হইতে কিন্নর তারাটা এত দূরে আছে যে, আমাদের বিশালদেহ সূর্য্যকে রাত্রিকালে কিন্নরগণ স্বাতী বা ধ্রুবতারার অপেক্ষা বড় দেখিবে না। লুব্ধক মানুষেরা উহাকে আরও ক্ষুদ্র দেখিবে।

তবে সূর্য্যের দেহটা আর বিশাল রহিল কই ? নিকটস্থ তারারও মানুষেরা উহার বিম্ব পরিমাণ করিতে পারিবে না। যদি সূর্য্যের দেহ আরও বিশাল হইত, যদি সূর্য্য-দেহ পৃথিবী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত, তাহা হইলেও আমরা নেপচুন গ্রহকে যত বড় দেখি, তাহারা সূর্য্যকে তদপেক্ষা কিছু বড় দেখিত মাত্র।

যদি নিকটস্থ তারাটিই এত দূরে, না জানি দূরস্থ তারা গুলা কত দূরে আছে ! যে তারা গুলা প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণেও অস্পষ্ট দেখায়, না জানি সে গুলা কত দূরে ? এই সকল বহু বহু দূরস্থিত তারাকে এখন যেমন দেখিতেছি, হয়ত তাহারা কত শত শত, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেইরূপ ছিল। হয়ত ইতিমধ্যে তাহাদের কত কি আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হয়ত কতগুলা নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

আর এক প্রকারে ঐ কথাটা বুঝা যাউক। কোন্ তারা কত উজ্জ্বল

দেখায়, তাহা পরিমিত হইয়াছে। ঔজ্জ্বল্যানুসারে আজকাল সমুদয় তারাকে আঠারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। লুব্ধক প্রভৃতি ১৮।১৯টা তারা উজ্জ্বলতম। ইহাদিগকে প্রথমপ্রভা তারা বলা যায়। ধ্রুবতারা প্রভৃতি ৫০।৬০টি দ্বিতীয়প্রভা তারা। এইরূপে খালিচক্ষে আমরা ষষ্ঠপ্রভা তারা পর্য্যন্ত দেখিতে পাই।

কিন্তু দ্বিতীয়প্রভা তারা অপেক্ষা প্রথমপ্রভা তারা ২৷৷০ গুণ অধিক উজ্জ্বল। এইরূপে দেখা যায় যে, ষষ্ঠপ্রভা তারা অপেক্ষা প্রথমপ্রভা তারা একশত গুণ অধিক উজ্জ্বল। অর্থাৎ ষষ্ঠপ্রভা একশতটি তারা একত্রিত করিলে একটি প্রথমপ্রভা তারার মত উজ্জ্বল হইল। এইরূপে, একাদশপ্রভার দশ হাজার, ষোড়শপ্রভার দশ লক্ষ; একবিংশতিপ্রভার দশ কোটি তারা একত্রিত করিলে, একটা প্রথমপ্রভা তারার মত উজ্জ্বল দেখাইবে।

যদি সকল তারাই সমান বৃহৎ হইত, যদি সকল তারাই সমান পরিমাণে আলোক বিকীর্ণ করিত, তাহা হইলে যে তারা যত অস্পষ্ট বোধ হয়, সে তারা তত দূরে আছে বলিতে পারা যাইত। কিন্তু কে জানে কোন্ তারা কত বড়, কে জানে কোন তারা হইতে কি পরিমাণে আলোক বিকীর্ণ হইতেছে।

এ সকল কথা জানা যায় নাই বটে, তথাপি হাজার হাজার তারা লইলে বলিতে পারা যায় যে, পঞ্চমপ্রভা তারা অপেক্ষা দশমপ্রভা তারা বহু বহু দূরে অবস্থিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় তারা প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণেও দৃষ্ট হয় না। আজকাল যে প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অষ্টাদশপ্রভা তারা পর্য্যন্ত দেখা যায়। যদি এই সকল তারার আকার প্রথম তারার আকারের সমান হয়, তাহা হইলে তাহাদের আলোক আসিতে প্রায় দুই হাজার বৎসর লাগিয়া থাকে।

কিন্তু কে জানে তারাগুলা কত বড়? প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণেও তাহাদের বিম্বের পরিমাপযোগ্য আকার দেখা যায় না। তবে ইহা জানা আছে যে, তারাগুলা সূর্য্যের ন্যায় স্ব স্ব তেজে দীপ্তিমান্। পূর্ণচাঁদ যত আলোক দেয়, আমাদের সূর্য্য তদপেক্ষা প্রায় সাড়ে চারিলক্ষ গুণ অধিক আলোক দেয়। আর লুব্ধক তারা যত আলোক দেয়, তদপেক্ষা পূর্ণচাঁদ তের হাজার গুণ অধিক আলোক দেয়। তবেই লুব্ধক অপেক্ষা আমাদের সূর্য্য প্রায় ছয় শত কোটি গুণ অধিক আলোক দেয়। কিন্তু মনে করুন যেন, লুব্ধক

তারাকে সূর্য্যের নিকটে আনা গেল। অবশ্য এইরূপ আট লক্ষ গুণ নিকটে আনিলে লুব্ধকের জ্যোতিঃ অনেক গুণে বর্দ্ধিত হইবে। কেন না, যে তারা হইতে যত আলোক পাই তাহার দূরত্ব হ্রাসের বর্গানুসারে জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে জানা যায় যে, এখান হইতে সূর্য্য যত দূরে, লুব্ধক তত দূরে থাকিলে উহা একশতটা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইত। বোধ হয়, অনেক তারাই লুব্ধকের সমান আলোক বিকীর্ণ করে। অতএব তৎসমুদয় অন্ততঃ আমাদের সূর্য্যের ন্যায় বিশালদেহ হইবে। কেন না একথা অস্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, তৎসমুদয় সূর্য্যাপেক্ষা অধিক আলোক বিকীর্ণ করে। বিধাতা কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন!

তবে তারাগুলা এক একটা বিশালদেহ তেজোময় সূর্য্য। খালিচক্ষে আমরা আকাশে ৬।৭ হাজার তারার অধিক দেখিতে পাই না। কিন্তু একটা যৎসামান্য দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিলেই যেখানে কিছুই দেখা যাইতেছিল না, সেখানে অনেক তারা দৃষ্টিগোচর হয়। যে দূরবীক্ষণে দ্বিগুণমাত্র বড় দেখায়, তাহার মধ্য দিয়া আকাশ দেখিলে তারা সংখ্যা লক্ষাধিক হইয়া পড়ে। 'লিক' মানমন্দিরে যে বৃহৎ দূরবীক্ষণটি আছে, বোধ হয় তদ্দ্বারা দশ কোটি তারা দেখিতে পাওয়া যায়। লর্ড রসের প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণে, বোধ হয়, একশত কোটি তারা দেখা যাইতে পারে। আরও বড় দূরবীক্ষণ থাকিলে, আরও কত তারা দেখা যাইত। তবে বিধাতা ব্রহ্মাণ্ডটাকে নিতান্ত প্রকাণ্ড করিয়াছেন! কত অসংখ্য বিশালদেহ তেজোময় পদার্থ লইয়া তাঁহার খেলা হইতেছে! কত কোটি কোটি সূর্য্য অসীম ব্রহ্মাণ্ডে সমুদ্রতটের বালুকার ন্যায় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে!

আমরা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ঈষৎ আভাস পাইলাম। একবার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। দূরবীক্ষণ অসীম ব্রহ্মাণ্ডের নিকট প্রান্তে আনিয়া কত কত বৃহৎ রাজ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, অণুবীক্ষণ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের নিকটে আনিয়া তাহাদের রচনা কৌশল ভাবিতে বলে। এদিকে আর এক প্রকার জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রচলিত ইঞ্চ লইয়াই প্রথমে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় লওয়া যাক। যিনি একটা পয়সা দেখিয়াছেন, তাঁহারই নিকট ইঞ্চের পরিমাণটা জ্ঞাত হইয়াছে। কোন বস্তু খুব ছোট বলিতে হইলে, তাহা ইঞ্চের দশ ভাগের বা একশত

ভাগের এক ভাগ বলিয়া থাকি। চুলের ন্যায় সরু বলিলে যেন সূক্ষ্ম পরিমাণের চরম সীমায় আসা গেল। কিন্তু মাথার চুল কি এতই সরু? উহা ত এক ইঞ্চের তিন শত ভাগের এক ভাগের মত স্থূল। তবেই তিন শতটা চুল পাশে পাশে রাখিলে এক ইঞ্চ চৌড়া হইবে। তা ছাড়া, খালি চোখে চুল ত স্পষ্ট দেখা যায়।

আমাদের রক্ত দেখিতে ঘন লাল জলের মত বোধ হয়। কিন্তু সকলেই জানেন, উহাতে জল ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাকণার মত কত কোষাণু আছে। এই সকল অসঙ্খ্য কোষাণু ঈষৎ লাল বলিয়া সমুদয় রক্ত রক্তবর্ণ দেখায়। খালি চোখে এই সকল কোষাণু দেখিতে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তা বলিয়া সে গুলা এত কি সূক্ষ্ম? উহারাও ত এক ইঞ্চের তিন হাজার ভাগের এক ভাগের মত স্থূল।

কি আমাদের শরীর, আর কি গাছের শরীর, সকল জীবশরীরই এই রূপ কোষাণু দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল কোষাণুর কোনটা বা মাংস, কোনটা বা স্নায়ু, কোনটা বা বল্কল, কোনটা বা অংশুতে পরিণত হয়। জীব-বিদ্‌গণকে শরীরের এই সকল স্থূল উপাদানের বিস্তার সর্ব্বদা পরিমাণ করিতে হয়। তাঁহারা এক ইঞ্চকে পুনঃ পুনঃ কত ভাগ করিবেন?

এজন্য তাঁহারা একটা নূতন মাপকাঠি গ্রহণ করিয়াছেন। ইঞ্চের হিসাবে, ইহা এক ইঞ্চের পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই মাপকাঠিকে তাঁহারা "মি" বলিয়া থাকেন। আমাদের মাথার চুল এই মাপকাঠির ৮০টার সমান মোটা, রক্তের কোষাণু ইহার ৮.৯টার সমান চৌড়া।

একটা সূচীর সূক্ষ্ম অগ্রভাগে কতগুলি পরী এককালে নৃত্য করিতে পারে, পূর্ব্বকালে পশ্চিমদেশে এই প্রশ্ন লইয়া নাকি মহা গণ্ডগোল উপ-স্থিত হইয়াছিল। কিন্তু পরীগণ ত যাকে তাকে দেখা দেন না। আজকাল অণুজীবগণের মধ্যে ঐ রূপ একটা প্রশ্নের মীমাংসা লইয়া গোলমাল হইয়া থাকে। তাঁহারা সূচ্যগ্রে লম্বিত এক বিন্দু জলে কেবল জল দেখেন না, তাহাতে অসঙ্খ্য অণুপ্রমাণ জীব বিচরণ করিতে দেখেন।

এই সকল অণুজীবের অনেকগুলা নাকি আমাদের নানাবিধ রোগের নিদান। এই জন্য অণুজীববিদ্‌গণ নির্ম্মল বায়ুতে নির্ম্মল জলে অণুজীব খুঁজিয়া বেড়ান।

আমাদের নিকট পৃথিবীটা যত বড় বোধ হয়, এই সকল অণুজীবের পক্ষে এক বিন্দু জল তত বড় বোধ হয়। ইহারা আবার আহার করে, ভক্ষ্যদ্রব্য জীর্ণ করিয়া শরীরে শোষণ করে। ইহাদের শরীরেও আমাদের শরীরের রক্তের মত, কোন প্রকার রস ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়।

অনেক অণুজীবের শরীরটা উক্ত 'মি' মাপকাটির একটারও সমান নয়। লম্বাতেই একটার সমান হয় না, মোটায় ত কথাই নাই। অনেকগুলার শরীর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বটে, কিন্তু চৌড়া দিকে 'মি' মাপকাঠিতেও পাওয়া যায় না। কতকগুলার শরীরে আবার লোম (cilia) আছে। কোনটার বা দুইটীমাত্র, কোনটার বা গোছা গোছা লোম, আবার কোনটার প্রায় সর্ব্বাঙ্গ লোমে আচ্ছন্ন।

এই সকল লোম বড় অণুবীক্ষণেও সম্যক্ দৃষ্টিগোচর হয় না। শরীরের সঙ্গে এই সকল লোমের সংযোগ আছে। সংযোগ কেন, লোমগুলা লইয়াই তাহাদের দেহ। দেহের রক্ত এই সকল লোমকে পুষ্ট করিতেছে, লোমের মধ্যেও কোন প্রকার রক্ত যাতায়াত করিতেছে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের কারণও তন্মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ তাহাদের ভিতরে সমুদয় জৈবনিক ক্রিয়া চলিতেছে।

এই সকল অণুপ্রমাণ জীবের বংশবৃদ্ধি আছে, ইহারাও সন্তান প্রসব করে। জনকের ধর্ম্ম সন্তানে বর্ত্তে, সুতরাং না জানি জনকের কি সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা সন্তানের শরীর গঠিত হয়! অণুপ্রমাণ জীবের মধ্যে না জানি কি জড়ময় অণু পরমাণুর বিন্যাস পরিবর্ত্তিত হইতেছে!

যে জলবিন্দুটিতে সহস্র অণুজীবের বিচরণ স্থান হইতেছে, সেই জলের অণুগুলা তবে আরও ক্ষুদ্র। বস্তুতঃ এক ফোঁটা জল আট হাজার মাইল ব্যাসবিশিষ্ট একটা পৃথিবীর মত বৃহৎ কল্পনা করিলে, জলের অণুগুলি এক একটা ছোট লেবু অপেক্ষাও বড় হইবে না। ইহাতেই ভাবুন, এক ফোঁটা জলে কত অণু আছে এবং একটা অণুই কত বড়।

বায়ু কত তরল পদার্থ। কিন্তু এক ঘন ইঞ্চ বায়ুতে নাকি ৩×১০^{২০} এতগুলি অর্থাৎ তিনের পর কুড়িটা শূন্য বসাইলে যত হয়, ততগুলি জড়ময় অণু বর্ত্তমান! আবার তাহাদের মধ্যেও ফাঁক আছে, সেই ফাঁকে অণুগুলি ইতস্ততঃ দোলিত হইবার স্থান পাইতেছে। ইঞ্চের হিসাবে অণুর পরিমাণ

শুনিতে চান? এক একটা নাকি এক ইঞ্চের ৪০।৫০ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র!

কিন্তু সেই ফাঁকা স্থানই কি বাস্তবিক ফাঁক? তাহাও যে আকাশ নামক পদার্থে পরিব্যাপ্ত। যেমন যাবতীয় জীবদেহস্থ অণুগুলি জলমধ্যে নিমগ্ন আছে, তেমনই এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থে অণুময় স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব চরাচর সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া রহিয়াছে। কোথায় আকাশের তারা, আর কোথায় আমরা! এই সূক্ষ্ম পদার্থ, তারাগণের সহিত আমাদের সংযোগ ঘটাইয়াছে। ইহাই বোধ হয় মাধ্যাকর্ষণাদি যাবতীয় শক্তির আধার। ইহারই কম্পন বিশেষে আমাদের চক্ষে লালনীলাদি বর্ণের উৎপত্তি। ইহারই তরঙ্গাভিঘাতে বজ্রপাণির বজ্রের উৎপত্তি।

এই সূক্ষ্ম পদার্থের তরঙ্গের বিস্তার মাপিতে জড়বিদ্‌গণ একটা তদুপযুক্ত সূক্ষ্ম মাপকাঠি গ্রহণ করিয়াছেন। এ সকল পরিমাণ করিতে ইঞ্চ লইলে চলে না, এজন্য তাঁহারা এক ইঞ্চকে পঁচিশ কোটি ভাগে ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগকে মাপকাঠি করিয়াছেন। আকাশ পদার্থের এক প্রকার কম্পনে লালবর্ণ আলোক জ্ঞান হয়। কিন্তু এজন্য আকাশ পদার্থে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহার বিস্তার এই নূতন মাপকাঠির ৬।৭ হাজার মাত্র। ইঞ্চ হিসাবে বলিতে হইলে বলা যায় যে, তাহার বিস্তার এক ইঞ্চের চল্লিশ সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এইরূপ, প্রতি শাস্ত্রেই শাস্ত্রোপযুক্ত মাপকাঠির প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু সকলেই অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। এক দিকে এত বৃহৎ যে কল্পনা করিতে মস্তক ঘূর্ণিত হয়, অন্য দিকে এত ক্ষুদ্র যে মনে হয় যেন তৎসমুদয় বস্তুতঃ নাই। সাংসারিক ব্যাপারে আমরা ইঞ্চ গজ মাইল লইয়াই সন্তুষ্ট। সাংসারিক ব্যাপারই বা কতটুকু। ব্রহ্মাণ্ড অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র; এত বৃহৎ, এত ক্ষুদ্র, যে পরিমাণে দুই দশটা শূন্য বাড়াইয়া কমাইয়া দিলেও প্রভেদ বুঝিতে পারি না।

সূক্ষ্ম জগতে বিধাতার অণিমা এবং স্থূলজগতে তাঁহার মহিমা প্রকটিত রহিয়াছে। ঐ দুই শক্তির স্থূল আভাস পাওয়াও সাধ্য নহে। কে জানে কত সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, কে জানে কত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আছে? আমাদের যত কিছু নাড়াচাড়া বিদ্যাবুদ্ধি পাঁচটা স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। কে জানে মানুষ অপেক্ষা উন্নততর জীবের নিকট ব্রহ্মাণ্ড কিরূপ দেখায়, কে জানে

অপরিস্ফুটেন্দ্রিয় কীটের নিকট মৃত্তাকণা কি প্রকার বোধ হয়? কে জানে আর দুই চারিটা ইন্দ্রিয় থাকিলে আরও কত রহস্য জানা যাইত? যে কয়টা ইন্দ্রিয় আছে, তাহাদেরই কি পূর্ণ-ক্রিয়া ঘটিয়াছে? কে জানিত জর্ম্মাণ পণ্ডিত রণটিজেন আবিস্কৃত আকাশ পদার্থের বিচিত্র শক্তি ছিল; কে জানে মার্কিণ-কিলী সাহেব বর্ণিত আকাশময় ভ্রামকযন্ত্র বাস্তবিক সত্য নয়। প্রকৃতি চিরকালই রহস্যময়। জড় ও শক্তির পরিমাণ লইয়া আমরা ব্যস্ত। কিন্তু জড় ও শক্তি প্রকৃতির একাঙ্গ মাত্র। আর এক বিচিত্র অঙ্গ লইয়া পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি লোকে কত বিতণ্ডাই করিতেছে। হয়ত জড় ও শক্তি, এক বই দুই নয়, হয়ত জড় ও চিৎ একেরই দ্বিবিধ প্রকটন মাত্র। ক্ষুদ্র ও বৃহতের পরিমাণ জন্য আমরা নূতন নূতন মাপকাঠি করিতেছি, কিন্তু চিতের পরিমাণ জন্য কি প্রকার মাপকাঠি হইবে!

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—

প্রতিবাদের উত্তর।

জানুয়ারী মাসের "দাসী"তে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় মৎপ্রণীত শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীর এক স্থানের যেরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ক্ষীণতা-প্রযুক্ত প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার প্রতিবাদের উত্তর দিতে আমি অক্ষম। তবে কিঞ্চিৎ না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীনাথ বাবু যেন জানেন যে, তাঁহার প্রতিবাদ বিষয়ে এই আমার প্রথম ও শেষ লেখা। মহর্ষির সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইত না, যদ্যপি আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ বসু অনেক পূর্ব্বে কোন সাহেবকে ঐ বিষয়ে লিখিত এক দীর্ঘ পত্রের বাঙ্গা-লায় অনুবাদ না করিয়া দিতেন। আমার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থা এমন নহে যে, অত বড় প্রস্তাব আমি এক্ষণে লিখি।

ঈশ্বর চারি রকমে পূজিত হয়েন। প্রথমতঃ—তিনি আমার জীবনের মঙ্গলা-মঙ্গল ঘটনার নিয়ন্তারূপে। দ্বিতীয়তঃ—আমার যে স্বজাতির দ্বারা তিনি বিশেষ নামে পূজিত, সেই স্বজাতির মঙ্গলামঙ্গল ঘটনার নিয়ন্তারূপে। তৃতীয়তঃ—সমস্ত পৃথিবীর অধিদেবরূপে। চতুর্থতঃ—সমস্ত বিশ্বের অধি-দেবরূপে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে উল্লিখিত সকল প্রকারে

পূজা করেন, কেবল দ্বিতীয়রূপে অর্থাৎ স্বজাতির অধীশ্বররূপে পূজা করেন না। ইহা অন্যায়। ইহাতে তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক অঙ্গবৈকল্য প্রকাশ পাইতেছে। তবে যদি তাঁহারা এই কথা বলেন যে, পিতৃপিতামহ ও ভাই-বর্গের সহিত অর্থাৎ হিন্দুদিগের সহিত আমাদিগের কোন সম্পর্ক নাই, হাজার একটা জাতি, যাহা ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে, তাহাতে ব্রাহ্ম বলিয়া এক নূতন জাতি যে আমরা সংযোগ করিতেছি, সেই জাতির সহিত কেবল আমাদিগের সম্বন্ধ, তাহা হইল সে স্বতন্ত্র কথা।

ব্রহ্ম সকল পৃথিবীর দেবতা সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যেমন সমস্ত পৃথিবীর দেবতা, তেমনি ভারতবর্ষের দেবতা; তিনি যেমন অন্য জাতির দেবতা, তেমনি হিন্দুজাতির দেবতা। তিনি আমাদের পিতাপিতামহদিগের পূজিত দেবতা, এই ভাবে কেমন একটু মধুরতা আছে, বলা যায় না। ব্রহ্ম নামে তিনি সকল হিন্দু দ্বারা পূজিত হয়েন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা, প্রত্যেকেই ব্রহ্মস্বরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—"সৃষ্টাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা।" ব্রহ্ম সৃজন, পালন, ও সংহার কার্য্য জন্য হরি, বিরিঞ্চি ও হর এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। দুর্গা সেই ব্রহ্মের শক্তি মাত্র, এই জন্য তিনি ব্রহ্মময়ী বলিয়া উক্ত হয়েন। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সকল হিন্দু শাস্ত্রই সেই এক মাত্র পরম ব্রহ্মকে কীর্ত্তন করিতেছে। সকল সাধারণ হিন্দু অবিশুদ্ধ সংস্কৃতে বলিয়া থাকে—"এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।" ব্রহ্মই সকল হিন্দুর উপাসিত দেবতা। ব্রহ্ম ভারতের চিরন্তন দেবতা। ব্রহ্ম শব্দ হইতে "ব্রাহ্ম" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যেমন ব্রহ্মের উপাসক, এমন অন্য কোন হিন্দু নহে। ব্রাহ্মেরা কি এমন অপদার্থ হইয়া গিয়াছেন যে, "ব্রহ্ম" শব্দ নিবন্ধন আমা-দিগের দেশীয় লোকের সঙ্গে, আমাদিগের পিতা পিতামহের সঙ্গে আমাদিগের যে একটু অপূর্ব্ব স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাহা নির্দ্দয় কুঠারাঘাতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন? ব্রাহ্মেরা বিশ্বজনীনতা ও স্বদেশানুরাগ এই দুই গুণের অনায়াসে সমন্বয় করিতে পারেন; তবে সে বিষয় যত্নবান হয়েন না কেন? ব্রহ্ম যে কেবল ভারতবর্ষের ও হিন্দুদিগেরই প্রধান দেবতা, সমস্ত পৃথিবীর ও অন্যান্য দেশের দেবতা নহে, এমন কথা ত আমি কখন বলি নাই। শ্রীনাথ বাবু কি মৎ-প্রণীত "সারধর্ম্ম" ও "Religion of love" পাঠ করিয়াছেন? বোধ হয় করেন নাই। যদি করিতেন তাহা হইলে

কথনও হিন্দু গণ্ডীর কথা বলিতেন না। আমি বিশ্বজনীনতা বড় ভাল বাসি, কিন্তু যে বিশ্বজনীনতা আমাকে আমার স্বদেশকে ভুলাইয়া দেয় তাহা আমি অসুস্থ ভাবুকতা জ্ঞান করি। Lord Beaconsfield বলিয়াছেন যে—"The cosmopolitan loves every other country but his own" আমি cosmopolitan বটে, কিন্তু Lord Beaconsfield বর্ণিত cosmopolitan নহি।

ব্রহ্ম নাম ও হিন্দু ভাব, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম দুই একেবারে এমন জড়িত হইয়া গিয়াছে যে পৃথক করা কঠিন। সকল হিন্দুরা বলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদেশীয় ধর্ম্ম নহে। উহা হিন্দুধর্ম্মের সার; তবে আমি স্বীকার করি যে অনেক ব্রাহ্ম এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের পার্থক্য সম্পাদন করিতে বিধিমতে যত্ন করিতেছেন বটে। ইঁহারা কালিদাসের ন্যায় যে শাখার উপরে উপবিষ্ট আছেন, তাহাই ছেদন করিতেছেন। ব্রহ্ম পিতৃপিতামহের উপাস্য দেবতা এই ভাবটি যে কেবল মধুর তাহা নহে; তাহা বিলক্ষণ উপকারী হইবার সম্ভাবনা। সেই পিতৃপিতামহ সেবিত ভারতের চিরন্তন দেবতার নামাঙ্কিত ধ্বজা উড্ডীন করিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ভারতের রাজনৈতিক উদ্ধার কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইব, এমত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম নামে সকল হিন্দু জাগ্রত হইবে, এমন আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দেবতার ন্যায় দেবতা নহেন। তিনি সকল হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধারণ দেবতা। ঐ নাম দ্বারা সকল হিন্দুকে-উত্তেজিত করা যাইতে পারে, কিন্তু আমরা ব্রহ্মযোগশূন্যতা এবং পরস্পর বিবাদ দ্বারা ব্রহ্ম নামের উপর যে কলঙ্ক আনিয়াছি, তাহাতে তাহাদের এক্ষণে ঐরূপ উত্তেজিত হইবার অল্প সম্ভাবনা দেখিতেছি। কিন্তু ইহার জন্য বেদবেদান্ত প্রতিপাদ্য পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম দায়ী নহেন; হতভাগা আমরা দায়ী।*

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

---

* এবিষয়ে আর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না। সম্পাদক।

"নদী"।

নদী। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ছয় আনা।

অনেকে মনে করেন, মানব-প্রকৃতিটা ভগবানের একটা মস্ত ভুল: বিশেষতঃ শিশু-প্রকৃতি। বাস্তবিক স্বর্গে যদি একটা টেক্সট্‌বুক কমিটি থাকিত, এবং ভগবান্ যদি তাহার, কিম্বা তথাকার গুরুমহাশয়দের পরামর্শ লইয়া, শিশু-প্রকৃতি গড়িতেন, তাহা হইলে শিশুরা এত খেলা ভাল বাসিত না, দুপর রোদে ঘরময় দাপাদাপি করিত না, ঠাকুরমার কাছে বসিয়া সন্ধ্যার আধ আলো আধ আঁধারে উপকথা শুনিতে চাহিত না, এবং এতটা স্বপ্নপ্রিয় ও কল্পনার দাস হইত না। ভগবানকেও কষ্ট পাইয়া বেত গাছের সৃষ্টি করিতে হইত না। কিন্তু যা হ'বার নয়, তার জন্য দুঃখ করিয়া কি হইবে? শিশুগুলিকে ভগবান্ আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া দেখা গেল যে, ঠেঙ্গাইয়া শিশুদিগকে গোপালের মত সুশীল ও সুবোধ করা গেল না। তাহারা ক্রমাগত নামতা পড়িতে ত চায়ই না; এমন কি, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কবিগণ যে এমন চৌদ্দ অক্ষরের মিল্ যুক্ত নীতিগর্ভ কবিতানিচয় প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ও অভিনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে চায় না! টেক্সট্‌বুক কমিটির চেয়ে ত ছেলেদের বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান অধিক নয়। তাঁহারা এ সকল কবিতাকে অতি উপকারী বলিয়াছেন। তবু শিশুরা সেগুলি আপনা হইতে পড়ে না। এখন উপায় কি? আমাদের বরাবরই একটা সন্দেহ আছে; ভয়ে বলিতে পারি নাই। সন্দেহটা এই, যে আমরা অবশ্য খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ জীব; কিন্তু হয়ত ভগবান্ নিতান্ত কাঁচা কারীকর না হইতেও পারেন। শিশুদিগকে ঠেঙ্গাইয়া পিটিয়া আমাদের মনের মত করিয়া গড়িতে ত পারা গেল না। এখন ভগবানের উপর হাতিয়ার না চালাইয়া শিশুদিগকে তাহাদের প্রকৃতির গতি অনুসারে বাড়িতে দিলে মন্দ হয় না। তাহাদের জ্ঞানার্জ্জনের মধ্যেও ক্রীড়া-শীলতা আসুক না; তাহাতে ক্ষতি কি? বিড়ালছানা গুলি লেজ নাড়িয়া লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করে; নীতি ও গাম্ভীর্য্য ভাল বলিয়া ভগবান্ তো তাহাদের লেজগুলি কাটিয়া সংসারে পাঠাইয়া দেন নাই? ক্রীড়াশীলতা বোধ হয় পাপ নয়। কল্পনাটাও বোধ হয় মন্দ জিনিস নয়। শিশুদের কল্পনা জাগাইয়া দেওয়া বরং ভাল বলিয়াই বোধ হয়। তুমি আমি হয়ত

জ্ঞানের শুষ্ক হাড় চিবাইতে পারি ; কিন্তু শিশুরা একটু রস চায় ; সকল জিনিসই সৌন্দর্য্যের পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিতে চায়। যিনি তাহাদের এই নির্দ্দোষ ক্রীড়ার সঙ্গী হইতে পারেন, তাহাদের কল্পনা সজাগ করিয়া তুলিতে পারেন, বিজ্ঞানকে তাহার সহচর সৌন্দর্য্যের সহিত একত্র করিয়া তাহাদের খেলার সাথী করিতে পারেন, তিনি তাহাদের পরম বন্ধু। আমরা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে শিশুদের বন্ধুত্ব-লিপ্সু দেখিয়া অতিশয় প্রীত ও আশান্বিত হইলাম। তাঁহার "নদী"র সঙ্গে অনেক শিশু কল্পনার রথে চড়িয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিবে। শিশুরা পড়িয়া পড়িয়া ইহার সুন্দর কাগজ ও ছাপা শ্রীহীন করিয়া দিলে আমরা সুখী হইব।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

যতই দিন যাইতেছে ততই আমরা একদিকে আপনাদিগের অসারতা ও অকর্ম্মণ্যতা, অপরদিকে সিদ্ধেশ্বর ভগবানের কৃপা বিশিষ্ট ভাবেই উপলব্ধি করিতেছি। যেখানেই আমরা 'আপনারা করিব' বলিয়া আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে চাহিয়াছি সেখানেই আমরা আপনাদিগকে দুর্ব্বল, অশক্ত, অসহায় এবং অকূল-পাথারে ভাসমান দেখিয়াছি। কিন্তু যখনই আমরা হা'ল ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র দুর্ব্বলের বল ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছি তখনই আমরা আপনাদিগকে ধনবল,জনবল এবং বুদ্ধিবলে বলীয়ান দেখিতে পাইয়াছি। দাসাশ্রমের ক্ষুদ্র ইতিবৃত্তে ভগবানের লীলা কাহিনী এই নূতন বা আকস্মিক নহে কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় অগণ্য এবং সুসম্বদ্ধ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহা হইতে আমাদিগের আজিও স্থায়ী মনী-ভূত এবং প্রাণগত শিক্ষালাভ হইল না। বুঝিতেছি তাহাও ভগবানের কৃপা ব্যতীত হইবার নয়। তাই নিতান্ত অশরণ হইয়া করজোড়ে তাঁহারই নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। আশা করি দাসাশ্রমের হিতৈষীগণ আমা-দিগের প্রার্থনায় যোগ দান করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বর্ত্তমান মাসের রোগী সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। রসিকচাঁদ, ৩। আয়াপ্রসন্ন মজুমদার, ৪। হৈমবতী, ৫। গোপালচন্দ্র নন্দী, ৬। আজিম মহম্মদ, ৭। দেবীয়া, ৮। স্বর্ণ, ৯। কুসমণি, ১০। দুর্গামণি, ১১। নবদুর্গা, ১২। পার্ব্বতী, ১৩। হীরামণি, ১৪। রাজেশ্বরী, ১৫। পার্ব্বতী, (২য়) ১৬। ঘুণুমণি, ১৭। ভুবনাথের মা।

গোপালচন্দ্র নন্দী।—বাড়ী খুলনা জেলায়, বয়স ৩২ বৎসর। হাঁপানি কাসী, জ্বর, বাতশ্লেষ্মাদিতে অনেক দিন হইতে কষ্ট পাইয়া একেবারে শয্যাশায়ী হন। শেষে দাসাশ্রমে আসিবার জন্ত প্রার্থী হন। এক সময়ে ইনি গিরিডিতে দাসাশ্রমের কর্ম্মচারী থাকিয়া বিপদকালে বিশেষ সাহায্য করেন সুতরাং দাসাশ্রমও তাঁহার বিপদকালে যথাশক্তি তাঁহার সেবা করিবার জন্ত স্থান দান করিয়া কৃতার্থ হন। এখন তিনি অনেকটা ভাল আছেন।

হীরামণি। বাড়ী মেদিনীপুর জেলা কাঁথি সবডিবিশনে। বয়স ২৮।২৯; চাকরাণীর কার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কাপড় তুলিতে গিয়া ছাদ হইতে পড়িয়া যায় এবং পদতলে ও পৃষ্ঠদেশে দারুণ আঘাত পাইয়া মৃতকল্প হয়। সেই অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে প্রেরিত হয়। তিন মাস চিকিৎসায় যখন অনেকটা আরাম হইয়া উঠে তখন সেখান হইতে বিদায় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তখনও শয্যাশায়ী, বসিতে বা দাঁড়াইতে কিছুই পারে না। কাজ কর্ম্ম করিবে কি! এই অবস্থায় দাসাশ্রমে আনীত হয়। এখন অনেকটা ভাল আছে এবং কিছু কিছু হাটিতেও পারে।

পার্ব্বতী (১ম)—বাড়ী উড়িষ্যা প্রদেশে বয়স প্রায় ৩৫।৩৬ চাকরাণীর কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গত চৈত্র মাস হইতে তাহার পেটের অভ্যন্তরে একটী ফোড়া হওয়ায় অত্যন্ত যাতনা পাইতেছে। ফোড়াটী পেটের মধ্যেই গলিয়া যায় ইহাতে ডাক্তারেরা আমরক্ত মনে করিয়া তাহারই চিকিৎসা করেন। প্রায় ১০ মাস পরে নানা কষ্ট ভোগ করিয়া দাসাশ্রমে আনীত হয়। তাহাকে এখন হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

ঘুণুমণি।—পিতার নাম উদ্ধব, জাতি কৈবর্ত্ত, বয়স ২১।২২ বৎসর, বাড়ী যশোহর জিলা। আড়কাটির প্রলোভনে পড়িয়া অজ্ঞাতসারে কুলী হইয়া আসামে যায়। যত দিন শক্তি ছিল, কাজ করিয়াছিল; যখন আসাম জ্বরে প্রপীড়িত হইয়া একেবারে মরণোন্মুখ হয় তখন তাহার কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাকে সেই অশরণাবস্থায় কলিকাতার রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া যায়। তদবস্থায় দাসাশ্রমে আসিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। এখন একটু ভাল হইয়াছে; জ্বরও ছাড়িয়াছে।

তারাপ্রসন্ন মজুমদার—বাড়ী ময়মনসিং জেলায়, বয়স ১৬ বৎসর। দেশে থাকিতে অনেক দিন ম্যালেরিয়া ভোগ করিয়া শেষে কয়েকটী বন্ধুর সাহায্যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। শেষে তাঁহারা চিকিৎসার বিশেষ

সুবিধা করিয়া না উঠিতে পারায় দাসাশ্রমে আসিতে পরামর্শ দেন। তাহাদের দেশের একজন মোক্তার বাবু একদিন তাহার সন্ধানে আসিয়া বলিলেন তোমার বাড়ীর সকলে যে তুমি মরিয়া গিয়াছ শুনিয়া ভারী ব্যাকুল হইয়াছেন। অতএব অবিলম্বে তুমি বাড়ী যাও। তারাপ্রসন্ন প্রায় একমাস ছিল এবং সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া গিয়াছে।

পার্ব্বতী (২য়) বাড়ী কলিকাতা জাতিতে ডোম বয়স প্রায় ৩২ বৎসর। যকৃৎ প্লীহা জরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল দেখিয়া পাড়ার একটী স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে দিয়া যায়। আরাম হইয়া গিয়াছে।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে নিম্নলিখিত মাসিক চাঁদা ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান দাতাগণের কল্যাণ করুন।

এককালীন দান।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫।০,বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, গোয়ালপাড়া ১০৲, A frieud ৫৲, ৫০ নং ওলড্‌বৈঠকখানা মেস্।/০, ১২। ৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মেস্ ॥০, ১২৬ নং ওলড্‌বৈঠকখানা মেস্।০, ৪২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট মেস্।০, A friedn of Hari Ghose's Street ১৲, বাবু ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ॥০, ৪০ নং পঞ্চাননতলা মেস্।০, ৪০।১ নং পঞ্চাননতলা মেস্।০, বাবু ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, বাবু মন্মথনাথ দত্ত ১৲, বাবু কিশোরীলাল সরকার ১৲, D. N. Bose Eqr ॥০, বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেট ১৲, ৭নং কাশিঘোষের লেন মেস।০, ৬৩।১ নং মেছুয়াবাজার রোড মেস।০, বাবু যতীন্দ্রনাথ মিত্র, ১৲, বাবু রাখালদাস মল্লিক ॥০, ১০০।১নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট মেস্।০, বাবু যামিনীকুমার বসু।১০, জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ ৫৲, ৬৫নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট মেস্ ৶৫ ২৬নং কানাইলাল ধরস্ লেন মেস ৶০, বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় ১৲, ১১নং মুসলমানপাড়া লেন মেস।০, ৮।১নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন মেস॥০, ১০০।২না মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট মেস।/০, ২৪নং রামকান্ত মিস্ত্রির লেনের মেস।৶০, বাবু গিরীশচন্দ্র দে ১৲, ১০৭ নং ওলড্‌বৈঠকখানা মেস ৶০,৫০ নং ওলড্ বৈঠকখানা মেস।/০, ৪।১ নং ছকু খানসামার লেন মেস।১৫, বাবু চণ্ডীচরণ সেন ১৲, ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৲, ১২৬ নং ওলড্‌বৈঠকখানা মেস্।০, বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষ ১৲, A sympathiser, Bethune Collage ৫৲, বাবু সারদাচরণ মিত্র ২৲, শ্রীমতী প্রভাবতী দাস ১৲, বাবু প্যারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, অনাথবন্ধু সমিতি ১৲, হৃষীকেশ মজুমদার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, বাবু রামচন্দ্র কুণ্ডু গোবিন্দপুর ১৲, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সাহা কুষ্ঠিপাঁচুরিয়া ১৲, বাবু জানকীনাথ সাহা কুষ্ঠিপাঁচুরিয়া ॥০, বাবু জলধর সাহা কুষ্ঠিপাঁচুরিয়া ॥০, বাবু বনমালী সাহা কুষ্ঠিপাঁচুরিয়া ॥০, বাবু চন্দ্রমোহন সাহা কুষ্ঠিপাঁচুরিয়া ॥০, বাবু রমেশচন্দ্র সেন ফরিদপুর ১৲, বাবু অম্বিকাচরণ মজুম-

দার ফরিদপুর ২৲, বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ভোজনদক্ষিণাপ্রাপ্ত ৶১৫ বাবু অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৲, বাবু গোবর্দ্ধন ঘোষাল, হিলোয় ৩৲, ৩১ নং ওল্‌ড বৈঠকখানা মেস ৸১০, ১৫নং মুসলমানপাড়া লেন মেস ॥০,বাবু শ্রীশচন্দ্র দত্ত ২৲,১৩৪ নং ওল্‌ড বৈঠকখানা মেস /১৫, ১২।৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মেস ॥০, ২১।১নং পটুয়াটোলা লেন মেস ॥০, বাবু সতীশ-চন্দ্র ঘোষ ১৲, A sympathiser ৬৲, বাবু ছত্রধন ঘোষ ১৲, ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি, এল ১৲, বাবু কালিদাস রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল ১৲, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲, বাবু বিহারীলাল দাস ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জানুয়ারী ১৲, বাবু মহেশচন্দ্র সান্যাল ১৲, বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ১৲, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র সান্যাল ১৲, বাবু বিনোদবিহারী মজুমদার।০, বাবু বিহারীলাল সাহা।০, Mrs K. N. Ray ৩৲, দাসা-শ্রমের বন্ধু ৶৫, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ ২৸৵৫ A friend of Dasasram ১৲, দেবী চৌধুরাণীর বিবাহ উপলক্ষে ৪৲, বাবু রতিকান্ত ঘোষ।০, ৬৩নং মেছুয়াবাজার রোড মেস।০, একজন বন্ধু স্ত্রীর স্বর্গার্থে ২৲, বাবু রাজেন্দ্রনাথ শেট্, জানুয়ারী ১৲, ২০ নং পটুয়াটোলা মেস।০, বাবু যোগেশচন্দ্র দে বি, এল ২৲, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ১৲, ৪নং পঞ্চাননতলালেন মেস।০, বাবু উপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।০, বাবু প্রিয়নাথ বসু ১৲, বাবু শ্যামা-দাস কবিভূষণ, ফেব্রুয়ারী ॥০, বাবু হরিপদ ঘোষাল, ফেব্রুয়ারী।০, বাবু ঈশানচন্দ্র দাস গোপালপুর জেলা ফরিদপুর বার্ষিক ১৲, বাবু শীতলচন্দ্র ঘোষাল উকীল উলুবেড়ে ১৲, বাবু রসিকলাল মুখার্জি বাগনান ১৲, বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ মেদিনীপুর ১৲, মেদিনীপুর ব্রাহ্ম-সমাজ ১৲, বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার মেদিনীপুর ১৲, বাবু দীনবন্ধু দত্ত পাহাড়ীপুর।০, আবদুল রহমান ১৲, আজবালী ॥০, বাবু তারাপ্রসাদ মাইতি ॥০, বাবু নিবারণচন্দ্র মুখার্জি ॥০, বাবু সারদাচরণ বসু ॥০, বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ ॥০, আবদুল রহিম।০, বাবু কৃষ্ণকিশোর আচার্য্য ১৲, বাবু জনার্দ্দন রাহুত ॥০, বাবু প্রিয়নাথ মুখার্জি ১৲, বাবু পরাণচন্দ্র দাস ১৲, বাবু উপেন্দ্রনাথ মাইতি ॥০, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ॥০, বাবু মধুসূদন রায় ৸০, বাবু গোলাম আলারখা ॥০, বাবু অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী মেদিনীপুর ॥০, বাবু সুশান্তনাথ সেন মেদিনীপুর ॥০, বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ মেদিনীপুর।০, বাবু বিহারীলাল হালদার মেদিনীপুর ॥০, বাবু পূর্ণচন্দ্র মেদিনীপুর ৸০, মনিরুদ্দীন আহাম্মদ ॥০, বাবু শ্রীধরচন্দ্র বসু।০, বাবু রামশেখর নন্দী ১৲, বাবু রাসবিহারী বসু ॥০, বাবু অতুলচন্দ্র বানার্জি ১৲, বাবু মোক্ষদাচরণ বসু ॥০, বাবু নবীন-চন্দ্র জানা।০, বাবু ক্ষেত্রমোহন পাল।০, মহম্মদ আজহর।০, বাবু ধিরাজচন্দ্র হালদার।০, মুন্সী নফির উদ্দীন মহম্মদ।০, বাবু দুর্গাপ্রসাদ সিংহ।০, মুন্সী মবারক আলী ৸০, মুন্সী আম-জেদ হোছেন।০, মুন্সী এ, করিম ৸০, বাবু রজনীকান্ত দত্ত ॥০, বাবু সতীকুমার গাঙ্গুলী ॥০, মুন্সী আবদার ওয়াক্ ॥০, বাবু কেদারনাথ সিংহ ॥০, বাবু অভিরাম দে ॥০, বাবু রামকুমার মাইতি ॥০, বাবু কুঞ্জবিহারী দাস ॥০, বাবু আর বসু ॥০, বাবু জীবনচন্দ্র দাস ॥০, বাবু ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্ত।০, বাবু প্যারীচরণ চট্টোপাধ্যায়।০, মুন্সী মহম্মদ বক্স ৸০, বাবু হরিপদ সিংহ ॥০, বাবু রসিকলাল ঘোষ ১৲, বাবু আবদুল লতিব ॥০, বাবু গোপালচন্দ্র রায় ॥০, এ, কেও ॥০, শ্রীচন্দ্রনাথ ঘোষ ॥০, বাবু অবিনাশচন্দ্র গোঁই ॥০, বাবু কৈলাসচন্দ্র আড়ুডি।০, বাবু

রজনীকান্ত মিত্র ॥০, মুন্সী মুরলহক ।০, এম্. সি, গাঙ্গুলী ॥০, বাবু কেদারনাথ রায় ॥০, বাবু নীলরতন রায় ১৲, বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ ॥০, বাবু গিরীন্দ্রনাথ মজুমদার ১৲, বাবু শ্রীধর চক্রবর্ত্তী ॥০, বাবু তিনকৌড়ি মাইতি ॥০, বাবু গোসাইদাস দাস।০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥০, বাবু মাধবচন্দ্র দত্ত ॥০, বাবু শ্যামাপদ মিশ্র ॥০, বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।০, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲, বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১৲, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১, রাজা কালী-প্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র ২৲, বাবু রাধামাধব দত্ত ।৵০, বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৵০, বাবু রজনীকান্ত কোঙরা ৵০, বাবু রাজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ৵০, বাবু নেপাল ভট্টাচার্য্য ৵০, বাবু ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত।০, বাবু অবিনাশচন্দ্র দত্ত ১৲, বাবু বঙ্কিম-চন্দ্র পাত্র।০, ত্রৈলোক্য বাবু ৵০, বাবু প্যারীলাল দত্ত ১৲, x—।০

বাবু ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্ট প্লীডার মেদিনীপুর ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বার্ষিক ৬৲ টাকা হিসাবে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ আদায় ১৲, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মেদিনীপুর বার্ষিক ৩৲ টাকা জানুয়ারী ১৮৯৬ হইতে আরম্ভ জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ আদায় ১৲।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

দাসীর সাহায্য ২৲, জামা বিক্রয় ৵০, পুস্তকবিক্রয় ৭।১০, বাক্সে প্রাপ্ত।৫, মোট ৯৮৵১৫।

মাসিক চাঁদা।

শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ২৲, রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর, ডিসেম্বর ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ, ডিসেম্বর ১৲, ৪০।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট মেস ডিসেম্বর ॥০, বাবু কালিশঙ্কর শুকুল, নবেম্বর ও ডিসেম্বর ২৲, বাবু প্যারিমোহন ভড় ডিসেম্বর।০, N. K. Bose Esqr C. S. ডিসেম্বর ১৲, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা মাঘ ॥০, বাবু নন্দ-কুমার দত্ত ডিসেম্বর ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ জানুয়ারী ১৲, বাবু দিননাথ চট্টোপাধ্যায় জানুয়ারী।০, বাবু প্রমথনাথ দাস জানুয়ারী ২৲, ১৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট মেস জানুয়ারী ॥০, বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানুয়ারী।০, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, জানুয়ারী ১৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু জানুয়ারী ॥০, বাবু দিনেশচন্দ্র চৌধুরী ফেব্রুয়ারী ॥০, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর জানুয়ারী ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত জানুয়ারী।০, ৪।২ নং ছকু খানসামার লেন মেস জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ৸০, বাবু শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী।০, বাবু বঙ্কবিহারী মিত্র জানুয়ারী।০, রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর জানুয়ারী ১৲, বাবু নন্দকুমার দত্ত, জানুয়ারী ১৲, বাবু প্যারিমোহন ভড়, জানুয়ারী।০, বাবু রাধানাথ দেব, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী ১৲, A lady C/o বাবু শ্রীনাথ দাস জানুয়ারী ১৲, ৪০।১নং কলুটোলা মেস জানুয়ারী ॥০, বাবু যদুনাথ বরাট ফেব্রুয়ারী ১৲, বাবু নবীনচন্দ্র বড়াল, জানুয়ারী ১৲, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী ফেব্রুয়ারী ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র ফেব্রুয়ারী ১৲, বাবু হরিধন চট্টোপাধ্যায় জানুয়ারী হইতে এপ্রেল ১৲, বাবু দিনেশ চন্দ্র চৌধুরী ফেব্রুয়ারী ॥০, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা ফাল্গুন ॥০, মোট ২৮॥০।

মোট আয়।

মাসিক চাঁদা ২৮॥০, দানপ্রাপ্তি ১৭০৸০, অন্যান্য প্রকারে আয় ১০৵১৫, বিগত মাসের স্থিত ৬৭॥৶১৫, মোট জমা ২৭৭৵১০।

ব্যয়।

কর্জ্জশোধ ২৫৲, আদায়কারী ৩৬৸৵০, গাড়ীভাড়া ৪॥৵১০, গচ্ছিতজমা ৭০, টাকার সুদ ১৲, কর্জ্জ দেওয়া যায় ১০৲, রাঁধুনী ৫৸৵০, চাকর ২৸৵১০, মেথর ৩৸৵১০, ধোপা।০, কর্ম্ম-চারীর বেতন ৩৬।৶০, দুগ্ধ ২৲, আতুরগণের খাইখরচ ৪৮॥৫, দাসাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট গচ্ছিত ১৶১০, অন্যান্য ॥৵১৫; মোট খরচ ২৪৯৸৶০।

মোট আয় ব্যয়।

মোট জমা ২৭৭৵১০, মোট খরচ ২৪৯৸৶০, মোট হস্তে স্থিত ১৭৶১০।

বস্ত্রাদি দান।

শ্রীমতী প্রভাবতি দাস এলপাকার চোগা ৬, কোট ১, টুপি ৩। Little sister of the Baud of Mercy, নুতন কাপড় ১, পিতলের হাতা ১, লোহের কড়া ১, গামলা ২। বাবু বিমলানন্দ দাসগুপ্ত সাদাকোট ১। বাবু রমেশচন্দ্র গুপ্ত গরম কোট ১। বাবু অনাথবন্ধু গুপ্ত পড়িয়া পাওয়া দান, নূতন কাপড় ১ জোড়া, পুরাতন কাপড় ১, ছেঁড়া কাপড় ১, গামছা ১। বাবু ব্রহ্মানন্দ বক্রাকতি কোট ১, সার্ট ২, বিছানার চাদর ১। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ প্যাণ্টালুন ১, কোট, ৩ সার্ট ১, ধুতি ১, মোজা ২। বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বঙ্গেশ্বর পুস্তক ৫। বাবু দিনেশচন্দ্র চৌধুরী মসারী ১।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। তাহা না হইলে কার্য্যকালে পরস্পরকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

১। দাসাশ্রম বিশেষভাবে অনাথ ও অশক্ত আতুরদিগেরই আশ্রয়-স্থান। যাহারা শক্ত, কোনপ্রকারে আপনাদের জীবিকা সংস্থান করিয়া লইতে পারে, কেহ যেন তাহাদিগকে দাসাশ্রমে লইয়া না আসেন। কিন্তু অশক্ত আতুর দেখিলেই এখানে পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন। যদি আনিবার খরচ তাঁহারা দিয়া উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে অগত্যা দাসাশ্রমই সে ব্যয়ভার বহন করিবেন।

(ক) আতুর অর্থে অন্ধ, খঞ্জ, কোনপ্রকারে বিকলাঙ্গ অত্যন্ত জীর্ণ বৃদ্ধ এবং চিররুগ্ন ব্যক্তি বুঝিতে হইবে।

(খ) অনাথ অর্থে—যাহাদের তত্ত্বাবধান করিবার কেহ নাই অথবা থাকিলেও এমন অস্বাভাবিক নির্ম্মম এবং হৃদয়হীন যে তাহার ভার লইতে চায় না।

২। (ক) রোগীদিগের জন্য সাধারণতঃ হাঁসপাতাল সকল মুক্ত রহিয়াছে। যাহাদের নিজের বাড়ী থাকিয়া চিকিৎসা চালাইবার সঙ্গতি নাই তাহারা হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। তবে অনেক সময় দেখা যায়, যে হাঁসপাতাল পরিপূর্ণ, স্থান খালি নাই; এরূপ অবস্থায় যত দিন হাঁসপাতালে স্থান খালি না পাওয়া যায়, ততদিন এখানে রাখিয়া তাহাদের চিকিৎসাদি করান যায়; কিন্তু তাহাদের ইহা জানা প্রয়োজন যে হাঁসপাতালে স্থানখালি হইলেই তাহাদিগকে সেখানে যাইতে হইবে।

(খ) অনেক সময় দেখা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইতেই রোগীরা হাঁসপাতাল হইতে বিদায়প্রাপ্ত হয় এবং নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় দাসাশ্রম তাহাদের আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত ভার লইতে প্রস্তুত আছেন।

(গ) গৃহস্থের ঘরের "চাকর চাকরাণী"দিগকে আমরা নিরাশ্রয় মনে করি না। সুতরাং এখন হইতে আর কেহ তাহাদিগকে এখানে আনিবেন না। আনিলেও দাসাশ্রম তাহাদিগকে রাখিতে বাধ্য নহেন।

দাসী

আমাদের অবস্থা।

(১)

ইংরাজ-শাসনে আমাদের এই বঙ্গদেশের লোকের অবস্থার সাধারণতঃ উন্নতি হইয়াছে না অবনতি হইয়াছে? যদি উন্নতি হইয়া থাকে, তবে কাহাদের, ও যদি অবনতি হইয়া থাকে, তাহাই বা কাহাদের? যদি কাহাদের অবনতি হইয়া থাকে, তবে তাহার কোন প্রতিকার আছে কি না? এই সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনেকে (বিশেষতঃ ইংরাজ সম্পাদক ও ইংরাজ রাজপুরুষ) বলেন, যে দেশের অবস্থার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে। দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে। শুনিতে পাই, ভারতে অন্য কোন অধিকারে এরূপ শান্তি স্থাপিত হয় নাই। জীবন ও সম্পত্তি আজ কাল অনেকটা নিরাপদ। রাস্তা ঘাটের আজ কাল খুব সুবিধা। রেল খালে দেশ শীঘ্রই ছাইয়া যাইবে। অন্তত: বহির্বাণিজ্যের যে সব অন্তরায় ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদের লোপ হইতেছে। জ্ঞানালোকে লোকের চক্ষু ফুটিতেছে। নিজের স্বার্থ তাহারা বুঝিতে পারিতেছে ও সেই সঙ্গে তাহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় বৃদ্ধি পাইতেছে। এ সব কথা যে নিতান্ত মিথ্যা নয় তাহা সকল বুদ্ধিমান লোকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ চিত্র কিছু অতিরঞ্জিত। ইহার আর এক দিক আছে; অধিকাংশ ইংরাজ সংবাদপত্র লেখক ও রাজপুরুষ তাহা কিন্তু দেখিতে পান না, কিম্বা দেখিয়াও দেখেন না। দেশে অন্নকষ্ট ত কোন না কোন স্থানে লাগিয়া আছেই। তাহার উপর দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের নানা স্থান অতিশয় অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান অধিকারের সময় এরূপ অন্নকষ্ট ও এরূপ দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল কি না সে কথা এখানে উঠিতে পারে না। তাহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যদি পূর্ব্বতন অধিকারের সময় ও ইংরাজ অধিকারের সময় দেশের অবস্থার কোন প্রভেদ না রহিল, তাহা হইলে আর

ইংরাজ রাজের কি গৌরবের কারণ থাকিতে পারে, তাহা সহজে বুঝা যায় না। যে রাজ্যে রাজার ও প্রজার সমান অনটন, যেখানে দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ লাগিয়াই আছে, সেখানে শাসন-প্রণালীতে যে কোন মূলগত দোষ নাই, একথা কোন অসমসাহসিক ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ বলিতে সাহস করেন না। যে রাজ্যে রাজার ও প্রজার অবস্থা এইরূপ সেখানে রাজার বিশেষ গৌরবের কারণ কি আছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শাসন-প্রণালীর কি কি দোষে দেশের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। (১) আমাদের শাসন-প্রণালী বড় ব্যয়সাপেক্ষ। পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় বাঙ্গালার সিভিল কর্ম্মচারিবর্গের ত্রৈমাসিক তালিকা দেখিয়া থাকেন। আজ কাল সহিয়া গিয়াছে কিন্তু ছেলেবেলায় যখন প্রথম ঐ তালিকা দেখি, তখন সাহেব কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানায় বাহার দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিতে হইয়াছিল। হাজার টাকার উপরে কত পদ! ইহার অধিকাংশই সাহেবদের একরূপ একচেটিয়া। তাহাতে দেশীয় লোকের প্রবেশাধিকার নাই বলিলেই হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বাঙ্গালী ইংরাজের কথা তুলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের এই দরিদ্র দেশের কর্ম্মচারীদের কি পরিমাণে মাহিয়ানা যোগাইতে হয়, তাহার প্রতি পাঠকের মন আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। বাঙ্গালীই হউন আর ইংরেজই হউন এরূপ উচ্চহারে তাঁহাদিগকে মাহিয়ানা দেওয়া দেশের পক্ষে কি বিষম ব্যাপার! এরূপ দানসাগরী ব্যবস্থা এ দেশের পক্ষে নয়। যে দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক আধপেটা আহার করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে ২০০০।২৫০০ হাজার টাকার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ৩০০০ হাজার টাকার কমিশনার ও সেক্রেটরি বড় গুরুপাক সামগ্রী। বাহুল্য ভয়ে আর এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা গেল না। (২) সামরিক ব্যয়। সিভিল তালিকা হইতে তাহার আভাস কিছুই পাওয়া যাইতে পারে না, এবং বাঙ্গালাকে সামরিক ব্যয়ের হিসাবে ভারতগবর্ণমেণ্টকে কত দিতে হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। ভারতগবর্ণমেণ্টের আয়ের যে বৃহৎ অংশ সামরিক বিভাগে ব্যয় হয় তাহা সকলেই জানেন। যুদ্ধ বিগ্রহাদি ত লাগিয়া আছেই। মোটা মাহিয়ানার সেনানী ত রাশি রাশি। এক একজন গোরা সৈনিকের প্রতি খরচাই বা পড়ে কত! সিপাহীই বা কত! ভারত-গবর্ণমেণ্টের সুবৃহৎ সামরিক বিভাগের খরচ ত ভারতবর্ষকেই যোগাইতে হয়।

(৩) ভারতের হিসাবে ইংলণ্ডে খরচ। ভূতপূর্ব্ব সাহেব কর্ম্মচারীদিগের পেন্‌সন, সেক্রেটরি অব্ ষ্টেটের মাহিয়ানা ও আফিসের খরচ, বিলাতে ভারতের জন্য সৈন্য রাখিবার ও তৈয়ার করিবার খরচ ভারতের জন্য নানা প্রকার আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় মাল পত্রাদি কিনিবার খরচ, প্রভৃতি নানা বাবদে বিলাতে যে বাৎসরিক কত কোটি টাকা পাঠাইতে হয় তাহা অনেকেই জানেন। এই টাকার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেকের অনুমান ক্রমে ক্রমে পাইতে থাকিবে। এই রাশি রাশি টাকার অধিকাংশের পরিবর্ত্তে কিছুই পাওয়া যায় না। যেমন সামরিক বিভাগের সমগ্র ব্যয়ভারের অংশ বঙ্গদেশকে বহন করিতে হয়, সেইরূপ বিলাতে খরচের হিসাবে দেয় টাকার অংশও ইহাকে দিতে হয়।

উপরে খরচের যে তিন বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল তাহার ঔচিত্যানুচিত্যের সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই এবং বলিবারও বিশেষ আবশ্যক নাই। এইরূপ ব্যয়বাহুল্য অনেক পরিমাণে পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল। ইংরাজেরা অবশ্য খয়রাৎ করিতে এদেশে আসেন নাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারেন যে, যদি ভারত অধিকার করিয়া তাঁহাদের স্বজাতির কিছু লাভ না হইল তবে এরূপ অধিকারের আবশ্যকতা কি? তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে করেন যে, দেশ শাসন করিতে হইলে অনেক ব্যয় দরকার ও বহুল পরিমাণে ইংরাজকর্ম্মচারী রাখা আবশ্যক। এইরূপ মনে করা স্বাভাবিক, এবং ইহাতে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহা-দের অবস্থায় পড়িলে আমরা যে অন্যরূপ করিতাম, এরূপ ভাবিবার কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু ইংরাজ শাসনযন্ত্র নানা প্রকারে ব্যয়সাধ্য হওয়া যে দেশের দুরবস্থার এক প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সহৃদয় ইংরাজেরাও স্বীকার করেন। কোন কোন ইংরাজ রাজস্বতত্ত্ববিৎ বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ড ও অন্যান্য সুসভ্যদেশের তুলনায় ভারতবাসীদিগের করভার এত লঘু যে এ সম্বন্ধে কোন অনুযোগ করিতে তাহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই সকল ব্যক্তি একটী কথা ভুলিয়া যান। এক জন ইংরা-জের গড়পড়তা আয়ের অপেক্ষা এক জন ভারতবাসীর গড়পড়তা আয় যে কত কম তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। আর একটী কথা এখানে মনে রাখা উচিত। ঠিক আয়ের তারতম্য অনুসারে দেয় করের তারতম্য হইলে অল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে করভার অসহনীয় হইয়া উঠে। যে

ব্যক্তির মাসে ৫০৲ টাকা আয়; মাসে ॥৵০ আনা লবণ কর দেওয়া তাহার পক্ষে যেরূপ কষ্টকর, যাহার ৫ টাকা আয় ৴০ আনা লবণকর দেওয়া তাহার পক্ষে অনেকগুণ অধিকতর কষ্টকর। অধিকাংশস্থলে কিন্তু এইরূপ অনুপাতও দেখা যায় না; বরং ইহার বিপরীতই দেখা যায়। যাহার ৫০৲ টাকা আয়, সে হয়ত মাসে ১৲ টাকা কর দিতেছে; আবার যাহার ২০৲ টাকা আয় সে হয়ত মাসে ।০ আনার কমে কোনপ্রকারেই অব্যাহতি পাইতেছে না।

(২)

দেশের দুরবস্থার যে কয়েকটী কারণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল, তাহাদের প্রতিবিধান করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। উহাদের প্রতিবিধান করিতে কেবল একমাত্র গবর্ণমেণ্টই সক্ষম। এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা অনাবশ্যক। অন্য অনেক কথা আছে। দুরবস্থার এমন অনেকগুলি কারণ আছে যাহাদের প্রতিবিধান (নিদান অনেক পরিমাণে) আমাদের সাধ্য। তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশের প্রাচীন ধনী বংশ সমুদয় ক্রমে হীনাবস্থ হইয়া পড়িতেছেন। কতকটা তাহা হইবারই কথা। দেশের অধিকাংশ ধনী লোকের ধন জমীদারী লইয়া। কতকগুলি ধনী লোক আছেন বটে, যাঁহাদের ভূমির সঙ্গে প্রায় কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহাদের কথা পরে বলিব। মোটের উপর দেখিতে গেলে জমীদারদের অবস্থার ক্রমিক অবনতি হইতেছে। বিষয়-বিভাগ ইহার এক প্রধান কারণ। ইংলণ্ডের অধিকাংশ জমীদার পুরাতনবংশীয়। তাহার দুইটি প্রধান কারণ আছে। (১) জ্যেষ্ঠাধিকার। অধিকাংশ স্থলে স্থাবরসম্পত্তি জ্যেষ্ঠপুত্র ছাড়া আর কেহ পান না। কাজেই জমীদারী বিভক্ত হওয়া একরূপ অসম্ভব। (২) ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার অভাব। উহাতে সকলেরই জীবন-স্বত্ব, কাহারও দানবিক্রয়ের ক্ষমতা নাই। আজকাল এই পদ্ধতির যদিও অনেক ব্যত্যয় হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ লোপ হয় নাই। যদি সম্পত্তির বিভাগ না হইল এবং ইহার হস্তান্তর সহজ না হইল, তাহা হইলে প্রাচীন জমীদার বংশের অবস্থা হীন হওয়া অনেকটা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের দেশে এরূপ হইতে পারে না। তোমার যদি তিনটী পুত্র থাকে তোমার সমস্ত সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে সমান বিভক্ত হইবেক। জ্যেষ্ঠা-

ধিকার কিম্বা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিবার অক্ষমতার স্বপক্ষে আমি যে কিছু বলিতেছি, এমন যেন কেহ মনে না করেন। প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ঐ দুই প্রকার চলন নাই। কিন্তু ঐ সব দেশের লোকদের উৎসাহ আছে, অধ্যবসায় আছে, শ্রমশীলতা আছে। যদিও ঐ সব দেশের অনেক পুরাতন ধনিবংশ ক্রমে গরীব হইয়া যায় কিন্তু তাহার স্থলে অনেক নূতন ধনিবংশের আবির্ভাব হয়। অনেকেই ধন উপার্জ্জনে তৎপর। অনেকেই বাণিজ্য কৃষিকর্ম্মাদিতে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে। দেশের উন্নতির জন্য মূলধনের আবশ্যক। ঐ সব দেশে আবশ্যকীয় মূলধনের বিশেষ অভাব হইতে পারে না। ইউ-রোপের উন্নত দেশ সমূহে জমীদারেরা সাধারণতঃ জমীদারীর উন্নতির প্রতি কত যত্নবান্! আমাদের দেশের কয়জন জমীদারকে ঐরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে দেখা যায়? উন্নতি অর্থসাপেক্ষ। অনেকের অর্থ নাই। উন্নতি জ্ঞানসাপেক্ষ। অনেকে অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন। উন্নতি পরিশ্রমসাপেক্ষ। অনেকেরই পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নাই। আমাদের দেশে যদি কোন জমীদার বা জমীদারসন্তান দেখিলেন যে গ্রাসাচ্ছাদন স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে, তিনি অমনি "বাবু" হইয়া পড়িলেন। কোনরূপ কাজ করা, নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা পাওয়া, তিনি অতি হেয়জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার উপর আর এক উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হই-য়াছে। সাহেবি অনুকরণ আজকাল বড় প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বড়মানুষের পক্ষে এরূপ হওয়া কতকটা অনিবার্য্য। যে দেশ বহুকাল হইতে পরপদানত, সে দেশের লোকদের আত্মমর্য্যাদা ও জাতীয় ভাব সহজেই লোপ পাইবে। বিজিতগণ বিজেতাদিগের অনুকরণ করিবেই করিবে। বড় মানুষদের মধ্যে এইরূপ অনুকরণ প্রথম আরম্ভ হয়। মুসল-মান রাজত্বের সময় এইরূপ ঘটিয়াছিল; ইংরাজ রাজত্বের সময় উহা ঘটি-তেছে। কিন্তু আমরা ইংরাজের কি অনুকরণ করিতে শিখিতেছি? চির-কালই দোষ অনুকরণ করা সহজ ও গুণ অনুকরণ করা কঠিন। আমরা মাত্রা চড়াইয়া অনুকরণ করিতেছি ইংরাজের পানস্পৃহা, ইংরাজের বিলা-সিতা। অনেক ধনিসন্তান আজকাল ইংরাজের চাল চুল ইংরাজের পোষাক পরিচ্ছদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন। ইহা যে তাঁহাদের উৎসন্ন যাইবার এক প্রধান সহায় হইয়াছে তাহা তাঁহারা বুঝেন না বা বুঝিতে চান না।

কোন কোন অর্থনীতিজ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি বলিতে পারেন, "নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা উন্নতিপথের প্রধান কণ্টক। অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। যদি আমাদের বিশ্বাস হয় যে আমাদের অবস্থা খুব ভাল, ইহার অপেক্ষা ভাল অবস্থা হইতে পারে না, তাহা হইলে আমাদের অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতার তিরোধান হইবে। যাহার অভাব নাই তার আকাজ্ক্ষা নাই এবং যার আকাজ্ক্ষা নাই তার চেষ্টাও নাই। আকাজ্ক্ষা ও চেষ্টার অভাবেই আমাদের জাতীয় অধঃপতন সাধিত হইয়াছে। যদি আমাদের দেশের ধনিসন্তানেরা ইংরাজী চাল চুলের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া পড়েন তাহা একটা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। কারণ তাহা হইলেই বুঝা যাইবে তাঁহারা আর তাঁহাদের পূর্ব্বতন অবস্থায় সন্তুষ্ট নন। তাঁহাদের অভাব বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক এবং অভাব মোচনের জন্ত তাঁহারা স্ব স্ব অবস্থোন্নতির চেষ্টা পাইবেন।" যদি এরূপ হয় তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে নিদান একবার মাদারবৃক্ষে আতা ফলিতেছে। কিন্তু ইংরাজী দোষ অনুকরণ ও ইংরাজী চাল চুলের খাতিরে জাতীয়ত্বের মস্তকে পদাঘাত যদি উন্নতির লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বুঝিব যে আজকালকার নূতন সভ্যতার জোরে উন্নতি শব্দের নূতনতর অর্থ হইয়াছে। আর এক কথা আছে। যদি সুধু অভাবই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে চিরাগত আলস্য ও চেষ্টাহীনত্বের কোন ব্যতিক্রম না ঘটে; তাহা হইলে অভাববৃদ্ধি ক্লেশ ও অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইবে নাকি? এবং আমাদের দেশে কি তাহাই ঘটে নাই? এই অভাববৃদ্ধির সহিত মোকদ্দমাপ্রিয়তা আসিয়া জুটিয়া অনেক জমীদার বংশকে উৎসন্ন দিতেছে না কি? অনেক জমীদারই হয় ঋণজালে জড়িত হইতেছেন, নয় প্রজাপীড়ক হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ইংরাজ অধিকারে জমীদার "মা বাবা ও দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা" এ ভাব থাকিতে পারে না স্বীকার করি, কিন্তু জমীদার ও প্রজার মধ্যে সদ্‌ভাব ও পরস্পরমঙ্গলেচ্ছা কেন যে অন্তর্হিত হইল তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

বিলাসিতার প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার; তাহা অমিতব্যয়। ইহাকে বিলাসিতার অঙ্গ বলিলেও বলা যায়। অনেক জমীদার পুত্রের বিবাহ, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে অনেক সময় অবস্থার অধিক ব্যয় করিয়া বসেন। কেহ মনে করিলেন, ঋণ শোধ হইবেই—আজ না হয় দুই দিবস

পরে হইবে, কিন্তু পুত্রের বিবাহ বা পৌত্রের অন্নপ্রাশনের সুবিধাত সর্ব্বদা ঘটিবে না। কেহ ভাবিলেন অবস্থা আজ কাল ভাল নয় বটে কিন্তু আমার সমাজে যেরূপ মান সম্ভ্রম, পিতৃশ্রাদ্ধে ১০০০০ হাজার টাকা খরচ না করিলে কিছুতেই আমার শোভা পাইবে না। এ সকলের উপর অনেকের মধ্যে নেশা আসিয়া জুটিয়াছে। নেশা অবশ্য পূর্ব্বেও ছিল কিন্তু পূর্ব্বে গাঁজা কিম্বা চরসে একজন বড়মানুষের যাহা খরচ হইত, বিলাতী সুরার তাঁহার উত্তরাধিকারীর তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক খরচ হইতেছে। অমিতব্যয়ের নানা কারণ আছে। তাহাদের সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই। এখানে কন্যার বিবাহে অপরিমিত ব্যয়ের কথা কিছু বলা গেল না। সমাজের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে কন্যার বিবাহে যতই খরচ হউক না কেন, তাহা অপরিমিত ব্যয়ের সামিল ধরা যাইতে পারে না। জমীদার ছাড়া দেশে আরও কতকগুলি ধনী লোক আছেন। ইহাঁদের মধ্যে কতকগুলি বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত। ইহাঁরা যে দেশের প্রভূত উপকার করিতেছেন সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। এইরূপ লোক দ্বারাই দেশের ধনবৃদ্ধি হয়। ইউরোপের অনেক অংশে যেমন পুরাতন ধনীরা নির্ধন হইয়া পড়েন, এইরূপ লোকই তাঁহাদের স্থান অধিকার করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় এইরূপ ধনকুবেরদের সংখ্যা যে কত অধিক তাহা অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ লোক কয়জন আছেন? কলিকাতায় অনেক বড় বড় হাউসওয়ালা আছেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী কয়জন? দার্জ্জিলিং অঞ্চলে অনেক চা বাগান আছে, তাহাদের মধ্যে কয়খানা বাঙ্গালীর? দেশে খনিজধনের অভাব নাই; কিন্তু যে সব লোক পাথুরিয়া কয়লা তোলার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এ দেশীয়? বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনবৃদ্ধির পথ আমাদের এক প্রকার বন্ধ। দেশে কোম্পানীর কাগজভক্ত আরও কতকগুলি ধনী লোক আছেন। ইহাঁদের সংখ্যাও খুব কম। ইহাঁদের দ্বারা দেশের যে কি উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ইহাঁদের সম্বন্ধে একটা কথা কিন্তু ঠিক। দেশের ঋণভার বৃদ্ধি করিতে ইহাঁরা বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। ইহাঁরা নিশ্চেষ্ট জীব এবং অল্পে সন্তুষ্ট। বিদেশ হইতে কাপড় আনিয়া আমাদিগকে পরিতে হইতেছে। দেয়াশেলাইটার জন্যও পরের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ইহাঁরা চেষ্টা করিলে এ অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

কিন্তু সে চেষ্টা করা বড় কঠিন ব্যাপার। ব্যাঙ্ক বা ট্রেজরি হইতে সুদ লইয়া আসা ইহা অপেক্ষা কত সুখকর? সে দিন গবর্ণমেণ্ট সুদের হার ৪৲ টাকা হইতে ৩॥৹ টাকা করিয়া দিলেন। শুনিতে পাই রাজস্বমন্ত্রীর নাকি একটু ভয় হইয়াছিল, পাছে অধিকসংখ্যক লোকে টাকা ফিরাইয়া লন। অনেক দিন হইতে চলিল ইংরাজ এ দেশে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও তাঁহারা আমাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। চিনিতে পারিলে সুরেন্দ্র বাবুর কারামোচনের সময় বারাকপুরে ফৌজ দাঁড়াইত না, এবং সুদের হার কমাইবার সময় ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের মনে ভয়ের উদ্রেক হইত না। গবর্ণমেণ্ট সুদের হার কমাইয়া দেওয়াতে আমাদের টাকা ফিরাইয়া লইবার ক্ষমতাই যদি থাকিবে, তাহা হইলে আর আমাদের এ দশা কেন? বলা বাহুল্য জমীদার ছাড়া অন্য ধনিগণের মধ্যেও বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানা প্রবেশ করিয়াছে। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলা, অতএব দেশের ধনিগণের সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা গেল না।

(৩)

এখন দেখা যাউক মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা কিরূপ। পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে অনেকেই চাষ করিতেন। ব্যবসা করা অনেকের কাজ ছিল এবং অনেকে প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেন। তখন লোকের অভাব অল্প ছিল। দেশে বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই। অনেকেরই মনে সন্তোষ ছিল। কাজেই মোটা ভাত, মোটা কাপড় এক রকমে চলিয়া যাইত, বিশেষ কষ্ট হইত না। এখন সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। অনেকে চাষ ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনেক গৃহস্থ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে কতকটা চাষের জমী ছিল, খানকয়েক লাঙ্গল ও জনকয়েক কৃষক চাকর ছিল। কিন্তু আজকাল সে সব কিছুই নাই। দূরপল্লীগ্রামে আজও এরূপ গৃহস্থ দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু যতই সহরের নিকটে আসা যায় ততই তাঁহাদের সংখ্যা বিরল হয়। যেরূপ গৃহস্থের কথা বলিতেছি, ইহারা কৃষক নহেন—মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। কিন্তু আজকাল কি দেখা যায়? ইহারা অনেকেই কৃষিকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন। পুরুষেরা অনেকেই ইংরাজীতে শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং চাকরী অবলম্বন করিয়াছেন, বা চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন; গৃহে আর সে সুখ সে সন্তোষ নাই, সে স্বচ্ছলতা নাই, সে সদ্‌ভাব নাই। পিতৃপিতামহের

যে সদ্‌গুণ ছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। সে পরমার্থপরতা, সে আতিথেয়তা আজ কোথায়? তাহাদের স্থান যদি কোন নূতন গুণ অধিকার করিত তাহা হইলে বিশেষ ক্ষোভের কারণ থাকিত না। কিন্তু অনেক স্থলে নূতন গুণ বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা হইতেছে তাঁহাদের মধ্যে অনেক ব্যবসায়ী লোক আছেন। ইহাঁদের অবস্থা যে মোটের উপর খারাপ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যাহা কিছু খারাপ হইয়াছে, তাহার কারণ সাধারণ, ইহাঁদের প্রতি প্রযোজ্য কোন বিশেষ কারণ নয়। কিন্তু ইহাঁদের অনেকের মধ্যে একটী বিশেষ দোষ ঢুকিয়াছে। আজ কাল কি এক ঢেউ উঠিয়াছে, সকলেরই "বাবু" হইবার সাধ। যাঁহারা নিজে "বাবু" হইতে পারিলেন না, তাঁহাদের ইচ্ছা অন্ততপক্ষে তাঁহাদের ছেলেরা "বাবু" হয়। বোধ হয় যেন ছেলের দিকে তাকাইয়া তাঁহারা ভাবেন—

"আমার যে সব রৈল বাকী
তুমি পেলেই আমি পাব।"

ছেলেদিগকে বাবু করিবার ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই বোধ হয় তাঁহারা তাহাদিগকে ইংরাজী স্কুলে পাঠান। ইংরাজি শিক্ষার প্রতিকূলে কিছু বলা আমার মতলব নয়, এবং আমি উহার বিরোধীও নই। ইংরাজী শিক্ষা হইতে দেশের যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা আমি বেশ জানি। কিন্তু ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন ব্যবসাদারের ছেলে ইংরাজী শিক্ষা করিল, তাহা হইলেই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। বাবু শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা তাহার এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ব্যবসা করা একটি ঘৃণার কার্য্য বলিয়া তাহার ধারণা জন্মিল, এবং যেমন তেমন একটা চাকরির জন্ত সে লালায়িত হইয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু এরূপ ভাব তাহার মনে উদয় হওয়ার জন্ত দেশই অনেকটা দায়ী। দেশের এমন দুরবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, আমার বাড়ীতে যদি একজন ২০৲ টাকা মাহিয়ানার আমলা ও একজন বড় দোকানদার আসে, আমি সেই আমলাকেই অধিক খাতির করিব। এ সম্বন্ধে একটী ঘটনা মনে পড়িল। আমার বাসার নিকটে একঘর আড়তদার আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয়। এক সময় আমার পরিচিত একজন হাকিম আমার বাসায় আসেন। তিনি আসিবার পরই আড়তদার একজন উপস্থিত হন। হাকিমটি তামাক

খাইতেছিলেন এবং খাইতেই রহিলেন। একটু পরে আড়তদারটী চলিয়া যাইলে বাবুটী বলিলেন—"ওর নিতান্ত ইচ্ছা যে এই হুঁকায় তামাক খায়, সেই জন্য ও যতক্ষণ ছিল আমি হুঁকা ছাড়ি নাই।" আড়তদারটী অবশ্য ইংরাজী জানেন না ও ইংরাজীভাবে মার্জ্জিত নন। এ কথাও বলা উচিত যে হাকিমটী বড় ভদ্রলোক, এবং হুঁকা সম্বন্ধে জাতীয়ত্বের কোন গোল ছিল না। আড়তদার না হইয়া আমার প্রতিবাসী যদি একজন কেরাণী হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় কোন অসুবিধা ঘটিত না। আমি হাকিম বাবুর কোন দোষ দেখি না। এ স্থলে তিনি দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাজ সমস্ত দেশের লোকের মনোভাব ব্যঞ্জক। যে কারণেই হউক না কেন ব্যবসাদারদের ছেলেদের বাবুভাবাপন্ন হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা একটা কুলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। বাবু হওয়া ও প্রকৃত শিক্ষা পাওয়া আমি অবশ্য এক ধরি না।

ব্যবসাদারের পর আছেন, নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতকারী শিল্পকর। অবস্থাভেদে ইঁহারা মধ্যবিত্ত বা তন্নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইতে পারেন। আপাততঃ যাঁহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত আছেন বা ছিলেন তাঁহাদের কথা বলা যাইতেছে। দেশের অনেক প্রয়োজনীয় শিল্প আজ লুপ্তপ্রায়। ভাতের পরই কাপড়। ভাগ্যক্রমে আমরা আজও নিজেদের ভাত নিজেরা করিয়া খাইতেছি—কিন্তু নিজেদের কাপড় নিজের করিয়া লওয়ার ক্ষমতা একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। ইহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে? পূর্ব্বে যে সব লোক বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত তাহাদের বংশীয়েরা অনেকেই হয় সমাজের নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিম্বা ইংরাজী শিক্ষা করিয়া চাকরী ব্যবসায়ীর দল পুষ্ট করিতেছে। বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে যাহা বলা হইল অধিকাংশ শিল্পের প্রতি তাহা প্রযোজ্য। দুই চারিটা শিল্প আছে যাহাদের সম্বন্ধে অবশ্য বিশেষ অবনতি লক্ষিত হয় না, যথা—দরজীর কাজ, ছুতারের কাজ ইত্যাদি। ঐ সব শিল্প ব্যবসায়ীদের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সাধারণ কারণের ফল, তাহার বিশেষ কারণ নাই। কিন্তু দেশের অধিকাংশ শিল্পের যে খুব মন্দ অবস্থা, সে বিষয়ে দ্বিমত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মধ্যবিত্ত লোকদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কয়টী সাধারণ কারণ আছে। চাকরীই ইহাদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে এবং চাকরীর বাজার বড়

খারাপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় বৎসরে ৩।৪ হাজার শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোক তৈয়ারি হইতেছেন। ইহাঁদের অধিকাংশেরই ভরসা ও উদ্দেশ্য চাকরী। কিন্তু চাকরীর জন্য উমেদার যত, তাহার সিকি চাকরী বৎসরে খালি হয় কিনা সন্দেহ। যে সব লোকের কথা উপরে বলিলাম ইহাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। ইহারা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংস্পর্শে আসেন নাই এমন লোক যে কত আছেন তাহা বলা যায় না। ইহারা অনেকেই চাকরীর জন্য উমেদার, এবং চাকরী না পাইলে ইহাদের সংসার চলিবার কোন উপায় নাই। চাকরির সংখ্যা যে অপেক্ষাকৃত কত কম তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। যদি দেশের সমস্ত চাকরীই হিন্দু ও মুসলমান পাইতেন তাহা হইলেও অধিকাংশ উমেদারকে বিফল মনোরথ হইতে হইত। যে চাকরী আছে তাহার উপরে সাহেব ও উপসাহেবগণ বিশিষ্ট ভাগ বসাইয়াছেন। আমি বড় বড় চাকরীর কথা বলিতেছি না; তাহা ত সাহেবদের একরূপ একচেটিয়া। যে সব ছোট ছোট চাকরী আছে তাহারও অনেকগুলি সাহেব ও উপসাহেবরা অধিকার করিয়াছেন। পাঠকদের মধ্যে যদি কেহ কলিকাতায় কোন একটী আফিসে একবার যান, তাহা হইলেই আমার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন। মধ্যবিত্ত অধিকাংশ লোকের চাকরী ভিন্ন উপায়ান্তর না থাকা যে বড় শোচনীয় অবস্থা, তাহা বুঝাইবার প্রয়াস করা অনাবশ্যক। আমাদের নিজেদের দোষেই হউক বা অন্য কোন অনিবার্য্য কারণ সমবায়েই হউক, অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের পথ আমাদের পক্ষে আজকাল রুদ্ধ। অনেককেই "হা চাকরি! যো চাকরী!" করিয়া বেড়াইতে হইতেছে। ইহাতে লোকের অবস্থা যে খারাপ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? অনেকে বলিতেছেন অধিকাংশ লোক সুকুমার বিদ্যাচর্চ্চা বা চর্চ্চার চেষ্টা ছাড়িয়া দিউক। অর্থকরী শিল্প শিক্ষা করুক ও ব্যবসায়ে মন দিউক. কথাটা বলা বড় সহজ। কাজটা তত সহজ নয়। প্রথমতঃ, অর্থকরী শিল্পবিদ্যা শিখিবার বিশেষ কোন উপায় দেশে আছে কি? দ্বিতীয়তঃ যদিও ঐরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিবার উপায় থাকে উহা কাজে লাগাইবার সুবিধা আছে কি? তৃতীয়তঃ ব্যবসা করা কি বলিলেই হয়? ইহাতে কি শিক্ষা ও অর্থের প্রয়োজন নাই? সে শিক্ষা কোথায় পাওয়া যাইবে, এবং সে অর্থই বা কোথা হইতে আসিবে? কেহ কেহ বলিবেন "সাধিলেই সিদ্ধি" চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। কিন্তু বস্তুতঃ

এরূপ কথার মূল্য অনেক সময় বড় বেশী নয়। কথা বলিলেই হয় না, উপায় দেখান দরকার। একদিকে লোকের যেমন অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি টাকার ক্রয়শক্তি কমিয়া গিয়াছে। টাকার ক্রয়শক্তি যে কি পরিমাণে কমিয়াছে পাঠক একজন বৃদ্ধ লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। বহুদিনের কথা নয়, চাউল টাকায় ১মণ, ঘি ৴২॥০ সের তৈল ৴৮ সের ও দুধ ।৬ সের ছিল। আমার মার কাছে শুনিতে পাই আমার পিতামহ মহাশয় আমাদের দেশে পয়সায় ৪।৫টা হংসের ডিম্ব কিনিয়া আনিতেন, দুই আনার মাছ কিনিলে একটা বৃহৎ সংসারে যথেষ্ট হইত। তরিতরকারী ও ফল ফুলারির কথা আর বলিবার আবশ্যক নাই। মোটের উপর বলিতে গেলে অল্প দিনের ভিতর টাকার ক্রয়শক্তি প্রায় তিন গুণ কমিয়া গিয়াছে। ক্রয়শক্তি যে পরিমাণে কমিয়াছে, সাধারণতঃ লোকের আয় সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। অনেক স্থলে ইহার বিপরীতই ঘটিয়াছে। ইহাতে অল্প আয়বিশিষ্ট লোকের যে কষ্ট হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

ইহার উপর আর এক রোগ আসিয়া জুটিয়াছে তাহা বিলাসিতা। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিলাসিতার ঢেউ চলিতেছে। পূর্ব্বে বিলাসিতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা হইয়াছে। তাহাদের অনেক গুলিই এই স্থানে প্রযুক্ত হইতে পারে। বিলাসিতা যদি অবস্থোন্নতির পরিচায়ক হয় তাহা হইলে ইহাতে বিশেষ দোষ না থাকিতে পারে। বিলাসের বস্তু উপভোগের জন্য আমরা যদি অবস্থোন্নতির চেষ্টা করি তাহা হইলে ইহার বিপক্ষে কিছু বক্তব্য না থাকিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকে যে বিলাস প্রিয় হইয়া দাঁড়াইছেন তাহা সাধারণতঃ অবস্থোন্নতির পরিচায়ক নয়, এবং অবস্থোন্নতির চেষ্টা তাহার কারণ নয়। বাহ্যিক আড়ম্বরের দিকে, পোষাকের পারিপাট্যের দিকে লোক অত্যন্ত ঝুঁকিয়াছে। আমার বাবার কাছে গল্প শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের সময়ে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা পূজার সময় একখানা নূতন কাপড় ও একখানা নূতন চাদর পাইয়া আনন্দে আটখানা হইয়া পাঁচ বাড়ী পূজা দেখিয়া বেড়াইত। তিনি তাঁর সময়ের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ছিলেন। এখন ঐ শ্রেণীর এমন একটী ছেলে কেহ দেখান দেখি যে ঐ ধুতি চাদরের দশ গুণ মূল্যের পোষাক পাইয়া সন্তুষ্ট হয়। ৫।৭ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই আজিকালিকার ছেলেরা

কোটের কাট, কামিজের কফ্‌ ও জুতার চেহারার সমালোচনা করিতে শিখে। আমার একটী প্রতিবাসী আছেন, তিনি কাছারিতে চাকরী করিয়া মাসে ২০৷২৫ টাকা উপায় করেন। পোষ্যের মধ্যে বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, আপাততঃ এক পুত্র ও দুই কন্যা। মফঃস্বলে বাড়ী, কাজেই ৫৲ টাকা বাড়ীভাড়া দিয়া থাকিতে হয়। পুত্রটীর বয়স ৯ বৎসর। কিছুদিন হইল তাহার অত্যন্ত ব্যারাম হয়। আমি তাহাকে ঐ সময়ে মাঝে মাঝে দেখিতে যাইতাম। একদিন গিয়া দেখি ছেলেটী "ইংলিস" কোটের আলোচনা করিতেছে। আমি শুনিয়া অবাক। পাঠক যেন মনে না করেন যে তখন তার বিকারাবস্থা। বিকারাবস্থা হইলেও ঐ ব্যাপার হইতে তাহার সাধারণতঃ আলোচ্য বিষয়ের মোটামোটি কতকটা জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। উপরে যে দৃষ্টান্তটী দিলাম উহা যে বড় বিরল নয়, তাহা বলা বাহুল্য। আমি কেবল মাত্র ৫০৲ টাকা মাহিনা পাই ও আমার অনেকগুলি পোষ্য আছে বলিয়া কি হইল? পূজার পূর্ব্বে গৃহিণী বলিলেন "বৎসরকার একদিন পাঁচ বাড়ীর পাঁচ ছেলে মেয়ে ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া বাহির হইবে; আমার ছেলেরা যে দীন হীন বেশে তাহাদের সঙ্গে মিশিবে কিম্বা তাহাদের পোষাক দেখিয়া মুখ চুণপারা করিয়া থাকিবে, মা হইয়া ইহা আমি কি করিয়া সহ্য করিব?" ইহা বড় কঠিন সমস্যা। গৃহিণী তাঁর ছেলেদের মুখ চুণ পারা করিয়া থাকা দেখিতে পারেন না, এবং আমি তাঁর মুখভার দেখিতে পারি না। ফল সহজেই অনুমেয়। হয়তঃ ১০০০৲ টাকা মাহিনার সবজজের সঙ্গে বা ৮০০ শত টাকা মাহিনার ডেপুটীর সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রাণ আমাকে পাল্লা দিতে হইল। ইহার উপর গৃহিণী নিজে যদি একটু সৌখীন হইলেন তাহা হইলে ত সোনায় সোহাগা। তাঁর সেমিজ চাই, গর্ণেটের জ্যাকেট ও ফ্রেঞ্চ সাড়ী চাই, এবং একশিশি কুন্তলীনও চাই। এক সময় আমাদের সঙ্গে এক বিএ-প্রস্ত যুবক কাজ করিতেন। তাঁর বেতন ছিল মাসিক ৩০৲ টাকা। একদিন শুনিলাম স্ত্রীর জন্ম তিনি ৫৫৲ টাকার বারাণসী সাটী কিনিয়াছেন (অবশ্য ধারে)। আমি বলিলাম, এ রোগ কেন? যুবকটী উত্তর করিলেন, "কি জানেন, আমাদের ওদিকে এ সব না হইলে ইজ্জৎ বজায় রাখা যায় না।" দিনকতক পরে তাঁহাকে সাটীখানি বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছিলাম। ঐরূপ যুবক আজকাল দেশে বিস্তর হইয়া পড়িয়াছে। এক দিকে যেমন বিলাসিতার স্রোত খর-

বেগে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং "ফোতো" বাবুগিও খুব বাড়িয়াছে, অপরদিকে তেমনি ঝুঁটা মালও খুব তৈয়ারি হইতেছে। ঝুঁটা জরি, ঝুঁটা সাটিন, ঝুঁটা বারাণসী, ঝুঁটা কতফিতে দেশ প্লাবিত। যাহার অন্নের সংস্থান নাই, তাহার ঘরেও একটা ঝুটা মখ্‌মলের কোট ও ঝুটা সাটিনের জ্যাকেট এবং একখানা খেলো বোম্বাই সাটী দেখিতে পাইবে। যাঁহাদের ৪০। ৫০ টাকা মাসিক আয়, আজকালকার বাজারে তাঁহাদের সংসার চলা একরূপ ভার হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর তাঁহাদের গৃহিণীরা পরী সাজিবার জন্য ও ছেলে মেয়েগুলিকে সাহেব বিবি সাজাইবার জন্য লালায়িত। ফল এই দাঁড়াইয়াছে—কষ্টের সংসার অশান্তির ও অধিকতর কষ্টের হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞান ও ইচ্ছা থাকিলেও বাবুর অনেক সময় গৃহলক্ষ্মীর অমতে চলিবার যো নাই। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, বাহ্যিক আড়ম্বরের খাতিরে ছেলে গুলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। এই রোগের জন্মস্থান হইতেছে কলিকাতা মহানগরী। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গালার মফঃস্বলের সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই জানেন যে,অন্যান্য সংক্রামক রোগের ন্যায় বাবুয়ানা রোগও সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়িতেছে। রোগটা অবশ্য প্রাচীন। "বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তন" বাক্য তাহার প্রমাণ। কথাটা বোধ হয় নূতন তৈয়ারি নয়। কিন্তু আজকাল রোগটা প্রবল ও বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "ফোতো" বাবুগির বিপক্ষে দুই এক কথা বলিতেছি বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিরোধী। বাবুয়ানা ও পরিচ্ছন্নতা যে এক বস্তু নয় তাহা বুঝাইবার প্রয়াস পাওয়া অনাবশ্যক।—

বড় মানুষদের অপরিমিত ব্যয়ের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মধ্যবিত্ত লোকদের সম্বন্ধেও খাটে। তাঁহাদের দেখাদেখি ইহারাও পুত্রের বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে অসম্ভব ব্যয় করিয়া বসেন। বড়মানুষ বলিয়া গণ্য হইবার ইচ্ছা ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত বলবতী। এবং এমন লোকও দেখা গিয়াছে যিনি পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ধার করিয়া ইংরাজী বাজনা ও চার ঘোড়ার গাড়ীর খরচ যোগাইয়াছেন। পানদোষ ইহাদের মধ্যেও বিলক্ষণ প্রবেশ করিয়াছে, অবস্থার অবনতির আর এক কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থান বড় অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। জলপথ রোধ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ও পুষ্টিকর আহারের অভাব প্রভৃতি নানা কারণ

ঐ অস্বাস্থ্যকরতার হেতু। যে কারণেই হউক না কেন অনেক জেলার জল বায়ু যে খুব খারাপ হইয়াছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নয়। অনেক পরিবারের মধ্যে ব্যারাম প্রায় বার মাসই লাগিয়া আছে। বর্ষার পরে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক গ্রামের অধিকাংশ লোক পীড়িত। এমন বাড়ী দেখিয়াছি, যাহাতে রোগীর শুশ্রূষা হওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে একটু জল দিবার লোক থাকে না। কে কাহাকে দেখে? যে যে স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ, সে সকল স্থানের স্ত্রী পুরুষে ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে। ছেলে পিলের দশা দেখিলে চক্ষে জল আসে। তাহারা অনেকে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই রুগ্ন। অনেকে শীঘ্র শীঘ্র মারা যায়। আর যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারা অতি কষ্টের সহিত জীবনরূপ বোঝাটা কোন প্রকারে বহিয়া বেড়ায় মাত্র। দেশের এরূপ অবস্থা হওয়ায় আমাদের যে কত দূর দুর্গতি ও দুর্দ্দশা হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বৎসর সালিয়ানা যে কত জীবন অকালে নষ্ট হইতেছে, ও কত টাকার ঔষধ ভক্ষিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? আজকাল পেটেণ্ট ঔষধ ওয়ালা ও নানাবিধ ডাক্তারদের "পোহাবার"। কেহ হয়ত খতাইয়া দেখেন নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় অনেক গৃহস্থের আজকাল ভাত খরচের নীচেই ঔষধ খরচ। পূর্ব্বে লোক বলিত "ভাতকাপড়"। শীঘ্রই লোকে বলিবে "ভাত ঔষধ"। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে লোকে ধনে প্রাণে মারা যাইতেছে। দেশের অস্বাস্থ্যকরতা যে আমাদের দুর্দ্দশার এক অন্যতম কারণ তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। আর একটী কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের এ অংশের উপসংহার করা যাইবে। অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ষষ্ঠীর অনুগ্রহ কিছু বেশী। অধিকাংশ দম্পতীর দেখিতে পাওয়া যায় ছেলে পিলের সংখ্যা ৫।৭টির কম নয়। ২০।২৫ টাকা আয়বিশিষ্ট লোকের পক্ষে এতগুলি সন্তান মানুষ করা—বিশেষতঃ আজি কালিকার দিনে কি দুরূহ ব্যাপার! সন্তান মানুষ করিবার দায়িত্ব বড় গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। শুধু খাওয়ান পরানই কত কঠিন! পিতামাতাই সন্তানকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন। অনেক সময় বেচারী ভাল খাইতে পাইল না। হয় ত সেইজন্য তাহার অকালে মৃত্যু ঘটিল। যদি বা বাঁচিয়া রহিল চিরকালই তাহার জীবন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। কখনও তাহার পূর্ণ বিকাশ হইল না। সন্তানকে রীতিমত খাওয়াইতে পরাইতে না

পারিলে পিতামাতার কি গভীর পরিতাপের বিষয় হয়, তাহার সম্বন্ধে বেশী বলার দরকার নাই। কিন্তু সুধু গ্রাসাচ্ছাদনও সামান্য ব্যাপার। সন্তানের চরিত্রের জন্য, তাহার শিক্ষার জন্য, অনেক পরিমাণে তাহার ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের জন্য, পিতামাতাই প্রধানতঃ দায়ী। চরিত্র এবং শিক্ষাই জীবন পথের প্রধান সম্বল। যাহার এই দুইটা নাই, তাহার মনুষ্য জন্ম বিফল, এবং সে সমাজের কণ্টক স্বরূপ। সে নিজের কোন উপকারে আসিল না, সমাজের ত নয়ই। তাহার ভরণপোষণের জন্য সমাজের যে ব্যয় হয়, তাহা সম্পূর্ণ লোকসান, কারণ তাহার পরিবর্ত্তে সমাজ কিছুই পায় না। পাওয়া দূরে থাকুক, তাহা দ্বারা সমাজের অপকারই সাধিত হয়। যে চরিত্র এবং যে শিক্ষার মূল্য এত অধিক, সন্তানের সেই চরিত্র এবং শিক্ষা প্রধানতঃ পিতামাতার চরিত্র ও শিক্ষা সাপেক্ষ। পিতামাতা চরিত্রবান ও শিক্ষিত হইলেই যে হইল তাহা নহে। অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তানের চরিত্র গঠন ও তাহার শিক্ষা প্রদান করিতে হয়; ইহাতে অনেক "কাঠ খড়ের" আবশ্যক। এখানে শিক্ষার অর্থ কেতাবি শিক্ষা নয়; যে শিক্ষার বলে মানুষ নিজের জীবনধারণোপায় অর্জ্জন করে এবং সমাজের উপকারে আসে সেই শিক্ষা। সন্তানের ভাবী সুখ দুঃখ তাহার চরিত্র ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। যদি সে দয়া, ধৈর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম প্রভৃতি শিক্ষা করে এবং কার্য্যকরী শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সে এবং তাহার পরিবারবর্গ পায়ের উপর পা দিয়া খাইতে না পাইতে পারে, কিন্তু কখনও তাহাদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ও যথার্থ সুখের অভাব হইবেক না।

কিন্তু যদি পিতামাতা সন্তানকে ভাল করিয়া লালন পালন না করিলেন এবং তাহাকে সৎশিক্ষা না দিলেন তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানের প্রতি এবং সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য হানি হইল না কি? কিন্তু এ কথা কয়জন ভাবিয়া দেখেন? যাহাকে পিতা মাতা পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন, জন্মাইবার পক্ষে যাহার কোন হাত ছিল না, জগতে যদি দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য বলিয়া কোন বস্তু থাকে, তাহা হইলে সেই সন্তানের সম্বন্ধে দায়িত্ব এবং তাহার প্রতি কর্ত্তব্যের অপেক্ষা গুরুতর দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য আর হইতে পারে না। সমাজের নিকট আমরা সকল বিষয়ে ঋণী। মানুষের মনুষ্যত্ব সমাজ হইতে। সেই সমাজের উপর নিজেদের জীর্ণ শীর্ণ অথবা দুশ্চরিত্র বিশিষ্ট এবং কুশিক্ষিত সন্তান নিক্ষেপ করিতে কাহারও অধিকার নাই।

এখন মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। আমাদের দেশের বিস্তর মধ্যবিত্ত লোকের অনেকগুলি সন্তান সন্ততি দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেরই আয় অল্প বলিয়া ইহাতে যে খুব কষ্ট হয় তাহা বলা বাহুল্য। অনেক ভদ্র পরিবারে দেখিয়াছি গৃহস্বামীর চাকরী নাই বা অন্য কোন উপায় নাই বলিলেই হয়। ছেলে বয়সে পিতামাতা বিবাহ দিয়াছিলেন। আয় না থাকিলে কি হয়, স্বভাবধর্ম্মে বৎসর দুই বৎসরে সন্তান সংখ্যা একটী করিয়া বাড়িতেছে। সংসারে কষ্টের পরিসীমা নাই। ছেলেগুলি দুইবেলা আহার পাইতেছে না। নির্ভর অনেক সময় আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশীদের দয়ার উপর। সংসার ইহাতে কিরূপে প্রতিপালন হইতে পারে, সহজেই বুঝা যায়। পরিবারের মধ্যে দুই একজন হয়ত না খাইতে পাইয়া মারাই গেল। ছেলেপিলেদের মধ্যে গুটিকতক হয়ত ম্যালেরিয়া জ্বর কিম্বা অন্য কোন ব্যারাম ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যে কয়টী রহিল তাহাদের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া থাকিল। কাহারও শরীরের বা মনের বিকাশ হইতে পাইল না। পুত্রগুলি গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকিল। সকলের অবশ্য বিবাহ হইয়া গেল। কন্যাগুলিকে, বিবাহাবস্থা উপস্থিত হইলে, হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিতে হইল। ভদ্র ঘরে আজ কাল কন্যাদায় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দায়। গরীব লোকের পক্ষে মেয়ে জলে ফেলা ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। এ রোগের কি কোন ঔষধ আছে? ইউরোপে অনেক বুদ্ধিমান লোকে অবস্থোন্নতি করিতে না পারিলে বিবাহ করেন না। নিজের অপেক্ষা নিজের সন্তান সন্ততির সামাজিক অবস্থা নিকৃষ্ট হইবে, ইহা তাঁহারা কিছুতেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের দেশে ওরূপ হওয়া অসম্ভব। কন্যা অবিবাহিত রাখা যাঁহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাঁহাদের দেশে কখনই অবিবাহিত পুরুষ থাকিতে পারে না। লোক অবিবাহিত থাকিলে তাহাদের চরিত্র দূষিত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কতক লোকের চরিত্র দূষিত হওয়া ভাল, কিম্বা দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া ভাল, এ জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার আমাদের দরকার নাই। অবিবাহিতাবস্থা যতটুকু চরিত্রদোষের কারণ, ততটুকু চরিত্র-দোষ আমাদের দেশে না হইবারই সম্ভাবনা। তবে কি আমাদের দেশে অত্যধিক বংশবৃদ্ধি বন্ধ করিবার কোন উপায় হইতে পারে না? আমার মতে ইহার একটি মাত্র উপায় আছে। সেটি কি? যদি প্রত্যেক বুদ্ধিমান দম্পতি এরূপ ভাবে

চলেন যে তাঁহাদের বেশী ছেলেপিলে না হইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহারা অত্যধিক বংশবৃদ্ধি হইতে উদ্ভূত নানা প্রকার যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইতে পারেন ; তাহা হইলে তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে দারিদ্র্যের হাত হইতে এড়াইতে পারেন। যাহাতে বেশী সন্তান না হইতে পারে স্ত্রী পুরুষের পক্ষে এরূপ ভাবে চলা যে অসম্ভব তাহা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ইউরোপে কোন কোন দেশ আছে, যেখানে অনেক মধ্যবিত্ত দম্পতি এরূপ ভাবে চলিয়া থাকেন। যদি মনের বল থাকে, যদি দায়িত্ব-জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে অন্যে যাহা করিতে সক্ষম অপরে তাহা না পারিবে কেন? আমি যেরূপ ভাবে চলিতে পরামর্শ দিতেছি, অনেকে তাহা অস্বাভাবিক মনে করিতে পারেন। কিন্তু স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার কথা তুলিলে বিষয়টা অনেকদূর গড়াইয়া পড়ে। তাহা হইলে বলিব, সমস্ত সভ্যতাই অস্বাভাবিকতা। তুমি যে রাঁধিয়া খাও তাহা কি অস্বাভাবিক নয়? তুমি যে কাপড় পরিয়া বেড়াও তাহা কি অস্বাভাবিক নয়? সভ্যতার মানেই সর্ব্ব প্রকার স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করা। অতএব অনিয়ন্ত্রিত সন্তানোৎপত্তি বন্ধ করা যদি অস্বাভাবিক হয় তাহা "বোঝার উপর শাক আটাটা" মাত্র। কেহ কেহ বলিতে পারেন আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিয়া চলিলে অধর্ম্ম হইবেক। ধর্ম্মের দোহাই বড় কঠিন দোহাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বহু সন্তানোৎপত্তি বন্ধ করিবার চেষ্টা যদি অধর্ম্ম হইল, সন্তানদিগকে লালন পালন করিতে না পারিলে কি কোন অধর্ম্ম নাই? যদি কেহ বলেন সন্তানোৎপাদন মানুষের এক স্বাভাবিক ধর্ম্ম,—আমার কাজ আমি সংসাধন করি, সন্তানের সুখ দুঃখের কথা আমার ভাবিবার দরকার নাই, "জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি ;" তাহা হইলে আমার এইমাত্র বক্তব্য আছে যে, এরূপ লোকের সঙ্গে তর্ক করা আমার সাধ্যাতীত। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন এ সকল বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনা সুরুচিবিরুদ্ধ। তাঁহাদের প্রতি আমার এইমাত্র বক্তব্য আছে যে, তাঁহাদের সুরুচি ও আমার সুরুচি এক বস্তু নয়। সমাজের উপকারার্থ অনেক বিষয়ের আলোচনা দরকার, এবং সে স্থলে রুচির প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। যে সব বিষয়ের সহিত সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সুখ দুঃখ বিশেষ ভাবে জড়িত, তাহাদের প্রকাশ্য আলোচনা না হইলে সমাজের অমঙ্গল হইবেক। অপরিমিত লোক বৃদ্ধি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সমাজের দারিদ্র্যের এক প্রধান কারণ। যেরূপ

সময় পড়িয়াছে, অধিক সন্তানোৎপত্তি স্ত্রী পুরুষের এক প্রধান অধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজেদের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য সকল সুবুদ্ধি স্ত্রী পুরুষের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে তাঁহাদের বেশী সন্তান না হয়। লোক সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে, জীবন-সংগ্রাম ততই কঠিন হইয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে—কিন্তু "পুঁথি বাড়িবার" ভয়ে তাহাদের আর উল্লেখ করা গেল না। (ক্রমশঃ)

পলাশ বন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সত্যকে একবারও পশ্চিম বঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলাম না। পূজাবকাশ ও সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশগুলি আমাকে একাকীই সেখানে কাটাইতে হইত। কিন্তু সত্য ব্যতীত আমার আর কিছুই ভাল লাগিত না। সত্যকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছিলাম বলিয়াই আমার হৃদয়ে এই অশান্তি ও অপূর্ণতার উৎপত্তি হয়। সত্যের একখানি চিঠির জন্য সমস্ত দিন উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে চিঠি না পাইলে, অস্থির হইতাম। মনের প্রসন্নতা কোথায় চলিয়া যাইত ; আহারে, শয়নে, ভ্রমণে, পাঠে, আলাপে কিছুতেই সুখ ও পরিতৃপ্তি পাইতাম না। মানুষের সহবাস আমি বিষবৎ পরিহার করিতাম। এইরূপ সময়ে আমি নির্জ্জনতাই অধিকতর ভাল বাসিতাম। প্রভাতে বনের ধারে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম ; সন্ধ্যার প্রাক্কালে, পর্ব্বতের নিম্নদেশে একটী বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতাম। সত্যেন্দ্রর অভাবে মনে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইত। একখানি চিঠি পাইলেই, এই যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হইতে পারিত, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেই অভিলষিত চিঠিখানিও যথা সময়ে আসিত না। সত্যেন্দ্রর উপর এক একবার রাগ ও অভিমান করিতাম ; কিন্তু আবার ভাবিতাম "সত্যেন্দ্রর যদি অসুখ হইয়া থাকে !" এই ভাবনা উপস্থিত হইলেই রাগ অভিমান কোথায় পলাইয়া যাইত। আমি তাড়াতাড়ি সত্যেন্দ্রকে চিঠি লিখিতে বসিতাম ; চিঠিতে রাগ অভিমানের ছায়া

মাত্র থাকিত না; সত্যেন্দ্র কেমন আছে, তাহাই জানিবার জন্ম কেবল ব্যাকুলতামাত্র প্রকাশিত করিতাম।

এইরূপ সত্যের একখানি চিঠির অভাবে আমি কখন বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইতাম; আবার অন্য সময়ে তাহার কায়িক ও মানসিক কুশল সংবাদ সম্বলিত একখানি পত্র পাইলেই যার পর নাই হৃষ্ট হইতাম। কিন্তু হর্ষের পর বিষাদ ও বিষাদের পর হর্ষের এই পর্য্যায় দেখিয়া সুখ জিনিষটার উপর ক্রমশঃ আমার শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতে লাগিল। সুখ জিনিষটা আমার নিকট একটা অস্থির, চঞ্চল, ও অস্থায়ী পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল; দেখিলাম, ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কিন্তু প্রাণ সুখেরই জন্ম লালায়িত। "কোথায় সুখ," "কোথায় সুখ" প্রাণের ভিতর হইতে নিয়ত কেবল এই এক ধ্বনিই উত্থিত হইতেছে। সংসারে যে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে আমি সন্দিহান্ হইতে লাগিলাম। আমি পিতামাতাকে কত শ্রদ্ধা ভক্তি করি, ভাল বাসি; আমার উপর তাঁহাদের কত স্নেহ ও দয়া। কিন্তু হায়! ভাবিতেও প্রাণ সিহরিয়া উঠে, হয়ত এই স্বর্গীয় স্নেহ সুখ হইতে হতভাগ্য আমাকে একদিন বঞ্চিত হইতে হইবে। সত্যকে কত ভাল বাসি; সত্যকে ভাল বাসিয়া কত সুখ! কিন্তু হায়, দেখিলাম, এ সুখসাগরেও বিলক্ষণ জোয়ার ভাটা আছে। বিবাহের চিন্তাকে মনের মধ্যে বড় একটা স্থান দান করিতাম না; কিন্তু দাম্পত্য সম্বন্ধটা যে আমাদের পবিত্র বন্ধুত্বেরই ন্যায় একটা জিনিষ হইবে, তাহা অনুমান করিয়া লইতাম। সুতরাং সে সুখের উপরেও নির্ভর করিতে ইচ্ছা হইত না। পিতামাতাকে ও বন্ধুকে হারাইবার যেরূপ ভয়, স্ত্রীকে পুত্রকন্যাদিগকেও তো হারাইবার সেইরূপ ভয় আছে। তবে বিবাহ করিয়াই বা সুখ কি? অস্থির, ক্ষণিক সুখের প্রতি আমার কেমন এক প্রকার বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল।

সত্য ও আমি এই সময়ে এম্-এ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। আমাদের উভয়েরই বয়ঃক্রম এই সময়ে প্রায় একবিংশ বৎসর হইয়াছিল, আমরা উভয়েই বিশিষ্ট সম্মান ও যোগ্যতার সহিত পরীক্ষায় সফলযত্ন হইয়াছিলাম। যতদিন পাঠে নিবিষ্ট ছিলাম, ততদিন সংসারকে বড়ই সুন্দর ও সুখময় স্থান মনে করিতাম। এ হেন সংসারে প্রবেশ করিবার কাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি অনেকবার আনন্দে

উৎফুল্ল হইতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মোহাঞ্জন খসিবার উপক্রম হইতেছিল; সংসারের প্রকৃত ছবি অল্পে অল্পে আমার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। যাহা দেখিতেছিলাম, তাহাতে সংসার-প্রবেশের ইচ্ছা হওয়া দূরে থাকুক, দ্বার হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। সংসারে যদি প্রকৃত সুখ পাওয়া না যায়, সংসারে প্রবেশ করিয়া লাভ কি? যদি সংসারে প্রাণের পূর্ণতৃপ্তি না হয়, তবে সংসারে প্রয়োজন কি?

এই গভীর প্রশ্নে আমার মনঃপ্রাণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। লোকের সহবাসে থাকিয়া এই প্রশ্নের সন্তোষকর মীমাংসার সম্ভাবনা দেখিতাম না; তাই নির্জ্জনে অবস্থান করিতাম। মুখমণ্ডল বোধ হয় চিন্তাভারাক্রান্ত দেখাইত। নতুবা যে দেখিত, সেই আমাকে আমার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত কেন? পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছি, ইহাতে আমার আনন্দই হইবার কথা; আনন্দিত না হইয়া আমি সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত ও বিষণ্ণ থাকি কেন? কেহই আমার এই অপূর্ব্ব ভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিত না। কিন্তু প্রতিবাসিনী বর্ষীয়সীরা অনেক আন্দোলন আলোচনার পর এ সম্বন্ধে একটা সুচারু-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে আমার পিতাঠাকুর মহাশয় ও জননী দেবী তাঁহাদের যথেষ্ট নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা অনতিবিলম্বে আমার জন্য একটী সুযোগ্যা পাত্রীর অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন!

জননীদেবী অতিশয় সরলহৃদয়া। তিনি আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া নিয়তই আমার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি পেট ভরিয়া খাই না কেন, উদাসীনের মত নির্জ্জনে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াই কেন, বয়স্য-গণের সহিত মিলিত হইয়া নির্দ্দোষ আলাপ বা আমোদে প্রবৃত্ত হই না কেন, দেবতা ও উপদেবতাদের বিহারস্থল পাহাড়পর্ব্বতে একাকী আরোহণ করি কেন, বনের ধারেই বা বেড়াইতে এত আগ্রহপ্রকাশ করি কেন,— এইরূপ তিরস্কার মিশ্রিত নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া তিনি আমার বিষাদের কারণ অবগত হইতে চেষ্টা করিতেন। আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিব, ঠিক্ করিতে পারিতাম না। অনেক দিন সতুর চিঠি পাই নাই, পাহাড়ে উঠিতে আমার বড় আনন্দ হয়, বয়স্যগণের সহিত আলাপ করিতে

আমার প্রবৃত্তি হয় না,—সময়ে সময়ে আমি তাঁহাকে এইরূপ উত্তর দিতাম। কিন্তু তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম, আমার উত্তরগুলি তাঁহার নিকট যেন সন্তোষজনক বোধ হইত না। আমি যে বিবাহ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছি, অবশ্য সে সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হন নাই। বিবাহের নাম শুনিলে আমি যে অত্যন্ত বিরক্ত হই, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। এই কারণে আমার সাক্ষাতে বিবাহের কথা কখনও তুলিতেন না। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার এইরূপ একটা ধারণা হইয়াছিল যে, অতঃপর আমার বিবাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। তাঁহার ভয় হইয়াছিল, আমাকে সংসার-বন্ধনে বাঁধিতে না পারিলে হয়তঃ আমি উদাসীন হইয়া যাইব। বলা বাহুল্য প্রতিবাসিনী বর্ষীয়সীরা এই ধারণাটিকে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে বিলক্ষণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমার বিবাহের প্রস্তাবের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত ও জীবনোপায় স্থিরীকৃত না করিয়া বিবাহ করিতে কখনই সম্মত হইব না, ইহা পিতৃদেব, জননী ও বন্ধুবান্ধব সকলেই জানিতেন। পিতাঠাকুর মহাশয় এই কারণেই এতদিন আমার বিবাহের নিমিত্ত তাদৃশ উদ্যোগী ছিলেন না। এক্ষণে আমার বিবাহের চিন্তায় অপর দশজনের নিদ্রাসুখের ব্যাঘাত ও শিরোবেদনা উপস্থিত হইলে, তিনি বাধ্য হইয়া লোকলজ্জার খাতিরে আমার জন্ত একটী সুযোগ্যা পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বয়স্যগণের নিকট আমি এই সংবাদ শ্রবণ করিলাম। শুনিয়া আমার হৃদয়ে দুঃখ, অভিমান, বিরক্তি ও হাস্যরসের বিচিত্র সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব লীলা আরম্ভ হইল। কিন্তু হায়, আমার হৃদয়ের গভীর অশান্তির কারণ কেহই অবগত হইল না। কাহাকেও তাহা বলিলামও না। যাহাকে তাহাকে তাহা বলিয়াই বা কি ফল হইবে? কেই বা তাহা বুঝিবে? বুঝিলেই বা কে আমার সংশয়-জাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে? একমাত্র অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ আমার অশান্তির কারণ জানিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বুঝিলাম, সেই মহাপুরুষ ভিন্ন এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে আর কাহারও সামর্থ্য নাই। তাঁহারই উপরে ধীরে ধীরে নির্ভর করিতে লাগিলাম।

আমার বিষাদের এই প্রগাঢ় ছায়া সত্যের প্রসন্ন হৃদয়কেও আচ্ছন্ন

করিয়াছিল। সত্য স্বভাবতঃই আমাকে গম্ভীর বলিয়া জানিত; কিন্তু গম্ভীর হইলেও আমার যে আত্মপ্রসাদের কিছুমাত্র অভাব ছিল না, তাহা সে বিলক্ষণ জানিত। এইবার পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আমি হৃদয়ে যে গুরুতর প্রশ্নের আন্দোলন অনুভব করিলাম,তাহার দুই একটী তরঙ্গ তাহার হৃদয়কেও অভিঘাত করিয়াছিল। সত্য আমাকে বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই পত্রে সকল কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছিল। আমার হৃদয় প্রেম ও সৌন্দর্য্যের জন্য যে কিরূপ লালায়িত, তাহা তাহাকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে ইহাও জানাইয়াছিলাম যে, এই প্রেম ও সৌন্দর্যতৃষা জগতের কোন পদার্থেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না, হইবারও নহে। জগতের প্রেমে বিচ্ছেদ আছে, জগতের সৌন্দর্য্যে অপূর্ণতা আছে। প্রাণ তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতেছে না। তাই হৃদয়ের আবেগে তাহাকে লিখিয়াছিলাম "আমি এই জগতের কোনও পরিমিত রূপে বা সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইতে চাই না; তাহাতে ডুবিয়া আত্মহারা হইতে চাই না। আমি চাই ডুবিতে এক অনন্ত সৌন্দর্য্যের সাগরে আমি চাই তন্মধ্যে আত্মহারা হইতে, তন্মধ্যে মিলিয়া যাইতে। সেই রূপসাগরে, সেই সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকরে না ডুবিতে পারিলে কি আমার তৃপ্তি জন্মিবে? জীবনে শান্তি পাইব? যেখানে সমস্ত সৌন্দর্য্য মিলিয়া গিয়াছে, যেখানে সমস্ত পবিত্রতা একত্রীভূত হইয়াছে, হায়, কবে আমি সেই স্থানে যাইব, কবে আমি তাহা দেখিয়া চরিতার্থ হইব? আহা, কি শান্তির নিলয় তাহা! কি অনন্ত প্রেমের ভাণ্ডার তাহা! সে প্রেমে বিচ্ছেদ নাই, সে আনন্দে শঙ্কা নাই, সে সম্ভোগে বিলাস নাই। জগদীশ, কবে আমায় সেই স্থানে লইয়া যাইবে?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পশ্চিমবঙ্গ আর ভাল লাগিল না। আমার বিষাদরোগের প্রতীকার করিতে সকলেই উদ্‌ভ্রান্ত; কিন্তু অবিচক্ষণ বৈদ্যের ন্যায় কেহই আমার রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না। চারিদিকেই বিবাহের কথা শুনিতে শুনিতে প্রাণে বিরক্তি জন্মিল। নির্জ্জন আরণ্য প্রদেশ, পর্ব্বত শৃঙ্গ, উপত্যকা, কোন স্থানেই আর সুখ পাইলাম না। গ্রীষ্মাবকাশের পর

কলেজ খুলিবার সময় উপস্থিত হইল। ব্যবহার শাস্ত্র পাঠ করিতে আমার কলিকাতায় যাইতে হইবে; সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। কলিকাতার জনাকীর্ণ পথে ভ্রমণ করিয়া বরং শান্তি ও নির্জ্জনতা অনুভব করিতে লাগিলাম। সত্য আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল; সুতরাং সে আমার মনে শান্তি আনয়নের জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। আমি সত্যের সহবাসে অনেকটা আশ্বস্ত হইতাম বটে; কিন্তু প্রাণের ভিতর অশান্তির ছায়া লুকায়িত থাকিত।

সত্য এম্ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইল। আমি আইন পড়িতে লাগিলাম। কেন আইন পড়িতেছি, আইন পড়িয়া কি করিব, তাহা ভাবিলাম না। আইন পড়িতে হয়, তাই পড়িতে লাগিলাম। প্রত্যহ কলেজে যাইতাম, কিন্তু সেখানে কি বিষয় পঠিত হইতেছে, তাহার একটা সংবাদ রাখিতাম না। অধ্যাপক আসিয়া যখন অধ্যাপনা আরম্ভ করিতেন, তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। আইনের নীরস ব্যাখ্যাগুলি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না। মন তখন কলেজ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিত; আমিও তাহার অনুসরণ করিতে করিতে মুহূর্ত্তমধ্যে নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া আসিতাম। অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, সহপাঠীরা কি জিজ্ঞাসা করিতেছে, কোনদিকেই আমার লক্ষ্য থাকিত না। অধ্যাপক মহাশয় কখন কখন পাঠ্য বিষয়ের বহির্ভূত কোনও অদ্ভুত প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিতেন; সহপাঠীরা প্রায় সকলেই তাহাতে যোগদান করিত। তাহাদের উচ্চ হাস্যধ্বনিতে কখন কখন আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত; আমি চকিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিতাম এবং হাস্যের কারণ বুঝিতে না পারিয়া, অপ্রতিভের ন্যায়, মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া থাকিতাম। বলা বাহুল্য, এইরূপ বিসদৃশ ব্যাপার হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি সচরাচর পশ্চাদ্ভাগে উপবেশন করিতাম। সহপাঠিবর্গের মধ্যে কেহই একটী দিনও আমাকে স্বস্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা করে নাই, ইহা তাহাদের সবিশেষ উদারতারই পরিচয় সন্দেহ নাই।

দিনের মধ্যে কেবল এক ঘণ্টার জন্য আমাকে কলেজে যাইতে হইত। সেই ঘণ্টাটি অতিবাহিত করিয়া আমি প্রায় সমস্ত দিনই বাসায় থাকিতাম।

সত্যেন্দ্র বৈকালে কলেজ হইতে প্রত্যাগত হইলে কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহার সহিত মিলিত হইতাম। অন্যান্য সময়ে বাসায় বসিয়া কেবল অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতাম। আমার পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে অবশ্য ব্যবহারশাস্ত্র ছিল না। তবে আমি কি কি বিষয় পাঠ করিতাম? সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে দুইটী ব্যক্তির রচনা আমার প্রাণস্পর্শ করিত। ইংরাজীতে কবিবর ওয়ার্ডস্বয়ার্থ এবং সংস্কৃত সাহিত্যে কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি। উভয়েরই মর্ম্মস্পর্শিনী রচনায় আমার ভাবসাগর উথলিয়া উঠিত। উভয়েরই নির্ম্মল পবিত্রজীবন, উভয়েরই ধর্ম্মভাব, উভয়েরই পূর্ণ আদর্শের জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং উভয়েরই বালসুলভ সরলতা আমার হৃদয় মন মুগ্ধ করিয়াছিল। আমি বাল্মীকির সহিত ওয়ার্ডস্বয়ার্থের তুলনা করিতেছি না; বাল্মীকির সহিত ওয়ার্ডস্বয়ার্থ কেন, জগতের কোন কবিরই তুলনা হয় না। কিন্তু তুলনা না হইলেও, বাল্মীকি ও ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতা পাঠ করিয়া আমি উভয়কে একই লক্ষ্যস্থলের যাত্রী স্থির করিয়াছিলাম। উভয়েরই লক্ষ্য পূর্ণ আদর্শ, পূর্ণ সৌন্দর্য্য, পূর্ণ পবিত্রতা। তাই উভয়েরই একমাত্র সাধ্য ও আরাধ্য বস্তু—সেই সত্য, সুন্দর, এক ও অদ্বিতীয় মহাপুরুষ; তাই উভয়েরই নিকটে আদর্শ কবি—সেই এক ও অদ্বিতীয় মহাকবি যাঁহার অপূর্ব্ব রচনা এই অপূর্ব্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,—সামান্য বৃক্ষপত্রে, তৃণদলে, বালুকাকণায় যাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বসুধা সহস্রধারায় উছলিয়া উঠিতেছে,—যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণিকামাত্র ধারণ করিতে গিয়া হৃদয় মন অভিভূত হইতেছে। তাই উভয়েই সেই মহাকবির অপূর্ব্ব রচনা পাঠ করিতে করিতে জীবনকে অতিবাহিত ও ধন্য করিয়াছেন, তাই উভয়েই নির্জ্জন অরণ্যে ও পর্ব্বতময় প্রদেশে শান্তিময় জীবন যাপন করিয়াছেন এবং দিব্য আনন্দের অধিকারী হইয়া সার্থকজন্মা হইয়াছেন। বাল্মীকি তো মহর্ষিই ছিলেন; ওয়ার্ডস্বয়ার্থও ঋষিজনোচিত জীবন যাপন করিয়া এই পাপ যুগে কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছেন। আমি উভয়েরই উপাসক হইলাম; উভয়েরই কাব্য পাঠ করিয়া হৃদয়ে পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার সংশয়জাল ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। এক দিব্য জ্যোতিঃতে হৃদয় মন পূর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, আমি এই মানবজীবন বৃথাকার্য্যে অতিবাহিত হইতে দিব না, যে কার্য্যে আত্মা আনন্দ ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে না, সে কার্য্য প্রাণান্তেও করিব না। সংসারের ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য কোন-

কালেই আমার নিকট শ্রেষ্ঠ সামগ্রী হইবে না। সেই মহাজ্যোতিঃই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইবে। আত্মার আনন্দের জন্ম সকলই পরিত্যাগ করিব। সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার একমাত্র আধার সেই মহান্ পরমেশ্বরের ধ্যান, চিন্তা ও সেবাতেই জীবনকে উৎসর্গ করিয়া দিব। আমার জীবনের লক্ষ্য এইরূপে স্থিরীকৃত হইলে, আমি কিয়ৎপরিমাণে শান্তি সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেকে আত্মা যে পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাঁহার কৃপা লাভ করাই যে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। হৃদয়ঙ্গম হইল বটে, কিন্তু সংসারের কোলাহলে আমি মধ্যে মধ্যে লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িতে লাগিলাম। লক্ষ্যহীন হইলেই, সাংসারিকতা ধীরে ধীরে আমার মনটিকে অধিকার করিয়া বসিত। কিন্তু সংসারের আমোদপ্রমোদে আত্মা তৃপ্তি লাভ করিত না; সুতরাং আমিও প্রকৃত সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইতাম। এরূপ অবস্থায় আহারে, শয়নে, পাঠে, আলাপনে কিছুতেই সুখ পাইতাম না এবং সহস্র চেষ্টাতেও মনকে নির্ম্মল ও সাংসারিকতাকে দূরীভূত করিতে পারিতাম না। মোহ যেন আমাকে জড়াইয়া থাকিত। কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হইলে কোন বস্তুই যেরূপ সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না, মোহাচ্ছন্ন হইয়াও আমি তদ্রূপ কোন বস্তুরই স্বরূপ দেখিতে পাইতাম না। মনে তখন বড় যন্ত্রণা হইত। যন্ত্রণা সময়ে সময়ে অসহ্যও হইয়া পড়িত। তখন নির্জ্জনে বসিয়া কিম্বা উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতাম এবং কাতর হৃদয়ে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। কিয়ৎক্ষণ পরে হৃদয়ের দুঃখভার যেন লঘু হইত, কুয়াসা যেন কাটিয়া যাইত, এবং প্রাণ যেন শান্তিরসে সিক্ত হইত। মেঘ-বৃষ্টি-ঝটিকা-বজ্রময় দুর্দ্দিনের শেষে নির্ম্মল গগনে উজ্জ্বল প্রভাকরের প্রকাশে ধরণী যেরূপ হাস্যময়ী হয়, প্রার্থনার পর আমার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হৃদয়-রাজ্যেরও সেইরূপ অবস্থা হইত। হৃদয়ের এই শান্ত, স্নিগ্ধ ও পবিত্র ভাবটির সংরক্ষার জন্ম আমি নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতাম। কিন্তু কালক্রমে দেখিতে পাইলাম, প্রার্থনা বা ঈশ্বর চিন্তাই ইহার একমাত্র উপায়। তদবধি প্রার্থনার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলাম। যখনই হৃদয়ে অন্ধকার বা কুয়াসা

আসিবার উপক্রম হইত, তখনই পরমেশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিতে বসিতাম। পরমেশ্বরের কৃপাতে অন্ধকার কোথায় পলায়ন করিত। প্রার্থনাই যে আত্মার একমাত্র জীবনীশক্তি, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

ইহার পর আমার মনের অবস্থাও কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইল। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা তেমনই প্রবল রহিল বটে, কিন্তু মন প্রসন্ন ও পবিত্র না থাকিলে কিছুই ভাল লাগিত না। শুধু স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কেন, এরূপ অবস্থায় বাল্মীকির রামায়ণ বা ওয়ার্ডস্বয়ার্থের মধুময়ী কবিতারও কিছুমাত্র মাধুর্য্য থাকিত না। ভগবদুপাসনা দ্বারা মন পবিত্র ও হৃদয় নির্ম্মল না হইলে তাহাতে দিব্য সৌন্দর্য্য কিছুতেই প্রতিভাত হইত না। পূর্ব্বে সৌন্দর্য্য দেখিলেই তাহাতে মুগ্ধ হইতাম, কিন্তু এখন আর সে প্রকার অবস্থা রহিল না। এখন যে কোন অবস্থায় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত করা আমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। আমি আবিলহৃদয়ে যখনই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি তখনই আমার প্রাণের মধ্যে একটা প্রলয় ও হাহাকার উঠিয়াছে। তখনই আমি কাহার জলদগম্ভীর রবে যেন স্তম্ভিত হইয়াছি। সেই রব শুনিলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, শরীর শিহরিয়া উঠিত, গণ্ডস্থল বহিয়া ঝর্ ঝর্ অশ্রু পড়িত ও সংসার যেন আমার চক্ষে অন্ধকারময় বোধ হইত। কিন্তু ভগবদুপাসনা দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হইলে বাহ্যপ্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি সহজেই উপভোগ করিতে পারিতাম, পরমেশ্বরের মহিমা ও কৃপা জলে, স্থলে ও শূন্যদেশে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতাম; ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিত্বসুধা পান করিতে সমর্থ হইতাম; মহর্ষি বাল্মীকির সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে বিমুগ্ধ হইতাম; তাঁহার ব্রহ্মঘোষ-নিনাদিত দণ্ডকারণ্যের প্রাণস্পর্শিনী শোভা ও পবিত্রতার কথা চিন্তা করিয়া আনন্দরসে নিমগ্ন হইতাম এবং জগৎলক্ষ্মী সীতাদেবী ভগবান্ রামচন্দ্র ও মহাত্মা লক্ষ্মণের অলৌকিক চরিত্রের আলোচনা করিতে করিতে মানসচক্ষে যেন স্বর্গরাজ্যের অস্পষ্ট ছায়া অবলোকন করিতাম। তখন হৃদয় প্রসারিত হইয়া যেন ব্রহ্মাণ্ডময় পরিব্যাপ্ত হইত; মোহমুগ্ধ মানবের অসার কোলাহলে প্রাণ ব্যথিত হইত; জগতের ধন, মান, ঐশ্বর্য্য অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইত; রাগ, দ্বেষ, অভিমান কোথায় লুকায়িত হইত; শত্রুমিত্র জ্ঞান থাকিত না; সকলকেই ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইত এবং জীবের কষ্ট দেখিয়া আত্মা ক্রন্দন করিত

তখন মনে করিতাম, সকলের দ্বারে দ্বারে আনন্দ ও শান্তির সমাচার আনয়ন করিব ; সকলকে পবিত্র হইতে বলিব ; সকলকে মহান্ পরমেশ্বরের চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিব। এইরূপ মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া আমি মধ্যে মধ্যে স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যাইতাম, ক্ষুধাতৃষ্ণা অনুভব করিতাম না, হাতের পুস্তক হাতেই থাকিত এবং কেহ নিকটে আসিলেও তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতাম না।

উপাসনা, সচ্চিন্তা, সদালাপ ও সদ্গ্রন্থপাঠই এই সময়ে আমার প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাধু মহাত্মাদিগের গ্রন্থাদি পাঠে আমি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতাম। অস্মদ্দেশীয় মহর্ষিগণোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদ পাঠ করিয়া আমি যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম, বাল্মীকির রামায়ণ বা ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতা পাঠ করিয়া আমি তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হই নাই। মনঃপ্রাণ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের মহাভাবে যতক্ষণ নিমগ্ন থাকিত, ততক্ষণ আমার আর কিছুই ভাল লাগিত না। নির্ম্মল গগনে পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ হইলে, দীপ্তিময়ী তারকারাজী যেরূপ আর চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, উপনিষদের মহাভাবে নিমগ্ন হইলে, বাল্মীকি বা ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতাও সেইরূপ আমার চিত্তবিনোদন করিতে পারিত না। কিন্তু অন্য সময়ে, অর্থাৎ আমি সংসারের কোলাহলময় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে, ইঁহারাই আমার জীবনাকাশে সমুজ্জ্বল তারকার ন্যায় সুশোভিত হইতেন।

যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় আমি আমার জীবনের গন্তব্য পথ দেখিতে পাইলাম। আমার লক্ষ্যও স্থিরীকৃত হইয়া গেল। তদনুসারে আমি আমার কার্য্যাদি নিয়মিত করিতে প্রস্তুত হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরমেশ্বরই যখন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইলেন, তখন জীবনের কার্য্যসকলও একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। আমি ব্যবহার শাস্ত্র পাঠ পরিত্যাগ করিলাম। ব্যবহারজীবী হইলে, অনেক সময় সত্যপথে চলিতে পারিব না, ইহাই আমার বিশ্বাস হইল। সত্যই পরমেশ্বর ; সুতরাং পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বসময়ে নির্ম্মল সত্যেরই

উপাসনা করা কর্ত্তব্য, ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। স্বাধীনতা না থাকিলে, সত্যের উপাসনা করা যায় না। এই কারণে, স্বাধীনতা লাভের জন্যও ব্যাকুল হইলাম। স্বাধীনতা অর্থে, আমি মনের ও আত্মার স্বাধীনতার কথাই বলিতেছি। এই স্বাধীনতালাভের পথে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য পরের দাসত্বকেই আমি প্রধান অন্তরায় মনে করিলাম। এই কারণে স্থির করিলাম, কাহারও বর্ত্তনভোগী হইব না। তবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিব? আমার সংসার অর্থে কেবল আমাকেই বুঝাইত। পিতামাতাকে আমার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিতে হইত না। আমার অগ্রজ ভ্রাতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগকেও কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। আমিও বিবাহ করি নাই এবং সংকল্প করিতেছিলাম, হয়ত বিবাহ করিবও না। সুতরাং আমার একমাত্র চিন্তা কেবল আমারই প্রতিপালনের জন্য। পরমেশ্বরের কৃপায় তাহারও একপ্রকার উপায় হইয়া গেল। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও একটী পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া কতিপয় সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইলাম। পিতৃদেবকে অনুরোধ করায় তিনি আমার জন্য সেই মুদ্রায় কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিলেন। সে ভূসম্পত্তির উপসত্ব বার্ষিক ৬০০৲ টাকা মাত্র। ইহাই আমার আয় নির্দ্দিষ্ট হইল। এই আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই আমি সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম।

বলা বাহুল, পিতৃদেব, জননী ও আমার অগ্রজ ভ্রাতারা আমার সংকল্পের কথা শুনিয়া আমাকে তাহা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন: কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্পানুসারে কার্য্য করিতে আমাকে একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাঁহারা দুঃখিত মনে নিরস্ত হইলেন। অবশ্য তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারিলে আমিও যারপর নাই আনন্দিত হইতাম; কিন্তু সঙ্কল্প সিদ্ধির অন্য কোনও উপায় না থাকাতে আমি অগত্যা নিজ ইচ্ছামতই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, পিতৃদেবকে আমি আমার অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জানাইয়াছিলাম; তিনি যেরূপ বিজ্ঞ, শিক্ষিত ও উদারচিত্ত তৎসমুদয় অবগত হইয়া আমাকে আর কোনও বাধা দিলেন না। কেবল জননী দেবীকেই কোনপ্রকারে বুঝাইতে পারিলাম না। আমি এখন বিবাহ করিব না এবং অপর ভ্রাতৃগণের ন্যায় কোনও উচ্চপদে

আরোহণের চেষ্টা করিব না, ইহা অবগত হইয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম এবং তাঁহাকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিতে লাগিলাম। কিন্তু বিবাহ না করিলে আমি যে উদাসীন হইয়া যাইব, এই বিশ্বাসটি তাঁহার মন হইতে কোনপ্রকারেই অপসারিত করিতে পারিলাম না। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম "মা, আমি যে উদাসীন হইব না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। বিবাহ করিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু এখন বিবাহের কোনও ইচ্ছা নাই। তুমি জোর করিয়া বিবাহ দিলে আমি চিরকালের জন্য অসুখী হইব। আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। এই পল্লীর অনতিদূরে আমি যে মৌজা ক্রয় করিয়াছি, সেই স্থানে আমি একটী ঘর প্রস্তুত করিব। সেই স্থানে নিরত থাকিলেও আমি প্রত্যহ তোমাদের চরণদর্শন করিতে আসিব ও সেবাশুশ্রূষা করিব। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশের লোকেরা আশ্রমে কঠোরভাবে জীবনযাপন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি এই অপেক্ষাকৃত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে না পারি তাহা হইলে কি লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।" এই বলিয়া আমি তাঁহার নিকট আর্য্যগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম, আর্য্যমহিলা গার্গী ও মৈত্রেয়ীর কথা উল্লেখ করিলাম এবং পরিশেষে আমার সঙ্কল্পটি অনুমোদন করিতে তাঁহাকে অনুনয় করিলাম। পুত্রবৎসলা জননীদেবী আমার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি আমার বিবাহ দেখিলে যে সুখে ইহলোক হইতে অবসৃত হইতে পারিবেন, সেই কথাটি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন।

সত্যকেও আমার সঙ্কল্পের কথা সমস্ত জানাইলাম। সত্যও আমাকে প্রথমে কিঞ্চিৎ বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে সেও আমার সঙ্কল্পটির অনুমোদন করিল। এইরূপে চারিদিকের পথ পরিষ্কৃত হইলে আমি পিতৃদেবের অনুমতিক্রমে আমার অভিলষিত মনোরম স্থানে একটী আবাসবাটী নির্ম্মাণ করাইলাম। স্থানটির নাম পলাশবন। কিন্তু নামটি পলাশবন না হইয়া শালবনই হওয়া উচিত ছিল। সেই স্থানের কিয়দ্দূরে কতিপয় পলাশ বৃক্ষ থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা এত অধিক ছিল না, যদ্দ্বারা সেই স্থানটি তাহাদের নামেই অভিহিত হইতে পারে। আবাস-বাটীর সন্নিকটেই শ্যামল শালবন শোভা পাইতেছিল। অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম।

এই গ্রামটিরও নাম পলাশবন। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই নিরীহ কৃষক; কিন্তু সেখানে কতিপয় ঘর ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতিও বাস করিত। গ্রামবাসী ব্যক্তিরা আমাকে তাহাদের প্রতিবাসী হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। আমি একটী শুভদিনে বাস্তু শান্তি করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করিলাম।

—:০:—

গীতোক্ত অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের দাসীতে বাবু প্রতুল চন্দ্র সোম মহাশয় তাঁহার "গীতোক্ত অবতার তত্ত্বের" শেষ ভাগে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, শ্রদ্ধাশীল ও ভগবৎ-পরায়ণ, সে তো প্রীতিপাত্র হইবেই; কিন্তু যে অধর্ম্মাচরণ করে, পাষণ্ড ও পাপাসক্ত, সে কি ভগবানের প্রীতির সীমার বাহিরে? তবে তো সে প্রেম অপূর্ণ। ইহাতে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন হইতে পারে, কিন্তু পাপীর উদ্ধার সম্ভব নয়। এই হেতু গীতার যুগাবতার প্রেমাবতার নয়। ফল কথা সুস্থকে রাখিয়া অসুস্থের কল্যাণ চেষ্টা, পথারূঢ় নিরানব্বইটিকে ছাড়িয়া পথভ্রান্ত একটির অন্বেষণই যে ধর্ম্ম সংস্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায়, তখনও এ ধারণা হয় নাই। মনস্বী ৺ বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই গীতোক্ত ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির পরাকাষ্ঠা, চরম অভিব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের এ প্রয়াস বৃথা। গীতার ধর্ম্ম অতি মহান্ হইলেও ইহা হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতম অভিব্যক্তি নয়। গীতার অসম্পূর্ণ অবতারবাদের পূর্ণতা নিতাই চৈতন্যে। যুগাবতার এখানে সাধুর পরিত্রাণের জন্য নয়, পাপীর পরিত্রাণের জন্য ব্যস্ত। 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং' "নয়, মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিবনা" এই প্রেমাবতারের ভাষা। নিগ্রহের বিনিময়ে এখানে আলিঙ্গন। কিরূপে বলি, আলিঙ্গনের ধর্ম্ম বিনাশের ধর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর নহে? প্রেমাবতার অবতারের চরম। গীতার অবতার প্রেমাবতার নহে; সুতরাং গীতোক্ত অবতার অতি মনোহর ও বিশদ হইলেও অসম্পূর্ণ।" উপরোক্ত কথা সম্বন্ধে আমার দুই একটি বক্তব্য আছে।

প্রতুল বাবু কৃষ্ণ অপেক্ষা চৈতন্যকে বড় বলিতে চান কিনা জানি না

কিন্তু লেখার আভাসে মনে হয় যেন তাহাই বলা তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহা হউক এবিষয়টা তত মারাত্মক নহে; কারণ যদি কেহ আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলে যে বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় লোকটা ভাল নহে কিন্তু বালিজুড়ি নিবাসী ৺ ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র লোক বেশ ভাল, তবে আমার বুঝা উচিত যে, আমি নিজে লোক মন্দ নহি, তবে আমার যাহা কিছু দোষ আছে তাহা আমার নামের দোষ। সেইরূপ কৃষ্ণ ও চৈতন্যকে ভগবানের অবতার স্বীকার করিয়া কৃষ্ণ অপেক্ষা চৈতন্য বড় বলিলে ইহাই বুঝা উচিত যে কৃষ্ণ ছোট নয়,তবে তাঁহার নাম ছোট, কারণ আমি কখনও আমার অপেক্ষা বড় বা ছোট হইতে পারি না। যাহা হউক একথা লইয়া বেশী বাক্‌বিতণ্ডা করিবার আবশ্যক নাই।

প্রতুল বাবু কয়েকটী কথার সাধারণ অর্থ লইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিনাশ শব্দের সাধারণ অর্থ লয়প্রাপ্ত হওয়া, মারিয়া ফেলা। অর্জ্জুন যখন ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে এই অর্থে মারিয়া ফেলিতে অস্বীকার হইয়া যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন ভগবান যে সকল কথা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, তাহা কি প্রতুল বাবু পাঠ করেন নাই? ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন:—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব নাভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

*   *   *

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

আমি যে কখনও ছিলাম না এমন নয়, সেইরূপ তুমি ছিলে না এমন নয়; এই রাজাগণও ছিলেন না এমন নয়; ইহার পরে আমরা সকলে থাকিব না এমন নয়। দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দেহে কৌমার,

যৌবন ও বার্দ্ধক্য, দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ। অতএব পণ্ডিত লোক তাহাতে মোহিত হন না।

* * * *

যিনি এই সকল দেহাদি ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী জানিও। কেহই সেই অব্যয়ের বিনাশ করিতে পারে না। নিত্য, অবিনাশী ও অপরিচ্ছিন্ন আত্মার এই দেহ সকল নশ্বর বলিয়া কথিত হয়; অতএব হে ভারত, যুদ্ধ কর।

যে ব্যক্তি ইহাকে হন্তা মনে করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই জানে না; যেহেতু ইনি হত্যা করেন না এবং হতও হয়েন না।"

যদি গীতার ধর্ম্ম এরূপ হয় তবে দুষ্টের বিনাশ হইল কি প্রকারে? প্রতুল বাবু হয়ত দেহের নাশকে বিনাশ বলিতে চাহেন, কিন্তু গীতাতে দেহের নাশকে বিনাশ বলে না, তাহাকে আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তি বলে।

প্রতুল বাবু হয়ত বলিবেন যে, এই দেহের নাশের আবশ্যক কি? চৈতন্য মহাপ্রভু অনেক দুষ্টের উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ত কখনও তাহাদের নাশ করেন নাই! গীতার কৃষ্ণ ধর্ম্মের এই মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, সেই জন্য দুষ্টের বিনাশ দ্বারা তাহাদের উদ্ধারের উপদেশ দেন।

গীতার কৃষ্ণ চৈতন্যের ধর্ম্মের মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয় লইয়া আমার বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার ইচ্ছা নাই; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তিনি ধর্ম্মের এই মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেও যেরূপ অবস্থায় অর্জ্জুনকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, সেরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের উক্ত মহান্ ভাব ব্যক্ত করিলে তিনি কেবল হাস্যাস্পদ হইতেন। দেশ কাল এবং পাত্র এই তিনটির বিবেচনা করিয়া সকল সময়ে উপদেশ দিতে হয়। একটী দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। মনে করুন এক জন ধর্ম্মযাচক ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে একজন পাষণ্ড আসিয়া তাঁহাকে কলসীর কানা দ্বারা আঘাত করিল। ধর্ম্মযাজক মহাশয় অনায়াসে বলিতে পারেন, "মেরেছ কলসীর কানা, তা' বলে কি প্রেম দিব না?" এরূপ বলিলে হয়ত সমাজের কোন অনিষ্ট হইবে না, বরং ইষ্ট হইবার সম্ভব। কিন্তু মনে কর, একজন মাজিষ্ট্রেট বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতেছেন, এমন সময়ে পুলিস একজন পাকা বদমাইস ডাকাতকে

আনিয়া তথায় উপস্থিত করিল। মাজিষ্ট্রেট যদি উক্ত ডাকাতের উপযুক্ত বিচার না করিয়া "চুরি করেছ পরের সোনা, তা' বলে কি প্রেম দিব না ?" বলিয়া ডাকাতের গলা ধরিয়া কান্দিতে আরম্ভ করেন, তবে প্রতুল বাবু উক্ত মাজিষ্ট্রেটকে কি বলিবেন ? বাতুল বলিবেন নাকি ? মাজিষ্ট্রেটের এরূপ কার্য্যে দেশের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের বেশী সম্ভব নয় কি ?

চৈতন্য একজন গরীব ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় "মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।" না বলিলে তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। তিনি যদি আলিঙ্গন ধর্ম্মের প্রচার না করিয়া "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ধর্ম্মের প্রচার করিতেন, তবে হয়ত তাঁহাকে অনেক দিন পূর্ব্বেই মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইত ; কারণ সে সময়ে মুসলমানদের রাজত্ব চলিতেছিল। চৈতন্য যেমন দায়ে পড়িয়া আলিঙ্গন-ধর্ম্মের প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ (আলিঙ্গনধর্ম্ম অবগত থাকিয়াও) দায়ে পড়িয়া "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ধর্ম্মের প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিজে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা, যাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন তিনিও একজন তদ্রূপ ; উপদেশ দেওয়া হইতেছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধস্থলে, যেখানে যুদ্ধের জন্য অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান। এরূপ স্থলে "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ধর্ম্মের প্রচার না করিয়া আলিঙ্গন-ধর্ম্মের উপদেশ দিলে দৃষ্টান্তোল্লিখিত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ডাকাতের গলা ধরিয়া কান্নার মত হইত। এবং লোকে তাঁহাকে হয়ত ঘৃণা করিত। শ্রীকৃষ্ণ মানবচরিত্র ভাল বুঝিতেন তাই অর্জ্জুন যখন "যুদ্ধ করিব না" বলিয়া ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া দিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

"ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥"

"মহারথগণ তোমাকে ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত মনে করিবেন ; যাঁহাদের নিকট তুমি সম্মানিত ছিলে এখন তাঁহাদের নিকট লাঘব প্রাপ্ত হইবে। তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্য নিন্দা করিয়া অনেক অবাচ্য কথা বলিবে ; তদপেক্ষা অধিক দুঃখকর আর কি আছে ?" এই সকল নানা কারণে

শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে প্রেম ধর্ম্মের প্রচার না করিয়া "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। আলিঙ্গনধর্ম্ম বিনাশধর্ম্ম হইতে উচ্চ হইলেও সকল সময়ে এবং সকল স্থানে তাহা উচ্চ নহে বা উচ্চ হইতে পারে না। তবলার বাদ্যে নর্ত্তকীদের পা উঠিতে পারে, কিন্তু রণোন্মত্ত যোদ্ধাদের পা উঠাইবার জন্য ভেরীর বাদ্য আবশ্যক। অতএব গীতার ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ নহে; দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে।

শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

গরিব-সেবক গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে (কুরিগ্রামে) ১২৫১ সনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা দুই সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম উমেশচন্দ্র ঘোষ। পিতা প্যারীমোহন ঘোষ অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। গিরিশচন্দ্র বাল্যকালে পাঠশালায় কিছুদিন পড়িয়া স্থানীয় জমীদারগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তার পর ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ করেন। ইংরেজী পড়িতে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া ১০ টাকা বৃত্তি পান। পঠদ্দশায় যে সমস্ত ছাত্রের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বর্ত্তমান নড়াইল জমীদারগণের অগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বাল্যকালের ভালবাসা বয়োবৃদ্ধি সহকারে কখনও হ্রাস হয় নাই। সামান্ত বৃত্তি পাইয়া তাঁহারই উৎসাহে এবং সাহায্যে গিরিশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। তথায় কিছুদিন পড়ার পর জেনারেল এসেম্‌ব্লি কলেজে প্রবেশ করেন।

পাঠাভ্যাসে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি যখন স্কুলে পড়িতেন, তখন প্রত্যহ সাংসারিক নানারূপ শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিয়া যে একটু সময় পাইতেন, তাহাই পাঠালোচনায় যাপন করিতেন। বৃথা আমোদে সময় কাটাইবার কখনও অবসর পান নাই। জেনারেল এসেম্‌ব্লি কলেজে অধ্যয়নের সময় বিখ্যাত ওগিল্‌বি সাহেবের সহিত আলাপ হয়। সাহেব তাঁহার ধর্ম্মভীরুতা এবং শিক্ষার জন্য আন্তরিক যত্ন দেখিয়া তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন এবং অনেক সদুপদেশ দান করিতেন। এই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়।

বাধ্য হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া বাড়ী আসিতে হইল। তারপর চাকরীর জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই হাজরাহাটী মাইনর স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হয়েন। সে পদে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন; ছাত্রগণ তাঁহাকে এতদূর ভক্তি করিত ও ভালবাসিত যে, এখনও অনেকের মুখে তাঁহার ভালবাসার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার পর আরও ২।১টী স্কুলে মাষ্টারী করেন; সকল স্থানেই তিনি গ্রামবাসীর প্রশংসাভাজন এবং ছাত্রগণের বিশেষ ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। তৎপরে শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া স্থানীয় জমীদারগণের ইংরেজী আফিসে প্রবেশ করেন। কিছুদিন পরে এ কার্য্য হইতে তিনি অবসৃত হয়েন। এই সময় তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইল; ইহার একদিন পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তাঁহাকে একাকী রাখিয়া, বৃদ্ধা মাতাকে কাঁদাইয়া, একমাত্র শিশুসন্তানসহ অল্পবয়স্কা ভার্য্যাকে চিরবৈধব্যানলে জ্বালাইয়া, ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। তিনি চারিদিক শূন্য দেখিলেন; মন অস্থির হইল। পরিশেষে মাতার উন্মত্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি আপনার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তখন আবার মনের বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব তখন তাঁহার সহায় হইল। মাতৃদেবীর সান্ত্বনায় অধিকাংশ সময়ই যাপন করিতে হইত। তাঁহাকে স্নান, আহার না করাইয়া তিনি কিছুই আহার করিতেন না। এখন পরিবারের সমস্ত ব্যয় তাঁহাকে বহন করিতে হইত। তিনি নড়ালের তদানীন্তন ডাক্তার এণ্ডার্শন (এখন ইনি কলিকাতার ধর্ম্মতলায় থাকেন) সাহেবের পুত্রকে পড়াইয়া মাসে মাসে যাহা পাইতেন, তাহা দ্বারাই পরিবারের ব্যয় কোন ক্রমে নির্ব্বাহ করিতেন। কালক্রমে স্থানীয় মুন্‌সেফী আদালতে তিনি নাজীর নিযুক্ত হয়েন। এই তাঁহার প্রথম গবর্ণমেণ্ট আফিসে প্রবেশ। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি এরূপ অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিতেন যে, তখনকার মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং যাহাতে শীঘ্রই সমস্ত কার্য্য শিক্ষা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে মুন্‌সেফ বাবু বিশেষ চেষ্টা করিতেন। অতুল বাবুর একমাত্র পুত্র যখন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েন, তখন তিনিও সেই পরিবারে মিশিয়া রাত্রিজাগরণ করিয়া রোগীকে ঔষধ পথ্যাদি খাওয়ান প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কর্ম্ম করিতেন।

এই গবর্ণমেণ্ট আফিসে কার্য্য করিবার সময়েই তাঁহার জীবনের নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইল। তিনি দেখিলেন যে, নড়ালে এরূপ অনাথ দরিদ্র অনেক আছে, যাহারা রোগে আক্রান্ত হইয়া স্ব স্ব ভরণ পোষণের জন্য অন্যের দ্বারে উপস্থিত হইতেও সম্পূর্ণ অক্ষম; এরূপ নিরাশ্রয় আতুর অনেক আছে, যাহারা সাময়িক ঔষধ এবং আশ্রয় অভাবে অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হয়; এরূপ চিররোগী অনেক আছে, যাহারা উপযুক্ত সেবার অভাবে, আস্তে আস্তে, মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে; এরূপ অসহায় ছাত্রও অনেক আছে, যাহারা স্কুলের মাহিয়ানা চালাইতে না পারিয়া অল্প বয়সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সংসারের এই সমস্ত বিচিত্র দৃশ্য তাঁহার হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হইল। তিনি নিজে দরিদ্রতার অঙ্কে লালিত পালিত; শোকে তাঁহার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের দুর্দ্দশা তিনি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন এবং তাহা দূর করিবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নিজের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়; সুতরাং সাহায্যের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইল। "হিতৈষী" নামে এক "ফণ্ড" সৃষ্টি করিলেন। যাঁহাদের অবস্থা ভাল তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া চাঁদার দ্বারা অনাথ, আতুরগণের সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অনেকে সম্মত হইলেন। এই টাকা হইতে তিনি কয়েকটী স্কুলের ছাত্রকে মাহিয়ানা দিতে লাগিলেন; কয়েকটী নিরাশ্রয় ব্যক্তির কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং কয়েকটী নিরুপায় লোককে অন্ন যোগাইতে লাগিলেন। স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ লইয়া নিজ হস্তে কয়েকটি রোগীকে খাওয়াইতেন। আফিসের কার্য্য করিয়া যতটুকু সময় অবসর পাইতেন, এইরূপে তাহা ব্যয়িত হইত। এই সময়ে বর্ত্তমান্ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নড়ালে ওয়ার্ডস্ ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি অতিশয় সদাশয় লোক; দরিদ্রের সাহায্যের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার হস্ত উন্মুক্ত ছিল। তিনি গিরিশ বাবুকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। চরিত্রগুণে রাধাকান্ত বাবু আজও নড়ালে পূজিত; আজও তাঁহাকে কেহ ভুলিতে পারে নাই। "হিতৈষী ফণ্ড" যাহাতে বিশেষভাবে কার্য্য করিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, মনে কষ্টও হয়, যে অনেকে নিয়মিতরূপে বা একেবারেই চাঁদা না দেওয়ায় "ফণ্ড" বেশী দিন স্থায়ী হইল না। কিন্তু

তথাপি গিরিশ বাবু ক্ষান্ত হইলেন না। আয় অনেক কমিয়া গেল লিয়া তিনি এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় বহু সংখ্যক লোকের সাহায্য করিতে পারিলেন না। এইরূপে, আস্তে আস্তে কয়েক বৎসর চলিয়া গেল। তার পর, নড়ালে সুযোগ্য ডেপুটী শ্রীযুক্ত আবদুল খালেফ্ মহোদয় আসিয়া গিরিশ বাবুর কার্য্যের বিষয় শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন, কিন্তু "ফণ্ডের" অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের যত্নে নড়াইলের অন্যতম জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহারী রায় মহাশয়ের সাহায্যে এক সভা আহূত হইল। ভদ্রমণ্ডলী অনেকেই চাঁদা দিবেন বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে অনেকেই কথা রাখিতে পারেন নাই। এই সব দেখিয়া গিরিশ বাবু এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, গৃহস্থেরা ফকীর কাঙ্গালকে ভিক্ষা দিয়া থাকে; সুতরাং যদি তিনি আতুর এবং দরিদ্রগণের হইয়া ভিক্ষা করিতে পারেন, তবে তাঁহার ইচ্ছা সফল হইতে পারে। এই মনে করিয়া তিনি প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে একটী একটী হাঁড়ী দিয়া আসিলেন এবং বলিলেন "আপনারা যেমন কাঙ্গাল, বৈষ্ণব ইত্যাদিকে প্রত্যহ ভিক্ষা দেন, সেইরূপ আমারও এই হাঁড়ীটীকে একটী কাঙ্গালের হাঁড়ী মনে করিয়া ইহাতে একমুষ্টি চাউল প্রত্যহ রাখিবেন।" এইরূপ করিয়া গৃহস্থের নিকট সাহায্য পাইতে লাগিলেন এবং অন্য অন্য লোকে দয়া করিয়া যে কিছু পয়সা দিতেন,তাহাও ফণ্ডে জমা হইতে লাগিল। ইহাতে "হিতৈষীর" কার্য্য চলিতে লাগিল। ২টী আতুরকে তাঁহার নিজের বাড়ী আনিলেন এবং তাঁহাদিগকে আপনার পরিবারের মধ্যে রাখিয়া নিজেই আহার ইত্যাদির ব্যয় বহন করিতে লাগিলেন। ইহাদের একটী বাতব্যাধি রোগে আক্রান্ত বৃদ্ধ, আর একটী পঙ্গু বৃদ্ধা। বৃদ্ধার পায়ে খুব বড় ঘা ছিল। নিজ হস্তে তাহার ঘা ধোয়াইয়া দিতেন। এবং আবশ্যকমত তাহাদের মলাদি পরিষ্কার করিতেন। ঔষধ পথ্য তিনি নিজ হস্তেই খাওয়াইতেন। কোন ঘটনোপলক্ষে তিনি তাঁহার আশ্রিত দরিদ্রমণ্ডলীকে খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন। তখন তাঁহার বাড়ীতে এক নূতন উৎসব হইত।

এই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে তাঁহাকে স্থানান্তরে বদলী হইতে হইল। কিন্তু তিনি যখনই যেখানে গিয়াছেন, তখনই তথাকার দরিদ্র আতুরগণ তাঁহার স্নেহ, তাঁহার সেবা পাইয়াছে। কিন্তু নড়ালে নিজ বাসস্থানে থাকিয়া, তিনি যেরূপ ভাবে হাঁড়ীর ব্যবস্থা করিয়া-

ছিলেন, সেরূপ আর কোথায়ও করিতে পারেন নাই। তবে এই হাঁড়ীর প্রথা তাঁহার কোন পরিচিত ভদ্রলোক খুলনা জেলার সেনহাটীগ্রামে প্রচলিত করিয়া অন্য অন্য স্থানেও যাহাতে ইহার প্রচলন হয় এই উদ্দেশ্যে "সঞ্জীবনীর" স্তম্ভে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। বাগেরহাটে যাইয়া (শুনিয়াছি) তিনি গ্রামবাসীর নিকট এবং স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের নিকট দরিদ্রের জন্য চাউল ভিক্ষা করিতেন। আফিস হইতে আসিয়া সন্ধ্যাবেলায় ঝোলা লইয়া একাকী বাসায় বাসায় ফিরিতেন। কিন্তু বাগেরহাটের জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি সময় সময় অসুস্থ হইতে লাগিলেন। এই সময়ে (তাঁহার মুখে শুনিয়াছি) কয়েকটি ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে অতঃপর আর রোগী লইয়া তাঁহাকে একাকী রাত্রি জাগিতে হইবে না; সকলে সমভাগে রাত্রি বিভক্ত করিয়া কার্য্য করিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহাকেই একাকী রাত্রি জাগিতে হইত। এখানে এই ভাবে কিছুদিন কাটাইলেন। সুখের বিষয়, এক্ষণে তিনি আফিসের কার্য্যে উন্নতি লাভ করেন। এখানে অস্থায়ী সেরেস্তাদারীরূপে কিছুদিন কার্য্য করিয়া খুলনায় স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়েন। খুলনায় আসিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হইল। কিন্তু এখানেও তাঁহার কার্য্যের বিরাম ছিল না। এখানেই দাসাশ্রমের ২।৩ জন সেবকের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। সেবকগণ দেখিলেন যে, তাঁহারা কলিকাতায় বৃহৎ ভাবে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেই কার্য্যই স্বল্পভাবে গিরিশ বাবু বহু পূর্ব্ব হইতে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। দাসাশ্রমের কার্য্যের সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তিনি খুলনা হইতে দাসাশ্রমে রোগী পাঠাইতেন এবং ছুটির সময় যখন বাড়ী আসিতেন, তখন নড়ালে যে সমস্ত অনাথ চিররোগী দেখিতেন তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া তথায় যাইতেন। সময়াভাবে দাসাশ্রমের অন্য কোন সাহায্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু নিজের অবস্থানুসারে আর্থিক সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই।

খুলনায় রোগীর সংখ্যা ক্রমে বেশী হইল; পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের নিরাশ্রয় নিঃস্ব লোকও তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। ইহা ব্যতীত রোগাক্রান্ত পথিকেরও অভাব ছিল না। আবার স্থানীয় হাঁসপাতালের আতুরগণের সাহায্যও তাঁহাকে সময় সময় করিতে হইত। অনেক সময়ে তাঁহাকে আফিসের কঠিন শ্রম করিয়া আসিয়া রোগীর পার্শ্বে বসিয়া অনিদ্রায়

রজনী কাটাইতে হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি রোগীর মৃত্যু হইত, তবে আর কষ্টের সীমা থাকিত না। কাষ্ঠ সংগ্রহ এবং শ্মশানে শব আনয়ন ইত্যাদি একাকী করা যায় না। এ সমস্ত বিষয়ে তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতেই হইত। কিন্তু তাহাও যাহাতে একাকী করিতে পারেন এরূপ বন্দোবস্তও তিনি করিয়াছিলেন। তিনি কাষ্ঠ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জমা রাখিতেন এবং শব লইয়া যাইবার জন্য একাকী টানিয়া লইয়া যাইতে পারেন এরূপ এক প্রকার গাড়ী কলিকাতা হইতে আনাইয়াছিলেন। দরিদ্রের সেবার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয় জাগ্রত ছিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য একটু বৃদ্ধি হয়, সেই চিন্তাই অনেক সময়ে তাঁহাকে ব্যাপৃত রাখিত। খুলনায় গবর্ণমেণ্টের যে হাঁসপাতাল আছে, তাহাতে অধিক লোকের স্থান সঙ্কুলন হয় না এবং ভৃত্যগণেরও ততদূর কর্ত্তব্যজ্ঞান না থাকায় অনেক সময় দরিদ্র রোগীদিগের বড় কষ্ট হয়। এই সমস্ত দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, খুলনায় অন্য একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করা উচিত। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের বাসস্থান স্বতন্ত্র করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি স্থানীয় সদাশয় ভদ্রমণ্ডলীর নিকট তাঁহার উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন। অনেকে তাঁহার সহিত একমত হইলেন। খুলনার উদারচরিত সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত পি, আর, হে জগন্নাথম্ মহাশয় তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন, এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সেন—যাঁহার অমায়িকতা এবং পরোপকারিতাগুণে খুলনাবাসিগণ চিরকাল মোহিত, যিনি দরিদ্রের সাহায্যে গিরিশ বাবুর দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—সেই হরিমোহন বাবুও তাঁহার সহিত এ কার্য্যে যোগদান করিলেন। চাঁদা সংগ্রহ হইতেছিল; তিনি অদম্য উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিতেছিলেন; কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইল। আশা করি, খুলনাস্থ অন্যান্য পরদুঃখকাতর, হৃদয়বান্ সদাশয় মহোদয় তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দরিদ্র আতুরগণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। আজ তাঁহার মৃত্যুতে দরিদ্রগণ যে অভাব বোধ করিতেছে, আশা করি, সহৃদয় মহোদয়গণ তাহা পূরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

নিম্নে এই দয়াশীল মহাত্মার জীবনের কয়েকটি আখ্যায়িকা বিবৃত হইল।

দুঃখিজনের দুঃখ দূর করিবার জন্য যেমন তাঁহার হস্ত সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ও প্রসারিত ছিল, তেমনি পারিবারিক অসচ্ছলতা অপনয়নের জন্য তিনি অনেক সময়ে যত্নবান্ ছিলেন। কিন্তু কখনই কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার পরিবারে লোক সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও কম ছিল না। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর কিছু দিন পরে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। তাঁহার গর্ভে চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের বিধবা পত্নী ও তাঁহার একমাত্র পুত্রও বর্ত্তমান। পুত্রগুলি সকলেই নাবালক। ইহাদের লেখাপড়া শিখাইবার ব্যয় এবং অন্যান্য আবশ্যকমত ব্যয় সঙ্কুলন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এরূপ অবস্থাপন্ন হইলেও তিনি কখনও অবৈধরূপে টাকা লইতেন না। এবং এরূপ নিঃস্বভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেও কোনদিন তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য, মনের শান্তি, হৃদয়ের প্রফুল্লতা নষ্ট হয় নাই। পারিবারিক নানাবিধ অশান্তির মধ্যে থাকিলেও তিনি কখনও ক্রোধের বশীভূত হন নাই। তিনি এতদূর ক্ষমাশীল ছিলেন যে অনেক সময়ে তাহা দোষে পরিণত হইত। প্রতিবেশী ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন। সকলের সহিতই সমভাবে তিনি মিশিতেন। আজ তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গ শোকসাগরে মগ্ন। তাঁহার আত্মীয়গণ, পরিচিত ভদ্রমণ্ডলী, স্নেহভাজন প্রতিবেশিগণ, সকলেই শোকাকুল। দরিদ্র, আতুর, নিরাশ্রয় অক্ষমগণ তাঁহার বিহনে হাহাকার করিতেছে।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে নড়ালে একটী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া পূর্ব্বকার ডিস্পেন্সারীর বারান্দায় পড়িয়া থাকে। রোগে তাহার অঙ্গুলি-গুলি খসিয়া পড়িতেছিল এবং ক্ষতস্থানে পোকা পড়িয়াছিল। সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিয়া সরিয়া যাইত। অনেকে ডিস্পেন্সারীর ঘাটে যাওয়াও বন্ধ করিল। ২।১ জন সহৃদয় ভদ্রলোক তাহাকে কিছু কিছু আহার্য্য দিতেন; কিন্তু তাহাতে যদি তাহার উদর সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ না হইত, তবে বড়ই কটু কথা বলিয়া গালি দিত। এই সব নানা অসুবিধায় কয়েকজন ভদ্রলোক তাহাকে তাড়াইবার উপায় স্থির করিলেন। পরিশেষে তাহারা গিরিশ বাবুকে খবর দিলেন। তিনি প্রাতঃকালে তাহার নিকট যাইয়া অম্লানবদনে তাহার ঘা ধোয়াইয়া দিলেন, পোকা যতদূর সম্ভব বাছিয়া

ফেলিলেন এবং ক্ষতস্থানে ঔষধ লেপন করিয়া দিলেন। তিনি নিজেই স্বহস্তে তাহাকে খাওইয়া দিলেন। এইরূপ ২।৩ দিন করিলে পর উক্ত ভদ্রমণ্ডলী তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তিনি টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তৎপরে লোক সঙ্গে দিয়া তাহাকে কলিকাতার কুষ্ঠাশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যতদিন তাহার পাথেয় সংগ্রহ করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন তাহাকে বিশেষ যত্নসহকারে সেবা করিতে লাগিলেন। যাইবার পূর্ব্বে একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার কি খাইতে ইচ্ছা করে। পিষ্টক খাইতে ইচ্ছা আছে, ইহা প্রকাশ করিলে পর তিনি অতিকষ্টে তাহার জোগাড় করিলেন। এবং অতীব আনন্দ সহকারে তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। কলিকাতার কুষ্ঠাশ্রমে পাঠাইবার পর, তিনি ২।১ বার তথায় যাইয়া তাহার সহিত দেখা করিতেন। বলা বাহুল্য রোগীটী তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাঁহার নিকট তখন প্রকাশ করিত।

নড়ালের পূর্ব্বকার ডিস্পেন্সারীর পাদদেশ ধৌত করিয়া চিত্রা নদী বহিয়া যাইতেছে। এই ডিস্পেন্সারীর দুইটী ঘর আছে। ডিস্পেন্সারী স্থানান্তরিত হওয়ায় ইহার একটী ঘরে বিদেশীয় অসহায় রোগিগণকে আশ্রয় দেওয়া হইত। এক সময়ে একটী বালক—বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইবে—জলোদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া কিরূপে যেন নড়ালে উপস্থিত হয়। বালকটীকে পথে দেখিয়া তিনি সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাহার কেহ নাই। তিনি তাহাকে উক্ত স্থানে আনিলেন এবং তদানীন্তন ডাক্তার বাবুকে তাহার চিকিৎসার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বাবু সম্মত হইলেন। তাহাকে উপর্য্যুপরি দুইবার Tap করিবার পর বালকটী দুরারোগ্য রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইল। কিন্তু সে যতদিন সেখানে ছিল, ততদিন তিনি স্বহস্তে তাহার কাপড়, মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিয়াছিলেন। বাটী হইতে আহার্য্য লইয়া যাইয়া তাহাকে আহার করাইতেন। আর একটী এই রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোক এইখানে তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সে ব্যারাম হইতে রক্ষা পায় নাই।

একটী ওলাউঠা রোগাক্রান্ত লোককেও তিনি এই স্থানে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহার ব্যারাম আরোগ্য করিতে পারিলেন না।

কলিকাতায় যাইয়া, তিনি প্রায়ই স্থানীয় জমীদার তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কাশীপুরস্থ ভবনে থাকিতেন। একবার তিনি তথায় কিছুদিন অবস্থান করিবার পর একদিন শুনিলেন যে, জমীদার বাবুর বাটীর অতি নিকটবর্ত্তী একটী বৃদ্ধা মেথরাণীর ওলাউঠা হইয়াছে। এই মেথরাণী জমীদার বাবুরই নিয়োজিত ভৃত্য। বাবুর কর্ম্মচারী সকলেই দূরে থাকিয়া ঔষধাদি ব্যবস্থা করিলেন; কেহই তাহার নিকটে যাইয়া ঔষধ পথ্যাদি খাওয়াইতে স্বীকৃত হইলেন না বা সাহসী হইলেন না। তিনি এ সংবাদ শুনিয়া তাহার ভার লইতে স্বীকৃত হইলেন। সমস্ত রাত্রি তাহার নিকট বসিয়া তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া প্রাতঃকালে তাহাকে একটু সুস্থ করিলেন; এবং আরও ২।৩ দিন থাকিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিলেন।

বাগেরহাট থাকিবার সময়, একদিন একটী রোগী পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে, তাহার সঙ্গিগণ তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে; কারণ সে তখন ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছিল। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ একখানি ঘরে আশ্রয় দিলেন; এবং সেই সময় হইতেই ঔষধ খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। আফিসের পরিশ্রমের পর একাকী রাত্রিজাগরণ করা বড় কষ্ট হইবে বুঝিয়া, তাঁহার কয়েকটী পরিচিত ভদ্রলোককে ডাকিলেন; এই মহোদয়গণই তাঁহাকে সেবা সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যকালে কেহই অগ্রসর হইলেন না। সকলেই নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অকৃতকার্য্য হইলেও তিনি নিরুদ্যম হইলেন না। নিজেই একাকী রাত্রিজাগরণ করিবেন, কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আমরা তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি যে, সবিশেষ পরিশ্রম করিয়াও তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। গভীর নিশীথে যখন তাহার মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটু চিন্তিত হইলেন। তার পর যে কি করিলেন তাহা আমাদের ঠিক স্মরণ নাই।

খুলনার নিকটবর্ত্তী কোন একগ্রামে একটী লোকের সর্ব্বাঙ্গে ঘা হইয়া পোকা পড়িয়াছিল। তাহার আত্মীয় বন্ধু কেহই না থাকায় তাহার শুশ্রূষা নিয়মমত হইতেছিল না। গিরিশ বাবু এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলেন। এবং সেই অবধি প্রত্যহ বিকালে আফিস হইতে

আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার ঘা ধোয়ান, পোকা ছাড়ান, প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া ঔষধ দিয়া আসিতেন। লোকটী তাহার নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা দেখিয়া মনে মনে কিছু সন্দিহান হইল। দুষ্ট লোকেও তাহার সে সন্দেহ-অগ্নিতে বাতাস দিতে ক্রুটী করিল না। কলি কালে এরূপ লোক নাই যে, স্বার্থসাধন ব্যতীত পরোপকার করিতে যায়; এই বিশ্বাসে তাহারা তাহাকে (রোগীকে) বলিল যে, কলিকাতায় কোম্পানী বাহাদুরের মানুষের তেলের দরকার, তাই বাবু তোমাকে একটু সুস্থ হইলে কলিকাতায় পাঠাইবেন। এই কথায় তাহার এতদূর বিশ্বাস জন্মিল যে, একদিন বিকালে গিরিশ বাবু যখন তাহার ঘা ধোয়াইবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন সে ক্রোধকম্পিত স্বরে তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, আমার এখানে আর আপনার আসিতে হইবে না; আপনি আমার গায় হাত দিবেন না। আমি আপনার কু অভিপ্রায় বুঝিয়াছি।" তিনিত ইহা শুনিয়াই অবাক্; অনেক বুঝাইয়াও তিনি তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি তথায় যাওয়া স্থগিত করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই রোগীটী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে হইতে তিনি তাঁহার নিজের বাসায় একটী চলৎ-শক্তিহীন পঙ্গুকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। পঙ্গুটীর মলমূত্র তিনি নিজেই পরিষ্কার করিতেন। এবং স্বহস্তেই তাহাকে খাওয়াইতেন। রোগী তাহার তত্বাবধানে থাকিয়া অনেকটা স্বচ্ছন্দে থাকিত। তাঁহার যে দিন মৃত্যু হইল, সে দিন রোগীর হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে সকলের চক্ষেই জল আসিয়াছিল।

রোগীটীকে তৎপরে তাহার কোন সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

পাঠক পাঠিকাগণ যাঁহার জীবন রোগীর সেবায় অতিবাহিত হইয়াছে, যাঁহাকে পরসেবার জন্যই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে, তাঁহার সেবাসংবাদ দুই একটা লিখিলে কি হইবে? তিনি যে ডায়েরী লিখিতেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে কিছুই লেখা না থাকায়, আমরা তাহার সকল গুলি জানিও না। তথাপি মনের মধ্যে যে দুই একটী স্বতঃই উদিত হইল, এবং আত্মীয় বন্ধুগণের মনে যেগুলি বিশেষভাবে মুদ্রিত হইয়া আছে, তাহারই ২।১টা এখানে উল্লেখ করিলাম। ইহাতেই হয়ত বুঝিবেন, কি

ভাবে তিনি জীবন কাটাইয়াছেন। এই লোকসেবা করিতে তাঁহাকে অনেক সময় অন্যের গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে—ধনীর রোষকষায়িত নেত্র দেখিতে হইয়াছে। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইহার কোন দিকেই লক্ষ্য করেন নাই। লোকসেবাই যিনি জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সংসারের ভীতি প্রদর্শন কি? তিনি কল্য যেখানে তিরস্কৃত হইয়াছেন, আজ সেখানে পূজিত। স্বার্থপর বিষয়াসক্ত মানব তাঁহার উচ্চ লক্ষ্যের গরিমা বুঝিতে পারিত না। মহৎ লোকেই মহত্তের মহত্ব বুঝে। এই জন্যই বরিশালের স্বনামখ্যাত পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় খুলনার প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর, দুই হস্তে গলা ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "গিরিশ বাবু, ধন্য আপনি; ধন্য আপনার জীবন; মানব-জীবনের মহদুদ্দেশ্য আপনিই সম্পন্ন করিতেছেন।" এই জন্যই কলিকাতার দাসাশ্রমের সেবকগণ তাঁহার সহিত এত শীঘ্র সখ্যস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। নড়ালের নিম্নশ্রেণীর লোকের নিকট তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। নড়ালে এমন অসহায় দরিদ্র বা রোগী খুব কমই ছিল, যে কোন দিন কোন রকমে তাহার সাহায্য না পাইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর আমরা অনেককেই তাঁহার মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। খুলনার সাধারণ লোকেও তাঁহাকে বিশেষরূপ জানিত।

শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষ।

সত্যধর্ম্ম ও সমাজ।

২

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আরম্ভেই জ্ঞানগত ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রথম প্রবন্ধে ইহা দর্শাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, জ্ঞান-মূলক ধর্ম্মই 'সত্যধর্ম্ম';—ধর্ম্মের অপর কোন মূল নাই। ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য যে কোন পথই অবলম্বন করা যাউক না কেন, অবশেষে মূল ধরিতে গিয়া জ্ঞানের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইতে হয়। জ্ঞানার্জ্জনই ধর্ম্মলাভের এক-মাত্র প্রশস্ত উপায়। এক্ষণে জ্ঞান কি উপায়ে অর্জ্জিত হইতে পারে, তদ্বি-ষয়ের আলোচনা করা যাউক।

বাল্যকালে 'বোধোদয়' গ্রন্থে ইহা পাঠ করিয়াছি যে "ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ।" অর্থাৎ জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারাই মানুষের মানসক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। চক্ষু দর্শন করিতেছে, কর্ণ শ্রবণ করিতেছে, নাসিকা আঘ্রাণ করিতেছে, জিহ্বা আস্বাদন করিতেছে এবং ত্বক্ স্পর্শ করিতেছে। কিন্তু এই সমুদয়ে কি জ্ঞানলাভ করা হইল? আমরা ত অনেক সময় চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকি, অথচ কি দেখি কিছুই বুঝিতে বা বলিতে পারি না। লোকে দেখিলে কিম্বা শুনিলে বলে 'তোমার মন কোথায় ছিল?' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে নিয়োজিত না করিলে জ্ঞানলাভ ঘটিতে পারে না। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয় বাস্তবিক পক্ষে মনের দ্বার মাত্র, উহাকে 'জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ' বলিলে খাটি অর্থ প্রকাশ পায় না। মন স্বীয় অন্তর্প্রকোষ্ঠ পরিহার করিয়া ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া, যখন জ্ঞানাহরণে প্রবৃত্ত হয় তখনই মানুষের জ্ঞানলাভ ঘটিয়া থাকে। অতএব এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে 'ইন্দ্রিয় মনের দ্বারস্বরূপ; যাহা দ্বারা মন বহির্জগতে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞানাহরণ করিতে সক্ষম হয়।' এই প্রকারে আহরিত জ্ঞানকে সাধারণতঃ 'প্রত্যক্ষ জ্ঞান' বা 'বিজ্ঞান' বলা যায়। মানুষ ইন্দ্রিয় সাহায্যে বহির্জগতে মনঃসংযোগ করিয়া তাহার ক্রিয়া কলাপ প্রত্যবধান করতঃ যে সমুদয় সত্য আহরণ করিতে সক্ষম হয়, তাহাদিগের সমষ্টিকেই 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপর এক উপায়ে মানুষের জ্ঞানাহরণ ঘটিয়া থাকে; ঐরূপে আহরিত জ্ঞানকে আমি এ স্থলে 'পরোক্ষ জ্ঞান' বলিব। জগতে 'প্রকৃতি' এবং 'পুরুষ' উভয়ই বিদ্যমান আছে; প্রকৃতির অভিব্যক্তিকে বহির্জগত এবং পুরুষের অভিব্যক্তিকে অন্তর্জগত বলা যায়। বহির্জগত পর্য্যালোচনা দ্বারা যে জ্ঞান সমাহৃত হয় তাহাকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা হইয়াছে। এবং অন্তর্জগত পর্য্যালোচনা দ্বারা যে জ্ঞান সমাহৃত হয় তাহাকে সাধারণতঃ 'দর্শন' কহে, এ স্থলে তাহাকে 'পরোক্ষ' জ্ঞান বলা যাইতেছে। প্রত্যক্ষতই হউক কিম্বা পরোক্ষতঃই হউক, জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তিনটী প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হয়; যথা,—আহরণ, ধ্যান ও ধারণা। জ্ঞানকে প্রথমে শিক্ষা সাহায্যে আহরণ করিয়া লইতে হইবে, তৎপর তাহাকে ধ্যান দ্বারা মানসগোচর করিতে হইবে, তদনন্তর ধারণা দ্বারা তাহাকে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া লইতে হইবে। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াকে সাধারণতঃ 'দর্শন'

নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এস্থলে ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে অনেকে সমাহৃত জ্ঞানের ধারণাকেই অন্তর্জগত পর্য্যালোচনা বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন; এ কারণ দুইটী পরস্পর স্বতন্ত্র প্রক্রিয়াকে একই (অর্থাৎ 'দর্শন') নামে অভিহিত করা হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে, অন্তর্জগত পর্য্যালোচনার্থ মনকে আপন অন্তর্প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া বহির্জগতে প্রবেশ করিতে হয় না, অতএব পরোক্ষ জ্ঞান কেবলমাত্র ধ্যান ও ধারণার বিষয়ীভূত এবং তদনুধাবন দ্বারা আয়ত্তীকৃত করিতে হয়; তাহাতে আহরণ প্রক্রিয়াটি আদবেই বিদ্যমান থাকে না। বাস্তবিক কি তাই? এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অন্তর্জগত পুরুষের অভিব্যক্তি। প্রকৃতি যেরূপ ইন্দ্রিয়গোচর হয় পুরুষ সেরূপ হয় না। কিন্তু প্রকৃতিতে পুরুষের কার্য্য ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে; ইহাকে সাধারণতঃ ভাষায় 'শক্তি' কহে। এই শক্তির জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে হইলে, প্রকৃতিতে তাহার কার্য্য পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কোন ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে, এবং কেহই বা আমাকে ঘৃণা করে, কাহার প্রাণে কোন্ চিত্তবৃত্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা ইন্দ্রিয় নিরোধ দ্বারা ধারণা করিবার উপায় নাই। (আমি এস্থলে 'যোগ' প্রণালীকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় নিরোধকরণশীল একটী প্রক্রিয়া মাত্র মনে করিতেছি; তাহা দ্বারা যে অনাহরিত জ্ঞান আয়ত্তীকৃত হইতে পারে, ইহা আমি স্বীকার বা সিদ্ধান্ত করিয়া লইতেছি না)। এইরূপ যাবদীয় অন্তর্জগতের কার্য্যই প্রকৃতিতে শক্তির অভিব্যক্তি দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়; অতএব জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, অন্তর্জগত এবং বহির্জগত উভয়তঃই জ্ঞানকে আহরণ করিয়া লইতে হয়। জ্ঞান আহরিত হইলে, মন তাহাকে অন্তর্প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া গোপনে তাহার অন্তর্বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুভূতি লব্ধ করিয়া লয়; ইহারই নাম 'ধ্যান'। ধ্যান কাহারও নিকট নূতন জিনিস নহে; বাল্যকালে পাঠ অভ্যাস করিবার সময় একটি কথাকে বারে বারে আওড়াইয়া মুখস্থ করিয়া লওয়া ধ্যানের প্রথম সোপানমাত্র। এইরূপে অনুভূত এবং অভ্যস্ত হইয়া গেলে, তখন জ্ঞান মানুষের চেতনার সহিত মিলিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি করে; ইহাকেই ধারণা 'বলা' হইয়াছে। মনে করা যাউক একটি লোক জ্যোতির্ব্বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে; তাহার প্রথম কার্য্য গগনে জ্যোতিষ্কের চলাচল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার ফলকে গণিত

যন্ত্রে পিষিয়া তাহা হইতে প্রকৃতিসম্ভূত জ্ঞান আহরণ করা; তদনন্তর ঐ আহৃত জ্ঞানকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠে সমাবিষ্ট করিয়া তাহাকে অনুভূতির আয়ত্তাধীন করিতে হইবে। বারম্বার অনুভূতি বা ধ্যানের কবলে নিষ্পেষিত হইয়া তাহা ক্রমশঃ জীবনের সহিত এমন ওতঃপ্রোত হইয়া যায় যে, তখন আর তাহাকে আহৃত জ্ঞান বলিয়া উপলব্ধি না করিয়া আপন চেতনার অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করা হয়। ইহাকেই জ্ঞানলাভ বলা যায়। গ্যালিলিও পৃথিবীর ঘূর্ণন মত প্রচার করণাপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি যখন কারামুক্ত হইলেন তখন কারাগারের বহিঃপ্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় সজোরে ভূতলে পদাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে "এই ত পৃথিবী ঘুরিতেছে, আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছি।" এবম্বিধ উপলব্ধিকেই জ্ঞানলাভ বা 'দর্শন' বলা যায়।

গতবারে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে তাহা এই উপলব্ধ জ্ঞান। মানুষ বহির্জগতই পর্য্যালোচনা করুন কিম্বা অন্তর্জগতই পর্য্যালোচনা করুন, উভয় স্থলেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানকে বহির্জগত হইতে আহরণ করিয়া লইয়া 'দর্শনের' আয়ত্ত করিতে হইবে, তাহা হইলেই উপলব্ধি ঘটিবে। এস্থলে জ্ঞানাহরণের অকুশলতা হেতু যে একটি শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হয় তাহা বলা আবশ্যক। মন যদি জ্ঞান আহরণার্থ বহির্জগতে প্রবেশ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, অথচ ইন্দ্রিয়দ্বার অবারিত থাকাতে বাল্যকাল হইতে যে সকল জ্ঞান আপনা আপনি অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশলাভ করে, তাহাদিগের ধ্যান ও ধারণাতে অভিনিবিষ্ট হয়, অথবা যদি কথঞ্চিৎ জ্ঞান আহরণ করিয়া তদনন্তর অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক অর্জ্জিত জ্ঞানেরই পৌনঃপুনিক ধ্যান ধারণাতে নিয়োজিত থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে কেবল উপলব্ধ জ্ঞানের মাত্রা হ্রস্ব হয়, তাহা নহে; উহা দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রবল হইয়া উঠে। ইহাই অহঙ্কারের উৎপত্তির কারণ।

অতএব সচরাচর দেখা যাইবে যে, যে স্থলে জ্ঞানাহরণে শৈথিল্য কিম্বা বিরক্তি ঘটিয়াছে অথচ মন ধ্যান ও ধারণা হইতে নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থিতি করিতেছে না, সে স্থলেই অহঙ্কারের উৎপত্তি এবং বিবৃতি ঘটিতেছে। মানুষ সর্ব্বক্ষণ কেবল নিজের দোষ দর্শনে উন্মুখ থাকিতে পারে না, আপনাকে আপনি পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলেই দোষ এবং গুণ উভয়েতেই মনঃসংযোগ অতি স্বাভাবিক। একারণ আত্ম-চিন্তায় একটি অবশ্যম্ভাবী ফল

'অহঙ্কার'! জগতে সক্রেতিস্ অতি অল্প, এ কারণ অহঙ্কার এত বেশী। পূর্ব্বে যে ভাষা ও সংজ্ঞা সকল ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা সহজে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বহির্জগত হইতে জ্ঞানাহরণের নামই 'বিজ্ঞান'; (যদি তাহা প্রকৃতিবিষয়ক হয় তবে তাহাকে 'পদার্থ-বিজ্ঞান' বা 'প্রকৃতি-বিজ্ঞান' বলা যাইবে, এবং যদি তাহা পুরুষ বিষয়ক হয় তবে তাহাকে 'মনোবিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হইবে।) আহরিত জ্ঞানকে ধ্যান ও ধারণার আয়ত্তীকরণের নাম 'দর্শন'। যে স্থলে বিজ্ঞানহীন দর্শনের প্রাচুর্য্য তথায়ই অহঙ্কারের প্রাদুর্ভাব! ইহার দৃষ্টান্ত হিন্দু পণ্ডিতদিগের (বিশেষতঃ 'বৈদান্তিক' অর্থাৎ বিজ্ঞানবিহীন বেদান্তাধ্যায়ী) মধ্যে অতি সাধারণ। অপরদিকে দর্শনবিহীন বিজ্ঞানও যে একান্ত অসম্ভাবনীয় ব্যাপার তাহা নহে;—এমন লোক অপ্রতুল নহে যিনি সূর্য্যকে জড়পিণ্ডরূপে জ্ঞানায়ত্ত করিয়া গিয়া পরক্ষণেই তাহাকে আবার "জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং" ইত্যাদি রবে সম্ভাষণ ও অভিবাদন করিতেছেন।

গতবারে আমরা ধর্ম্মকে জ্ঞানমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা জ্ঞানকে বিজ্ঞান ও দর্শন এই দুই অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছি এবং ইহাও দর্শাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বিজ্ঞান হইতে দর্শনে সমারূঢ় না হইলে জ্ঞানের উপলব্ধি ঘটে না। জ্ঞানের উপলব্ধি না ঘটিলে তাহা ধর্ম্মের মূল হইতে পারে না। ইহাও দেখিতে পাইয়াছি যে, বিজ্ঞানবিহীন দর্শন অন্ধের ন্যায় আপনাতেই আপনি নিমজ্জিত হইয়া অন্ধকারে বা অহঙ্কারে জীবন যাপন করে। আমি সোজাসুজি ধর্ম্মকে এক এক পা করিয়া পিছাইয়া আনিয়া বিজ্ঞানের স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া দিতেছি; কিন্তু বিজ্ঞানের যে ধর্ম্মবিরোধিতা বিষয়ে একটী অপবাদ রহিয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত ক্ষালন করিতে চেষ্টা করি নাই। আগামী বারে বিজ্ঞানকে ধর্ম্মবিরোধিতা দোষ হইতে বিমুক্ত করিয়া, তাহাকে ধর্ম্মের মূলে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিব এবং ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইব যে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাই একমাত্র সত্য এবং স্থিতিশীল ধর্ম্ম হইবে।

গতবারে জ্ঞানাশ্রিত সংস্কারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সমাজবদ্ধ সংস্কার জ্ঞানের আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইতে না পারিলে ঐ সমাজে কুসংস্কারের অভ্যুদয় হইবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমান

প্রবন্ধে আমরা ইহা দেখিয়াছি যে, দর্শন বিহীনবিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানবিহীন দর্শন কিম্বা উভয়েরই বিহীনতা হইতেই মানুষের চিত্তবিভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে। এই সকল কারণ যে সমাজে বর্ত্তমান সেই সমাজে জ্ঞানের অধোগতি হেতু উপলব্ধির অভাব ঘটিতে আরম্ভ করে। যখন উপলব্ধি সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার ফল সংস্কারের উপর গিয়া প্রতিফলিত হয়। ইহাই সংস্কারের কুভাবাপন্ন হইবার একমাত্র কারণ। কুসংস্কার কোন সমাজে আপনি জন্মাইতে পারে না। জ্ঞানাশ্রয়ে সংস্কারের অভ্যুদয় হইলে তাহা যখন সামাজিক ব্যক্তিবর্গের উপলব্ধির সংস্পর্শে আনীত হয় তখন তাহাদিগের উপলব্ধির সঙ্কীর্ণতা ঘটিলেই তাহা কুভাবাপন্ন হইতে আরম্ভ করে। উপলব্ধিকে সংস্কৃত রাখিবার একমাত্র উপায় 'দর্শন' এবং দর্শনকে সঞ্জীবিত রাখিবার একমাত্র উপায় বিজ্ঞান। এইরূপে জ্ঞান ও সংস্কার উভয়কেই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে উপস্থাপিত করিলে ধর্ম্মকে একান্তই বিজ্ঞানের স্কন্ধে আনিয়া ফেলিতে হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত।

দাসাশ্রমের পঞ্চম বার্ষিক সভার কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৬ সালের ২০শে জানুয়ারী সোমবার বেলা ৫টার সময় এলবার্ট হলে দাসাশ্রমের পঞ্চম বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। মৌলবী সিরাজ উল্ ইস্লাম খাঁ বাহাদুর হাইকোর্টের উকীল এবং ভূতপূর্ব্বইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে অনেক গণ্য মান্য ভদ্রলোক, জমিদার এবং ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। স্থানাভাবে অনেককে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে হয়। সভাপতির অনুমতি ক্রমে দাসাশ্রমের পূর্ব্ব বৎসরের সম্পাদক বাবু মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী গত চারি বৎসরের কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। তাহার সার মর্ম্ম এখানে প্রদত্ত হইল।

১৮৯১ সালের ২৭এ জুন বসিরহাট সবডিবিজানের অন্তর্গত জালালপুর নামক গ্রামে দুটি নগণ্য যুবক এই দাসাশ্রম প্রথমতঃ স্থাপন করেন। কিছুদিন পরে দুইটী যুবক কলিকাতায় আসিয়া স্কুলের বালকগণের "রিলিফ ফ্রেটারনিটী" নামক সভার সঙ্গে এক যোগে রোগীদের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন যে, এমন অসহায় রোগী অনেক আসিয়া

পড়ে যে, নিজেদের একটা ঘর না হইলে এ সকল রোগীর সেবার বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। তদনুসারে ১০২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট ভাড়া করা হয়। এই সময় হইতে দাসাশ্রমের প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথম বৎসর কয়েক মাস মাত্র কার্য্য হয়, তাহাতেই এখানে ১১টি রোগী আশ্রয়-প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ১২৮ জন রোগী আতুর অনাথ বালক বালিকা এবং পতিতা রমণী দাসাশ্রমের সেবালয়ে আশ্রয়প্রাপ্ত হয়। এই বৎসরে ৮টী দাতব্য চিকিৎসালয় মফঃস্বলের স্থানে স্থানে স্থাপিত হয় ও তাহাতে ১০৫৭ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ আয় ২২৩৭ টাকা ব্যয়—২২৩০৸৵০। এই বৎসরের প্রারম্ভ হইতে "দাসী" নাম্নী একখানা মাসিক পত্রিক বাহির হইতে থাকে, ইহার লাভ দাসাশ্রমের খরচার্থ ব্যয়িত হয়। এই দাসী হইতে এবৎসরে ৪৭৮৷৷৵১০ সাহায্য পাওয়া যায়। তৃতীয় বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮৭ জন রোগী ও আতুর এই সেবালয়ে আশ্রয়-প্রাপ্ত হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিতে ৩৩৬০ জন রোগী হয়। এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ আয় ২৯৫৩৶৫, মোট ব্যয় ২৯৫৩৴৫। দাসী এ বৎসর ৫০৩৸৴১৫ সাহায্য করে। চতুর্থ বৎসরে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নানা গোলমাল হেতু উন্নতিতে কিছু বাধা পড়ে। এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮ জন রোগী ও আতুর সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। এবৎসরে খরচ অল্প হইবে বলিয়া সেবালয় গিরিডিতে উঠিয়া যায়। রোগী ও আতুরগণ এত দূরদেশে যাইতে সম্মত হইত না বলিয়াই এবার সংখ্যা এত অল্প হইয়াছিল। এই সকল কারণে সেবালয়ের কার্য্যকারকগণ আবার সেবালয় উঠাইয়া কলিকাতায় আনিয়াছেন। এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ আয় ২৪৮৯৸৵১০ এবং মোট ব্যয় ২৪৮০।৵৭৷৷। "দাসী" ২১৬৸৵৭৷৷ সাহায্য করেন। এই ত গেল দাসাশ্রমের কার্য্যবিবরণী। বর্ত্তমানে ইহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। ১ম গৃহহীন অনাথ আতুর-গণকে সেবালয়ে রাখিয়া ভরণপোষণ এবং সেবা শুশ্রূষা, ২য় অসহায় দরিদ্র রোগিগণের সেবার ও চিকিৎসার সাধ্যমত ব্যবস্থা।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে হাইকোর্টের উকীল বাবু কালি-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল এবং মিঃ এ, সি, রায় তেজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। কালি বাবু সকলকে অনুরোধ করেন, যেন সকলেই এই সভাস্থল হইতে মনে করিয়া যান যেন কোনও বিশেষ সংখ্যক মুদ্রার জন্ত তাঁহার দাসাশ্রমের নিকট ঋণী রহিলেন। সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বার্ষিক সভার কার্য্যবিবরণী ২রা ফেব্রুয়ারীর বঙ্গনিবাসীতে, ১লা ফেব্রুয়ারীর সঞ্জীবনীতে বিশেষভাবে বাহির হইয়াছে। সেই সপ্তাহের মুসলমান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র "মিহির ও সুধাকর" দাসাশ্রমের অন্যান্য বিবরণের পর বলিতেছেন "এই মহৎ সৎকার্য্যে সাহায্য করা প্রত্যেক ধর্ম্মভীরু বড়লোকের একান্ত কর্ত্তব্য।"

সঞ্জীবনী কার্য্য-বিবরণী মুদ্রিত করিয়া বলিতেছেন—"এই কার্য্য-বিবরণী হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে, দাসাশ্রমের উদ্দেশ্য কেমন মহৎ। কিন্তু বঙ্গবাসিগণ এমন উন্নত কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন না, কালীচরণ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন, প্রত্যেকের প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, আমি দাসাশ্রমের নিকট কোনও বিশেষ সংখ্যক টাকার জন্য ঋণী। এক দিনে পারি, এক বৎসরে পারি আর আমরণ পারি দাসাশ্রমের সেই ঋণ আমাদিগকে শোধ করিতেই হইবে। প্রত্যেক ভারতবাসীর কালীচরণ বাবুর এই কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। নানা কারণে ৪র্থ বর্ষে দাসাশ্রমের ৮০০৲ টাকা দেনা হয়, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় এ দেনা এখনও শোধ হইতেছে না। দাসাশ্রম এক্ষণে ভারতবাসীর নিকট ১৫০০০৲ টাকার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা হইলে দাসাশ্রমের সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া, একটী গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারিবে; এবং দাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠিত এলোপ্যাথিক ঔষধালয় ঋণ মুক্ত হইয়া দাসাশ্রমকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে। ইহাঁরা আরও ২৫০৲ টাকা মাসিক চাঁদা জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই দাসাশ্রমের দ্বারা দেশের অন্ধ, অনাথ, আতুরগণের এবং গৃহহীন, আত্মীয়বিহীন রোগিগণের যে মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে, তদ্বিষয় স্মরণ করিলে মাসে ২৫০৲ টাকা চাঁদা এবং এককালীন ১৫০০০৲ টাকা কিছুই নয় বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই কোটি কোটি ভারতবাসিগণের মধ্যে কি এমন ১৫০০০ লোক নাই যে, একেবারে একটি টাকা দাসাশ্রমের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দান করেন? কলিকাতার অগণ্য বড় লোক অথবা গৃহস্থের মধ্যে কি এমন ২৫০ জন পাওয়া যাইবে না, যাঁহারা এই অনাথ অতুরগণের এবং শত শত রোগিগণের মুখের দিকে তাকাইয়া মাসে একটি করিয়া টাকা চাঁদা দিতে পারেন? আমরা আশা করি, দানশীল উদারচেতা মহোদয়গণ দাসাশ্রমের অভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন।"

বঙ্গনিবাসীও কার্য্যবিবরণী পর্য্যালোচনার পর বলিতেছেন—"উদ্দেশ্য

ছুটি অতি মহৎ। কিন্তু দাসাশ্রমের কার্য্যকারকগণ ভগ্নাবস্থ, ঋণগ্রস্ত ও ক্লান্ত হইয়া ভারতবাসিগণের নিকটে কাতরে ভিক্ষা চাহিতেছেন, এমন কেহ কি নাই যে ইহাদের ভিক্ষায় কর্ণপাত করে? "পাঁচের লাঠি একের বোঝা।" দাসাশ্রম এ সত্য বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। দাসাশ্রম এক পয়সা হইতে আরম্ভ করিয়া মাণিকদহের জমিদার বাবু বিপিনচন্দ্র রায়ের ২৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দান সমান আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন, তাই বার্ষিক সভায় মাননীয় হাইকোর্টের উকীল বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন ভারতবাসী সকলেই মনে কর দাসাশ্রমের নিকট তোমরা সকলে কিছু কিছু টাকার জন্য ঋণপাশে আবদ্ধ। ভারতবাসী সেই ঋণ শোধের উপায় কর। এই বার্ষিক সভার এলবার্টহলে ২০শে জানুয়ারি অধিবেশন হয়। হল লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মৌলবী সিরাজ উল্ ইস্লাম খাঁ বাহাদুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় এবং মিঃ এ, সি, রায় বক্তৃতা করেন। দাসাশ্রম এই খানে ১৫০০০৲ টাকা সাহায্য পাইবার জন্য আবেদন করেন। এই টাকা হইলেই দাসাশ্রমের সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া একটী বাড়ী নির্ম্মিত হইতে পারিবে, এবং দাসাশ্রম মেডিকেলহল ও দাসাশ্রমকে সহায্য করিতে পারিবে। ইহারা ২৫০৲ টাকা মাসিক চাঁদার জন্যও আবেদন করিয়াছেন। আমরা দানশীল স্বদেশবাসিগণের নিকট ইহাদের আবেদন জানাইতেছি। বঙ্গনিবাসীর বহুসংখ্যক গ্রাহক, যদি একটী করিয়াও টাকা দাসাশ্রমকে দান করেন, তাহা হইলে দাসাশ্রম উপকৃত হয়। অসহায় রোগী ও আতুরগণকে সেবালয়ে পাঠাইয়া দিলেও দাসাশ্রম উপকৃত হইবে।"

আমাদের অভাবের কথা আর আমরা নূতন করিয়া কি বলিব। ভরসা করি নব বর্ষে আমাদের দাসাশ্রমের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ নূতন উৎসাহের সহিত দাসাশ্রমের কার্য্যে সাহায্য করিবেন।

দাসাশ্রমের নূতন বৎসরের কার্য্য-ব্যবস্থা।

এ বৎসর কার্য্য সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহার্থ পূর্ব্ব বৎসরের কমিটি আর ছয়জন নূতন ভদ্রলোককে কমিটিতে গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণ দাসাশ্রম কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইলেন।

বাবু নীলরতন সরকার এম, এ, এম, ডি। বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম, এ, এম, বি (সম্পাদক)। বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম, এ। বাবু যদুনাথ ঘোষ এম, এ। বাবু প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস-সি। বাবু ফকির চাঁদ সাধুখাঁ এল্, এম্, এস্। বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ। বাবু ইন্দুভূষণ রায় (সেবালয়ের অধ্যক্ষ), বাবু মৃগাঙ্কধর চৌধুরী (সহকারী সম্পাদক), এবং বাবু ক্ষিরোদচন্দ্র দাস।

নূতন বৎসরের প্রারম্ভ হইতেই দাসাশ্রমের সেবালয় পুনরায় কলিকাতায় ৪৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে। এখানে আসিবার পর হইতে রোগী ও আতুর সংখ্যা ক্রমে বাড়িতেছে। আমরা আবার অসহায় রোগী-দিগকে লইতেছি। তবে সুবিধা হইলেই আমরা রোগীদিগকে কলিকাতা কালেজ হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিব। কারণ সেখানে চিকিৎসার যেমন সুব্যবস্থা হইবে এমন আর কুত্রাপি হইবার আশা নাই। আমরা এখনও অনেকগুলি আতুরকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের বন্ধুগণ ভরসা করি অনাথ আতুর পাইলেই যত্ন করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিবেন।

দাসাশ্রমের একটি গৃহ হইলেই দাসাশ্রম প্রকৃত প্রস্তাবে স্থায়ী হয় বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান কমিটি গৃহনির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তাঁহারা উপযুক্ত ট্রষ্টি নিয়োগ পূর্ব্বক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। আমরা ভরসা করি, এ সময়ে "দাসীর" গ্রাহক, পাঠক, দাসাশ্রমের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী সকলে মিলিত হইয়া একবার সমবেৎ চেষ্টা করুন যাহাতে দাসাশ্রম স্থায়ী হইতে পারে।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

১। বাবুরাম ২। রসিক চাঁদ ৩। ছৈরন্নুন্না ৪। দেবিয়া ৫। দুর্গাতারিণী ৬। স্বর্ণ ৭। নবদুর্গা ৮। ফুলমণি ৯। হীরামণি ১০। রাজেশ্বরী ১১। পার্ব্বতী।

হীরামণি। উড়ীষ্যাবাসিনী; দুতোলার ছাদের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া অত্যন্ত অঘাতিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল দেব তাহাকে ১৮ই জানুয়ারি তারিখে এখানে দিয়া যান। এখানে আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছে। ঈশ্বর কৃপায় দিন দিন ভাল হইতেছে।

রাজেশ্বরী। পটলডাঙ্গা নিবাস; জাতিতে বৈষ্ণব। কেহ নাই, নিরাশ্রয়া প্রায় সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়াছে জ্বর আছে এই ভাবে এখানে ২২এ জানুয়ারি তারিখে কোন ভদ্রলোক কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। ভগবানের কৃপায় দিন দিন আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আর ২। ৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে।

পার্ব্বতী। দক্ষিণরাঢ়ি কায়স্থ কন্যা; নিবাস উড়িষ্যা। ২৪ পরগনার অন্তর্গত বশির হাটে কোন ভদ্র পরিবারের মধ্যে ছিল। গত চৈত্র মাস হইতে জ্বর পেটের ব্যায়রামে আক্রান্ত হয়। প্রায় ১১ মাস এইরূপ ব্যায়রামে ভুগিয়া ২৯শে জানুয়ারি তারিখে এখানে প্রেরিত হয়। এখন ইচ্ছাময়ের কৃপায় কিঞ্চিৎ ভাল আছে।

আয় ব্যয়।

গিরিডি।

জমা

মাঃ বাবু ফকির চাঁদ সাধু খাঁ ৬০৲, মনি অর্ডার ২০৲, দান ৩৲, চাঁদা ১৲, মোট ৮৯৲।

খরচ

কর্ম্মচারীর বেতন ১৩৸০, গোয়ালা ২৷৶০, বাটী ভাড়া ২২৲, ধোপা ১৲, গিরিডি হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত আসিবার খরচ ৩৩৲, মোট ৭২৷৶০, সংসার খরচ ১৬৷৶০।

কলিকাতা।

মাঃ বাবু মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী সংসার খরচ ৩১৲, দফে ১০৲, দফে ১৫৲, দফে ৩৲, দফে ১০৲, মোট ৩৮।

মোট জমা ৮৯৲ + ৩৮৲ = ১২৭৲।

মোট খরচ ৭২৷৶ + ১৬৷৶ + ৩১৲ = ১২০। হস্তেস্থিত ৭৲।

দান বাবু শক্তিকান্ত ভট্টাচার্য্য ২৲, বাবু হরিদাস দে একজন রোগীর দুগ্ধের দাম ১৲।

দানপ্রাপ্তি।

(১লা জানুয়ারি হইতে ৩১এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত)

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত দান গুলি বিগত মাসে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান দাতাগণের কল্যাণ সাধন করুন।

মাসিক চাঁদা।

শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ২৲, A son, C/o Babu Girindra Nath Ghose অক্টোবর হইতে জানুয়ারী ১৲, বাবু হারাধন চট্টোপাধ্যায় ডিসেম্বর ।০, বাবু শ্রীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী জানুয়ারী ।০, বাবু কেদারনাথ দাস ডিসেম্বর ।০, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস নবেম্বর ও ডিসেম্বর ২৲, বাবু নবীনচন্দ্র বড়াল ডিসেম্বর ১৲, ১৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ছাত্রগণ ডিসেম্বর ॥০, বাবু প্রসন্নকুমার বসু সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর ১৲, বাবু যদুনাথ বসাট জানুয়ারী ১৲, ৪।২ নং ছকু খানসামার গলির ছাত্রগণ ডিসেম্বর ॥০, A lady C/o Babu Sreenath Das ডিসেম্বর ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ডিসেম্বর ।০, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ডিসেম্বর ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র ডিসেম্বর ১৲, বাবু বঙ্কুবিহারী মিত্র ডিসেম্বর ।০, বাবু অনাথনাথ দেব ডিসে ১৲, বাবু দিনেশচন্দ্র চৌধুরী ডিসে ॥০, বাবু বিপিনবেহারী রায় চৌধুরী ডিসে ।০, বাবু বিপিনবেহারী রায় চৌধুরী জানুয়ারী ১৲, বাবু শশীভূষণ স্থানপতি, জলপাইগুড়ি, নবেম্বর ও ডিসে ২৲, মোট মাসিক চাঁদা ১৮৲।

এককালীন দান।

বাবু সত্যব্রত সামশ্রমী ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র দাস পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২০৲, বাবু সত্যপ্রিয় দেবের পরলোকগতা মাতার বার্ষিক দান ৫৲, শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ ১৲, G. C. Bose Esqr. ১৲, শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী ৸৵০, 'কেহ' ভ্রাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, ডাক্তার অহিরুদ্দিন আহম্মদ ১৲. ২০ নং পটুয়াটোলার ছাত্রগণ ।৵০, বাবু আশুতোষ মিত্র G. E. ১৷, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ১৲. বাবু দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১৷, বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় ও বাবু হরিহর রায় ৵০, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২৲, বাবু পূর্ণচন্দ্র সিংহ ১৲, ৬৭নং বেচুচাটুর্জ্জি ষ্ট্রিটের ছাত্রগণ।০, বাবু পিয়ারীমোহন দত্ত ৶০, ৮১ নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনের ছাত্রগণ ৷৶০, A fraind of Dasasram ১৲, ১১নং মুসলমান পাড়া লেনের ছাত্রগণ ।০, মুন্সি আবদুল আজিজ /০, ১০৭নং ওল্ড বৈঠকখানা রোডের ছাত্রগণ ৵০, ৬৭নং ঐ ঐ ছাত্রগণ ৷১০, ১০০৷২ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট দাসাশ্রম সাহায্য ভাণ্ডার ৷৵১১, বাবু শ্রীকৃষ্ণ বসু ১৲, ৬৩৷১নং মেছুয়াবাজার রোড দাসাশ্রম সাহায্য ভাণ্ডার ৶১০, ৬৩১নং মেছুয়াবাজার রোডের ছাত্রগণ।০, রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর ৫৲, বাবু অক্ষয়নাথ রায় মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৩৲, একজন বন্ধু ৩৲, বাবু গৌরলাল রায় কাকিনিয়া, শীত বস্ত্রের জন্য ৪৲, শ্রীমতী নবশশী সেন গুপ্ত ৷০, বাবু শ্রীনাথ দাসের দ্বিতীয়া কন্যা ২৲, ১২০৷১নং মসজিদ্ বাড়ী ষ্ট্রিট দাসাশ্রম সাহায্য ভাণ্ডার ।/১০, Mrs. A. M. Bose ১৫৲, বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৲. দাসাশ্রমের বন্ধু মাঃ বসন্তকুমার লাহিড়ী ৫৲, বার্ষিক সভায় দানাধারে প্রাপ্ত ২৸২৷০, আবদুল আজিব ৷০, শ্রীমতী জগত্তারিণী মৈত্র ২৲, শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী ১৲, বাবু রতিকান্ত মজুমদার ১৲, একজন বন্ধু ১৷, শ্রীমতী নিস্তারিণী চক্রবর্ত্তী ২৲, বাবু কালিনারায়ণ গুপ্ত ১৲, দানাধারে প্রাপ্ত ১৷০, বাবু চারুচন্দ্র রায় ১৲, বাবু ফকিরচাঁদ সাধু খাঁ ১৲, বাবু ভূপতিনাথ বসু ৷৶১৫, শ্রীমতী সরোজিনী মিত্র ১৷, শ্রীমতী নলিনী দাসী ১৲, বাবু শ্রীচরণ রায় ১৲, বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র ১৲, বাবু হেমচন্দ্র গুপ্ত ৷০, বাবু মোণিমোহন সেন ১৷, বাবু রাজচন্দ্র মজুমদার ২৲, বাবু রামগোপাল রায় ৷০, বাবু নবীনকৃষ্ণ সেন গুপ্ত ২৲. A friend ১৲, বাবু নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ৫৲. A friend বন্ধুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲. বাবু অশ্বিনীকুমার দাস ৮৲. রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী, কাকিনিয়া ৫০৲, মৃত বাবু অক্ষয়কুমার দাসের স্ত্রী স্বামীর আত্মার কল্যাণার্থ ১৲, অমরনাথের জননী, মৃত পুত্রের আত্মার কল্যাণার্থ ১৲, শ্রীমতী ক্ষেমদাসুন্দরী মিত্র ৪৲, শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঘোষ ২৲, J. T. Sunderland, London, ৫৲, রাজীবলোচন দাস ৷৫। মোট ১৮১৷৶২৷০।

মোট আয়।

মাসিক চাঁদা ১৮৲, এককালীন দান ১৮১৷৶২৷, পুস্তক বিক্রয় ৷৵০, পূর্ব্ব মাসের স্থিত ৷৶৫, দাসীর সাহায্য ৮৪৲, মোট ২৮৪৷৵৭৷০।

মোট ব্যয়।

সেবালয় ১২৭৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৩০৷, গাড়িভাড়া প্রভৃতি ২৷৶১৫, টিকিট ১৷৵০, কলিকাতার অগ্রিম বাটি ভাড়া গৃহ মেরামতি বাবৎ ১৫৲, আদায়কারীর খরচ ২৷৶১০, বার্ষিক সভা ও উৎসবাদির খরচ ২৩৷৶০, মাল ভাড়া ৮৲, অন্যান্য ৷৵৭৷০, কার্য্যকারক আসার খরচ ১০৷৶০, মোট ২১৬৷৶১২৷০।

আয় ব্যয়।

মোট আয় ২৮৪৷৵৭৷০, মোট ব্যয় ২১৬৷৶১২৷০, হস্তেস্থিত ৬৭৷৶১৫।

বস্ত্রাদি।

৺ দুর্গারাণী দাসীর স্মরণার্থ ৫ গজি বোম্বাই চাদর ৪ জোড়া, ৬ গজি বোম্বাই চাদর ১ জোড়া। বাবু শ্রীনাথ দাসের দ্বিতীয় কন্যা নূতন বোম্বাই চাদর ১ জোড়া। বাবু রামচন্দ্র মজুমদার জ্যাকেট ২, প্যান্টুলেন ৩, চাপকান ১, কম্ফর্টার ১, পিরান ১, হাতকাটা ১।

গুপ্তপ্রেস্ হইতে একখানি নূতন বৎসরের পঞ্জিকা।

দাসী

সত্যধর্ম্ম ও সমাজ।

সত্যের সম্মাননা ও অসত্যের অবমাননাকে ধর্ম্ম কহে। সত্য উপলব্ধি দ্বারা লাভ করিতে হয়, এবং উপলব্ধি জ্ঞানমূলক। সকল মানুষের জ্ঞান সমপরিমাণবিশিষ্ট নহে, মানুষের শিক্ষাভেদে অর্জ্জিত জ্ঞানেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে; জ্ঞানের বিশিষ্টতা হেতু মানুষের উপলব্ধিরও বৈষম্য জন্মায়; একারণ জগতে লোকভেদে সত্যের নানাপ্রকার বিকাশ ও তদনুযায়ী নানা-জাতীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। সকলেই জ্ঞাত আছেন এক 'প্রেম' কথাটীকে নানা ভাবে বুঝিয়া লওয়াতে জগতে খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ, তাঁহাদের স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে প্রেমের বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি হইতে বিভিন্ন প্রকার সত্যলাভ ও প্রচার করিয়াছিলেন; তাই ঐ সকল ধর্ম্ম পরস্পর হইতে এত স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার ঐ সকল ধর্ম্মের অনুচরগণ আরও বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি হেতু পূর্ব্বার্জ্জিত সত্য হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া নূতন সত্যের প্রচারে যত্নবান হইতেছেন। জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতানুসারে নবার্জ্জিত সত্যেরও উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটিতেছে এবং এই কারণে মহাজন-প্রচারিত ধর্ম্মেরও স্থলবিশেষে উন্নতি বা অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। খৃষ্ট প্রচারিত সত্য রোমান পোপ একভাবে উপলব্ধি করিলেন এবং মার্টিন লূথর অপরভাবে উপলব্ধি করিলেন; ইহা হইতেই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের অধঃপতন ও প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল। বুদ্ধদেব কীটহিংসা-পর্য্যন্ত নিবারণ করিতে সক্ষম করিয়া আপন প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান জৈন সম্প্রদায় বুদ্ধের দোহাই দিয়া কীটহিংসাতে বিরত থাকিলেও নরহিংসা তাহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হয়ত বুদ্ধদেব পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের হিংসাকে পাপ বলিয়া উল্লেখ করিতে গিয়া নরজাতির কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন;—হয়ত তিনি ইহা ভাবিয়াছিলেন যে কীট পতঙ্গের হিংসাকে যাহার পাপ বলিয়া ধারণা হইবে, তাহার পক্ষে

নরহিংসা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু বুদ্ধের মত প্রেমের উপলব্ধি লইয়া সকল লোক জন্মাইল না; এক্ষণকার জৈন সম্প্রদায় হয়ত মনে করে যে বুদ্ধ যখন নরহিংসার বিষয় উল্লেখ করেন নাই, তখন তাহাতে পাপ না থাকাই সম্ভব! এইরূপে জ্ঞানের তারতম্যানুসারে উপলব্ধির বিশিষ্টতা হেতু ধর্ম্মের উত্থান ও পতন সংঘটিত হইতেছে এবং নানাজাতীয় নবধর্ম্মেরও অভ্যুদয় হইতেছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে ধর্ম্মকে জ্ঞানাশ্রিত না করিয়া বিশ্বাসমূলক করিলেই সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হয়। বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়মূলক; অতএব যে সত্য আত্মপ্রত্যয় দ্বারা উপলব্ধ হয়, তাহা অনায়াসে গ্রাহ্য হইতে পারে। এস্থলে একটী বিবেচনার কথা আছে;—সকল বিশ্বাসই কি আত্মপ্রত্যয়মূলক? বিশ্বাস কি জ্ঞানমূলক হইতে পারে না? কোন বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়মূলক এবং কোনটী জ্ঞানমূলক তাহা কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে? আত্মপ্রত্যয়মূলক বিশ্বাস মানুষের আদৰেই জন্মায় কিনা? একটী বলিতে গিয়া, ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বিবেচনার কথা বলিয়া ফেলিলাম; কিন্তু আমার ধারণা হয় মানুষের অধিকাংশ বিশ্বাসই সংস্কারমূলক। মানুষ আত্মপ্রত্যয় নাম দিয়া সংস্কারকে ভিত্তিরূপে খাড়া করিয়া, তাহার উপর সত্যের ঘর বাঁধেন ও তাহাতে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপ ধর্ম্মের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী নহে। সংস্কার 'কু' ও 'সু' উভয়ই হইতে পারে; তদনুসারে ধর্ম্মের দুইটী বিভিন্ন প্রকার বিশিষ্টতা জন্মায়। চৈতন্যদেব ভক্তির স্রোতে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহারই শিক্ষা "ভক্তিতে মুক্তি" বঙ্গবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; তিনি ভক্তিকে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; এবং বিশ্বাস সংস্কারাশ্রিত। তাই সংস্কারের স্রোতে পড়িয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম 'সু' ও 'কু' উভয় ভাবাপন্ন হইয়াছে, এবং বঙ্গবাসীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় নহে। বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মের চাকচিক্য আছে; তাহা অতি সরস, অতি মৃদু; তাহা যে কেবল নিজে কোমল তাহা নহে, যাহার সংস্পর্শে আসে তাহাকেও কোমল করে; অধিকন্তু তাহার আয়ত্তীকরণে আয়াস অধিক করিতে হয় না। এত গুণ থাকাতেই তাহা সহজে মানুষের মন হরণ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এত গুণ সত্বেও সংস্কার তাহার মূলে থাকিয়া কীটরূপে দংশন করিতেছে। বোধ হয় অতি মৃদুতাই ইহার জীবনের একটী অন্তরায়।

কাহারও বা মতে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" মতাবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। মহাজন যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহাতে চলিলে কোন বিপদাশঙ্কা নাই। কিন্তু তাহাতেও বিবেচনার কথা রহিয়াছে;—সকল মহাজন একরূপ কথা বলেন নাই, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব জ্ঞানানুযায়ী পথ দেখাইয়াছেন। তাহাও কেবল পথের নির্দ্দেশমাত্র বলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই নির্দ্দেশ মত পথটী নিজের দেখিয়া লইতে হইবে। পথ ভোলা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়, তাহা নিজের অপরিপক্ক জ্ঞানের ফলমাত্র। এইরূপে দেখা যায় যে ধর্ম্ম ও সত্যার্জ্জনে মানুষকে প্রতিপদে জ্ঞানের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতে হইতেছে। জ্ঞান ব্যতিরেকে সত্যলাভ ঘটে না এবং সত্যোপলব্ধি, তাহার সম্মাননা ও অসত্যের অবমাননাকেই ধর্ম্ম বলা যায়।

এস্থলে একটী গুরুতর প্রশ্ন এই উঠিতেছে যে জগতে কি এমন দুইটী লোক পাওয়া যায়, যাহাদের জ্ঞানের মাত্রা সর্ব্বতোভাবে এক? তাহা যদি না হয় তবেত এই সিদ্ধান্তে আসিয়া দাঁড়াইতে হয় যে, জগতে যত জন মনুষ্য আছে ততটী ধর্ম্মও আছে। কথাটী আপাততঃ সকলের নিকট অসম্ভব মনে হইলেও বাস্তবিক তাহা মিথ্যা নহে। জগতে প্রত্যেক মনুষ্যেরই এক একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম রহিয়াছে; ঐ ব্যক্তিগত ধর্ম্মের বাহ্য প্রকটনের নামই মানব চরিত্র। যাহার ব্যক্তিগত ধর্ম্ম সংস্কারমূলক, তাহার চরিত্র সংস্কারগত; এবং যাহার ব্যক্তিগতধর্ম্ম জ্ঞানমূলক, তাহার চরিত্র জ্ঞানগত। ইহাদের মধ্যে একটী অতি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে; জ্ঞানগত চরিত্র জ্ঞানের মাত্রার সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং তাহার উন্নতি ও অবনতি জ্ঞানের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সংস্কারগত চরিত্র সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না, কারণ মানুষের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইতে বহুকাল লাগে। প্রত্যেক মানুষেরই চরিত্র সমালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, তাহার কতকাংশ জ্ঞানমূলক এবং অপরাংশ সংস্কারমূলক। যাহাদের চরিত্রে সংস্কারগত ভাব অধিক পরিস্ফুট তাহারা জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও কেবলমাত্র সংস্কার দ্বারা চালিত হইয়া জগতে আদর্শ জীবনযাপন করিয়া যাইতেছে; আবার যাহাদের চরিত্রে সংস্কার হইতে জ্ঞানের প্রাধান্য অধিকতর পরিস্ফুট, তাহারা কোন সংস্কার ব্যতিরেকে কেবল মাত্র আপন কর্ত্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হইয়া জীবনকে সুপথে চালিত করিতেছে। এই

উভয়বিধ চরিত্রেরই উপযোগিতা রহিয়াছে। সংস্কারমূলক চরিত্র কুসংস্কারের সংস্রবে আসিলে তাহাকে সুপথে রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। এস্থলে জ্ঞান-মূলক চরিত্র অনায়াসে সংস্কারের মূলচ্ছেদ করিয়া, আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে সক্ষম হয়। আবার সংস্কারবিহীন চরিত্র জ্ঞানের অভাবে একান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পাপের অন্ধকূপে নিমজ্জিত হয়। হিন্দুসমাজে সংস্কারপ্রধান চরিত্রের বহুদৃষ্টান্ত দেখা গিয়া থাকে, এবং সংস্কারবিহীন অজ্ঞানান্ধ চরিত্রেরও একান্ত অপ্রতুল নহে। যে সমাজ যত প্রাচীন তাহাতে সংস্কারের প্রাধান্য তত অধিক; এবং সমাজ না হইলে সংস্কার জন্মাইতেই পারে না। এক্ষণে সমাজ বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই এক একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম রহিয়াছে; এ কারণ জগতে দুইটা মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবে এক ধর্ম্মাবলম্বী দৃষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু আবার ইহাও দেখা যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্যের ব্যক্তিগত ধর্ম্মের একটা মুখ্যাঙ্গ ও একটা গৌণাঙ্গ রহিয়াছে। মুখ্যাঙ্গ কতকগুলি স্থূল সত্যের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়, এবং গৌণাঙ্গ ঐ সকল স্থূল সত্যের উপলক্ষণাদি দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক;—মনে কর 'ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস' একটা মুখ্য সত্য। ইহার অন্তরালে দুইটা গৌণ সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; কাহারও মতে ঈশ্বর শক্তি-স্বরূপ, এবং কাহারও মতে ঈশ্বরের 'ব্যক্তিত্ব' রহিয়াছে (এ স্থলে ব্যক্তিত্ব দ্বারা 'মনুষ্যত্ব' বুঝাইতেছে না।) এই উভয় গৌণ মতের পার্থক্য সত্ত্বেও উক্ত মতদ্বয়ের উপলব্ধিকারীদিগকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এইরূপ গৌণ সত্য বাদ দিয়া কতকগুলি মুখ্য সত্যের সমষ্টি দ্বারা একটা ধর্ম্মমত খাড়া করা যাইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি ঐ সকল মুখ্য সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উক্ত ধর্ম্মের অনুযায়ী বলা যাইবে এবং তাহাদিগের সমষ্টি ঐ ধর্ম্মানুযায়ী 'সমাজ' বলিয়া অভিহিত হইবে। এইরূপে 'সমাজ' শব্দের একটা অর্থ খাড়া করিয়া দিলে তদ্দ্বারা ইহা বুঝাইবে যে, কতকগুলি গৃহীত মতের সমষ্টিকে যে সকল লোক সত্য বলিয়া সম্মাননা করিতেছে এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধ মতের সমষ্টিকে অসত্য বলিয়া অবমাননা করিতেছে, তাহাদিগের একত্র দলবদ্ধ হওয়ার নামই 'সমাজ'। এ স্থলে কোন সমাজের গৃহীত সত্যকে ধ্রুব সত্য বলা হইতেছে না, অতএব

তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে না। যাহারা ঐ মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের নিকটই উহা তাহাদের ধর্ম্মমত বলিয়া গণ্য হইবে। অপরের নিকট তাহা অসত্য বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া আশ্চর্য্য নহে; সে স্থলে ঐ মত ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাই জগতে বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তির কারণ। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, এক সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মতের বিশ্লেষণ ঘটাতে ঐ সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। সমাজ একবার গঠিত হইয়া গেলেই তাহাতে সংস্কার জন্মাইতে আরম্ভ করে, ইহার জন্য কাহাকেও আয়াস করিতে হয় না। দশজন লোক একরূপ বিধি করিয়া তন্মতে চলিতে সঙ্কল্প করিলে তাহাদের পরপুরুষেরা ক্রমে ঐ সকল বিধিকে কর্ত্তব্যের বিধান বলিয়া গণ্য করিবে। কোন কোন সমাজে এই সকল বিধান লিপিবদ্ধ হইয়া পরপুরুষদিগের পথপ্রদর্শক হয়; ইহাই বেদ, পুরাণ, মনুসংহিতাদি হিন্দুশাস্ত্রীয় গ্রন্থ, এবং বাইবেল কোরাণাদি অপর ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ। এ স্থলে ইহা লক্ষিত হইবে যে, সকল সংস্কারেরই আরম্ভ জ্ঞান-মূলক; কিন্তু তাহা একবার সংস্কারের পদবীতে আসিয়া দাঁড়াইলে সাধারণতঃ তাহা জ্ঞানাশ্রিত না থাকিয়া আপনাআপনি চলিতে থাকে। তখনই তাহার 'সু' ও 'কু' দুইটী পথ প্রসারিত হইয়া পড়ে। সমাজ গঠিত হইলেই সংস্কার অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সংস্কার জ্ঞানের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলেই ঐ সমাজের অধঃপতনের পথ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে। তাই সামাজিক ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য যাহাতে সমাজবদ্ধ সংস্কার জ্ঞানের আশ্রয়ে জন্মাইতে এবং তদনুসারে চালিত হইতে পারে। সংস্কার ভিন্ন সামাজিক জীবন তিষ্ঠিতে পারে না, কারণ কোন সমাজে সকল ব্যক্তিকে সমজ্ঞান-বিশিষ্ট পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব সংস্কার না থাকিলে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের চরিত্রের সমতা রক্ষা হইতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মসমাজে অতিশয় পরিস্ফুট। ব্রাহ্মসমাজ নূতন সমাজ, তাই তাহাতে এখনও সংস্কার সম্যক জন্মাইতে সময় পায় নাই; এ কারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এখনও প্রচুর পরিমাণে চরিত্রের অসমতা বিদ্যমান রহিয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রবন্ধে জ্ঞানাশ্রিত সংস্কার এবং জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম ও তদাশ্রিত সমাজের বিষয় আলোচিত হইবে।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র।

চন্দ্রশেখর—ঘটনাবৈচিত্রে, দৃশ্যবৈচিত্রে, বর্ণনবৈচিত্রে, চরিত্রবৈচিত্রে চন্দ্রশেখরের মত উপন্যাসের সংখ্যা বঙ্গ সাহিত্যে নিতান্ত অল্প। চন্দ্রশেখরে দুইটি উপন্যাসভাগ একত্র বিজড়িত। কোথায় রত্ন-মণি-মাণিক্য-মোহন, বিলাসতরঙ্গ-ভঙ্গ-প্লাবিত নবাবের অন্তঃপুর; আর কোথায় শাস্ত্রচর্চ্চারত স্থিরচরিত্র, ধীরবুদ্ধি, উদারস্বভাব চন্দ্রশেখরের কুটীর!! বড় ও ছোটর মিলনের পুণ্য প্রয়াগক্ষেত্র চন্দ্রশেখর। কিন্তু বড় কে? ধনে জনে নবাব বড়, কিন্তু মনুষ্যত্বে চন্দ্রশেখর কত বড়! আবার মুসলমান নবাবের বিলাস-পাপপঙ্কিল অন্তঃপুরে যে শতদল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহার তুলনা কোথায়? দলনী শৈবলিনী অপেক্ষা কত বড়। এই গ্রন্থান্তর্গত চরিত্রগুলির মধ্যে চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, রামানন্দস্বামী, শৈবলিনী ও দলনী এই কয়টিই প্রধান।

চন্দ্রশেখর আধ্যাত্মিক বীর। তাঁহার প্রবল জ্ঞানপিপাসা, অত্যুদার হৃদয়, দুর্ল্লভ মহত্ব, এই সকল একাধারে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব না হইলেও সুলভ নহে। এই একত্রীকরণেই চরিত্রের পূর্ণতা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চন্দ্রশেখর মানব ভিন্ন আর কিছুই নহেন; মানবের দৌর্ব্বল্যও তাঁহাতে ছিল। এই দৌর্ব্বল্য ছিল বলিয়াই তাঁহার সহিত আমাদের সহানুভূতি মিশিতে পারে—আমাদিগের হৃদয়ের আবেগ, উচ্ছ্বাস তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়। জনসন একস্থানে বলিয়াছেন যে, যদি চরিত্রের কেবল উজ্জ্বল অংশই প্রদর্শিত হয়, তবে আমরা হতাশ হইয়া পড়ি এবং বিবেচনা করি কোন অংশে তাহার অনুকরণ করা আমাদের সাধ্যাতীত। কেবল জ্যোতির্ম্ময় মহিমা আমাদিগের অনুকরণাতীত। তাই চন্দ্রশেখরের চরিত্রে এই দুর্ব্বলতা। তাঁহাকে মানব করিবার জন্যই এই দুর্ব্বলতা। চন্দ্রশেখরের জ্ঞানতৃষ্ণা তীব্র—তাহার তীব্রতা স্রোতে তাঁহার অন্যান্য কর্ত্তব্য ভাসিয়া গিয়াছিল। প্রথমে আমরা দেখিতে পাই তাঁহার বিবাহের কারণ,—জ্ঞানান্বেষণের সুবিধা। তাহার পর জ্ঞানান্বেষণের ব্যস্ততায় তিনি তাঁহার পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তাই তাঁহাকে কর্ত্তব্য অবহেলার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। শৈবলিনীর গৃহ-

ত্যাগ হইতে তাঁহার শাস্তি আরম্ভ—সেই পুস্তকদাহে তাহার আরম্ভ; সেখানেই তাহার বিকাশ। তাঁহার প্রেম গভীর, গৃহপ্রত্যাগমন-পথে তাহা প্রমাণিত; পথে তাঁহার চিন্তাই তাহার পরিচায়ক। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কয়টি কথা বলা আবশ্যক। তিনি স্বীয় কার্য্যের তীব্র সমালোচক। তাঁহার প্রেম প্রস্তররুদ্ধমুখ প্রস্রবণের মত, তাই শৈবলিনীর গৃহত্যাগের পর, তিনি তাহা বিশ্বপ্রেমে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার উদারতা অসীম নহিলে তিনি ফষ্টরের হত্যা হইতে প্রতাপকে নিবারণ করিতে চাহিতেন না। তাঁহার প্রেম যেমন তল-তীর-হীন সাগরের ন্যায় গভীর এবং গম্ভীর, তাঁহার উদরতাও সেইরূপ। তাঁহার মহত্বের দৃষ্টান্ত এক আধটি নহে। এখন তাঁহার দৌর্ব্বল্যের কথা বলিতে হইবে, তাহা শৈবলিনীর পরীক্ষা—এইস্থানে চন্দ্রশেখর মনুষ্য, তিনি সন্দেহাতীত দেবতা নহেন, তিনি জগতের মনুষ্যমাত্র।

প্রতাপ সংসারী, কিন্তু সংসারে থাকিয়া শত প্রলোভন ও সুবিধার মধ্যে থাকিয়া, ঐশ্বর্য্য, বল, সকলের অধীশ্বর হইয়াও কেমন করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করিতে হয়, প্রতাপ তাহাই দেখাইয়াছেন; তাহাই তাঁহার চরিত্রের নৈতিক উদ্দেশ্য। প্রতাপ বীর—প্রতাপ প্রকৃত বীর—ইন্দ্রিয় জয়ে প্রতাপ বীর, বাহুবলে প্রতাপ বীর, কৃতজ্ঞতায় প্রতাপ বীর, মহত্বে প্রতাপ বীর হইতেও বীর। বীরত্বে প্রতাপ অতুলনীয়। বাল্যে প্রতাপ প্রেমের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে গিয়াছিল। শৈবলিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রতাপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন—সে বীরত্ব কেবল শারীরিক বীরত্ব নহে—তাহা নৈতিক বীরত্বও বটে। প্রদীপের আলোকোজ্জ্বল কক্ষ মধ্যে অমল শ্বেতশয্যায় শয়ানা শৈবলিনীকে যখন তিনি তিরস্কার করিলেন তখন প্রতাপের চরিত্র, ব্যবহার, বীরত্ব সকলই ব্যাখ্যাত হইল। প্রতাপ বলিলেন "ঈশ্বর জানেন আমি কোন দোষে দোষী নহি।" দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই। তাহার পরে সেই গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ—দৃশ্য হিসাবে অগাধ জলে সন্তরণের মত দৃশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন পুস্তকে নাই (গ্রন্থকারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন *) কিন্তু অন্য সৌন্দর্য্য হিসাবে দেখিতে গেলে তেমন সুন্দর দৃশ্য আর কোথায় আছে? সেইত প্রতাপের চিত্তসংযমের, নৈতিক বলের চরম উৎকর্ষ। সেই শপথ—তাহা কি কঠোর,

* তৃতীয়বর্ষের দ্বিতীয়ভাগ সাধনায় "বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—লেখক।

কি ভীষণ! তাহা রূঢ় শুনায় বলিয়াই চন্দ্রশেখর যখন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন সেস্থলে যাহা ছিল, পরে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা পরিবর্জ্জিত করিয়াছিলেন। প্রতাপ শৈবলিনীকে ভাল বাসিয়াও রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাহা যদি তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানবিরোধী বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহার প্রধান কয়টি কারণও দৃষ্ট হয়—প্রথমতঃ তাঁহার বিবাহে শৈবলিনীর হৃদয় হইতে প্রতাপলাভাকাঙ্ক্ষা দূর হইবার সম্ভাবনা; দ্বিতীয়তঃ তাহাতে তাঁহার আপনার চিত্তবৃত্তিদমনের সুবিধার সম্ভাবনা—এই যে আপনার অসীম ক্ষমতায় অবিশ্বাস ইহাই প্রতাপের চরিত্রের মাধুরী,—তৃতীয়তঃ ইহাতে চন্দ্রশেখরের আজ্ঞা পালন করা হইল। কিন্তু ইহাতেও যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, তবে সেই রণক্ষেত্রে অমূল্য জীবন দানেও কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? সেই রণক্ষেত্রেই প্রতাপের মহিমা পূর্ণরূপে বিকশিত। প্রতাপ যখন বুঝিলেন যে তিনি জীবিত থাকিলে শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের অসুখের সম্ভাবনা, তখন বীর প্রতাপ বীরের ন্যায় জীবনত্যাগ করিলেন। দধীচি প্রভৃতির জীবনদানেও বাসনা মিশ্রিত ছিল, আকাঙ্ক্ষা সেখানেও প্রবল। কিন্তু প্রতাপের জীবনত্যাগ স্বার্থমিশ্রিত ছিল না। এত বড় আদর্শ, এত বড় উপদেশ আর কোথায় আছে? যোগীবর রামানন্দস্বামীও তখন বলিয়াছেন "এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী, আমরা ভণ্ডমাত্র।" তাহার পর সেই পরহিতব্রতধারী মহাপুরুষ প্রতাপের মহত্বের সম্মুখে অবনতমস্তক হইয়া হৃদয়ের হৃদয় হইতে প্রার্থনা করিলেন "প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।" কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "পরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।" প্রতাপ আদর্শ পুরুষ। সেই আদর্শে মানবকুল চিরদিন ধন্য হইক আর সেই মহান আদর্শ চরিত্র জয়যুক্ত হউক। প্রতাপ উপদেশ দিয়াছেন :—

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

রামানন্দস্বামী নরচিত্তজ্ঞ দার্শনিক এবং পরোপকার ব্রতধারী সন্ন্যাসী। তাঁহার জ্ঞান অসীম, তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থের

সন্ন্যাসীগণের ন্যায় তিনিও কতকটা অসামান্য ক্ষমতাপন্ন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তিনি কেবল ক্রিয়া কর্ম্মকারী নহেন, পরোপকার ব্রতই তাঁহার জীবনের ব্রত। হৃদয়হীন হইয়া ক্রিয়া কর্ম্ম সম্পাদনে কি পরোপকারের অপেক্ষা অধিক পুণ্য লাভ হয়? কপাল-কুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই নবকুমারের মুখদিয়া বলাইয়াছেন "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থ দর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।" লোক দেখান পুণ্যকর্ম্মের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই-রূপ আন্তরিক ঘৃণা। রামানন্দস্বামী পরের হিতের জন্য সকল ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন—স্বার্থপরতার গরলশ্বাস তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি মহাত্মা পলের সেই মহাবাক্য "Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep" জীবনের মহাউদ্দেশ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বজীবন গ্রন্থকার ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঠকের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়াছেন। তবে গ্রন্থশেষে মনে হয় যে, তিনিও একদিন প্রতাপের মত প্রেমে পড়িয়াছিলেন। প্রতাপের প্রেম সঙ্কীর্ণ থাকিয়াই মহত্বে উপনীত হইয়াছিল আর তাঁহার প্রেম প্রেমের উচ্চতম আদর্শে উপনীত হইয়াছিল; তাহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নারী-প্রেম হইতে তিনি বিশ্বপ্রেমে, ভগবৎপ্রেমে উপনীত হইয়াছিলেন; প্রেম মহত্বে পরিণত হইয়াছিল। সে উচ্চসীমায় "Love is heaven and heaven is love." কেবল রামানন্দস্বামীর ক্ষমতার আতিশয্য সাধারণ পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করে সন্দেহ নাই।

সত্য বটে "Love is the light and sunshine of life;" কিন্তু প্রয়োগ ফলে সকল দ্রব্যই বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। সংসারজ্ঞানাভিজ্ঞ বলেন, যে সকল দ্রব্যেরই দুইদিক আছে,—আলোক ও আঁধার। প্রেমেরও দুইদিক আছে। একে তাহা পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, অন্যে তাহা নিতান্ত পাপপঙ্কিল। প্রেমের এই দুই অবস্থা কেবল ব্যবহারের ফল। আত্মসংযম, জ্ঞান, ধীরতা এবং সদ্বিবেচনার অধীন হইলে প্রেম হইতে কখন কুফল উৎপন্ন হইতে পারে না —প্রতাপ তাহার দৃষ্টান্ত। আবার আত্মসংযমের অভাব হইলে, অধীরতা ও অদূরদর্শিতা প্রবল হইলে প্রেম হইতে কি ভীষণ কুফল উৎপন্ন হইতে পারে শৈবলিনীতে তাহা প্রকাশ। একজন স্থির, গম্ভীর, অগাধ সমুদ্রের মত— আপনাতে আপনি স্থির, নিমগ্ন—অল্প আহ্লাদে বিষাদে তাহার গাম্ভীর্য্য

বিচলিত হয় না—তবু সে আপনার বলে আপনি বিশ্বাসবান নহে, ইহাই তাহার মাধুরী। আর একজন অগভীর, আপনার বেগ সম্বরণে অসমর্থ, অদূরদর্শী আপনার অল্প বলের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সে ছুটিয়া যায়—সে বেগ ক্ষণস্থায়ী ও ভীষণ—তাহাতে যাহা সম্মুখে পড়ে তাহাই ভাসিয়া যায়—কিন্তু বলিয়াছি সে বেগ ক্ষণস্থায়ী। সেই শৈশব হইতেই দেখিতে পাই প্রতাপ আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন—শৈবলিনী তাহা পারে না—পারিলে সে প্রথমেই গঙ্গায় ডুবিত। সংসারাবর্ত্তে আসিয়া ডুবিল শৈবলিনী, উঠিল প্রতাপ—তাহার পর আবার মহত্ত্বে ডুবিল প্রতাপ, পাপে ডুবিল শৈবলিনী—ডুবিল উভয়েই; কিন্তু স্রোত আর এখন এক নহে। সেই কূলে কূলে ভরা নদীর তরঙ্গরঙ্গময় উরসে দুইজনে মরিল না—সংসারের কর্ম্মস্রোতে দুইজনে দুই দিকে গিয়া পড়িল—একজন আত্মসংযম অবলম্বন করিল, আর একজন তাহা পারিল না—সেই ডুবিল। এরূপ বিষম বিরোধবৈচিত্র্য বড় সচরাচর দৃষ্ট হয় না। শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের বিবাহ হইলে বোধ হয় উভয়েই সুখী হইত; কিন্তু তাহা হইল না। যখন হইল না তখনও শৈবলিনী কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিতে পারিল না—এই কর্ত্তব্য অবহেলাই তাহার অধঃপতনের প্রধান কারণ। শৈবলিনী তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ও তেজস্বিনী রমণী। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় গ্রন্থে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়; তাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ না হইলে, সে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য উন্মত্ত হৃদয়কে গৃহকর্ম্মের আবরণে আবৃত রাখিতে পারিত না। সে যখন ফষ্টরের সহিত চলিয়া গেল, তখন সে প্রেমোন্মাদঅবস্থাপন্ন, বুদ্ধি না থাকিলে সে প্রতাপের উদ্ধারসাধন ও আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব না থাকিলে, সে নবাব সমক্ষে রূপসী বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারিত না। তাহার তেজস্বিতা অসাধারণ—ফষ্টর, সমরক্ষেত্রে নির্ভীক, মরণে অকাতর ফষ্টরও বঙ্গরমণীর কমনীয় কোমল করে ছুরিকা দেখিয়া পিছাইয়া গিয়াছিল, আর প্রতাপ তাহার কথা শুনিয়া চমকিত হইয়াছিলেন। শৈবলিনী যখন বলিল "তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার প্রস্ফুটোন্মুখ যৌবনকালে ওরূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? * * * * আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলামনা কেন? না

পাইলাম ত মরিলাম না কেন? * * * * * তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?" তখন সহজেই বুঝা যায় যে সে প্রতাপেরই উপযুক্ত গৃহিণী হইত। সে ধরণীর ধূলায় নির্ম্মিতা; চন্দ্রশেখরের প্রেম অনুভব করিতে হৃদয়ের যে উচ্চতা ও মহত্ত্ব প্রয়োজন, সে তাহার প্রেমতাড়িত হৃদয়ে সে উচ্চতা, সে মহত্ত্ব আনিতে পারিল না। তাহার অবস্থায় সত্যই "who can gaze upon the sun in heaven?" অভাগিনী আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতে পারিল না; রমণীর পবিত্রতায় কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া ভবিষ্যৎকালের শিক্ষার জন্য সে গৃহত্যাগ করিল। দুঃখ কোথায় অধিক—গৃহে না বাহিরে? চন্দ্রশেখরের—দরিদ্র চন্দ্রশেখরের—গৃহে যদি তাহার উন্মত্ত প্রেমপিপাসা পরিতৃপ্ত না হইত, তবুও সেথায়—

"Her modest looks the cottage might adorn,
Sweet as the primrose peeps beneath the thorn;"

আর এই অকূলে সে কোথায় যাইবে তাহার স্থির আছে কি? সেই বিরামবিহীন ফেনিল জলরাশির ক্রীড়ায় সে কোথায় ভাসিয়া চলিল—

"as a weed
Flung from the rock, on ocean's foam, to sail
Where'er the surge may sweep, the tempest's breath prevail."

শৈবলিনী ভবিষ্যতের শিক্ষার জন্য একটা দৃষ্টান্ত; তাই তাহার প্রায়শ্চিত্তে লেখক পাঠকের সম্মুখে পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রস্ফুট ছবি ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্তেই জাতীয় ভাবের পূর্ণ বিকাশ। অনেক সুন্দর ইংরাজী বা ফরাসী উপন্যাস আমাদের নিকট তেমন প্রাণস্পর্শী হয় না; তাহার কারণ হৃদয়ের নিভৃত কোণে একটি জাতীয় ভাব লুকায়িত থাকে—"সেটা ক্ষুদ্র, দৃষ্টির অগোচর তবু তীক্ষ্ণতম।" শ্রদ্ধেয় বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক স্থলে বলিয়াছেন "শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদা জাগ্রত, কর্ম্মশীল, অনুসন্ধান তৎপর, আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় নিশ্চেষ্ট, কর্ম্মহীন স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট।" সত্য বটে "এই শ্যামা আর্য্য-প্রকৃতিতে হয়ত রাত্রির মত একটা গভীরতা, মাধুর্য্য, স্নিগ্ধকরুণা এবং সুনিবিড় আত্মীয়তার ভাব আছে;" কিন্তু আমাদিগের স্বপ্নকুহকাবিষ্ট হৃদয়, সহসা আপনার মধ্য

হইতে আপনাকে সচেতন করিয়া তুলিয়া শ্বেতজাতির হৃদয়ের মত কর্ম্ম-প্রবণ করিয়া তুলিতে পারে না। আমরা কঠোর কার্য্যের পরিবর্ত্তে সহজেই অসাধারণ গম্ভীর একটা কিছুর অবতারণা করিতে ভাল বাসি। কর্ম্মের কঠোর তপনতাপ অপেক্ষা, আমরা স্বপ্নকুহকের স্নিগ্ধতায় অধিক মুগ্ধ একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। সেই ভীমকায় মহীধর, সেই বিকট অন্ধকার, সেই দেহ ও মনের অবস্থা, সেই চিত্ত বৃত্তিরোধ, এ সকল হয়ত প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত উপকরণ, কিন্তু শ্বেতকায় এ দৃশ্য ভাল বাসিবে না। সে আপনার সমালোচনার অনুবীক্ষণের নিম্নে এই প্রাচ্যকল্পনাসৃষ্ট দৃশ্য স্থাপন করিয়া বলিবে যে, ইহা ঠিক কার্য্যগত নহে এবং প্রাচ্য প্রকৃতির প্রিয়তম কল্পনার উপর যথাসম্ভব বিদ্রূপরস সিঞ্চন করিয়া যখন সে তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবে, তখন আমরা আর তাহাকে চিনিতে পারিব না; তাহা যে সেই দ্রব্যেরই রূপান্তর তাহা আর বুঝিতে পারিব না। চন্দ্রশেখর কোন প্রতীচ্যদেশবাসীর রচনা হইলে এই দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইত —এই প্রায়শ্চিত্ত অক্ষরে অক্ষরে জগতের কার্য্যের সঙ্গে মিশাইয়া যাইত; আমরা সে কার্য্যস্তূপের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিতাম। এইরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের পাশ্চাত্য আদর্শ East Lynne পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়।

শৈবলিনী প্রতাপ ভুলিল; তখন চন্দ্রশেখরের সেই অসীম প্রেম তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল "সেই যে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্ত ভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গভঙ্গ ভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর,—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না।" এই পরিবর্ত্তনের জন্ম বঙ্কিমচন্দ্র একটু দার্শনিক কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। "মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে।" উপন্যাসে এইরূপ দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা উচিত কিনা তাহাও বিবেচ্য বিষয়—এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। একদল বলেন যে এইরূপে দর্শন বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিলে তাহা লোকের নিকট রসহীন ও

বিরক্তিকর বোধ হয় না, কিন্তু শিক্ষা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপে উপন্যাসে দর্শন ধর্ম্ম ও ইতিহাস শিক্ষা দিয়াছেন; স্কট ও লিটনও এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আর একদল বলেন যে, এরূপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহারা বলেন যে উপন্যাসে কেবল বাস্তব চিত্র চিত্রিত হইলেই হইল, অন্ধকার ও আলোক উভয় দেখাইলেই গ্রন্থকারের কর্ত্তব্য শেষ হইল। একের প্রাধান্য প্রদর্শন গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে, তিনি কেবল নিপুণ চিত্রকরের মত ঠিকটি চিত্রিত করিবেন। য়ুরোপীয় লেখক ও পাঠকদিগের মধ্যে আজকাল এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ লক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কবি উইলিয়ম মরিসের মতের মর্ম্মার্থ এখানে প্রদান করিলাম। তিনি বলেন আজকাল লোকে নীতিপ্রবণ উপন্যাস লইয়া পাগল। এই যে নিত্য নূতন নীতির নেশা, তিনি ইহার পক্ষপাতী নহেন, এই যে নব নব নীতির নিয়ম তিনি বলেন এ সব কেন? এই সব Novels with a purpose কেন? তিনি এ সব ভাল বাসেন না; তিনি কেবল আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য উপন্যাস পাঠ করেন। তিনি বলেন যদি দর্শনাদির কথা বলিবে তবে স্পষ্ট করিয়া তাহাই বল; সে গুলি উপন্যাসের সঙ্গে মিশাইয়া চিনি মাখান ঔষধের বড়ির মত লোকের গলাধঃকরণ করাইবার প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে; কোন মত ভ্রান্ত তাহা নির্ণয় করা দুরূহ,—দুরূহ কেন একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র কোন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। বাস্তবিক সমস্ত জটিলতার মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে বোধ হয় শৈবলিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। সে প্রায়শ্চিত্ত পাপের ভীতি—পুণ্যের জয়।

দলনী প্রেমের পবিত্রতা ও মহত্বের আদর্শ বিকাশ। কিন্তু মুসলমান কন্যা দলনীর হৃদয়ে সেই বিকাশ দেখাইয়া গ্রন্থকার পবিত্রতার সার্ব্বজনিকতা এবং হৃদয়ের উদারতা দেখাইয়াছেন। পবিত্রতা সর্ব্বজনীন। আমাদিগের প্রিয় মাতৃভূমি সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষে পবিত্রতা বিকশিত হইলে তাহার গৌরব যেমন অসামান্য, আফ্রিকার জনশূন্য মরুপ্রান্তে বা সাগরচুম্বিত কর্ম্মবীর ইংরাজের মাতৃভূমিতে পবিত্রতা বিকশিত হইলেও তাহার গৌরব তেমনই অসামান্য—তাহা দেশ কাল বা পাত্রভেদেই অঙ্গহীন হয় না। আর লেখকের উদারতা যে তিনি জাতির

মধ্যে জাতির অবতারণা করেন নাই। জাতীয় হিসাবে মুসলমান দিগকে বাদ দিলে আমাদের চলে না; শত শত বৎসরের ঘটনাস্রোত হিন্দু ও মুসলমানদিগের ভাগ্য একত্র গ্রথিত করিয়াছে—আমরা একদেশবাসী, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও একজাতি সন্দেহ নাই। বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গ যেমন মরণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আপনাকে অগ্নি মধ্যে পাতিত করে, দলনী তেমনই মরিবার জন্য, অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য নবাবের প্রেমে আপনার নিজত্ব হারাইয়া তন্ময় হইয়াছিল। গুর্গণখাঁ কেবল আপনার কার্য্য সিদ্ধির জন্য ভগিনীকে লোকবিশ্রুত বিলাসসাগর নবাবের অন্তঃপুরে রাখিয়াছিল; কিন্তু দলনী বুঝিল যে নবাব তাহার স্বামী—তাই সে দেবতা নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে ভক্তি করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, সত্যই দলনী নবাবকে বলিতে পারিত:—

"বঁধু, কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া; একমন লইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

প্রেম সুলভ না হইলেও নিতান্ত দুর্ল্লভ নহে; কিন্তু প্রেমের সহিত এই বিনয় ও নম্রতা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। এই পতিপ্রেমে আপনার প্রেম মিশাইয়া আপনার ক্ষুদ্রত্ব বোধেই প্রেমের প্রকৃত পরিস্ফুটতা। যখন বিষপানান্তর অশ্রুকলুষিতনয়ন যুক্তকর দলনীকে গ্রন্থকার পাঠকের সম্মুখে আনিলেন, তখন মনে হইল, এই মূর্ত্তিতেই তাহার সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ। সে মূর্ত্তির কথা মনে হইলেই মনে পড়ে:—

The rose is fairest when 'tis budding new,
And hope is brightest when it dawns from fears.
The rose is sweetest washed with morning dew,
And love is loveliest when embalmed in tears.

একদিকে যেমন এই কথা মনে পড়ে, অপরদিকে তেমনই মনে পড়ে প্রাচীন কবির সেই কথা:—

"কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া কাঁদিয়া জনম গেল॥"

গ্রন্থকার দলনীর চরিত্র কোনরূপ জটিলতায় সমাচ্ছন্ন রাখেন নাই; সেই

মহত্তম আদর্শ তিনি সরল ভাবেই আনয়ন করিয়াছেন। দলনী রমণীর কর্ত্তব্য পালনের, সংযমের দৃঢ়তার ও হৃদয়ের পবিত্রতার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

লরেন্স্ ফষ্টর এই গ্রন্থমধ্যে বিশেষরূপে জড়িত। গ্রন্থের প্রথমাংশেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন "যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা যায় নাই।" ইহা ঐতিহাসিক সত্য; ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই ইহা অবগত আছেন। ক্ষমতাশালী না হইলে মুষ্টিমেয় বণিকসম্প্রদায় এই বিশাল বিপুল দেশের বক্ষে বুদ্ধিবলে বা বাহুবলে আপনাদিগের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইত না। আর তাহাদিগের স্বেচ্ছাচারিত্বের পরিচয় ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফষ্টর সেই সম্প্রদায়ের লোক। তাহার স্বেচ্ছাচার-প্রবৃত্তিই চন্দ্রশেখর গ্রন্থের ভিত্তি। শত পাপ অতিক্রমের পর নবাবের শিবিরে জানুসংলগ্ন ভূমি, যুক্তকর, ঊর্দ্ধনেত্র ফষ্টরের প্রতি সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তখন ফষ্টরের হৃদয়ে পাপের জন্য যন্ত্রণা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই নরক। মানবের কল্পনাসৃষ্ট গন্ধকাগ্নির অন্ধকারময় আলোক ভীষণ, তরলগন্ধকসমুদ্রোর্ম্মিময় নরক বা তপ্ত তৈলময় নরক অপেক্ষা মানব-হৃদয়ের এই অবস্থা ভীষণ। হৃদয়ের এই অবস্থা কি ব্যক্ত করা যায়? হতভাগ্য ফষ্টর যখন এইরূপ যাতনা-পীড়িত, তখন সে তাপদগ্ধ জীবন-মধ্যাহ্নের কথা স্মরণ করিয়া, সেই জীবন-সায়াহ্নে যুক্তকরে ঈশ্বরকে স্মরণ করিল। তখন সে যাহা বলিল, তাহা ভক্তযোগী নিউম্যানের ভাষায়:—

> "I was not ever thus, nor prayed that Thou
>
> Shouldst lead me on;
>
> I loved to choose and see my path; but now
>
> Lead Thou me on.
>
> I loved the garish day, and spite of fears,
>
> Pride ruled my will: remember not past years."

মীরকাসেম্—হতভাগ্য মীরকাসেম্ যদি অত্যাচার বা অবিবেচনার কার্য্য করিয়া থাকে, তবে তাহার কারণ ছিল না কি? ক্ষুব্ধসাগরের তরঙ্গ-রাশির মত, তাহার নিধনের জন্য ষড়যন্ত্র তাহাকে ঘিরিতেছিল। তাহার উপর ভৃত্যের সেই হীন ব্যবহার ও সর্ব্বোপরি সেই পতিপ্রেম-পরায়ণা

প্রাণপ্রিয় পত্নীর প্রতি সন্দেহ; এ সকলের কি একটা বিরক্তিকর, উন্মাদকর ক্ষমতা নাই? আপনার ক্ষণিক মূর্খতায় সেই হতভাগা অজেয়, অসীম, অতুলনীয় প্রেমরাজ্য, স্বর্গসম্ভবা পত্নী হারাইয়া অনুতপ্ত—তখন তাহার বুদ্ধির স্থৈর্য্য প্রত্যাশা করা যায় না "মুক্তা, প্রবাল, রজত, কাঞ্চন-শোভিত" উচ্চাসন তখন তাহার নিকট কণ্টকাকীর্ণ নারকীয় শয্যার মত বোধ হইতেছিল। "উজ্জ্বলতম সূর্য্যপ্রভ হীরক-রঞ্জিত" মুকুট তখন তাহার নিকট "ধরার ধূলার চেয়ে নীচ" বোধ হইতেছিল। এই ঐশ্বর্য্য, এই সম্মান, আর তাহাদের সহচর ষড়যন্ত্রের ভীষণতা ও দুশ্চিন্তা বিধৌত করিয়া যদি সে আবার সেই ক্ষুদ্র অবলার বিপুল প্রেম-রাজ্যে, আপনার শান্তিময় নিভৃত নিকেতন নির্ম্মাণের অবসর পাইত, তবে তুচ্ছ এই অসার ধনসম্পত্তি পদদলিত করিয়া সে যাইতে পারিত; কারণ সেখানে বিশ্বাস কখন শিথিল নহে, প্রেম কখন আবেগহীন বা স্বার্থ-পঙ্কিল নহে, সুখ কখন পরিমিত নহে; সেখানে জগৎ স্বর্গের রূপান্তর মাত্র। তখন তাহার

"জীবনের গ্রন্থি পড়িছে খসিয়া
হইয়া তরঙ্গাহত।"

তাই সেই হতভাগ্য বাঙ্গালার শেষ নবাবের প্রতি ক্রোধ অপেক্ষা, অধিক দয়া হয়।

গুরগন্‌খাঁর ক্রমাবনতি, দুরাশায় মানবের অবনতির পথ কিরূপে পরিষ্কৃত হয়, তাহা সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর পাঠ করিয়া মনে হয় গ্রন্থখানির বিশেষ নৈতিক উদ্দেশ্য আছে। যে অবস্থাতেই হউক সন্তুষ্ট থাকা, ঈশ্বরে নির্ভর করা এবং পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যপথ অবলম্বন করিয়া আপনার কর্ম্মক্ষেত্র বিশাল ধরায় আপনার কর্ত্তব্য পালন করা, ইহাই চন্দ্রশেখরের মহান্ শিক্ষা। কর্ম্মবীর কর্ত্তব্যবোধী প্রতাপ বা পতিপ্রেম-পরায়ণা পবিত্রহৃদয়া দলনীর তুলনা কোথায়? পাপের প্রায়শ্চিত্ত শৈবলিনীতে পরিস্ফুট। চন্দ্রশেখর পত্নীর প্রতি মনোযোগ না দেখাইয়া, কর্ত্তব্য অবহেলায় যে অপরাধ করিয়াছিলেন, গৃহত্যাগী ব্যথিতহৃদয় চন্দ্রশেখরকে তাহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। কর্ত্তব্য অবহেলায় অবশ্যই পাপ আছে। আর যে যেরূপ কর্ম্ম করে তাহাকে তাঁহার ফলভোগ করিতে হয়। রামের বনগমনের পর দশরথ কৌশল্যাকে বলিতেছেন;—

"যদাচরতি কল্যাণি নরঃ কর্ম্ম শুভাশুভম্।
সোঽবশ্যং ফলমাপ্নোতি তস্য কালক্রমাগতম্॥"

এখানে আর একটি বিষয় পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে নারীপ্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানানুশীলন ফলে, ক্রমে ক্রমে স্বদেশ-প্রেমের, স্বজাতি-প্রেমের ও ভগবৎ-প্রেমের মনোমুগ্ধকর মহান নীতি গাহিয়া এই শত শত শতাব্দীর উৎসাহ উদ্দমহীন আলস্যপরবশ জাতির নিকট এক কর্ত্তব্য-পরায়ণ জীবনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে "The thoughts of men are widened with the process of the suns." ইহারই প্রথম অঙ্কুর রামানন্দ স্বামীতে।

চন্দ্রশেখরের ভাষা, বর্ণনা ও দৃশ্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়। গ্রন্থান্তর্গত দৃশ্যগুলি অতীব সুন্দর। সেই বিপুল বারিময়-বক্ষ ভাগীরথী তাহার শত শত তরঙ্গে আলোক জ্বালাইয়া বহিয়া যাইতেছে, আর তাহারই মধ্যে প্রতাপ ও শৈবলিনী। সেই ভীষণ গিরিগহ্বর, সেখানে মার্ত্তণ্ডকরজালের প্রবেশাধিকার নাই। সেই বিকট অন্ধকারের মধ্যে, তাহার অপেক্ষাও বিকটতর অন্ধকারময় হৃদয় লইয়া শৈবলিনী। সেই দরিদ্র চন্দ্রশেখরের গৃহে—তাহাতে একখানি শান্তিময় কুটীরের ছবি নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠে। আবার সেই ভীষণ রণক্ষেত্র। কিন্তু বর্ণনাকৌশলে সে সকল জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণনার উপযুক্ত ভাষা না থাকিলে তাহা হইত না। সে ভাষা কোথায় গম্ভীর হইতেও গম্ভীরতর, আবার কোথাও তাহা সরল মধুর হইতেও মধুরতর; আবার স্থানে স্থানে তাহা গম্ভীর বলিয়াই মধুর এবং মধুর বলিয়াই গম্ভীর।

যেখানে জড়-প্রকৃতির বিকট গম্ভীরতা বর্ণনা করিয়া স্বভাব-পূজক বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়ের হৃদয় হইতে প্রকৃতির স্তব করিয়াছেন; সেখানে আশ্চর্য্য হইতে হয়—যে লেখক চিরদিন মানবচরিত্র ও মানবের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণে এত মনোযোগ দিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে এতখানি স্বভাব-পূজার ভাব, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আপনার মধ্যে আপনার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে! তখন মনে হয়, তিনিও বায়রণের মত বলিতে পারিতেন:—

"I love not Man the less, but Nature more."

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন যে, বিদেশীয় অনেক ভ্রমণকারী কেবল স্বভাবের

শোভা দর্শনার্থ ভ্রমণ করেন। বঙ্গদেশে আসিয়া তাঁহারা এই সমতল ভাগে সৌন্দর্য্যাভাব বোধ করেন। এখানে পার্ব্বত্যপ্রদেশের শোভা না থাকিলেও সৌন্দর্য্যের অভাব কি? শস্যক্ষেত্র কি নয়নের সম্মুখে মনোরম শোভাময় চিত্র উপনীত করে না? যখন হরিৎক্ষেত্রে হরিদ্রাবর্ণ সর্ষপ-কুসুম বিরাম বিহীন ভাবে ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলে, আর পবন হিল্লোলে সেই হরিদ্রাবর্ণ কুসুমচূড় হরিৎক্ষেত্রে দুলিতে থাকে, তখন কি বোধ হয় না যে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ বহিতেছে? একবার তিনি নদীপথে খুলনা জেলায় বেড়াইতে বেড়াইতে নদীতীরে সুপারি বৃক্ষের যে কুঞ্জ দেখিয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য্য ভুলিবার নহে। তাহার পর সীতারাম গ্রন্থে উড়িষ্যার বর্ণনায় তাঁহার সৌন্দর্য্য-পূজা ও শিল্প-সমালোচনা-প্রতিভা উভয়ই প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সকল শান্ত বর্ণনা হইতে একবার যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনার দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে মনে হয়, এ কি বৈষম্য! সেই ভীষণ নারকীয় দৃশ্য, তাহাও সেই রচনা-মাধুর্য্যে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। আর সেই মৃত ও আহত স্তূপ মধ্যে প্রতাপ—তাঁহার সেই শেষ বাক্যাবলী। সেই মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য হৃদয়-পটে চিরাঙ্কিত হইয়া যায়।

এই গ্রন্থখানি আরম্ভ করিলে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ জন্মে। এবং গ্রন্থ সমাপ্তির পর স্মৃতি সেই গ্রন্থকে সুধাভাণ্ডারের মত হৃদয়ে রাখিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার মাধুরী উপভোগের অবসর দান করে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

পলাশ বন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি বাল্যকালে পশ্চিম বঙ্গে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমার পিতা ঠাকুর মহাশয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোনও উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিয়া বহুকাল এই অঞ্চলে অবস্থান করিয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের জলবায়ু স্বাস্থ্যজনক বলিয়া তিনি কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণপূর্ব্বক এই দেশেই বসবাস করিবার সঙ্কল্প করেন। তদনুসারে তিনি দেবীপুর নামক

এক বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রামের সন্নিহিত একটী মনোরম পল্লীতে কিয়দ্দিন বাস করেন। আমার অগ্রজ ভ্রাতারা কলিকাতায় থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। আমি অল্পবয়স্ক ছিলাম বলিয়াই হউক, কিম্বা দেবীপুরে আমার বিদ্যাশিক্ষার যথেষ্ট উপায় বিদ্যমান ছিল বলিয়াই হউক, কিম্বা আর যে কোনও কারণেই হউক, আমি পিতামাতারই নিকটে অবস্থান করিতাম। দেবীপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে আমি স্বদেশে আমাদের গ্রামস্থ বঙ্গবিদ্যালয়ে কিয়দ্দিন বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলাম।

আমাদের আবাসবাটী পল্লীর বহির্ভাগে অবস্থিত ছিল। তাহার অনতিদূরেই একটী পর্ব্বত; কিন্তু তাহা বৃক্ষলতাচ্ছন্ন ছিল না; কতিপয় আরণ্য বৃক্ষমাত্র তাহার নগ্নকৃষ্ণদেহের শোভা বর্দ্ধন করিত। তত্রত্য অধিবাসীরা বলিত, পূর্ব্বে পর্ব্বতটি নিবিড় জঙ্গলে সমাবৃত ছিল; ক্রমে পল্লীর স্থাপন ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই জঙ্গল এবং তদধিবাসী ব্যাঘ্রভল্লুকাদিও অদৃশ্য হইয়া পড়ে। যাহা হউক, বৃক্ষলতা না থাকায় পর্ব্বতটি দূর হইতে ভীষণ দেখাইত। তাহাতে আবার লোকে তাহাকে নানা দেবতা ও উপদেবতার বিহার-স্থল কল্পনা করিয়া তাহার ভীষণতা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। দেবতাদের উদ্দেশে পূজা ও বলি দেওয়া ভিন্ন অন্য কোনও কারণে কেহ তাহার উপরে আরোহণ করিত না। কিন্তু আমি প্রায়শঃ এই নিয়মের লঙ্ঘন করিতাম। লঙ্ঘন করিয়া মধ্যে মধ্যে জননীর তিরস্কার ও পিতৃদেবের কঠোর তাড়না পর্য্যন্ত সহ্য করিতাম।

পর্ব্বতে আরোহণ করিবার প্রবৃত্তি আমাতে কিরূপ প্রবল ছিল, জনক জননী তাহা অবগত ছিলেন না। স্বদেশে বঙ্গবিদ্যালয়ে যখন পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, নদী নির্ঝরের কথা পাঠ করিতাম, তখন পর্ব্বত কখন নয়নগোচর না করিলেও আমি মানসপটে তাহার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইতাম; কল্পনার সাহায্যে বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম এবং পার্ব্বত্য নির্ঝরের বক্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কত মনোরম প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম যে দিন পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া সত্য সত্যই পাহাড় দেখিলাম, বাড়ীর অনতিদূরেই শালবনের হরিৎ রেখা দেখিতে পাইলাম, এবং পার্ব্বত্য নির্ঝরের উল্লাসময়ী ক্রীড়া দৃষ্টিগোচর করিলাম, সেইদিন হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলাম, জীবনে আর কখনও সেরূপ আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি

বলিয়া মনে হয় না। গৃহে পদার্পণ করিয়াই ছুটিয়া আমি পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম; উল্লাসে, ভয়ে, কৌতূহলে কিয়দ্দূর উঠিয়া একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়াছিলাম এবং সেখান হইতে একবার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিয়া লইয়াছিলাম। নিম্নোন্নত ভূমি, বৃহৎ অজগরের ন্যায় পার্ব্বত্য নদী, মেঘ-মালার ন্যায় দূরবর্ত্তিনী শৈলশ্রেণী, বনাচ্ছন্ন প্রদেশ, নির্জ্জন মনোরম প্রান্তর, ও আম্রকাননের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম সকল চিত্রিত দৃশ্যপটের ন্যায় আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। পর্ব্বতের ভীষণ গম্ভীর মূর্ত্তি, সেই স্থলের নির্জ্জনতা ও প্রকৃতির নীরবতা আমার বালক হৃদয়ে ভীতিমিশ্রিত এক অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত ছুটাইয়া দিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে যেন যাদুমন্ত্রবলে আমার কল্পনাদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল, চিত্তবৃত্তি যেন মার্জ্জিত ও বিকশিত হইয়াছিল এবং হৃদয়ও যেন প্রশস্ততা লাভ করিয়াছিল। সেই দিন আমার ক্ষুদ্র জীবনের একটী মহাদিন। সেই দিন হইতে আমি জীবনে এক অভি-নব পরিবর্ত্তন অনুভব করি এবং এক দিব্য পবিত্র আনন্দের অধিকারী হইতে সমর্থ হই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই দিনের কথা আমার স্মৃতিপটে সমভাবে জাজ্বল্যমান থাকিবে।

দেবীপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে আমি বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। স্বদেশে থাকিবার কালে আমি বিদ্যাশিক্ষায় তত মনোনিবেশ করি নাই; কিন্তু এই নূতন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া অবধি বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আমার অনুরাগ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বাল্য-সুলভ চাঞ্চল্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ করিয়া আমি গম্ভীর স্বভাব ও সংযত-চিত্ত হইলাম। বিদ্যালয়ের পাঠাদি প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ অবসর পাইলেই আমি কখনও একাকী এবং কখনও বা কতিপয় বিশিষ্ট সহচরের সহিত পর্ব্বতের সন্নিকটে কিম্বা বনের ধারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম; অথবা কখন কখন নির্দ্দোষ ক্রীড়াতেও মত্ত হইয়া আনন্দলাভ করিতাম।

কিন্তু সহচরগণের সহিত অবস্থান বা ভ্রমণ অপেক্ষা আমি নির্জ্জনতারই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলাম। প্রায় প্রত্যহই দিবাবসান কালে আমি পর্ব্বতের উপর একাকী বসিয়া থাকিতাম। গ্রামের কোলাহল সেখানে পৌঁছিত না এবং সেই উচ্চ স্থানের বায়ু নির্ম্মল, শীতল ও সুখসেব্য বোধ হইত। সেই স্থানে উপবেশন করিয়া আমি প্রায়ই সূর্য্যদেবকে অস্তাচলে গমন করিতে দেখিতাম। তাঁহার কনক কিরণমালা বৃক্ষপত্রে, পর্ব্বতশিখরে,

হরিৎক্ষেত্রে ও দূরস্থিত গিরিগাত্রে পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত। ক্রমে সন্ধ্যার প্রগাঢ় ছায়া ধরাতলে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইত; পশুপক্ষী নীরব হইত; বৃক্ষলতা নিস্পন্দ হইত; কেবল মধ্যে মধ্যে গৃহমুখী রাখাল বালকের সঙ্গীত ও দলভ্রষ্ট দুই একটী গো মহিষের কণ্ঠবিলম্বিত ঘণ্টার নিক্কণ ভিন্ন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইত না। আমি সেই সময়ে সেই পর্ব্বত স্কন্ধে উপবেশন করিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবে নিমগ্ন হইতাম, হৃদয়ে কত অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতাম এবং তাহাদের অতৃপ্তির জন্য বিষণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিতাম। এইরূপে পশ্চিম বঙ্গে আমার জীবনের কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে সেই বিদ্যালয়ে আমার পাঠ কাল সমাপ্ত হইয়া আসিল। পরিশেষে কৈশোরের অন্তে ও যৌবনের প্রারম্ভে আমি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতা মহানগরীতে উপনীত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আসিয়া এক অভিনব রাজ্যে পড়িলাম। কলিকাতা নগরীর শ্রী, ঐশ্বর্য্য, জনতা, কোলাহল কিয়দ্দিন আমার মনোরাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রহিল। ততদিন মনে আর কোন বিষয়ই স্থান পাইত না। ক্রমে কৌতূহল অনেকটা চরিতার্থ হইয়া আসিলে, অর্থাৎ কলিকাতানগরীর অভিনবত্ব তিরোহিত হইবার উপক্রম হইলে, জনকোলাহল আমার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির গৃহে আমোদ প্রমোদে দুই চারি দিবস অতিবাহিত করিবার পর, দরিদ্র ব্যক্তি আপনার শান্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের জন্য যেরূপ লালায়িত হয়, কলিকাতা নগরীর বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে কিয়দ্দিন থাকিতে থাকিতে, আমিও তৎপ্রতি বীতরাগ হইয়া, পশ্চিম বঙ্গের সেই আড়ম্বর শূন্য নৈসর্গিক শোভার জন্য তদ্রূপ ব্যাকুল হইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি কলেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছিলাম; কলেজের বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আমার কোথাও যাইবার উপায় ছিল না। সুতরাং আমি উপায়াভাবে, অবসর কালে, একমাত্র কল্পনার আশ্রয় লইয়া কলিকাতানগরীর সেই কোলাহলপূর্ণ রাজপথেই ভ্রমণ করিতে করিতে পশ্চিমবঙ্গের সুপরিচিত পর্ব্বতশৃঙ্গে, জনহীন আরণ্যপথে, প্রান্তরে ও কৃষক-

গ্রামে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতাম এবং মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিতাম। সুখময়ী কল্পনার প্রসাদে নগরীর কোলাহল আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না এবং জনতা আমার চক্ষুতে প্রতিভাত হইত না; যেন যাদুমন্ত্রবলে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কোলাহলময়ী নগরী প্রশান্ত বনাচ্ছন্ন প্রদেশে পরিণত হইয়া যাইত, এবং আমিও যেন দুই একটী আরণ্য কপোতের কূজন ও অজ্ঞাতনামা পক্ষীর মধুময় কণ্ঠস্বর ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইতাম না! কলিকাতায় অবস্থান কালে আমি মধ্যে মধ্যে এইরূপ স্বপ্নের আবেশে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতাম।

স্বপ্নশীল ছিলাম বলিয়া, আমি কাহারও সহিত মিলিতে মিশিতে বড় একটা ভাল বাসিতাম না। আমার সমবয়স্ক সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেরই অন্যপ্রকার প্রকৃতি ছিল। তাহাদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া বা আলাপ করিয়া আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত না। তাহাদের ও আমার রুচি, আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিতে আকাশ পাতালের প্রভেদ ছিল। সুতরাং আমি তাহাদের সহবাস হইতে দূরে থাকিতে পাইলেই যারপর নাই আনন্দিত হইতাম। প্রয়োজন ব্যতীত আমি কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিতাম না। এই কারণে, আমার সহপাঠীরাও আমার সহিত মিলিতে মিশিতে আদৌ ইচ্ছা প্রকাশ করিত না। তাহারা আমাকে অহঙ্কৃত, অসামাজিক ও পল্লীগ্রামবাসী বলিয়া উপহাস ও বিদ্রূপ করিত। অবশ্য আমার সাক্ষাতে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। সাক্ষাতে সম্মানেরই সহিত সকলে কথাবার্ত্তা কহিত; কিন্তু শুনিয়াছি, অসাক্ষাতে আমার অদ্ভুত প্রকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহারা বিলক্ষণ আমোদ সম্ভোগ করিত। আমি তাহাদের সম্মান বা বিরাগে অবিচলিত থাকিতাম। আমি কেবল জ্ঞানসঞ্চয়েই নিরত ব্যাপৃত থাকিতাম এবং অবসরকালে কল্পনাকে সঙ্গিনী করিয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বপ্নরাজ্যে প্রয়াণ করিতাম।

কলেজে কিয়দ্দিন অধ্যয়ন করিতে করিতে, একটী সহপাঠীর প্রতি আমার হৃদয় বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হয়। উদ্ধতস্বভাব চপলচিত্ত সহপাঠি-বৃন্দের মধ্যে কেবল সেই যুবকটিকেই শান্ত শিষ্ট ও সরলপ্রকৃতি দেখিতে পাইতাম। তাহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই প্রফুল্ল; দৃষ্টি সরল, স্নিগ্ধ, কোমল ও প্রেমময়—যেন তদ্দ্বারা তাহার হৃদয়ের সদ্ভাবগুলি আপনা আপনিই প্রকটিত হইয়া পড়িতেছে। সেই যুবকটিকে দেখিলেই তাহার সহিত বন্ধুত্ব

করিতে ইচ্ছা হইত; কিন্তু অনেকবার আলাপ করিব মনে করিয়াও তাহার সহিত আলাপ করিতে পারি নাই। একদিন কলেজের ছুটীর পর, আবাসে প্রত্যাগত হইবার কালে, ঘটনাক্রমে দুইজনে পথিমধ্যে একত্র হইলাম। দুই একটী কথা কহিয়াই যুবকটির হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। যুবকটিও সহপাঠীদের মধ্যে কাহারও সহিত পবিত্র বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন নাই। আমি যেরূপ তাঁহার সহিত, তিনিও সেইরূপ আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু তিনি আমার গম্ভীর প্রকৃতি দেখিয়া এতাবৎকাল ঘনিষ্ঠতা করিতে সাহসী হন নাই। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিলাম; বলিলাম "এখন আর শঙ্কার কোনও কারণ নাই। বাহ্যপ্রকৃতি স্বভাবতঃই সুন্দর। কিন্তু আকাশে সূর্য্য না থাকিলে, সেই সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্য ও বিষাদেরই ছায়া আসিয়া পড়ে। সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতি কেমন প্রফুল্ল হয়; তাহার শত সৌন্দর্য্য চারিদিকে কেমন উছলিয়া পড়ে! আশা করি, আপনিও আমার তমোময় জীবনের সূর্য্যস্বরূপ হইবেন।" সেইদিন হইতে সত্যেন্দ্র ও আমি অভিন্নহৃদয় হইলাম।

সত্যেন্দ্রের হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, জগতে তাহার তুলনা নাই। স্বর্গীয় সদ্ভাবকুসুমে তাহা উল্লসিত; তাহাদের দিব্য সৌরভে তাহা পরিপূরিত এবং এক স্নিগ্ধ, শুভ্র, অলৌকিক জ্যোতিঃতে তাহা উদ্ভাসিত। সত্যেন্দ্রের হৃদয় যে কি অপূর্ব্ব উপাদানে গঠিত, তাহা বলিতে পারি না। তাহাকে যতই জানিতে লাগিলাম, তাহার হৃদয়ের যতই পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সত্যেন্দ্রকে দেবকুমার বলিয়া মধ্যে মধ্যে আমার ভ্রম হইত। মানবসন্তানকে তো কখনও আমি এরূপ পবিত্র ও সুন্দর হইতে দেখি নাই। ঋষিকুমারেরা বুঝি এইরূপই ছিলেন। সত্যেন্দ্র বুঝি শাপভ্রষ্ট হইয়া মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে! সত্যেন্দ্রের দেহ, মন, আত্মা সমস্তই বুঝি একই উপাদানে গঠিত! অহো, সত্যেন্দ্র আমার মনে যে আলোক আনিয়া দিল, তাহাতে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া গেলাম। সত্যেন্দ্র সত্য সত্যই আমার তমোময় জীবনের সূর্য্যস্বরূপ হইল।

কি শুভক্ষণেই আমি সত্যেন্দ্রের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম! মাহেন্দ্র ক্ষণ কাহাকে বলে জানি না। কিন্তু এই মাহাক্ষণেই আমাদের বন্ধুতাসূত্র গ্রথিত হইয়া থাকিবে। এরূপ বন্ধু ও এরূপ মিলন জগতে অল্পই হইয়া থাকে।

সত্যেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া অবধি আমি আর একাকী ভ্রমণ করিতাম না। সমস্ত দিন মহোৎসাহে পাঠাভ্যাসে রত থাকিয়া আমরা উভয়ে বৈকালে ভ্রমণের সময় ব্যাকুলহৃদয়ে একত্র হইতাম। তখন আমরা উভয়ে একমন, একপ্রাণ, একহৃদয়। তখন আমাদের এক চিন্তা, এক আকাঙ্ক্ষা, এক চেষ্টা। তখন আমাদের উৎসাহের সীমা নাই, আনন্দের শেষ নাই। বিদ্যাশিক্ষায় আমাদের অনুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল; সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে আমরা আগ্রহান্বিত হইলাম, এবং সচ্চিন্তা, সদালাপ ও সদ্গ্রন্থপাঠে আমরা এক অপূর্ব্ব প্রীতি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। সহপাঠিবর্গ আমাদের স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। কেহ কেহ আমাদের হিংসা করিতে লাগিল; কিন্তু অনেকেই আমাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। সত্যেন্দ্রের ও আমার পরীক্ষার ফল আশাতীতরূপে সন্তোষজনক হইতে লাগিল। অধ্যাপকেরা আমাদিগকে যারপর নাই স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং সত্যেন্দ্র আমার ও আমিও সত্যেন্দ্রের উন্নতিতে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপে দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সত্যেন্দ্রকে আমি আমার প্রাণের অভাব, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য সমস্তই বলিতাম; সত্যেন্দ্রও আমাকে তাহার প্রাণের অভাব, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য সমস্তই বলিত। সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর আমার অন্তর্ব্বাহ্য যেরূপ জানেন, সত্যও আমার অন্তর্বাহ্য সেইরূপ জানিত। তাহার নিকট আমার গুপ্ত বা গোপনীয় কিছুই ছিল না। তাহার নিকটে কিছু গোপন করাকে আমি পাপ মনে করিতাম। যদি কখনও কিছু গোপন করিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে মনে কোন মতেই শান্তিসুখ অনুভব করিতে পারিতাম না। সত্যেন্দ্রও তাহার প্রাণের সকল কথা আমাকে বলিত। এইরূপে আমরা উভয়ে পরস্পরকে জানিতাম। পরস্পরের শক্তি, গুণ, ও দৌর্ব্বল্য পরস্পরের অবিদিত ছিল না। এই পারস্পরিক জ্ঞানের জন্য আমরা নিয়তই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতাম। পরস্পরের যত্ন ও চেষ্টায় আমরা আমাদের স্বভাবগত দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুণের সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

প্রাণের মিলন যাহাকে বলে, সত্যের ও আমার তাহা হইয়াছিল। আমি যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের একান্ত অনুরাগী, সত্য তাহা জানিত। ফলফুল লতা পাতা, বন জঙ্গল পাহাড় আমি যে অতিশয় ভাল বাসি, সত্যের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সত্য কখনও পাহাড় পর্ব্বত দেখে নাই, সুতরাং সে আমার নিকট তাহাদের বর্ণনা শুনিতে যারপর নাই কৌতূহল প্রকাশ করিত। গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশের সময় আমি পশ্চিম বঙ্গে জনক জননীর নিকট অবস্থান করিতাম। সত্যকে ছাড়িয়া সেই কতিপয় মাস অতিবাহিত করা আমার পক্ষে ক্লেশকর হইলেও কেবল একমাত্র স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উপভোগের লালসাতেই আমি সেখানে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতাম। কিন্তু সেখানে যাইয়া পূর্ব্বের মত আর আনন্দলাভ করিতাম না। সেই পাহাড় সেই জঙ্গল, সেই নদী, সেই খাল সমস্তই বিদ্যমান ছিল; কিন্তু আমার প্রাণের একটা স্থল যেন শূন্য পড়িয়া থাকিত; কিছুতেই আর তাহা পূর্ণ হইত না। তখন আমার বড় কষ্ট হইত; তখন ভাবিতাম, সত্য যদি নিকটে থাকিত, তাহা হইলে আজ প্রাণের মধ্যে এই অপূর্ণতা কখনই অনুভব করিতাম না। তখন বুঝিতে লাগিলাম, সত্যের সহিত কোন সৌন্দর্য্য উপভোগ না করিলে, তাহার আর মাধুর্য্য থাকে না।

পশ্চিমবঙ্গে বেড়াইতে যাইবার জন্য সত্যকে আমি অনেকবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও, সত্য একবারও আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার এই অসামর্থ্যের কতিপয় কারণও বিদ্যমান ছিল। সত্য বাল্যকাল হইতেই জনকজননীহীন; সত্যের পিতার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল; তাহার যেরূপ আয় ছিল, তাহাতে একটী পরিবারের সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। কলেজের ছুটী হইলেই, সত্য আপনার বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতে যাইত। প্রধানতঃ এই কারণেই, (অর্থাৎ কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করিয়া কেবল একমাত্র ভ্রমণজনিত আনন্দ সম্ভোগের জন্য,) আমি তাহাকে পশ্চিমবঙ্গে যাইতে বড় একটা অনুরোধ করিতাম না। আর একটী কারণেও, সত্য কলেজের অবকাশের সময় অন্য কোথাও যাইতে পারিত না। সত্যেন্দ্রর এক পিতৃস্বসা ছিলেন। তিনি পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। সত্যের মরুময় জীবনে করুণাময়ী পিতৃস্বসাই স্বর্গীয় স্নেহের একমাত্র নিস্যন্দিনী ছিলেন। তাঁহার পবিত্র স্নেহসিঞ্চনে সত্যের শোক-

সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইত। সুতরাং কলেজের অবকাশ হইলেই, সত্য পিতৃষ্বসার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইত। এই কারণেও, আমি সত্যকে পশ্চিমবঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিয়া তাহার সুখের এই সামান্য পরিমাণের আর হ্রাস করিতে চাহিতাম না। সত্য পৈত্রিক আবাসে বিষয়-কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিবৎসর গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশে পিতৃষ্বসার গৃহে গমন করিত। সেই গ্রামে তাহার পিতার জনৈক বন্ধুও বাস করিতেন। তিনি এবং তাঁহার পত্নীও সত্যকে যার পর নাই স্নেহ করিতেন। একবার পূজাবকাশের সময়, আমি সত্যের ও তাহার পিতৃষ্বসার সবিশেষ অনুরোধ-ক্রমে সত্যের সহিত সেখানে গমন করিয়াছিলাম। সত্যের পিতৃবন্ধু হরনাথ বাবুর সহিতও সেই উপলক্ষে আমি পরিচিত হই। তিনি অতিশয় মহাশয় ব্যক্তি। তিনি ধনশালী, শিক্ষিত ও উদারচরিত্র। তাঁহার একমাত্র কন্যা ভিন্ন আর কোনও সন্তান ছিল না। কন্যাটির নাম সুরমা। তখন তাহার বয়ঃক্রম দশ বা একাদশ বর্ষ ছিল। কন্যার তখনও বিবাহ হয় নাই। হরনাথ বাবু এত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কন্যার প্রতি অত্যধিক স্নেহই তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্পের প্রধান কারণ ছিল। বিবাহ হইলে, কন্যা পরের হইবে এবং পরগৃহে যাইবে, এই চিন্তায় হরনাথ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী কন্যার বিবাহ আরও দুই এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কন্যার উপযুক্ত পাত্র স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন ; সুতরাং কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহারা একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিলেন। কন্যার এই নির্ব্বাচিত পাত্র আর কেহই নহেন—আমার বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ।

হরনাথ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর এই সঙ্কল্পের কথা সত্য ও সত্যের পিতৃষ্বসা ব্যতীত আর কেহ জানিতেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমি সত্যের নিকটে যতদূর জানিতে পারিয়াছিলাম, সুরমা তাহা জানিত না। পিতামাতা সুরমার বিবাহের কথা তাহার সমক্ষে কখনও উত্থাপিত করিতেন না। আর সুরমাকে যেরূপ সরলা ও পবিত্র স্বভাবা দেখিলাম, তাহাতে তাহার মনে বিবাহের চিন্তা কখনও যে উদিত হইয়াছে, তাহা বোধ হইল না। আমরা হরনাথ বাবুর বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে কেহ নাই। হরনাথ বাবু কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন, এই মনে করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখি-লাম, বহির্ব্বাটীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানে একটী সুন্দরী বালিকা এক শেফা-

লিকা বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়া একমনে পুষ্পসংগ্রহ করিতেছে। সত্য তাহাকে দেখিবামাত্র ডাকিল "সুরমা"। সুরমা চকিতার ন্যায় একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া সত্যকে দেখিবামাত্র আনন্দধ্বনি করিতে করিতে তাহার দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে আমাকে দেখিয়া সহসা স্থির হইল এবং "সত্তু দাদা, যেও না; বাবাকে ডেকে আনি" এই বলিয়া ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই, হরনাথ বাবু বহির্ব্বাটীতে আসিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হস্ত অবলম্বন করিয়া আনন্দ ও উল্লাসের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি সুরমাও আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্য হরনাথ বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে এবং তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিতেছে, ইত্যবসারে সুরমা সত্যের হাত টানিয়া আব্‌দারের স্বরে বলিতে লাগিল "সত্তুদাদা, বাড়ীর ভেতর একবার এস না, মা তোমায় ডাকৃচেন।" কন্যার আগ্রহ দেখিয়া হরনাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন "সতু, সুরমার জিদ্ দেখ্‌ছ না, আগে তুমি বাড়ীর ভিতর থেকেই হ'য়ে এস; আমি ততক্ষণ দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কই।" এই বলিয়া, তিনি আমার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন।

সুরমাকে এই প্রথম দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধে আমার মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহাই দেখাইবার জন্য আমি এই ঘটনাটি একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিলাম। সত্য সুরমার সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আমাকে অনেক কথা বলিয়াছিল। সুরমা সত্যকে কখন কখন পত্রও লিখিত। সেই পত্রগুলিও আমি দেখিয়াছিলাম। বন্ধুর বর্ণনে ও সেই পত্রগুলিতে আমি সুরমার সরল পবিত্র-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং মনে মনে তাহার একটী চিত্রও আঁকিয়া লইয়াছিলাম। এক্ষণে স্বচক্ষে সুরমাকে দেখিয়া বুঝিলাম, আমার কাল্পনিক চিত্র জীবন্ত চিত্রেরই অনুরূপ বটে।

হরনাথ বাবুর সহিত নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময়ে সত্য সুরমার সহিত অন্তঃপুর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরনাথ বাবু সত্যকে দেখিয়া বলিলেন "সতু, তুমি সুরোকে যে বইখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলে, তা ও কতদূর পড়েছে, দেখ্‌লে?" সুরমা পিতার কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিল "আমি বইখানি আগাগোড়া পড়েছি। মাকে আমি সীতা সাবিত্রীর কথা অনেকবার পড়ে শুনিয়েছি।" এই বলিয়া সুরমা তদণ্ডেই অন্তঃপুর হইতে তাহার উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকখানি আনিয়া উপস্থিত

করিল। বালিকা আসিয়াই স্ফূর্ত্তির সহিত বলিতে লাগিল "এতগুলি গল্পের মধ্যে সীতা ও সাবিত্রীর গল্পই আমার বড় ভাল লেগেছে। মা বল্‌ছিলেন, যমকে কেউ বশীভূত কর্‌তে পারে না; কিন্তু সাবিত্রী খুব ভালমেয়ে ছিল বলেই, যম তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। হাঁ সতুদাদা, সাবিত্রী কি খুবই ভাল মেয়ে ছিল? আচ্ছা, ভাল মেয়ে কেমন ক'রে হ'তে হয়, কই বইয়ে তো তা লেখা নাই?" বালিকার আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা দেখিয়া সকলেই বড় আনন্দিত হইলাম। আমি ভাবিলাম, সুরমা যদি কখনও আমার বন্ধুর জীবনের সঙ্গিনী হয়, তাহা হইলে, তাহারা উভয়েই যথার্থতঃ সুখী হইবে। (ক্রমশঃ)

প্রতিবাদ।

দাসীর ১১শ ও ১২শ সংখ্যায় শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছেন। আমরা অতীব আগ্রহের সহিত এই প্রবন্ধটী পাঠ করিলাম। কিন্তু উহাতে এমন কয়েকটী কথা দেখিলাম, যাহা আমাদিগের নিকট অত্যন্ত আপত্তিজনক বলিয়া বোধ হইল। আদি, ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও কার্য্যগত যে যে প্রভেদ আছে, তাহা অনেকেই জানেন। আদি সমাজ যে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে "হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণাকার" মনে করেন, তাঁহারা যে "সমাজ সংস্কার স্বেচ্ছাধীন" বলেন, আর "হিন্দুধর্ম্মের সকলই থাকিতে পারে, কেবল পরিমিত দেবতার পরিবর্ত্তে অপরিমিত দেবতা আসিবেন" এইরূপই যে তাঁহাদিগের মনোভাব, তাহাও আমরা অবগত আছি। সুতরাং সে সকল মতদ্বৈধ সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ করিয়া কোনও ফল দেখা যায় না। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে মাননীয় বসু মহাশয় এমন দুই চারিটী কথা বলিয়াছেন, যাহা কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না। তজ্জন্যই আমরা নিতান্ত কর্ত্তব্য-বোধে সেই কথাগুলির প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। বসু মহাশয় বয়সে আমাদিগের পিতৃতুল্য, জ্ঞানে গুরুতুল্য এবং ধর্ম্মে আচার্য্য তুল্য। তাঁহার কথার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে যাওয়া আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতা ও অনধিকার চর্চ্চা সন্দেহ নাই। তথাপি যে কেন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে

সাহস করিতেছি, ভরসা করি, ভক্তিভাজন বসু মহাশয় এবং সহৃদয় পাঠক-মণ্ডলী তাহা বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

উক্ত প্রবন্ধের একস্থলে লিখিত হইয়াছে, "মহর্ষির মত এই যে, দেশী প্রথা যতদূর রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা রক্ষা করিয়া পৌত্তলিক আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি ব্রাহ্মদিগের সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত; সামাজিক সংস্কার করা আর না করা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। এই প্রকারে তিনি সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারের পার্থক্য ব্রাহ্মসমাজে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আমার মতে এই প্রকার পার্থক্য রক্ষা করাই উচিত।" এ পর্য্যন্তও আমাদিগের বলিবার কিছু নাই। কেন না মহর্ষির মত কি, তাহা বসু মহাশয় যেমন জানেন, আমাদের ততদূর জানিবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু, তাঁহার নিজের মত সম্বন্ধেইবা আমাদিগের বলিবার কি আছে? কিন্তু ইহার পরের কথা অতি গুরুতর। তাহা এই "যে ব্রাহ্ম গার্হস্থ্য ক্রিয়াতে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে কখনই ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না; কিন্তু যিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা রক্ষা করিয়া যিনি ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাকেও ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না। যেহেতু ব্রাহ্ম শব্দে হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা পরব্রহ্মের উপাসক বুঝায়; অতএব যে ব্রাহ্ম হিন্দুভাব-সম্পন্ন নহেন, তাঁহাকে প্রকৃত ব্রাহ্ম বলা যায় না, তিনি Theist।"

বিচারের সুবিধার জন্য আমরা এই কথাগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লইব।

(১) "যিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ হিন্দু-ধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা রক্ষা করিয়া যিনি ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাকেও ব্রাহ্ম বলা যায় না।"

'ব্রাহ্ম' নামের এই সংকীর্ণ ও বিষম অর্থ আমরা এই প্রথম শুনিলাম। হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে, যিনি তাহা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহেন, তিনি ব্রাহ্ম নহেন! লেখক মহাশয়ই তো অন্য স্থানে বলিয়া-ছেন, "যাহা সত্য, তাহা সকল স্থানে ও সকল সময়েই সত্য, সেই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বের ধর্ম্ম।" তবে কি বিশ্ববাসী ব্রাহ্ম মাত্রকেই "হিন্দুধর্ম্মের

যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে” তাহা রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার করিতে হইবে? তৎপর, “হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে,” এই “যাহা কিছু” কাহাকে বলেন? এ বিষয়ে তো সর্ব্বদাই মতভেদ দেখা যাইতেছে। আপনি যাহা রক্ষা করা যাইতে পারে ভাবিতেছেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো তাহাই বর্জ্জনীয় মনে করিতেছেন। মহর্ষি বলেন, পৌত্তলিকতা ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মের সকলই থাকিতে পারে; অথচ সমুদ্র-গমন, যবনান্ন গ্রহণ, শূদ্রাদির বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের একান্ত বিরোধী আচরণগুলি তো তাঁহারই পরিবারে ও শিষ্যমণ্ডলীতে সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইতেছে। যে নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসক; যিনি ঈশ্বর-বোধে কোন প্রকার পরিমিত পদার্থের উপাসনা করেন না; ঈশ্বরে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই যাঁহার জীবনের ব্রত; সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় মানবের প্রতি যিনি উদার ভ্রাতৃভাবসম্পন্ন; যিনি যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের বিশুদ্ধ সাধনায় নিযুক্ত আছেন; তিনি যদি “হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারে” ইচ্ছুক নহেন, তবে তিনিও ব্রাহ্ম নহেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ তাঁহার একটী আধুনিক উপদেশে বলিয়াছেন, “আমরা আদি ব্রাহ্ম, সাধারণ ব্রাহ্ম, মন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্ম বা অন্য কোনরূপ ব্রাহ্ম—এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বিস্মৃত হইয়া আমরা ব্রাহ্ম, এক ঈশ্বরের উপাসক, এক পিতার পুত্র, মনুষ্য আমাদের ভ্রাতা, এই মহৎ ভাবটীর উপর আত্মার সমস্ত ঝোঁক সমর্পণ কর।” মহর্ষির এই উক্তিতে কেমন উদার ও বিশ্বজনীন ভাব প্রকাশ পাইতেছে! কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ বসু মহাশয় তাঁহার সংকীর্ণ হিন্দু-গণ্ডীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, তোমরা পৌত্তলিকতাদি পরিত্যাগ করিলেও, হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে, যদি তাহা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক না হও, তবে তোমরা ব্রাহ্মই নহ। কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বসু মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আরও গুরুতর—

(২) “যেহেতু ব্রাহ্ম শব্দে হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা, পর-ব্রহ্মের উপাসক বুঝায়। অতএব যে ব্রাহ্ম হিন্দুভাব সম্পন্ন নহেন, তাঁহাকে প্রকৃত ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না, তিনি Theist.”

এ অতি ভয়ানক কথা! “হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা”র অর্থ কি?

আমরা তো উহার সহজ অর্থ এইরূপ বুঝি যে, হিন্দুজাতি যে বহু দেবতার বিশ্বাসী, পরব্রহ্ম সেই সকল দেবতার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। অর্থাৎ হিন্দুদিগের ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতা, কালী, দুর্গা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবতা, লক্ষ্মী নারায়ণ প্রভৃতি গৃহ দেবতা, জরাসুরা, শীতলা প্রভৃতি গ্রাম্য-দেবতা এবং প্রেত পিশাচাদি অপদেবতা, এইরূপ যে তেত্রিশ কোটী দেবতা আছে, তন্মধ্যে "পরব্রহ্ম" নামে এক দেবতা আছেন, সেই দেবোপাসকদিগকেই ব্রাহ্ম বলে। তাঁহারা যখন হিন্দুর দেবতার উপাসক, তখন ত তাঁহারা "হিন্দুভাবসম্পন্ন" হইতে বাধ্য; অন্যথা তাঁহাদিগকে প্রকৃত ব্রাহ্ম বলা যাইবে না, তাঁহারা "Theist." এইক্ষণ আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই, হিন্দুরা যে তেত্রিশ কোটী দেবতা মানেন, ব্রাহ্মদিগের উপাস্য "পরব্রহ্ম" কি সেই সকল দেবতার "সর্ব্বপ্রধান দেবতা?" শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মগণও কি হিন্দুদিগের স্বীকৃত কোন একটী দেবতার (অবশ্য সর্ব্বপ্রধান দেবতার) উপাসক মাত্র? বৈষ্ণব প্রভৃতি যেমন নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকেই প্রধান বলেন, অথচ অন্যান্য দেবতাও মানেন, ব্রাহ্মগণও কি সেইরূপ ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রধান "হিন্দু-দেবতা" বলিয়া অন্যান্য দেবতাকে "অপ্রধান দেবতা" বলেন? তাঁহারাও কি কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন? শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ন্যায় একজন অগ্রগণ্য ব্রাহ্ম বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মদিগের উপাস্য পরব্রহ্ম কেবল হিন্দুদিগেরই সর্ব্বপ্রধান দেবতা; তিনি মুসলমান, খৃষ্টান বা ইহুদীর কেহ নহেন; কেননা যদি তিনি সকলেরই ঈশ্বর হয়েন, তবে তো আমাদিগকে সকল ধর্ম্মেরই যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহাই রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার করিতে হইবে। তাহা কি সম্ভব?

হা! এতদিন পরে কি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত আমাদের মত লোকের ব্রহ্মতত্ত্ব লইয়া বিচার করিতে হইবে? সেই অনাদি অনন্ত জগন্নিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর যে হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা মাত্র নহেন, কিন্তু তিনিই যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র দেবতা, এবং মনুষ্য মাত্রেরই "একমেবাদ্বিতীয়ং" উপাস্য, একথা কি আমরা তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট হইতেই শিক্ষা করি নাই? তবে আজি একথা কেন? রাজর্ষি রামমোহন, বেদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে যে "একমেবা-

দ্বিতীয়ং” সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মই মানবের একমাত্র উপাস্য ; তিনি তো কোথাও এমন কথা বলেন নাই যে, হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতাই জগতের উপাস্য। মহর্ষি প্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্মবীজেও তো এমন কথার কোনও আভাস পাওয়া যায় না। তদীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে ব্রহ্মের স্বরূপাদি যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাতেও তো আমরা পরম-ব্রহ্মকে হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমরা গভীর দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, “ব্রহ্মশব্দে হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা পরব্রহ্মের উপাসক বুঝায়” বসু মহাশয়ের এইকথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলাম না। এবং “যে ব্রাহ্ম হিন্দুভাব সম্পন্ন নহেন, তাঁহাকে প্রকৃত ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না,” তদীয় এই উক্তির প্রতিও আমরা শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে না পারিয়া অতীব মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইলাম। অহিন্দুভাবাপন্ন ব্রাহ্মদিগকে তিনি ব্রাহ্ম না বলিয়া Theist বলিয়াছেন ; উক্ত শব্দের তিনি কি অর্থ করেন জানি না ; আমরা তো ঐ শব্দ ব্রাহ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া থাকি।

উক্ত প্রবন্ধে বসু মহাশয় ব্রাহ্ম বিবাহ বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, অতঃপর আর তদ্বিষয়ে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি আদি সমাজের সপ্তপদী গমন ও লাজবর্ষণ প্রভৃতি প্রথা সমন্বিত বিবাহকেই ব্রাহ্মবিবাহ বলেন ; ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত বিবাহকে বিবাহই বলেন না। এক সময়ে এই বিষয় লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এইক্ষণ আর তদ্বিষয়ে বাক্যব্যয় না করাই ভাল। আমরা মাননীয় বসু মহাশয়কে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন কায়স্থবংশীয় ব্রাহ্মের কন্যা কোনও ব্রহ্মনিষ্ঠ সুচরিত্র ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত পরিণীতা হইতে অভিলাষিণী হয়েন, উক্ত যুবকও যদি তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী করিতে অভিলাষ করেন, তবে কি বসু মহাশয় ধর্ম্মতঃ সেই বিবাহের বিরোধী হইতে পারেন ? যদি সেই বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত মনে হয়, তবে উহা (ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিবাহ) আদি সমাজের “ব্রাহ্ম বিবাহ” মতে সম্পন্ন হইলে “হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বৈধ বিবাহ” হইতে পারে কি ? আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হউন। তিনিতো ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিশ্ববাসীর ধর্ম্মই বলিয়াছেন। মনে করুন্ একজন মুসলমান যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ; তাঁহার ইচ্ছা তিনি ভক্তি-ভাজন প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম

খীজে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দীক্ষিত হইবেন; বসু মহাশয় কি তাঁহাকে দীক্ষিত করিতে অসম্মত হইতে পারেন? কদাপি নহে। এখন এইরূপ কোন ব্রাহ্ম-যুবকের বিবাহসময়ে কি আদি সমাজের ব্রাহ্মবিবাহ-পদ্ধতি চলিবে? উহাও কি "হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বৈধ বিবাহ" বলিয়া গণ্য হইবে? তিন আইন যে "ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন" নহে এবং উহার সাহায্য গ্রহণ করা যে সর্ব্বথা সুবিধাজনক নহে, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। তবে যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদিগের জন্য স্বতন্ত্র রাজবিধি না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত পার্থিব বিষয়াদির জন্য উহার সহায়তা গ্রহণ করা হয়, এইমাত্র।

উপসংহারে আমরা পুনরায় ভক্তিভাজন বসু মহাশয়ের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। নিতান্ত কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা তাঁহার সহিত এরূপ অপ্রিয় বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছি। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কুত্রাপি যদি অজ্ঞাতসারেও কোন প্রকার অসম্মানসূচক কথা বলিয়া তাঁহার অন্তরে বেদনা দিয়া থাকি, তজ্জন্য যেন তিনি আমাদের অপরাধ গ্রহণ না করেন।

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

পুষ্প।

Flower in the crannied wall,
I pluck you out of the crannies,
I hold you here, root and all, in my hand,
Little flower—but *if* I could understand
What you are, root and all, and all in all,
I should know what God and man is.

—*Tennyson.*

স্নেহভাজনেষু।

তুমি আমাকে ফুলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিষম বিপদে ফেলিয়াছ। কিসে আপনাকে ব্যক্ত করিব ভাবিয়া পাইতেছি না; ফুল যে বুঝাইবার নহে, বুঝিবার—তাহাও সম্পূর্ণরূপে নহে। ক্ষুদ্র ফুল দেখিতে যত ক্ষুদ্র দেখায়, বুঝিতে গেলে তাহা অনন্ত পরিমাণে বাড়িয়া যায়। ক্ষুদ্র ফুল আয়ত্ত করা যাহা, এই বিশ্বজগতের অসীম রহস্যরাজ্য আয়ত্ত করাও যে তাহাই।

আমরা সচরাচর ফুলে যাহা দেখি, ফুল চিরকাল তদপেক্ষা অধিক দেখাইবার প্রয়াস করিতেছে। সামান্ত অভিনিবেশেই তাহা অনুভূত হয়, বেশী দূর যাইতে হয় না, আমরা পদে পদে ফুলকে অসীম এবং অতলস্পর্শ বলিয়া অনুভব করি।

ফুল অসীম এবং অতলস্পর্শ বলিলাম, আরও বলিব—ফুল পৃথিবীতে অতুলনীয়। যদি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে চাও, তবে ফুল বুঝিতে পারিবে না। তুমি, বোধ করি, আধুনিক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাসের কবিতা পড়িয়াছ। এই কবির উলঙ্গ এবং উন্মাদময় কবিতার মধ্যে আমি এক জায়গায় একটা অতি গভীর এবং হৃদয়ঙ্গম কথা পাইয়াছি। কবি তাঁহার হৃদয়-রাণী সারদার পূজা করিতে যাইতেছেন। কি দিয়া পূজা করিবেন? পৃথিবীতে দেবীর উপযুক্ত জিনিষ কি আছে? তিনি উদ্বোধনে গাহিতেছেন:—

সারদা হৃদয়রাণি প্রীতির প্রতিমা খানি
এস গো, পূজিব আজ প্রেম ও ফুলে!
তব যোগ্য উপহার জগতে নাহি যে আর,
পৃথিবীর স'বি মাখা মাটি ও ধূলে।

প্রেম ও ফুল! মানব-হৃদয়ের প্রেম, প্রকৃতি-হৃদয়ের ফুল, এ জগতে দেব-পূজার তদপেক্ষা আনন্দিত উপকরণ নাই, আর সমস্ত অপবিত্র, "মাখা মাটী ও ধূলে।" ফুলের সঙ্গে শুধু একটী জিনিষের তুলনা হয়, তাহা অদৃশ্য অস্পৃশ্য এবং রহস্যময়; তাহা এই প্রেম। প্রেমের তুলনীয় ফুল, ফুলের তুলনীয় প্রেম। ফুল সৌন্দর্য্য, প্রেম আকর্ষণ। সৌন্দর্য্যে প্রেম জন্মায়, আবার প্রেমেই সুন্দর করে; প্রেম ও ফুল প্রকারান্তরে অচ্ছেদ্য ভাবে অনুবদ্ধ হইয়া এই জগৎসৃষ্টির অন্তররহস্যে অবস্থান করিতেছে।

প্রাচীন হিন্দুরা ইষ্টদেবতার পূজা করিতেন—উপকরণ ছিল, হৃদয়ের প্রেম এবং অকিঞ্চন পুষ্প চন্দন। সচন্দন জবাপুষ্প এবং প্রীতি-বিচ্ছুরিত শোণিতরাগরক্ত হৃদয়, দুইটিই জগদম্বার প্রিয় এবং এই পৃথিবীর সার। তাঁহারা জানিতেন ফুল হইতে প্রেম পৃথক নহে, একজাতীয়; তাঁহারা দুইটিকে ভিন্ন করিয়া দেখিতে পারিতেন না। সকল দেশে এবং সকল কালেই এই ফুল আদরের, আনন্দের এবং উৎসবের চিহ্ন। প্রেমের অধি-দেবতা যিনি, তাঁহার বিজয়াস্ত্র ফুল; ফুলের বন্ধন জগতে চিরকাল প্রেমের বন্ধন। ফুলের অসীম শক্তি, মানবের যেই উদ্দাম বৈরগতি কঠিন লৌহ-

শৃঙ্খলেও নিয়ন্ত্রিত হয় না, পুষ্পশৃঙ্খল তাহাকে অনায়াসে বিজিত এবং অভিভূত করিয়া ফেলে। এমন অতুলনীয়, অননুভবনীয় ফুল, তুমি তাহারই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিয়াছ; সুতরাং বুঝিতে পার পদে পদে আমার দুর্ব্বলা ভাষা এবং চিন্তা ব্যর্থ এবং বিফল হইবার উপক্রম করিতেছে কি না।

ফুলে এক প্রকার মাদকতা আছে, একমাত্র হৃদয়ের দ্বারাই তাহার অনুভব হয়। ফুলকে বুঝিবার পথে ইহাই একমাত্র সহায়, অথবা অন্তরায়। আজ প্রভাতে পুষ্পোদ্যানে বসিয়াছিলাম, চারিদিকে জ্যোতিশ্ছায়ার মত শত শত ফুল ফুটিতেছিল, একমনে তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলাম। কোন ফুল শিশুর অধরে হাসির মত, কোন ফুল অশ্রুসজল দুঃখের মত, কোনটী ভয়ের মত, বিস্ময়ের মত, কোনটী বা রাঙ্গামুখী লজ্জার মত!—আমাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্ব্বাক্ এবং স্পন্দহীন করিয়া ফেলিল। আমার চারিদিকে জাগ্রত প্রাণীসঙ্ঘের উচ্চ-কলরব, এবং পাখীর তীব্রসঙ্গীত; কিন্তু ফুলের বিকাশেও যেন একটা সঙ্গীত আছে; আমার কার্ণে সেই সঙ্গীত আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। তাহা স্পষ্ট করিয়া শুনিবার জন্য আমি নিতান্ত কুতূহলের সহিত চিত্তকে অধিকতর সমাহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বোধ হইল বাহিরের কোলাহল ক্রমে ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে; সর্ব্বশেষ আমার অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রপথ হইতে জগৎসংসার যেন ছায়ার মত সরিয়া পড়িল এবং এক অননুভূতপূর্ব্ব নিবিড় নিস্তব্ধতায় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়পথ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি যেন ডুবিতে ডুবিতে এই চির-কল্লোলময় জগৎসমুদ্রের তলভাগে নামিয়া পড়িয়াছি; জগতের এই মৃত্তিকা-ময় আচ্ছাদনটি যেন সহসা অপসৃত হইয়া গিয়াছে, আর আমি তাহার কেন্দ্রদেশে, তাহার হৃদয়মধ্যে চলিয়া আসিয়াছি। সেখানে মানুষের হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত রক্তপ্রবাহের মত একটা প্রবল আনন্দপ্রবাহ! জল-বুদ্‌বুদের মত প্রতি মুহূর্ত্তে তথা হইতে অসংখ্য ফুল ধরাপৃষ্ঠে ফুটিয়া উঠিতেছে। আমার হৃদয় বাতাসের ন্যায় ফুলের চারিদিকে নাচিতে লাগিল। মধুকরের ন্যায় ফুলের বুকে ঢলিতে লাগিল। গন্ধের ন্যায় চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তবু একটী ফুলও ধরিতে পারিলাম না,—একটী ফুলও ভাল করিয়া আয়ত্তীকৃত করিতে পারিলাম না। আমার জ্ঞান ক্ষুদ্র, ফুল অনন্ত। সেই ফুলগুলি এখনো বাগানে ফুটিয়া আছে। আমার সমস্ত জ্ঞান-গরিমা এবং বিফল

গবেষণা যেন তাহাদের চিক্কণ দলগুলির অন্তরালে অন্তরিত করিয়া সুগভীর পরিহাসের সহিত চাহিয়া আছে!

তবু মনে হইতেছে, কি যেন কোথায় পাইয়াছি; তাহাই তোমাকে প্রত্যুত্তরে জানাইবার চেষ্টা করিলাম। কথাগুলি তোমাদের বৈজ্ঞানিক চক্ষে ছায়ার মত প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিও, একভাবে জগতের সমস্তই ছায়া। ধ্যানস্থের নিকট এই চলাচল ভূতগ্রাম বাষ্পের মত অদৃশ্য হইয়া যায়;—শুধু যাহা সনাতন, যাহা ইহার ধর্ম্ম অখণ্ড এবং অমৃত তাহাই ভাসিয়া উঠে। পুষ্পের ভিতরেও যদি কোন অখণ্ড এবং অমৃত ধর্ম্মের সর্ব্বাভিভাবক বন্ধনরজ্জু সঞ্চরিত হইয়া থাকে, তাহার অন্বেষণ করিব। আর ছায়ামাত্রেই যে মিথ্যামূলক ইহা কে বলিল? ছায়াই ত চিরকাল কায়ার অনুমাপক বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে!

পুষ্প সৃষ্টির গুপ্ত আনন্দ—উথলিয়া পড়িতেছে। বিশ্বপ্রকৃতির এই রহস্যবসনের অন্তরালে যে একটা অতি প্রবল আনন্দপ্রবাহ ইহাকে চিরকাল সঞ্জীবিত এবং সংরক্ষিত করিতেছে, তাহা যেন সে আর লুকাইয়া রাখিতে পারে নাই—ফুলগুলি হাস্য প্রফুল্ল অধর দলের মত বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই পুষ্প দেখিলেই মনে হয়, এই মৌনময়ী আবেগময়ী প্রকৃতির একটি মৌনময় এবং আবেগময় ইঙ্গিত যেন চিরকাল উদ্যাক্ত এবং উন্মুক্ত হইয়া আছে।

পুষ্প প্রকৃতির মুখ; কেননা পুষ্পেতেই ইহার হৃদয়ের অনবচ্ছিন্ন ছায়া প্রতিভাত হইয়াছে,—প্রকৃতি নিজের জন্য নহে, যেন আর কাহার জন্য বাঁচিয়া আছে। প্রকৃতি সুদূর ভবিষ্যতের অস্পষ্ট কুহেলিলীলায় কাহার সুমহৎ অস্তিত্ব এবং সম্পূর্ণ আদর্শবিম্ব উৎপ্রেক্ষা করিয়া ভূমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; দণ্ডে, দিনে, মাসে, বৎসরে শতাব্দীতে নিজকে সহস্ররূপে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহারি অনুরূপ করিয়া গঠিবার চেষ্টা করিতেছে; নবঋতু সমাগমে নব নব বেশ ধারণ করিয়া হৃদয়গত এক প্রচণ্ড মহাদ্রাবকের তাড়নায়, উত্তেজনায় অনন্ত আকাশে শাঁ শাঁ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে! প্রকৃতির এই প্রবল আত্মনিস্পেষক, আত্মনিঃসারক এবং আত্মবিনাশক ভাব, তবু প্রকৃতি কেমন শান্ত, স্থির, যেন কোথাও কিছু আয়াস নাই, যেন কোথাও কিছু হয় নাই। আবার, প্রকৃতি কেমন গোপনে অযাচিত ভাবে আসিয়া আমাদের উপকার করে—আমরা ত ক্ষেতে বীজ বপন করিয়া

আসি মাত্র; প্রকৃতি আপনা আপনি আসিয়া ধারাসারের উপর ধারাসার ঢালিয়া আমাদের সেই নিদাঘের শুষ্ক কঠোর ক্ষেত্রগুলিকে সরস করিয়া লীলাতরঙ্গিত হরিৎ সমুদ্রে পরিণত করে; এবং সেই চিরচঞ্চল হরিৎতরঙ্গগুলির উপর কালে রাশি রাশি স্বর্ণকণিকা ছড়াইয়া রাখিয়া যায়। প্রকৃতির এই যে সজীব মৌনভাব, এই যে অযাচিত আত্মদান এবং বিপুল আত্মবিস্মরণ ইহা ফুলের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠিয়াছে।

ফুল কেন ফোটে, কাহার জন্য ফোটে, কে জানে? নিজকে বিকশিত করা ফুলের যত উদ্দেশ্য, নিজকে প্রকাশিত করা যেন ততটা নহে। ফুলের অসীম ধৈর্য্য। যেখানে লোক নাই, নয়ন নাই, হৃদয় নাই, ফুল সেখানেও ফোটে, জনহীন গহন বিপিনের আঁধার গুহাভ্যন্তরে পত্রান্তরালে লুকাইয়া লুকাইয়া ফুল হাসিতে থাকে। কে জানে ফুলের কেন এত আনন্দ, যে সমভূতি চায় না, প্রশংসা চায় না; শুধু নীরবে, নির্জ্জনে জোনাকির মত আপনার আনন্দালোকে আপনাকে নিমগ্ন এবং অভিভূত করিয়া রাখিতে চায়।

ফুলের ভিতর কত পরিবর্ত্তন! প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র আয়ুঃসীমায় ক্ষুদ্র ফুলের ভিতর কত ভাঙ্গা গড়ার ধুম! ইহারই ভিতর নিজের সবখানির সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে, ইহারই মধ্যে জড়িত কুঞ্চিত দলগুলিকে পূর্ণরূপে উন্মেষিত করিয়া রূপের হাট বসাইতে হইবে; অতিথি অভ্যাগতের যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিতে হইবে, এবং আত্মভাণ্ডারের সমস্ত মধু এবং গন্ধ পর্য্যবসিত করিয়া, শেষে নিজকে সহস্রধা বিভক্ত করিয়া দশদিকে অভিব্যাপ্ত হইতে হইবে, ক্ষুদ্র ফুলের অত কাজ, তাহার ভিতর অত ছুট্‌ছুটি, প্রত্যেক পরমাণুর অত হাঁকাহাঁকি! তবু ফুল যেন নির্ব্বিকার শান্ত, যেন কোথাও কিছু হয় নাই!

আবার ফুলের কেমন মহান্ আত্মোৎসর্গ! ফুল কেন ফোটে? ফুলের ফুটিয়া কি সুখ? অমন গন্ধ, অমন সৌরভ-গৌরবে সজ্জিত হইয়া ফুলের লাভ কি? ফুলের গন্ধ পরের জন্য; ফুলের সৌরভ পরের জন্য, এক কথায় ফুলের সমস্তটা পরের জন্য; সুন্দর ফুল দেখিলে লোকে ছিঁড়িয়া লয়, সুগন্ধি ফুল লোকে নাকের কাছে আনিয়া উত্তপ্ত নিশ্বাসে শুকাইয়া দেয়; তবু ফুল ফোটে; ফুলের হাসি কমে না। ফুলের অভিমান নাই, বিবাদ নাই। তাই ফুল প্রকৃতির মুখ; স্নেহময়ী, ধৈর্য্যময়ী, অন্নপূর্ণাস্বরূপিণী প্রকৃতির হৃদয়বিম্ব আমাদিগের সম্মুখে আবিষ্কৃত করিয়াছে।

পুষ্পের সৃষ্টি কেন? মানুষ যাহাকে হিত (utility) বা প্রয়োজন বলে, পুষ্পের সৃষ্টি তেমন কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নহে। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়—সাধারণ মনুষ্যের প্রিয়ভূত এই চতুর্ব্বিধ বস্তুবিভাগের কোনটিতেই ফুল বিশেষ গৌরবের সহিত দাঁড়াইতে পারে না। ফুলে মধু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ফুল না থাকিলেও তাহার কোন বিশেষ অভাব ঘটিত না। কারণ মধুকরেরা পত্র হইতেও মধু আহরণ করে। আবার সূর্য্যোদয়ের প্রারম্ভে পূর্ব্বাকাশের রক্তিমাচ্ছটার মত ফুল ফলের হিসাবেও নিষ্প্রয়োজন; অতি ক্ষীণ কোমল দলগুলির দ্বারা ফুলের গর্ভবীজের যে পরিমাণে সংরক্ষণ এবং পরিপোষণ হইয়া থাকে, কঠোর পত্রের দ্বারা তদপেক্ষা বেশী হইতে পারে, বিশেষতঃ ফুলের এই দলগুলির সৌন্দর্য্যে এবং সৌরভে আহুত হইয়া অনেককীট আসিয়া ফুলে বাসা করিয়া থাকে, এবং তাহাতে ফুলের সমূহ অনিষ্টই হয়।

ফুলের সৃষ্টি শুধু সৌন্দর্য্যের হিসাবেই সার্থক। আবার সৌন্দর্য্যও এই হিতবাদের কাছে টিকিতে পারে না। সৌন্দর্য্য জগতের হিসাবে নিষ্প্রয়োজন; সৌন্দর্য্য শুধু অনন্তের হিসাবেই সার্থক। মানব জগৎকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত চর্ব্ব্যাদি লইয়া আর মানব স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছে না,—প্রভাতসূর্য্যের সুপ্তোত্থিত—তরল কিরণের ন্যায় মানবহৃদয় সমস্তের আদিকারণ জিজ্ঞাসায় উৎকলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মানবের দৃষ্টি ক্ষীণ সীমাকাঙ্ক্ষী, তাহার দৃষ্টিই তাহার চারিদিকে অনন্ত আকাশের ঘননীলিমার মত একটা অন্ধকার আবরণ ঘনাইয়া তুলিয়াছে। মানব বার বার তাহার ক্ষুদ্র পক্ষদ্বয়ের (প্রত্যক্ষ এবং তন্মূলক অনুমানের) উপর ভর দিয়া উঠিতেছে, আর হতাশ ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে "প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধি", বলিয়া বিরত হইতেছে। এই ভগ্না-শায় এবং অশান্তির ঘোর দুর্দ্দিনে সৌন্দর্য্যই মানবের একমাত্র আশার এবং বিশ্বাসের অবলম্বন. সৌন্দর্য্য আপনার জগদতীত কৌলীন্য-মর্য্যাদায় মানব-হৃদয়ে অমরতার আশীর্ব্বাদ আনিয়াছে এবং এক মঙ্গলময় আদিকারণের উদার অমৃতমধুর অস্তিত্বাশ্বাসে মানবের কল্পনাপথ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং সৌন্দর্য্য প্রয়োজনের হিসাবে হীনপ্রভ হইলেও ভাবতঃ এই জগতের একান্ত সন্তর্পণ এবং আশ্রয়, সৌন্দর্য্যে বাস্তবিক প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়ের ভাবই অধিক।

পুষ্পের সমস্তই সৌন্দর্য্য। প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য পুষ্পে সংক্ষেপিত

হইয়াছে, এবং এই সৌন্দর্য্যই ফুলের সার্থকতা, সুতরাং পুষ্পেও প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়ের ভাগ অধিক। পুষ্প মানবের নয়নে সৌন্দর্য্য প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে, মানবের নিকট একটা অসীম সৌন্দর্য্যগৌরবের এবং পরম্পরায় আভাস আনিয়াছে; এবং প্রভাতের শুকতারার মত চিরকাল এই ইহপারের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে পরপারের জ্যোতির্ব্বার্তায় আশ্বস্ত করিয়া রাখিতেছে।

পুষ্প-সৌন্দর্য্যের দুইটা দিক আছে,—সুগন্ধ ও বর্ণসৌষ্ঠব। ঐ দুয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ করা সুকঠিন। অতল সমুদ্র এবং অসীম আকাশের ন্যায় দুইটির ভিতরে এমন একটা ভাবময় অনন্তের আভাস বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহাতে মানবের ধারণাশক্তি খানিক দূর উঠিয়াই আবার নিজের ক্ষুদ্র নীড়টির ভিতর ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। সাধারণ লোকেরা গন্ধহীন পুষ্পকে ভাল বাসে না। নির্গন্ধ কুসুমের সহিত গুণহীন লোকের উপমা দেয়; কেহ একটা গন্ধহীন ফুল হাতে লইলে তাহার উপর আক্রমণ করিতেও ছাড়ে না। আপনাপন রুচির উৎকর্ষ বিষয়ে ইহাদের যতই দৃঢ়বিশ্বাস থাকুক না কেন, উক্তরূপ ব্যবহার নিঃসন্দেহ রুচির স্বল্পায়তনতার পরিচায়ক। মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ক্ষীণ, বিবেকহীন এবং স্বল্পারাম; দৃষ্টি বিকলনপটু এবং অনন্তপ্রসারিণী। প্রকৃতি তাহার অপরিসীম সৌন্দর্য্য রাজ্য লইয়া চিরকাল ইহার সম্মুখে উদ্যত হইয়া আছে। তাই ইহার তৃষ্ণা সহজে মিটে না, ঘ্রাণে জড়োপকরণের আধিক্য, সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি শ্রেষ্ঠতর এবং অপেক্ষাকৃত স্বার্থাবেশশূন্য। কোনও ইতর প্রাণীর এই বর্ণোপভোগের ক্ষমতা আছে কিনা সন্দেহ, ইহা মানুষেরই একমাত্র সৌভাগ্যের এবং গৌরবের সম্পত্তি। এই স্বার্থহীন সৌন্দর্য্যলিপ্সা পৃথিবীতে স্বর্গের বাতাস আনিয়াছে এবং মানবকে মানবাতীত জগতের মধুর আশায় বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহা অনেক পরিমাণে শিক্ষা ও অনুশীলনসাপেক্ষ এবং ঘ্রাণশক্তির মত ততটা সহজাত নহে। অতএব মানবের মধ্যেও এমন ভাগ্যবান অতি বিরল, যিনি আত্মদৃষ্টির সমস্ত সংস্কারদৈন্য এবং মৌলিক অপচ্ছায়া অপসারিত করিয়া এক উদার স্বভাব বিশদদৃষ্টি বিশ্বজগতের এই বর্ণসৌন্দর্য্যময়ী ছবিখানির উপর রাখিতে পারেন; এবং ইহার প্রত্যেক স্নায়ুতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নিজ হৃদয়কে বীণাতন্ত্রের মত তরল কম্পনে নর্ত্তিত করিয়া তুলিতে পারেন।

ফলতঃ, সৌরভপার্থক্যে পুষ্পের প্রতি সমাদরের তারতম্য হইবে কেন? ঐশ্বর্য্য বিবেচনা করিতে গেলেও ঘ্রাণ অপেক্ষা বর্ণ অনেক উচ্চ। ফুল সুন্দর; 'সুন্দর' কথাটী এমন সূক্ষ্ম এবং নিটোল ভাবে জগতের অন্য কোনও জিনিসের সম্পর্কে খাটে না। মানুষের রূপজ্ঞানে নাকি দেশভেদ এবং জাতিভেদ প্রথা একান্ত প্রবল, কোন জাতির লোক ক্ষুদ্র চোক, ক্ষুদ্র নাসিকা ভাল বাসে, কোন দেশের লোক কটা চুল পিঙ্গলাক্ষি ভাল বাসে; আবার, কোন দেশে গলগণ্ডও নাকি সৌন্দর্য্যের বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ আদৃত হয়। কিন্তু ফুল সর্ব্বত্র সুন্দর, সকলের নিকট সমাদৃত। ফুলে দেশকাল, পাত্র ভেদ নাই; রুচি অরুচি নাই; সুসভ্য ইউরোপবাসী হইতে অসভ্য অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত সকলেই ফুল গলায় ধরে, মাথায় পরে। ফুলের-বিশ্বব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বতোষকতাও বর্ত্তমান। তাহার কারণ, ফুলের সঙ্গে মানব-হৃদয়ের মূলগত সহানুভূতি আছে; উভয়ের যেন একই উদ্দেশ্য, যেন একই লক্ষ্য, তাই মানব-সমাজ ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে ফুলকে চিনিয়া লইতে পারে।

পুষ্পসৌন্দর্য্যে একটা ভাবময় প্রবাহ আছে। এই প্রবাহ অসীম হইতে অসীমে ছুটিয়া যাইবার এবং আত্মহারা হইবার প্রয়াস। জড়পদার্থ পুষ্প অচেতন, নির্ব্বাক; তবু পুষ্পের দিকে চাহিয়া দেখ, যেন কথা কহিবার উদ্যমে আছে। সুখদুঃখ বিবেকশূন্য পুষ্প, তবু পুষ্পের দিকে চাহিয়া দেখ, যেন এক অবিশ্রাম হাসিতে এবং আনন্দে ডুবিয়া আছে! এক কথায় পুষ্পের ভিতর নিজের জড়ত্ব এবং অচৈতন্য ছাড়াইবার একটা প্রয়াস চৈতন্য চিরকাল বিদ্যমান। আবার, মানুষের অপেক্ষা পুষ্পের হৃদয়প্রবণতা অনেক বেশী: আকাশের সূর্য্যের সঙ্গে, চন্দ্রের সঙ্গে—সমস্ত জগৎ যন্ত্রের সঙ্গে পুষ্প পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ। পুষ্পে পদার্থের দূরাদূরাত্মক নিয়ম বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। পুষ্প আকাশের সুদূর প্রান্ত হইতে অন্ধকারের নিঃশব্দ পদসঞ্চার অনুভব করে, পুষ্প বালসূর্য্যের কোমল করস্পর্শেই আনন্দোচ্ছ্বাসে শিহরিয়া উঠে। পুষ্পের ভিতর দিয়া স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের স্নায়ু-রজ্জু চলিয়া গিয়াছে, পুষ্প স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের বিবাহ দিয়াছে।

পুষ্পের আর একটা বিশেষ গুণ অথবা দোষ এই যে, পৃথিবীর অন্যান্য ভাল জিনিষের মত পুষ্পের আয়ুকাল অতি স্বল্প। পুষ্প গম্ভীর প্রকৃতি রমণীর মুখে ঈষদ্ স্মিত বিকাশের মত, যৌবন প্রবাহে লীলা এবং ভাবজাত

আবেশ তরঙ্গের মত, মানবহৃদয়ে সাধুচিন্তা এবং পরমার্থ ভাবোন্মেষের মত' ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এই অস্থায়িত্বই পুষ্পের বিশেষত্ব এবং অমরতা সূচিত করে। পৃথিবীতে প্রত্যেক ভাল জিনিষের অস্ফুট জীবন এবং অচরিতার্থতা দেখিয়া যেমন আমাদের বিশ্বাস তাহার জন্য পরকালের অনন্তপরিসর রঙ্গভূমি নির্ম্মাণ করে, পুষ্পের সম্বন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। আর এই জন্মমৃত্যুতেও ফুলের একটা রাগিনী, একটা ছন্দ আছে। আবহমানকাল ফুলের এই রাগিনীর এবং এই ছন্দের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

ফুল ফোটে উষায় সন্ধ্যায়
সন্ধ্যায় উষায় ত্যজে প্রাণ,
আলো আঁধারের সম্মিলনে
জন্ম মৃত্যু দুইটি মহান!

পুষ্প জড়সৌন্দর্য্যের চরম অভিব্যক্তি। পুষ্প ছায়াতরল অর্থময় মৌন-সৌন্দর্য্যে চিরকাল লালায়িত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্তরঙ্গভাবে প্রাণি-জগতের দিকে অগ্রসর হইয়া আছে। আর এক পা অগ্রসর হইলেই যেন একটা অঘটন ঘটিয়া যায়,—পুষ্পগুলি স্ফুটবাঙ্ময় এবং আনন্দময় প্রাণ-হিল্লোলে মুখর হইয়া উঠে, এবং নিখিল সৃষ্টির প্রেমসৌন্দর্য্য একাধারে সঞ্চরিত এবং সঞ্চিত হইয়া পড়ে!!

শ্রীশঃ।

রামপ্রসাদ সেনের কথা।

বিগত শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় কবি-রঞ্জন রামপ্রসাদ সেনকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখেন; বিগত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দাসীতে আমি তাহার প্রতিবাদ করি। প্রবন্ধ-লেখক আমার প্রতিবাদটি পড়িয়া একান্ত কাতর হইয়া পড়েন, তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নিকট একজন সাধু বৈষ্ণবের ন্যায় দৈনস্বরে পত্র লিখিয়া শরণা-পন্ন হন। কৈলাস বাবু তাঁহাকে সমর্থন করিতে দাঁড়ান নাই, সুতরাং প্রাণপণে লেখনী ধারণ করিয়া তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রবন্ধ-লেখকের যুক্তি সমস্তই আমরা পূর্ব্বপ্রতিবাদে ভগ্ন করিয়াছি,

তিনি সেই ভগ্নব্যূহ সাজাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতিবাদে একটিও নূতন যুক্তি দেখিলাম না, খণ্ডন করিব কি? আমাদের নিকট তীক্ষ্ণধার নানারূপ অস্ত্রই আছে, কিন্তু এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে নাতিসূক্ষ্ম একটি বংশদণ্ডই যথেষ্ট। তাঁহার প্রথম যুক্তি বৈদ্যজাতির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভিন্ন প্রাচীন কালে অন্য কোন কবির উদয় হয় নাই। আমরা তাঁহার প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের এই শোচনীয় অভাব লক্ষ্য করিয়া, চৈতন্যপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বিজয়গুপ্ত, বৈষ্ণবপ্রভাব সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দ দাস, ত্রিলোচন দাস, কবিকর্ণপূর, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, প্রেমবিলাস-রচক নিত্যানন্দ দাস ও পরবর্ত্তী সময়ে লালা জয়-নারায়ণ সেন, রামগতি সেন, আনন্দময়ী গুপ্তা, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি বৈদ্যবংশীয় কবিগণের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ইঁহাদিগের পরিচয় পাইয়াও বিনা বাক্য ব্যয়ে সেই অসার যুক্তি আবার উপস্থিত করিয়াছেন, আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভিন্ন অন্য কোন বৈদ্য কবি যদি না থাকিতেন, তবেই বা রামপ্রসাদের বৈদ্য হইতে বাধা কি থাকিত, তাহা বুঝা যায় না। রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন "রাজ্য নিল চোরে।" ইহার অর্থ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অর্থশালী ছিলেন ("ধন হেতু মহাকুল" ইত্যাদি পদ দেখুন)। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বৈদ্যজাতি কখনও ধনী ছিলেন না—সুতরাং রাম-প্রসাদ বৈদ্য হইতে পারেন না। এই অসার কথার পৃষ্ঠে আমি রাম-প্রসাদের সমকালবর্ত্তী রাজা রাজবল্লভের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, সে সময়ের বহুসংখক বৈদ্য জমীদারের কথা আমরা জানি, প্রয়োজন হইলে তাহা প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু প্রবন্ধ-লেখকের যুক্তি এতই সামান্য যে এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত গবেষণার কিছু মাত্র প্রয়োজন দেখিতে পাই না।

রামপ্রসাদ মধ্যে মধ্যে 'দাস' শব্দ ভণিতায় প্রয়োগ করিয়াছেন—ইহাই তাঁহাকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করার একমাত্র যুক্তিবল। কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক আমার প্রতিবাদ পড়িয়া স্বীকার করিয়াছেন, "বৈষ্ণবের নিকট শাক্ত প্রসাদ ভক্তি বিনয়ে বড় বেশী ঋণী। ভাষাতেও কম নহে।" অপর স্থলে "রামপ্রসাদ 'দাস' শব্দ কুত্রাপি বিনয় প্রকাশার্থে''ও ব্যবহার করিয়াছেন। কুত্রাপি নহে সর্ব্বত্র। যতবার তাঁহার ভণিতায় 'দাস' শব্দ পাওয়া যায়

ততবার 'দীন হীন' 'দাস দাস' ও ততোধিক বার "দাসীপুত্র" দৃষ্ট হয়; ইহা বিনয় সূচক উক্তি মাত্র। লেখক বলেন "বৈষ্ণবের দাস শব্দ প্রায়শঃ নামের অন্তর্ভূত ছিল—স্বতন্ত্র দাস বলিয়া বৈষ্ণব-কাব্যে নাই বলিলেই হয়" তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রের পল্লব-গ্রাহী মাত্র, পরন্তু অল্প লইয়া বহুভাষী। নরহরি সরকার ঠাকুর, রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্ত্তী, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি বহুবিধ বৈষ্ণব লেখক 'দাস' স্বতন্ত্ররূপে নিজের নামের পশ্চাতে যোজনা করিয়াছেন; রামপ্রসাদও মধ্যে মধ্যে তাহাই করিয়াছেন; প্রবন্ধ লেখকের যাহা একমাত্র যুক্তি তাহা অনুসরণ করিলে তিনি অনায়াসে বহু সংখ্যক প্রাচীন কবির জাতি মারিতে পারেন। এই অসার যুক্তি বারংবার গুঞ্জরণ করিয়া তিনি কর্ণের বধিরতা সম্পাদন করিলেন; ইহা ছাড়া তাঁহার তহবিলে আর কিছু যুক্তিবল আছে কি? শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু "কবিরঞ্জন কাব্য-সংগ্রহ" নামক যে পুস্তক খানা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রবন্ধলেখক বোধ হয় সেই পুস্তক খানা কক্ষতলে লইয়াই দিগ্বিজয় করিতে ইচ্ছা করেন; আমরা তাঁহাকে সেই পুস্তকেরই দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম চারি পংক্তি দেখিতে অনুরোধ করি; সে স্থলটি এই;—

"রাম রাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদপদে
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া॥"

এখন রামরাম সেনের পুত্র যে রামপ্রসাদ সেন হইবে, এ সম্বন্ধে তাঁহার কি কি আপত্তি আছে?

এতদ্ব্যতীত "ভিষক, প্রসাদ" ভণিতার পদ আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

বাঙ্গালা ১১৫৭।৫৮ সালে রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন; ১২৫০।৫১ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ক্রমাগত দশবৎসর পর্য্যন্ত নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া করিয়া কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবন-চরিত সঙ্কলন করেন। এ সম্বন্ধে গুপ্তকবি নিজে এই লিখিয়াছেন, "এ বিষয়ে যতদূর যত্ন করিতে হয়, আমরা তাহার অন্যথা করি নাই বহুকাল পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়া ক্রমশঃই যথাবিহিত পরিশ্রম এবং অনুসন্ধান করিয়াছি; কত স্থান ভ্রমণ করিয়া কত লোকের নিকট কতপ্রকার কাতরতা

প্রকাশ করিয়াছি। অধুনা দশ বৎসর পরে বাঞ্ছিত বিষয়ে এক প্রকার কৃতকার্য্য হইলাম।" রামপ্রসাদের মৃত্যুর ৭০।৮০ বৎসর পরে এই সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হয়; তখন তাঁহার পৌত্র বর্ত্তমান ছিলেন। রামপ্রসাদ একটা অপরিচিত লোক ছিলেন না, দেশশুদ্ধ লোক সাধকপ্রবরের নাম জানিত; এই ৭০।৮০ বৎসর পরে যে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় তাহার মধ্যে কায়স্থকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ার ন্যায় একটা অতি স্থূল ভ্রম প্রচার করা ও তাহা প্রচলিত হওয়া কি স্বাভাবিক? এই সময় আজু গোঁসাইয়ের কতকগুলি প্রতিপক্ষ সূচক গানও সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে একটি যথা—

"এই সংসার রসের কুটি
খাই দাই বাজারে
বসে মজা লুটি,
ওহে সেন! নাহি জ্ঞান বুঝ
তুমি মোটামুটি
ওরে ভাই বন্ধু, দারা সুত
পীড়ে পেতে দেয় দুধের বাটী।"

এই গুলি কি গুপ্তকবির জাল রচনা? যে পর্য্যন্ত সদ্বিবেচক প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় এই জালিয়াত প্রমাণ না করিতে পারেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার কাল্পনিক উক্তি গণ্য হইবে না। পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, রাম প্রসাদের মৃত্যু ও তাঁহার চরিতলেখক গুপ্তকবির জন্মের মধ্যে ব্যবধান ৫০ বৎসরের অধিক হইবে না, সুতরাং গুপ্ত কবির লিখিত স্থূল স্থূল কথাগুলি শুধু গ্রাহ্য নহে—প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার অদ্ভুত মত সমর্থন করিতে যাইয়া, তৎবিপক্ষে প্রমাণ গুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া গিয়াছেন—আজু গোঁসাই কল্পিত ব্যক্তি, গুপ্তকবি মিথ্যা কথার প্রচারক, 'দ্বিজ' শব্দ প্রক্ষিপ্ত, রাম প্রসাদের বংশধরগণ জাল, 'ভিষক' শব্দ প্রক্ষিপ্ত। তীব্রবেগে লেখনী চালাইয়া সব ঝুঁট বলিয়াছেন; কিন্তু যুক্তির রাজ্যে এবম্বিধ নবাবী কায়দা শোভা পায় না; এস্থলে তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। কল্পনার দ্বার অবারিত; লেখকের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করিলেই বা কি হইবে; তিনি তাঁহার বদ্ধ মুষ্টি শিথিল করিবেন না; রাম প্রসাদ নিজে তাঁহার পিতার নাম 'রাম রাম

সেন' বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, লেখক সে স্থল প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারেন।

রামপ্রসাদ ভগ্নী 'অম্বিকা' ভ্রাতা 'নিধিরাম' ও 'বিশ্বনাথ' পিতা 'রাম রাম সেন' প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণের নিকট এখনও সেই বংশাবলী আছে। রাম প্রসাদের প্রপৌত্র গোপাল কৃষ্ণ সেন এখনও বর্ত্তমান। গোপাল কৃষ্ণের পিতা হয়ত রামপ্রসাদকে দেখিয়া থাকিবেন। গোপাল কৃষ্ণ সেনের পুত্র কালীপদ সেন—উড়িষ্যার অন্তর্গত অঙ্গুল নামক স্থানে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছেন এবং তাঁহার চারিটী পুত্র ভাবী উন্নতির পরিচয় দিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী।

আমরা এইরূপ প্রবন্ধের ভবিষ্যতে আর কোন প্রতিবাদ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিব না। তরুণবয়স্ক লেখকের কল্পনা জল্পনা দ্বারা রাম প্রসাদ সেনের জাতিচ্যুত হওয়ার কোনও আশঙ্কা নাই, সুতরাং তাঁহার বংশধরগণ আশ্বস্ত হইয়া নিদ্রা যাউন। প্রবন্ধ-লেখক বাঙ্গলার সুকৃতি সন্তান, যেহেতুক সাধক-প্রবরের টিকি ধরিয়া এরূপ টানা হেঁচড়া করিতে পারিতেছেন।*

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

ঘুঘুর স্বর।

বিশাল প্রান্তর জুড়ি দ্বিপ্রহর দিন!
নিদাঘ রবির ঝাঁঝে অনল খেলায়।
দূর পানে চেয়ে চেয়ে পদতল লীন
পড়ে আছি আধশুয়ে তরুর ছায়ায়।

লাগিতেছে কাণে আসি চারিদিকময়
ঘুঘুর গহনচ্ছন্ন গভীর সঙ্গীত;
কঠোর নিদাঘ শ্রান্ত—হেন মনে লয়
ধরার ধমনী যেন হতেছে স্পন্দিত।—

---

* এ সম্বন্ধে অতঃপর অপর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না। সম্পাদক।

মনে পড়ে কত কথা বিশ বরষের—
এই ছায়া পৃথিবীর ছায়া সুখ দুখ!
একাকার হয়ে গেছে নাহি পাই টের
কুটিল ভ্রূকুটি আর আদর উন্মুখ।

শুধু সবখানি ঘিরে উঠেছে ভাসিয়া
একটী সংক্ষেপ অর্থ গভীর বিশাল—
বাঞ্ছা আর বাঞ্ছিতেরে দু'দিকে ভাগিয়া
একটী নিষ্ঠুর সিন্ধু আছে চিরকাল।

ভাবি আর মাঝে মাঝে শুনি আন্‌মনে
চৌদিকের নিরন্তর সঙ্গীত বিতান;
ডাক আর সাড়া শুধু, না বুঝি কেমনে
হৃদয় যে কেঁপে উঠে, কি নাড়ীর টান?

জনহীন প্রান্তরের দূরান্তর ময়
তলহীন নির্জনতা হৃদয়েতে ভ'রে,
মনোভার শ্রান্ত দেহে, রহস্য নিলয়
এ গীত যে শুনিয়াছে সে বুঝিতে পারে!

সে বুঝে কেমনে এই সুর রশ্মি ধরি
কত জগতের গান পড়ে যে আসিয়া!
সমস্ত শরীর খানি অবসাদে ভরি—
শত যুগন্তের স্মৃতি উঠয় কাঁদিয়া!—

বিশ্বের সীমায় ব'সে দূরান্তরে দূরে
কে যেন করিছে শুধু আকুল আহ্বান
"কোথায় কোথায়" বলি সে রহস্য পুরে
চিরকাল খুঁজিতেছি অধীর পরাণ।

দুইটি ক্রন্দন শুধু, মাঝখানে তার
হইতেছে জড় কোটি শতাব্দীর রাশি,
বাড়িতেছে অশ্রুময় সাগর অপার
দিন দিন; অন্তরে দ্বীপান্তর বাসী—

বসি জনশূন্য মাঠে শুনিতে শুনিতে
প্রাণের আত্মীয় স্বর উদাস মধুর,
মানব জীবন খানি—পারিনু বুঝিতে
একটী অপরিস্ফুট রোদন ঘুঘুর!

এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা। *

একবৎসর এসিয়াটীক সোসাইটির পত্রিকার সাহিত্য এবং ইতিহাসাদি বিষয়ক বিভাগে যতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত শিলিংফোর্ড সাহেবের কুশী নদীর গতিপরিবর্ত্তন-বিষয়ক প্রবন্ধ, এবং পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বাঙ্গালয় বৌদ্ধধর্ম্ম" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উভয় প্রবন্ধ সম্বন্ধেই কিছু কিছু বক্তব্য আছে।

(১) শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে দুইটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়াও আবার যখন শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থের কথা প্রসঙ্গে সেই কথারই বিবৃতি করিতেছেন, তখন মনে হয়, এ বিষয়ে তাঁহার যাহা যাহা লিখিবার আছে, এখনও তাহা শেষ হয় নাই। না হওয়াই ভাল। কারণ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত সুপণ্ডিত এবং অনুসন্ধান-তৎপর ব্যক্তিদিগের নিকট আমাদের অনেক শিখিবার আছে। তিনি যখন সকল কথা বিস্তৃত ভাবে লিখিবেন, তখন হয়ত, এখন যাহা ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, অথবা যাহা অসঙ্গতি দোষপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা পরিস্ফুট এবং নির্দ্দোষ বলিয়া বুঝিতে পারিব। কাজেই সন্দেহযুক্ত স্থলের কোন উল্লেখ করা গেল না। তবে একটা অবান্তর বিষয় সম্বন্ধে একটি কথা বলিব। শাস্ত্রী মহাশয় 'ধর্ম্ম' পূজার একটি মন্ত্র তুলিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূজ্য "ধর্ম্ম" নিশ্চয়ই "বুদ্ধ"। শ্লোকটি এই :—

যস্যান্তো নাদি মধ্যো নচ করচরণং নাস্তি কায়নিদানম্
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্মব যস্য (হ জস্য ?)
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকল জনহিতং সর্ব্বলোকৈকনাথং
তত্ত্বং তংচ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতুবঃ শূন্যমূর্ত্তি।

* Journal of the Asiatic Society of Bengal Part I. History, Literature &c. No. 1. 1895.

শ্লোকটি শুধু ব্যাকরণ দোষ দুষ্ট তাহাই নয়, ইহাতে অনেক শব্দের পর্য্যন্ত অভাব; কারণ চেহারা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্যাকরণের হিসাবেই হউক আর ছন্দের হিসাবেই হউক, এটা একটা নির্দ্দোষ শ্লোকের ভগ্নাবশেষ মাত্র। যোগীন্দ্র শব্দটা যদি প্রথমা বিভক্তিতে না থাকার সম্ভাবনা দেখান যায় (পরে ঐ শব্দ ৩য়া বিভক্তি যুক্ত দেখান যাইবে), তাহা হইলেই যোগীন্দ্র শব্দের বুদ্ধ বলিয়া যে অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বজায় থাকে না। তৎপরে আবার শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই ব্যাখ্যা করিবার সময় "পাতুব" স্থলে "চিন্তয়েৎ" লিখিয়া সন্দেহ বাড়াইয়া দিয়াছেন। "চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং" টুকু স্বীকৃত হইয়াছে দেখিয়া সাহস করিয়া অন্যত্র যেরূপ পাঠ দেখিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিতেছি। শ্লোকটি এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার বহুপূর্ব্বে, ৪ঠা জানুয়ারীর এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল;

যস্যান্তো নাদি মধ্যং নচ করচরণৌ নাস্তিকায়োন নাদঃ
নাকারো নৈবরূপং নচ ভয় মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য
যোগ্যৈন্দ্রৈর্ধ্যান গম্যং সকল জনময়ং সর্ব্বলোকৈক নাথং
ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং।

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের সহিত এইটি মিলাইয়া পড়িলে এই শ্লোকটিকেই খাঁটি বলিয়া মনে হয়। এ পাঠ স্বীকার করিলে ত এ শ্লোক আর বুদ্ধের ধ্যান বলিয়া মনে হয় না। "শূন্য" কথাটা বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ প্রবল; তাহা মানি। কিন্তু স্বয়ং "বুদ্ধ" যে অতিন্দ্রিয় এবং নিরবয়ব, এরূপ তো কোথাও দেখি নাই। হয়ত থাকিতেও পারে; সে বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় যত জানেন, আমরা তাহা জানিতে পারি, সম্ভবপর নহে। দেখাইয়া দিলে শিক্ষালাভ করিয়া উপকৃত হইব। শাস্ত্রী মহাশয় আমার গুরুস্থানীয়; আমি তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে বসি নাই। তবে এতৎ প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা বলিবার আছে সেটা বলিয়া ফেলি। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে "যিনি অশেষ, যাঁহার আদি মধ্য নাই, যাঁহার হস্ত নাই পদ নাই এবং দেহের বীজ পর্য্যন্তও নাই, যাঁহার কোন প্রকার আকৃতি বা রূপ নাই, এবং যিনি জন্মাদি শূন্য, ইত্যাদি, ইত্যাদি,—তাঁহাকে আবার কি প্রকারে ধ্যান করা সম্ভব? প্রতিমা ধ্যান পরাভূত করিয়া, অতীন্দ্রিয় শক্তির ধ্যান প্রবর্ত্তন করিবার এই প্রকার চেষ্টা অতি বিড়ম্বনার বিষয়।" এটা যদি

বিড়ম্বনা হয়, তবে বিড়ম্বনার ভাগী এই শ্লোক-রচয়িতা একা নহেন; উপনিষদের ঋষিগণও ইহার অংশীদার। অথবা সেই ঋষিগণই বিশেষরূপে, এই প্রকার নিরবয়ব অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মধ্যানের জন্য দায়ী। আমার কিন্তু মনে হয় যে নিরাকারের ধ্যান যত সহজ, সাকার ধ্যান তত নহে। চক্ষু বুঁজিয়া বা চক্ষু চাহিয়া একটি মানুষ বা একটি বস্তু কতক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যানের বিষয়ীভূত রাখা যায়? পারিপার্শ্বিক অন্য মনুষ্য বা অন্য পদার্থের প্রতি মনোযোগ না দিলে এ প্রকার চেষ্টায় মানসিক বিকার উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু অন্যদিকে আবার, মানুষ যখন গুণের কথা ভাবে, স্নেহ প্রেমের কথা চিন্তা করে, তখন তাহার চিন্তা বা ধ্যান বিশেষরূপে একনিষ্ঠ হইতে পারে। কবির কাব্য, প্রণয়ীর প্রেম পত্রিকা, প্রভৃতি ইহার সাক্ষী এবং উদাহরণ। চক্ষু বুঁজিয়া হউক বা চক্ষু চাহিয়া হউক মাতার শরীরাবয়ব কতক্ষণ চিন্তার বিষয়ীভূত রাখিতে পারা যায়? আর যদি মাতারস্নেহ প্রেমের কথা আলোচনা করা যায়, তবে কত দীর্ঘ সময় যে সেই ধ্যানে কাটিয়া যায় তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে অধিক তর্ক করিবার আমার কিছুই নাই; বিশেষ এটুকু শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের অবান্তর বিষয়। কথা এই উদ্ধৃত ধ্যানের উদ্দিষ্ট পুরুষ বুদ্ধ না হিন্দু জাতির প্রাচীন উপনিষদের সেই পুরাতন ব্রহ্ম?

(২) প্রায় ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন C. S. (ইনি এক্ষণে পুরীর মাজিষ্ট্রেট্ কলেক্টর) একটি দীর্ঘ সরকারী রিপোর্টে গঙ্গানদীর গতি-পরিবর্ত্তনাদি অতি যোগ্যতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই রিপোর্টে যে সকল কথা পড়িয়াছিলাম শিলিংফোর্ড সাহেবের প্রবন্ধ পড়িয়া তাহার অনেক কথা বদ্ধমূল হইতে চলিল। প্রাচীনকালে, কুশী নাকি একবার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া সমৃদ্ধিশালী গৌড়নগরীকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া হতশ্রী করিয়াছিল; এবারে আবার তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া দেশের আর একটা অমঙ্গল নাকি সাধন করিবে। গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদের রাজধানী কলিকাতা নাকি উচ্ছন্ন যাইবে; এত বড় বড় বাড়ী ঘর, এমারৎ, স্মৃতিস্তম্ভ, কীর্ত্তিস্তম্ভ সকলই নাকি হয়ত অতল জলে ডুবিবে; আর না হয়ত গৌড়েরমত ব্যাধি মন্দিরে পরিণত হইয়া শবরাশি পরিব্যাপ্ত হইয়া পরিত্যক্ত হইবে। একথার সঙ্গে সঙ্গে আবার ডাক্তার সীমসন্ সাহেবের ভবিষ্যৎবাণীও স্মরণ করিয়া ভাবিতে বসিব

কি? যে আমাদের এত সাধের, এত অহঙ্কারের সহর কলিকাতার ধ্বংসের আর বড় অধিক বিলম্ব নাই? পিলিংফোর্ড বলেন যে, নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়া এবং নূতন পথে প্রবাহিত হওয়া বড় বহু সময়সাপেক্ষ নহে। প্রমাণ স্থলে তিনি ২০ বৎসরের মধ্যে দুই একটি নদীর ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটীয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালার মাটিতে সোণা ফলে; সে সোণা ফেলিয়া সুধু আঁচলে গ্রন্থি আঁটিয়া বাঙ্গালার লোক কোথা যাইবে? ডেল্‌টা-ভূমি ও জলপ্রায় দেশ জলীয় বায়ু পরিপূর্ণ এবং রোগময়, তাহা বুঝি কিন্তু মেলেরিয়ার প্রকোপ যতই বাড়ুক নদীর অস্থিরতায় এবং দৌরাত্ম্যে দেশের সহর গ্রামাদি যতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক, এমন "মিঠে মাটি" কেহ ছাড়িতে পারিবে না। সহর ধ্বংস হইলেই বা আমাদের ভয় কি? যদি বাঙ্গালার শস্যক্ষেত্রের প্রতি কমলার দৃষ্টি অচলা থাকে, তবে আমরা হাজার সহর ভাঙ্গিব হাজার সহর গড়িব। খেলা ধূলা লইয়াইত সংসার।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

২১ নবেম্বর হইতে ৩০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।

১ দামো, ২ বাবুরাম, ৩ রসিকচাঁদ, ৪ ছৈয়লুন্না, ৫ দেবিরা, ৬ দুর্গাতারিণী, ৭ স্বর্গ, ৮ নবদুর্গা ও ৯ ফুলমণি।

দামো—আর এ সংসারে নাই। নিত্য ভগবানের নাম যাহার কণ্ঠের আভরণ ছিল, ভগবানের নাম লইতে লইতেই তাহার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হইয়াছে। ভগবানের প্রসাদে তাহার আত্মা শান্তিলাভ করুক, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

দাসাশ্রমের রোগী সংখ্যা নিতান্ত কম হইয়া পড়িয়াছে। দুটী একটী করিয়া অনেকেই মর্ত্তধাম পরিত্যাগ করিল। এখন এই দূরদেশে রোগী সহজে আসিতে চায় না। আনিতে গেলেও এক একটী রোগীর জন্যে তাহার সঙ্গীলোকের যাতায়াতের ব্যয়সুদ্ধ প্রায় তিনগুণ অধিক করিয়া পড়ে। এই সকল কারণে মৃতরোগীদিগের স্থান আর সহজে পূরণ হইতেছে না। এই জন্য দাসাশ্রমের সেবালয় আবার কলিকাতায় লইয়া যাইবার কল্পনা করা হইতেছে কিন্তু সেখানকার খরচ এত বেশী যে লইয়া যাইতে হইলে নিতান্ত দুঃসাহসের উপর ভর করিয়া যাইতে হয়—এই জন্য দাসাশ্রমের কর্তৃপক্ষেরা নানাপ্রকারে ইতস্ততঃ করিতেছেন। ফল পরে শ্রোতব্য।

২১ নবেম্বর হইতে ৩০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১ মাস ১০ দিনের আয় ব্যয়।

আয়।

পূর্ব্বমাসের জের ৮৲২৷৷ মণিঅর্ডার ১৩০৲ মাং বৈকুণ্ঠ বাবু জিনিষপত্র খরিদ বাবত ৬৲ কাপড় বিক্রয় ।৵০ দান ও চাঁদা ২/০ মোট=১৪৬৷৴২৷৷

ব্যয়।

সংসারখরচ ৩৷৵৫ কর্ম্মচারী বেতন ৬৩৷৵১২॥ বাঁকি বেতন শোধ ১৬৲ দাহ খরচ ১॥০ গাড়ী ভাড়া ১৮৲ জিনিষপত্র খরিদ ৬৲ পার্শেল মাসুল ১৲ মোট=১৪২৸৵১৭॥

মোট জমা——১৪৬৷৶২॥০, মোট খরচ——১৪২৸৵১৭॥০, হস্তেস্থিত ৩॥৵৫, গুপ্তদান ১৵০, বাবু গোষ্টবিহারী কুণ্ডু ১৲, বাবু বলাই চাঁদ দত্ত ১২ জোড়া বোম্বাই বিছানার চাদর।

কলিকাতা।

(২৫শে নবেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।)

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত দানগুলি বিগত মাসে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান দাতাগণের কল্যাণ করুন।

মাসিক চাঁদা।

বাবু অনাথনাথ দেব, অক্টোবর, নবেম্বর ২৲, বাবু দীনেশচন্দ্র চৌধুরী, নবেঃ ॥০, বাবু যদুনাথ বরাট C. E. নবেঃ ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ অক্টোবর ও নবেঃ ১৲, নবাব আবদুল শোভাল চৌধুরী অক্টোবর ১৲, বাবু নন্দলাল দত্ত জুলাই আগষ্ট সেপ্টেঃ ৩৲, বাবু রামচন্দ্র সরকার ছয়মাসের চাঁদা ১২৲, বাবু হরিধন চট্টোপাধ্যায় নবেঃ।০, এস্, সি, মুখোপাধ্যায় ডিসেঃ।০, এ, বি, চট্টোপাধ্যায় ত্রৈমাসিক ১৲, ৪০। ১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট নবে ॥০, ৬৩। ১ মেছুয়াবাজার রোড সেপ্টেঃ।০, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা অগ্রহায়ণ ॥০, ৪। ২ ছকুখানসামার লেন নবেঃ ॥০, বাবু গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ডিসেঃ।০, বাবু তেজচন্দ্র বসু নবেঃ ও ডিসেঃ ১৲, A Lady C/o Babu S. N. Das নবেঃ ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত নবেঃ।০, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর নবেঃ ১৲, বাবু নন্দকুমার দত্ত নবেঃ ১৲, বাবু প্যারীমোহন ভড় নবেঃ।০, বাবু রামচন্দ্র মিত্র নবেঃ ১৲, বাবু কেদারনাথ দাস নবেঃ।০, বাবু নন্দলাল দত্ত অক্টোবর নবেঃ ডিসেঃ ৩৲, বাবু যদুনাথ বরাট C. E. ডিসেঃ ১৲, N. B. Bose Esqr. নবেঃ ১৲, বাবু বঙ্কুবিহারী মিত্র নবেঃ।০, ১৮, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নবেঃ ॥০, নবাব সৈয়দ আবদুল শোভান চৌধুরী নবেঃ ১৲, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল সেপ্টেঃ ১৲ বাবু প্রমথনাথ দাস ডিসেঃ ২৲, বাবু মোহিনীমোহন রায় কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ ৩৲, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা পৌষ ॥৫, বাবু নবীনচাঁদ বড়াল নবেঃ ১৲, বাবু রাধানাথ দেব নবেঃ ॥০, বাবু প্রমথনাথ দাস নবেঃ ২৲। মোট ৪৭॥০

এককালীন দান।

বাবু চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মাগুরা ১৲, বাবু বসন্তকুমার বসু ঐ ২৲, বাবু হৃদকমল দাস গুপ্ত ঐ ১৲, বাবু ললিতমোহন পাল ঐ ২৲, মৌলবী আফজুর উদ্দিন খাঁ ঐ ১৲, বাবু ভুবনমোহন ঘোষ ঐ ১৲, বাবু নৃপেন্দ্রনাথ পাল ঐ ১৲, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস ঐ ১৲, তৃতীয় মুন্সেফ ঐ

১৲. বাবু তারকনাথ মিত্র ঝিনাইদহ ১৲, Joint Magistrate ঐ ১৲, বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ঐ ১৲, বাবু কেদারনাথ ঘোষ ঐ ॥०, একটী বন্ধু ঐ ॥०, বাবু পতিনাথ সরদার ঐ ।०, বাবু পতিনাথ মৈত্র ঐ ১৲, দুটি বন্ধু ঐ ৸०, কয়েকটি বন্ধু ঐ ২।० মুন্সেফির আমলাবর্গ ঐ ১৲, বাবু সর্ব্বেশ্বর মজুমদার ঐ ১৲, বাবু তারিণীচরণ মৌলীক ঐ ১৲, বাবু কেদারনাথ বক্সী ঐ ১৲, বাবু পূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী রাণাঘাট ১৲ বাবু ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দে চৌধুরী ঐ বাবু কুঞ্জবিহারী সাহা শান্তিপুর ১৲, বাবু মনোহর পাল শাঃ ১৲, বাবু রামদুর্লভ খাঁ শাঃ ১৲, কয়েকটি ভদ্রলোক, শাঃ ১৸৵० বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র রায় শাঃ ১৲ বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ শাঃ ১৲ বাবু শশীভূষণ রায় শাঃ ॥०, বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় শাঃ ১৲, বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় শাঃ ২৲, মুসলমান সম্প্রদায় শাঃ ৪৲, ক্ষুদ্র সংগ্রহ শাঃ ১৵৫, বাবু বিশ্বের দাস শাঃ ১৲, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র বিশ্বাস শাঃ ॥०, দুটি ভদ্রলোক শাঃ ১৲, মুন্সী মহম্মদ কাদের গোবিন্দপুর ১৲, ইংরাজী স্কুল শান্তিপুর ১৲, জনৈক বন্ধু ১৲, N. Chororia আজিমগঞ্জ ৩৲ বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র গুহ খাসনবীশ ১৲, বাবু যোগেশচন্দ্র সেন /० বাবু রাধানাথ দেব ৵०, ডাক্তার অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত ১৲, বাবু জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ৫৲, বাবু বলাইচাঁদ দত্ত, বি, এল ৫৲, বাবু নিমাইচরণ সেন ॥०, বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲, L. V. Mittra ৵० বাবু মহেন্দ্রনাথ শেঠ ১৲ বাবু ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ।०, ৮।১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন ৸৵১০ মুন্সী আবদুল রহিম, C. E. ১৲, ডাক্তার চুনীলাল বসু ১৲, ১২৬ ওল্ড বৈঠকখানা ।०, A friend of 50 Old Baithak Khana ।/०, জনৈক হিতৈষী ১৲, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ৫৲, বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি বেড়া ১৲, বাবু নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেড়া ১৲, ইস্‌মাইল উদ্দিন মিঞা বেড়া ১৲, বাবু কেদারনাথ পোদ্দার বেড়া ।०, বাবু বনমালী সাহা বেড়া ।०, বাবু জলধর উপেন্দ্রনারায়ণ সাহা বেড়া ।०, বাবু জানকীনাথ সাহা বেড়া ।०, যুধিষ্ঠিরনারায়ণ সাহা বেড়া ।०, বাবু শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেড়া ১৲, বাবু গুরুচরণ কুণ্ডু বেড়া ।०, নজর হাজি বেড়া ১৲, বাবু নবীনচন্দ্র দাস বেড়া ১৲, বাবু কেদারনাথ সাহা বেড়া ॥०, বাবু গোপালচন্দ্র চন্দ বেড়া ।०, বাবু সূর্য্যমল বাবু বেড়া ॥०, বাবু বিশ্বম্ভর শিকদার বেড়া ১৲, বাবু রামচন্দ্র সাহা বেড়া ॥०, বাবু বনয়ারীলাল তরফদার বেড়া ।०, বাবু ষষ্ঠীচরণসাহা বেড়া ৵० বাবু ভুতনাথ পাল বেড়া ॥०, বাবু দেবলাল সাহা বেড়া ৵०, বাবু গোপীমোহন দত্ত বেড়া ৵० বাবু তমু সরদার বেড়া।०, বাবু জগচ্চন্দ্র দাস বেড়া ॥०, বাবু যদুলাল পাল বেড়া ১৲, দুটি ভদ্রলোক বেড়া ॥०, বাবু কাশিনাথ দত্ত মথুরা ১৲, বাবু শরদিন্দু চক্রবর্ত্তি ৵० ৬৩ নং হ্যারিসন্ রোড ।०, ১০১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ১নং রঘুনাথ চাটুর্জির ষ্ট্রীট ।०, বাবু জানকীনাথ মজুমদার ১৲, বাবু মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৲, ১০০।২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ।/०, ডাক্তার অমূল্যরতন বসাক ১৲, A Debtor ৵०, জনৈক হিতৈষী ২৲, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী ১৲, বাবু হরলাল রায় ১৲, বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র ।०, A friend of Dasasram ৵৫, বাবু নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ২৲, ৬৫ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট ৵०, বাবু রামবিহারী ঘোষ ৫৲, ২১।১ পটুয়াটোলা লেন ।०, ৫০ ওল্ড বৈঠকখানা ।/०, ১২৬ ওলড্ বৈঠকখানা ।०, রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ ১০৲, ২৭।১ ঝামাপুকুর লেন ॥०, বাবু মুকুন্দলাল পাল চৌধুরী ১৲, বাবু হেমেন্দ্র

নাথ সিং ২৲, বাবু মহদানন্দ বড়ুয়া ॥০, বাবু দয়ালচন্দ্র ঘোষ ২৲, A sympathiser ৶০, বাবু জ্যোতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তির সংগৃহীত কুকুরিয়া গ্রাম ॥০, মোট ১২০৸৶০

বস্ত্রাদি ও অলঙ্কার বিক্রয়।

বস্ত্র বিক্রয় ৫।৶০, essence of chicken পুস্তক বিক্রয় ।/১৫, গহনা বিক্রয় ৯।৶০। মোট ২০॥/১৫

মোট আয়।

মাসিক চাঁদা ৭৪॥০, এককালীন দান ১২০৸৶০, নানাবিধ বিক্রয় ২০॥/১৫, পূর্ব্ব মাসের স্থিত ২॥৶০। মোট ১৯১॥/১৫

ব্যয়।

গিরিডিতে পাঠান ব্যয় ১৩১॥০, পাথেয় ৬।১০, সুদ ১৲, আদায়কারীর খরচ ৩৯॥৴১৫, ডাকখরচ ॥৶০, ধারশোধ ৭৲, ঋণ দাসী ৩৲ মুটে ১৶১৫, অন্যান্য ৸৶১০। মোট ১৯১৴১০।

আয় ব্যয়।

মোট আয় ১৯১॥/১০, মোট ব্যয় ১৯১৴১০। হস্তে স্থিত ।৶৫।

বস্ত্রাদি।

অনাথবন্ধুসমিতি মোটাচাদর ৬ খানা, শ্রীমতি প্রভাবতী দাসী প্যান্টালুন ৩, জ্যাকেট ১, ফ্লানেলকোট ১, টুপী ৩, গলাবন্ধ ৩।

দাসাশ্রম উঠিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে।

নিম্নলিখিত কারণবশতঃ দাসাশ্রম পুনরায় গিরিডি হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে।

১। আমাদের যে দুইজন কার্য্যকারক গিরিডিতে থাকিয়া আতুরগণের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা অনবরতঃ পরিশ্রম ও রাত্রিজাগরণাদি করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। এখানে যখন দাসাশ্রম ছিল তখন আমাদের অনেক সহায় ছিলেন। কতকগুলি যুবক পালা করিয়া রাত্রিজাগরণের সহায়তা করিতেন ও নানাভাবে আমাদের সহায়তা করিতেন। কিন্তু গিরিডিতে আমাদের আদৌ সহায় ছিল না। তজ্জন্য কর্ম্মকারক দুইজন একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছেন।

২। গিরিডিতে কয়েকমাস আদৌ মৎস্য পাওয়া যায় না। তজ্জন্য আতুরগণের এতই আহারের কষ্ট উপস্থিত হয় যে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা আমাদের একেবারে অসাধ্য হইয়া পড়ে।

৩। আশ্রম কলিকাতায় না থাকাতে আমরা দেখিতেছি যে সাধারণের সহানুভূতি ক্রমে অল্প হইয়া আসিতেছে।

৪। আতুরগণকে গিরিডিতে লইয়া যাইতে এত অধিক খরচ পড়ে যে এক এক সময়ে সে জন্য আমাদিগকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

৫। আতুরগণ কলিকাতা হইতে এত দূরদেশে যাইতে অনেক সময়ে অসম্মত হয়। তজ্জন্য আতুর সংখ্যা একেবারে এত অল্প হইয়া পড়িয়াছে যে আতুরগণের খরচের অপেক্ষা সরঞ্জামী খরচ বাড়িয়াছে।

এই সকল কারণে দাসাশ্রম আবার কলিকাতায় আসিয়াছে। কলিকাতায় আসাতে যদিচ খরচ কিছু বাড়িবে, কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি এখানে আশ্রমের কার্য্যকারিতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ভরসা করি দাসাশ্রমের বন্ধুগণ নূতন বৎসরে নূতন উৎসাহের সহিত আমাদের সহায়তা করিবেন। আশা করি সকলে আতুরগণকে উদ্যোগ করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিবেন। আমরা আবার আমাদের ক্ষমতা অনুসারে রোগীগণের পরিচর্য্যা ও চিকিৎসার সুবিধা করিতেছি। দানশীল মহোদয়গণের দয়ার উপরেই দাসাশ্রমের কার্য্যকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আশ্রম এখন নিম্নলিখিত ঠিকানায় আছে সুতরাং সকল পত্রাদি এই ঠিকানায় লিখিবেন।

৪৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট সিমলা বাজারের নিকট।

ভ্রমসংশোধন।

ডিসেম্বর সংখ্যার "দাসীর" সূচীতে "দুইটী পক্ষী" নামক প্রবন্ধের লেখক বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় না হইয়া বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস এম্. এ হইবে।

(১)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৫২	২৭	বিবাহ	ব্রাহ্মবিবাহ
৬৫৫	২২	আসিবে না।	আসিবেন।

সম্পাদকের নিবেদন।

"দাসী"তে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে কেবল দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ এবং দাসাশ্রম ঘটিত অন্যবিধ সংবাদ, প্রার্থনাদির জন্যই দাসাশ্রম দায়ী। আর যাহা কিছু লিখিত হয়, তন্মধ্যে যিনি যাহা লিখেন, তজ্জন্য তিনিই দায়ী। সম্পাদক কেবল নিজের লেখার জন্যই দায়ী। দাসাশ্রম সম্পাদকীয় কোনও মতামতের জন্যও দায়ী নহেন। কারণ কোন বিষয়ে কোন বিশেষ মত প্রচার দাসাশ্রমের উদ্দেশ্য নয়। কেবল সেবাধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ফাল্গুন মাসের "সাহিত্যে" "দাসী"র সমালোচনায় একটি ভুল আছে। "সাহিত্যে"র সম্পাদক মহাশয় দাসাশ্রমের একজন পুরাতন অনুগ্রাহক ও বন্ধু। তিনি, শুধু কথায় নয়, কাজেও অনেক সময় নিজ হিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভুলটি দেখাইয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, "দাসী" পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তাহাতে কেবল সেবাবিষয়ক প্রবন্ধাদি থাকিত। কিন্তু ইহা ঠিক্ নয়। ১৮৯৩ সালের নবেম্বর মাসের "দাসী"তে আমরা একটি প্রবন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলাম যে, ততঃপর "দাসী"তে জন-হিতৈষণা ব্যতীত অন্যবিষয়ক প্রবন্ধাদিও থাকিবে। সুতরাং তদবধিই "দাসী"তে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্যে"ও "দাসী"র এমন কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহার সহিত জনহিতৈষণার কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং "দাসী"র এই পরিবর্ত্তন নূতন নয়। নূতনের মধ্যে কেবল বর্দ্ধিত কলেবর। কি কারণে লিখিতব্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার কারণ ১৮৯৩ সালের নবেম্বর মাসের "দাসী"তে প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে এখনও আমরা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে সেবা-বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেছি, পরেও করিব।

CALCUTTA

Printed and Published by KARTIKCHANDRA DATTA

AT THE B. M. PRESS. 211, *Cornwallis Street.*

দাসী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

(২)

১৭৬৯ শকাব্দায় তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক এক গ্রন্থসভা সংস্থাপিত হয় এবং সেই সভাতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যে সকল প্রবন্ধ ছাপাইবার উপযুক্ত, তাহাই বিবেচিত হইত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (তখন তিনি ডাক্তর অথবা রাজা হয়েন নাই) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, যদিও ইঁহারা ব্রাহ্ম ছিলেন না, তথাচ এই সভার সভ্য ছিলেন। বিবেচনা করিতে গেলে তত্ত্ববোধিনী সভাই তখনকার এই দেশের জ্ঞান, ধন ও মানসিক ক্ষমতা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, মহর্ষির ভায়রাভাই শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও শোভাবাজারের রাজবাটীর আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং আমি এই গ্রন্থ-সভায় সভ্য ছিলাম।

আমি ১৭৬৬ শকে চিরস্মরণীয় লালা হাজারী লাল কর্তৃক ১৯ বৎসর বয়ক্রম কালে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হই। আমি তাঁহার সম্মুখে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমি মহর্ষিকে ইংরাজিতে যে পত্র লিখি তাহা হইতে অনুবাদিত হইয়া নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

"আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি ও পুনঃ প্রচার যখন আপনার জীবনের ব্রত তখন আপনার নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সকল হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃত মূল, সরল বঙ্গানুবাদ ও বিশদ ব্যাখ্যা সহ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করুন। ইহার প্রথম ভাগে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্লোক সকল থাকিবে। এই সকল শ্লোক কেবল বেদান্তদর্শন হইতে না লইয়া সমস্ত শ্রুতি হইতে সংগ্রহ করা

উচিত, কারণ বেদান্তদর্শনকে অন্যান্য হিন্দুদার্শনিকেরা এবং সাকারবাদী অনেক পণ্ডিত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রুতিকে একান্ত প্রমাণিক বলিয়া ভারতবাসী সমগ্র হিন্দু স্বীকার করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকলের সমর্থন জন্য হিন্দু দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র এবং ইতিহাস হইতে ঈশ্বর বিষয়ক বচন সকল উদ্ধৃত হইবে। ইহার তৃতীয় অর্থাৎ শেষভাগে প্রাচীন হিন্দুগণের নীতি-বিষয়ক শ্লোক সকল সরল তাৎপর্য্যের সহিত প্রকাশিত হইবে। এই সকল শ্লোক সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া আহৃত হইবে এবং এই শ্লোক সমূহ সৌন্দর্য্যে এবং সারবত্তায় মহাত্মা যিশুখৃষ্টের স্বর্গীয় বচন সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও না হউক ত সমকক্ষ হইবে।" আমার এই প্রস্তাবের চারি পাঁচ বৎসর পরে মহর্ষি হিন্দুশাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক সকল সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম ভাগে ঈশ্বরের লক্ষণ এবং তাহার সঙ্গে যোগ এবং তাহার উপাসনা বিষয় সকল উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এবং ইহার দ্বিতীয় ভাগে মনু যাজ্ঞবল্ক্য, মহাভারত, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র এবং অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র হইতে নীতি বিষয়ে উপদেশ বাক্য সকল গৃহীত হইয়াছে। মনু হইতে সারসংগ্রহ আমি করিয়া দিই। এই দুই ভাগ গ্রন্থেই সংস্কৃত শ্লোকের নিম্নে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ভাগের তাৎপর্য্য মহর্ষি, অক্ষয় বাবু ও আমার দ্বারা লিখিত হয়। দ্বিতীয় ভাগের তাৎপর্য্য সকল অনেক দিবস পরে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী দ্বারা লিখিত হয়। যে বৎসরে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ প্রকাশিত হয় সেই বৎসর হইতে ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে বৈদান্তিক ধর্ম্মের কোন উল্লেখ না থাকিয়া খাঁটি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে সকল বাক্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বাক্যটি সকলাপেক্ষা সুন্দর এবং মহান্—"তস্মিনপ্রীতি—তস্যপ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসন-মেব," ঈশ্বরকে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। এই উচ্চ ও মহান্ বাক্যটি মহর্ষির নিজের রচিত। বাইবেলে এইরূপ একটী বাক্য আছে—"সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমার ঈশ্বরকে ভাল বাস এবং তোমার প্রতিবাসীদিগকে নিজের ন্যায় দেখ।" মহর্ষির বাক্যটা বাইবেলোক্ত উক্ত রচনাপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কারণ বাইবেলে নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য অবধারিত করা হইয়াছে। কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা হয় নাই। মহর্ষির উক্তিতে ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করা উচিত বলা হইয়াছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও লক্ষ্ণৌএর বিখ্যাত রাজা দক্ষিণারঞ্জন প্রথমে এই বাক্যটী অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বেদোক্তি মনে করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জানাই যে উহা বেদোক্তি নহে, মহর্ষির রচনা। অক্ষয় বাবু মহর্ষিকে বেদান্তের অভ্রান্ততার মত পরিত্যাগে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের কিছুকাল পরে ১৭৭২ শকাব্দায় ১১ই মাঘোৎসবের বক্তৃতায় অক্ষয় বাবু প্রকাশ্যভাবে বলেন যে, প্রকৃতিতে ঈশ্বরের সত্ত্বা ও মহিমা উপলব্ধি করাই ব্রাহ্মগণের একমাত্র লক্ষ্য এবং জগৎ গ্রন্থই ব্রাহ্মগণের একমাত্র শাস্ত্র এবং একথাও বলেন যে রামমোহন রায়েরও এইরূপ মত ও বিশ্বাস ছিল। বলা বাহুল্য তিনি সেই বক্তৃতায় রামমোহন রায়কে ধর্ম্মসংস্কারকদিগের মধ্যে উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। উহা উক্ত মহাত্মার প্রশংসায় পরিপূর্ণ। তিনি ঐ প্রশংসায় সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত।

এই সময় হইতে যুবকগণকে ব্রাহ্মধর্ম্ম উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়। এই সময় হইতে "তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্বেদঃ সামবেদো" ইত্যাদি মুণ্ডক উপনিষদের প্রসিদ্ধ বাক্যটী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মর্ম্মসূচক বাক্য হইয়া পত্রিকার শিরোদেশ শোভিত করে। ঐ শ্লোকের মর্ম্ম এই "বেদ বেদাঙ্গই" নিকৃষ্ট জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ যাহাদ্বারা অব্যয় অক্ষয় ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানগোচর হয়েন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞান বেদ বেদাঙ্গ পাঠে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা মনুষ্যের মনে স্বয়ং সম্ভূত হয়।

১৭৭১ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে "ধর্ম্মতত্ত্ব বিবেক" নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতেই সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজে সহজ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের মতের অবতারণা করা হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত উহার লেখক।

১৭৭৮ শকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্জ্জন ধ্যানের জন্য হিমালয় পর্ব্বতে কিছুকাল বাস করিতে গমন করেন। পূর্ব্ব হইতেই নির্জ্জন ধ্যানের জন্য এক বলবতী স্পৃহা তাঁহার প্রাণে উদিত হইয়াছিল। ১৭৮০ শকে সীপাহি-বিদ্রোহের পরে তিনি পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হিমালয়ে তাঁহার নির্জ্জন বাসে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। তাঁহার

এই নির্জ্জন বাসের গভীর চিন্তার ফল 'ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ব্যাখ্যান'; ঐ ব্যাখ্যান আজ সমগ্র ব্রাহ্মগণের হৃদয়ের এক অতি প্রিয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হিমালয়ে মহর্ষির নির্জ্জন বাসের সময় ১৭৭৮ শকের ২৯এ পৌষ তারিখে তাঁহার অনুপস্থিতে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক অধিবেশন হয়। বাবু (পরে মহারাজা) রমানাথ ঠাকুর সেই সভার সভাপতির কার্য্য করেন। সেই সভাতে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে পরলোকগত বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী ও রাধাপ্রসাদ রায়ের স্থলে রমাপ্রসাদ রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের ট্রুষ্টি নিযুক্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রেসকে অর্থাগমের এক উপায় স্বরূপ করিতে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করা হয়।

১৭৮১ শকে ১১ই পৌষে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক এক বিশেষ সভা আহুত হয়। তাহাতে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ, উভয়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্ত পৃথকভাবে আর কাজ করিবার অবশ্যক নাই। সেই সময় হইতে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্মিলিত হইল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এতকাল যাবৎ ইহার সম্পাদকের কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন তিনি এই সময় স্বপদ পরিত্যাগ করেন। উক্ত সভাতেই নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার প্রাপ্ত হন।

সভাপতি

বাবু রমাপ্রসাদ রায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ

" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

" কালীকৃষ্ণ দত্ত। (নিবাধই দত্ত পুকুরের)

" বৈকুণ্ঠনাথ সেন।

সম্পাদক

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

" কেশবচন্দ্র সেন।

সহকারী সম্পাদক

পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক

বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

পরিদর্শক বা প্রচারক

বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। নবীন বাবুর পরে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সপ্তদশ বয়ঃক্রম কালে এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি এই অল্প বয়সেই এই কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করেন এবং অনেক প্রকারে সমাজের উন্নতি সাধন করেন। তিনি অনেকগুলি ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, সেই সকল সঙ্গীতের ভাষার সৌন্দর্য্য এবং অতি উচ্চ স্বর্গীয় ভাব সমস্ত ব্রাহ্মগণের হৃদয় সম্যক্‌প্রকারে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সত্যেন্দ্র বাবু স্ত্রী স্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী এবং জাতি বিভেদের উচ্ছেদ সাধনে বিশেষ চেষ্টিত।

অক্ষয় বাবু নানা প্রকার শারীরিক পীড়া ও দুর্ব্বলতা জন্য চার বৎসর পূর্ব্বেই কার্য্য পরিত্যাগ করেন। কেশব বাবু ইহার পর সমাজের সহকারী সম্পাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। ও তৎপরে সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। ইনি বিখ্যাত রামকমল সেনের পৌত্র। দেবেন্দ্র বাবু হিমালয় পর্ব্বতে নির্জ্জন বাসের পরে কলিকাতায় যখন প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন ইহার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইহার বয়স তখন ২২ বৎসর মাত্র। এই বয়সেই কেশব বাবু সুন্দর রূপেই ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন। উক্ত ভাষায় বক্তৃতা করণে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা থাকাতে তিনি ইংরাজীতে কৃতবিদ্য যুবকদিগের শিক্ষাস্থল ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন।

১৭৮১ শকাব্দার ২৫এ বৈশাখে ঐ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। প্রতি রবিবারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিতেন এবং কেশব বাবু ইংরাজীতে বলিতেন। দেবেন্দ্র বাবু ইহাতে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সকল পুস্তকাকারে "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছিল তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল।

(উপদেশ)

১। ... ...ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং স্বরূপ।

২। ... ...ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতি এবং প্রলয় কর্ত্তা।
৩। ... ...ঈশ্বরের আনন্দ স্বরূপ।
৪। ... ...ঈশ্বরের সত্যস্বরূপ।
৫। ... ...ঈশ্বরপ্রীতি এবং সংসারের উন্নতি।
৬। ... ...সাংসারিক সুখ এবং ব্রহ্মানন্দ।
৭। ... ...পরকাল।
৮। ... ...স্বর্গ এবং নরক।
৯। ১০। ... ...মুক্তি।

এই বিদ্যালয়ে যে সকল বালক পড়িত তাহাদের রীতিমত পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা পারদর্শিতা দেখাইতে পারিত তাহাদের উচিত মত পুরস্কার প্রদান করা হইত।

১৭৮১ শকে ১১ই শ্রাবণ দিবসে মহর্ষি তাঁহার "ব্যাখ্যানপুস্তকের" অমর ও চিরস্মরণীয় উপদেশ সকল প্রদান করিতে আরম্ভ করেন।

১৭৮৩ শকাব্দার ১২ শ্রাবণ তারিখে মহর্ষির দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ ব্রাহ্ম-বিধিমতে সম্পন্ন হয়। ইহাই ব্রাহ্ম-অনুষ্ঠানের প্রথম সূত্রপাত। পারিবারিক ক্রিয়া কর্ম্মে পৌত্তলিক আচার বর্জ্জন করিয়া তাহা ব্রহ্মোপাসনা-পূর্ব্বক সম্পন্ন করিবার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ১৭৭২খৃঃ ব্রাহ্ম-বিবাহের সাহায্য জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া সিবিল বিবাহ পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিয়া লন। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্ম সকল ইহাকে ব্রাহ্ম-বিবাহের আইন বলিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে ইহাকে "ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন" এই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে না। যে বিবাহ ঐ আইনানুসারে সম্পন্ন হয় তাহা ধর্ম্ম বর্জ্জিত কারণ এই বিবাহ যখন রেজষ্টরী করা হয় তখন যে অঙ্গীকার সকল করিতে হয়, তাহাতে ঈশ্বরের নাম গন্ধ নাই আর সেই নিরীশ্বর অঙ্গীকার না করিলে বিবাহ বৈধ-বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না। যদিও ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ এই বিবাহে উপাসনাদি ব্রাহ্মক্রিয়া সকল সংযোজিত করিয়াছিলেন তবুও ইহাকে বিবাহ বলা যাইতে পারে না, কারণ ঐ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলেও ঐ বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হয়। যে বিবাহ কেবল জগৎপিতা ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া সম্পন্ন হয় তাহাই প্রকৃত ব্রাহ্ম বিবাহ; কোন্ মানবের সাক্ষ্যতায় অথবা স্বাক্ষরে তাহা হইতে পারে না।

আদি সমাজের ব্রাহ্মগণ কাশী ও নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ নিকট হইতে এক বৃহৎ ব্যবস্থাপত্র আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বৈধ বলিয়া মত দিয়াছেন।

ব্রাহ্ম মতে মহর্ষির দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ সময় হইতে পৌত্তলিক ক্রিয়া কর্ম্ম সকল ব্রাহ্মগণ দ্বারা উপেক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মসমাজ এই সময় হইতে এক নূতন ও উন্নত আকার ধারণ করিল। বলাবাহুল্য এই সকল সংস্কার অতি সহজে ও শীঘ্র সম্পন্ন হয় নাই।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ক্রিয়াকর্ম্মের প্রচারে হিন্দু জাতির সেই সেই অংশগুলি গ্রহণ করিয়াছেন যাহা বিবেক ও সত্যের অনুমোদিত; উহার পৌত্তলিক অংশ সকল তাহা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে সকল ক্রিয়া কাণ্ড সংস্কৃত আকারে ব্রাহ্মসমাজে (আদি ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত তখন অন্য ব্রাহ্মসমাজ ছিল না) গৃহীত হইয়াছিল, নিম্নে তাহাদের নামোল্লেখ করা হইল।

১। জাতকর্ম্ম।	৪। উপনয়ন।
২। নামকরণ।	৫। দীক্ষা।
৩। বিবাহ।	৬। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ।

ব্রাহ্মবিবাহে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সপ্তপদীগমনের রীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই রীতিটি এরূপ মনাকর্ষক এবং সুন্দর যে সিবিল-বিবাহ-পদ্ধতির প্রণেতা অনারবল ফিট্‌স্ জেম্‌শ ষ্টিফেন সাহেব ইহা ইংরাজ সমাজে প্রচলন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা তিনি আদি সমাজের সিমলাপর্ব্বতে প্রেরিত প্রতিনিধি ৺ সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও ৺ নবগোপাল মিত্র মহাশয়দ্বয়কে বলিয়াছিলেন।

এই স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে মহর্ষির মত এই যে, দেশী প্রথা যতদূর রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা রক্ষা করিয়া পৌত্তলিক আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি ব্রাহ্মদের সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত; সামাজিক সংস্কার করা আর না করা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। এই প্রকার তিনি সমাজ সংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারের পার্থক্য ব্রাহ্মসমাজে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আমার মতে এই প্রথার পার্থক্য রক্ষা করাই উচিত। যে ব্রাহ্ম গার্হস্থ্য-ক্রিয়াতে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই তাঁহাকে কখনই ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না; কিন্তু যিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন অথচ হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে তাহা রক্ষা করিয়া যিনি

ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক নহেন তাঁহাকেও ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না। যেহেতু ব্রাহ্ম শব্দে হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা পরব্রহ্মের উপাসক বুঝায় অতএব যে ব্রাহ্ম হিন্দু ভাব সম্পন্ন নহেন তাহাকে প্রকৃত ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না, তিনি Theist।

১৭৮৩ শকাব্দার ২৭ চৈত্রে আদি সমাজে ব্রাহ্মদিগের এক সাধারণ সভা হয় তাহাতে মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের সমাজপতি পদে নিযুক্ত হয়েন।

১৭৮৭ শকে ১১ মাঘোৎসবে কয়েক জন ব্রাহ্মিকা আদি সমাজ-মন্দিরে উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মিকাদিগের মধ্যে প্রথম এই দৃষ্টান্ত দেখান। স্ত্রীপুরুষে একত্র দেবোপাসনা সম্পূর্ণ হিন্দুরীতি সম্মত। প্রত্যেক হিন্দু-দেবমন্দিরে এরূপ হইয়া থাকে। সমাজ গৃহের তৃতীয় তলে যেখানে উপাসনা হইয়া থাকে সেখানে স্ত্রীলোকদিগের উঠিবার জন্য পূর্ব্বদিকে এক স্বতন্ত্র সিঁড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে। যদ্যপি কোন ব্রাহ্মিকা উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সমাজের ঐ দিকে পর্দ্দা ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যখন কোন ব্রাহ্মিকা উপস্থিত থাকেন না তখন সমস্ত গৃহ ব্রাহ্মদিগের ব্যবহার জন্য খোলা থাকে।

সর্ব্বপ্রথমে আদি সমাজের "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ" নাম ছিল। কিন্তু ১৭৮৯ শক হইতে "কলিকাতা" শব্দের পরিবর্ত্তে "আদি" শব্দ ব্যবহৃত হইতে-লাগিল। "আদি" শব্দের অর্থে অনেকেই মনে করেন যে এই সমাজ সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছিল সেই জন্য উহার ঐ নামকরণ হইয়াছে কিন্তু বলাবাহুল্য যে কেবল ভারতেই ইহা আদি নহে সমগ্র পৃথিবীতে একেশ্বরবাদীদিগের উপাসনা মন্দিরের মধ্যেই আদি। সেই জন্য ভবিষ্যত সময় যে কোন দেশে যে কোন জাতির মধ্যে একেশ্বরবাদীর উপাসনামন্দির স্থাপিত হইবে তাহার সহিত ইহা পিতৃ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিবে।

১৭৯৪ শকের ৩১ ভাদ্র দিবসে জাতীয় সভার (National Societyর) এক অধিবেশন হয়। দেবেন্দ্র বাবু তাহাতে আগ্রহপূর্ব্বক সভাপতির কার্য্য করেন। সেই সভায় আমি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয় এক বক্তৃতা করি। তাহাতে আমি অতি স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছিলাম যে পৃথিবীর বর্ত্তমান ধর্ম্ম সকলের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ও মহান্। এই সভায় বহুসংখ্যক হিন্দু ও ব্রাহ্মশ্রোতা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সকলের সম্মুখে শাস্ত্রীয় বচনের দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে আমি সক্ষম হইয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের

পূর্ণাকার এবং যদিও এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন জাতিবিশেষ বা মত বিশেষে আবদ্ধ নহে তথাপি উহা হিন্দুধর্ম্মের সার। হিন্দুধর্ম্ম ক্রমবিকাশ দ্বারা সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। যাহা সত্য তাহা সকল স্থানে ও সকল সময় সত্য সেই জন্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বের ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম আপনা আপনি ক্রম বিকাশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছে। যদিও হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; তবুও ইহা হিন্দুধর্ম্ম কারণ পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি তাহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যে ব্যক্তি ছিলেন এখনও সেই ব্যক্তি আছেন, সময়ে তাঁহার শরীরের বৃদ্ধি ও জ্ঞানের পরিপকতা হইয়াছে মাত্র। যে সভায় হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করা হয়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই উপমাটি প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন এই উপমাটি অতি সুন্দর ও সর্ব্বসামঞ্জস্য সাধক। এই বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি পক্ষে ইহা অনেক সহায়তা করিয়াছে। ইহার পর হইতে হিন্দুসমাজ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বৈদেশিক ধর্ম্ম নহে। উহা আর্য্যঋষিগণের ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার প্রণালী বিষয়ে মহর্ষির মত নিম্নে বিবৃত হইয়াছে।

১। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু আকারে প্রচারিত হওয়া উচিত। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে, হিন্দুভাবের মধ্য দিয়া হিন্দু শাস্ত্রের সাহায্য লইয়া প্রচার করিলে এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে নচেৎ নহে।

২। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার এই দুয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ না করিলে নয় আর সমাজ সংস্কার স্বেচ্ছাধীন, হিন্দুধর্ম্মের সকলই থাকিতে পারে কেবল পরিমিত দেবতার পরিবর্ত্তে অপরিমিত দেবতা আসিবে না।

৩। ঈশ্বরোপাসনাতে যে কোন ব্রাহ্মের সহিত যোগ দেওয়া যাইতে পারে।

যদি আমরা এই মতানুসারে কার্য্য করিতে না পারি তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব ও ইহার দেশীয় ভাব এককালে কখনই রক্ষিত হইবে না। মহর্ষি চিরকালই এই মতানুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

সমাজ সংস্কার স্বেচ্ছাধীন হইলেও ঐ বিষয়ে যাঁহারা অত্যন্ত অগ্রসর, তাঁহাদিগের সহিত উপাসনা করিতে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগের কোনই আপত্তি নাই।

সাহেবকে আমি যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার কোন কোন স্থল একেবারে উঠাইয়া দিয়া, কোন কোন স্থল পরিবর্ত্তন করিয়া আবার কোন কোন স্থল পরিবর্ত্তিত করিয়া এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে মহর্ষির অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে অসাধারণ পরিশ্রম, যত্ন ও উৎসাহ, তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠা, তাঁহার তপস্বী ভাব, তাঁহার হিন্দুভাবের ক্ষীণ আভাসমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বলিতে কি এই প্রবন্ধ তাঁহার জীবনবৃত্তের কঙ্কালমাত্র। ইহাতে তাঁহার জীবনের অধুনাতন ঘটনা সকলের কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা ভবিষ্যতে তাঁহার জীবনবৃত্ত লেখকের কিঞ্চিৎ উপকরণে আসিতে পারে, এই আশায় ইহা প্রকাশিত হইল।

চিন্তা করিতে কি সুখ যে, মহর্ষি আমাদিগের মধ্যে এখনও বর্ত্তমান আছেন, এখন আমরা তাঁহার নিকট আরো ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি, এখনও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার অমূল্য পরামর্শ লাভ করিতে পারি। সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মধর্ম্মের পুনর্জ্জন্মদাতা মহর্ষিকে তাঁহাদিগের প্রধান আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ দিবসে মহর্ষি তাহার উনআশি বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। ঐ দিবসে তাঁহার পার্ক ষ্ট্রীটস্থ ভবনে তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনার পর তাঁহার পরিবারের সকল লোকেরা এবং বাহিরের উপস্থিত ব্রাহ্মেরা তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন। সে দৃশ্য কি মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র।

(৪)

বিষবৃক্ষ—বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের মত সুন্দর উপন্যাস সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ বলেন যে বিষবৃক্ষেই বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভার পূর্ণ বা সর্ব্বোচ্চ বিকাশ—আমরা সে মতাবলম্বী নহি। কিন্ত বিষবৃক্ষ প্রকৃত জীবনের চিত্র বলিয়াই তাহা এত সুন্দর, সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল আদৃত।

গ্রন্থমধ্যে এক দিকে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-পরায়ণা, পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখী; অন্য-

দিকে শিশিরস্নাতা অপ্রস্ফুট যূথিকাকলিকার মত "ন প্রবুদ্ধা ন সুপ্তা" কুন্দনন্দিনী; এক দিকে হাস্যময়ী,সরলপ্রাণা কমলমণি; অপরদিকে পাপময়ী হীরা; একদিকে সদসদ্‌বুদ্ধিসঙ্ঘর্ষ-নিপীড়িত নগেন্দ্র; অন্যদিকে পাপস্রোতে ভাসমান দেবেন্দ্র। এরূপ বৈপরীত্যময় চরিত্রসমাগম সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সেই জন্যই বিষবৃক্ষ এমন সুন্দর উপন্যাস।

এখন বিষবৃক্ষের চরিত্রগুলির সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর সম্বন্ধে বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, "একদিকে লজ্জাশীলা, ভীরুস্বভাব-সম্পন্না, আত্মঘাতিনী, সুন্দরী, চপলা বালিকা,—অন্য দিকে নিস্বার্থপরায়ণা, বুদ্ধিমতী, সংযতা, সাধ্বী, পতিব্রতা স্ত্রী। মমতাহীন সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে, সূর্য্যমুখী শিক্ষিতা, ধীরা, গম্ভীরা,—অসহ্য পৈশাচিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও আপনাকে সামলাইতে সক্ষম। কুন্দ সংসারের বড় ধার ধারে না, সংসার সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা অতি অল্প;— সে সংসারে চপলা, মুখচোরা বালিকা; যাকে ভাল বাসে, তাকে চায়, ভালবাসার প্রতিদান না পাইলে কাঁদে, আবার সময় সময় অভিমান ক'রে, জলে ডুবে মরিতে যায়।"

আবার কুন্দর কাছে পৃথিবী একটী অজানা দেশ; সে অতি সঙ্কোচে, অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া চলে—তার পদে পদে ভয়; সূর্য্যমুখী আপন কর্ত্তব্যপথে অস্খলিত চরণে বিচরণ করে,—সে যেখান দিয়া চলিয়া যায়, সেখানে ফুল ফুটিয়া উঠে; ভূমি শস্য শ্যামলা হয়।"

উভয়ের চরিত্রে এই প্রভেদ। সূর্য্যমুখী কর্ত্তব্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন; তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সম্মুখে সকল বাধা বিঘ্ন প্রবল ঝটিকার সম্মুখে মেঘ-রাশির মত দূর হইয়া যায়, স্নিগ্ধ আলোক দিগ্বিভাসিত করিয়া হাসিতে থাকে। সঙ্কোচে, লজ্জায় কুন্দ তাহা পারে না। প্রস্ফুটিতা সূর্য্যমুখীর মত সূর্য্যমুখী জানেন, কেমন করিয়া রবির কিরণে হাসিতে হয়, কেমন করিয়া সে কিরণ প্রতিবিম্বিত করিতে হয়, কেমন করিয়া পূর্ব্বগগনপ্রান্তে মেঘের রেখায় রেখায় সেই আলোক দেখিয়া চক্ষু মেলিতে হয়; আবার কেমন করিয়া সান্ধ্যগগনে সেই প্রেমময়ের প্রেম-নির্ব্বাণের সময়, চক্ষু মুদিতে হয়। অপ্রস্ফুট কুন্দ,তাহা পারে না; রবির দিগন্তব্যাপী কর-স্রোতের মধ্যে, সে আত্ম-হারা হইয়া পড়ে; সে ত তত আলোক কখন দেখে নাই! সে আপনার অপ্রস্ফুট হৃদয়ে তত আলোক, তত প্রেম, তত আনন্দ রাখিতে পারে না।

কুন্দকে অপ্রস্ফুট বলিলাম, কারণ তাহার প্রস্ফুট ভাব আমরা কোথাও পাই নাই। যুবতী হইয়াও কুন্দের কখন যৌবনচাঞ্চল্য হয় নাই। যুবতী কুন্দকে সম্বোধন করিয়া হরিদাসী বৈষ্ণবী যখন বলিল, "হ্যাগা—তুমি কিছু ফরমাস করিলে না?" তখন কুন্দ "লজ্জাবনতমুখী" হইল; আপনি তাহার কথার উত্তর দিতে পারিল না। আবার "সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী তাহার কথা রাখিল দেখিয়া কুন্দ বড় লজ্জিতা হইল। তাই বলিতেছি, কুন্দ-কুসুম ফুটে নাই। মরণাহতা যুবতীর কথায় গ্রন্থকারও বলিয়াছেন, "অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল।" "কাব্যসুন্দরী" প্রণেতা বলিয়াছেন যে,কুন্দনন্দিনীর চিত্র "তত বিভাসিত নহে, অতি কোমল বর্ণে মৃদু রঞ্জিত, কিন্তু উহার চিত্রে এমন মাধুর্য্য, এমন সৌন্দর্য্য আছে, যাহা তাহার পার্শ্বস্থ কোন উজ্জ্বল চিত্রে নাই।" বাস্তবিক "সূর্য্যমুখী অন্ত দেশে দুর্লভ, কিন্তু কুন্দনন্দিনী বঙ্গদেশেও দুর্লভ।" কারণ কুন্দ কেবল কোমলতার ও নিশ্চেষ্ট সরলতার আদর্শ; আর "সূর্য্যমুখী বঙ্গনারীর অলঙ্কার, বঙ্গভূমির অলঙ্কার, নারী-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।"

সূর্য্যমুখীর মত পতিপ্রেমপরায়ণা, স্বার্থত্যাগিনী কয় জন আছে? কয় জন পতির প্রেমের মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া আপনার আমিত্ব লোপ করিতে পারে? সূর্য্যমুখী যখন বলিলেন, "পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; * * * পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে তবে সে স্বামীর স্নেহ।" তখনই মনে হয় সূর্য্যমুখী দেবী। যখন স্বামীর কথায় তিনি বলিলেন, "তাঁহার ছায়া দেখিলে তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি," তখনই মনে হয়, পতিপ্রেমে তাঁহার আমিত্ব বিসর্জ্জিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে সূর্য্যমুখী যখন মনে মনে বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব-ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্ত প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্ত দেশত্যাগী হইবে! তুমি বড় না আমি বড়?" সূর্য্যমুখীর প্রেমে স্বার্থের লেশমাত্র নাই। সূর্য্যমুখী যখন কমলমণিকে বলিলেন, "আমি কে?" তখন মনে হয় সূর্য্যমুখী রমণীচরিত্রের আদর্শ। কুন্দনন্দিনীর সহিত নগেন্দ্রের বিবাহান্তে কমলমণি সূর্য্যমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি সুখী হইয়াছ?"—সূর্য্যমুখী বলিলেন, "আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে

দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যে, আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।” বাস্তবিক তিনি পতিপ্রেমপরায়ণার উচ্চতম আদর্শ। তিনি রমণীজাতির গৌরব। সূর্য্যমুখী সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, “বাবা আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয়গুণে গুণবান হও। ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি না।” নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসেন কিন্তু সূর্য্যমুখী তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না। নগেন্দ্রের সুখের জন্য সূর্য্যমুখী আপনার সুখ বলি দিলেন—কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ দিলেন। এমন দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল। তিনি সত্যসত্যই স্বামীকে বলিতে পারিতেন :—

“আমার পরাণ যাহা চায়,
　　তুমি তাই, তুমি তাইগো!
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
　　মোর, কেহ নাই, কিছু নাইগো!”

সূর্য্যমুখীর মত সহ্যগুণ, প্রেমের জন্য স্বার্থত্যাগ কুন্দনন্দিনীর নাই;—থাকিলে সে আত্মঘাতিনী হইতে পারিত না। যে অবহেলা সূর্য্যমুখী সহ্য করিলেন, কুন্দ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। কেবল একবার মাত্র কুন্দের পরোপকার বৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছিল। কমল যখন তাহাকে বলিলেন,—“বুঝেছি—মরিয়াছ। মর তাতে ক্ষতি নাই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে?”—তাহাকে বুঝাইলেন যে, তাহার জন্য সোনার সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে, তখন সে হৃদয়ের পুণ্যতীর্থ নগেন্দ্রের দর্শনসুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিতা করিতে সম্মত হইল—কলিকাতায় যাইতে চাহিল। সেই একবার “কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল।”—একবার সে সরোবরে ডুবিতে গিয়াছিল—আরও একবার বড় যন্ত্রণায় সে মরিবে স্থির করিয়াছিল; মরণাহতা হইয়া সে নগেন্দ্রকে বলিল—“মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখন ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না।” নগেন্দ্রকে দর্শন করিয়া প্রথম দুইবার তাহার সঙ্কল্প সামান্য কথায় স্বামীর উপর গম্ভীর অভিমানের মত দূর হইয়া গিয়াছিল; শেষবারেও সে তাঁহাকে বলিল—“তবে তোমাকে দেখিলে, আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।” আর সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগের পর দেখিলেন যে, স্বামীর অদর্শন

জনিত যাতনা অপেক্ষা গৃহের যাতনা শতগুণে সহনীয়, তাই আবার রমণীর শুষ্ক পতির নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সূর্য্যমুখী সত্য সত্যই বড় দুর্দ্দান্ত।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন "কমলমণি রমণীরত্ন।" সত্যই বহুগুণের উৎকর্ষ দিয়া কমলের চরিত্র নির্ম্মিত। "কমল, পরিপূর্ণ প্রফুল্লতার মূর্ত্তিমতী কল্পনা।" সংসারের সুখে, দুঃখে, আনন্দে, বিবাদে কমল কখন বিচলিতা নহেন; আবার তাঁহার পতিপ্রেম প্রবল; তিনি সূর্য্যমুখীকে লিখিতেছেন,—"স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।" তবে কমল কেবলই হাস্যময়ী নহেন। কমল স্নেহময়ী, দয়াময়ী, সহানুভূতিময়ী; তাঁহার আপনার উপর দিয়া সংসারের কষ্টের ঝন্‌ঝাবাত কখন বহিয়া যায় নাই—তবুও কমল সহানুভূতিময়ী, নহিলে সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী উভয়ে যাতনার সময় তাঁহাকে আশ্রয় বলিয়া জানিবেন কেন? কমলমণি সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা নহেন; তিনি যখন সূর্য্যমুখীকে উপদেশ দিতেছেন, কুন্দকে বুঝাইতেছেন ও ভ্রাতার আগমন প্রত্যাশায় নানা উদ্যোগ করিতেছেন, তখন কে বলিবে তিনি সংসারের ধার ধারেন না—সংসারের চিন্তাস্রোত তাঁহার হৃদয়ের কেবল উপর দিয়াই বহিয়া যায়? কমলমণির আর একটি গুণ আছে, আর একটি ভাব আছে যাহা এই গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত অন্য কোন প্রধান চরিত্রে নাই, তাহা কমলের জননীত্ব; কমল স্নেহময়ী জননী। তবে কমলের কোন্ গুণের অভাব? মানবহৃদয়ের সকল বৃত্তির সমউৎকর্ষকে যদি মানবচরিত্রের উচ্চতম আদর্শ বলিতে হয়, তবে এই গ্রন্থ মধ্যস্থ অন্যান্য চরিত্রের উজ্জ্বলতা কমলের উজ্জ্বলতার নিকট ম্লান হইয়া পড়ে। কমলের ভাস্বর মধুর জ্যোতিঃর নিকট তাঁহাদের জ্যোতিঃ তেমন মধুর বোধ হয় না। সংসার সরসীউরসে যখন কমলের মত কমল ফুটিয়া উঠে, তখন আর কোন্ কুসুম তাহার মত সুন্দর দেখায়? সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে কমলমণি পত্নীর উচ্চ আদর্শ। কমলের চরিত্র মধুর হইতেও মধুর, সুন্দর হইতেও সুন্দর।

ঘাতপ্রতিঘাতে নগেন্দ্রের চরিত্রের সৃষ্টি। ধীরে ধীরে আত্মবিস্মৃতি কেমন করিয়া মানবহৃদয় অধিকার করে, আবার কেমন করিয়া তাহা দূর হয়, এই চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। নগেন্দ্রের প্রেমসূর্য্য সূর্য্যমুখীর দিকে চাহিয়াছিল—সহসা মেঘের ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ সূর্য্যমুখীকে চক্ষের অন্তরাল করিল—তিনি ভাবিলেন এই ক্ষণস্থায়ী আবরণছায়ায় বুঝি সত্যসত্যই জীবনের ছায়াস্নিগ্ধ পথ আছে; সেখানে বুঝি দুঃখজ্বালার তীব্রতাপ হৃদয় স্পর্শ করিবে না।

সূর্য্যমুখী শুকাইয়া উঠিলেন; সে মোহ আবরণও বাত্যাবাহিত শরতের লঘুমেঘের মত সরিয়া গেল। তখন জগতের কঠোর যাতনার মধ্যে তাঁহার আত্মভ্রম ঘুচিল; তখন মনে হইল:—

"সেই মায়া উপবন কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাথার!

সূর্য্যমুখীকে পাইলেন কিন্তু কুন্দ শুকাইয়া গেল। নগেন্দ্রের অভাব ছিল না। "কান্তরূপ; অতুল ঐশ্বর্য্য; নীরোগশরীর; সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা; সুশীল চরিত্র; স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী" সকলই তাঁহার ছিল। তাই তিনি চিত্তবৃত্তি দমন শিক্ষা করেন নাই আর চিত্তবৃত্তি দমন করিতে শিক্ষা করেন নাই বলিয়াই কুন্দকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিয়াছিল। এক জ্বালা ঘুচাইতে তিনি আর এক জ্বালার আশ্রয় লইলেন—মদ্যপান আরম্ভ করিলেন। তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা; তখন তিনি চিত্তবৃত্তি দমন করিতে চাহিলেন, কিন্তু অগ্নি জ্বলিয়াছে—নিবিল না। সূর্য্যমুখীকে তিনি বলিলেন "আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টা করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখন তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।" বাস্তবিক এই বাক্য প্রবাহ যাতনার্ত্ত নগেন্দ্রের হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে অগ্নিপ্রবাহের মত বাহির হইয়াছে। হরদেবকে তিনি লিখিলেন "আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।" ইহা সত্য কথা; তিনি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। তিনি কুন্দনন্দিনীকে পাইলেন কিন্তু সূর্য্যমুখীকে হারাইলেন। বিচ্ছেদেই প্রেমের পরিপাক; সত্যসত্যই "বিরহে বাড়ায় তৃষ্ণা।" বিরহের করাল শ্মশানে দাঁড়াইয়া নগেন্দ্র বুঝিলেন, কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখী নহে। তখন তিনি আত্মভ্রম বুঝিলেন; বুঝিলেন কেন সূর্য্যমুখীর প্রেমে হৃদয় জুড়ায় নাই—বুঝিলেন সে প্রেমতৃষ্ণা জুড়াইবার নহে বলিয়াই জুড়ায় নাই। বুঝিলেন কেন কবি বলিয়াছেন:—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥"

কিন্তু তখন

"বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!"

তখন সূর্য্যমুখীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। মনে আশা ছিল কোথাও না কোথাও হৃদয়পটে চিরাঙ্কিত সেই মুখ আবার দেখিতে পাইবেন;—প্রদোষে কমলের মত একখানি ম্লানমুখ আবার হৃদয় উজ্জ্বল করিবে। আবার

"তমু প্রকাশেন বিচেয় তারকা
প্রভাতকল্পা শশিনেবশর্ব্বরী"

সূর্য্যমুখীর বিষাদক্লিষ্ট মুখচ্ছবি দেখিতে পাইবেন, কিন্তু তাঁহার পরীক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্যই গ্রন্থকার প্রথমে তাঁহার আশা পূর্ণ করিলেন না। প্রেমের আরও পরিপাক, পরীক্ষা, পূর্ণতা হইল; তৃষ্ণা আরও তীব্র, তীক্ষ্ণ হইল। নগেন্দ্র যে জ্ঞান লাভ করিলেন, যে শিক্ষা পাইলেন, তাহা আর ভুলিবার নহে। তখন একদিন দুঃখকাতর হতাশের সুখস্বপ্নের মত সূর্য্যমুখী আসিলেন। গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; গ্রন্থকার বলিয়াছেন "অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখ ভোগই প্রধান শিক্ষা।"

দেবেন্দ্রের উপর যেমন রাগ হয়, ঘৃণা হয়, তেমনই দয়াও হয়। সে ত এমন ছিল না। মধুর পবনে কুসুমকলিকা কেবল ফুটিতেছিল, ঘটনাচক্রে ফুটিবার পূর্ব্বে সে পঙ্কিল স্থানে পতিত হইল; তখন তাহার কতকগুলি দল ফুটিল—ফুটিল, কিন্তু হৃদয়ে দুর্গন্ধ, পাপ লইয়া। দেবেন্দ্র পূর্ব্বে এমন ছিল না—তাহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল; হৈমবতী যদি সূর্য্যমুখী বা কমলমণি হইত, তবে হয় ত তাহা নিষ্কলঙ্কই থাকিত। গ্রন্থকার কমলাকান্তের দপ্তরে বলিয়াছেন, "সংসারশিক্ষা-শূন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না—তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে।" স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া দেবেন্দ্র আপনার সর্ব্বনাশ সংসাধন করিল—পাপস্রোতে গা ভাসাইল। শেষ আবর্ত্তে পড়িয়া আর জ্ঞান রহিল না; সকল প্রকার ইন্দ্রিয়সুখে সে হৃদয়ের শান্তি অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কোন পাপেই আর তাহার বিতৃষ্ণা রহিল না। দেবেন্দ্র যখন বলিল, "আর যদি কখন আমার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ কর্ণে শুনি, তবে মদ ছাড়িব। নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।" তখন তাহার জন্য সত্যই দুঃখ হয়। সেই পাপাসক্তের নয়নে ঘটনাক্রমে কুন্দনন্দিনীর অপরূপ রূপরাশি পতিত হইল। পাপতৃষ্ণার উপর পাপতৃষ্ণা প্রবল হইল। তখন তাহার "কাঁটা ফুটে" মরার ভয় দূর হইয়া গিয়াছিল,

লোকলজ্জার নিষ্ঠুর দংশনের ভয়ে সে আর ভীত নহে। সে তখন "কলঙ্কের ফুল" খুঁজিতে লাগিল; হরিদাসী বৈষ্ণবী সাজিয়া দত্তবাড়ী গেল—আরও নানারূপ পাপ উপায় অবলম্বন করিল। সে যে কুন্দকে পাইবার জন্ত এত চেষ্টা করিল, সে হয়ত কেবল

"To sport an hour with Beauty's chain
Then throw it idly by."

পাপেই পাপের বৃদ্ধি—মধ্যে হীরা আসিয়া পড়িল। ক্রোধপরবশ দেবেন্দ্র, পাপময় দেবেন্দ্র তাহার সর্ব্বনাশ করিল—পাপের ভার পূর্ণ হইল—তাঁহার রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিল।

এই গ্রন্থে হীরা আর একটি প্রধান চরিত্র। হীরা দত্তবাড়ীর দাসী, সে অশিক্ষিতা বালবিধবা বলিয়াই পরিচিতা। তাহার ভরা যৌবন, দুর্লভ-রূপ, সে চঞ্চল স্বভাবসম্পন্না, বিলাসাসক্তিময়ী। এইরূপ যুবতীর অবনতির পথ শীঘ্রই পরিষ্কৃত হয়; হীরার অধঃপতন নিতান্ত শীঘ্র না হইলেও তাহার গভীরতা অত্যন্ত অধিক। সে দেবেন্দ্রকে দেখিল, দেবেন্দ্রের অতুল রূপ, অতুল ঐশ্বর্য্য—আপনার পাপ-উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ভাবিয়া সে হীরাকে আদর করিল;—হীরা মরিল। হীরা নিতান্ত সাধারণ রমণীর মত নহে; যখন সে দেখিল যে দেবেন্দ্র অন্তে আসক্ত, তখন দত্তগৃহের উদ্যানে তাহাকে শিক্ষা দিল—আপনার সর্ব্বনাশের পথ আপনি পরিষ্কৃত করিল। তখন সে ডুবিয়াছে। এদিকে দেবেন্দ্র ক্রোধান্ধ হইল—পয়োমুখ বিষকুম্ভের মত সে হীরার সর্ব্বনাশ সংসাধন করিল। "ঘুমের দেশে ভাঙ্গিল ঘুম"—হীরা আপনার অবস্থা বুঝিল। তখন তাহার পৈশাচিক ভাব ভীষণ প্রবল হইয়া উঠিল—তাহার প্রতিহিংসা বৃত্তি উত্তেজিত হইল; প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিই তাহার জীবনের গ্রন্থি সবল রাখিল। দেবেন্দ্রের প্রতি প্রতিহিংসা লইতে না পারিয়া সে কুন্দের প্রতি প্রতিহিংসা লইল—সহজেই তাহার প্রতি প্রতি-হিংসা লইতে পারিল, সরলা যুবতী আত্মঘাতিনী হইল। আবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। হীরা উন্মাদিনী হইল—অতীত পাপের স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া সে উন্মাদিনী হইল। দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পরেও গভীর রজনীতে উদ্যান মধ্যে, রক্ষকে ভীতচিত্তে শুনিয়াছে উন্মাদিনী হীরা গাহিতেছে,—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

এই গ্রন্থমধ্যে নিতান্ত অল্প সময়ের জন্ত আমরা দুই জনের সাক্ষাৎ পাই।

হরদেব ঘোষাল ও সুরেন্দ্র উভয়েই অত্যল্প কালের জন্য পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন; কিন্তু তাহাতেই তাঁহাদিগের মহত্ব বুঝিতে পারি। তাঁহাদিগের জ্যোতিঃ ভাস্বর স্নিগ্ধ; চিত্রের পশ্চাৎভাগে তাঁহারা স্থাপিত—তথাপি তাঁহাদিগের জ্যোতিঃ হৃদয় আলোকিত করে।

বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি গুরুতর সামাজিক প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন বা প্রচলিত মতের বিরোধী মত পাঠকের মনে অঙ্কুরিত করিয়া গিয়াছেন। এমন অনেক কুসুম আছে উষার আলোক যাহাদিগকে কেবল প্রস্ফুটোন্মুখ করিয়া যায়; দীপ্ত সূর্য্যকরে তাহারা প্রস্ফুটিত হয়; তখন সমস্ত দলগুলি বিকশিত হয়। বঙ্গসাহিত্যের বিমল প্রভাতে বঙ্কিমচন্দ্রের উদয়—"বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন" বঙ্কিমচন্দ্র কথিত মতকে কেবল প্রস্ফুটোন্মুখ রাখিয়াছিলেন—তাহার বিকাশ পরে হইয়াছিল। বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর বিধবাবিবাহ হইয়াছে। শ্রীশচন্দ্রকে নগেন্দ্র যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে বিধবাবিবাহের সপক্ষে মতগুলিও প্রদত্ত হইয়াছে কিন্তু বিবাহের আদ্যন্ত শোকোচ্ছ্বাসোদ্দীপক—সেই হইতেই বিপদের উপর বিপদের ঘন মেঘ আষাঢ়ের আকাশে জলভরা জলধরজালের মত আসিয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্র এমন ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন যে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে পুস্তক সমাপ্ত করিবার পর সে কথা আর মনে থাকে না। থাকে না বলিয়াই যে গুণ বা দোষের জন্য তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের "সংসার" সর্ব্বসাধারণে তেমন আদৃত নহে, সেই গুণ বা দোষসত্বেও বিষবৃক্ষ সর্ব্বসাধারণে আদৃত। বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষে যে মতের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন—সংসারে তাহার বিকাশ।

বিষবৃক্ষ অতি সুন্দর উপন্যাস; কিন্তু তাহা দোষবর্জ্জিত নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের কথা বলিতেছি না; এই গ্রন্থে একটি প্রধান দোষ দৃষ্ট হয়—সেটি সেই স্বপ্নদর্শন। কুন্দ স্বপ্নে তাহার জীবনের বিপ্লবকারী মূর্ত্তিযুগল দেখিতে পাইল—রেখায় রেখায় তাহাদিগের মূর্ত্তি মিলিল—আবার স্বপ্নে যে বাণী শুনিল তাহাই হইল। স্বপ্নের এইরূপ অজ্ঞেয় রহস্যময় অসীম ক্ষমতা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। দোষ সত্বেও বিষবৃক্ষের মত সুন্দর উপন্যাস দুর্লভ। গ্রন্থকারের সহিত আমরাও ভরসা করি "ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"

প্রচারে প্রকাশিত "দুইটি হিন্দুপত্নী" নামক প্রবন্ধে, শ্রদ্ধেয় বাবু চন্দ্রনাথ বসু ভ্রমরের সহিত সূর্য্যমুখীর তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সূর্য্যমুখীর আচরণফলে "যে যেখানে ছিল সকলেই শেষে সুখী হইল,।নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী সন্তানাদি লাভ করিয়া পরম সুখে পবিত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গেল।—দুঃখিনী কুন্দনন্দিনী থাকিলে সেও নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর সঙ্গে তেমন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইত। কিন্তু ভ্রমরের আচরণের ফলে ভ্রমর গেল, গোবিন্দলাল গেল, হরিদ্রাগ্রামের রায়বংশ লোপ হইল, কৃষ্ণকান্ত রায়ের নাম ডুবিল, একটা সংসার, একটা সম্পত্তি, একটা ঐশ্বর্য্য ছারখার হইয়া গেল।" তাহার পর লেখক বলিতেছেন "বুঝিবা পরিণামের এই ভীষণ, এই শোচনীয় প্রভেদ ভাবিয়া সূর্য্যমুখী যে ধাতুর পত্নী, সংস্কৃত সাহিত্যে সেই ধাতুর পত্নীত্বের এত গৌরব করা হইয়াছে।" দুঃখের বিষয় আমরা শ্রদ্ধেয় লেখকের এই মতের অনুমোদন করিতে সমর্থ নই। আমাদিগের বিশ্বাস যে দেশ কাল ও পাত্রভেদে আচরণের প্রভেদ হইয়া থাকে ;—ভ্রমরের অবস্থায় ভ্রমর যাহা করিয়াছিল তাহাতে তাহার গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহে। গোবিন্দলালের পাপের প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক ছিল। আর যদি সব লোপ হইল এবং গোবিন্দলাল ও ভ্রমর সন্তানাদি লাভ না করিয়া মরিল (!!!) তাহাতেই বা দোষ কি? যদি তাহাতে কোন দোষ থাকে, তবে তাহা গোবিন্দলালের। মহাভারতকার বলিয়াছেন যে, এ সংসারে পিতা পুত্রের কর্ম্মে বদ্ধ নহেন, পুত্রও পিতার কর্ম্মে আবদ্ধ নহেন,—সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকেন। গোবিন্দলাল স্বেচ্ছায় যে বিষপান করিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি অবশ্যই ভোগ করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের উপসংহার ভাগে চন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছেন "বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল, এই দুইখান পুস্তককে যদি উপন্যাস বল, তবে দুই খানিই হিন্দু উপন্যাস, যদি কাব্য বল তবে দুই খানিই হিন্দু কাব্য।" কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার স্থান এ নহে ; তবে বিষবৃক্ষ সম্বন্ধে গোটা দুই কথা বলিবার আছে। "যদি হিন্দু উপন্যাস অর্থ এই হয় যে এই পুস্তকের অন্তর্গত সমস্ত প্রধান চরিত্রই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, তবে পুস্তক পাঠ করিয়াও যে তাহা বুঝে নাই, বৃথা তাহার পুস্তক পাঠ ; আর যদি ইহা হিন্দুর জন্য রচিত এই অর্থ হয়, তবে বলিতে চাহি যে সাহিত্যক্ষেত্রে এমন

সুন্দর উপন্যাসখানিকে এমন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় না। যাহা ভাল তাহা সর্ব্বদাই ভাল, যাহা মন্দ তাহা সর্ব্বত্রই মন্দ, ইহা কোন ঘটনাবিশেষের কথা নহে, ইহা মতের কথা। একখানি ভাল উপন্যাস হইতে একটী ভাল কবিতা হইতে, একখানি সুন্দর চিত্র হইতে আনন্দ উপভোগ করিবার অধিকার সকলেরই আছে, তবে পণ্য দ্রব্যের মত তাহাতে হিন্দুত্বের ছাপ দেওয়া কেন?। ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে একটা প্রস্ফুট সৌন্দর্য্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে, লোক চক্ষুর অন্তরালে হিন্দুত্বের নিভৃত অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যরূপে এই পুস্তকখানি রাখিতে ইচ্ছা হয় না। তাহাতে কি বিশেষ উপকার বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা?

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

তুকারাম।

একাদশ প্রস্তাব।

এইরূপে দিন দিন তুকারামের প্রতিপত্তি ও সেই সঙ্গে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তিমান ও অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষ ভাবিয়া, অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গ্রামে গ্রামে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত ও গৃহে গৃহে তাঁহার অভঙ্গ সমূহ গীত হইতে লাগিল। অতি দূরদেশ হইতেও আর্ত্ত, পীড়িত ও ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতে আরম্ভ করিলেন। সমাজের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়া থাকা একদিকে যেমন ক্লেশকর, অতিরিক্ত পরিচিত হওয়াও অপর দিকে তেমনই অসুবিধাজনক। সাধুগণের পক্ষে এরূপ সমাদর ভাজন হওয়া আরও বিশেষরূপ ধর্ম্ম-বিঘ্নোৎপাদক। তাহাতে তাঁহাদিগের স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়, এবং আহার, বিহার এমন কি নিয়মিত পূজা, পাঠ প্রভৃতিতেও স্বাতন্ত্র্য থাকে না। জনসমাজে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে তুকারামকে এই অসুবিধা বিলক্ষণ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কেহ তাঁহাকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপহার পাঠাইতেন, কেহ তাঁহাকে সুমিষ্ট খাদ্য ভোজন করাইতে চাহিতেন, কেহ বা তাঁহাকে দেবাবতার বা দেবানুগৃহীত পুরুষ ভাবিয়া, অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করিতেন। নিস্পৃহ ও বিনয়ী তুকারামের এ

সকল ভাল লাগিত না। সাধ্যানুসারে তিনি সকল প্রকার সাংসারিক সম্পদ ও গৌরব হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিলে পাছে কেহ ব্যথিত হন, এই ভাবিয়া, সম্পূর্ণরূপ নিজের ইচ্ছানুসারেও চলিতে পারিতেন না। ইহার উপর আরও বিপদ ছিল। মৃতবৎসা আসিয়া তাঁহার নিকট সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতেন, বিষয়ী নিজের বৈষয়িক উন্নতির জন্য অনুরোধ জানাইতেন ; দিন নাই, রাত্রি নাই, দলে দলে লোক আসিয়া নানা প্রকার উপরোধ শুনাইতেন। এই সকল কারণে যেরূপ সংযম ও বিরাগের সহিত জীবন অতিবাহিত করিতে তুকারামের ইচ্ছা হইত, সকল সময় তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না। তিনি দুঃখিতচিত্তে ভগবানের নিকট বলিতেন, "প্রভো, আর কেন, এইবার আমাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া চল।" অনবরত ব্রত উপবাস ও জগারণ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার শরীরও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল ; অথচ মানসিক পরিশ্রমের বিরাম ছিল না। ভক্তবৃন্দকে সমাগত দেখিলেই তিনি সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইতেন ; এবং নূতন নূতন অভঙ্গ রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতেন ; তখন আর শরীরের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেন না। তাঁহার পৃথিবীর প্রবাসকাল যে সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল, জীবনী শক্তি হ্রাসের সঙ্গে তিনি তাহা অনুভব করিতে পারিতেছিলেন। ক্রমশঃ ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভাবস্থার ন্যায় তাঁহার জীবনে পুনর্ব্বার বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য লক্ষিত হইল। মন পার্থিব কোন বস্তুতেই স্থির থাকিত না। এক স্থানে বসিয়া আছেন, হঠাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আমি বৈকুণ্ঠে যাইতেছি।" হরি কথা ভিন্ন অন্য কথা আর মুখে আনিতেন না। দিবা রাত্রি হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন এবং প্রতি গ্রাসে ও প্রতি নিশ্বাসে হরিনাম স্মরণ করিতেন। সঙ্কীর্ত্তন কালে প্রায়ই বলিতেন, "হে পণ্ঢরীশ, তোমার নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা আর অধিক কষ্টকর কি আছে? আমার আয়ু পরিমিত করিতে চাও, কর, কিন্তু প্রভো, এই করিও, যেন আমার শক্তির হ্রাস না হয়, যেন প্রভো, আমি শক্তির অভাবে তোমার গুণগান করিতে অসমর্থ না হই।" কি মধুর প্রেম! কি অহেতুকী ভক্তি! এরূপ ভক্তি না থাকিলে কি কখনও ভগবানের কৃপার অধিকারী হইতে পারা যায়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, লোহগ্রামের লোকেরা তুকারামের সঙ্কী-

র্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্ত সর্ব্বদা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তুকারামের সঙ্গ লাভ দ্বারা লোহগ্রামবাসিগণ ধর্ম্মানুরাগী ও ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগ-জনিত সদাচরণ গুণে তাঁহাদিগের পার্থিব সম্পদও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। লোহগ্রামবাসিগণ তুকারামকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন, তুকারামও তাঁহাদিগের প্রতি তেমনই স্নেহবান ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি অভঙ্গে তিনি লোহগ্রাম সম্বন্ধে আপনার সস্নেহ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি লোহগ্রামে যাইয়া এক মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। এই সময় মহারাষ্ট্রীয়গণের সঙ্গে মুসলমানদিগের সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছিল এবং লুণ্ঠন, হত্যা ও গ্রাম উৎসাদন প্রভৃতি নিষ্ঠুর কার্য্য তখন মহারাষ্ট্রদেশে একরূপ দৈনিক ঘটনাই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তুকারামের অবস্থান কালে লোহগ্রাম "পরচক্র" দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে, তাহার অধিবাসিগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। গ্রামবাসিদিগকে নিরুৎসাহিত ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া তুকারাম তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিলেন। সকলকে একত্র করিয়া তিনি সুমিষ্ট বাক্যে বলিলেন; "যে ধন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্ম শোক করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা গিয়াছে, তাহা ভগবানেরই বিধানে গিয়াছে; সুতরাং তাহা তাঁহারই সেবায় উৎসৃষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, সকলে শোক সম্বরণ কর। অন্তরাত্মাস্থিত নারায়ণই সকল প্রকার সুখ দুঃখের ভোক্তা; শরীরে তপ্ত অঙ্গার পতিত হইলে, তিনিই দুঃখ ভোগ করেন; সুতরাং দুঃখ কখনও জীবের নিজের নয়। ভগবান যখন, বিনা মূল্যে, কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারা লভ্য, তখন অর্থ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া চিন্তা কি?"

তুকারাম এইরূপে গ্রামবাসিদিগকে অবস্থানুরূপ সান্ত্বনা দান করিলেন। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁহার স্বভাবত কোমল হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত ও উদাসভাবাপন্ন হইল। তুকারামের নিজের যদিও কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু সাধারণের ক্ষতিতে তিনি নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্তের ন্যায় বোধ করিলেন। শত্রুহস্তে উৎসাদিত গ্রামের দৃশ্য অতি শোচনীয়। ভস্মাবশেষ গৃহ, পদদলিত শস্যক্ষেত্র, ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হতাহত জীবদেহ এবং লুণ্ঠিত-বিত্ত ও বিপন্নদিগের অশ্রুসিক্ত মুখ দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। এই হৃদয়ভেদী দৃশ্য দর্শন করিয়া তুকারাম সংসারের অনিত্যত্ব আরও সুস্পষ্টরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি ভগবানকে কেবলই বলিতেন, "প্রভো

এই মর্ত্ত্য লোকে বাস আমার যথেষ্টই হইয়াছে, এইবার আমায় বৈকুণ্ঠে লইয়া চল।" তুকারামের উপদেশ গুণে লোহগ্রামবাসিগণ পূর্ব্ব হইতেই সাংসারিক সুখে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই আকস্মিক বিপৎপাতে সে শিক্ষা সম্যক্‌রূপ ফলদায়িনী হইল। পার্থিব সম্পদের অসারত্ব বুঝিয়া, লোহগ্রামের অনেকে, ধর্ম্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য, তুকারামের সঙ্গে দেহুতে আগমন করিলেন।

তুকারামের দেহুতে প্রত্যাগমনের অল্পদিন পরে দোলযাত্রার উৎসব উপস্থিত হইল। সাধারণতঃ দোলযাত্রা উপলক্ষে অনেক বীভৎস আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তুকারাম সে সকল রহিত করিয়া গ্রামস্থ সকলকে কেবলই হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিতে বলিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে "হোলির" কুৎসিত আমোদ রহিত হওয়াতে, দেহুগ্রাম সে বার নির্ম্মল ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইল। পূর্ণিমা গত হইলে, প্রতিপদের দিন তুকারাম সমস্ত রাত্রি সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। সে রাত্রিতে তিনি যে ২৪টী অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা "কায়াব্রহ্মকরণ" অর্থাৎ "ব্রহ্মে দেহ-সমর্পণ" নামে পরিচিত। সঙ্কীর্ত্তনের পর প্রাভাতিক আরতি সমাপনান্তে তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দানপূর্ব্বক হরিনাম ঘোষণা করিতে করিতে, মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন এবং অবলাইকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি বৈকুণ্ঠে যাইতেছি, তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে এস"। ইহার কিছু-দিন পূর্ব্ব হইতে তুকারাম কোন তীর্থে যাইতে হইলে সকলকে বলিতেন যে, "আমি বৈকুণ্ঠে যাইতেছি," সুতরাং অবলাই সহজেই মনে করিলেন যে, তুকারাম এবারও কোন তীর্থে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন এবং তাঁহার অভ্যাসানুরূপ "আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম" বলিতেছেন। সেই জন্য তিনি সে কথায় কোন উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি সসত্ত্বা, গৃহে শিশুসন্তানগুলিকে ফেলিয়া এবং সংসারের ভার ছাড়িয়া কেমন করিয়া তোমার সঙ্গে যাইব।" তুকারাম এই কথা শুনিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম, আর গৃহে ফিরিব না।" ইহার পর আত্মীয়, স্বজন ও বন্ধুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন ;—

আত্মজন, পরজন, যে হও সে হও।
পাণ্ডুরঙ্গ শ্রীচরণে শরণ গে লও॥
জানায়ো প্রণাম মোর গুরুজনগণে।
শেষ নিবেদন মোর রাখিও স্মরণে॥

পড়ে যদি মধুভাণ্ডে মক্ষিকা কখন।
সে কি আর উঠিবারে চাহে কদাচন॥
সময় বারেক যদি গত কভু হয়।
সেও আর কোন দিন ফিরিবার নয়॥
সিন্ধু সনে ভাগীরথী হয় যদি লীন।
ফিরিতে পশ্চাতে সে কি চাহে কোন দিন॥
এই নিবেদন তবে চরণে সবার।
যাইতেছে তুকারাম ফিরিবে না আর॥

অনন্তর নিজের পত্নীর কথা উল্লেখ করিয়া, অনুগত ও শিষ্যদিগকে বলিলেন ;—

"যা ছিল প্রাণের কথা বলেছি সকল।
একটী এখনও বাকী রয়েছে কেবল॥
চলিলাম আমি আজ অমর-সদনে।
রহিলেন পত্নী মোর মরত ভবনে॥
জান সবে গৃহকার্য্যে নহে সে চতুরা।
নাহি মুখে মিষ্টবাণী, বড়ই মুখরা॥
কি বলিব সাধুগণ, তোমা সবে আর।
মোর অনুরোধে সবে লয়ো তার ভার॥
বহু উপকারে আমি আছি তার ঋণী।
বসনে বাঁধিয়া তারে করেছি গৃহিণী॥ *
পাণ্ডুরঙ্গ, ঋণ তার করো বিমোচন।
খুলে দাও উভয়ের দাম্পত্যবন্ধন॥
তুকা বলে দয়াময় হরির কৃপায়।
ঋণ শোধি তুকারাম মুক্তি পথে ধায়॥

ইহার পর সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন ;—

চলিনু আপন দেশে শুন বন্ধুগণ।
"রাম রাম" সবে মোর করহ গ্রহণ॥ †

* বিবাহের সময় দম্পতী পরস্পরের বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বদ্ধ হন। তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম, বোধ হয় তুকারামের ইহাই বলা উদ্দেশ্য। আমাদিগের দেশেও বর কন্যাকে "গাঁটছড়া" বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

† "আমার রাম রাম গ্রহণ করিও" অর্থাৎ আমার বিদায় কালীন নমস্কার অবগত হইও। "রাম রাম" উচ্চারণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবার প্রথা মহারাষ্ট্রদেশে প্রচলিত আছে।

এই হল শেষ দেখা সকলের সনে।
ভবের সম্বন্ধ পাশ ছিন্ন এত দিনে॥
সবার চরণে আমি করি এই নতি।
দীন আমি, কৃপা সবে রেখ মোর প্রতি॥
যাই আমি, বন্ধুগণ, যাই নিজ ধাম।
বল সবে "রাম কৃষ্ণ বিট্ঠলের" নাম॥

এইরূপে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, বিঠোবাকে প্রণামানন্তর, তিনি নাম ঘোষণা করিতে করিতে সেখান হইতে বহির্গত হইলেন। তুকারাম বলিয়াছিলেন যে, "আর আমি প্রত্যাগমন করিব না; সেই জন্য যদিও কেহ কেহ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে এরূপ বৈকুণ্ঠগমনের কথা বলিতেন বলিয়া, তিনি যে এবার সত্য সত্যই মহাপ্রস্থান করিবেন, তাহা কাহারও প্রত্যয় হয় নাই। তাঁহারা ভাবিলেন, হয়ত তিনি কোন বহুদূরস্থ দুর্গম তীর্থে গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং সেই জন্যই এরূপ কথা বলিতেছেন। তাদৃশ সঙ্কট বহুল সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহার প্রিয়শিষ্য রামেশ্বর ভট্টকেও এ বিষয়ে অনুরোধ জানাইতে বলিলেন। তুকারামের অনুগামিগণ যখন এইরূপ পরামর্শ করিতেছিলেন,তুকারাম তখন সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে একবারে ইন্দ্রায়নী তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি তাঁহার অন্তিমপ্রার্থনা সূচক কয়েকটী অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। তুকারামের ভক্তিমান চরিতাখ্যায়ক মহীপতি বলেন যে, সেই সকল অভঙ্গ গীত হইবার পর, সহসা দিব্য জ্যোতিতে তাঁহার পার্শ্বচরদিগের চক্ষু ঝলসিত হইল এবং তাহার পর তাঁহারা নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে তুকারাম কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তিগণ তুকারামের এইরূপ অন্তর্দ্ধান ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পান নাই; কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবগণ দেখিলেন যে, স্বর্গ হইতে দেবগণবেষ্টিত বিমান অবতীর্ণ হইল এবং শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদে ও গন্ধর্ব্বগণের নাম ঘোষণায় আকাশ পরিপূর্ণ হইল। তুকারাম দেবগণে বেষ্টিত হইয়া, দেবরথে আরোহণপূর্ব্বক, সশরীরে বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিলেন। ভারতের অন্যান্য অনেক সাধু পুরুষের ন্যায় তুকারামেরও তিরোভাব এইরূপ অলৌকিকতায় জড়িত হইয়াছে এবং তাহা বিশ্লেষণ করিয়া কোথায় ও কি ভাবে তিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয়

করিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার কোন চরিতাখ্যায়ক অনুমান করেন যে, হয় ত যে সময় তুকারামের শিষ্যগণ তাঁহার শেষ সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, তুকারাম সেই সময় ইন্দ্রায়নীতে অবতরণপূর্ব্বক "জলসমাধি" গ্রহণ করিয়াছিলেন। জলসমাধি গ্রহণের প্রথা মহারাষ্ট্রদেশে যেরূপ প্রচলিত ছিল, তাহাতে তুকারামের ন্যায় বীতরাগ পুরুষের পক্ষে তাহা অবলম্বন করা অসম্ভব নহে। তুকারাম যেখানে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে এখনও নির্দ্দেশ করে, ইন্দ্রায়নীর সে স্থান অতি গভীর এবং শিশুকাদি জল জন্তুতে পরিপূর্ণ। গভীর জলের জন্যই হউক, বা এই সকল জলজন্তু দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই হউক, তুকারামের দেহ আর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই বলিয়াই, বোধ হয়, তুকারাম সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তুকারামের চরিতাখ্যায়ক উপরি উক্তরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তুকারামের তিরোভাব সম্বন্ধে এইরূপ আরও দুই একটী অতি-লৌকিক মত প্রচারিত আছে। সে সকলের আলোচনায় কোন লাভ নাই। দেহুতে তুকারামের বংশধরদিগের গৃহে তাঁহার অভঙ্গ সমূহের যে পাণ্ডুলিপি এখনও রক্ষিত ও অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছে এবং যাহা ইন্দ্রায়ণী হইতে উদ্ধৃত পাণ্ডুলিপি বলিয়া সেখানকার লোকে এখনও বিশ্বাস করেন, তাহার শেষে এইরূপ লিখিত আছে "১৫৭১ শকাব্দের ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়া তিথির প্রাতে তুকারাম তীর্থ প্রয়াণ (বৈকুণ্ঠ গমন) করিয়াছিলেন।" ইহাতে কোন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহাই তাঁহার পরলোক গমন সম্বন্ধে অমিশ্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; ইহার অতিরিক্ত কিছু নির্দ্দেশ করিতে হইলে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তুকারামের তিরোভাবের সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। তাঁহার শিষ্যবর্গ এবং অবলাইও হাহাকার করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তুকারাম হয়ত জল হইতে পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে পারেন, বা তীর্থযাত্রা হইতে বিরত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারেন, এই আশায় সকলেই ইন্দ্রায়ণীর তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে অপর সকলেই গৃহে প্রতিগমন করিলেন; কেবল রামেশ্বরভট্ট প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটী ভক্তিমান শিষ্য তাঁহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত না হওয়া

পর্য্যন্ত সে স্থান ত্যাগ করিব না এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তথায় বাস করিতে লাগি-লেন। মহীপতি বলেন, চতুর্থ দিনে তুকারাম তাঁহাদিগের জন্য স্বর্গ হইতে আপনার ব্যবহৃত একটী বাদ্য ও পরিচ্ছদ নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার সংবাদ স্বরূপ কয়েকটী অভঙ্গও প্রেরণ করিলেন। তখন তাঁহারা তুকারাম নিশ্চয়ই পরলোক গমন করিয়াছেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, স্নানশুদ্ধি সমাপনান্তে বিঠোবাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন।*

তুকারামের তিরোভাবকালে অবলাই সসত্ত্বা ছিলেন। তুকারাম পত্নীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার গর্ভে এবার যে সন্তান জন্মিবে তাহার নাম নারায়ণ রাখিও, সে বিশেষ ভক্তিমান হইবে।" তুকারামের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। নারায়ণ সত্য সত্যই পরম ভক্তিমান ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া-ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি অভঙ্গ এখনও মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত আছে। তুকারামের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে শিবাজী একবার দেহুতে আগমন করিয়াছিলেন। তুকারামের পুত্রদিগকে বিশেষতঃ নারায়ণকে ভক্তিমান ও পিতৃপথাবলম্বী দেখিয়া, তিনি তাঁহাদিগের ভরণপোষণের জন্য কয়েকখানি গ্রাম জায়গীর দান করিয়াছিলেন। তুকারামের বংশধরগণ অদ্যাপি তাহা ভোগ করিতেছেন।

তুকারামের জীবনের আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। সাধারণতঃ সাধুদিগের জীবন যেরূপ ঘটনা-শূন্য হইয়া থাকে, তুকারামের জীবন সেরূপ নহে। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ। সুখ দুঃখের যে অভিজ্ঞতা হইতে মনুষ্যের শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তুকারামের জীবনে তাহা যথেষ্টই ঘটিয়াছিল। সম্পন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি পিতা মাতার পরম আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। সামাজিক রীতি অনুসারে অল্পবয়সে বিবাহ করাতে তরুণ যৌবনেই তাঁহাকে সংসারপাশে বদ্ধ হইতে হইয়াছিল। বিষয় বুদ্ধির তাঁহার অভাব ছিল না। যে কয়বৎসর তিনি পৈত্রিক ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার যথেষ্টই উন্নতি হইয়াছিল। সুতরাং পিতামাতার স্নেহ, পত্নীর প্রেম, নবজাত পুত্রের মায়া এবং অর্থের মোহ প্রভৃতি, সকল প্রকার সাংসারিক প্রলোভন একত্র সম্মিলিত হইয়া,

* এই নিদর্শন প্রাপ্ত হইবার দিনই তুকারামের তিরোভাবের দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে এবং এই দিনে এখনও প্রতি বৎসর তুকারামের স্মরণার্থ দেহুতে একটী মেলা হইয়া থাকে।

তাঁহাকে শত বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছিল। পৃথিবীর কোটী কোটী জীবের ন্যায় তিনিও বিষয়ের সেবায় নিমগ্ন থাকিবেন, এ অবস্থায় ইহাই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু যিনি রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে পথের কাঙ্গাল করিয়াছিলেন এবং ভিকারিণী শচীমাতার সর্ব্বস্বধন শ্রীচৈতন্যকে তাঁহার অঞ্চল হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার সাভিলাষ দৃষ্টি তুকারামেরও উপর নিপতিত হইয়াছিল। পৃথিবীর শোক, তাপ, হিংসা ও অশান্তি প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য, তিনি তুকারামকে আপনার সৈনিকরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। পিতামাতার আকর্ষণ, পত্নীর বাহুপাশ দূরে থাকুক, লৌহের শৃঙ্খলে পদদ্বয় আবদ্ধ থাকিলেও, ভগবানের চিহ্নিত সৈনিক তুকারামের সাধ্য ছিল না যে, তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন। বিশ্বরাজের রণভেরীর অহ্বানে তিনি সংগ্রামক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। তাঁহার বন্ধনও একে একে ছিন্ন হইতে লাগিল। পিতা, মাতা, এবং তাঁহার ভ্রাতৃজায়া উপর্য্যুপরি পরলোক গমন করিলেন। ভ্রাতা সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। স্নেহাস্পদ পুত্র শৈশব আতক্রান্ত না হইতে হইতেই পিতামাতাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। বাণকের পক্ষে যাহা প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর তুকারামের সেই জাতীয় ব্যবসায়েও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তুকারাম প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিলেন না। অর্থ, পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব, স্বজাতীয়গণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা সকলই ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল এবং সর্ব্বশেষে তাহার রোগজীর্ণা পত্নী অর্থাভাবে প্রাণত্যাগ করিলেন। ভগবানের এমনই বিচিত্র কৌশল যে, যাহা একের পক্ষে বিষ, অপরের পক্ষে তাহাই অমৃত স্বরূপ হইয়া থাকে। তুকারাম যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, অনেকের পক্ষে নাস্তিকতাই তাহার পরিণাম। কিন্তু শিশু যেমন মাতার নিকট প্রহৃত হইলেও মাতাকেই দৃঢ়রূপে ধারণ করে, তুকারামও তেমনই সেই বিশ্বজননীর নিকট নিগৃহীত হইয়া তাঁহাকেই অবলম্বন করিলেন।

স্বর্ণকার স্বর্ণের শ্যামিকা দূর করিবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে দগ্ধ করে, ভগবানও আপনার প্রিয়তম সন্তানগণের নির্ম্মলত্ব প্রতিপাদনের জন্য, তাঁহাদিগকে সংসারের প্রচণ্ড অনলে নিক্ষেপ করেন এবং সেই অগ্নি পরীক্ষা দ্বারাই তাঁহাদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধত্ব সাধিত হয়। তুকারামের সমস্ত জীবনই এক সুদীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষা বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

সংসারের অসারত্ব বুঝিয়া তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার নিস্কৃতি ছিল না। তাঁহাকে মুক্তিমার্গ গমনে উদ্যত পদ দেখিয়া আত্মীয়, বন্ধু ও প্রতিবাসিগণ চতুর্দ্দিক হইতে নিবারণের জন্য ধাবিত হইলেন। কেহ তাঁহাকে উন্মাদ এবং কেহবা নির্ব্বোধ, ভাবিয়া তিরস্কার করিলেন। তুকারাম যখন তাহাতে বিচলিত হইলেন না, তখন বিদ্রূপ, কটূক্তি ও তাহার পর নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। কণ্টকের যষ্টিতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, এবং তাঁহার সর্ব্বস্বধন বিঠোবার চরণে উৎসৃষ্ট অভঙ্গগুলি ইন্দ্রায়ণীতে নিক্ষিপ্ত হইল। গৃহে শান্তি থাকিলে মনুষ্য এ সকল বাহিরের অত্যাচার কোন রূপে সহ্য করিতে পারে; কিন্তু তুকারামের পক্ষে সে শান্তির কণামাত্রও ছিল না। এক রজ্জুতে বদ্ধ বিপরীতমার্গগমনেচ্ছু পশুদ্বয়ের ন্যায় তিনি ও তাঁহার পত্নী বহুদিন পর্য্যন্ত পরস্পরের কষ্ঠ বেদনারই কারণ স্বরূপ ছিলেন। * তুকারাম যখন কোন রূপে পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন সাধুজনের পক্ষে যে পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর, তাহা উপস্থিত হইল। পুষ্প বিকসিত হইলে মধুমক্ষিকাগণ দলে দলে আসিয়া তাহার মধুলুণ্ঠন করিতে থাকে, শেষ বিনিময়ে আপনাদিগের পদরেণু রাখিয়া তাহাকে কলুষিত করিয়া যায়। সাধুপুরুষদিগেরও সদ্‌গুণের কথা শুনিলে মক্ষিকাবৃত্ত লোক দলে দলে ধাবিত হয়, এবং অতিরিক্ত প্রশংসা দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে আত্মাভিমান উৎপাদন পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে বিমলিন করিয়া যায়। তুকারামের নাম সাধারণের নিকট পরিচিত হইবার পর হইতেই তাঁহার নিকট লোক-সমাগম আরব্ধ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছত্রপতি শিবাজী হইতে পুত্রহীনা দরিদ্রা বিধবা পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছিতেন; শিষ্য, সেবক ও অনুরক্ত জনের সংখ্যা ছিল না। অর্থের এবং প্রশংসার প্রলোভন অজস্রধারে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু

* তুকারামের সাংসারিক অশান্তির বিষয় আমরা যথাস্থলে উল্লেখ করিয়াছি। অবলাইয়ের বাক্যবাণে প্রথম প্রথম তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অবলাই পতিকে কেবল তিরস্কার করিয়াই নিরস্ত থাকিতেন না; মহীপতি বলেন যে একবার তুকারাম কতকগুলি ইক্ষু দরিদ্র বালকদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, অবলাই তাঁহার পৃষ্ঠে একগাছি ইক্ষুদণ্ড ভগ্ন করিয়াছিলেন। তুকারাম তাহাতে কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন, অবলাইয়ের আমার প্রতি এতই ভালবাসা যে আমাদিগের দুই জনের জন্য অবলাই ইক্ষুটীকে দুই খণ্ড করিয়া লইলেন। তুকারাম এ বিষয়ে সক্রেটিসকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন।

তুকারাম তাহাতে বিমুগ্ধ হইলেন না। প্রশংসার মাদকতা উপলব্ধি করিয়া তিনি তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিলেন, এবং লক্ষপতির সম্পদ উপেক্ষা পূর্ব্বক ভিক্ষুকের জীর্ণকন্থা নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। উৎপীড়নে অক্ষুণ্ণ, প্রশংসায় অবিচলিত এবং ঐশ্বর্য্যে অনাকৃষ্ট থাকিয়া, তিনি ভগবানের নামামৃত স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে আদর্শ সকলের পক্ষে উপ-যোগী বা স্পৃহনীয় না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার বিনয়, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার স্বার্থত্যাগ এবং তাঁহার ভগবদ্ভক্তি মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে অনুকরণীয়। আত্মসংযম, ভূতানুকম্পা এবং অহেতুকী ভক্তি প্রভৃতি প্রকৃত সাধুর যে সকল লক্ষণ তাহা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। লক্ষ লক্ষ লোকের শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াও তিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা নীচ বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং ঘোর অত্যাচারীকেও প্রেমালিঙ্গন দানে বশীভূত করিয়া হরিনামামৃত বিতরণে কৃতার্থ করিতেন। বহিরঙ্গ ধর্ম্ম দেশ এবং জাতি অনুসারে বিভিন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু অন্তরঙ্গ ধর্ম্মে জাতিগত বা দেশগত কোন পার্থক্য নাই। সকল দেশীয় এবং সকল সম্প্রদায়স্থ সাধু-গণকেই তাহাতে সমতুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তরঙ্গ ধর্ম্মে তুকারাম যে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, যে কোন দেশীয় সাধুপুরুষেরই পক্ষে তাহা গৌরবজনক। ভেদ-বুদ্ধি-বিমূঢ় মনুষ্য সমাজ সাম্প্রদায়িকতা বিস্মৃত হইয়া প্রকৃত সাধুপুরুষের সমাদর করিতে শিক্ষা করিলে, তুকারাম সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বজাতীয় "সাধু" রূপেই পরিগণিত হইবেন।

তুকারামের অবলম্বিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধেও দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। যদিও তিনি কোন নূতন ধর্ম্মমত প্রচারিত করিয়া যান নাই, কিন্তু এক বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বদেশে এক নূতন কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের দুরভিগম্যতা দূর করিয়া তিনি তাহাকে সাধারণের সুপ্রাপ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আচণ্ডাল সকলেই যে ভক্তিগুণে মুক্তিলাভ করিতে পারেন এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে হইলে যে বাহ্যানুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না, তাহা তিনি লোকের প্রতীত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতে তাঁহার স্বদেশীয়গণ ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, প্রকৃত সাধুতা কেবলই ব্রাহ্মণগণের একমাত্র সম্পত্তি নহে। আকরস্থিত রত্নের ন্যায় নীচ-কুলেও প্রকৃত সাধু পুরুষের আবির্ভাব হইতে পারে। তুকারাম আজীবন

হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপে এবং শাস্ত্রোপদেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান যে অতি অকিঞ্চিৎকর, তাঁহার অনেকগুলি অভঙ্গে তিনি তাহা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন। বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার অভঙ্গ সমূহে নিম্নলিখিত ভাবগুলি পরিস্ফুট হইবে।

১ম। সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ সকল অবস্থাতেই শ্রীভগবানকে ভক্তি করিবে।

২য়। ত্রাতা, পাতা ও শরণ্যরূপে তাঁহাতেই নির্ভর করিয়া থাকিবে।

৩য়। তিনি কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই লভ্য; বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না।

৪র্থ। জীবের প্রতি অনুকম্পা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, আত্মানুভূতি এই সকলই প্রকৃত ধর্ম্মের অঙ্গ। ভস্মলেপন বা জটাধারণ ধর্ম্মের অতি নিকৃষ্ট অংশমাত্র।

৫ম। দ্বিজ, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই ভগবানের কৃপার অধিকারী। জাতি বা বংশের সঙ্গে ভগবৎকৃপার সম্বন্ধ নাই।

৬ষ্ঠ। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ অতি নিকট এবং অতি মধুর। তিনি আমাদিগের নিকট হইতে দূরে নহেন। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে আহ্বান করিলেই আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারি।

ইহাই তুকারামের প্রচারিত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, এবং ইহা দ্বারাই তিনি মহারাষ্ট্র দেশের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ যদিও ধর্ম্মের বিভিন্ন লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু ভগবানের সহিত জীবের নৈকট্য সংস্থাপনই সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। যে ধর্ম্মে সে উদ্দেশ্য যতই সম্পাদিত হয়, সে ধর্ম্ম ততই উচ্চ। এই উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য ভগবানকে কেহ রাজা, কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ সখা, কেহবা প্রিয়তম নায়করূপে কল্পনা করিয়াছেন। ভগবান কাহারও কিছু নহেন, অথচ তিনি সকলেরই সকল। যিনি যে ভাবে তাঁহাকে আরাধনা করেন, তিনি সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। নায়কভাবে ভগবানকে আরাধনা বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর্শ। দুর্ভাগ্যক্রমে এই আদর্শ হইতে পাত্র বিশেষে অতি বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে। তুকারাম যদিও বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতের অনুরূপ ছিল না। বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিদিগের ন্যায় তিনি জীব ও ভগবানের মধ্যে

পরকীয় নায়ক নায়িকাভাব কল্পনা করেন নাই। ভগবানকে প্রাণারাম পতিরূপে তিনি অনেক স্থলে আহ্বান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাঁহাকে পিতা, মাতা, সখা, সুহৃদ, শরণ্য ও আশ্রয়দাতারূপে ভজনা করিতেও বিস্মৃত হন নাই। জীবের বর্ত্তমান অবস্থায় ভগবানের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ, তাহাতে ভগবানে পরকীয় নায়কত্ব ভাব আরোপ করা কেবল ধর্ম্মের বিকৃতিকরণ মাত্র। ওতপ্রোত ভাবে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হইবার বাসনা হইতেই এই নায়কভাবের উৎপত্তি। কিন্তু জীবের বর্ত্তমান অপূর্ণ ও কলুষিত অবস্থায় সাধ্য কি যে, সেই পূর্ণস্বরূপ নিষ্পাপ পুরুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইতে পারে। সুতরাং প্রাণারাম পতি ও সখারূপে ভজনার সঙ্গে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব মূলক রাজ ভাব ও পিতৃভাব রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই সকল কারণে তুকারামের আদর্শই অতি মহান্ ও স্বাভাবিক বলিয়া আমাদিগের প্রত্যয় হয়।

যে লালসাময় মাদকতাপূর্ণ ভাবের জন্য, বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিরও গ্রন্থ অনিষ্টোৎপাদক হইয়াছে, তুকারামের কবিতায় তাহা লক্ষিত হয় না। তাঁহার কবিতা ভাগীরথীর সলিলের ন্যায় স্নিগ্ধ, নির্ম্মল ও তৃপ্তিকর; তাহা পান করিলে তৃষ্ণা দূরীভূত হয়, অথচ তাহাতে অবসাদ উৎপন্ন হয় না। যখন মহারাষ্ট্র দেশ কর্ম্মকাণ্ডের প্রাবল্যে শুষ্কমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তুকারাম সেই সময়ে সেখানে ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন। জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতগণ যখন তর্কবলে "সগুণ ব্রহ্ম-স্থাপন" ও "সগুণ-ব্রহ্ম নিরসন" করিতেন, বিদ্যাভিমান শূন্য তুকারাম এই সময় সেখানে আবির্ভূত হইয়া বিনীত ভাবে ভক্তিকথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান, তর্ক শক্তি, বা বিদ্যা তাঁহার কিছুই ছিল না অথচ তাঁহার কথা শুনিলে বিষয়ীর বিষয় বাসনা নিবৃত্ত হইত, জ্ঞানাভিমানীর জ্ঞানগর্ব্ব দূরীভূত হইত এবং শুষ্ক হৃদয় তার্কিক ভক্তির অমৃতাশ্রুতে অভিষিক্ত হইত। একমাত্র ভক্তি বলেই তিনি লোকের হৃদয় বিগলিত করিতেন। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে হইলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তুকারামের তাহা ছিল না, সেই জন্য পৃথিবীর অল্প লোকেই তাঁহার নাম অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তি নির্ভরশীলতা, জীবানুকম্পা, বৈরাগ্য, বিনয় প্রভৃতি গুণ, পৃথিবীর যে কোন সাধু মহাত্মারই পক্ষে স্পৃহনীয়। যে সকল ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বতী আপনাদিগের সত্তা বৃহৎ তরঙ্গিনীতে বিলুপ্ত

করে, তাহাদিগের নাম পৃথিবীর মানচিত্রে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যকারিণী শক্তি তজ্জন্য হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কৃষকের শস্যক্ষেত্রের শ্যামলতা সম্পাদন করিয়া এবং তৃষ্ণার্ত্তকে অমৃত বারিতে পরিতৃপ্ত করিয়া, তাহা চিরদিনই ধীর গমনে প্রবাহিত হইতে থাকে। তুকারামের অস্তিত্ব ভারতের শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মপ্রচারকদিগের অস্তিত্বে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কার্য্যকারিণী শক্তি তজ্জন্য বিলুপ্ত হয় নাই। পৃথিবীর কত তাপ-ক্লান্ত পথিক কত শুষ্ককণ্ঠ নরনারী এখনও তাঁহার ভক্তিরস পূর্ণ কবিতায় তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। হিন্দুজাতি পুরুষকারে ও বলবীর্য্যে জগতের কোন কোন জাতি অপেক্ষা এক্ষণে নিকৃষ্ট হইলেও সহৃদয়তা, জীবানুকম্পা এবং ভক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণে জগতের কোন জাতি হইতে নিকৃষ্ট নহেন। লুণ্ঠিতবিত্ত ও অধঃপতিত হইলেও এই সকল গুণই এক্ষণে হিন্দুজাতির একমাত্র গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে এবং ইহাতেই হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব। যাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষা এবং দৃষ্টান্তগুণে হিন্দুজাতি পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রকৃতিগত এই সকল গুণ এখনও রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তুকারাম তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতর। হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব রক্ষা করা যদি গৌরবজনক ও প্রার্থনীয় হয়, তবে তুকারাম অবশ্যই হিন্দুসন্তান মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হইবেন এবং ভক্তি কথায় লোকের অনুরাগ বিলুপ্ত না হইলে, তাঁহার নাম ভারত ভূমি হইতে কথনও অন্তর্হিত হইবে না।

সম্পূর্ণ। *

---

* তুকারাম দীর্ঘকাল অবধি দাসীতে প্রকাশিত হইতেছে। তুকারামের কতকগুলি কবিতা অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিবার আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবেও পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় আমরা আপাততঃ সে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলাম। কেহ কেহ তুকারাম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কবিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। তুকারামের জন্মভূমি দেহু, তাঁহার প্রিয় নদী ইন্দ্রায়ণী এবং তাঁহার আরাধ্যদেবের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র পণ্ঢরপুর দর্শন না করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। দাসীর পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা তুকারাম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ও নাম ধাম ইত্যাদি জানাইলে আমি আনন্দিত হইব। আপাততঃ কাহারও মূল্য প্রেরণের প্রয়োজন নাই। সে সম্বন্ধে পত্রাদি পরে লিখিত হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বৈদ্যনাথ দেওঘর।

রামপ্রসাদ বৈদ্য কি কায়স্থ ?

সাধক কবি রামপ্রসাদের জীবনী, জাতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল ভ্রমপূর্ণ মত প্রচারিত আছে, তাহার দূরীকরণার্থে আমি একটী প্রবন্ধ লিখি। বিগত শ্রাবণমাসের নব্যভারতে উহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের গ্রন্থ ও সঙ্গীতসমূহ পাঠ করিলে নিম্নলিখিত কথাগুলি ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতীতি হয়।

(১) রামপ্রসাদ বৈদ্যজাতীয় ও সেন উপাধিধারী।

(২) কুমারহট্টে তাঁহার বাসস্থান।

(৩) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্করভূমি ও কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন।

(৪) কৃষ্ণচন্দ্রের সন্তোষার্থ রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত রাজাকে উপহার দেন।

(৫) বিদ্যাসুন্দর স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

(৬) আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের সহিত সঙ্গীতসমর করিতেন।

(৭) রামদুলাল ভিন্ন রামমোহন নামে রামপ্রসাদের আরও এক পুত্র ছিল।

(৮) কাব্য ও গান রচনার সময় রামপ্রসাদের মাতা জীবিতা ছিলেন ইত্যাদি।

উপরি উক্ত ভ্রমগুলির সংশোধন ভিন্ন কোন ব্যক্তি বা জাতির প্রতি বিদ্বেষপ্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। তবে সত্য কথাও অনেক সময় অপ্রীতিকর হয়। বিশেষতঃ ভ্রমের ভিত্তিতে স্বজাতিগৌরবের মঞ্চস্থাপন করিয়া যাঁহারা চিরকাল সুখে আসীন আছেন, সত্যের ভাষাটা তাঁহাদের কর্ণে স্বভাবতই নীরস বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং যাঁহারা সেই সত্য প্রকাশ করেন, তাঁহারা যে ইহাঁদের নিকট বালক, চপল, বাতুল, অভদ্র প্রভৃতি সম্ভাষণ পাইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি ? এই জন্যই 'দাসী'তে (১৮৯৫ সেপ্টেম্বর অক্টোবর) আমাদের প্রবন্ধের প্রতিবাদচ্ছলে জনৈক লেখক যে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হই নাই।

প্রতিবাদ-লেখক আরম্ভেই বলিয়াছেন—প্রবন্ধলেখক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামগতি ন্যায়রত্নকে গালি দিয়াছেন, বৈদ্যদিগকে কেবল চিকিৎসা-

ব্যবসায়ী বলিয়াছেন, বৈদ্যেরা জমিদার ছিলেন না বলিয়াছেন, বৈদ্যজাতির উপর ইঁহার বিদ্বেষ, ইনি কায়স্থ ভাল বাসেন, ব্রাহ্মণকায়স্থ না লিখিয়া কায়স্থব্রাহ্মণ লিখেন, অতএব ইহাঁর প্রবন্ধ অপাঠ্য, এ বালক, চপল,—ইহাঁর মাথা গরম হইয়াছে, আমি বৈদ্য ইহাঁর চিকিৎসা করিব।

এই সকল কথা হাসিয়া উড়াইবার উপযুক্ত, উত্তর দিবার উপযুক্ত নহে। তিনি যে ভাষায় অভ্যস্ত তাহা সকলের আয়ত্ত নহে। অতএব মৃদুহাস্য করিয়া আমরা তাঁহার তর্কের বিষয়সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিব।

প্রতিবাদ-লেখকের আপত্তি রামপ্রসাদের জাতি লইয়া। তিনি স্বকীয় প্রবন্ধের নাম করিয়াছেন 'রামপ্রসাদ সেন'। তাঁহার বিশ্বাস রামপ্রসাদ বৈদ্য, আমরা জোর করিয়া তাঁহাকে কায়স্থ বলিতেছি। কিন্তু স্বকীয় প্রবন্ধে তিনি এই বিশ্বাসের কোন হেতু দেখাইতে পারেন নাই। প্রবন্ধের নাম করিয়াছেন রামপ্রসাদ সেন কিন্তু রামপ্রসাদের যে সেন উপাধি ছিল এমন কোন প্রমাণ তিনি প্রবন্ধে প্রদর্শন করেন নাই। রামপ্রসাদের সম্বন্ধে তাঁহার কোন চিন্তা অনুসন্ধানের পরিচয় প্রবন্ধে পাওয়া যায় নাই। তিনি গুপ্ত কবিদিগের কথিত প্রবাদগুলি, প্রায় সাধুভাষায় চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়াছেন মাত্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই প্রতিবাদ লেখা তাঁহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা হইয়াছে।

আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে রামপ্রসাদকে কায়স্থ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি।

(১) রামপ্রসাদের উপাধি দাস।

(২) তাঁহার ভগিনীপতির উপাধিও দাস।

(৩) রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষ জমিদার।

(৪) রামপ্রসাদ চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন বা চিকিৎসা ব্যবসায় করেন নাই। জমিদারের আমলা ছিলেন।

(৫) তাঁহার বঙ্গভাষায় গান ও গ্রন্থ লেখা।

(৬) তিনি কি গ্রন্থে কি গানে কোথায়ও সেন বলিয়া পরিচয় দেন নাই।

(৮) আজু গোসাঁইর কথা কল্পিত।

প্রতিবাদকারী আমাদের ১ম ও ২য় কারণ সম্বন্ধে বলেন—

(১) দাস শব্দ বিনয়ব্যঞ্জক।

(২) দাস হইলেই কায়স্থ হইবে এমন কোন কথা নাই। বৈদ্য দাসও আছে।

(৩) ভগিনীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাস সহোদরাভগিনীপতি না হইতে পারেন।

দাস শব্দে যে বিনয় প্রকাশ পায় তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু দাস শব্দ জাতি-প্রকাশকও বটে। রামপ্রসাদ দাস শব্দ কুত্রাপি বিনয় প্রকাশার্থে কোথাও জাতিপ্রকাশার্থে উপাধি স্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। যাহারা সরলভাবে প্রসাদের কাব্য ও গান পাঠ করিয়াছেন তাহাদের ইহাই ধারণা হয়। প্রতিবাদকারী দীনতা-ব্যঞ্জক দাস শব্দ দুই একটী উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু উপাধিব্যঞ্জক দাস শব্দের উল্লেখ করেন নাই। আমরা প্রবন্ধে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাও দেখিতে ইচ্ছা করেন নাই। আমরা এস্থলে পুনরায় উপাধিবোধক দাস শব্দ উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক দেখিবেন নিতান্ত তর্কের ইচ্ছা না থাকিলে তাহার দীন অর্থ ঘটান যায় না।

(১) কবি রামপ্রসাদ দাসে গো ভাবে জননী।

(২) ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস,
সতত কাতর করুণাভাব,
বারয় রবিতনয় শঙ্কা,
মদনমথন-অঙ্গনা।

(৩) শ্রীরামপ্রসাদ দাসে,
এ কথা শুনিয়া হাসে,
অন্য স্বস্ত্যয়নে কিবা কাজ।

(৪) রামপ্রসাদ দাসে,
প্রেমানন্দে ভাসে।

(৫) ভণে রামপ্রসাদ দাস,
মার এই এক ধ্যান।

(৬) কহিছে প্রসাদ দাস,
রসরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।

(৭) ভণে দাস রামপ্রসাদ,
হায় একি পরমাদ।

(৮) রামপ্রসাদ দাস কয়,
রিপু ছয় কর জয়।

(৯) রামপ্রসাদ দাসে কয় শেষে,
ব্রহ্মরসে মিশাইবা।

(১০) কবি রামপ্রসাদ দাসে,
আনন্দ সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।

(১১) কলয়তি রামপ্রসাদ দাস,
ঘোর তিমির পুঞ্জ নাশ,
হৃদয় কমলে সতত বাস,
শ্যামা দীর্ঘকেশী।

কি কালীকীর্ত্তন, কি কৃষ্ণকীর্ত্তন, কি গান সর্ব্বত্রই এইরূপ উপাধি প্রকাশক দাস শব্দ আছে। সেন উপাধি কোথায়ও নাই। আবার এই সকল দাস শব্দ যে পরবর্ত্তী লোকে যোজনা করিয়া লইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই, কেননা দাস শব্দের পরিবর্ত্তনে ছন্দো ভঙ্গ হয়। সুতরাং এই অপরিবর্ত্ত-নীয় বহু ব্যবহৃত দাস শব্দ যে রামপ্রসাদের জাতিবাচক তাহার সন্দেহ নাই।

প্রতিবাদকারী এক স্থলে বলিয়াছেন—রামপ্রসাদ যেমন বৈষ্ণবের মতন বিনয় প্রকাশার্থে দাস শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তেমনি বৈষ্ণবের মত শ্রী শব্দেরও ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতিবাদ-লেখক শ্রী শব্দ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া রামপ্রসাদের গ্রন্থ ও বৈষ্ণব সাহিত্য উভয়ত্র আপনার অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ শ্রী শব্দের প্রয়োগ করিতেন শ্রদ্ধাপ্রকাশের জন্য। দেবতা, গুরু, গুরুস্থান, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রাধিদেবতা, ভগবৎগুণকীর্ত্তন-বিষয়ক গ্রন্থ প্রভৃতির নাম তাঁহারা শ্রীপূর্ব্বক উচ্চারণ করিতেন। আত্মনাম বা পুত্রাদির নামের পূর্ব্বে (১) কখনও শ্রী ব্যবহার করেন নাই। প্রসাদ বৈষ্ণবের মত শ্রী শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। তিনি ছন্দের জন্য শ্রী ব্যব-হার করিয়াছেন। যেখানে শ্রী প্রয়োগ না করিলে ছন্দঃপতন হয়, তথায় নিজের বা পুত্রের নামের পূর্ব্বে শ্রী লিখিয়াছেন। শ্রী প্রয়োগ সম্বন্ধে রামপ্রসাদ ও বৈষ্ণব কবিতে এই প্রভেদ। বৈষ্ণবের মত শ্রী প্রয়োগ না করিলেও যে রাম-প্রসাদ বৈষ্ণবের মত দীনতা প্রকাশ করিয়াছেন একথা মিথ্যা নহে। প্রসাদের শাক্ত ধর্ম্ম বৈষ্ণব মতে অনুপ্রাণিত। তিনি শ্যামের গোচারণ গোষ্ঠলীলার

(১) দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাং
সিদ্ধং সিদ্ধাধিকারাংশ্চ শ্রীপূর্ব্বং সমুদীরয়েৎ॥

অনুকরণে শ্যামার গোচারণ গোষ্ঠলীলা গাইয়াছেন। বৈষ্ণবের নিকট শাক্ত প্রসাদ ভক্তি বিনয়ে বড় বেশী ঋণী। ভাষাতেও কম নহে। কিন্তু তাই বলিয়া দাস শব্দও যে বৈষ্ণবের নিকট ধার করা তাহা বলা যায় না। বৈষ্ণবের দাস শব্দ প্রায়শঃ নামের অন্তর্ভূত ছিল—যেমন কৃষ্ণদাস, গোবিন্দদাস, হরিদাস, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস। এখনও বৈরাগীদিগের নাম প্রায়ই এইরূপ। স্বতন্ত্র দাস বলিয়া বিনয় প্রকাশ বৈষ্ণব কাব্যে নাই বলিলেই হয় সুতরাং প্রসাদের দাস শব্দকে বৈষ্ণবের অনুকরণ বলিয়া জাতিবোধক নহে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রতিবাদক লেখক রামপ্রসাদের গানে কয়েকটী দ্বিজ শব্দ দর্শন করিয়া, প্রসাদ কায়স্থ হইতে পারেন না বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। তবে এ দ্বিজ দর্শনে প্রসাদকে ব্রাহ্মণ বলিতে তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। প্রসাদকে বৈদ্য রাখিতেই হইবে তা যে প্রকারেই কেন হউক না। এজন্য কৈফিয়ত দিতেছেন—"বৈশ্য জাতি (একি মুদ্রাকর প্রমাদ, না প্রতিবাদলেখক বৈদ্য বৈশ্য এক মনে করেন?) চিরকালই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন সুতরাং দ্বিজ লেখাতে রামপ্রসাদের কোন অসঙ্গতি হয় নাই।" কোন অসঙ্গতি হউক কি না হউক রামপ্রসাদ ইচ্ছা করিয়া কেন একটা কৈফিয়তের নীচে আসিতে গেলেন বুঝা যায় না। গুপ্ত লিখিলে বা বৈদ্য লিখিলেই আর এত কৈফিয়ত দিতে হইত না। বৈদ্যগণের চিরন্তন যজ্ঞসূত্রের কথা লোকে না জানুক, গুপ্ত উপনামের কথা অনেক দিন অবধি জানা আছে। বৈদ্যের দ্বিজ পরিচয় এই নূতন শুনা গেল। এদেশে দ্বিজ পরিচয় ব্রাহ্মণেই এত দিন দিয়াছেন। তবে এখন কি হইবে বলিতে পারা যায় না।

আমরা মূল প্রবন্ধে দ্বিজ শব্দ প্রয়োগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। প্রতিবাদ লেখক হৃদ্‌গত বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাহা পাঠ করিলে তাহার জন্য অদ্য আমাদিগকে আর কিছু লিখিতে হইত না।

কি কালীকীর্ত্তন (বিদ্যাসুন্দর সমেত) কি কৃষ্ণকীর্ত্তন কোথায়ও দ্বিজ ভণিতা নাই। এ সকল লোকমুখে বড় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। অন্যের রচনাও ইহার সহিত মিশ্রিত হইবার সুবিধা পায় নাই। সুতরাং ইহাতে যাহা আছে তাহার উপর নিঃসংশয়ে নির্ভর করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সকল গ্রন্থে 'দাস' ব্যতীত জাতিবোধক অন্য কোন শব্দ নাই। দ্বিজ ভণিতা কেবল গানে দেখা যায়। গান লোকমুখে বড়ই পরিবর্ত্তিত

হয়। রামপ্রসাদের গানের সুর সহজ, ভাব সরল, শব্দগুলি সকলেরই পরিচিত। সুতরাং অল্পদিনেই প্রসাদের গান বড় বেশী প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে গায়কের রুচি, শক্তি ও অভিজ্ঞতানুসারে যে পরিবর্ত্তনও বেশী হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়। বিশেষতঃ ওমা, ঐ যে, দেখ, মা, তারা, প্রভৃতির পরিবর্ত্তে দ্বিজ শব্দের প্রয়োগ বড়ই সহজ। উহাতে সঙ্গীতের কোনও হানি হয় না। অধিকাংশস্থলে ঐ সকল শব্দের পরিবর্ত্তে যে দ্বিজ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। প্রসাদপদাবলির ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণেও এ কথার যাথার্থ্য দৃষ্ট হয়। একজনের প্রকাশিত গ্রন্থের যে গানে দ্বিজ শব্দ আছে, অন্যের প্রকাশিত গ্রন্থের সেই গানে হয়ত তারা, বা ওমা এইরূপ একটা শব্দ রহিয়াছে। তবে কথা এই যে, অন্য শব্দ প্রয়োগ না করিয়া গায়কেরা দ্বিজ শব্দের প্রয়োগ করিল কেন? সঙ্গীতরচয়িতা আপনাকে দ্বিজ বলিয়া পরিচিত না করিলে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। এমন হইতে পারে যে, গীতরচক আপনাকে দুই এক স্থলে দ্বিজ বলিয়াছেন, গায়কেরা সেই দ্বিজ শব্দ বহুল স্থলে প্রয়োগ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আদিতে একবারে ছিল না এমন হইতে পারে না। দ্বিজ শব্দে বঙ্গদেশে একমাত্র ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। সুতরাং সহসা গীতরচয়িতা রামপ্রসাদকে ব্রাহ্মণবলিয়া মনে হইতে পারে। তাহা হইলে কাব্যরচয়িতা রামপ্রসাদ আর গীতরচয়িতা রামপ্রসাদ দুই পৃথক্ ব্যক্তি হইয়া পড়েন। কিন্তু কাব্য ও গানের ভাষার সাদৃশ্য, উভয়ে কবিরঞ্জন উপাধির প্রয়োগ, বিশেষতঃ গানেরও বহুস্থানে দাস উপাধি দর্শন করিলে আর সে সন্দেহ থাকে না। তখন এক রামপ্রসাদ দাসই যে কাব্য ও গান রচনা করিয়াছেন তাহা স্বতই মনে উদিত হয়। দ্বিজ শব্দ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, দুই একটী গানে স্বয়ং রামপ্রসাদ দাস আপনাকে দ্বিজ বলিয়া থাকিবেন। যখন সাধনাতে তিনি একবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন, তখন দ্বিজ বলা অসম্ভব বা অশাস্ত্রীয় নহে (প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্ববর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ)। এখনও অনেক নীচ জাতীয় লোকদিগকে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ হইয়া উপবীত ধারণ করিতে দেখা যায়। গান ভিন্ন অন্যত্র দ্বিজ শব্দ নাই। গানের মধ্যেও উহার সংখ্যা বেশী নহে। আমরা ২৩১টী গানের মধ্যে ৫।৬টীতে দ্বিজ শব্দ পাইয়াছি। সুতরাং দ্বিজ শব্দ কায়স্থত্বের প্রতিকূল বলিয়া এস্থলে মনে করি না। এবং এই দুই এক স্থলে দ্বিজ শব্দের ব্যবহারে দাস উপাধির হানি হইতেছে না।

অতঃপর প্রতিবাদ-লেখক বলিতেছেন "রামপ্রসাদ দাস হইলেই যে কায়স্থ হইবেন এ কথার কোন প্রমাণ নাই। বৈদ্যের মধ্যেও দাস আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার সহোদরাভগ্নীপতি নাও হইতে পারেন।" আমরা বলি দাস হইলেই তিনি কায়স্থ হইবেন। কেননা বৈদ্যদাসগণ সকলেই এক গোত্র, বৈদ্য দাসের ভগিনীপতি দাস হইতে পারে না। রামপ্রসাদের ভগিনীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। লক্ষ্মীনারায়ণ যে রামপ্রসাদের সহোদরা ভগিনীর পতি তাহা কবি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী,
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি।
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস,
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস।
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম,
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম।
সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা,
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা।
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা,
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা।
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া,
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া।
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি,
শ্রীরাম দুলালে মাগো দেহ পদধূলি।

কালীকীর্ত্তনের অষ্টম মঙ্গল বিদ্যাসুন্দরের সমাপ্তি সময় কবি উল্লিখিত কবিতাগুলি দ্বারা আত্মীয়গণের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন। যাহার সহিত যে সম্পর্ক, তাহাও ইহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন। নিধিরামকে যেমন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, ভবানী যদি সহোদরা ভগিনী না হইতেন, তাহা হইলে কেবল জ্যেষ্ঠা না বলিয়া বিশেষ পরিচয় অবশ্যই বলিতেন। কেবল জ্যেষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠা বলিলে বঙ্গভাষায় সহোদর সহোদরাকেই বুঝায়। ভবানীকে জ্যেষ্ঠা এবং অম্বিকাকে সর্ব্বাগ্রজা বলাতে উভয়েই যে তাঁহার সহোদরা তাহা নিঃসংশয়ে বুঝাইতেছে। কাজেই প্রতিবাদ-লেখকের "সহোদরা ভগ্না নাও হইতে পারেন" এই কথার কোন মূল্য নাই। তিনি কেবল

প্রতিবাদের জন্ত লেখনীচালনা করিয়াছেন, সত্যানুসন্ধানের জন্ত নহে। সুতরাং গ্রন্থপাঠ বা চিন্তা তাঁহার আবশ্যক হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা রামপ্রসাদের সম্বন্ধে চিন্তা অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভবানীকে রামপ্রসাদের সহোদরা বলিয়াই বুঝিয়াছেন। এই ভবানীর স্বামীই লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। বৈদ্য দাসের ভগিনীপতি দাস হইতে পারে না,এই জন্ত আমরা রামপ্রসাদ দাসকে বৈদ্য মনে না করিয়া কায়স্থ মনে করি।

রামপ্রসাদ দাসের কায়স্থত্বের অনুকূলে আরও দুএকটী কথা আছে। তাঁহার গানে জানা যায়, তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ ধনী ও জমিদার ছিলেন। সে কালে বঙ্গদেশে কায়স্থগণই প্রায় জমিদার ছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের অনুগ্রহে একালে যাহাই হউক, সে কালে বৈদ্যগণ জমিদার ছিলেন না। তখন নাকি চিকিৎসকের গৃহে লক্ষ্মী থাকিতেন না—এইরূপ শাস্ত্রাদিতে শুনা যায়। তাহাতে বোধ হয় সে কালে চিকিৎসকেরা অধিক সঞ্চয় করিয়া ধনী বলিয়াও পরিচিত হইতে পারিতেন না। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়ে রামপ্রসাদকে কায়স্থ বলিয়াই মনে হয়।

আর একটী কথা—রামপ্রসাদের ব্যবসায়। রামপ্রসাদ বৈদ্য হইলে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া স্বজাতিসুলভ কবিরাজী করিতেই প্রবৃত্ত হইতেন, কায়স্থসুলভ আমলাগিরিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। তৎকালে স্বজাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া কেহ অন্যের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইত না।

প্রতিবাদলেখক বলিয়াছেন,—তাঁহার বংশধরগণ এখনও জীবিত আছেন, সুতরাং তাঁহাকে বৈদ্যদাস কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ দাসের সম্বন্ধে যত কল্পিত কথা আছে, তন্মধ্যে জীবিত বংশধর বর্ণনাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। দাস রামপ্রসাদের অধস্তন পুরুষগণ সেন উপাধিধারী—ইহা অপেক্ষা আর বিচিত্র কি? প্রতিবাদ লেখক স্বয়ং এবং তিনি যাঁহাদের পদানুসরণ করিয়াছেন তাঁহারা রামপ্রসাদের বংশধর বলিয়া যাঁহাদিগকে টানিয়া আনিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই সেন রামপ্রসাদের বংশধর। কিন্তু দাস রামপ্রসাদ, সেন রামপ্রসাদ নহেন। তবে কালে, দাস রামপ্রসাদের বংশধর বাহির হওয়াও বিচিত্র নহে। পণ্ডিতবর ৺রামগতি ন্যায়রত্ন বর্দ্ধমান যাইয়া বিদ্যাপোতা, মালিনীপোতা, সুড়ঙ্গ, সকলই পাইয়াছিলেন। রামপ্রসাদের ভিটা ও বংশধর আবিষ্কৃত হওয়াও অসম্ভব নহে।

রামপ্রসাদের বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে প্রতিবাদ-লেখকের আর একটী প্রমাণ আজু গোসাঁই। আজু গোসাঁই সম্বন্ধে আমরা নব্যভারতে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট মনে করি। প্রতিবাদ-লেখক তাহার একটী কথাও খণ্ডন করিতে পারেন নাই, আজু গোসাঁই সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসজনক প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই, ব্যঙ্গ করিয়া কথাটা উড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে, ঠাকুরমার উপকথা শুনিয়া কালীদাসের জীবনী লেখাই তাঁহার কার্য্য, ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে আসা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র।

প্রতিবাদ-লেখকের শেষ কথা রামপ্রসাদ স্বয়ংই আপনাকে ভিষক্ বলিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ একটী গানের চরণ তুলিয়াছেন। প্রায় ২৫০ গান একখানি বিস্তৃত কাব্য ইহার মধ্যে কেবল একটী গানের একটী চরণে বৈদ্যবাচক একটী শব্দ দেখিয়া শতসংখ্যক দাস শব্দ ও বিবিধ বিরোধী প্রমাণসত্ত্বে বৈদ্য বলিয়া নিশ্চয় করা কখনই সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ দাস শব্দ যেমন অপরিবর্ত্তনীয় ভিষক্ শব্দটী তেমন নহে। উহার পরিবর্ত্তে সাধক, শ্রীরাম বা অন্য কোন শব্দ যে ছিল না তাহা বলিবার উপায় নাই। আবার গানটী যে ভাবের তাহাতে ভিষক্ শব্দটী জাতিবাচক না হইলেও হইতে পারে। পঞ্চভূত রূপ ভূতের ওঝা অর্থেও প্রযুক্ত হইলেও হইতে পারে।

উপসংহারে প্রতিবাদ-লেখককে বলি রামপ্রসাদ বৈদ্য বা কায়স্থ যাহা হউন না কেন তাহাতে ঐ জাতি দ্বয়ের যে বিশেষ কিছু আসে যায় এমন বোধ হয় না। আমরা প্রমাণ প্রয়োগ যাহা পাইয়াছি তাহাতে কায়স্থ বলিয়া বুঝিয়াছি বলিয়াই কায়স্থ বলিয়াছি। বৈদ্য বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারিলে আমরা আহ্লাদে তাহাই প্রকাশ করিতাম। অতঃপর যদি কেহ বৈদ্য বলিয়া প্রমাণ দেখাইতে পারেন, আমরা আহ্লাদ সহকারে তাহা স্বীকার করিব। কিন্তু বিনা প্রমাণে উপকথার উপর নির্ভর করিয়া কিছু বলিলে কেহই স্বীকার করিবে না। 'গুপ্ত কবি ও পণ্ডিত ন্যায়রত্ন কল্পনা ও প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াছেন, বলিয়া আমরা নাকি উক্ত মহাশয় দ্বয়ের অসম্মান করিয়াছি। সত্য কথায় ত্রুটি দেখাইলে যদি অসম্মান হয়, তাহা হইলে আমরা নিরুপায়। যাহা হউক আমরা প্রতিবাদ-লেখককে জিজ্ঞাসা করি—

(১) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে ১০০ বিঘা নিষ্করভূমি ও কবিরঞ্জন উপাধি দেন।

(২) রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীত্যর্থে বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ণ করেন।

(৩) কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও আজু গোসাঁইর কবিতাসমর বাধাইয়া তামাসা দেখিতেন।

(৪) কাব্য ও গান রচনার সময় রামপ্রসাদের মাতা জীবিতা ছিলেন।

(৫) রামপ্রসাদ সেন উপাধিধারী।

এ সকল কি কল্পনা বা কিংবদন্তী নহে? হায় বদান্য রাজকিশোর! তুমি কোথায়? তোমার আদেশে রচিত গ্রন্থ, কাহার নাম ঘোষণা করিতেছে! আর সাধক কবি! তুমিও জানিতে না যে, কালে বঙ্গের ঐতিহাসিক বিজ্ঞগণ তোমাকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিষ্কর গ্রহণ করাইয়া সেনোপাধি প্রদান করিবেন। তুমি গৃহত্যাগী হইয়া ভিক্ষা করিয়া গিয়াছ; কিন্তু ইহাঁরা তোমার ১০০ বিঘা নিষ্করে আজিও চাষ আবাদ করিতেছেন! তুমি লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয়ে থাকিলেও ইহাঁরা কুমারহট্টে তোমার গৃহ সংস্থাপিত রাখিতেছেন!

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

অবসর।*

গীতিকবিতাই বাঙ্গালীর সম্পত্তি। কবিকঙ্কণ কাব্য লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, চণ্ডী একখানা সুন্দর কাব্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু কাব্যখানা গীতিকবিতার ঘ্রাণময়, তাহার শাখাপ্রশাখা গীতিকবিতার ফুল-পল্লবে জড়িত হওয়াতে কাব্যভাগ আবৃত হইয়া গিয়াছে। পদ্মপুরাণও একটি গানের মত; রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গীয় অনুবাদে আমরা কাব্য-ভাগ বেশী পাই না, গীতিভাগটি সুন্দর হইয়াছে। এদেশের মৃত্তিকা ও জল-বায়ু কঠিন দ্রব্য কোমল করিয়া ফেলে,—শালতরুর বীজ বপণ করিয়া মাধবী-লতা না পাইলেই সৌভাগ্য বিবেচনা করিতে হইবে। মেঘনাদবধকাব্যে কতকটা উদ্দাম ও অভিনব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—তাহা এদেশের

---

*শ্রীবরদাচরণ মিত্র প্রণীত। মুখার্জ্জি এণ্ড কোং দ্বারা ৬০নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পক্ষে অপূর্ব্ব। কিন্তু কৃত্রিম কুসুমে যেরূপ গন্ধ পাওয়া যায় না, সাহিত্যিক ভাব, জাতীয়ভাব হইতে স্বতন্ত্র হইলেও সেইরূপ কাব্যের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে আশা করা যায় না। স্বভাবের প্রতিকৃতি না তুলিতে পারিলেও লেখনী স্বীয় স্বাধীন খেলা দ্বারা সাময়িক ভাবে মনোরঞ্জন করিতে পারে, কিন্তু কবির কণ্ঠে অমর যশোমাল্য অর্পণ করিতে পারে না।

আমাদের দেশে যখন মহিমান্বিত চরিত্রের আদর্শ ছিল, তখন রামায়ণ ও মহাভারতে জাতীয় চরিত্র সুবিম্বিত হইয়াছিল ;—এই দুই কাব্য স্বভাবের অবিকল প্রতিকৃতি—তাহাদের নির্ম্মল দর্পনে সমাজের ভূত যুগের পরিষ্কার চিত্র প্রতিভাত রহিয়াছে। সেই সব বিশাল চরিত্র এখন সাহিত্যের এক প্রান্তে চিত্রসার হইয়া রহিয়াছে—প্রচীন সমাজের বিরাট ভগ্নস্তূপ পরিবেষ্টন করিয়া কোমল গীতি-কবিতার লতিকাবলী দেখা যাইতেছে,—অসির ঝনৎকার স্থলে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে—কুরুক্ষেত্রের রক্তরঞ্জিত ক্ষেত্রের নিকট বৃন্দাবনের প্রেম-ক্ষেত্র বিস্তারিত হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত আমাদের স্বভাব পুনরায় বীরত্বে গঠিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে মল্লযুদ্ধের অভিনয় করিয়া দর্শকের উপহাস ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদ্রেক করিতে পারিব না।

উদ্যমশীল জাতির গীতি-কবিতার মৃদুতায় একরূপ দৃঢ়তা থাকে; বাইরণের গীতি-কবিতাগুলির একরূপ তেজ আছে যাহা আমাদের বাঙ্গালা কাব্য গুলিতে নাই। পাহাড়ে একরূপ ফুল দেখিয়াছি যাহার দলগুলি নিম্নভুমির বৃক্ষত্বকের ন্যায় কঠিন। উদ্যমপূর্ণ জাতির গীতিকবিতাও একরূপ পাহাড়ে ফুল। তাঁহাদের প্রেমের কথায়ও তেজ, আত্মাভিমান এবং কথঞ্চিৎ কঠোরতা আছে; তাঁহারা সরবৎ হইতে তপ্তমদিরার পক্ষপাতি—তাঁহাদের তরলতার মধ্যেও কিছু তীব্রত্ব আছে।

কিন্তু বাঙ্গালী কোমল ভাবের রাজা; বাঙ্গালীর প্রেমের নানা বিচিত্র লীলা ও ভঙ্গীতে কোমলতাই নানা ভাবে খেলা করিয়া থাকে; সেই প্রেমের মান, দর্প, রাগ—বাহ্যিক কঠোরতা কোমলতার ছদ্মবেশ মাত্র। এই গীতি-কবিতা আমাদের দেশের অভিনব সৌন্দর্য্য ও সুরভিমাখা সামগ্রী; ইহা অন্যান্য দেশের কবিতা হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যায়।

প্রায় ৫০০ বৎসর হইতে বাঙ্গালী শৌর্য্য বির্য্য-হীন ও এই সময় হইতে দেশীয় কবিগণ অকাতরে এই পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন; আমরা রবীন্দ্র

বাবু, গিরীন্দ্র মোহিনী, মানকুমারী, কামিনী সেন প্রভৃতি কবিগণ হইতে অজস্র কুসুমোপহার পাইয়াছি ; অবসরের কবি ইহাঁদের দলের একজন, তাঁহার গীতি-কবিতার স্বাভাবিকত্বে ও সরসতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

মিত্র মহাশয় মেঘদূতের বঙ্গীয় অনুবাদে আমাদিগকে তাঁহার সুন্দর কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন ; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশের শিরোভূষনগণ মেঘদূতের অনুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নব্যভারতে আমরা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। কবির হৃদয়টি সৌন্দর্য্যের উপাসনায় গাঢ়রূপে মগ্ন,—তিনি সৌন্দর্য্যের চিত্র দেখিয়া যে আবেগময় প্রাণটি লইয়া পূজা করিতে দাঁড়ান, তাঁহার লেখনী আমাদিগকে তাহার অবিকল ছায়াটি আঁকিয়া দেখায়। তাঁহার এই নূতন কবিত্ব-মালিকায় আমরা অগ্নির ন্যায় তীব্রজ্বালা বিশিষ্ট ও কুন্দ-কুসুমের ন্যায় স্নিগ্ধ কথার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। ছন্দগুলিকে তিনি ভাবের অনুবর্ত্তী করিয়াছেন,—স্বরের স্বাভাবিক হ্রস্ব দীর্ঘতাক্রমে তিনি কবিতার ছন্দোরক্ষা করিয়া কবিতাগুলির আবৃত্তি অতি সুললিত করিয়াছেন ; তাঁহার "মূক বালিকা" শীর্ষক কবিতাটি বড় সুন্দর হইয়াছে, কবি মূক বালিকাকে একটি চিত্র-পটের সঙ্গে নিপুণ ভাবে তুলনা করিয়া, নীরব নিস্পন্দ ছবি খানির ন্যায় একটি মনোজ্ঞ মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। সদ্যোজাত শিশুকে 'নূতন গড়া খোপার ফুলের সঙ্গে উপমা দিয়া জননীর সঙ্গে তাহার স্বর্গীয় খেলার যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা নিপুণ চিত্রকরের তুলি-যোগ্য হইয়াছে।

তাঁহার 'দগ্ধ হৃদয়' কবিতাটিতে একটু ইংরাজী ভাবের তেজ আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু উহা পড়িয়া প্রেমিকের ধমনী চঞ্চল হইবে—

"উহু, একি গো দহন, জ্বলে প্রাণ মন,
হৃদয়ে কি গুরু যাতনা।
একি, গরল ভখিনু, অমিয়া পিয়াসে,
আগুনে মাখিনু বাসনা!
ওই হৃদয়ের স্তরে, বহ্নি বিহরে,
জুড়াবে সকল ধমনী,
যেন বৃশ্চিক দংশন, হয় প্রতিক্ষণ,
প্রাণে বিষ জ্বালা এমনি!

ওগো মানুষের প্রাণে, সহিবে কত বা,
কত বল তাহে আছে রে,
যদি পলাইতে চায়, তার স্মৃতি হায়,
হাসি ফিরে পাছে পাছে রে!
লোকে বলে ভালবাসা, পরাণের আশা,
কত গুরু ব্যথা জানে না,
সে যে হৃদি পদ্মবনে, মদ মত্তকরী,
সরমের বাধা মানে না,
যদি মরিবারে চাই, তার মুখ স্মরি
মরণত নাহি আসে গো,
সে যে হেসে তারি প্রায়, উপেক্ষিয়া যায়,
ভাল মোরে নাহি বাসে গো।
কেন চাঁপার আঙুলে, পরশিলি করে
কহিলি বীণার ভাষা,
যদি জেনে ছিলি মনে, কঠিন পরাণে
নাহি দিবি ভালবাসা॥" ইত্যাদি

পুস্তকের শেষে কয়েকটি ইংরাজি কবিতা সন্নিবিষ্ঠ হইয়াছে—সেই সব কবিতার উদ্যমশীলতা, স্বপ্নাবেশ, ও দর্শনাত্মক শান্তি যথাক্রমে স্কট, শেলি ও টেনিসনের কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয়; আমরা কবিতা কয়েকটি আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি; কিন্তু তরুদত্ত ও মাইকেলের ইংরাজী কবিতাও কত সুন্দর হইয়াছিল; মিল্টন ল্যাটিন কবিতা লিখিয়া যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এক শতাব্দী পূর্ব্বে কয়েক জন হিন্দু উৎকৃষ্ট পার্শী কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরদুর্গ জয় করা অতি বড় বিক্রম—উহা পৃথিবীতে কেহ পারে নাই।

আমরা নূতন কবির দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি, প্রতি বৎসর শরদান্তে এইরূপ শরৎ সেফালিকার উপঢৌকন দিয়া তিনি আমাদিগকে সুখী করুন—এই বাসনা। তাঁহার Witan Gemot কবিতার যে রাজনৈতিক গূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের নিকট সে আশা সুদূর পরাহত। এই রাজনৈতিক দুর্দ্দিনে কবি আমাদিগের প্রভুদিগের মুখ হইতে যাহা শুনিতে চাহেন,—তাহা কি আমরা শুনিব?

"Our children dark, our children white,
Shall of our smile have equal light,
Ye holy gods, before your sight,
This sacred oath take we"

* * * *

O shame, that still our brothers weep,
Upon our honor's death-like sleep,
Our promise to the ear we keep,
And break it to the hope."

জানি না ফুলের আঘাতে লৌহের দ্বার মুক্ত হয় কিনা; উপাখ্যানে শুনিয়াছি পরীর-ফুৎকার-শোধিত ফুলের প্রক্ষেপে লৌহ দ্বার খুলিয়াছে, কবির মন্ত্রঃপূত ফুৎকারে কি অভিমান-দর্পিত জাতি কর্ণপাত করিবেন ?

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্য বিবরণ।

গিরিডি।

২২এ অক্টোবর হইতে ২১এ নবেম্বর পর্য্যন্ত।

১ দামো, ২ বাবুরাম, ৩ রসিকচাঁদ, ৪ গগনচন্দ্র সরকার, ৫ ছৈয়লুন্না, ৬ গোপাল মণ্ডল, ৭ দেবিয়া, ৮ দুর্গাতারিণী, ৯ স্বর্ণ, ১০ নবদুর্গা ও ১১ ফুলমণি।

দামো—এতদিনের পর দামো আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে বসিয়াছে। ইদানিং দামো একেবারেই অথর্ব্ব ও শয্যাশায়ী হইয়াছিল এবং ক্রমাগত নানা প্রকার পীড়ায় যাতনা পাইয়া আসিতেছিল। শীত পড়িতে না পড়িতেই তাহার অবস্থা খুব মন্দ হইয়া উঠিয়াছে। উদরাময় ও কাশীতে একেবারে শেষ দশাপন্ন হইয়া আহারাদী প্রায় ত্যাগ করিয়াছে। এখন সে সময় সময় ভগবানের নাম লইয়া বলে "আর কেন কষ্ট দাও, শীঘ্র পার কর।" আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ যে আমরা সকলেই পীড়িত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি, আর আমরা তেমন করিয়া সেবা করিতে পারিতেছি না। লোকজনের দ্বারা কাজকর্ম্ম চালান এক প্রকার অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে, এখন ভগবান জানেন, পরিণাম কি ?

গগনচন্দ্র সরকার—হাঁসপাতালে পাঠাইবার জন্য কলিকাতায় পাঠান হইয়াছে।

রসিকচাঁদ—ইহার একমাত্র ভ্রাতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। রসিক চাঁদের ইচ্ছা

তাহার খুড়তুত ভাইদের কাছে থাকে, কিন্তু তাহাকে আশ্রয় দিতে পারে এমন ত কাহাকেও জানি না। যদি কেহ থাকেন, আসিলেই আমরা রসিককে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

আয় ব্যয়।

২২শে অক্টোবর হইতে ২১শে নবেম্বর পর্য্যন্ত)

জমা।

পুর্ব্বমাসের জের ।/০ মনিঅর্ডার ৯৬৲, মাঃ ইন্দুভূষণ রায় ১৯৲, ২৯এ সেপ্টেম্বর ও ১১ই অক্টোবর রোগী আনিবার জন্য মাঃ বাবু গোপালচন্দ্র নন্দী ১২৲, দান ১১৲, মোট জমা ১৩৮।/০

খরচ।

সংসার খরচ ৪২৸১৫ কর্ম্মচারীর বেতন ৫৩।/৭৷৷, রোগী আনিবার এবং পাঠাইবার খরচ এবং জিনিষ ক্রয় ১৪।১৫, ধোপা ১৲, বাড়ীভাড়া ১৮৲ দাহ খরচ ১।০, মোট খরচ ১৩০।১৭৷৷।

মোট জমা খরচ।

জমা ১৩৮।/০। খরচ ১৩০।১৭৷৷। হস্তেস্থিত ৮৲২৷৷।

কলিকাতা।

(২৫ শে অক্টোবর হইতে ২৪ শে নবেম্বর পর্য্যন্ত)

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত দানগুলি বিগত মাসে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান দাতাগণের কল্যাণ করুন।

মাসিক চাঁদা।

৪।২ ছকুখানসামা লেনের ছাত্রগণ অক্টোবর ।০, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ছাত্রনিবাস ঐ ৷৷০, বাবু প্রসন্নকুমার বসু জানুয়ারী হইতে এপ্রিল ১৲, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল অক্টোবর ১৲ বাবু হারাণচন্দ্র চট্টো ঐ ১৲ A Lady co S. N. Das ঐ ১৲, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ঐ ১৲ বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ঐ ।০, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৷৷০, বাবু নন্দকুমার দত্ত অক্টোবর ১৲,বাবু বঙ্কুবিহারী মিত্র নবেম্বর ।০, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২৲, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক ৪৲ বাবু বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী নবেম্বর ।০, বাবু শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ।০, বাবু কেদারনাথ দাস অক্টোবর ।০, বাবু প্রসন্নকুমার বসু মে হইতে আগষ্ট ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র অক্টোবর ১৲, বাবু প্যারীমোহন ভড় ঐ ।০, N. K. Bose Esq. ১৲, রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর অক্টোবর ও নবেম্বর ২৲, N. C. Baral অক্টোবর ১৲, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল আগষ্ট ১৲।

এককালীন দান।

একজন প্রচারক ।০, বাবু উমাপদ রায় ।০, রায় বিপিনবিহারী মিত্র বাহাদুর১০, বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র ।৵০, বাবু পঞ্চানন দত্ত ১৲, বাবু গৌরীশঙ্কর দে ১৲, বাবু শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী ৷৷০,

বাবু শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১, বাবু হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ১, বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ১, বাবু যোগেশপ্রসন্ন ভাদুড়ী ১, S. C. Mukerji Esq. ১, Mrs. K.N.Ray ১, কোন সমিতি সাঃ বাবু প্রিয়নাথ দাস ৷৹, বাবু কালীদাস মজুমদার ৷৹, বাবু মনোমোহন মজুমদার ও বাবু রেবতীমোহন ঘোষ /১০, S. C. Mukerji, Esq. ।৹, বাবু ক্ষেত্রমোহন দে ১, বাবু সূর্য্যকুমার রায় চৌধুরী ১, বাবু মদনমোহন বসু ১, বাবু জয়গোপাল সিংহ ৶৹, বাবু শ্যামাচরণ মিত্র ১, বাবু সুরেশচন্দ্র মিত্র ২, Dr. K. D. Mukerji. ১, D. N. Ray Esq. ৶৹, A. Debtor. ৶১০, কুমার দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ২, বাবু হরিদাস শ্রীমানী /৹, ৺ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোর স্ত্রী, স্বামীর বার্ষিক শ্রাদ্ধে ২, বাবু কেদারনাথ কুলভি ১, বাবু জ্ঞানদাপ্রসাদ দত্ত ৶৹, J. Ghoshal, Esq. ১, বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ৷৹ বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ॥৹, ডাঃ কেশবচন্দ্র দাস ২, A friend of Dsaasram. ১, ৬৫ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট ৶১০ বাবু রাজেন্দ্রনাথ শেঠ ১, বাবু কালিকা প্রসাদ মুখো ১, বাবু তারাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত ১, বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ৪, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী ১, বাবু ধরণীধর রায় ২।

অন্যপ্রকারে আয়।

হাওলাত ৭, বিগত মাসের জের ৩১৷৶১০ মোট ৩৮৷৶১০।

মোট আয়।

মাসিকচাঁদা ২০, এককালীন দান ৪৮৷/১০ অন্যান্য প্রকারে আয় ৩৮৷৶১০। মোট আয় ১০৯৸/৹

ব্যয়।

রোগীর গাড়ী ।৵৹, গিরিডি সেবালয় ৯০৸৵৹, কর্জ্জ টাকার সুদ ১, কমিশন ১৩৷৵৫, মৃগাঙ্ক বাবুর ট্রামভাড়া ও ডাক ব্যয় ।/১৫, ডাক ব্যয় ১৵৹, মোট ব্যয় ১০৭৵৹।

মোট আয় ব্যয়।

আয় ১০৯৸/৹, ব্যয় ১০৭৵৹, হস্তেস্থিত ২৷৶৹।

বস্ত্রাদি।

বাবু আনন্দচন্দ্র রায় বিছানার চাদর ২ জোড়া। ডাক্তার চুনীলাল বসু মোজা ২ জোড়া, প্যাণ্টুলেন ৪ জোড়া, সার্ট ৪। বাবু রামদুর্ল্লভ মজুমদারের স্ত্রীতসরের কোট ১, আলপাকার কোট ১, চাপকান ২, প্যাণ্টুলেন ১।৹। বাবু আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারির স্বর্গীয় কন্যা শান্তশীলা ঘোষের প্রদত্ত গরম জ্যাকেট, ২ গরম কাপড় ১, সাদা জ্যাকেট ৩ ধুতি ১, মসারি ১, দস্তানা ১ জোড়া, ফ্লানেল টুকরা ১, বার্লি টিন ২, সাগু টিন ১, পিস্‌কারী ১, এরারুট টিন ১, শিশি বোতল ১৮টা। বাবু অত্রিকুমার রায় স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন ঘোষের আত্মার কল্যানার্থ-Brand's Essence of chicken ৩ কৌটা, Olive Oil ২ বোতল, Lint Gota parcha ও Cotton প্রভৃতি। বাবু ব্রজের চাঁদ গোস্বামী-নুতন কোরা ধুতি—১, ধোলাই ধুতি ১। বাবু প্রসন্নকুমার মল্লিক পুরাতন সাদাধুতি ১।

ভ্রমসংশোধন।

অক্টোবর মাসের দাসীতে বাবু সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সংগৃহীত যে ২৲ দুই টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার হিসাবঃ—

দাসাশ্রম সাহায্য ভাণ্ডার ১২০/২ মশজিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট ৸৶০, দাসাশ্রম সাহায্য-ভাণ্ডার ৬৩।১ মেছুয়াবাজার ৶১৫ ও ১টী শার্ট। দাসাশ্রম সাহায্য-ভাণ্ডার ৬৩ হ্যারিসন রোড ।৶১৫, দাসাশ্রম সাহায্য-ভাণ্ডার ১০০/২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ।/১০ মোট ২

দাসাশ্রম।

উদ্দেশ্য।—নানাপ্রকারে বিপদ্‌গ্রস্ত মানবগণের সাধ্যানুসারে হিত-সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ ইহা অনাথ আতুরদিগকে আশ্রম দিয়া, তাহাদিগকে ভরণপোষণ ও সেবার বিধান করিয়া থাকে।

সাধারণ বিভাগ।—সেবালয়—ইহা গিরিডিতে অবস্থিত।

"দাসী" বিভাগ।—জন-হিতৈষণা প্রবর্ত্তনা ও দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ প্রচার ও দাসাশ্রমের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগ হইতে "দাসী" নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক-মাশুল সমেত ২৲ টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়।

ডিস্পেন্সারি বিভাগ।—দাসাশ্রমকে ঔষধ সাহায্য করিবার জন্য ও ইহার স্থায়ী এবং পাকা আয়ের সংস্থান করিবার জন্য ইহার এলোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারি আছে। ঠিকানা—৮৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কার্য্যপ্রণালী।—ইহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া সম্প্রতি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। ভগবানের কৃপার উপর বিশিষ্টরূপে নির্ভরশীল এবং সকলে একমত ও একপ্রাণ হইয়া যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা ও কার্য্যে সেইরূপ চেষ্টা করা হয়।

দাসী

"খাঁ জাহান আলী।"

বাগেরহাটের আপিস, কাছারি, বন্দর ও লোকের বাসস্থান ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে ৫।৭ মিনিটের পথ অগ্রসর হইলেই একটী পাকা রাস্তা পাওয়া যায়। এই পথ ধরিয়া চলিলেই খাঁজে আলীর প্রধান প্রধান কীর্ত্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায়। বাগেরহাট হইতেই খাঁজে আলীর কীর্ত্তির আরম্ভ। মহকুমার পশ্চিম দিকে ৩।৪ মিনিটের পথ অন্তরই পাকা ঘাট সংলগ্ন এক একটী পুরাতন পুকুর দেখা যাইবে। অনেক স্থলে ঘাটগুলি খসিয়া পড়িয়াছে, পুকুরগুলিও শুকাইয়া পতিত জমিতে পরিণত হইয়াছে। পাকা ঘাটগুলির ভগ্নাবশেষ অধিকাংশ স্থলেই রহিয়াছে, পুকুরগুলি কোথাও শুষ্ক, কোথাওবা বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। দুই একটী পুকুরের নিকট ইষ্টকালয়ের চিহ্ন অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। পাকা পথটী কিন্তু অদ্যাপিও সুদৃঢ়াবস্থায় আছে। পথের গাঁথনি দেখিলেই মনে হয়, ইহার নির্ম্মাণে বিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। কতকাল পূর্ব্বে যে এ পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এখনও পথটী বিলক্ষণ শক্ত আছে। বন জঙ্গলে পথের অনেক অংশ আবৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং কোন কোন স্থান হইতে লোকেরা ইষ্টক খুঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাতেই পথ দিয়া অবাধে ও একটানে গমনাগমন করা যায় না। কিন্তু সামান্য সংস্কার হইলেই পথটী সুগম হইতে পারে। শুনিলাম এই পথ নাকি চট্টগ্রাম্ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য তাহা জানি না। যাহা হউক খাঁজে আলীর যে সকল কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান আছে, তৎসম্বন্ধেই কিছু বলিতেছি। প্রায় ২ মাইল পথ গাড়ীতে আসিয়া আমাদিগকে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হইল। যেখানে গাড়া রহিল, সে স্থান ঘোর অরণ্যময়। সঙ্গীয় লোকেরা বলিল যে, নিকটবর্ত্তী বন হইতে সেখানে সময় সময় বড় বাঘ আসিয়া থাকে, নেক্ড়ে বাঘ নাকি

সেই বনেই আছে। আমরা ৫।৭ জন|লোক দিনের বেলায় যাইতেছিলাম, সুতরাং আমাদের পক্ষে নেকড়ে বাঘকে ভয় করিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। চতুর্দ্দিকে নিবিড় বন, বনের মধ্য দিয়া এক অপ্রশস্ত পাকা পথ চলিয়াছে। আমরা এই পথ ধরিয়া প্রায় এক মাইল চলিয়া গিয়া একটী ভগ্নপ্রায় প্রকাণ্ড উচ্চ খিলান করা ফটক পাইলাম। এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গিয়া চারিটী গুম্বজযুক্ত মস্‌জিদাকৃতি একটী বৃহৎ ইষ্টকালয় দেখিতে পাইলাম।

একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটি সুপ্রশস্ত প্রস্তর-পথ মন্দির পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। আমরা যখন এই পথে যাইতেছিলাম, তখন এক-জন মুসলমান আসিয়া আমাদিগকে জুতা পায় দিয়া মস্‌জিদের মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। তাহার সঙ্গে আর একজন মুসলমান জুটিল। তাহারা উভয়েই আমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত মস্‌জিদের দ্বার খুলিয়া ভিতরে লইয়া গেল। মস্‌জিদের দ্বার প্রস্তরনির্ম্মিত এবং অভ্যন্তরেও প্রস্ত-রের অনেক কারুকার্য্য আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দুই দিকে দুইটী প্রস্তরনির্ম্মিত সমাধিস্তম্ভ। সমাধিস্তম্ভে পারসীতে অনেক কথা লেখা আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের মধ্যে কেহই পারস্য ভাষা জানিতেন না, সুতরাং আমরা তাহা হইতে কিছুই জানিতে পারিলাম না। যে দুইটী মুসলমানের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা বলিল যে, সমাধিদ্বয়ের মধ্যে যেটী বৃহৎ তাহার নিম্নে পীর খাঁঞ্জে আলী সমাহিত আছেন, অপরটী তাঁহার উজিরের (তিনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) সমাধি। মুসলমানদ্বয় খাঁঞ্জেআলীর কেরামত সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। কিন্তু তাহাদের কথায় পীর খাঁঞ্জেআলী বাদসাহ, নবাব, সৈনিক পুরুষ, কি ফকির, তাহার কিছুই বোঝা গেল না। সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে একটী অতি প্রকাণ্ড দীঘী। দীঘীর চতুষ্পার্শ্বে বন জঙ্গল হইয়াছে। সম্মুখের দিকে খানিকটা স্থান পরিষ্কার আছে। ঘাটের নিকট একটা ভয়ানক কুম্ভীর দেখিয়া আমরা একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম। তখনই কুম্ভীরের আহারের জন্য অপর দর্শকেরা একটী মুরগী দিয়াছিল। মুরগীটী গলাধঃকরণ করিয়া কুম্ভীর যখন ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল, তখনই আমরা তথায় উপস্থিত। একটী মুসলমান ছেলে কুম্ভীরকে একখানা লাঠি দ্বারা তাড়া করিতেছিল, কিন্তু কুম্ভীরের তাহা গ্রাহ্য নাই। কুম্ভীর হয় বালকটাকে

নিতান্ত কৃপাপাত্র মনে করিয়াই তাহার আঘাত ধীর ও শান্তভাবে সহ্য করিতেছিলেন, নয় বহুকাল অন্ধ পুকুরে বাস করিতে করিতে তাঁহার হিংস্র স্বভাব হারাইয়া ফেলিয়া বড়ই নিরীহ হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক তাঁহাকে ভাল মানুষ বলিয়া আমাদের কিন্তু বিশ্বাস হইল না, তাঁহার গাত্র স্পর্শ করা দূরে থাকুক, তাঁহার সম্মুখে যাইতেও আমাদের সাহস হইল না। আমরা পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। শুনিলাম "কালা পাহাড়" ও "ধলাপাহাড়" নামে দুই প্রকাণ্ড কুম্ভীর সর্ব্বাগ্রে এই দীঘীতে ছিল। তাহাদিগকে নাকি এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা হয় ত কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে। যাহাকে দেখা গেল, ইনি বোধ হয় তাহাদেরই বংশধর। শুনিলাম, দীঘীর মধ্যস্থানে একটী মন্দির আছে। শীতকালে নাকি মন্দিরের কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বৈশাখ মাসের শেষভাগে গিয়াছিলাম, তখন বৃষ্টির জলে পুকুর পূর্ণ, আমাদের ভাগ্যে সে দর্শন লাভ হইল না। সেখান হইতে গাড়ীর নিকট ফিরিয়া আসা গেল। গাড়ীতে চড়িয়া পূর্ব্বদিকে প্রায় দুই মাইল পথ গিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হইল। গাড়ী হইতে নামিয়া প্রায় আধ মাইল পথ চলিয়া একটী সুবৃহৎ ইষ্টকালয় দেখিতে পাইলাম। ইহাই খাঁঞ্জেআলীর সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। এই ইষ্টকালয়ে ৭৭টী গুম্বজ আছে। সমস্তই খিলানের উপর। স্তম্ভগুলি প্রস্তরের। দেয়ালেও অনেক প্রস্তরের কাজ আছে। অনেক স্থান হইতে তস্করেরা প্রস্তর খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। মেঝেরও অনেক অংশে গভীর গর্ত্ত সকল দেখা গেল। প্রবাদ আছে যে, খাঁঞ্জেআলী বহু অর্থ ঘরের মেঝেতে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং ভাগ্যক্রমে কেহ কেহ সেই অর্থ লাভ করিয়া বড় মানুষ হইয়াছে। বরিশাল জিলার অধীনস্থ কোন স্থানের নবোন্নত ধনীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ একটা অপবাদ আছে যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাগেরহাটের নিকটে পাঁঠা বিক্রয় করিতে আসিয়া খাঁঞ্জেআলীর প্রোথিত অর্থ লাভ করেন এবং পাঁঠাগুলি ছাড়িয়া দিয়া টাকা লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। বাগেরহাটের অতি নিকটবর্ত্তী কোন কোন জমিদার সম্বন্ধেও এইরূপ টাকা লাভের জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এ সকল জনশ্রুতির সত্যাসত্য নিরূপণ করা কিন্তু বড়ই কঠিন ব্যাপার। ৭৭ গুম্বজশোভিত বৃহদায়তন বাড়ীটী দেখিলেই মনে হয়, বাদসাহী আমলের কোন মুসলমান বড় লোকের রুচি ও কল্পনা অনুসারে স্থপতিগণ বাড়ীটী নির্ম্মাণ

করিয়াছে। স্থাপত্য-বিদ্যা-নিপুণ ব্যক্তিগণ ভিন্ন এরূপ সুন্দর ও সুরুচিকর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা সাধারণ মিস্ত্রীগণের কর্ম্ম নয়। যাঁহারা আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের তাজমহল, কুতবমিনারের কারুকার্য্য দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অপ্রসিদ্ধ অরণ্যময়, সুন্দরবন-প্রদেশীয় এই বাড়ীটী একবার দেখিলে বুঝিতে পারেন, ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে কত শ্রম, কত অর্থ এবং কত যত্নের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার মালমস্‌লা, প্রস্তরাদি নিশ্চয়ই পশ্চিম হইতে আনা হইয়াছিল। তখন পশ্চিম যাইবার পথও এরূপ সুগম ছিল না। সুতরাং গো-শকটে ও মুটের স্কন্ধে চাপাইয়া এ সকল মালমস্‌লা আনাইতে নিশ্চয়ই অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। বাড়ীটী নির্ম্মাণ করিতেও কম দিন লাগে নাই। বহুলোক খাটিয়া বহু বৎসরে এরূপ একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারে। বাড়ীটীর গঠন প্রণালী অনেকটা দুর্গের ধরণে। দুর্গের উদ্দেশ্যেই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইহার দুইটী দ্বার। সদর দ্বারটী খুব উচ্চ খিলান, পশ্চাৎ দ্বার অনেক নীচু। ইহার নিম্নতল সমস্তই খোলা। স্তম্ভের উপরে বাড়ীটী দাঁড়াইয়া আছে, সুতরাং সমস্ত নিম্নতলটাকে একটা প্রকাণ্ড হল বলিলেই চলে। আমি তাহার এক প্রান্ত হইতে অতি উচ্চৈঃস্বরে ইংরেজীতে "সভাপতি মহাশয় ও ভদ্র মহোদয়গণ !" এই কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিয়াছিলাম, অপর প্রান্ত হইতে আমার সঙ্গীয় বন্ধুগণ বহুদূরের শব্দ যেরূপ শোনা যায় সেইরূপই শুনিতে পাইয়াছিলেন। কলিকাতার টাউন হল অপেক্ষা এ হলটী কিছু বড় হইবে বলিয়াই মনে হয়। একটী প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর উঠা গেল। ছাত ঘোর অরণ্যময়। সঙ্গীয় লোকেরা বলিল ছাত এখন সর্প ব্যাঘ্রের আবাসভূমি হইয়াছে। আমরা ছাতের উপর দুই চারি মিনিট দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম। ছাদের উপরে নাকি একজন স্ত্রীলোক ফকীর থাকিতেন। অনেকে তাঁহাকে সিঁড়ির উপরিস্থ চিলাকোঠায় ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ধ্যানরত দেখিয়াছে। আমরা তাঁহার দর্শন পাইলাম না। উপরের কিছুই দেখা গেল না। একে নিবিড় বন, তাহাতে আবার সর্প ও ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়াই চক্ষু স্থির হইল। আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম এবং পশ্চাৎদিকের অপ্রশস্ত ও অনতি-দীর্ঘ দ্বার দিয়া নিকটবর্ত্তী দীঘীটা দেখিতে গমন করিলাম। এ বাড়ী হইতে দীঘীর নিকট যাইতে আমাদের ২।৩ মিনিটের অধিক লাগিল না। এটীকে "ঘোড়াদীঘী" বলে। "ঘোড়াদীঘী" নাম

শুনিয়াই আমার মনে হইল, নিশ্চয়ই এই প্রকাণ্ড বাড়ীটীতে সৈনিক পুরুষেরা থাকিত এবং তাহাদের অশ্বাদি স্নান করাইবারজন্য এ দীঘীটী কাটান হইয়াছিল। গোরস্থানের সম্মুখে যে দীঘীটা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, "ঘোড়াদীঘী" তাহা অপেক্ষা অনেক বড়। "ঘোড়া দীঘীর" জল দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম, এরূপ পরিষ্কার জল পাড়াগেঁয়ে দীঘী পুষ্করিণীতে আমি অল্পই দেখিয়াছি। দীঘীটার অধিকাংশ বনজঙ্গলে আবৃত হইয়া আছে। সম্মুখের দিক অনেকটা পরিষ্কার। আমরা যখন ঘোড়াদীঘীর নিকট গেলাম, তখন দুইটী চণ্ডাল স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমরা সেখান হইতে সরিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু তাহারা শীঘ্র শীঘ্র আমাদিগকে দীঘী দেখিবার সুবিধা করিয়া দিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম, দীঘীতে অনেক কুম্ভীর আছে। আমরা "আয় আয়" করিয়া ডাকিবামাত্র একটী কুম্ভীর মাথা তুলিয়া ঘাটের দিকে আসিতে লাগিল। কুম্ভীর যখন ঘাটের অনেকটা কাছে আসিয়াছে, তখনও স্ত্রীলোক দুইটীর মধ্যে একজন জলে পা দিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা তাহাকে পারে উঠিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিলাম; কিন্তু সে একটু হাসিয়া বলিল, "এ কুমুর কাহাকেও কিছু বলে না।" তখন অপর স্ত্রীলোকটী কুম্ভীরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওরে তুই আসিস্‌নে, বাবুরা তোর জন্য কিছুই আনেন নাই, মিছামিছি ডাক্‌ছেন।" আশ্চর্য্য বাপার! কুম্ভীর আর অগ্রসর হইল না। যতদূর আসিয়াছিল, তত দূরেই মাথা জাগাইয়া রহিল। নিরাশার কথা শুনিয়া বুঝিবা বেচারার আর পা চলিল না। আমরা কুম্ভীরকে সেই অবস্থায় রাখিয়া ৭৭ গুম্বজ বিশিষ্ট বাড়ীতে আবার ফিরিয়া আসিলাম এবং আর কিছুকাল এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম এবং বাঘেরহাট ফিরিয়া যাইবার সময় গাড়ীতে বসিয়া সকলেই নীরবে গম্ভীরভাবে "খাঁঞ্জেআলীর" বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শ্রীজীব গোস্বামীর জীবন-বৃত্তান্তে "পীর আলীখাঁর" সমাধি মন্দিরের উল্লেখ আছে। এই পীর আলিখাঁই পীর খাঁনজাহান আলী তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। এই জীব গোস্বামীর পিতৃপিতামহের কাটোয়া ও বরিশাল জেলার অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপে বাসস্থান ছিল। তাঁহারা জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাটোয়া হইতে বরিশাল জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী চন্দ্রদ্বীপে যাইবার সময় বর্ত্তমান বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী ফয়তাবাদে বিশ্রাম করিয়া যাইতেন। ফয়তাবাদেও তাঁহাদের বিশ্রাম বাড়ী ছিল। এই ফয়তাবাদই "পীর খাঁনজাহান আলীর" ক্ষুদ্র

নগর। ব্লকম্যান সাহেব নানা প্রদেশীয় মুদ্রা ও সমাধির উপরিস্থ পারস্য ও আরব্য অক্ষরে লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ গুলি বিশ্লেষণ করিয়া মুসলমানদিগের রাজত্ব কালীন অনেক স্থানের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৃত্তান্ত নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি পীর খাঁঞেআলীর সমাধি মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া এই বিধ্বস্ত নগরকে "কালীফয়তাবাদ" নাম দিয়াছেন। উভয় জীব গোস্বামীর জীবন চরিতে ও ব্লকম্যান সাহেবের বিবরণে যশোহরের অন্তর্গত ফয়তাবাদ বা কালীফয়তাবাদের নামোল্লেখ আছে।

জীব গোস্বামীর পিতৃপুরুষেরা ফয়তাবাদে অবস্থান করিতেন। জীব-গোস্বামীর পিতৃপুরুষদিগকে ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ জীবগোস্বামীকে ধরিয়া হিসাব করিলেও ফয়তাবাদ নগর প্রায় ৪০০শত বৎসরাবধি প্রতিষ্ঠিত, ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। জীবগোস্বামী শ্রীশ্রী ৺ চৈতন্যপ্রভুর সমকাল-বর্ত্তী লোক। তবে তিনি মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। মহাপ্রভু ১৪৫৫ শকে মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন। অতএব মহাপ্রভুর তিরো-ভাব হইতে গণনা করিলেও বর্ত্তমান ১৮১৭ শক পর্য্যন্ত ৩৬২ বৎসর হয়। সে যাহা হউক পীরখাঁনজাহানআলীর ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ফয়তাবাদ নগরেরও কোন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। বাগেরহাট মহকুমার কাননগো মহাশয় গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র খুঁজিয়া এ সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছিলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখককে তদ্বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, খাঁনজাহান-আলীর বর্ত্তমান কীর্ত্তি সকল রক্ষা করিবার দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ি-য়াছে। গবর্ণমেণ্ট "খাঁনজাহানআলীর" বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একবার বিস্তারিত বিবরণ চাহিয়াছিলেন। তদনুসারে বাগেরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কাননগো মহাশয়কে তথায় পাঠাইয়া ইহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণ-মেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

সংসার ও ধর্ম্ম।

সংসারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্নের নানারূপ উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। উত্তরগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। সংসারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে সংসার একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিব অথচ ধর্ম্মলাভও করিব, ইহা হইতে পারে না। যেখানে সংসারের শেষ, সেইখানে ধর্ম্মের আরম্ভ।

২। সংসারে থাকিয়াও ধর্ম্মসাধন হইতে পারে। সংসার ধর্ম্মের বিরোধী নহে, বরং সহায়। কর্ম্মক্ষেত্রে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ধর্ম্মজীবনের সূচনাই হয় না।

৩। সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধন অর্থশূন্য কথা। এককে পরিত্যাগ করিয়া অপর থাকিতে পারে না। বায়ুশূন্য স্থানে উড্ডয়ন যেরূপ অসম্ভব, দেশকে (space) অবলম্বন না করিয়া ভ্রমণ যেমন প্রলাপবাক্য, সেইরূপ সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মসাধন আকাশ-কুসুম মাত্র। সংসার ধর্ম্মের বহির্ব্বিকাশ, ধর্ম্ম সংসারের আন্তরিক শক্তি।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার মত রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ সকল গুলিকেই একটা না একটার অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে। যাঁহারা বলেন সংসার ও ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী, একের সহিত অপরের চিরশত্রুতা, তাঁহাদের মতের বিস্তৃত সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদের কথা সত্যও হইতে পারে, নাও হইতে পারে। এই প্রবন্ধে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইব, তাহা ছাড়া আর যত প্রকার সিদ্ধান্ত আছে, তাহার সকলগুলিই ষোল আনা ভুল, এমন আস্পর্দ্ধা করিতে হইলে যে সমস্ত সদ্‌গুণ আবশ্যক, তাহার কিছুই আমাতে নাই। সত্যরাজ্যের দরজা খুলিবার একমাত্র চাবি আমার হাতে আছে, এমন আস্ফালন কোন সাহসে করিব? তবে একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সাক্ষাতভাবেই হউক, পরোক্ষভাবেই হউক, যে মত অসত্য, তাহা স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট। "সংসার ধর্ম্মের শত্রু" এই কথা স্ববিরোধী কিনা, তাহা নির্ণয়ের সহায়তা করিবার জন্য আমি কেবলমাত্র একটী প্রশ্ন করিয়া ক্ষান্ত হইব। সকলেই স্বীকার করিবেন, সংসার ঈশ্বর হইতে প্রসূত ও তাঁহার সহিত নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত। অল্প কথায় বলিতে গেলে, ঈশ্বরের সহিত আত্মার যোগ স্থাপন করা ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যাহার সহিত ঈশ্বরের নিত্যযোগ, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও যাহা তিষ্ঠিতে পারে না, ঐশী শক্তি হইতে যাহার উৎপত্তি; ঈশ্বরের সহিত মান-

মাত্মার যোগস্থাপনের পক্ষে তাহা কেমন করিয়া অন্তরায় হইতে পারে? সংসার যদি ঈশ্বরের প্রকাশ হয়, তবে তাহা মানবাত্মাকে ঈশ্বরের নিকটে না আনিয়া কেমন করিয়া তাঁহা হইতে দূরে ফেলিবে? এক্ষণে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক। ধর্ম্মের দুইটা দিক আছে। একটা ভাবের দিক—অন্তরের দিক; আর একটা বাহিরের দিক অর্থাৎ কার্য্যের দিক। বলা বাহুল্য কার্য্যের দিক পরিত্যাগ করিলে, ধর্ম্ম একেবারে লোপ না পাইলেও নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। অনুষ্ঠান নাই, উল্লেখযোগ্য এমন কোনও ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠান ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

এখন প্রশ্ন এই, ধর্ম্মানুষ্ঠান কাহাকে বলে? কোন্ কার্য্যগুলিকে ধর্ম্মানুষ্ঠান নামে অভিহিত করা যাইতে পারে? ধর্ম্মকার্য্য সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপ হইতে স্বতন্ত্র না এক? * অনেকে হয়ত বলিবেন, সংসারে যে সমস্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, তাহা ছাড়া ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কতক-গুলি কর্ত্তব্য আছে, সেই সকল কর্ত্তব্যের সমষ্টিকে ধর্ম্মানুষ্ঠান বলা যায়। এ কথা সত্য হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান সাংসারিক কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়ে। এ মতের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ ভাবে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। এ মত সত্য হইলে আরও যে কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, আমি কেবল তাহারই উল্লেখ করিব। ঈশ্বরের প্রতি যদি মানবের "কর্ত্তব্য" থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বর মানুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তুমি যদি আমা হইতে স্বতন্ত্র, সীমাবিশিষ্ট ব্যক্তি না হও, তোমার যদি কতক-গুলি ন্যায্য অধিকার (rights) না থাকে এবং তুমি ও আমি যদি এক সমাজভুক্ত না হই, তাহা হইলে তোমার প্রতি আমার কোনও কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না। রামের সঙ্গে যদুর যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত যদি তাহার ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ না হয়, তবে ঈশ্বরের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য আছে, এ কথা বলা যায় না। অল্প কথায় বলিতে গেলে, ঈশ্বরকে সসীম ও মানবাত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে না করিলে, তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আছে, এ কথার কোনও অর্থ থাকে না। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ দ্বৈতবাদীদিগের (Deists) মত কেহ বলিতে পারেন, ঈশ্বর জগৎ ও মান-

* মানুষ স্ব ইচ্ছায় যত প্রকার কার্য্যও করিতে পারে, তাহার সকলগুলিকে আমি "সাংসারিক কার্য্য" এই নাম প্রদান করিতেছি না। যে সকল কার্য্য নীতিবিগর্হিত নহে তাহাই প্রকৃতপক্ষে সংসারের কার্য্য।

বাত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি কেবল জগৎ সৃষ্টি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহার পর জগৎ আপনা আপনি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চলিতেছে। যিনি এ প্রকার মতাবলম্বী, তিনি বলিলেও বলিতে পারেন, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু যিনি বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর জগতের প্রাণ, মানবাত্মার সহিত তাঁহার বস্তুগত কোনও পার্থক্য নাই, জগৎ তাঁহারই বাহ্য প্রকাশ, এক কথায় যিনি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনও পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহার নিকট ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য অর্থশূন্য কথা।

তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করা গেল, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আছে। সেই সকল কর্ত্তব্য কি? কেহ হয়ত বলিবেন, ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যসাধন করা হইল। বেশ কথা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ধর্ম্মের একটা আভ্যন্তরিক দিক আছে। উপাসনা ধর্ম্মের সেই ভিতরের দিক; কিন্তু ধর্ম্মের ভিতরের দিক থাকিলেই যথেষ্ট হইল না। ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম নিতান্ত অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। অধিকন্তু বাহির পরিত্যাগ করিলে ভিতরেরও অস্তিত্ব লোপ পায়। তাহা ছাড়া উপাসনাকে—আত্মার সহিত পরমাত্মার অচ্ছেদ্য যোগ উপলব্ধি করাকে "কর্ত্তব্যকার্য্য" বলা কতদূর সঙ্গত, চিন্তাশীল পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

যাহাদিগকে "ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য" এই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে, যদি এমন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান না থাকে, তাহা হইলে, ধর্ম্মের সহিত সংসারের পার্থক্য কি রহিল? সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই কি তবে ধর্ম্ম? একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে স্বীকার করিতেই হইবে, ধর্ম্মের সহিত সংসারের বাস্তবিকই কোন প্রভেদ নাই। কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া আপন আপন অনুষ্ঠিতব্য কার্য্য সম্পাদন ভিন্ন ধর্ম্মসাধনের অপর কোনও পথ নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, সংসার ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। পরিবারে ও সমাজে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলিকে যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মের কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত ধর্ম্ম অসম্ভব, এ কথায় বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না। ধর্ম্মানুষ্ঠানের অর্থ ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন নহে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন একই

বস্তু, এ কথা মানিতেই হইতেছে। যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যও নহে, সংসারধর্ম্ম-প্রতিপালনও নহে, এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, ইহা প্রতিপন্ন করার ভার তাঁহার উপর। ধর্ম্মের বাহিরের দিকের— অনুষ্ঠানের দিকের সহিত সংসারের কোনও পার্থক্য নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন যদি ধর্ম্ম অসম্ভব হয় ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ যদি একই বস্তু হয়, তাহা হইলে সংসার ও ধর্ম্ম অবিভাজ্যরূপে পরস্পরের সহিত নিত্য সংযুক্ত এ কথা প্রমাণিত হইতেছে। সংসার ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র নহে, ধর্ম্মের বহির্ব্বিকাশ।

যাঁহারা সংসারের সহিত ধর্ম্মের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে দেখিয়া, আমি প্রচ্ছন্ন নাস্তিক এরূপ সন্দেহ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত হইতে অনুরোধ করি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মের একটা ভিতরের দিক আছে। বাহির ছাড়া ভিতর থাকে না, ভিতর ছাড়া বাহির থাকে না, ইহাই আমার একমাত্র বক্তব্য। সংসার ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না, এ কথা শুনিয়া যাঁহারা আমার উপর বেজায় চটিয়া গিয়াছেন, যদি তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ভিন্ন প্রকৃত পক্ষে সংসার হয় না, এই অবশিষ্ট কথাটুকু বলি, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইব কি? ধর্ম্ম ভিন্ন সাংসারিকতা থাকিতে পারে, কিন্তু সংসার থাকে না। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ও বিষয়াসক্ত গৃহস্থের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। আবার সংসার ভিন্ন গৈরিক বসন থাকিতে পারে, অশ্রু, মূর্চ্ছা, ভাবের তরঙ্গ থাকিতে পারে, কীর্ত্তন, উল্লম্ফন, চীৎকার, বক্তৃতাময়ী উপাসনা, প্রভৃতি থাকিতে পারে কিন্তু ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম সর্ব্বা-বয়বসম্পন্ন। কান্তিপূর্ণ জীবন্ত দেহের সহিত কঙ্কালের যে প্রভেদ, সংসার-যুক্ত ধর্ম্ম ও সংসারবিবর্জ্জিত ধর্ম্মের (?) মধ্যে সেই প্রভেদ।

দৈনন্দিন জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহ পরম ধার্ম্মিক মহাজনের নিকট নিতান্ত হেয় বোধ হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের দিক হইতে দেখিলে সেইগুলিই ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিণত হয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশমান একমেবা-দ্বিতীয়ং ব্রহ্মের সহিত আপনার অচ্ছেদ্য যোগ উপলব্ধি করিয়া ও আপ-নাকে তাঁহারই কার্য্যসম্পাদনের যন্ত্রস্বরূপ জানিয়া সংসারের যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠানই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন। জগৎকে জড়পিণ্ডমাত্র মনে কর ও ঈশ্বরকে ইহা হইতে দূরে রাখিয়া দাও, অহং জ্ঞানে স্ফীত হইয়া আপনাকে ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাধীন জীব মনে কর, নিজকৃত কার্য্য সমূহের সহিত

বিশ্বযন্ত্র ও বিশ্বপ্রাণের নিগূঢ় ও অনতিক্রমণীয় সম্বন্ধ বিস্মৃত হও, * তোমার সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন শুষ্ক সাংসারিকতায় পরিণত হইবে। আবার সংসারকে দূরে ফেলিবার চেষ্টা কর, সমাজ ও পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে সকল কর্ত্তব্য-পাশ দ্বারা আবদ্ধ, সেই সকলের প্রতি অমনোযোগ প্রদর্শন কর, তোমার ধর্ম্মসাধন পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবে। তুমি আপনিও প্রতারিত হইবে, অপরকেও প্রতারিত করিবে। দুইভাবে দেখিলে একই জিনিষ দুইরূপ দেখায়। যে সকল সাংসারিক কার্য্য শুদ্ধ সংসারের চক্ষে দেখিলে সাংসারিকতার আকার ধারণ করে, সেই সকল কার্য্যই সমগ্রের (whole)—ব্রহ্মের দিক দিয়া দেখিলে ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিণত হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় বিষয়টী পরিষ্কাররূপে বোধগম্য হইবে। একটী সুন্দর গোলাপ দেখিয়া কবি মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন, আর নীরসপ্রাণ কবিত্বশূন্য কোনও ব্যক্তি গোলাপ যে কতকগুলি জড় পরমাণুর বিশেষ প্রকার সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না। দুই জনে একই জিনিষ দেখিতেছেন, কিন্তু দেখিবার তারতম্য আছে। কবি যাহা দেখিতেছেন, তাহা অপেক্ষা কিছু কম অপর ব্যক্তির নয়নগোচর হইতেছে, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু কবি যে চক্ষে দেখিতেছেন, অপর ব্যক্তি সেই চক্ষে দেখিতেছেন না। কিন্তু কবি যে ভাবেই দেখুন না কেন, দ্রষ্টব্য পদার্থ তাঁহার সম্মুখে থাকা চাই। গোলাপ ফুলটিকে যদি নষ্ট করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে কবির কবিত্ব কোথায় থাকে? সেইরূপ সাংসারিক সংসারকে যে ভাবে দেখেন, ধার্ম্মিক সেই সংসারকেই আর একভাবে দেখেন। কিন্তু সংসারকে যদি দূরে অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম কোথায় থাকে?

ফল কথা এই, সংসার ধর্ম্মের শত্রুও নহে, ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্রও নহে, কিন্তু ধর্ম্মের বহির্ব্বিকাশ। সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধন করা যেমন সম্ভব, দেহত্যাগ করিয়া প্রাণধারণও তেমনি সম্ভব। জনসাধারণের এমনই আশ্চর্য্য ধারণা যে গভীর মহাসমুদ্রের অতলস্পর্শ পাদদেশ, হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ ও চন্দ্রতারকাশোভিত নীলাকাশের সীমা অতিক্রম না করিলে ব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায় না। যাঁহাকে পাইবার জন্য দিগ্‌দিগন্তে হস্ত

* যন্ত্র কথাটা এরূপভাবে ব্যবহার করা উচিত নহে। ইংরাজী organism শব্দের ঠিক বাঙ্গলা মনে না পড়াতে অগত্যা "যন্ত্র" শব্দ ব্যবহার করিলাম।

প্রসারণ করিতেছি, তিনি চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছেন, অথচ দেখিতেছি না। যিনি জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সকল কার্য্যের প্রাণস্বরূপ হইয়া আছেন, তাঁহাকে মূর্চ্ছা ও উচ্ছ্বাসের ক্ষণিক সুখসম্ভোগের কাল ভিন্ন অপর সময়ে চিনিতে পারিতেছি না! পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যদি ঈশ্বরের দর্শন লাভ না কর, তবে কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না; কেন বৃথা কষ্ট করিয়া মর? অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, ধর্ম্ম কি তবে এতই সহজ প্রাপ্য? আমার উত্তর এই—ধর্ম্ম এত সহজ প্রাপ্য বলিয়াই এত দুর্ল্লভ।

শ্রীহীরালাল হালদার।

শান্তিনিকেতন।

আশ্রমে বসিয়া আছি। হাত কয়েক মাত্র পুষ্পফলে অবনত বৃক্ষ সকল বিরাজ করিতেছে। তাহার পরে দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তর। কোন দিকে বা গ্রামের শ্যামল প্রান্তরেখা দেখা যাইতেছে, কোন দিকে বা তাহাও দেখা যাইতেছে না। এই বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আমি একাকী বসিয়া আছি। প্রভাতের মলয়-বায়ুর মৃদুহিল্লোল আমাকে চামর ব্যজন করিতেছে। সূর্য্য-কিরণ বিপুলচ্ছায় বৃক্ষের অন্তরাল হইতে নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া আমার শীতাপনয়ন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। সংসারের বিষময় কোলাহল প্রবেশ করিতে সাহস করিতেছে না; বিহগকুল মধুধারা বর্ষণ করিয়া হৃদয়-নিহিত দাবাগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছে। আশ্চর্য্য! এই প্রান্তরের মধ্যে আমি কি ক্ষুদ্র, কিন্তু সকলেই যেন আমারই সেবা করিতে ব্যস্ত। যখন সংসারের কোলাহলময় নগরে থাকি, তখন আমি আপনাকেই কত বড় ভাবি। সকলেই চীৎকার করিতেছে; আমি মনে করি যে আমার সুকণ্ঠ হইতে একটি চীৎকারধ্বনি বহির্গত না হইলে, চীৎকারগুলি ঠিক সুস্বর হইতেছে না। সকলেই কার্য্য করিতেছে; আমি মনে করি যে সেই সকল কার্য্যে আমার হস্ত থাকিলে তাহা আরও অধিক সুসম্পন্ন হইত। কোলাহলের সংসারে আমি আপনাকে খুব বড় লোক ভাবিয়া সকলের সঙ্গে আমিও চীৎকার করিয়া কোলাহলই বাড়াইতে থাকি, কমাইতে পারি না। কিন্তু এই আশ্রমের নির্জ্জনতার মধ্যে আসিয়া আমিও মগ্ন হইয়া গিয়াছি; আমার ক্ষুদ্রতা

বুঝিয়াছি ; কোলাহল করিবার ক্ষমতাই হারাইয়া ফেলিয়াছি। এই নির্জ্জন-বাসে আমি আমার ক্ষুদ্রতাও বুঝিয়াছি, আমার মহত্বও বুঝিয়াছি। হে দেবদেব! এই বিশ্বমন্দিরে আসীন তোমাকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছে, "মধ্যে বামন মাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।"

আর তোমারি সেই অনন্ত জ্যোতির বিস্ফুলিঙ্গমাত্র এই মানবাত্মার সেবার জন্য তোমারি আদেশে বিশ্বজগৎ নিয়ত চেষ্টা পাইতেছে। আমি যতটুকু জড়, ততটুকু ক্ষুদ্র; জড়শক্তি সকল অন্ধভাবে আমার সেই জড়-দেহের উপর দ্বন্দ্ব লাগাইতেছে; আমার বলিবার ক্ষমতা নাই, আমার করিবার ক্ষমতা নাই; জড়শক্তির অধীন হইয়াই এই জড়দেহকে চলিতে হইবে। আমি যতটুকু আত্মা, ততটুকু মহান্; এখানে জড়শক্তির কোন ক্ষমতাই খাটিবে না; আত্মা সেই জীবনের উৎস, শক্তির উৎস, প্রেমের উৎস পরমাত্মার নিকট হইতে অমৃত লাভ করিয়া থাকে। জড়দেহ থাকে থাক্, যায় যাক্; আত্মা, গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় বিশ্বজননীর গর্ভে বাস করিয়া অমৃতপানে পরিপুষ্ট হয়।

সংঘর্ষণ না হইলে কোন পদার্থেরই অনুভব হয় না, ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য। এই যে আলোক অনুভব করিতেছি, যদি না ধূলি প্রভৃতি পদার্থ রাশির সহিত ইহার সংঘর্ষণ হইত, তবে ইহা অনুভব করিতে পারিতাম না। আমার বাহুতে যে বল আছে, অপর কোন পদার্থের সংঘর্ষণে বাধা না পাইলে সে বল অনুভব করিতে অক্ষম হই। তেমনি কোলাহলময় সংসারে জড়-পদার্থের সহিত অধিক সংঘর্ষণ হয় বলিয়া সেখানে জড়-দেহপিণ্ডেরই অধিক অনুভব হয়, দেহপিণ্ডেরই কথা অধিক শুনিতে পাওয়া যায়—সেখানে তাই দেহপিণ্ডের অতিরিক্ত আত্ম-তত্ত্ব উপহাসের কথা। কিন্তু এই নির্জ্জন আশ্রমে জড়-পদার্থের সহিত জড়-দেহের তত সংঘর্ষণ হয় না, যত পরমাত্মার সহিত আত্মার। এখানে কাহাকেও ধাক্কা মারিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিতে হয় না; পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নিজের ঐশ্বর্য্য বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না। এখানে আত্মা, যতটা পারে জড়-দেহের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, পরমাত্মার অতুল ঐশ্বর্য্যে আপনাকে দিবানিশি মগ্ন রাখিতে চাহে। এখানে তাই জড়তত্ত্ব কেহ শুনিতে চাহে না, আত্মতত্ত্বই হৃদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া থাকে। পরমাত্মার সহিত সংঘর্ষণে আত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়।

ভবকোলাহল দূরে ত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন আশ্রমে ধ্যানচক্ষে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া কত না সুখশান্তি ভোগ করিতেছি। এই টুকু সুখ শান্তি দিবার জন্য প্রকৃতি আপনার ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে। মানবাত্মাকে সুখে স্বচ্ছন্দে পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য ভগবান এই জগতের মহান্ দাসাশ্রম খুলিয়াছেন। প্রকৃতি তথায় সেবিকা; এই মহান্ আকাশ তাহার জলন্ত চুল্লী; সূর্য্য চন্দ্র তাহার ইন্ধন; পৃথিবী ও পৃথিবীর ন্যায় জীবজন্তুর আবাসভূমি অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাহ। এই দাসাশ্রমে যেমন জড়দেহের পুষ্টির জন্য নানাবিধ ফুল ফল দিবানিশি প্রস্তুত রহিয়াছে, তেমনি আত্মারও পুষ্টির জন্য প্রেম, দয়া প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ দিবানিশি সজ্জিত রহিয়াছে। হে দেব! তোমার কি করুণা! আমরা পাপী তাপী দীন দরিদ্র হইলেও তুমি আমাদিগকে সুখশান্তি দিবার কত চেষ্টা করিতেছ। আমরা সকলেই অনাথ আতুর জন; অনাথ-নাথ তুমি, তুমিই দীনদয়াল। প্রেম, দান প্রভৃতি সুমিষ্ট উপকরণ পাওয়া যায় বলিয়াই এত কষ্টের সংসারও সময়ে সময়ে শান্তিনিকেতন বলিয়া বুঝিতে পারি। এই মহান্ দাসাশ্রম প্রকৃতই শান্তিনিকেতন; এখানে দেখ, সকলেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তোমারই সেবা করিতেছে। তবে আমরা যে অনেক সময়ে এই সংসারকে শান্তিনিকেতন বলিয়া দেখি না, তাহা আমাদেরই চক্ষের দোষ। আমাদের চক্ষু হইতে কুটা সরাইতে পারি না, আর এই জগৎ সংসারকে শান্তিহীন, অশান্তিপূর্ণ মরুভূমি বলিয়া চীৎকার করিতে থাকি। যতদিন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র উদিত হইতে থাকিবে, যতদিন পুষ্পরাশি সুগন্ধ বিস্তার করিবে, যতদিন ওষধি বনস্পতি সকল ফলভরে অবনত হইতে থাকিবে, যতদিন নদী সকল সুমিষ্ট জল প্রবাহিত করিবে, এবং যতদিন প্রেম, ভক্তি, দয়া বাৎসল্য প্রভৃতি স্বর্গীয় বস্তু ইহজগতে বিরাজ করিবে, ততদিন ইহা শান্তি-নিকেতন থাকিবেই। যে জড়দেহের প্রতিবন্ধকতায় এই শান্তিনিকেতনের শান্ত ভাব অনেক সময়ে ধরিতে পারি না, না জানি, সেই জড়দেহ হইতে মুক্ত হইলে কত শান্তি লাভ করিব। হে প্রাণময়! তুমি এই জড় শরীর বিচূর্ণ করিয়া দাও। আত্মা তোমার শান্ত-স্বরূপ নিত্যকাল দেখিয়া শান্তি লাভ করুক।

মানব! তুমিও যদি এই পৃথিবীকে শান্তি-নিকেতন করিতে ইচ্ছা কর, তবে সেই পরমাত্মাকে তোমার আদর্শ কর, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছা সম্মিলিত কর। ঈশ্বর এই জগতে সুখ শান্তি দিবার জন্য এক

মহান্ দাসাশ্রম খুলিয়াছেন, তুমিও সেই আদর্শে তোমার উপযুক্ত দাসাশ্রম খোল; তোমার সাধ্যমত অনাথ আতুরজনকে আশ্রয় দাও। মহান্ আকাশ ঈশ্বরের; আমরা তাহাকে আমাদের উপযুক্ত করিয়া বলি ঘটাকাশ, পটাকাশ। মহান্ দাসাশ্রম ঈশ্বরের এই জগৎ; আমরা আবার তাহারই মধ্যে এক একটী সীমা কল্পনা করিয়া বলি, এই দাসাশ্রম এই দেশের, অমুক দাসাশ্রম অমুক গ্রামের, আর তৃতীয় দাসাশ্রম অমুক নগরের। কিন্তু সকল দাসাশ্রমেই সেই মহান্ দাসাশ্রমেরই আংশিক প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। মানব! তুমি উৎসাহ পাওনা বলিয়া, প্রশংসা পাওনা বলিয়া দাসাশ্রম খুলিতে পরাঙ্মুখ হইও না। যখন দেখিব গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে, সকলেই অনাথ আতুরদিগকে, দীনদরিদ্রদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া লাগিয়াছে; যখন দেখিব মনুষ্যদিগের মধ্যে দ্বেষ হিংসা লোভ চলিয়া গিয়া সাধুবৃত্তি সকলেই কেবল রাজত্ব করিতেছে, তখনই জানিব জগতে দাসাশ্রমের প্রভাব পূর্ণ বিস্তৃত; তখনই জানিব ধরণীতে শান্তি-নিকেতন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্কিমচন্দ্র।

(৩)

মৃণালিনী—মৃণালিনী বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য্যবিষয়ক প্রথম উপন্যাস; এই খান হইতে এক নূতন ধারা প্রবাহিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রেমপ্রধান। সামান্য কোনও লেখকের হস্তে পতিত হইলে পুনরুক্তিতে প্রেম অরুচিকর হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকবার এই প্রেমকে নূতন নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন নূতন মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন। কাজেই বৈচিত্রের জন্য প্রত্যেক মূর্ত্তিই মনোহর; প্রত্যেক মূর্ত্তিকে তিনি নূতন নূতন সৌন্দর্য্যে সিক্তি করিয়া তুলিয়াছেন। এক সূর্য্যালোক কতস্থানে কত ভিন্নরূপ দেখায়, কিন্তু তাহা কখন বিরক্তিকর বলিয়া মনে হয় কি? প্রভাতে যখন মেঘের উপর সোনালি ছটা ছড়াইয়া পড়ে, তখন এক শোভা, মধ্যাহ্নে এক শোভা, আবার সান্ধ্য গগনে অম্বুদমালার উপর সেই অস্তরবি রশ্মিরাশির খেলায় আর এক সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়; বৃক্ষপত্রে প্রতিফলিত সে কিরণের এক শোভা, আবার অম্বুধির বিশাল

রঙ্কে তরঙ্গে তরঙ্গে শতখণ্ডে ভগ্ন সে কিরণের আর এক শোভা। বঙ্কিম-চন্দ্রও প্রেমকে সেইরূপ নানা শোভায় দেখাইয়াছেন। মৃণালিনী আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রেমপ্রধান উপন্যাস।

মৃণালিনী পাঠ করিলে প্রধানতঃ পাঁচটি চিত্র চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়:—মনোরমা, মৃণালিনী, গিরিজায়া, হেমচন্দ্র ও পশুপতি। তন্মধ্যে মনোরমা চরিত্র একটি মধুর কবিতা। ব্যাখ্যায় কবিতার মাধুরী বুঝাইয়া দিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। কবিতার সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যায় থাকে না, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে হয়। তাই মনোরমার চরিত্র কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া সহজ কার্য্য নহে; সে চেষ্টাও এখানে করিতে ইচ্ছা করি না।

নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে দূরাগত মধুর সঙ্গীতের ন্যায় মনোরমার চরিত্র হৃদয়ে এক স্নিগ্ধতা ঢালিয়া যায়। তাহার স্মৃতি অপনীত হইতে সময় লাগে। মনোরমা দুই মূর্ত্তিতে পাঠককে দেখা দিয়াছেন; এক সেই "কুসুম নির্ম্মিতা" বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী আর এক সেই "তেজোগর্ব্ববিশিষ্টা কুঞ্চিত ভ্রূবীচিবিক্ষেপকারিণী" প্রৌঢ়া। প্রথম দর্শনে মনোরমা প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সরলতা এবং জ্ঞান যে পরস্পর বিরোধী নহে, তাহা বুঝিলেই মনোরমাকে আর প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইবে না। তাহা ভিন্ন মনোরমার অবস্থা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ; সেই তেজস্বিনী বালিকা যখন আপনার জীবনের আশ্চর্য্য ইতিহাস জানিতে পারিল, তবুও দেখিল যে সুখ তাহার প্রাপ্য সে সুখ হইতে সে কতদূরে, তখন তাহার অবস্থা ভাবিয়া দেখ। সে আপনাকে রহস্যের কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে বাধ্য হইল। যখন মনোরমা হেমচন্দ্রের উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিল, তখন মনোরমা বালিকা; যখন মনোরমা, মৃণালিনীর মিথ্যা কলঙ্ককাহিনী শ্রবণানন্তর হেমচন্দ্রের বর্ষণোন্মুখ-অম্বুদমালা-শোভিত অম্বরের মত মুখ দেখিয়া তাঁহার কাতরতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হেমচন্দ্র বলিলেন, "কিছু না," তখন মনোরমা বলিল, "কিছু না—বলিবে না! ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে!" কিন্তু মনোরমা আপনার বুকে বিছা পুষিয়াছিল, তাহার নয়নে অশ্রু আসিল—এই মনোরমা বালিকা নহে। তাহার প্রেম সম্বন্ধীয় কথা শুনিয়া হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, "আমি ইহাকে একদিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম!" কিন্তু হেমচন্দ্রের সেই সকল গম্ভীর কথার মধ্যে মনোরমা বলিল, "ভাই হেমচন্দ্র, তোমার এ জীন

কিসের চানড়া?" হেমচন্দ্র দেখিলেন বালিকা। পশুপতির নিকটেও তাহার দুই মূর্ত্তি। যখন "সেই রত্নপ্রদীপদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোকবিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল, তখন এক মূর্ত্তি; আর যখন মনোরমা পশুপতিকে উপদেশ দান করে বা ভর্ৎসনা করে, তখন এক মূর্ত্তি। যখন মনোরমা হেমচন্দ্রকে বলিল—"আজি তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা গিয়াছে? কে তোমায় এমন প্রবোধ দিয়াছে?" আবার বলিল—"তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কূলপরিপ্লাবিনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না।" তখন বুঝিলাম সে নর-হৃদয়ের সকল তত্ত্বই অবগত ছিল। একবার "মোহিতা" মনোরমাকে মনে করিয়া দেখ, দেখিবে, তাহার হৃদয়ের গভীরতা অসীম, তাহার ভালবাসা অপরিমেয়, সে রমণীকুলের ভূষণ। মনোরমা যখন পশুপতিকে বলিল, "এ ঘর ছাড় তোমার রাজ্যলাভের দুরাশা ছাড়। প্রভুর অহিত চেষ্টা ছাড়। এ দেশ ছাড়িয়া চল, আমরা কাশীধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি তোমার চরণ সেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব। যেদিন আমাদের আয়ুঃশেষ হইবে, একত্রে পরমধামে যাত্রা করিব। যদি ইহা স্বীকার কর—আমার ভক্তি অচলা থাকিবে। নহিলে"—সে বলিল, "নহিলে দেবী সমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমার আমায় এই সাক্ষাৎ, এজন্মের মত আর সাক্ষাৎ হইবে না।" তখন দেখিলাম মনোরমার হৃদয়ের দৃঢ়তা। মনোরমা প্রতিভার মানস-কুসুম। যখন কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা দেখিয়া হেমচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন না, মনোরমা বালিকা না তরুণী, তখন হইতেই মনোরমার কবিতার আরম্ভ। আর সেই বকুল, শাল, অশোক, চম্পক, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষচ্ছায়াময় স্বচ্ছান্ধকারাবৃত বাপীকূলে স্বচ্ছান্ধকারময় হৃদয় লইয়া মনোরমা—তাই বলিয়াছি মনোরমা আদ্যোপান্ত একটি কবিতা। যাঁহারা রমণীহৃদয়ে নব-যৌবনোন্মেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, যাঁহারা কতকাংশেও মনোরমার ন্যায় অবস্থাপন্না রমণীর ভাব অধ্যয়ন করিবার অবসর পাইয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন, মনোরমা কেবল কবিকল্পনা নহে।

মৃণালিনীর চরিত্র স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল। আয়েষা এবং তিলোত্তমার বা মনোরমা এবং গিরিজায়ার একত্রীকরণ মৃণালিনী। মৃণালিনীর হৃদয় প্রেমের

লীলাভূমি। প্রেমের জন্ত রমণী কতদূর করিতে পারে এই চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন। জীবনের শত আবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, শত বাধাবিঘ্নের উপর দিয়া প্রেম কেমন করিয়া সাগরসঙ্গমাভিলাষিণী স্রোতস্বতীর মত বহিয়া যায়, এই চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। মৃণালিনী প্রেমের উজ্জ্বল চিত্র। মর্ম্মপীড়িতা, প্রণয়ী কর্তৃক লাঞ্ছিতা, যাহার জন্ত তিনি গৃহত্যাগিনী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহার দ্বারা অপমানিতা মৃণালিনী যখন বলিলেন যে তিনি নিজেই হেমচন্দ্রের দুর্ব্ব্যবহারের কারণ—বলিলেন, "সে আমারই দোষ, আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই, কি বলিতে কি বলিলাম।" তখন আমরা বুঝিতে পারি না এই মৃণালিনী দেবী কি মানবী! সেইখানেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ, সেইখানেই প্রেম তাহার পূর্ণমহিমায় প্রকাশিত। মৃণালিনীর হৃদয়তরণী জীবনের "সকালবেলা" প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়াছিল। তখন আশার পবন বহিতেছিল—মৃণালিনীও ভাবিয়াছিল, "মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।" কিন্তু, "হেনকালে কালমেঘ উঠিল আকাশে"—মাধবাচার্য্যের আজ্ঞায় হেমচন্দ্র দূরে গমন করিলেন, তখন মনে হইল, "কূলত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে।" কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় নাই। সেখানে কলঙ্কের কণ্টকতরু যাতনার ভুজঙ্গে বেষ্টিত। তখন কেবল দুঃখ রহিল—

"যাহারে কাণ্ডারী করি সাজাইয়া দিনু তরি
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে।"

নবকিশলয়দলশোভিতা ব্রততীর উপর একটি অনাঘ্রাত প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুমের মত এই গ্রন্থমধ্যে গিরিজায়ার চিত্র—কুসুমটি সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া তুলিয়াছে কিন্তু তাহার উপযোগিতাও যথেষ্ট। "বঙ্কিমচন্দ্র" লেখক বলিয়াছেন, "বিরহ-দুঃখকাতরা মর্ম্মপীড়িতা রাজরাণী মৃণালিনীর পার্শ্বে মিলনলালসাবতী আনন্দময়ী ভিখারিণী গিরিজায়া বড়ই সুন্দর শোভা পাইতেছে। যেন স্থির, অচঞ্চল, অগাধ সমুদ্রের পার্শ্বে, একটি মধুরনাদিনী লীলাময়ী তরঙ্গিনী বিরাজ করিতেছে। সমুদ্রে করালকাদম্বিনীর ছায়া পড়িয়াছে; দুই একবার প্রবল বায়ুতে তাহার তরঙ্গমালা গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তবু যেন সমুদ্র 'সে আপনার বলে আপনি স্থির, আর তাহারই পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সুখমলয়হিল্লোলে রঙ্গময়ী হইয়া তরঙ্গভঙ্গে দিগ্বিভাসিত সূর্য্য কিরণ প্রতিবিম্বিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বহিয়া যাইতেছে।' এমন

সুন্দর সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না। এই বিকাশোন্মুখ নলিনীবৎ মধুর হাস্যময়ী গিরিজায়া অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর স্বরূপ। প্রতিবার দর্শনে হৃদয়ে নব নব সৌন্দর্য্যের ভাব জাগিয়া উঠে। বিরামবিহীন অতৃপ্ত নয়নে আমরা সেই চিত্রের দিকে চাহিয়া থাকি—চাহিয়া চাহিয়া সকল ভুলিয়া যাই, মন এক সৌন্দর্য্যরাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। কে গিরিজায়ার মত পরকে আপনার করিতে পারে? গিরিজায়ার কণ্ঠস্বরই কেবল মধুর নহে, ভিখারিণীর হৃদয় তদপেক্ষাও মধুর। সে তাহার প্রেমময় হৃদয়ে হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর মিলনাশাকে বলবতী করিয়া তুলিয়াছিল, তাই সেই মিলনের জন্ত সে কিনা করিয়াছিল? গিরিজায়া সুরসিকা। দিগ্গজ চরিত্রাঙ্কণে বঙ্কিমচন্দ্রের যে দোষ হইয়াছে, গিরিজায়ার চরিত্রে তাহা সংশোধিত হইয়াছে, কারণ এখন তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য নহে, তাহা পূর্ণ। তাই গিরিজায়ার চরিত্র বড়ই সুন্দর।

হেমচন্দ্র প্রেমিক। তাঁহার প্রেম রূপজ মোহ নহে, তাঁহার লালসা কলুষিত নহে। তাহা স্বার্থপরতার গরলশ্বাসে বিষাক্ত নহে। তাহা স্বচ্ছ স্রোতস্বতীর মত, তল পর্য্যন্ত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ; কিন্তু তাহার প্রবাহ ক্ষীণ নহে। ক্ষীণ নহে বলিয়াই বুঝি তিনি মৃণালিনীর মিথ্যা কলঙ্ককাহিনী শ্রবণ করিলে তাহা এমন ভীষণ তরঙ্গময়, কূলপ্লাবিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। বীর-হৃদয় নানা উচ্চাশায় পূর্ণ; কিন্তু প্রেম সে হৃদয়ের সূর্য্যালোক, পৃথিবীর বক্ষে উচ্চ গিরির মত প্রেম সেখানে মহান্, মহিমান্বিত। তাই বুঝি যখন তিনি হৃদয় হইতে মৃণালিনীর স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে চাহিতেছিলেন, তখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। সেইজন্ত সেই সময়ের কথায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে রজনীর উদয় হইয়াছিল, তিনি কেবল তাহাই দেখিতেছিলেন। সে রজনী তখনও জ্যোৎস্না! নহিলে তাঁহার উপাধান আর্দ্র কেন? কেবল মেঘোদয়মাত্র। যাহার হৃদয় আকাশে অন্ধকার বিরাজ করে, সে রোদন করে না।" হেমচন্দ্র যে ব্যাপারের ব্যাপারি, তাহাতে ব্যাপারিরও কষ্ট যথেষ্ট, নহিলে কেন মর্ম্মযাতনাপীড়িত রাজপুত্র বলিবেন :—

"ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরনু বহুদেশ।
কাঁহা মেরে কান্তবরণ, কাঁহা রাজবেশ॥
হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি।
সোহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি॥"

যেখানে ভিন্ন ভিন্ন দিগ্‌গামী একাধিক জলস্রোত মিলিত হয়, পরস্পরকে উন্মত্তভাবে সকলে আবেগে ঘাত প্রতিঘাত করিতে থাকে জলরাশির সেই ফেনিল কলকলনাদমুখরিত মিলনস্থল এক অনির্ব্বচনীয় অশান্ত সৌন্দর্য্যাগার হইয়া উঠে। মানব হৃদয়েও যখন একাধিক ভাব প্রবল হইয়া উঠে, তখন সে হৃদয় এই মিলনস্থানের মত হয়। পশুপতির হৃদয় এইরূপ মিলন স্থল। সে হৃদয়ে মনোরমা-লাভ-লালসা, রাজ্য-লাভ-লালসা, বিবেক-তাড়ন এইকয়টাই বড় প্রবল। কাজেই সেখানেও এক অশান্ত সৌন্দর্য্য, একতীব্র উচ্ছ্বাস। সাধারণ সৌম্যশান্ত সৌন্দর্য্যপ্রিয় পাঠকের নিকট এ সৌন্দর্য্য মধুর বোধ হইবে না—এ আবর্ত্তে তাঁহার হৃদয় বিবশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যেই এক মধুরতা আছে; সকল সৌন্দর্য্য হৃদয়কে আনন্দিত করে। কবি কীট্‌স বলিয়াছেন:—

> "A thing of beauty is a joy for ever :
> Its loveliness increases ; it will never
> Pass into nothingness ;"

সকল প্রকারের সৌন্দর্য্যে যাঁহারা আনন্দানুভব করেন, তাঁহারা নিপুণ চিত্রকর বঙ্কিমচন্দ্রের এই সুন্দর চিত্রে যথেষ্ট মাধুরী দেখিতে পাইবেন, এই চিত্র হইতে যথেষ্ট আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হইবেন। এইরূপ বিপরীত দিগ্‌গামী স্রোতোবেগে মানব হৃদয় কিরূপ হইয়া যায়, পশুপতির চরিত্রে তাহা যেরূপ দেখান হইয়াছে, তাহা সুন্দর।

এই গ্রন্থ মধ্যেও অসাধারণ ক্ষমতাবান চরিত্র আছে। কিন্তু এ চরিত্র সময় সময় অলৌকিক বলিয়া বোধ হইলেও একেবারে দুর্জ্ঞেয় নহে। মাধবাচার্য্যের অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহার আগমনে বিস্মিত হেমচন্দ্র এক স্থানে বলিয়াছেন, "কিন্তু আপনি—কামচর না অন্তর্য্যামী?"

মৃণালিনীর ভাষা এবং গীত সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা না বলিলে বক্তব্য শেষ হয় না। মৃণালিনীর ভাষা অনেকটা প্রাঞ্জল এবং মধুর; তাহার গীতগুলি অতীব মধুর। কবিতা রচনায় যে বঙ্কিমচন্দ্র তেমন ক্ষমতাশালী ছিলেন না, তাহা বহুপূর্ব্বের "ভারতী"র সমালোচক তাঁহার কবিতা-পুস্তক সমালোচনায় সময় দেখাইয়াছেন। কিন্তু মৃণালিনীর সকল সঙ্গীতগুলিই স্থানোপযোগী এবং মধুর। মৃণালিনীর সংশোধিত সংস্করণে লেখকের নাটক রচনায় প্রয়াসের চেষ্টা দেখা যায়।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

গীতোক্ত অবতার-তত্ত্ব।

অবতার হিন্দু ব্যতীত অপর ধর্ম্মেও আছে। কিন্তু হিন্দুর অবতার যেমন সংখ্যায় অনেক এবং প্রকৃতিতে বিভিন্ন, তেমন অন্য কোন ধর্ম্মের নহে। খৃষ্টানের এক খৃষ্ট। বৌদ্ধের বুদ্ধের অবতার সংখ্যায় বহু হইলেও প্রকৃতিতে প্রায় এক, প্রায় সকলই ধর্ম্ম-অবতার। কিন্তু হিন্দুর অবতার না সংখ্যায় এক, না প্রকৃতিতে এক। তাই অপরাপর ধর্ম্মের অবতার-তত্ত্বাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের অবতারতত্ত্ব অনেকটা জটিল। এই জটিল অবতারতত্ত্ব গীতায় যেমন বিশদরূপে ব্যাখ্যাত, তেমন আর কোথাও দেখি না।

ভগবান্ কহিতেছেন :—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনিনী ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব!

(৪।৫।৬।৭ শ্লোক, সপ্তম অধ্যায়)

"ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, আমার প্রকৃতি এই আটরূপে বিভক্ত। হে মহাবাহো! ইহা কিন্তু অপরা (নিকৃষ্টা); ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য একটি জীবস্বরূপ (চেতনময়ী) আমার প্রকৃতি অবগত হও; যে প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে।—সমুদায় ভূত এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা জানিও। আমি প্রকৃতিসমেত জগতের উৎপত্তি ও লয় স্থান। হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই;— সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত আছে।"

ভগবানের দুই প্রকৃতি, এক অহঙ্কারাদিরূপে অষ্টধা বিভক্তা, অপর জীবভূতা। এই দুই প্রকৃতি হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি। সূত্রে যেমন মণিহার তাঁহাতে তেমনি জগৎ। ইহাতেও যেন বলা হইল না। আরও বলিতেছেন :—

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।

(৩৯ শ্লোক, ১০ম অধ্যায়)

"হে অর্জ্জুন, যাহা সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ, তাহা আমি। যে হেতু আমি ব্যতীত যাহা থাকে, এরূপ চর বা অচর ভূত নাই (আমি ছাড়া আর কিছুই নাই)।"

তিনি সর্ব্বভূতের বীজ। বীজের বিবর্ত্তনে যেমন গাছ, তাঁহার প্রকাশে তেমনি বিশ্ব। এ বিশ্বে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি বিশ্বাবতার। কিন্তু বিশ্বের সর্ব্বত্রই কি তিনি সমানভাবে প্রকাশিত?

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
(১৮ শ্লোক, ৫ম অধ্যায়)

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে ও কুকুরে জ্ঞানী-গণ সমদর্শী।"

পণ্ডিতেরা গরু, হাতী, কুকুর, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণে সমদর্শী সত্য কিন্তু এই সমদৃষ্টি, সকলই ভগবৎপ্রকাশ বলিয়া। গরু, হাতী, কুকুর বা চণ্ডালে নাই, ভগবান শুধু ব্রাহ্মণে আছেন, ইহা ভেদবুদ্ধি। এই ভেদবুদ্ধির অভাবই সমদৃষ্টির কারণ, প্রকাশের সমতা সমদৃষ্টির কারণ নহে। নহিলে কেন ভগবান বলিবেন:—

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামাস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥

* * * *

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাংধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবিনামুশনাঃ কবিঃ॥
দণ্ডোদময়তা মস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহং॥
(২১ শ্লোক, ২৭ শ্লোক ৩৩।৩৭।৩৮ শ্লোক ১০ম অধ্যায়

"আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিঃ সকলের মধ্যে কিরণশালী সূর্য্য, মরুৎগণের মধ্যে মরীচি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। আমি বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের মধ্যে চেতনা। আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসের মধ্যে কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে অগ্নি এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে মেরু। হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিও; আমি সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং স্থির জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু এবং বাক্য সকলের মধ্যে এক অক্ষর অর্থাৎ ওঁ কার; যজ্ঞগণের মধ্যে (অজপারূপ) জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়। আমি বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বথ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্ব মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিলমুনি। অশ্বগণের মধ্যে এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমারে অমৃতার্থ ক্ষীরোদমথনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবাঃ এবং ঐরাবত জানিও; মানবগণের মধ্যে আমারে নরাধিপ জানিও।

* * * *

আমি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়; আমি মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে উশনাঃ কবি (শুক্রাচার্য্য)। আমি দমনকারীদিগের নীতি, গুহ্যগণের মৌন এবং তত্ত্বজ্ঞানিগণের জ্ঞান।"

সাধারণ ভাবে সমগ্র বিশ্ব ভগবানের প্রকাশ হইলেও ইহার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও বস্তুতে তিনি বিশেষ ভাবে প্রকাশিত। এই বিশেষ প্রকাশই তাঁহার বিশিষ্টাবতার। যেখানে রূপের বিশেষত্ব, সেখানে রূপ-বিশিষ্ট, আর যেখানে গুণের বিশেষত্ব সেখানে তিনি গুণবিশিষ্ট। তাই ভগবান বলিতেছেন:—

যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্॥
(৪১ শ্লোক, ১০ অধ্যায়)

"ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, অথবা প্রভাব বলাদিগুণ-দ্বারা সমৃদ্ধ যাহা যাহা আছে, তুমি সে সমুদায়ই আমার প্রভাবের অংশ সম্ভূত জানিও।"

জগৎ রূপগুণময়। এখানে আকাশে চাঁদ হাসে, প্রভাতে পাখী গায়, শীতাবসানে বসন্ত ফুলসাজে সাজিয়া দেখা দেয়। মানুষ রণে, শিল্পে ও বিজ্ঞানে নৈপুণ্য প্রকাশ করে। এই রূপগুণের লীলাক্ষেত্র বলিয়াই জগৎ এত সুন্দর। রূপগুণ জগৎ ও জীবের শোভা, জীবশ্রেষ্ঠ মানবেরও শোভা।

কিন্তু ধর্ম্ম তাহার প্রতিষ্ঠা। ধার্ম্মিক লোকেরা মনুষ্যসমাজের ভূষণ-স্বরূপ এ কথা সত্য নয়; তাঁহারা সমাজের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ। এ হেন ধার্ম্মিকেরা যখন নির্য্যাতিত, সমাজের ভিত্তি তখন সঙ্কটাপন্ন। সমাজের এই সঙ্কটে, ধর্ম্মের এই গ্লানিতে ধর্ম্মাবহ পাপঘ্নদের অবতার স্বাভাবিক। তাই ভগবান কহিতেছেনঃ—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
(৭।৮ শ্লোক, ৪র্থ অধ্যায়)

"হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই।"

"সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কর্ম্মীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ইহা তাঁহার যুগাবতার। গীতার এই যুগাবতার সাধুদিগের পরিত্রাতা আর দুষ্কৃতদের বিনাশকর্ত্তা। অধার্ম্মিকদের বিনাশ করিয়া যদি ধর্ম্মসংস্থাপন হয়, তাহা-তেই তিনি প্রবৃত্ত। সমাজের কত অঙ্গ বিনষ্ট হয় ক্ষতি নাই, অবশিষ্ট সমাজ-শরীর রক্ষা হইলেই হইল। এস্থলে ধর্ম্ম বা law আসিয়াছে, প্রেম বা grace আসে নাই। প্রেমকে অগ্রাহ্য করিলে ফল আলিঙ্গন, ধর্ম্ম বা law এর বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম অভিশাপ। গীতায় দুষ্কৃতেরা অভিশপ্ত, বিনাশের জন্য চিহ্নিত। ভগবানের প্রীতি দুষ্কৃতের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে জানে না; সাধুদের লইয়াই পরিতৃপ্ত। তাই ভগবান বলিতেছেন :—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকালোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥
(১৩ শ্লোক—২০ শ্লোক, ১২শ অধ্যায়)

"সর্ব্বভূত সম্বন্ধে অদ্বেষ্টা, মৈত্র এবং কৃপালু, মমতাহীন, নিরহঙ্কার, সুখদুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সদাসন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত, যোগী, মদ্‌বিষয়ে স্থির-লক্ষ্য ও আমাতেই মনবুদ্ধিসমর্পণকারী—(এরূপ) যে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। যাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, আর যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। সকল বিষয়ে নিস্পৃহ, শুচি, অনলস, উদাসীন (পক্ষপাতশূন্য,) চিন্তাশূন্য এবং সংকল্পবিকল্পশূন্য যিনি আমার ভক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি (প্রিয়বস্তু পাইয়া) হৃষ্ট হন না, (অপ্রিয় পাইয়া) দ্বেষ করেন না, (ইষ্ট নষ্টে) শোক করেন না, (অপ্রাপ্ত অর্থ) আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি পাপপুণ্য পরিত্যাগী ও মদ্ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্র এবং মান ও অপমান একরূপ, শীতোষ্ণ সুখদুঃখে বিকারশূন্য, আসক্তিশূন্য, নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাবাপন্ন, মৌনী, যাহা-কিছুতেই সন্তুষ্ট, বাসস্থানবিহীন, স্থিরচিত্ত, এতাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। যাহারা উক্তবিধ এই অমৃতরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধাশীল মৎপরায়ণ সেই ভক্তগণ আমার প্রিয়।"

যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, শ্রদ্ধাশীল ও ভগবৎপরায়ণ সে তো প্রীতিপাত্র হই-বেই ; কিন্তু যে অধর্ম্মাচরণ করে, পাষণ্ড ও পাপাসক্ত, সে কি ভগবানের প্রীতির সীমার বাহিরে ? তবে তো সে প্রেম অপূর্ণ। ইহাতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন হইতে পারে, কিন্তু পাপীর উদ্ধার সম্ভব নয়। এই হেতু গীতায় যুগাবতার প্রেমাবতার নয়। কল কথা সুস্থকে রাখিয়া অসুস্থের কল্যাণ চেষ্টা, পথারূঢ় নিরনব্বইটিকে ছাড়িয়া পথভ্রান্ত একটির অন্বেষণই যে ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায়, তখনও এ ধারণা হয় নাই। মনস্বী ৺বঙ্কিম-চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই গীতোক্ত ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির পরাকাষ্ঠা, চরম অভিব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের এ প্রয়াস বৃথা। গীতার ধর্ম্ম অতিমহান্ হইলেও ইহা হিন্দুধর্ম্মের

উচ্চতম অভিব্যক্তি নয়। গীতার অসম্পূর্ণ অবতারবাদের পূর্ণতা নিতাই চৈতন্তে। যুগাবতার এখানে সাধুর পরিত্রাণের জন্ত নয়, পাপীর পরিত্রাণের জন্ত ব্যস্ত। "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" নয়, "মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?" এই প্রেমাবতারের ভাষা। নিগ্রহের বিনিময়ে এখানে আলিঙ্গন। কিরূপে বলি, আলিঙ্গনের ধর্ম্ম বিনাশের ধর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর নহে? প্রেমাবতার অবতারের চরম। গীতার অবতার প্রেমাবতার নহে; সুতরাং গীতোক্ত অবতারতত্ব অতি মনোহর ও বিশদ হইলেও অসম্পূর্ণ।

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম।

সেকালের পাঠশালা।

গত আগষ্ট মাসের "দাসী"তে, 'সেকালের পাঠশালা' শীর্ষক প্রবন্ধটি অতীব আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। লেখকের সহিত কয়েকটি বিষয়ে আমার মতের ঐক্য না হওয়ার নিমিত্তই আমি নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে প্রতিবাদ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। লেখকের প্রবন্ধটি পড়িয়া আমার মনে যে কয়েকটি ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাই সাধারণের নিকট উপস্থিত করাই আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

১। লেখক বলিয়াছেন :—"আধুনিক পাঠশালাতে আপনি সেই চির-ন্তন চট, চেটাই ও মাদুর আর দেখিতে পাইবেন না। সুদৃঢ়, সুগঠিত কাষ্ঠময় বেঞ্চ সমূহই আজ কাল তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। আধুনিক পাঠশালার গুরুমহাশয়ও অনেক স্থলে ইংরেজি-জুতা পরা, কোট-কামিজ আঁটা, টেরি কাটা নব্যবাবু।"—লেখক মহাশয় বোধ হয় কোন 'সহুরে' পাঠশালা দেখিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। তিনি যদি একবার পাড়া-গাঁয়ে যাইয়া তথাকার পাঠশালা সমূহের অবস্থা দেখিয়া আসিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে এখনও অধিকাংশ পাঠশালায় পূর্ব্বকার ন্যায় "পোড়োরা" মাদুর পাতিয়া বসিয়া 'কয় আকার দিলে কা, কয় ইকার দিলে কি' ইত্যাদি বিবিধ প্রকার শব্দোচ্চারণ করিয়া 'তালপত্র' লিখিতেছে। তাহাদের অনতিদূরে 'ছাট্' (বেত) হস্তে দেবদারুকাষ্ঠ-নির্ম্মিত কেরো-

সিন তৈলের বাক্সের উপর থালিগায়ে গুরুমহাশয় ঘুমের ঘোরে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে সমাসীন আছেন। তিনি থাকিয়া থাকিয়া 'পড়ুয়া'দিগকে বিকট শব্দে তাড়া দিতেছেন। এখনও কোন ছাত্র পাঠশালে না আসিলে অন্যান্য ছাত্রগণ দলবদ্ধ হইয়া যাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতেছে। দুই তিন জনে ধৃত বালকের হস্ত এবং দুই তিন জনে তাহার পদদ্বয় ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িতে পড়িতে তাহাকে পাঠশালায় লইয়া আইসে।

"গুরুমশায়, গুরুমশায় আর বল'ব কি,
বেত্ বোনের আসামী হাজির করে'ছি।
রাম তুলসী, রাম তুলসী, রাম তুলসীর পাতা
গুরুমশায় ক'য়ে দেছেন কাণ মলার কথা।"

—এইরূপে বালকগণ ধৃত বালকের কাণ মলিতে মলিতে তাহাকে পাঠশালায় লইয়া আইসে। সেখানে গুরুমহাশয় বালকের যে দশা করেন, তাহা বুদ্ধিমান পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।

এখনও কদলীপত্রের ঠোঙ্গায় করিয়া বাড়ী হইতে গুরুমহাশয়কে তামাক আনিয়া দিবার রীতি আছে। যে ছাত্র বাড়ী হইতে তামাক না আনিবে, তাহাকে সপাং সপাং শব্দে বেত্ খাইতে হয়। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ এখনও ছাত্রদিগকে চুরীবিদ্যা-শিক্ষা দিতেছেন, কারণ বাবার অথবা কাকার তহবিল হইতে চুরী না করিলে তাহারা তামাক কোথায় পাইবে? কেহ কেহ বাড়ী হইতে পয়সা চুরী করিয়া তদ্দ্বারা তামাক কিনিয়া আনিয়া গুরুমহাশয়ের দারুণ প্রহারের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতেছে।

২। "আধুনিক কোন কোন গুরুমহাশয়ের ন্যায়, তিনি বেলা দশটা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত পাঠশালা করিতেন না এবং রবিবারেও পাঠশালা বন্ধ রাখিবার সঙ্কল্প করিতেন না।"—এখনকার গুরুমহাশয়েরা রবিবারে পাঠশালা করেন না বটে (সে কালের গুরুমহাশয়েরাও এরূপ করিতেন কিনা, সে কথা জানি না), তবে এখনও পাঠশালা সব স্থানেই বোধ হয় দুই বেলাই হইয়া থাকে।—আমরা যখন দেশে থাকি তখন আমরা তথাকার একটি পাঠশালার ঘড়ীর কার্য্য করি। দশটার সময় যখন আমরা এই পাঠশালার নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাই, তখন নামতা পড়া আরম্ভ হয়। এই

নামতা পড়া শেষ হইলেই তাহাদের ছুটী হয়। আবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন আমরা এই পাঠশালার নিকট দিয়া নিকটবর্ত্তী ময়দানে বেড়াইতে যাই, তখন ইহাদের ছুটীর সময় হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইহাদের দুই বেলাই পাঠশালা হয়। এই পাঠশালার গুরুমহাশয়কে আমরা সর্ব্বদাই খালি গায়ে এবং পায়ে থাকিতে দেখি। এই পাঠশালার নিকটে ঘরামিরা কাজ করিতেছিল। আমরা প্রায়ই দেখিতাম, গুরুমহাশয় ওরফে 'ধেনু-গুরু' মধ্যে মধ্যে যাইয়া কলিকা চাহিয়া এক এক দম দিয়া আসিতেছেন।

৩। "একালের পাঠশালায় আপনি কচিৎ সেই পবিত্র 'তালপত্র' ও 'ভক্তি' দেখিতে পাইবেন। ঘৃণ্য শ্লেট পেনসিল এখন তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। ম্যাজেণ্টা ও ভুলেল রংএর দৌরাত্ম্যে এবং ম্যানু-ফ্যাকচারিং কেমিষ্ট্সদের জ্বালায় আজ কাল বেচারা বালকেরা ভূষা ও ও বাবলা আটা মাড়িয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণা চাকচিক্যময়ী মসী প্রস্তুত করিবার আমোদটি পর্য্যন্ত সম্ভোগ করিবার আমোদ পায় না।" এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না। কারণ এখনও 'তালপত্র' প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। 'কদলীপত্র' লিখিবার রীতি এখনও আছে বটে, তবে অনেক কমিয়াছে। সে কালের পাঠশালায় প্রথম 'তালপত্র' পরে 'কদলীপত্র' তৎপরে কাগজে লিখিতে হইত। এখন প্রায়ই 'তালপত্র' ছাড়িয়াই কাগজ লিখিতে আরম্ভ করিতে হয়। সে কালে 'তালপত্র' ছাড়িয়া 'কদলীপত্র' ধরিবার সময় এবং 'কদলীপত্র' ছাড়িয়া কাগজ ধরিবার সময় গুরুমহাশয়দের যে ঘোর অত্যাচার ছিল, তাহা এখন অনেক কমিয়াছে বটে। তখন থালা, ঘটী, বাটী, কলসী ইত্যাদি না দিলে গুরুমহাশয় কিছুতেই 'কদলীপত্রে' অথবা কাগজে উন্নীত করিতে স্বীকার পাইতেন না। এখন সেটা প্রায় নাই, একথা স্বীকার করি। কিন্তু যে বেচারা পয়সা খরচ করিয়া বালকদিগকে ইংরাজি স্কুলে পড়াইতে অক্ষম, তাহার উপর অত্যাচারটা এখনও প্রায় সমভাবেই রহিয়াছে।

এখনও বালকগণ রন্ধনশালায় গমনপূর্ব্বক 'ঝিনুক' দ্বারা ভাতের হাঁড়ির তলা আঁচড়াইয়া তদ্দ্বারা লিখিবার কালী প্রস্তুত করে। এখনও বালক-দিগকে 'হরিতকী', 'জায়ফল' ইত্যাদি দ্বারা কালী করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এত যে বিভিন্ন প্রকারের লিখিবার কালী বাজারে মিলিতেছে, তবুও এখনও বালকেরা 'কাঠ পোড়ান' কয়লা দ্বারা কালী প্রস্তুত করিয়া,

তন্মধ্যে ছেঁড়া নেকড়া ভিজাইয়া ঐ নেকড়া দোয়াতের মধ্যে ভরিতেছে, কারণ তাহা না হইলে যদি কালী পড়িয়া যায়।

৪। "গুরু মহাশয়ের হুকুম, স্লেটের সঙ্গে একটু সিক্ত ছিন্ন বস্ত্র বাঁধিয়া রাখ, তদ্বারাই স্লেট মোছা যাইবে।" মুখের থুথুর বিষয়টা কি লেখক মহাশয় একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন নাকি? আমার ত বেশ স্মরণ আছে, যে পাঠশালা হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় আমার জিহ্বা একেবারেই শুষ্ক হইয়া যাইত।

লেখক মহাশয় যে 'সহরে' পাঠশালার কথা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ তিনি অনেক সময় পাঠশালা হইতে পলাইয়া প্যারেড্ দেখিতে যাইতেন। আমার কিন্তু সে সুবিধা ছিলনা। আমি হদ্দ বিপিন ধোপা অথবা যদু নন্দীর সহিত জগীর মা'র বাগানের জাম অথবা কুল চুরী করিয়া খাইতে যাইতাম। পাঁওরুটীর উল্লেখও লেখক করিয়াছেন, কিন্তু তখন আমরা পাঁওরুটী কাহাকে বলে তাহা জানিতাম না। এখনকারও অনেক পাঠশালার ছাত্র বোধ হয় পাঁওরুটী চক্ষেও দেখে নাই।

লেখক 'ভূতবাঁধার' বিষয়টা হয়ত জানেননা, অথবা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের দেশীয় পাঠশালায় এরূপ 'ভূতবাঁধার' রীতি প্রচলিত ছিল কিনা, তাহা জানি না। আমরা কিন্তু প্রত্যহ স্কুলে যাইবার সময় ছোট ছোট আ-গাছার পত্র সমূহ একত্র করিয়া একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভূত বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতাম।

আমাদের গুরুমহাশয় পাঠশালায় আসিবার সময় বাজার খরচা সঙ্গে লইয়া আসিতেন। অবশ্য সকালকার পাঠশালার অধিবেশনেই এরূপ করিতেন। যাই স্কুলের নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া বাজারে মৎস্য, তরকারী, ইত্যাদি যাইতেছে দেখা যাইত, অমনি গুরুমহাশয় আমাদিগকে নামতা পড়িতে হুকুম দিতেন। নামতা পড়া শেষ হইলেই আমাদের ছুটী হইত। আমাদের মধ্য হইতে পর্য্যায়ক্রমে ২।৩ জনকে প্রত্যহ গুরুমহাশয়ের সহিত বাজারে যাইতে হইত এবং তাঁহার ক্রীত জিনিষাদি তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হইত। ২।৩ জন বাদ্যকরের ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়িত। গুরু মহাশয়ের বাড়ীতে কোন শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেই ইহাদের আত্মীয় স্বজনকে যাইয়া বিনা পয়সায় গুরুমহাশয়ের বাড়ীতে

বাজাইয়া দিয়া আসিতে হইত। জন কয়েক ঘরামির ছেলেও আমাদের সঙ্গে পড়িত। বর্ষা কালে গুরুমহাশয়ের ঘরের খড় উড়িয়া গেলে ইহাদের আত্মীয় স্বজনকে যাইয়া ঐ ঘর মেরামত করিয়া দিয়া আসিতে হইত। এইরূপে ধোপাকে বিনা পয়সায় কাপড় কাচিতে হইত, নাপিতকে কামাইতে হইত—ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের সুবিধা আমাদের গুরুমহাশয়ের ছিল।

আমাদের গুরুমহাশয় এক প্রকার নূতন শাস্তির বিধান করিতেন। অপরাধী বালককে একটা চাউলের বস্তার ভিতর পুরিয়া তন্মধ্যে এক প্রকার পোকা ভরিয়া দিতেন। ঐ পোকার কামড়ে বালকের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইত। অথবা ঐ প্রকারে বস্তার মধ্যে ভরিয়া, মুখ মাত্র বাহিরে রাখিয়া সমস্ত দিবসের জন্য জলের ভিতর বসিয়া থাকিতে হইত। বলা বাহুল্য এবম্বিধ দুই প্রকার অবস্থাতেই বস্তার ভিতর বালকের হাত পা বাঁধা থাকিত। পৃষ্ঠোপরি তৈল মর্দ্দন করিয়া তদুপরি বেত্রাঘাত করাই আমাদের গুরুমহাশয়ের রীতি ছিল। এখন আর এসব দেখা যায় না।

উপসংহারে আমাদের গুরুমহাশয়ের একটু বিদ্যার পরিচয় দেওয়া উচিত মনে করিতেছি। আমাদের পাঠ্যপুস্তকের এক স্থানে ছিল :—

"দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?" গুরুমহাশয় তাহার অর্থ করিতেন :—"হে মহীতে ! দুঃখ বিনা সুখ কি হয় ?" একবার আমরা গুরুমহাশয়কে 'দুষ্কর্ম্ম' এই কথাটার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি একথাটার এইরূপ অর্থ করেন :—"দুঃ ছিল কর্ম্ম = দুষ্কর্ম্ম ; অর্থাৎ কিনা যে কর্ম্ম দূরে, বহুদূরে সাধিত হয় "—ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ সাহিত্য এবং ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ আমরা এই গুরুমহাশয় হইতে করিয়াছি।

তবে আমাদের গুরুমহাশয়ের দুইটি বিশেষ গুণ ছিল।

প্রথম :—সব-ইন্‌স্পেক্টর বাবু স্কুল দেখিতে আসিয়া আমাদিগকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে গুরুমহাশয় দূরে দাঁড়াইয়া বিবিধ প্রকারের ভাব ভঙ্গী করিয়া আমাদিগকে ঐ প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিতেন। যথা :—প্রশ্ন—২ × ৪ কত ?—গুরুমহাশয় দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার এক হস্তের ৫টী অঙ্গুলি ও অপর হস্তের ৩টী অঙ্গুলি দেখাইতেন। ইহা দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারিতাম যে প্রশ্নের উত্তর ৮। আমরা গুরুমহাশয়ের এরূপ ভাবভঙ্গীর তাৎপর্য্য গ্রহণে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত ছিলাম এবং আমাদের উপর গুরুমহাশয়ের এরূপ কড়া হুকুম

ছিল যে কেহ স্কুল পরীক্ষা করিতে আসিয়া কোনরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ গুরুমহাশয়ের পানে তাকাইতে হইবে।

দ্বিতীয় ঃ—গুরুমহাশয় আমাদিগকে পাঠশালায় যতই প্রহার করুন না কেন, আমার পিতা, মাতা প্রভৃতি কেহ তাঁহাকে আমার বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বালক বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই-রূপে সকল বালককেই তিনি তাহাদের পিতা মাতার নিকট উত্তম বালক বলিয়া পরিচিত করিতেন। গুরুমহাশয় পারিতোষিকের লোভে অথবা অন্য কোন কারণে এরূপ করিতেন, তাহা তখন বুঝিতাম না, তবে এখন একটু একটু বুঝিতে পারি।

এখনকার পাঠশালা গৃহ মধ্যেই হয়। তখনকার পাঠশালা শীতকালে আমতলায় রৌদ্রে হইত।

শ্রীরাসবিহারী সেন।

সেবা-সংবাদ।

গত রবিবার [৯ই ভাদ্র] দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বৈদ্যনাথে রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম উন্মুক্ত করিয়াছেন। সাঁওতাল পরগণার ডিপুটী কমিশনর ও স্থানীয় সমস্ত ভদ্র লোক এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া, সাধারণকে এই অনুষ্ঠানে সাহায্যের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, "হিন্দুমাত্রেরই হিন্দুর এই পবিত্র তীর্থে কুষ্ঠ রোগীদিগের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক তীর্থযাত্রী যদি অন্ততঃ চার আনা করিয়া ঐ কার্য্যে দান করেন, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় অর্থ অনায়াসেই সংগৃহীত হইতে পারে। আমি সকলকেই এই অনুষ্ঠানে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করি।" মহারাজা নিজের নামে এক হাজার ও আপনার জননীর নামে ৫০০, এই দেড় হাজার টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। কুষ্ঠাশ্রমের কমিটীর হস্তে এক্ষণে প্রায় আট হাজার টাকা মজুত আছে; আরও প্রায় তিন হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষর আছে। কিন্তু ইহার সুদে ২৪ জন রোগীর সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে না। আর পঞ্চাশ হাজার টাকা এজন্য আবশ্যক। বৈদ্যনাথের ন্যায় স্থানে পঞ্চাশ হাজার টাকা আশা করা অসম্ভব নহে। প্রতি বর্ষে বৈদ্যনাথে যে

তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়, তাঁহারা প্রত্যেকে এক আনা করিয়া দিলে তিন চারি বৎসরে এই অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে। স্বয়ং আমার মহারাজা যাহাতে কৃপা-দৃষ্টি দিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সুসম্পন্ন হইবে। আমাদিগের পাঠকদিগকেও আমরা তাঁহাদিগের সাধ্যানুসারে একার্য্যে সাহায্যের জন্ত অনুরোধ করি। যিনি যাহা পাঠাইতে চাহেন, দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও কুষ্ঠাশ্রম কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর নামে পাঠাইবেন।—বঙ্গবাসী।

দাসাশ্রম।

উদ্দেশ্য।—নানাপ্রকারে বিপদ্গ্রস্ত মানবগণের সাধ্যানুসারে হিত-সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ ইহা অনাথ আতুরদিগকে আশ্রয় দিয়া, তাহাদিগের ভরণপোষণ ও সেবার বিধান করিয়া থাকে।

সাধারণ বিভাগ।—সেবালয়—ইহা গিরিডিতে অবস্থিত।

"দাসী" বিভাগ।—জন-হিতৈষণা প্রবর্ত্তনা ও দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ প্রচার ও দাসাশ্রমের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্ত এই বিভাগ হইতে "দাসী" নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক-মাশুল সমেত ২৲ টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়।

ডিস্পেন্সারি বিভাগ।—দাসাশ্রমকে ঔষধ সাহায্য করিবার জন্ত ও ইহার স্থায়ী এবং পাকা আয়ের সংস্থান করিবার জন্ত ইহার এলো-প্যাথিক ডিস্পেন্সারি আছে। ঠিকানা, ৮৬, হারিসন রোড, কলিকাতা।

কার্য্যপ্রণালী।—ইহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া সম্প্রতি ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। ভগবানের কৃপার উপর বিশিষ্টরূপে নির্ভরশীল এবং সকলে একমত ও একপ্রাণ হইয়া যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা ও কার্য্যে সেইরূপ চেষ্টা করা হয়।

দাসী

তুকারাম।

দশম প্রস্তাব।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রজাতির কিরূপ উন্নতি ঘটিয়াছিল, পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা তাহার আভাষ প্রদান করিয়াছি। সূর্য্যের প্রথম রশ্মি পৃথিবীতে নিপতিত হইবার পূর্ব্বে, আলোকমণ্ডিত আকাশ যেমন তাঁহার উদয় সূচনা করে, সেইরূপ কোন দেশপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে দুই একজন পূর্ব্বগামী সাধুপুরুষ তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রচার করিয়া রাখেন। এই সকল সাধুপুরুষদিগের দ্বারা উত্তরকালীন মহাপুরুষদিগের পথ পরিষ্কৃত হয়। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে সেণ্টজনের আবির্ভাব ইহার সর্ব্বজন-পরিচিত উদাহরণ। আমাদিগের বঙ্গদেশেও শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে শ্রীবাস, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তগণ তাঁহার আগমনসূচক ভেরী নিনাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যাংশে সুপ্রসিদ্ধ একনাথ স্বামী* মহারাষ্ট্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তিরোভাবের সমকালেই রামদাস স্বামী আবির্ভূত হন এবং তাঁহার পরেই তুকারামের অভ্যুদয়। বঙ্গদেশে যেমন শ্রীচৈতন্যের সমকালে নিত্যানন্দ, সনাতন, হরিদাস প্রভৃতি অনেক সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রদেশেও তেমনই জয়রাম স্বামী, রঙ্গনাথ স্বামী, কেশব স্বামী, বোধ্‌লে বাবা প্রভৃতি ভক্তসাধুগণ তুকারামের সমকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের ন্যায় ইহারাও ভক্তিহীন ক্রিয়াকাণ্ডের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া, ধর্ম্মের সরলভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যপ্রণোদিত ধর্ম্মের ন্যায় ইহাদিগেরও প্রচারিত ধর্ম্ম কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভক্তিগুণে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই মুক্তির অধিকারী, এই মহাসত্য তাঁহারাও প্রচার করিয়াছিলেন। তুকারাম যে শূদ্র হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত

---

* ইহার পরিচয় এবং ইহার সম্বন্ধে কয়েকটী আখ্যান ৪র্থ প্রস্তাবে (দাসীর ৪র্থ ভাগ ২য় সংখ্যায়) প্রদত্ত হইয়াছে।

সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ইহাঁদিগেরই ব্যবহারের ও উপদেশের ফল। হিন্দুধর্ম্ম সংস্কার-বিরোধী, এই অধুনা প্রচলিত বিশ্বাস সত্য নয়। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের মধ্যেও এমন কোন কোন উদারচেতা ধর্ম্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ের সমাজ-সংস্কারক-দিগের কার্য্য তাঁহাদিগের কার্য্যের অপেক্ষা অধিকতর উদারতার পরিচায়ক কি না সন্দেহ। জাতিভেদ ভারতের জাতিসাধারণের সম্মিলনের প্রধান অন্তরায় বলিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট চিরদিন নিন্দিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আহারে ও সামাজিক ব্যবহারে জাতিভেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেও ভারতবাসিগণ জাতি বিচার করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিকের সম্মাননায় কুণ্ঠিত নহেন। ধার্ম্মিকব্যক্তি যে জাতিতেই উৎপন্ন হউন, তিনি ভারতবাসীর শ্রদ্ধাপাত্র ও ব্রাহ্মণোচিত সম্মানে সম্মানিত। ব্রাহ্মণত্বপ্রধান ভারতের অনেকগুলি প্রধান ধর্ম্মপ্রচারকও ব্রাহ্মণেতর জাতিতেই উৎপন্ন। বুদ্ধ ক্ষত্রিয়, নানক (কেহ কহ বলেন ক্ষত্রিয়) তুকারাম শূদ্র, কবীর জোলা, তিরু-বল্লিয়ার পারিয়া বা চণ্ডাল।* ইহাঁদিগের সমকালীন ব্যক্তিগণ ইহাঁদিগকে দেবতার ন্যায় সম্মান করিতেন এবং এখনও ইহাঁরা দেবোচিত আদর প্রাপ্ত হইতেছেন। তুকারাম শূদ্র হইয়াও কি জন্য তাদৃশ সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এই সকল কথা বলিতেছি। আরও একটী কারণ আছে। তুকারামের সমকালবর্ত্তী হিন্দু-সাধুগণের ন্যায় কয়েকজন মুসলমান সাধুরও নাম আমরা মহীপতির গ্রন্থে উল্লিখিত দেখিতে পাই। মুসলমান হইয়াও, ইহাঁরা হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং হিন্দুসাধুগণের ন্যায় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সেখ মহম্মদ নামক কোন মুসলমান সাধুকে তুকারাম ও রামদাস স্বামী প্রভৃতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিতেন। আজন্ম হিন্দুর ন্যায় তিনিও হিন্দু-তীর্থক্ষেত্রে সম্মিলিত সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেন।† এখন যেমন "পার্লামেণ্ট অফ্ রিলিজন্" বা ধর্ম্ম মহাসভা আহ্বান করিয়া, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতামত জ্ঞাত হইবার

* ইনি তামিলভাষীদিগের তুকারাম। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ইহাঁর মূর্ত্তি দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া থাকে।

† এখনও এভাব ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই। আমাদিগের কোন পরিব্রাজক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে, হিমাচলস্থিত "ব্যাস গুহার" নিকটে এখনও কোন মুসলমান সাধু বাস করিতেছেন। ইহাঁর প্রতিবাসী সাধুগণ ইহাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন এবং অনেক সময় ইহাঁর আশ্রমে আসিয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনা করেন।

চেষ্টা হইতেছে, ভারতের পূর্ব্বকালীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণও এইরূপ কোন তীর্থক্ষেত্রে তদধিষ্ঠাতা দেবতার উৎসবে সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন ও মানসিক ভাবের আদান প্রদান দ্বারা নিজের নিজের ধর্ম্মমত গঠিত ও মার্জ্জিত করিয়া লইতেন। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র পণ্ঢরপুরে অনেকবার এইরূপ সাধু-সম্মিলন হইয়াছিল। একবার বিঠোবার যাত্রা উপলক্ষে নানাস্থান হইতে ভক্তগণ পণ্ঢরপুরে সম্মিলিত হইলে, তুকারামও সেখানে উপস্থিত হইলেন। এখানে রামদাস স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রামদাস স্বামী সে সময় মহারাষ্ট্রদেশের অগ্রগণ্য সাধুপুরুষ ও ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধির জন্য এবং শিবাজীর দীক্ষাগুরু বলিয়া তাঁহার সম্মানের সীমা ছিল না। তুকারাম এবং রামদাস স্বামী উভয়েই পরস্পরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, সুতরাং এই সাক্ষাতে উভয়েই পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। প্রত্যেক সাধুই আপন আপন পন্থানুযায়ী পূজা, অর্চ্চনা ও প্রচার আরম্ভ করিলে, তুকারামও তাঁহার অভ্যাসানুরূপ সংকীর্ত্তন ও কথকতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সংকীর্ত্তনে সমাগত তীর্থযাত্রিগণ ও সাধুমণ্ডলী বিমুগ্ধ হইলেন। একদিন সাধুগণ তুকারামকে তাঁহার পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলে, তুকারাম নিম্নলিখিত অভঙ্গে তাঁহাদিগের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ;—

শূদ্র জাতি, করিতাম বৈশ্য ব্যবসায়।
পূজিতাম কুলপূজা দেব বিঠোবায়॥
আত্মকথা সাধুগণ বলিবারে নাই।
কিন্তু জিজ্ঞাসিছ সবে কহিতেছি তাই॥
পিতামাতা পরলোকে করিলে গমন।
সহিলাম নিদারুণ দুঃখের পীড়ন॥
দুর্ভিক্ষের গ্রাসে মোর গেল ধন মান।
অন্ন বিনা জ্যেষ্ঠা পত্নী ত্যজিলেন প্রাণ॥
বড় লজ্জা হ'ল, কিন্তু কি করিব হায়।
ক্ষতি হ'ল, করিলাম যত ব্যবসায়॥
নিদারুণ ক্লেশ আর না পারি সহিতে।
করিলাম স্থির এই বিচারিয়া চিতে॥
বিঠোবার ভগ্ন গৃহ সংস্কারি যতনে।
কাটাইব কাল সেথা ভজন সাধনে॥
একাদশী দিনে আরম্ভিনু সংকীর্ত্তন।
অভ্যাস আমার তাহে না ছিল কখন॥
সাধুগণ বিরচিত গুটী কত গান।
লইনু কণ্ঠস্থ করি হ'য়ে ভক্তিমান॥
সুগায়কগণ যবে গাইতেন গীত।
ধ্রুবা ধরিতাম আমি হ'য়ে শুদ্ধ চিত॥
সাধু-পাদোদক নিত্য করিতাম পান।
লোকভয় অন্তরেতে না দিতাম স্থান॥
কায়মনোবাক্যে দেহ স'পি আপনার।
করিতাম যথাসাধ্য পর উপকার॥
জন্মিল বিরাগ মোর সংসারের প্রতি।
আত্মজন বাক্যে আর না রহিল প্রীতি॥
সত্যাসত্য সাক্ষী করি আপনার মনে,
লোকের গঞ্জনা বাক্য না শুনি শ্রবণে,
স্বপ্নে গুরুদত্ত মন্ত্র করিয়া গ্রহণ,
করিলাম হরিনামে বিশ্বাস স্থাপন॥
কবিত্ব শকতি ক্রমে উপজিল মনে।
স্থাপন করিনু চিত্ত বিঠোবা চরণে॥
হইল নিষেধ পরে কবিতা লেখায়।
বড় কষ্টে কয় দিন গিয়াছিল তায়॥

নিক্ষেপিয়া গ্রন্থ মোর ইন্দ্রায়ণী নীরে।
ত্যজিতে পরাণ গেনু বিঠোবা মন্দিরে॥
অপার করুণাসিন্ধু দেব নারায়ণ।
কহিলেন মোরে সেথা আশ্বাস বচন॥
বিস্তারিয়া কহি যদি সব বিবরণ।
বিলম্ব ঘটিবে বহু, কিবা প্রয়োজন॥
যে দশায় আছি এবে প্রত্যক্ষ সকল।
ভবিষ্যতে কি ঘটিবে জানেন বিঠ্ঠল॥
কৃপাময় হরি মোর নিজ ভক্তগণে।
না ত্যজেন, স্থির হইয়া বুঝিয়াছি মনে॥
তুকা বলে পাণ্ডুরঙ্গ যে কথা সকল।
বলালেন, তাই মাত্র আমার সম্বল॥

তুকারামের বিনীত ব্যবহার ও অকৃত্রিম ভক্তি দর্শন করিয়া, সাধুগণ সকলেই পরমপ্রীত হইলেন। তাঁহার বৈরাগ্যের ও নিঃস্বার্থতার জন্য তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন, এবং তাঁহাকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিতেন। আত্মাভিমানশূন্য সরলস্বভাব তুকারামের সে প্রশংসা ভাল বোধ হইত না। তিনি একদিন একটী অভঙ্গে সাধুগণের নিকট বলিলেন;—

এই নিবেদন মোর শুন সাধুগণ।
অধম পতিত আমি অতি অভাজন॥
আমারে সম্মান হেন উচিত না হয়।
এত সমাদর মোর যোগ্য কভু নয়॥
আমি যে কেমন মোর চিত্ত জানে তাই।
সত্য, সত্য, আজও মোর মুক্তি ঘটে নাই॥
নিজ মনে একজন একভাবে থাকে।
বাহিরের লোক তারে অন্যভাবে দেখে॥
আত্মপরিচয় কিবা দিব, সাধুগণ।
সংসার করিল মোরে বহু নিপীড়ন॥
লাঙ্গুল মর্দ্দন করি বলীবর্দ্দগণে
পারি নাই ব্যবসায়ে পোষিতে স্বজনে॥*
তাই এ বৈরাগ্য ব্রত করেছি গ্রহণ।
কি প্রশংসা ইথে মোর আছে সাধুগণ॥
স্বভাবতঃ অর্থ মোর হয়েছিল ক্ষয়।
অন্ন মাত্র দানে শুধু করিয়াছি ব্যয়॥
পত্নী পুত্র প্রতি আমি হইয়া উদাস।
হীনবুদ্ধি, মন্দভাগ্য করেছি প্রকাশ॥
সরম হইল বড় দেখাতে বদন।
আশ্রয় লইনু তাই বিজন কানন॥
আপন উদর জ্বালা পালিবার তরে।
নির্ম্মম হইনু, ভুলি আত্ম পরিবারে॥
না ছিল উপায় বনে গিয়াছিনু তাই।
প্রশংসার কথা ইথে কিছুইত নাই॥
থাকিতাম দিবানিশি উদাসীন মনে।
"হাঁ" দিতাম, না বিচারি লোকের বচনে॥
পূর্ব্ব পিতৃগণ মোর ছিলা ভক্তিমান।
তেঁই আমি বিঠোবায় স'পিয়াছি প্রাণ॥
আমি যে বৈরাগ্য ব্রত করেছি গ্রহণ।
সে কেবল সংসারের সহি নিপীড়ন॥
কিন্তু সাধুগণ মোর চিত্ত এই চায়।
ভক্তিগুণে যেন কেহ এই পথে ধায়॥

তুকারাম যে কিরূপ সাধুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার এইরূপ উন্মুক্তহৃদয়ে আত্মগতভাব প্রকাশের চেষ্টায়ই তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তুকারাম প্রতিদিনই পণ্ঢরীপুরের উৎসবে সংকীর্ত্তন করিতেন। একদিন নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী সংকীর্ত্তন করিলেন :—

কি আর বলিব, বলহ সকলে, ধরম করম নীতি
সার কথা এই, বিঠোবা চরণে, রাখ সদা স্থিরমতি॥

---

* ব্যবসায়ীগণ দ্রুতগমনের জন্য আপনাদিগের ভারবাহী বলীবর্দ্দদিগের লাঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া থাকে। তুকারামের এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, এমন কি বলীবর্দ্দদিগকে প্রহাররূপ অধর্ম্ম কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াও সংসার প্রতিপালন করিতে পারি নাই। তবে আমার সংসারত্যাগের জন্য প্রশংসা কি?

এ জগত মাঝে, যাহা কিছু আছে, ক্ষর অক্ষর রূপ ;
পণ্ঢরীনাথ, সার তাহার, সে চরণে কর নতি ॥
আগম জলধি, মন্থনে যদি, উঠিল এ নবনীত ;
সার ভাবিয়া, হৃদয়ে রাখিয়া, দিবানিশি কর প্রীতি ॥

সেদিন প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। পরদিন সমবেত সাধুগণের উপরোধে রামদাস স্বামী স্বয়ং সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। সাতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ সঙ্কীর্ত্তন ও উৎসবের পর পূর্ণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের আদর্শে সাধুগণ (দধিকাদা) উৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধুদিগের মধ্যে কেহ নন্দ, কেহ যশোদা, কেহ বাল-গোপাল সাজিলেন। তুকারাম গোপবালক হইলেন। যিনি যে ভাবে অভিনয় করিতেন, তুকারাম তৎক্ষণাৎ নব নব অভঙ্গ রচনা করিয়া তাঁহার অভিনীত সেই সেই ভাব আরও পরিস্ফুট করিতেন। দেশপ্রসিদ্ধ, পলিত-কেশ সাধুগণ এইরূপ বালকের ন্যায় সরলভাবে নৃত্যগীতাদির দ্বারা উৎসবানন্দ ভোগ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। তুকারামের বিনীত ব্যবহারে ও সঙ্কীর্ত্তনের গুণে অনেক নীরস হৃদয়ও আর্দ্র হইল। রামদাস স্বামী একজন "রামায়ৎ" সন্ন্যাসী ছিলেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত, উচ্চবংশজাত ব্রাহ্মণ এবং শিবাজীর গুরু বলিয়া তিনি প্রথমাবস্থায় কিঞ্চিৎ ধর্ম্মাভিমানী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি ভিন্ন অপর কোন দেবমূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন। কিন্তু পণ্ঢরীপুরের সাধুসম্মিলনের পর হইতে তাঁহার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। মূর্ত্তিমান্ ভক্তি-ধর্ম্মরূপী তুকারামকে দর্শন করিয়া এবং সমাগত সাধুগণের নিষ্ঠা, প্রেম ও পরস্পরের প্রতি উদ্ধতভাবশূন্য ব্যবহার আলোচনা করিয়া তাঁহার আত্মা-ভিমান খর্ব্ব হইল। পণ্ঢরীপুরে আগমন করিয়া বিঠলের মূর্ত্তি দর্শনে তিনি বলিয়াছিলেন, "হে মনোমোহন মেঘশ্যাম শ্রীরাম, চাপ বাণ পরিত্যাগ করিয়া তুমি এখানে ইষ্টকোপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছ কেন ?" কিন্তু পণ্ঢরী-পুর হইতে প্রতিগমনের সময় তিনি বলিলেন, "সকল স্থানই দেবসত্তায় পরিপূর্ণ, তবে কোন্ তীর্থে গমন করিব ?" অনেকে অনুমান করেন যে তুকারামের সহিত পরিচয়ই রামদাস স্বামীর এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ। ইহার পরও রামদাস স্বামীর সঙ্গে তুকারামের কয়েকবার পণ্ঢরীপুরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। একবার উত্থানএকাদশীর উৎসব উপলক্ষে সমস্ত সাধুগণ সম্মিলিত হইলে, শিবাজীও সেখানে আগমন করিলেন। প্রাচীনকালের

নরপতিদিগের ন্যায় শিবাজী সমাগত সাধু সন্ন্যাসীদিগের যথারীতি অভ্যর্থনা ও সংকার করিলেন এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মকার্য্য যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য উৎসবক্ষেত্রে সানুচর বর্ত্তমান রহিলেন। এই সকল উৎসব-ক্ষেত্রে সাধু সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় সন্ন্যাসিনীগণও উপস্থিত থাকিতেন। আকাবাই নাম্নী রামদাস স্বামীর কোন শিষ্যার কথা মহীপতির গ্রন্থে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এই উপলক্ষ্যে সমাগত ব্যক্তিদিগকে রামদাস স্বামীর প্রণীত "দাসবোধ" নামক কোন অধ্যাত্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। পণ্ডরীপুরের উৎসবের পর আমরা তুকারামকে আরও একটী উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিতে পাই। শিবাজী পরলীগড় নামক কোন গিরিদুর্গে রামচন্দ্রের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, মহারাষ্ট্রদেশের প্রসিদ্ধ সাধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তুকারাম সেখানে উপস্থিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন ও কথকতা দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। শিবাজী স্বয়ং এবং আকাবাই, বেণুবাই, বহিনাবাই প্রভৃতি রামদাস স্বামীর কয়েকজন ধর্ম্মানুরাগিনী শিষ্যাও এই উপলক্ষ্যে সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই উৎসব-ক্ষেত্রে অনেক সঙ্গীতপারদর্শী ও ভক্তিমান ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু তুকারামেরই সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর হওয়াতে, প্রায় এক মাসকাল সকলে তাঁহারই সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। উৎসব শেষ হইলে, শিবাজী সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধুসন্ন্যাসীদিগের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারামেরও অর্চ্চনার জন্য তিনি স্বর্ণমুদ্রা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু তুকারাম যে হঠাৎ কোথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। শিবাজী তুকারামকে চারিখানি গ্রাম দান করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তুকারামের অন্তর্দ্ধানে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না। তিনি রামদাস স্বামীর নিকট তুকারামের ব্যবহার সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিলে রামদাস স্বামী তাঁহাকে বলিলেন,"বৎস ধার্ম্মিকদিগের নিকট ত্রৈলোক্যেরও সম্পদ তুচ্ছ। তুকারাম মহাসিদ্ধিকেও পদাঘাত করিয়া নিষ্কামভাবে বিঠোবার ভজনে রত আছেন। চতুর্ব্বিধ মুক্তিও তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর; এই সামান্য পার্থিব সম্পদের তাঁহার নিকট মূল্য কি ?" মহীপতি বলেন যে তুকারামের নিস্পৃহতা দর্শন করিয়া রামদাস স্বামী বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তুকারামের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

তুকারাম প্রত্যেক বৎসর আষাঢ়ী ও কার্ত্তিকী একাদশী উপলক্ষে পণ্ঢরপুরে গমন করিতেন। একবার পীড়ার জন্য তিনি সেখানে গমন করিতে পারেন নাই। দৈনিক অন্ন জল প্রাপ্ত না হইলে, তুকারামের ক্লেশ বোধ হইত না, কিন্তু নিরূপিত ধর্ম্মচর্চ্চায় কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিলে তিনি একবারে অস্থির হইয়া পড়িতেন। একাদশীর দুই চারিদিন পূর্ব্বে যখন অন্যান্য সকলে পণ্ঢরপুরে গমনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, তখন তুকারাম মাতৃদর্শনোৎসুক বৎসের ন্যায় অধীর হইতে লাগিলেন। তিনি কেবলই ভাবিতেন, 'হায়! আমি এমনই অধম যে এই পুণ্য দিনে বিঠোবার দর্শনে বঞ্চিত হইলাম।' ক্রমে পণ্ঢরপুরে যাত্রার নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে, তুকারামের শিষ্য ও অনুচরগণ সমারোহের সহিত ধ্বজপতাকা ও বাদ্যভাণ্ডসহ যখন তাঁহার গৃহের সমীপবর্ত্তী হইলেন, তখন তুকারাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অতি কষ্টে আপনার গৃহের বহির্দ্দেশস্থ রাজপথে আসিয়া, শিষ্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা গিয়া বিঠোবাকে বলিবে যে, আমি তাঁহার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি আমাকে এবার তাঁহার দর্শনসুখে বঞ্চিত করিলেন। তাঁহাকে বলিও, তিনি যদি আমাকে এখনও একটু বল দেন, আমি ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি এবং ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া নৃত্য করি। তোমরা বিঠোবাকে আমার এই পত্র দিও।" এই বলিয়া তিনি ২৪টী অভঙ্গ শিষ্যদিগের হস্তে প্রদান করিলেন।

তুকারাম এই সকল অভঙ্গ বা পত্র শিষ্যদিগের হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিলে, তাঁহারা পণ্ঢরপুরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে তুকারামের দারুণ ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। তিনি সেই পীড়িত অবস্থায়ও ধীরে ধীরে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া অল্পে অল্পে চলিতে লাগিলেন। শেষে তুকারাম গমন শক্তির অভাবে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। তুকারামের কোন চরিতাখ্যায়ক বলেন যে, মাতা যেমন শ্বশুরালয়গামিনী দুহিতাকে বিদায় দান করিয়া, চক্ষুর অন্তরাল না হওয়া পর্য্যন্ত সজলনেত্রে সেইদিকপানে চাহিয়া থাকেন এবং দুহিতাও যেমন অশ্রুমোচন ও পিতৃভবনের দিকে পুনঃপুনঃ গ্রীবাবর্ত্তন করিতে করিতে পতিগৃহাভিমুখে অগ্রসর হন,

তুকারাম ও তাঁহার শিষ্যগণ সেইরূপ পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর তুকারামের শিষ্যগণ পন্ঢরপুরে গমন করিয়া তুকারামের পত্র বা প্রেরিত অভঙ্গসমূহ বিঠোবাকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। মহীপতি ইহার পর যে সকল অতিলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে বর্ণনা করা অনাবশ্যক।

উৎসব সম্পূর্ণ হইলে তুকারামের শিষ্যগণ দেহুতে প্রত্যাগমন করিলেন। তুকারাম যেখানে তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব হইতে সেখানে যাইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পরস্পরের প্রণাম ও অভিবাদনাদির পর তুকারাম তাঁহাদিগকে উৎসবের সবিস্তর বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে তাহা শ্রবণ করাইয়া, বিঠোবার প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বৈদ্যনাথ দেওঘর।

সূর্য্যের তাপ ও পরমায়ুঃ

সূর্য্যই আমাদের জীবনস্বরূপ। সহস্ররশ্মির কৃপাতে ধরাতলে প্রাণিমাত্রেরই কোন অভাব নাই। সকলেই জানেন যে কার্বন ও অক্সিজেনের সংযোগে এক অনিষ্টকর পদার্থ উৎপন্ন হয়। উহা পৃথিবীতে অহরহঃ প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু সূর্য্যের কিরণে এরূপ এক রাসায়নিক শক্তি আছে, যাহা গরলকেও অমৃত করিয়া তুলে। কার্বন ও অক্সিজেন সূর্য্যের প্রতাপে পৃথক হইয়া যায়, এবং কার্বন উদ্ভিদের আহারে পরিণত হয়। অতএব সহস্ররশ্মিই উদ্ভিদ্‌রাজ্যের জীবন। জীবরাজ্যেও তদীয় মহৎ কার্য্যের অবধি নাই। আমিষভোজীই হউন, আর নিরামিষভোজীই হউন, সকলকেই সূর্য্যের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। মাংসাশী উদ্ভিদাহারে গঠিতশরীর জীবেরই মাংস খাইয়া থাকেন। সুতরাং সূর্য্যই সকলের আহারদাতা। যিনি আহারদাতা, তিনিই ত যাবতীয় কার্য্যই করিতেছেন; আমরা তাঁহার হস্তে অবলম্বন মাত্র। রেলগাড়ি চলিতেছে, বাষ্পপোত চলিতেছে, বহুবিধ কলকারখানা হইতেছে, কাহার কৃপায়, কাহার ক্ষমতায়? সূর্য্যই লক্ষ লক্ষ হস্ত বিস্তার করিয়া আমাদের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করিতেছেন। সে কয়-

লায় বাষ্পপোত চলিবে, তাহা ভূগর্ভ-নিহিত উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ। অতএব সূর্য্যের মঙ্গলকামনা সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য। উদ্ভিদের জীবন, জীবের পালনকর্ত্তা ও কর্ম্মের গুরু সবিতা অক্ষয়, অমর, অক্ষুণ্ণতেজা হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কিন্তু যাহাকে যত ভালবাসা যায়, তাহারই তত বিপদের আশঙ্কা করা যায়। অনেক জ্যোতির্বেত্তারা বলেন যে যিনি অদ্য সদর্পে অপ্রতিহত প্রভাবে কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন, তিনিই কালের মাহাত্ম্যে হৃতসর্ব্বস্ব ও গতায়ু হইয়া ম্লানমুখে সৌরজগৎ অন্ধকার করিয়া থাকিবেন। সূর্য্যের ভূত ও ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া তাঁহাদের অত্যন্ত ব্যাকুলতা উপস্থিত হইতেছে। এক্ষণে তাদৃশ ব্যাকুলতার কারণ কথঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করা যাউক।

জ্যোতির্বিদেরা সূর্য্যের তাপ-বিকিরণ শক্তি অবলম্বন করিয়া তদীয় পরমায়ুঃ স্থির করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু সে তাপের সম্যক্ নির্দ্ধারণ করাও বড় সহজ কথা নহে। সূর্য্যসম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয়ই মহত্ত্বব্যঞ্জক। সূর্য্য ও পৃথিবীর অন্তর নয়কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল; সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় নিকটবর্ত্তী হইলে, সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে পৃথিবী গলিয়া পরিশেষে বাষ্পময় হইয়া যাইত। সূর্য্য হইতে যে পরিমাণে তাপ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহার কেবল দুই শত কুড়ি কোটি ভাগের এক ভাগ আমরা পাইয়া থাকি। এক্ষণে বিবেচনা করুন যে সূর্য্যের তাপমান কত হইতে পারে। সূর্য্যের পৃষ্ঠফল পৃথিবীর পৃষ্ঠফলের বারহাজার গুণ। সূর্য্যের সমগ্র পৃষ্ঠের উপর বিশ ফুট্ উচ্চ করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট কয়লা সাজাইয়া তাহাকে সুন্দররূপে পোড়াইলে যে পরিমাণে তাপ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, সেই পরিমাণে তাপ সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া থাকে। সূর্য্যের ঘনফল পৃথিবীর ঘনফলের প্রায় তের লক্ষ গুণ। ঈদৃশ মহাকায় হইলেও, সূর্য্য যদি একটী জ্বলন্ত কয়লার পিণ্ড হইত, তাহা হইলে ছয় হাজার বৎসরে পুড়িয়া নিঃশেষিত হইয়া যাইত। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে বহুকাল হইতে সূর্য্যের তাপবিকিরণ শক্তি সমান রহিয়াছে, হ্রাস বা বৃদ্ধি ধরিতে পারা যায় না। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কয়লার মত কোন বস্তুবিশেষের দহন দ্বারা সূর্য্যের তাপ সংরক্ষিত হইতেছে না, কারণ তাহা হইলে অনতিকালেই দহন শেষ হইয়া উহা ভস্মাবশেষ হইয়া যাইত।

তবে কি প্রকারে সূর্য্যের তাপসংগ্রহ চলিতেছে? এবিষয়ে দুইটী মত

আছে। মেয়ার সাহেব বলেন যে রাশি রাশি উল্কাখণ্ড সূর্য্যোপরি পড়িয়া সংঘর্ষণে তাপ উৎপাদন করিয়া সূর্য্যের তাপ রক্ষা করিতেছে। হেল্মহোল্‌জ্ বলেন যে সূর্য্যপিণ্ডের আকুঞ্চন দ্বারা তদীয় তাপ সংরক্ষিত হইতেছে। মেয়ারের মত সম্বন্ধে দুইটি প্রধান আপত্তি আছে।

(১) ধূমকেতু সকল বহুদূর হইতে আইসে, এবং সূর্য্যকে স্পর্শ না করিয়া, কেবল প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়। তদ্রূপ যদি কোন উল্কাখণ্ড বহুদূর হইতে সূর্য্যের দিকে ধাবিত হয়, তবে উহা সূর্য্যে পতিত না হইয়া সূর্য্যের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবার সম্ভব। সুতরাং যদি কোন উল্কাখণ্ড সূর্য্যে পতিত হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে সূর্য্য হইতে অনতিদূরে অগণ্য অমেয় উল্কারাশির মহাসমুদ্র আছে, যাহা হইতে স্খলিত উল্কাখণ্ড সকল সূর্য্যে নিপতিত হইয়া অচিন্ত্য-কালের জন্য তদীয় তাপ রক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলে তাদৃশ বিপুল উল্কারাশি অবশ্যই সূর্য্যের সন্নিকটস্থ বুধ ও শুক্রের গতির সবিশেষ পরিবর্ত্তন করিত। কিন্তু সেরূপ কোন গতিবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না।

(২) অধ্যাপক পিয়র্স বলেন যে মেয়ার সাহেবের মত স্বীকার করিলে, গণনা দ্বারা পাওয়া যায় যে পৃথিবী স্বপৃষ্ঠে পতিত উল্কাখণ্ডের দ্বারা বৎসরে যে তাপ পাইয়া থাকে, তাহা সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত তাপের অর্দ্ধেক। কিন্তু বস্তুতঃ পৃথিবীর উপর উল্কাবর্ষণ জনিত তাপ সূর্য্যপ্রদত্ত তাপের কোটিভাগের একভাগও হয় কিনা বলা যায় না।

সুতরাং সম্প্রতি একমাত্র হেল্মহোল্‌জের মতই বলবান্ রহিয়াছে। ১৮৭০ খৃঃঅব্দে লেন্ সাহেব প্রমাণ করেন যে যদি কোন বাষ্পময় বর্ত্তুল চতুর্দ্দিকে তাপ বিকীর্ণ করে, ও নিজের অণুসকলের পরস্পর আকর্ষণে ক্রমে ছোট হইয়া আইসে, তাহা হইলে উক্ত বর্ত্তুলের উষ্ণতার হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। ক্রমেই যত বর্ত্তুলের আকুঞ্চন দ্বারা বাষ্পময় অবয়ব ঘন হইয়া জলবৎ হইবার সম্ভাবনা হয়, ততই তাহার আকুঞ্চন দ্বারা উত্তপ্ত হইবার গুণ কমিয়া যায়। সূর্য্যকে বাষ্পময় স্বীকার করিলে (ইহাতেও মতদ্বৈধ আছে,) সূর্য্যের অচঞ্চল উষ্ণতার কারণ পাওয়া যাইতে পারে। সূর্য্যের ব্যাস যদি সম্প্রতি বৎসরে দুইশত পঞ্চাশ ফুট করিয়া কমে, তাহা হইলেই গোল মিটিয়া যায়। সন্দেহ হইতে পারে যে সূর্য্যের ব্যাস যদি বাস্তবিকই হ্রাস পাইত, তাহা হইলে সেরূপ হ্রাস দূরবীক্ষণযন্ত্রের হস্ত

হইতে কিরূপে মুক্তি পায়? তাহার উত্তর এই যে সূর্য্যের ব্যাস প্রায় আট-লক্ষ ছয়ষষ্টি হাজার মাইল। তাহা আড়াইশত ফুট কমিয়া বৎসরে কমিলে কি ধরিতে পারা যায়? কিন্তু তাহা হইলেও বহুকালের পরে সূর্য্যের বিশাল বপুঃ সবিশেষ ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। নিউকম্ব সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে সম্প্রতি সূর্য্যের যে ব্যাস আছে, তাহার অর্দ্ধেকে পরিণত হইতে পঞ্চাশলক্ষ বৎসরের বেশী লাগিবে না। তৎকালে সূর্য্যস্থ বাষ্পসকল আটগুণ ঘন হইবে। তাহা হইলে আর উহা প্রকৃত বাষ্পময় থাকিবে না, সুতরাং ক্রমেই তৎপরে তাপবিকিরণ দ্বারা চন্দ্রের ন্যায় শীতল হইয়া পড়িবে। এখনই ত অনেকে বলেন যে সূর্য্যপিণ্ডোপরি যে সকল মেঘাকার বিন্দু লক্ষিত হয়, সে সকল জলবৎ তরল পদার্থে গঠিত। নিউকম্ব সাহেব আরও সিদ্ধান্ত করেন যে আর এককোটিবৎসর পরে সূর্য্যের তাপ এত কমিয়া যাইবে যে পৃথিবী হইতে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

সূর্য্যের মৃত্যুদিনের ত কতকটা আভাস পাওয়া গেল। এক্ষণে সূর্য্যের জন্মতিথি কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বহুকালেও সূর্য্যের তাপবিকিরণের হ্রাস বৃদ্ধি ধরিতে পারা যায় না। সুতরাং সূর্য্যের উষ্ণতা স্থির স্বীকার করিলে, সূর্য্যের বয়স সহজেই নির্দ্দেশ করা যায়। সূর্য্যকে প্রথমে অনন্তকায় ধরিলেও, গণনাদ্বারা স্থির হয় যে সূর্য্যের উষ্ণতা একই থাকিলে, অনন্তকায় গুটাইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইতে প্রায় এককোটি আশী হাজার বৎসর লাগে। অনেক সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরা এরূপ বলিতে সাহস করেন যে জ্যামিতির কোন প্রতিজ্ঞাও উক্ত গণনা অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য নহে। অতএব সূর্য্য যে পরিমাণে তাপবিকিরণ করিয়া থাকেন, দুইকোটি বৎসরের পূর্ব্বে সে পরিমাণে কিছুতেই তাপ দিতে পারিতেন না। সুতরাং সূর্য্যের তাপ-বিকিরণশক্তি একই থাকিলে, তাঁহার বয়স দুইকোটি বৎসরের অধিক বলা যায় না। সুতরাং পৃথিবীর বয়সও দুইকোটি বৎসরের বেশী কিরূপে বলা যায়? কিন্তু এক গোল উপস্থিত। সূর্য্যের তাপবিকিরণ-শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি দুই বা চারিশত বৎসরে বুঝিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু দুই বা দশ হাজার বৎসরে তাহার পরিমাণ বড় অগ্রাহ্য না হইতে পারে। এরূপই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়, যে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমানভাবে তাপ প্রেরণ করিতেছেন? লেন সাহেব বলেন যে

বাষ্পময় পদার্থ আকুঞ্চনদ্বারা উত্তরোত্তর সমধিক উষ্ণ হইয়া থাকে। তবেই আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে সূর্য্য দিগন্তব্যাপী বাষ্পময় শরীর লইয়া অবতীর্ণ হইলেন, ক্রমেই আকুঞ্চনদ্বারা উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া জ্বলন্ত পিণ্ডাকারে পরিণত হইলেন, এবং ক্রমেই বর্ত্তমান তাপবিকিরণশক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। ঈদৃশ দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা সুদূর ভবিষ্যদ্‌-গর্ভে সমাহিত। যেখানে দুইকোটি বৎসর পাওয়া যাইতেছে, সেখানে দুইশত কোটি বৎসরেও কূল পাইবে না।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টরাজ।

জ্ঞানবৃক্ষ ও তাহার একটি সুফল।

মনুষ্য সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে ইডেন উদ্যান তৈয়ারি হয়। এই রম্য উদ্যানের মধ্যস্থলে জ্ঞানবৃক্ষ রোপিত হয়। কেন যে মানুষের উপর হুকুম ছিল যে সে যেন ঐ বৃক্ষের ফল স্পর্শ না করে, তাহা এখন ঠিক করা বড় কঠিন। মানব জাতির "অতি বড় বৃদ্ধ প্রপিতামহী" প্রথম ঐ বৃক্ষের একটী ফল পাড়িয়া খাইতে সাহসী হন। স্ত্রীলোকের জ্ঞানপিপাসা চির-কালই বলবতী। আদি পিতা আদম কিছু স্ত্রৈণ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সে সময় স্ত্রৈণ হওয়া ছাড়া তাঁর উপায়ান্তর ছিল না। আদম ইহুদী ছিলেন এবং সেই জন্ত আমরা অনুমান করি যে হয় ত তাঁহার বহুবিবাহের পক্ষপাতী হওয়া খুব সম্ভব। কিন্তু হইলে কি হয়, "তখন সবে ধন নীলমণি" "হবা" ভিন্ন আর রমণী নাই। পিতা মহাশয়ের বিবাহেচ্ছা যতই বলবতী থাকুক না কেন, তাহা সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। যে কারণেই হউক, তিনি সহধর্ম্মিণীর অনুগামী হইলেন—জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইলেন। অনেক সময় আমি এই আদি পিতা মাতাকে মনে মনে অনেক ধন্তবাদ দিই। যদি তাঁহারা ঐ জ্ঞানবৃক্ষের ফল না খাইতেন, তাহা হইলে আমরা কি প্রগাঢ় অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন থাকিতাম! তাহা হইলে আমরা বাল্মীকি ও কালিদাস, হোমার ও সেক্‌সপিয়ারের কাব্য পড়িতে পারিতাম না, রেল খাল দেখিতে পাইতাম না, তারে খবর পাঠাইতে পারিতাম না, এমন কি বর্ত্তমান সভ্যতার ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র চিহ্ন সামান্ত পোষ্টকার্ডখানারও মুখ দেখিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ। উপরে যে জ্ঞানবৃক্ষের দুই একটি

ফলের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহারা যে বহুমূল্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাহারা না থাকিলে সমাজ সভ্যতার উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিতে পারিত না। কিন্তু সমাজ রক্ষার জন্য ইহাদের তাদৃশ আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় না। দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা বলেন খৃঃপূঃ ৪০০৮ বৎসরের সময় আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথ্বী ও তাহার সঙ্গে মানবজাতি সৃষ্ট হয়। রেলগাড়ী, তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি সেদিন আবিষ্কৃত হইল। প্রায় ৬০০০ হাজার বৎসর কাল মানব সমাজ উহাদের অভাবেও বেশ চলিয়াছিল। বাল্মীকি ও হোমারের জন্মের পূর্ব্বেও সমাজের স্থায়িত্বের কোন বিশেষ ব্যাঘাত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞানবৃক্ষের এই সব ফল, বোম্বাই, ল্যাংড়া বা ফজলি আম, মজফরপুরী নিচু বা ভাল মর্ত্তমান কলার সমান। সমাজের জীবন ধারণের পক্ষে উহাদের বিশেষ আবশ্যকতা নাই। এই প্রবন্ধে আমরা কিন্তু যে ফলটির কথা বলিব, তাহা সমাজের জীবন ধারণের প্রধান উপায়; বলিতে কি উহা না থাকিলে সমাজ এত দিনে মরিয়া যাইত। ফলটী কি? ফলটীর নাম পরনিন্দা। উহা যে জ্ঞানবৃক্ষের ফল, তাহা বুঝাইতে বেশী কথা বলা অনাবশ্যক। (১) জ্ঞান না হইলে আমরা কোন বিষয় জানিতে পারি না। (২) যাহার নিন্দা করি তাহার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অসীম হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে আমরা তাহার দোষ বাহির করিতে সক্ষম হইব কি প্রকারে? এই দুইটী কথা ভাল করিয়া বুঝিলে, পরনিন্দা যে জ্ঞানবৃক্ষ-জাত তাহা বুঝিতে কোন বুদ্ধিমান্ লোকের কষ্ট হইবেক না।

পরনিন্দা এত ভাল লাগে কেন? এমন কোন মহান্ উদারস্বভাব পুরুষ থাকিতে পারেন, যিনি পরনিন্দা করেন না এবং পরনিন্দা যাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু তাঁহার দর্শন খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে। অসভ্য জাতিদের মধ্যে পরনিন্দা প্রচলিত আছে কিনা বলিতে পারি না; যদিও থাকার খুব সম্ভব। পরনিন্দা যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহারা সমাজবদ্ধ হইবে কি প্রকারে? কিন্তু কোন সভ্যসমাজ যে পরনিন্দা অর্থাৎ পরচর্চ্চা বিরত হইয়া থাকিতে পারে, ইহা কল্পনা করিতেও আমি অক্ষম। যখনই আমরা পাঁচজনে মিশি, তখনই পরচর্চ্চা করিবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। সুবিধা পাইলেই পরচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করি। পরচর্চ্চা করিতে পাইলে কি আনন্দ! যেদিন পরচর্চ্চা করিতে না পাই, সে দিনটা বৃথা

গেল বলিয়া বোধ হয়। শুনিয়াছি সুদূর বিদেশে কোন স্বদেশী সঙ্গীত শুনিতে পাইলে নাকি মনে অসীম আনন্দের উদয় হয়। আমার এক ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বন্ধু একবার বলিয়াছিলেন যে এক সময় লিভারপুল সহরে দূর হইতে এক খালাসীর মুখে লক্ষৌ ঠুংরি শুনিয়া তাঁর মনে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। আমার ভাগ্যে এরূপ আনন্দভোগ কখনও ঘটে নাই, ঘটিবে বলিয়াও বোধ হয় না। আমার কিন্তু একটা কথা মনে হয়। এইরূপ গান কি পরনিন্দা অপেক্ষাও মধুর? পরনিন্দা অপেক্ষা মধুরতর জিনিস যে আর থাকিতে পারে, তাহা সহসা বিশ্বাস করিতে আমি নারাজ।

পরনিন্দা এত ভাল লাগে কেন? একটু তলাইয়া বুঝিলে শুধু ভাল লাগে নয়, পরনিন্দা একটা সামান্য ভোগের বস্তু নয়, ইহা এক অত্যাবশ্যক পদার্থ। ইহা না থাকিলে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। সময়ের ভার বড় ভার। আমার মনে হয়, পরনিন্দা না থাকিলে এই ভারে আমাদিগকে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হইত। জীবনে মানুষ হতাদর হইত, এবং হয় তাহাকে আত্মহত্যা করিয়া সকল ক্লেশের হাত এড়াইতে হইত, না হয় সে শুধু বিরক্তিতে ঠায় মারা যাইত। "রাম বাবুর ছেলেটি একটী বাঁদর", "শ্যাম বাবু একটা জানোয়ার", "মদের ভাঁটীতে না চোঁয়াইলে ঈশান বাবুর ক্ষুধা হয় না," ঈদৃশ ও অন্যাদৃশ গুরুতর প্রশ্ন সমূহের যদি বিচার করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে জীবন ধারণ করা যে কি কঠোর হইয়া দাঁড়াইত, তাহা সকল শিক্ষিত ব্যক্তি অনায়াসে বুঝিতে পারেন। "নরুদের বউটী বড় কালো" "সুহাসিনীর মার মত বউ কাঁট্‌কী শাশুড়ী আর নাই," সময় কাটাইবার নিমিত্ত আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের কাছে যদি এইরূপ প্রশ্ন সব উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে হয় তাঁহারা গহনার মায়া পর্য্যন্ত কাটাইয়া আমাদের গৃহ অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইতেন, কিম্বা গৃহ এরূপ আলোকিত করিয়া তুলিতেন যে ক্ষুদ্র পতঙ্গবৎ আমাদিগকে সেই আলোতে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইত। আমার বোধ হয় পরনিন্দা সংসার-পথে অন্ধের যষ্টি, সংসার-মরুতে তৃষিতের বারিবিন্দু, সংসার-অরণ্যে সুখের কল্পতরু, সংসার-উদ্যানে "বসোরা" গোলাপ।

পরনিন্দা না করিয়া লোকে করে কি? যদি পাঁচ জন এক ব্যবসায়ী লোক একত্র হন অনেক সময় তাঁহারা ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কথা কহিয়া

থাকেন। চারি জন হাকিম বাবু একত্র হইলে হয় ত তাঁদের উপরওয়ালার গুণাগুণের সমালোচনা আরম্ভ করেন, নয় ত অমুক মকদ্দমাটার এইরূপ বিচার হইলে ভাল হইত, একাউন্টাণ্ট জেনরালের বা হাইকোর্টের এক নূতন সার্কুলার আসিয়াছে, এইরূপ কথা অনেক সময়েই পাড়িয়া থাকেন। উকিল বাবুদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় অনেক সময় আইনের বাজে তর্ক চলিতেছে, কিম্বা "নূতন জজ সাহেব বড় কড়া," "অমুক জায়গার মুন্‌শেফ বাবুকে দেখিলাম একটী গবাকান্ত", "অমুক ডেপুটী বাবু ইংরাজীতে যে রায় লেখেন, কালেক্টর সাহেব তাহা বুঝিতে না পারিয়া এবার হইতে তাঁহাকে বাঙ্গলায় রায় লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন," এইরূপ সব অত্যাবশ্যক সত্যের আলোচনা হইতেছে। জন কয়েক মাষ্টার মহাশয় একত্র হইলে দেখা যায় কেহ আজকালকার ছেলে গুলা বড় বিগ্‌ড়াইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিতেছেন, কেহ শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের সমালোচনা করিতেছেন, কেহ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দিগ্‌গজ প্রশ্নকর্ত্তার গুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। বাহুল্য ভয়ে ডাক্তার বাবু, কেরাণী বাবু ও অন্যান্য বাবুদের কোন উল্লেখ করিলাম না। যদি পাঁচ শ্রেণী হইতে পাঁচজন লোককে একত্র করা যায়, তাহা হইলে অনেক সময় তাঁহারা "বারিশূন্য মীনবৎ" হইয়া পড়েন। কেহই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না যে কি কথা কহিব। অনেক সময় দেখা গিয়াছে এক মজ্‌লিশে জন কয়েক ভিন্ন ব্যবসায়ের লোক একত্র হইয়াছেন। সকলেই হয় ত সকলকে চিনেন। কিন্তু সব চুপ চাপ। এক পার্শ্বে হয় ত দুইজন সমব্যবসায়ী লোকে ফুস্‌ফাস্‌ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ব্যবসা সম্বন্ধীয় কোন কথা বলিতেছেন। হঠাৎ একজন অনুপস্থিত ব্যক্তির কথা পড়ুক দেখি, অমনি সকলের মুখ প্রফুল্ল হইবে, মনের শূন্যতা ব্যঞ্জক মুখের ভাব মিলাইয়া যাইবে, ফুস্‌ফাস্‌ বন্ধ হইবে, সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া, অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা-প্রণোদিত হইয়া, তাঁর কথা শুনিতে আরম্ভ করিবেন। আজ কাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রসাদে, সস্তায় বিদ্যাদান প্রথা প্রচলিত হওয়ার প্রসাদে বহুল পরিমাণে দেশে শিক্ষা বিস্তার হইতেছে। দেশময় এম্, এর ছড়াছড়ি। বি, এ উপাধিধারী ব্যক্তি আজ কাল অনেকের কাছে অর্দ্ধশিক্ষিত ও দয়ার পাত্র। দেশের অবস্থা এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও উপরিউক্ত মজ্‌লিসে এতক্ষণ সকলে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিলেন। কেহই এমন একটী প্রসঙ্গ খুঁজিয়া

পাইতেছিলেন না, যাহা সকলের বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। শুনিতে পাই, মৃত্যু প্রভেদের অরি। তাহার কাছে, রাজা, প্রজা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, যুবা, বৃদ্ধ এবং স্ত্রী পুরুষের কোন প্রভেদ নাই। একটু ভাবিয়া দেখুন দেখি, পরনিন্দাও নিদেন কিয়ৎ পরিমাণে কি এ সম্বন্ধে মৃত্যুর সদৃশ নয়? যিনি যে অবস্থার লোক হউন না কেন, পরনিন্দার চক্ষে সব সমান। উপরিউক্ত মজ্‌লিশটীতে নানা বর্ণের নানা অবস্থার লোক আছেন। এতক্ষণ তাঁহাদের মনের কবাট বন্ধ ছিল। আকৃতিগত সাম্য না থাকিলে তাঁহারা যে সকলে এক জাতীয় জীব, এবং পরস্পর পরস্পরের কাছে মনোভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম, সে সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারিত। কিন্তু যেমন পরের কথা উঠিল, অমনি স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সমস্ত বৈষম্য দূর হইল। পরস্পরের প্রতি একজাতীয়ত্ব-জাত সহানুভূতির বিকাশ পাইল। সকলেই পরস্পরের কাছে একটু ঘেঁসিয়া বসিলেন, এবং পরনিন্দারূপ উৎস হইতে আনন্দ-সুধা পান করিয়া সকলেই সমান বিভোর হইলেন। পরনিন্দার প্রতি আমার ভক্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতেছে। উহাকে আমার সমাজবন্ধনের এক প্রধান উপকরণ বলিয়া বোধ হইতেছে। "প্রধান" বলিলে বোধ হয় সব বলা হইল না। পরনিন্দা না থাকিলে মানব-সমাজ কিরূপে গঠিত হইত, তাহা আমি ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ইন্দ্রের অশনি নির্ম্মাণার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া দধীচি মুনি আপনাকে হিন্দুজগতে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তির নিন্দা করিয়া আমরা সমাজবন্ধন বজায় রাখি, মানুষকে মানুষের সঙ্গে মিশিতে ও সহানুভূতি করিতে শিক্ষা দেই, ভাবিতে গেলে তাঁহাদের গৌরবের কাছে দধীচি মুনির গৌরব নিষ্প্রভ। নিন্দিত ব্যক্তিগণ সমাজের যে কত উপকারক, তাহা আমার ক্ষুদ্র লেখনী বর্ণন করিতে অক্ষম। সমাজের উচিত, প্রধান প্রধান নিন্দিত ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করা, তাঁহাদের নাম দেবশ্রেণীভুক্ত করা। রোমের অনেক সম্রাটকে দেবশ্রেণীতে উন্নীত করা হইত। হিন্দুদের মধ্যেও এ প্রথা সম্পূর্ণ বিরল ছিল না। কিন্তু নিন্দিত ব্যক্তিদিগকে দেবতার পর্য্যায়ে তোলা ও রোমক সম্রাটদিগের প্রতি ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করার মধ্যে একটু পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। সম্রাটেরা অনেকেই অতি কদর্য্য প্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের হইতে জগতের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়াছিল।

কিন্তু আমি যাঁহাদের হইয়া ওকালতি করিতেছি, তাঁহারা মানবসমাজের নিঃস্বার্থ বন্ধু। "প্রধান প্রধান" বলিবার একটু অর্থ আছে।—

যদি সকল নিন্দিত ব্যক্তিকে দেবশ্রেণীভুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে দেবগণের তালিকা কিছু বড় হইয়া পড়িবে। একেই ত আমাদের দেবতার সংখ্যা কিছু অধিক। সংখ্যা বেশী বাড়াইলে সামলাইতে পারা যাইবেক না।

পরনিন্দার আর একটী মহতী উপকারিতার কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। যখনই আমি বলি, "কৈলাস বাবু বড় মাতাল" এবং তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসি, তখন কি একটা কথা উহ্য থাকে না যে "আমি মাতাল নই।" যখন আমার কোন মান্য প্রতিবেশী আমাকে কৃপণ বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন না, তখন কি তাঁর অলক্ষিত ভাবে ইহা প্রচার করা হয় না যে তিনি নিজে দাতাকর্ণ নাই হউন, নিদান বৃষকেতু কিম্বা তাঁর বংশধর। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহিণী যখন পার্শ্বস্থ গরীব দত্তদের ছেলেদের দেখিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মাগো ওদের ছেলেগুলা দেখিতে যেন কাফ্রী এবং বাড়ীতে খাইতে পায় না বলিয়া যখনই নিমন্ত্রণে যায় হাঁসের মত গেলে," তখন কি বস্তুতঃ মনে মনে এই কথা ভাবিয়া তিনি আনন্দে আটখানা হন না যে "তাঁর ছেলেগুলি সব কন্দর্পের বাচ্চা এবং বাড়ীতে নানাবিধ জিনিষ খাইতে পায় বলিয়া মোটে পেটুক নয়।" উপরি উক্ত কয়টি উদাহরণ হইতে সুবিজ্ঞ পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, পরচর্চ্চা হইতে কি এক বিমল আত্মপ্রসাদ জন্মায়। এই আত্মপ্রসাদ যে কি মূল্যবান পদার্থ, তাহা বুঝাইবার প্রয়াস করা অনাবশ্যক। আরও একটা কথা আছে, আমি যদি সর্ব্বদা পরের দোষ অনুসন্ধান করি ও তাহার সমালোচনা করি, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে স্বতঃই উহার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিবে এবং এমন দিন আসিবেই আসিবে যেদিন আমাতে ঐ দোষ লক্ষিত হইবে না। যদি আমার ভাগ্য এরূপ হয়, যে নানা লোকের নানাপ্রকার দোষ আমার চক্ষে পড়ে, ও তাহাদের সমালোচনা করিবার আমার যথেষ্ট সুবিধা হয়, তাহা হইলে বুঝিবে দেবতারা আমার প্রতি খুব সুপ্রসন্ন, এবং আমার ধর্ম্মময় হইবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। অনেক অপরিপক্ক বুদ্ধি লোক আছেন যাঁহারা পরনিন্দার প্রতি খড়্গহস্ত। দাঁত থাকিতে লোকে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। পরনিন্দা উঠিয়া গেলে সমাজের যে কি দুর্গতি হইবে, সমাজ থাকিবে কিনা, বাবুদের যদি এ কথাটা বুঝিবার শক্তি থাকিত, তাহা

হইলে আর ভাবনা কি? ভরসার বিষয় এরূপ অদূরদর্শী লোকের দল আজও প্রবল হয় নাই। তাহা হইলে তাহারা সভা করিয়া পরচর্চ্চা উঠাইয়া দিত। আজও জগতে সূক্ষ্মবুদ্ধি সমাজনীতিবিশারদ সুপণ্ডিত অনেক আছেন। ইঁহারাই আমাদের একমাত্র আশাস্থল। ইঁহারা যতদিন আছেন, ততদিন পরনিন্দার কোন ভয় নাই, এই ভরসায় বুক বাঁধিয়া প্রবন্ধ শেষ করা গেল।

দ।

রামপ্রসাদ সেন।

সম্প্রতি নব্যভারত পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩০২) "রামপ্রসাদ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে "কল্পনাপ্রিয় অনবধান লেখক" ও ৺ রামগতি ন্যায়রত্নকে "গড্ডলিকার" ন্যায় তাঁহার অনুকরণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন; তিনি বৈদ্যজাতির উপরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রুদ্ধ। এক স্থলে লিখিয়াছেন "সেই প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ কায়স্থই বঙ্গভাষার যাহা কিছু অনুশীলন করিয়াছিলেন। এক কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যতীত বৈদ্যদিগের মধ্যে কাহাকেও এ পথে বড় দেখা যায় নাই। * * * * চিকিৎসা ব্যতীত তৎকালে তাঁহারা অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। রামপ্রসাদ বৈদ্য হইলে তাঁহাকে আমরা চিকিৎসাব্যবসায়ী কবিরাজরূপেই দেখিতে পাইতাম। গীত-রচক, গ্রন্থপ্রণেতা, জমিদারী কার্য্যে অভিজ্ঞরূপে দেখিতে পাইতাম না।" অন্য এক স্থলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা উল্লেখ করিয়া বৈদ্যদিগের প্রতি একটু ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন—"বৃন্দাবনের শীতল ছায়ায় তাঁহার চিত্তে ত্রিদোষ চিন্তা আর ভাল লাগে নাই।" অপর এক স্থলে রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন—"শিশুকালে মাতা মলো রাজ্য নিল পরে।" এই গীতাংশ দ্বারা তাঁহার পিতা পিতামহদিগকে জমিদার বলিয়া বোধ হয়। সে কালে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত বঙ্গদেশে বৈদ্যের জমিদারীর কথা কোন পুঁথিতে, পুস্তকে বা লোকমুখে শুনা যায় নাই। সুতরাং রামপ্রসাদ যে কায়স্থ ছিলেন তাহা নিশ্চিত।" লেখকের প্রায় সবগুলি "সুতরাং" এরই যুক্তিবল এইরূপ। লেখক বৈদ্যজাতির উপর

যেরূপ বিদ্বেষপরায়ণ, স্বজাতির উপর সেই পরিমাণেই সহৃদয়; উদ্ধৃত অংশে 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ' না লিখিয়া "কায়স্থ ব্রাহ্মণ" লিখিয়াছেন।

উদ্ধৃত লেখার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কারণ বিদ্বেষ-জনিত লেখা সমালোচনার অনুপযুক্ত। লেখক ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও ৺ স্থায়রত্ন মহাশয়দিগকে যেরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বালকোচিত চাপল্য-পূর্ণ। তিনি যেরূপ লগুড় লইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার সমালোচকও সেই-রূপ লগুড় লইয়া দাঁড়াইলে, পাঠকবৃন্দ কলহের চিত্রটিতে আকৃষ্ট হইতে পারিতেন। তাঁহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়াছে, এই জন্য তাঁহার বৈদ্যকে শত্রু জ্ঞান করা স্বাভাবিক হইয়াছে; এ অবস্থায় রাগের প্রত্যুত্তরে রাগ করা আমাদের ধর্ম্ম নহে, বৈদ্যসমাজ এ অবস্থায় চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

প্রথম অভিযোগ—বৈদ্যজাতি বাঙ্গলাভাষার অনুশীলন করেন নাই; ইহা অমূলক। লেখকের বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস পড়া নাই। বঙ্গদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন জন্য বৈদ্যগণ প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে এ দেশে তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের সমকক্ষ। বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্যও তাঁহারা কম প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই—চৈতন্যপ্রভুর পূর্ব্বে পদ্ম-পুরাণের আদি লেখক, উৎকৃষ্ট কবি—বিজয়গুপ্ত বৈদ্য; কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দ দাস, ত্রিলোচন দাস, কবিকর্ণপুর, মুরারি গুপ্ত, ইঁহারা বৈষ্ণবযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার; ইঁহারা ছাড়াও বৈষ্ণব কবিগণের বহুসংখ্যক বৈদ্যজাতীয় ছিলেন—বৈষ্ণবসমাজে তাঁহাদের নাম সুপরিচিত। পরবর্ত্তী যুগে লালা জয়নারায়ণ সেন, রামগতি সেন, আনন্দময়ী গুপ্তা, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন,—বৈদ্যসমাজের কবি; বঙ্গভাষার অনুশীলনেও বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের সমকক্ষ।

দ্বিতীয়তঃ, সে কালে বৈদ্যগণ কখনও অর্থশালী জমিদার ছিলেন না। বল্লালসেন প্রভৃতিকে লেখক যাহাই মনে করুন না কেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-গণ অন্যরূপই বিশ্বাস করিয়াছেন। সে কালের চিরাগত বিশ্বাস প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের ইন্দ্রজালের দ্বারা প্রতারিত হয় নাই—এ বিষয়ে আমরা তাঁহাদের মতই প্রামাণ্য মনে করি। আবুল ফাজল লিখিয়াছেন, বঙ্গের অধিকাংশ জমি-দারই কায়স্থ, তিনি খোট্টাদের মুখে শুনিয়া পুস্তক লিখিয়াছিলেন—সে দেশে বৈদ্যসম্প্রদায় নাই। সুতরাং তাঁহাদের কায়স্থবৈদ্যদিগকে এক কায়স্থরূপেই বর্ণনা করা সম্ভব। যে সময় রামপ্রসাদ জীবিত, তখনই মহারাজ রাজবল্লভের অতুল্য কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—আজ কীর্ত্তিনাশার জলে সেই শিল্প-নৈপুণ্য-

পূর্ণ বিবিধ রত্নমণ্ডিত অসংখ্য মন্দির চুড় বিলীন হইয়াছে ;—অথবা এত কথাই বা কেন ? সামান্য "রাজ্য নিল চোরে" কথা হইতে বঙ্গদেশের একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রতি এরূপ অনুদার কথার উদয় হয় কেন ? ইহা সামান্য ভদ্রতার নিয়ম বিরুদ্ধ।

তারপর রামপ্রসাদের কথা ; লেখকের যুক্তিগুলির একটিও আমাদের নিকট সমীচীন বোধ হয় না। তিনি রামপ্রসাদের কয়েকটি ভণিতায় দাস রামপ্রসাদ পাইয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তিনি কায়স্থ। এ বিষয়ে তাঁহার অন্য কোনও প্রমাণ নাই। অন্য যে কয়েকটি অনুমান উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা বাতুলের ন্যায় ; যথা—(১) প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈদ্য-কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছাড়া আর কেহ নাই, সুতরাং রামপ্রসাদ বৈদ্য-কবি নন। (২) রামপ্রসাদের উপাধি 'কবিরঞ্জন' কিন্তু বৈদ্যগণের উপাধি কবিরাজ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। (আমরা ইতিপূর্ব্বে কবিকর্ণপুরের উল্লেখ করিয়াছি।) সুতরাং কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ বৈদ্য নহেন। (৩) রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন—"রাজ্য নিল চোরে"—রাজ্য অর্থাৎ ভূমি কায়স্থ ভিন্ন আর কাহারও ছিল না, সুতরাং রামপ্রসাদ নিশ্চিতই কায়স্থ। উল্লেখমাত্রই এই তিন যুক্তির অসারতা দৃষ্ট হয়—আমরা এ বিষয়ে আর কিছু বলা সঙ্গত মনে করি না।

রামপ্রসাদের ভণিতায় 'দাস রামপ্রসাদ' পাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে লেখকের মত এই—"কায়স্থগণের ন্যায় দাস উপাধির বহুল ব্যবহার করেন বৈষ্ণবেরা * * * রামপ্রসাদ বৈষ্ণব নহেন, ঘোর শাক্ত। এই জন্য তাঁহার দাস উপাধি দর্শনে তাঁহাকে কায়স্থ জাতীয় বলিয়া নিশ্চয় করি।"

রামপ্রসাদের সময় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধারণ ভাবগুলি ও বিনয়-মাখা রচনা-পদ্ধতি বঙ্গীয় সমাজে এতদূর অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল যে "ঘোর শাক্ত" হইলেও রামপ্রসাদ তাহা হইতে অব্যাহতি পান নাই, তিনি দাসানুদাস, দীন, দাস, প্রভৃতি শব্দ অনেকবার ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,—

"প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস-দাস, দাসীপুত্র হই॥"

এই ভাবের ভণিতা প্রায় পত্রে পত্রে দৃষ্ট হয় ;—তাহা ছাড়া

"কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীন,
দীন দয়াময়ি দুর্গে, ত্রাহি, ত্রাহি, ত্রাহি।"

"অরসিক অভক্ত অধম লোক হাসে।
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে॥"
"কালীর পদে, মনের খেদে,
দীন রামপ্রসাদ ভাসে।"
"দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি,
অভয়া চরণ পাবার আশে।"
"দীন রামপ্রসাদ বলে বলে,
মা এবার কালী কি করিলি।"
"কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন।"
"দীন রামপ্রসাদ বলে মন নীরে বুঝি ডুবায় তরী।" ইত্যাদি।

এই সঙ্গে সঙ্গে দাস রামপ্রসাদের ভণিতাযুক্তও কয়েকটি পদ পাওয়া যায়; 'দাস—দাস' 'দাসী—পুত্র' 'দীন' 'দাস' প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া তিনি বৈষ্ণবের ন্যায় বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন; এজন্য তাঁহার জাতি যায় নাই। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বত্রই 'শ্রী' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন; রামপ্রসাদের রচনায় ও এই 'শ্রী' শব্দের বহুলতা দৃষ্ট হয়, যথা,—"শ্রীমণ্ডপ" "শ্রীরঞ্জন" "শ্রীরাম-প্রসাদ" "শ্রীরামদুলাল" ইত্যাদি।

বৈদ্যের মধ্যেও 'দাস' আছে; লক্ষ্মীনারায়ণ দাস তাঁহার সহোদরাভগ্নী-পতি নাও হইতে পারেন; সুতরাং "দাস রামপ্রসাদ" হইলেই যে তিনি কায়স্থ হইবেন, এ কথার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। তাঁহার বংশধরগণ এখনও জীবিত আছেন সুতরাং তাঁহাকে 'বৈদ্যদাস' কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই; 'দাস' 'দীন' "দাস—দাস" প্রভৃতি শব্দ তাঁহার বিনয়ের পরিচায়ক; তাঁহার পদ্ধতি 'সেন'। রামপ্রসাদ বৈদ্য ছিলেন, এ কথা তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন, প্রবন্ধলেখক অস্বীকার করিলে কি হইবে? তাঁহার একটি গানের শেষ চরণ এইরূপ;—

"কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ,
হয়ে কালীর শরণাগত।" *

রামপ্রসাদ যতবার নিজকে 'দাস' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে অধিকবার 'দ্বিজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন;—

"দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে॥"

* কবিরঞ্জন কাব্য সংগ্রহ, যোগেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা প্রকাশিত, ৮৫ পৃঃ। আমরা সমস্ত পদাংশই এই পুস্তক হইতে উঠাইয়াছি।

"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে এ চরিত্র শিখলে কোথা ॥"

"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মা বুঝি নিদয় হলে ॥"

"দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি, চরণতলে রেখো রে।"

"দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস, জন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাস!"

"দ্বিজ রামপ্রসাদ ভাবিয়া সার।"

"বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ আছে এ মনের সাধ মা।"

"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালী বলে যাব তরী ॥"

"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, আমার কপালে বুঝি অগ্নি ওই।"

"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালের বশে কাজ হারালে ॥"

"দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, তবে আর কারে ভয়।"

"দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়।"

"দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, তারা নামটি সার।"

এরূপ আরও অনেক আছে; বাহুল্য ভয়ে উঠাইলাম না। প্রবন্ধলেখক অনুমান করেন, এগুলি পরবর্ত্তী গায়কের যোজনা; বহুসংখ্যক 'দ্বিজ' শব্দ যদি গায়কদের যোজনা হয়, তবে অল্পসংখ্যক 'দাস' শব্দ না হইবে কেন?—তাঁহার যুক্তির স্থিরতা নাই।

বৈশ্যজাতি (পূর্ব্ববঙ্গের কথা বলিতেছি না) চিরকালই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং দ্বিজ লেখাতে ৵ রামপ্রসাদের কোনও অসঙ্গতি হয় নাই।

প্রবন্ধলেখক নিজে যুক্তিবলে যে ঐতিহাসিক মত গঠন করিয়াছেন, তাহার অসারতা প্রদর্শিত হইল; এখন তিনি নিজ মত প্রবল করিতে দুইটি ঐতিহাসিক খাঁটি সত্য ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আজুগোসাঞি রামপ্রসাদকে সেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; আজুগোসাঞি নিশ্চয়ই ভুল লিখিয়াছেন কিম্বা তিনি কল্পিত ব্যক্তি হইবেন; ইহার অন্য কোন যুক্তি কি প্রমাণ নাই; তিনি তাঁহার মতের বিপক্ষ সকলকেই মিথ্যুক বলিবেন, এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিবেন। রামপ্রসাদের বংশধরগণ এখনও আছেন—তাঁহারা এ রামপ্রসাদ নয়, অন্য কোন রামপ্রসাদ হইতে উদ্ভূত। এই সব অলৌকিক যুক্তির সহায়ে তিনি যে ননীর মন্দির উঠাইয়াছেন, তাহা আলোকে আপনিই গলিয়া পড়িবে; ইহা ভাঙ্গিতে কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই।

কবিবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়া কবিগণের জীবন-চরিত প্রকাশ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ বেশী প্রাচীন লেখক নহেন; গুপ্ত-কবির সময় এই ব্যবধান আরও অল্প ছিল; কবিবরের বিশেষ পরিশ্রম ও পর্য্যটনের ফলে যে সব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঘরে বসিয়া একখানা পুস্তকের দুপাতা উল্টাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অবমাননাসূচক ভাষায় মত প্রচার করিতে কণ্ঠ উত্থিত করিতে যাওয়া সমীচীন নহে; রামপ্রসাদের বাড়ী "কুমারহট্ট" এ কথা প্রবন্ধলেখক অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া এরূপ করার কোনও কারণ দেখিতে পাইলাম না।

কীর্ত্তন।

ঐ গান গে'তে গে'তে চলে' যায়
পথে পথে ফেরে নদীয়ায়;
ও কে নেচে নেচে চলে, মুখে হরি বলে;
চলে' চলে' পাগলের প্রায়।

সে কে যায় নেচে নেচে, আপনায় বেচে,
পথে পথে শুধু, প্রেম যেচে যেচে,
সে কে দেবতা ভিখারী মানবের দ্বারে;—
দেখে যা'রে তোরা দেখে যা এ;

সে যে বলে "কৈ ত কেউ পর নাই"
সে যে বলে "সবাই যে নিজ ভাই"।
সে যে বলে "শুধু হেসে, শুধু ভাল বেসে
আমি ভ্রমি দেশে দেশে, প্রাণ চায়"
ও কে গান গে'তে গে'তে [ইত্যাদি]

ও কে প্রেমে মাতোয়ারা, চ'খে বহে ধারা,—
কেঁদে কেঁদে সারা—কেন, ভাই?
ঐ দ্বেষহিংসা ছুটি আসি পড়ে লুটি,
ও তার ধূলি মাখা দুটি—রাঙ্গা পায়;

বলে "ছেড়ে দেও মোদের, চলে' যাই,—
নয় যে প্রভু তোমার প্রেমে গলে' যাই ;—
এ যে নূতন মধুর প্রণয়ের সুর,
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই ?"

ঐ নরনারী সব পিছে ধায় ;
ঐ জয়ধ্বনি উঠে নীলিমায় ;
তোরা আয় সবে চলে', মুখে 'হরি' বলে',
ও তোদের ছেঁড়া পুঁথি ফেলে চলে' আয়।
ও কে গান গে'তে গে'তে [ইত্যাদি]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সর্পবিষ।

কথিত আছে, রাজা জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। কুক্ষণে আস্তীক-মুনি সর্পযজ্ঞ বন্ধ করিয়া দেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টও প্রতিবর্ষে সর্পযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতেছেন। রাজা জনমেজয়ের চেষ্টা সফল হয় নাই এবং আমাদের বর্ত্তমান রাজা বিস্তর পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়াও আমাদিগকে নিরাপদ করিতে পারেন নাই।

গত ইং ১৮৯৩ সালে কেবল বঙ্গদেশে প্রায় ৫৫,১০০ সর্প নিহত হইয়াছে। অবশ্য কেবল বিষধর সর্প মারিতে রাজার আজ্ঞা। তথাপি ঐ বৎসরে বঙ্গদেশে প্রায় এগার হাজার লোক সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আর, সকল সংবাদই কি রাজার গোচর হয় ?

প্রায় দেড় হাজার জাতীয় সর্প আছে। বৈজ্ঞানিকেরা সর্পকুল নয়টী পরিবারভুক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক পরিবারের দুই চারিটী জাতি ভারতে বসতি করিতেছে। এক এক জাতীয় কত সর্প আছে! পোড়াইয়া কিম্বা মারিয়া সর্পকুল নির্মূল করা অসম্ভব। সুখের বিষয়, সকল সর্পই বিষধর নহে ; সকলগুলি বিষধর হইলে ভারতভূমিতে তাহারাই রাজ্য করিত।

বিষধর সর্প। কোন্ সাপ সবিষ, আর কোন্ সাপ নির্বিষ, তাহা দেখিবামাত্র চিনিবার উপায় নাই। যিনি সমুদয় সর্প দেখিয়াছেন, সমুদয়

সর্পের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনিই কেবল কোন্‌টা বিষধর, আর কোন্‌টা নয়, বলিতে পারেন।

সবিষ ও নির্ব্বিষভেদে পূর্ব্বে সর্পকুল দুই ভাগে বিভক্ত করা হইত। কিন্তু অনেক সর্পের বিষে মানুষের বা অপর কোন বড় প্রাণীর বড় একটা কিছু হয় না। কোন কোনটা শিকার গলাধঃ করিবার সময় তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। বাস্তবিক, সবিষ ও নির্ব্বিষ, এই দুই শ্রেণীতে সর্পকুল বিভাগ করা অবৈজ্ঞানিক।

তবে একটা স্থূল উপায় এই। বিষকোষে সর্পবিষ সঞ্জাত হয়। এই বিষকোষ চক্ষুর পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত। বিষকোষ হইতে বিষদন্ত পর্য্যন্ত একটা নালী আছে। আবার বিষদন্তেও একটা নালী আছে। কামড়াইবার সময় সেই বিষকোষ বা বিষের থলিটি নিষ্পিষ্ট হয়। তখন তথা হইতে প্রথমে বিষদন্তমূলে, পরে তথা হইতে বিষদন্তের নালী দিয়া দষ্টস্থানে বিষ আসিয়া পতিত হয়।

অতএব যে সকল সর্পের দাঁতে নালী থাকে, সে গুলিই বিষাক্ত বলিয়া বোধ হয়। যদি কোন সর্প বিষাক্ত বলিয়া জানা না থাকে, তাহার দন্তে নালী দেখিলে, তাহাকে বিষাক্ত বলিয়া সন্দেহ করা কর্ত্তব্য। কেন না নালী আছে, অথচ নালীর ক্রিয়া নাই, এরূপ না হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু সর্প কামড়াইলে কে তাহার বিষদাঁত বা বিষনালী দেখিতে যাইবে ? একটা সহজ লক্ষণ জানা থাকিলে, অনেক স্থলে বৃথা আশঙ্কা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। ডাক্তার ফেরার সাহেব আমাদের দেশের অনেক সর্প পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি একটা সহজ লক্ষণ বলিয়াছেন। এই লক্ষণটা অধিকাংশ বিষধর সম্বন্ধে ঠিক।

লক্ষণটা এই। আমাদের মুখের নীচে এক পাটী এবং উপরে এক পাটী দাঁত আছে। অর্থাৎ মোট দুই পাটী দাঁত। কিন্তু সর্পের তিন পাটী দাঁত আছে। মুখের নীচে এক পাটী এবং উপরে দুই পাটী। উপরের দুই পাটীর মধ্যে আমাদের মত মুখের সম্মুখে এক পাটী এবং কিঞ্চিৎ ভিতরে তালুতে আর এক পাটী। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বিষধরের মুখের উপরের দুই পাটীর সম্মুখের পাটী না থাকিয়া তাহার জায়গায় দুই চারিটা মাত্র দাঁত আছে। এই দাঁতগুলিই বিষদাঁত। সুতরাং কোন সর্প কামড়াইলে যদি ভিতরে ও বাহিরে দুই সারি দাঁতের চিহ্ন দেখা যায়, তাহা হইলে

তাহা বিষাক্ত নহে, মনে করা যাইতে পারে। এইরূপে ঢেমনা সাপ কামড়াইলে বাহিরে ও ভিতরে দুই সারি দাঁতের দংশন চিহ্ন দেখা যাইবে।

গোক্ষুর, চন্দন বা উলুবোড়া সম্বন্ধে এ নিয়মটা ঠিক। কিন্তু কোন কোন সাপের বিষদাঁত আছে, অথচ তাহাদের বিষ মারাত্মক নহে। আবার, সমুদ্রের লোণা জলে এক প্রকার সাপ আছে। তাহাদের বিষদাঁত এত ছোট যে কামড়াইলে বিষদাঁতের ও অপর দাঁতের চিহ্ন একই রকম দেখায়। অথচ তাহাদের দংশন মারাত্মক হইতে পারে।

বাসস্থান ভেদে সর্পকুল নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে যেগুলি বিষাক্ত বলা গেল, সেগুলি বঙ্গদেশের সর্প সম্বন্ধে ঠিক মনে করিতে হইবে। *

১। গাছের সাপ। ইহাদের অধিকাংশের দেহ সবুজবর্ণ। ইহাদের মধ্যে সবিষ ও নির্ব্বিষ উভয় বিধ সর্পই আছে।

২। জলের সাপ। মিষ্ট জলের সাপ বিষাক্ত নহে। লোণা জলের সাপ বিষাক্ত। লোণা জলের সাপ গুলার লেজ মাছের লেজের মত চেপটা।

৩। ডাঙ্গার সাপ। আমাদের দেশের অধিকাংশ সর্প এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা ইহাদের দণ্ডাকার দেহ বাঁকাইতে পারে।

৪। গর্ত্তের সাপ। ইহারা গর্ত্তে বাস করে। ইহাদের মুখ ও লেজ ছোট। দেহ বাঁকাইতে পারে না। ইহারা বিষাক্ত নহে।

এই বিভাগটা নিতান্ত স্থূল ভাবিতে হইবে। কেন না, কোন কোন সাপ মাটির উপর ডাঙ্গায় বাস করিলেও সময়ে সময়ে জলে প্রবেশ করিতে পারে। আবার গাছের সাপ ও ডাঙ্গার সাপ কখন কখন স্থান পরিবর্ত্তন করে।

গোক্ষুরের ফণা দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যে সাপের ফণা নাই, সেটা বুঝি বিষধর নহে। বলা বাহুল্য, কথাটা ঠিক নহে। সাপের ফণা ও মস্তকের গঠন ধরিয়া বঙ্গদেশের বিষধরের একটা বিভাগ দেওয়া গেল।

ক। দেহ ও শিরঃ প্রায় দণ্ডাকার, লেজ ক্রমশঃ সরু, চক্ষুতারা গোল।

১। বিষদাঁত ব্যতীত বাহির সারিতে অপর কোন দাঁত নাই।

এরূপ সাপ বঙ্গদেশে নাই। আসামে আছে।

* Thanatophidia of India by Sir Joseph Fayrer, M. D.

২। বিষদাঁত ব্যতীত বাহির সারিতে দুই একটা অপর দাঁত আছে।

(১) ফণাযুক্ত......শঙ্খচূড়, গোক্ষুর, (কেউটে)

(২) ফণাহীন......শঙ্খিনী, ধোমনচিতি।

খ। শিরঃ ত্রিকোণাকার, লেজ ক্ষুদ্র, চক্ষুতারা লম্বা।

১। চক্ষু ও নাসিকার মধ্যস্থলে গর্ত্ত নাই। উলুবোড়া বা চন্দনবোড়া।

২। চক্ষু ও নাসিকার মধ্যস্থলে গর্ত্ত আছে। লাউডগা ? আমেরিকার রাটেল স্নেক এই শ্রেণীর।

দেশভেদে গাছপালার জীবজন্তুর নাম ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। তার উপর, অধিকাংশ সাপের বাঙ্গালা নাম নাই। উলুবোড়াকে কোথাও বা চন্দন বোড়া, কোথাও বা শিয়াচন্দর বা শ্রীচন্দ্র বলে। ফেরার সাহেবের মতে গোক্ষুর, শঙ্খচূড় এবং উলুবোড়া একই রূপ ভয়ানক। আমরা সচরাচর গোক্ষুর ও কেউটেকে দুই জাতীয় মনে করি। কিন্তু নিগ্রো, চীনে, ইংরাজ প্রভৃতি যেমন এক জাতীয় মনুষ্য, সেইরূপ গোক্ষুর ও কেউটেও এক জাতীয় সর্প। গোক্ষুরাদির বড় বিষদাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিলেই নিরাপদ মনে করা উচিত নহে। কেন না, বিষদাঁতের মূলের নিকট কতকগুলি অপরিণত ছোট ছোট দাঁত থাকে। বড় বিষদাঁত গুলি ভাঙ্গিয়া গেলে এই অপরিণত দাঁতগুলি বাড়িয়া উঠে। বিষধরের বিষদাঁতই জীবিকা সংগ্রহের সহায়। কোন ক্রমে একবার ভাঙ্গিয়া গেলে সে আত্মরক্ষা ও আহার সংগ্রহ করিবে কি রূপে ?

সর্প-বিষ। মালেরা কি প্রকারে সর্পবিষ সংগ্রহ করে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। বিষধরকে রাগাইয়া তাহার মুখের নিকট কলা-পাতা ধরে। সেই পাতায় সর্ষপ-তৈলের মত এক পলা বিষ নিক্ষিপ্ত হয়। উহা ঈষৎ হরিদ্রাভ দেখায়। গোক্ষুরবিষ জল অপেক্ষা কিছু ভারি, উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০৫৮। শুকাইয়া রাখিলে বহুকাল পর্য্যন্ত বিষের মারাত্মক গুণ নষ্ট হয় না। শুষ্কবিষ হরিদ্রাভ দানা দানা দেখায়। ২১ বৎসরের পুরাতন বিষ প্রাণিশরীরে প্রবিষ্ট হইলেও প্রাণীটি মরিয়া যায়।

সদ্যোনির্গত সর্পবিষে ভূরি ভূরি অণুজীব দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল অণুজীব মারাত্মক নহে। সর্পমুখের লালায় ঐ সকল অণুজীব থাকে। বিষ পতিত হইবার সময় অণুজীবও তৎসঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পড়ে।

এখন কথা এই, সর্পবিষে এমন কি পদার্থ আছে, যদ্দারা প্রাণ বিনষ্ট হয় ? পূর্ব্বে কেহ কেহ মনে করিতেন, যেমন মৃত প্রাণীর গলিত দেহে এক প্রকার বিষ (ptomaine) থাকে, সর্পবিষেও তাহাই থাকে। কিন্তু ইহা সকলে স্বীকার করেন না।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায় যে গোক্ষুর বিষের উপাদান এই।

১০০ ভাগ সদ্যনির্গত বিষে

৭২ ভাগ............জল

২৮ ভাগ............কঠিনাংশ

১০০ ভাগ শুষ্কবিষে

৫৩ ,, অঙ্গারক

১৮ ,, সোরাজনক

৭ ,, জলজনক

২০ ,, অম্লজনক ও গন্ধক

২ ,, ভস্ম

১০০ ,,

যাবতীয় প্রাণীশরীরে প্রোটীড (Proteid) বলিয়া এক প্রকার পদার্থ আছে। ডিমের শাদা জিনিসটা প্রধানতঃ ঐ পদার্থ। উহার রাসায়নিক উপাদান এই।

৫২-৫৫ ভাগ...অঙ্গারক

১৫-১৭ ,, ...সোরাজনক

৭ ,, ...জলজনক

২১-২৯ ,, ...অম্লজনক

৩---২ ,, ...গন্ধক

ঐ দুই তালিকা দেখিলে বিষ ও ডিম্বশ্বেত উপাদানে প্রায় এক পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। তবে প্রভেদের মধ্যে বিষে অপেক্ষাকৃত অধিক সোরাজনক পদার্থ থাকে।

অধ্যাপক মিচেল সাহেব বিষকে দুই প্রকার প্রোটীডে পৃথক করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটা গ্লোবুলিন (Globuline) অন্যটা পেপ্‌টোন (Peptone)। গ্লোবুলিন সিদ্ধ করিলে জমিয়া কঠিন হয় এবং উহা জলে

দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু পেপ্‌টোন অল্পক্ষণ সিদ্ধ করিলে জমিয়া যায় না এবং উহা জলে মিশ্রিত হয়। এই পেপ্‌টোনই নাকি বিষের মারাত্মক অংশ।

আমাদের শরীরের রক্তেও প্রোটীড আছে। সুতরাং যে দ্রব্যে বিষের গুণ নষ্ট করিবে, তদ্দ্বারা দেহের রক্তও বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। বিষের প্রোটীড নষ্ট করিবে অথচ রক্তের প্রোটীড নষ্ট করিবে না, এমন দ্রব্য না থাকারই সম্ভাবনা। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিষ সিদ্ধ না করিলে উহার গুণ নষ্ট হয় না। ডাক্তার ফেরার অনেক গাছ গাছড়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, অনেক ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সর্পদংশনের ঔষধ নাই।

সাপে নেউলে কি প্রকার ভাব, প্রবাদেই তাহার প্রমাণ। অনেকে মনে করেন যে, সর্পবিষে নেউলের কিছু হয় না। ফেরার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সর্পবিষ অধিক মাত্রায় নেউলের রক্তে মিশ্রিত না হইলে, নেউলের বড় একটা কিছু হয় না। নেউলের গায়ের লম্বা লম্বা ঘন লোম উহার শরীরে বেশী মাত্রায় বিষ প্রবেশের অন্তরায়। এই জন্য বিড়ালও সহজে মারা পড়ে না। তবে সর্পবিষ নেউলের রক্তে মিশ্রিত হইলে, উহার রক্ষা নাই।

ঢেমনাসাপ নির্ব্বিষ। কিন্তু ঢেমনা সাপকে গোক্ষুর কামড়াইলে ঢেমনা সাপের কিছুই হয় না। এই জন্যই বোধ হয় মালেরা মনে করে যে, নর-গোক্ষুর নাই। নরঢেমনাই নারী-গোক্ষুরের সহিত সঙ্গত হয়। বলা বাহুল্য অনুমানটা ঠিক নহে। গোক্ষুর সাপের নর নারী উভয়ই আছে।

রক্তের সহিত সর্পবিষ মিশ্রিত না হইলে, শরীরের তত ক্ষতি হয় না। উদরে কোন স্থানে ক্ষতাদি না থাকিলে সর্পবিষ পেটে গেলেও নাকি বড় একটা কিছু হয় না। কিন্তু ফেরার সাহেব দেখিয়াছেন যে, Mucous Membrane দিয়াও বিষ শোষিত হইতে পারে। সুতরাং ক্ষত না থাকিলেও বিষ পেটে গেলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

রক্তের সহিত বিষ দ্রুতবেগে মিশ্রিত হয়। এ জন্যই এত শীঘ্র সর্প দংশনে লোক মারা পড়ে। রক্তে যে সকল কোষাণু (blood corpuscles) আছে, তৎসমুদায় পিণ্ডীকৃত হয় এবং নির্গত রক্ত আর জমিয়া যায় না। লোকে ইহাকেই বলে যে, রক্ত জল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ফেরার সাহেব

বলেন যে, গোক্ষুর সাপে কামড়াইলে রক্ত জল হয় না, চন্দন বোড়া কামড়াইলেই রক্ত জল হয়।

সর্প বিষ সম্বন্ধে ফ্রেজার সাহেবের পরীক্ষা। নিজের দেহ কামড়াইলে বিষধরের কিছুই হয় না। আবার কোন গোক্ষুর অপর গোক্ষুর বা কেউটেকে কামড়াইলে ইহাদের কিছুই হয় না। বাস্তবিক যাহার নিজের বিষ আছে অপর বিষে তাহার বড় একটা কিছুই হয় না। সম্প্রতি ডাক্তার কানিংহাম সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, অনেক নির্ব্বিষ সাপও গোক্ষুর বিষে প্রাণত্যাগ করে না। ঢেমনা সাপ ইহার দৃষ্টান্ত, পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। কিন্তু যাহার বিষের তেজঃ যত, অপর বিষে তাহার তত কম অনিষ্ট হয়। যাহা হউক বিষধরের রক্তে এমন কোন পদার্থ আছে, যদ্দ্বারা বিষের মারাত্মক গুণ ব্যর্থ হয়। এমন কি, অল্পদিন হইল, ফ্রেজার সাহেব দেখিয়াছেন যে, যে শশককে সর্প বিষের টীকা দেওয়া হইয়াছে, সর্পবিষ ব্যতীত অন্যান্য বিষেও তাহার সহজে বড় একটা কিছু হয় না।

কয়েক বৎসর হইতে ফ্রেজার সাহেব এই লক্ষণ অবলম্বন করিয়া সর্পবিষের ঔষধ আবিষ্কারে নিযুক্ত ছিলেন। বহুকষ্টে তিনি সর্পবিষ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া তিনি ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে সর্পবিষ সংগ্রহ করিতেছিলেন। গত বৎসর তিনি পরীক্ষার উপযুক্ত পরিমাণ বিষ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পরীক্ষার প্রথম ফল এই যে, অল্প পরিমাণ সর্পবিষ কোন প্রাণীর দেহের রক্তের সহিত মিশ্রিত থাকিলে, তখন তাহা অধিক পরিমাণ সর্পবিষ অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। তিনি প্রথমে শশক লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। কত অল্প পরিমাণ বিষে শশকের মৃত্যু ঘটে, তাহাই তাঁহার প্রথম পরীক্ষার বিষয় ছিল। এই পরিমাণ স্থির হইলে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণ বিষ শশক দেহে প্রবেশিত করিলেন। অবশ্য ইহাতে শশকের মৃত্যু হইল না। দশদিন পরে পরে বিষের পরিমাণ অল্পে অল্পে বাড়াইয়া সেই শশক দেহে প্রবেশিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি দেখিলেন যে, মারাত্মক পরিমাণ অপেক্ষা পঞ্চাশ গুণ অধিক বিষ একেবারে সেই শশক দেহে প্রবিষ্ট হইলেও তাহা অনায়াসে সহ্য হইল! অর্থাৎ তাহার শরীরে এখন এত বিষ প্রবেশ করিল যে, তাহাতে তাহার মত ৫০টি শশকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইত।

বস্তুতঃ অত বিষেও তাহার অনিষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে বরং তাহার শরীর

হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে একবার একটা শশকের শরীরে এত বিষ প্রবেশিত করিয়াছিলেন যে, সেই পরিমাণ বিষে সেই শশকের আকারের ও ওজনের মত ৩৭০টা শশক মরিয়া যাইত। পরে তিনি অশ্ব ও বিড়ালেও এই বিষসহতা গুণ প্রমাণিত করিলেন।

কিন্তু কতদিন পর্য্যন্ত সর্পবিষের টীকার গুণ থাকে? এ সম্বন্ধে এখনও বড় একটা কিছু জানা যায় নাই। তবে একটা শশকে দেখা গিয়াছে যে, অন্ততঃ ২০ দিন পর্য্যন্ত শশকের সর্পবিষসহতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাঁহার দ্বিতীয় পরীক্ষা এই। কোন প্রাণীর রক্ত বাহির করিয়া কিয়ৎ-ক্ষণ রাখিয়া দিলে একটা রস বা জলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হয়। এই রসকে বিজ্ঞানে সিরাম (serum) বলে। ইহাকে রক্তের জলীয় অংশ বলা যাইতে পারে। তিনি একটা প্রাণীর দেহে সর্পবিষ প্রবেশিত করিয়া তাহার রক্ত বাহির করিলেন। সর্পবিষ প্রবেশ বশতঃ সেই প্রাণীটা সর্পবিষসহ হইয়াছিল। ইহার রক্তের সিরাম লইয়া তাহার সহিত নূতন বিষ মিশ্রিত করিলেন। পরে এই বিষমিশ্রিত সিরাম অপর একটা প্রাণিদেহে প্রবেশ করাইলেন। তিনি দেখিলেন যে, ইহাতে সেই প্রাণীর কোন অনিষ্ট হইল না। অতএব সর্পবিষসহ সিরামে নূতন বিষের মারাত্মক গুণ নষ্ট হয়।

এই সিরামের নাম তিনি আণ্টিবেনিন (antivenene) বা প্রতিবিষ রাখিয়াছেন। এখন তিনি একটা নূতন প্রাণীর শরীরে প্রথমে প্রতিবিষ এবং অনতিবিলম্বে নূতন বিষ প্রবেশিত করিলেন। কিন্তু ঐ প্রতিবিষে বিষের গুণ বিনষ্ট হইল। আর একটা প্রাণীদেহে প্রথমে বিষ প্রবেশিত করাইয়া যখন বিশের লক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন প্রতিবিষ প্রয়োগ করি-লেন। তিনি দেখিলেন তৎক্ষণাৎ বিষের লক্ষণ তিরোহিত হইল এবং প্রাণী-টাও পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইল। অতএব যে প্রাণিশরীর সর্পবিষসহ হইয়াছে, তাহার রক্তের সিরাম সর্পবিষের ঔষধ স্থির হইল। এই সিরাম শুষ্ক করিয়া রাখা যাইতে পারে।

এখন বাকি, ঐ প্রতিবিষের উপাদান নিরূপণ। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার আবিষ্কৃত প্রতিবিষের উপাদান জানিতে পারিলে অপরাপর ঔষধের ন্যায় সর্পবিষের ঔষধ বোতলে বোতলে বিক্রয় হইবে। কবে সে দিন আসিবে? ফ্রেজার সাহেবের আবিষ্কৃত প্রতিবিষ জলের সহিত মিশ্রিত

হয়। সর্প দংশনের পর সেই প্রতিবিষ জলের সহিত মিশাইয়া দেহে প্রবেশিত করিতে হইবে।

সম্প্রতি কানিংহাম সাহেব আলিপুরে সর্পবিষের কয়েকটি ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্লীচিং পাউডার (bleaching powder) এবং গোল্ড ক্লোরাইড্ (gold chloride) পদার্থদ্বয়ের সর্পবিষের তেজঃ খর্ব্ব করিবার গুণ প্রমাণিত হইয়াছে। এই দুই পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে। সর্পদষ্ট-স্থানের নিকটে উহাদের জল প্রবেশিত করিলে বিষের উগ্রতা খর্ব্ব হয়। কিন্তু তিনি দেখিয়াছেন যে, বিষ দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে এতদ্দ্বারা কোন ফল হয় না।

যাহা হউক, সর্পবিষের ঔষধ আবিষ্কারের নিমিত্ত এখন যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, আশা হয় অচিরে তাহাতে পরীক্ষকগণ সফলমনোরথ হইবেন। কি চিকিৎসক কি অপর লোক, সকলেরই সর্প-দংশনের ঔষধ জানিবার আগ্রহ আছে। কিন্তু ভ্রমে পড়িয়া টোট্‌কা, গাছগাছড়া, মন্ত্র তন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে নিশ্চিন্ত থাকেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

কেরল।

(১)

আমরা এক্ষণে দক্ষিণাপথের মালভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া মলয় পর্ব্বতে বিহার করিতেছি। বামে পশ্চিম ঘাট কুলপর্ব্বত; এক খানির পর আর এক খানি স্তূপ অগ্রসর করিয়া দিতেছে। গিরিপরম্পরা মধ্যে কাকভিম্বাভ মেঘমণ্ডল আনত হইয়া রহিয়াছে। ক্বচিৎ এক একখানি অখণ্ড প্রস্তরশৈল দৃষ্ট হইতেছে। পর্ব্বত খুদিয়া দেবালয় নির্ম্মাতা কোন নরপতিকে পাইলে ইহা একটি দিব্য দর্শনীয় স্থান করিয়া তুলিতে পারা যাইত। সত্য বটে—

"সুচন্দন বনোদ্দেশো
মার্গিতব্যো মহাগিরিঃ।"

কিন্তু আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় মলয়ানিলে চন্দনের সৌরভ পাইয়া পুলকিত হইতেছে না। মলয়ার দেশের বনে যে চন্দন জন্মে তাহা সুগন্ধি নহে। কর্ণাটে

কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান-সন্নিহিত ভূভাগ সদ্গন্ধশালী চন্দনের আকর। শকটশ্রেণী নিবিড় বন ভেদ করিয়া চলিয়াছে, জনসমাগমের চিহ্ন নাই। পূর্ব্বে লৌহাদ্ধ আশ্রয়-ভবনে বন্যহস্তী ও বাইসন্ আসিয়া উপস্থিত হইত। ক্রমে "বাজরা" শ্রেণীর "কম্বু" বা "রাগী" শস্যক্ষেত্র ও কচ্ছবিরহিতা স্ত্রীকুল সম্মুখীন হইল। গ্রামবাসীর পালিত হস্তী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। কল্য আমরা কর্ণাটে ছিলাম। রজনী প্রভাতা হইলে দৃষ্ট হইয়াছে, আমরা দ্রবিড়ে, অধুনা কেরলে উপনীত হইয়াছি। দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্নাবয়ব। ফলবান বৃক্ষবাটিকার অন্তরে মধ্যে মধ্যে উচ্চ দেহবিশিষ্ট বাঙ্গালার তৃণাচ্ছন্ন গৃহের মত তালপত্র আচ্ছাদিত বাসস্থান। ধান্যক্ষেত্রে কটিবসনা স্ত্রীজাতি দণ্ডায়মান।

তুলামাসের শেষ দিন উপলক্ষে উৎসবের জন্য নিকটবর্ত্তী জনপদের বহুলোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাহারা এই ট্রেনে উঠিলেন। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর শকটে দুইটি পুরুষ ও একটি কিশোরীসহ মহিলা উঠিয়াছেন। মলয়ারি পুরুষটীর মস্তকের মধ্যস্থলে শিখা; শিরের অপর ভাগ ও শ্মশ্রু গুম্ফ মুণ্ডিত। তাহার কর্ণে ক্ষুদ্র লিপ্ত কুণ্ডল আছে। পরিধানে কৌপীনসহ বহির্বাস। বৈদেশিক প্রভাবে কোট্ ও টুপি ধারণ করিয়াছেন। স্ত্রীর পরিধান পুরুষের মত, মস্তকে চিকুরদাম চূড়ার ভাবে সজ্জিত, শ্বেত বস্ত্রখণ্ড মস্তকোপরি হইতে গাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে; কর্ণে সুবৃহৎ হিরণ্যকর্ণিকা কর্ণপত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া ত্বকের পরিধি মধ্যে অবস্থান করিতেছে। গলে সুবর্ণ মাল্য; মণিবন্ধ অলঙ্কারবিহীন।

সোরনুর ষ্টেষণে অবরোহণ করিয়া গো-যানে উঠিতে হইল। কুচ্চি এখান হইতে ৩৬ ক্রোশ। সুরী নদীর উপর সেতু আছে। পরপার হইতে বোধ হয় কুচ্চিরাজ্য আরম্ভ হইল। ত্রিচুরের পথ অরণ্য ভেদ করিয়া চলিয়াছে। বনদেবীগণ অনাবৃতবক্ষে সঞ্চরণ করিতেছেন, আমাদের সেদিকে চাহিতে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করেন না। কোন যুবতী কাষ্ঠশিরে মন্দগতিতে আসিতেছেন, কেহ বা অন্য কার্য্য ব্যপদেশে স্থানান্তরে যাইতেছেন। সৌন্দর্য্যের ছাঁচগুলি নিটোলভাবে দেহযষ্টি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। নগ্নমাধুরী বীভৎস না হইলে বিশেষ তৃপ্তিকর হয়। আমার সহচর অবাক্ হইয়া গেলেন, আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম, সভ্যতার ছলনা অদ্যাপি এখানে প্রবেশ করে নাই। যে ব্যবহার দূষ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না, তাহা কেন লজ্জাকর হইবে? পূর্ব্বে ত্রিবাঙ্কোড়ে রাজ

সমক্ষে নায়ারসীমন্তিনী বক্ষ আবৃত রাখিলে অসম্মান প্রদর্শন করা হইতেছে বলিয়া গণ্য হইত।

তাপাসহিষ্ণু মলয়ারিগণ তালপত্রের আতপত্র পরিগ্রহ করিয়া চলিয়াছেন। কেরল-ভূপতি পর্য্যন্ত তালপত্রের ছত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। খদিরবিহীন তাম্বুল সেবনার্থ অপক্ক শুপারি কর্ত্তন ও লিখনসৌকর্য্যের জন্য এক খানি ক্ষুদ্র ছুরিকা কটিসংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে। সৎপথের উভয় পার্শ্বে নাজারা (খৃষ্টান) গণের বসতি ও পণ্যবীথিকা। তাহারা যে বৈদেশিকভাবে অনুপ্রাণিত, অঙ্গনাগণের গাত্রাবরণ জামা সে সাক্ষ্য দিতেছে। বালিকারা কর্ণপত্রের ছিদ্র চতুরঙ্গুলি পরিমিত করিবার জন্য দুইটী করিয়া সীসক চক্র আলম্বিত করিয়া দিয়াছে।

আমাদের নিদ্রাকালে রাত্রি একটার সময় গাড়ি থামিল। চালক "কোকাল" "কোকাল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। ব্যাপারটী কিছুতেই আমাদের বোধগম্য করাইতে না পারিয়া সে নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে কিঞ্চিৎ হিন্দীভাষাভিজ্ঞ এক মুপ্লালা (মুসলমান) বালককে নিদ্রোত্থিত করিয়া সমভিব্যাহারে আনিল। কথাটি এই যে এ স্থানের নাম কোকাল, এখান হইতে "উড়ী" (উড়ূপ) যোগে কুচ্চি যাইতে হয়।

উষার আলোক প্রকাশিত হইলে নদীবক্ষে শতাধিক দ্রোণীর ছদি দৃষ্ট হইল। ইহা দ্বারা কুচ্চি হইতে দ্রব্যজাত আনীত ও প্রেরিত হইয়া থাকে। কুচ্চি ও ত্রিবাঙ্কোড়ের বৃটিষ্ রেসিডেন্ট্ ত্রিচুরে বাস করেন। তদীয় দুইখানি তরণী সজ্জিত রহিয়াছে। টিপু সুলতান মালয়ার আক্রমণ করিলে জিমরিণ্ স্বকীয় তাবৎ বলক্ষয় করিয়া দেশত্যাগ করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্তু কুচ্চিরাজ বলবানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন ; এ জন্য অদ্যাপি রাজদণ্ড ধারণ করিতেছেন। সকল অবস্থায় স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা শ্রেয়ঃ নহে।

এদেশে সরিতের প্রাচুর্য্য হেতু নদীর বিশেষ নাম নাই। তীরবর্ত্তী স্থানের নামানুসারে প্রবাহের সংজ্ঞা হইয়া থাকে। আমরা তণ্ডুল ও চিপিটকাদি সংগ্রহ করিয়া কুচ্চি যাত্রা করিলাম। মিষ্টান্নের মধ্যে নারিকেল লড্ডুক পাইয়াছিলাম। তাহা নাজারার নিকট ক্রীত হইয়াছে সন্দেহ হওয়ায় নিক্ষেপ করিতে হইল। সমুদ্র-বেলার পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রণালী-পথে দ্রোণী খানি মৃদু হিল্লোলে যষ্টিভরে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি শ্যামল ছবিখানির

বিস্তার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের পূর্ব্বদিন আহার না হওয়ায় সেদিকে লুব্ধদৃষ্টি নিপতিত হইল না। কোথায় উপযুক্ত ভূমি মিলিবে, এই চিন্তা হইতেছে, এমন কালে অনুকূল বায়ু উপস্থিত হওয়ায় নাবিক পাল তুলিয়া দিল। আমরা অপরিচিত স্থানে যে অজ্ঞাতকুলশীলকে সহায় করিয়া চলিয়াছি, তাহার সহিত ইঙ্গিত ভিন্ন কথোপকথনের উপায় না থাকায় অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইতে হইয়াছে। অবশেষে এক "ধানমারি" (নিম্নভূমি)তে অবতরণ করিয়া নারিকেল আম্র পনসের উদ্যানে পাকের আয়োজন করা হইল।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বাঙ্গালার মত। প্রাবৃট্ কালে ভূমি জলমগ্ন হয়; জল অপসৃত হইলে বিবিধ ধান্য বপন হইয়া থাকে, কোনটী সার্দ্ধদ্বিমাসে, কোনটি বা চারি মাসে পক্ক হয়। যাহা ষণ্মাসে পরিপক্ক হয়, তাহার শস্য-মঞ্জরীতে চৌদ্দটী, আর যাহা সার্দ্ধ দুই মাসে পাকে, তাহাতে সাতটি বীজ ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক ভূমিতে বৎসরে দুইবার শস্য জন্মে।

আহারান্তে যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, নারিকেল উদ্যানের শোভা, ততই গভীর হইয়া আসিতেছে। ক্ষুদ্র তটিনীর উভয় পার্শ্বে অবিরল নারিকেল বৃক্ষরাজী অবিরল ফলগুচ্ছ ধারণ করিয়া নদীগর্ভে আনত হইয়াছে। পশ্চাতে একপংক্তি, তদনন্তর অন্যশ্রেণী চলিয়াছে। নারিকেলাভ্যন্তরে গুবাক আপন অঙ্গ মিশাইয়া সুষমা বিস্তার করিতেছে। বৈচিত্র্যবিহীন হইলে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয় না, সেই কারণে কৃশ পূগ তরু মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র মস্তক উত্তোলন করতঃ দণ্ডায়মান। নিম্নে আর এক স্তর না দিলে নিরবচ্ছিন্ন শ্যামল হয় না, তাই কদলী শাখা বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। বাঙ্গালা অপেক্ষা কেরল শ্যামরূপে অধিক পরিমাণে সুন্দর। ইহাতে "বন্দে মাতরং" সঙ্গীতটী সহসা হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল। সুর দিব্য মিলিতেছে, কাশ্মীরের পর এতাদৃশ তৃপ্তিদায়িনী শোভা আর দৃষ্ট হয় নাই। যাহা বারম্বার দর্শন করিতে বাসনা হয়, অথচ নিঃশেষিত হইতেছে না, তাহা কি প্রীতিপদ! নদীকূলে শুষ্ক নারিকেলবৃন্ত বা কেতকীজাতীয় লতার বেড়া গৃহস্থের বাটীর সীমা নির্দ্দেশ করতঃ চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কেতকী ফলের আকার পক্ক আনারস ফল স্তবকের ন্যায়। নারিকেলকুঞ্জের মধ্যে ইতস্ততঃ স্থাপিত বলিয়া গৃহগুলিতে প্রখর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইতে পারে না। এই কুঞ্জবনে ইডেন্ উদ্যানস্থ ইভের মত কেরলীগণ বিচরণ করিতেছে।

পত্রবিতান তমসাবৃত হইলে শয়নের আয়োজন হইল। নাবিকদ্বয় বিশ্রাম করিল না। সূর্য্যোদয় হইলে দুগ্ধ আহরণার্থ "পালু" (পয়স্) শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভৃত্যকে গাভীর অন্বেষণ করিতে নিয়োজিত করিলাম। কুত্রচিৎ দুই একখানি তৈলের পণ্যশালা দৃষ্ট হইল, কোন আপণে কদলীগুচ্ছ কণককান্তি বিস্তার করিতেছে। কোন স্থানে নারিকেলবল্কল রজ্জুর উপযোগী করিবার জন্য কাষ্ঠতাড়ন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। নারিকেলশস্য পেষণার্থ নরচালিত পেষণযন্ত্রখানি তদুপরিস্থ ছদিসমেত ভ্রাম্যমাণ। শিউলী কটিদেশে ভাণ্ড আবদ্ধ করিয়া নারিকেল বৃক্ষারোহণ-পর হইল। তস্কর অবরোধের জন্য গৃহস্থ বৃক্ষগাত্রে কণ্টকের বেষ্টন দিয়াছে। যে বৃক্ষের ফল আপনি পতিত হইতে পারে, তন্নিম্নে করণ্ড প্রস্থাপিত হইয়াছে। এদেশের শ্রী নারিকেলের উপর নির্ভর করে, এ জন্য দেশের নাম কেরল। মলয়পর্ব্বত হইতে মলয়ার নাম ব্যুৎপন্ন হইয়াছে।

বেলানগর যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তৈল ও রজ্জু সম্ভার-গৃহের সংখ্যা ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। দূরে কতকগুলি খর্পরাচ্ছন্ন বৃহৎ গৃহ, উহাই কুচ্চি বন্দর। পশ্চাৎ সরিৎ হইতে অম্বুধি ও দূরবর্ত্তী গুণবৃক্ষসমন্বিত বাষ্পীয় অর্ণবপোতের ক্ষুদ্রাবয়ব দৃষ্ট হইল। প্রণালীর আকার এখানে সমুদ্রবৎ।

কোন ভূতত্ত্ববিৎ সমভিব্যাহারে থাকিলে বালুকার স্তর পড়িতে আরম্ভ হইয়া এই দ্বীপ উৎপন্ন হইতে কি পরিমিত কাল অতিবাহিত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিতাম। শত বর্ষে ভূমি আড়াই ফীট্ উচ্চ হয়। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিতেন, পৃথিবীতে ছয় সহস্র বর্ষ হইল মানববসতি হইয়াছে। অধুনা মানবের উৎপত্তি কালের পরিমাণ তিন লক্ষ বৎসর বিবেচিত হইয়া থাকে। মামথ্ মৃগয়াকারী মনুষ্য এক লক্ষ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী জীব।

কুচ্চি বন্দর বোম্বাইবাসী গুজরাটীদের দ্বারা চালিত। কচ্ছ-মাণ্ডুই প্রদেশের হিন্দু ভাটিয়া, মুসলমান খোজা, কোকনস্থ ব্রাহ্মণ ও কোচিনী য়িহুদীতে নগর পরিপূর্ণ। ভাটিয়াগণ আফ্রিকা ও খোজাগণ মরিসস্ পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিয়া থাকেন। জনেক ভাটিয়া বণিক কহিলেন, তিনি নৌকাযোগে সপ্তবার আফ্রিকাখণ্ডে বস্ত্রের ব্যবসায় করিতে গিয়াছিলেন। বস্ত্রের বিনিময়ে গজদন্ত প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইত। বন্য ক্রেতৃগণ কোন প্রকার প্রতারণা করিত না। বোম্বাই হইতে যে বস্ত্র গৃহীত হইত, তাহার মূল্য যথাস্থানে পঞ্চাশৎ

দেয় ছিল। ইদানীং আফ্রিকায় ইউরোপীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি হওয়ায় উক্ত ব্যবসায় রহিত হইয়াছে। যবনান্ন গ্রহণ করিতে হয় না বলিয়া এই গতায়াতে বল্লভাচারী বৈষ্ণবদিগের হিন্দুত্ব অব্যাহত রহে। বঙ্গদেশে ইউরোপ যাত্রা-কারিগণ যদি অন্ন বিচার রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে জাতিচ্যুত হইবেন না। জাতিরক্ষা করিবার উপায় না করিয়া শাস্ত্রার্থ বলে সমুদ্রযাত্রার বৈধতা প্রতিপন্ন করিলে ফল হইবে না।

৯৪ বৎসর পূর্ব্বে বুচানন্ যখন মালয়রে আগমন করিয়াছিলেন, তখন ১০০০ নারিকেলের মূল্য ১৩৷৷০ টাকা; ১০০০ সুপারি ৸০ আনা; মরিচ এক খণ্ডি (খারি) ৮/৭ মূল্য ১২৫৲ টাকা; এলাচ্ এক খারি ১০০৲ টাকায় বিক্রীত হইত।

১২৯৯ সাল

৩ অগ্রহায়ণ।

	প্রেরণ ব্যয় সমেত কোচিনে ১/০ মোণের মূল।	কলিকাতায়।
নারিকেল শস্য	৭৶০	অজ্ঞাত
নারিকেল তৈল	১২/০	১২৲
নারিকেল রজ্জু (স্থূল)	৩৸৶০	৪৲
মরিচ	১৬৷৵০	১৫৲
এলাচ	৬৯৸৶০	অজ্ঞাত

কুচ্চি ও কলিকাতার মূল্যের তারতম্য দৃষ্ট হইতেছে না; তবে বণিজ্যায় লভ্য কি? কলিকাতায় কুচ্চি ভিন্ন অন্যত্র হইতে ঐ সকল দ্রব্য আনীত হয়, এবং কুচ্চি হইতে কলিকাতা ভিন্ন অন্যস্থানে পণ্যসম্ভার গিয়া থাকে; এ কারণ সময় বিশেষে মূল্যের অনুপাত লাভজনক না হইতে পারে। কুচ্চি হইতে যাঁহারা কলিকাতায় দ্রব্য পাঠান, তাঁহারা টাকা না আনাইয়া তণ্ডুল ও থলে আনাইতে পারেন; ইহাতে কলিকাতায় প্রেরণ-ব্যয়ের উপর যে হুণ্ডীর বাঁটা ধরা হইয়াছে তাহার হ্রাস হইবে। কুচ্চিতে ক্রয়কারী যদি অগ্রিম অর্থ দিয়া পণ্য গ্রহণের নিয়মসূত্রে আবদ্ধ থাকেন, হট্ট-মূল্য হইতে অবশ্য সুলভে গ্রহণ করিবেন।

শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়কে উপায়ান্তরাভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল বিষয়-তৃষ্ণা থাকিলেই বণিক হইতে পারে না; আশার সহিত সাবধানতা মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। পর্য্যবেক্ষণী শক্তি শিক্ষাসাপেক্ষ নহে। সকলে গণনা-কুশল হইতে পারেন না। লোকাদরপ্রিয়তা, এবং আসঙ্গলিপ্সা প্রবল থাকা চাই। নতুবা স্বার্থবাহ অকৃতকার্য্য হইবেন। গুর্জ্জরনিবাসী বণিকগণ কেরল হইতে শ্বেত এলা-ফল বাঙ্গালায় লইয়া যান, এজন্য আমরা তাহাকে গুজরাটী এলাচ্ আখ্যা প্রদান করিয়াছি। মলয়ারে এলাচ্ রাজসম্পত্তি; ব্রিটিষ্ রাজের অহি-ফেণের ন্যায় সার্ব্বজনিক উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া একটি বিভিন্ন পল্লীতে উপনীত হইলাম। জ্যোৎস্না-ময়ী য়িহুদী ললনাকুল গৃহদ্বার ও যবনিকাভ্যন্তরে পরিলক্ষিত হইতেছেন। উজ্জ্বলবর্ণের গুণে শ্বেত পরিচ্ছদ উজ্জ্বলতর দেখাইতেছে। মার্জ্জিত স্বর্ণের বর্ত্তুল-মালিকা দিব্য সাজিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তেজঃপুঞ্জ দুই একটি পুমান্ দেখা দিতেছে। চন্দ্রমণ্ডলে কলঙ্কের মত য়িহুদীপল্লীতে শ্যামাভ দেশীয় য়িহুদীর দল রহিয়াছে। কলিকাতায় ইহাদিগকে কোচিনী কহে। শ্বেত ও কৃষ্ণয়িহুদীতে সঙ্কর বিবাহ হয় নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মলয়ারে বাসের জন্য য়িহুদীগণ ব্রাহ্মণ রাজার নিকট একটি স্থানের সনন্দ পাইয়াছিল। মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম এতদুভয় য়িহুদীধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন ভাষা মাত্রেই পূর্ব্ব ভাষার সহিত সংস্রব রাখে, তদ্রূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের ছায়া লইয়া গঠিত হয় নাই, অবনীতে এমন কোন ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই। হজরৎ মহম্মদ কহিয়াছেন, আমি নূতন কোন বিষয় প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করি না; ইব্রাহিম যে প্রকার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রচার করিতেছি। মহম্মদের য়িহুদী এবং খৃষ্টান্‌ভার্য্যা ছিল। মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মের সার বিষয় এক। ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব, স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব, ঈশ্বরাদিষ্ট গ্রন্থ, ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি, শেষ বিচারের দিন ও ঈশ্বরের অনুজ্ঞায় উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ আস্থা করিয়া থাকেন। সমুদ্রতটে অবস্থিত বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রবাস-সাহসী "অঞ্জুবর্ণ" (পঞ্চমবর্ণ) জেরু-জালেম নিবাসী য়িহুদী, ইয়ুরোপীয় খৃষ্টান, এবং আরব্য মুসলমানবর্গ কেরলে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীদুর্গাচরণ ভুতি।

ব্রহ্ম রমণী।

গত সংখ্যক 'ব্ল্যাকউড্' পত্রিকায় 'ব্রহ্মরমণী' শীর্ষক একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকাবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আমরা এই প্রবন্ধের সার সঙ্কলন প্রকাশ করিতেছি।

ব্রহ্মবাসিগণ রমণীবর্গকে যেরূপ স্বাধীনতা, তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির উপর যে পরিমাণে অধিকার দান করেন; পৃথিবীর কোন দেশেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। আইনের চক্ষে এ দেশে পুরুষ ও রমণীর অধিকার সমান। পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার, পুত্রের অধিকার অপেক্ষা অল্প নহে; রমণীর বিষয়ের কেহ ট্রষ্টী নিযুক্ত হয় না, এবং বিবাহের পর তাহারা তাহা যথেচ্ছ ভোগদখল করিতে পারে। শৈশবকাল হইতেই স্ত্রীজাতি স্বাধীন; ব্রহ্মরমণীগণের শৌর্য্য বীর্য্য সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। রমণীগণের অনন্ত প্রশংসাধ্বনিতে ব্রহ্মের প্রেমসঙ্গীত তরঙ্গিত নহে; কিম্বা রমণীগণ সকল পাপের মূল, এ কথা বলিয়া কোন ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা তাহাদের দিকে কোন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ক্ষেপণ করেন না। ব্রহ্মের কোন পুরুষ তাহাদিগকে ধর্ম্মের সহচারিণী বা অধর্ম্মের পথপ্রদর্শিকা বলিয়া মনে করেন না। তাহাদের সাহিত্যে স্ত্রী পুরুষ এবং পৃথিবী সম্বন্ধে কোন উচ্চ আদর্শ কল্পিত হয় নাই; পৃথিবীতে জীবন সাধারণতঃ যে ভাবে চলে, তাহারই একটা মোটামুটি ভাব লইয়া তাহারা জীবনপথে অগ্রসর হয়। ব্রহ্মরমণীগণের মধ্যে কেহ বীর নারী নাই, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রেমিকার অভাব নাই; রমণীর যে সকল গুণ প্রার্থনীয়, ইহাদের মধ্যে তাহা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সুগঠিত মধ্যদেশ, অনতিদীর্ঘ দেহ, তাহার উপর ঢিলা পিরান, বিদেশী আগন্তুকের চক্ষে বড়ই সুন্দর দেখায়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের চাহনীতে, তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে এমন একটী মাধুর্য্য ক্ষরিত হয়, যাহাতে মুগ্ধ পুরুষ-চক্ষু একেবারে বদ্ধ হইয়া যায়। পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের বর্ণ গৌর, চক্ষু গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ না হইলেও তাহার চঞ্চল আকর্ষণী শক্তি পুরুষের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। ব্রহ্মরমণীগণের ব্যবহার অতি নম্র, প্রকৃতি গম্ভীর, বিলাসবাসনা অনন্যসাধারণ এবং কণ্ঠস্বর অতি কোমল ও সুমিষ্ট।

ব্রহ্ম পুরুষের ন্যায় রমণীগণের মধ্যে লেখাপড়ার আলোচনা সাধারণ

নহে, বাদ্যযন্ত্র চালনায় তাহাদিগকে অভ্যস্ত দেখা যায় না ; রমণীগণের মধ্যে অনেকে গ্রাম্য কবিতা সুর করিয়া শুদ্ধরূপে আবৃত্তি করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিবার কোন বন্দোবস্ত নাই ;—নৃত্যবিদ্যা, অঙ্কণ-কৌশল প্রভৃতিতেও তাহারা অনভ্যস্ত। গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্যে তাহারা বাল্যকাল হইতেই শিক্ষিত হয় ; রমণী-প্রকৃতি তাহাদের চতুষ্পার্শে কিরূপে বিকশিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিমগ্ন রহিয়াছে—তাহা তাহারা সম্পূর্ণ-রূপে ধারণা করিতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাগণও চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, এবং তাহারা যে সকল পুরুষ ও রমণীকে দেখিতে পায়, তাহাদের সম্বন্ধে এক একটা মতামত সংগঠন করিতে সমর্থ হয়,—তাহাদের এই সকল মতামত, তাহারা যাহা দেখে সে সম্বন্ধে তাহা-দের মনোভাব, বাস্তবিকই প্রীতিকর জ্ঞাতব্য বিষয়। সেই সকল সুন্দর চিন্তা অজ্ঞতাপ্রসূত নহে, তাহা তাহাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা-জাত।

ব্রহ্মবালিকাদিগের আমোদ ও ক্রীড়ার সংখ্যা অধিক নহে। প্রত্যেক গৃহস্থবালিকার উপর কতকগুলি গৃহকর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়া থাকে ; ধনীর গৃহে দাসদাসীর প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তাহাদের কন্যাগণ নিজের জন্য কিম্বা পিতামাতার নিমিত্ত সেলাইএর কাজ করে। ইহারা বাল্যকালে বিবাহিতা হয় না ; ষোল হইতে কুড়ি বৎসর বয়স ইহাদের বিবাহ-কাল, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক বয়সে অনেকের বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহ তাহাদের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

ব্রহ্মরমণীগণের মধ্যে 'পূর্ব্বরাগের' নিয়ম আছে ; সমস্ত ব্রহ্মেই এ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। এবং সেজন্য সময়ও নির্দ্দিষ্ট আছে। রাত্রি নয় দশ ঘটিকার সময় ইহারা অনুরক্ত পুরুষের সহিত মিলিত হয় ; বিশেষতঃ রজনী যদি শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী হয় তাহা হইলে ত কথাই নাই। এখানকার চন্দ্রা-লোকপ্লাবিত রাত্রি কি রমণীয়! সমস্ত জগৎ রৌপ্যময় স্বপ্নে মগ্ন হইয়া যায়, কেবল মৃদু নৈশ সমীরণের মধুর হিল্লোল, কুসুম-সুরভি-ভারে আকুল হইয়া নিদ্রাহীন প্রণয়ীযুগলের গণ্ডস্থলে চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়, বাঞ্ছিতের কামনায় প্রাণ তখন কণ্ঠাগত হইয়া উঠে। প্রত্যেক গৃহের সম্মুখেই বারান্দা, মৃত্তিকা হইতে তিন ফীট উচ্চ। বালিকাগণ এই বারান্দায় বসিয়া বিশ্রাম করে। সঙ্গে কখন একটি সখী, কখন বা সে একাকী। প্রণয়-প্রার্থিগণ ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দার নিকট দণ্ডায়মান হয়, এবং অর্দ্ধস্ফুট-

রবে, অতি ধীরে তাহাদের আবেগপূর্ণ তৃষিত হৃদয়ের কাহিনী বিবৃত করে। কখন কখন কোন কার্য্যোপলক্ষে যুবকগণ আসিয়া সসম্ভ্রমে তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া যায়। বালিকাগণ তাহাদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করে, ইচ্ছা হইলে কাহাকেও চুরট দান করে, এবং যদি দৈবাৎ কোন অনুগৃহীত প্রণয়পাত্রের শুভাগমন ঘটে, তাহা হইলে চুরট ধরাইয়া তাহার মুখে লাগাইয়া দেয়, ইহা যেন তাহারই কোমল স্নেহ-চুম্বন।

বারান্দার অদূরে বালিকার কোন আত্মীয় শয়ন করিয়া থাকে, কারণ হঠাৎ কোন বিপৎপাত হইলে সে বালিকার সাহায্যে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইতে পারে; এরূপ সময়ে বন্ধুভাবে কোন শত্রুর আগমনও অসম্ভব নহে। বালিকাগণের প্রণয়ে বাধা দিবার কেহই নাই, যাহাকে ইচ্ছা সে বিবাহ করিতে পারে। তবে বিবাহ-প্রার্থীর সচ্চরিত্র, সক্ষম হওয়া চাই; স্ত্রী যতটুকুই সাহায্য করুক, তাহার বলে এবং নিজের ক্ষমতায় তাহাকে সংসার চালাইতে হইবে। কিন্তু যদি তাহা সেই লুব্ধ প্রণয়ীর পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সে বালিকাকে লইয়া পলায়ন করে; এরূপ অবস্থায় পরিবারের মধ্যে ভারি একটা গণ্ডগোল বাধিয়া উঠে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা দশদিনের অধিক স্থায়ী হয় না।

কোন কারণে বিবাহে বিলম্ব ঘটিলেও অনেক সময় প্রণয়িণীকে লইয়া প্রণয়ী অন্তর্ধান করে, বিলম্ব করিতে তাহাদের ভরসা হয় না; শুভকর্ম্মে কত বিঘ্ন ঘটিতে পারে কে জানে? জীবনও ত দীর্ঘ নহে।

পূর্ণিমা নিশায় দিবারাত্রির কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না; কেবল সূর্য্যের কণক কিরণের পরিবর্ত্তে চন্দ্রের রজতচ্ছটা, তেমনি পরিস্ফুট এবং সমুজ্জ্বল! আরণ্য ভূমি হর্ষমগ্ন, অরণ্যের অন্তরালে কাঠুরিয়াগণের পর্ণকুটীর, ইতস্ততঃ জল-প্রপাত, সুগন্ধি শ্যামল তৃণের সুকোমল শয্যা, আর উন্নত বৃক্ষরাজীর অবারিত ছায়া। এখানে খাদ্যদ্রব্যেরও অভাব হয় না। এক ঝুড়ি চাউল, গোটাকতক শুকটি মাছ এবং খানিক মসলা একটা নিরালা যায়গাতে অনায়াসেই লুকাইয়া রাখা যাইতে পারে; কেবল দুই একটা হাঁড়ির দরকার, দুটি হাঁড়িতেই এক সপ্তাহ ভাতর াঁধা চলিতে পারে। কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর সাহায্যে তাহা এখানে আনীত হয় এবং এই নিভৃত আরণ্য প্রদেশে পলায়িত প্রণয়ীযুগল কিছু দিন অতি আরামে অতিবাহিত করে। পীত, লোহিত কত বর্ণের সুন্দর সুন্দর পুষ্পে এই বনভূমি অলঙ্কৃত, এই সকল পুষ্প আহরণ

করিয়া প্রণয়ী প্রণয়িনীর কেশদাম ফুলে সজ্জিত করিয়া দেয় এবং প্রতি-ক্ষণে উভয়ে প্রণয়োদ্দীপ্ত মধুর কল্পনায় অভিনব পৃথিবী সৃজন করিয়া তাহাতে কল্পনাতীত মোহময় সুখভাণ্ডার আবিষ্কার করে। নূতন আলোকে তাহাদের হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এবং রহস্য-সঙ্কুল স্নিগ্ধ বন-চ্ছায়া এই সকল বন বালকবালিকাগণের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের মধুময় স্মৃতি নবজাগ্রত করিয়া তুলে। হঠাৎ এক দিন হয় ত গিরি-উপত্যকার পবিত্র অশ্বথ মূলে তাহাদের সঙ্গে ভগিনী অথবা পিতৃব্য-পত্নীর গোপনে সাক্ষাৎ হইল; তিনি তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন যে, তাহাদের বিবাহের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হইয়াছে। অনতিবিলম্বে বন্ধুগণ আসিয়া মহানন্দে তাহাদিগকে বিবাহ বাসরে লইয়া চলিল; তখন সেই নন্দন কানন ত্যাগ করিয়া মর্ত্তের এই সাধারণ গার্হস্থ জীবনে প্রবেশ করিতে হয় ত তাহাদের হৃদয় সন্তপ্ত হইয়া উঠে।

উক্ত প্রবন্ধের লেখক মিঃ ফিলডিং সাহেব তাঁহার বালক ভৃত্য সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্পে এই প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার বিংশ বৎসর বয়স্ক একটি পরিচারক ছিল। এক বৎসর হইতে সে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সাহেব তাঁহার আড্ডা হইতে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে তাম্বু ফেলিয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার পরিচারক সেই গ্রামের সর্দ্দার-কন্যার প্রণয়-ভাজন হয়। এই বালিকা অতি সুন্দরী। তাহার মস্তকে তরঙ্গায়িত অলকগুচ্ছ এবং কণ্ঠস্বর অতীব মনোহর। বালিকা এই যুবকের প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন সন্ধ্যা-কালে যুবক তাঁহার নিকট আসিয়া ছুটির প্রার্থনা করিল, দুই একদিনের মধ্যেই তাহাদের বিবাহ হইবে, সুতরাং আর বিলম্ব করা অসম্ভব। সাহেব তাহাকে উপদেশ দিলেন যে, তাহাদের দুজনেরই বয়স যখন অল্প, তখন আর কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া সাংসারিক অবস্থা কিছু ভাল হইলে বিবাহ করা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ এ সময় তাহার চাকরি ছাড়িয়া যাওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। যুবক সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আহারাদির পর তাহার প্রণয়িণীকে এই সকল কথা বলিতে গেল। সেদিন চলিয়া গেল, যুবক আর ফিরিল না, পরদিন সকালে যুবতীর পিতা সর্দ্দার আসিয়া বলিল, তাহার কন্যাকে পাওয়া যাইতেছে না। বলা বাহুল্য দুই জনেই পরামর্শ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাহাদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; অবশেষে একদিন সন্ধ্যাকালে ফিলডিং সাহেব

তাম্বুর সন্নিকটবর্ত্তী একটি সুবৃহৎ অশ্বত্থমূলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় পলাতকা যুবতীর মাতা আসিয়া সাহেবকে জানাইল যে তাহার কন্যার সহিত সাহেবের ভৃত্যের বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া গিয়াছে, যুবক অন্যত্র চাকরীও পাইয়াছে, তাহাতে যে অর্থ উপার্জ্জন হইবে, তাহাতেই স্বামী স্ত্রীর স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিবে; কিন্তু সাহেব যতক্ষণ সে অঞ্চলে আছেন, ততক্ষণ তাঁহার ভাবী জামাতা সেদিকে আসিতে ভরসা করিতেছে না। তিনি রাগ করিয়াছেন ভাবিয়া সে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। সাহেব সেই স্ত্রীলোকটিকে অভয় দিয়া বলিলেন, তিনি রাগ করেন নাই, অধিক কি প্রণয়ীযুগলকে বিবাহিত দেখিলে তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইবে। স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল। তাহার কন্যা ও ভাবী জামাতা সন্নিকটবর্ত্তী অরণ্যে লুক্কায়িত ছিল বলিয়া অনুমান হয়; কারণ পরদিন প্রভাতেই উভয়ে সাহেবের তাম্বুর সম্মুখে উপস্থিত হইল; তাঁহার ভৃত্য অনেকক্ষণ লজ্জায় সাহেবের দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু শীঘ্রই এ সঙ্কোচ বিদূরিত হইল, এবং সে পূর্ব্ববৎ অসঙ্কুচিতভাবে তাহার প্রভুর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

ব্রহ্মরমণীগণ সবলদেহা, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা এবং সাহসিনী। ব্রহ্মে বিবাহ-বন্ধন বিচ্যুতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া মিঃ ফিল্ডিং বলিয়াছেন— এদেশে বিবাহ কিম্বা বিবাহ-বন্ধনচ্যুতি বৎসরে কি পরিমাণে ঘটে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ, কারণ তাহার কোন হিসাব রক্ষিত হয় না। তবে সাহেব তাঁহার অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শতকরা একটি দম্পতি বিবাহ বন্ধন ছেদন করে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। পতি-পত্নী পরস্পরকে পরিত্যাগ করিলে পুত্র পিতার নিকট যায়, মাতা কন্যাকে গ্রহণ করে, কিন্তু পুত্র-কন্যা-পরিবৃত কোন দম্পতিকে প্রায়ই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে দেখা যায় না। ব্রহ্মরমণীগণ যে শুদ্ধ ব্রহ্মবাসীরই সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত তাহা নহে; ইংরেজ, চীন, হিন্দু, মুসলমান ব্রহ্মের অনেক বৈদেশিক উপনিবেশিকই ব্রহ্মরমণীকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতেছেন; ভারতবর্ষের লোক ভারতের বাহিরে বাস করিতে কদাচ রাজী হয় না; এমন কি ফিল্ডিং সাহেবের মতে একজন ফরাসী তাহার স্বদেশ ত্যাগ করিতে যে পরিমাণে অনিচ্ছুক একজন হিন্দুস্থানী হিন্দুস্থান ছাড়িতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অনিচ্ছুক, কিন্তু তথাপি তাঁহার একজন শিখ সৈন্য কর্ম্ম হইতে অবসর

গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মে বাস করিতে লাগিল, ব্রহ্মরমণীকে বিবাহ করিয়া সে স্বদেশ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গকে ত্যাগ করিয়া চিরজীবন প্রবাসে অতিবাহিত করিতে কুণ্ঠিত হইল না। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ব্রহ্মদেশে তত্রত্য রমণীবর্গ সম্বন্ধে যে সকল গল্প প্রচলিত আছে, সেগুলি ব্রহ্মরমণীর আত্মত্যাগ, সাহস, অনুরাগ প্রভৃতির উৎকৃষ্ট পরিচায়ক।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ইছামতী।

খরস্রোতা ইছামতী নিশীথ আঁধারে
নগ্নকায়া, যৌবনের লাবণ্য পাথারে
নিমগ্না সৈকতশ্রেণী ; মৃদু কলনাদে
বিরহ সঙ্গীত স্ফুরে ; বহে অবসাদে
নিশীথ সমীর দূর হতে গন্ধবাহি।
শূন্যে রহে অনিমেষে তারাকুল চাহি।
তটমূলে ঘুমাইছে শ্রান্ত তরিগুলি
নাবিকেরে লয়ে বুকে ; মৃদু দীপাবলি
জ্বলিতেছে অতি ক্ষীণ অস্ফুট আলোকে।
অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা ভূলোক দ্যুলোকে।
ওপারে কানন আড়ে মৃদু কুহুস্বরে
স্বপনের মত লাগে, সুধারাশি ঝ'রে'
পশয়ে শ্রবণে যেন। নীল বন রেখা
সুদূর বিস্তৃত ; দূরে আধ যায় দেখা
মিটি মিটি দীপালোক, যেন নিভুপ্রায়
ঘন আঁধারের চাপে। যথা আঁখি ধায়
সীমাহীন অন্ধকার জাগিছে ব্যাপিয়া
দিক দশ, ঊর্দ্ধ অধ রয়েছে গ্রাসিয়া।

চলিয়াছ এঁকে বেঁকে কোন দূরদেশে
স্রোতস্বিনি! ছুটিয়াছ কাহার উদ্দেশে ?

স্মৃতি-তীর্থ কতগুলি আছে তব তীরে—
অতীত কঙ্কাল লয়ে? তব পূত নীরে
ডুবিয়াছে কত শত সৌভাগ্য তপন,
দুর্দ্দিনের অন্ধকারে ভরিয়া ভুবন।
জানি নাক তব স্রোতে পূত ভস্মরাশি
চির পুণ্যস্মৃতি সম আছে কত মিশি।
অয়ি! তব প্রেমনীরে দুকুল শোভিত—
চারু কিশলয়ে, ঘন বনানী হরিৎ
শ্যামল বরণে শোভে; তমাল পিয়াল
অশ্বথ শাল্মলী তাল শোভিছে বিশাল,
গুবাক্ খর্জ্জুরশ্রেণী—শোভে দলে দলে
দূর শূন্যে মাথা রাখি; যেন স্বর্ণ থালে
উপহার বিলাইছ নাগরিক জনে
সাধ পুরি যেবা চায় যার যত মনে।

বল দেখি আজি মোরে কোন কর্ম্মফলে
কল্পতরু সমা তুমি, কোন্ পুণ্যবলে
দীন দরিদ্রের ঘরে এত হর্ষরাশি
ফুটাইছ অবহেলে; আর বিশ্বগ্রাসি
অভাবের তাড়নায়—হতভাগ্য আমি
কেন সদা স্বার্থপর নীচ পথগামী।
বল দেখি অবস্থার কোন বিপর্য্যয়ে
এত দীন নীচ আমি, মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে
পারিনাক ক্ষুধিতের মুছিবারে আঁখি,—
পারিনাক জুড়াইতে হৃদি মাঝে রাখি।
হৃদয়ের তীর মোর মরুভূমি সম
কেন বল দেখি, কেন এতই অক্ষম
দীন হীনে হাসাইতে, কেন পর দুঃখে
অশ্রুজল নাহি ফেলি, থাকি মনোসুখে।
পুণ্যবতি! পূতনীর স্পর্শেতব আমি
পারিবকি হইবারে পুণ্যপথগামী?

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীহট্টাগমন।

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ও মনঃসন্তোষণীর সারমর্ম্ম।)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ও মনঃসন্তোষণীর সারমর্ম্ম উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, অদ্য সে চেষ্টা করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনঃসন্তোষণী উদয়াবলীরই অনুবাদ বিশেষ, সুতরাং উভয় গ্রন্থেরই প্রতিপাদ্য বিষয় এক। তবে মনঃসন্তোষণীতে অল্প যে একটু বিশেষ আছে, তাহাও যথাস্থানে বলা যাইবে। ইহাও পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, উদয়াবলীতে শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বারের পূর্ব্বদেশাগমন-বার্ত্তা বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম আগমনের চারি কি পাঁচ বৎসর কাল পরে,—১৪৩১ শকে, সন্ন্যাসগ্রহণান্তর তিনি দ্বিতীয় বার (পূর্ব্বদেশে) শ্রীহট্টে গমন করেন। সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভুর নাম হয়—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; এই জন্যই (অর্থাৎ গৌরসন্ন্যাসীর উদয় বা আগমনোপলক্ষে যে গ্রন্থ রচিত হয়, সেই) গ্রন্থের নাম প্রদ্যুম্নমিশ্র, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী রাখিয়াছেন। এখন, মূল বিষয়ের অবতারণা করা যাঁক।

শ্রীমৎ মধুকর মিশ্র নামক জনৈক বিপ্র, অতি প্রাচীনকালে শ্রীহট্ট আগমন করেন। তিনি সামবেদী ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার পূর্ব্ব বাসস্থানের নাম কি, তাহা বলা যায় না; তবে এইমাত্র অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তিনি পশ্চিম দেশ হইতে এখানে আগমন করেন। মধুকর মিশ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। শ্রীহট্ট জিলায় তিনি কিয়ৎপরিমাণ ভূমি "বরে" প্রাপ্ত হন,* মধুকরের "বরপ্রাপ্ত" হেতু ঐ স্থান "বরগঙ্গা" নামে বিখ্যাত হইল। ("বরপ্রাপ্ত হেতু নাম বরগঙ্গা থৈলা।"—মনঃ সন্তোষণী)। বর্ত্তমানে ঐ স্থানকে "বুরুঙ্গা" বলে। মধুকর সপরিবারে শ্রীহট্টে আগমন করেন, এইখানে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারিটী পুত্র হয়। কথিত আছে যে, মধুকরের স্ত্রী পঞ্চম গর্ভে একটী সর্প প্রসব করেন। (এই বিবরণ কিন্তু মনঃসন্তোষণীতে নাই।) মধুকরের তৃতীয় পুত্রের নাম উপেন্দ্র

---

* মধুকর সম্ভবতঃ কোন ধনী জমিদার কি কোন রাজা কর্ত্তৃক আনীত ও ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। "বরে প্রাপ্ত" ইহার অর্থ কি? অদ্বৈত প্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিতও, দেখা যায় যে, এইরূপই "লাউড়ের" রাজা কর্ত্তৃক শ্রীহট্টে আনীত ও শ্রীহট্ট—সুনামগঞ্জের নিকট বাড়ী করিয়া বাস করেন। সুবিধা হইলে সে কথা পরে বলিব।

মিশ্র, উপেন্দ্রের পত্নীর নাম শোভা, শোভাদেবীর অপর নাম কমলাবতী। উপেন্দ্র মিশ্র নির্জ্জনতাপ্রিয় ধ্যানানুরক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নির্জ্জনবাস (তপস্যা) জন্য পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নীর সহিত (শ্রীহট্টের) ঢাকাদক্ষিণ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপর ভ্রাতৃত্রয় বুরুঙ্গাতেই বাস করিতে লাগিলেন। (এইখানে বলিয়া রাখি যে, তাঁহার কাহারও কাহারও বংশ অদ্যাপি বুরুঙ্গায় আছেন, তবে এখন আর তাঁহারা বিশুদ্ধ "বৈদিক" নহেন, বিবাহাদিতে অনেকটা হীনতর হইয়া পড়িয়াছেন।) ঢাকাদক্ষিণ আগমনের পরে ক্রমে তাঁহার সাতটী পুত্র হয়; উপেন্দ্রের তৃতীয় পুত্রের নামই প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মিশ্র। মনঃসন্তোষণী বলেন—

"উপেন্দ্র মিশ্রের,　　　গৃহে নিরন্তর,
সাতটী সন্ততি শোভা।
সরোবরে যেন,　　　বিকশে নলিন,
হেন জন মনলোভা॥
সকল হইতে,　　　রূপ লাবণ্যেতে,
ভাল দেখি জগন্নাথে।
সুবোধ দেখিয়া,　　　সুযশ শুনিয়া,
আনন্দিত হৈলা চিতে॥"

শ্রীমৎ উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে সাংসারিক কার্য্যব্যপদেশে বিভিন্ন দেশে গমন করেন। মিশ্ররাজ তাঁহার তৃতীয় পুত্র জগন্নাথের অত্যন্ত বিদ্যানুরাগ এবং চমৎকার বুদ্ধি দর্শনে হৃষ্ট হইয়া অধ্যয়নের জন্য তাঁহাকে নবদ্বীপ পাঠাইয়া দেন। নানা কারণে, বিশেষতঃ বিদ্যাচর্চ্চার জন্য ঐ সময়ে নবদ্বীপ অতি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন শ্রীহট্ট দেশীয় অনেক লোক নবদ্বীপে বাস করিতেন। (এমন কি, মিশ্রের স্বগ্রাম ঢাকাদক্ষিণের রত্নগর্ভ পণ্ডিত, স্বীয় পুত্রত্রয়ের সহিত নবদ্বীপ বাস করিতেন। ঐরূপ আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম করা যাইতে পারে। যথা, সম্রান্ত শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারী গুপ্ত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য রত্ন প্রভৃতি। এই শেষোক্ত ব্যক্তি শচীদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন, ইনি মহাপ্রভুর মেসো)।

জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে গিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। দেশেই তৎকর্ত্তৃক ব্যাকরণাদি অধীত হইয়াছিল, উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট একণে

অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি সামবেদ পড়িয়া ক্রমে ন্যায় সাংখ্যাদি দর্শনে অল্পকালেই বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। অপিচ, তাঁহার সুমধুর বাক্য, ভুবনমোহন রূপ ও অসীম গুণ এবং অমায়িকতায় নবদ্বীপের স্ত্রী পুরুষ সকলই তাঁহার বশীভূত হয়। এই সময়েই পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে "পুরন্দর" উপাধি দান করেন।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপের একজন প্রধান লোক। তিনি একদিন জগন্নাথ মিশ্রের সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহার কুল শীল অবগত হইয়া তৎকরে আপন দুহিতারত্ন শচীকে সমর্পণ করেন। এই শুভ সম্মিলন "প্রাজাপত্য বিধানে" সম্পাদিত হয়। এই হইতেই জগন্নাথ মিশ্র, প্রকৃত পক্ষে নবদ্বীপের অধিবাসী হইলেন। গঙ্গাতীরের বাটীতে নবদম্পতি পরমসুখে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের আটটী কন্যা জাত ও অচিরকাল মধ্যে বিনষ্ট হন। অতঃপর বিশ্বরূপের জন্ম হয়। পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনাদি প্রযুক্ত জগন্নাথের মন ঐ সময় নিতান্ত বিষাদিত হয়, ও একটী অজ্ঞাত উদ্বেগে তিনি ব্যথিত হইয়া পড়েন; আবার পিতামাতাকে দর্শনের জন্য ঐ সময়েই তাঁহার প্রবল বাসনা জন্মে। যখন জগন্নাথের হৃদয় এইরূপ আন্দোলিত হইতেছিল, ঠিক তখনই তিনি পিতার পত্র প্রাপ্ত হন, উপেন্দ্র মিশ্র তাঁহাকে শ্রীহট্ট আগমনের জন্য আহ্বান করেন।

পত্র প্রাপ্তে জগন্নাথ কালবিলম্ব না করিয়া সপরিবারে বহুকাল পরে দেশে আসিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূকে পাইয়া বৃদ্ধ পিতামাতা কিদৃশ আনন্দ লাভ করেন, তাহা এস্থলে বলা বাহুল্য মাত্র। জগন্নাথ এবং শচী কায়মনে তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। জগন্নাথাগ্রজ পরমানন্দের স্ত্রীর নাম সুশীলাদেবী। সুশীলা বড় সদ্‌গুণসম্পন্না রমণী ছিলেন। এই সুশীলা ও শচীতে বড়ই "সদ্ভাব" হইয়াছিল। (এই খানে একটী কথা বলা আবশ্যক। উদয়াবলীতে পরমানন্দ মিশ্র এবং তাঁহার স্ত্রী সুশীলার প্রসঙ্গ আছে, জগন্নাথের কনিষ্ঠ অপরাপর ভ্রাতৃগণের বা তাঁহাদের স্ত্রী পুত্রাদির কোন প্রসঙ্গই নাই। পরে, মনঃসন্তোষণী পাঠে জানা যায় যে, তাহারা বিবাহের পূর্ব্বেই দেহ ত্যাগ করেন)।

এইরূপে পারিবারিক সুখে কিছুদিন অতীত হইল। শচী পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইলেন; এই গর্ভের সন্তানই শ্রীমহাপ্রভু। কথিত আছে যে, গর্ভধারণের

পর শচীদেবীর অঙ্গকান্তি উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং ইহাও বর্ণিত আছে যে, শচীর গর্ভধারণের পর একদা শোভার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, বধূকে পুত্রের সহিত যেন শীঘ্রই নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, তিনি স্বপ্নে ইহাও জানিতে পারেন যে, এই গর্ভে একটী অচিন্ত্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। বৃদ্ধা প্রাতে পতির নিকট এই বার্ত্তা পরিজ্ঞাপন করিলে ধর্ম্মভীরু উপেন্দ্র মিশ্র পুত্র ও পুত্রবধূকে নবদ্বীপ পাঠাইতে উদ্যোগ করিলেন।

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে শচী যখন গুরুবর্গকে প্রণামাদি করিতেছেন, তখন বৃদ্ধা শোভাদেবী বধূকে কোলে করিয়া মৃদুস্বরে তাহাকে বলিলেন,—

"শুন মা তোমার, গর্ব্ভের মাঝার,
যে পুরুষ জনমিবা।
দেখিতে তাঁহারে, বাসনা অন্তরে,
এথা পাঠাইয়া দিবা॥"—মনঃসন্তোষণী।

শাশুড়ীর অনুরোধ রক্ষা করিতে শচী স্বীকৃতা হইলেন। তখন "স্বল্পগর্ভা" ভার্য্যার সহিত জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপ যাইতে উদ্যত হইলেন।

"প্রয়াণং কর্ত্তুমুদ্যুক্তো ভার্য্যয়া স্বল্পগর্ভয়া।"—উদয়াবলী।

যথাসময়ে জগন্নাথ নবদ্বীপে আসিলেন, যথাসময়ে নিমাই ভূমিষ্ঠ হইলেন। ক্রমে নিমাই শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, ক্রমে উপযুক্ত সময়ে তাঁহার "হাতেখড়ি," উপনয়ন প্রভৃতি হইল।

"অতঃপর জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়।
স্বদেহ ত্যজিয়া পরম্পদ প্রাপ্ত হয়॥
তান শ্রাদ্ধ আদি ক্রিয়া গৌরাঙ্গ সুন্দর।
করিলেন যত্নক্রমে লোকে সুগোচর॥
তৎপরে শ্রীশচী মাতার আজ্ঞা অনুসারে।
বঙ্গদেশে গেলা প্রভু প্রয়োজন তরে॥"—মনঃসন্তোষণী।

(এ যাত্রা নিমাইয়ের প্রথম; তখন তিনি শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন কি না, বলা যায় না। অদ্যাপি কোন গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না; তবে পদ্মা নদী পার হইয়া আসিয়াছিলেন, এ কথা চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে)।

ঐ সময়ে তদীয় ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী দেহত্যাগ করেন এবং তাহাতে শচীদেবী অত্যন্ত শোকাভিভূতা হইয়া পড়েন। কথিত আছে, মহাপ্রভু আপন হৃদয়ে

তাহা অনুভব করিতে পারেন। মার দুঃখ জানিতে পারিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, আর তাঁহার ঢাকাদক্ষিণ যাওয়া হইল না, ফিরিয়া নবদ্বীপে আসিলেন।

শচীর আজ্ঞায় নিমাইকে আর একটী পত্নীগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার নাম—শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া। বিবাহের পর নিমাই গয়ায় গমন করেন, গয়া হইতে আসিয়াই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ, ইহার পরেই সন্ন্যাস।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাইকে শান্তিপুরে আনয়ন করা হইয়াছিল। তখন শচীদেবী প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিতে শান্তিপুরে গমন করেন, সেই সময় শচী-দেবীর চিত্তে একটী চিন্তা উদিত হইয়াছিল। তিনি ভাবিলেন—"পূর্ব্বে আমি শ্বাশুড়ীর কাছে, নিমাইকে তথায় পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া অসি-য়াছি। এ পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। এই অপরাধেই হয়তঃ নিমাই আমার কোল-ছাড়া হইল; গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘনাপরাধে আমি হয়তঃ পথের কাঙ্গালিনী হইলাম। যাহা হউক, এখন আমার এই একমাত্র বাসনা যে, নিমাই আমার কুশলে থাকুক, নিমাই আমার স্বধর্ম্মে, সম্মানে, সুস্থ শরীরে, দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকুক,—দেবতাগণ তাঁহাকে মঙ্গলে রাখুন।" শোকাকুলা সন্তান-বৎসলা শচী এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বকীয় বাক্য রক্ষা ও পুত্রের কল্যাণ-বর্দ্ধনাভিলাষে পুত্রকে ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"আর এক কথা কহি শুন বাছাধন।
তব পিতামহী সঙ্গে প্রতিজ্ঞা বচন॥
তুমি মোর গর্ভে যবে বসতি করিলা।
আমাকে প্রতিজ্ঞা তেহো তখনে করাইলা॥
শুন বধূ তোমা গর্ভে পুরুষ যে হবে।
তাকে পাঠাইয়া তুমি মোরে দেখাইবে॥
ইহা অঙ্গীকার করি আইনু নবদ্বীপে।
ইহা যদি পূর্ণ তুমি কর কোন রূপে॥"—মনঃসন্তোষণী।

শচীর এই অনুরোধই মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার পূর্ব্বদেশ আগমনের কারণ। সুতরাং সন্ন্যাসের পরই তিনি শ্রীহট্টে আগমন করেন। নিমাই প্রথমতঃ প্রপিতামহের স্থান বুরুঙ্গায় আগমন করেন। এখানে তিনি এক রাত্রি অবস্থিতি করিয়া বুরুঙ্গা গ্রাম হরিসংকীর্ত্তনে মাতাইয়া তুলেন। (এই স্থানে তাঁহার কএকটী অলৌকিক ঘটনার কথা গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহা

পরিত্যক্ত হইল।) পরদিন প্রাতে বুরুঙ্গা হইতে যাত্রা করিয়া বৈকালে পিতামহের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন সূর্য্যদেব অস্তোন্মুখ, পশ্চিম গগন নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। প্রভু পিতামহের বহির্ব্বাটিকায়, তিনি,—

"হরি হরি শব্দ মুখে করি উচ্চারণ।
করিতে লাগিলা ইতস্ততঃ পর্য্যটন॥"—মঃ সঃ।

মহাপ্রভু বহির্ব্বাটীতে ভ্রমণ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার জেষ্ঠতাতপত্নী বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীকে জানাইলেন যে, হিমাচলসদৃশ উন্নতকায় এক দিব্য সন্ন্যাসী মূর্ত্তি বহির্ব্বাটীতে আসিয়াছেন। এমন রূপ বুঝি মনুষ্যে সম্ভবে না। বৃদ্ধা বাহিরে আসিলেন, পরস্পরে পরিচয় হইল, মহাপ্রভু তখন বাড়ীর ভিতর আসিলেন। সে রাত্রি প্রভু পিতামহের বাটীতে বাস করিলেন, জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী পরম যত্নে তাঁহাকে আহার করাইলেন। বৃদ্ধা, পৌত্রের নিকট আপন সুখ দুঃখের বিবিধ কাহিনী কহিলেন ও পৌত্রের অমিয়মাখা উপদেশ লাভে কৃতকৃতার্থ হইলেন। পরদিন মহাপ্রভু নিকটবর্ত্তী "বৃদ্ধ শিব" ও "অমৃত কুণ্ড" দর্শনে গেলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইলে দুটী অদ্ভুত ঘটনার কথা বিবৃত আছে।

বৃদ্ধা তাঁহার পৌত্রকে হঠাৎ "নবজলধরবর্ণ বনমালাবিভূষিত" কৃষ্ণরূপে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে রূপ পরিবর্ত্তিত হইল, এখন আর কৃষ্ণ-মূর্ত্তি নাই। বৃদ্ধা দেখিলেন—সে স্থানে ভুবনমোহন গৌর শিশু দাঁড়াইয়া। সে দৃশ্যও পরিবর্ত্তিত হইল,—এখন সেই মহিমান্বিত সন্ন্যাসীশিরোমণি।

ইহার পরই নিমাই চলিয়া যান। এখানেই গ্রন্থ সমাপ্তি।

যে দুইটী রূপ বৃদ্ধাকে দেখাইয়াছিলেন, সেইরূপ দুইটী মূর্ত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণ মূর্ত্তি ও গৌর মূর্ত্তি (সন্ন্যাসী নহেন) বৃদ্ধা কর্ত্তৃক, (কথিত আছে) তখনই সংস্থাপিত হয়। অতি প্রাচীন উদয়াবলীতে এবং মনঃসন্তোষণীতে এই মূর্ত্তি যুগলের প্রসঙ্গ আছে। এ মূর্ত্তি যুগল যে অতি প্রাচীন, তার আর সন্দেহ নাই। ঢাকাদক্ষিণে মিশ্র উপাধিধারী যে ব্রাহ্মণগণ আছেন, তাঁহারাই পূজাদি করিয়া থাকেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ এখন নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছেন, স্বীয় বংশমর্য্যাদা ও কৌলীন্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঢাকাদক্ষিণের মহাপ্রভু শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ দেবতা, বিবিধ পর্ব্বোপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রী দেবদর্শনে বহুদূর হইতে আসিয়া থাকে। সহর হইতে ঢাকাদক্ষিণ ৮ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী

দুইটি পক্ষী।

জুন মাসের "দাসী"র ৩৫২ পৃষ্ঠাতে "বঙ্গদেশের অন্যত্র প্রচলিত" কতিপয় শব্দের যে "বাঁকুড়ী" প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটী ভুল আছে। "ছাতারে পাখী"র প্রতিশব্দে "ফেঙ্গা" বলা হইয়াছে। কিন্তু "ফেঙ্গা" ও "ছাতারে পাখী" একই পক্ষী নহে। বাঁকুড়া জেলায় যাহাকে "ফেঙ্গা" বলে, বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশে তাহাকে "ফিঙ্গে" বলে। এই পক্ষীর বর্ণ ঘোর-কৃষ্ণ। ইহার মস্তকে একটী ঝুঁটী আছে ও ইহার পুচ্ছটি কাঁচির ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত। এই পক্ষী নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে বাঁকুড়া-জেলায় যাহাকে "ধ-ফেঙ্গা" বলে, তাহার কণ্ঠ অতীব মিষ্ট। এই কারণে সুকণ্ঠ-পক্ষিপ্রিয় ব্যক্তিরা ইহাকে সযত্নে পুষিয়া থাকে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের শেষ রাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকে ইহারা এরূপ সুস্বরলহরীতে আকাশমণ্ডল পূর্ণ করিতে থাকে, যে তাহা শ্রবণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। অন্যজাতীয় "ফেঙ্গা"রা কিছু কর্কশকণ্ঠ ও কলহপ্রিয়। কাকের সহিত তাহাদের বিশেষ বৈরিতা। কাক দেখিলেই তাহারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে থাকে ও তাহাকে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে।

"ছাতারে পাখী" বাঁকুড়া-জেলাতে, (অন্ততঃ জেলার পশ্চিমাংশে) কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। "ছাতারে পাখী"র গাত্রবর্ণ পিঙ্গল বা তাম্রবর্ণ। ইহারও মস্তকে ঝুঁটি আছে। এই পক্ষীকে সচরাচর বাগানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কণ্ঠস্বর অতীব কর্কশ। কাককণ্ঠও ইহাদের কণ্ঠের তুলনায় বরং সুমিষ্ট। "ছাতারে পাখী"ও ফেঙ্গার ন্যায় অতিশয় কলহপ্রিয়।

তাহার পর কাঠঠোক্রা পাখীর "বাঁকুড়ী" প্রতি শব্দ দেওয়া হইয়াছে "টেঁস্কনা"। বাঁকুড়া জেলায় যাহাকে "টেঁস্কনা" বলে, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে তাহাকেই "নীলকণ্ঠ" বলে। কলিকাতা হুগলী অঞ্চলে তাহাকেই কাঠঠোক্রা বলে কি না, তাহা আমি জানি না। কিন্তু "টেঁস্কনা" পাখীকে আমি কখনও চঞ্চু দ্বারা বৃক্ষের ডাল ঠুকিতে দেখি নাই। ইহাদিগকে কখন বৃক্ষের কোটরেও বাস করিতে দেখি নাই। আমাদের গৃহের চিলেঘরের আলিসার নীচে কতকগুলি "পায়রা খোপ" আছে। এক জোড়া টেঁস্কনা পাখী কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার একটী "খোপ" দখল করিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের দৌরাত্ম্যে পায়রাগুলি সেখানে কুলায় প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় না। এই পক্ষীর গাত্রবর্ণ নীলাভ; কণ্ঠদেশ গাঢ় নীল। মস্তকে

ঝুঁটি আছে। ইহারা অত্যন্ত ক্রোধ-পরায়ণ; কাহাকেও নিকটে আসিতে দেয় না। আসিলে কর্কশ শব্দে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে থাকে। ইহারা খড়, কুটী প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নীড় প্রস্তুত করে। "ফেঙ্গা"র ন্যায় ইহাদেরও কাকের সহিত চিরশত্রুতা আছে।—"টেঁস্ টেঁস্" শব্দ করে বলিয়া ইহাদের নাম "টেঁস্কনা।" বিহার ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে "টেঁস্কনা" বা "নীলকণ্ঠ" পক্ষী পবিত্র ও শুভদর্শী বলিয়া বিবেচিত হয়। বিজয়া দশমীর দিনে ইতরসম্ভ্রান্ত সমস্ত হিন্দুই সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নগরের বহির্ভাগে "নীলকণ্ঠ" দর্শনে বহির্গত হয়। অনেকের হস্তে বন্দুক থাকে। বাগানে বা বৃক্ষরাজির নিকটে সেই বন্দুক দ্বারা "ফাঁকা" আওয়াজ করা হয়। কোনও বৃক্ষে নীলকণ্ঠ পক্ষী থাকিলে বন্দুকের শব্দে ভয়ে আকাশে উড্ডীন হয় আর সেই সময়ে সকলেরই সেই শুভদর্শী পক্ষীটি দর্শন করা ঘটে। কিন্তু, সচরাচর যেরূপ ঘটিয়া থাকে, প্রয়োজনের সময় কোন বস্তুরই (যেরূপ অনেক ব্যক্তিরও) দর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং "নীল-কণ্ঠ" পক্ষী মহাশয়ও লোকের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া এই সময়ে আশ্চর্য্য-রূপে অদৃশ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু সেইদিনে যেরূপেই হউক, তাঁহাকে দর্শনলাভ করা চাইই। সুতরাং কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতেই একটী নীলকণ্ঠকে পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং উপস্থিত ব্যক্তি-বর্গের নিকট কিছু পুরস্কারের আশা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দেয়।

"নীলকণ্ঠ" বা "টেঁস্কনা" সম্বন্ধে কাহারও কোনও গোলযোগ না থাকে, এই জন্য আমি এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। আমি স্বচক্ষে বিহারীদের "নীলকণ্ঠ" দর্শনের এই আগ্রহ দেখিয়াছি। আর "নীলকণ্ঠ" যে "টেঁস্কনা" তৎসম্বন্ধেও আমার কোন সন্দেহ নাই। এখন কথা হইতেছে যে, এই "টেঁস্কনা" "কাঠ-ঠোক্‌রা" কিনা। বাঁকুড়া অঞ্চলে কাঠ-ঠোক্‌রা নামে একটী পাখী আছে। তাহা আমি দেখিয়াছি। তাহার আকার বুল্‌বুলের ন্যায় ও গাত্রবর্ণ কৃষ্ণাভ। একদিন দ্বিপ্রহরের সময় আমাদের বাটীর সম্মুখবর্ত্তী এক আম্রবৃক্ষের শুষ্ক শাখায় এই পাখীটি অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠক্ ঠক্ করিতেছিল। আমি কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহার কার্য্য দেখিয়াছিলাম। পাখীটি চারি পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া প্রায় এক ইঞ্চি গভীর একটী কোটর প্রস্তুত করিয়াছিল। পরদিন আর সে সেখানে আসিল না। বোধ হয়, সেই শুষ্ক শাখাটি বিদারণ করা তাহার চঞ্চুর পক্ষে কঠিন হইয়াছিল।

"কাঠ্-ঠোক্‌রা" একটী generic name মাত্র। এই জাতীয় নানাবিধ পক্ষী আছে। ফিঙ্গের ন্যায় আকারবিশিষ্ট কিন্তু বিচিত্রবর্ণ একটী পক্ষী একবার রাঁচিতে দেখিয়াছিলাম। তাহাও কাঠ্-ঠোক্‌রা জাতীয়। এই পাখীটি দেখিতে, অতিশয় সুন্দর—নাম "সরস্বতী" পাখী। ইহা অন্যান্য পাখীর ন্যায় দাঁড় বা ডালের উপর সোজা হইয়া বসিতে পারিত না। বৃক্ষের ডালে ইহা ঝুলিয়া থাকিত। আমরা একটী কাষ্ঠ দেওয়ালে ঠেসাইয়া

রাখিয়াছিলাম। পাখীটি সেই কাষ্ঠের গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহার চঞ্চু দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট। জিহ্বা অতীব বৃহৎ। সর্পের জিহ্বার ন্যায়। লক্ লক্ করিয়া জিহ্বা বাহির করিত। জিহ্বা দ্বারাই ইহা খাদ্যাদি গ্রহণ করিত। ইহার প্রধান খাদ্য ছিল "কুর্‌কুট্" নামধেয় একজাতীয় আরণ্য পিপীলিকা। তাহাই সংগ্রহ করিয়া ইহাকে খাওয়াইতে হইত। কুর্‌কুটেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যখন যাইতে থাকে, তখন "সরস্বতী" আপনার সুদীর্ঘ লোল জিহ্বা বাহির করিয়া তাহাদের গমন পথ অবরুদ্ধ করে। যাহারা তাহার জিহ্বা স্পর্শ করে. তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার উদরস্থ হইয়া যায়।

"সরস্বতী"র কণ্ঠস্বর বিচিত্র। সেরূপ স্বর আর আমি অন্য কোনও পক্ষীর কণ্ঠে কখনও শুনি নাই। সরস্বতীর পায়ের সহিত কাষ্ঠে একটা দড়ী বাঁধিয়া রাখিলেই চলিত। পিঞ্জরের কোনও প্রয়োজন ছিল না। "সরস্বতী" কিছুদিন থাকিতে থাকিতে বেশ পোষ মানিয়াছিল। তাহাকে কোনও বৃক্ষ দেখাইয়া ছাড়িয়া দিলে, সে তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষে উড়িয়া যাইত। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখে এক প্রকার "শীষ্" দিলেই সে উড়িয়া আসিয়া পুনর্ব্বার হস্তের উপর বসিত। কখন কখন সে মুখে করিয়া একটী পাতা লইয়া আসিত। এই পাখীটি ছোটনাগপুরের কোনও জঙ্গলে ধৃত হইয়াছিল। ভগবানের রাজ্যে যে কত অদ্ভুত পক্ষী আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

(২২শে জুলাই হইতে ২১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত)

দাসাশ্রমে এই মাসে নিম্নলিখিত রোগী ছিল ;—

১ দামো, ২ তিতুরাম, ৩ টোকানি, ৪ বাবুরাম, ৫ খেদনা, ৬ রসিকচাঁদ, ৭ দেবিয়া, ৮ দুর্গাতারিণী, ৯ শিবু. ১০ স্বর্ণ, ১১ নবদুর্গা, ১২ ফুলমণি।

১। দামোর—অবস্থা অতি শোচনীয় ; পা ফুলিয়া পড়িয়াছে, শরীর রোগ ও জরাজীর্ণ। এখন সে কেবল প্রার্থনা করিতেছে, "ঠাকুর শীঘ্র পার কর।" সে এখন গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার অন্নদা বাবুর চিকিৎসাধীন।

২। খেদনা—হাজারিবাগ জেলায় বাড়ী। অন্ধ, একদিন গিরিডির পথে যাইতে যাইতে পড়িয়া যাওয়ায় উরুদেশে অত্যন্ত আঘাত লাগে। হাঁসপাতালে থাকিয়া তাহার যথোচিত চিকিৎসা হয়। এখন সে যষ্টিভর করিয়া কোন রূপে দু চার পা চলিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের ডাক্তার বাবু অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দেন।

৩। তিতুরাম, ৪। টোকানী, ৫। শিবু—দাসাশ্রমের নিয়মাধীন হইয়া থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হওয়ায়, তাহাদের ইচ্ছানুসারে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় পঁহুছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারা আসিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিল যে কিছুতেই রাখা গেল না।

আয়।

মণিঅর্ডার ১৩৮৲, খেদনা রোগীর জমা ৪৲, বাবু তিনকড়ি বসু ১।৴০, পূর্ব্ব মাসের হস্তেস্থিত ।৴১৫, বাবু গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু ১৲, মোট ১৪৪৸৴১৫।

ব্যয়।

সংসার খরচ ৩৪৶১২॥, কর্ম্মচারীর বেতন ৫৬।৶২॥ (পূর্ব্বের বাকি শোধ সম্বলিত), বাড়ী ভাড়া ১৮৲, ধোপা ২৻১০, গোয়ালা ৪৸৶১৫, পূর্ব্ব মাসের ঋণ শোধ ২৲, পার্শেল মাসুল ১॥০, বাজে খরচ ৶০, মোট ১১৯৶০, হস্তেস্থিত ২৫॥৶১৫।

দানপ্রাপ্তি।

(২৫শে জুলাই হইতে ২৪শে আগষ্ট পর্য্যন্ত)

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বিগত মাসে নিম্নলিখিত মাসিক চাঁদা ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দীনদয়াল পরমেশ্বর পরদুঃখকাতর দাতাগণের মস্তকে আশীর্ব্বাদবারি সিঞ্চন করুন।

মাসিকচাঁদা।

ডাঃ কেদারনাথ দাস জুন ও জুলাইয়ের চাঁদা ॥০, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী জ্যৈষ্ঠ মাসের চাঁদা ২৲, বাবু হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জুলাই মাসের চাঁদা ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র ঐ ঐ ১৲, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ঐ ঐ১৲, বাবুত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ঐ ঐ ।০, N. C. Baral Esq. জুন ও জুলাইয়ের চাঁদা ২৲, N. K. Bose Esq. জুলাইয়ের চাঁদা ১৲, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের চাঁদা ২৲,জনৈক ভদ্রমহিলা জুলাই মাসের চাঁদা ১৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু ঐ ঐ ॥০, বাবু অনাথনাথ দেব ঐ ঐ ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী আষাঢ় মাসের চাঁদা ১৲।

এককালীন দান।

শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ ভ্রাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে ১৲, বাবু মাণিকচন্দ্র রায় ভক্তিসঞ্চারিণী সভা হইতে ১৲, N. C. Bose Esq ১৲, বাবুহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১০৲, বাবু প্রমথনাথ চট্টো ১৲, Hon. C. C. Mitter Esqr ৫৲, বাবু গৌরীশঙ্কর দে এম্ এ ১৲, ডাক্তার বিহারীলাল বসু ৪/, বাবু বিজয়গোপাল ঘোষ ২৲, বাবু গোপালচন্দ্র আচার্য্য ১৲, বাবু পুলিনবিহারী রায় ৫৲, বাবু মতিলাল মুখো ১৲, বাবু বিমলাচরণ সেন ৶০, শ্রীমতী কৃষ্ণকিশোরী চৌধুরাণী ১৲, শ্রীযুক্ত গোঁসাই রামরতন ভারতী ১৲, বাবু নীলরতন বন্দ্যো ।০, বাবু বেণীমাধব চাকী ।০,মুন্সী মহম্মদ উজির ১৲, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ দাস ১৲, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সাহা ॥০, বাবু কৃষ্ণলাল সাহা ॥০, বাবু নবীনচন্দ্র সাহা ৻১০, বাবু গোপীনাথ সাহা ৶০, বাবু বনমালী সাহা ৶০, বাবু শ্রীরামচন্দ্র সাহা ॥০, বাবু মুকুন্দলাল ও প্রসন্নকুমার সাহা ।০, বাবু অধরচন্দ্র সাহা ।০, বাবু গৌরাঙ্গচন্দ্র সাহা ।০, বাবু রাধানাথ সাহা /০, বাবু দ্বারকানাথ কৈলাশচন্দ্র প্রামাণিক ॥০, বাবু রাজনারায়ণ ঘোষ ৶০, একজন হিতৈষী /০, একজন বন্ধু ॥০, বাবু বনমালী সান্ন্যাল ।৶১০, বাবু গোঁসাইদাস দত্ত ১৲, একজন বন্ধু ॥০, বাবু চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য /০, বাবু যদুনাথ মজুমদার ।০, একজন বন্ধু রামপুর বোয়ালিয়া ১৲, বাবু রামজয় বাগচী ॥০, একজন হিতৈষী ॥০, বাবু ভুবনমোহন মৈত্র ১৲, বাবু গুরুনাথ মুন্সী ১৲, বাবু শশধর রায় ১৲, বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ ২৸০, বাবু কুমুদবিহারী সেন পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে ২৲, বাবু ভোলানাথ লাহিড়ী ১৲, নীতিবিদ্যালয় ১৲, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত ১৲, বাবু নবীনচন্দ্র হাজারিকা ১৲, G. C. Mukerji ।০, বাবু গোপালচন্দ্র সিংহ ১৲, বাবু হীরালাল মৈত্র ।০, W. B. Livingstone Esqr. ১৲, বাবু হরচন্দ্র রায় ।০, বাবু প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য ৸৶০, ডাঃ অক্ষয়কুমার ভাদুড়ী ১৲, বাবু শ্যামলাল ঘোষ ১৲, বাবু তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু ললিতমোহন মৈত্র ১৲, A friend of Rampur Boalia ১৲, বাবু ভগবতীচরণ গাঙ্গুলি ১৲, একজন ভদ্রলোক ৶০, বাবু শরৎচন্দ্র রায় ১৲, বাবু রাজকুমার সরকার ১৲, বাবু হরিচরণ মৈত্র ১৲, বাবুনিত্যানন্দ বিশ্বাস ॥০, বাবু যদুনাথ মজুমদার ১৲, বাবু রামচন্দ্রচক্রবর্ত্তী ৸১০, বাবু দেবেন্দ্রনাথ সাহা ৶০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সাহা ॥০, রাজসাহী কলেজ বোর্ডিংয়ের ছাত্রগণ ।৶১০, কুমারী স্নেহলতা মজুমদার প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতায়

মরুণ ১০৲, বাবু কেদারনাথ সেন ৵০, বাবু নলিনীকান্ত সেন ৵০, বাবু সূর্য্যকান্ত রায়চৌধুরী ৯৲, বাবু কৃষ্ণমোহন দাস ১৲, বাবু রজনীকান্ত মিত্র মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, বাবু ভোলানাথ সরকার অটল বিহারী ঘোষের এফ,এ পাশ উপলক্ষে ১৲, বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো ।০, বাবু শীতলদাস রায় ১ম পুত্রের জন্মোপলক্ষে ২৲, বিধুভূষণ দত্ত ॥৵০, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু ।০, বাবু সীতানাথ গাঙ্গুলী ।০, S. K. Lahiri Esq. ।০, বাবু রাসবিহারী কর্ম্মকারের সংগৃহীত ৻১০ বাবু নৃত্যগোপাল পাঁড়ে ॥০, বাবু রসিকলাল ঘোষ এম্ এ ॥০, বাবু গোপালচন্দ্র মুখো এম,এ ।০, বাবু প্রাণকৃষ্ণ ভাদুড়ী ১৲, বাবু রামনারায়ণ ব্যানার্জ্জি ২৲, Rev. B. N. Banerji ১৲, বাবু নীলমণি ঘটক ১৲, বাবু গোষ্ঠবিহারী সেন ১৲, বাবু নন্দলাল ভট্টাচার্য্য ॥০, শ্রীমতী মনোমোহিনী শেঠ ।/১০, বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ॥০, বাবু কুঞ্জলাল কর ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র দাস ।০, বাবু মদনমোহন দাস ১৲, বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখো ১৲, বাবু শ্রীচরণ দাস ।০, বাবু রজনীকান্ত দাস ।০, বাবু মোহিনীমোহন শেঠ ।০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস ৵০, বাবু রাধিকালাল শেঠিয়া ।০, বাবু রজনীকান্ত দাস ।০, বাবু রাধারমণ দাস ॥০, শ্রীমতী সুমতী চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু রজনীকান্ত মজুমদার ॥০, বাবু অঘোরনাথ মুখো ॥০, ডাঃ দুকড়ি ঘোষ ২৲, সিটি স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণ ।১০, বাবু কালীনারায়ণ রায় ৵১০, বাবু সীতানাথ দাস ১, P. N. Bose ১৲, বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র ॥০, J. Barooah Esqr জন্মদিনে ৸০, শ্রীমতী সুলতা রায় ৵০, শ্রীমতী ললিতা রায় ৵০, বাবু কালীচরণ সোম ১৲, বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ ২৲, বাবু প্রতুলচন্দ্র ঘোষ ২৲, বাবু শশিভূষণ বসু ২৲, বাবু নারায়ণকৃষ্ণ সেন ১৲, বাবু মাণিকচন্দ্র ঘোষ ৵০, বাবু গোঁসাই মহেন্দ্র গিরি ৪৲, বাবু ব্রজলাল চট্টো ১৲, বাবু পঞ্চানন মৈত্র ।০, বাবু কেদার নাথ গুপ্তের সংগৃহীত ৩॥৵০, বাবু দুর্গাদাস মুখো ।০, বাবু প্রতাপচন্দ্র বসু ১৲, বাবু রজনী কান্ত চক্রবর্ত্তী ।০, বাবু ঠাকুরদাস ডাক্তার ॥০, বাবু হরিনাথ পালিত ॥০, বাবু যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ।০, বাবু লক্ষ্মীলাল সেন ॥০, বাবু রামচন্দ্র ঘোষ ॥০, বাবু গিরিশচন্দ্র দাস ৵০, বাবু নীলমণি কোঙর ১৲, বাবু যামিনীকান্ত কোঙর /১০, বাবু গোপীমোহন সাহা ॥০, বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখো ১৲, বাবু কেশবচন্দ্র বাগছী ॥০, বাবু শশিভূষণ রায় ॥০, বাবু রামসুন্দর রায় ৵০, বাবু বিষ্ণুদাস নাথ ॥০, বাবু জগমোহন বীর স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, বাবু বিনোদ বিহারী পাল ২৲, Friends' Association, City College ৪।০, ২০।৫ ভবানীচরণ দত্তের লেনস্থ ছাত্রগণ ।৴১০ ।

বস্ত্রাদি ।

মাঃ বাবু কালীনারায়ণ সেন ঢাকাই শাড়ী ১, কোট ১ ; কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু দুই পুটুলি পুরাতন কাপড় ; শ্রীমতী শৈলবালা মিত্র কামিজ ৫, কোট ৪, জ্যাকেট ১, মোজা ১, টুপি ২, পেন্টুলন ১, গেঞ্জিফ্রক ১, তসর কাপড় ১ ; মাঃ বাবু সুধীরচন্দ্র মল্লিক পুরাতন থান ধুতি ১ ।

অন্যান্য প্রকারে আয় ।

পুস্তক বিক্রয় /১০, 'দাসী' হইতে প্রাপ্ত ১৫৲ ।

মোট আয় ।

মাসিক চাঁদা ১৪।০, দানপ্রাপ্তি ১৪৬৵০, অন্যান্য প্রকারে আয় ১৫/১০, গত মাসের জের ৩১।৴০, উদ্বৃত্ত জমা ৸৫, মোট আয় ২০৭॥৵১৫ ।

ব্যয় ।

গিরিডি সেবালয় মঃ অঃ কমিশন সহিত ১২৯॥০, ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের অবশিষ্ট ঋণ শোধ ১৯৲, কমিশন ৩০৸/১৫, দাসীর ঋণ শোধ ৫৲, বাক্স ক্রয় ১৸৵০, বিপন্ন লোক ১॥০, পার্শ্বেল ১৴/১০, চট ৴০, ডাক খরচ ৵১০, বর্ণপরিচয় ফণ্ডে ঋণ ৵০, মোট ব্যয় ১৮৯।৵১৫ ।

মোট আয় ব্যয় ।

মোট আয় ২০৭॥৵১৫, মোট ব্যয় ১৮৯।৵১৫, হস্তেস্থিত ১৮।০ ।

দাসী

তুকারাম।

নবম প্রস্তাব।

তুকারাম যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা মহারাষ্ট্রজাতির ইতিহাসে বিশেষরূপে স্মরণীয়। একদিকে বাহুবল ও জ্ঞানবল এবং অপর দিকে ভক্তিবল, এই তিনের সম্মিলনে মহারাষ্ট্র দেশ তখন অপূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। বাহুবলের অবতার স্বরূপ শিবাজী, জ্ঞানবলের অবতার স্বরূপ রামদাস স্বামী* এবং ভক্তি ও প্রেমবলের অবতার স্বরূপ তুকারাম, তিন জনই এক সময়ে মহারাষ্ট্রজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সমগ্র হিন্দুজাতির অভ্যন্তরে নবজীবন সঞ্চারের জন্যই যেন বিধাতা তাঁহাদিগের তিন জনকে সমকালে মহারাষ্ট্র দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যের ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায়, জাতীয় জীবনেও এমন এক একটী "শুভযোগ" উপস্থিত হয় যে, সেই সময় নানা বিষয়ে তাহার উন্নতি ও সমৃদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দী মহারাষ্ট্রজাতির ইতিহাসের এই শুভ যোগকাল। বীরবর শিবাজীর বলে বলীয়ান্ হইয়া, মহারাষ্ট্র সৈনিকগণ যে সময় বিজয়নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিত, তুকারামের রচিত অভঙ্গসমূহ সেই সময়ই গৃহে গৃহে সংকীর্ত্তিত হইয়া, সহস্র সহস্র মহারাষ্ট্র নরনারীকে ভক্তি ও প্রেমে বিগলিত করিত। যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, শিবাজী কেবলই বাহুবলের দ্বারা মহারাষ্ট্ররাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত; এক পদে বিচরণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ন্যায়, একমাত্র বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। মুসলমানগণ যে শত বর্ষের মধ্যে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র হইতে ভারত-সাগর

---

* ইনি শিবাজীর দীক্ষাগুরু ছিলেন। শিবাজীর সাংসারিক ও বৈষয়িক (Public) অধিকাংশ কার্য্য ইঁহারই আদেশ ও পরামর্শ অনুসারে সম্পাদিত হইত। সর্ব্ব কার্য্যে সক্ষম ও সর্ব্বার্থদর্শী বলিয়া, ইঁহার স্বদেশীয়গণ ইঁহাকে "সমর্থ রামদাস স্বামী" এই গৌরবজনক আখ্যায় অভিহিত করেন।

পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা কেবল বাহুবলের গুণে নয়, ধর্ম্মবলও তাহার অন্যতর কারণ। মুসলমানজাতির ন্যায় মহারাষ্ট্র জাতিতেও বাহুবলের সহিত ধর্ম্মবলের সম্মিলন হইয়াছিল বলিয়াই, তাঁহারা সমাগত "পবনাগ্নির" ন্যায় তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এই সম্মিলনেরই গুণে, সমস্ত বিষয় লইয়া বিবেচনা করিলে, মহারাষ্ট্র জাতি এখনও ভারতের* জাতিসাধারণের মধ্যে অন্যতর অগ্রবর্ত্তী জাতি। শিবাজী ও রামদাস স্বামী প্রভৃতির ন্যায়, কুটীরবাসী দরিদ্র তুকারামও তাঁহার স্বজাতির মহত্ব সংস্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন ; তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এই সকল কথা বলিতেছি।

তুকারাম, শিবাজী এবং রামদাস স্বামী, কেবল একই সময়ে আবির্ভূত হন নাই, পরস্পরের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধেও সম্বদ্ধ ছিলেন এবং নিজের নিজের প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুসারে পরস্পরের কার্য্যে সহায়তা করিতেন। তুকারামের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ ও সম্মিলন, তাঁহাদিগের উভয়েরই জীবনের একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহা হইতে তাঁহাদিগের উভয়ের প্রকৃতি সুন্দররূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। শিবাজীর বীরত্বের, ততোধিক তাঁহার বুদ্ধি চাতুর্য্যের বিষয় সাধারণ্যে পরিচিত ; কিন্তু তিনি যে কিরূপ সংযতচিত্ত ও বৈরাগ্যশীল পুরুষ ছিলেন, তাহা অতি অল্প লোকেই অবগত আছেন। রাজা না হইয়া সন্ন্যাসী হইলেও তিনি একজন আদর্শ সন্ন্যাসী হইতেন। এক দিকে রাজপদ তুচ্ছ করিয়া, শিবাজী যেমন মুনিজনোচিত কঠোরতা ও নিগ্রহ অভ্যাস করিতে পারিতেন, অপর দিকে তুকারামও, তেমনই দরিদ্রতার গ্রন্থিনিষ্পেষক যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইয়াও, সাংসারিক সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য ধূলির ন্যায় পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। শিবাজী এবং তুকারামের সাক্ষাৎকারে আমরা এই উভয়েরই দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হই। বাল্যকাল হইতে পুরাণ ও কথকতাদি শ্রবণে শিবাজীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার অভিভাবক দাদাজী কোণ্ডদেও† তাঁহাকে সর্ব্বদাই বলিতেন, "রাজ্যসাধন রূপ মহাব্রত সম্পন্ন করিতে হইলে, সাধুপুরুষদিগের আশীর্ব্বাদ, উপদেশ ও সঙ্গ-

---

* বুদ্ধি বিদ্যা সম্বন্ধে বাঙ্গালিই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত ; কিন্তু রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ এবং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের ন্যায় ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশেও অধিক জন্মগ্রহণ করে নাই।

† দাদাজী কোণ্ডদেব নিজেও তুকারামের বিশেষ গুণপক্ষপাতী ছিলেন। একবার দুইজন ব্রহ্মচারী, তুকারামের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে কোণ্ডদেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত

লাভ নিতান্ত আবশ্যক। শিবাজী সেইজন্য কখনও সাধুসঙ্গ লাভের অবসর ত্যাগ করিতেন না। তুকারামের সদ্‌গুণাবলী এবং তাঁহার কথকতার প্রশংসা শ্রবণ করিয়া, শিবাজী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য একান্ত উৎসুক হইলেন। তুকারাম সঙ্কীর্ত্তন ও কথকতা করিবার জন্য এই সময় লোহগ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শিবাজী তাঁহাকে আপনার রাজধানী পুনায় আনয়নের জন্য, সম্ভ্রমসূচক ছত্র, অশ্ব ও একজন কারকুন প্রেরণ করিলেন। তুকারাম শিবাজীর নাম অবগত ছিলেন, এবং ধর্ম্মানুরাগী ও স্বজাতিবৎসল রাজপুত্র বলিয়া, তিনি মনে মনে তাঁহাকে সমাদর করিতেন। কিন্তু তাঁহার বহুজনাকীর্ণ ও ঐশ্বর্য্যাড়ম্বরপূর্ণ সভায় গমন করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইতেই তুকারাম নির্জ্জনতাপ্রিয় হইয়াছিলেন। ধনাঢ্য লোকদিগের নিকট গমন করিলে পাছে তাঁহাদিগের প্রদত্ত উপায়নাদি গ্রহণ করিতে হয়, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকিতেন। সুতরাং তিনি শিবাজীর আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। শিবাজীর কারকুন তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "মহারাজ আপনার দর্শনের জন্য আতুরের ন্যায় প্রতীক্ষা করিতেছেন; তাঁহাকে দর্শন দানে সনাথ করুন্।" তুকারাম বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। এক দিকে রাজপুত্র শিবাজীর ব্যাকুল আহ্বান এবং অপর দিকে ঐশ্বর্য্যের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি, উভয় বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার চিত্ত দোলায়মান হইল। তুকারামের আশঙ্কাও নিতান্ত অমূলক ছিল না। তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ সাধু সন্ন্যাসীদিগকে, সাক্ষাতের সময়, এত অধিক অর্থ উপায়ন প্রদান করিতেন, যে, নিতান্ত নিস্পৃহ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহার প্রলোভন অতিক্রম করা দুরূহ হইত। শিবাজীর আমন্ত্রণে তাঁহার চিত্তের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, নিম্নানুবাদিত অভঙ্গে তাহা প্রকাশিত হইবে;—

"চাহিনা যে সব নাথ, কেনগো দিতেছ মোরে?
নিরন্তর কেন হেন ফেলিছ সঙ্কট ঘোরে?
সংসার হইতে সদা দূরে রহিবারে চাই।
মানবের সাথ আর করিতে বাসনা নাই॥

বিজন বিপিন মাঝে সতত হরষে র'ব।
জগতের কার(ও) সনে কখনও না কথা ক'ব॥
এইমাত্র চাহি শুধু যেন দেহ, ধন, জন।
বমন সদৃশ সদা করি প্রভু দরশন॥

করিল, তিনি তুকারামকে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে বলিলেন। তুকারাম সেই উপলক্ষে যে সকল অভঙ্গ গান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া, অভিযোগকারী সন্ন্যাসীদ্বয়ের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। দাদাজী তুকারামকে সমাদর ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক নিন্দক সন্ন্যাসীদিগকে ভৎ'সনা করিয়া বিদায় দান করিলেন।

তুকা বলে, পদে তব এই নিবেদন করি। সকলই তোমারই ইচ্ছা হে পণ্ঢরপতি হরি ॥*

এ সম্বন্ধে আরও একটী অভঙ্গের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"সম্ভ্রমের চিহ্ন ছত্র, ঘোটক, মশাল,
সম্মান, ঐশ্বর্য্য, দম্ভ, আড়ম্বর হায়।
চলিতে পুণ্যের পথে বড়ই জঞ্জাল ॥
শূকর পুরীষ সম ঘৃণি সে সবায় ॥
হে পণ্ঢরপতি, মোরে বল কেন তবে,
তুকা বলে, ত্বরা করি এস একবার,
বিষম বন্ধনে তার জড়াইছ এবে?
বিপদ-পতিতে হরি করগো উদ্ধার ॥

শিবাজীকেও তুকারাম তাঁহার আহ্বানের প্রত্যুত্তরে চারিটী অভঙ্গ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শিবাজীকে তাঁহার রাজকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সংসারের প্রতি উদাসীন হইলেও তুকারামের সাংসারিক অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। নিম্নে সেই কয়টী অভঙ্গের অনুবাদ প্রদত্ত হইল;—

বিশ্বস্রষ্টা এ জগৎ করি নিরমাণ,
বিচিত্র নৈপুণ্য-লীলা করিলা বিধান ॥
সপ্রেম লিপিতে তব হ'তেছে প্রত্যয়।
ধর্ম্মজ্ঞ, চতুর, তুমি সাধু, সদাশয় ॥
গুরুর চরণে তব আছে স্থির মতি।
বিশ্বাস আছয়ে দৃঢ় ধরমের প্রতি ॥
পবিত্র এ "শিব" নাম সেজেছে তোমারে।
প্রজাদের ভাগ্যসূত্র ধৃত তব করে ॥
ধ্যান-যোগ, ব্রত আর যম, আরাধন।
করিয়াছে মুক্ত তব সংসারবন্ধন ॥
দেখিতে আমায় তব দৃঢ় অভিলাষ।
পত্রেতে তোমার তাহা করেছ প্রকাশ ॥
কিন্তু নিবেদন মোর শুন নরবর।
দিতেছি পত্রের তব এই সদুত্তর ॥
কাননিবাসী আমি উদাসীন বেশে,
বাসনাবিহীন হয়ে ভ্রমি দেশে দেশে ॥
কদাকার, ধূলিময়, বসন বিহনে
ফল মূলাহারে তনু ক্ষীণ দিনে দিনে ॥
শুষ্ক কর পদ, সদা বিকট মুরতি।
দেখিলে আমারে তুমি না পাইবে প্রীতি ॥
বন্ধুভাবে এই আমি করি নিবেদন।
মোরে দেখিবার কথা ভুলো না রাজন্ ॥

সদয় তোমারে সর্ব্ব অন্তর্যামী যিনি।
তাই লিখিতেছি আজ হেন দীন বাণী ॥
তা না হলে বিঠলের সেবক যে জন,
কৃপার ভিখারী সে ত নহে কদাচন ॥
রক্ষক, পোষক মোর প্রভু ভগবান।
কেবা আছে এ জগতে তাঁহার সমান ॥
চাহিতে তোমার কাছে নাহি কিছু আশ,
শূন্য করিয়াছি, ছিল যত অভিলাষ ॥
ত্যজিয়া বিষয়-তৃষা সংসারের কাম,
লভিয়াছি বিনা করে নিবৃত্তির গ্রাম ॥
সতী যথা চাহে মাত্র নিজ প্রাণেশ্বরে।
তেমতি ব্যাকুল প্রাণ বিঠলের তরে ॥
কিছু নাহি হেরি ভবে শুধু নারায়ণ।
তোমারেও তাঁর মাঝে করি দরশন ॥
ভাবিতাম তোমারেও বিঠল বলিয়া,
কেন তবে হেন লিপি দিলে পাঠাইয়া?
সাধুগুরু রামদাস, শিষ্য তুমি তাঁর,
অচলা ভকতি পদে রাখিবে তাঁহার ॥
অন্য গুরু প্রতি তব চিত্ত যদি ধায়,
তাঁর প্রতি ভক্তি তব কিসে রবে হায় ॥
তুকা বলে, শুন ওগো বুদ্ধির সাগর।
ভক্তিতে ভক্তের মোক্ষ ঘটে নিরন্তর ॥

যাব যে তোমার কাছে, কি ফলিবে ফল?
মুক্ত আছে ভিক্ষাপথ, হবে ক্ষুধা নাশ,
পথশ্রম মাত্র মোর ঘটিবে কেবল ॥
লজ্জা নিবারিতে পথে আছে ছিন্ন বাস ॥

---

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট অভঙ্গগুলির, সত্যেন্দ্র বাবুর কৃত অনুবাদ সত্ত্বেও, আমরা নিজে অনুবাদ করিয়া দিলাম। অবলম্বিত মূলের সহিত পার্থক্য বশতঃ আমাদিগের অনুবাদের সহিত সত্যেন্দ্র বাবুর অনুবাদে পার্থক্য লক্ষিত হইবে।

পাষাণ উত্তম শয্যা করিতে শয়ন।
আকাশ হইবে মোর অঙ্গ-আবরণ॥
পর অনুগ্রহ তবে চাহিব কি আশে,
আয়ুমাত্র ক্ষয় হয় বাসনার বশে॥
সম্মান প্রয়াসী জন রাজগৃহে যায়।
কিন্তু বল শান্তি কভু মিলে কি সেথায়?
সমাদর পায় সেথা ধনবান জন,
দরিদ্রের ভাগ্যে মান না মেলে কখন্॥
বেশ, ভূষা. আড়ম্বর হেরিলে নয়নে
মৃত্যু সম বিভীষণ বোধ হয় মনে॥
হয় ত এ সব কথা করিয়া শ্রবণ,
বিরত আমার প্রতি হবে তব মন।
কিন্তু আমি জানি ভাল অন্তর্যামী যিনি,
মোর প্রতি নিরদয় না হবেন তিনি॥
গরীয়ান যেই জন সাধু সদাচার,
কঠোর সংযমে নিত্য দিন গত যার;
ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত সদা করে অনুষ্ঠান,
কামনা থাকিলে সেও নীচের সমান।
তুকা বলে ধনি জন, তোমাদের মান
নশ্বর, আমরা কিন্তু চির-ভাগ্যবান্॥

এই মহাযোগ নিত্য সাধিও যতনে,
শুভ যাহা, ঘৃণা কভু করিও না মনে॥
যে কার্য্য করিলে হয় পাপের সঞ্চার।
যতনে করিও তাহা নিত্য পরিহার॥
তোমার অধীনে যদি থাকে খল জন,
তাদের বচনে কভু নাহি দিও মন॥
গুণী যেবা, রাজ্য যেই করিছে রক্ষিত,
বিচার করিয়া তুমি দেখিবে বিহিত॥
সকলই ত জান ভূপ, কি বলিব আমি,
অনাথ দুর্ব্বলে কভু ভুলিওনা তুমি॥
শুনিলে এ সব গুণ, পাব আমি প্রীতি।
সাক্ষাতে নাহিক কায শুন নরপতি॥
দরশনে নাহি হ'বে কোন ফলোদয়।
বৃথা কাযে দিন মাত্র হইবেক ক্ষয়॥
দু একটী কায যাহা ভাল বুঝি মনে।
হ'ক্ ভ্রম, তাই লয়ে রহিব যতনে॥
সর্ব্বজীবে এক আত্মা দেব নারায়ণ।
এই সার কথা সদা রাখিও স্মরণ॥
গুরু রামে চিত্ত সদা স্থাপন করিবে।
গুরুরামদাসে নিত্য আপন ভাবিবে॥
মানব জনম তব ধন্য নরপতি।
কীর্ত্তির গৌরবে তব পূর্ণ আজ ক্ষিতি॥

আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া* তুকারাম যেরূপ দৃঢ়তার অথচ মধুরতার সহিত শিবাজীর পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু দায়োজিনিস্ আলেক্জাণ্ডারের নিকট উপস্থিত না হইলে, আলেক্জাণ্ডারই দায়োজিনিসের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তুকারামের অভঙ্গসমূহ পাঠ করিয়া এবং তাঁহার নিস্পৃহতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, শিবাজীর তাঁহাকে দর্শনের ইচ্ছা আরও বলবতী হইল এবং তিনি নিজেই তুকারামের নিকট আগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন; এবং বস্ত্র, ভূষণ, পূজার উপচার সামগ্রী ও বহুমূল্য উপায়নাদি সঙ্গে লইয়া, সানুচর তাঁহার নিকট লোহগ্রামে আগমন করিলেন। তুকারামকে প্রণাম ও অর্চ্চনানন্তর শিবাজী একটি পাত্র স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ করিয়া তাহা তুকারামের

---

* কেহ কেহ এইরূপ সাতটী অভঙ্গ তুকারামের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু মহীপতি তাঁহার গ্রন্থে ৪টী মাত্র অভঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আভ্যন্তরীণ প্রমাণে অপর অভঙ্গগুলি তুকারামের রচিত কি না সন্দেহ হওয়ায় আমরা তাহার অনুবাদ করিলাম না। প্রথমোল্লিখিত অভঙ্গ দুইটী শিবাজীকে লিখিত নয়, তুকারামের নিজের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অভিব্যক্ত।

সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। পাছে শিবাজী তাঁহাকে কোনরূপ উপহার প্রদান করেন, সেই আশঙ্কায় তুকারাম তাঁহার নিকট গমন করেন নাই; এক্ষণে শিবাজীকে এরূপ উপায়ন প্রদান করিতে দেখিয়া তিনি মনে মনে বিরক্ত হইলেন এবং শিবাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজপুত্র, যাহারা হরির সেবক, তাহাদিগের নিকট ক্ষুদ্র পিপীলিকা ও রাজাধিরাজ উভয়েই তুল্য। তুমি আমাকে যে উপহার প্রদান করিয়াছ, তাহার সহিত মৃত্তিকার কোন পার্থক্য নাই। হরিভক্ত হইয়া আমরা কলির প্রধান বন্ধন মোহ ও আশা পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছি। বিঠোবাই আমাদিগের সর্ব্বস্ব; তাঁহার কৃপায় আমরা (হরিভক্তগণ) ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; বিঠোবা আমাদিগের জনক, জননী; তাঁহার বলে আমরা অসীম বলীয়ান্; সমগ্র বৈকুণ্ঠ এক্ষণে আমাদিগের গৃহে আসিয়াছে এবং সর্ব্বত্র আমাদিগের প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধন, প্রভুতা ও বল, এই তিনটীতেই রাজার রাজপদ, কিন্তু বিঠোবার কৃপায় এই তিন বিষয়েই আমরা রাজাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমি যাহাতে আনন্দ করি, তুমিও তদনুসরণ কর। হরিনাম গান কর, কণ্ঠে তুলসীমাল্য ধারণ করিয়া ও একাদশী-ব্রত পালন করিয়া, আপনাকে হরিদাস রূপে পরিণত কর; তাহা হইলেই আমার সন্তোষ বিধান করা হইবে।"

আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত দায়োজিনিসের ব্যবহার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়াছে। তাহার সহিত পাঠক তুকারামেরও নিস্পৃহতা ও দৃঢ়চিত্ততা তুলনা করুন্। মহারাষ্ট্র দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি আসিয়া আজ তুকারামের দ্বারে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; অথচ চীরধারী তুকারাম তাঁহার প্রদত্ত স্বর্ণরাশির দিকে একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন না, এদৃশ্য বাস্তবিকই অবলোকনীয় এবং কবির লেখনীতে ও চিত্রকরের তুলিকায় অমর হইবার যোগ্য। নিস্পৃহতায় তুকারাম ও দায়োজিনিস্ সমকক্ষ হইলেও, উভয়ের উক্তিতে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিভিন্নতা।

শিবাজী তুকারামের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার নিস্পৃহতা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি তুকারামের প্রত্যাখ্যাত ধন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার আশায় কয়েক দিন লোহগ্রামে অবস্থান করিলেন। প্রতিদিন সশিষ্য তুকারাম মহোৎ-

সাহে সঙ্গীত করিতেন। ভক্তগণের আনন্দোচ্ছ্বাসে এবং মধুর বীণা ও মৃদঙ্গধ্বনিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইত। শ্রোতাগণের সপ্রেম একাগ্রতায় এবং তুকারামের ভক্তিপ্রধান উপদেশ গুণে সঙ্কীর্ত্তন অতি মধুর ও হৃদয়-স্পর্শী হইত। শিবাজী একবারে বিমোহিত হইলেন। এক দিন তুকারাম নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী সঙ্কীর্ত্তন করিলেন ;—

হরি, তুমি মম পিতা, তুমি মম মাতা হে।
সুহৃদ্, সখা তুমি, তুমি মম ধন জন,
প্রাণ রমণ তুমি, শান্তি সদন হে॥
আপন বলিতে প্রভু তোমা বিনা কেহ নাই।
সাধনের ধন তুমি, তুমিই শরণ হে।
ত্রিভুবন পূর্ণ করি, রহিয়াছ তুমি হরি,
তব দরশন বিনা বৃথা এ নয়ন হে।
তব দরশন বিনা বৃথা এ নয়ন হে॥
তব গুণ যে রসনা, কভু না করে ঘোষণা,
বিনাশ মঙ্গল তার কি ফল রহিয়া হে॥
যেথা তব অধিষ্ঠান, সেই পুণ্য তীর্থ স্থান
না ভ্রমিল যদি পদ কি ফল তাহায় হে॥
ত্যজিয়ে বিষয় সুখ তব শ্রীচরণে হরি,
তনু, মন, সব মম করেছি অর্পণ হে॥
বিনা তব গুণ গাথা, অসার জ্ঞানের কথা,
বিফল প্রয়াস শুধু, চাহিনা শুনিতে হে॥
এ বিষম ভবনদী, চাহ রে তরিতে যদি,
এস, বিঠোবার পদে লইগে শরণ হে॥

তুকারাম, ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনানন্তর, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। যে মানসিক বলে তিনি দ্বারস্থ নর-পতিকে ক্ষুদ্র পিপীলিকার সহিত তুলনা করিতে ভীত হন নাই, তাহা দর্শন করিয়া শিবাজী বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং অক্ষৌহিণী পতির অপেক্ষা এরূপ সন্ন্যাসীর শক্তি অধিক বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। নিজের রাজ অপেক্ষা, তুকারামের সন্ন্যাসী পদ তাঁহার নিকট শ্লাঘ্য বোধ হইল। তিনি তুকারামের ন্যায় নির্জ্জনে ধর্ম্মালোচনায় জীবন যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সমস্ত রাত্রি সঙ্কীর্ত্তনের পর অরুণোদয়ের পূর্ব্বে মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া অন্যান্য সকলে যখন আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করিলেন, শিবাজী তখন তুকারামকে নমস্কার পূর্ব্বক রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া, নিকটবর্ত্তী একটী অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং আপনার কর্ম্মচারী-দিগকে আজ্ঞা দিয়া গেলেন যে, তাঁহারা যেন কোন কারণে তাঁহার নিকট গমন না করেন। সমস্ত দিন অরণ্যবাসের পর শিবাজী প্রতিদিন রাত্রিতে তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য সেই গ্রামে আগমন করিতেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ভীত হইয়া তাঁহার জননী জিজিবাইকে এই সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। জিজাবাই শুনিবামাত্র ব্যাকুলিত চিত্তে লোহগ্রামে উপস্থিত হইলেন। শিবাজীর কর্ম্মচারিগণ জিজিবাইকে বলিয়াছিলেন যে, তুকারাম হইতেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে,

তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিবাজী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন। জিজিবাই শুনিয়া তুকারামের শরণাপন্না হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার একটী মাত্র পুত্র আপনার উপদেশে সংসার-ত্যাগী হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন পুত্র কন্যা হয় নাই; সুতরাং আমাদিগের বংশের স্থিতি ও রাজ্য রক্ষা কে করিবে? আপনি কৃপা-পূর্ব্বক আমার পুত্রটীকে আমায় ভিক্ষা দিন।" এই বলিয়া তিনি অঞ্চল প্রসারণ পূর্ব্বক, তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন। করুণহৃদয় তুকারাম তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "শিবাজী কীর্ত্তন শুনিতে আসিলে, আমি তাঁহাকে উপদেশ দ্বারা পুনর্ব্বার সংসারে প্রবিষ্ট করাইব, আপনি চিন্তিত হইবেন না; বিঠোবার ভজন করুন, তিনি আপনার দুঃখ দূর করিবেন।" পরদিন রাত্রিতে শিবাজী সঙ্কীর্ত্তন স্থলে উপস্থিত হইলে তুকারাম তাঁহাকে সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, সৎকর্ম্মই "সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র তরণী। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ বলেন, স্বধর্ম্ম প্রতিপালন ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই; অপরের ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইলে তাহার আচরণে কোন ফল লাভ হয় না। বিধাতা মানবসমাজ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং সকলেই নিজের নিজের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, ইহাই শ্রুতির আদেশ। যে শ্রুতি-বাক্য প্রতিপালন না করে, সে অধঃপতিত হয়।" এই বলিয়া তুকারাম ব্রাহ্মণাদি জাতির ধর্ম্ম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, শিবাজীকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিলেন, "সম্মুখ যুদ্ধে শত্রু জয় ও প্রজা পালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। বিলাসী ব্যক্তি নিজের অবয়বের পুষ্টিসাধন করিয়া, যেরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করে, নরপতিগণ স্ব স্ব প্রজাপুঞ্জকে সুখী দেখিয়া সেইরূপ আনন্দ লাভ করেন। সদ্বিবেকের সহিত প্রজা পালন অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহত্তর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ক্ষত্রিয়গণ অনৈষ্ঠুর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, প্রজাপুঞ্জের সুখে সুখানুভূতি, সর্ব্বভূতে দয়া এবং সর্ব্বকালে হরিস্মরণ দ্বারা ভগবানের করুণা লাভ করেন; তাঁহাদিগের পক্ষে অরণ্যা-শ্রয়ের কোন আবশ্যক নাই. ভগবান স্বয়ং আসিয়াই তাঁহাদিগকে দর্শন দান করেন।" তুকারামের এই উপদেশে শিবাজীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি পুনর্ব্বার রাজচিহ্ন সমুদায় গ্রহণ করিলেন এবং জননীর সহিত কয়েকদিন সেখানে বাস করিয়া তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে পরিতৃপ্ত

হইলেন। অঞ্চলের নিধি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া, জিজিরাইয়ের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল; তিনি তুকারামকে প্রণিপাতপূর্ব্বক শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কয়েকদিন এইরূপে অবস্থানের পর শিবাজী তুকারামের প্রসাদ * গ্রহণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। ইহার পর শিবাজী কখনও তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিতেন না। একবার পুনায় তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন কালীন, শিবাজী পুনা হইতে ১৫মাইল দূরবর্ত্তী সিংহগড়ে অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু তুকারামের সঙ্কীর্ত্তনের তিনি এমনই অনুরাগী হইয়াছিলেন যে, যে কয়দিন সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার প্রতিদিনই তিনি সিহগড় হইতে পুনায় গমনাগমন করিতেন। মহীপতি বলেন যে এই উপলক্ষে একবার কতকগুলি মুসলমান সৈনিক সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে সঙ্কীর্ত্তন স্থলে ধৃত করিবার জন্য চেষ্টা করে। শিবাজী আত্মরক্ষার জন্য সঙ্কীর্ত্তন স্থল পরিত্যাগ করিতে চাহিলে, তুকারাম তাঁহাকে নিবারণ করেন এবং পরে তুকারামের প্রার্থনায় বিঠোবা স্বয়ং আসিয়া শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করেন। ঘটনাটী কতদূর ঐতিহাসিক সত্য, তাহা নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
বৈদ্যনাথ।

কোম্পানী বাহাদুরের মনুষ্য-তৈল বিক্রয়।

দুই বৎসর অতীত হইল, দাসাশ্রমের জনৈক বন্ধু গোয়ালন্দের নিকটবর্ত্তী কোন স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। একদিন একটী ছাত্র আসিয়া তাঁহাকে খবর দিল—"মাষ্টার মহাশয়! আমাদের গ্রামের একটী বৃদ্ধা গোয়াল ঘরের আগুনে পড়িয়া একখানি পা পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। সংসারে তাহার কেহ থাকিয়াও নাই। পা খানি পচিয়া ভয়ানক ঘা হইয়াছে এবং তাহাতে

* কথিত আছে শিবাজী তুকারামের নিকট বিদায় লইবার সময় এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, যে তুকারাম যদি আমাকে তাঁহার প্রসাদচিহ্নস্বরূপ "ভাকর" (ভুট্টা হইতে প্রস্তুত একরূপ রুটী) প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদিগের রাজ্য মুসলমানদিগের হস্ত হইতে উদ্ধৃত হইবে; আর যদি তিনি আমাকে একটী নারিকেল ফল প্রদান করেন, তাহা হইলে আমার পুত্র লাভ হইবে। তুকারাম শিবাজীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে দুইই প্রদান করিয়াছিলেন।

পোকা পড়িয়াছে। আপনি ত দাসাশ্রমের কথা কতই বলিয়া থাকেন। ইহাকে যদি সেখানে পাঠাইয়া দেন, তবে বড় উপকার হয়।" এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় তখনি সেই ছাত্রটীকে লইয়া পূর্ব্বকথিত গ্রামে বৃদ্ধার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় গিয়া যে শোচনীয় অবস্থা দেখিলেন, তাহা ভাবিতেও চোখে জল আসে! তিনি দেখিলেন, সেই বাড়ীর কর্ত্তা (নাম মনে নাই) জ্বর, প্লীহা, যকৃত, উদরী এবং শোথে শয্যাগত। মৃত্যু যেন তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। গৃহিণীরও অবস্থা প্রায় তদ্রূপ। তাহাকেও গ্রহণী, সূতিকা ও জ্বরে শয্যাগত দেখিলেন। দুইটী অপোগণ্ড শিশুর উত্থানশক্তি আছে বটে, কিন্তু পেটগুলি প্লীহাতে পূর্ণ। বৃদ্ধাটী ঐ কর্ত্তার শাশুড়ী। তাহার বয়স প্রায় ৬০।৭০ বৎসর হইবে। চোখে ভাল দেখিতে পাইত না, তথাপি হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিত। সে অঞ্চলে গোয়াল ঘরের মশা নিবারণের জন্য এক একটী অগ্নিকুণ্ড থাকে। দুর্ভাগিনী একদিন সেই অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া একখানি পা ভয়ানক রূপে পুড়াইয়া ফেলে। তাহাতে ঘা হইয়া পোকা পড়িয়াছে। বৃদ্ধা যাতনায় চীৎকার করিতেছে! সে দৃশ্য দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। বাড়ীর মধ্যে কেবল ৯।১০ বৎসরের একটী মেয়ে ভাল ছিল। সে কোন প্রকারে কষ্টে সৃষ্টে সকলের পথ্য যোগাইত। শিক্ষক মহাশয় সেই দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। ইহাদিগকে দাসাশ্রমে পাঠাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বাড়ীর কর্ত্তাটী যদিও বা যাইতে রাজী হইল, তথাপি গৃহিণী কিছুতেই সম্মত হইল না। গৃহিণী তীব্রস্বরে স্বামীকে বলিল—"প্রাণ গেলেও বিদেশ বিভুঁইয়ে যাইব না। তুমি যদি যাও, তবে গলায় কলসী বাঁধিয়া আমি আত্মহত্যা করিব। যেতে হয় বুড়ী যাক্।" সেই শিক্ষক, ছাত্র ও গ্রামের দুই একজন মাতব্বর ব্যক্তি কত বুঝাইলেন, গৃহিণী কিছুতেই সম্মত হইল না। শত যুক্তি তর্ক পরাস্ত হইল, গৃহিণীরই জয় হইল। স্থির হইল—আর কেহ যাইবে না, কেবল বুড়ীই শিক্ষকের সঙ্গে যাইবে।

সেই দিনই বৃদ্ধার ঘা পরিষ্কার করিয়া পোকাগুলি বাহির করিয়া দেওয়া হইল; এবং পরদিন যাওয়া স্থির করিয়া শিক্ষক তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাথেয় সংগৃহীত হইল; কিন্তু

৫ ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়া কিরূপে বৃদ্ধাকে রেলওয়ে ষ্টেশনে আনা যায়? ইহারা জাতিতে চাঁড়াল, কোন পাল্কী-বেহারা বা গাড়োয়ান তাহাকে আনিতে রাজী হইল না। কত প্রলোভন, কত ভয় দেখান হইল, তথাপি সেই জাতিভেদের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে কেহই সাহসী হইল না। অবশেষে কি করা যায়? সকলেই নিরাশ হইলেন। শিক্ষক স্থির করিলেন, যে কোনরূপে তাহাকে দাসাশ্রমে পাঠাইতেই হইবে। সন্ধ্যার সময় সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া দুই একজন মাতব্বর ব্যক্তিকে বলিলেন—"তোমরা ত এই বৃদ্ধার জ্ঞাতি; তোমরা ইহাকে ষ্টেশনে রাখিয়া আসিতে পারিবে না কি?" সকলেই অস্বীকার করিল। তখন সেই শিক্ষক নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা তোমরা না যাও, আমি একাই ইহাকে সমস্ত রাত্রি ধীরে ধীরে বহন করিয়া ষ্টেশনে লইয়া যাইব।" শিক্ষকের এই কথায় ছাত্রটীও তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। তখন গ্রামের একটী কৃষক যুবা উত্তেজিত স্বরে বলিল,—"যে যাহা বলে বলুক, আমিও আপনাদের সহিত যোগ দিব। আজ আর বেলা নাই; কাল বিকালে আসিবেন। আমরা তিন জনে ইহাকে ষ্টেশনে লইয়া যাইব।" শিক্ষক এই আকস্মিক বন্দোবস্তে আনন্দিত হইয়া সেদিনকার মত বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। পরদিন আবার শিক্ষক ও ছাত্র সেই গ্রামে উপস্থিত হইলেন। যেমন গ্রামে প্রবেশ করা, অমনি চারিদিক হইতে সকলে বলিতে লাগিল—"হ্যাঁগো হ্যাঁ, এই কি ভদ্রলোকের কাজ? এমন সর্ব্বনাশ করিতে আছে? ছি! ছি! ছি!!" শিক্ষক ত অবাক্! তিনি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলেন না। যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই লোকে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। অবশেষে একজন আসিয়া বলিল—"মহাশয়! এই গ্রামে মহেশ নামে এক চৌকিদার বাস করে। সে নাকি থানা হইতে শুনিয়া আসিয়াছে, কোম্পানী বাহাদুর কলিকাতায় মানুষের তেল বিক্রয় করেন। বুড়াবুড়ীদের কাটিয়া তেল প্রস্তুত হয়। আপনি নাকি সেই কোম্পানীর এজেণ্ট! তাই এই বুড়ীকে এত আগ্রহের সহিত নিতে আসিয়াছেন। নতুবা আজিকালিকার দিনে কে কার উপকার করে? মহেশ চৌকিদারের কথায় সকল লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আপনি সতর্ক হউন।" শিক্ষক ত অবাক্! একি ব্যাপার? আজিকালিকার দিনেও মানুষের এমন কুসংস্কার থাকে? যে লোকটী সাহায্য করিবে

বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তিনি অন্যমনস্কভাবে তাহার বাড়ীতেই উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র সেও বলিল,—"আমি আপনাদের সাহায্য করিতে পারিব না।" শিক্ষকের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গ্রামের মেয়েরা পর্য্যন্ত বলিতে লাগিল—"ভদ্রলোকের ছেলে, মানুষের এমন সর্ব্বনাশ করে?" তখন শিক্ষক মহাশয় হাসিবেন কি কাঁদিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি সকলকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, কিন্তু কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল না। তিনি জনৈক প্রতাপশালী জমীদারের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, নতুবা সেদিন অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন—"তোমরা মহেশ চৌকিদারকে ডাক। সে কোন্ স্থানে এ কথা শুনিয়া আসিয়াছে, প্রমাণ করুক। যদি প্রমাণ করিতে না পারে, আর এই বুড়ী যত্নাভাবে এখানে মারা যায়, তবে তাহার নামে আমরা আদালতে নালিশ করিয়া শাস্তি দেওয়াইব।" এই কথা শুনিয়া সকলেই বলিয়া উঠিল—"ঠিক্ কথা, ঠিক্ কথা, মহেশকে ডাক।" ধীরে ধীরে গ্রামের মাতব্বরগণ একত্রিত হইল। মহেশের জন্য লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু চৌকিদার মহাশয় শিক্ষকের নিদারুণ সঙ্কল্প শুনিয়া পূর্ব্বেই চম্পট দিয়াছিলেন। কাজেই মহেশকে পাওয়া গেল না। সুতরাং সকলেই শিক্ষকের কথা সত্য বলিয়া স্থির করিল এবং বৃদ্ধাকে লইয়া যাইবার অনুমতি দিল। তখন রাত্রি প্রায় ১০টা। শিক্ষক ও ছাত্র দুই জনে একটা বাঁশের দোলা প্রস্তুত করিয়া সেই বৃদ্ধার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অন্য লোক না পাওয়ায় তাঁহারা দুই জনেই বৃদ্ধাকে লইয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে গ্রামের আরও দুই একজন কৃষক উপস্থিত হইল। বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, ছাত্রটী বৃদ্ধাকে ডাকিয়া বলিল—"ওগো ওঠ, মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন। এখনি তোমাকে যাইতে হইবে।" বৃদ্ধা পূর্ব্বেই তেল বিক্রয়ের কাহিনী শুনিয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ্য বৈঠকে সে কথা মিথ্যা বলিয়া যে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা শুনে নাই। সে তাঁহাদের সাড়া পাইয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল—"ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ, শীঘ্র আমায় রক্ষা কর। জীয়ন্ত যম আমায় নিতে আসিয়াছে।" সঙ্গে সঙ্গে সেই রুগ্ন বালকবালিকা, এমন কি সেই মুমূর্ষু কর্ত্তা ও গৃহিণী পর্য্যন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। গ্রামের লোক কত

বুঝাইল, দরজা খুলিতে বলিল, কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে ২।৩ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া শিক্ষক মহাশয় নিরাশ মনে ফিরিয়া গেলেন। ইহাদের আর দাসাশ্রমে আসা হইল না। কয়েক দিন পরেই শুনা গেল, বৃদ্ধা এবং তাহার জামাতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। হায় কুসংস্কারে মানুষের কত সর্ব্বনাশ করে!

এই ত গেল এক ঘটনা। মাস খানিক হইল এই প্রকার আরও একটী ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহাও এইখানে লিখিত হইল।

যশোহর জেলার অন্তর্গত কুলবাড়িয়া বাগআঁচড়া গ্রাম হইতে আমরা গত মাসে একটি অবশাঙ্গ আতুর পাইয়াছি। নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি তাহার স্বগ্রামস্থ একজন ভদ্রলোকের লিখিত।

"এই ব্যক্তির নাম শ্রীরসিকলাল পাড়ুই। ইহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ ও কঙ্কাল-মাত্র সার। যশোহর জেলার অন্তর্গত কুলবাড়িয়া বাগআঁচড়া গ্রামে ধীবর-বংশে ইহার জন্ম। ইহার পিতা জগমোহন পাড়ুই অতি সজ্জন ছিল। রসিকের শৈশবেই তাহার মাতাঠাকুরাণীর কাল হয়। সুতরাং বৃদ্ধ জগ-মোহনকে তাহার এক ভগ্নীর সাহায্যে শৈশব হইতে রসিক, প্রসন্ন ও কৈলাস এই তিন পুত্রকে মানুষ করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আজ যে রোগে রসিককে চিরদিনের জন্য শয্যাশায়ী করিয়াছে, উহা তাহার ১৩।১৪ বৎসরের সময় তাহাকে আক্রমণ করে। আমরা শুনিয়াছি, ঐ সময়ে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহাকে এই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন এক গ্রাম্য হাতুড়ে কবিরাজের সাহায্যে তাহার শরীরের উপরার্দ্ধ অনেক পরি-মাণে ভাল হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু নিম্নভাগ পূর্ব্ববৎ অসাড় রহিয়া গেল। সেই অবধি রসিকের জীবন-প্রদীপ প্রজ্জলিত থাকিয়াও তাহার গৃহকে যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা আর দূর করিবার উপায় নাই। তাহার কি শোচনীয় অবস্থা, তাহা কি কল্পনা করিয়া বুঝিতে পারা যায়? তাহার প্রকৃত অবস্থা কি, না দেখিলে কখন হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। তাহার জন্য তাহাদের ঘরের দাওয়ায় এক পার্শ্বে একটু দূরে একখানা বংশমঞ্চ বান্ধিয়া দেওয়া হইল। রসিক সেই বাঁশের মাচায় যে ভাবে শুইল, কত কত বৎসর চলিয়া গেল, তাহার স্থানের পরিবর্ত্তন হইল না। সে যে অবস্থায় শুইয়াছিল, সেই অবস্থায় থাকিয়াই মল-মূত্র পরিত্যাগ করিত;

মঞ্চের মধ্যস্থিত ছিদ্র দিয়া মল-মূত্র নিম্নে পতিত হইত; মলমূত্র হইতে পরিষ্কার করিয়া রাখিবার কেহ তাহার ছিল না। মাছি ভন্ ভন্ করিয়া তাহার গাত্রে জড়াইয়া থাকিত, মশা রাশি রাশি আসিয়া তাহাকে কামড়াইত কিন্তু হস্তপদ প্রভৃতি সকল অবয়ব থাকিতেও তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। সেই অবস্থায় থাকিয়াই আবার তাহাকে অন্যের আনীত অন্নের দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিতে হইত। বিষ্ঠার গন্ধে সে বংশমঞ্চের নিকট যাইতে কাহারও প্রবৃত্তি হইত না। তাহার আত্মীয়েরা কেবল নাকে কাপড় দিয়া কোন রকমে তাহার আহারীয় মঞ্চোপরি রাখিয়া আসিত।* যদি তাহার জননী জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের এদশা সহ্য করিতে পারিতেন না। মলমূত্রমণ্ডিত অবস্থায় দূরে উদাসীন ভাবে রাখিয়া দিয়া তিনি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। জননী জীবিত না থাকিলেও তাহার পিতা তাহার উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিত, তাহার ভ্রাতারাও তাহার অভাব মোচনে যত্নবান থাকিত। তাহাদের সংসারে স্ত্রীলোকের অভাব ছিল বলিয়া তাহারা গৃহমধ্যে রাখিয়া তাহার সেবা করিতে পারিত না। আর সেরূপ সেবা কেবল জননী ভিন্ন আর কাহারও নিকট পাওয়া সম্ভব নহে। বৃদ্ধ জগমোহন যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন রসিক যতদূর নিকটে ছিল, জগমোহনের মৃত্যুর পর সে তদপেক্ষা দূরে গিয়া পড়িল। তাহার মঞ্চ গৃহ হইতে দূরে নির্ম্মিত হইল। কেন না মলমূত্রের গন্ধে সে গৃহে অবস্থান করা কঠিন হইয়াছিল। জগমোহনের মৃত্যুর পর মধ্যম ভ্রাতা প্রসন্নের উপর সংসারের ভার পড়িল। প্রসন্ন খুব বলিষ্ঠ এবং স্বীয় ব্যবসায়ে অত্যন্ত পটু ছিল। তাহার সংসার বেশ স্বচ্ছলতায় সহিত চলিতে লাগিল। এই সময়ে সে বিবাহ করে। কিন্তু ইহাদের স্বচ্ছল অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইল না। অল্প দিনের মধ্যে প্রসন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। একমাত্র কন্যা রাখিয়া তাহার স্ত্রীও ইহলোক পরিত্যাগ করিল। কনিষ্ঠভ্রাতা কৈলাস এখন সংসারের ভার গ্রহণ করিল। সেও খুব বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যক্ষম। কোন রূপে সংসার

---

* এই সকল ন্যক্কারজনক বর্ণনা পাঠ করিতে কেহই ইচ্ছা করেন না; কিন্তু অনেক হতভাগ্য লোক কিরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা সাধারণের গোচর করিবার নিমিত্ত এই বর্ণনাগুলি যেমন পাইয়াছি, তেমনি রাখিয়া দিলাম। সম্পাদক।

চালাইতে লাগিল। কিন্তু হায় তাহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকা যায় না। কয়েক মাস হইতে সে রক্ত আমাশয় ও জ্বরে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সে পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন না করিলে সংসার চলে না। মধ্যে ঔষধ সেবন করিয়া কিছু আরাম হইয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে না হইতে তাহাকে উদরান্নের জন্ম জলে ডুব দিয়া মৎস্য ধরিতে হইয়াছিল। ইহাতেই তাহার রোগ বৃদ্ধি হয় ও জ্বর হইয়া নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এই কৈলাসের উপর আতুর রসিকের জীবিকার ভার। মধ্যম ভ্রাতা প্রসন্নের কন্যাটীরও এই কৈলাস কাকা ভিন্ন আর গতি নাই।

"আমরা ইহার এই দুরবস্থা দেখিয়া রসিককে দাসাশ্রমে আনিবার জন্ম একবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। দাসাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাদের নিকট তাঁহার পাথেয় প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের লোকের এমনি দুরবস্থা —তাহারা মনে করিল, আমরা কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্ম তাহাকে দাসাশ্রমে আনিতে চাহিতেছি। কেহ কেহ বলিল, সরকার বাহাদুরের কিছু মানুষের তেলের দরকার হইয়াছে, তাই কলে কৌশলে রুগ্ন অকর্ম্মণ্য লোকদিগকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলে ও জ্বাল দিয়া তৈল প্রস্তুত করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল। তাহাদের যে সকল জ্ঞাতি দুর্গন্ধের জন্ম তাহার মঞ্চের নিকট যাইত না—যাহারা তাহার দুর্দ্দশায় এক কপর্দ্দক দিয়াও সাহায্য করিতেছে না বা করিবে না, তাহারা গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, না যাওয়া উচিত নহে। গেলেই মারিয়া তেল করিবে।

"সবিশেষ বুঝাইয়া বলায় রসিক আসিতে সম্মত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার জ্ঞাতিরা বাধা দিয়া আসিতে দেয় নাই।

"ঈশ্বরেচ্ছায় ও দুইটী যুবকের চেষ্টায় রসিক আজ দাসাশ্রমে আনীত হইয়াছে। ইঁহারা রসিককে আনিতে গিয়া যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্ম তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। রসিকের আত্মীয় স্বজনকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া ও দাসাশ্রমের বিবরণ তাহাদিগকে শুনাইয়া— এবং গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া তাঁহাদের দ্বারা বুঝাইয়া ও অনুরোধ করিয়া ইঁহারা রসিককে দাসাশ্রমে আনিবার জন্ম প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে দিন রসিককে আনা হইল, সে দিনের

দৃশ্য কি মনোহর! যুবকদ্বয়ের একজন বাবু সুশীলচন্দ্র মল্লিক রসিকের আত্মীয় দুই এক জনকে মঞ্চ হইতে রসিককে নামাইবার জন্য বলিলে তাহারা নাকে কাপড় দিয়া অতি কষ্টে মঞ্চের নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু ২।১ মিনিট সেখানে থাকিতে থাকিতে ওআক ওআক করিয়া বমি করিতে করিতে পলাইয়া আসিল। অবশেষে একটী ধীবর বালক রসিকের মস্তক ও সুশীল বাবু রসিকের পদদ্বয় ধারণ করিয়া অতি কষ্টে তাহাকে নামাইলেন। রসিকের মাথায় এক ঝোপের মত চুল হইয়াছিল। জীর্ণ মঞ্চের আচ্ছাদনের ভিতর দিয়া ২০।২২ বৎসরের বৃষ্টি পড়িয়া তাহার চুল যে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। গ্রামের পরামাণিককে চুল কাটিবার জন্য ডাকিয়া আনা হইল, কিন্তু সে তাহাকে স্পর্শ করিতে চাহিল না। তখন সুশীল বাবু নিজে কাঁচি হস্তে চুল কাটিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ঐরূপ চুলের জটা কাটা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব? তাঁহার হাতে লাগিতে লাগিল, তিনি পারিলেন না। অবশেষে যথেষ্ট পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়া উক্ত প্রামাণিকের সাহায্যে চুলগুলি কর্ত্তন করা হইল। প্রামাণিক সুশীল বাবুদের প্রজা ছিল বলিয়া অবশেষে স্বীকৃত হইয়াছিল। সে চুলগুলিও দর্শনীয় বিষয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় সুশীল বাবু সেখানে উহা রাখিয়া আসিয়াছেন। চুল কাটার পর রসিকের সুন্দর মুখশ্রী প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহার হাতের নখও খুব বড় হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্তর তাহাকে স্নান করাইয়া একখানা তক্তার উপর শয়ন করাইতে হইল এবং তৎপরে নৌকা, গোযান ও রেলগাড়ীর সাহায্যে কলিকাতায় আনিয়া দাসাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করা হইল। সেদিন প্রত্যূষে তক্তায় করিয়া যখন রসিককে দাসাশ্রম-কার্য্যালয়ের নিকট আনা হইল, তখন সকলে দেখিয়া অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমরাও সে দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম।

"ইহার পর রসিককে গিরিডিতে দাসাশ্রমের সেবালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। আশা করি সে সেখানে সুখে জীবনের অবশিষ্ট দিন গুলি কাটাইতে সক্ষম হইবে।

"বাড়ী হইতে যখন আইসে, তখন তাহার বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত রোদন করিয়াছিল। রসিকও বাড়ীর সকলকে ছাড়িয়া আসিয়া অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব

করিতেছিল। তাহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় সেই রোগক্লিষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৈলাসের কষ্টের কথা ভাবিয়া কাতর হইতেছিল। সুশীল বাবু ও তাঁহার সঙ্গী বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যাহাতে তাহার ভাইটী রোগমুক্ত হইয়া সুখে থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। তাঁহারাও যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন। রসিকের ইচ্ছা যে তাহার এই ভাইটী দাসাশ্রমে থাকিয়া রোগমুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যায় এবং সে স্বচক্ষে তাহাকে সুস্থ দেখিয়া কৃতার্থ হয়।"

খণ্ডগিরি।

"এই সেই খণ্ডগিরি? এইখানেই অর্হতগণ সংসারে বীতরাগ হইয়া নির্ব্বাণের পথ অন্বেষণ করিয়াছিলেন? এইখানেই রাজেন্দ্রগণ বৌদ্ধযতিগণের ধ্যান ও সমাধির নিমিত্ত গিরিদেহ খোদিত করাইয়াছিলেন?"

পশ্চিমগগনে নানারঙ্গ ছড়াইয়া ভানু ক্রমশঃ ধরাশায়ী হইতেছেন। গিরিপাদ হইতে অপক্ব ধান্যের শ্যামল দুকূল পরিয়া বিস্তীর্ণ বসুন্ধরা স্বীয় কলেবর মাণ্ডত করিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে দেবাদিদেব ভুবনেশ্বরের তুঙ্গ মন্দিরচূড়া নয়নে অস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। সন্ধ্যা-সমাগম দেখিয়া সমুদ্র-সমীর ক্লান্ত শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে। লোকালয়ের কোলাহল নাই, সংসারের আকুলতা নাই, চারিদিক্ নিস্তব্ধ।

শরৎকাল। একদিন অপরাহ্নে আমরা খণ্ডগিরি দেখিতে আসিয়াছিলাম। তথায় পাষাণময় গুম্ফা (খোদত গৃহ) দেখিয়া আসিয়া উদয়গিরির উপরে ক্লান্তদেহে উপবিষ্ট। সম্মুখে ও নীচে "রাজারাণী গুম্ফা" নামক গিরিদেহখোদিত পাষাণময় দ্বিতল গৃহশ্রেণী।

হয় ত বাহ্যপ্রকৃতি আমাদের চিন্তাস্রোতকে নূতন মার্গে চালিত করে, হয় ত আমাদের মনই প্রকৃতিকে ইচ্ছানুরূপ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া আপনার সহচরী করিয়া লয়। কোথায় সেই প্রাচীন বৌদ্ধগণ, আর কোথায় আমরা! প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধকীর্ত্তি প্রথিত হইয়াছিল; সামীপ্যগুণে আজ আমরা সেই কালের অন্তর্ভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নীরবে সেই পুরাতন কাহিনীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলাম। যেন কালের পরিবর্ত্তন হয় নাই, যেন সেই সকল গিরিগুহা এখনও ভিক্ষুগণে পরিপূর্ণ, যেন আমরা তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

খণ্ডগিরির সম্মুখে পূর্ব্বদিকে কয়েকটা আম্র বৃক্ষের বাগান। তন্মধ্যে এখানে সেখানে কয়েকটা বট ও অশ্বত্থ গাছ। কিঞ্চিৎ দূরে কুচিলা ও অন্যান্য বন্য বৃক্ষের জঙ্গল। একটা অশ্বত্থবৃক্ষস্থ কয়েকটা বানরের আকস্মিক চীৎকারে আমাদের চিন্তাস্রোত প্রতিহত হইল। আমার বন্ধু বলিলেন, "চলুন, তৃতীয়ার চাঁদ ডোব ডোব হইতেছে। এখানে হিংস্র জন্তুর অসদ্ভাব নাই।" বাস্তবিক, সেই বৌদ্ধযতিগণের পুরাতন কুটীর সকল এখন হিংস্র জন্তুর আবাস-ভূমি হইয়াছে। পাষাণময় বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে' উচ্চগিরিশেখর বলিয়াই এখনও ভগ্ন স্তূপে পরিণত হয় নাই।

পাষাণও কালের হাত এড়াইতে পারে নাই। স্থানে স্থানে গুম্ফা ভগ্ন হইয়াছে, স্থানে স্থানে শিলা সকল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ বন্য বৃক্ষে গৃহ ও প্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত হইয়াছে। দুই এক উচ্চ স্থান ব্যতীত সমুদয় গিরিদেহ বৃক্ষাদিতে আবৃত হইয়াছে।

নীচে হইতে উপরে আরোহণের তেমন পথ নাই। তবে, প্রাচীন আর্য্যগাথা শুনিতে মধ্যে মধ্যে কোন কোন লোক সে সকল স্থানে বিচরণ করে বলিয়া, লতাপাতার ভিতর দিয়া একটা সঙ্কীর্ণ অস্পষ্ট পথ পড়িয়াছে।

সেই ভিক্ষুগণসেবিত বহুকষ্টে খোদিত গুম্ফা সকল এখন সর্পাদির ক্রীড়াভূমি। যেখানে যতিগণ ধ্যানে দিবসরজনী যাপন করিতেন, এখন তাহা আরণ্য বৃক্ষের উর্ব্বরাভূমি। কত কত সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি হয়ত সেখানে লগ্নসমাধিচিত্তে বাস করিতেন, কত কত সংসার-বিরাগী সেখানে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অন্ধকার রাত্রি সমাগত দেখিয়া আমরা আর অধিকক্ষণ তথায় থাকিতে পারিলাম না। লতাপাতার ভিতর দিয়া গাছের ডালপালা বাঁকাইয়া আমরা উদয়গিরির শেখর হইতে নিঃশব্দে অবতরণ করিতে লাগিলাম।

আমার বন্ধুর সহধর্ম্মিণী আমাদের সঙ্গিনী হইবার অভিলাষে পাহাড়ের কিয়দ্দূর উঠিয়াছিলেন। লতাপাতায় পথ আবৃত, স্থানে স্থানে বিশ্লিষ্ট শিলা সকল পতনোন্মুখ দেখিয়া তিনি কিয়দ্দূর উঠিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উদয়গিরির পাদদেশে এক বৈষ্ণবের কুটীর রহিয়াছে। তাঁহার কুটীরে বন্ধু-গেহিনী আশ্রয় লইয়াছিলেন।

একটি ক্ষীণ প্রদীপ গৃহের এক পার্শ্বে মিট্ মিট্ করিতেছিল। নানা দেশদেশান্তরের নানা ভক্তযোগী সন্ন্যাসীর পাদুকা-শ্রেণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া

বৈষ্ণব ঠাকুর তাহাদের ইতিহাস বর্ণনা করিতেছিলেন। কাষ্ঠময় পাদুকার বিচিত্র রচনা ও তদুপরি চন্দনলেপ দেখিয়া বুঝিলাম যে, তৎসমুদয়ের অধিকারী নানাদেশীয় সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি বৈষ্ণবঠাকুরের অচলা ভক্তি। বৈষ্ণবঠাকুর শুভ্র শ্মশ্রুতে হাত দিয়া পাদুকা-কাহিনী ব্যাখ্যা করিতেছিলেন; অদূরে সম্ভ্রমে অবনতমস্তকে বন্ধুগেহিনী তাহা শুনিতেছিলেন।

আরতির সময় অতীতপ্রায় দেখিয়া বৈষ্ণবঠাকুর আমাদিগকে পরদিন আসিতে বলিলেন। আমরাও সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কোন কথা হয় নাই। কি যেন গাম্ভীর্য্যে, কি যেন পূর্ব্বগৌরবস্মৃতিতে, কি যেন আশাভঙ্গে, আমার বন্ধুর চিত্ত পূর্ণ হইয়াছিল। কতক্ষণ পরে বন্ধু বলিলেন, "আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ঐ সকল গিরিগুহায় কালাতিপাত করিতেন? যদি তাঁহারা মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আশ্রম বিলুপ্ত করিয়া গেলেন না কেন?"

ছয় বৎসর পরে আবার খণ্ডগিরি দেখিবার জন্য উৎসুক হইলাম। কটকের ঠিক দক্ষিণে পুরী। পুরী যাইবার এক সুন্দর পাকা রাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়া ৮ ক্রোশ গেলে পশ্চিম দিকে বাঁকিতে হয়। পাকা রাস্তা হইতে প্রায় ২।।০ ক্রোশ দূরে মহাদেব ভুবনেশ্বরের পুণ্যক্ষেত্র। তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে আরও ২।।০ ক্রোশ গেলে খণ্ডগিরি। অতএব এ পথে গেলে খণ্ডগিরি প্রায় ১৩ ক্রোশ দূরে পড়ে।

এবার আমাদের খণ্ডগিরিই দেখিবার সংকল্প ছিল। এজন্য ঐ বাঁকা পথে না গিয়া সোজা চাঁদগা পথে যাবার বন্দোবস্ত করা গেল। ঐ পথ দিয়া খুরদা যাইতে হয়। এজন্য উহার নাম খুরদা রাস্তা হইয়াছে। এই পথে খণ্ডগিরি কটক হইতে ৮।৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

এবার এক জন প্রত্ন ও ভূ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বন্ধু সপরিবারে যাইতেছিলেন। এবার সেই নীরব কবি সঙ্গে ছিলেন না। আহারাদি সমাপন করিয়া রাত্রি দশটার সময় শ্রীংযুক্ত গোযানে চড়িয়া খণ্ডগিরি যাত্রা করা গেল। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, পথের দুই পার্শ্বে অরণ্যানী। ঘোর অন্ধকার রাত্রে এরূপ পথ আরও অতিক্রম করিয়াছি শুনিয়া ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল।

শীতকালের সূর্য্য, দেখিতে দেখিতে শীঘ্রই আকাশে উঠিয়া বসিলেন।

শীঘ্রই ৮টা বাজিল। আমরা খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া উদয়গিরির পাদদেশে স্থিত বৈষ্ণবঠাকুরের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

বাস্তবিক, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি, একই গিরি; মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ দ্বারা একটি হইতে অন্যটি খণ্ডিত দেখায়। বোধ হয়, এই জন্যই একটির বিশেষ নাম খণ্ডগিরি হইয়াছে। উভয়ই বালুকাপ্রস্তরে গঠিত, উভয়ই প্রায় এক দিকে বিস্তৃত, উভয়ই প্রায় একই প্রকার উচ্চ। চারি দিকের ভুমি হইতে উহারা প্রায় ৮০ হাত উচ্চ মাত্র। উদয়গিরি প্রায় ৮০০ হাত দীর্ঘ, খণ্ডগিরিও প্রায় সেইরূপ।

বালুকাপ্রস্তর বলিয়া গুম্ফা-খননের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু বালুকা-প্রস্তর বলিয়াই গুম্ফার কারুকার্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে। পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া যে গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, তাহাদিগকে এখানে গুম্ফা* বলে। এরূপ গুম্ফা পশ্চিমদিকের খণ্ডগিরি এবং পূর্ব্বদিকের উদয়গিরি, উভয়েই বর্ত্তমান। তবে উদয়গিরিতে যত আছে, খণ্ডগিরিতে তত নাই।

আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমরা প্রথমে উদয়গিরি দেখিতে উঠিলাম। একটির পর একটি সমুদয় গুম্ফা দেখিতে লাগিলাম। উদয়গিরির পূর্ব্বাংশে "রাণী নওর" বা রাজারাণী নামক পূর্ব্বোক্ত দ্বিতল গুম্ফা। 'নওর' শব্দটা নগর শব্দের অপভ্রংশ। এই নাম হইতেই উহার অপরাপর নাম 'রাণীগুম্ফা', 'রাণী অন্তঃপুর' ইত্যাদির উৎপত্তি।

উহার তিন দিকে দ্বিতল গৃহশ্রেণী। কেবল দক্ষিণ-দিক্ উন্মুক্ত। ঐ দিকেও গৃহ থাকিলে গুম্ফাটি আজ কালকার চকমিলান বাড়ীর মত দেখাইত। মধ্যস্থিত প্রাঙ্গণ প্রায় ৩০ হাত লম্বা এবং ১৬ হাত চৌড়া। দক্ষিণ-দিকে পূর্ব্বে কি ছিল, তাহা বলা যায় না। কেন না, এক্ষণে তাহা বিচ্ছিন্ন পাথরে এবং তৃণ-গুল্মাদিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে।

---

* গুম্ফা বা গুম্ফ শব্দ সংস্কৃত বলিয়াই বোধ হয়। ইহার অর্থ গুহা। তিন চারিখানি সংস্কৃত অভিধানে গুম্ফ শব্দের গ্রন্থন অর্থ পাইলাম। কিন্তু গুম্ফার অর্থ গুহা না করিলে নিম্নের শ্লোকের অর্থ পরিস্ফুট হয় না।

"যেন স্বৈরমপাশি পাণিনিমতং
প্রাণাদি কানাদবাগ্ গুম্ফে।"

সাহিত্য রত্নাকর।

"অন্তস্তমরংস্ত পন্নগগবী গুম্ফেষু চাজাগরীৎ।"

মল্লিনাথ কৃত টীকায়াঃ মঙ্গলাচরণম্।

গৃহগুলি হঠাৎ দেখিলে দ্বিতল বোধ হয়। কিন্তু নীচের তলার ঠিক উপরে উপর তলা নহে। বোধ হয় পাহাড়ের গা যেমন ঢালু ছিল, তদনুসারে উপর তলের গৃহগুলি নীচের তলার পশ্চাদ্দিকে খোদিত হইয়াছে।

প্রাঙ্গণের তিন দিকে সারি সারি ঘর। ঘরের সম্মুখে থামযুক্ত বারান্দা। দ্বার প্রকোষ্ঠের দুই পার্শ্বে দুই জন বর্ম্মাবৃত প্রহরী পাষাণদেহ বহির্গত করিয়া আছে। এই বারান্দার কোথাও বিকটবদন স্থূলদেহ বামনমূর্ত্তি, কোথাও কিম্ভূতকিমাকার হ্রস্বমূর্ত্তি, আর কোথাও বা বঙ্কিমবপু সুকুমারীর দেহ যষ্টি। ইহাদের মস্তকে উপরিস্থিত গুরুভার অর্পিত হইয়াছে।

নীচের বারান্দা প্রায় ৪০ হাত লম্বা, ৬ হাত চৌড়া এবং ৪৷৷৹ হাত উচ্চ। উপর তলার এক একটা ঘর প্রায় ১০ হাত লম্বা, ৫ হাত চৌড়া এবং ২৷৷৹ হাত উচ্চ। এই রাণী গুম্ফাই সকলের মধ্যে প্রকাণ্ড। দ্বারের উপরে যে সকল নরনারীমূর্ত্তি আছে, তাহাদের ধুতি চাদর, আভরণ, সঙ্গীত-যন্ত্র ইত্যাদি আজও প্রায় অবিকৃত আকারে উড়িষ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ের আরও উচ্চে গণেশ-গুম্ফা। গণেশ-গুম্ফাও বিস্তৃত। কিন্তু উহা দ্বিতল নহে। উহাতে দুই খানি মাত্র ঘর, ঘরের সম্মুখে বারান্দা। গুম্ফার দুই পার্শ্বে দুইটা পাষাণময় হস্তীমূর্ত্তি রহিয়াছে। গজকে গজানন ভাবিয়াই বোধ হয় উহার নাম গণেশ-গুম্ফা হইয়া থাকিবে।*

স্বর্গপুরী গুম্ফা প্রকৃত দ্বিতল, অর্থাৎ ইহার নীচের তলার ঠিক উপরে উপর তলা। কিন্তু ইহাই উহার ধ্বংশের কারণ হইয়াছে। তদনন্তর জয়া বিজয়া, বৈকুণ্ঠ, সর্প প্রভৃতি অনেকগুলি গুম্ফা দেখিতে লাগিলাম। ব্যাঘ্র গুম্ফাটি

---

* গণেশ-গুম্ফার দ্বারে কতকগুলি প্রস্তর ও তদুপরি কাঁচা লতাপাতা দেখিয়া বড় কৌতূহল জন্মিল। আমরা শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্বদিন কেহ পাহাড়ে উঠে নাই। এখানে লতাপাতা কে রাখিল? নিকটে গিয়া দেখি, ঘরের ভিতরে এক ভীমকলেবর রক্তচক্ষু পুরুষমূর্ত্তি। সেখানে হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। মূর্ত্তি দেখিয়াই তাহাকে কোন দুর্ব্বৃত্ত দস্যু বলিয়া মনে হইল। সে সেই নির্জ্জন উচ্চ পাহাড়ের গুম্ফার ভিতরে কেন? লোকটা প্রথমে কোন উত্তর দিল না। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে লোকটা বলিল, সে তিন দিন হইতে কোন রোগ শান্তির আশায় গণেশ-গুম্ফায় "হত্যা" দিতেছে। তিন দিন উপবাসী ব্যক্তির সেইরূপ সবল দেহ, রক্তচক্ষু ও তাহার গোপন চেষ্টা দেখিয়া সে কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া সেখানে লুকায়িত আছে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া তত্রত্য চৌকীদারকে উহার প্রকৃত তথ্য লইতে পাঠান গেল। সে আসিয়া বলিল, সে ব্যক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে।

দেখিতে ব্যাঘ্রমুখের মত। গোল বৃহৎ লোল চক্ষু যেন বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। নাসারন্ধ্রও আকারসদৃশ বৃহৎ। মুখবিবরে গুম্ফা খোদিত হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বিশাল দংষ্ট্রা বিকসিত করিয়া মুখব্যাদান করিয়া আছে। এইরূপ, সর্পগুম্ফায় একটা সর্পের ফণার নীচে ক্ষুদ্র গৃহ খোদিত হইয়াছে।

এইরূপ, প্রাণীর আকারে কয়েকটি গুম্ফা খোদিত হইয়াছে। কোনটার ঘর নিতান্ত ক্ষুদ্র ; এত ক্ষুদ্র যে তন্মধ্যে কিরূপে কেহ সোজা হইয়া বসিতে পারিত, তাহাই অসম্ভব মনে হয়। আবার এক একটা ঘর বড় হইলেও তাহার দ্বারটি এত ক্ষুদ্র যে, কচ্ছপের ন্যায় হস্তপদাদি আকুঞ্চিত না করিলে তন্মধ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। কোন কোনটার দ্বারের উপরিভাগে কত লতাপাতা, কত নরনারীর মূর্ত্তি, কত যুদ্ধ সজ্জা। এক্ষণে কোন মূর্ত্তি প্রায় মিশিয়া গিয়াছে, কোনটার হাত আছে ত পা নাই, পা আছে ত মাথা নাই। আবার কোথাও ফলপুষ্প এখনও যেন সদ্যোনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অনেক উচ্চে উঠিয়াছেন। শীতকাল হইলেও তাঁহার কিরণজাল ক্রমশঃ অসহ্য হইতে লাগিল। দ্রুতপদে আমরা উদয়-গিরি সমাপন করিয়া তত্রত্য ডাক বাঙ্গালায় মাধ্যাহ্নিক আহার নিমিত্ত পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম।

বৈকালে খণ্ডগিরি আরোহণ করিলাম। উহাতে উঠিবার নিমিত্ত কিয়-দ্দূর পর্য্যন্ত একটা সোপানশ্রেণী আছে। কিয়দ্দূর উঠিলেই বামে ও দক্ষিণে দুই দিকে দুইটা পথ। দক্ষিণ দিকে অনন্ত গুম্ফা। উহাতে এক খানি লম্বা ঘর, ঘরের সম্মুখে বারান্দা। গৃহমধ্যে বুদ্ধদেবের ভগ্নপ্রায় প্রস্তর-মূর্ত্তি। দ্বারের উপরে রাণীগুম্ফার ন্যায় কতকগুলি স্থাপত্য অলঙ্কার। দুই পার্শ্বে অনন্তের ফণা সকল বিস্তৃত রহিয়াছে।

সোপানশ্রেণীর বাম পথে গেলে কয়েকটা গুম্ফা দেখা যায়। এগুলি জৈন গুম্ফা। কোনটার মধ্যে ধ্যানী বৌদ্ধের কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি, কোন-টায় বা জৈনদের জিনমূর্ত্তি।

খণ্ডগিরির শিখরদেশে একটা আধুনিক জৈন মন্দির। অমন সুন্দর স্থান আর নাই। তথা হইতে চারিদিক সুন্দর দেখায়। উচ্চ বলিয়া শাদা পাথরে এখনও উদ্ভিদ্-জন্মোপযোগী মৃত্তিকা সঞ্চিত হয় নাই। দূর হইতে

গিরিকন্দরের আচ্ছাদন স্বরূপ বৃক্ষাদির ভিতর দিয়া ঐ জৈন মন্দির দৃষ্টি-গোচর হয়।

ঐ মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে দেবসভা নামক বৌদ্ধ-চৈত্য। উহার পূর্ব্বদিকে আকাশগঙ্গা বা গুপ্তগঙ্গা নামক একটা বাপী। প্রায় ৪০ হাত উচ্চে পাহাড় কাটিয়া ঐ বাপী প্রস্তুত হইয়াছিল। উহাতে বার মাস জল থাকে। বোধ হয়, কোন পার্ব্বত্য প্রস্রবণের জলে উহা পূর্ণ থাকে। এক্ষণে উহার আদর নাই, জলও হরিদ্বর্ণ। বোধ হয় পূর্ব্বে গুম্ফাবাসিগণের ঐ জলই পানীয় ছিল।

তিন বৎসর পরে পুরী হইতে প্রত্যাগমন কালে আবার খণ্ড-গিরি দেখিতে আসিলাম। খণ্ড-গিরি যতই দেখি, ততই যেন উহাতে নূতন নূতন রহস্য দেখিতে পাই।

ভুবনেশ্বর হইতে আসিতে আসিতে খণ্ড-গিরির শিখরস্থিত পূর্ব্বোক্ত শ্বেত জৈন মন্দির গাছপালার ভিতর দিয়া অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড সূর্য্য চারি দিক্ দগ্ধ করিতেছিলেন। প্রখর কিরণে মৃতপ্রায় হইয়া উদ্ভিদ্গণ এক প্রকার বিকটগন্ধ বাষ্প উদ্গীরণ করিতে-ছিল। যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, বন্যবৃক্ষাচ্ছাদিত গিরিদেহের উন্মুক্ত স্থান সকল ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে লাগিল।

ভারতের পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থ পূর্ব্বঘাট গিরি নামক পর্ব্বতশ্রেণী সকলেই অবগত আছেন। সেই পূর্ব্বঘাট গিরি চিলিকা হ্রদেই শেষ হয় নাই। আরও উত্তর দিকে উড়িষ্যার ভিতর দিকে উহা বিস্তৃত রহিয়াছে। প্রভেদ এই যে, এখানে স্থানে স্থানে অবিচ্ছিন্ন আকার ত্যাগ করিয়াছে। চারিদিকের মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যেন উহার শাখাগুলি উত্থিত হইয়াছে। ঐ সকল বিশ্লিষ্ট গিরির মধ্যে খণ্ডগিরি একটি।

উহাকে একটী গিরি বলা সঙ্গত হইল না। কেন না, বিশ্লিষ্ট গিরি সকল পরস্পর প্রায় সংলগ্ন। উহাদের পূর্ব্বদিকে উদয়গিরি, তারপর খণ্ডগিরি,তার পর নীলগিরি, তার পর ধবলাগিরি বা ধৌলির পাহাড়। এই ধৌলির পাহাড় উদয়গিরির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি,উভয়েরই সামান্য নাম খণ্ডগিরি। ঐ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে হইলে পূর্ব্বদিকেরটিকে উদয়-গিরি বলা যায়। নীলগিরিতে কোন দর্শনযোগ্য বস্তু নাই। ধৌলির

পাহাড়ে অশোকখোদিত অশোক-বার্ত্তা এখনও সভ্য জগতকে লজ্জিত করিতেছে। ধন্য প্রিন্‌সেপ সাহেবের অধ্যবসায়, ধন্য তাঁহার গবেষণা-বৃত্তি! তিনিই প্রথমে ধৌলির পাষাণ-দেহ হইতে প্রিয়দর্শী অশোকের অহিংসাধর্ম্ম,—রোগ দুঃখের সময় ইতর প্রাণিগণের প্রতি দয়া, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের ইতিহাস উদ্ধার করেন।

বিদ্যাকেশরী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল উড়িষ্যার প্রাচীন ইতি-হাসে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার Antiquities of Orissa এবং Indo-Aryans নামক পুস্তক দুই খানিতে ভারতের লুপ্ত কীর্ত্তি, আচার ব্যবহার প্রভৃতির জ্বলন্ত ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন।

খণ্ডগিরির গুম্ফা সকল কে কবে খোদিত করিয়াছিলেন? কোন কোন গুম্ফায় কি লেখা আছে। কালের কুটিলগতিতে লেখাগুলি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। দুই এক স্থানে যাহা পড়া যায়, তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, সমুদয় গুম্ফা এক সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই। কোন কোন গুম্ফা খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত হইয়াছিল। ঐর নামক কোন কলিঙ্গাধিপতির নাম কোন কোন লেখায় পাওয়া যায়। তিনিই অনেক গুম্ফা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

উড়িষ্যায় যত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের ক্রমিক নিদর্শন গিরি-গুম্ফায়, মন্দিরে, মঠে এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়। সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পর প্রায় সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া এখানে তাঁহার ধর্ম্ম অপ্রতিহত ছিল। সেই সময়েই ঐ সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ গুম্ফা রচিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্রাকার গুম্ফাগুলি না কি সকলের প্রাচীন।

সেইদিন চিন্তা করুন। যেদিন মাগধীয় বৌদ্ধরাজগণ দেশদেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। যেদিন ধর্ম্মের গৌরবে কত কত লোক ভিক্ষু হইয়া লোকালয় স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ করি-তেন। নির্জ্জন স্থান পাইলে কে ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত কোলাহলময় নগরে বাস করিতে চায়? মধ্যে মধ্যে যে গৃহের জীর্ণসংস্কার আবশ্যক হয়, সে গৃহ ছাড়িয়া কে না গিরিগুহায় থাকিতে চায়?

আবার ভানু পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িলেন। আবার অতনুবনরাজিশ্যামিত উপত্যকা অন্ধকারে আরও শ্যামিত হইয়া উঠিল। উচ্চ খণ্ডগিরির জৈন-মন্দিরের চূড়া হইতে ক্ষীণ কিরণ ক্রমশঃ নামিয়া পড়িতে লাগিল। নির্জ্জন

স্থান আরও যেন নির্জ্জন হইয়া উঠিল। একজন বঙ্গদেশীয় পাগলা বৈষ্ণব কখন জৈন-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল। সায়াহ্ন দেখিয়া মৃদঙ্গের ঘোর বাদ্যে তাহার স্থাপিত বিগ্রহের সম্মুখে আরতি করিতে লাগিল। সেই মৃদঙ্গ কাঁসরের রবে গিরিকন্দর দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থানে অস্তাচলগামী সূর্য্যের ক্ষীণ আলোকে, মৃদঙ্গের ঘোর নিনাদে, পাগলের বিকট হাস্য, বৃক্ষাদির ভিতর দিয়া সামুদ্র সমীরের হু হু শব্দ, চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিল। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বর্ষা-দিবার মৃত্যু।

মেঘের অঞ্চলে ঝাঁপি' অরুণ আনন,
কাঁদিতে কাঁদিতে আজি এসেছিল দিবা;
ভেদিয়া জলদ-বাস, অতি মৃদুতর
পড়ে'ছিল ধরণীতে বরণের বিভা।
সারা বেলা বর্ষি অশ্রু, অতি ধীরে ধীরে
সমস্ত আকাশ পায়ে করি অতিক্রম,
ক্লান্ত স্বর্ণ তনুখানি পড়েছে মূরছি'
অস্তাচল প্রান্তে এবে, রোদন-রক্তিম
করুণ নয়নাকাশ অর্দ্ধ উন্মীলিত;
মুখ হ'তে সরে গেছে মেঘ অবরণ!
ম্লানমুখী সন্ধ্যাসখী বসি এলোকেশে
শিয়রেতে, শ্রান্ত শির স্নেহে কোলে লয়ে,
নত নেত্রে হেরিছে সে বিশীর্ণ বয়ান;
বিন্দু বিন্দু শিশিরাশ্রু ফেলিয়া ভূতলে!
মিলা'ল জীবনজ্যোতি দিবাদেহ হ'তে
জন্মশোধ, পড়ে এল ছায়ার পল্লব
আঁখি পরে, পরশিল শীতল মরণ।
টানি' দিয়া মৃত কায়ে আঁধার বসন
সায়াহ্ন বিষণ্ণ মুখে পশিল সুধীরে
নক্ষত্রপ্রদীপ জ্বালা নিশার মন্দিরে!

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।

সেকালের পাঠশালা।

(১)

একালের পাঠশালার কথা স্মরণ করিয়া কেহ কেহ "চোখের জল" ফেলিয়া থাকেন। একালের পাঠশালা সম্বন্ধে আমার তেমন অভিজ্ঞতা না থাকায়, এইরূপ কার্য্য করা সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু বিংশতি বৎসর পূর্ব্বেকার পাঠশালা সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতাবলে, আমি কাহারও অনুরোধ বা প্ররোচনাতেও, সেকালের পাঠশালার কথা চিন্তা করিয়া চোখের জল ফেলিতে সম্মত হই না।

একালের পাঠশালার অন্তর্বাহ্য কিছু কিছু যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, সেকালের পাঠশালার সহিত ইহার সাদৃশ্য অল্প। এই পরিবর্ত্তনশীল যুগে পাঠশালাতেও পরিবর্ত্তনের ছাপ অঙ্কিত হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালী যেরূপ না-বাঙ্গালী না-ইংরেজ; আধুনিক কৃষ্ণযাত্রা যেরূপ না-যাত্রা না-থিয়েটার; আধুনিক পাঠশালাও আমার চক্ষে তদ্রূপ না-পাঠশালা, না-স্কুল!

প্রথমে বাহ্য বিষয়ই ধরুন। আধুনিক অনেক পাঠশালাতে আপনি সেই চিরন্তন "চট, চেটাই ও মাদুর" আর দেখিতে পাইবেন না। সুদৃঢ়, সুগঠিত কাষ্ঠময় বেঞ্চসমূহই আজ কাল তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। আধুনিক পাঠশালার গুরুমহাশয়ও অনেক স্থলে ইংরেজী-জুতো-পরা, কোট-কামিজ-আঁটা, টেরি-কাটা নব্যবাবু। কিন্তু সেকালের গুরুমহাশয়দিগকে আমরা কখনও চটী ভিন্ন অন্য কোনও জুতা পরিতে দেখি নাই; আর অঙ্গে কোট-কামিজ চড়ানো দূরে থাকুক, তিনি চক্ষে সে সকল সামগ্রী কখনও দেখিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি পাঠশালার মধ্যে খোলা গায়েই বসিয়া শিক্ষাদান-কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং বড় বড় পাঠশালা-পরিদর্শকেরা আসিলেও কদাচ নগ্নবপু সমাবৃত করিবার চিন্তা পর্য্যন্ত করিতেন না। আধুনিক কোন কোন গুরুমহাশয়ের ন্যায়, তিনি বেলা দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্তও পাঠশালা করিতেন না এবং রবিবারেও পাঠশালা বন্ধ রাখিবার সঙ্কল্প করিতেন না। তাঁহার পাঠশালা প্রায় সর্ব্ব দিনই খোলা থাকিত; কেবল পর্ব্বদিনেই এই প্রথার ব্যতিক্রম হইত। সে সব কথা যথাস্থানে বলিতেছি।

এ কালের পাঠশালায় আপনি কচিৎ সেই পবিত্র তালপত্র ও "তক্তি" দেখিতে পাইবেন। ঘৃণ্য স্লেট্ পেন্‌সিল এখন তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। ম্যাজেণ্টা ও গুলেল রংএর দৌরাত্মো এবং ম্যানুফ্যাক্‌চারীং কেমিষ্টদের জ্বালায় আজ কাল বেচারা বালকেরা ভুষা ও বাব্‌লা আঠা মাড়িয়া ঘোরকৃষ্ণবর্ণা চাক্‌চিক্যময়ী মসী প্রস্তুত করিবার আমোদটি পর্য্যন্ত সম্ভোগ করিতে পায় না! তালপত্র ও তক্তিতে না লিখিলে হাতের "আঁখর" যে কখনও বসিতে পারে, সে বিশ্বাস আমার নাই। সে কালের পাঠশালার ছাত্র—আমাদের মত কে "মুক্তা" বসাইতে পারে, তাহা জানিতে চাই।

আমি স্থিতিশীল সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও, "পাষাণ-হৃদয়" স্লেটের উপর চিরকালই চটা। পাষাণে দাগ বসে না, আঁখর বসিবে, ইহাও কি বিশ্বাস হয়? তাহার পর, তাহার দয়ামায়ার পরিচয় তাহার নামেই বিলক্ষণ অবগত হওয়া যাইতেছে; তৎসম্বন্ধে আমাকে আর কষ্ট স্বীকার করিয়া অধিক কিছু বলিতে হইবে না। যদি তুমি স্লেট ধরিলে, তবে স্লেটও তোমায় ধরিয়া বসিল। তোমার আর কোথাও একটী পাও নাড়িবার যো রহিল না। একবার যে ডোবার ঘাটে স্লেটখানা ধুইতে যাইবে, সে আশায় মুখে একবারে ছাই পড়িল। গুরুমহাশয়ের হুকুম,—স্লেটের সঙ্গে একটু সিক্ত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া রাখ। তদ্দ্বারাই স্লেট মোছা যাইবে। ডোবার ঘাটে যাইবার আবশ্যকতা কি? কিন্তু বলুন দেখি, তক্তি বা তালপত্রের বেলায় গুরুমহাশয় কখনও কি মুখ হইতে এই আদেশ উচ্চারণ করিতে পারিতেন? আমরা যখন পাঠশালায় পড়িতাম, তখন প্রত্যহ ডোবার ঘাটে তালপত্রগুলি ধুইতে যাইতাম। তালপত্রের লেখাগুলি সযত্নে ধুইয়া না ফেলিলে, কোন মতেই তাহা হইতে কালীর দাগ উঠিত না। সুতরাং এই কষ্টসাধ্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য ব্যাপারে যে ঘণ্টা খানেক সময় লাগিত, তাহার আর বিচিত্রতা কি? তাহার পর সেই জলসিক্ত তালপত্রগুলিকে শীঘ্র বিশুষ্ক করিবার জন্য, তাহাদিগকে মেলিয়া তাহাদের উপর ধূলিজাল বর্ষণ করিতে হইত। ধূলিকণাসমূহ জলবিন্দুসমূহকে শোষণ করিলে, তালপত্র হইতে তাহাদিগকে আবার ঝাড়িয়া ফেলিতে হইত। তৎপরে হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জন্যও আবার ডোবার ঘাটে যাইতে হইত। সুতরাং একবার ভাবিয়া দেখুন, তালপত্র ব্যবহারের কত সুবিধা ছিল! বুদ্ধিমান্ বালকেরা এই দেড় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিত ও কত নূতন তথ্যের

আবিষ্কার করিতে পারিত! "পাষাণ হৃদয়" স্লেট যে কত বালককে পাষাণ-হৃদয় ও জড়প্রকৃতি করিয়া দিয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে সত্যসত্যই আমার চক্ষু হইতে অশ্রু বাহির হয়।

আমি পাঠশালার বুদ্ধিমান্ বালকদের মধ্যে পরিগণিত ছিলাম না। আমার বুদ্ধির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কখনও কোনও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানি না। কিন্তু অনেকেই আমার কার্য্য দেখিয়া কারণের অস্তিত্ব অনুমান করিতেন। পাঠশালায় সমস্ত দিন আবদ্ধ হইয়া থাকিতে বড়ই নারাজ ছিলাম, আর শুভঙ্করের "আর্য্যা" মুখস্থ করিতেও অতীব অনিচ্ছা প্রদর্শন করিতাম। কুক্কুর, বিড়াল, পারাবত, পক্ষিশাবক, ইহাদের প্রতি আমার প্রবল অনুরাগ ছিল; আর সুপক্ক ফলাদিরও উপর বিলক্ষণ অনুগ্রহদৃষ্টি ছিল। শুভঙ্কর দাসের—

"কুড়ুবা কুড়ুবা কুড়ুবা লীয্যে।
কাঠায় কুড়ুবা কাঠায় লীয্যে॥"

এই অদ্ভুত শ্লোকগুলি মুখস্থ না করিয়া আমি গোপনে কৃত্তিবাসী রামায়ণের রামরাবণের যুদ্ধবৃত্তান্ত পড়িতে অতিশয় আগ্রহ প্রদর্শন করিতাম। আমার মতিগতি দেখিয়া গ্রামের অনেক প্রবীণ ব্যক্তি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে জাজ্বল্যমান আছে।

"পা'খ পায়রা পাঁচালী,
তিনে ছেলে মজালি।"

আমাকে লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞবর উপরোক্ত শ্লোকটি মধ্যে মধ্যে উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু ইহাতেও ডোবার ঘাটে "তক্তি" বা তালপত্র ধুইতে যাইবার প্রবৃত্তি আমার কিছুমাত্র কমে নাই!

ডোবার ঘাটে তালপত্র ধুইতে যাইবার সঙ্গে "পা'খ, পায়রা, পাঁচালী"র কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা এস্থলে বলা কর্ত্তব্য। তালপাতাগুলি জলে কিয়ৎক্ষণ ডুবাইয়া রাখিতে হইত। সেই অবসরে আমি নানা স্থানে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিয়া আসিতাম। কোন দিন ডোবার পাড় পার হইয়া খিড়কি দ্বার দিয়া বাটীতে প্রবেশ করিতাম এবং জননীর সহিত দুই চারি গ্রাস অন্ন খাইয়া চলিয়া আসিতাম। কোন দিন মেনী বিড়ালীর ছানাগুলিকে চোর-কুঠরী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতাম, অথবা পায়রার বাচ্চাগুলা উড়িবার চেষ্টা করিতেছে কি না, তাহা দেখিয়া

আসিতাম; কিম্বা কোন দিন হালদারদের মালতীর সহিত গোপনে পাকা কুল, পাকা তেঁতুল, লবণলঙ্কাযুক্ত পিষ্ট আম ও পিষ্ট আমড়া মনের সুখে খাইয়া আসিতাম, অথবা দত্তদের ভাবিনী ও ন'বৌয়ের সহিত একপাড়ি অষ্টাচৌকা খেলিয়া আসিতাম। যদি কোন দিন কোন দুষ্টাশয় বালক তাল পাতা ধুইতে আসিয়া আমাকে ডোবার ঘাটে না দেখিয়া গুরুমহাশয়কে "লাগাইয়া" দিত, আর গুরুমহাশয় তদনুসারে ভূমির উপর সশব্দে বেত্রাঘাত করিতে করিতে আমাকে নিকটে আহ্বান করিতেন, তখন আমি সেই দুষ্টাশয় বালকের মিথ্যাবাদিত্ব প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে অম্লানবদনে আমার ঔদরিক বিকারের কথা বলিয়া ফেলিতাম। গুরুমহাশয় আমার কথায় প্রায়ই অবিশ্বাস করিতেন না; সুতরাং এই উত্তরের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য কোনও দিন কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন নাই। করিলে, নিশ্চিত আমাকে বিপদে পড়িতে হইত।

তালপত্র ব্যবহারের জন্য এবম্বিধ আরও অনেক সুযোগ সুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইত। তালপত্র ছিঁড়িয়া গেলে, নূতন পত্র সংগ্রহ করিতে হইত। আমরা যে অঞ্চলে বাস করিতাম, সেখানে বাজারে তালপত্র বিক্রীত হইত না। আমাদিগকে গাছ হইতে তালপত্র কাটাইয়া লইতে হইত। যেদিন তালপত্র কাটাইতে হইত, সেদিন প্রায় সমস্ত দিনই ছুটী! তাল"বেল্লো" কাটাইয়া, তাহা হইতে সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত পত্রগুলি বাছিয়া, ও তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং প্রত্যেকের গোড়া ও আগা উত্তমরূপে "মুছাইয়া" একটী বৃহৎ "পাততাড়ি" প্রস্তুত করিতে প্রায় সমস্ত দিনই যাইত। পাততাড়ির "বেতী" এবং মালতীকে দিবার জন্য তালপত্র নির্ম্মিত বালা, কঙ্কণ, অনন্ত, মল, হার ও অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিতেও অনেক সময় অতিবাহিত হইত। অবশ্য, মালতীর জন্য এই সমস্ত "মরকত"ময় অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার কথা মালতী ও আমি ভিন্ন কেহ জানিত না।

তালপত্র ব্যবহারের এতই সুবিধা ছিল। "তক্তি" ব্যবহারেও কতক সুবিধা ঘটিত; কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া স্লেট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি এই সুবিধাটুকু আর ঘটিত না। গুরুমহাশয়ের পূর্ব্ব আদেশানুসারে আমরা সকলেই স্লেটের সঙ্গে দড়ি দিয়া এক খণ্ড সিক্ত ছিন্ন বস্ত্র বাঁধিয়া রাখিতাম। স্লেটে "আঁক" কসিতে থাক, আর সেই সিক্ত বস্ত্র দিয়া তাহা মুছিয়া ফেল! এই কবিত্বশূন্য ব্যাপারে কি কাহারও মেজাজ ঠিক্ থাকিতে পারে? আমার

তো মেজাজ গরম হইয়া উঠিত। কোথাও একটি পা নড়িবার যো ছিল না, আর মালতীর সহিত সেই পাকা কুল পাকা তেঁতুলের ভাগ পাড়িবারও অবসর থাকিত না। স্লেট খানার উপর এক দিন এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিলাম যে তাহা মাটিতে আছাড়িয়া ফেলিলাম। গুরুমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল ?" আমি বলিলাম, "হাত হইতে স্লেট খানা পড়িয়া গেল।" স্লেট খানা ভাঙ্গিল কিন্তু ভাল করিয়া ভাঙ্গিল না। সেই ভাঙ্গা স্লেটেই কাজ চলিতে লাগিল! আর একদিন পেন্‌শিলটার উপর রাগ করিয়া তাহা কড়মড় শব্দে চিবাইয়া ফেলিলাম। চিবাইয়া দেখি, তাহা খাইতে বেশ! একটা নূতন আবিষ্কার হইল, ও সেই দিন হইতে আমার পেন্‌সিল ভক্ষণ প্রবৃত্তিও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। যে দিন অঙ্ক কসিতে মন লাগিত না, সেই দিন পেন্‌সিলটা উদরস্থ করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু জনেক দুষ্টাশয় সহপাঠী আমাকে এক দিন পেন্‌সিল খাইতে দেখিয়া গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিল। গুরুমহাশয়ের কাছে ঘটনাটি অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। একবার জিহ্বা পরীক্ষা করিলেই সত্য কথা ধরা পড়িত। বেগতিক দেখিয়া সে দিন বলিলাম, "আমার মুখে পেন্‌শিলটা ছিল বটে ; কিন্তু কখন তাহা চিবাইয়া ফেলিয়াছি, তাহা আমার মনে নাই।" ডোবার ঘাটে যাইবার এইরূপে চারি দিকে পথ বন্ধ দেখিয়া এক দিন স্লেট খানাকে বাড়ী হইতে একটু তৈল মাখাইয়া লইয়া আসিলাম। অঙ্ক কসিবার সময় কোন মতেই আর স্লেটে লেখা গেল না। অগত্যা গুরুমহাশয় বলিলেন, "কয়লা দিয়া স্লেট খানা মাজিয়া লইয়া আয়।" সেই দিন আমার আনন্দ দেখে কে ? একবার মনের সাধে চারিদিকে ঘুরিয়া আসিলাম। কিন্তু এই সুবিধা প্রতিদিন ঘটিত না। গুরুমহাশয় বলিতেন, "একদিন স্লেট মাজিলে চার পাঁচ দিন আর মাজিতে হয় না।" যাহাই হউক, স্লেটের উপর আমি যে কেন চটা, তাহা আশা করি সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এখন সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ বলুন দেখি, পাঠশালা হইতে তালপত্র ও তক্তি উঠিয়া যাওয়াতে সুকুমার বালকবৃন্দের কষ্টের সীমা আছে কি না ?

সে কালে অতি প্রত্যূষে আমাদিগকে পাঠশালায় উপস্থিত হইতে হইত। গুরুমহাশয় বলিতেন, খুব প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পাঠে রত হইলে উত্তমরূপে পাঠাভ্যাস হয়। আমরা প্রত্যূষে উঠিতাম বটে, কিন্তু পাঠে কচিৎ রত হইতাম। সূর্য্যোদয় না হইলে গুরুমহাশয় শয্যাত্যাগ

করিতেন না। সুতরাং আমরা এই সময়ে শৌচসম্পাদনোদ্দেশে মাঠ ও ময়দানের দিকে যাইতাম। বাল্যকালে বীরোচিত কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিটা আমাদের মধ্যে বড়ই বলবতী ছিল। আমাদের মধ্যে যাহাকে দুর্ব্বল ও ভীরু দেখিতাম, তাহাকে আমরা মনে মনে ঘৃণা করিতাম। নিকটবর্ত্তী সহরে আমরা কখন কখন সিপাহীদের প্যারেড্ দেখিতে যাইতাম। দেখিয়া আমাদেরও সিপাহী হইবার ইচ্ছা হইত। সুতরাং বন্দুকাদির উপায়াভাবে আমরা এক একটি বাঁশের লাঠী ঘাড়ে করিয়া এক সঙ্গে পা ফেলিয়া সিপাহী হইবার সখ্ মিটাইতাম। কখন কখন চারি পাঁচ জনে সারি সারি দাঁড়াইয়া লাঠী ঘাড়ে করিয়া সমান ভাবে প্রায় এক মাইল দৌড়িয়া যাইতাম ও আসিতাম। আমাদের এই প্রবৃত্তিটি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রত্যূষ ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে সুযোগ ও অবসর পাইতাম না। সুতরাং প্রত্যূষেই এই প্যারেড কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। প্রত্যূষে কেহ আমাদিগকে এই কার্য্য করিতে দেখিতেও পাইত না। এই কারণে আমাদিগকে কখনও কাহারও তিরস্কারভাজন হইতে হয় নাই।

আমাদিগকে প্রাতরুত্থান অভ্যাস করাইবার জন্য গুরুমহাশয় আমাদের "হাতছড়ি"র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই ব্যবস্থা এইরূপ:—যে বালক সর্ব্বাগ্রে পাঠশালায় আসিত, গুরুমহাশয় তাহার করতলে বেত্রাগ্রভাগ দ্বারা সামান্য আঘাত করিতেন মাত্র। ইহার নাম "শন্টি" অর্থাৎ "শূন্য"। যে "শন্টি" হইত, তাহার খুব সম্মান। সে ছুটীর সময় সর্ব্বাগ্রে বাড়ী যাইতে পারিত। তৎপরে যে বালক পাঠশালায় আসিত, অর্থাৎ দ্বিতীয় বালকের করতলে গুরুমহাশয় একবার মাত্র বেত্রাঘাত করিতেন। এইরূপে তিনি তৃতীয় বালকের করতলে দুইবার, চতুর্থ বালকের করতলে তিনবার ও সর্ব্বশেষ বালকের করতলে উপস্থিত বালকবর্গের সংখ্যানুসারে কখনও ত্রিশ এবং কখনওবা চল্লিশবারও বেত্রাঘাত করিতেন। সর্ব্বশেষ বালকেরই মরণ হইত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গুরুমহাশয় প্রত্যহ "হাতছড়ি" করিতেন না। তাঁহার যেদিন অভিলাষ হইত, সেইদিনই "হাতছড়ি" হইত। কিন্তু "হাতছড়ি" হউক আর না হউক, আমাদিগকে প্রতিদিনই তাহা "খাইবার" জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত।

প্রাতঃকালে সচরাচর সাহিত্য, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতির পঠন ও পাঠনা হইত। এই সময়ে বালকেরা প্রায় সকলেই মন লাগাইয়া স্ফূর্ত্তির

সহিত পাঠাদি প্রস্তুত করিত। পাঠশালার বালকবৃন্দের কলরবে পল্লীখানি প্রতিধ্বনিত হইত। বেলা ১০টার সময় "জলখাবারের ছুটী" হইত। বালকেরা এই সময়ে দন্তধাবনের জন্য দলে দলে নানাদিকে গমন করিত। কিন্তু এই অবসরে তাহারা একবার আপন আপন নবসঞ্চিত জড়তাও বিদূরিত করিয়া লইত। এই উদ্দেশ্যে কেহ কূর্দ্দন, কেহ লম্ফন, কেহ ইতস্ততঃ ধাবন এবং কেহবা ফল বা পক্ষিশাবক সংগ্রহের জন্য বৃক্ষাদিতেও আরোহণ করিত। কিন্তু ক্ষুধার সময় বলিয়া, এই সময়ের স্ফূর্ত্তিটা প্রায়ই অল্পক্ষণস্থায়ী হইত।

জলখাবার খাইয়া বালকেরা শ্লেট, পেন্‌সিল, তক্তি ও অঙ্কের পুস্তক লইয়া পাঠশালায় উপস্থিত হইত। যাহারা অঙ্কাদি কসিতে জানিত না, তাহারা বামকক্ষে পাততাড়ি লইয়া ও দক্ষিণ হস্তে মাটীর দোয়াত ঝুলাইয়া পাঠশালায় উপনীত হইত। তাহাদের কলমগুলি পাততাড়ির "বেতী"র মধ্যে গুঁজা থাকিত। বসিবার জন্য সকল বালককেই গৃহ হইতে আপন আপন আসন আনিতে হইত। ছোট ছোট বালকেরা আসনটি পাততাড়িতে জড়াইয়া আনিত। ইহাতে সেটি বহন করা তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইত। এইরূপে নিজ নিজ আসনে বসিয়া বালকেরা কেহ কেহ অঙ্ক কসিত এবং কেহ কেহবা তাল পাতে "আঙ্ক" "আঙ্ক" লিখিত। পাঠ-শালার মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণী থাকিত। কোন শ্রেণীতে হয়ত একটীমাত্র বালক, কোন শ্রেণীতে দুইটী এবং কোন শ্রেণীতে বা ততোধিক। কিন্তু সকল বালকই এক সঙ্গে বসিত; সুতরাং বাহিরের লোকের পক্ষে শ্রেণী ঠিক্ করিয়া লওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার হইত। কিন্তু গুরুমহাশয় সকল শ্রেণী নখদর্পণে দেখিতে পাইতেন।

গুরুমহাশয়ের পক্ষে একাকী এতগুলি বালকের ও শ্রেণীর তত্ত্বাবধারণ করা সহজ ব্যাপার হইত না। এই কারণে "সর্দ্দার পোড়ো" বালকেরা অধ্যাপনা কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ সহায়তা করিত। এই বালকেরা প্রায়ই পাঠশালার প্রথমশ্রেণীভুক্ত ও গুরুমহাশয়ের একান্ত প্রিয়পাত্র। "সর্দ্দার পোড়ো" বালকেরা এক একজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুরুমহাশয়। ইহাদের হস্তে নিম্নশ্রেণী সমূহের ভার থাকিত। ইহারা নিম্নশ্রেণীর বালকসমূহের পাঠ লইয়া আবার পাঠ বলিয়া দিত এবং কাহারও পাঠে অনবধানতা ও দুষ্টামী দেখিলে নিজেরাই তাহার দণ্ডবিধান করিত। ১টা বাজিলে বালকেরা

অসংখ্য স্রোতস্বতী ও জলধারা ধীরভাবে ও অলক্ষিতভাবে অথচ অবিরামে পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া গুঁড়িয়া ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা অপনয়নের চেষ্টায় আছে ; ও প্রাচীন স্তরাবলীর উপরে আরও একটা স্তর গড়িয়া তুলিতেছে ; এবং অদ্যাপি পুরাতনী সুরধুনীর সহস্র ধারা "গতপ্রাণী মৃতকায়া" সহস্রজীবের কাকশৃগাল পরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত করিয়া ভবিষ্যকালের ভূতত্ত্ববিদের নিমিত্ত সেই স্তরমধ্যে সমাহিত করিয়া রাখিতেছে।

অদ্য বঙ্গদেশে গঙ্গামুখে বা মিসর প্রদেশে নীলনদ মুখে যে ব্যাপার ঘটিতেছে, কতকোটি বৎসর ধরিয়া কতকোটি নদনদী ভূ-পৃষ্ঠের সেই বন্ধুরতাপনোদন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। অদ্যাপি যে প্রণালীতে অলক্ষিত ভাবে এই স্তরবিন্যাস ব্যাপার চলিয়াছে ; অতি প্রাচীন কালেও যে সেই প্রণালী ক্রমেই অলক্ষিত ভাবে স্তরবিন্যাস ব্যাপার ঘটিত, তাহাতে সংশয় করিবার সম্যক্ কারণ দেখা যায় না। সেই প্রণালীক্রমেই স্তরের উপর স্তর জমিয়া প্রায় লক্ষ ফুট স্থূল কঠিন ত্বক্ খানি ধরণীর পৃষ্ঠোপরি জমিয়া গিয়াছে। গঙ্গা, নীল, মিসিসিপি প্রভৃতি বড় বড় স্রোতস্বতী বৎসরে কত মাটি বহিয়া থাকে, মোটামুটি নির্দ্ধারণ করিয়া, পৃথিবীর এই ত্বগাবরণ কতকালে নির্ম্মিত হইয়াছে, কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

একটা উদাহরণ দিতে পারি। উদাহরণটি মৃত আচার্য্য হক্স্লির নিকট গৃহীত। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক যুগ ছিল, যখন বড় বড় ভূখণ্ড মহাবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। ভূ-পৃষ্ঠের উপরে উদ্ভিদের অবশেষ জমিয়া গিয়া একটা বিস্তীর্ণ আস্তরণ স্বরূপ হইত। কালক্রমে ভূগর্ভের সংকোচনে সেই ভূখণ্ড বসিয়া গিয়া সমুদ্রাকারে পরিণত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য নদনদী মাটি আনিয়া সেই উদ্ভিজ্জ আস্তরণের উপর একটা মৃণ্ময় আস্তরণ বিন্যস্ত করিত। এইরূপে সমুদ্রগর্ভ পূরণ হইয়া আবার স্থলে ও মহারণ্যে পরিণত হইত। আবার তাহার উপর উদ্ভিজ্জ আস্তরণ ; আবার তদুপরি মৃৎস্তর। এইরূপে কতকাল ধরিয়া উদ্ভিজ্জ স্তরের উপর মৃণ্ময় স্তর, তদুপরি আবার উদ্ভিজ্জ স্তর, জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীর ত্বক্ নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমরা সেই ত্বকের আবরণ স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া পাথর কয়লা তুলিয়া স্বকার্য্য সাধন করি। ত্রিশ চল্লিশ হাত স্থূল এক একটা পাথর কয়লার স্তর দেখা যায় এবং স্থানে স্থানে এইরূপ দুই শত আড়াই শত স্তর উপর্য্যুপরি থাকে থাকে সজ্জিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। মনে কর ৫০ পুরুষ উদ্ভিদের

দেহাবশেষ জমিয়া এক ফুট স্তর জন্মে ; মনে কর এক এক পুরুষ উদ্ভিদের জীবনকাল গড়ে—দশ বৎসর। তাহা হইলে এক ফুট স্তর জমিতে পাঁচ শ বৎসর লাগে। পঞ্চাশ ফুট জমিতে পঁচিশ হাজার বৎসর লাগে। এবং পঞ্চাশ ফুট স্থূল স্তর আড়াইশটা উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইতে যাটি লাখ বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়।

মনে কর পাথর কয়লার স্তরোৎপত্তির কাল পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসের এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। বুঝিয়া দেখ পৃথিবীর বয়স কত।

ভূতত্ত্ব-বিদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা কালের আদি কল্পনা করিতে পারি না। অনাদি কালের নিকট কোটি কোটি বৎসর নিমেষের মত। তাই ভূ-তত্ত্ববিৎ নিরুদ্বেগে পৃথিবীর পঞ্জরস্থ এক একটা স্তর নির্ম্মাণে দশবিশ কোটি বৎসরের ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না।

ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রায় একই পথে চলেন। জীববিদ্যা বলেন, মানুষের নিকট জ্ঞাতি মর্কট। মর্কট রূপান্তরিত হইয়া মানুষে পরিণতি পাইয়াছে। অন্ততঃ মানুষের উৎপত্তির অন্য কোন প্রণালী সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু মনুষ্য যে কত সহস্র বৎসর মনুষ্যাকারে ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান, তাহাই নির্ণয় করা দুরূহ। অন্ততঃ গত লক্ষ বৎসরে মনুষ্যশরীরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনের প্রমাণ পাওয়া যায় না। মর্কটদেহের মনুষ্যত্বে পরিণতিতে যে কত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার অতি সামান্য জীবাণু হইতে মর্কটমহাশয়ের অভিব্যক্তি ব্যাপারে যে কত কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে।

অতএব নিঃসংশয়ে সাব্যস্ত হইল, যে বিগত কোটি কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ভূপঞ্জরে স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপার আজিকার মতই চলিতেছে ; এবং বিগত কোটি কোটি কোটি বৎসরে অঙ্গহীন অচেতন জীবাণু হইতে অভি-ব্যক্তির ধারাক্রমে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ কি না, প্রাচীনা বসুন্ধরার বয়সের কূল কিনারা নাই।

ভূতত্ত্ববিদ্ ও জীবতত্ত্ববিদ্ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এমন সময়ে বিখ্যাত সার্ উইলিয়ম টমসন্ (লর্ড কেলবিন) একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত করেন। তিনি বলিলেন কিছুদিন পূর্ব্বে,—সে বড় বেশীদিনের কথা নয়,—পৃথিবীর অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তখন বসুন্ধরার জন্য সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল মাত্র।

এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থ-বিদ্যা সেই সূতিকাগৃহের প্রাচীরে নির্ম্মাণের তারিখ অঙ্কিত দেখিতেছে। আজ যে ভাবে নদনদী স্তরনির্ম্মাণ করিতেছে, তখন সে ভাবে স্তরনির্ম্মাণ চলিত, তাহা বলা যায় না। তখন যে পৃথিবী জীবাধিবাসের উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সন্দেহের কারণ প্রধানতঃ তিনটি।

প্রথম, সম্প্রতি পৃথিবী একদিনে এক পাক আবর্ত্তিত হয়। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে ঘুরিতেছে; চন্দ্র পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সমুদ্রের জলরাশিকে আপনার দিকে আকৃষ্ট রাখিয়াছে। তাই পৃথিবীর আবর্ত্তনে বাধা পড়ে। আবর্ত্তনের বেগ ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। গত দুই হাজার বৎসরে আবর্ত্তনের বেগ একটু কমিয়া গিয়াছে, আবর্ত্তনের কাল একটু বাড়িয়া গিয়াছে, অহোরাত্রির পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য এই কারণে বহুদিন হইতে পৃথিবীর আবর্ত্তন-বেগ মন্দীভূত হইতেছে। সহস্র কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর বেগ বর্ত্তমান বেগের দ্বিগুণ ছিল, গণনায় কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। আজ কাল যে ঘণ্টার চব্বিশ ঘণ্টায় রাত্রি দিন হয়, তখন সেই ঘণ্টার বার ঘণ্টায় রাত্রি দিন হইত। সুতরাং তখন পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল তাহার সহিত আজিকার অবস্থার কোন তুলনা হইতে পারে না। ভূতত্ত্ববিদেরা যে এক নিঃশ্বাসে লক্ষ কোটি বৎসরের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে তাহার কোন মূল নাই। একালের স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপার দেখিয়া সেকালের স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপারের সহিত কোন তুলনা আনিতে পারা যায় না।

দ্বিতীয়, সূর্য্য পৃথিবীতে সম্প্রতি যে পরিমাণে তাপ দিতেছে, তাহার মোটামুটি পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এই তাপের কিয়দংশ মাত্র লইয়া নদনদীর সৃষ্টি ও জীবসৃষ্টি চলিতেছে। সূর্য্য কিছু চিরকাল এই পরিমাণে তাপ দিতেছে না। বোধ হয় পাঁচশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য তাপ একেবারেই দিত না। তখন সূর্য্যের তাপ বিকীরণ শক্তি ছিল না। সুতরাং তখন পৃথিবীতে মেঘবৃষ্টিও ছিল না, নদনদীও ছিল না; জীবের অস্তিত্বের কথাই নাই।

তৃতীয়, পৃথিবী একটা তপ্তপিণ্ড মাত্র। কেবল উপরের চামড়াটা অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে মাত্র। বৎসর বৎসর প্রচুর পরিমাণে তাপ পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া দিগন্তে বিস্তীর্ণ হইতেছে। অর্থাৎ কিনা, পৃথিবী

ক্রমেই শীতল হইতেছে। আজ পৃথিবীর অবস্থা কেমন, ও বৎসর বৎসর তাপ কত খরচ হইয়া যাইতেছে, জানিলে ভবিষ্যতে কোন্ দিন পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হইবে, গণিয়া বলা যাইতে পারে। সেইরূপ অতীতকালে পৃথিবীর কখন্ কি অবস্থা ছিল, তাহাও গণিয়া বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে পৃথিবী আরও গরম ছিল, সন্দেহ নাই। লর্ড কেলবিনের গণনায় দশ কোটি কি জোর বিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এত গরম ছিল, যে তখন ভূপৃষ্ঠে শীতল কঠিন চর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। তখন ভূ-পৃষ্ঠ উষ্ণ ও তরলাবস্থ ছিল। সুতরাং তখন পৃথিবীতে জীবের উদ্ভব হয় নাই। টেট্ সাহেবের গণনায় এই কাল দশ বিশ কোটি বৎসর পর্য্যন্ত হয় না। তিনি দুই এক কোটি বৎসরের উর্দ্ধে উঠিতে চাহেন না।

দাঁড়ায় এই। পৃথিবীর বয়ঃক্রম বড় বেশী নহে। ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা বয়সের ইয়ত্তা করিতে চাহেন না, সেটা বিষম ভুল। কয়েক কোটি বৎসর মাত্র, হয় ত এক কোটি বৎসরও নহে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ শীতল ও কঠিন হইয়াছে। পৃষ্ঠে স্তরবিন্যাস, জীবের উদ্ভব, জীবপর্য্যায়ে উন্নতি ও বিকাশ, হয় ত কয়েক লক্ষ বৎসর মাত্রেই ঘটিয়াছে।

উভয় পক্ষের বিবাদের ফল এইরূপ দাঁড়াইল। ভূপৃষ্ঠের কাঠিন্য প্রাপ্তির পর হইতে যদি পৃথিবীর বয়ঃক্রম হিসাব করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি অথবা কয়েক লক্ষ বৎসর মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। তৎপূর্ব্বে পৃথিবী এত গরম ছিল যে তখন জীবনিবাস ঘটিতে পারিত না। হয় ত সূর্য্য হইতে সম্যক্ পরিমাণ তাপও তখন আসিত না। হয় ত পৃথিবীর আবর্ত্তন বেগ এত ছিল, যে একালের দিবারাত্রি ঋতু পরিবর্ত্তনাদির সহিত সেকালের তত্তৎ ঘটনার কিছুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। ভূবিদ্যা যে অম্লানভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠের একখানি সূক্ষ্ম পরদা গাঁথিতে দশবিশ কোটি বৎসর চাহিয়া বসেন এবং জীববিদ্যা যে কেবল মর্কটকে মানুষ বানাইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর চাহেন, তাঁহাদের সেরূপ দাবী অগ্রাহ্য।

আচার্য্য হক্সলি ভূবিদ্যাবিৎ ও জীববিদ্যাবিদের তরফ হইতে জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লর্ড কেলবিন্ ভূবিদ্যাকে কোটি দশেক বৎসর মঞ্জুর করিতে প্রথমে রাজী ছিলেন। ভূপৃষ্ঠে প্রায় লক্ষ ফুট স্থূল স্তর জমিয়াছে। তাহা হইলে গড়পরতা হাজার বৎসরে এক ফুট করিয়া জমিয়াছে, স্বীকার করিতে হয়। ইহা

কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। এবং হক্সলির মতে ভূবিদ্যারও এই পরিমিত কালের অধিক দাবী করিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই দশ কোটি বৎসর মধ্যেই লক্ষ ফুট স্তর জমিয়াছে ও এই বিচিত্র জীবজগতের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা বিকাশ ঘটিয়াছে, ইহা কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে।

আর একটা কথা; কেলবিনের বিচার প্রণালীতে কোন ভুলের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তৎপ্রদত্ত সংখ্যাগুলি তাঁহার নিজের কবুল মতেই আন্দাজে প্রদত্ত। ভূপৃষ্ঠে জলস্থলের সমাবেশের একটু ব্যবস্থাভেদ ঘটিলেই অথবা সমুদ্রের জল খানিকটা জমাট বাঁধিয়া বরফস্তূপ আকারে মেরুপ্রদেশ দিয়া সরিয়া গেলেই পৃথিবীর আবর্ত্তন-বেগের এক আধটু ব্যতিক্রম হইয়া যাইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন্ সময়ে জলস্থলের বা জল বরফের সমাবেশ কিরূপ ছিল, না জানিলে আবর্ত্তন-বেগ সম্বন্ধে কোন একটা সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা কঠিন। লর্ড কেলবিন্ এই সকল কথা স্বয়ংই তুলিয়াছেন। তার পর সূর্য্যের অবস্থা সম্বন্ধে এবং সূর্য্য কর্ত্তৃক বিকীর্ণ তাপের পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বড়ই কম। কেলবিন্ স্বয়ংই এই বিষয়ে স্বীয় সিদ্ধান্ত কয়েকবার পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং ঠিক এত বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য তাপ বিকীরণ করিত না, নিশ্চয় করিয়া বলা দুঃসাহসিক ব্যাপার। তার পর পৃথিবীর নিজের তাপের কথা। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক অবস্থা বিষয়ে আমরা এক্ষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভূগর্ভে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদের তাপ পরিচালন শক্তি কিরূপ, এবং উষ্ণতা সহকারে তাহাদের তাপ পরিচালন শক্তি বাড়ে কি কমে, এই সকল গণনায় না ধরিলে তাহার উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করিতে গেলে ভ্রান্তিরই সম্ভাবনা। সম্প্রতি লর্ড কেলবিনের জনৈক শিষ্যই গুরুপ্রদত্ত গণনার বিশুদ্ধিপক্ষে সন্দিহান হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই সকল বিষয়ে আমাদের আরও ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। আজ কেলবিন্ যেখানে দশ কোটি বৎসর মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত আছেন, একটু অভিজ্ঞতা বাড়িলেই হয় ত সে স্থলে পঞ্চাশ কোটি দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। সুতরাং এরূপ স্থলে ভূবিদ্যাবিদের ও প্রাণিতত্ত্ববিদের লজ্জিত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ নাই।

আশা করা যায়, অচিরকালে ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সহিত একটা সালিসী বন্দোবস্ত করিয়া

মিটমাট করিয়া ফেলিবেন। আমরাও তখন জননী বসুন্ধরার বয়সের তথ্য কতকটা জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইব।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

ইংলণ্ডে নিরামিষ ভোজন চলে কি না ?

বৎসরাধিক হইল, আমি ইংলণ্ডে বাস করিতেছি; এখানে নিরামিষ-ভোজন চলিতে পারে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অগ্রসর হইলে এখন আর বোধ করি, আমার অনধিকার-চর্চ্চা হইবে না। আমি অতি শৈশবাবস্থায় আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার ইংলণ্ডে আসিবার কথা শুনিয়া দেশের বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন, "এবার ত তোমাকে মাংস আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হইবে, অতএব দেশ ছাড়িবার আগেই মৎস্য ও মাংস ভোজন করিতে আরম্ভ কর।" তখন আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, "ইংলণ্ডে নিরামিষ-ভোজন করিয়া লোকে থাকিতে পারে কি না, আমি ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিব; জীবনধারণের জন্য আবশ্যক হইলে আমিষ-ভোজনে আমার আপত্তি থাকিবে না।" আত্মীয়েরা ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি বুঝিতেছ না; মাংস-ভোজন ব্যতীত ইংলণ্ডে চলে কি না, ইহার পরীক্ষা করিতে গিয়া আপনার শরীর নষ্ট করিবে কেন? মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন নিরামিষ-ভোজী ছিলেন বলিয়াই ইংলণ্ডে তাঁহার পীড়া হইয়াছিল; তবু ত তিনি সেখানে ছয় মাসের অধিক ছিলেন না। তোমাকে তিন বৎসর সেই শীতপ্রধান দেশে বাস করিতে হইবে; গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইবে; সুতরাং আহার-প্রণালীর পরিবর্ত্তন না করিলে তোমার সকল আশা ও আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবে; অধিকন্তু জীবন থাকিবে কি না সন্দেহ।" তাঁহাদিগের ভয়প্রদর্শনেও আমি তখন বিচলিত হই নাই। অবশেষে আমার ইংলণ্ড আগমনের সময় উপস্থিত হইল। ১৮৯৪ অব্দের ১০ই মার্চ্চ দিবসে আমি বম্বে নগরে পোতারোহণ করিলাম। পি, এণ্ড, ও, কোম্পানির "কার্থেজ" নামক বাষ্পীয়পোত আমাদিগকে বক্ষে লইয়া অকূল মহাসাগরে ভাসমান হইল। পোতারোহণ করিবার পরেই ভাবিতেছিলাম, "জাহাজে আমার আহারের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে? শুনিয়াছিলাম, পি, এণ্ড, ও কোম্পানি প্রথম শ্রেণীর যাত্রিবর্গকে আহারার্থ

যথেষ্ট ফলমূল দিয়া থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে মাংস প্রভৃতি সাধারণ আহার গ্রহণ করিয়াই জীবনধারণ করিতে হয়। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী; আমি কি আহার করিয়া বাঁচিব ?" এমন সময়ে দেখিলাম, সেই জাহাজে আরও তিন জন স্বদেশীয় যাত্রী রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিত আলাপ হইল; সেই তিন জনের মধ্যে দুই জন নিরামিষভোজী। একজন গুজরাটী; তাঁহার নাম মুদি। অপর জন মহারাষ্ট্রীয়; তাঁহার নাম কুক্‌ড়ে। নিরামিষভোজী সহযাত্রী পাইয়া আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। মুদি বলিলেন, "সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" তিনি জাহাজের প্রধান পাচকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের তিন জনের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন; পাচককে ব্যঞ্জন-রন্ধনের প্রণালীও বলিয়া দিলেন। এই ব্যাপারের পরেই আমি সামুদ্রিক পীড়ায় অভিভূত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম; আমার উপরি-উক্ত বন্ধুদ্বয় যে ঐ পীড়া হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, তাহা নহে। আহার-কালে আমাদের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি শয্যাপার্শ্বে নীত হইল; আমরা কথঞ্চিৎ ভোজন করিলাম। ব্যঞ্জন পলাণ্ডু-মিশ্রিত ছিল বলিয়া আমি তাহা ভোজন করিতে পারি নাই; বন্ধুরা সুখে আহার করিয়াছিলেন। পাঁউরুটী, বিস্কুট জাহাজে যথেষ্ট পাওয়া যায়, সুতরাং ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার জন্য চিন্তা করিতে হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের জন্য পোতাধ্যক্ষেরা যদি দুগ্ধের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অনেক কষ্টের লাঘব হইয়া যায়। পি, এণ্ড, ও, কোম্পানি দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগকে দুগ্ধসার-চূর্ণ দ্বারা পানীয় প্রস্তুত করিয়া দেন বটে, কিন্তু তাহা কখনই দুগ্ধের ন্যায় সুখাদ্য হইতে পারে না। আমরা যদি প্রথম শ্রেণীর যাত্রিবর্গের ন্যায় অকৃত্রিম দুগ্ধ পাইতাম, তাহা হইলে আমরা সুখে দুধভাত খাইয়া দিনযাপন করিতে পারিতাম। যাহা হউক আমরা যাহাতে প্রতিদিনই আমাদের গৃহমধ্যে আহার পাই, পরদিন তাহার বন্দোবস্ত করিলাম। ওট পরিজ্, অন্ন, পাঁউরুটী ও কৃত্রিম দুগ্ধ আহার-পানে আমাদিগের দিন কাটিতে লাগিল। সাধারণ আহারগৃহে বসিয়াও আমরা কয়েকদিন আহার করিয়াছিলাম। ইংরেজ যাত্রীরা আমাদিগের নিরামিষ-ভোজন দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলেন। আমরা ইংলণ্ডে যাইতেছি, অথচ নিরামিষ ভোজন পরিত্যাগ করি নাই, ইহাই তাঁহাদিগের বিস্ময়ের বিষয়। গুজরাটী বন্ধু মুদি

বম্বে হইতে অনেক ফল আনিয়াছিলেন, আমরা প্রতিদিনই কিছু কিছু সেই ফল খাইতাম। জাহাজ ইটালীর উপকূলে ব্রিণ্ডিসি নগরীতে উপস্থিত হইলে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইয়োরোপের মধ্যদিয়া স্থলপথে ইংলণ্ডাভিমুখে চলিলেন। যাইবার সময়ে আমাদিগকে তাঁহার কতকগুলি ফল দিয়া গেলেন। শুনিয়াছি, ইটালী ও ফ্রান্স প্রভৃতির মধ্য দিয়া আসিবার সময়ে নিরামিষভোজী বলিয়া তাঁহার বিশেষ কষ্ট হয় নাই। তিনি বম্বে হইতে এক প্রকার মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন; তাহা খাইয়াও কোন কোন সময়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে আমরা ২রা এপ্রিল রাত্রিকালে ইংলণ্ডে পৌঁছিলাম। তখন আমরা নিতান্ত ক্লান্ত। ভূমধ্যস্থ সাগরে ও বিস্কে উপসাগরে আমাদিগের জাহাজ ভয়ানক আলোড়িত হইয়াছিল; আমি ত কয়েক দিন শয্যা হইতে উঠিতেই পারি নাই। সকল খাদ্যেই আমাদিগের ভয়ানক অরুচি জন্মিয়াছিল। জাহাজ সে রাত্রিতে কূলে লাগিল না; টেম্‌স্‌ নদীর বক্ষে স্থিতি করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, যে সকল যাত্রী সেই রাত্রিতেই লণ্ডনে যাইতে চান, তাঁহাদিগকে তীরে লইয়া যাইবার জন্য অপর একখানি জাহাজ আসিয়া উপস্থিত; আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আমার পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম, বি, সি, এম, সেই জাহাজে করিয়া আসিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু কুক্‌ড়ে ও আমি উভয়ে চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লণ্ডনে উপস্থিত হইলাম। কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে চট্টোপাধ্যায় আমাদিগকে সে রাত্রিতে লণ্ডনে আনিলেন, তাহা বলা যায় না। প্রথম মহানগর লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া কি দেখিলাম, কি ভাবিলাম, তাহা উল্লেখ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আহারের কথা বলাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া আমরা যথেষ্ট আহারাভাবে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলাম। আমাদিগের বাস-বাটীর গৃহিণীকে অন্ন প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলাম; কিন্তু সকল দিন আমাদিগের ভাগ্যে সুপক্ক অন্নও জুটিত না। চট্টোপাধ্যায় আমাদিগকে নিরামিষ হোটেলে লইয়া গিয়াছিলেন; আমি পলাণ্ডুর দুর্গন্ধ সহ্য করিতে পারি না বলিয়া সেখানকার খাদ্যাদিও গ্রহণ করিতে পারি নাই। কুক্‌ড়ে ও আমি উভয়েই মৎস্য খাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। কুক্‌ড়ে কয়েক দিন পরে স্কটলণ্ডে এডিনবরা নগরীতে চলিয়া গেলেন। শুনিয়াছি, এডিনবরাতে ভারতবাসী ছাত্রদের কষ্ট

নাই। সেখানে অনেকগুলি ভারতবাসী ছাত্র একত্রে বাস করেন। এক জন নবাগত তথায় উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহার প্রতি অতিশয় যত্ন ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অনেকে আমাদিগের দেশের ব্যঞ্জনাদি রাঁধিতে জানেন। কোন কোন বাসাবাটীর গৃহিণীকেও তাঁহারা ঐ সকলের রন্ধন-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশের পুত্র শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলা-নবিশ এডিনবরায় ভারতীয় ছাত্রদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন করেন। কোন নূতন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলে সুবোধচন্দ্র তাঁহাদিগের বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন; আহারাদির যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহার উপায় বলিয়া দেন। আমার বন্ধু কুক্‌ড়ে এডিনবরায় চলিয়া গেলেন; আমি লণ্ডনে রহি-লাম। প্রথম দুই এক মাস আমার আহারের কষ্ট কি ভয়ানক হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সময়ে সময়ে মনে করিতাম, বোধ হয় ইংলণ্ডে নিরামিষ-ভোজন চলে না। আমার বন্ধু চট্টোপাধ্যায় আমাকে মৎস্য ও মাংস প্রভৃতি ভোজন করিবার জন্য প্রতিদিন অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সুবিজ্ঞ ডাক্তার লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত রসিক-লাল দত্ত লণ্ডনে আসিলেন। তিনিও আমাকে বলিলেন, "মাংস প্রভৃতি আহার না করিলে চলিবে না; গ্রীষ্মকালে যদিও চলে, দারুণ শীতে কখনই চলিবে না।" আমারও শরীর আহারের কষ্টে দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল। প্রথম তজ্জন্য ঔষধ খাইতে লাগিলাম। অবশেষে বাধ্য হইয়া কয়েক দিন মৎস্য, হাঁসের ডিম ও মেষমাংস খাইয়াছিলাম। ঐ সকল দ্রব্য মুখে তুলিতে যেরূপ ঘৃণা হইত, ও যেরূপে উদরসাৎ করিতাম, তাহা আর কি বলিব? কয়েকদিন পরে ভাবিলাম, ইংলণ্ডে নিরামিষ-ভোজন চলে কি না, তাহার ত আমি পরীক্ষা করিতে পারিলাম না। ঐ সময় মধ্যে আমি লণ্ডনের নানা স্থান ও নানা ব্যাপার দেখিয়াছিলাম, লণ্ডন সম্বন্ধে আমার কতকটা অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। আমি পলাণ্ডু খাইতে পারিলে আমাকে কয়েক দিনের জন্যও আমিষ-ভোজন করিতে হইত না। লণ্ডন নগরে নিরামিষ-ভোজীদিগের জন্য অনেকগুলি হোটেল আছে। তন্মধ্যে একটী হোটেলে ৬ পেনি দিলে উদর পুরিয়া খাইতে পাওয়া যায়। এরূপ সুলভ শুনিয়া আমি তথায় গিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তথাকার কোন দ্রব্য মুখে করিতে পারি নাই। ব্যঞ্জনাদি তথায় পলাণ্ডু-সংযোগে প্রস্তুত হইয়াছিল।

আমার না খাইতে পারার আর একটী কারণ আছে। দেশে আমি সুখাদ্য ব্যতীত কিছু খাইতে পারিতাম না; নিত্য নূতন ব্যঞ্জন না হইলে আমার তৃপ্তিকর হইত না। আমি অল্পাহারে সন্তুষ্ট হইতাম বটে, কিন্তু নূতন ও উৎকৃষ্ট না হইলে আমার রুচিকর হইত না। সেই জন্যই এ দেশের অনেক দ্রব্য আমি মুখে করিতে পারি নাই। লণ্ডনে চ্যারিংক্রস্ নামক স্থানে, টটন্হ্যাম কোর্ট রোডে, ও অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে নিরামিষ-ভোজীদিগের জন্য উৎকৃষ্ট হোটেল আছে। অনেক ভদ্রলোক ব্যয় লাঘব করিবার জন্য ঐ সকল নিরামিষ-হোটেলে আহার করিয়া থাকেন। আমিও দিবসের মধ্যাহ্ন কালে টটন্হ্যাম কোর্ট রোডে "আইডিয়াল ক্লব" নামক হোটেলে গিয়া "পুডিং," ও ফল প্রভৃতি আহার করিতাম। উষাকালে এক বাটী চা ও একটু পাঁউরুটী খাইতাম, বেলা ৯টার পর দুধ ভাত খাইতাম। অধিকাংশ দিনই সুপক্ক অন্ন পাইতাম না। সন্ধ্যাকালে পুনরায় আলুসিদ্ধ, দুধভাত ও পাঁউরুটী চর্ব্বণ করিতাম। এই সকল দ্রব্য বাটীতেই পাইতাম। এইরূপে লণ্ডনে আমারও প্রায় পাঁচ মাস কাটিয়াছিল। যে ব্যক্তি পলাণ্ডুমিশ্রিত ব্যঞ্জন খাইতে পারেন, হোটেলে অন্ন গ্রহণ করিলে তাঁহার অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ হইবার সম্ভাবনা। কেন্‌সিংটন্ প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে কতকগুলি বাসা আছে, সেই সকল বাসায় থাকিলে কষ্ট না হইবারই সম্ভাবনা। আমায় যে উপরিউক্ত প্রকার আহারে ও কষ্টে কাল কাটাইতে হইয়াছিল, ব্যবস্থার দোষ ও আমার অনভিজ্ঞতাই তাহার মূল কারণ। যে সকল আমিষ-ভোজী ভারতীয় ছাত্র লণ্ডনে আহার ও বাসাভাড়ার জন্য সপ্তাহে দেড় পাউণ্ড ব্যয় করেন, সেই ব্যয় করিয়া নিরামিষ-ভোজন করিলে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। আমিষভোজী ছাত্রেরা সাধারণতঃ লণ্ডনে কিরূপ আহার প্রাপ্ত হন, অনেকের তাহা জানিবার কৌতূহল হইতে পারে। তাঁহারা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রো-থান করিবার পরে দু একটা অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম, দু এক টুক্‌রা পাঁউরুটী ও দুই টুক্‌রা অর্দ্ধসিদ্ধ শূকর মাংস ভোজন করিয়া থাকেন, এক বাটী চাও তৎসঙ্গে খাইতে পান। ইহার নাম "ব্রেক-ফাষ্ট।" তৎপরে বেলা ১টার সময় লঞ্চন্ বা জলযোগ। তৎকালে দুই টুক্‌রা গোমাংস, এক টুক্‌রা পাঁউরুটী ও আপেল প্রভৃতি ফলের পুডিং খাইবার ব্যবস্থা। অপরাহ্নে তাঁহারা এক বাটী চা খাইয়া থাকেন। সন্ধ্যাকালে পুনরায় আহার; তাহার নাম

ডিনার। সে সময়ে পুনরায় গোমাংস, শূকরমাংস, পাঁউরুটী ও কোন প্রকার পুডিং যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যাঁহারা মাংস খাইয়া থাকেন, তাঁহারা অন্ন ও রুটীকে প্রধান খাদ্য ও মাংসকে ব্যঞ্জন বলিয়া জানেন। এদেশে মাংসই প্রধান খাদ্য; অন্ন বা রুটী প্রভৃতি, মাংসের সহিত সময়ে সময়ে একটু একটু খাইবার জন্য। নিরামিষ-ভোজী মাংসের পরিবর্ত্তে অন্ন ও রুটীকে প্রধান আহার করিতে পারেন; প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ, নানা প্রকার পুডিং ও ফল প্রতিদিন ভোজন করা তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। আপেল, আঙ্গুর, কলা, আনারস, কমলা লেবু এখানে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত এদেশীয় পেয়ারা, কুল, ষ্ট্রবেরি, চেরি প্রভৃতি ফল আছে। আমি যেদিন লণ্ডনে আনারস ক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, দাম শুনিয়া আমাকে অবাক্ হইতে হইয়াছিল। ছয় শিলিংএর কমে একটী আনারস পাওয়া যায় না। তখন ছয়শিলিংএর মূল্য ছয় টাকা। ছয় টাকা খরচ করিয়া একটী আনারস খাইতে প্রথম আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। নিরামিষ-ভোজীর পক্ষে এদেশে ফল অতি উপাদেয় ভোজ্য। যে সকল ভারতবাসী ছাত্র রন্ধন-প্রণালী জানেন, তাঁহারা বাটীর গৃহিণী বা পাচিকাকে অনায়াসে শিখাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে অধিক কষ্ট পাইতে হয় না। সকল বাসার গৃহিণী প্রতিদিন আমাদের প্রণালীতে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে সম্মত হয় না। এদেশে লোকে কেবল সিদ্ধ আর অর্দ্ধসিদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিতেই ভাল বাসে। ফ্রান্সের লোকেরা এদেশের লোকের রন্ধনানভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া উপহাস করিয়া থাকে। আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, তৎকালে হেমচন্দ্র নারায়ণ নামক এক গুজরাটী তথায় বাস করিতেন। তিনি একটু বাঙ্গলা জানেন; পাঁচ ছয় বৎসর এদেশে থাকিয়া ইংরাজীও সামান্য একটু শিখিয়াছিলেন। সহজ সহজ ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তক অবলম্বন করিয়া তিনি অনেকগুলি গুজরাটী পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আছে দেখিয়া আমি তাঁহাকে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনচরিত গুজরাটী ভাষায় লিখিতে বলি। তদনুসারে তিনি ব্রিটিস্ মিউজিয়মের পুস্তকালয় হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল প্রণীত "কেশবচরিত" গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এই হেমচন্দ্র নারায়ণ নিরামিষভোজী ছিলেন। তিনি মধ্যাহ্নে নিরামিষ-হোটেলে গিয়া আহার করিতেন;

অন্যান্য সময়ে বাটীতে স্বয়ং রাঁধিয়া খাইতেন। আমাকে তিনি একদিন মোহনভোগ খাওয়াইয়াছিলেন। তিনি ছাত্র ছিলেন না বলিয়া রন্ধনের সময় পাইতেন। শুনিয়াছি, তাঁহার লণ্ডনে থাকার ও আহারাদির খরচ প্রতিমাসে তিন পাউণ্ড পড়িত। তিন পাউণ্ড ব্যয়ে কোন ব্যক্তি লণ্ডনে থাকিতে পারেন, ইহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বোধ করি, তিনি বড় কষ্টে ছিলেন। আমাদিগের দেশে অনেক যুবক ইংলণ্ডে আসিবার জন্য বড় ব্যাকুল, তাঁহারা এ দেশকে ইন্দ্রপুরী বলিয়া বোধ করেন। তাঁহাদিগের কেহ যেন তিন পাউণ্ডে লণ্ডনে থাকা যায় মনে করিয়া বাটী হইতে এ দেশে পলাইয়া না আসেন। লণ্ডনে থাকিবার ব্যয় সাধারণতঃ সাপ্তাহিক দেড় পাউণ্ড ; তদ্ব্যতীত পাঠাদির ব্যয় বিস্তর। সে সমস্ত কথা এ প্রবন্ধে বলিবার নহে। নিরামিষভোজন যে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়-কর, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরামিষভোজীর শরীর-রক্ষার্থে ব্যয়-সংক্ষেপ না করিয়া উৎকৃষ্ট ভোজন করাই উচিত। আমার আহারের কষ্ট হইত বলিয়া ডাক্তার দত্ত স্বয়ং রাঁধিয়া যত্ন পূর্ব্বক আমাকে এক দিন খাওয়াইয়াছিলেন। আমাদিগের দেশের নিরামিষ ব্যঞ্জন টিনের কৌটার ভিতর সুরক্ষিতাবস্থায় এখানে পাওয়া যায় ; একটী কৌটার মূল্য এক শিলিং। রন্ধনপাত্রে জল চড়াইয়া সেই জল উষ্ণ হইলে, তাহাতে উক্ত কৌটা নিক্ষেপ করিতে হয়। জল ফুটিতে থাকে ; সঙ্গে সঙ্গে কৌটার ভিতর ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া যায়। তদনন্তর কৌটার মুখ খুলিলে ভিতর হইতে সুন্দর ব্যঞ্জন বাহির হয়। ডাক্তার দত্ত আমাকে ঐ রূপ ব্যঞ্জন প্রথম খাওয়ান। তাহাতে সজ্‌না খাড়া ও বেগুন ছিল ; সজ্‌না খাড়া বা বেগুন এদেশে নাই। রন্ধনপ্রণালী জানা থাকিলে, ও বাটীর গৃহিণীকে শিখাইয়া ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিলে ভারতবাসী এ দেশেও অনেক স্বদেশীয় ব্যঞ্জনাদি পাইতে পারেন। আলু, কপি, সিম, কড়াইসুঁটী, মুসুর ডাল এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং নিরামিষ-ভোজী ভারতবাসীকে যদি কখনও লণ্ডনে আহারের কষ্ট পাইতে হয়, অনভিজ্ঞতাই তাহার মুখ্য কারণ।

প্রায় পাঁচ মাস লণ্ডনে অতিবাহিত করিয়া আমি কেম্ব্রিজে আসিলাম। কেম্ব্রিজে আমাকে বহুদিন থাকিতে হইবে, সেখানে আহারের কষ্ট পাইতে হইবে কি না, ইহা আমার চিন্তার বিষয় ছিল। কেম্ব্রিজে আসিয়া দেখিলাম, এখানে ৫।৬ জন গুজরাটী ছাত্র আছেন, তাঁহারা নিরামিষ-ভোজী।

আমার জাহাজের বন্ধু মুদি কেম্ব্রিজে বহুপূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা কয়েকটী বাটীর গৃহিণীকে নিরামিষ ভারতীয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে শিখাইয়াছিলেন। আমি যে বাটীতে স্থান পাইলাম, সেই বাটীর গৃহিণী নিরামিষ ভারতীয় ব্যঞ্জন রন্ধনে বিখ্যাত। যদিও গৃহিণীর রন্ধন ভাল নহে, তথাপি এ দেশে ইহাই আমাদিগের নিকট অতি আদরণীয়। এখানে আসিবার পর আমার আহারের কষ্ট প্রচুর পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। আলু ও সিমের ছক্কা, কপির ডান্‌লা এখানে পাইতে লাগিলাম। আমি কিছুই রন্ধন জানি না; কিরূপে রাঁধিতে হয়, তাহা আমার আত্মীয়েরা দেশ হইতে পত্রে লিখিয়াছিলেন; আমি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বাটীর গৃহিণীকে দিয়াছিলাম; তদ্দ্বারা গৃহিণী অনেক বস্তু রাঁধিতে শিখিয়াছে। আমার বাসার গৃহিণী খিচুড়ি, মোহনভোগ, পায়স, লুচি ও কড়াইসুঁটীর ডান্‌লা করিতেও শিখিয়াছে। এখন আমি প্রাতে ওট্‌পরিজ্, টোষ্ট্, দুগ্ধ প্রভৃতি আহার করি; মধ্যাহ্নে অন্ন বা খিচুড়ি, ভাজাভুজি ও সুস্বাদ ব্যঞ্জন, মোহনভোগ, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রাপ্ত হই। অপরাহ্নে চা, বিস্কুট ও কেক, এবং সন্ধ্যাকালে টোষ্ট্, দুগ্ধ ও পুডিং প্রভৃতি আহার করিয়া থাকি। নানাবিধ ফলও দুষ্প্রাপ্য নহে। মাংস খাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। মধ্যে আমার একটু অসুখ হওয়ায় হাঁসের ডিম খাইয়াছিলাম; তাহা যে না খাইলে চলিত না, আমার ত তাহা বোধ হয় না। দশ মাস আমার কেম্ব্রিজে কাটিল। নিরামিষ-ভোজনে ভারতবাসী ইংলণ্ডে থাকিতে পারেন, এ বিষয়ে আমার এখন আর কোন সন্দেহ নাই। আমাকে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন ও অন্যান্য কারণে বাধ্য হইয়া তবু কয়েক দিন হাঁসের ডিম খাইতে হইয়াছিল, কিন্তু কয়েকজন গুজরাটী ছাত্র এদেশে আসিয়া অবধি একদিনের জন্যও কোন প্রকার আমিষ-ভোজন করেন নাই। আমার জাহাজের বন্ধু মুদি এখন ডিম খাইয়া থাকেন; কিন্তু অপর চারজন গুজরাটী ছাত্র এখানে এখনও সম্পূর্ণরূপ নিরামিষ-ভোজী আছেন। লণ্ডনেও একজন নিরামিষ-ভোজী গুজরাটী ছাত্র আছেন। এখানকার গুজরাটী ছাত্রদিগের মধ্যে একজন ও লণ্ডনের একজন উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। এই দুইজন এখন বাতুলালয়ে বাস করিতেছেন। ইঁহাদিগের একজনের নাম ভীমভাই দেশাই ও অপরের নাম বেদান্ত। লোকে বলেন, নিরামিষ-ভোজন উহঁাদিগের বাতুলতার হেতু। ঐ কথা

বলিয়া এখানকার লোকে আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ভীম-ভাই দেশাইকে দেশে পাঠাইবার উদ্যোগ করা হইয়াছিল, কিন্তু পোতা-ধ্যক্ষেরা উন্মাদকে লইয়া যাইতে চান না। কি ভয়ানক! এ ব্যক্তিকে কত কাল বিদেশে বাতুলালয়ে কাটাইতে হইবে, কে জানে? আর একজন গুজরাটী নিরামিষ-ভোজী ছাত্রের যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হইয়াছে; লোকে তাহার কারণও "নিরামিষ-ভোজন" বলিয়া থাকেন। নিরামিষ-ভোজন হইতেই যে বাতুলতা ও যক্ষ্মারোগ জন্মিয়াছে, এ কথা কোন ক্রমেই বিশ্বাস্য নহে। এখন এদেশে নিরামিষ-ভোজী ইংরাজেরও অভাব নাই। কত নরনারী যে এখন নিরামিষ-ভোজী হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। আমাদের দেশে যেমন ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ প্রভৃতির শাখা নগরে নগরে স্থাপিত হইয়াছে, এদেশে নগরে নগরে তেমনই নিরামিষ-ভোজীদিগের সভা স্থাপিত হইয়াছে। লণ্ডন, বর্ম্মিংহাম, মাঞ্চেষ্টর, গ্লাসগো প্রভৃতি সকল স্থানেই নিরামিষ-ভোজীদিগের দল প্রবল হইতেছে। ঐ সকল সভা হইতে প্রচারকেরা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে গমন পূর্ব্বক নিরামিষ-ভোজন প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রচার-প্রণালীও অতি চমৎকার। প্রচারক কোন নগরে উপস্থিত হইয়া নিরামিষ-ভোজনের উপকারিতা সম্বন্ধে পাঁচ ছয়টী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলের নিকটেই নিরামিষ খাদ্য প্রস্তুত হইতে থাকে। নিরামিষ খাদ্য কত উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহা শ্রোতৃবর্গকে অবগত করিবার জন্য এক এক পাত্র নিরামিষ খাদ্য প্রত্যেক দর্শককে বক্তৃতান্তে অর্পণ করা হয়। এরূপ প্রণালীতে আমাদের দেশে সভা ও বক্তৃতা হইলে বোধ করি সভাস্থলে বহু দর্শকের সমাবেশ হইতে পারে। কিছু দিন হইল, কেম্ব্রিজে নিরামিষ-ভোজন-সভার উৎসব হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে ভিন্ন স্থান হইতে প্রচারক আসিয়া বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লাটীন-অধ্যাপক বৃদ্ধ মেয়র সাহেব একজন নিরামিষ-ভোজন প্রচারক। বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি কুব্জ হইয়া পড়িয়াছেন। লোকের কেমন সংস্কার, কেহ কেহ তাঁহার কুব্জ হইবার কারণও নিরামিষ-ভোজন বলিতে কুণ্ঠিত হন না। কেম্ব্রিজে ডিক্সন্ নামে এক দরজী আছে; ঐ ব্যক্তি নিরামিষ-ভোজী। যাহার সহিতই কেন সে ব্যক্তির আলাপ হউক না, ঐ ভদ্র-লোক নিরামিষ-ভোজী কি না, সে জিজ্ঞাসা করে। আমার সহিত যখন ডিক্সনের পরিচয় হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নিরামিষ-ভোজী কি

না?” আমি বলিলাম, “হাঁ, আমি নিরামিষ-ভোজী।” সে কহিল, “দেখিবেন, যেন, এদেশের লোকের কথা শুনিয়া আপনি নিরামিষ-ভোজন পরিত্যাগ করিবেন না। তাহারা বলিবে, নিরামিষ-ভোজন ভারতবর্ষের উপযোগী হইতে পারে, এদেশের উপযুক্ত নয়; সে কথা গ্রাহ্য করিবেন না।” আমি বলিলাম, “আমাদের কাছে ও সকল কথা বলা বাহুল্য মাত্র।” আমি নিরামিষ-ভোজী বলিয়া ঐ দরজী আমার ক্যাপ্ ও গাউনের মূল্য পঁচিশ শিলিংএর পরিবর্ত্তে বিংশ শিলিং লইয়াছিল। আমি একদিন ঐ দরজীর দোকানে গিয়াছি,—দেখি, ডিক্সন এক ব্যক্তিকে নিরামিষ-ভোজনের উপকারিতা বুঝাইতেছে, ও তাঁহাকে নিরামিষ-ভোজী হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। এইরূপ প্রচারানুরাগ ইংরেজ জাতির প্রত্যেকের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট রহিয়াছে। কোথাও সুরাপানের বিরুদ্ধে, কোথাও রাজনীতি সম্বন্ধে, কোথাও বা অপর কোন বিষয়ে লোকে প্রচার করিতেছে। আমাদিগের দেশে বক্তৃতার মূল্য নাই, এখানে লোকের বক্তৃতা দ্বারাই আইন সকল প্রস্তুত হয়; পার্লামেণ্ট সভার পরিবর্ত্তন-সংগঠনও রাজনৈতিকবর্গের বক্তৃতার দ্বারাই হইয়া থাকে। এই কারণেই এদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই নিরামিষ-ভোজীদিগের দল গঠিত হইয়াছে। এই কারণেই ব্ল্যাকপুল, বার্মিংহাম, বোর্ণ্‌মাউথ, ব্রাইটন্, ক্যাণ্টার্‌বরি, কভেণ্ট্রি, ডর্সেট, ডেভন, ডবলিন, এপিং, ফেল্কিক্স্‌টো, ষ্টান্‌ব্রিজ্, ইয়ারমাউথ, হেষ্টিংস্, হেভর, কিলার্ণি, হাম্পটন্, লণ্ডন, মেলভারণ্, মেথ্‌ওল্ড, নিউক্যাসল্, নর্‌উইচ্, নর্‌ফোক্, নটিংহাম, স্ক্রাবো, সাউথ্‌পোর্ট, সাউথ্‌সি, সণ্ডার্‌লাণ্ড, টুইক্স্‌বরি, ভেণ্ট্‌নর, উইডন্, ওয়াইমাউথ, উইঞ্চেষ্টর, উড্‌ফোর্ড প্রভৃতি স্থানে নিরামিষ-ভোজীদিগের জন্য প্রকাশ্য বাসাহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রীস, ইটালি, ফ্রান্স ও সুইট্‌জর্লাণ্ডেও নিরামিষ-ভোজন প্রচারিত হইয়াছে। এদেশের নিরামিষ-ভোজীরা সকলেই ডিম খাইয়া থাকেন, সুতরাং আমরা তাঁহাদিগকে সহজে নিরামিষ-ভোজী বলিয়া গণ্য করিতে চাই না। যখন এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গের মাংসভোজন স্বচক্ষে দর্শন করি, তখন ডিম্বভোজীদিগকে নিরামিষ-ভোজী বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা নিরামিষ-ভোজী হইয়াও যখন সুস্থ ও সবল রহিয়াছেন, তখন এদেশে নিরামিষ-ভোজন চলে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আর কঠিন নহে। নিরামিষ-ভোজনে এদেশে স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে না, ঈদৃশ ভয় বা সন্দেহ নিতান্ত অমূলক।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী এবং বাঙ্গালা মনঃসন্তোষণী।

কিছুদিন হইল, আমরা তুলটকাগজে লিখিত বহু প্রাচীন একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী। ইহার প্রতিলিপি একখানি, মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু চৈতন্যচরণ দাস মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করি; তিনি তাহা সানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নামেই পাঠক তাহার বর্ণনীয় বিষয় কিছু বুঝিয়া থাকিবেন। গ্রন্থখানিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বদেশাগমনকাহিনীই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনে লিখিত হইয়াছিল—"১৪২৬ শকে ঃউনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চৈতন্য বঙ্গদেশে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীহট্টে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাড়ী (শ্রীহট্ট বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী) সুতরাং পৈতৃক বাসস্থান দেখিতে কৌতুহল জন্মিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যদিও এ যাত্রায় শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছিলেন না, তথাপি, বোধ হয় পৈতৃক বাসস্থান সন্দর্শনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।"

বঙ্গদর্শনের লেখক মহাপ্রভুর পূর্ব্বদেশাগমনের উদ্দেশ্য স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থপাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, মহাপ্রভু শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত হস্তলিখিত পুথির শেষে লিখা ছিল—"শ্রীমৎ উপেন্দ্র মিশ্র বংশোদ্ভব প্রদ্যুম্ন মিশ্রেণ বিরচিতম্।" ইহাতে গ্রন্থকারের বংশপরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তবে গ্রন্থখানি কত কালের? গ্রন্থের সর্ব্বশেষ শ্লোকটী দ্বারা এসম্বন্ধে একটু সাহায্য পাওয়া যায়। সে শ্লোকটী এই :—

"তস্যৈবাদেশতঃ কৃষ্ণচৈতন্যস্যো দয়ানিধেঃ।
প্রদ্যুম্নাখ্যেন মিশ্রেণ কৃতেয়মুদয়াবলী॥"

ইহাতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, মহাপ্রভুর সমকালে তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারেই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি পাইয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ জন্মে এবং শ্রীচৈতন্যের শ্রীহট্টাগমন সম্বন্ধে আরো কিছু পাওয়া যায় কি না, অনুসন্ধান করা হয়; তাহাতে, ঐ গ্রন্থেরই প্রমাণ স্বরূপ আর একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম—মনঃসন্তোষণী। প্রণেতা—শ্রীজগ-

জীবন মিশ্র। জগজ্জীবন মিশ্রের বাস শ্রীহট্ট,—ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। সার্দ্ধ শত বর্ষের পূর্ব্বে যে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

চরিতামৃতে লিখিত আছে :—

"শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্‌গুণ প্রধান ॥
সপ্ত পুত্র তাঁর হয় সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর ॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥"

—আদি ১৩ পরি।

এখন প্রদ্যুম্ন মিশ্র উপেন্দ্র মিশ্র বংশীয়। অতএব তিনিও শ্রীহট্টবাসী। কেন না উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্রদের মধ্যে কেবল মাত্র জগন্নাথই নবদ্বীপে বাড়ী করিয়াছিলেন। আবার, প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর সমসাময়িক হওয়ায়, তাঁহাকে উপেন্দ্র মিশ্রের পৌত্র অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

মনঃসন্তোষণী গ্রন্থ চৈতন্য উদয়াবলীর এক প্রকার অনুবাদ বিশেষ। ইহার রচয়িতা মঙ্গলাচরণের শেষে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"অল্পাক্ষরে চৈতন্য উদয়াবলী নাম।
এই গ্রন্থে কৈলা চৈতন্যের গুণ গান ॥"
"প্রভুর জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রদ্যুম্ন মিশ্রবর।
তাহার পদদ্বন্দে মোর প্রণতি বিস্তর ॥"

—মনঃসন্তোষণী।

মনঃসন্তোষণীর এই "জ্ঞাতি ভ্রাতা" শব্দ দ্বারা, প্রদ্যুম্ন মিশ্র যে উপেন্দ্র মিশ্রের পৌত্র, তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। জগন্নাথাত্মজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও উপেন্দ্র মিশ্রের পৌত্র, অতএব প্রদ্যুম্ন মহাপ্রভুর "জ্ঞাতিভ্রাতা।"

শ্রীহট্টে ঢাকাদক্ষিণ নামে একটী গ্রাম আছে, মিশ্রখ্যাতি কএক ঘর ব্রাহ্মণ ঐ গ্রামে আছেন; তাঁহারা আপনাদিগকে উপেন্দ্র মিশ্র বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। এখানে মহাপ্রভুর প্রাচীন এক বিগ্রহ (মূর্ত্তি) ও আছেন, মিশ্র ঠাকুরগণ তাহার সেবা করেন। (এই মূর্ত্তির কথাও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ-দ্বয়ে পাওয়া যায়।) ঢাকাদক্ষিণ গ্রামেই উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী ছিল, (পূর্ব্বোক্ত মহাপ্রভু মূর্ত্তি ঐ বাড়ীতেই আছেন।) ঢাকাদক্ষিণস্থ এই মিশ্র ঠাকুরদের নিকট হইতে আমরা যে বংশতালিকা প্রাপ্ত হই, তাহার কিয়দংশ এই।
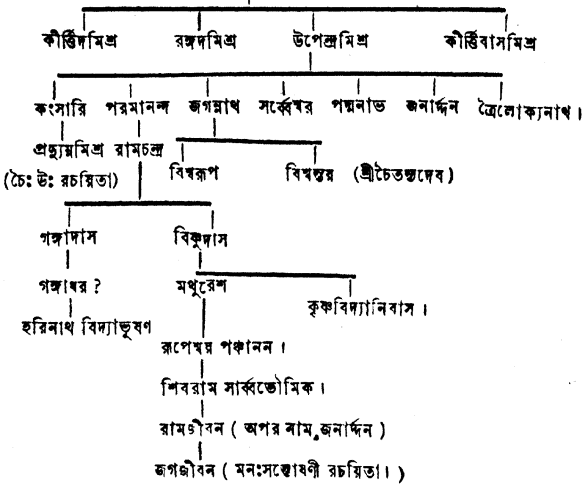
এই বংশ তালিকায় প্রদ্যুম্ন মিশ্র ও জগজ্জীবন মিশ্রের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক রামচন্দ্র মিশ্র হইতে গণনায় জগজ্জীবন মিশ্র ৬ষ্ঠ পুরুষ। তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে রামচন্দ্রের ২০০ বর্ষ পরে জগজ্জীবনের জীবনকাল দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে ৪১০ চৈতন্যাব্দ চলিতেছে। ৪১০ হইতে ২০০ বিয়োগে ২০০ থাকে। অতএব ২০০ বর্ষ পূর্ব্বে জগজ্জীবন জীবিত ছিলেন বলা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে যে তিনি মনঃসন্তোষণী রচনা করিয়াছিলেন, তার আর সংশয় নাই।

জগজ্জীবন মিশ্রের রচনা স্থানে স্থানে বেশ সুন্দর—সুখ-পাঠ্য, সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল। যথা—

"এই বাক্য পঞ্চামৃত,
পান করি মোর চিত,
শীতল হইল প্রাণ মোর।" ইত্যাদি।

যথা—"—কেশ মধ্যে অপূর্ব্ব বন্ধন।
নবীন জলদ মাঝে,
যেমন আশ্চর্য্য সাজে,
ইন্দ্র ধনু শ্রেণী বিনিন্দন॥" ইত্যাদি।

---

* বিশ্বকোষ-সম্পাদক বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় দিয়া যে পত্রখানি লিখিয়াছিলাম, তাহাতে মিশ্র বংশ তালিকার এই অংশটুকু লিখিয়াছিলাম। ১২২ সংখ্যক বিশ্বকোষে তিনি ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সম্পূর্ণ বংশাবলী এস্থলে লিখিত হইল না। লেখক।

তাঁহার উপমা প্রয়োগেও স্থানে স্থানে নূতনত্ব আছে যথা—

"মণি মকর কুণ্ডল,
জ্যোতি দীপ্ত গণ্ডস্থল,
দর্পণে বিদ্যুৎসম ভায়।"
ইত্যাদি।

জগজ্জীবন মিশ্রের রচনার আর একটী নমুনা দিতেছি। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রদর্শনে গিয়াছেন, শচী নিমাইকে আনিয়া দেখাইতেছেন, শিশুর অধরে যেন হাস্য প্রস্ফুটিত হইতেছে। যথা—

"কৈছন রূপ, অনুপ বর কাঞ্চন
মুচুকি মুচুকি মুখ হাস।
দামেন দমক, চমক চিত চঞ্চল,
তাহি মে করত নিবাস॥
দশ নখ ছান্দ, চান্দ মদ ভঞ্জন,
নও নও দারিম কোর।
অধর নাল, নালবর শোভন,
নিরখি সবহি বিভোর॥
নয়ন বাণ, বাণ পরিশীক্ষণ,
সতত বাতাওত কামে।
ভুককোহু জ্যোতি, জীতি সউ কার্ম্মুক,
পৈঠল আধ উপরমে॥
শ্রুওণ বরণ, অরুণাবলি নিন্দিত,
গণ্ড মুকুরবিছ ভানু।
সোবরণ সাপকি, পেথম গঞ্জিত,
করযুগ লম্ব আজানু॥
শিরপর কেশ, বেশ মন মোহন,
শিখি আনা কণ্টকি কাঁতি।
লোহিত থল, কমলাবলী রাজিত,
চরণ যুগলক হি ভাতি॥
উরু গুরু চারু, কদল তরু গঞ্জন,
রোমকি বিবরে অঙ্গে।
তাহি মে ঐছন, রোম সব শোহন,
চীকণ রেখ সুরঙ্গে॥
ঐ ছন মূরত, আখি ভর দেখত,
মত ওর হোই মাতারি।
তৈছে পতিকো, দেখাওল আনি,
কোকরি শচীবর নারী॥
সব নরনারী, নিরন্তর ভাসল,
রূপ দরশ অনুরাগে।
ঐছে অনুপ পহুঁ, হৃদি নাহি পৈঠল,
জগ জীওনে কি অভাগে॥"
(মনঃসন্তোষিণী)

চৈতন্যচরিতামৃতের পঞ্চম পরিচ্ছেদে অবগত হওয়া যায় যে, প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামক এক ব্যক্তি মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে রামানন্দ রায়ের নিকট কৃষ্ণকথা জানিতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দের আচার ব্যবহার প্রদ্যুম্নের ভাল লাগে নাই, তিনি ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভুকে তাহা জানাইলেন।

রামানন্দ রায়ের উপর দোষারোপ ও মহাপ্রভুকে ধর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করা কম কথা নহে। এই দুইটী কারণে জানা যায় যে, প্রদ্যুম্ন মিশ্র সামান্য লোক ছিলেন না। রামানন্দ রায়কে স্বয়ং মহাপ্রভু অতি সমাদর করিতেন। রামানন্দ রায় রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতিনিধি স্বরূপে কাঞ্চিনগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধির জন্য স্বয়ং প্রতাপরুদ্র রামানন্দকে সম্মান করিতেন। রামানন্দ প্রসিদ্ধ "জগন্নাথবল্লভ" নাটকের রচয়িতা। মহাপ্রভু যে পাঁচখানি গ্রন্থ অতি ভাল বাসিতেন, তন্মধ্যে জগন্নাথবল্লভ একখানি। যথা—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"
('চৈতন্যচরিতামৃত')

রামানন্দ রায় অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, নীলাচলবাসী সকলেই তাঁহাকে চিনিত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাঁহাকে চিনিতেন না, জানা যাইতেছে।

এই সকল কারণে বোধ হয় যে, উদয়াবলী-রচয়িতা এবং চৈতন্য চরিতামৃতের ৫ম পরিচ্ছেদোক্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্র এক ব্যক্তি। একই ব্যক্তি বলিয়াই সম্বন্ধের গৌরবে তিনি মহাপ্রভুকে কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবেন। নতুবা যে সে ভক্ত মহাপ্রভুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেন না। এবং এই জন্যই, অর্থাৎ অপরিচিত ও ভিন্নদেশী বলিয়াই বোধ হয়, বিখ্যাত রামানন্দ রায়ের সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না।

এই সময় শ্রীহট্টবাসী কেহ কেহ শ্রীক্ষেত্র গিয়াছিলেন. এ প্রসঙ্গ চৈতন্য-ভাগবতে আছে। এই সুযোগেই প্রদ্যুম্ন মিশ্রও নীলাচলে গিয়া থাকিবেন। যথা—

"সহস্র সহস্র লোক না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার॥
কেহ বা ত্রিপুরাবাসী কেহ চাটীগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী॥"
(চৈতন্য ভাগবত)

মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া আসিলে সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম নীলাচলবাসী ভক্তগণকে মহাপ্রভুর সহ মিলাইয়া দেন। তন্মধ্যে একজনের নাম প্রদ্যুম্ন মিশ্র ছিল। তিনি নীলাচলবাসী, এবং রামানন্দ রায়কে অবশ্যই জানিতেন। যে প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে গমন করেন, তিনি ভিন্ন ব্যক্তি, অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না।

অদ্য শ্রীহট্টবাসী এই দুইজন গ্রন্থকারের পরিচয় দিয়া বিদায় লইতেছি। সময়ান্তরে তাঁহাদের গ্রন্থের সারমর্ম্ম উপহার দিতে অভিলাষ রহিল। ইতি।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর কৃপায় এবং পরদুঃখকাতর দাতাগণের সাহায্যে দাসাশ্রমের আরও একটী মাস নিরাপদে অতীত হইয়া গেল। নিম্নে আতুরগণের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

১ দামো, ২ তিতুরাম, ২ বাবুরাম, ৪ টোকানি ঋষি, ৫ রসিকচাঁদ, ৬ খেদনা, ৭ দুর্গা-তারিণী, ৮ শিবু, ৯ দেবীয়া, ১০ স্বর্ণ, ১১ ফুলকুমারী, ১২ নবদুর্গা, ১৩ নেসনন্তী, ১৪ দুখীয়া।

রসিক চাঁদ। বাড়ী যশোহর জেলার বাগআঁচড়া গ্রামে, বয়স ৫০।৫১। ১৩।১৪ বৎসর বয়সের সময় পক্ষাঘাতে হাত পা একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। এখন ঐ সমস্ত শুষ্ক স্থানে ক্ষত হইতেছে। ইহার বিশেষ বিবরণ "কোম্পানী বাহাদুরের মনুষ্য-তৈল বিক্রয়" নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

খেদনা। হাজারিবাগ জেলার চাতরা গ্রামে ইহার বাড়ী, বয়স ২৫ বৎসর। ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে ইহার চক্ষুতে ছানি পড়ায় অন্ধ হইয়াছে। একদিন মগধপুরে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া যায়। ডাক্তার বাবু অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় দেড় মাস চিকিৎসার পর এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে এখন শয্যাশায়ীই আছে।

নেসনন্তী ও দুখীয়া—কোন অপরিহার্য্য কারণে ইহাদের প্রেরক দিনাজপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর মহাশয়ের নিকট ইহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আয়।

পূর্ব্ব মাসের জের ২৸৭॥, রোগীদিগকে আম কাঁঠাল খাওয়াইবার জন্য দান ৩৲,বাবু গোষ্ঠ-বিহারী কুণ্ডু মাসিক চাঁদা ১৲, মণিঅর্ডার ১১৮৲, কলিকাতা দাসাশ্রম কার্য্যালয় হইতে মাং বাবুগোপালচন্দ্র নন্দী ৩৲, কর্জ্জ জমা ২৲। মোট জমা—১২৯৸৭॥।

ব্যয়।

সংসার খরচ ৪৬৵৭॥, গাড়ী ভাড়া ১৮৲, পূর্ব্ব মাসের হাওলাত শোধ ১৮৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৩৯॥৵০, রোগী পাঠান খরচ ৬॥৫, রোগী আনিবার জন্য (মুটে, গাড়ী, খোরাকী) ৸১৫, বাজে খরচ /৫। মোট খরচ—১২৯৵১২॥।

হস্তেস্থিত—॥/১৫।

দান।

বাবু শক্তিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য ২৲, বাবু শ্যামাচরণ পাল ১৲ ও ৫টী ভাল আম।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বিগত মাসে নিম্নলিখিত মাসিক চাঁদা ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দীনদয়াল পরমেশ্বর পরদুঃখকাতর দাতাগণের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বারি সিঞ্চন করুন।

(২৫শে জুন, হইতে ২৪শে জুলাই পর্য্যন্ত)

রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর ১ম মাসের চাঁদা ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী জ্যৈষ্ঠ মাসের চাঁদা ১৲, বাবু হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জুন মাসের চাঁদা ১৲, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ঐ ঐ ১৲, N. K, Basu Esq. জুলাই মাসের চাঁদা ১৲, বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস জুলাই মাসের চাঁদা ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ মে মাসের চাঁদা ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র জুন মাসের চাঁদা ১৲ বাবু অনাথনাথ দেব ঐ ১৲, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ঐ ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ঐ ।০, নবাব সৈয়দ আব্‌দুল্‌ সোভান চৌধুরী ঐ ১৲, জনৈক মহিলা ঐ ১৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু ঐ ॥০।

দান।

বাবু রামগোপাল বিশ্বাস পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ১৲, জনৈক মহিলা মাঃ কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু ৫৲, বাবু বিপিনবিহারী রায়ের প্রজাবর্গ ২৫৲, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী ।৵০, বাবু মন্মথকুমার বসু ।০, A friend of 25, Sutharpara ।০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সরকার ৸০, বাবু চন্দ্রমোহন সাহা ॥০, খানখানাপুর ছাত্রসমাজ ১৲, ১১নং মুসলমানপাড়ার ছাত্রনিবাস ৵০, বাবু অবিনাশচন্দ্র রায় ১৲, ১১নং রাধানাথ মল্লিকের লেন ।০, বাবু রাসবিহারী কর্ম্মকারের সংগৃহীত ⁄০, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, বাবু হেমচন্দ্র সেন ।০, বাবু রজনীমোহন কর ৵০, বাবু নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিকের সংগৃহীত ৵১০, বাবু মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ ॥০, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ধর ॥০, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৫৲, বাবু প্রমথনাথ চৌধুরী ।০, বাবু যুগলকিশোর ত্রিপাঠি ।০, বাবু অমরেন্দ্রনাথ বসু ৵০, A friend of Eden Hostel ।০, বাবু চন্দ্রশেখর রায় ৵০, বাবু শরচ্চন্দ্র সিংহ ৵০, A sympathiser, Eden Hostal ৵০, A poor friend do. ৵০, বাবু রমেশচন্দ্র হুই ⁄০, কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন ২৲, বাবু রামগোপাল রায় ১৲, জনৈক প্রচারক ৵০, বাবু কিরণচন্দ্র সিংহ ৵০. বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখো ৵০, বাবু বৈদ্যনাথ বন্দ্যো ৵০, বাবু শশীভূষণ বসু সুব্রতার জন্মদিনে ১৲, বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ।০, বাবু লালমোহন দাস M.A. B.L., ৫৲, বাবু সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি ।০, বাবু শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী ২৲, বাবু অবিনাশচন্দ্র সেন ১৲, বাবু হেমচন্দ্র মিত্র ১৲, বাবু শশীভূষণ ঘোষ ॥০, বাবু চন্দ্রকালী ঘোষ ২৲, বাবু সারদাপ্রসন্ন রায় ১৲, Hon. Sir R. C. Mitter ৫৲, বাবু শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী ॥০, বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ ১৲, বাবু অবনীমোহন চট্টো ৩১০, শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা দেবী ৩১০, বাবু পঞ্চানন দত্ত ৵০, বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু ১৲, Hon. A. M. Bose ৩৲, বাবু হীরণমোহন দাস গুপ্ত ।০, ১৭।৩, ঝামাপুকুরের ছাত্রগণ ॥০, বাবু প্রবোধচন্দ্র বড়দলৈ ৵০, ৪০, পঞ্চাননতলার ছাত্রগণ ।০, ১৯/৫, ছকুখানসামার লেন ।০, বাবু নীলরতন রায় ॥০, বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যো ১৲, বাবু রোহিণীমোহন দাস ১৲, ১০৬/১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ।৵০, একজন ভদ্রলোক ৩১০, সৈয়দ সামসুল্‌ হুদা ৫৲, বাবু হারাণচন্দ্র দত্ত ১৲, Messrs G. C. Dey & Co. ১৲, বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখো ১৲, বাবু রমণীকান্ত দাস ৵০, বাবু যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ৵০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন ৵০, বাবু সতীশচন্দ্র রায় ৵০, A poor friend ৩১০, শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা ৫৲, বাবু কিশোরীমোহন দাস ৵০, বাবু মোহিনীমোহন

ঘোষ ৵০, বাবু সানুকুলচন্দ্র রায় ৵০, বাবু কুমুদবান্ধব চট্টো ৵০, বাবু বিধুভূষণ দাস ৵০, বাবু অতুলচন্দ্র বসু ৵০, বাবু মঙ্গল সিংহ ৵০, বাবু বিপিনচন্দ্র বাগ্‌চী ৵০, বাবু কেদারনাথ রায় ১৲, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ।০, বাবু দীননাথ গোপ ১৲, বাবু রামপ্রসাদ রায় ১৲, বাবু মহিমচন্দ্র সরকার।০, বাবু শুকচাঁদ গোপ ১৲, বাবু মথুরানাথ গোপ ৷৷০, বাবু প্রাণনাথ প্রামাণিক ।০, বাবু নবীনচন্দ্র গোপ ১৲, মুন্সী মিয়াজান বিশ্বাস।০, ডাঃ প্রসন্নকুমার সরকার ৷৷০, বাবু রামচরণ বিশ্বাস ১৲, বাবু জয়ধর প্রামাণিক।০, বাবু অদ্বৈত প্রামাণিক ৷৷০, বাবু ব্রজলাল আগরওয়ালা।০, একজন বন্ধু ৫৲, বাবু শশীভূষণ চন্দ ৷৷০, বাবু বিশ্বেশ্বর সেন ৵০, বাবু বিধুভূষণ দত্ত ৵০, বাবু প্রমথনাথ পাল ৵০, বাবু হরিনাথ মজুমদার।০, বাবু পূর্ণানন্দ সাহা ৷৷০, কতিপয় ছাত্র।৫, বাবু সতীশচন্দ্র আচার্য্য /০, বাবু রমণীমোহন সাহা ৵০, শ্রীমতী বিনোদিনী কুণ্ডু /০, শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী সাহা /১০, শ্রীমতী সরোজিনী সাহা ৵০, বাবু মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু /১০, বাবু গোপেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডু ৵০, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী পুত্রের রোগারোগ্য উপলক্ষে ১৴, বাবু রাধারমণ সাহা ১৲, একজন ভদ্রলোক ৵০, বাবু দীননাথ কুণ্ডু ১৴, বাবু রজনীকান্ত বৈরাগী ৵০, বাবু মহিমচন্দ্র মৈত্র।০, বাবু বসন্তকুমার সাহা ৵০, বাবু কান্তিচন্দ্র দত্ত /০, বাবু সুরেশচন্দ্র সান্নাল ৴১০, বাবু মুকুন্দলাল কুণ্ডু /০, শ্রীমতী দামিনীসুন্দরী প্রামাণিক ৵০, কুমারখালী স্কুলের ছাত্রগণ ৷৷৵১৫, বাবু অনুকুলচন্দ্র রায় ১৲, নীতি-বিদ্যালয় ১৲, বাবু শশীভূষণ ঘোষ বি.এ. ১৲, বাবু ভবানীচরণ নন্দী।০, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৫৲, বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ মুখো ৷৷০, বাবু অমৃতলাল কুণ্ডু ১৴, বাবু প্রবোধচন্দ্র দত্ত B.L. ।০, বাবু শিবচন্দ্র বসু ৷৷০, শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ স্বামীর বার্ষিক শ্রাদ্ধে ২৲; বাবু রমাপ্রসাদ মল্লিক ৫৲, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা গুপ্তা ১৲, বাবু যদুনাথ সাহা /০, আমলাপাড়া মেস /০, B. C. Sen Esq. ৫৲, J. Fairlie Esq. ৫৲ বাবু দক্ষিণারঞ্জন আচার্য্য ১৲, বাবু ক্ষুদীরাম মিত্র।০, বাবু গতিনাথ সান্ন্যাল।০, বাবু বনমালী কর্ম্মকার ৵০, বাবু সীতানাথ সরকার ৵০, বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় ৷৷০, বাবু বিহারীলাল দাস।০, সৈয়দ আলি উল্লা ৷৷০, বাবু দুর্গাচরণ বিশ্বাস ১৲, একজন গরিব ৴১০, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১০৲, বাবু নরেন্দ্রমোহন রায় ।০ বাবু কৃষ্ণকিশোর বসাক ৫৲।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

পুরাতন গদী বিক্রয় ৪৲, চাউল বিক্রয় ৫৷৷৵০, পুস্তক বিক্রয় ৵০, বস্ত্র বিক্রয় ১৲।

মুষ্টি ভিক্ষা পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

বস্ত্রাদি।—১০৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটী ছাত্র ধুতি ১, শ্রীমতী মুক্তকেশী দত্ত মৃতকন্যার পরিত্যক্ত—সাড়ী ৫, ঝুটা জরির সাড়ী ১, বেনারসী সাড়ী ১, আলোয়ান ১, গরম পেটি কোট ১, তোয়ালে ১, গরম জ্যাকেট ৫, সাদা জ্যাকেট ৩, সেমিজ ১, ইজের ৩, ডুরে সাড়ী ১, মোজা ৫ জোড়া, গরম রুমাল ১, টুপি ১, পেটী কোট ৪, গরম পেটি কোট ১, বালসের ওয়াড় ১, কোঁচান সাড়ী ১; কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসুর জনৈক আত্মীয়া পর্দ্দা ১, নূতন ধুতি ৮, পেটি কোট ১, জ্যাকেট ১; শ্রীমতী অমূল্যকুমারী বসু পুরাতন সাড়ী ৬।

মোট আয়।

দানপ্রাপ্তি ১৫৫৷৷/১৫, মাসিক চাঁদা ১২৸০, অন্যান্য প্রকারে আয় ১০৸০, বিগত মাসের জের ১৮৲১৫, মোট আয় ১৯৭৵১০।

ব্যয়।

গিরিডি সেবালয় ১১২৷৷০, আদায়কারীর ব্যয় ২২৷৷৵০, "দাসী"কে ধার ৮৷৷৴১০, রোগীর পাথের ১০/১০, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের ঋণ শোধ ১০৴, খাতা ক্রয় /১০, হাঁড়ি ৫, ডাক খরচ ১৵৫, মুটে ৴১০, হিসাব গরমিল ৷৷০। মোট ব্যয় ১৬৫৷৷৴১০।

মোট আয় ব্যয়।

আয়—১৯৭৵১০, ব্যয়—১৬৫৷৷৴১০, হস্তেস্থিত—৩১৷৷৵০।

দাসী

বালুকাময় জলশোধকের উপযোগিতা ও ব্যবহার।

গত মার্চ্চ মাসের দাসীতে 'বিশুদ্ধ জলের আবশ্যকতা ও সংগ্রহোপায়' প্রকাশিত হইয়াছে।—নিত্য পানীয় জল বালুকাময় শোধক দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি বালুকাময় জলশোধকের উপযোগিতা কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাও তথায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

বালুকাময় জলশোধকের কার্য্যক্ষমতা পাঠকগণের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে তদ্বিষয় এখানে সবিস্তারে বলা যাইতেছে। বালুকা দ্বারা পানীয় জল কি প্রণালীতে শোধন করিতে পারা যায়, এবং ব্যবহারোপযোগী ও প্রকৃষ্ট জলশোধকই বা কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয় প্রকটিত করা যাইতেছে। এই নিত্য রোগভোগে কাতর বঙ্গদেশে পানীয় জলের বিষয় যতই আলোচিত হয়, মঙ্গলের ততই সম্ভাবনা।

বিশুদ্ধ জলের আবশ্যকতা ও সংগ্রহোপায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে কোন কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকটিত করা আবশ্যক মনে করিতেছি। কথাটা নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। কেন না, তাঁহাদের নিকট এরূপ তর্ক কিম্বা ঔদাসীন্য কখন আশা করি নাই।

কথাটা কিন্তু নূতন নহে। অনেক সময় অনেক লোককে বিবিধ আকারে এই তর্ক উত্থাপন করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞানের মতেরই যখন স্থিরতা নাই, তখন তাহার উপদেশ পালন করায় না করায় সমান ফল। "আজ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী ঘোষণা করিলেন যে অমুক জিনিসটী আহার করিলে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। আবার কয়েক বৎসর পরে শুনা গেল যে তত্তুল্য উপকারী সামগ্রী কদাচিৎ পাওয়া হয়। এই

দেখুন না, সামান্য বালুকাময় জলশোধকের বালুকা পুনঃ পুনঃ ধৌত করিবার আদেশ শুনিয়াছিলাম ; এক্ষণে, সে মত পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে বালুকা বিলোড়িত না হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলা হইতেছে। আজ বলা হইতেছে, অণুজীবগণ (microbes) নানা রোগের নিদান, আবার হয়ত দুই চারিবৎসর পরে শুনিব যে তাহা নহে, রক্তের সহিত কোন প্রকার বিষ মিশ্রিত হয়, তাহাতেই সংক্রামক রোগের উৎপত্তি। ইত্যাদি।"

উপরে যে প্রকার তর্কের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, বোধ হয় তাহার মূল সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। চিরাভ্যস্ত রীতির পরিবর্ত্তনে আলস্য এবং ঔদাসীন্য ব্যতীত ঐ প্রকার তর্কের অপর কোন মূল নাই।—"কে আবার নূতন কূপ নির্ম্মাণ করে, কে আবার জলশোধনের ভাবনায় সময়ক্ষেপ করে! ভাল মন্দ যা হবার তা হবেই। ইত্যাদি।"

অলস, উদ্যোগ-বিমুখ কার্য্যদ্বেষী ব্যক্তির নিকট তর্কের অভাব নাই। বৃথা তর্ক দ্বারা মনকে শান্ত করিবার প্রয়াসে তাঁহারা যতই কেন আস্ফালন করুন না, প্রকৃতির নিয়ম তাহাতে অণুমাত্রও শিথিল হয় না। পাপের ফল নিশ্চিতই ভুগিতে হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষার অবহেলা করিলে যে পাপ হয়, তাহার ফল প্রত্যক্ষ। * ভাল হউক, মন্দ হউক, কথাটা যখন উঠিয়াছে, তাহার একটা উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বড় দুঃখ হয় যে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট মূল তত্ত্বগুলিও তত পরিস্ফুট নহে।

বিজ্ঞানের মূলধন দুইটি,—পরীক্ষা ও পরিদর্শন। ঐ দুই মূলধন প্রয়োগ করিয়া বিচার-শক্তির সাহায্যে নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করা যায়। বিজ্ঞানে কেন, শিশুর ও বৃদ্ধের সামান্য জ্ঞানের প্রভেদের কারণ, ঐ মূলধন ব্যবহারের বৈষম্য। বলা বাহুল্য, পরীক্ষা দ্বারা যেরূপ সূক্ষ্ম ও যথার্থ জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়, পরিদর্শনে তদ্রূপ জ্ঞান সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোন্ কারণে কোন্ রোগের উৎপত্তি বা কোন্ বিধানে রোগবিশেষের উপশান্তি,— এ সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রধানতঃ পরিদর্শনই একমাত্র উপায়। মানুষ লইয়া পরীক্ষা করা চলে না। সময় বুঝিয়া নানা বিষয়

* এখনও কেহ কেহ তর্ক করিয়া থাকেন যে 'কেন আমরা এমন নদীর জল পান করি, অমন কূপের জলের তুল্য সুস্বাদুজল আর নাই, ইত্যাদি।' কিন্তু নদী তড়াগ সাগর থাকিলেই জল পেয় হয় না, কিম্বা কোন জল মিষ্ট বা স্বচ্ছ হইলেই তাহা নির্দ্দোষ নহে। কোন জল ব্যাধিকর অণুজীবহীন না হইলে তাহা পেয় নহে। কোন্ জল পেয় এবং কোন্ জল অপেয়, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা গিয়াছে।

লক্ষ্য করিয়া স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অধিকাংশ তত্ত্ব অবগত হইতে হয়। এই জন্যই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কখনও জড়বিজ্ঞানের ন্যায় সূক্ষ্ম হইতে পারে না। একটি মনুষ্য-দেহ বলিতে যে শক্তি-সমষ্টি বুঝায়, তাহার ক্রিয়া ও প্রভাব আমাদের সম্যক্ অনধীত। মানুষের "ধাতু" বলিয়া যে একটা অনির্দ্দেশ্য শক্তি আছে,—তাহার স্বরূপ বা ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাত। এই জন্যই একই দ্রব্য ব্যক্তিবিশেষে বিষবৎ কার্য্য করে, অপরের তাহাতে কিছুই হয় না। এই জন্যই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অধিকাংশ উপদেশ কেবল নিষেধার্থক।

কিন্তু তা বলিয়া বর্ত্তমান জ্ঞানের অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধিশীল। অর্জ্জিত বর্ত্তমান জ্ঞান লইয়াই আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। এখনকার কোন্ কথাটা ভবিষ্যতে উল্টাইয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া আমরা সাংসারিক কাজ করি না। যখন যেমন জ্ঞান বাড়িবে, তখন তেমন কাজ করিতে হইবে। অর্থচেষ্টা প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্যে এক নিয়ম ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আদেশ পালনে অন্য ব্যবস্থা, এমন ব্যবহার কখনও আদরণীয় নহে।

পানীয় জল শোধন করিয়া পান কর। যেহেতু, শোধন না করিলে রোগ-ভোগের আশঙ্কা। এই সামান্য অথচ অতীব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রতিপালন করিতে এত পরাঙ্মুখ কেন? অনেকে চাল ডাল প্রভৃতি সামগ্রী কত বাছিয়া কত ধুইয়া রন্ধন করেন। জল সহজে যথেষ্ট পাওয়া যায় বলিয়াই কি তাহার প্রতি অনাদর?

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত কূপ নির্ম্মাণে আর একটি আপত্তি হইয়াছে। সাধ্যমত তাহার একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

কথাটা এই।—"নগরবাসিগণের নিমিত্ত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া কূপ বা বিলাতী কলযোগে পানীয় জলের উপায় করা আবশ্যক মনে করি। কিন্তু দেশের লোক যে অজ্ঞ, তাহারা উহার আবশ্যকতা বুঝেনা। যেখানে সেখানে যে কোন জলপানেই তাহাদের প্রবৃত্তি। তাহারা যে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া নবরচিত কূপ হইতে জল আনিয়া ব্যবহার করিবে, এমন আশা নাই। সুতরাং পেয় জল সংগ্রহের উপায় করা বৃথা।"

এ আপত্তিটা তত অসার নহে। জলের গুণাগুণ সহজে বুঝা যায় না। সচ্ছন্দলব্ধ জল ছাড়িয়া বহির্দৃষ্টিতে সেই একই প্রকার জলের নিমিত্ত দশ

পা যাবার কষ্ট করিতে চায় কে? বাস্তবিক, পাত্র বিবেচনা করিলে নিরাশ হইতে হয়।

কিন্তু নিরাশ ও বিষণ্ণ হইলে চলিবে কি? যখন তোমার প্রতিবেশীর গৃহ অগ্নিসাৎ হইতে থাকে, তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক কি? যখন তোমার পাড়ায় কোন সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হয়, তখন তোমার ভয় হয় না কি? যাহার দোষে ঘরে আগুন লাগিয়াছিল, তাহাকে ভৎ‌র্সনা করিতে ক্রটি কর কি? কঠিন হৃদয়ে পাড়ার বসন্তরোগীকে দূরে পাঠাইবার মানস হয় না কি? যখন নগরে সমাজবদ্ধ হইয়া ঘন বসতির লাভ আকাঙ্ক্ষা কর, তখন তাহার সঙ্গে কতকগুলি রক্ষণনিয়মও অবশ্য পালনীয়। স্বেচ্ছাচারী হইয়া আমাকে বিপদে বা কষ্টে ফেলিবার অধিকার তোমার নাই। *

এই কয়েকটী কথা আমরা সময়ে সময়ে ভুলিয়া যাই। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত অনেক মিউনিসিপালিটীতে দেখা যায়। কমিশনার মহোদয় হয়ত কিঞ্চিৎ করুণহৃদয়। স্থূল দৃষ্টিতে করুণা প্রকাশ করিতে গিয়া ঘোর অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়া ফেলেন।

আর এক কথা।—কোন্ জল পেয়, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া না দিলে, তাহারা তদনুসারে কাজ করিবে কেন? তাহাদিগকে শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের পদানুসরণে প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টা আবশ্যক। আবার, যাচনা থাকিলে সঞ্চয় আবশ্যক, নতুবা নহে;—এ বাক্য সকল স্থলে প্রযোজ্য নহে। লোকশিক্ষার নিমিত্ত সঞ্চয় যাচনার পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। সামান্য সামান্য মূল তত্ত্ব লইয়াই গোলযোগ। যাহা হউক, কি প্রকার পরীক্ষা বা পরিদর্শন দ্বারা বালুকাময় জলশোধকের উপযোগিতা প্রকাশিত হইয়াছে,—তাহার কয়েকটি বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বে মনে করা যাইত যে, জলমধ্যে ভাসমান কর্দ্দমাদি দূর করিয়া জল স্বচ্ছ করাই বালুকাময় শোধকের উদ্দেশ্য। এক্ষণে অণুজীব-বিদ্যার সাহায্যে জানা যায় যে, তদ্দ্বারা ব্যাধিকর অণুজীব দূরীভূত করাই বালুকাস্তরের উদ্দেশ্য। সুতরাং যে বালুকাময় শোধক দ্বারা এ কার্য্য সুচারুরূপে

---

* আবশ্যক হইলে বঙ্গদেশের মিউনিসিপাল আইনের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। See Sections 199 A and 200 of the amended Municipal act of 1894, and also paras 23 and 24 of the explanatory circular issued by the Bengal Govt.

সম্পন্ন না হয়, তাহার ব্যবহারে তাদৃশ উপকার নাই বালুকাময় শোধকের কার্য্যক্ষমতা স্থির করিতে হইলে পূর্ব্বে এইরূপ কোন উপায় অবলম্বন করা হইত। জলের সহিত অঙ্গার বা নীলরঙ্গ চূর্ণ মিশাইয়া শোধকে সেই জল ক্ষরিত করা হইত। তাহা দিয়া বর্ণহীন স্বচ্ছ জল নির্গত হইলে শোধক উত্তম বলিয়া গণ্য হইত। বস্তুতঃ যে শোধকের মধ্যাস্থিত রন্ধ্রগুলি যত ক্ষুদ্র হইত, তাহাই তত উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যাইত। ফলতঃ স্বচ্ছ জল পাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে সূক্ষ্মরন্ধ্রবিশিষ্ট শোধকই ব্যবহার্য্য।

কিন্তু সূক্ষ্ম রন্ধ্র দ্বারা জলে অবলম্বিত কর্দ্দমকণিকা প্রতিরুদ্ধ হইলেও, তদ্দ্বারা সূক্ষ্মতর অণুজীবগণ আবদ্ধ হয় না। সুতরাং যদ্দ্বারা অণুজীবগণ প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, তদ্রূপ শোধকের প্রয়োজন। কোন শোধক কার্য্যক্ষম কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে দেখা উচিত, শোধকে ঢালিবার পূর্ব্বে জলে কতগুলি অণুজীব থাকে, এবং তদ্দ্বারা ক্ষরিত হইবার পরেই বা কত থাকে। যে শোধক দিয়া যত অল্পসংখ্যক অণুজীব নির্গত হয়, তাহাই তত উৎকৃষ্ট।

কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যত পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, একটিও অণুজীব যাইতে পারিবে না এমন শোধক নির্ম্মাণ করা দুষ্কর ও অসম্ভব। অণুজীব সংখ্যার হ্রাস ব্যতীত উহা দ্বারা সমুদায় দূরীভূত করিতে পারা যায় না। যে সে প্রকার শোধকেই অল্প বা অধিক অণুজীব হ্রাস করা সহজ।

কয়েক বৎসর ধরিয়া আমেরিকায় সামান্য বালুকাময় শোধকের কার্য্যকারিতা পরীক্ষিত হইয়াছে। উক্ত পরীক্ষায় জানা যায় যে—বালুকাময় শোধক এমনভাবে নির্ম্মিত হইতে পারে যে, তাহাতে শতকরা ৯৯·৫টি অণুজীব দূরীভূত করিতে পারা যায়। যে বালুকার পৃষ্ঠদেশ প্রায় তিন বিঘা, তদ্দ্বারা আড়াই লক্ষ মণ জল ক্ষরিত করিয়া ঐ ফল পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বালুকার পৃষ্ঠফল এক বর্গফুট ধরিলে প্রায় ৫।৬ মণ জল নির্গত করা হইয়াছিল।*

বালুকাশোধকের কার্য্যকারিতা বুঝিতে হইলে দুইটি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বিচার করা আবশ্যক। (১) বালুকা-স্তরের গভীরতা এবং (২) জল

---

* এই প্রবন্ধের কয়েকটি কথা গত এপ্রিল মাসের Knowledge নামক পত্রিকা হইতে গৃহীত।

নির্গমের বেগ। অবশ্য, দুই চারি অঙ্গুলি স্থূল বালুকাস্তর দিয়া জল ক্ষরিত হইলে যত অণুজীব প্রতিরুদ্ধ হইবে, আরও স্থূল স্তর দিয়া তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক অণুজীব আবদ্ধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বালুকাস্তর যত স্থূল হউক না, দ্রুতবেগে জল নির্গত হইলে যত অণুজীব বহির্গত হইবে, মন্দবেগে হইলে তদপেক্ষা অল্প অণুজীব জলের সহিত চলিয়া আসিবে।

অণুজীবগণ সূক্ষ্ম বলিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, যে শোধকের বালুকা যত সূক্ষ্ম হইবে, তাহাই তত কার্য্যকারী। কিন্তু এ বিষয়ে কয়েকটি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। পরীক্ষার নিমিত্ত কোন জলের সহিত এক প্রকার অণুজীব মিশ্রিত করা হইয়াছিল। ঐ অণুজীব অনেক বিষয়ে টাইফইড রোগের অণুজীবের সদৃশ। শোধকে এত মোটা বালুকা ব্যবহৃত হইয়াছিল যে, তাহার শতটি পাশাপাশি রাখিলে এক ইঞ্চ বিস্তৃত হয়। এরূপ বালুকার ৬০ ইঞ্চ গভীর স্তর দিয়া ঐ অণুজীব মিশ্রিত জল ক্ষরিত করা হইয়াছিল। ক্ষরিত জলে দেখা গেল যে শতকরা ৯৮টি জলের সামান্য অণুজীব এবং ৯৯·৫টি উক্ত মিশ্রিত অণুজীব দূরীভূত হইয়াছে। বালুকাস্তরের ক্ষেত্রফল তিন বিঘা, এবং ২৪ ঘণ্টায় লক্ষাধিক মণ জল নির্গত হইয়াছিল। অর্থাৎ বালুকার পৃষ্ঠফল এক বর্গফুট ধরিলে ৬০ ইঞ্চ গভীর বালুকা-স্তর দিয়া প্রায় ২৬ মণ জল নির্গত করা হইয়াছিল।

এই প্রকার পরীক্ষায় যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা আমেরিকার মাসাচিউ-সেটস্ প্রদেশের লরেন্স নগরের জল সংগ্রহে প্রযুক্ত হইয়াছে। যে নদীর জল ঐ নগরবাসিগণ ব্যবহার করিত, উহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের মল তাহার সহিত মিশ্রিত হইত। প্রতি বর্ষে টাইফইড রোগে লরেন্স নগরে অনেক লোক মারা পড়িত। সেই নদীর উপর দিকে লাওয়েল নামক একটি নগর আছে। প্রতি বর্ষে লাওয়েল নগরে টাইফইড রোগের মড়কের পর লরেন্স নগরে উক্ত রোগ আবির্ভূত হইত। মলদূষিত জল পান করিয়াই যে লরেন্সবাসিগণের রোগভোগ ঘটিত, তাহা এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যায়। প্রায় এক বৎসর হইল লরেন্স নগরে বালুকাময় শোধক স্থাপিত হইয়াছে। তদবধি নগরের স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে খৃঃ ১৮৯২ অব্দের হামবর্গ নগরের ওলাউঠা মড়কের বিষয় লিখিত হইয়াছে। অণুজীববিদ্ অধ্যাপক কোক সাহেব (Dr. Koch)

প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে এল্‌ব নদীর অশোধিত জল পান করাতে হামবর্গ নগরে ওলাউঠার প্রকোপ ঘটে।* তাহার পর তথায় বালুকাশোধিত জল পানের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতিদিন নগরে যত জল আবশ্যক হয়, তাহা নদী হইতে তুলিয়া প্রকাণ্ড পুষ্করিণীতে একদিন রাখা হয়। পরদিন সেই জল বালুকাশোধকের উপরে গিয়া পড়ে। প্রথমে সিকি ইঞ্চ গভীর ছোট ছোট পাষাণ খণ্ড, তদুপরি মোটা বালির আট ইঞ্চ পুরু স্তর, তাহার উপরে প্রায় তিন ফুট সরু বালি আছে। এইরূপে তথায় বালুকাময় শোধক নির্ম্মিত হইয়াছে। জল নির্গমের বেগ সর্ব্বদা সমান রাখিবার অভিপ্রায়ে বালির উপর তিন ফুটের অধিক জল এককালে আসিতে দেওয়া হয় না। তদবধি আরও কয়েকটি নগরে বালুকাময় শোধক স্থাপিত হইয়াছে।

কয়েক ফুট বালুকা ভেদ করিয়া জল নিঃসৃত হইলে কিরূপে তদ্দ্বারা অণুজীব ধ্বংস হয়, তাহার প্রকৃত কারণ সম্যক্‌ অবগত হওয়া যায় নাই। পূর্ব্ব প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, সদ্যোনির্ম্মিত বালুকাময় শোধক তত ফলোপ-ধায়ক নহে। জলক্ষরণবশতঃ বালুকার উপরে যে একপ্রকার পিচ্ছিল কর্দ্দম পতিত হয়, এই পঙ্কই জল শোধনের কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু পঙ্ক দ্বারাই বা অণুজীব ধ্বংস কিরূপে সম্ভবে? অণুবীক্ষণ সাহায্যে উক্ত পঙ্ক পরীক্ষা করিলে তাহাতে অসংখ্য অণুজীব বাস করিতে দেখা যায়। বোধ হয় উহারা বায়ুর অম্লজনক গ্যাসের (oxygen) সাহায্যে

---

* হুগলির অন্তর্গত জাহানাবাদে গত বৎসর বর্ষাকালে হঠাৎ ওলাউঠা দেখা দেয়। জাহানাবাদের অনেক লোক তথাকার দ্বারকেশ্বর নদীর জল ব্যবহার করে। ক্রমে প্রকাশ হইল যে, তাহার কয়েক ক্রোশ উপরে একখান গণ্ডগ্রামের কয়েকটা ওলাউঠা রোগী ঐ জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জাহানাবাদের নীচেও কয়েকটা গ্রামের লোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হয়। ঐ ঐ গ্রামের যে সকল পরিবার ঐ নদীর জল ব্যবহার করিত, তাহাদেরই ঘরে নাকি ওলাউঠা দেখা দেয়। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, জাহানাবাদ অঞ্চলে ওলাউঠা কচিৎ দেখা যায়। আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত আয়েনপুর থানার মধ্যে বাউশখালি, রাজনগর, বলভদি প্রভৃতি গ্রাম সকল কুমার নদীর দুই পার্শ্বে অবস্থিত। সম্প্রতি ঐ নদীতীরবর্ত্তী প্রায় ২০।২৫টি গ্রামে ওলাউঠা রোগে অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। ঐ সকল গ্রামের অধিবাসিগণ ঐ নদীর জল পান করিয়া থাকে। এক্ষণে উক্ত নদীর আদৌ স্রোত নাই এবং উহাতে এত জৈবপদার্থ মিশ্রিত হইয়াছে যে, জলের উপরিভাগে সবুজবর্ণের একটা সর সর্ব্বদা ভাসিয়া রহিয়াছে। এরূপ স্থলে যে ঐ ঐ গ্রামে বহুলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

জলের জৈব পদার্থকে অজৈব পদার্থে পরিণত করে। সাধারণতঃ জলে যথেষ্ট অম্লজনক মিশ্রিত থাকে, তদ্ভিন্ন বায়ু হইতেও অম্লজনক প্রাপ্ত হয়। জৈব পদার্থ না পাইলে অণুজীব বাঁচিতে পারে না; কেন না উহাই তাহাদের আহার। এজন্য বোধ হয় আহারাভাবে অণুজীবগুলি মরিয়া যায়। এমনও হইতে পারে পঙ্কস্থিত অণুজীবগণ এমন কোন দ্রব্যবিশেষ উৎপাদন করে, যাহা অপর অণুজীবের পক্ষে বিষবৎ কার্য্য করে।

প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, অণুজীব ধ্বংসের সহিত পঙ্কের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কেন না ঐ পঙ্ক চাঁচিয়া ফেলিলে, শোধক পূর্ব্ববৎ তত অণু-জীব দূরীভূত করে না। এজন্য ঐ পতিত পঙ্কস্তর যাহাতে বিলোড়িত না হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বালুকার উপরে কিম্বা ভিতরে কোন ফাঁক বা ছিদ্র রাখাও কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু, সেই ছিদ্র দিয়া অবিশোধিত হইয়াই জল নিঃসৃত হইবে।

কিন্তু মধ্যে মধ্যে বালুকা-শোধক পরিষ্কার করাও কর্ত্তব্য। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য। (১) বহুকাল ব্যবহারে বালুকার উপরে সঞ্চিত পঙ্ক ক্রমশঃ নিম্ন-গামী হইয়া বালুকার ভিতরে প্রবেশ করে। (২) ঐ পঙ্ক বালুকার উপরে এমন জমাট বাঁধে যে তদ্দ্বারা জল নিঃসরণ নিতান্ত মৃদু হইয়া পড়ে।

অল্প গভীর কূপজল পরিত্যাজ্য। কেন পরিত্যাজ্য তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। গভীর কূপ খনন করিয়া যাহাতে নিম্নস্তরের জল সংগৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই শ্রেয়স্কর। এই স্বাভাবিক উপায়ে বিশোধিত জল নানাস্থানে ব্যবহৃত হইতেছে। কৃত্রিম জলশোধক অপেক্ষা এই স্বাভাবিক জলশোধককে বঙ্গীয় স্বাস্থ্যরক্ষক সমিতি অধিক উপযোগী বলিতেছেন।*

যেখানে এরূপ কূপ জলের অভাব, সেখানে নিত্য ব্যবহার্য্য জল বালুকা-পূর্ণ কলস বা হাঁড়ির ভিতর দিয়া ক্ষরিত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বেশী মূল্য দিয়া বিলাতী জল-শোধক ক্রয় না করিলে অনেকের সন্দেহ যায় না। বাস্তবিক, সামান্য বালুকাপূর্ণ হাঁড়ি দিয়া এত সহজে পানীয় জল বিশুদ্ধ হইতে পারে, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না। অনায়াসলব্ধ সামান্য ঔষধের পরিবর্ত্তে যেমন মূল্যবান্ ঔষধের প্রতি কাহারও কাহারও প্রগাঢ় ভক্তি দেখা যায়, তেমনই মূল্যবান্ জলশোধকের প্রতি তাঁহাদের অটল বিশ্বাস।

* Sanitary Board's circular No. 11 dated the 15th. Nov. 1894.

ডাঃ কোক প্রভৃতি অনেকে বাজারের নানাবিধ কৃত্রিম জলশোধক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, অনেক দিন পর্য্যন্ত কার্য্যোপযোগী থাকে, এমন কোন ক্ষুদ্র জল-শোধক নাই। ডাঃ কোক বলেন স্বাভাবিক মৃত্তিকা-বালুকা-স্তর দিয়া ক্ষরিত জল পানই শ্রেয়স্কর।

যাহা হউক, গভীর কূপজল দুষ্প্রাপ্য হইলে, গৃহে বালুকাময় শোধক দ্বারা জল শোধন করা কর্ত্তব্য। উপরি বর্ণিত পরীক্ষাগুলির ফল অবলম্বন করিয়া সামান্য বালুকাময় শোধক নির্ম্মাণের প্রণালী নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

জলের অণুজীব ধ্বংসের নিমিত্ত কয়লার প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু অনেকে যেরূপে শোধকে কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে বরং অহিত হইবার সম্ভাবনা। চুল্লীর সদ্য কয়লা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহা সাবধানে ধৌত করা কর্ত্তব্য। নতুবা পাংশুক্ষার যোগে পানীয় জল অনর্থক বিস্বাদ করা হয়।

প্রথমতঃ, দেখিতে হইবে প্রতিদিবস কত মণ জল আবশ্যক। জল-শোধকের আকার এতদনুসারে করিতে হইবে। মনে কর, প্রতিদিন ৫।৬ মণ জল আবশ্যক। এজন্য বালুকা-স্তর অন্ততঃ এক ফুট গভীর ও এক বর্গ ফুট বিস্তৃত হওয়া চাই। জল ক্ষরণের বেগ এমন হইবে যেন সমস্ত দিবা-রাত্রিতে ৬ মণের বেশী জল ক্ষরিত না হয়। অর্থাৎ এতদ্দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় ৯।১০ সের জলের অধিক ক্ষরিত হইতে দিবে না।*

ঐ নিয়মটি স্মরণ রাখিয়া আপনার ইচ্ছামত বালুকাময় জলশোধক নির্ম্মাণ করিতে পার। কলসীর উপর কলসী রাখিয়া কিরূপে জলশোধক নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। উপরি উপরি তিনটী কলসী বা হাঁড়ি বসিতে পারে, কাঠের বা বাঁশের এমন একটা ফ্রেম আবশ্যক। যে জল শোধিত করিবার আবশ্যক, সকলের উপরের হাঁড়িতে তাহা রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়টির তলায় ধৌত অঙ্গার, শিলা, বা ইট খণ্ড, তাহার উপরে গলার নিম্ন পর্য্যন্ত সুপরিস্কৃত ও ধৌত বালুকা রাখিয়া হাঁড়িটি পূর্ণ করিবে। উহাই বালুকাময় শোধক। নীচের তৃতীয় হাঁড়িটিতে বালুকা-ক্ষরিত জল, ব্যবহারের নিমিত্ত সঞ্চিত হইবে। অবশ্য, জল ও বালুকাপূর্ণ হাঁড়ি দুইটির তলায় ছিদ্র থাকিবে। ঐ ছিদ্র দিয়া ফোঁটা ফোঁটা আকারে জল পতিত হইতে থাকিবে।

* See Bengal Sanitary Board's circular.

হাঁড়ির আকার ক্ষুদ্র হইলে একটির পরিবর্ত্তে দুইটি হাঁড়ি বালুকাপূর্ণ করা কর্ত্তব্য। হাঁড়ি রাখিবার ফ্রেমটি ৩ হাত উচ্চ হইলেই চলিবে। ছিদ্রের আকার বড় হইয়া পড়িলে, অনেকে তুলার বা বস্ত্রের পলিতা পরাইয়া ছিদ্রমুখ ক্ষুদ্র করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ করিলে কয়েক দিবস পরে পলিতা পচিয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে একটা লৌহ প্রেক ছিদ্রে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে পুনঃ পুনঃ পলিতা পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। যাহা হউক, উদ্দেশ্য বুঝিলে নানা উপায়ে জলনির্গমবেগ খর্ব্ব করা যাইতে পারে। কাঠের ফ্রেমের অভাবে মোটা দড়ির শিকায় কলসী ঝুলাইলেও কার্য্য চলিতে পারে।

কোন কোন স্থানে কূপ খনন করিবার সুবিধা নাই, কিম্বা কূপ খনন করিলেও উত্তম জল পাওয়া যায় না। তথায় নদীর বা বৃহৎ পুষ্করিণীর জল বালুকাময় শোধক দ্বারা নির্দ্দোষ করিয়া লওয়াই একমাত্র সহজ উপায়। বর্ষাকালে অনেক স্থানেই ওলাউঠা আমাশয় প্রভৃতি উদরপীড়া জন্মিয়া থাকে। ব্যবহার্য্য জল সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের যে উপদেশ প্রকটিত করা হইল, তখন তৎপ্রতি সকলের মনোযোগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বাল্য সখী।

সায়াহ্ন সময় বকুলের মূলে
খেলে পল্লী শিশুদল!
কলহ চীৎকার আনন্দের ধ্বনি,
পূর্ণ করে নভস্তল॥
নব কিসলয় সুচারু ভূষণে
শোভা পায় তরুবর।
পল্লব মাঝারে বসি পিক তাহে,
তুলে কুহু কুহু স্বর॥
সন্ধ্যা সমীরণ বহি ধীরে ধীরে,
কাঁপায় বিটপ কুল।
নীরবে খসিয়া, পড়িছে ভূতলে
রজত-কণিকা ফুল॥
সচল কুসুম শিশুগণ কত
তরুমূলে করে খেলা।
আঁচল ভরিয়া কেহ আনে ফুল,
কোন জন গাঁথে মালা॥

পিক-কুহুরবে মিলাইয়ে স্বর,
কেহ কুহু কুহু করে।
যতন করিয়া গাঁথি ফুলহার,
কেহ নিজ গলে পরে॥
কত উচ্চ হাসি, কত করতালি,
কত আনন্দের গীত।
স্বরগ শোভায় পূর্ণ করি ধরা,
হয় সেথা উথলিত॥
ক্রমে দিবা শেষ, লোহিত বরণে
অস্তাচলে ডুবে রবি।
শঙ্খ ঘণ্টারব উঠে চারিদিকে,
ম্লান হয় বন ছবি॥
সাঙ্গ করি খেলা শিশুগণ যত,
নিজ নিজ ঘরে চলে।
বালক বালিকা দুইটী কেবল
রহে বসি তরুতলে॥

দ্বাদশ বরষ বালকের বয়ঃ,
বালিকা নবম গত।
সুঠাম সুন্দর মুরতি দোঁহার,
যেন দেবশিশুমত ॥
সরলতা মাখা সুচারু বদন,
অধরে ফুটেছে হাসি।
প্রফুল্ল কমলে শোভিতেছে যেন
প্রভাত কিরণ রাশি ॥
কুড়াইয়া ফুল আনিছে বালক;
একমনে বসি বালা,
যতন করিয়া সুকোমল করে
গাঁথিছে বকুলমালা ॥
আকুল কুন্তল ঢাকি গ্রীবা দেশ,
পড়িয়াছে পৃষ্ঠ পরে।
দ্বিগুণ শোভায় শোভিছে বদন,
নবোদিত শশিকরে ॥
মুগধ বালক নিরখি সে শোভা,
হেরে অনিমেষ হয়ে।
কি উচ্ছ্বাস যেন বালকের প্রাণে
উঠে, মুখ পানে চেয়ে ॥
গাঁথা হ'ল মালা, হাসিয়া বালক,
ধরি বালিকার কর,
কহিলা, "কুমুদ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে,
চল দোঁহে যাই ঘর ॥
গাঁথিয়াছি মালা এই লও তুমি",
এত বলি স্নেহ ভরে।
লয়ে কণ্ঠহার, বালিকার গলে
পরাইল সমাদরে ॥
হাসিল বালিকা, নিজ কণ্ঠমালা
দিলা বালকের গলে।
হাতে হাত ধরি, হরষিত মনে
দোঁহে গৃহ পানে চলে ॥

২

দ্বাদশ বরষ গিয়াছে চলিয়া,
কোথা হায় সেই দিন।
কি যেন ব্যথায় অভাগী কুমুদ,
হইতেছে ক্রমে ক্ষীণ ॥
বাল্য সাথী তার নরেন্দ্র এখন
গেছে চলি কোন দেশে।
ভগ্ন বক্ষ লয়ে কাঁদে অভাগিনী,
বিশুষ্ক মলিন বেশে ॥
কুলীন কুমারী এখনও অনূঢ়া,
কেহ নাই ত্রিসংসারে।
হৃদয়ের জ্বালা হৃদয়ে চাপিয়া,
ভাসে বালা অশ্রুধারে ॥
জনকের সনে নাহি দেখা কভু,
জননী শৈশবে মৃত।
পরগৃহ মাঝে দাসীপনা করি,
অভাগীর দিন গত ॥
শৈশবে তাহারে বাসিত যে ভাল,
সেও দূরে গেছে চলি।
বারতা তাহার না জিজ্ঞাসে কভু,
নিজে আছে সুখে ভুলি ॥
ভুলেছে নরেন্দ্র, কিন্তু অভাগিনী
ভুলিতে না পারে তার।
ত্রিজগৎ যেন অভাগীর চোকে
তার(ই) ছবি মাখা হায় ॥
দ্বাদশ বরষ গেল একে একে,
তবু আশা পথ চেয়ে।
আজ (ও) অভাগিনী রয়েছে বাঁচিয়া,
নরেন্দ্রের নাম লয়ে ॥
নাহি গন্ধ লেশ, গিয়াছে শুকায়ে
সেই বকুলের মালা।
তবুও যতনে, হৃদয়ে তুলিয়া,
এখনও রেখেছে বালা ॥
সেই পথ, ঘাট, সেই তরু লতা
সেই বন, উপবন।
রয়েছে তেমনই, অভাগিনী শুধু
করে অশ্রু বিসর্জ্জন ॥
ফুরাইলে বেলা, শূন্য কুম্ভ লয়ে,
যায় বালা নদীকূলে।
মনে পড়ে তার শৈশবের কথা,
ভাসে বুক অশ্রুজলে ॥
যে বকুল মূলে নরেন্দ্রের সনে
গেঁথেছিল ফুল হার।
হেরিলে সে তরু ফেটে যায় বুক,
ঝরে তপ্ত অশ্রুধার ॥
প্রতিবাসী কেহ নরেন্দ্রের নাম
যদি কোন দিন করে।
চাহি জিজ্ঞাসিতে ফোটেনা বচন,
অভাগিনী লাজে মরে ॥
উদাসীন ভব দুখিনীর দুখে,
বারেক না ফিরি চায়।

কাননের ফুল কাননে ফুটিয়া,
যেন গো ঝরিয়া যায়॥

৩

রাজপথ পাশে উঠেছে প্রাসাদ,
কিবা শোভা মনোহর।
বিচিত্র সজ্জায় শোভিত ভবন,
নরেন্দ্রের বাসঘর।
আনন্দ উচ্ছ্বাস উঠে গৃহ হ'তে,
মধুর বাদিত্র বাজে।
কুসুম স্তবকে, বসনে, ভূষণে,
শোভে পুরী চারু সাজে॥
বালক নরেন্দ্র যুবক এখন,
ধনে, মানে, বিভূষিত।
পত্নী, পুত্রদয়ে সে পুরীর মাঝে,
বাস করে হরষিত॥
প্রবেশি সংসারে ভুলেছে নরেন্দ্র
শৈশবের ধূলি খেলা।
কে রাখে স্মরণে কোন্ বালিকায়,
কবে পরাইল মালা॥
জগৎ এখন কর্ম্মক্ষেত্র তার,
ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা।
সে কেন স্মরণে রাখিবে গো বল,
বালিকার ভালবাসা॥
ধনে, মানে, জ্ঞানে, ভূষিত যে জন,
খ্যাতি যার দেশময়।
স্বপন সমান শৈশবের প্রেম
তার কিগো মনে রয়॥
প্রকোষ্ঠ মাঝারে হরষে নরেন্দ্র
করে সুখ আলাপন।
দ্বার দেশে তার আছে দাঁড়াইয়া
কাঙালিনী একজন॥
দূর পল্লী হ'তে এসেছে দুখিনী
লয়ে নরেন্দ্রের নাম।
একবার শুধু দেখিবে তাহারে,
এই তার মনস্কাম॥
মলিন বসন অঙ্গে পরিধান,
শিরে রুক্ষ কেশভার।
পথশ্রমে তনু অবসন্ন প্রায়
নাহি শক্তি দাঁড়াবার॥
যৌবনের কান্তি না ফুটিতে দেহে
অকালে ধরেছে জরা।
জীর্ণ শীর্ণ দেহ, কালিমা নয়নে
জিয়ন্তে যেন গো মরা॥
বিনয়ে দুখিনী কহে দ্বারপালে
"প্রভু পাশে তব যাও।
কাঙালিনী এক ডাকিছে তাঁহারে,
এ সংবাদ গিয়া দাও।।"
গর্ব্বিত বচনে কহে দ্বারপাল,
"বলিতে না হয় লাজ।
তোর কথা শুনি প্রভুরে আমার
ডাকিব এখানে আজ॥"
কাঁদে অভাগিনী, হেরি দ্বারপাল
নরেন্দ্রের কাছে যায়।
কহে, "নারী এক দ্বারে দাঁড়াইয়া,
প্রভুরে দেখিতে চায়॥"
কৌতুকী নরেন্দ্র গবাক্ষ হইতে
চাহি দেখে নিজ দ্বারে।
অভাগীর সনে মিলিল নয়ন,
কিন্তু চিনিবারে নারে॥
অনিমেষ হয়ে নরেন্দ্রের পানে
চাহি রহে কাঙালিনী।
দুই গণ্ড দিয়া বহে অশ্রু ধারা,
বদনে না সরে বাণী॥
বিস্মিত নরেন্দ্র, না পারে বুঝিতে
কি বেদনা প্রাণে তার।
ভাবে মোরে হেরি, কেন অভাগিনী
ফেলে এত অশ্রুধার॥
ডাকি নিজ জনে কহিলা নরেন্দ্র,
"কেবা আছ, হোথা যাও।
কে ওই রমণী এস জিজ্ঞাসিয়া,
ভিক্ষা যদি চাহে, দাও॥"
দুখিনীর কাণে পশিল সে কথা,
না পারি সহিতে আর।
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল অভাগী
দ্বার দেশে শবাকার॥
ত্রস্ত ব্যস্ত হ'য়ে ছুটিলা নরেন্দ্র,
বাঁচাইতে রমণীরে।
দেখে অভাগীর স্পন্দ নাই বুকে,
শ্বাস মাত্র বহে ধীরে॥
হেরি ক্ষণ কাল চমকি নরেন্দ্র,
রমণীরে তুলে কোলে।
পরশি সে তনু কণ্টকিত দেহ
অভাগিনী আঁখি মিলে॥

মুহূর্ত্তেক তরে চাহি মুখ পানে কণ্ঠ হ'তে তার পড়িল খসিয়া
নয়ন মুদিলা বালা। বিশুষ্ক বকুল-মালা॥

২৯এ মার্চ্চ, ১৮৯৫। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু। বৈদ্যনাথ।

জ্যোতিষের পারিভাষিক শব্দ।

১। গত জানুআরি মাসের "দাসী"তে "লাভেরিয়ে" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ উপভোগ করিলাম। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে পুস্তকের অত্যন্ত অপ্রতুল; ইহার কারণ বোধ হয়, আমাদের সমাজে বিজ্ঞান অনুরাগী লোকের সংখ্যা কম এবং লেখকও কম। যদিও কৃতবিদ্য যুবক-দিগের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দের অভাব প্রযুক্ত এবম্বিধ প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্তি ও শক্তি সত্ত্বেও পরাঙ্মুখ হন।

লাভেরিয়ে প্রবন্ধটি অতি সুন্দর ও সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে। জ্যোতিষ, গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ক এরূপ প্রস্তাব লিখিত হইলে, পাঠক-সাধারণের পক্ষে, পরম উপকার দর্শে, এবং বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন হয়। প্রবন্ধের অন্তর্গত কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি।

২। অর্থানুবাদ (Translation) এবং বর্ণানুবাদ (Transliteration), ভাষান্তর করিবার এই দুই মাত্র উপায়; কিন্তু ইউরোপীয় ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় আনিতে হইলে অনেক স্থলে স্বরানুবাদ (Transphonation) অবলম্বন করিতে হয়; ইংরাজীতে "Transphonation" বলিয়া কোন কথা আছে কিনা, বা হইতে পারে কিনা, বলিতে পারি না। Le Verrier কথাটি ফরাশী ব্যক্তিবিশেষের নাম; ফরাশী ভাষায় শব্দের অন্তস্থিত অনেক ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ হয় না। অতএব উক্ত ফরাশি কথাটি আমাদের ভাষায় লিখিতে হইলে, অন্তেস্থিত r (র)এর উচ্চারণ ছাড়িয়া এবং স্বরানুবাদের রীত্যনুসারে vকে অন্তঃস্থ ব করিয়া লে বেরিয়ে করিতে হয়; কিন্তু আমাদের ওষ্ঠ্য ও অন্তঃস্থ ব এর আকার ও উচ্চারণের ভেদ নাই; সুতরাং v ও b এক ব দ্বারা ব্যক্তিত হয়; এই কারণ বশতঃ অনেকেই vকে ভ=bh করেন। অতএব ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অনুসারে অন্তঃস্থ ব এর পেটে কএটি শূন্য দিয়া কিম্বা পেট কাটিয়া (ৰ) ওষ্ঠ্য ব হইতে প্রভেদ করিলে ভাল

হয় ; নচেৎ বিক্‌টোরিয়া, বর্জিনিয়া, বিক্‌টর, বা ভিক্‌টোরিয়া, ভর্জিনিয়া, ভিক্‌টর ইত্যাদি শব্দ শুনিতে ভাল লাগে না। এখন আর ব এর পেট কাটিয়া র করিবার রীতি নাই ; অতএব এখন ব এর পেট কাটিলে আর র বলিয়া ভুল হইতে পারিবে না।

৩। "সৌরমণ্ডলের আলোচনার প্রবেশ দ্বারেই আমরা দেখিতে পাই, একটি প্রকাণ্ড দীপ্তিমান জ্যোতিষ্ক কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া অপর কতকগুলির স্থিতিগতি নির্দ্ধারণ করিতেছে।" এই বাক্যটিতে সৌরমণ্ডল কথাটি যে solar system এর স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ("আলোচনার প্রবেশ দ্বার" threshold of enquiry, এ কথায় এখন আমার দরকার নাই)। কিন্তু সৌরমণ্ডল বলিলে আমরা রবিবিম্ব-ভিন্ন আর কিছু কি বুঝি ? Solar system বলিলে রবিচন্দ্র পঞ্চ বা সপ্ত তারাগ্রহ এবং ধূমকেতু প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান যে জ্যোতিষ্কগণ দেখিতে পাই, তাহাই বুঝিয়া থাকি এবং বহুবর্ষাবধি বহু পুস্তকে solar systemএর স্থানে সৌরজগৎ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে সৌরমণ্ডল ব্যবহার করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। সৌরমণ্ডল, ভূমণ্ডল, মুখমণ্ডল বলিলে যথাক্রমে রবিবিম্ব, ভূগোল এবং মুখ মাত্রেই বুঝায়। সৌরমণ্ডল বলিলে সজ্যোতিষ্কগণ সূর্য্য বুঝায় না ; অতএব solar system এর স্থলে সৌরজগৎ ব্যবহার করা শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয়। "এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশি জগৎপতে" এই মন্ত্রে সূর্য্য জগৎপতি দেখিতেছি, অতএব যে জগতের পতি সূর্য্য, সেই সৌরজগৎ solar system।

৪। ইংরাজী force কথার স্থানে বাঙ্গালা শক্তি দেখিতেছি, কিন্তু force এর স্থানে "বল" কথা অনেকে অনেক দিন অবধি ব্যবহার করিতেছেন, এখন কি বলে "বল"কে বেদখল করিয়া স্বত্ব-হীন শক্তিকে বলের স্বত্বে স্বত্ববতী করিবেন ? অতএব force এর বাঙ্গালা "বল" থাকিলে ক্ষতি কি ? বল আর শক্তিতে ভেদ নাই বটে, তথাপি পারিভাষিকত্ব রক্ষার জন্য এক শব্দ এক অর্থেই ব্যবহার্য্য।

৫। Planetary perturbationএর বা disturbanceএর তরজমা ভ্রষ্টতা করিয়াছেন, কিন্তু ভ্রষ্টতা শব্দে কি perturbationএর ভাব আসে ভ্রষ্টের ভাব ভ্রষ্টতা ; ভ্রষ্ট শব্দ ভ্রন্‌স (পতন fall) ধাতু নিষ্পন্ন। এতদ্দ্বারা প্রায় কেবল অধঃপতনই বুঝায়। কিন্তু perturbation তো কেবল অধঃ-

পতন নয়। perturbation স্থানচ্যুতি অর্থাৎ মন্দ বা শীঘ্র ফল দ্বারায় গ্রহের গণিতাগত স্থান এবং বেধলব্ধ স্থান এতদুভয়ের যে অন্তর তাহাই perturbation। perturbation জনিত বেধলব্ধ গ্রহ, গণিতাগত গ্রহের অগ্রে বা পশ্চাৎ, ঊর্দ্ধে বা অধঃ, দক্ষিণে বা বামে, যে কোন দিকে থাকিতে পারে। তবেই ভ্রষ্টতা দ্বারা এরূপ অবস্থানের ভাব আসে না; অতএব সবিনয়ে নিবেদন যে বিক্ষোভ কথাটী খাটে কি না একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। বিক্ষোভ বি+ক্ষুভ্ অর্থ চঞ্চলনে to agitate। বিক্ষোভ perturbation, বিক্ষুভিত perturbed, বিক্ষোভক perturber বা perturbing.

৬। সূর্য্য, চন্দ্র এবং গ্রহগণ আমাদের উপাস্য দেবতা। সূর্য্য বা কোন গ্রহ বাক্য মধ্যে থাকিলে মর্য্যদাব্যঞ্জক বিভক্তি ব্যবহার কি কর্ত্তব্য নহে? "অর্থাৎ যদি সূর্য্যই একমাত্র নিয়ন্তা হইত" না বলিয়া "হইতেন" বলিলে ভাল হয় না? তত্বতঃ যদি সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা না হন, কেবল জড়পিণ্ড মাত্র, তাহা হইলেও মর্য্যাদাব্যঞ্জক বিভক্তি ব্যবহার করায় কি কোন দোষ দৃষ্ট হয়? ইংরাজী ব্যাকরণে অপ্রাণিবাচক শব্দমাত্রেই ক্লীবলিঙ্গ; তথাপি সূর্য্যের বেলা প্রায়ই he এবং চন্দ্রের বেলা she ব্যবহৃত হয়, অথচ সূর্য্য পুরুষ নন, চন্দ্রও স্ত্রী নন। তাই বলি রবি-চন্দ্রকে দেবতা বলিয়া মানুন আর না মানুন, তাঁহাদের প্রসঙ্গে কথা কহিবার সময় একটু ভক্তিভাব দেখাইলে দোষ কি? এ পরিচ্ছেদে পারিভাষিক শব্দ নাই, অতএব ইহা আমার প্রতিজ্ঞাত আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত বলিয়া ব্যামৃষ্ট হইতে পারে।

৭। Uranusকে ইন্দ্র বলা হইয়াছে; সুদণ্ড নামধেয়; ইউরোপীয়েরাও এই অর্থে ইউরেনস নাম রাখিয়াছেন। কিন্তু এই নব আবিষ্কৃত গ্রহের নাম লইয়া ইউরোপে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। ইনি নানা সময়ে নানা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইঁহাকে (foot noteএ) টিপ্পনীতে চুপি চুপি ইন্দ্র বলিয়া যাওয়া কি উচিত হইয়াছে? এখন যে নাম রাখিবেন, তাহাই রহিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতএব একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া নাম রাখিলেই ভাল হয়; নচেৎ এখনকার ছেলে মেয়েদের মত গিরীন্দ্রকুমার সতীন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্র প্রসাদ, প্রিয়তোষ, নিভাননা প্রভৃতি নিরর্থক নামধেয় হইবার আশঙ্কা থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া মথুরা হইতে নন্দালয়ে আনীত হইলে নন্দ, যশোদা, গোপ এবং গোপাঙ্গনারা

ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নাম থুইয়াছিলেন।

"নন্দ থুইল নাম শ্রীনন্দের নন্দন। যশোদা থুইল নাম যাদু বাছাধন॥
কেলেসোনানাম থুইল রাধা বিনোদিনী। ননীচোরা নাম থুইল যতেক গোপিনী॥"

তেমনি সর উইলিয়ম হরশেল কর্ত্তৃক এই নবীন ব্যোমচর মর্ত্ত্যলোকে পরিচিত হইলে ইউরোপে নন্দোৎসব সদৃশ হরশেলোৎসব হইল। আবিষ্কর্ত্তার মর্য্যাদার্থে তদীয় নামানুসারে কতিপয় বর্ষ পর্য্যন্ত গ্রহটি হরশেল নামে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তজ্জন্য উহা অদ্যাপি Herschelএর নামের আদি বর্ণসহ একটি ক্ষুদ্র মণ্ডলরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত হয়। হরশেল স্বয়ং তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বর জর্জের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য গ্রহটিকে জর্জ বলিয়া ডাকিতেন। পরে প্রস্তাব হইল যে,ইহার নাম ধর্ম্ম থাকুক; কারণ নরলোকে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, এখানে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইতে পারে না; অতএব ধর্ম্মদেবতা Asteræa এই নব আবিষ্কৃত গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী হউন। একজন বলিলেন, ইহার নাম Cybele অর্থাৎ দেবমাতা অদিতি থাকা উচিত। কারণ ইউরোপীয়দের মতে দেবতাদিগের আদিপুরুষ শনি ও বৃহস্পতি ত্রিদশালয়ে বহুকালাবধি আধিপত্য করিতেছেন, অথচ দেবপ্রসূতি অদিতির লোক দেখা যায় না; অতএব এই সুযোগে তাঁহাকে এই নবপ্রকাশিত গ্রহের অধিষ্ঠাতৃত্ব পদে নিযুক্ত করা যাউক। জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ প্রক্টর (Proctor) বলিলেন যে গ্রীকদিগের মতে সুরজননীর অন্যতর নাম যে হ্রিয়া তাহা দিলেই ভাল হইত, কারণ হ্রিয়া আর রাহু স্বরতঃ আর অর্থতঃ এক। প্রক্টর জানিতেন, ব্রহ্মদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা রাহু নামে যে এক গ্রহ আছে বলে, তাহা এই ইউরেনস; হরশেল তাহার পুনরাবিষ্কারমাত্র করিয়াছিলেন। রাহু যে কোন বিগ্রহবিশিষ্ট গ্রহ নহে, তাহা পাঠকের অবিদিত নাই। রাহু কেতু ক্রান্তিবৃত্তে চান্দ্রকক্ষার পাতদ্বয় (ascending এবং descending nodes) মাত্র। প্রক্টর অস্মদ্দেশীয় জ্যোতিষে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত এরূপ অসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন। উক্ত কয়েকটি নামের মধ্যে বিশিষ্ট কারণ বশতঃ কোনটি কাহারও মনে লাগিল না। প্রসপেরিণ বলিলেন, ইহার নাম বরুণ (নেপতুন) হইলে ঠিক হইত, কারণ বরুণ শনির কনিষ্ঠ পুত্র আর বৃহস্পতি তাহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র; পুত্রদ্বয় পিতার পার্শ্বে ঊর্দ্ধ অধোভাগে থাকিলেই বেশ দেখায়, সর্ব্বাঙ্গ-

সুন্দর হয়। অবশেষে মিষ্টার বোডের প্রস্তাব অনুসারে উক্ত গ্রহের নাম Uranus রহিল। প্রাচীন ইউরোপীয় মতে ইউরেনস্ দেব-পিতামহ। বৃহস্পতির পিতা শনি, বৃহস্পতি অপেক্ষা ঊর্দ্ধ আকাশে বৃহত্তর কক্ষায় ভ্রমণ করেন; এখন বৃহস্পতির পিতামহ শনির পিতা ঊর্দ্ধতম আকাশে বৃহত্তম কক্ষায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তদানীন্তন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের বিশ্বাস ছিল, ইউরেনসের ঊর্দ্ধদেশে আর গ্রহ নাই, কিন্তু ৬৫ বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে অর্থাৎ ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ইউরেনসের কক্ষার ঊর্দ্ধতর আকাশে আর একটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইল। ইঁহার নাম নেপ্‌তুন রহিল।

এখন দেখুন ইউরেনস শব্দটি যথারীতি বর্ণানুবাদ করিলে বরুণ হয়। অর্থানুবাদ করিলে ইন্দ্র হয়। স্বর সাদৃশ্যের অনুরোধে অর্থ বিস্মৃষ্ট হইতে পারে না, কিন্তু বরুণত্বে ও ইন্দ্রত্বে কি সবিশেষ ভেদ দৃষ্ট হয়? বরুণ "কশ্যপস্য অদিতিনাম্না পত্ন্যাং জাতঃ"। ইনি "পুষ্করাদ্যৈর্গণৈঃ সর্ব্বৈ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ"। বৃষ্টির জন্য ইঁহার জপনীয় মন্ত্র, "পুষ্করাবর্ত্তকৈ মেঘৈঃ প্লাবয়ন্তং বসুন্ধরাং। বিদ্যুদ্‌গর্জ্জিত সন্নদ্ধং তোয়াত্মনং নমাম্যহং॥ যস্য কেশে জীমূতা নদ্য সর্ব্বাঙ্গ সন্ধিষু। কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চতারঃ তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ॥" বরুণ মন্ত্র "ওঁ বৃষ্টিরিহানাব্যন্তরয়ো মরুতাস্পৃশতীং গচ্ছবশাপগ্নিদৃত্বা দিবং গচ্ছতং তেনো বৃষ্টিমাবহ।"

এই তো গেল বরুণের পরিচয়। ইন্দ্র কে? ইনিও অদিতির পুত্র, বরুণের সহোদর। ইনিও দিক্‌পাল,—পূর্ব্বদিকের অধিপতি। বরুণের ন্যায় ইঁহারও মেঘের উপর আধিপত্য দেখা যায়। ইন্দ্রের অপর এক নাম মেঘ-বাহন। ইনি পর্য্যন্য বা পর্জ্জন্য="শব্দায়মান মেঘঃ বা অগর্জ্জন্নপি মেঘঃ"। বৈদিক ভারতে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিদেব। মিত্র বরুণ অর্য্যমা প্রভৃতি যেমন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত, ইন্দ্রও তাহাই। যখন ভারতে পুরাণের আবির্ভাব হয় * * * তখন ইন্দ্রের শক্তি বিস্তর খর্ব্ব হইয়াছিল এবং এই সময়েই বরুণকে নভ্য আধিপত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্‌পতিত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তবেই ইউরেনস বৈদিক বরুণ হইলেন।

আমি অভিভাবক স্বরূপে সাহিত্য আদালতে এই দরখাস্ত করি যে, নেপ্‌তুন যখন ত্রিদশালয়ের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে অধিষ্ঠিত, তখন অর্থতঃ তিনি যে হউন সে হউন, আমরা "দখলিকারের দখল সাব্যস্ত থাকুক" এই আইন

অনুসারে তাঁহাকে ইন্দ্রত্ব পদে অভিষেক করিতে পারি। নেপ্‌তুন বিলাতি জলাধিপতি বলিয়া আমরা কেন তাঁহাকে বরুণ বলিব? যখন দেবলোকে তাঁহার উচ্চতম আসন দেখিতেছি, তখন তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিব। হরশেলের আবিষ্কারের পর আর নূতন গ্রহ বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই, এই বিশ্রম্ভবিমূঢ় হইয়া তদানীন্তন জ্যোতির্ব্বিদেরা হরশেলের ইউরেনস্ নাম রাখিয়াছিলেন। যখন নেপতুন বাহির হইল, তখন ইউরেনস প্রাপ্তব্যবহার হওয়ায় জ্যোতিষ জগতে তাঁহার নাম জারি হইয়াছে, কাজেই নাম বদলাইবার আর অবকাশ হইল না। আর বদলই বা কতবার হইবে? সুতরাং ইন্দ্রের উপর বরুণকে বসাইতে হইল। আমরা যখন ৬ চাঁদের স্থানে ৬০০ চাঁদের খোকার নামকরণ করিতেছি, তখন আর গুণানুরূপ সার্থক নাম ভিন্ন উপনাম দিবার আবশ্যক কি? আর এক কথা। বিলাতি বরুণকে আমরা বরুণ বলিব কি বিলাতি ইন্দ্রকে আমরা ইন্দ্র বলিব, তাহার কোন নজীর দেখি না। তাহা হইলে সুরসুন্দরী কামপ্রসবিনী ৰিনস কেমন করিয়া অসুরগুরু শুক্র হইবেন? এবং শনিতনয় যুপিতর (দেবপিতৃ) কেমন করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতি হইবেন? এ সকল কারণ বশতঃ ইউরেনস্‌কে বরুণ ও নেপতুনকে ইন্দ্র বলা সঙ্গত বোধ হয়।

৮। Observationএর অর্থ ঠিক পর্য্যবেক্ষণ বটে, কিন্তু প্রাচীন সিদ্ধান্তীরা উক্ত অর্থে "বেধ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। লক্ষ্য যেমন শর দ্বারা ভেত্তব্য; তেমনই গ্রহবিম্ব নলিকাদি যন্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হয় তাঁহারা এরূপ কল্পনা করেন, তজ্জন্য দর্শন স্থলে বেধ ব্যবহার করেন। যথা,—

"গ্রহাঃ সূর্য্যাদয়োঃ যথা যেন প্রকারেণ দৃক্‌তুল্যতাং বেধিত গ্রহসমতাং
গচ্ছন্তি তৎ তাদৃশং স্ফুটীকরণং স্পষ্টক্রিয়া গণিত প্রকারা প্রবক্ষ্যামি।"
সূঃ সি. ২।১৪। রঙ্গনাথ টী.।

"অত্র সমায়াং ভূমৌ স্থিতো গণকেন বেধঃ কর্ত্তব্যঃ।"
সি. শি. ১১।৪১। টী.।

"কেন্দ্রার্ধষষ্টি বেধাদকেন্দ্বোরন্তরাংশকার্কাংশঃ।
স্ফুট নষ্ট তিথিজ্ঞেয়া তস্মাৎ কার্য্যা তথা চাপ্তাঃ॥"
পঞ্চ. সি. বরাহমিহির ১৪।১২।

অহগণাৎ সাধিতো যো গ্রহঃ স মধ্যমঃ যতো যত্র বেধেনাকাশে বিলোক্যমানে তাবান্ গ্রহো দৃষ্টঃ কিঞ্চিদন্তরং দৃষ্টং প্রত্যহং গতে র্বিসদৃশত্বাৎ। এবং প্রত্যহং গ্রহান্ গোলেন চক্রযন্ত্রেণ বা বিদ্ধা অহর্গনোৎপন্ন মধ্যম গ্রহ বেধিত স্পষ্ট গ্রহয়ো অন্তরাণি সাধিতানি।"
গ্রহলাঘব ২।১ টী.। গণেশ দৈবজ্ঞ।

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সুখের নদী

এখানে বয় নির্ঝরিণী
মধুর গেয়ে নিরবধি,
মেঘের মেয়ে, নীলবসনা,
আপন মনে, সুখের নদী ;
—গেয়ে কত আনন্দ গান
নেচে নেচে যায় সে চলে ;
চুল গুলিতে, কপোলে তার
সোনার কিরণ পড়ে ঢলে'।

সাঁঝের রবি কিরণ মাখা
দিনের কার্য্য করে' শেষ,
যায় সে সোনার মেঘে চড়ি'
সাগর পারে আপন দেশ।
উঠে তারা নীল আকাশে,
কোমলতার রাজ্য গড়ে ;
পদতলে, মুখে হাসি,
জগৎ—শোভায় ঢলে পড়ে ;—
জগৎ—কনক রূপে ভরা ;
আকাশ—সুখে উজল প্রাণ ;
নদীর উপর যায় ভেসে এই—
প্রেমের, হাসির, আলোর গান।—

"হাঁ রে তোরা কাঁদিস কেন ?
থাকিস্ বিরস সদাই রুষি'—?
সকলেরই জন্যে এ সুখ,
ধনী, গরিব—নে' যার খুসি ;
আশাময় এ সুখের জগৎ,
রূপের, ভালবাসার ধরা ;
এ নহে ত কাঁটার বন, —এ
শোভার বাগান, গোলাপ ভরা।"

ভাসায়ে আয় প্রেমের তরি—
ধরবে সকল ভগ্নী ভাই ;
হাসির দাঁড়ে, উজল সন্ধ্যায়,
গানের দেশে ভেসে যাই ;
ডুবায়ে দে' দুঃখ জ্বালা
আজ এ শান্ত সন্ধ্যা বেলা ;
ধনের, যশের ঝগড়া বিবাদ—
ভুলে যা'—সব ছেলে খেলা ;
ভবিষ্যতের ভূতে প্রেতে
আনিস না ক হেথায় ডেকে' ;
পাস্‌নে ভয় রে সুখী হ'তে
নিজের সুখের ছায়া দেখে ;
আকাশেতে নাইক আঁধার,
বজ্র ঝড় ত নাইক সেথা ;
আকাশে ও স্বর্ণরাজ্য,
ঝর্ঝরিছে নদী হেথা।
মলয় চুমে কুসুম ; আসে
স্বর্গের হাসি ধরায় নেমে ;
সোনার আকাশ, সোনার জগৎ,—
পূর্ণ রূপে, পূর্ণ প্রেমে।

আয়
দূরে রাখি ঘৃণায়, ক্রোধে,
প্রাণের প্রাণের পাওনা দেনা ;
এ সুখ ও এ স্বপ্ন কেহ
হেথায় এসে শুধাবে না।

এ নদী, এ সুখের নদী,
লহরী তার মধুর হাসি ;
ভাবেনা সে ভবিষ্যতে,
জানে না সে দুঃখরাশি ;
জানে না সে হতাশা, কি
দুঃখের জ্বালা, প্রাণের ব্যথা ;
ভাবে বর্ত্তমানের সুখ সে—
স্বপ্ন, শান্তি, গানের কথা ;
আননে তা'র প্রসন্নতা
মৃদু সান্ধ্য রবির কর ;
তরঙ্গে তার প্রাণের নৃত্য ;
ঝর্ঝরে তার গীতের স্বর !

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

কন্যাদায়।

রামধন বাবু সামান্য গৃহস্থ। আজ কাল যে বাজার, তাহাতে কত শত বি-এ, এম্-এই জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ, তায় রামধন বাবুত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া স্পর্শ করেন নাই। বাল্যকালে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। নয়টা বাজিবার পূর্ব্বেই পিতার রক্ত জল করিয়া সমাহৃত অন্ন ধ্বংস করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন। মধ্যাহ্নে দু পয়সার জলখাবারও খাইতেন, ৪টার পর বাটীও ফিরিয়া আসিতেন, কিন্তু পড়াশুনা কতদূর হইত, তাহা ঠিক জানা যাইত না। ইতিপূর্ব্বেই রামধন বাবুর পিতা পিতৃকার্য্য করিয়া দিয়াছেন। ছেলেকে লেখা পড়া শেখান ততটা আবশ্যক কিনা জানিনা, বিবাহটা দেওয়া অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য—"পিণ্ড লোপ হয়! কি কথা!!" ক্রমে পিতৃদেবের পিণ্ডের প্রত্যাশাও হইল, কিন্তু পুত্র না হইয়া একটী কন্যা হইল। তাহার তিন বৎসর পরে পিতৃদেবের আশাও ফলবতী হইল। পৌত্র মহাশয় ক্রমে দিগম্বর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধূলিধূসরিত কলেবরে রাজপথ সুশোভিত করিতে লাগিলেন। রামধন আর বাবাজীবনের "বার্ডস্ আই" ক্রয় করিবার পয়সা যোগাইয়া উঠিতে পারেন না। আজ গুণধর পুত্র ঘোষেদের ননীর লাঠিম কাড়িয়া লইয়াছে,কাল বোসেদের শ্যামের ঘুড়ি ছিঁড়িয়া দিয়াছে,—নানা প্রকার আর্জ্জি দাখিল হইতে লাগিল। সে সকলের খেসারতও রামধনকে দিতে হইতে লাগিল। শিষ্টস্বভাব পুত্ররত্ন প্রাণান্তেও অত্যাচারের কথা স্বীকার করেন না, প্রত্যর্পণ দূরের কথা। মধ্যে মধ্যে "বক" "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ" প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গীসহ অমৃতায়মান বালকণ্ঠবিনিঃসৃত বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্রবণবিবর পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বেই পিতৃদেব পৌত্রমুখ দর্শন করিয়া পিণ্ডলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া পিণ্ড-প্রত্যাশায় অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। অগত্যা রামধনের চাকরী না করিলে আর দক্ষিণ হস্ত চালান সুকঠিন হইয়া উঠিল। যাহা যৎকিঞ্চিৎ পৈতৃক সঞ্চিত অর্থ ছিল, পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডপ্রদাতা শ্রীমান্ বংশধর বাবাজীবনের আমোদ প্রমোদে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। বহুকষ্টে ২।১টা প্রতিবাসীর মোকদ্দমা জুটাইয়া Purloin চাটুর্য্যে কোং-র উকীলের

আফিসে ৩০৲ ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরী হইল। চাকরী হইল, পৈতৃক ঢিলে পায়জামা, ও চাপকান বাহির হইল, ৯টার পূর্ব্বে ভাতের জন্য গৃহিণীর রাত্রে নিদ্রা বন্ধ হইল। মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, কিন্তু মাহিয়ানার টাকা কৈ? উকীল-বাটী নাকি মাসে মাসে কেরাণীরা বেতন পায় না। এদিকে ধোপার পয়সা, ট্রামের পয়সার জন্য বিব্রত হইতে হইল। রামধন বাবুর সৌভাগ্য, ছেলের লেখা পড়ার খরচ নাই; বংশধর স্কুলে যান না। সে বড় কম খরচা নয়, বৃষোৎসর্গ ব্যাপার। বৎসর বৎসর নূতন ধরণের কেতাব; অঙ্কের কেতাবও বৎসর বৎসর, কোন বৎসরে বা দুই দফা নূতন নূতন চাই। তার পর পাখার পয়সা, জলের পয়সা, প্রশ্ন ছাপানর পয়সা ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম ব্যয়। ভগবানের কৃপায় এবং শ্রীমান্ বংশধরের কল্যাণে সে সকল কোন কষ্টই কোন উৎপীড়নই রামধন বাবুকে সহ্য করিতে হইল না। কিন্তু বার্ডস্ আই, কামিজের হাতার ষ্ট্রাপ, হাফ্ মোজার টানা ইত্যাদির খরচা প্রায় স্কুলের খরচার সমান হইতে লাগিল। অগত্যা, রামধন বাবু ঠিকা কাজ লইয়া সমস্ত রাত্রি লিখিয়া মধ্যে মধ্যে দুই চারি টাকা উপার্জ্জন করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্য পূর্ব্বোক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সুখে দুঃখে অনশনে অর্দ্ধাশনে, কোনরূপে দিন কাটিতেছিল, কিন্তু আবার এক নূতন দায় উপস্থিত। কন্যাটীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইতে যায়। রামধন বাবুর পিতা সংকল্প করিয়াছিলেন পৌত্রীকে অষ্টম বর্ষে পাত্রসাৎকরণ জনিত গৌরীদানের ফল লাভ করিয়া বংশে অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু কালের কুটিল গতি হঠাৎ দেহের নশ্বরতা প্রতিপাদিত করিয়া তাঁহার সে সাধে বাদ সাধিয়াছে। রামধন বাবু নানা স্থানে পাত্র অপাত্র চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যেখানে যান, পাত্র লেখা পড়ায় ধনুর্দ্ধর হউক আর নাই হউক, বিষয় আশয় থাকুক আর নাই থাকুক, এত বেশী খাঁই করিয়া উঠে যে রামধন বাবু তত টাকা কখন একত্রে দেখেন নাই অথবা কন্যার বিবাহে এত টাকা যে ব্যয় হয়, তাহাও তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জাতিপাতের ভয়ে, আত্মীয়বর্গের তাড়নায়, গৃহিণীর গঞ্জনায়, সমাজের শাসনে, মুন্সীগঞ্জের হীরালাল দত্ত মহাশয়ের পুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। পাত্রটী রূপে শৈলসুতাসুতের ন্যায়। সকলেই রূপের কথা উঠিলে শৈলসুতাসুতের সহিত উপমা দেয়। আমরাও চির প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম

না। তবে রামধন বাবুর ভাবী জামাতা, রামধন বাবুর পিতৃদেবের সংকল্পিত গৌরীদানের গৌরীর গৌর কনিষ্ঠ না হইয়া জ্যেষ্ঠ শৈলসুতাসুত সদৃশ;—আর কোন অঙ্গে তাদৃশ সৌসাদৃশ্য থাকুক আর নাই থাকুক উদর দেশটীতে সম্পূর্ণ আছে। অলঙ্কার শাস্ত্রে বলে যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়, বস্তুতঃ তাহা গুণে কিছু ন্যূন হয়। কিন্তু আমাদের এ উপমায় অলঙ্কার শাস্ত্র পরাস্ত। যেহেতু জামাতার উদর শৈলসুতাসুত অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। বাবাজীবনের প্লীহা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে চিৎ হইয়া শয়ন করিতেও কষ্ট হয়। সর্ব্বাঙ্গের মাংসগুলি বোধ হয় একত্রিত হইয়া উদরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিদ্যার কথা আর কি বলিব ? মাতৃভাষায় নাম লিখিতেও লজ্জা বোধ করেন ,বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া বি এ, এম্ এ, উপাধি ত আজকাল হাড়ী, মুচি পাইতেছে ; সুতরাং এরূপ জঘন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অপমানের কথা। বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসর ৫ মাস। বাবাজীর এটী তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম দুইটী সংস্করণই নিজ ভাগ্যবলে বিবাহের অব্যবহিত পরেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রামধন বাবুর কন্যার বড়ই জোর কপাল, তাই এহেন পাত্রের যোগাযোগ ঘটিয়া উঠিয়াছে।

দেনা পাওনা স্থির, বিবাহের দিন স্থির, সমস্তই স্থির। কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডন করে কার সাধ্য ? শুভ গাত্রহরিদ্রার পূর্ব্ব রাত্রে হীরালাল বাবুর পুত্রের জ্বর হইল। জ্বর পূর্ব্ব হইতেই একটু একটু হইত কিন্তু তাহাতে স্নানাহার সহ্য হইত। বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে স্নানাহার সহ্য হওয়ার কথাটা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়। উত্থানশক্তি রহিত বা চৈতন্য রহিত না হইলে আর তাঁহাদের মতে স্নানাহার অসহ্য হয় না। হীরালাল বাবুর পুত্রের সেই স্নানাহারসহিষ্ণু জ্বর হইল। অগত্যা গাত্র হরিদ্রা বন্ধ হইল, এত ধূমধাম, এত আয়োজন আপাততঃ বন্ধ হইল। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নকালে রামধন বাবুর ভাবী জামাতা পিতামাতার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ভাবিনী প্রণয়িনীর আশা ভরসা অতলজলে ভাসাইয়া লীলা সম্বরণ করিলেন। হীরালাল বাবুর বংশ লোপ হইল, পিণ্ড লোপ হইল। পিণ্ডের সম্ভাবনা কস্মিন্ কালেই ছিল না। তবে হীরালাল বাবুর মনে আশা ছিল বটে ; সে আশাটুকুও গেল।

এদিকে রামধন বাবুর মাথায়ও আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বহুকষ্টে সন্ধান করিয়া কন্যার বিবাহের পাত্র স্থির করিলেন, অদৃষ্ট দোষে বা

গুণে তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। আবার গণ্ডূষ করিতে হইল। আবার স্থানে স্থানে চেষ্টা হইতে লাগিল, কিন্তু সেই কথা।—রূপার ঘড়াসুটে বাসন, চুড়িসুট ডায়মনকাটা সোণার গহনা ইত্যাদি ইত্যাদি। রামধন বাবু উপায়ান্তর না দেখিয়া হাটখোলার রামসেবক মিত্রের পুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। রামসেবক বাবু চাকরি বাকরি করেন না, আবশ্যকও নাই। পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট। দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ সমস্তই করিয়া থাকেন। পুত্রটীও রত্ন বিশেষ। কলিকাতার কোন বিখ্যাত কালেজে বি এ, পড়েন; সুবোধ, শিষ্ট, সচ্চরিত্র, সুরূপ, সকলই "সু", এই "সু"ই "কু"র কারণ হইয়া উঠিয়াছে। রামসেবক বাবুর গৃহিণী রূপার ঘড়া না পাইলে কন্যাকে দুধে আল্‌তার পাথরে দাঁড়াইতে দিবেন না। অগত্যা রামধন বাবু সম্মত হইলেন। রামসেবক বর্ত্তমান প্রথা মতে নগদ টাকা লইতে একেবারেই নারাজ। পাঁটা পাঁটি বিক্রয়ের মত টাকা লওয়া কি? তবে ফুলশয্যা দিতে হইলে বৈবাহিক মহাশয়ের বিস্তর ব্যয় হইবে। রামধন বাবু ছা-পোষা, বিশেষ কুটুম্ব হইতে চলিলেন, তাঁহার স্বাশ্রয় করাও কর্ত্তব্য। আর এপক্ষেও ফুল শয্যার তত্ত্ব লইয়া যে সকল লোক আসিবে, তাহাদের বিদায় এবং ভোজনা-দিতে তাঁহারও বিস্তর ব্যয় হইবে। অথচ জিনিষ গুলি ত আর সম্ভ্রমের দায়ে বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবেন না—হতভাগা প্রতিবাসিবর্গকে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। এরূপ কার্য্যে কোন পক্ষেই লাভ নাই। অতএব ও সম্বন্ধে নগদ ৪০০৲ দেওয়াই স্থির হইল। সে টাকা ফুলশয্যার দিনে দিতে হইবে। রামসেবক বাবু পূর্ব্বে লইবেন না। তাহা হইলে যে শুক্রবিক্রয়ী হইয়া ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে? আহা কি ধার্ম্মিক! এরূপ ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ২।১টা লোক আছে বলিয়াই এঘোর কলিযুগে আজিও সোমবারের পর মঙ্গলবার হইতেছে, বৈশাখ মাসের পর জ্যৈষ্ঠ মাস আসিতেছে, সূর্য্যের পর চন্দ্র উঠিতেছে।

যাহা হউক বিবাহের দিন স্থির হইল। ক্রমে দিন আসিল, বরপাত্র সভায় বসিলেন। ৩।৪ শত বরযাত্রও আসিয়াছেন। ক্রমে সম্প্রদানের সময় উপস্থিত হইল। রামধন বাবু গরদের জোড় পরিয়া সভাস্থ ব্রাহ্মণবর্গের অনুমতি লইয়া কন্যা পাত্রস্থ করিলেন। বরকন্যা অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বরযাত্রবর্গ আহারের জন্য ব্যস্ত। এমন সময় রামধন বাবু

সভা মধ্যে গললগ্নীকৃতবাসে দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিলেন,—"মহোদয়গণ, আমার একটা দুঃখের কথা শুনুন। আমি অতি দরিদ্র। দুবেলা আহার হয় না, অতি কষ্টে দিন পাত করি, তাহার উপর কন্যাদায়। হাতে পায়ে ধরিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু কাহারও দয়া হইল না। বুঝিলাম এসংসার গরিবের নহে। এদিকে জাতিপাত হয়। অগত্যা রামসেবক বাবুর পুত্রের সহিত বিবাহের স্থির করিলাম। এই যে রূপার ঘড়া গাড়ু দেখিতেছেন, এগুলি ভাড়া করা। ঐ যে লোকটী দাঁড়াইয়া আছে দেখিতেছেন, এদ্রব্য গুলি উহারই। এখনি এগুলি উঠাইয়া লইয়া যাইবে। খাট বিছানাও তাই। কন্যার গাত্রে যে অলঙ্কার গুলি দেখিলেন, ওগুলি আমার প্রতিবাসিবর্গের। কল্য প্রাতেই যাহার যে গহনা ফিরাইয়া লইবে। ইহাতে রামসেবক বাবু অবশ্য আমার প্রতি একটু অসন্তুষ্ট হইবেন, হয়ত আমার কন্যা আর আমার বাটী পাঠাইবেন না। তাহাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। যেহেতু আমার বাটী থাকিলে ত মাসের অর্দ্ধেক দিন উপবাস করিতে হইবে। তবে আমার একমাত্র দুঃখ ক্ষোভ কষ্ট অপমানের বিষয় এই যে এতগুলি ভদ্রলোক অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটী পদধূলি দিয়াছেন, আর আমি এমনি হতভাগ্য যে ইঁহাদিগকে একটু মিষ্টমুখ করাইতে পারিলাম না। হা আমার অদৃষ্ট! যাহা হউক সমস্ত দিন উপবাসে ও এই বৃহৎ কার্য্যের আয়োজনে আমার শরীর আজ বড়ই ক্লান্ত। এখন অনুমতি হয় ত বাটীর মধ্যে যাই, জল খাইগে।"

রামধন বাবুর কথা শুনিয়া সকলেই নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ! রামসেবক বাবু চৈতন্যহীন!

সুভদ্রা।

সুভদ্রাচরিত্রের ন্যায় মধুর নারী-চরিত্র জগতের ইতিবৃত্তে অতীব দুর্লভ। তিনি মানুষী, মানবের দুহিতা, মানবের পত্নী এবং মানবের জননী; কিন্তু তাঁহার জীবনের একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্য দেখিলেই তাঁহাকে দেবী বলিয়া ভ্রান্তি হয়। তাই অনেক হিন্দু তাঁহাকে দেবী বলিয়া ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার চরিত্র সর্ব্বাংশেই পূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত। নারী-জীবনে যাহা কিছু আবশ্যক, সুভদ্রায় তাহার কোনটীরই অভাব ছিল না। সুভদ্রা চরিত্র সর্ব্বতোভাবে বর্ণনা করা অত্যন্ত আয়াস ও শ্রম সাপেক্ষ

এবং বর্ত্তমানে আমার উদ্দেশ্যও সেরূপ নহে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার কুরুক্ষেত্র ও রৈবতক নামক কাব্যদ্বয়ে এই মধুর চরিত্র অতীব সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। এস্থলে আমি কেবল তাঁহারই উক্ত কাব্যদ্বয়ের অবলম্বনে সুভদ্রার অলৌকিক এবং আদর্শ প্রাণিপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

সুভদ্রা রাজার নন্দিনী, সংসারের সর্ব্বপ্রকার সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যেই তাঁহার জন্ম, এবং তিনি সেই সুখসমৃদ্ধির মধ্যেই লালিতা ও বর্দ্ধিতা। দরিদ্রের অন্নাভাবে হাহাকার, পীড়িতের রোগশয্যার কাতরোক্তি, ব্যথিতের আর্ত্তনাদ, পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকার অশ্রুজল, এ সকলের কিছুই তাঁহার নয়নগোচর হইবার উপায় বা সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জন্মাবধি জগতের চিরোজ্জ্বল ও নিত্যসুখময় চিত্রাবলীর মধ্যে থাকিয়াও অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার হৃদয় যেন করুণার আকর স্বরূপ ছিল। অপরের কোন কষ্ট দেখিলেই তিনি একেবারে দ্রবীভূত হইয়া পড়িতেন; কাহারও চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখিলে তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না; কাহারও কোন প্রকারের দুঃখ দেখিলে তাহা বিমোচন করিবার জন্য তিনি একেবারে অধীরা হইয়া পড়িতেন এবং সে সময়ে তিনি তাঁহার নিজের বসন ভূষণ বা নিজের স্বাস্থ্য ইহার কিছুরই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। কাহারও কোন প্রকারের অভাব দেখিলে তাহা দুরীকরণার্থ তিনি এতদূর ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন যে তৎকালে তিনি গুরুজনবর্গের বিরক্তি বা তিরস্কারের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া নিঃসঙ্কোচে আপনার অঙ্গের অলঙ্কার তাহাকে খুলিয়া দিতেন। পিতামাতা বা অন্য কোন গুরুজন যখন তাঁহার এইরূপ কার্য্য অন্যায় বলিয়া বোধ বা অসন্তোষ-প্রকাশ করিতেন, তখন সেই ভীতা বালিকার স্থির নিশ্চল সাশ্রু বদনমণ্ডল আর সেই রুষ্ট গুরুজনের প্রতি মার্জ্জনা-প্রার্থনাব্যঞ্জক দৃষ্টি যাঁহার নয়নগোচর হইত, তাঁহার হৃদয় এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইত এবং তিনি সেই বদনমণ্ডলে ও সেই দৃষ্টিতে এক অতুল স্বর্গীয় মাধুরী অনুভব করিতেন। ব্যাসাশ্রম দর্শনকালে কৃষ্ণার্জ্জুনের নিকটে ছোট ছোট ঋষিকুমার কুমারী-গণের আধ আধ কথায় তাহাদের সুভদ্রামাতার স্নেহ বর্ণন, এবং তচ্ছ্রবণে ধনঞ্জয় কৌতুহলাক্রান্ত হইলে তাঁহার নিকট বাসুদেব কর্তৃক আপন ভগিনীর

পরিচয় পাঠ করিবামাত্রই সেই করুণার ছবিখানি যেন নয়নপথে আবির্ভূত হয়।

* * একটী বালিকা
বাম করে জড়াইয়া কণ্ঠ অর্জ্জুনের,
বলিল আহ্লাদে—"দেখ, সুভদ্রা জননী
কেমন সুন্দর বস্ত্র, কুণ্ডল, বলয়
দিয়াছেন, আমার যে নাহি মাতা পিতা।"
* * *

অর্জ্জুন। কে সুভদ্রা বাসুদেব ?

কৃষ্ণ। আমার ভগিনী। প্রাণের অধিক
আমি ভাল বাসি তারে। স্নেহ ভরা মুখ
তার, স্নেহে ভরা বুক ; স্নেহ সুধারাশি,
ভদ্রার ঈষৎ হাস্যে পড়ে ছড়াইয়া।
পরিবারে পরিচিতে সর্ব্বত্রে সমান,
পালিত, বনের পশু বিহঙ্গ নিচয়ে,
উদ্যান কুসুমে,—সদা সেই স্নেহামৃত
বরষে আমার ভদ্রা অজস্র ধারায়।
যেই খানে রোগী, শোকী ; ভদ্রা সেই খানে
মূর্ত্তিমতী শান্তি রূপে ; অশ্রু যেই খানে,
সেখানে ভদ্রার কর। যেখানে শুকায়
পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পলতা ; আছে সেই খানে
সলিলরূপিণী ভদ্রা। ডাকিছে যেখানে
অনাহারে পশু, পক্ষী, দরিদ্র ভিক্ষুক ;
সেই খানে অন্নপূর্ণা সুভদ্রা আমার।
* * *
সংসারের স্বার্থ ছায়া, কুটিলতা দাগ,
নাহি পায় স্থান পার্থ তাহার হৃদয়ে—
নির্ম্মল সরল সেই দয়ার সাগরে।
চির উদাসিনী ভদ্রা ; দরিদ্র দেখিলে
খুলে দেবে আপনার অঙ্গের ভূষণ
গোপনেতে। বড় সাধ আশ্রম দর্শন ;
আসিলে আশ্রমে, করে যায় সর্ব্ব অঙ্গ
আভরণহীন। যদি কর তিরস্কার,—
সতত সজল দুই প্রশস্ত নয়ন
স্থাপিয়া তোমার মুখে রহিবে চাহিয়া
নিরুত্তরে। সেই দৃষ্টি নহে সংসারের,
নহে বালিকার তাহা, নহে মানবীর।

কেবল মাত্র বালকবালিকা ও নরনারীর দুঃখে দুঃখী হইয়া এবং তাহাদের দুঃখ বিমোচন করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয় জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক প্রাণীর দিকেই কি এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে প্রধাবিত হইত। মানবের কষ্ট, মানবের যাতনা দেখিলে

তাঁহার করুণ হৃদয় যেরূপ আর্দ্র ও ব্যথিত হইত, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গা-দির মধ্যে কোন সামান্য প্রাণীর কোন প্রকারের যাতনা দেখিলেও তিনি সমভাবেই অনুভব করিতেন। কৈশোরাবস্থায় একটী নীড়ভ্রষ্ট শুকশাবক লইয়া সখী সুলোচনার সহিত তাঁহার কথোপকথন শ্রবণ করিলে নরনারী মাত্রেই মোহিত হইবেন সন্দেহ নাই।

	ওটী ওকি ?—এক	শুকের শাবক
	পড়ি বৃক্ষ মূলে,	আহত দেহ।
	চলে গেল সব	তৃষ্ণা কাতরতা,—
	সেই ভিক্ষা নাহি	বুঝিল কেহ।
	দেখিলা সুভদ্রা	সেই কাতরতা,
	সে করুণ ভিক্ষা	শুনিলা তার ;
	কাঁদিল পরাণ	ভিজিল নয়ন
	ছুটিল লইয়া	সরসী পার।
সুলোচনা।	একি লো তোর কুমারী ব্রত ?	
ভদ্রা।	জীবনের ব্রত, স্বজনি মোর।	
সুল।	চল বিহঙ্গিনী	চল যাই তবে
	নারায়ণ কাছে	মাগিগে বর
	বিহঙ্গম পতি,	কানন যৌতুক,
	গাছের আগায়	বাসর ঘর।
সুভ।	না দিদি মাগিব,	সর্ব্ব প্রাণিপতি,
	জগৎ যৌতুক	প্রকৃতি ঘর।
	বল দিদি বল	কেমন বিবাহ
	কেমন যৌতুক	কেমন বর।

কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গণে অষ্টাদশ দিবস ধরিয়া অহোরাত্র আহত সৈনি-কের শুশ্রূষা তাঁহার পরদুঃখকাতরতার ও জীবসেবার জ্বলন্ত উদাহরণ। স্বপক্ষীয়ই হউক আর শত্রুপক্ষীয়ই হউক রণক্ষেত্রে সেবার সময়ে তিনি সকলকেই সমানচক্ষে দেখিতেন এবং সেই ঘোরতর সংগ্রামের সময় আহ-তের সেবার জন্যই তিনি আপন পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আহত সৈনিকের সেবা করিয়া আপনার সুকুমার দেহ পতন করা সম্বন্ধে সুলোচনার সহিত তাঁহার কথোপকথন অতীব হৃদয়গ্রাহী ও গভীর উপদেশ-পূর্ণ। এই কথোপকথনের মধ্যেই তাঁহার কোমল-হৃদয়ের জনকজননীর স্নেহময় ক্রোড়ে যাপিত শৈশবজীবনের, ভ্রাতা ভগ্নী পরিবেষ্টিত কৈশোর-জীবনের, পতিপ্রেম পরিপূরিত যৌবনজীবনের, এবং মাতৃস্নেহাভিষিক্ত প্রৌঢ়জীবনের, তত্তৎকালীন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অতীব সুন্দররূপে অঙ্কিত রহিয়াছে।

সুলো—

অভাগি! এরূপে কিলো, অনিদ্রায় অনাহারে
খোয়াইবি দেহ আপনার?
নাহি রাত্রি নাহি দিন থাক প্রলেপের মত
লাগি অঙ্গে আহত সবার।

* * *

এইরূপে রাত্রি দিন মরিয়া মড়ার তরে
নাহি জানি পাও কিবা সুখ।

সুভ। রোগে শান্তি দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া
দিদি! এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ?
যেমতি অনল জল, সৃজিলেন নারায়ণ
সৃজি সেইরূপ দিদি! রোগ শোক দুঃখ,
সৃজিলা অনন্ত প্রেমপূর্ণ নারী বুক।
আছে আর কিবা সুখ হায়! এইরূপে যদি,
ঢালিয়া অমৃত মৃতে, শান্তি যন্ত্রণায়,
রমণীজীবন-গঙ্গা বহিয়া না যায়।

* * *

সুলো। মানিলাম নারীধর্ম্ম, আর্ত্ত আহতের সেবা,
কিন্তু শক্রদের সেবা কেন?

* * *

সুভ। শক্র! শক্র কি মানুষ নহে লো আমার মত?
রক্ত মাংস নাহি কি তাহার?
তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শক্রর প্রাণ?
একজল ভিন্ন জলাধার।
তাও এক ধাতুময়, অস্ত্রে এক রূপে হয়,
সর্ব্ব দেহ ক্ষত ও বিক্ষত;
সহে একরূপ ব্যথা, এক রূপ মৃত্যুমুখে
শক্র মিত্র হয় নিপতিত।
শক্র! এক ভগবান সর্ব্ব দেহে অধিষ্ঠান
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয়!
কেবা তুমি কেবা আমি, কেবা শক্র মিত্র কেবা?
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়?

* * *

যেই জন পুণ্যবান্ কেনা তারে বাসে ভাল?
তাহাতে মহত্ব কিবা আর?
পাপীরে যে ভাল বাসে, আমি ভাল বাসি তারে
সেই জন প্রেম অবতার।

* * *

শক্র মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ
সেই জন দেবতা আমার।
জনক জননী মুখ শিশুর ক্ষুদ্র জগত
শিশু কিছু নাহি জানে আর।

ক্রমে বাড়ে পরিসর কিশোর কিশোরী দেখে
ভ্রাতা ভগ্নী পূর্ণ এ সংসার।
পতি পত্নী প্রেমরঙ্গে যৌবনে ছুটে তরঙ্গে
আলিঙ্গিয়া ভূতল গগন।
ক্রমে সন্তানের স্নেহ দেখায় অনন্ত মুখ—
পুণ্যতীর্থ সাগর সঙ্গম।
প্রেম ধর্ম্ম এই দিদি। কালি কৃষ্ণার্জ্জুন মত
দেখিতাম সকল সংসার।
মাতৃস্নেহ পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব
অভিমন্যু উত্তরা আমার।

এতদূর দয়ার্দ্রচিত্তা ও কোমলস্বভাবা হইয়াও সুভদ্রার হৃদয়ে ধীরা রমণীর ন্যায় তেজ, কর্ত্তব্য জ্ঞান ও সহিষ্ণুতা ছিল। স্নেহ মমতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হইয়াও তাঁহার হৃদয় অযথা অপত্যস্নেহবিগলিত হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে কখন প্রতিবন্ধক জন্মায় নাই। শৈলজার মুখে পরদিন রণে একমাত্র পুত্র ষোড়শ বৎসর বয়স্ক কুমার অভিমন্যুর অমঙ্গল সম্ভাবনা, এবং তজ্জন্য সে দিবস তাহাকে সমরগমন নিবারণার্থ তাঁহার অনুরোধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি জননী হইয়া যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, সেই প্রত্যুত্তরই তাঁহার হৃদয়ের অমানুষিক তেজস্বিনী বৃত্তি ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

শৈল। —কর এ প্রতিজ্ঞা—
কালি রণে পুত্রে তব দিবে না যাইতে।
* * *
শুনিয়াছি কৌরব মন্ত্রণা
অলক্ষিতে। বীরধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন
কালি রণে ঘটাইবে ঘোর অমঙ্গল
কুমারের,—
* * *

সুভ।
* * *
ধর্ম্ম যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সনাতন,
জান শৈল। ধর্ম্ম যুদ্ধে করিয়া বারণ
কুমারে, কেমনে ধর্ম্মে হইবে পতিতা
পার্থের রমণী, অভিমন্যুর জননী?
হইবে পতিতা আহা! কৃষ্ণের ভগিনী?

শৈল। ষোড়শ বর্ষীয় শিশু করিবে সমর,
একি ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের?

সুভ। ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
কেশরীর ধর্ম্ম,—ধর্ম্ম কেশরীশিশুর।
ষোড়শবর্ষীয় যেই ক্ষত্রিয় সন্তান

বিরত সংগ্রামে, সেই ভীরু কুসন্তান
ক্ষত্রিয়কুলের গ্লানি।

অবশেষে যখন সমরক্ষেত্রে সেই কুমার অভিমন্যুর মৃতদেহ ক্রোড়ে ধরিয়া তিনি অশ্রুবিন্দুশূন্য নয়নে অবিচলিত চিত্তে ও অটলহৃদয়ে গোবিন্দের ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন, তখন সেই দেবীমূর্ত্তি কি এক অপূর্ব্ব সৌম্যভাব ধারণ করিয়াছিল। সেই একমাত্র দৃশ্যের কল্পনা মাত্রই তাঁহাকে মানবী-শ্রেণী হইতে অনেক দূরে লইয়া যায়।

কেবল দুইটী নেত্র শুষ্ক বিস্ফারিত,
এই মহাশোকক্ষেত্রে ; কেবল অচল
এই মহাশোকক্ষেত্রে একটী হৃদয় !
সেই নেত্র সেই বুক মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃত-পুত্র-মুখ মায়ের হৃদয়ে,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,
আদর্শ-বীরত্ব-বক্ষে প্রীতির প্রতিমা
নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অধর
গাহিতেছে কৃষ্ণনাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী।

বঙ্কিমচন্দ্র।

(২)

দুর্গেশনন্দিনী—"বঙ্কিমচন্দ্র" লেখক বলিয়াছেন,—"দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমবাবুর প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস। কিন্তু ইহা তাঁহার সর্ব্বপ্রথম লিখিত উপন্যাস নহে। দুর্গেশনন্দিনীর পূর্ব্বে তিনি বঙ্গভাষায় আর একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।" কিন্তু সাহিত্যসম্পর্কে ধরিতে গেলে ইহাই তাঁহার প্রথম উপন্যাস বলিতে হইবে। গ্রন্থ পাঠ করিলেও তাহা বোধ হয়। তবে অনেক সময় প্রথম পুস্তকের যাহা হয়, দুর্গেশনন্দিনীর তাহা হয় নাই। ইহা ধীরে ধীরে সাহিত্য-সাগরগর্ভে বিস্মৃতির অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে নাই ; ইহার যশ এখনও অক্ষুণ্ণ। বহুকাল পরে প্রথম বয়সে রচিত উপন্যাস পুনর্মুদ্রিত করিতে বিকন্সফিল্ড সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন। জীবিতকালে টেনিসন প্রথম প্রকাশিত কবিতাপুস্তক পুনর্মুদ্রিত করেন নাই ; কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর এখনও সংস্করণের পর সংস্করণ হইতেছে। ইহাতে গ্রন্থকারের ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে তিনটি চরিত্র প্রধান ; প্রথমা তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী সদা প্রফুল্লা ও

স্থিরসঙ্কল্পা বিমলা; দ্বিতীয়া, বৃষ্টিবারিবিধৌতা যূথিকাকলিকার মত তিলোত্তমা; তৃতীয়া, ফুল্লনলিনীতুল্য গম্ভীরা অথচ হাস্যময়ী, প্রণয়কাতরা কিন্তু স্বার্থ-ত্যাগিনী আয়েষা। এই চরিত্রেই বিশেষ বিশেষত্ব আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তিনজনের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয় সৌন্দর্য্যই প্রকাশিত। বিমলা "অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায়; নির্ব্বাস, মুদি-তোন্মুখ, শুষ্কপল্লব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ।" তিলোত্তমা "বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়, নবস্ফুট, ব্রীড়া-সঙ্কুচিত, কোমল, নির্ম্মল, পরিমলময়।" আয়েষা "নব-রবিকর-ফুল্ল জল-নলিনীর ন্যায়; সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত; নাসঙ্কুচিত, নাবিশুষ্ক; কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণদলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না।"

"কাব্যসুন্দরী" লেখক বলিতেছেন, "বিমলা বঙ্কিমবাবুর আদর্শচিত্র। বঙ্কিমবাবু বঙ্গকুলবধূকেও যেরূপ স্বাধীনতা ও তেজস্বিতায় ভূষিতা করিতে চাহেন, যেরূপ বুদ্ধিমত্তায় চতুরা করিতে চাহেন, স্বাধীনতার সহিত যেরূপ কর্ম্মবলে বলবতী করিতে চাহেন, তাহার প্রথম আদর্শ বিমলায় প্রদর্শিত হয়।" তখন গ্রন্থকার নবীন; বিমলা সর্ব্বত্র আদর্শো-পযোগিনী নহেন। "বিমলা একেইত ক্রীড়াকৌতুকিনী, বিমলা নিজ প্রবৃত্তি-পরায়ণা, বিমলা নিপীড়িতা, তেজস্বিনী রমণীরত্ন।" ক্রীড়াকৌতুকিনী ঠিক আদর্শের মত নহেন। নবীন গ্রন্থকার সময় সময় সীমা অতিক্রম করিয়াছেন; কোথাও একটু বর্ণনার খাতিরে, কোথাও একটু সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য, কোথাও একটু রসিকতার জন্য তিনি ক্রীড়াকৌতুকিনী বিমলাকে অঙ্কিত করিতে যাইয়া সময় সময় বর্ণে একটু অধিক চাকচিক্য দিয়াছেন। নিজ প্রবৃত্তিপরায়ণা বিমলাচিত্র অঙ্কনে গ্রন্থকার অধিকাংশ সময় সফলচেষ্ট এবং নিপীড়িতা তেজস্বিনী রমণীরত্ন বিমলাচিত্র অঙ্কনে তাঁহার ক্ষমতার চরম উৎকর্ষ। দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করিলে আমরা সে বিমলাকে ভুলিতে পারি না; শৈশবের সুখস্মৃতির মত সে চিত্র আমা-দিগের স্মৃতিপট আলোকিত করিয়া রাখে; ব্যথিত কাতরজীবনের শত ঘটনা সে স্মৃতি মুছিতে পারে না।

তিলোত্তমার চরিত্র গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তও করেন নাই, সম্পূর্ণ অব্যক্তও রাখেন নাই। তিনি রবিকরোজ্জ্বল গিরিচূড়ার কুজ্ঝটিকায়

অর্দ্ধাবৃত সৌন্দর্য্যের মত, তরল ক্ষুদ্র মেঘাবগুণ্ঠনান্তরায়বর্ত্তী পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্যের মত তাহা দেখাইয়াছেন। কেবল এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। তিলোত্তমার অর্দ্ধ বিকশিত নিশ্চেষ্ট সরলতা কুন্দনন্দিনীতে পূর্ণ বিকশিত।

আয়েষা চরিত্র আশ্চর্য্য সুন্দর। গ্রন্থকার আপনি বলিয়াছেন,—"যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা।" দুর্গেশনন্দিনী পাঠের পরও যাঁহাকে আয়েষাচরিত্র বুঝাইতে হয়, বৃথা তাঁহার উপন্যাস পাঠ। আয়েষা দেবী না মানবী? কারাগারে ওস্‌মানের সহিত তাঁহার কথোপকথন পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার হৃদয় যেমন গর্ব্বিত, তেমনই কোমল। সেই গর্ব্বিত বাক্যাবলির পার্শ্বে তাঁহার স্নেহবিগলিত বাক্যগুলি যেন উত্তুঙ্গ তরঙ্গকুলসঙ্কুল সাগরের পার্শ্বে শান্তসাগরের ছবি। তিনি জগৎসিংহকে হৃদয় দান করিয়াছিলেন কিন্তু স্বার্থ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি আপনি দাঁড়াইয়া আপনার সুখের আশার সমাধি দেখিয়াছিলেন। এই মুসলমান কন্যার চরিত্র গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উদার জাতীয়ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। সমগ্র ভারতবাসীদিগকে জাতীয় ভাবে দর্শন না করিলে বোধ হয় তিনি মুসলমান কন্যাকে এমন সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিতে পারিতেন না। আইভ্যান হোর রেবেকায় ও আয়েষায় আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।

রবীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন,—"নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন।" বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসে রসিক ছিলেন। "তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্রহাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে।" কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে হাস্যরসের অবতারণায় তিনি কৃতকার্য্য নহেন। দিগ্‌গজ তেমন উজ্জ্বল নহে, সে আপনি পাঠককে হাসাইতে পারে নাই; বিমলা বা আশ্‌মানি তাহাকে উপলক্ষ করিয়া সময় সময় পাঠককে হাসাইয়াছে মাত্র। শূন্য ভাণ্ডারে রসিকতার চেষ্টার দোষ বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন এবং "বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই।" তুষারের উপর মসীবিন্দুর মত গ্রন্থমধ্যে দিগ্‌গজের বর্ণমালিন্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অন্যান্য চরিত্র বিশদরূপে সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই; বীর জগৎসিংহ ও ওসমান সহজবোধ্য, সরল, সুন্দর। এই গ্রন্থের অভিরামস্বামী বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী গ্রন্থ সকলের সন্ন্যাসী প্রভৃতির প্রথম অবস্থা। দুর্গেশ-নন্দিনীর ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থের ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাতে নির্ঝরমুক্ত বারিধারার সহজ গতি নাই। পাশ্চাত্য মহাদেশের সাম্যগীতির ঝঙ্কারমুগ্ধ শিক্ষিত যুবকের হৃদয়ে যে সকল উদার মত স্থান পাইয়া থাকে, এই গ্রন্থে তাহাদের ছায়া দৃষ্ট হয়।

কপালকুণ্ডলা—কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। ইহাতে গ্রন্থকারের ক্ষমতাও দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা অগ্রসর। কপালকুণ্ডলা ক্ষুদ্রা-য়তন কিন্তু ক্ষুদ্রের অনাদর মূঢ়ের কাছে; যূথিকাকুসুম, তারকা, ইহারাও আমাদের চক্ষে ক্ষুদ্র; কিন্তু ইহাদিগের সৌন্দর্য্যের তুলনা কোথায়? কপাল-কুণ্ডলা এক শান্ত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। ইহার ভাষা সহজগতি; এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার সংস্কৃতবহুল ভাষা ভাল বাসিতেন এবং সেই জন্য কপালকুণ্ডলার ভাষা কিছু জটিল। এইরূপ ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাই তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থ সকলে ভাষা এমন কুসুমসুষমাসম্পন্ন নহে। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত নিয়মে চলিবে কিনা, এ সম্বন্ধে তিনি স্বীয় মত পরিবর্দ্ধিত রাজসিংহ গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তিনটি চরিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হয়—কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি ও কাপালিক। প্রকৃতিপালিতা সরলা কপালকুণ্ডলাই কবির আশ্চর্য্য সৃষ্টি। আমরা সাহিত্য জগতে আরও দুইটি প্রকৃতিপালিতা রমণীর দেখা পাই, শকুন্তলা ও মিরাণ্ডা। আশ্রমপালিতা শকুন্তলা সংসারজ্ঞান-বিরহিতা নহেন, মিরাণ্ডাও সংসারজ্ঞানশূন্য, এমন বলিতে পারি না; সংসারজ্ঞানশূন্যা হইলে প্রকৃতির কোমল বক্ষে পালিতা হইয়াও তিনি বলিতে পারিতেন না, "Sweet lord, you play me false!" কিন্তু কপালকুণ্ডলা স্বতন্ত্র সৃষ্টি। "কপালকুণ্ডলা কেবল মাত্র প্রকৃতির স্নেহে বর্দ্ধিত। ভীষণ নিষ্ঠুর পশুহৃদয় কাপালিকের স্নেহ, স্নেহই নহে। কঠিন পাষাণ নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার স্তূপ—বজ্রে গড়া করুণার ছদ্মবেশ।" কপালকুণ্ডলাকে কবি একেবারে সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা করিয়াছেন। বিবাহের কথায় যখন তিনি বলিলেন, "বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?" তখন বুঝিলাম তিনি

সংসারের কিছু বুঝেন না ; তাহার পর সংসারে প্রবেশ করিয়াও যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন না, ফুটিয়া ফুলের কি সুখ এবং বলিলেন "বোধ করি সমুদ্র তীরে, সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" তখন বুঝিলাম তিনি এখনও সেইরূপ সরলা। সেই সাগরতীরবর্ত্তী কানন যেমন স্নিগ্ধ সুন্দর, কপালকুণ্ডলাও সেইরূপ। কপালকুণ্ডলার আদর্শ সংসারী গ্রন্থকার বোধ হয় আপনার কল্পনা ব্যতীত আর কোথাও প্রাপ্ত হয়েন নাই ; তাঁহার ক্ষমতা এই যে, তিনি সে চরিত্রে আরম্ভ হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। তিনি একবারও বনবাসিনী কপালকুণ্ডলাকে সংসারজ্ঞানময়ী কপালকুণ্ডলা করেন নাই। কপালকুণ্ডলা যে সেই কপালকুণ্ডলা তাহার প্রমাণ শ্যামাসুন্দরীর জন্য ঔষধ আনিতে গমন ও গ্রন্থশেষে শোচনীয় আত্মত্যাগ। "বঙ্কিমচন্দ্র" লেখক বলিয়াছেন, "এই স্বার্থময় কপটতাজড়িত সংসারে থাকিয়া থাকিয়া আমরা একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি—সরলতাময়ী পরময়ী কপালকুণ্ডলা তাই আমাদিগের এত ভাল লাগে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বনবাসিনীর উপযুক্ত স্থানে "সেই গম্ভীর নাদি বারিধিতীরে সৈকত ভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে" তাঁহাকে দেখাইয়াছেন, আর "সেই অনন্তগঙ্গা প্রবাহ মধ্যে, বসন্ত বায়ু বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত" করিতে করিতে উপযুক্ত স্থানেই তাঁহাকে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অপসারিত করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্ণনার বঙ্কিমচন্দ্র এক সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ; তিনি সুন্দরী মতিবিবিকে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়করাইয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্য্যের কাছে তাঁহার সৌন্দর্য্য ম্লান। তিনি যেন পাঠককে বলিয়াছেন, যে তুমি জান মতিবিবি বড় সুন্দরী, কিন্তু একবার আমার প্রতিভার দুহিতা কপালকুণ্ডলাকে দর্শন কর ; তাহার পর রোমিয়োর মত "I will make thee think thy swan a crow।" বাস্তবিক মতিবিবির পার্শ্বে কপালকুণ্ডলাকে দাঁড় করাইয়া লেখক যে কেবল তাঁহার রূপের গৌরব দেখাইয়াছেন এমন নহে, তিনি গুণেরও গৌরব দেখাইয়াছেন ; কারণ অন্ধকারের পার্শ্বে আলোক আরও সুন্দর দেখায়, পাপের পার্শ্বে পুণ্য আরও স্বর্গীয় বোধ হয়। চরিত্র বৈপরীত্যে সৌন্দর্য্য আরও উছলিয়া উঠিয়াছে।

প্রকৃতি অন্ধকারের পার্শ্বে আলোক স্থাপিত করিয়া তাহার মাধুরী দেখান,

চিত্রকর বৈষম্যময় বর্ণ পাশাপাশি স্থাপন করিয়া বর্ণের মাধুরী দেখান। বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি চরিত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া কপালকুণ্ডলা চরিত্র আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছেন—সে দুইজন সংসার-সুখসম্ভোগেচ্ছাবতী শ্যামা-সুন্দরী এবং ইন্দ্রিয়সেবারত ও প্রণয়বিদগ্ধ মতিবিবি। তিনি তাঁহার "প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয় সেবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" মতিবিবির চরিত্রে সেই কথাই পরিস্ফুট। এখানে তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে পাপের পঙ্কে পুণ্যের শতদল বিকশিত হইতে পারে—প্রণয় পরশ-পাতর স্পর্শে পাপপঙ্কিল হৃদয় নির্ম্মল হইয়া উঠে। অনুতাপানলবিদগ্ধা মতিবিবি যখন পেষ্‌মন্‌কে বলিলেন, "অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফল লাভ হইল? * * * * ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলইত প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আমি এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, এক দিনের তরেও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কখন সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র।" তখন পাঠকের মনে হয়, "ইন্দ্রিয় সেবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" ইহাই গ্রন্থের মহান্‌ নৈতিক উদ্দেশ্য।

কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি উভয়েরই হৃদয়ে স্বাধীন থাকিবার প্রবল বাসনা। "উভয়েই স্বাধীনা—স্বেচ্ছাচারিণী—কিন্তু একজনের ইচ্ছা নির্ম্মল সলিলরাশির ন্যায় বক্ষদেশে বিমল চন্দ্রালোক প্রতিবিম্বিত করিয়া বিজন কাননাভ্যন্তরে আপন মনে বহিয়া যাইতেছিল, অপরের অভিলাষ অদৃষ্টদোষে পঙ্কিলতা প্রাপ্ত হইয়া প্রখর সূর্য্যালোকে কলঙ্করাশি সুপ্রকাশিত করিয়া বহুজনসমাকুল নগর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল।" প্রথম হইতেই মতিবিবি আপনার বাসনা সংযত করিতে অভ্যাস করে নাই। পতিপ্রেম হইতে বিচ্ছিন্না হইয়া যুবতী পাপ-পথে ধাবিত হইতে লাগিল—গরল পান করিতে লাগিল। শেষে সমস্ত হৃদয় বিষাক্ত হইয়া গেল। তখন মহাকবি বায়রণের মত মতিবিবিও সেই অবস্থাপন্ন।ঃ—

"Untaught in youth my heart to tame
My springs of life were poisoned."

মতিবিবি কখন প্রেম দেয় নাই, কিন্তু

"এ সুখ ধরণীতে　　কেবলি চাহনিতে,
জান না হবে দিতে আপনা,

সুখের ছায়া ফেলি কখন্ যাবে চলি
বরিবে সাধ করি বেদনা।"

বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে অগ্নিতে পুড়িলে অঙ্গারের মলিনত্ব লোপ পায়। ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগেচ্ছাবতী মতিবিবি অনুতপ্তা হইল। দিল্লীর সম্রাটের সিংহাসনার্দ্ধের আশা ত্যাগ করিয়া লুৎফ-উন্নিসা দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রেমের জন্য পাগল হইল। শেষকালে বলিল,—"বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তি সকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাহিনা, এক একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিয়ো, কেবল চক্ষুঃ পরিতৃপ্তি করিব।"

শার্দ্দূলচর্ম্মাবরণ, অস্থিভূষণ, ছিন্নশির-গলিত-শবাসন ভীষণ কাপালিক গ্রন্থ মধ্যে একটি প্রধান চরিত্র; সে নিষ্ঠুরতার স্তূপ।

গ্রন্থের আর দুইটি বিষয়ে কিছু বলিলেই আমাদিগের বক্তব্য শেষ হয়। প্রথম ভবানীর পদ হইতে ত্রিপত্রচ্যুতি, দ্বিতীয় স্বপ্নদর্শন। এই দুইটি গ্রন্থের গল্পাংশকে কতক পরিমাণে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন করিয়াছে মাত্র। স্বপ্ন এখনও একটা অমীমাংসিত অদ্ভুত ব্যাপার। তাহা কি বর্ণে বর্ণে সত্য হয়? গ্রন্থে এই সকল সন্নিবেশ করা কেন? তবে গ্রন্থকার বোধ হয় স্বপ্নাদিতে বিশ্বাস করিতেন, তাই এত গ্রন্থে সে সকল আসিয়াছে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

জগদ্রাম রায়।

(২)

প্রথম প্রস্তাবে জগদ্রাম রায়ের কবিতা সম্বন্ধে শিবদাস বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই পাঠকগণকে শুনাইয়াছি। এই প্রস্তাবে তাঁহার গ্রন্থ হইতে কিছু কবিতা পাঠকগণকে উপহার দিব।

যাঁহারা কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, রামচন্দ্র লঙ্কাপুরে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস যেরূপে এই পূজার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অল্প অল্প অস্বাভাবিকের গন্ধ পাওয়া যায়; কারণ, কৃত্তিবাসে বর্ণিত হইয়াছে যে রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাবণ দুর্গাকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি রাবণকে রক্ষা করিবার জন্য

রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। রামচন্দ্র দেবীকে তুষ্ট করিবার জন্ম যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই চারি দিন দেবীর পূজা করেন; পরে পঞ্চম দিনে অর্থাৎ দশমীতে দেবীর নিকট বর গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ স্থলে রাবণকে বধ করেন। রামচন্দ্র যে পাঁচ দিন দেবীর পূজায় নিযুক্ত ছিলেন, সে কয়েক দিন রাবণ রণস্থলে বসিয়া রহিল। এ'টা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না? জগদ্রাম রায় কিন্তু অস্বাভাবিকের দিকে যান নাই। তাঁহার মতে রামচন্দ্রের এই দেবী-পূজা লঙ্কাতে না হইয়া কিষ্কিন্ধ্যার কাননে হয়। কিষ্কিন্ধ্যাতে এ পূজা কেন হয়, তাহার কারণ জগদ্রাম এইরূপ দিয়াছেন।—

হনুমান সীতাদেবীর অন্বেষণ করিয়া আসিলে পর রামচন্দ্র তাঁহাকে লঙ্কার সমস্ত বিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতে বলেন। হনুমান প্রভুর আদেশ মত লঙ্কার বর্ণনা করিতে করিতে এক স্থানে বলিলেন,—

"দশানন রাবণ সে বিদিত সংসারে।
শঙ্কর শঙ্করী-পদ সদা সেবা করে॥
পূর্ব্বে হরগৌরী বর দিলেন রাবণে।
সমরে সহায় মোরা হব দুই জনে।
শূল খড়্গ ধরি রণে অগ্রেতে থাকিব।
তোমা সনে রণে সব পরাভব হব (১)॥
পশুপতি পার্ব্বতীতে পুত্র ভাব গণে।
তে কারণে ত্রিভুবন তৃণ তুল্য গণে॥"

হনুমানের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া বিষণ্ণ চিত্তে,—

"সুগ্রীব মিতায় কন দেব রঘুমণি।
রাবণ সতত সেবে শিবা শূলপাণি॥
ভক্তিতে ভজিয়া ভুলায়েছে ভোলানাথে
সে ভাবে ভবানী ভব আছেন লঙ্কাতে॥
পুত্র ভাবে ভগবতী দিয়াছেন বর।
যাঁর তেজ ধরে সেই রাজা লঙ্কেশ্বর॥
বিবরণ সকল কহিল হনুমান।
অতেব ভাবহ মিতা তার অনুষ্ঠান॥
যেকালে লঙ্কাতে যাব রাবণ বধিতে—
অব্যাজে আসিব (১) রাজা সংগ্রাম করিতে।
পরাভূত হয়্যা দ্রুত যাইয়া ভবনে।
সঙ্কটে সেবিব (১) শিব দুর্গার চরণে॥
দাসের দুঃখেতে দুঃখী হয়্যা দুই জনে।
লঙ্কা জন্ম যদ্যপি আসিয়া মোর স্থানে॥
রাবণে অভয় দিতে বলেন শঙ্কর।
রাক্ষসে করিতে হবে অজর অমর॥
সঙ্কট আগামী আমি কহিনু তোমায়।
জানকীর উদ্ধারে পড়িল বড় দায়॥"

এই বাক্য শুনিয়া,—

"সুগ্রীব কহেন নাথ এ অতি আনন্দ।
বিনা যুদ্ধে সীতারে পাইব রামচন্দ্র॥
আশ্বাস (২) ঘুচিল ইথে ভাব মনে মনে।
সীতা ভেট দিয়া শিব মাগিব (১) রাবণে॥
রাবণ করুক কার্য্য আপন লঙ্কাতে।
আমরা অযোধ্যা যাব সীতা লঞা সাথে॥"

---

(১) জগদ্রাম রায়ের গ্রন্থে প্রায় সকল স্থানেই তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়াপদ এইরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বোধ হয় তাঁহার সময় এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

(২) হস্তলিখিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় আশ্বাস শব্দ প্রায় সকল স্থানেই আশঙ্কা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা, "উপায় করিয়া গেলে আশ্বাস ঘুচিবে।" ঠিক বলিতে পারা যায় না গ্রন্থকর্ত্তার সময়ে আশ্বাস শব্দ আশঙ্কা অর্থে ব্যবহৃত হইত কিম্বা লিপিকরের ভ্রম বশতঃ এরূপ ঘটিয়াছে।

রামচন্দ্র কিন্তু এই উপদেশে আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি সুগ্রীবকে মনের কথা খুলিয়া বলিলেন।

"শ্রীরাম বলেন মিতা পূর্ব্ব কথা বলি।
যে কালে হরণ হৈল৷ প্রাণের মৈথিলী॥
প্রতিজ্ঞা করেছি যেবা হরিল বনিতা
সবংশে বধিয়া তারে উদ্ধারিব সীতা॥
রাবণে অভয় দিলে নষ্ট হৈল পণ।
শ্রীরামের নহে কভু দ্বিতীয় বচন॥
বিফল সাধন মোর নাহিক ধনুকে।
মোর পণ ভঙ্গে পীড়া পাব (১) তিন লোকে॥
নিজ নারী কম্বি ত্যাগ পণ ত্যাগ নারি।
ইহার বিধান বল বানরাধিকারী॥"

ইহার উত্তরে—

"সুগ্রীব বলেন নাথ এ কোন ভাবনা।
তুষ্ট নহে শিব কেন করিবেন মানা॥
তোমার যে দ্রোহী বটে, শিব দ্রোহী সে।
অভিন্ন তোমাতে তাঁথে কি আশ্চর্য্য এ॥"

সুগ্রীবের এই যুক্তি শুনিয়া ভক্তবৎসল রামচন্দ্র যাহা উত্তর করিলেন, তাহা তাঁহারই মুখে শোভা পায়।

"শ্রীরাম বলেন মিত্র সে কথা নিশ্চয়।
শিব রামে ভেদ হইলে বেদ মিথ্যা হয়।
কিন্তু সেবকের জন্য সর্ব্ব কর্ম্ম হয়।
ভক্তের ভাবেতে বেদবিধি নাহি রয়॥
কোন্ শাস্ত্রে বলিয়াছে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে?
উচ্ছিষ্ট খাইনু কেন শবরীর স্থানে?
চণ্ডালে করিতে স্পর্শ কোন্ শাস্ত্রে বলে?
সখা ব'লে কোলে নিনু গুহক চণ্ডালে॥
বিপ্র নারী অহল্যা সে আমার পূজিত।
তাঁরে পদ রজঃ দিনু এ কোন্ বিহিত?
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার হেতু।
গর্ভবাস সহ্য করি হয়ে দেবকেতু॥
সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম ঘটে ভক্তের পিরীতে।
ভক্তাধীন নাম তেঁই বলয়ে জগতে॥
ভক্তের যে বাসনা এড়ান নাহি যায়।
নিজ প্রাণ দিতে হয় ভক্ত যদি চায়॥
ভক্ত হইতে পূজ্য নহে জনক জননী।
দাসের সদৃশ দারা সুত নাহি গণি॥
বেদ বিপর্য্যয় কর্ম্ম হয় ভক্ত হৈতে।
সেবক সদৃশ বস্তু নাহি ত্রিজগতে॥
অতেব শম্ভুর বাক্য নারিব হেলিতে।
ভকত বৎসল নাম যাব (১) সীতা হইতে॥
বরঞ্চ থাকুন সীতা রাবণ ভবনে।
বৈষ্ণব প্রধান শিবে লজ্যিব কেমনে॥"

সুগ্রীব শুনিয়া কহিলেন, তবে উপায়? রামচন্দ্র কহিলেন, উপায় আছে।

"অকালে অম্বিকা পূজা করিয়া আশ্বিনে।
বিজয়া দশমী যাত্রা করহ দক্ষিণে॥
আশুতোষ হন সে ভবানী-ভূতপতি।
সাদরে সেবিলে সে সন্তোষ হব (১) অতি।
ভক্তি করি পূজিলে ভুলিব (১) ভোলানাথ।
মনোভীষ্ট সিদ্ধ হব (১) ঘুচিব (১) উৎপাত॥
নিজে ভোলানাথ হন নাহি আত্ম-পর।
সন্তুষ্ট হইলে দিব নাহি হেন বর (৩)
অতএব পূজ ভব ভবানী সহিত।
কায়মন বাক্যে সেব যাতে হন প্রীত॥
দোঁহা তুষ্ট করি আগে রাবণে মাগিব।
অবশ্য শঙ্কর শিবা অনুকূল হব (১)॥"

এই কারণে দেবী-পূজা কিষ্কিন্ধ্যাতেই হয়। জগদ্রাম রায়ের রামে দূরদর্শিতার পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রামে অন্যান্য গুণ ষোল কলায় পূর্ণ থাকিলেও দূরদর্শিতার পরিচয় বড় মিলেনা। কৃত্তি-

---

(৩) এমন কোন বর নাই যাহা তিনি সন্তুষ্ট হইলে না দিতে পারেন।

বাসের রামায়ণে দেখুন, যেখানে যেখানে রামচন্দ্র মন্ত্রণা করিতে বসিয়াছেন, সেই সেই স্থানে নিজে কিছুমাত্র মন্ত্রণা না করিয়া, কেবল, ভারতবর্ষের মিত্র রাজাদের রেসিডেণ্টের মতে মত দেওয়ার ন্যায়, জাম্বুবান বা বিভীষণের মতে মত দিয়াছেন। জগদ্রামের রাম সেরূপ নহেন। তিনি মন্ত্রণার জন্য মন্ত্রিগণকে আহ্বান করেন বটে, কিন্তু পরের হাত তুলা দেখিয়া তিনি নিজে হাত তুলেন না। তিনি সকলের মত শুনিয়া নিজের একটা মত স্থির করেন। আমার এই কথা শুনিয়া কেহ এমন মনে করিবেন না যে, আমি কৃত্তিবাস অপেক্ষা জগদ্রামকে বড় বলিতেছি। কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে আত্মবিস্মৃত করিয়া এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জগদ্রামের রাম আত্মবিস্মৃত নহেন। তিনি আপনাকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বলিয়া জানেন; সুতরাং তিনি অন্যের হাতে কাঠের পুতুল হইবেন কেন?

তাজমহল কেমন? এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ যদি তাজমহল হইতে একটি প্রস্তর আনিয়া দেখায়, তাহা হইলে যেমন হয়, কোন কাব্যের পরিচয় দিবার জন্য কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিলেও প্রায় তেমনই হয়। তথাপি উপায়ান্তর অভাবে আমরা প্রচলিত পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছি। পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র কায়মন ঐক্য করিয়া সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি হস্তে দেবীর আবাহন করিতেছেন,—

"আগচ্ছ আগচ্ছ দুর্গা প্রতিমা ভিতরে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ নারায়ণি প্রণতি তোমারে।
প্রসীদ, পার্ব্বতি, দেবি, আনন্দদায়িনি,
নবদুর্গা শুদ্ধচিত্তে শত্রুসংহারিণি।
দুর্গা দেবি ইহাগচ্ছ পূজাসন্নিধানে।
যজ্ঞভাগ গ্রহণ কর মা নিজ গুণে॥
রক্ষা কর দক্ষসুতা, সপক্ষ হইবে।
অধিষ্ঠান হবে গো অম্বিকা সদাশিবে॥
দেবি, জগন্মাতা সৃষ্টি-সংহারকারিণি।—
শরতে মরতে পূজা নও মা তারিণি।
ত্রাণ-কর নেত্রে-হের শঙ্করবনিতা।
যাবৎ পূজিব তাবৎ থাক জগন্মাতা॥
তব আগমনে যে যে দেবেরাগমন।
সে সব সহিত আমি করি আবাহন।
সংসার সাগর পারে তুমি সে তরণী।
তরাবে তাপিত জনে তারা ত্রিলোচনি॥—
উর মাতা মহিষ-মর্দ্দিনি প্রতিমাতে।
পঞ্চানন, ষড়ানন, গজানন সাথে॥
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে এ'স ত্বরাপর।
কৈলাস ত্যজিয়া মাতা মেড়ে (৪) কর ভর।
ভৈরব সহিত ভীমা আইস ভূতলে।
সেবিব বিমল পদ শীতল কমলে॥
লাল জবাযুত রক্ত চন্দনে চর্চ্চিয়া।
আমোদে ওপদে দিয়া পূজিব অভয়া॥"

রামচন্দ্র একে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাহার উপর তিনি ভক্তির সহিত দেবীর আবাহন করিতেছেন; সে পূজা কখন কি বিফল হইতে পারে? তাঁহার অন্তরের সহিত মা মা বলিয়া ডাকার ফল ফলিল; কৈলাসে

৪) মেড়—প্রতিমাপঞ্জর।—

হরগৌরী একাসনে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহাদের আসন টলিয়া উঠিল। অমনি,—

"করপুটে কাত্যায়নী, প্রণমিয়া শূলপাণি
জিজ্ঞাসা করেন বিবরণ।
বল প্রভু ভূতনাথ, কেহ হেন অকস্মাৎ
টল মল করয়ে আসন॥
শুন ত্রিনয়ন প্রভু, বাম অঙ্গ নাচে কভু
দক্ষ অঙ্গ স্পন্দয়ে কখন।
কভু থাকি হর্ষ মনে, কভু প্রাণ কাঁদে কেনে
হরষ বিষাদ হয় মন॥
কি জানি কি লভ্য হয়, না জানি কি অপচয়,
বুঝিতে না পারি কিছু আমি।
ক্ষণে দন্তে জিহ্বা কাটে ক্ষণে মনে হর্ষ উঠে,
একি বটে বল মোর স্বামি॥"

কবির কেমন রচনাকৌশল দেখুন। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ দেবীর পূজা করিতেছেন, তাই মায়ের কখন বাম অঙ্গ নাচিতেছে, কখন বা মনে হর্ষ উদয় হইতেছে; এদিকে ভক্তপ্রধান রাবণের বিনাশ হইবে, তাই মায়ের কখন দক্ষিণ অঙ্গ নাচিতেছে, কখন প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, কখন দন্তে জিহ্বা কাটিতেছেন, কখন বা হর্ষে বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র যতই অন্তরের সহিত মা মা বলিয়া ডাকিতেছেন, কৈলাসে মায়ের অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি হইতেছে। পরিশেষে তিনি আর স্থির হইতে না পারিয়া মহাদেবকে পুনরায় কহিলেন,—

"স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে, কেবা ডাকে দুর্গা বলে,
কে পড়িল বিষম সঙ্কটে।
স্থির হৈতে নারি আর, বল বটে কি প্রকার,
দ্রুত যাব তাহার নিকটে॥"

ইহা অপেক্ষা জগন্মাতার মাতৃস্নেহের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, এইরূপ অল্প কথায় বর্ণিত হইতে প্রায় দেখা যায় না। দেবীর এইরূপ অস্থিরতা দেখিয়া মহাদেব ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানে রামচন্দ্রে পূজার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার

"পুলকে পুরিত গাত্র, প্রেমে ছল ছল নেত্র,
আনন্দ উথলে ঘনে ঘন।"

তিনি ধ্যান হইতে উঠিয়া দেবীকে কহিলেন,—

"শিব কন শুন শিবা, আজি অতি শুভ দিবা,
পরম আনন্দ ক'রে মানি।
কিষ্কিন্ধ্যা কাননে হরি, প্রতিমা প্রকাশ করি
তোর পূজা করিছেন তিনি॥

নির্ম্মাইয়া দশভুজা, আশ্বিনে তোমার পূজা,
প্রকাশিলা রাজীবলোচন।
ষাটি সহস্রেক মুনি, সঙ্গে লঞা চক্রপাণি,—
তোমার করেন আবাহন॥
যে পূজা বসন্তে ছিল, সে শরৎ কালে হৈল
ইহা বৈ * কি আনন্দ আর।
প্রভু রাম কৃপানিধি তিনি পূজা কৈলা যদি,
তবে হৈল সংসারে বিস্তার॥
বাম অঙ্গ নেচে উঠে, এই সে মঙ্গল বটে,
চল চল চণ্ডিকা চপলে।
গুহ গজানন নেহ, ব্যাজ আর না করিহ
লঘুগতি চল ভূমিতলে॥"

রামচন্দ্রের পূজায় মহাদেব সুখী হইলেন বটে, কিন্তু জগন্মাতা সুখী হইতে পারিলেন না; কারণ স্ত্রীলোকদের মনের মধ্যে বিপদের আশঙ্কা থাকিলে তাঁহারা শুভসংবাদে সুখ অনুভব করিতে পারেন না। মায়ের দক্ষিণ অঙ্গ নাচিতেছে, এবং কেন নাচিতেছে, তাহা মহাদেব প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন না; এই কারণে পূজার কথায় সুখী না হইয়া তিনি পুনর্ব্বার মহাদেবকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"শঙ্করের কথা শুনি বলেন শঙ্করী। বিবরণ ত্রিলোচন বলহ এখনি॥
বাম অঙ্গ নৃত্য প্রভু বলিলে বিচারি॥ শ্রীরাম করেন পূজা কি কার্য্য বিশেষ।
দক্ষ অঙ্গ নাচে তাথে কিবা হবে হানি। বিবরণ বনিতারে বল ব্যোমকেশ॥"

এই প্রশ্ন শুনিয়া শিব কিছু বিপদে পড়িলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে রাবণবধের কথা ভগবতীর প্রীতিকর হইবে না; সেই জন্যই তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত সংবাদ গোপন করিয়া কেবল বাম অঙ্গ নাচার শুভ-ফল বলিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন যে দক্ষিণ অঙ্গ নাচার ফল না বলিলে ভগবতী ছাড়িবেন না, তখন অগত্যা মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য বনে গমন করিলে রাবণ তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা সীতা দেবীকে হরণ করিয়াছে। রাবণ তোমার দাস, সেই জন্য রামচন্দ্র তোমার পূজা করিতেছেন।" পরে কহিলেন—

"তোমারে করিয়া তুষ্ট মাগিবেন বর। রাবণ হইবে নাশ এই মাত্র হানি॥
সবংশেতে ধ্বংশ হবে রাজা লঙ্কেশ্বর॥ এই অপচয় তেঞি নাচে দক্ষ অঙ্গ।
এ নিমিত্তে পূজা চিত্তে ভাবহ ভবানি। অল্প দায় বটে মন না করিহ ভঙ্গ॥

* বৈ—অপেক্ষা।

মহাদেব হিসাব করিয়া বাকী কাটিয়া দেখাইয়া দিলেন যে লোকসান হইতে লাভের ভাগ বেশী এবং দুই চারিটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন—

"পিত্তল বিকল হয় পাইলে কাঞ্চন।
ইন্ধন করয়ে ত্যাগ পাইলে চন্দন॥
কূপ জল দিয়া যদি পাই গঙ্গাজল।
শুক্তির বদলে প্রিয়ে পাই মুক্তাফল॥
পাষাণ ব্যয়েতে যদি স্পর্শ-মণি মিলে।
এ সকলে হানি কি পরম লভ্য বলে॥
রাবণে ত্যজিলে যদি রাম তুষ্ট হন।
ইথে হৈতে লভ্য কিবা ত্রিভুবনে ধন॥"

এইরূপ প্রায় প্রত্যহই দৃষ্টিগোচর হয় যে একটী স্ত্রীলোক আপনার প্রিয়-তম পতির নিকট বসিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছেন এবং নানা প্রকারে পতির মনস্তুষ্টি করিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। এমন সময় স্বামী যদি কোন কারণ বশতঃ ঐ আদর্শ পত্নীর সম্মুখে আপন পুত্রকে ভর্ৎসনা বা প্রহার করেন, তবে তখন আর স্ত্রীলোকটীর পত্নীভাব থাকে না। মাতৃস্নেহের প্রবল স্রোত হৃদয়ে উত্থিত হইয়া ঐ আদর্শ পত্নী-ভাবকে একেবারে ডুবাইয়া দেয়। তখন তিনি প্রিয়তম পুত্রকে কোলে লইয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতে থাকেন। আজ জগজ্জননীর সেই দশা উপস্থিত হইল। এতক্ষণ তিনি আর্য্য-রমণীর আদর্শ পত্নীভাবে মহাদেবের নিকট বসিয়াছিলেন; কোন কথা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইলে স্বামীর পদে প্রণতা হইয়া করপুটে উক্ত কথা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। কিন্তু ভক্ত-প্রধান রাবণের বিপদ শুনিতে পাইয়া এবং মহাদেবকে সেই বিপদের সহায় বুঝিয়া সে আদর্শ পত্নীভাব ক্ষণকালের জন্য লোপ পাইল এবং প্রবল মাতৃস্নেহ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। জগ-দ্রাম রায়ের এই স্থানের বর্ণনা এত সুন্দর যে আমি সমস্তটুকু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"ভক্তের বিপত্তি হবে চিত্তে খেদ হইল।
লোহিত লোচন দেহে ঘর্ম্ম উপজিল॥
কলেবর থর থর কম্পিত অধর।
মহাদেবে মহামায়া করেন উত্তর॥
কি বলিলে কাশীনাথ অন্ন দায় বটে?
সে কথায় প্রাণ যায় হিয়া মোর ফাটে॥
দ্বি-গুণ আগুণ মোর উঠিল জ্বলিয়া।
সেবক বধের কথা কর্ণেতে শুনিয়া॥
শুন পশুপতি এবে বলি যে উচিত।
ভূত ভবিষ্যতে হেন না দেখি এ রীত॥
জননী জনক ভাবে যেমতি বালকে।
যারে ভজে সে ভাবয়ে তেমতি সেবকে॥
সেবক প্রভুতে হয় এমন সম্বন্ধ।
ভক্তের আনন্দ হইলে প্রভুর আনন্দ॥
দাসের দুর্গতি হৈলে স্বামী দুঃখ মানে।
এইরূপ আচার করয়ে ত্রিভুবনে॥
তুমি হে অখিল-স্বামী কি বল বচন।
কৌশল করিয়া বুঝি বুঝ মোর মন॥
একবার শিব বলি যদি কেহ ডাকে।
শূল ধরি শঙ্কটে সহায় হও তা'কে॥
উগ্র তপ জপ কত করিল রাবণ।
ধ্যান করি যুগ ধরি কৈল অনশন॥
এক পদে তা'পর সহস্র বর্ষ ছিল।
সহস্র পূর্ণেতে এক মুণ্ড কাটি দিল॥
দশম হাজার বর্ষে দশ শিরঃ দিয়া।
তব পদ সেবিল সকল তেয়াগিয়া॥

সে কালে সরল হৈয়া কিনা বর দিলে।
পুত্র বলে অগ্নিকুণ্ড হ'তে তুলে নিলে॥
মোর কোলে দিয়া পুনঃ বলিলে আমারে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবণের ভার লাগে তোরে॥
তদবধি হৈল মোর লঙ্কা পুরে বাস।
উগ্রচণ্ডা খাণ্ডা ধরি রক্ষা করি দাস॥
রাবণ ভুবনে মোর ভকত প্রধান।
কার্ত্তিক গণেশ নহে তাহার সমান॥
পুত্রভাব রাবণের জানয়ে সংসারে।
সে যদি মরিবে ধিক্ থাকুক আমারে॥"

সচরাচর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রীলোকেরা কোন্দলের সময় নিজের ক্ষমতা অল্প জানিতে পারিলেই ক্রন্দন করিয়া সেই ক্ষমতার অভাব পূরণ করেন; কিন্তু আদ্যা শক্তি নিজের ক্ষমতা বেশ বুঝেন। তিনি জানেন যে তাঁহার শক্তির অংশ মাত্র লইয়া এই বিশ্বরাজ্য চলিতেছে; তাই সগর্ব্বে মহাদেবকে কহিলেন,—

"আমি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী মোর খ্যাতি।
মোর দাস করে নাশ কাহার শকতি॥
প্রচণ্ডা চামুণ্ডা আমি খাণ্ডা ধরি যাব।
রাবণেরে পৃষ্ঠে রাখি সংগ্রামে দাণ্ডাব॥
দেখিব দানব দৈত্য অসুর রাক্ষস।
সুপর্ণ পন্নগ যক্ষ দেবের সাহস॥
ভূত প্রেত পিশাচ গন্ধর্ব্ব বেতালেতে।
নর কি বানর যেবা আসিবে সাক্ষাতে॥
সমূলেতে সংগ্রামেতে সংহার করিব।
ভক্তের কারণে ভূমি শোণিতে ভাসাব॥
নিশুম্ভ শুম্ভেরে আমি নাশ কৈলাম ক্ষণে।
মহিষ-মর্দ্দিনী নাম্ কি লুকা'ল ভুবনে॥
মহি অহি সহিত করিব সর্ব্বনাশ॥
তথাপি রাখিব হে রাবণ নিজ দাস॥
মোর দাস নাশ কেবা সাধ করে মনে।
সর্ব্ব-সংহারিণী নাম্ কি লুকা'ল ভুবনে॥"

মাতৃস্নেহের প্রবল স্রোতে জগন্মাতার হৃদয়ে পত্নীভাব ডুবিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা একেবারে লয় প্রাপ্ত হয় নাই। প্রবল বন্যাতে ভাসমান তৃণের ন্যায় এক এক বার পত্নীভাব মাতৃস্নেহের প্রবল স্রোত ভেদ করিয়া উপরে উঠিতেছে। তাই মা পুনর্ব্বার কহিলেন,—

"অন্য জন যদি হেন বচন বলিত।
উগ্রচণ্ডা নিকটে এখনি ফল পাইত॥
তুমি স্বামী দারা আমি তেঞি সহ্য হৈল।
এ কথা কহিতে মুখে লজ্জা না জন্মিল॥"

পরে জগন্মাতা সামান্যা রমণীর ন্যায় মহাদেবকে ভৎর্সনা করিতেছেন।

"তুমি হে যেমন, বলিলে তেমন,
এমতি তোমার কায্।
তব দোষ নয়, ধুতুরাতে কয়,
তেঞি সে এমন সাজ॥
এই করিয়া, সব খোয়াইয়া,
হয়েছ দিগম্বর।
তোমার গুণে, বিঁধিল ঘুণে,
আমার অন্তর॥
বিভূতি গায়, দেবের সভায়,
যে যায় নাংটা বেশে।
এমত কথা, বলিতে হেথা,
লাজ কি মুখে এসে॥
ভাঙ্গের ঘোরে, নয়ন ফিরে,
চলিতে ঠাহর নাই।
জটার ঘটা, বিভূতি ফোঁটা,
দেখিলে ভয় পাই॥
যাবত কাল, হাড়ের মাল,
ভূতের সঙ্গে খেলা। (৫)
নহিলে কেনে, তোমার সনে,
ফিরিছে দানবগুলা॥
কিসের ভাবে, দেবতা সবে,
চরণ দুটা পূজে।
বুঝিতে নারিলাম, ভাবিয়া মরিলাম,
পুড়িল এ সব লাজে॥

(৫) "ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।" ভারতচন্দ্র।

* * *

হেন নহিলে, সব খোয়া'লে,
কাঁধে করিলে ঝুলি।
ভেক করিয়া, ভিক্ষা মাগিয়া,
ফিরিছ কুলি কুলি॥ (৬)
ক্ষণেতে রোষ, ত্বরিতে তোষ,
দোষগুণ সমজ্ঞান।

শ্মশান বাস, সদা উদাস,
উপহাস নাহি মান॥
আচার বিচার, নাহিক তোমার,
যার তার ঘরে খাও। (৭)
বদন বাদ্য, করিলে সদ্য—
তখনি ভুলে যাও॥"

পরে তিনি সোজা কথায় মহাদেবকে বলিলেন,—

"তোমার পারা, হইবে যারা,
তারা বুঝিতে পারে।
আপনার দাস, তাহার বিনাশ,
শিবা দেখিতে নারে॥

অশেষ মত, বুঝাতে কত,
পারিব ত্রিলোচন।
বলি হে উজা, (৮) চাই না পূজা,
বাঁচুক রাবণ ধন॥"

নিম্ন শ্রেণীর কবি হইলে তিনি মহাদেব দ্বারা ভগবতীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন যে রাবণ অতিশয় পাপী এবং রামচন্দ্র অতিশয় ধার্ম্মিক পুরুষ। অতএব রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের সহায় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু জগদ্রাম রায় সে শ্রেণীর কবি নহেন। জগদ্রামের মহাদেব এক জন প্রধান Politician এবং নারী-চরিত্রের পারদর্শী। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে ভগবতী যেরূপ রাগান্বিত হইয়াছেন, তাহাতে রাম বড় কি রাবণ বড় লইয়া তর্ক-বিতর্ক উঠাইলে একটি ছোট খাট রকমের ফৌজদারী হইবার খুব সম্ভব। তিনি একে বৃদ্ধ তাহার উপর,—

"ভাঙ্গের ঘোরে, নয়ন ফিরে,
চলিতে ঠাহর নাই।"

কি জানি ফৌজদারীতে গিয়া কোন কথা ভুল বলিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাঁহার ঘাড়ে পিনাল কোডের ২১১ধারা চড়িতে পারে; সেই জন্য তিনি ফৌজদারীর দিক দিয়া চলিতে নারাজ। এই সকল নানা কারণে মহাদেব রাম রাবণের কথাটা উড়াইয়া দিলেন। তিনি নারী-চরিত্র বুঝিতে বেশ সক্ষম ছিলেন। তিনি বুঝিতেন যে রমণী-হৃদয়ে একবার রোষ উপস্থিত হইলে লজ্জার উদ্রেক ব্যতীত উক্ত রোষ সহজে যায় না; সেই কারণে অন্য কথার উল্লেখ না করিয়া যে কথায় ভগবতীর লজ্জা জন্মিতে পারে, সেই কথা পাড়িলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে ভগবতীকে কহিলেন—

(৬) কুলি—রাস্তা।
(৭) "বেদাচার বহিষ্কৃত।" ভারতচন্দ্র।
(৮) উজা—উজু। বাঁকুড়া জেলায় উজু শব্দ সোজা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"শুন লো শিবা, বলিব কিবা,
তোমার গুণের কথা।
কহিলে মরম, পাইবে সরম,
গণপতির মাতা ॥
পূর্ব্বকালে রণস্থলে
রক্তবীজ নাশে।
ভীষণ আকার, কর মার্ মার্
দেবতা পলায় ত্রাসে ॥
বরণ কালী, মুণ্ডমালী,
লহ লহ করে জিহ্বা।
করাল বদন, বিকট দশন,
গলিত বসন কিবা ॥
* * * * *
যোগিনী সঙ্গ, সব উলঙ্গ,
তোমার সনে নাচে।
অসুর অমর, করে থর থর,
ভয়ে না এসে কাছে ॥
গুহ গজানন, ভাই দুই জন,
মা বলিয়া কাছে গেল।
মায়ের সজ্জা, দেখিয়া লজ্জা-
সাগরে ডুবিয়াছিল ॥
বধিয়া বৈরি, নাচ ফিরি ফিরি,
ঘন ঘন দাও লম্ফ।
অহি মহীযুত, কমঠ পীড়িত,
ত্রিজগত ভয়ে কম্প ॥
ভূমি টলমল, যায় রসাতল,
চরাচর ডুবে জলে।
খাইয়া সিদ্ধি, পাগল বুদ্ধি,
পড়ি তোর পদতলে ॥
এ সব মনে, পড়িবে কেনে,
সে গেল অনেক দিন।
তে কারণে কৈ, মোর হৃদে এই,
দেখ তোর পদ চিন্ ॥" (১)

মহাদেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কারণ,—

"পতির বাণী, শুনি ভবানী,
হরের হৃদয়ে চান।
চরণাঙ্কিত, হৃদি ভূষিত,
নিজে দেখিতে পান ॥
হৈলা লজ্জিত, কোপ বর্জ্জিত,
গদগদ অধোমুখী।
অতি প্রমোদে, হরের পদে,
পড়িল যুগল আঁখি ॥"

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সকল কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, সমুদয়ই জগদ্রাম-রচিত দুর্গাপঞ্চরাত্রি হইতে। অতঃপর জগদ্রামের প্রধান কাব্য অদ্ভুত রামায়ণের কথা বলিব।

শ্রীবলরাম বন্দোপাধ্যায়।

"ছেলেটী যেন কার্ত্তিক।"

কালিদাসের কুমার-সম্ভব বোধ হয় অনেকে পড়িয়াছেন—নিদান তাহার কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। অথবা এই মহাকাব্যের কথা জানা না থাকিলেও পুরাণবিবৃত কুমারের জন্মবৃত্তান্ত অনেকের বোধ হয় জানা আছে। তারক নামে এক অসুর এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়। সে এরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে যে:দেবতারা পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। কাজেই তাহাকে মারিবার জন্য উপায় উদ্‌ভাবন করিতে হইল। জানা গেল মহা-

(১) চিন্—চিহ্ন।

দেবের ঔরসজাত পুত্র ভিন্ন কেহই তারকাসুরকে বধ করিতে পারিবেন না। কাজে কাজেই দেবগণ শিবের শরণাপন্ন হইলেন। ইহার ফল শিবের সহিত উমার বিবাহ এবং কুমারের জন্ম। ক্রমে ইনি দেবসেনাপতিরূপে বরিত হন এবং তারকাসুরকে বধ করেন।

কুমার দেবসেনাপতি—কাজে কাজেই মহাবীর। শিবদুর্গার পুত্র বলিয়াও দেবসমাজে ইহাঁর খুব প্রতিষ্ঠা। বঙ্গদেশে আজও ইহাঁর সঙ্গে বৎসরে আমাদের দুইবার দেখা হয়। শারদীয় পূজা উপলক্ষে মাতার সঙ্গে ইনি অনেক বঙ্গগৃহে একবার আবির্ভূত হন, কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে ইনি একলা আসেন। বাসন্তী পূজার উল্লেখ করিলাম না, কারণ তাহা দেশে অতি বিরল।

ছেলেবেলা আমরা যে কার্ত্তিককে দেখিতাম, তিনি সুন্দর যুবাপুরুষ, তাঁর বাউরি কাটা চুল, ওষ্ঠে গোঁফের রেখা, ফিন ফিনে ধুতি পরিহিত, গলায় কোঁচান উড়ানি দোদুল্যমান, পায়ে জরির জুতা, ময়ূরাসন, ও এক হাতে একটা ছোট ধনু এবং আর এক হাতে একটা ছোট তীর। আজ কাল তাঁর একটু ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন তাঁর বাউরি কাটা চুলের পরিবর্ত্তে এলবার্ট টেরি, জরির জুতার পরিবর্ত্তে পায়ে ইংরাজী জুতা ও গাত্রে কোট দেখা দিয়াছে। বুট জুতা ও মোজা এখনও শ্রীঅঙ্গে উঠে নাই, কিন্তু, যদি হিন্দুয়ানি বজায় থাকে, ক্রমে যে তাহা হইবে না, কে বলিতে পারে? এবং আমরা না দেখিতে পাই, আমাদের পুত্র কিম্বা পৌত্রেরা ক্রমে যে দেব-সেনাপতির পরণে পেণ্টুলান, মাথায় পিরালী পাগ্‌ড়ি, মুখে চুরট ও চক্ষে চসমা দেখিতে পাইবে না, তাহা বলা যায় না। অবশ্য আমরা ধরিয়া লইলাম, তাহাদের সময়ে আজকালকার সুসভ্য পোষাক বজায় থাকিবে।

কুমারের পোষাকের এরূপ ক্রম পরিবর্ত্তনের কারণ কি? অনেকেই বলিবেন, কালমাহাত্ম্য। ইংরাজী শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার খরস্রোত দেশ মধ্যে বহিতেছে। আমাদের গৌরবস্থল উনবিংশ শতাব্দীর ঢেউ যে দেবমহলে না পৌঁছিবে কেন তাহার কারণ বুঝা যায় না। যে সভ্যতার খাতিরে কার্ত্তিকের জননী সিংহবাহিনী দশভুজার অঙ্গে সাটিনের জ্যাকেট, ও তাঁর ভগ্নীদ্বয় বীণাপাণিও কমলার বেশ আজ সুসভ্য ও পরিমার্জ্জিত, সেই খাতিরেই তিনি আজ বাঙ্গালী বাবু। সভ্যতার ঢেউ তাঁহাদের পরিবারের দুইজনের গাত্রে কেবল বিশেষ লাগে নাই;—তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মহাদেব ও

তাঁর দাদা গণেশ। তাঁহাদের শোধরাইবার আর উপায় নাই। মহাদেব সেকেলে বৃদ্ধ, ইংরাজী মতে old fool, তাঁহার সভ্য হইবার ক্ষমতা গিয়াছে। নূতন নেশাটাই তিনি ধরিতে পারিলেন না,—আজও যখন সিদ্ধি ও ধুতুরার জন্য লালায়িত, তাঁকে কি আর হস্তি অজিন বা ব্যাঘ্র চর্ম্ম ছাড়াইয়া স-মোজা ইংরাজী জুতা ও কোট পেণ্টুলান পরান যাইতে পারে? গণেশ দাদাও তথৈবচ। তাঁরও হস্তিমুণ্ড এবং চারি হাত এ সভ্য জগতে আর চলে না। যদি তাঁর চেহারার কোন উন্নতি হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাঁর পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা বৃথা।

কার্ত্তিকের পোষাকের উন্নতির কারণ এখন আমরা কতকটা বুঝিতে পারিলাম। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাবুত্বজ্ঞাপক বাহ্যিক চিহ্ন সমূহের যেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তেমনি ভদ্রলোকের আসরে স্থান পাইবার জন্য তারকারিকেও কতকটা পোষাকের পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয় বেশ ভূষাটা সম্পূর্ণ সময়ের উপযোগী করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁর কথা বার্ত্তা কি পরিমাণে ইংরাজীভাবাপন্ন ও বাঙ্গালা কহিবার সময় তাহাতে শত করা কত ইংরাজী মিশান, তাহা আমি আজ ঠিক করিয়া বলিতে পারিলাম না। যদি জানিতে পারি, পাঠকদিগকে জানাইতে কালবিলম্ব করিব না।

যাহা হউক কার্ত্তিকের কিন্তু কতকটা বাঙ্গালী-বাবুর আদর্শ। ইহার আর একটা প্রমাণ দিব। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি "ছেলেটী যেন কার্ত্তিক।" এই তুলনা কি ভাবব্যঞ্জক? আমরা কি ছেলেটী বীরত্ব-লক্ষণযুক্ত এই ভাবিয়া ঐ কথা বলিয়া থাকি? প্রত্যেক বঙ্গবাসীই জানেন তাহা নয়। যখন ছেলেটী গৌরবর্ণ, পাতলা চেহারা, এক "গোঁয়ার গোবিন্দ" নয়, এবং ভাল করিয়া কাপড় চোপড় পরাইলে ঠিক বাবুটীর মত দেখায়, তখন কার্ত্তিকেয় তাহার উপমান। তখনই আমরা বলিয়া থাকি "ছেলেটী যেন কার্ত্তিক।" আমাদের সঙ্গে কুমারের আর একটি সম্বন্ধ আছে। তিনি বন্ধ্যানারীর উপাস্য। তাহার কারণ, তিনি ষষ্ঠীদেবীর স্বামী বলিয়া। কিন্তু যখন কোন বঙ্গমহিলা পুত্রকামনায় কার্ত্তিকের অর্চ্চনা করেন, তখন কি তিনি কার্ত্তিকেয় যে দেবসেনাপতি মহাবীর, একথা ভাবেন, এবং বীরভাবাপন্ন পুত্র ইচ্ছা করেন? নবীনারা কি করেন বলিতে পারি না, কিন্তু অশিক্ষিতা প্রবীণারা যে তাহা করিতেন না, একথা আমি বলিতে পারি।

এইখানেই থামিতে পারিতাম কিন্তু আরও দুই কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করা গেল না। কুমারের এরূপ অবস্থা আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য প্রদান করে নাকি? অনেক সময় কোন কোন দেব-হৃদয় কোন কোন দেবশরীর এরূপ ছাঁচে ঢালা হয় যে জাতীয় মন, জাতীয় হৃদয় তাহাতে বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যে জাতি যুদ্ধপ্রিয়, যাহাদের মধ্যে বীরত্বের গৌরব আছে, যাহাদের আত্ম-মর্য্যাদা বোধ আছে, তাহারা যে কখন দেবসেনাপতিকে আমরা যে ভাবে দেখিতে শিখিয়াছি, সেই ভাবে দেখিতে পারিত, তাহা আমি কল্পনায়ও আনিতে পারি না। রাজপুতেরা কুমারের পূজা করে কি না জানি না, এবং করিলেও কিভাবে করে বলিতে পারি না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বলা যায় যে বীরপ্রসূ রাজ-পুতনায় তিনি কখনও বাবুভাবাপন্ন নন এবং হইতে পারেন না। বাঙ্গালী-চরিত্র, বাঙ্গালী জীবনের ইতিহাস অনেক পরিমাণে বাঙ্গালার কার্ত্তিকেয়তে প্রতিবিম্বিত। যদি আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস একেবারে না জানিতাম, তাহা হইলেও কুমারের দুর্দ্দশা দেখিয়া বাঙ্গালা হইতে মনের উন্নত ভাব, হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত এবং জাতীয় আত্মসম্মান যে অনেক কাল বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতাম। বহুকাল হইতে আমরা পর-পদ-দলিত, বহুকাল হইতে আমরা প্রবলের পদানত, বহুকাল হইতে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে শৌর্য্য বীর্য্য নির্ব্বাসিত। ইহার ফল জাতীয় চরিত্রের হীনতা। সেই হীনতাই বঙ্গপূজিত কুমারের আকারে ও বেশভূষায় প্রতিফলিত। আমাদের ক্ষমতা থাকিলে বোধ হয় তাঁহার হস্তস্থিত কুত্রীভূত ধনুর্ব্বাণের পরিবর্ত্তে আজ ছড়ি কিম্বা কলম ও রেনল্ড্‌সের কোন উপন্যাসরত্ন শোভা পাইত। পাঠক স্বীকার করিবেন কি জানি না, কিন্তু আমাদের চরিত্রমাহাত্ম্যেই "ভবেশ-ঔরস" দেবসেনাপতি স্কন্দ আজ বাঙ্গালী বাবু। দ।

দাসাশ্রম।

উদ্দেশ্য।—নানাপ্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত মানবগণের সাধ্যানুসারে হিত-সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ ইহা অনাথ আতুরদিগকে আশ্রয় দিয়া, তাহাদিগের ভরণপোষণ ও সেবার বিধান করিয়া থাকে।

সাধারণ বিভাগ।—সেবালয়—ইহা গিরিডিতে অবস্থিত।

"দাসী" বিভাগ।—জনহিতৈষণা প্রবর্ত্তনা ও দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ প্রচার ও দাসাশ্রমের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগ হইতে "দাসী" নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক-মাশুল সমেত ২৲ টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়।

ডিস্পেন্সারি বিভাগ।—দাসাশ্রমকে ঔষধ সাহায্য করিবার জন্য এবং ইহার স্থায়ী ও পাকা আয়ের সংস্থান করিবার জন্য ইহার এলোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারি আছে। ঠিকানা, ৮৬ হারিসন রোড, কলিকাতা।

কার্য্যপ্রণালী।—ইহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া সম্প্রতি ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। ভগবানের কৃপার উপর বিশিষ্টরূপে নির্ভরশীল এবং সকলে একমত ও একপ্রাণ হইয়া যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা ও কার্য্যে সেইরূপ চেষ্টা করা হয়।

পারিবারিক আমোদ প্রমোদ।

সংসারের কঠোর সংগ্রামে পরিশ্রান্ত মানবের আরামের স্থান পরিবার। সুতরাং মানুষের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই পরিবারে থাকা আবশ্যক। মানুষের আকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই পরিবার সংস্কার এবং সঙ্গঠন করা কর্ত্তব্য।

মানুষ পরিবারে যত রকম সুখের প্রত্যাশা করে, তন্মধ্যে আমোদ প্রমোদ একটি প্রধান জিনিস। দরিদ্রতায় উৎপীড়িত, রোগে শোকে জর্জ্জরিত এবং পরিশ্রমে ক্লিষ্ট প্রাণে শান্তি পাইবার পার্থিব উপায়ই আমোদ প্রমোদ। সুতরাং মানুষ আপনার পরিবারেও যদি একটু আমোদ প্রমোদ না পায়, পরিবারটাও যদি একটা আফিস গৃহ হয়, এখানেও যদি হাকিম সমীপে কেরাণী বাবুর মত গুরু গম্ভীরভাবে বসিয়া কেবল কাজের কথা—কেবল সংসারের খাতাপত্র লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে হয়; তবে এই পরিবার প্রথা উঠিয়া গেলে ক্ষতির যে কি কারণ আছে, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আর ইহার পরিবর্ত্তে সমস্ত দিন আফিস এবং স্কুল কলেজের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ক্লান্ত দেহে শ্রান্তমনে বাঙ্গালী যখন গৃহে

আসিলেন, তখন যদি পিতামাতা ভাই বোন এবং স্ত্রীপুত্রের হর্ষোৎফুল্ল অমিয়-মাখা বাণীর সঙ্গে, আমোদ প্রমোদ একটু প্রাপ্ত হন, তবে কি সংসার তাঁহার নিকট স্বর্গ বলিয়া মনে হয় না? সুতরাং প্রত্যেক পরিবারেই আমোদ প্রমোদের কিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু এমন এক শ্রেণীর উৎকট কার্য্যবাদী লোক আছেন, সরস ইক্ষু-দণ্ডকে ঘানিতে পেষণ করিয়া যেমন শুষ্ক নীরস করিয়া ফেলা হয়, তেমনি সংসার তাঁহাদিগকে কার্য্যের ঘানিতে পিষিয়া এমন কঠোর করিয়া ফেলিয়াছে, যে, তাঁহারা আমোদ প্রমোদের ভিতর সময়ের অপব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না! পাছে বা চতুর সময় মূহূর্ত্তের জন্য ইহাঁদিগকে ফাঁকি দিয়া যায়, তাই ইহাঁরা কার্য্যের যষ্টি লইয়া সর্ব্বদা সময়ের পথ আগুলিয়া রহিয়াছেন!

কিন্তু একটি কথা। আমোদ প্রমোদের মধ্যে যে একটুও দোষ নাই, এমন কথা বলা যায় না। আমোদ প্রমোদের ভিতর ভয়ঙ্কর একটা মোহ আছে। এই মোহে মানুষ এমন অন্ধ হয় যে, আমোদে একেবারে মত্ত হইয়া পড়ে, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। অনেক লোক এই আমোদের কুহকে পড়িয়া সৎকাজ সৎসংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের দেশের অনেক ধনীর সন্তান এই আমোদেই মাটি হইয়া গিয়াছেন—এখনও যাইতেছেন।

এমন অনেক খাদ্য দ্রব্য দেখা যায়, যাহার অল্প একটু খাও, তোমার নির্জ্জীব প্রাণ সবল হইবে; বেশী খাও, তোমার সবল প্রাণকেও সংহার করিবে। আমোদ প্রমোদও ঠিক সেই প্রকার। ইহা যতক্ষণ পরিমিত ততক্ষণই ভাল, আর যখন দেখিলে অপরিমিত হইল, তখনই জানিবে, তাহার ফল বিষময় হইবে। আমোদপ্রমোদের আরো দুইটী দিক্ আছে। আমোদপ্রমোদ যতক্ষণ পরিবারে, আপনার পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্ত্রী পুত্র অথবা প্রকৃত বন্ধুদিগের মধ্যে আবদ্ধ, ততক্ষণই ইহার ফল অতি শুভ; কিন্তু যখন সে আমোদ ঐ সকল অতিক্রম করিয়া বাহিরে "এয়ারের" এবং অসৎ কার্য্যের মধ্যে চলিল, তখনই ভয়ানক আশঙ্কার কথা। তখন হয় তো ঐ আমোদ প্রমোদই তোমার হাত দুখানি ধরিয়া তোমাকে নরকের পথে লইয়া যাইবে। ইহার দৃষ্টান্ত, বর্ত্তমান সময়ে একবার আমাদের যুবক এবং বালক মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া দেখ,—তাহারা বাহিরের কুৎসিৎ আমোদের স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া কোন্ নরকের দেশে চলিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে বালক এবং যুবকদিগের নৈতিক দুর্গতি ও চরিত্রহীনতার প্রধান কারণ কি? সুরুচিসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি যাঁরা, তাঁরা দেখিতে পান, বাহিরের কুৎসিৎ আমোদই ইহার একটি বিশেষ কারণ। ঐ দেখ না বেশ্যাশ্রিত থিয়াটারগুলি বালক এবং যুবকদিগের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহাদের কোমল প্রাণে কি কীট প্রবেশ করাইয়া দিতেছে! তাহাদের সেই সুধাময় মুকুল-জীবন গুলিকে কি বিষময় করিয়া ফেলিতেছে। হায়! দেশের লোকগুলি একবার এদিকে চাহিয়াও দেখে না। চাহিয়া দেখা ত দূরের কথা, আরো দেখি একদল রুচিবিহীন সাহসশূন্য দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক,—যাঁহারা সমাজের ভয়ে পরিবারে কোনরূপ আমোদ প্রমোদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না, ওদিকে আমোদের সখ্‌টি ও বিলক্ষণ; তাই আর কি করেন,—দায়ে পড়িয়া ঐ সমস্ত রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়া আমোদ-স্পৃহা চরিতার্থ করেন; আর লম্বা চৌড়া প্রশংসাপত্র বাহির করিয়া এই যুবক-জীবন-বিনাশকারী থিয়েটারগুলির পক্ষ সমর্থন করেন। আমরা বুঝিতে পারি না, যখন ঐ সকল প্রশংসাকারীদিগের সমক্ষে অভিনেতা ভদ্র সন্তানগুলি অভিনেত্রী বারাঙ্গনাদিগকে কখনও স্ত্রী সম্বোধনে আলিঙ্গন, কখনও মাতৃ সম্বোধনে তাহাদের চরণ বন্দন, কখনও বা অন্য কোন সম্বোধনে একত্র উপবেশন এবং হাস্য পরিহাস করিতে থাকে, তখন ঐ লোকগুলির দুর্দ্দশা ভাবিয়া কেমন করিয়া তাঁহারা চক্ষুর জল সম্বরণ করেন!

বেশ্যাশ্রিত থিয়েটার গুলির এই এক দোষ ত চক্ষুর সম্মুখেই দেখা যাইতেছে, যে কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে বেশ্যাদিগের আওতায় পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। কোন বুদ্ধিমান যদি বলেন, "বেশ্যাদিগের সঙ্গে থাকিলেই যে মারা পড়িতে হইবে, এমন তো কোন কথা নাই।" আমরা বলি, যে দেশের শাস্ত্রে বলে "ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্" সে দেশের লোকের মুখে ও কথা আর শোভা পায় না। তার পর যে সমস্ত অসংযত অগঠিতচরিত্র যুবক এবং বালকেরা এই রঙ্গালয় দর্শন করিতেছে, তাহাদের রুচি বিকৃত হইয়া যাইতেছে। মায়াবিনী কলঙ্কিনীদিগের কুহকে পড়িয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমি একবার একটি ছাত্রালয়ে কিছুদিন বাস করিতাম; সেখানে দেখিতাম, অনেকগুলি ছাত্র পড়াশুনা ফেলিয়া, অভিনয়ের প্রত্যেক বারগুলিতে থিয়েটার দেখিতে যায়। তাহার একজনকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ধৈর্য্য যে দেখিতেছি

আশ্চর্য্য! আপনি যে রাত্রি জাগিয়া কত ক্লেশ সহ্য করিয়া রোজ রোজ থিয়েটার দেখিতে যান, ইহাতে কি আপনার বিরক্তি হয় না?" তিনি বলিলেন—"আশ্চর্য্য শুনিলে আরো অবাক্ হইবেন, আমি বরাবর একই থিয়েটারে যেয়ে থাকি।" আমি বলিলাম "তাহার অর্থ কি?" তিনি বলিলেন—"অর্থ আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি! সেই যে একদিন একটা স্ত্রীলোকের মুখে কি এক সঙ্গীত শুনিয়াছি, কিভাবে যে তাহার মুখখানি দেখিয়াছি, আর সে মুখ, সে কণ্ঠ ভুলিতে পারি না। সরল প্রাণে বলিতে কি, আমি স্বধু সেই স্ত্রীলোকটাকে দেখিতেই রোজ থিয়েটারে যাই।" আমার মনে হইল, হায়! এতদূর যখন গড়াইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই এই যুবক সেই বেশ্যার প্রলোভনে থিয়াটারে ঢুকিবে।

এই থিয়েটার দেখিয়া যুবকদিগের আরো কতকগুলি কুশিক্ষা হইতেছে—অশ্লীল সঙ্গীতে রুচি-বিকৃতি, নারীচরিত্রে ঘৃণা এবং সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ। থিয়েটারের প্রহসনগুলি সম্প্রদায়বিশেষের অযথা নিন্দায়, শিক্ষিতা মহিলাদিগের অনর্থক কুৎসায় এবং কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। আমরা দেখিয়াছি, যুবক ও বালকগুলি অভিনয় দেখিয়া যখন বাসায় আসে, তখন যে সমস্ত উৎকৃষ্ট চরিত্রের অভিনয় দেখিয়াছে, তাহার বড় একটা আলোচনা করে না; কিন্তু প্রহসনগুলিতে সম্প্রদায়বিশেষকে এবং শিক্ষিতা রমণী-দিগকে যে সমস্ত গালাগালি দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল আলোচনা করে এবং অশ্লীল সঙ্গীত গাহিয়া সমবয়স্কদের সঙ্গে এয়ারকি দেয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, যুবক এবং বালকদিগের থিয়েটারে যাইবার প্রবল গতিটাকে কিরূপে ফিরান যাইতে পারে? কি উপায়ে তাহাদের কুৎসিৎ আমোদ বন্ধ হইতে পারে? ইহার একমাত্র উপায় পারিবারিক আমোদ প্রমোদ। যুবক এবং বালকদিগের উল্লিখিত আমোদের ঝোঁকটা যে এত প্রবল, তাহাতে তাহাদের খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির দৌরাত্ম্যে দিবানিশি দর্শন ও বিজ্ঞান লইয়া বেচারীদের তরল মস্তিষ্ক কতই না ঘুরাইতে হই-তেছে, শিরঃপীড়াও এই সুযোগে দর্শন দিয়াছে। ইহাতে যদি আমোদের সুশীতল বরফ জল একটু তাহাদের মাথায় না পড়ে, তাহা হইলে চলিবে কেন? ইংরাজ বালকগুলির জন্য তাহাদের ঘরে বাহিরে কত রকম আমো-দের বন্দোবস্ত। আর আমাদের পরিবারেও কোন প্রকার আমোদের

বন্দোবস্ত নাই, বাহিরেও কোন প্রকার বিশুদ্ধ আমোদ নাই। কাজেই যুবক এবং বালকেরা বাহিরের কুৎসিৎ আমোদে যোগ দেয়। এখন আমরা পরিবারে যদ্যপি বিশুদ্ধ আমোদের বন্দোবস্ত করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাদের বাহিরের কুৎসিৎ আমোদে যোগ দেওয়াও বন্ধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার বন্ধনটাও দৃঢ় হয় এবং এই উপলক্ষে নৈতিক শিক্ষারও সুযোগ পাওয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, এই পারিবারিক আমোদের কিরূপ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে?

চারি বৎসর হইল, আমি কোন স্থানে কোন একটি সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাস করিতেছিলাম। সেই পরিবারের কয়েকটি ছেলে মেয়ে যেন এক একটি স্বর্গের ফুল। বেশ সুন্দর সুকুমার হাসিখুসি মুখ, সরল শুভ্র সুকোমল প্রাণ। কয়েকটিতে আমোদ প্রমোদে সেই পরিবারটিকে এমন সুখশান্তিময় করিয়াছিল, যে, আমরা তো অনেক সময় আনন্দে ডুবিয়া থাকিতাম; যাঁহারা এই পরিবারে বেড়াইতে আসিতেন, তাঁহারাও আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন, বালকবালিকাদিগকে প্রাণের ভাল বাসা দিয়া যাইতেন। ইঁহাদের আমোদ ছিল কি রকম, শুনুন। একটি বালিকা হইত ধ্রুব। আর দুটি হইত ধ্রুবের সখা; দু একটি গান, একটু অভিনয় করিয়া দশ পোনের মিনিটের মধ্যে এ দৃশ্যটি সমাপ্ত করিত। আবার একটি বালিকা হইত মা; দুটি হইত মেয়ে; ইংরাজীতে বালিকারা বেশ এদৃশ্যটি অভিনয় করিত। আবার একটি বালিকা হইতেন লক্ষ্মী, আর কয়টি হইত সখী; ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুমিষ্ট গান করিত। এক ঘণ্টার মধ্যেই অভিনয় শেষ হইত। উক্তরূপে অভিনয় ব্যতীত কোন বালিকা হারমোনিয়ম বাজাইত, কেহ বা গান করিত; বেশী বয়সের পুরুষ রমণীরা শিক্ষাপ্রদ গল্প করিতেন। ইহাতে এক দিকে যেমন আমোদও পাওয়া যাইত, অন্য দিকে তেমনি শিক্ষাও হইত।

আমরা বলি, আমাদের পরিবার গুলিতে কি, উল্লিখিত পরিবারের মতন আমোদ প্রমোদ প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে না? আমাদের পরিবারের অভিভাবকেরা যদ্যপি, আমাদও হয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়, অথচ কোনরূপ লজ্জাজনক দৃশ্য না থাকে, এপ্রকার দু এক খানি ক্ষুদ্র নাটক প্রস্তুত করিয়া বালকবালিকাদিগকে শিখাইয়া দেন, তাহা হইলে বোধ হয় বালকবালিকারা মিলিয়া মাঝে মাঝে অভিনয় করিতে পারে, তাহাতে গৃহের আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া প্রতিবাসীরা বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করিতে পারেন। ইহার সঙ্গে যদি বালকবালিকাদিগকে হারমোনিয়ম, পিয়ানো কিম্বা অন্যান্য যন্ত্রাদি শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর কিয়ৎকাল পরিবারের সকলে বসিয়া বালকবালিকাদের সঙ্গীত এবং বাজনা শুনিতে পারেন।

বালকদের সঙ্গে বালিকাদিগকে যুক্ত করিয়াছি বলিয়া কথাটি অনেকের কাছে নূতন বোধ হইতে পারে। অনেকে বলিতে পারেন, "মেয়েরা, ছি! তারা আবার গান করিবে কি!" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কথাটা এদেশের পক্ষে

নূতন নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ভদ্ররমণীদিগের মধ্যে সঙ্গীতের প্রথা ছিল। বিবাহ বাড়ীতে কিম্বা অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানে দল বাঁধিয়া ঘরের বধূরা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া গলা ছাড়িয়া গান গাহিতেন। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ইংরাজী শিক্ষার ঢেউ লাগায়, শিক্ষিত বাবুরা এখন তাহা তুলিয়া দিয়াছেন। তা, সে সময়কার সেই মেয়েদের সঙ্গীত যেরূপ অশ্লীল ছিল, তাহা তুলিয়া দেওয়াই ভাল হইয়াছে। কিন্তু মূর্ত্তিমতী সঙ্গীত যে রমণীজাতি, তাঁহাদিগকে সঙ্গীত-বিদ্যা হইতে একেবারে বঞ্চিত করাও একটা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা হইয়াছে। তাহাতে দেশেরও বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষিত বাবুরা রমণীদিগের অশ্লীল সঙ্গীত তুলিয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে যদি বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে মেয়েদের দুটি গান শুনিবার জন্য আজ তাহাদের এই পাপ থিয়েটার কিম্বা অন্য কোন কুস্থানে যাইতে হইত না।

আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, বিরাট রাজার কন্যা উত্তরাকে অর্জ্জুন নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনকালে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া সঙ্গীত করিতেন। যাউক, আমাদের সে সব মহাভারতের কথায় আর দরকার নাই। আমরা বলি, ১৩।১৪ বৎসরের ভাইদের সঙ্গে মিশিয়া ১১।১২ বৎসরের বোনেরা যদি অভিনয় করেন, সঙ্গীত করেন, তাহাতে আর আপত্তি কি? এইরূপ হইলেই পারিবারিক আমোদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর কৃপায় এবং পরদুঃখকাতর দাতাগণের সাহায্যে দাসাশ্রমের আর একটী মাস নিরাপদে অতীত হইয়া গেল। নিম্নে আতুরগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল:—

১। দামো, ২। তিতুরাম, ৩। টোকানী, ৪। দেবীয়া, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। শিবু ৭। ফুলকুমারী, ৮। স্বর্ণ, ৯। বাবুরাম। ইহারা সকলেই পূর্ব্ববৎ দিন কাটাইতেছে।

১০। নেসবতী—জাতিতে গোয়ালা। নিবাস দিনাজপুর। বয়স ২৩।২৪ বৎসর। জন্ম হইতেই ইহার শরীরের বামপার্শ্ব অবশ। অন্য কোন পীড়া নাই। দিনাজপুরের ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর মহাশয় নিজে আসিয়া সেবালয়ে রাখিয়া গিয়াছেন।

১১। দুখীয়া—ঐ নেসবতীর পুত্র। ইহার বয়স প্রায় চা'র বছর। পেটটী প্লীহাতে পূর্ণ। ইহার অন্য কোন রোগ নাই। অতটুকু শিশুকে মা ছাড়া করিয়া রাখা যায় না বলিয়া, ইহাকেও সেবালয়ে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

১২। নবদুর্গা সরকার। বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসর। দুটী চক্ষু অন্ধ। ইহাকে মাণিকদহ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

১৩। রামজী—কিছুদিন হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে।—ভগবান ইহার আত্মার কল্যাণ করুন।

১৪। ১৫ বুড়া ও বুড়ী—মেহেরপুরে অতি দুরবস্থায় কাল কর্ত্তন করিতেছিল। উভয়েরই বয়স প্রায় ৬০।৭০ বৎসর। বৃদ্ধটীর উত্থান শক্তি নাই। বৃদ্ধাও প্রায় তদ্রূপ।

তথাকার স্কুল সমূহের সহৃদয় সব্ ইনিস্পেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাদিগকে পাঠাইয়া দেন। মেহেরপুর হইতে কলিকাতা আসিতে ইহারা এত ক্লেশ পাইয়াছিল যে, এই খানে আসিয়া কথা বলিবারও শক্তি ছিল না ; এমন কি ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছিল। যখন ইহারা আমাদের কার্য্যালয়ে পঁহুছিল, তখন অসাড় অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। এমতাবস্থায় আমরা গিরিডিতে পাঠাইতে কিছুতেই সাহস করিলাম না। অবশেষে মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া এবং শুষ্ক পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করাইয়া Little sisters of the poor এর নিকট লইয়া গেলাম। তাঁহারা ইহাদের অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন।

১৬। একজন হিন্দুস্থানী—আড়কাটীরা ফাঁকি দিয়া আসামে লইয়া গিয়াছিল। সেখান হইতে নানা রোগে পীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ একটী খোলার ঘরে মলমূত্রে মাখামাখি হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কার্য্যালয়ে খবর দেওয়ায়, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করাইয়া, হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা আছে।

গিরিডি সেবালয়ের আয় ব্যয়।

আয়।—মণি অর্ডার ৯০৲, শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্টবিহারী কুণ্ডুর চাঁদা ১৲, গত মাসের জের ৲৷৭॥ হাওলাৎ জমা ১৯৲, সর্ব্বসুদ্ধ জমা ১১২৷৭॥ এক শত বার টাকা আট আনা দেড় পয়সা মাত্র।

ব্যয়।—কর্ম্মচারীর বেতন ৫০৷৴২॥ সংসার খরচ ৩৮৷৴২॥, গোয়ালা ।/৫, ধোপা।৵১৫, দাহ খরচ ১৷৷০, বাড়ী ভাড়া ১৮৲, বাজে খরচ ।১৫, মোট ১০৯৸০।

মোট জমা খরচ।

জমা—১১২৷৷৭॥ ।—

বাদ খরচ ১০৯৸০, হস্তেস্থিত ২৸৭॥, দুই টাকা বার আনা দেড় পাই।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বিগত মাসে নিম্নলিখিত মাসিক চাঁদা ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দীনদয়াল পরমেশ্বর পরদুঃখকাতর দাতাগণের মস্তকে আশীর্ব্বাদবারি সিঞ্চন করুন।

(২৫শে মে হইতে ২৪শে জুন পর্য্যন্ত)

মাসিক চাঁদা।

বাবু অনাথনাথ দেব মে মাসের চাঁদা ১৲, বাবু নন্দলাল দত্ত এপ্রিলের চাঁদা ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী বৈশাখের চাঁদা ১৲, N. K. Bose Esq মে মাসের চাঁদা ১৲, বাবু হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ ঐ ১৲, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস ঐ ঐ ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র ঐ ঐ ১৲, A. Lady ঐ ঐ ১৲, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ঐ ঐ ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ঐ ঐ।০, বাবু কেদারনাথ দাস ঐ ঐ।০, নবাব সৈয়দ আবদুল সোভান চৌধুরী ঐ ঐ ১৲ A. Sen Tnrough G. N. Sen ঐ ঐ।০, বাবু তেজচন্দ্র বসু ঐ ঐ॥০, বাবু রাখালদাস মিত্র এপ্রিল ও মের চাঁদা ॥০, N. C. Baral Esq মে মাসের চাঁদা ১৲,

এককালীন দান।

বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ॥০, বাবু রামতনু লাহিড়ী ॥০, বাবু বসন্তকুমার লাহিড়ী ॥০, বাবু দুর্গাদাস বসু ১৲, বাবু বিষ্ণুচন্দ্র মুখো ॥০, বাবু গোষ্ঠবিহারী সামন্ত ৵০, বাবু বসন্তকুমার সরকার ॥০, মৃত কালীপ্রসন্ন বসু শ্রাদ্ধোপলক্ষে ॥০, মিসেস সেন—লেডী ডাক্তার চুঁচুড়া পুত্রের জন্মদিনে ১৲, বাবু প্রমথনাথ দাস ১৲, বাবু হরিচরণ দাস ৩৲, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দাস ২৲, ডাঃ শরৎচন্দ্র চন্দ ॥০, বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত ২৲, বাবু অভয়াচরণ দাস M. A, ২৲, বাবু নারায়ণচন্দ্র বসু ২৲, বাবু রাজচন্দ্র দাস ১৲, বাবু কালীমোহন দেব ১৲, বাবু বিপুলচন্দ্র গুপ্ত

২৲, শ্রীমতী মনোমোহিনী ঘোষ ১৲, শ্রীমতী হরিদাসী দেবী ১৲, বাবু জগৎচন্দ্র দাস ৫৲, বাবু শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ৫৲, বাবু কামিনীকুমার চন্দ ৫৲, বাবু হেমেন্দ্রনাথ দত্তরায় পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে ১৲, বাবু বিহারীলাল মজুমদার ১৲, বাবু রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ৫৲, বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১৲, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ১৲, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ১৲, বাবু হরকান্ত বসু মৃতঋষির পরিত্যক্ত ৮১২॥, বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু M. A. ৬৲, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ২৲, বাবু ইন্দ্রনারায়ণ সাধু খাঁ ৷১০, বাবু রাজেন্দ্রনাথ শেঠ ১৲, বাবু শরচ্চন্দ্র সিংহ ১৲, J. Ghoshal Esq ১৲, রায় রামশঙ্কর সেন বাহাদুর ১৲, বাবু অভয়াচরণ পাল ২৲, বাবু বিপিনবিহারী রায় ৭।০, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বৈদ্যরত্ন ১৲, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সরকার।০, বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় ॥০, বাবু কিশোরীলাল সরকার ১৲, বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২৲, বাবু চারুচন্দ্র সরকার ১৲, বাবু চন্দ্রকান্ত সেন ১৲, বাবু হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ১৲, মা—জামালপুর ৮৲, বাবু জয়কৃষ্ণ বসু।০, অজ্ঞাত ১৫৩১ কটন ষ্ট্রীট ২৲, বাবু রাধানাথ মুখোপাধ্যায় ১৲, বক্স এলাহি।০, বাবু কেদারনাথ কুলভী ১৲, বাবু বিজয়বিহারী চট্টো ১৲, বাবু গিরিশ্চন্দ্র সেন ॥০, বাবু লক্ষ্মীশ্বর হাজারিকা ১৲, A friend, Victoria Hostel /০, বাবু নলিনাক্ষ রায় চৌধুরী।০, বাবু হরিপদ বসু।০, বাবু রাইচরণ বিশ্বাস।০, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় /০, পণ্ডিত নৃত্যগোপাল কবিরত্ন ৪৲, বাবু নিরুপমকুমার বিশ্বাস ১৲, বাবু কেদারনাথ দত্ত ১৲, বাবু প্রসন্নকুমার মুখো ১৲, মৌলবী মহম্মদ ইয়ুসুফ খাঁ ১৲, বাবু আনন্দচন্দ্র দাস ২৲, বাবু যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ।০, বাবু বিরাজকৃষ্ণ ঘোষ ১৲, বাবু অক্ষয়কুমার মুখার্জি ১৲।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

এজেণ্ট দ্বারা পুস্তক বিক্রয়, কমিশন ও পার্শেল খরচ বাদ, ২০৲, চাউল বিক্রয় ২৸/০।

চাউল।

মুষ্টি ভিক্ষা পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

বস্ত্রাদি।

বাবু বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ—গরম কোট ১, বাবু কেদারনাথ মজুমদার দ্বিতীয় M. B. পরীক্ষায় পাশ উপলক্ষেঃ—ধুতি ৬, চাদর ২, সার্ট ৫, বালিসের ওয়ার ১, বিছানার চাদর ১, খাট ১, গঞ্জিক্রক ১।

বাবু হরকান্ত বসু মৃতঋষির পরিত্যক্তঃ—সোনার মাদুলী ১, ধুতি ৪, সোনার দানা ৩, নূতন ধুতি ১, ফ্লানেলের জামা ১, বিছানার চাদর ১।

মোট আয়।

মাসিক চাঁদা ১২৸০, দানপ্রাপ্তি ১০৬॥/২॥০, অন্যান্য প্রকারের আয় ২২৸/০, বিগত মাসের জের ৩৫৸/৷১০, উদ্বৃত্ত জমা ৵০, মোট আয় ১৭৮/১২॥।

ব্যয়।

পূর্ব্বের পার্শেল খরচ ॥/১০, আদায়কারীর ব্যয় ১৮।/১৫, মুটে ৵০, গিরিডি সেবালয় মঃ অঃ কঃ সহিত ১১১।৵০, ডাক ব্যয় ১৲, মেহেরপুরের দুটী রোগীর জন্য ১৫॥৵০, একটী পথে পরিত্যক্ত রোগী হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যয় ॥০, এজেণ্টের দরুণ ব্যাগ ২৲, মাণিকদহের একটী আতুর গিরিডিতে পাঠাইবার ব্যয় ১০৵০, রোগীর আহার ৵০, বিবিধ ৶১২॥, মোট ব্যয় ১৬০৷১৭॥।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ১৭৮/১২॥, মোট ব্যয় ১৬০৷১৭॥, হস্তেস্থিত ১৮৷১৫।

স্থানাভাবে মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার দেওয়া গেল না।

কলিকাতা, ২০৮।২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, "দাসী"-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীললিতমোহন দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দাসী

আমার পশ্চিম ভ্রমণ।

(শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত)

ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে (১৮৬৭) মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ ও ভক্তিভাজন বাবু রামতনু লাহিড়ীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ে রামগোপাল বাবু পীড়িত হইয়া জলবায়ু পরিবর্ত্তনার্থ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় ভাগলপুর হইয়া যান। কিছুদিন পরে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়। রামতনু বাবু এই সময় তাঁহার ভাগলপুরস্থ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদিন জাতিবিভেদ লইয়া তাঁহার সহিত আমার ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। আমি বলিলাম, "যখন সকল দেশে সকল সমাজে জাতিবিভেদ কোন না কোন প্রকারে আছে ও থাকিবে, তখন আমাদের দেশের জাতিবিভেদ এতই কি দোষ করিল? আপনি কি আপনার চাকরের সহিত একত্রে খাইতে পারেন?" তিনি বলিলেন, "ও যদি সাবান দিয়া গা হাত পা পরিষ্কার করে, তাহা হইলে আমি খাইতে পারি।" তর্ক যখন খুব জাঁকিয়া উঠিল, তিনি কুপিত হইয়া ইংরাজী বাঙ্গলা মিশ্রিত ভাষায় বলিলেন, "Had you not stood for the poor widow, আজ তোমায় গালাগালি দিয়া ভূতছাড়া করিতাম।" যে দিন আমি ভাগলপুর ছাড়িয়া আসি, সে দিন তাঁহার সঙ্গে কোন কারণ বশতঃ বিদায়ী দেখা করিয়া না আসাতে বৃদ্ধ আমার সহিত দেখা করিবার জন্য Railway platformএ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। Platformএ দাঁড়াইয়া কথোপকথন কালে দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সাদীর গোলেস্তাঁ হইতে এক বয়াৎ উদ্ধৃত করিয়া আওড়াই। তখন গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে হইয়াছে। রামতনু বাবু পার্শী জানেন, কিন্তু ভাল জানেন না। আমি যে বয়াৎ আওড়াইলাম, তাহার প্রত্যেক শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ তিনি তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার এক

মিনিট বিলম্ব আছে, তথাপিও তিনি ছাড়েন না। আমি দেখিলাম, মহা মুস্কিল। কোন ক্রমে তাঁহার হাত এড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক গাড়ীতে ঢুকিলাম। পথে আবার একদিন অবস্থিতি করিয়া এলাহাবাদে আমার হেয়ার সাহেবের স্কুলের সমাধ্যায়ী পুরাতন বন্ধু বাবু নীলকমল মিত্রের বাটীতে অবস্থিতি করি। তথায় তাঁহার পুত্র সপ্তদশবর্ষীয় যুবক চারুচন্দ্র মিত্র আমার যথেষ্ট শুশ্রূষা করেন। ইনি নামেও চারু, কর্ত্তব্যেও চারু। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য ঐ নামের উপযুক্ত, এমত নহে। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, সরলতা, সৌজন্য ও অতিথি সেবার জন্য ঐ নামের উপযুক্ত ছিলেন। কলিকাতায় থাকিতে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের মুখে ইহার বিবিধ গুণের কথা শ্রবণ করিয়া ইহার প্রতি অসাধারণ স্নেহভাবের উদয় হয়। পিতৃস্নেহের ন্যায় স্নেহ উদিত হয়। নীলকমল বাবুর বাটীতে (লালকুটি তাহার নাম) অবস্থিতি কালে পাঁচটি জিনিষ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। (১) একটি অতি বৃহৎ কাকাতুয়া পক্ষী। (২) একটি শিখ ভদ্রলোক। ইনি পূর্ব্বে কোতোয়ালী কার্য্য করিতেন। নীলকমল বাবুর কোন বিশেষ উপকার করাতে তিনি তাঁহার কর্ম্মচ্যুত অবস্থায় আপনার বাটীতে তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন। (৩) ব্রাহ্মদিগের ঘর। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্ম জাওয়ান থাকিত। (৪) একটি ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম হরিবোল ব্রাহ্মণ ছিল; নামাবলী গায় দিয়া সর্ব্বদা "হরি হরি বোল" বলিয়া বেড়াইতেন। (৫) একটি ঘর যাহাতে একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ভাগবত পাঠ করিতেন। কিছুদিন এলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়া আগ্রায় যাই। তথায় স্বপ্নে দৃষ্ট কোন অপূর্ব্ব রমণীর স্বর্গীয় দৃশ্যের ন্যায় মনোহর তাজমহল দর্শন করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরে বাবু (পরে রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হই। তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক কাইসার বাগস্থ তাঁহার অতি শোভনতম রাজভবনবৎ বাটীতে আমাকে দুই তিন দিন রাখেন। আমার সহিত বিখ্যাত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কর তাঁহার অতিথি হয়েন। এক দিন দক্ষিণা বাবুর বাটীতে উপাসনা করি। সে উপাসনা শুনিয়া হেমচন্দ্র কর বলেন যে এ উপাসনায় কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান, কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, সকলেই ইহাতে যোগ দিতে পারেন। লক্ষ্ণৌএ কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া পুনরায় এলাহাবাদে ফিরিয়া আসি। তথায় অবস্থিতি করিবার কালীন কানপুরের

কতকগুলি ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত এক অতি বিনীত আবেদন-পত্র প্রাপ্ত হই। আমি এইরূপ আবেদন-পত্রের উপযুক্ত নহি। সেই পত্রে তাঁহারা কানপুরে কিছুদিন থাকিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই নিমন্ত্রণ অনুসারে কানপুরে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদিগের সমাজে উপাসনা করি। তৎপরে লক্ষ্ণৌয়ে পুনরায় গমন করিয়া দক্ষিণা বাবুর আলয়ে তিন সপ্তাহ অবস্থিতি করি। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিলাতে বিখ্যাত Times পত্রে ইংরাজের পক্ষে দুই একটি প্রবন্ধ লেখাতে এবং বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় মিসনারি ডাক্তার ডফ্‌ লর্ড ক্যানিংএর নিকট তাঁহার গুণানুবাদ করাতে লর্ড বাহাদুরের অনুগ্রহদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে অযোধ্যা প্রদেশে লর্ড বাহাদুর এক জমিদারী প্রদান করেন। দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যা প্রদেশের পুনর্জন্মদাতা বলিলে হয়। তিনি লক্ষ্ণৌতে ক্যানিং কলেজ ও Oudh British Indian Association সংস্থাপন করেন। দক্ষিণা বাবু বিখ্যাত ডিরোজিও সাহেবের ছাত্র ছিলেন। ইহা সকলেই জানেন যে ডিরোজিওর ছাত্রেরা অত্যন্ত ইংরাজীভাবাপন্ন লোক। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যায় গিয়া টিকি রাখিয়া পরম হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি তথাকার একটি ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ঐ পুত্র উঁহার ঔরসে ও উঁহার বিবাহিতা বর্দ্ধমানের বিখ্যাত বিধবা রাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে হয়। আমি যে তিন সপ্তাহ তাঁহার ওখানে অতিথি স্বরূপ থাকি, তন্মধ্যে এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করি। ঐ ব্রাহ্মসমাজ লক্ষ্ণৌএ সংস্থাপিত প্রথম ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু আমি উহার ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া সংস্থাপন করি নাই, অন্য একটি নাম দিয়া উহা সংস্থাপন করি। পরে ব্রাহ্মসমাজ নাম ধার্য্য করি। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন উপলক্ষে অনেক লোক আমার নিকট গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিল। একদিন দক্ষিণা বাবু আমাকে বলিলেন যে "তুমি জান তোমার পিছু আমি গোয়েন্দা রাখিয়াছি; পাছে পাগলা undo the work I have done in Oudh। অর্থাৎ অযোধ্যায় হিন্দু হইয়া আমি যে কাজ করিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন রূপ অহিন্দু কার্য্য দ্বারা পাগল তাহার বিলোপ সাধন না করে।" আমি উত্তরে বলিলাম যে "কেবল আমি পাগল নহি, আপনিও কিঞ্চিৎ পাগল। আপনি পাগল না হইলে ক্যানিং কলেজ ও British

Indian Association সংস্থাপন করিতে পারিতেন না।" দক্ষিণা বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন; কিন্তু তিনি রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যেমন কেবল উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত হইত, কেবল তাহাই হওয়া কর্ত্তব্য, এমন মনে করিতেন। আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজকে অহিন্দু ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার ভ্রম ছিল। যখন আমরা সকল হিন্দু শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করি এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদিক বাক্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করি, তখন আমরা কি প্রকারে অহিন্দু হইলাম? দক্ষিণারঞ্জন উপনিষদকে অত মান্য করিতেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় বেদের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতেন না। লক্ষ্ণৌতে একবার কোন সাহেবের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথনের সময় তিনি গোমতীর অপর পারস্থ প্রকৃতি-পটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "There's the Brahmin's Bible."। তিনি বলিতেন "বেদের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।" কিন্তু উপনিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং উপনিষদই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ হওয়া কর্ত্তব্য; এমন মনে করিতেন। তাঁহাকে ঔপনিষদিক্ ব্রাহ্ম বলিলেই হয়। প্রণবের প্রতি আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা, দক্ষিণা বাবুর সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতেন, তখন তাঁহার চাপরাসীদিগকে "ওঁ" অঙ্কিত তক্‌মা পরিধান করাইতেন। সিপাহি বিদ্রোহের পর যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত রাজ্যের ভার ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে লইয়া নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন, তখন সেই উপলক্ষে এক ঘোষণা পত্র বাহির করেন। যে দিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে ও উপনগরে ঐ ঘোষণা পত্র উদ্‌ঘোষিত হয়, সেইদিন মহা মহোৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের দিনে দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার ঢাকার জমিদারীতে ব্রাহ্মসমাজ করিয়া মহারাণীর প্রতি ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও অন্যান্য কার্য্য-বৃত্তান্ত যে ইংরাজী পুস্তকে ছাপা হইয়াছিল; সেই পুস্তকের এক খণ্ড লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থিতি কালে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা আমি অতি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়াছি। দক্ষিণারঞ্জন বলিতেন যে তিনি যেমন ধর্ম্মসংস্কারক, তেমনি সমাজসংস্কারক। স্বামী রাজকুমারীকে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতা আনিয়া কলিকাতায় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট বার্চ সাহেবের সম্মুখে civil marriage করেন। তাহার সম্পাদক

গুড় গুড়ে পণ্ডিত ও অন্যান্য ব্যক্তি এই বিবাহের সাক্ষী ছিলেন। গুড় গুড়ে পণ্ডিতের প্রকৃত নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। লক্ষৌ অবস্থিতি কালে তিনি (দক্ষিণা বাবু) আমাকে একদিন বলিলেন যে তিনি বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল বিবাহ এককালে করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সমাজ-সংস্কারক আর কে আছে? ব্রাহ্মেরা তাঁহার কাছে এই বিষয়ে দাঁড়াইতে পারে না। দক্ষিণারঞ্জন ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়-কন্যার বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত জ্ঞান করিতেন। আমি যখন লক্ষৌতে ছিলাম, তাহার পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছিল। কেবল পৌত্র বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার নাম ভুবনরঞ্জন।* তিনি উইল না করিলেও এই পৌত্রের বিষয় প্রাপ্ত হইবার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

লক্ষৌর দক্ষিণা বাবুর ওখানে তিন সপ্তাহ অতিবাহন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে কানপুর ফিরিয়া আসি। সাম্বৎসরিক উৎসবের দিবস হিন্দু ধর্ম্মসম্প্রদায় বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতাতে প্রমাণ করি যে আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে। দাদু, কবীর ব্রাহ্ম ছিলেন। যে আট মাস কানপুরে কাটাই, তাহার মধ্যে এক মাস হেমচন্দ্র সিংহের বাটীতে ও আর এক মাস ডাক্তার অক্ষয়কুমার দের বাটীতে থাকি, আর কয়েক মাস ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকি। হেমচন্দ্র সিংহ ব্রাহ্ম ছিলেন। অক্ষয়কুমার দে ব্রাহ্ম ছিলেন না। উভয়ে যার পর নাই আমাকে যত্ন করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র সিংহ বড় মজার লোক ছিলেন। হিন্দুভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নাম তিনি "নামাবলী" রাখিয়াছিলেন। আমাকে সর্ব্বদাই বলিতেন, "নামাবলীটী ছাড়ুন।" একদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাই, ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়াতে তিনি বলিলেন যে আপনার দেরি হওয়াতে আমি মনে করিলাম যে "আপনি নৈমিষারণ্যে চলিয়া গিয়াছেন।" নৈমিষারণ্য কানপুরের পর পারে কিছুদূর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমার হিন্দুভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। এক দিন কানপুরের সকল ব্রাহ্মকে লইয়া আমি বিটুর গ্রামে বাল্মীকি তপোবনে গমন করি। বাল্মীকির তপোবনে বাল্মীকির উপাসিত চিরন্তন ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া বৈকালে পরপারস্থ সীতা-পরিহার মন্দিরের সম্মুখে এ পারের ঘাটে বসিয়া রামায়ণ বিষয়ে বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতা তত-

* তিনি এক্ষণে (১৮৯৫) জীবিত আছেন।

বোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই বক্তৃতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে রামায়ণ অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করে। সমস্ত দিন আনন্দে কাটান যায়। বিটুর গ্রামে বৎসর বৎসর একটী মেলা হয়। ঐ গ্রামের অপর নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই স্থানে একটি মহারাষ্ট্রীয় উপনিবেশ আছে। ঐ স্থানে খ্যাত্যাপন্ন (সুখ্যাতি-সম্পন্ন কি কুখ্যাতিসম্পন্ন, পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন) ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবের নিবাস ছিল। দেখিলাম, তাঁহার বাটী ইংরাজেরা সমভূমি করিয়াছে। কেবল এক জোড়া প্রকাণ্ড ফটক পড়িয়া আছে। বিটুরবাসী মহারাষ্ট্রীয়দিগের বালিকা কন্যাগুলি চেহারা ও বেশভূষায় ঠিক আমাদের বাঙ্গালি বালিকার ন্যায় দেখিতে। তাহাদিগকে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম।

তুকারাম।

সপ্তম প্রস্তাব।

তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন ও কথকতা কিরূপ হৃদয়গ্রাহী হইত, আমরা তাহা উল্লেখ করিয়াছি। দেহুর নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামের লোক, তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতেন। হরিকথাতেই তুকারামের আনন্দ, লোকে আগ্রহের সহিত তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ করে, ইহার অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই ভাবিয়া তুকারাম আনন্দিত চিত্তে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য, সেই সকল গ্রামে গমন করিতেন। ক্রমে অনেক লোকেই তাঁহার অনুরক্ত ও মতাবলম্বী হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু সাধারণ লোক, যেমন তাঁহাকে সাধুভক্ত জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন, ঈর্ষাকলুষিত আত্মাভিমানী ধর্ম্মব্যবসায়িগণও তেমনই তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহীপতি বলেন, "যাহাদিগের বিদ্যা, বয়স, রূপ, জাতি ও কুলের অভিমান প্রবল, সাধুদিগের প্রবাদবাণী তাহাদিগের তৃপ্তিকর হয় না। কাহার কোন বংশে জন্ম, কে কোন পথাবলম্বী, কাহার শাস্ত্রজ্ঞান কতদূর, এই সকল কথা লইয়া ইহারা মত্ত থাকে। প্রকৃত ধর্ম্ম কিরূপে লাভ করিতে পারা যায়, তাহা তাহাদিগের লক্ষ্য থাকে না। তুকারাম শূদ্র হইয়া, ব্রাহ্মণকেও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, এবং শাস্ত্রজ্ঞানবিরহিত হইয়া, শাস্ত্রের মর্ম্ম

সাধারণের নিকট প্রচার করেন, ইহা কাহারও কাহারও নিকট নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। দেহুর মোহান্ত মম্বাজী গোঁসাই পূর্ব্বে তুকারামের সঙ্গে কিরূপ অসৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মম্বাজীর ন্যায় রামেশ্বর ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণও এই সময় তুকারামের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। মম্বাজী নিজের প্রতিপত্তি লোপের আশঙ্কাতেই, তুকারামের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন; কিন্তু রামেশ্বর ভট্টের আক্রোশের কারণ অন্যরূপ ছিল। রামেশ্বর নিজে "রাজমান্য" শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সাধারণের সাক্ষাতে তিনি আপনাকে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া অভিমান করিতেন। তুকারাম যেরূপ ভাবে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার মনঃপূত ছিল না। সাধারণ শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিতগণের ন্যায়, তিনি তুকারামকে একজন অজ্ঞ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে অনধিকারচর্চ্চাকারী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাহার উপর তুকারাম ব্রাহ্মণের চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার মর্ম্মদাহ হইত। উপদেশ দিতে হইলে ব্রাহ্মণই দিবেন, ভগবৎ-কথা প্রচার করিতে হইলে ব্রাহ্মণই করিবেন, ইহাই ভারতবর্ষের চিরপ্রচলিত রীতি। বণিকপুত্র তুকারামকে, যে তিনি, ব্রাহ্মণের ন্যায়, আপনাকে লোকের মুক্তিপথের পথপ্রদর্শক বলিয়া অভিমান করেন? রামেশ্বর লোকের মুখে তুকারামের কার্য্যপ্রণালী ও সুযশ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে দমন করিবার জন্য তুকারামের যে গ্রামে বাস, তাহার অধিকারীর নিকট যাইয়া তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তিনি গ্রামাধিকারীকে বুঝাইলেন, যে তুকারাম শূদ্র হইয়া শ্রুতির মর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, শাস্ত্রানুসারী ক্রিয়াকলাপাদিতে উৎসাহদানের পরিবর্ত্তে আপাতমধুর ও মোহোৎপাদক সঙ্গীতাদি দ্বারা সরলচিত্ত লোকদিগকে মতিভ্রান্ত করিতেছেন, শূদ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্রাহ্মণসন্তানদিগের নমস্কার গ্রহণ করিতেছেন, সকল ধর্ম্ম উৎসাদিত করিয়া, কি এক অদ্ভুত মত "নাম মহিমা" প্রচার ও "ভক্তি-পথ" স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মবিপ্লাবক, ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী ও "পাষণ্ড মতের" পরিপোষক। ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য তাঁহার শাসন একান্ত আবশ্যক।* রামেশ্বর ভট্ট দেশমান্য ব্যক্তি ছিলেন,

* বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অবিদিত নাই যে শ্রীচৈতন্যকেও ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্য ঠিক

সুতরাং তাঁহার মুখে এরূপ কথা শুনিয়া গ্রামাধিকারী দেহুর "পাটিল" বা গ্রামলেখককে তুকারামের নির্ব্বাসনের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। পাটিল তুকারামকে প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া দেহু ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বলিলেন। দরিদ্র তুকারাম বিষম বিপদে পড়িলেন। হঠাৎ পিতৃপিতামহের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়া সহজ কথা নয়; এদিকে গ্রামাধিকারীর অনভিমতে গ্রামে বাস করাও সম্ভব নয়। অনেক চিন্তার পর তুকারাম শেষে রামেশ্বর ভট্টের শরণাপন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। রামেশ্বর স্নানান্তে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন, তুকারাম সেই সময় যাইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তুকারাম ভাবিয়াছিলেন যে, যে হরিকথায় পাষাণও বিগলিত হয়, রামেশ্বর তাহা শ্রবণ করিলে আর তাঁহার প্রতি বিরক্ত থাকিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার সম্মুখে যাইয়া আপনার অভ্যাসানুরূপ হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রামেশ্বরের হৃদয় তাহাতে বিগলিত হইল না; তিনি বিরক্তির সহিত তুকারামকে বলিলেন, "তুকারাম তুমি শূদ্র, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন কালে তুমি যে সকল কথা ব্যক্ত কর, তাহাতে শ্রুতির অর্থ প্রকাশিত হয়। এরূপ সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা গায়ক ও শ্রোতা উভয়কেই নিরয়ভাগী হইতে হয়, শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে। অতএব তুমি এখন হইতে আর কখনও এরূপভাবে সঙ্কীর্ত্তন ও কবিতা রচনা করিও না।" ব্রাহ্মণভক্ত তুকারাম "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য" এই বলিয়া রামেশ্বরের কথার উত্তর দিলেন, এবং তাঁহাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি একাল পর্য্যন্ত যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে প্রভুর আদেশ কি, জানিতে ইচ্ছা করি।" গর্ব্বিতস্বভাব ও ধর্ম্মাভিমানী রামেশ্বর বলিলেন, "সেই সকল কবিতা ইন্দ্রায়নীর জলে লইয়া নিক্ষেপ কর।" তুকারামের হৃদয় এই নিদারুণ আদেশে ব্যথিত হইল, কিন্তু তিনি হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত না করিয়া, "যে আজ্ঞা, তাহাই হইবে," এই বলিয়া রামেশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক, প্রস্থান করিলেন। রচনা উৎকৃষ্ট হউক, বা অপকৃষ্ট হউক, রচয়িতার পক্ষে তাহা বহুমূল্যবান। নিজের পুত্রকন্যার ন্যায় তাহার প্রতি মমতা জন্মে, সুতরাং রামেশ্বরের নিষ্ঠুর আদেশে তুকারাম

এইরূপ নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল। চৈতন্য অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন; শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য শূদ্র তুকারাম যে আরও অধিক বিদ্বেষের আস্পদ হইবেন, তাহা বলা অতিরিক্ত।

যে মর্ম্মপীড়িত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নয়। বিশেষতঃ তুকারাম যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নাম, যশ, বা অর্থলাভের জন্য নয়। তাঁহার সর্ব্বস্বধন বিঠোবার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পদার্থই বিনাশ করিবার জন্য, রামেশ্বর এই কঠোর আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, দেবতা, তাঁহার আদেশ সর্ব্বথা শিরোধার্য্য, এইরূপ বিশ্বাসেই তুকারাম রামেশ্বরের আজ্ঞার প্রতিবাদ করেন নাই, ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত বাক্য অবশ্যই প্রতিপাল্য বলিয়া, তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও কবিতাগুলি ইন্দ্রায়নীতে নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় তাঁহার দারুণ ক্লেশ বোধ হইল। যে তুকারাম আপনার পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারমূলক কাগজপত্রগুলি স্বহস্তে নদীজলে নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কবিতাগুলি নিক্ষেপ করিবার চিন্তা করিতে তাঁহার হৃদয় অধীর হইতে লাগিল। তুকারাম জানিতেন যে, কবিতাগুলি আর তাঁহার নহে, তাঁহার প্রিয়তম বিঠোবার, সুতরাং বিঠোবার মন্দিরে প্রবেশ করা অবধি তাঁহার হৃদয়ের যন্ত্রণা সমধিক বর্দ্ধিত হইল। ভক্তের নিকট ভগবান, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সখা, সুহৃৎ, সকলেরই স্থান অধিকার করেন; শিশু যেমন মাতার নিকট যাইয়া, আপনার দুঃখ নিবেদন করে, তুকারামও তেমনই বিঠোবাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে আপনার বেদনা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রভো, তুমি সকলের কর্ত্তা, তুমিই আমাকে এই সকল কবিতা রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিলে, আজ তুমি আবার তাহা ইন্দ্রায়নীতে নিক্ষেপ করিবার জন্য ব্রাহ্মণের মুখে আদেশ প্রচার করিতেছ। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হউক।" তুকারাম এই বলিয়া রচিত কবিতাগুলি পাষাণ ফলকে আবদ্ধ করিয়া এবং তাহা উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া বিঠলের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ইন্দ্রায়নীর জলে নিক্ষেপ করিলেন, এবং ভক্ত যেমন প্রতিমা বিসর্জ্জনান্তে শূন্যমনে গৃহে প্রত্যাগমন করে, সেই রূপ শূন্যমনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কুটিলস্বভাব লোকেরা এই উপলক্ষে তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে বিরত হইল না। কেহ বলিল, তুকারাম আপনাকে সাধু মোহান্ত বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল; ভালই হইল যে, রামেশ্বর ভট্টের ন্যায় একজন সাধু পুরুষের দ্বারা তাহার কুটিলতা ভেদ হইল। তুকারাম প্রথম প্রথম এসকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া, নিজের ইচ্ছানুরূপ পূজা ধ্যান ইত্যাদিতেই নিমগ্ন ছিলেন; কিন্তু গ্রামের

সকল লোক যখন এক বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল যে, "তুকারাম পূর্ব্বে আপনার পৈত্রিক কাগজপত্রগুলি নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া আপনার ঐহিক সম্পদ বিসর্জ্জন দিয়াছিল; এক্ষণে আপনার একমাত্র সম্বল কবিতা-গুলিও নিক্ষেপ করিয়া নিজের পারত্রিক সম্পদ বিসর্জ্জন করিল;" তখন তাঁহার হৃদয় নিতান্তই অধীর হইল। তিনি অন্ন জল ত্যাগ করিয়া বিঠোবার মন্দিরের সম্মুখে যে তুলসীমঞ্চ ছিল, তাহারই নিকটে একটী প্রস্তর খণ্ডের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। দিবারাত্রির মধ্যে তিনি কখনও সে স্থান ত্যাগ করিতেন না বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। মহীপতি বলেন তুকারাম এইরূপ ভাবে ত্রয়োদশ দিবস অতিবাহিত করিলে পর দেহুর লোকদিগের প্রতি বিঠোবার স্বপ্নাদেশ হইল যে, "আমি তুকারামের কবিতাগুলি জলের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়াছি, তোমরা যাইয়া তাহা উদ্ধার কর।" তৎপরদিন গ্রামের লোকেরা সেই সকল কবিতা প্রাপ্ত হইয়া তুকারামকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। কৃতজ্ঞ তুকারাম এই উপলক্ষে সাতটী অভঙ্গ রচনা করিয়া বিঠোবার বন্দনা করিয়াছেন।

এদিকে রামেশ্বর ভট্ট তুকারামকে তাঁহার কবিতাগুলি ইন্দ্রায়নীর জলে নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করিয়া, শিষ্যগণের সহিত পুনরায় "নাগনাথ" নামক প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গের পূজা করিবার জন্য গমন করিতে-ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি কোন মুসলমান ফকীরের উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, তন্মধ্যস্থ জলাশয়ে স্নান করিলেন। কিন্তু স্নানের পর হইতেই তাঁহার বিষম গাত্রদাহ আরব্ধ হইল এবং কিছুতেই তিনি তাহা প্রশমন করিতে পারিলেন না। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ফকীরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন, কিন্তু রামেশ্বর ব্রাহ্মণ হইয়া মুসলমান ফকীরের শরণাপন্ন হইতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি এই গাত্রদাহ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য, জ্ঞানেশ্বরের সমাধিস্থলে যাইয়া, আশ্রয়প্রার্থী হই-লেন। অনেকেই বলিতেছিল, যে, তুকারামের প্রতি তাদৃশ নিষ্ঠুর ব্যব-হারের জন্যই তাঁহার এই অপ্রতিবিধেয় গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। রামেশ্বরও এক দিন স্বপ্ন দেখিলেন যে জ্ঞানেশ্বর তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুমি ভগবদ্ভক্ত তুকারামের অনিষ্টাচরণ করাতেই তোমার সমস্ত সুকৃত বিনষ্ট হইয়া তোমার এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। তুকারামের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন তোমার আর মঙ্গল নাই।" তুকারামের অভঙ্গ সমূহের পুনরুদ্ধার সংবাদও

এই সময় রামেশ্বরের কর্ণগোচর হইল। তখন আত্মকৃত কার্য্যের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া রামেশ্বর তুকারামের নিকট তাঁহার স্তুতিপূর্ণ এক পত্র প্রেরণ করিলেন। রামেশ্বর তুকারামের প্রতি সেরূপ অমানুষিক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেও তুকারাম তাঁহার উপর কিছুমাত্র বিরক্ত বা বিদ্বেষভাবাপন্ন হন নাই। তিনি রামেশ্বরের শিষ্যগণের মুখে ভট্টের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া, অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার পত্রের প্রত্যুত্তরে নিম্নলিখিত অভঙ্গটী রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

হৃদয় নির্ম্মল, হলে শত্রুদল, সুহৃদ্ সমান হয়।
শার্দ্দূল ভীষণ, না করে ভক্ষণ, নাহি দংশে ফণীচয়।
বিষম গরলে, সুধাফল ফলে, বিপদ সম্পদ প্রায়।
নিষিদ্ধ করম, হয় সে ধরম, সন্তাপে আনন্দ হায়॥
দীপ্ত হুতাশন, না করে দহন, বহ্নিশিখা স্নিগ্ধ হয়।
জগতে সমান, সকলের প্রাণ, কর প্রীতি বিশ্বময়।
তুকা বলে তবে, শিখিলেত এবে, জগতের কিবা রীত্।
দেব নারায়ণ, প্রসন্ন এখন, মনে রেখ সুবিহিত॥

মহীপতি বলেন যে তুকারামের প্রেরিত এই অভঙ্গ পাঠ করিয়া রামেশ্বরের গাত্রদাহ নিবারিত হইল, এবং রামেশ্বর তুকারামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হইলেন। তুকারাম তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। মধ্যপথে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, রামেশ্বর তুকারামের নিকট নিজের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য বিশেষরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তুকারাম তাঁহাকে উপযুক্ত সান্ত্বনা দান করিলেন। রামেশ্বর বলিলেন, "আপনার প্রেরিত অভঙ্গই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছে। এখন হইতে আমি আর আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না।" এই বলিয়া রামেশ্বর বিদ্যা, কুলাভিমান এবং সাংসারিক প্রতিষ্ঠার মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুকারামের চরণ ধারণ করিলেন। রামেশ্বর এই সময় হইতে তুকারামের অনুরাগী ভক্ত হইয়া তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের ন্যায় সঙ্কীর্ত্তনের সময়, ধ্রুবা ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গীতের সাহায্য করিতেন। সত্যেন্দ্র বাবু রামেশ্বর ভট্টের এই পরিবর্ত্তন অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'বোম্বাই চিত্র' হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী পংক্তি সাদরে উদ্ধৃত হইল ;—

"এইক্ষণ অবধি রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের একজন পরম ভক্ত শিষ্য হইলেন—বিদ্বেষ অনুতাপে পরিণত হইল—যাঁহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তাঁহাকে দেবতারূপে পূজা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার বোধ-

গম্য হইল, ভগবদ্ভক্ত জনের কোন জাতি নাই। যেমন শালগ্রাম প্রস্তর হইয়াও পূজার্হ, সেইরূপ ঈশ্বরানুরাগী পুণ্যাত্মার প্রতি নীচ জাতির দোষ অর্শে না। দশগ্রন্থী বৈদিক পণ্ডিতেরা শাস্ত্র, পুরাণ, ভগবদ্গীতা প্রত্যহ পাঠ করেন, কিন্তু তাঁহারা সে সকলের সার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। এই কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মকাণ্ডের কুচক্রে ও জাত্যভিমানে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। তুকা সামান্য ব্যবসায়ী বণিক নহেন,—তিনি বিঠোবার চরণদাস—তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ভক্ত ও ত্যাগী পুরুষ আমি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখি নাই।"* এইরূপে তুকার প্রতি রামেশ্বর ভট্টের ভাব আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইল ও তিনি যে সকল কবিতা জলমগ্ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে তুকারামের শিষ্য সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইয়া, কিরূপে তাঁহার সঙ্গে পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগ পূর্ব্বক পৃথক হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন। তুকারামের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া, কানাইয়া এবং সেই সঙ্গে আরও কয়েক জন লোক, এই সময় তুকারামের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ইন্দ্রায়নী হইতে তাঁহার কবিতা সমূহের পুনরুদ্ধারের পরই তুকারামের ভাগ্য অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহাকে আর অধিক সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। তবে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের পক্ষে চির শান্তি কখনও সম্ভব নয়; সুতরাং দুই এক স্থলে তিনি নির্যাতনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। একবার তাঁহার কোন শিষ্যের পত্নীর হস্তে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্তি পাইতে হইয়াছিল। তুকারামের শিষ্যদিগের মধ্যে শিবজী কাঁসার নামে একজন কাংস্যকার ছিলেন। তুকারামের উপদেশ গুণে শিবজীকে ক্রমশ সংসার-বিরাগী হইতে দেখিয়া শিবজীর পত্নী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইলেন এবং তুকারামই সকল অনিষ্টের মূল ভাবিয়া তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্য একদিন তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক অত্যুষ্ণ জল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। তুকারাম যন্ত্রণায় অধীর হইলেও কাংস্যকার পত্নীকে কোন কথা না বলিয়া বিঠোবার চরণ বন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহা হইতে তাঁহার যন্ত্রণা

---

* রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের স্তুতিবিষয়ক যে কয়েকটি অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

ক্রমশ প্রশমিত হইল। তুকারাম এই উপলক্ষ্যে যে অভঙ্গটী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

প্রচণ্ড অনলে দেহ করিছে দাহন।
এ সময় কোথা হরি করগো রক্ষণ॥
জনক জননী প্রভু তুমিই আমার।
এস তবে কৃপা করি এস একবার॥
আপাদ মস্তক হের দহিছে অনলে।
নিবারিতে নাহি পারি ভাসি আঁখিজলে॥
ভেঙে বুঝি গেল বুক সহেনা যে আর,
দাঁড়ায়ে কি দেখিতেছ ওহে গুণাধার।
শান্তির সলিল লয়ে এস ত্বরা করি
তোমাবিনা কেবা মোরে উদ্ধারিবে হরি।
তুকা বলে, তুমিত গো জননী আমার
তোমা বিনা আর কেবা করিবে নিস্তার॥

দুর্ব্বৃত্তা কাংস্যকার-পত্নী তুকারামের উপর একবার এইরূপ অত্যাচার করিয়াই নিরস্ত হয় নাই। আহারের সময়ও তাঁহাকে বিষমিশ্রিত খাদ্য প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তুকারাম তাহা হইতেও অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। মহীপতি বলেন তুকারামের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের ফলে কাংস্যকার পত্নী অল্পদিনের মধ্যেই কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হইয়াছিল এবং দয়াময় তুকারামের অনুগ্রহে পরে সেই দুর্ম্মোচ্য ব্যাধি হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

তুকারামের সহিষ্ণুতার বিষয় আমরা বর্ণন করিয়াছি। তাঁহার আত্মসংযমের দৃষ্টান্তও মহীপতি উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, একবার একটী যুবতী রমণী, তুকারামের নিকট আসিয়া আপনার পাপাভিলাষ ব্যক্ত করে; তুকারাম তাহাকে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, দুইটী অভঙ্গে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তুকারাম যে কিরূপ কঠোর সংযমী পুরুষ ছিলেন, এই দুইটী অভঙ্গ হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অভঙ্গ দুইটীর সত্যেন্দ্র বাবুর কৃত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

"স্ত্রী সঙ্গ চাহিনা দেব শুষ্কতরু এ যে
এ পাষাণ দেহ তাহে স্ত্রী সঙ্গ কি সাজে?
ভজন সাধন তাহে সব ঘুরে যায়।
লালসা মজালে পরে রক্ষা পাওয়া দায়॥
তাকানো সে মুখপানে মৃত্যুর সমান।
কামিনী লাবণ্য যেন দুঃখের নিদান॥
তুকা বলে সাধু হয় যদিও আগুণ।
কাছে গেলে দহিবে সে এই তার গুণ॥
পরস্ত্রীকে দেবপত্নী রুক্মিনী সমান
এ দড় বিশ্বাস মোর, ইথে নাহি আন।
যাওমা কি দিব তোরে কিবা মোর আছে।
বিষ্ণুদাস আমরা গো কেন কষ্ট মিছে।
এ তব দুর্দ্দশা হেরি হৃদি দহে দুখে।
ছিছি ছিছি হেন কথা আনিও না মুখে।
তুকা বলে হে সুন্দরী পতি যদি চাও
লোকের অভাব নাই, খুঁজে কি না পাও।*

এরূপ আত্মসংযম না থাকিলে কি আর তুকারাম, স্বদেশীয় সমাজে দেবযোগ্য পূজা প্রাপ্ত হইতেন?

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

* প্রয়োজন বোধে সত্যেন্দ্র বাবুর অনুবাদের দুই একটি কথা পরিবর্ত্তিত হইল।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

বাঙ্গালা ভাষার এখন আর সে দিন নাই। বাঙ্গালা ভাষা এখন কেবল অশিক্ষিত দোকানদার স্ত্রীলোক ও অর্দ্ধশিক্ষিত সংবাদপত্রলেখকের ভাষা নহে। যাঁহারা বিদ্যা ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন ও বাঙ্গালা ভাষার সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহা এদেশের পক্ষে সৌভাগ্যেরই বিষয় বলিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি না হইলে বাঙ্গালী জাতিরও যে উন্নতি হইবে না, ইহা আজকাল অনেকেই বুঝিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিলে সমাজে কোনও ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা এবং কিয়ৎপরিমাণে প্রশংসালাভও হইতে পারে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা যে কখনই স্থায়ী হইবে না, ইহা নিশ্চিত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যদি কেবল Captive Lady র ন্যায় আরও কতিপয় ইংরেজী কাব্য লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম আজ কেহ স্মরণ করিত কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। কুমারী তরুদত্ত তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভাকে যদি বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবায় নিয়োজিত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আজ তিনি কখনই তাঁহার স্বদেশীয়গণের স্মৃতির এক কোণে পড়িয়া থাকিতেন না। যাঁহারা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন নাই, তাঁহারা তরুদত্তের নামও শুনিয়াছেন কিনা, সন্দেহ স্থল। প্রসিদ্ধ ইংরেজী-লেখক বাবু ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার Travels of a Hindu নামক পুস্তক যদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ও তাঁহার পুস্তকের আজ কত গৌরব হইত। শশিচন্দ্র দত্ত ইংরেজী ভাষায় যে সমুদয় পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বঙ্গদেশে রাজকৃষ্ণ রায়ের যতটুকু নাম থাকিবে, তাহার শতাংশের একাংশও নাম তাঁহার থাকিবে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। লালবিহারী দের "গোবিন্দ সামন্ত" ও "বঙ্গদেশের রূপ কথা" কেবল ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরই নিকট আদৃত হইবে; কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট তিনি চির-কালই Dickens বা Thackerayর ন্যায় অপরিচিত থাকিবেন। "রাম শর্ম্মা" ইংরেজের নিকট কস্মিন্কালেও ত বাঙ্গালী মিল্টন বলিয়া গণ্য হই-

বেন না; অধিকন্তু একমাত্র বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকটও কখনও পরিচিত হইতে সমর্থ হইবেন না।

প্রকৃত কথা এই, কোনও জাতির সাধারণ ব্যক্তিবর্গের উন্নতিতেই জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হয়। ইদানীং সহস্র সহস্র যুবক কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষায় কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেও, তাঁহাদের মধ্যে কেবল যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই উক্ত ভাষায় অধিকার লাভে সমর্থ হন, ইহা এক প্রকার অবধারিত সত্য। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যুবক ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিলেও বাঙ্গালা ভাষা তাঁহারা একেবারে বিস্মৃত হইতে সমর্থ হন না। জননী, ভগিনী, স্ত্রী ও ইতর সাধারণের সহিত তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষাতেই কথোপকথন করিতে হয়। কেবল সমশিক্ষিত ব্যক্তি-গণেরই সহিত তাঁহারা না বাঙ্গালা না ইংরেজী এক "বিতিকিচ্ছি" অদ্ভুত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে তাঁহাদের যে একটা আন্তরিক প্রবৃত্তি আছে, তাহা বোধ হয় না। ইংরেজীর "বুক্‌নী" দিয়া কথোপকথন করা ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে ইদানীং একটা রীতি (কেহ কেহ বলেন, একটা রোগ) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে কেবল এই রীতিরই অনুসরণ করেন মাত্র। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, অবিমিশ্র বাঙ্গালাতে কথাবার্ত্তা কহিতে পাইলে অনেকেই যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচেন। যাঁহারা মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া লিখন, পঠন ও কথোপকথনে কেবল ইংরেজী ভাষাই ব্যবহৃত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবস্থা আমার নিকট বড়ই শোচনীয় প্রতীয়মান হয়। একজন বাঙ্গালী একটী হিন্দুস্থানী মহিলাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে হৃদ-য়ের প্রেমজ্ঞাপনোদ্দেশে "সই" য়ের স্থলে "সেঁঞা রে" বলিলে যেরূপ হয়, কিম্বা অনেক পীড়িত আতুর ব্যক্তি "বাপরে, মাগো" বলিবার পরিবর্ত্তে "Oh Papa, Oh mamma" বলিলে যেরূপ হয়, বাঙ্গালী হইয়া এবং বাঙ্গালা ভাষা বিস্মৃত না হইয়া বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার করিলেও ঠিক্ তদ্রূপই হয়। হাজার হিন্দী ও ইংরেজী জানিলেও, বাঙ্গালা ভাষাই যেন আমাদের প্রাণ। বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালাতে কথা-বার্ত্তা কহিয়া প্রাণে যেরূপ সুখ ও "সোয়াস্তি" পাওয়া যায়, এরূপ অন্য কোনও ভাষাতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষায় কথা কহিতে হইলে আমার মনে হয় যেন আমার প্রেমা-

স্পদের সহিত আমার হইয়া আর কেহ প্রেমালাপ করিতেছে। অন্য ভাষায় কথা কহিতে গেলেই যেন পরস্পরের মধ্যে একটী ব্যবধান আসিয়া পড়ে। সে ব্যবধানটি কিছুতেই যায় না।

যাহা হউক, বঙ্গদেশে ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষার বহুল চর্চ্চা হইলেও বাঙ্গালী সাধারণ বাঙ্গালা ভাষা পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্য ভাষা গ্রহণ করিবে না। বহুভাষাবিদ্ অনেক ব্যক্তি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাই জনসাধারণের মাতৃভাষা, হৃদয়ের ভাষা ও সর্ব্বপ্রধান ভাষা হইয়া থাকিবে। জাতীয় উন্নতি সংসাধিত করিতে হইলে, এই বাঙ্গালা ভাষা দ্বারাই জনসাধারণের মন ও চিত্তের উৎকর্ষ-বিধান করিতে হইবে। অন্য কোনও ভাষার অবলম্বনে এই উদ্দেশ্য কখনও সফল হইবে না। সুতরাং স্বদেশহিতৈষী, মনীষী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন ও পুষ্টিসাধন করা কর্ত্তব্য। এই ভাষা ও সাহিত্য যত উন্নত, মার্জ্জিত ও পবিত্র হইবে, সাধারণ ব্যক্তি-বর্গও ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুই চারিটি ব্যক্তির উন্নতিতে সমাজের কখনও উন্নতি হয় না। সমাজের যাঁহারা অস্থি মজ্জা ও প্রাণ স্বরূপ, সেই জনসাধারণের উন্নতিসমষ্টিতেই জাতীয় উন্নতি অবধারিত হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা এই পবিত্র মাতৃভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কোনও চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবেন, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা চিরকাল তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের পাঠ্য করিয়া দিয়া এদেশের মহান্ উপকার সাধন করিয়াছেন এবং চিরকাল বাঙ্গালা জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে যে সকল মহাত্মা প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, সহস্র দোষ থাকিলেও কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী সাধারণ আজিও তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করিয়া থাকে। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস বাঙ্গালী নরনারী

মাত্রেরই সুপরিচিত ও পূজ্য। ইহারাই বাঙ্গালী জাতির নীতিপরায়ণতা ও ধর্ম্মানুরাগ এখনও অটল রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহারা বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালা ভাষায় যদি রামায়ণ ও মহাভারত না লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আজ যে বাঙ্গালীর কিরূপ অবস্থা ঘটিত, তাহা বলা যায় না। ইহারাই প্রকৃত পক্ষে জাতীয় কবি ছিলেন এবং ইহাদেরই স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রিয়তা সার্থক হইয়াছিল। ইহারা পূর্ব্বোক্ত মহাকাব্যদ্বয় বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া বাঙ্গালীজাতিকে যে কি অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া উঠিতে পারি না। ধনী, জ্ঞানী ও মানী ব্যক্তি হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত—সকল ব্যক্তিই এখনও ইহাদের বিরচিত "অমৃত সমান" অপূর্ব্ব কথা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন এবং ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে কৃতনিশ্চয় হন। ইহারা জাতীয় জীবনকে যেন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে এক জীবন্ত শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া অকাল মৃত্যু বা ক্ষয় হইতে যেন রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী ইহাদের ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে না।

ইহাদের তুলনায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবি ছিলেন। বিষয় নির্ব্বাচন ও অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ভাবই কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত মার্জ্জিত ভাষায়, রচনা পারিপাট্যে এবং সুকোমল ও সুললিত সঙ্গীত সৃষ্টিতে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত গুণ সমষ্টিই তাঁহাদের প্রাধান্য স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল না। আমাদের বক্তব্য আরও একটু পরিস্ফুট করিয়া বলা যাউক। ভাষার পারিপাট্য ও লালিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাব পরিমার্জ্জিত এবং বিষয়ও উন্নত না হইলে, কোন গ্রন্থই সাহিত্যজগতে কখনও উচ্চস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। হইলে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশেই নাতিসুন্দরী, আড়ম্বরশূন্যা, পবিত্রস্বভাবা কুলমহিলাদের অপেক্ষা বাহ্যবাক্চিক্যময়ী, পারিপাট্যশালিনী, কলাবতী বারবনিতাদেরই সমধিক আদর ও পূজা হইত! যাহারা এই শেষোক্তাদের দেহে সৌন্দর্য্য ও লালিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়, তাহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতে চাই না; তবে আমি এই মাত্র বলিতে পারি, তাহারা আমার পূর্ব্বোক্ত কথার যাথার্থ্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।

এই কথা পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের কবিতার মধ্যে উন্নত ও মার্জ্জিত ভাব আমি একেবারে কোথাও দেখিতে পাই নাই। ইঁহাদের কবিতার মধ্যে যেরূপ নিকৃষ্ট, তদ্রূপ উন্নত ভাবও আছে। কিন্তু অনেকেরই রচনায় ভাল ভাব অপেক্ষা মন্দ ভাবেরই প্রাধান্য সমধিক। ইহা যে এক-মাত্র তাঁহাদের বিকৃত রুচিরই দোষ, তাহা নহে। দোষ অনেকটা সেই যুগের—যে যুগে তাঁহারা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই কারণে কৃত্তিবাস এবং কাশীদাসও এই যুগদোষ হইতে একেবারে নির্ম্মুক্ত হইতে সমর্থ হন নাই। বিষয় নির্ব্বাচন করিতে ক্ষম না হইলে, ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত কবিগণের তুলনায় বাঙ্গলা সাহিত্যজগতে অনেক নিম্নস্থান অধিকার করিতেন, সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এই কবিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বঙ্গভাষাকে মার্জ্জিত ও সম্পদশালিনী করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যও ইঁহাদের অনেকেরই রচনাগুণে সাহিত্যপদবীতে আরূঢ় হইতে সমর্থ হই-য়াছে। এই কারণে বাঙ্গালী ইঁহাদের নিকটেও চিরকাল ঋণী থাকিবে। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঋণী থাকিবে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের নিকটে—যাঁহারা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনে ও ধর্ম্মভাব সংরক্ষণে সহায়তা করিয়াছিলেন।

জাতীয় জীবন সংগঠন ও জাতীয় জীবনকে উন্নতির পথে আকর্ষণ করাই জাতীয় সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্য্য। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকেরা বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের তৎকালীন তাদৃশী আকর্ষণী শক্তির অভাবই তাহার প্রধান কারণ ছিল। বাঙ্গালা-সাহিত্য বলিয়া তখন কোনও একটা জিনিষ ছিল না। যুবকদের হৃদয়ে তখন যে অভিনব আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ অভিলাষ জাগরিত হইয়াছিল, বাঙ্গালা ভাষার কোনও পুস্তকপাঠে তাহা চরিতার্থ হইত না। ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য আর স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হইত না। সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে ম্লেচ্ছবর্ব্বরের ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে বর্ব্বরের সাহিত্য বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? কালক্রমে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের রচনায় সেই আকাঙ্ক্ষা কিয়ৎ

পরিমাণে চরিতার্থ করিবার উপক্রম হইল। যুবকেরাও বাঙ্গালা ভাষার যৎসামান্য আদর করিতে লাগিলেন। ক্রমে উচ্চ বিষয় উচ্চ ভাব ও মার্জ্জিত রুচি লইয়া বঙ্গদেশে কবিসকলও প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিলেন। বাঙ্গালী যুবকেরাও মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি নবীন কবিগণের গদ্য পদ্য কাব্যাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে মিল্টন, সেক্ষপীয়র, ওয়ার্ডস্বার্থ পাঠ করিয়া বাঙ্গালী যুবকেরা যে বাঙ্গালী কবিদেরও কাব্যাদি পাঠ করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন, ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিরই পরিচয় সন্দেহ নাই। রজনীকান্তের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, চন্দ্রনাথের সমালোচনা, রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মস্পর্শিনী রচনা, কালীপ্রসন্নের জ্বালাময়ী উক্তি ও ভূদেবের প্রগাঢ় চিন্তাশীল বিবৃতি, আধুনিক বাঙ্গালী পাঠকের আদরের বস্তু। এই সমস্ত গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করিয়া বাঙ্গালী আপনার জীবনে এক অভিনব পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছে।

জাতীয় সাহিত্যেই জাতীয় ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক বাঙ্গালীর সহিত সে কালের বাঙ্গালীর যেরূপ সাদৃশ্য, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেরও তদ্রূপ সাদৃশ্য। দুইটীকে পরস্পরের সান্নিধ্যে স্থাপন করিলে উভয়ের মধ্যে বংশগত সাদৃশ্যও যেন লক্ষিত হয় না। ইংরেজের শাসনকালে বাঙ্গালী চরিত্রের বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিবর্ত্তন মন্দের দিকেও যেরূপ হইয়াছে, ভালর দিকেও তদ্রূপ হইয়াছে। কিন্তু মন্দ অপেক্ষা ভালর দিকেই পরিবর্ত্তনের পরিমাণ সমধিক। পাশ্চাত্য শিক্ষাগুণে বাঙ্গালীর বিশ্বাস, চিন্তা, রুচি, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম, আশা, আমোদ, প্রমোদ, পোষাক, পরিচ্ছদ, কার্য্য, চেষ্টা,—সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তনের ছাপ অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেও যে এই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? অনেকে এই কারণে আধুনিক বাঙ্গালাসাহিত্যকে বিজাতীয় ভাবপূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তাহাকে জাতীয় সাহিত্য নামে অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হন। কোন্ বিষয়টি জাতীয় ও কোন্‌টি বিজাতীয়, তৎসম্বন্ধে একটী সন্তোষকর মীমাংসায় উপনীত হওয়া সুকঠিন। যাহা প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত ও অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহাকেই যদি জাতীয় বলা যায়, তাহা হইলে আধুনিক বঙ্গসাহিত্য জাতীয় সাহিত্য নহে। কিন্তু কোনও যুগবিশেষে সাধারণ ব্যক্তিবর্গ যাহাতে

আনন্দ লাভ করে, তাহাকেই যদি জাতীয় নামে অভিহিত করেন, তাহা হইলে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে জাতীয় সাহিত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাচীন বাঙ্গালীর যেরূপ জাতীয় সাহিত্য ছিল, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যও আধুনিক বাঙ্গালীর তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য। যাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাব এখনও সমধিক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই, অবশ্য তাঁহারা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজাতীয় ভাব দেখিতে পাইবেন। তাঁহারা ভারতচন্দ্রের কবিতায়, কবির লড়াইয়ে, পাঁচালী গানে, বিকট রসিকতায়, ও এতাদৃশ ব্যাপারে যে প্রবৃত্তি দেখাইবেন, বঙ্কিমের উপন্যাস পঠে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা রসাস্বাদনে কিম্বা ভূদেবের সামাজিক তত্ত্ববিচারে তাদৃশ প্রবৃত্তি ও আগ্রহ দেখাইতে পারিবেন না। তাঁহাদের যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা, তদনুসারেই তাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন। ঠিক্ এই সমস্ত কারণেই, আধুনিক বঙ্গীয় যুবকেরাও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি বীতস্পৃহ এবং আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেরই একান্ত পক্ষপাতী এবং ইহাকেই তাঁহাদের একমাত্র জাতীয় সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেই তাঁহারা তাঁহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও চেষ্টার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখিয়া থাকেন। সুতরাং আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যকেই জাতীয় সাহিত্য বলা তাঁহাদের পক্ষে কিছু বিচিত্র ও অসঙ্গত নহে। সত্য বটে, বর্ত্তমান কালে "শিক্ষিত" ব্যক্তিগণের সংখ্যা জনসাধারণের তুলনায় সামান্য মাত্র। কিন্তু যখন আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবাদি স্তরপরম্পরা ভেদ করিয়া সমাজের নিম্নতম স্তরেও উপনীত হইতেছে, তখন আশা করা যায়, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য অনতিবিলম্বে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিরই জাতীয় সাহিত্যে পরিণত হইবে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যই এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ স্থানীয়। অন্ততঃ আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শেই অনেকটা গঠিত হইতেছে। বঙ্গদেশে, তথা সমগ্র ভারতবর্ষে, আজকাল পাশ্চাত্য সাহিত্যের যেরূপ প্রতিপত্তি ও প্রাদুর্ভাব, তাহাতে এইরূপ হওয়া অনিবার্য্য। এই কারণে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে মৌলিক গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। বাঙ্গালা নভেল, কাব্য, ইতিহাস, প্রবন্ধ—অধিকাংশই পাশ্চাত্য সাহিত্যের ছায়া ও উচ্ছিষ্ট মাত্র। ইংরেজী সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্য অপেক্ষা যে

বাদ প্রতিবাদ।

হরিদাস ঠাকুর—প্রতিবাদের উত্তর।

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ যবনকুলপাবন হরিদাস ঠাকুর, ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যবনকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় কি প্রমাণে ইহা অবগত হইয়াছেন, মার্চ্চ মাসের "দাসী"তে আমরা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। বিগত এপ্রিল মাসের "দাসী"তে অচ্যুত বাবু এই জিজ্ঞাসার উত্তর স্বরূপ একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই উত্তর সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে লিখিত হইল।

১। হরিদাস যে যবনকুলে জন্মিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আমরা চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। কোন প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার বিরোধী প্রমাণ আছে কি না, আমরা ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু অচ্যুত বাবু "চৈতন্য সঙ্গীতা" নামক একখানি বাঙ্গালা পয়ার গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া উপরিউক্ত সর্ব্বজনমান্য বৈষ্ণবগ্রন্থদ্বয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীচৈতন্যলীলা সম্বন্ধে বৈষ্ণবভক্তগণ ভক্তিতে বিগলিত হইয়া ঘটনা ও কল্পনার সহযোগে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি করিতেছেন। এই সমস্তকেই প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অবধারণ করিলে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের আর কিছুমাত্র আবশ্যকতা থাকে না। ঘটনার সমসাময়িক লোকের লিখিত বিবরণেও নানাপ্রকার সংস্কার ও বিশ্বাসমূলক কল্পনা এবং জনশ্রুতি মিশ্রিত হইয়া যায়। পরবর্ত্তী কালের রচনার তো কথাই নাই। পরবর্ত্তী সময়ে এই গুলিই ঐতিহাসিক প্রমাণ স্থলে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই কারণ বিরোধস্থলে পরবর্ত্তী গ্রন্থ অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকেই সাধারণতঃ প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করিতে হয়। "চৈতন্য সঙ্গীতা" গ্রন্থকে প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, এই গ্রন্থ কত দিন পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে—কি অবস্থায় রচিত হইয়াছে—কাহাকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, এই সকল কথার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। অচ্যুত বাবু তাহার কিছুই করেন নাই। কেবল বর্ণনার ক্রমের উল্লেখ করিয়া, "এই ক্রমানুসারে চৈতন্য সঙ্গীতা গ্রন্থে বহুতর অভিনব কাহিনী* বর্ণিত আছে", বলিলেই ইহা প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থরূপে প্রতিপাদিত

---

* এই গ্রন্থে দুই একটী অভিনব অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা দেখিয়াই অচ্যুত বাবু মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এই "অভিনবত্ব"ই এই গ্রন্থের অপ্রামাণিকতার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি কিছুদিন হইল রয়াল ১২ পেজী ৪৮ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকার আকারে বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম "শ্রীল শ্রীযুক্ত ভগীরথ বন্ধু"। ইনি গ্রন্থের নানাস্থানে আপনাকে "শঙ্খকার" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে, গ্রন্থকার "শাঁখারি"-জাতীয় ছিলেন। গ্রন্থখানি কতদিন হইল রচিত হইয়াছে, গ্রন্থের কোন স্থানে তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটী অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনামূলক কথা আছে। পাছে কেহ এই গল্পগুলি অবিশ্বাস করে, তজ্জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"শিবের বচন এই তন্ত্রের প্রচার। চৈতন্যসঙ্গীতা কহে দীন শঙ্খকার॥"

গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "পার্ব্বতীরে সদাশিব গোপনেতে কন। শ্রীচৈতন্যের মহিমাদি নাম সংকীর্ত্তন॥" এই গোপনীয় বৃত্তান্ত কোনও উপায়ে অবগত হইয়াই বোধ হয় "বন্ধু" মহাশয় এই পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। "বন্ধু" মহাশয় পুনশ্চ বলিতেছেন, যদিও "বহু গ্রন্থে প্রকাশিত মহিমা সকল। চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্য মঙ্গল॥" তথাপি তিনি অতি অজ্ঞান ও দীন হীন হইয়াও "ভাষামত কিঞ্চিৎ বর্ণনা" করিলেন। কিন্তু এই

হইতে পারে না। বিশেষতঃ চৈতন্য সঙ্গীতার লিখিত বিবরণ মহাপ্রভুর অপ্রকটের অল্পকাল পরে রচিত চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থের বিরোধী। আমরা লিখিয়াছিলাম, বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থকে অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নয়। দেখিলাম, চৈতন্যভাগবতাদি প্রামাণিক গ্রন্থের বিরুদ্ধে অচ্যুত বাবু কোন "বিশেষ প্রমাণ" উপস্থিত করিতে পারেন নাই। "বিশেষ প্রমাণ" তো দূরের কথা, চৈতন্যসঙ্গীতার ন্যায় কোন গ্রন্থ ঐতিহাসিক বিতর্কস্থলে কোনওরূপ প্রমাণ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত শ্লোকমাত্রই যেমন অভ্রান্ত ঋষি-বাক্য নয়, পয়ারাদিচ্ছন্দে লিখিত চৈতন্য বা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থমাত্রই সেই প্রকার প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থ নয়। এ কথা বিজ্ঞব্যক্তিকে আর অধিক করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না।

২। আমরা চৈতন্যভাগবত হইতে "জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে। জন্মিলেন নীচ-কুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে॥ ইত্যাদি" যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, অচ্যুত বাবু তাহার কোন

"কিঞ্চিৎ বর্ণনার" মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন ও বিস্ময়জনক দুই চারিটী কথা না থাকিলে চৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থের ন্যায় ইহার প্রাধান্য ও প্রামাণ্য হয় না, এই নিমিত্ত বোধ হয় হরিদাসের জন্মবিবরণ ও শ্রীচৈতন্যের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে দুই চারিটী "অভিনব কাহিনী" লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে হরিদাসের "ব্রহ্ম হরিদাস" নাম কেন হইল, তাহার এইরূপ কারণ উল্লিখিত হইয়াছে,—"নাম ব্রহ্ম এই মাত্র মনেতে বিশ্বাস। রাখিলা পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদাস॥" কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বত্র এ সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম কিনা, ইহা পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মা কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ দ্রষ্টব্য)। এই কারণ ব্রহ্মাকে যবনকুলে হরিদাসরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ বিশ্বাস নিবন্ধন বৈষ্ণবগণ হরিদাসকে "ব্রহ্ম হরিদাস" বলিয়া থাকেন। "চৈতন্য সঙ্গীতা"য় এই প্রবাদটী এইরূপ রূপান্তরিত হইয়া লিখিত হইয়াছে,— "একদিন পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিতেছেন,—"ব্রহ্ম হরিদাসের কি পাপ। যবনে পালিত তারে, নানাস্থানে বেত্রে মারে, কেন পায় এত মনস্তাপ॥" মহাদেব উপরিউক্ত গোবৎস হরণের বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "গোহরণ পাপে ব্রহ্মা হইল যবন। বেত্রাঘাতে হৈল তার পাপ বিমোচন॥ অতএব সেই ব্রহ্মা কলিতে যবন। ব্রহ্ম হরিদাস নাম তথির কারণ॥" গ্রন্থকার ইহার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন,—"নাম ব্রহ্ম এই মাত্র মনেতে বিশ্বাস। রাখিলা পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদাস॥" বৈষ্ণব সমাজের প্রসিদ্ধ প্রবাদটীর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে গিয়াই "বন্ধু" মহাশয় আপনার কথা আপনি খণ্ডন করিয়াছেন। ফলতঃ প্রথমাবস্থায় হরিদাসকে কেহই "ব্রহ্ম হরিদাস" বলিতেন না, বহুদিন পরে উপরি কথিত প্রবাদের সৃষ্টি হয়। "চৈতন্য ভাগবত" গ্রন্থের মধ্যখণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,—

"মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়। হরিদাস স্মরণে সকল পাপ ক্ষয়॥ কেহ বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস। কেহ বলে প্রহ্লাদের যেন পরকাশ॥ সর্ব্ব মতে মহা ভাগবত হরিদাস। চৈতন্য গোসাঞির সঙ্গে যাহার বিলাস॥" বোধ হয় এই মূল অবলম্বনে উক্ত প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। পরে ক্রমশঃ বৈষ্ণব সমাজের অবনতি সঙ্ঘটিত হইলে কতকগুলি লোকের মধ্যে জাত্যভিমান আবার প্রবল হয়। হরিদাস মুসলমান ছিলেন, একথাটা তাঁহাদের অসহ্য হওয়ায় হরিদাসের মুসলমান গৃহে প্রতিপালিত হওয়ার কথা পরিকল্পিত হয়। তৎপরে তাহাই পল্লবিত হইয়া আলোচ্য ক্ষুদ্র পুস্তিকায় নিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাই অনেকের মতে সৎসিদ্ধান্ত। যাহা হউক, "চৈতন্য সঙ্গীতার" ন্যায় কোন গ্রন্থ অবলম্বনে ঐতিহাসিক মীমাংসায় উপস্থিত হওয়াটা নিতান্তই হাস্যাস্পদ বলিয়া বোধ হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাধন ভক্তিনিধি মহাশয় সম্প্রতি আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, এই "চৈতন্য সংগীতা গ্রন্থখানি অতি আধুনিক, এবং সাহজিক সম্প্রদায়ের রচিত ; সুতরাং ইহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।"

সমীচীন উত্তর দেন নাই। কেবল একস্থানে এইমাত্র বলিয়াছেন, "যে দুই এক স্থানে হরিদাসকে যবন বা নীচ বলা হইয়াছে, তাহা ভজন ও বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ। তাহার মূল্য অধিক নহে।" হরিদাসকে মুসলমানেরা নিদারুণরূপে প্রহার করিয়াছিল, তাহাও কি ভজন-মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ? চৈতন্যভাগবতের "জাতিকুল নিরর্থক" ইত্যাদি বাক্য গ্রন্থকারের উক্তি নয়। কুলিয়া গ্রামে একদা "ডঙ্কের" নৃত্য * হইতেছিল, নাগরাজ অনন্ত নৃত্যকারী "ডঙ্কের" দেহে আবির্ভূত হইয়া নৃত্য গীত করিতেন, সুতরাং নৃত্যকালে ডঙ্কের বাক্য অভ্রান্ত দেববাণী, সকলে এই প্রকার বিশ্বাস করিত। উপরিউক্ত "জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে। জন্মিলেন নীচকুলে ঈশ্বর-আজ্ঞাতে॥" ইত্যাদি বাক্য হরিদাস সম্বন্ধে ডঙ্ক মুখে বিবৃত হইয়াছিল। ইহা মানবোক্তি নহে—দেববাণী; নাগরাজ ডঙ্কের শরীরে অবতীর্ণ হইয়া এই সকল কথা বলিয়াছেন, তৎকালে সকলে এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। "প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য কপি হনুমান। এইমত হরিদাস নীচ জাতি নাম॥" এই দৃষ্টান্ত দ্বারা "ডঙ্ক" হরিদাসকে স্পষ্টতঃ যবনবংশোৎপন্ন বলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হওয়ায় ইহাকে অর্থবাদ বলা যায় না। হরিদাসও এইকালে উপস্থিত ছিলেন। ফলতঃ হরিদাস যে মুসলমানকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এই "ডঙ্ক-বাক্য" একটী অকাট্য প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে। ইহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ, এবং তৎকালে দেববাণী বলিয়া গৃহীত। কষ্ট কল্পনা করিয়া ইহার ভিন্নরূপ অর্থ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। অচ্যুতবাবু এই প্রমাণটী খণ্ডন করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই।

৩। আমাদের আর একটী যুক্তি—হরিদাস ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাকে পুনর্ব্বার মুসলমান ধর্ম্মে আনিবার জন্য মুসলমানেরা অত্যাচার করিত না। হরিদাস মুসলমানকুলে জন্মিয়া হিন্দু হইতেছেন বলিয়াই মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। মুলুকপতি হরিদাসকে স্পষ্টতঃ যবনকুলজাত বলিয়াছেন। যথা—

"আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশজাত॥
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।" ইত্যাদি।

অচ্যুত বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, মুলুকপতির এই স্পষ্ট কথাটাও কি "ভজন ও বৈষ্ণব মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ" প্রশংসা বাক্য মাত্র? বস্তুতঃ কি এই কথাটার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই? অচ্যুত বাবু বলেন, "ইহার মূল্য অধিক নহে।" কি সর্ব্বনাশ! অচ্যুত বাবু যে সরল কথার কুটিল অর্থ করিতে গিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-ইতিহাসের মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা কি বুঝিতেছেন না? এরূপ স্পষ্ট উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিলে, বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে তিনি কি প্রকারে ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন করিবেন, বুঝিতে পারা যায় না। অচ্যুত বাবুর ব্যাখ্যা-নীতির অনুসরণ করিলে কেবল বৈষ্ণব-সাহিত্য কেন, কোন সাহিত্য হইতেই কিছুমাত্র ঐতিহাসিক তত্ত্বোদ্ভেদের সম্ভাবনা থাকে না!

৪। আমাদের আর একটী কথা—হরিদাসকে লইয়া হিন্দু ও মুসলমান সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। হরিদাস ব্রাহ্মণসন্তান হইলে এই আন্দোলনের সময় এ কথা অপ্রকাশিত থাকিত না; এবং চৈতন্য-ভাগবতে এই বৃত্তান্ত অবশ্যই উল্লিখিত হইত। অচ্যুত বাবু ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন, "এতদপেক্ষা গুরুতর বিষয়ও বৃন্দাবন দাস বর্ণন করেন নাই। হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ মালা জপ করিতেন * * * এই বিষয়টীর উল্লেখ চৈতন্যভাগবতে নাই। ইত্যাদি।" কি আশ্চর্য্য! অচ্যুত বাবু কি মনোযোগ সহকারে চৈতন্যভাগবত পাঠ করেন নাই? এই দেখুন,—

* তৎকালে এক জাতীয় লোক সর্ব্বাঙ্গে অহিভূষা ধারণ করিয়া নৃত্য গীত করিয়া বেড়াইত। ইহার নাম "ডঙ্কের নৃত্য"। সবিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত "শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

"তবে হরিদাস গঙ্গাতীরে গোফা করি।
থাকেন নিরন্তে অহর্নিশি কৃষ্ণ-স্মরি॥
তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তাঁর যেন বৈকুণ্ঠ ভবন॥"

চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড।

"বারবনিতার বিবরণ" চৈতন্যভাগবতে লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু হরিদাসের প্রতি মুসলমানদিগের উৎপীড়নের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। হরিদাসের ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণের কথা, এই ঘটনার সহিত দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ। এ কথা পরিজ্ঞাত থাকিলে, উৎপীড়ন বৃত্তান্তের সঙ্গে তাহার উল্লেখ না করিলেই চলিতে পারে না। ফলতঃ ইহা উল্লেখ না করিবার কারণ এই যে, বৃন্দাবন দাস এবং সাময়িক হিন্দু মুসলমান সকলেই হরিদাসকে মুসলমান-সন্তান বলিয়াই জানিতেন, চৈতন্যসঙ্গীতা গ্রন্থের "অভিনব কাহিনী" তখন প্রকাশিত হয় নাই। এই জন্যই বৃন্দাবন দাস নানাস্থানে হরিদাসকে মুসলমানকুলতিলক বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন।

৫। বিচারের সময় হরিদাস মুলুক পতিকে বলিয়াছিলেন, "শুন বাপ সভারই একই ঈশ্বর; ইত্যাদি।" হরিদাস ইহাতে আপনাকে মুসলমান বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন।

"হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি কর্ম্ম॥"

ইত্যাদি পয়ারের সরল অর্থ এই যে, কোন ব্রাহ্মণ স্ব-ইচ্ছায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে হিন্দুরা তাহাকে কি অত্যাচার করে? হরিদাসের এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে, আমিও ঐরূপ আপন ইচ্ছায় হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, (পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যথা, 'লওয়াইয়া আছে চিত্তে করি আমি তেন।") আমাকে কেন শাস্তি দাও। কিন্তু অচ্যুত বাবু এই সরল পয়ারের অর্থবিপর্য্যয় ঘটাইয়া কিরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সহৃদয় পাঠকগণ একবার দেখুন। অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন, "অঘোর বাবু বলেন যে, হরিদাস ব্রাহ্মণ হইলে কাজিকে [কাজিকে নয়, মুলুকপতিকে। অচ্যুত বাবু অনেক স্থলেই ভ্রমবশতঃ মুলুকপতির পরিবর্ত্তে "কাজি" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।] উত্তর দিতেন, হরিনাম করাই তাহার কুলধর্ম্ম। * * লেখার ভঙ্গীতে কি তাহাই বুঝাইতেছে না? বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই যে, উদ্ধৃত পয়ারে "ব্রাহ্মণ" শব্দ থাকায় তাহাই নির্দ্দেশিত হইতেছে।" অচ্যুত বাবুর এই কয়টী কথার অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না। বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, "ব্রাহ্মণ" শব্দে হরিদাস নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও মুসলমান হইয়াছিলেন, এই কথাই বলিয়াছেন। হরিদাস দৃষ্টান্ত স্বরূপে একথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা দৃষ্টান্ত বাক্য, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু অচ্যুত বাবু বলেন, তাঁহার ব্যাখ্যা "বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত"। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত নয়, অদ্ভুত সিদ্ধান্ত বটে! অচ্যুত বাবুর মতে হরিদাস ৬ মাস বয়সের সময় মুসলমান গৃহে নীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনিত আপন ইচ্ছায় মুসলমান হন নাই যে "ব্রাহ্মণ" শব্দে তাঁহাকেই বুঝাইবে?

৬। হরিদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, "একথা ভাবিবার কয়েকটী সূক্ষ্ম হেতু" অচ্যুত বাবু উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার লিখন ভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, এই "সূক্ষ্মহেতু" গুলি যেন কেবল তর্কের খাতিরে উপস্থিত করা হইয়াছে। যাহাহউক আমরা এই হেতুগুলির উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিতেছি।

(ক) "হরিদাস মূলে যবন ছিলেন না বলিয়াই ব্রাহ্মণগণ সেই হিন্দুধর্ম্মের প্রবল প্রতাপের কালেই হরিদাসের সংস্পর্শে আসিতে ভয় করিতেন না।" ইহার উত্তরে বলা যায়, একজন

মুসলমান-সন্তান একান্ত হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া দিবারাত্র হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রমুখ হিন্দুগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিতেন। অনেক ফকির দরবেশকেও হিন্দুগণ ভক্তি করিয়া থাকেন। আর সংস্পর্শে আসিবার অর্থ কি? হরিদাসের সঙ্গে এই সকল ব্রাহ্মণেরা কি আহার ব্যবহার করিতেন? হরিদাসকে সকলেই সাধুজ্ঞানে ভক্তি করিতেন, ইহা ত হিন্দুজাতির স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি। সাধু যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন, হিন্দুগণ তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকেন। পরিয়াবংশোদ্ভব "বল্লুবর," 'জোলা'-কুলোৎপন্ন "কবিরজী", কশাইজাতীয় "সধনা" প্রভৃতি অনেকেই হিন্দুদিগের নিকট সম্মান ও ভক্তিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং মুসলমান হরিদাসের অপূর্ব্ব ভক্তিনিষ্ঠা এবং অলৌকিক প্রেম-চেষ্টা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সকলে তাঁহাকে ভক্তি প্রদর্শন করিবেন, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে।

(খ) "অদ্বৈত প্রভু হরিদাসকে 'শ্রাদ্ধপাত্র' ভোজন করাইয়াছিলেন। * * সমাজের সাধারণ লোক আর ভক্তির অনুরোধে কিছু সামাজিকতা ত্যাগ করে না; ইত্যাদি।" সাধারণ লোকে সামাজিকতা কেন ত্যাগ করিবে? অদ্বৈত আচার্য্যকে অচ্যুত বাবু কি "সাধারণ লোক" মনে করেন? অদ্বৈতই বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনের মূল। তিনি নিশ্চয়ই অসাধারণ লোক, এবং তাঁহার এই "সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্যের—এ অসম-সাহসের মূলে" কেবল অসাধারণ হরিভক্তিপরায়ণতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। অচ্যুতবাবু বলিতেছেন, হরিদাস "হিন্দুসমাজে এক প্রকার পরিগৃহীত হইয়াছিলেন বলিয়া "শ্রাদ্ধপাত্র" দেওয়ায় হিন্দুগণ আপত্তি করেন নাই।" হরিদাস সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, ইহাও একটী "অভিনব কাহিনী", ইহার কোনও মূল নাই। চৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, শ্রাদ্ধপাত্র প্রদানের অব্যবহিত পূর্ব্বেই হরিদাস আচার্য্যকে বলিতেছেন, তুমি কুলীনসমাজে বাস করিয়া আমাকে প্রত্যহ অন্ন দাও, তোমার কি লজ্জা ভয় নাই? যাহাতে সমাজে তোমার কোন বিপদ না ঘটে, তাহাই কর। আচার্য্য ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥"

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা।

ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে, আচার্য্য সমাজ-ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, কেবল ভক্তকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্যই যবন হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র দিয়াছিলেন। হরিদাস সমাজে পরিগৃহীত হইলে প্রত্যহ কেবল অন্ন প্রদানের জন্যই আচার্য্যকে সমাজ-ভয় প্রদর্শন করিবেন কেন? ফলতঃ হরিদাসের হিন্দুসমাজে পরিগৃহীত হওয়ারূপ "অভিনব তত্ত্বটী" শ্রীচরিতামৃত বিরুদ্ধ, সুতরাং অচ্যুতবাবুকেই ইহার আবিষ্কর্ত্তা বলা যাইতে পারে।

আর একটী কথা—হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদানরূপ সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অদ্বৈতাচার্য্যের সাহস ছিল না, এই কথার প্রমাণস্বরূপ অচ্যুতবাবু বলিতেছেন, "নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহের পূর্ব্বে 'গাঁই গোত্র' উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে উপবীত ধারণ করিতে" হইয়াছিল। নিত্যানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম হইতে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহা দুর্ব্বলতার পরিচয় নহে। নিত্যানন্দ সমাজভীত দুর্ব্বল-চেতা ছিলেন না। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি নিজে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ হইয়া বারেন্দ্রবংশীয় মাধবাচার্য্যের সহিত স্বীয় দুহিতা গঙ্গাদেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, হরিদাসকে ব্রাহ্মণ-কুলজাতরূপে প্রমাণ করিতে অচ্যুত বাবু এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন যে, সেজন্য সমগ্র বৈষ্ণবজগতের পরম পূজনীয় শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্য ও অবধূত নিত্যানন্দকে সমাজভীতরূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। ইহা বৈষ্ণবতা ও প্রকৃত তথ্যের একান্ত বিরোধী।

(গ) অচ্যুত বাবুর তৃতীয় "হেতু" এই—হরিদাস "চৈতন্যের ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে" কুলীনগ্রামের সত্যরাজ ও রামানন্দ বসুকে শিষ্য করিয়াছিলেন। হরিদাস "হিন্দুসমাজে

এক প্রকার পরিগৃহীত” না হইলে খাঁটি যবনের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিতে কুলীনগ্রামী সাহস করিতেন, বোধ হয় না। সত্যরাজ ও রামানন্দ বসু হরিদাসের শিষ্য হইয়াছিলেন, অচ্যুত বাবু এ কথা কোথায় পাইয়াছেন? চরিতামৃতের মূল-শাখা গণনার মধ্যে লিখিত আছে, “তার উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন। সত্যরাজ আদি তার কৃপার ভাজন॥” এই-টুকু পাঠ করিয়াই অচ্যুত বাবু সত্যরাজ ও রামানন্দকে হরিদাসের শিষ্য মনে করিয়াছেন! চরিতামৃতের এই পরিচ্ছেদের অন্যত্র আবার কুলীনগ্রামীদিগকে সাধারণ শাখার মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। আদিলীলার একাদশ পরিচ্ছেদে আবার রামানন্দ বসুকে নিত্যানন্দের স্কন্দ শাখার অন্তর্গতরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাস্তবিক কুলীনগ্রামিগণ নিত্যানন্দের শিষ্য। রামানন্দ বসুর পরিবারবর্গ অদ্যাপি নিত্যানন্দ বংশীয় খড়দহের গোস্বামিগণের শিষ্য। রামানন্দ বসুর বংশধর কুলীনগ্রামবাসী আমাদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যিনি মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অদ্যাপি শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে প্রতি বর্ষে পট্টডুরী প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার প্রমুখাৎ আমরা কুলীনগ্রামের বসু বংশের বিশেষ বিবরণ অবগত আছি। সত্যরাজ বা রামানন্দ বসু কস্মিন্‌কালেও হরিদাসের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। সত্যরাজের পিতা এবং রামানন্দের পিতামহ, গুণরাজ খান উপাধিযুক্ত মালাধর বসু একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব ও কবি ছিলেন [ইনিই বাঙ্গালার আদিকাব্য “শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়” কাব্য রচয়িতা।] এই বংশ বহুকাল হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। হরিদাস ঠাকুর, সত্যরাজ প্রভৃতির স্নেহ ও ভক্তিতে বাধ্য হইয়া কিছুদিন কুলীনগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। রামানন্দ বসু হরিদাসকে এতদূর ভক্তি করিতেন যে, সমাজ-ভয় অগ্রাহ্য করিয়া, কুলীন-গ্রামস্থ হরিদাসের আশ্রমে, দারুনির্ম্মিত হরিদাসের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হরিদাসের সঙ্গে ইঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এইজন্য কবিরাজ গোস্বামী ইঁহাদিগকে হরিদাসের কৃপাভাজনরূপে ও তাঁহার উপশাখার মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। কুলীনগ্রামে হরিদাসের যে প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজিত আছে, তাহার আকৃতি মুসলমান ফকিরের ন্যায়। এখানে হরিদাস মুসলমান-সন্তান বলিয়াই বিখ্যাত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন।*

(ঘ) অচ্যুতবাবুর আর একটী ‘সূক্ষ্ম হেতু’ এই,—হরিদাস গৃহ হইতে বহির্গত হওয়ার পর ব্রাহ্মণ-গৃহেই অন্ন ভোজন করিতেন। হিন্দুসমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য “ব্রাহ্মণেতর জাতির অন্নগ্রহণ করিতেন না; ইত্যাদি।” ইহার উত্তরে বলা যায়, হরিদাস, বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করার পর, সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন করিতেন। এজন্য সাত্ত্বিক আহার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ব্রাহ্মণজাতি সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ—দেবদ্বিজে কোন ভেদ নাই, ব্রাহ্মণের অন্ন ভগবানের প্রসাদ—ইহা ভোজন করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয়—দুর্জাতির জন্য সমস্ত কলুষ বিনষ্ট হয়—এই প্রকার বিশ্বাস করিয়াই হরিদাস ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিতেন, ইহাই “সৎসিদ্ধান্ত।” হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশের চেষ্টায় হরিদাস এই কার্য্য করিতেন বলিলে তাঁহার মাহাত্ম্য নিতান্তই খর্ব্ব করা হয়।

উপসংহারে আমরা একটী কথা বলি। তর্কস্থলে যদি স্বীকারও করা যায় যে, হরিদাস ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি ৬ মাস বয়ঃক্রম হইতে মুসলমান গৃহে প্রতি-পালিত হওয়ায় বিশিষ্টরূপেই যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ হিন্দুর চক্ষে তিনি প্রকৃতই যবন। সুতরাং কষ্ট-কল্পনা করিয়া এতদিন পরে তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার কোন সার্থকতা নাই। হরিদাসকে যবন-সন্তান মনে করিয়া আমাদের ক্ষুণ্ণ হইবারও কোন কারণ নাই। যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন, তিনি ভগবদ্ভক্ত সাধু, সুতরাং আমাদের পূজ্য।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

---

* কুলীনগ্রামস্থ হরিদাস ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত “শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবন-চরিত” গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

প্রতিবাদের উত্তর।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত (হরিদাস সম্বন্ধে) আর অধিক বাদ প্রতিবাদ করিতে রুচি নাই। আমাদের অভিমত আমরা লিখিয়াছি; যেটী সত্য, পাঠকবর্গ কর্ত্তৃক তাহাই গৃহীত হইবে। অদ্য চৈতন্যসঙ্গীতা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুটী কথা বলিতেছি।

এবারকার প্রতিবাদে অঘোর বাবু আমার লিখিত উত্তরের (দাসী ৪র্থ সং) কথাগুলি খণ্ডনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ৬ষ্ঠ ও ৭মাঙ্কিত হেতু সম্বন্ধে (রূপ সনাতন প্রসঙ্গে) কোন কথা না বলিবার কারণ কি? আমার প্রস্তাবের মধ্যে, ৭ম হেতুটীই বিশেষ আবশ্যকীয়। সর্ব্বপ্রথম ইহারই প্রতি মনোযোগ দেওয়া অঘোর বাবুর উচিত ছিল, কিন্তু তিনি ইহার উল্লেখও এবারকার প্রতিবাদে করেন নাই। যে "অকাট্য-যুক্তি" বলে তিনি হরিদাসকে যবন-ঔরস-জাত বলেন, এ কথাগুলি তাহার অনুকূল না প্রতিকূল?

অঘোর বাবুর এবারকার সুদীর্ঘ প্রতিবাদের প্রতিপাদ্য চৈতন্যসঙ্গীতাকে অপ্রামাণ্য প্রদর্শন করা। চৈতন্যসঙ্গীতাখানিকে আধুনিক বলিয়াই তিনি অপ্রামাণ্য বলেন। (কিন্তু "পূর্ব্ব পরয়োর্মধ্যে পরবিধির্ব্বলবানিতি।—পাণিনিসূত্রম্। চৈতন্যসঙ্গীতা সম্বন্ধে খাটিতে পারে কি না জানি না। কবিরাজ গোস্বামী ব্যবহারেও ঐ বিধি দিয়াছেন।) চৈতন্য-সঙ্গীতাকার কত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, গ্রন্থখানি কেমন আধুনিক, ইহা তিনি কিছু বলেন নাই। কেবল বলিয়াছেন—এক, "অপ্রামাণ্য।" যদি বা গ্রন্থখানি আধুনিকই হয়, তথাপি চৈতন্যসঙ্গীতারও একটা মূল আছে। সে মূল একখানি তন্ত্র, যাহার কথা চৈতন্য-সঙ্গীতাকার গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন। যথা:—"শিবের বচন এই তন্ত্রের প্রচার।" "পাছে কেহ গল্পগুলি অবিশ্বাস করে তজ্জন্য গ্রন্থকার" মিছামিছি শিবের দোহাই দেন নাই, চৈতন্য-সঙ্গীতার মূল যথার্থই একখানি তন্ত্র। ঐ তন্ত্রের নাম "শিবগীতা।" যদি বলেন, মহাপ্রভুর বা তদ্ভক্তগণের জীবনী সম্বন্ধে তন্ত্রের কথা মানি না, তবে আমরা অনন্তসংহিতা এবং ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতা প্রভৃতির নাম করিতে পারি। এ দুখানিই তন্ত্র এবং মহাপ্রভু ও তদ্ভক্তগণের কাহিনীতে পূর্ণ। অনন্ত সংহিতার শ্লোক চৈতন্যভাগবতে উদ্ধৃত আছে, এবং ভক্তিরত্নাকরে ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অঘোর বাবু প্রাচীন শিবগীতা তন্ত্রখানি মানিবেন কি না জানি না। কিন্তু সুবিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় ঐ তন্ত্রখানি অবলম্বন করিয়া স্বীয় অপূর্ব্ব গ্রন্থ অমিয় নিমাই-চরিত ১ম খণ্ডের ১৭৭ পৃষ্ঠায় হরিদাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"হরিদাস ব্রাহ্মণের পুত্র, পিতৃমাতৃহীন বলিয়া মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, কাজেই হরিদাস মুসলমান। কিন্তু হরিদাস পরমসাধু হইয়া উঠিলেন।" ইত্যাদি।—অমিয় নিমাই-চরিত ১ম খণ্ড।

এবং চৈতন্যসঙ্গীতা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন:—"শ্রীশিবগীতা একখানি তন্ত্র, চৈতন্য-সঙ্গীতা তাহার অনুবাদ।"

আর একজন বৈষ্ণব মহাজন (কেশব-ভারতীর বংশসম্ভূত শ্রীল অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী) বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার (২য় খণ্ড) ২৭১ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন যে, হরিদাস ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন।

তৃতীয় খণ্ড বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ৩২৩ পৃষ্ঠায় একটী সম্পাদকীয় প্রস্তাব বাহির হয়। তাহাতে হরিদাস সম্বন্ধে কি লিখা ছিল, উদ্ধৃত করিতেছি:—

"হরিদাস ব্রাহ্মণ সন্তান বটেন, কিন্তু শৈশবাবধি মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানই ছিলেন। ইহার পিতার নাম ছিল সুমতি, এবং মাতার নাম গৌরী।" ইত্যাদি।

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদক বর্ত্তমান বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অগ্রণী ও নমস্ত পণ্ডিত শ্রীল প্রভু

রাধিকানাথ গোস্বামী (অদ্বৈত-সন্তান) ও পণ্ডিত শ্রীল প্রভু শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত-বাচস্পতি (নিত্যানন্দ-সন্তান) এবং ভক্তিবিনোদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট। বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজে ইঁহাদের কথা কেহই অমান্য করেন না। অতএব আমার প্রবন্ধটী "অদ্ভুত ব্যাখ্যা" নহে, সৎসিদ্ধান্তই বটে।

প্রতিবাদ প্রস্তাবের উপসংহারে অঘোর বাবু লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাধন ভক্তিনিধি মহাশয় সম্প্রতি আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, এই চৈতন্য সংহীতা গ্রন্থখানি অতি আধুনিক এবং সাহজিক সম্প্রদায়ের রচিত, সুতরাং ইহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।"

ভক্তিনিধি মহাশয় অঘোর বাবুকে যাহা লিখিয়াছেন, তিনিই জানেন। তবে হরিদাস সম্বন্ধে ভক্তিনিধি মহাশয়ের কি মত, তাহা আমরা বিশেষরূপে জানি। বিগত পৌষ মাসের (দ্বাদশ খণ্ড-নবম সংখ্যা) নব্যভারত পত্রিকার ৫০৪ পৃষ্ঠায় ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—

"প্রথমতঃ হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্ম ঔরসে ব্রহ্মকুলে বুঢ়ন গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তত্রস্থ বেণাপুরের জঙ্গলে থাকিতেন। শকুন্তলা শকুনী কর্ত্তৃক যেরূপ রক্ষিতা ও পশ্চাৎ মহাতপা কণ্বমুণি কর্ত্তৃক পালিতা হইয়াছিলেন, ব্রহ্ম হরিদাস সেইরূপ শৈশবে পিতামাতা বিয়োগ জন্য জনৈক যবন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পশ্চাৎ গঙ্গাতীরস্থ * * ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।" পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভক্তিনিধি মহাশয় নব্যভারতে এরূপ লিখার পর যখন চৈতন্য সঙ্গীতাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, (অঘোর বাবুর লিখায় জানা গেল) তখন বোধ হয়, তিনি অন্য একখানি প্রামাণিক গ্রন্থাবলম্বনে হরিদাস সম্বন্ধে নব্যভারতোক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সে গ্রন্থখানি বোধ হয়—শিবগীতা। আর একটী কথা—চৈতন্য সঙ্গীতায় আমরা বহু অনুসন্ধানেও সাহজিক মতের কথা পাই নাই।

শিবগীতা তন্ত্র সংস্কৃত এবং বহু প্রাচীন, অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। (ঐনামে বটতলায় মুদ্রিত একখানি গ্রন্থ আছে, সেখানি স্বতন্ত্র।) শিবগীতা ব্যতীত আর একখানি বাঙ্গালা পয়ার গ্রন্থে (পয়ার ব'লে যদি বা অগ্রাহ্য না হয়) হরিদাসের হিন্দুত্বের কথা পাওয়া যায়, তাহার নাম—নামামৃত লহরী। রচয়িতা—উদ্ধব দাস। উদ্ধব দাসের পদ, সংগ্রহ গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। চৈতন্য সঙ্গীতারই ন্যায় তাহার কথা; উদ্ধৃত করিবার বিশেষ চেষ্টা করা গেল না। (বিশেষতঃ বর্ত্তমানে গ্রন্থখানি আমার হাতে নাই।) অঘোর বাবু এ দুই গ্রন্থের অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারেন ; এবং তাহা প্রমাণোপযোগী গ্রন্থ কিনা, দেখিতে পারেন। আমার বক্তব্য এই।*

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

জীবনোপায়।

(২৬৬ পৃষ্ঠার পর।)

মিখাইলাকে হাস্য করিতে দেখিয়া সাইমন যেমন আশ্চর্য্যান্বিত ও অপ্রতিভ হইল, আগন্তুক জমীদার-পুত্রও তেমনই ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"কোথাকার গর্দ্দভ তুই, যে অমন করিয়া দন্ত বাহির করিতেছিস্? ইহা যেন স্মরণ থাকে যে আমার জুতা ঠিক্ সময়ে প্রস্তুত চাই এবং যেরূপ বলিয়া দিয়াছি, তাহার যেন এক চুল ব্যতিক্রম না হয়।"

* হরিদাসের জন্ম সম্বন্ধে অতঃপর আর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না।—সম্পাদক।

মিথাইলা উত্তর করিল,—"জুতার জন্য যখনই লোক আসিবে, তখনই প্রস্তুত পাইবে ; তাহাতে কালবিলম্ব হইবে না।"

জমীদার-পুত্র "আচ্ছা" বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন। কিন্তু ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র দ্বার তাঁহার বিশালায়তন দেহের নির্গমন পক্ষে একান্ত অল্পায়তন প্রতিপন্ন হইল। তিনি মস্তক নমিত করিতে গিয়া দ্বারদেশে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর সাইমনকে, তাহার ব্যবসাকে, তাহার জাতিকে এবং এক কথায়, জগতের সমস্ত দরিদ্র শ্রেণীকে, ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণের জন্য গালি দিতে দিতে বহির্গত হইয়া স্বীয় যানারোহণ-পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

আগন্তুকের ত্রয়কা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে সাইমন মাত্রিওনার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"বাবা! শরীর নয় যেন একটা পাহাড়! হাতুড়ির ঘা মরিলেও কিছু করিবার যো নাই। তাঁহার মাথার আঘাতে আমার চৌকাঠটা ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার যে কিছু হইয়াছে, এরূপ ত বোধ হইল না।" মাত্রিওনা উত্তর করিল,—"এসব লোক যেরূপ খায় এবং যেরূপ থাকে, তাহাতে তাহাদের শরীর হৃষ্টপুষ্ট না হইয়া কি করে ?"

অনন্তর সাইমন মিথাইলার দিকে চাহিয়া বলিল,—"দেখ তোমারই কথাতে আমি এই কাজ লইয়াছি ; নতুবা চামড়া যেরূপ দামী ও জমীদার-পুত্র যেরূপ অগ্নিশর্ম্মা, আমি একা হইলে এরূপ কাজ হাতে লইতাম না। একটু বেশকম করিলে প্রাণান্ত করিবে। তোমার জোয়ানের হাত! এই লও, মাপ লইয়া চামড়া কাট। যেরূপে পারা যায়, ভাল জুতা তৈয়ার করিতেই হইবে।"

মিথাইলা হাত বাড়াইয়া চামড়া লইল এবং টেবিলের উপর তাহা বিস্তার করিয়া অতি মনোযোগের সহিত কাটিতে আরম্ভ করিল। মাত্রিওনা মনে করিল, বিশ রুবল মূল্যের একখণ্ড চামড়া কাটিতে দেখাতেও বাহাদুরী আছে ; এই ভাবিয়া মিথাইলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মাত্রিওনা চর্ম্মকার-পত্নী ; আজীবন চর্ম্মকারের সহবাস করিয়াছে। কাজেই চর্ম্মকারের ব্যবসায়ের কোন কার্য্য তাহার অজ্ঞাত ছিল না। মিথাইলাকে চর্ম্ম কাটিতে দেখিয়া সে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল ; কারণ তাহার মনে হইতে লাগিল যে মিথাইলা যেরূপ করিয়া কাটিতেছে, তাহাতে বুটজুতা

প্রস্তুত হইতে পারে না; অথচ সে স্বকর্ণে শুনিয়াছে যে জমীদার-পুত্র বুট-জুতার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছেন। মাত্রিওনা একবার ভাবিল, মিথাইলাকে এই ভুলের বিষয় বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিতে লাগিল যে হয়ত মিথাইলা কোন নূতন প্রণালীতে বুট প্রস্তুত করিতে যাইতেছে; তাহার না জানিয়া কথা কহা ভাল নহে। এই ভাবিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। মিথাইলার চর্ম্মকর্ত্তন শেষ হইলে সে সেলাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মাত্রিওনা আবার সভয়ে দেখিতে পাইল যে বুটজুতা যেরূপ দোহারা সূতা দ্বারা সেলাই করিতে হয়, মিথাইলা তাহা না করিয়া একসূত্র দ্বারা সেলাই করিতেছে। তথাপি সে নিজের অজ্ঞতা অনুভব করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ক্রমে মধ্যাহ্ন সমাগত হইল। সাইমন স্বীয় কর্ম্মত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিল, এবং মিথাইলা কি করিতেছে, তাহা দেখিবার জন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে সাইমনের চক্ষু স্থির! সাইমন ভয়চকিত নেত্রে দেখিতে পাইল যে মিথাইলা জমীদার-পুত্রের চর্ম্ম দ্বারা এক যোড়া শবের পরিধানের উপযোগী চটীজুতা প্রস্তুত করিতেছে!! * সাইমন কতক্ষণ হতচেতনের ন্যায় রুদ্ধকণ্ঠে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিল—"এ কি করিয়াছ? তুমি স্বকর্ণে শুনিয়াছ যে জমীদার-পুত্র বুট প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তুমি তৎপরিবর্ত্তে চটীজুতা প্রস্তুত করিয়াছ; তাও আবার শবের পায়ের চটী! এখন উপায় কি হইবে? তুমি এতদিন হইতে আমার আলয়ে কার্য্য করিতেছ, কিন্তু কখনওত এরূপ ভুল কর নাই। আজ তুমি এরূপ ভুল করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহাত স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই চামড়া কোথায় পাইব? হায়! তোমারত মাথা যাইবেই, সেই সঙ্গে আমার নিজের এবং আমার স্ত্রী পুত্র সকলেরই মাথা যাইবে।......"

সাইমন এইরূপ বকিয়া যাইতেছিল, এমন সময় একজন অশ্বারোহীর অশ্বপদশব্দ কর্ণগোচর হওয়াতে সে তাহার অসমাপ্ত বাক্যের মাঝখানে থামিয়া পড়িল। তাহার মনের ভিতর কে বলিয়া উঠিল যে ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি তাহারই গৃহে আসিতেছে। মাত্রিওনার মনেও যুগপৎ ঐ ভাবের

---

* ইয়ুরোপে মৃতব্যক্তিকে নগ্নপদে কবর দেওয়ার রীতি নাই। শবের পায়ে এক প্রকার চটীজুতার ন্যায় পাদুকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উদয় হওয়াতে সে শীঘ্রগতি দ্বার খুলিয়া দিল। পরক্ষণেই অশ্বারোহী ব্যক্তি তাহাদের দ্বারে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে তাহারা সকলে সভয়ে দেখিল, যে এ ব্যক্তি জমীদার-পুত্রের সমভিব্যাহারী ভৃত্য!

ভৃত্য গৃহপ্রবেশ করিলে সাইমন তাহাকে অভ্যাগতোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিল। ভৃত্য উপবেশন না করিয়া আসনদানার্থ গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—"আজ প্রাতে যে জমীদার-পুত্র তোমার দোকানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী আমাকে তোমার নিকট পাঠাইলেন।"

সাইমন,—"তাঁহার কি আদেশ?"

ভৃত্য,—"তিনি কহিলেন যে তোমাকে যে বুটের জন্য আদেশ করা হইয়াছিল, তাহার প্রয়োজন হইবে না। যদি বুটের জন্য চামড়া না কাটিয়া থাক, তবে তাহার পরিবর্ত্তে একযোড়া শবের চটী যত সত্বর পার, প্রস্তত করিয়া দাও। আমি এখানে বসিয়া তাহা প্রস্তত করাইয়া একেবারে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া সাইমন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া, একবার আগন্তুকের মুখের দিকে ও একবার মিথাইলার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন সে কোন প্রেতপুরে বা স্বপ্নরাজ্যে উপনীত হইয়াছে। এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা তাহার জীবনে আর কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থিতির পর সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মাপে চটী করিতে হইবে?" ভৃত্য বলিল,—"যে মাপ তোমার কাছে আছে, সেই মাপে; চটী আমার মনিবের জন্য।"

সাইমন,—"কি বলিতেছ?"

ভৃত্য,—"আমার প্রভু তোমার গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণকালে তোমার দ্বারের চৌকাঠে যে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে ললাটের একটী শিরা ক্ষত হওয়ায় অজস্র রক্তস্রাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বাড়ী পৌঁছিলে দেখা গেল, তাঁহার শবমাত্র ত্রয়কায় পড়িয়া আছে।"

সাইমন এই বাক্য শুনিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিস্ফারিতনেত্রে মিথাইলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু দেখিতে পাইল যে সে তাহাদের কথোপকথনে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া একান্তমনে চটী জুতা সেলাই করিতেছে; দেখিলে মনে হয় যেন যে বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল, তাহা

সে পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিল, অথবা ঐ কথোপকথন তাহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। এতদিনের পর সাইমনের মনে এই প্রথম সন্দেহ হইল যে মিথাইলা কোন দেবতা বা দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইবে! সে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া এইরূপ নানা ভাবনা ভাবিতেছে, এমত সময় মিথাইলা আপন কার্য্য সমাধা করিয়া আগন্তুকের হস্তে চটী জুতা আনিয়া দিল। আগন্তুককে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না বলিয়া সে একান্ত হৃষ্টচিত্তে চর্ম্মকারকে যথোচিত পারিশ্রমিক প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল।

এক, দুই করিয়া ক্রমে আরও তিন বৎসর কাটিয়া গেল। মিথাইলা ঠিক পূর্ব্বমত আছে;—সে কাহারও বাড়ী যায় না, কখনও ঘরের বাহির হয় না, কাহারও সহিত কথা কহে না, আপন মনে আপন কাজ করে এবং কার্য্যশেষে গৃহকোণে বসিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে। সাইমনের গৃহে আগমনাবধি তাহাকে দুইবার মাত্র হাস্য করিতে দেখা গিয়াছে; তদ্ব্যতিরিক্ত তাহার মুখে আর কখনও হাসির লক্ষণ মাত্র দেখা যায় নাই। সাইমন কিম্বা মাত্রিওনা তাহাকে আর কখনও কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। সাইমন এক্ষণে, মিথাইলা কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, সেই সকল ভাবনা না করিয়া দিবানিশি এই ভাবিতে থাকে যে মিথাইলা তাহাকে কোন দিন ছাড়িয়া না যায়।

একদা অপরাহ্নে গৃহস্থ সকলেই আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে;—মাত্রিওনা বৈকালিক রন্ধনে মনোনিবেশ করিয়াছে, সাইমন এক জানালার পার্শ্বে বসিয়া কার্য্য করিতেছে এবং মিথাইলা অপর জানালার সম্মুখে বাহিরের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া সাইমনের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে। সাইমনের বালকবালিকাগণ কখনও বেঞ্চের উপর, কখনও টেবিলের উপর উঠিয়া লাফালাফি করিতেছে। একটী সপ্তমবর্ষীয় বালক দৌড়াইয়া মিথাইলার কাছে উপস্থিত হইল এবং তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র দেহটী জানালার চৌকাঠ পর্য্যন্ত পৌঁছিল না। তখন সে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া মিথাইলার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া জানালার বাহিরে দেখিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইল। সে বাহিরে নেত্রপাত করিবামাত্র চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"কাকা! কাকা! (সাইমনের সন্তানেরা

মিথাইলাকে 'কাকা' বলিত।) দেখ, আমাদের বাড়ী এক সওদাগর-পত্নী আসিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে দুইটী ছোট মেয়ে; তাহার মধ্যে একটীর পা খোঁড়া!"

মিথাইলা এই কথা শুনিবামাত্র হস্তস্থিত পাদুকা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অতি সত্বর স্কন্ধ হইতে বালককে নামাইয়া অতি উৎসুক-নেত্রে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল! মিথাইলা যতদিন সাইমনের গৃহে অবস্থিতি করিতেছে, তত দিনের মধ্যে কেহ কখনও তাহাকে কোন বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতে দেখে নাই। আজ তাহাকে সামান্য কারণে এরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া সাইমন ও মাত্রিওনা একান্ত বিস্মিত হইল। সাইমন উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিল। সে দেখিতে পাইল যে একটী ভদ্র মহিলা দুইটী বালিকার হাত ধরিয়া তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের পরিচ্ছদ দেখিলে সম্ভ্রান্তবংশীয়া বলিয়া ধারণা হয়। বালিকা দুইটীর আকার প্রকার ও পরিচ্ছদে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই; দেখিলে কিছুতেই পরস্পর হইতে পার্থক্য বুঝিবার উপায় নাই। কেবল একটী বালিকার এক পদ ভগ্ন, তাই লাঠি ভর করিয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছিল। সাইমনের মনে হইতে লাগিল যে যদি এই পার্থক্য না থাকিত, তবে তাহাদের বিবাহ হইলে তাহাদের স্ব স্ব স্বামী আপন আপন স্ত্রী চিনিয়া লইতে পারিত কিনা, সন্দেহস্থল। সাইমন দেখিয়াই বুঝিল, বালিকা দুইটী যমজ; কিন্তু যমজেতেও এইরূপ সৌসাদৃশ্য অতি বিরল!

সাইমন এইরূপ নানা কথা ভাবিতেছে, ইত্যবসরে উক্ত মহিলা বালিকা দুইটীর হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। সাইমন ও মাত্রিওনা তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিল এবং স্বাগত জিজ্ঞাসার পর বিনীতভাবে তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মহিলা উত্তর করিলেন যে তিনি বালিকা দুইটীর জন্য ছাগলের চর্ম্মের দুই যোড়া উৎকৃষ্ট জুতা প্রস্তুত করাইতে ইচ্ছা করেন। সাইমন উত্তর করিল,—"আমরা সচরাচর এত ছোট পায়ের জুতা তৈয়ার করি না; তবে আমার কর্ম্মকারক বেশ চতুর লোক। সে আপনার পসন্দ মতন অতি সুশ্রী জুতা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবে।"

সাইমন এই বলিয়া মিথাইলার দিকে নেত্রপাত করিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মিথাইলা অনিমেষনেত্রে বালিকা দুইটীর মুখপানে চাহিয়া

রহিয়াছে। তাহার হাতের কাজ মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। মিখাইলা এত বিহ্বল যে সাইমন যে তাহার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া রহিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার চৈতন্য নাই। সে নিস্পন্দ হইয়া বালিকাদ্বয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে। সাইমন ভাবিল, বালিকা দুইটী অলোকসামান্যা রূপবতী বটে, কিন্তু একান্তই বালিকা! যদি যুবতী হইত, তবে মিখাইলার এইরূপ মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণের কিছু কারণ বুঝা যাইত। কিন্তু এই শিশু সুকুমারীদ্বয়ের প্রতি মিখাইলার দৃষ্টি এরূপ অভিনিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, যে মনে হয়, যেন তাহাদিগকে দৃষ্টির অন্তরাল করিতে গেলে মিখাইলার নেত্রদ্বয়ও সেই সঙ্গে উৎপাটিত হইয়া যাইবে। যাহা হউক, মহিলাটীর দৃষ্টি ঐদিকে আকৃষ্ট হইলে তিনি পাছে সাইমনের কর্ম্মকারককে একান্ত অভদ্র মনে করেন, এই জন্য সে নিজেই জুতার মাপ লইতে বসিল।

আগন্তুক মহিলা খোঁড়া মেয়েটীকে কোলে তুলিয়া লইয়া সাইমনকে বলিলেন,—"ইহার খোঁড়া পায়ের মাপ আগে লও; পরে ইহার ভাল পায়ের মাপ লইলেই দুজনের হইবে। কারণ ইহার ভাল পা ভাল মেয়েটীর পায়ের সহিত এক মাপের, ইহারা উভয়ে যমজ।" সাইমন মাপ নিতে নিতে বলিল,—"ইহার পা কি জন্মাবধিই খোঁড়া? এমন চমৎকার রূপত কখনও দেখি নাই। তাহার উপর এই বিপদ কিরূপে ঘটিল?"

আগন্তুক মহিলা,—"ইহার জন্মিবার পর তাহার মায়ের শরীর চাপা পড়িয়া এই পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।"

এই কথা হইতে হইতে মাত্রিওনাও ঐ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল; এক্ষণে বলিয়া উঠিল,—"তবে কি আপনি ইহাদের মা নন?"

আগন্তুক মহিলা,—"না, গো, আমি ইহাদের কেহই নই। আমার সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই,—অথবা 'ছিল না' বলিতে হইবে; কারণ এখন আমিই ইহাদের সর্ব্বস্ব এবং ইহারাই আমার সর্ব্বস্ব।"

মাত্রিওনা,—"আপনি ইহাদের মা না হইলেও মায়ের অধিক যত্ন করেন, দেখিতে পাইতেছি।"

আগন্তুক মহিলা, —"কেন করিবনা? ইহাদের জন্মকালে আমাকেও ঈশ্বর একটী পুত্রধনে ভূষিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা কে খণ্ডাইবে? তিনি আমার কোলের ছেলেকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন

এবং আমার কোল জুড়াইবার জন্য ইহাদিগকে আমার কোলে তুলিয়া দিলেন। ইহাদের তখন আপন বলিবার জগতে কেহ ছিল না।” এই বলিয়া তিনি বালিকাদ্বয়কে অঙ্কে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে তাহাদের মুখচুম্বন করিলেন।

মাত্রিওনা,—“আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে এবং একটি চর্ম্মকার-পত্নীর এইরূপ কুতূহল ধৃষ্টতা মনে না করেন, তাহা হইলে আমার একান্ত ইচ্ছা যে ইহাদের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করি।”

আগন্তুক মহিলা একান্ত আশ্বস্তভাবে মাত্রিওনার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া উপবেশন করিলেন এবং বালিকাদ্বয়কে আপনার দুই পার্শ্বে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন,—“আমার স্বামী পূর্ব্বে ধান চাউলের ব্যবসা করিতেন। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়া ধান কিনিয়া আনিতেন; ঐ ধান এক কলের অধিকারী ক্রয় করিয়া লইত এবং কলে তাহার তুঁষ ছাড়াইয়া চাউল করিয়া সহরে গিয়া বিক্রয় করিত। এক্ষণে আমাদের অবস্থা খুব ভাল হইয়াছে, আমরা নিজেরাই এক কল করিয়া সমস্ত ব্যবসা নিজেরা চালাইতেছি। যখনকার কথা বলিতে যাইতেছি, তখন আমরা কেবল গ্রামে গিয়া ধান্য ক্রয় করিতাম মাত্র। একবার,—তখন আমার বয়স ১৯ কি ২০ বৎসর হইবে, সবেমাত্র এক বৎসর হইল আমার বিবাহ হইয়াছে, কোলে একটী ১॥ মাসের ছেলে,—আমরা এক গ্রামে গিয়া ধান্য ক্রয়ার্থ বসতি করিতেছিলাম। তথায় আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে এক কাঠুরিয়া ছিল। কাঠুরিয়ার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা, এমতাবস্থায় একদিন তাহার স্বামী জঙ্গলে কাঠ কাটিতে গিয়া একটী কাঠ চাপা পড়িয়া মারা যায়। পরিবারটী একান্ত দরিদ্র বলিয়া আমরা গিয়া নানা প্রকারে কাঠুরিয়া-পত্নীকে সান্ত্বনা দিতে যত্ন করিলাম। তাহারও বয়স আমারই মতন। একে যুবতী, তাহাতে গর্ভবতী, আবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তাহার উপর একমাত্র জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে রমণী একেবারে শোক দুঃখে অভিভূতা হইয়া শয্যাশায়িনী হইল। আমি প্রত্যহ একবার গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিতাম। তাহার স্বামীর মৃত্যুর তিন দিন পরে একদা প্রত্যূষে গিয়া দেখিলাম যে রমণী মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে; তাহার পার্শ্বে পড়িয়া দুইটী সদ্যঃপ্রসূতা দিব্য-লাবণ্যময়ী বালিকা ক্রন্দন করিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া রমণীকে স্পর্শ করিলাম; তখন জানিতে পারিলাম যে রমণী প্রসবান্তেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। দরিদ্র বলিয়া কেহ গ্রাহ্য করিবে না, এই আশঙ্কায় অথবা লোকাভাবে সে

প্রসববেদনা অনুভব সময়ে কাহাকেও সংবাদ দেয় নাই। প্রসবকালে বোধ হয় অর্দ্ধোপবিষ্টাবস্থায় ছিল এবং প্রাণবায়ু বিনির্গমনান্তে তাহার দেহটী গড়াইয়া পড়িয়াছিল ; কারণ বালিকা দুইটীকে উঠাইতে গিয়া দেখিলাম যে তাহার দেহের চাপে একটি বালিকার একটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

"ক্রমে এই সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। গ্রামস্থ সকল গৃহস্থ ব্যক্তিরা একত্র হইয়া নানারূপ শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। আমরা মরণান্তে শোক ও সহানুভূতি যথেষ্ট প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সহানুভূতিটুকু অল্প অল্প খরচ করিয়া রুগ্নের সেবার সহায়তা করিলে অনেকস্থলে শোকটুকু বাঁচিয়া যাইতে পারে। এই রমণীকে গ্রামস্থ লোকেরা পূর্ব্ব হইতে একটু যত্ন করিলে তাহার এই অকালমৃত্যু ঘটিত না। আমিও তখন নিজের অমনোযোগের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। যাহা হউক এক্ষণে সকলে পরামর্শ করিতে লাগিল যে বালিকা দুইটিকে লইয়া কি করা যাইবে? গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা স্থির করিল যে যাহাদের শিশু ক্রোড়ে আছে, এরূপ মহিলাদিগের হস্তে ইহাদের ভারার্পণ করিতে হইবে ; পরে চাঁদা করিয়া ইহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যাইবে। আমার তখন প্রথম যৌবন, সুস্থ সবল দেহ যেন যৌবনগর্ব্বে ফাটিয়া পড়িতেছে। আমি অগ্রসর হইয়া মেয়ে দুইটিকে কোলে তুলিয়া লইলাম এবং 'আমিই ইহাদের ভার গ্রহণ করিলাম' বলিয়া আপন গৃহে লইয়া গেলাম। এই দুইটীই আমার সেই পালিতা কন্যাদ্বয়!" এই বলিয়া মেয়ে দুইটীকে পুনরায় কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন করিয়া আগন্তুক মহিলা পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"ইহাদের জন্মের দুই বৎসর পরে আমার নিজের ছেলেটী ঈশ্বর কাড়িয়া লইয়াছেন ; কিন্তু আমি ইহাদিগকে লইয়া সুখে আছি। ইহারা না থাকিলে আমার কি হইত, বলিতে পারি না, কারণ আমার আর এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই।"

আগন্তুক মহিলা এইরূপে আপন কাহিনী শেষ করিয়া বালিকাদ্বয়কে লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন সাইমনের দৃষ্টি মিখাইলার দিকে আকৃষ্ট হইল। ওকি! মিখাইলার দেহে যেন আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে ;— মুখে হাসির ছটা বিদ্যুতের ন্যায় খেলা করিতেছে, সমস্ত শরীর যেন জ্যোৎস্না-মণ্ডিত হইয়া গৃহকোণ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। মিখাইলার প্রত্যেক অঙ্গে যেন স্বর্গীয় জ্যোতির প্লাবন বহিতেছে।

মিখাইলার হাস্য ও দেহের জ্যোতি দেখিয়া সাইমন ও তাহার পত্নী হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। মিখাইলা যখন দেখিতে পাইল যে সাইমনের দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন সে মৃদু হাস্য করিতে করিতে স্বীয় আসন ত্যাগ করিয়া সাইমনের দিকে অগ্রসর হইল এবং গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিল,—"ভ্রাতঃ, আমার দুঃখের দিন ফুরাইয়া গেল; আমি একণে তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করি। তোমাদের অন্নে এতদিন প্রতিপালিত হইয়াছি, একণে তোমরা উভয়ে স্বচ্ছন্দমনে আমাকে স্বস্থানে গমন করিতে অনুমতি দাও।"

সাইমন,—"তোমার আকার প্রকার দেখিয়া আমার মনে হইতেছে না যে তুমি কোন পার্থিব নর; কিন্তু তুমি সাধারণ মানুষের মত কথা কহিতেছ, তাই আমিও তোমাকে সাধারণ মানুষের মত সম্বোধন করিতেছি। ভ্রাতঃ মিখাইলা, তুমি যাইতে চাহিলে তোমাকে যে ধরিয়া রাখি, এমন সাধ্য আমার নাই। আর, তোমাকে যখন দেবরূপী দেখিতেছি, তখন তোমার নিজের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিবারও আমার অধিকার নাই। তবে একটী বিষয়ে আমার বড় সংশয় রহিয়াছে, তাহা যদি অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দাও, তবে একান্ত কৃতার্থ হইব। তুমি আমার গৃহে আসিয়া অবধি কখনও হাস্য কর নাই; কেবল তিনবার মাত্র হাস্য করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহারও কোন কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস যে যদি তুমি ঐ তিনবার হাস্য করিবার কারণ বুঝাইয়া দাও, তবে আমার মত অজ্ঞ লোকেরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ হইতে পারে। আশা করি, আমাকে এই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিবে না।"

মিখাইলার মুখে এখন আর বিষাদের ছায়া নাই; প্রফুল্লতা মুখ ও অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সে হাস্যমুখে স্নেহার্দ্র কোমল স্বরে বলিতে লাগিল,—"আমি যতদিন তোমাদের গৃহে ছিলাম, ততদিন তোমরা যে আমাকে প্রতিনিয়ত বিষন্ন দেখিয়াছ, তাহার কারণ এই, আমি ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন হেতু শাস্তিভোগ করিতেছিলাম। এই শাস্তি হইতে মুক্তিলাভকরণার্থ আমার উপর ঈশ্বরের তিনটী আদেশ হইয়াছিল। আমি যে পাপ করিয়াছিলাম, তাহা জগতের তিনটী নিগূঢ় সত্য না জানার ফল। তাই ঈশ্বরের এই আদেশ হইয়াছিল যে, আমি যে পর্য্যন্ত ঐ তিনটী সত্য পরিজ্ঞাত না হই,

সে পর্য্যন্তই আমার শাস্তি। প্রথম, যখন তোমার গৃহে আসিলাম, তখন তোমার স্ত্রী নিজেদের অবস্থা ভুলিয়া আমাকে আহার ও বস্ত্রদান করিলেন; তাহাতে আমি একটী সত্য শিক্ষা করি। আমার শাস্তির একতৃতীয়াংশ খণ্ডন হইল বলিয়া তখন আমি প্রথম হাস্য করিয়াছিলাম। তাহার পর বহুদিন গত হইলে যখন এক জমীদার-পুত্র জুতা প্রস্তুত করাইতে আসিয়াছিল, তখন আমি দ্বিতীয় সত্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। আমার শাস্তির দুই-তৃতীয়াংশ কাটিয়া গেল বলিয়া তখন আমি দ্বিতীয়বার হাস্য করিয়াছিলাম। তৎপর ঐ বালিকা দুইটীর জন্ম বৃত্তান্তে আমি তৃতীয় সত্য লাভ করিয়া শাস্তি হইতে সম্যক্ মুক্তি লাভ করিয়াছি। তোমরা যে আমার দেহ হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে দেখিয়াছ, তাহার কারণ এই যে, ঈশ্বর এই উপায়ে আমাকে জানাইয়া দিলেন যে, আমি শাস্তি হইতে সম্যক্ মুক্তি লাভ করিলাম।"

সাইমন,—"তুমি কি কি সত্য শিক্ষা করিলে এবং কি পাপে শাস্তিভোগ করিয়াছ, তাহা যদি কৃপা করিয়া আমাকে শুনাও, তবে আমিও সত্য শিক্ষা করিতে পারি এবং তোমার পাপের বিষয় জ্ঞাত হইলে তাহা হইতে নিজকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে পারি। ভাই, আমাকে সমস্ত বিস্তার করিয়া বল।"

মিখাইলা পুনরায় বলিতে লাগিল,—"ঈশ্বর আমাকে কেন শাস্তি দিয়াছেন, তাহা বলিতে হইলে আমাকে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে হয়। তুমি আমার এমন উপকারী বন্ধু যে তোমার নিকট আর আত্মগোপন করিয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে; অতএব বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি একজন স্বর্গীয় দূত; ঈশ্বরের আদেশে পৃথিবীস্থ সুকৃতি-পরায়ণ মানবদিগের মরণান্তে তাহাদের আত্মা স্বর্গস্থ করিবার নিমিত্ত আমরা নিয়ত পৃথিবীতে যাতায়াত করিয়া থাকি। একদা আমি নিজের অজ্ঞানতা বশতঃ ঈশ্বরের একটী আদেশ অবহেলন করাতে স্বর্গচ্যুত হইয়া এই শাস্তি ভোগ করিয়াছি। তাহার বিবরণ কহিতেছি। একদিন ঈশ্বর আমাকে ধরণীস্থ একটী রমণীর আত্মাকে স্বর্গে আনয়নার্থ আদেশ করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা পক্ষবিশিষ্ট, মর্ত্ত্য ও স্বর্গের মধ্যে উড়িয়া যাতায়াত করি। আদেশমাত্র আমি উড়িয়া ধরাতলে উপনীত হইলাম এবং ঐ আসন্নমৃত্যু রমণীর সিয়রে গিয়া দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে রমণী কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র হইল দুইটী লাবণ্যময়ী

যমজ কুমারী প্রসব করিয়াছে। সে যাতনায় ছটফট করিতেছে; মেয়ে দুইটী ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। রমণী হাত বাড়াইয়া তাহাদিগকে ধরিতে পারিতেছে না, এবং নিজে উঠিয়া তাহাদিগকে কোলে তুলিবার কিম্বা অন্য কোন উপায়ে সান্ত্বনা করিবার ক্ষমতা হইতেছে না। দুই তিন বার চেষ্টার পর উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিল, কিন্তু যাতনায় ক্রন্দন করিতে লাগিল; তথাপি অপত্যস্নেহ তাহাকে নিশ্চেষ্ট হইতে দিল না। সে যেমন উঠিবার জন্য পুনরায় মাথা তুলিল, অমনি আমার দিকে তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। আমাকে দেখিবামাত্র মৃত্যু আসন্ন জানিয়া সে হতচেতন হইয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরে চেতনালাভ করিয়া আর্ত্তস্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—'দেবদূত,' আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি; তুমি স্বর্গের সৌরভ লইয়া মর্ত্ত্যে বিচরণ কর, তোমাকে কি চিনিতে বাকী থাকে? তুমি আমাকে লইতে আসিয়াছ, আমি সংসারের দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব, ইহাতে আমার আনন্দ ছাড়া নিরানন্দ হইতে পারে না। কিন্তু আমার এই সদ্যঃপ্রসূতা বালিকা দুইটীর কি দশা হইবে? তাহাদের এজগতে আপনার বলিবার কেহ নাই। আমি গেলে তাহারাও অযত্নে অনাহারে মারা যাইবে। অতএব দেবদূত, আমি কড়যোড়ে প্রার্থনা করি, আমার মেয়ে দুইটীর জন্য, অন্ততঃ তাহারা যতদিন না চলিয়া বেড়াইতে পারে, তত দিন পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা কর। আমাকে আজ নিও না। পিতা মাতা বিহনে শিশুসন্তান বাঁচিতে পারিবে না।' হায়! অভাগিনী জানিত না যে সে নিজে বাঁচিলেও তাহার রুগ্নাবস্থায় কে শিশুদিগের ভরণপোষণ করিবে? যাহা হউক, তাহার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া আমার প্রাণ গলিয়া গেল। আমি কোন প্রাণে এমত কাতরতাপূর্ণ প্রাণটী কাড়িয়া লইয়া বালিকা দুইটীরও মৃত্যুর কারণ হইব? আমি একটী বালিকাকে তুলিয়া জননীর বক্ষে এবং অপরটীকে হাতের কাছে রাখিয়া পুনরায় ঈশ্বরের সিংহাসনতলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

"ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইয়া আমি এই নিবেদন করিলাম,—'মহাপ্রভু! আমা দ্বারা ঐ রমণীর আত্মা আনয়ন হইল না। কারণ তিন দিন হইল তাহার স্বামী বৃক্ষ চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। তাহাদের জীবিকার সংস্থান কিম্বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কিছুই নাই। রমণী এই মাত্র দুইটী

সুকুমারী প্রসব করিয়াছে। মাতা বিহনে ইহাদের জীবন ধারণ অসম্ভব! একারণ রমণী অনেক কাতরোক্তি করাতে আমি তাহার আত্মা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ঐ কাতরোক্তি আপনার চরণেও পৌঁছিয়াছে এবং আপনিও তাহার প্রতি করুণাবর্ষণ করিবেন জানিয়া আমি তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি।'

"বিধাতা পুরুষ আমার বাক্য শুনিয়া এইমাত্র আদেশ করিলেন যে 'যাও, পুনরায় গিয়া ঐ রমণীর আত্মা গ্রহণ কর। তোমাকে ধরাতলে গিয়া কিছুকাল মানবরূপে বাস করিয়া জগৎপালনের বিধান শিক্ষা করিতে হইবে। ঐ বিধানের তিনটী সত্য তোমার নিকট অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। যতদিন তাহা শিক্ষা না হইবে, ততদিন তুমি আর স্বর্গধামে বাস করিবার অধিকারী হইবে না। সেই সত্য তিনটী এই—(১) মানুষের ভিতরে কি আছে? (২) মানুষকে কি জানিতে দেওয়া হয় নাই? ও (৩) মানুষের জীবনোপায় কি?'

"আমি বিধাতার আদেশে পুনরায় মর্ত্ত্যধামে আগমন করিলাম। আসিয়া দেখি, রমণী আমার গমনে আশ্বস্তা হইয়া শয্যাতলে উপবেশন করিয়া কন্যাদ্বয়কে স্তন্যদান করিতেছে। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহার আত্মা গ্রহণ করিলাম;—তাহার হাত অশক্ত হইয়া পড়িল, বালিকাদ্বয় শয্যাতলে গড়াইয়া পড়িল এবং রমণীর মৃতদেহ তাহাদের একটীর উপর পড়িয়া তাহার পা ভাঙ্গিয়া দিল। আমি তাহাদের রোদন সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বর মর্ত্ত্য ছাড়িয়া স্বর্গাভিমুখে চলিলাম। অর্দ্ধপথে প্রচণ্ড ঝটিকা উঠিয়া আমার হস্ত হইতে রমণীর আত্মাটী উড়াইয়া লইয়া গেল। আমি আরও দেখিলাম যে আত্মা আমার হস্তস্খলিত হইয়া আপনাআপনি উর্দ্ধদিকে উড়িয়া যাইতেছে কিন্তু আমি ক্রমশঃ নিম্নদিকে চলিয়াছি। আমার অতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। আমার পক্ষ দুইটী ঝটিকাতে উড়িয়া চলিয়া গেল এবং আমি জড়পিণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইলাম।

"স্বর্গে কাহারও কোন অভাব বোধ থাকে না, তাই অভাব পূরণ জন্য স্বর্গবাসীদের কোন চেষ্টাও হয় না। আমি ভাবিতাম যে অভাব বোধ ও অভাব পূরণ, ইহাই মানুষের জীবন, এবং মানুষ নিজের অভাব নিজের চেষ্টাতেই পূরণ করিয়া থাকে। ধরাতলে নিপতিত হইয়া আমি প্রথমেই ক্ষুৎপিপাসা ও শীত বোধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু অভাব পূরণের কোন

উপায়ই খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি প্রথমে উড়িয়া চলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতেও সক্ষম হইলাম না। এরূপ অবস্থায় আমি যখন গীর্জ্জার পার্শ্বে পড়িয়াছিলাম, তখন সাইমন আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল।”

এতদিনে সাইমন ও মাত্রিওনা বুঝিতে পারিল যে, কিরূপ লোককে তাহারা এতদিন অশন বসন দিয়া পালন করিয়াছে। তাহারা মিখাইলার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাহার নিকট দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল। মিখাইলা তাহাদিগকে হাত ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—“আমি এইরূপ অবস্থায় একান্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, এমন সময় সাইমন, তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে। আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি নিজে দিনান্তে খাইতে পায় না, পরিধানে গলিত বস্ত্র, ইহাদ্বারা কিরূপে আমার সংস্থান হইবে? আর তাহা না হইলেও আমি ত আর কোন উপায় দেখি না। ইতিমধ্যে তুমি আমাকে দেখিয়া মুখ বিকৃত করিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছিলে, তখন আমি আরও হতাশ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেখিলাম, তুমি আমার দিকে অগ্রসর হইতেছ। তখন তোমার মুখের ভাব অন্যরূপ হইয়াছিল। তোমার মুখে আমি ঈশ্বরের প্রীতি দেখিতে পাইয়া অনেক আশ্বস্ত হইলাম। তুমি আসিয়া আপন বস্ত্রে আমাকে আচ্ছাদিত করিয়া সঙ্গে করিয়া গৃহে আনিলে। তখন মাত্রিওনা, তোমার মুখ দেখিয়া আমি আবার হতাশ হইয়া পড়িলাম। তোমাদের স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া দেখিয়া আমার মনে হইল না যে, আমি আমার অভাব পূরণোপযোগী কিছু তোমাদের নিকট প্রত্যাশা করিতে পারি। আমার প্রাণ একান্ত আকুল হইয়া উঠিল; আমি মুক্তির উপায় ভুলিয়া গিয়া উদরের জ্বালায় একান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, তোমারও মুখের পরিবর্ত্তন ঘটিল; তোমার স্বামী ঈশ্বরের নাম লইবামাত্র তোমার মুখে ঈশ্বরের প্রেম ফুটিয়া উঠিল। তুমি সমস্ত রাগ দ্বেষ ভুলিয়া আমার অভাব নিজের প্রাণে অনুভব করিলে, আমাকে আহার দিয়া জীবন দান করিলে! তখন হঠাৎ আমার মনে হইল, ঈশ্বর আদেশ করিয়াছিলেন, আমাকে শিক্ষা করিতে হইবে, মানুষের প্রাণে কি রহিয়াছে, যাহার বলে জগৎ চলিতেছে, যাহা না থাকিলে জগৎ বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস হইয়া যাইত,—মানুষের প্রাণে আছে—‘প্রেম’!

“তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, আমার এক সত্য লাভ হইল। আমার

নির্ব্বাসনের এক তৃতীয়াংশ কাটিয়া গেল ভাবিয়া আমি আনন্দে হাস্য করিয়াছিলাম।

"প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে আমি আশ্বস্ত চিত্তে অপর সত্য লাভের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত আমি আর কিছুই নূতন শিক্ষা করিতে পারিলাম না। তৎপর কিছুদিন অতীত হইলে এক জমীদার-পুত্র জুতা প্রস্তুত করাইতে আসিল। আমি সভয়ে দেখিতে পাইলাম যে তাহার পশ্চাতে আমার পূর্ব্ব সহচর অপর এক দেবদূত দাঁড়াইয়া আছে। গৃহস্থ কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি দেখিবামাত্র চিনিলাম এবং জানিলাম যে জমীদার-পুত্রের আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত। এদিকে দেখিতে পাইলাম যে তিনি এক বৎসরের জন্য জুতার বন্দোবস্ত করিতে বসিয়াছেন। তখন হঠাৎ আমার মনে ঈশ্বরের দ্বিতীয় আদেশ উদয় হইল। মানুষকে কি জানিতে দেওয়া হয় নাই? আমি ভাবিলাম, 'হায়! এব্যক্তি অর্দ্ধদণ্ড মধ্যে গতাসু হইবে, কিন্তু এখনও তাহা না জানিয়া কতরূপ কল্পনা ও কত বিষয়ের কালব্যাপী বন্দোবস্ত করিতে যাইতেছে!' মানুষকে জানিতে দেওয়া হয় নাই—তাহার নিজের "জীবনের পরিণাম!" মানুষ নিজের জীবনের পরমুহূর্ত্তে কি ঘটিবে, তাহা জানিতে পারে না; তাই নানারূপ কল্পিত অভাব সূচনা করিয়া তাহার পূরণ জন্য কত প্রকার বৃথা আয়োজন করিয়া থাকে। ঈশ্বরের এই দ্বিতীয় সত্য উপলব্ধি হওয়াতে আমার পাপের দুই তৃতীয়াংশ কাটিয়া গেল জানিয়া, আমি দ্বিতীয়বার হাস্য করিয়াছিলাম।

"তৎপর এই বালিকাদ্বয়ের জীবনে আমি তৃতীয় সত্য পরিস্ফুট দেখিতে পাইলাম। ইহারা যখন প্রথম এই গৃহে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন হইতেই আমি ইহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলাম এবং কিরূপে ইহারা জীবিত থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতাতে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহাদের পালয়িত্রীর উপাখ্যানে আমি জানিতে পারিলাম, মানুষের জীবনোপায় কি। মানুষের জীবনোপায়, পিতামাতা কিম্বা তাহাদেরই চেষ্টা যত্ন, এসব কিছুই নহে; তাহা কেবল ঈশ্বরদত্ত 'প্রেম'। ঈশ্বরের প্রেম এই দয়াবতী রমণীর প্রাণে না থাকিলে এই শিশু দুইটী কিছুতেই রক্ষা পাইত না।

"এই তিন সত্য হইতে আমি জানিতে পারিলাম যে ঈশ্বর 'প্রেমস্বরূপ'—

যেখানেই ঈশ্বরের প্রেম বিরাজ করিতেছে, সেখানেই স্বয়ং ঈশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন। যেখানেই ঈশ্বর প্রেমরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেখান হইতেই মানুষের জীবনের উৎস প্রবাহিত হইতেছে। মানুষ নিজের চেষ্টা যত্নে কিছুই করিতে পারে না; বৃক্ষ যেরূপ মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ মানুষ ঈশ্বরের প্রেমরূপ উৎস হইতে আপন জীবনোপায় সংগ্রহ করিয়া থাকে। সন্তানের জীবন ধারণ জন্য কি প্রয়োজন তাহা জানিতে না পারিয়া জননী শোকাতুরা হন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রেম যে কোন উৎস হইতে কোনদিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা কেহই দেখিতে পায় না। মানুষ সর্ব্বক্ষণ নিজের পরিণাম ভাবিয়া কাতর হয়, কিন্তু ঈশ্বরের বিধান তাহাকে সেই পরিণাম জ্ঞান হইতে বঞ্চিত রাখে। আমি আজ জানিতে পারিলাম যে ঈশ্বর স্বয়ং প্রেমরূপে মানুষের জীবনোপায় বিধান করিতেছেন! অতএব মানব-জীবনের উপায়, অবলম্বন, সমস্তই একমাত্র 'প্রেম' !!"

মিখাইলার এই বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তাহার দেবরূপ প্রতিভাত হইয়া উঠিল; দীপ্তিমান নক্ষত্রমণ্ডিত দুই পক্ষ সমুদ্গত হইল। হঠাৎ যেন স্বর্গ হইতে আলোক অবতীর্ণ হইয়া মিখাইলাকে মণ্ডিত করিয়া ফেলিল। সাইমন ও মাত্রিওনা যুগপৎ ভয়, বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। অনন্তর উভয়ে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিতে পাইল যে গৃহে আর কেহই নাই, মিখাইলা অন্তর্হিত হইয়াছে !*

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

জগদ্রাম রায়।

Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air.
—*Gray*.

কত সময় যে কবি-কল্পনা সত্যে পরিণত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উপরে যে কবি-কল্পনা উদ্ধৃত হইয়াছে, এই প্রবন্ধের শীর্ষের

---

* এই গল্পটি বিখ্যাত রুশীয় উপন্যাস-লেখক কাউণ্ট টলষ্টইয়ের একটি গল্পের তাৎপর্য্যানুসারী অনুবাদ।

লিখিত জগদ্রাম রায়ের পক্ষে তাহা ঠিক মিলিয়া যায়। পাঠক! আপনি কখনও জগদ্রামের নাম শুনিয়াছেন কি? ইনি কবি-কল্পিত, মরুভূমিজাত পুষ্পের ন্যায়, স্বীয় কবিতা-মাধুরী দ্বারা স্বদেশীয় কয়েক জনের মাত্র মন মুগ্ধ করিয়া unwept, unhonored and unsung হইয়া কবি রাজ্যে গমন করেন। ইনি যদি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়া প্রত্যেক ইংরাজী-শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকের কণ্ঠাভরণ হইত এবং তাঁহার বিমল যশোরাশি দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত। কিন্তু তিনি ত সেরূপ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া এ সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সেরূপ পুণ্য থাকিলে এই ভারতবর্ষের এক তমসাচ্ছন্ন প্রদেশ বাঁকুড়া জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন কেন? ইংলণ্ডের কথা দূরে থাক্, তিনি যদি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার যশোরাশি কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের যশের ন্যায় দিগন্ত বিস্তৃত হইত। কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের নামের সহিত জগদ্রাম রায়ের নাম উল্লেখ করায়, এখন বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন যে জগদ্রাম রায়ও একজন কবি ছিলেন। জগদ্রাম রায় আজ কালকার কবি নহেন। ইনি বঙ্গভাষায় একজন পুরাতন ও প্রধান কবি ছিলেন। একশত বৎসরের উপর হইল, তিনি নানাবিধ সুললিত ছন্দে 'অদ্ভুত রামায়ণ' প্রভৃতি তিন চারিখানি সুবৃহৎ মহাকাব্য রচনা করিয়া স্বদেশবাসীদের মন মুগ্ধ করিয়া যান। স্বদেশবাসীদের মনমুগ্ধ করিয়া যান, এই কথা বলিলাম বলিয়া যেন এরূপ কেহ মনে না করেন যে, তাঁহার সেই মধুর পদাবলী অপর দেশবাসীদের মন মুগ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। স্বদেশবাসী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার পদাবলী এ পর্য্যন্ত তাঁহার স্বদেশের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র যায় নাই। অনেকে সুযোগ্য ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুলস্ বাবু শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন। উপস্থিত সময়ে আমি নিজে জগদ্রাম রায়ের কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, শিবদাস বাবু তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, অদ্য পাঠকগণকে তাহাই শুনাইব। ইনি জগদ্রাম রায়ের রচিত অদ্ভুত রামায়ণের ভরত-সংবাদ নামক অংশবিশেষ মুদ্রিত করেন, এবং তাহার ভূমিকাতে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"বাঁকুড়া জেলায় ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুলস্ থাকা কালে স্কুল পরীক্ষার

ব্যপদেশে আমি একবার ভুরিসুট পরগণায় যাই এবং ঠিক সন্ধ্যার সময় একটী পল্লীতে উপস্থিত হই। যদিও আমার গন্তব্য স্থান অন্যত্র ছিল, তথাপি রাত্রিকালে উক্ত দেশে গমনাগমন বিপদসঙ্কুল জানিয়া রাত্রিতে আমার গন্তব্য স্থানে যাইতে সাহস করিলাম না। উক্ত পল্লীর একটী চণ্ডীমণ্ডপে অশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে দুই একটী করিয়া প্রায় ২০।২৫ জন গ্রামবাসী হুঁকা হস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আমার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দুইটী সমবয়স্ক যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের কক্ষদেশে একখান হস্ত লিখিত পুঁথি ও অপরের হস্তে একটী প্রজ্বলিত মৃণ্ময় প্রদীপ ছিল। যুবকদ্বয় মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া তানলয়ে পুস্তকটী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে অংশটুকু যুবকদ্বয় পাঠ করিতেছিলেন, তাহা করুণারসে এরূপ পূর্ণ যে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নয়নাশ্রু গণ্ড-স্থল প্লাবিত করিয়া বক্ষ দেশে বহিতে লাগিল। যদিও আজন্মকাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়া আমার মেজাজ কতকটা ইংরাজী ধরণের হইয়াছে, তথাপি আমার বেশ মনে হইতেছে, দুই এক বিন্দু অশ্রুকণা আমারও নয়ন-প্রান্তে দেখা দিয়াছিল। ইত্যাদি।” শিব বাবু জগদ্রামের কবিতায় এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি ঐ অংশ টুকু অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছিলেন। জগদ্রাম রায়ের সম্যক্ গ্রন্থ ছাপাইবার জন্য শিব বাবুর একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জগদ্রাম রায়ের কপাল নিতান্ত মন্দ, তাই শিব বাবু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

আমি জগদ্রাম রায়কে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের কবি বলিয়াছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রয়োগ করি নাই। এক্ষণে উক্ত বিষয়ে কিছু প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। এই প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশে জগদ্রামের জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁহার গ্রন্থের কথঞ্চিৎ পরিচয় লইবার জন্য আমি একবার তাঁহার জন্মভূমি ভুলুই গ্রামে যাই।

এই ভুলুই গ্রামটী রাণীগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রসিদ্ধ দামোদর নদের দক্ষিণ তটে অবস্থিত। গ্রামটী বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত এবং বাঁকুড়ার ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। গ্রামটী পল্লী হইলেও তাহাতে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস আছে। একা ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব জগদ্রাম রায়ের বংশাবলী গ্রামখানির প্রায় অর্দ্ধেক অংশ

ব্যাপিয়া বসবাস করিতেছেন। যদিও তাঁহারা আধুনিক মতে শিক্ষিত নহেন (আজ কাল অল্প ইংরাজী না জানিলে কেহ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হন না), তথাপি তাঁহারা ভদ্রের একশেষ ও অতিশয় অতিথিপ্রিয়। ভুলুই গ্রামটী এক্ষণে যে স্থানে আছে, পূর্ব্বে এ স্থানে ছিল না। পুরাতন ভুলুই বর্ত্তমান ভুলুইয়ের প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে ছিল। ১২৩০ সালের দামোদর নদের বিখ্যাত বন্যাতে পুরাতন ভুলুই নদীগত হইলে গ্রামবাসীরা বর্ত্তমান ভুলুইয়ে উঠিয়া যান এবং তাঁহাদের জন্মস্থানের নামেই আধুনিক ভুলুই গ্রামের নামকরণ করেন। পুরাতন ভুলুই গ্রামের এক্ষণে কোন চিহ্নমাত্র নাই; কেবল একটী পুরাতন শিবমন্দির নদীর দক্ষিণ তটে দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ স্থানটী দর্শকগণকে দেখাইয়া দিতেছে। ১২৩০ সালের বিখ্যাত বন্যায় যে কেবল ভুলুই গ্রামটী নদীগত হইয়াছে, তাহা নহে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপর অনেকগুলি গ্রামও নদীগর্ভে লীন হয়। ১২৩০ সালের বন্যা সম্বন্ধে একটী গ্রাম্য কবিতা উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাহার এক স্থানে এইরূপ আছে;—

ভাঙ্গিল আধগাঁ, ভাড়া, গয়লাপাড়া,
ভাঙ্গিল বাবুইশোল,
তা' পরে ভাঙ্গিল গিয়ে নপুর বল্লভপুর।
বান ছুটিছে (যেন) টাঙ্গন ঘোড়া,
তা' পরে ভাঙ্গিল গিয়ে মেজে মহিষাড়া।

বান-ভাঙ্গা কবিতাটীর যে অংশটুকু উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ভুলুই গ্রামের নাম নাই বটে, কিন্তু তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম সকলের উল্লেখ আছে; যথা—পূর্ব্বে আধগাঁ বা অর্দ্ধ গ্রাম ও মেজে, পশ্চিমে ভাড়া, উত্তরে নপুর ও বল্লভপুর। পুরাতন ভুলুই এই চতুঃসীমার মধ্যে ছিল; তবে গ্রামখানি পূর্ব্বকালে সামান্য পল্লীগ্রাম ছিল বলিয়াই উক্ত কবিতাতে উহার কোন উল্লেখ নাই। অনেকেই বলেন, জগদ্রাম রায়ের স্বহস্ত লিখিত পুস্তকটী ঐ বন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম; কারণ আমি ভুলুই গিয়া জগদ্রাম রায় মহাশয়ের বংশধর রামনয়ান রায় মহাশয়কে জগদ্রামের গ্রন্থ আনিয়া আমাকে দেখাইবার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি গ্রন্থকর্ত্তার স্বহস্তে লিখিত পুঁথিটী আনিয়া দেখাইলেন। গ্রন্থটী এরূপ ভক্তি ও যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে যে, দেখিলেই সহসা মনের মধ্যে ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়। পুঁথিটী প্রথমতঃ একটী বৃন্দাবনী নামাবলী দ্বারা আবৃত আছে। ঐ পবিত্র আবরণ খুলিলে পর সম্পূর্ণরূপে শ্বেত

চন্দনে চর্চ্চিত দুইখান পাটা দৃষ্ট হইল। গ্রন্থটী এরূপ ভাবে শ্বেত চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত কেন হইল, জিজ্ঞাসা করায়, রামনয়ান রায় মহাশয় কহিলেন যে, তাঁহারা গ্রন্থটীর প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকেন, সেই জন্য এরূপ চন্দন লাগিয়াছে। রামনয়ান রায় মহাশয় জগদ্রাম রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। রামনয়ান রায় গ্রন্থটী খুলিয়া গ্রন্থের কোন অংশ জগদ্রাম রায়ের স্বহস্তের লিখা এবং কোন অংশ জগদ্রাম রায়ের উপযুক্ত পুত্র রামপ্রসাদ রায়ের স্বহস্তের লিখা তাহা আমাকে দেখাইয়া দিলেন। রামপ্রসাদ রায়কে জগদ্রামের উপযুক্ত পুত্র বলিবার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ, তিনিও পিতার ন্যায় পরম ধার্ম্মিক ও ভক্ত ছিলেন ; দ্বিতীয়তঃ, তিনিও নিজে একজন সুকবি ছিলেন। জগদ্রাম রায় পুত্রের কবিত্বশক্তি দেখিয়া স্বরচিত "দুর্গাপঞ্চরাত্রি"র নবমী ও দশমীর গান রচনা করিবার জন্য পুত্রকে অনুমতি দেন। রামপ্রসাদ রায় নবমী পালার গান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এইরূপ লিখিয়াছেন—

* * * * *

ষষ্ঠী আর সপ্তমী অষ্টমী সুশোভন।
এ তিন দিনের গান করিলা রচন ॥
নবমী, দশমী দুই দিবসের গান।
বর্ণনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞাদান ॥
আজ্ঞা পেয়ে হর্ষ হয়ে কৈনু অঙ্গীকার।
যেমন মশকে লয় মার্জ্জারের ভার ॥
বামন বাসনা যেন বিধু ধরিবারে।
পঙ্গু লঙ্ঘিবারে চায় সুমেরু শিখরে ॥
তেন অঙ্গীকার কৈনু পিতার বচনে।
আগু পাছু কিছুমাত্র না ভাবিলাম মনে ॥   ইত্যাদি।

রামপ্রসাদ দুর্গা পঞ্চরাত্রির নবমী ও দশমীর গান শেষ করিয়া কৃষ্ণলীলামৃত-রস নামক একটী প্রকাণ্ড কাব্য লিখিয়া যান।

অদ্ভুত রামায়ণ কোন শকে রচিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আমি পুস্তকটীর শেষ পৃষ্ঠা বাহির করিলাম। তথায় নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত আছে ;—

সপ্তদশ শতাব্দ দ্বাদশ যুক্ত তাথে।
ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে ॥
উনত্রিংশ দিবস বারেতে বৃহস্পতি।
জন্মভূমি ভুলুই গ্রামেতে করি স্থিতি ॥
দ্বিজ জগদ্রাম কাব্য করিল সম্পূর্ণ।
রামধ্বনি কর পাপ তাপ হ'ক শীর্ণ ॥

উল্লিখিত কবিতা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, জগদ্রাম রায় ১৭১২ শকের ফাল্গুন মাসের ঊনত্রিশ দিনে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে জন্মভূমি ভুলুই গ্রামে বসিয়া এই অদ্ভুত রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন। বর্ত্তমানে ১৮১৭ শকাব্দা চলিতেছে। ১৮১৭ হইতে ১৭১২ বাদ দিলে ১০৫ থাকে। সুতরাং ১০৫ বৎসর হইল এই অদ্ভুত রামায়ণ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটী নিতান্ত ছোট খাট নহে। কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হইতে ইহার আকার অনেক বড়; কারণ সপ্তকাণ্ড রামায়ণে যে সকল কথা আছে, তাহা ত ইহাতে আছেই, অধিকন্তু পুষ্করকাণ্ড বলিয়া একটী অষ্টমকাণ্ড ইহাতে আছে। এই পুষ্করকাণ্ডে সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। সহস্রস্কন্ধ রাবণের সহিত রামচন্দ্রের বহু দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধ হয়। পরে রামচন্দ্র পরাজিত হইলে সীতা অসিতা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করেন। এই অদ্ভুত রামায়ণ ব্যতীত দুর্গা পঞ্চরাত্রি ও আত্মবোধ নামক অপর দুইটী কাব্য জগদ্রাম রায় রচনা করেন। শেষোক্ত দুইটী গ্রন্থও নিতান্ত ছোট নহে। দুইটীতে প্রায় অদ্ভুত রামায়ণের তুল্য হইবে। এখন দেখা যাউক, এইরূপ তিনখান সুবৃহৎ কাব্য লিখিতে কত সময় আবশ্যক হয়। জগদ্রাম রায় সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি একজন সংসারী লোক ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার সমস্ত ছিল। তিনি নিজে দুই একখান তালুক করিয়া যান। ইহার উপর তিনি নিজে একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন, সুতরাং দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি সন্ধ্যা-পূজাদিতে অতিবাহিত করিতেন। সন্ধ্যা-পূজা, বিষয়-পর্য্যবেক্ষণ ও পরিবারদের তত্ত্বাবধান করিয়া যাহা অল্প সময় থাকিত, সেই সময়টুকু তিনি কাব্য লিখিয়া অতিবাহিত করিতেন। এরূপ অবস্থায় এরূপ সুবৃহৎ তিনখান কাব্য লিখিতে ২০ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে বলিলে অন্যায় বলা হয় না। তৎপরে, জগদ্রাম রায় কিছু জন্মগ্রহণ করিয়াই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন নাই; অন্ততঃ ২০।২৫ বৎসর বয়সে কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং অদ্ভুত রামায়ণ রচনার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৪০।৪৫ বৎসর হওয়া খুব সম্ভব। এমতে ৪৫+১০৫=১৫০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে ১৮১৭ শকাব্দা চলিতেছে। ইহা হইতে ১৫০ বাদ দিলে ১৬৬৭ শক হয়। সুতরাং জগদ্রামের জন্ম ১৬৬৭ শকে বা তাহার দুই চারি বৎসর অগ্রে বা পরে

হইয়াছিল বলিয়ে বিশেষ ভ্রমে পড়িবার সম্ভব নাই। এই কারণেই আমি জগদ্রাম রায়কে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের কবি বলিয়াছি।

জগদ্রাম রায়ের কবিতা সম্বন্ধে পাঠকগণকে পরের মুখে ঝাল খাওয়াইয়াছি অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে শিবদাস বাবু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, পাঠকগণকে তাহাই বলিয়াছি। দ্বিতীয় প্রস্তাবে জগদ্রাম রায়ের পুস্তক হইতে দুই চারিটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কবিতার হার পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল। আশা করি, পাঠকগণ, জগদ্রামের কবিতারস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গলা।

যে যে ভাবে জীবন কাটায়, তাহার কথাবার্ত্তা হইতে তাহা বুঝা যায়। উকীলের মুখে মোকদ্দামার কথা, শিক্ষকের মুখে শিক্ষকতার কথা, মুদির মুখে চাল ডালের কথা, কেরাণীর মুখে বড় সাহেবের গল্প প্রায়ই শুনা যায়। মেয়েরা একত্র হইলে তরি-তরকারী ও গহনাদির কথা বলেন। কথাবার্ত্তা হইতে যেমন মনুষ্যের ব্যবসায়াদি নির্ণয় করা যায়, তদ্রূপ তাহার চরিত্র ও প্রকৃতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। উন্নতচরিত্র সদাশয় ব্যক্তির কথাবার্ত্তা একরূপ, পশুপ্রকৃতি বাসনাসক্ত ব্যক্তির কথাবার্ত্তা অন্যবিধ। ব্যক্তিবিশেষের সহিত তাহার কথাবার্ত্তার যে সম্বন্ধ, কোন জাতির সহিত তজ্জাতীয় সাহিত্যের সেই সম্বন্ধ। কারণ, সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্ব। জাতীয় সাহিত্যে জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয়। যে দেশের অধিবাসিবর্গের জাতীয় জীবন যত দীর্ঘকালব্যাপী, তাহার সাহিত্যের ইতিহাসও তত দীর্ঘকালব্যাপী। যে দেশের লোকেরা জীবনের যত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে স্ব স্ব শক্তির নিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের সাহিত্যও তত বৈচিত্র্যপূর্ণ। অনেকে বলেন, কোন মার্কিন লেখক যে এ পর্য্যন্ত মার্কিন জীবনঘটিত কোন অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিতে সমর্থ হন নাই, তাহার কারণ, আমেরিকার অধিবাসিবর্গের মধ্যে সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের অভাব। পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর স্বার্থ, প্রকৃতি, শ্রেণীগত সংস্কার প্রভৃতির সহযোগিতা ও সংঘর্ষেই উপন্যাসের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন্ত

ছবির উৎপত্তি হয়। যে জাতি যত গভীরভাবে সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছে, তাহার জাতীয় সাহিত্যও ভাবের গভীরতার জন্য সেই পরিমাণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলায় যে কোন উৎকৃষ্ট নাটক লিখিত হইতেছে না, তাহার একটি কারণ এই যে বাঙ্গালী জাতিগত ভাবে কোন সুখ বা কৃতিত্বে উৎফুল্লচিত্ত হয় নাই, কিম্বা কোন গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করে নাই। সুস্থ শরীরেই হর্ষের উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়। অপর দিকে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত অসাড় অঙ্গে কোন বেদনা অনুভূত হয় না। আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য কোথায়, জাতীয়তাই বা কোথায়, যে আমরা জাতীয় গৌরবে আত্মহারা এবং জাতীয় অপমানে ম্রিয়মান হইব? যে জাতি নিজ শক্তি ও উদ্যম-শীলতা দ্বারা উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহার সাহিত্যে আত্মগৌরব, আশা ও উদ্যমের চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। আবার যে জাতি অধঃপতিত হইয়াছে, তাহার সাহিত্যে অবসাদ ও নৈরাশ্যের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অধঃপতিত জাতির সাহিত্যে পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতিজনিত অন্তঃসারশূন্য আত্মম্ভরিতাও কখন কখন পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহা উন্নত জাতির আত্মগৌরব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ।

সাহিত্যে যেমন জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব পড়ে, তদ্রূপ জাতীয় প্রকৃতিও প্রতিফলিত হয়। ফলতঃ জাতীয় চরিত্র ও জীবন একই বস্তুর দুইটি দিক্ মাত্র। উভয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট। চরিত্র অন্তরের জিনিষ,জীবন তাহারই বাহ্য অভিব্যক্তি মাত্র। হিন্দু আত্মা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন; তজ্জন্য তাঁহার সভ্যতায় বাহ্য ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বৈভব অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। হিন্দু ধ্যানপরায়ণ, আত্মরত ও কর্ম্ম-বিমুখ। তাই তাঁহার সাহিত্যে প্রকৃত ধারাবাহিক ইতিহাস-গ্রন্থ নাই বলিলেই হয়। আত্মার উন্নতি, সম্প্রসারণ, বিকাশ ও মুক্তি যাঁহার প্রধান চিন্তা ও সাধনের বস্তু, তিনি আত্মার ইতিহাস লিখিবেন; কিন্তু তিনি অনিত্য বাহ্য ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিতেও পারেন;—যদিও বাহ্য ইতিহাস ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। হিন্দুর সাহিত্যে যেমন হিন্দুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, অন্যান্য জাতির সাহিত্যেও তদ্রূপ তাহাদের চরিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে।

জাতীয় জীবন বলিলে শ্রেণীবিশেষের জীবন বুঝায় না। রাজা, অভি-জাতবর্গ, কিম্বা ধন ও সামাজিক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের জীবনই জাতীয়

জীবন নয়। বাহারা খাটিয়া খায় ও খাটিয়া খাওয়ায়, বরং তাহাদের জীবনই জাতীয় জীবন নামে আখ্যাত হইবার অধিকতর দাবী করিতে পারে। বণিক্, কৃষক, শিল্পী, শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, সকলেরই জীবন জাতীয় জীবনের অন্তর্ভূত। সুতরাং কোন সাহিত্য বাস্তবিক জাতীয় নামের যোগ্য কি না, বিচার করিতে হইলে, দেখা উচিত, তাহাতে সকল শ্রেণীর সুখ, দুঃখ, স্বার্থ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা, বিশ্বাস, উদ্যম, আমোদ প্রভৃতির যথাযথ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে কি না। আমরা শৈশবে যে সকল উপকথা শুনিতাম, তাহার অধিকাংশই রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী, মন্ত্রিপুত্র, সহরকোটাল, সুয়ো ও দুয়ো রাণী প্রভৃতির কাহিনীতে পূর্ণ। উপকথা-রাজ্যে চাষাভুষা গরিব লোকদের অতি বিরল বসতি। যদিবা তাহারা তথায় বাস করে, অধিকাংশ স্থলে সে কেবল রাজরাজড়াদের সুবিধার জন্য। অনেক জাতির সাহিত্যও তেমনি কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকদের জীবন লইয়াই ব্যস্ত। গরিব-লোকদের কথা তাহাতে নাই।

এখন দেখা গেল যে, সাহিত্যকে জাতীয়তা দিতে হইলে তাহাতে সকল শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য জীবনের ছবি থাকা চাই। তাহাতে এরূপ কথা থাকা চাই, যাহা সকল শ্রেণীর লোকের মর্ম্মস্পর্শী হয়, এবং সকলেরই হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারে। চাষা চাষার সুখ-দুঃখের কাহিনী, মাঝি মাঝির সুখ-দুঃখের কাহিনী, যে যে শ্রেণীর লোক সে সেই শ্রেণীর লোকের সুখ দুঃখের কাহিনী যেমন বুঝিবে, অপরের কাহিনী তেমন বুঝিবে না। জীবন কথাটা কি অর্থে প্রয়োগ করিতেছি, এক্ষণে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। যে সকল চিন্তা ও ভাবের স্রোত মানুষের মনের মধ্যে প্রবাহিত হয়, আভ্যন্তরীণ জীবন বলিলে আমরা সেই সমস্তই বুঝি। বাহ্য জীবন, বলিলে বুঝি, মানুষ কি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, কি ভাবে বিশ্রাম-সময় যাপন করে, কিরূপ আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া করে, কিরূপ বেশভূষা করে, ইত্যাদি। ধর্ম্মবিশ্বাস আভ্যন্তরীণ জীবনেরই অন্তর্ভূত। ইহা মানুষের অনেক কার্য্যের নিয়ামক, অনেক সুখ দুঃখের মূলীভূত। সুতরাং মানুষের জীবন বলিলে আমরা তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সমূহও বুঝিব।

বাঙ্গলা সাহিত্যকে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য নামের উপযুক্ত করিতে হইলে, সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর কথা ইহাতে লিখিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালী-জীবনের সত্য, পূর্ণাঙ্গ ছবি দিতে হইলে বাঙ্গালী যত প্রকার কার্য্য

করে, এবং আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয়, সকলেরই কথা ইহাতে থাকা চাই। সুতরাং এমন অনেক শব্দের প্রয়োগ করা চাই, যাহা লিখিত বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গীভূত নয়। চাষা, গাড়োয়ান, ছুতার, কামার, নৌকার মাঝি, মুচি, রাখাল, রাজমিস্ত্রি, কুম্ভকার, সহিস, দোকানদার, তাঁতি, ঘরামী, ময়রা, দরজি, কাঁসারি, শাঁখারি, পোদ্দার, কলু, গোয়ালা, মুদি, তামুলি, প্রভৃতি স্ব স্ব ব্যবসায়ে যে সকল শব্দ ব্যবহার করে, তৎসমুদায় এবং তাহারা যে সকল যন্ত্র ও হাতিয়ারাদি লইয়া কার্য্য করে, তাহাদের নাম অধিকাংশ স্থলেই "সাধুভাষা"র বহির্ভূত। তাহারা যে সকল ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয়, তাহারও অনেক পারিভাষিক শব্দ পুস্তকের ভাষায় অপ্রচলিত। তাহাদের নানাবিধ পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, খাদ্যদ্রব্যাদির সমুদয় নামও লিখিত বাঙ্গলায় পাওয়া যায় না; এই সকল শব্দ কথিত বাঙ্গলার অন্তর্গত। তাহাদের অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান শাস্ত্রবহির্ভূত, সুতরাং কথিত বাঙ্গলার সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল সাধুভাষায় অবর্ণনীয়। তাহাদের স্বভাবচরিত্র বুঝিতে হইলে, শুধু তাহাদেরই বা কেন ? সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্বভাব চরিত্র বুঝিতে হইলে—বঙ্গদেশের উপকথা ও মেয়েলি ছড়া রূপ যে অলিখিত জাতীয় সাহিত্য আছে, তাহার অনুশীলন করা আবশ্যক। এই সকলেও সাধুভাষার বহির্ভূত অনেক কথিত বাঙ্গলা শব্দ আছে।

ভাষা যতদিন লিপিবদ্ধ না হয়, ততদিন অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল থাকে, এবং সহজেই পৃথক্ পৃথক্ প্রভাষা বা প্রাদেশিক ভাষায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। অসভ্যদেশে দুই এক ক্রোশ অন্তর যেরূপ ভাষার পার্থক্য দেখা যায়, সভ্যদেশে তদ্রূপ দেখা যায় না। ভাষা লিপিবদ্ধ ও পুস্তকগত হইলে, অনেক পরিমাণে তাহার পরিবর্ত্তনশীলতা ও বিভাজ্যতা হ্রাস পায়। এই জন্য দেখা যায়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলার লেখকগণের পুস্তকের ভাষা প্রায় এক, কিন্তু তত্তৎ অঞ্চলের কথিত ভাষা অতিশয় বিভিন্ন; এত বিসদৃশ যে একজন বর্দ্ধমানবাসী একজন চট্টগ্রামবাসীর খাঁটি কথিত ভাষা বুঝিতে পারে না। * ভিন্ন ভিন্ন জেলায়, এমন কি এক জেলারই ভিন্ন ভিন্ন উপবিভাগে একই জিনিষ, একই গাছ, একই প্রাণীর স্বতন্ত্র নাম। এইজন্য প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গলার একটি অভিধান প্রস্তুত করা উচিত।

---

* অনেকে মনে করেন, পুস্তকের ভাষাই আদি ও আদর্শভাষা; প্রাদেশিক কথিত প্রভাষাগুলি তাহারই অপভ্রংশমাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রভাষাগুলিই স্বাভাবিক, পুস্তকের ভাষা অনেক পরিমাণে মানুষের হাতগড়া একটি কৃত্রিম বস্তুমাত্র।

প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গালার অভিধান প্রণয়নের প্রয়োজন অন্যান্য দিক্ দিয়াও বুঝা যায়। (১) বঙ্গদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে এই সকল কার্য্যের বিবিধ প্রক্রিয়ার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সে গুলি বুঝিতে হইলে, ঐ সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যেক জেলায় প্রচলিত পারিভাষিক নাম জানা চাই। কারণ, তাহা না জানিলে, নানাস্থানে প্রচলিত প্রক্রিয়া জানিয়া তাহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ বুঝা যাইবে না। বিদেশ হইতে আনীত কোন অভিনব উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়ার প্রচলনার্থও এবম্বিধ জ্ঞান প্রয়োজন। (২) উদ্ভিদ্ বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইলে নানাবিধ কৃষিজাত ও স্বভাবজ গাছ গাছড়ার নানা জেলায় প্রচলিত নানাবিধ নাম জানা দরকার। আমরা স্বদেশজাত উদ্ভিদ্‌সমূহের নাম জানি না, কিন্তু Roxburgh প্রভৃতি ইংরাজগণ বহুবিধ ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদের বাঙ্গলা, হিন্দি, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি নাম নিরূপণ করিয়াছেন। সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদে অনেক উদ্ভিদের নাম আছে, যাহাদের বাঙ্গলা নাম একস্থানে এক প্রকার, অন্যস্থানে অন্যপ্রকার। এই সমুদায় নাম সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ হইলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। (৩) প্রাণিবিদ্যার উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার পশু পক্ষ্যাদির স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার বহুবিধ নাম সংগৃহীত হওয়া দরকার। বড় বড় জানোয়ারের নাম প্রায় সর্ব্বত্রই এক। কোথাও কোথাও বা একাধিক নাম প্রচলিত। যেমন মহিষ বা "মোষ" বলিলে সকল বাঙ্গালীই বুঝিতে পারে যে কোন্ চতুষ্পদের নাম করা হইতেছে। কিন্তু পশ্চিম বাঁকুড়া ও মানভূম অঞ্চলে মহিষকে "কাঢ়া" বা "কাড়া" এবং মহিষীকে কাড়ীও বলে। ইহার একটি "শিষ্ট প্রয়োগ" মনে পড়িল। কথিত আছে, মানভূম অঞ্চলে একবার এক যাত্রার দলের অধিকারী রামায়ণের একটি পালা গাহিতে-ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের চন্দনচর্চ্চিত দেহের শোভা বর্ণন প্রসঙ্গে গাহি-লেন—"রামের গায়ে চন্ধন কিবা সাঝে রে, যেমন পাঁকমাখা কাঢ়াটা;" অর্থাৎ "রামের গায়ে চন্দন কিবা সাজে রে, যেন তিনি একটি পঙ্কাক্তদেহ মহিষ!!" রাম ও মহিষের গায়ের রঙ্গ এক কিনা, কবিগণ বিচার করিবেন। বড় বড় জানোয়ারের নাম সম্বন্ধে যাহাই হউক, ক্ষুদ্র চতুষ্পদ, নানাবিধ পক্ষী, মৎস্য ও কীটপতঙ্গাদির নামে বিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। (৪) একটি কথিত বাঙ্গলা শব্দ এক জেলায় শ্লীল, অপর জেলায় হয়ত অতি অশ্লীল। ইহাতে অনেক সময় অনেককে পুরুষ এবং মহিলা উভয় সমাজেই

বড় অপ্রতিভ হইতে হয়। প্রাদেশিক বাঙ্গলার অভিধান থাকিলে এরূপ লজ্জিত হইতে হয় না। (৫) আমাদের সাহিত্যে প্রাকৃতিক শোভার বর্ণন, ঋতু বর্ণন, নরনারীর রূপ বর্ণন, প্রভৃতি বড় একঘেয়ে ও পুঁথিগত হইয়া পড়িয়াছে। যেন পূর্ব্ব কবিগণ সমস্ত সৌন্দর্য্য নিঃশেষরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, এবং উপমারও আর নূতন বস্তু রাখিয়া যান নাই। উপমা ও বর্ণনাগুলি তাঁহাদের মানসোদ্যান হইতে সদ্যশ্চয়িত, সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পের মত বোধ হয় না। খঞ্জন পক্ষী কয়জন দেখিয়াছেন, জানিনা, কিন্তু চক্ষুর প্রশংসা করিতে হইলেই যেন কেহ "খঞ্জন গঞ্জন আঁখি" বলিতে মাথার দিব্য দেয়। যিনি গজেন্দ্রগমন ভাল বাসেন না, তিনিও হয়ত নিজ তন্বঙ্গী নায়িকাকে "গজেন্দ্রগমনী রাই" এর সহিত তুলনা করেন। যিনি কোন জন্মে হয়ত মুক্তা দেখেন নাই, তিনিও "মুক্তার মত দন্ত পাঁতি" বলিতে ছাড়েন না। তুষারদর্শন খুব কম বাঙ্গালীর অদৃষ্টে ঘটে, কিন্তু তবু সকলেই নিষ্কলঙ্ক শ্বেত বুঝাইবার জন্য তুষারের উল্লেখ করেন। সংস্কৃত কবিগণ কেকার বড় ভক্ত। আমার কিন্তু ময়ূরের ডাক ভাল লাগে না। আমি কেন কেকার মোহিনী শক্তির বর্ণনা করিব? আমরা বাস্তবিক যে সকল পশুপক্ষীর রূপে, গতিতে, বা স্বরে মুগ্ধ হই, যে সকল বৃক্ষলতা, ফলপুষ্পের শোভা ও সৌরভে আকৃষ্ট হই, যদি কাব্যে তৎসমুদয়েরই উল্লেখ করি, তাহা হইলে বাস্তবিকই পাঠকগণের মনে একটা সৌন্দর্য্য, সুস্বর বা সৌরভের ছাপ পড়ে। কারণ পুরাতন পুঁথিগত উপমাগুলা কথার কথা হইয়া পড়িয়াছে; তাহারা হৃদয়ে কোন ভাববিশেষের উদ্রেক করিয়া দেয় না। কিন্তু প্রত্যেক কবিকে যদি স্বানুভূত সৌন্দর্য্যের কথাই বলিতে হয়, তাহা হইলে অনেক সময় "সাধু" ভাষায় কুলায় না; তাঁহাকে প্রাদেশিক কথিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই কথিত ভাষার অভিধান না থাকিলে অপর প্রদেশের লোকেরা তাঁহার কাব্যের রসাস্বাদনে সমর্থ হইবে না।

(৬) প্রাদেশিক ভাষা হইতে চরিত্রতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান অনুশীলনের বিশেষ সুবিধা হয়। এই বিষয়টি এরূপ গুরুতর যে ইহা লইয়াই একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে। আমরা এখানে কেবল দুই একটা সামান্য উদাহরণ দিব। যে জাতির ভাষায় দুরূহ ও শ্রুতিকটু অক্ষরের যত বেশী প্রচলন, সাধারণতঃ তাহাদের স্বভাব তত রুক্ষ ও বীর্য্যশালী। যেমন মারাঠাদিগের ভাষা। জাতি ও ভাষা সম্বন্ধে এই নিয়ম যেমন সত্য

এক জাতি ও ভাষার অঙ্গীভূত পৃথক্ পৃথক্ স্থানের লোক ও প্রভাষা সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। বাঁকুড়ার পশ্চিম ও মানভূম অঞ্চলের কথা বড় কর্কশ। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাঁকুড়ার মত বঙ্গের আর কোথাও বোধ হয়, "ড়" অক্ষরটির এত ব্যবহার নাই। প্রথম, "বাঁকুড়া" নামটিতেই "ড়" আছে। তাহার পর আরও কতকগুলি স্থানের নাম শুনুন। লড়্রা, কড়্রা, বদ্ড়া, মুড়্রা, সেন্দড়া, কেঞ্জ্যাকুড়া, আড়্রা, মোষ্যাড়া, কু'লমুড়া, তেঁতুলমুড়ী, হাড়্মাস্ড়া, থামারবেড়্যা, জামজুড়ী, বেল্যাড়া, বেল্যাতোড়, বড়্জোড়া, কলাইবেড়্যা, প্রভৃতি। "ড়" যুক্ত নামের একটি ছড়া আছে। সেটি ভুলিয়া গিয়াছি। নতুবা তাহা নিশ্চয়ই পাঠকগণের কৌতুক উৎপাদন করিত।

আর একটি উদাহরণ দিতেছি। "মুখ-খোলা" স্পষ্ট উচ্চারণ অপেক্ষা "মুখ-বুজা" অস্পষ্ট উচ্চারণ সভ্যতর বটে, কিন্তু উহা আলস্যের পরিচায়ক। যেমন, বাঁকুড়ার লোকের মত "হুঁকা" বলিতে হইলে মুখ যতটা "হাঁ" করিতে হয়, এবং যেমন স্পষ্ট "আ" উচ্চারণ করিতে হয়, সভ্যতর কলিকাতাবাসীর মত "হুঁকো" বলিতে হইলে ততটা মুখব্যাদান করিতে হয় না, অন্ত্য স্বরটাও না স্পষ্ট "ও"কার, না স্পষ্ট "আ"কারের মত উচ্চারিত হয়। এখন প্রাদেশিক ভাষা হইতে ভাষা-বিজ্ঞান শিক্ষার কিরূপ সুবিধা, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। ভিন্ন ভিন্ন প্র-ভাষার মধ্যে ব্যাকরণ, উচ্চারণ ও শব্দগত বিস্তর পার্থক্য আছে। প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা ব্যতীত এগুলি বুঝা যায় না। প্রথম, ব্যাকরণের কথা। মধ্য ও পশ্চিম বাঙ্গলার লোকেরা বলেন, "আমি যাই নাই;" পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা বলেন, "আমি গিয়াছিলাম না।" "যাইব, করিব," প্রভৃতির পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গে "যাইমু, ক'রমু" প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হয়। এই শেষোক্ত পদ দুইটির সহিত সংস্কৃত "যামি" ও "করোমি" পদদ্বয়ের সাদৃশ্য সকলেই অনুভব করিবেন। এইরূপ সাদৃশ্য হইতে বাঙ্গলা ও সংস্কৃতের সম্বন্ধ নির্ণয় পক্ষে কিছু সুবিধা হইতে পারে। তাহার পর দেখুন হিন্দীতে বলে, "নেহি যাঙ্গে;" বাঁকুড়ার পশ্চিম ও মানভূম অঞ্চলে বলে, "নাই যাব;" কিন্তু বঙ্গের অন্যত্র সকলে বলে, "যাব না"। ইহা হইতে হিন্দী এবং পশ্চিম বাঁকুড়া ও মানভূমের প্রভাষার নিকট সম্বন্ধ অনুভূত হইবে। এই নিকট সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সংস্কৃত অঙ্গন শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ "আঙ্গিনা," "বাঁকুড়ী" প্রতিশব্দ "আগ্না" বা

"এগন্তা"। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের পদাবলীতে স্নানের ব্রজভাষানুযায়ী প্রতিশব্দ "সিনান" কথাটির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বাঁকুড়ার লোকেও "সিনান" বলে। বঙ্গের অন্যত্র সকলে বলে, "কি জন্যে যাব", পশ্চিম বাঁকুড়াবাসী বলে, "কিস্‌কে যাব।" এই "কিস্‌কে" কথাটি হিন্দীর অনুরূপ। এইরূপ বহু-সংখ্যক উদাহরণ সংগৃহীত হইলে হিন্দী ও ব্রজভাষার সহিত বাঁকুড়ার প্রভাষার সম্বন্ধ নির্ণীত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, কেবল বাঁকুড়ার প্রভাষা সম্যক্‌রূপে জানি বলিয়াই ইহার এতবার উল্লেখ করিতেছি। আর একটি কথা। বাঙ্গলা ভাষায় যেমন সংস্কৃত ব্যতীত, পারসী, আরবী, ইংরাজী প্রভৃতি শব্দও প্রবেশ করিয়াছে, তদ্রূপ অনেক সাঁওতালী প্রভৃতি অনার্য্য ভাষার কথাও মিশ্রিত হইয়াছে। যেমন, বাঁকুড়া ও মানভূমের অনেক স্থানে "মার্‌ দৌড়্‌" না বলিয়া "মার্‌ দেলাং" বলে। এই "দেলাং" কথাটি সাঁওতালী ভাষা হইতে গৃহীত।

প্রভাষা সমূহের অভিধান প্রণয়নের আবশ্যকতা বুঝা গেল। এখন কথা এই, এরূপ অভিধান প্রণয়নের ভার কে লইবে? শুনিলাম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিতেছেন। ইহা এই সমিতিরই কার্য্য। তবে জানিনা, পরিষদ কি প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন। উক্ত সভার কাজে লাগিতে পারে ভাবিয়া, আমি একটি পদ্ধতির উল্লেখ করিতেছি। পরিষদ একটি প্রশ্ন-তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক জেলার বিভিন্ন উপবিভাগ বা গ্রামবাসী দুই চারিজন লোককে প্রেরণ করিয়া প্রশ্নের উত্তর আনয়ন করুন। তালিকায় নিম্নলিখিত ও তদ্বৎ অপরাপর প্রক্রিয়া, বিষয় ও বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

চাষ—হলচালন, বীজবপন, আগাছা উৎপাটন, জলসেচন, শস্য কর্ত্তন, আহরণ, ইত্যাদি। ধান, আক, গম, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চাষের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করিতে হইবে।

চাষের যন্ত্রাদি—লাঙ্গল, কোদাল প্রভৃতি। ভূমি সম্বন্ধে নানা প্রকার বন্দোবস্ত, যেমন খাজনা (টাকায় কিম্বা আবাদী ফসলে) বন্দোবস্ত, ভাগে বন্দোবস্ত, ইত্যাদি।

ধানভানা। ধান ভানিবার ঢেঁকি প্রভৃতি যন্ত্র ও তাহাদের বিবিধ অংশ, ধানভানার নানাবিধ প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

বিবিধ শস্য ও তরকারীর নাম।

শকট—শকটের চক্র ও অপরাপর অংশের নাম।

নৌকা—বিবিধ প্রকার নৌকার ও নৌকার নানা অংশের, ও নৌকা চালাই-বার নানাবিধ কৌশল ও প্রক্রিয়ার নাম।

শিল্পী ও শ্রমজীবী—ছুতার, কামার, মুচি, রাজমিস্ত্রি, কুম্ভকার, সহিস, খনির কুলি, তাঁতি, ঘরামী, ময়রা, দরজি, কাঁসারি, শাঁখারি, কলু, গোয়ালা, পোদ্দার, প্রভৃতির ব্যবসায় ও কার্য্যের বিবিধ প্রক্রিয়া ও হাতিয়ারের নাম। এক একটি ব্যবসায় ধরিয়া বিস্তৃত তালিকা করিতে হইবে।

গৃহ—পাকা এবং খড়ের বা খোলার ঘরের নানা অংশের নাম।

গৃহস্থালী—নানা প্রকার ঘটি বাটী, বসন ভূষণ,তরকারী, খেলা প্রভৃতির নাম।

উদ্ভিদ্ ও পশুপক্ষ্যাদি—নানা প্রকার উদ্ভিদ্ ও পশু পক্ষ্যাদির নাম।

ধর্ম্মানুষ্ঠান—নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানঘটিত ক্রিয়াকলাপের নাম।

উপকথা ও মেয়েলি ছড়া—একই উপকথা বা মেয়েলি ছড়ার জেলাভেদে যে আকার ভেদ হইয়াছে, তাহাও নিরূপণ করা উচিত।

কিছু আয়াস স্বীকার করিলেই এই অসম্পূর্ণ তালিকাটিকে অনেকটা কার্য্যোপযোগী করা যায়। অনেক স্থলে সংস্কৃত বা ইংরাজী শব্দ দিয়া কথিত বাঙ্গলায় তাহার প্রতিশব্দ জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে। অনেক সময় গৃহ, যন্ত্র, প্রাণী ইত্যাদির ছবি দিয়া চিহ্নিত প্রত্যেক অংশের নাম জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইবে। আবার যেখানে এই সকল উপায় ব্যর্থ হইবে, সেখানে বিশদ বর্ণনা দ্বারা প্রক্রিয়া বা বস্তু বা প্রাণীবিশেষের নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আশা করি "দাসী"র পাঠক পাঠিকাগণ এই বিষয়ে নিজ নিজ সাধ্যমত উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকিবেন। যথাসময়ে শ্রম সফল হইবে।

পরিশিষ্ট।

বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচলিত কতকগুলি শব্দের তালিকা।

সংস্কৃত বা বঙ্গদেশের অন্যত্র প্রচলিত শব্দ প্রথমে, তাহার পরে "বাঁকুড়ী" প্রতিশব্দ দেওয়া গেল।

স্ত্রী—মেইয়া, মাইয়া; কন্যা বা মেয়ে—বিটী; ভাদ্রবধূ—ভাদর বৌ, বুয়াসিন্; পা—পা, ভোঁড়; মুখ—মুখ, মু, ব্যাত; গোঁপ—মচ; কাছা—ছোট; তাকিয়া—গির্‌দ্যা, তাকিয়া; দা—কাটারী; ঢেঁড়স্—রামঝিঞা; বিলাতী কুমড়া—ডিংল্যা, ডিজ্যাল্যা; পেয়ারা—পেয়ারা, আঞ্জির; বর্‌বটী—

রমাকলাই, তেলাকুঁচা—তিঁৎপল্লা, অলস (কুঁড়ে)—গোড্ড্যা ; ভীরু (ভীতু) —ডরপুকুণ্ডা ; নিকর্ম্মা ; গোঁয়ার—উঁকা জানালা—জানালা, ঝরকা ; ফর্সা (মনুষ্য সম্বন্ধে)—গরা, গোরা ; কবরী (খোঁপা)—ঝুঁটি ; বায়না (শিশুদের নির্ব্বন্ধাতিশয়)—রগড়, লগড় ; লালভেরেণ্ডা—সম্বর ; বোগ্‌না —লোকী ; ধুচুনী—টঁকা ; ধনু—কাঁড়বাঁশ ; ঝিনুক—সিতুই ; গিরগিটী—কেঁকলাস ; ল্যাটামাছ—গোড়ুই ; চিংড়ী—চিংড়ী, ইচ্‌লী ; কাক—কাগ, কেউআ, কেগুআ ; ক্রৌঞ্চ—কোঁচবগ ; ছাতারে পাখী—ফেঙ্গা ; বাড়ী—বাকুল ; মজুর—মুনীস ; উকুন—ইকুন, উকুন, ডেঙ্গর ; শূকর—শূয়ার, বরা ; শশক—খরগোস্, সড়্‌সড়্যা ; গোখ্‌রা সাপ—খরীস ; কেউটে—কেল্যাসাপ ; ধীবর (জেলে)—ক্যায়ট ; কাঠঠোক্‌রা—টেঁস্কনা ; গ্রাম্যপথ—কুলি ; মনিব (মজুরদের)—গলা ; ছিদ্র—ভিন্দ ; কাঁটা ফুটেছে—কাঁটা ভুঁকেছে ; চৌকীদার—চৌকীদার, দিগার ; ডুগ্‌ডুগি—ডুগ্‌ডুগি, বিষম ঢাকী ; চড় (চপেটাঘাত)—চড়, টালা ; মাটীর দেওয়াল—কাঁথ ; আতা—মান্দা'র ; মা—(সম্বোধনে) মা, মাই ; ঘড়া—গোর্‌য্যা ; লঙ্কা—সুঁপ্‌র্‌য্যা, সঁপোর্‌য্যা ; ছোট পুকুর বা ডোবা—গোড়্যা ; তঞ্চকতা—তঞ্চকতা, তকল্লোবী।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর কৃপায় দাসাশ্রমের আর একটী মাস নিরাপদে অতীত হইয়া গেল। নিম্নে আতুরগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল :—

১। দামো, ২। তিতুরাম, ৩। টৌকানী, ৪। দেবীয়া, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। শিবু, ৭। ফুলকুমারী, ৮। স্বর্ণ, ৯। কৃষ্ণপ্রসন্ন, ১০। বাবুরাম। ইহারা সকলেই পূর্ব্ববৎ দিন কাটাইতেছে।

১১। দুর্গামণি—এই জন্ম দুঃখিনী নারী নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া কিছু দিন হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। ভগবান ইহার কল্যাণ করুন।

১২। রামজি—এই দুর্ভাগ্য একে খঞ্জ, তাহাতে আবার পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বড় কষ্ট পাইতেছে। বাঁচিবার আশা নাই।

সহর এবং মফস্বলের সহৃদয় বন্ধুগণ যদি তথাকার সহায়হীন অন্ধ, খোঁড়া, প্রভৃতি আতুরগণকে আমাদের নিকট কৃপা করিয়া পাঠাইয়া দেন, তবে আমরা বড়ই কৃতার্থ হইব। সংবাদ দিলে আমরা স্বয়ং গিয়াও লইয়া আসিতে পারি।

গিরিডি সেবালয়ের আয় ব্যয়।

আয়। মণিঅর্ডার ৭৫৲,বাবু সত্যানন্দ বসু মহাশয়ের স্ত্রী ৫৲,বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায় চৌধুরী

মহাশয়ের স্ত্রী ৫৲, বাবু প্রতিভারঞ্জন রায় ৫৲০, শিশি বিক্রয় /০, পুরাতন কাপড় বিক্রয় /১০, বাবুরাম বাবত জমা ৫৲, গত মাসের জের ৩৮২॥০, বাক্সে দান প্রাপ্ত ৫৲০, বাবু গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু ১৲, মোট আয়—১০৪৮৶১২॥,।

ব্যয়। সংসার খরচ ৪০৷৶১০, ধোপা ২৷০, বাড়ী ভাড়া ১৮৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৩৫৶৫, দাহ খরচ ১॥০, বাজে খরচ ১৶০, গোয়ালা ৩৷১০, মোট ব্যয় ১০২৷৶৫।

মোট আয় ব্যয়।

আয়—১০৪৮৶১২॥, ব্যয়—১০২৷৶, হস্তেস্থিত ২৭॥০।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বিগত মাসে নিম্নলিখিত মাসিক চাঁদা ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দীনদয়াল পরমেশ্বর এই পরদুঃখকাতর দাতাগণের মস্তকে আশীর্ব্বাদ-বারি সিঞ্চন করুন।

(২৪শে এপ্রিল হইতে ২৩শে মে পর্য্যন্ত)

বাবু শীতলদাস রায় ১৲, বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ১৲, A Lady c/o. Babu S.N. Das এপ্রিল মাসের চাঁদা ১৲, একজন মুসলমান মহিলা ৷০, বাবু গোলামচরণ গোঁরাই ২৲, ২নং সরকার্স লেনস্থ ছাত্রনিবাসের উদ্বৃত্ত বাসা খরচ মাঃ বাবু শশিভূষণ চট্টো ১৲, বাবু শ্রীনাথ সিংহ ।০, Dr. M. M. Bose ১৲, বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু ১৲, বাবু যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ ॥০, বাবু ভগবানচন্দ্র চৌধুরী ১৲, বাবু যজ্ঞেশ্বরচরণ চৌধুরী ॥০, বাবু বিপিনকৃষ্ণ চৌধুরী ॥০, শ্রীমতী প্রিয়বালা চৌধুরী ॥০, শ্রীমতী তারামণি দাসী ।০, বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী ॥৶০, একটী গরিব /০, বাবু সারদাচরণ বসু ১৲, বাবু যোগেশচন্দ্র গুপ্ত ॥০, বাবু যাদবেশ্বর তর্করত্ন ৮৶০, বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৲, Mr. K. N. Majumdar ২৲, A friend ২৲, একজন বন্ধু ॥০, একজন বন্ধু ১৲, শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী ১৲, শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী ।০, বাবু মনোমোহন বসু ॥০, মুন্সী সফাৎউল্লা ১৲, বাবু মনোমোহন বক্সী ২৲, The Charity fund ২৲, বাবু উমাচরণ শেঠ ।০, বাবু রাখালদাস মিত্র ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চের চাঁদা ॥০, ডাঃ চন্দ্রনাথ চট্টো স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধে ৪৲, বাবু খগেন্দ্রনাথ বসু ১৲, শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ মাতৃশ্রাদ্ধে ১৲, বাবু শশীভূষণ মল্লিক ॥০, বাবু প্যারীমোহন ভড় এপ্রিল ও মে মাসের চাঁদা ॥০, সৈয়দ আব্দুল জব্বর চৌধুরী জ্যৈষ্ঠ মাসের চাঁদা ১৲, N. K. Bose Esq. এপ্রিলের চাদা ১৲, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর এপ্রিলের চাঁদা ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ঐ মাসের চাঁদা ।০, বাবু রামচন্দ্র মিত্র ঐ মাসের চাঁদা ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের চাঁদা ২৲, বেথুন স্কুলের কোন ছাত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে ৷৶৫, A. Sen, Through G. N. Sen এপ্রিল মাসের চাদা ।০, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস মবেশ্বর, ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ ও এপ্রিলের চাঁদা ৪৲, বাবু হরিনাথ চট্টো ৶০, রায় হেমচন্দ্র সরকার বাহাদুর ২৲, বাবু মন্মথমোহন মুখো ১৲, বাবু কৃষ্ণদাস লাহা ১৲, বাবু বিজয়কৃষ্ণ মিত্র ২৲, নবাব সৈয়দ আব্দুস্ সোভান চৌধুরী এপ্রিলের চাঁদা ১৲, রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর এপ্রিলের চাদা ১৲, N. C. Baral Esq. মার্চ্চ ও এপ্রিলের

চাদা ২৲, কুমার জগদীন্দ্রনারায়ণ ১৲, বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ১৲, একটী ছাত্র ৵০, বাবু প্রসন্নকুমার দেব বক্সী ১৲, বাবু রজনীকান্ত রায় ১৲, মুন্সী জাফর আলী সরকার ॥০, বাবু সর্ব্বানন্দ ঘোষ।০, শ্রীমতী সীতাদেবী চৌধুরী ১৲, বাবু সীতানাথ বন্দ্যো ১৲, বাবু দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস ১৲, বাবু সর্ব্বমোহন চৌধুরী ॥০, বাবু কৃষ্ণকুমার গুহ ॥/০, দীনহাটা স্কুলের বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণ ৵৫, একটী ভদ্রলোক ৵০, বাবু উমেশচন্দ্র খাসনবীশ ১৲, বাবু জনকীনাথ মজুমদার ১৲, বাবু অভয়নাথ রায় ১৲, A friend ।/০, বাবু সারদাচরণ সেন ১৲, শ্রীমতী মহামায়া ঘোষ ১৲, বাবু কেদারনাথ দাস এপ্রিলের চাঁদা ।০, বাবু হারাণচন্দ্র চট্টো এপ্রিলের চাঁদা ১৲, বাবু ললিতমোহন বসাক পুত্র বিজন প্রসুনের নামকরণে ১৲, বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ ১৲, বাবু নীলমাধব বসু ২৲, বাবু নন্দলাল দত্ত মার্চ্চ মাসের চাদা ১৲, বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম্-এ ২৲, বাবু পরেশনাথ রায় ॥০, বাবু যোগেশচন্দ্র দে বি-এল ২৲, বাবু সতীশচন্দ্র মুখো ১৲, A friend, Cornwallis Square ২৲, বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক ॥০, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী অপরাজিতার জন্মদিনে ১৲, বাবু হীরালাল হালদার ।৵০, বাবু শ্যামাচরণ গুপ্ত ৵০, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যো ২॥৵৫, বাবু সত্যরঞ্জন কানুগিরী স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, বাবু শরচ্চন্দ্র খাঁ ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ এপ্রিলের চাঁদা ১৲, বাবু বেণীমাধব মিত্র ।০, বাবু রসিকচন্দ্র রায় মোক্তার দিনাজপুর মাসিক চাঁদা বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ৮৲, শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী গুহ ঠাকুরমা ও দিদির মৃত্যুদিন উপলক্ষে ২৲, মৌলবী ইয়াকিন উদ্দীন ॥০, বাবু প্রসন্নকুমার বসু ১৲, পণ্ডিত ভুবনমোহন কর ১৲, বাবু মাধবচন্দ্র বন্দ্যো ১৲, বাবু অশ্বিনীকুমার গুহ ১৲, বাবু হরকালী সেন ১৲, বাবু জানকীগির গোস্বামী ১৲, বারসই ষ্টেশন মাষ্টার ॥০, একজন সহানুভূতিকারক ॥০, দেবী চৌধুরাণী ১৩২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ১৲, A friend ।০, বাবু সুশীলচন্দ্র মিত্র ১৲, Mrs. N. R. Sircar ।০, বাবু প্রমথনাথ দত্ত ১০৲, বাবু সীতানাথ রায় B.L. ২৲, বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু এপ্রিলের চাঁদা ॥০, বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ॥০, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ॥০, রায় কালিকাদাস দত্ত দেওয়ান বাহাদুর ২৲, বাবু কৃষ্ণসুন্দর সেন ১৲, বাবু হরিদাস মুখো ১৲, বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় ১৲, বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুহ ॥০, একজন বন্ধু /৫ ।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

চাউল বিক্রয় ৫৸/১৫ দাসী হইতে এপ্রিল ও মে মাসের সাহায্য ৫০৲, মোট ৫৫৸/১৫ ।

বস্ত্রাদি। ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিং ধুতি ২, বিছানার চাদর ১, জ্যাকেট ১, বালিসের ওয়াড় ৪, বাবু পরেশনাথ রায় পাঞ্জাসিয়া ধুতি ১।

চাউল।

বিগত মাসে যাঁহারা মুষ্টি ভিক্ষা দিয়াছিলেন, এমাসেও তাঁহারা কৃপা করিয়া দিয়াছেন।

মোট আয়।

দান ও মাসিক চাঁদা প্রাপ্তি ১৩৪॥৵০, অন্যান্য প্রকারে আয় ৫৫৸/১৫, বিগত মাসের জের ২৮॥/১৫, মোট আয় ২১৯৵১০।

ব্যয়।

অপার সার্কুলার রোডের অবশিষ্ট বাড়ী ভাড়া শোধ ৫০, গিরিডি সেবালয় (মঃ অঃ কমিশন সহিত) ৭৫৸০, আদায় কারীর ব্যয় ২৪।৵৫, বাবু ইন্দুভূষণ রায় ২০, কর্ম্মচারীর বেতন ৪, এক থান নূতন কাপড়, বাতি, গালা ও সাবান প্রভৃতি ৩৲১০, সাইন বোর্ড ও ভিক্ষার বাকসে নামলিখা ১৷০, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের ঋণ শোধ ১, পার্শেল খরচ ৸০, খাতা ৸০, ডাক খরচ ।৵০, অচ্যুত বাবুর মঃ অঃ খরচ ৵০, ট্রাম ভাড়া ।১০, চট্‌ ৵১৫, রসিদ ষ্টাম্প /০, নিব ৫, বিগত মাসের উদ্বৃত্ত জমা ৷০, হিসাব গরমিল ৷০, কেরোসিন তৈল ৲৫।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ২১৯৵১০, মোট ব্যয় ১৮৩৷৵০, হস্তেস্থিত ৩৫৸/১০।

ভ্রম সংশোধন।

৫ম সংখ্যার দান প্রাপ্তিতে "বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ।০" স্থলে "বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ১।০" হইবে।

" " " "বাবু সদয়াচরণ মিত্র M.A.B.L. ৪" স্থলে "বাবু সারদাচরণ মিত্র M. A. B. L ৪" হইবে।

" " 'দাসী'র মুল্য প্রাপ্তি স্বীকারে 'সাবেক' স্তম্ভে "বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।৵০" সংযোজিত হইবে।

"দাসী"র নিকট হইতে দাসাশ্রমের সাহায্যপ্রাপ্তি।

গত জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত "দাসী" দাসাশ্রমকে নগদ ২৮০ টাকা দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতাস্থ দাসাশ্রম কার্য্যালয়ের ঘরভাড়া ও কর্ম্মচারীর বেতনাদির ব্যয়ও "দাসী" নির্ব্বাহ করিয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ভারতবর্ষীয় ভক্তকবি—প্রথম ভাগ। শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী-প্রণীত। মুল্য ।৵০ আনা মাত্র। এই পুস্তকখানিতে কবীর, নানক, তুলসীদাস ও তুকারাম এই চারি জন ভারতবর্ষীয় ভক্ত কবির জীবনচরিত সংক্ষেপে এবং সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় আখ্যাত হইয়াছে। এতন্মধ্যে কবীরের জীবনী কিছু বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। কবীর, তুলসীদাস এবং নানকের পদাবলীর কিছু কিছু অনুবাদসমেত নমুনাও দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন।

ব্রহ্ম-সাধন। শ্রীকালীনাথ দত্ত-প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলি আছে;—নিগূঢ়-প্রেম; চরিত্র-সংগঠন; শাস্ত্র, পুরাতন ও নূতন; সাধনের অবস্থাত্রয়; প্রসঙ্গ; সদালাপ; অচ্যুত-পদ; ভাবাঙ্গগঠন; প্রকৃত আত্ম-দর্শন; আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ; ভয়, জ্ঞান ও ভক্তি; হিন্দু ও য়িহুদী জাতির বিশেষ ধর্ম্মভাব। প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে কোন কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সকলগুলিতেই লেখকের ধর্ম্মভাব, চিন্তাশীলতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে অল্প কথায় ধর্ম্মের অনেক গভীর সত্য সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। যথা—"প্রার্থনা আত্মার শ্বাসত্যাগ, ব্রহ্মকৃপা আত্মার শ্বাসগ্রহণ।"

জলকষ্টাদির কাহিনী ও বৃষ্টিতত্ত্ব। শ্রীসাগরচন্দ্র কুণ্ডু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। এই বাহ্যাড়ম্বরশূন্য ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে কতকগুলি অতিশয় প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিত হইয়াছে। যথা—মেঘের উপর বনের প্রভাব, জলাশয় সংস্কার, আর্টেশিয়ান ওয়েল বা প্রস্রবণ-কূপ প্রভৃতি। সর্ব্বত্র এই সকল বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত।

ভবানীপুর সাহায্য-সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণ। সন ১৩০১ সাল। ভবানীপুর সাহায্য সমিতির উদ্দেশ্য অতি প্রশংসনীয়। "ভবানীপুরবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে সম্পত্তিহীন নিরুপায় বিধবা, পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালকবালিকা এবং শারীরিক বা মানসিক বৈকল্য, পীড়া বা অন্য কোন বিপদ্‌হেতু অন্ন-সংস্থানের উপায়রহিত ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য সাহায্য দান, ভবানীপুর সাহায্য-সমিতির উদ্দেশ্য।" ১২৯৯ সালে ৩৭ জন ও ১৩০০ সালে ৪৪ জন অন্তঃপুরবাসিনী অসহায়া বিধবাকে সমিতি প্রতি মাসে সাহায্য দিয়াছেন। "১২৯৯ সালের মাসিক চাঁদা ২০৯ জন দাতার নিকট হইতে ২১৮৬৸০ টাকা ও এককালীন দান ২৯৯৲ টাকা, মোট ২৪৬৭৸০ টাকা সমিতির আয় সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং ১৩০০ সালে ২৪১ জন দাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত ২৭১০৸০ টাকা মাসিক চাঁদা ও এককালীন দান ১৫৩৲ টাকার সহিত সমিতির মোট আয় ২৮৬৩৸০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বর্ষে দাতার সংখ্যা ৩২ জন ও আয়ের পরিমাণ ৩৯৬৲ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। এবং ১২৯৯ সালে ৫৭৯ জন প্রার্থীকে ১২২৮৲ টাকা দেওয়া হইয়াছিল, এবং ১৩০০ সালে ১১১২ জন প্রার্থীকে ২৩০৬।৶১০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। অতএব প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরে, দাতার সংখ্যা ৩২ জন, আয়ের পরিমাণ ৩৯৬৲ টাকা, সাহায্য-প্রার্থীর সংখ্যা ৫৩৩ জন ও ব্যয়ের পরিমাণ ১০৭৮।৶১০ বৃদ্ধি হইয়াছে।"

The Report of the Calcutta Orphanage for the year 1892, 1893 & 1894. অর্থাৎ কলিকাতা অনাথাশ্রমের ১৮৯২, ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সালের কার্য্যবিবরণ। ১৮৯৩ সালের শেষে আশ্রমে ৫টি বালক ও ৫টি বালিকা ছিল। ১৮৯৪ সালের শেষে ৭টি বালক ও ৬টি বালিকা ছিল। কয়েক মাস পূর্ব্বে ৯ বৎসর বয়স্ক একটি বধির-মূক বালক হারাইয়া গিয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তখন তাহাকে পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি বালকটিকে আবার পাওয়া গিয়াছে। বালকগণ কলিকাতার দুইটি স্কুলে শিক্ষা পাইতেছে; বালিকাগণকে আশ্রমেই শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে আশ্রম ৪০ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে

অবস্থিত আছে। ১৮৯২, ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সালে ইহার আয় যথাক্রমে ২৭২৮১৫, ৫৮৯।/৫ ও ১১৮১।১০, এবং যথাক্রমে ২৮০॥৶০, ৫৯৪॥০ ও ১২২৮।১০ হইয়াছিল। অনাথাশ্রমের কথা আমরা "দাসী"তে অনেকবার বলিয়াছি; সুতরাং এখন আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

শিশুগাথা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। মূল্য দুই আনা। ইহার অনেকগুলি কবিতা শিশুগণের পাঠোপযোগী হইয়াছে।

গুরু ও সাধনতত্ত্ব। শ্রীকালীনাথ দত্ত প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। এই পুস্তকে গুরু-আনুগত্য ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-তত্ত্ব শীর্ষক দুইটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। "দাসী"তে ধর্ম্মমতের আলোচনা করা হয় না, সুতরাং এই পুস্তকে যে সকল ধর্ম্মমত সমর্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিলাম না। সাহিত্য হিসাবে পুস্তকখানি ভাল হয় নাই। ইহার ভাষা জটিল এবং ইংরাজী ও বাঙ্গলার মিশ্রণে কিছু অদ্ভুত রকমের হইয়াছে। কিছু আয়াস স্বীকার করিয়া লেখকের যুক্তি-মার্গের অনুসরণ করিলে মনে হয় লেখক নিজের বাগ্‌জালে নিজেই জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। পুস্তকের ৭৮ পৃষ্ঠায় লেখক দুর্নীতির একপ্রকার সমর্থন করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

এই কি রামের অযোধ্যা? অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অযোধ্যার অবস্থা। [ঐতিহাসিক উপন্যাস।] শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। ইহার নামেই এই গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অযোধ্যার মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ও অন্যান্য ভারত-প্রবাসী ইংরাজগণ কিরূপ অর্থগৃধ্নু ছিল, এই বহিখানি পড়িলে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। ঠগীর বৃত্তান্তও ইহাতে কিছু কিছু আছে। যাহারা গলায় গামছা দিয়া বা অন্য উপায়ে পথিকগণের প্রাণবধ করিত, গ্রন্থকার তাহাদিগকেই "ঠগী" বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের নাম "ঠগ" এবং তাহাদের কার্য্যের নাম "ঠগী।" সব্‌জিথ'র হত্যার বিবরণটি কর্ণেল মেডোজ্ টেলার প্রণীত Confessions of a Thug নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হইল। ১৭ পৃষ্ঠায় লেখক বলিয়াছেন, "ইংলণ্ডের চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে আত্মীয়তা কিম্বা বন্ধুতা প্রদর্শনার্থ রমণীগণ পুরুষের মুখচুম্বন করেন এবং পুরুষকেও আপনাপন মুখ-চুম্বনের অধিকার প্রদান করেন।" আমরা বিলাত যাই নাই, এখানেও ইংরাজসমাজে মিশি নাই; সুতরাং নিজ অভিজ্ঞতা হইতে পূর্ব্বোক্ত রীতিটি ইংরাজসমাজে "চিরপ্রচলিত" এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু চেম্বার্সের এন্‌সাইক্লোপীডিয়া নামক বিশ্বকোষের নূতন সংস্করণে Salutations (অভিবাদন) শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে মনে হয়, এই রীতি ইংলণ্ডে বহুকাল পূর্ব্বে অপ্রচলিত হইয়া যায়। উক্ত প্রবন্ধ হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "In England it was *formerly* the custom to kiss at the beginning and end of a dance, as well as on meeting a lady or taking leave of her." "The Puritans objected strongly to it, but its *disuse* was really the result of the French airs that came in with Charles II., and it lingered among honest country-folk till the times of the *Spectator*."

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অতঃপর সাধারণতঃ "দাসী"তে আর গ্রন্থ-সমালোচনা থাকিবে না। প্রয়োজন হইলে উৎকৃষ্ট গ্রন্থবিশেষের সমালোচনার্থ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। দাসাশ্রমের কল্যাণার্থ এইরূপ নিয়ম করিতে হইল।

দাসাশ্রম মেডিক্যাল হল।

দাসাশ্রমের বন্ধুগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে দাসাশ্রমের স্থায়ী আয়ের সংস্থান করিবার জন্ত ইহার একটি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দাসাশ্রমের স্থায়ী ৺সুরাজমোহিনী ফণ্ডে যে টাকা ছিল, তাহা ঋণ লইয়াই এই কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ঔষধালয়ের লাভ হইতে উক্ত ঋণের ৩০০৲ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। এই প্রকারে ৺ সুরাজ-মোহনী ফণ্ডের সমুদয় টাকা পরিশোধ হইয়া গেলে, ঔষধালয়টি দাসাশ্রমের একটি ঋণশূন্ত সম্পত্তি হইয়া যাইবে। ৺সুরাজমোহিনী ফণ্ডের টাকা যেমন শোধ হইতে থাকিবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দাতার ইচ্ছানুসারে কোম্পানীর কাগজ কেনা হইবে। সুদ দাসাশ্রম পাইবেন। ইহা হইতে আমাদের বন্ধুগণ বুঝিতে পারিবেন যে ঔষধালয়ের আয় মাসে মাসে খরচ করিয়া না ফেলিয়া আমরা ঐ আয় জমাইয়া উহাকে "দাসাশ্রম মেডিক্যাল হল" নামক একটি ঋণশূন্য সম্পত্তিতে পরিণত করিতেছি।

কলিকাতা, ২০৮।২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, "দাসী"-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীললিতমোহন দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সম্পাদকের নিবেদন।

"দাসী"তে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে কেবল দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ এবং দাসাশ্রম ঘটিত অন্যবিধ সংবাদ, প্রার্থনাদির জন্যই দাসাশ্রম দায়ী। আর যাহা কিছু লিখিত হয়, তন্মধ্যে যিনি যাহা লিখেন, তজ্জন্য তিনিই দায়ী। সম্পাদক কেবল নিজের লেখার জন্যই দায়ী। দাসাশ্রম সম্পাদকীয় কোনও মতামতের জন্যও দায়ী নহেন। কারণ কোন বিষয়ে কোন বিশেষ মত প্রচার দাসাশ্রমের উদ্দেশ্য নয়। কেবল সেবাধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ফাল্গুন মাসের "সাহিত্যে" "দাসী"র সমালোচনায় একটি ভুল আছে। "সাহিত্যে"র সম্পাদক মহাশয় দাসাশ্রমের একজন পুরাতন অনুগ্রাহক ও বন্ধু। তিনি, শুধু কথায় নয়, কাজেও অনেক সময় নিজ হিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভুলটি দেখাইয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, "দাসী" পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তাহাতে কেবল সেবাবিষয়ক প্রবন্ধাদি থাকিত। কিন্তু ইহা ঠিক্ নয়। ১৮৯৩ সালের নবেম্বর মাসের "দাসী"তে আমরা একটি প্রবন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলাম যে, ততঃপর "দাসী"তে জন-হিতৈষণা ব্যতীত অন্যবিষয়ক প্রবন্ধাদিও থাকিবে। সুতরাং তদবধিই "দাসী"তে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্যে"ও "দাসী"র এমন কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহার সহিত জনহিতৈষণার কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং "দাসী"র এই পরিবর্ত্তন নূতন নয়। নূতনের মধ্যে কেবল বর্দ্ধিত কলেবর। কি কারণে লিখিতব্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার কারণ ১৮৯৩ সালের নবেম্বর মাসের "দাসী"তে প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে এখনও আমরা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে সেবা-বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেছি, পরেও করিব।

CALCUTTA

Printed and Published by KARTIKCHANDRA DATTA

AT THE B. M. PRESS. 211, *Cornwallis Street.*

পিতৃভূমি দর্শন।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত।

আমার কানপুরে অবস্থিতির সময়ে (১৮৬৮) গবর্ণমেণ্ট স্কুল ইনস্পেক্টর ও আমার হিন্দু কলেজের সমাধ্যায়ী বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রতি (তখন তিনি C. I. E. হন নাই) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী স্কুল সকল পরিদর্শন করিয়া ঐ সকল স্কুলের যে সকল নিয়ম বঙ্গদেশের বাঙ্গালা স্কুলে চালাইবার উপযুক্ত তাহা গ্রহণ করিবার ভার অর্পণ করেন। তিনি সেই ভার প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল স্কুল পরিদর্শনার্থ পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন। যখন তিনি কানপুরে যান, তখন তথায় আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। একদিন কথোপকথনের সময় পিতৃভূমি অর্থাৎ কান্যকুব্জ (কনোজ) দর্শনের প্রস্তাব উঠে। কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গদেশে আইসেন; এই জন্য আমরা ঐ স্থানকে পিতৃভূমি সংজ্ঞা দিয়াছিলাম। আমরা কনোজ যাইতে সংকল্পারূঢ় হইলাম। ভূদেব আমাকে বলিলেন, "যাইবে তো গাড়ু গামছা হাতে কর।" আমি বলিলাম, "এই উনবিংশ শতাব্দীতে?" আর এক কথা আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; সে কথা এই যে "আমরা গাড়ু গামছা বহা জাত, আগে তাহা প্রমাণ কর।" কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ আমার বিশ্বাস। কনোজ ফরাকাবাদ জেলায় স্থিত, কানপুর জেলায় স্থিত নহে। কিন্তু কানপুর জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার পণ্ডিত চূড়ামণ্ অত্যন্ত শিষ্টতাপূর্ব্বক ততদূর আমাদিগের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের পিতৃভূমি দর্শনে উৎসাহ দেখিয়া আমাদিগকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনাদিগের যেরূপ উৎসাহ দেখিতেছি, কনোজে গিয়া পিতৃভূমির জন্য মোকদ্দমা না করেন।"

কনোজের অর্দ্ধরাস্তায় শিওরাজপুর গ্রামে সেখানকার তহশীলদার অর্থাৎ ডেপুটি কলেক্টর লালা বিহারীলালের বাসায় আমরা অতিথি হইলাম। লালাজি অতি যত্নের সহিত অতিথি সৎকার করিলেন। লালা বিহারীলাল ঘোর সাকারবাদী হিন্দু। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "শুনিতেছি কলি-

কাতার অনেকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মগণ।" ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া তাঁহার সহিত আমার ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "বুৎপরস্ত্‌ হোনা মোনাসেব নেহি।" তিনি উত্তর করিলেন, "বুৎপরস্ত্‌ কোন হ্যায়? হামলোক ক্যায়া মাট্টীকা বুৎকো পূজ্‌তে হে, না উস্‌কা ভিতর দেওতাকো পূজ্‌তে?" লালাজি ভূদেবকে তর্কের মীমাংসার মধ্যস্থ নিযুক্ত করিলেন। ভূদেব অত্যন্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "সব আচ্ছা হ্যায়, সব আচ্ছা হ্যায়।" অর্থাৎ ব্রাহ্ম ধর্ম্মও ভাল প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মও ভাল। লালা বিহারীলাল এই মীমাংসায় এমনি সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহার মুখে ভূদেবের "তারিফ" আর ফুরায় না। আমি ভূদেবকে বলিলাম যে "আমি যাহা এতক্ষণ বকিয়া মরিলাম তুমি এক কথায় তাহা মীমাংসা করিয়া দিলে; তোমাকে ধন্য।" তৎপরদিন সন্ধ্যাকালে কনোজের অতি নিকট মিরাকিসরাই নামক স্থানে পৌঁছিলাম। তথায় পৌঁছিয়া প্রয়াগবাসী লালা কিশোরীলাল নামক তথাকার মুনসেফের বাসায় আমরা অতিথি হইলাম। লালাজি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিবাসী সকল হিন্দু জাতির বিবরণ হিন্দীতে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন। তিনি সেই বিবরণ পুস্তক এক এক খণ্ড আমাদিগকে দান করিলেন। পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়াছি যে এলাহাবাদের বাবু নীলকমল মিত্রের স্ব সম্পর্কীয় কলিকাতাবাসী মহেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক কোন উৎসাহী ব্যক্তি আমাদিগের পিতৃভূমি দর্শনের সঙ্গী ছিলেন। তিনিও একখানি পুস্তক পাইলেন। উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কথোপকথনের সময় লালা কিশোরীলাল একটি আশ্চর্য্য কথা বলিলেন। সে কথা এই যে গত কুম্ভমেলার সময়ে হরিদ্বারে মোগল অর্থাৎ পারস্তদেশীয় পরিচ্ছদধারী বোখারা ও সমরখন্দ নিবাসী হিন্দু তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমি এইমাত্র বলিলাম যে ইহা আশ্চর্য্য কথা; কিন্তু পরে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম তাহা আশ্চর্য্য নহে। আমরা ইংরাজী পুস্তকে ও ইংরাজী সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে ঐ সকল স্থানে হিন্দু বণিক অনেক পুরুষ অবধি বসতি করিতেছে।

লালাজির প্রণীত হিন্দু জাতি বিষয়ক পুস্তকে লেখা আছে যে কনোজের বীরসিংহ নামক রাজার রাজত্ব সময়ে তাঁহার দ্বারা পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে প্রেরিত হয়। যেদিন আমরা লালা কিশোরীলালের আতিথ্যস্বীকার করিলাম, তৎপর দিবস আমরা কনোজ দর্শনার্থ বহির্গত হই। কনোজের শ্রীহীন দশা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হই। জয়চাঁদ ও সংযুক্তায় কনোজ আর সে

কনোজ নাই। যে নগরে ২৪০০০ চব্বিশ হাজার পানের খিলির দোকান ছিল ও নিত্য উৎসব সমাজ সকল দ্বারা যাহা পূর্ণ ছিল, সেখানে এক্ষণে অসংখ্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্ন গৃহ ও নিস্তব্ধতা বিরাজমান। সে দৃশ্য দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়। আমরা দেখিলাম জয়চাঁদের দুর্গস্থানে তামাকের চাষ হইতেছে। আমরা কনোজের হিন্দীস্কুল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের টোল দেখিতে গেলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাদিগকে অর্ঘ প্রদান না করিয়া মুসলমান রীত্যনুসারে আতর ও গুলরুটে এলাচ দিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা টোলের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বলিলেন যে এমন প্রবাদ আছে যে তাঁহাদিগের কোন কোন ভাই বন্ধু বঙ্গদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। আমরা তাহার পর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণের এবং কান্যকুব্জের লালাদিগের সহিত বাঙ্গালী কায়স্থের বিবাহ সুসাধ্য কি না? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করিলেন, "যজ্ঞ কি বিয়ে।" "মহাযজ্ঞ করিয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র ও কাশীর প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা কর।" এই প্রণালী হ'চ্ছে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রকৃত হিন্দু পদ্ধতি। আমার স্মরণ হয়, ডাক্তার গোল্ট্‌ষ্টুকর (Dr. Goldstucker) সাহেবও আমার Brahmic Questions of the Day নামক পুস্তিকা চিঠিতে সমালোচনা করিবার সময় ঠিক এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যেমন অচল ও সংস্কারবিরুদ্ধ মনে করি, তাঁহারা সেরূপ নহেন। কনোজে "মীরে বাঙ্গালি" নামক কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ভগ্ন বাটী আছে। তিনি বঙ্গদেশে গিয়া অনেক অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক স্বীয় জন্মস্থান কনোজে আসিয়া ঐ বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পিতৃভূমি কনোজ দর্শন করিয়া, বিশেষতঃ কনোজ হইতে বঙ্গদেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন স্মরণ করিয়া, আমাদিগের কি এক মনের ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। উষ্ণীষ ও বৃহৎ চর্ম্মপাদুকাধারী পঞ্চব্রাহ্মণ গোযানে ও তাঁহাদিগের সহিত পঞ্চ কায়স্থ কেহ হস্তী যানে কেহ অশ্ব যানে কেহ অন্ত্র যানে বঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছেন, আমরা কল্পনাচক্ষে যেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

বর্ত্তমান শতাব্দীর এই জ্ঞানোজ্জ্বল যুগে যাগ যজ্ঞের নাম শুনিয়া অনেকে হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু তাঁহারা অবহিতচিত্তে এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে, শীর্ষোক্ত "পঞ্চ মহাযজ্ঞ" কুসংস্কারপ্রসূত কোন সঙ্কীর্ণ ক্রিয়া নহে। প্রাচীন ভারতের গৃহমেধী আর্য্যগণ আচার্য্যকুল হইতে বেদ ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাপন পূর্ব্বক পিতৃগৃহে সমাবর্ত্তনানন্তর দার-গ্রহণ করিয়া যে পাঁচটী নিত্যঅনুষ্ঠেয় গৃহধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, আর্য্য শাস্ত্রে তাহাই "পঞ্চ মহাযজ্ঞ" নামে কথিত হইয়াছে। গৃহস্থের সমষ্টিই সমাজ। যেদেশের গার্হস্থ্য নীতিতে নিজের মঙ্গলের সহিত সমাজের মঙ্গলা-মঙ্গল অনুস্যূত, তাহাকেই উৎকৃষ্ট গার্হস্থ্যনীতি বলা যায়। সমাজবন্ধনের পূর্ব্বে মানুষ প্রবৃত্তির একান্ত বশীভূত ছিল, এ অবস্থায় স্বার্থই তাহার সকল কার্য্যের নিয়ন্তা। কিন্তু কেবল স্বার্থের উপর কখনও গার্হস্থ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যেহেতু গৃহস্থ সমাজসূত্রে আরও দশজনের সহিত সম্বদ্ধ। সুতরাং স্বার্থ পরার্থের অনুগত না হইলে সমাজ রক্ষা হইতে পারে না। স্বার্থ এবং পরার্থের সম্মিলনই সমাজস্থিতির প্রকৃষ্ট উপায় এবং পর-মার্থই তাহার নিয়ন্তা হওয়া আবশ্যক। পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, স্বজাতি ও স্বদেশ এবং সাধারণ জনসমাজ, সকলেরই সহিত নানা কর্ত্তব্য সূত্রে মানবজীবন সম্বদ্ধ। মনুষ্যের চিত্ত এই সকল কর্ত্তব্য-সূত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ স্বার্থ হইতে পরার্থে সম্প্রসারিত হইয়া সমস্ত বিশ্বের হিতসাধনে নিযুক্ত হইলেই পরমার্থ লাভে সমর্থ হয়, কেন না সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলই পরমার্থ। মানুষ গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করিয়া পরার্থপরতা অভ্যাস পূর্ব্বক ক্রমশঃ যাহাতে বিশ্বের সেবা-ব্রতে দেহ মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারে, এই সুমহান্ উদ্দেশ্যেই আর্য্যঋষিগণ গৃহীর জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন।

যাহা ধর্ম্মোদ্দেশে যজন করা যায়, তাহাই যজ্ঞ। এই পাঁচটী অনুষ্ঠান মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের হেতুভূত বলিয়া ইহার নাম "পঞ্চ মহাযজ্ঞ।"

"ঋষি যজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥"

মনু সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ২১ শ্লোক।

মনু বলিতেছেন, "ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ, এই সমুদয় যজ্ঞ সর্ব্বদা যথাশক্তি পরিত্যাগ করিবে না" ॥২৩॥*

অর্থাৎ দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, মানবসমাজ ও তির্য্যক জাতির সেবা এই পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্ভূত।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমোদৈবোবলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥"

৩য় অ, ৭০।

অর্থ :—"অধ্যয়ন অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদিদ্বারা পিতৃতর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলির নাম ভূতযজ্ঞ ও অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ বলা যায়" ॥৭০॥

এই পঞ্চবিধ নিত্য কর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় ইহা দ্বারা যেমন ব্যক্তিগত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সংসাধিত হয়, সেই প্রকার জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণও ইহার লক্ষ্য। গৃহীকে প্রতিদিন এই পাঁচটী অনুষ্ঠান যথানিয়মে সম্পন্ন করিতে হইত। সন্ধ্যোপাসনা ও হোমক্রিয়া দ্বারা দেবসেবা অর্থাৎ চিত্তকে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা পরব্রহ্মে সমাধান করিয়া ধর্ম্ম সাধন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা নিজের ও অন্যের জ্ঞানোন্নতি সাধন অর্থাৎ লোকশিক্ষার বিস্তার, লোকান্তরিত আত্মার স্মরণার্থ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি, রূপ পিতৃসেবা দ্বারা পরলোকে বিশ্বাস এবং পিতৃ পিতামহাদি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির উদ্দীপন, অতিথিসেবারূপ নৃযজ্ঞের দ্বারা মানব মাত্রের প্রতি সাম্য ও মৈত্রী শিক্ষা, এবং ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর তৃপ্তিসাধন দ্বারা বিশ্বজনীন প্রেমে আত্মার সম্প্রসারণ, এই পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই জন্য মনু ইহাকে "মহাযজ্ঞ" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। উপরি উক্ত মহান্ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ সংসারধর্ম্ম পালন করিতেন বলিয়াই মনু গৃহস্থকে সকল আশ্রমবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। আধ্যাত্মিক বলবীর্য্য জ্ঞানবিজ্ঞান শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া উপচিকীর্ষা ও বিশ্বজনীন প্রীতি প্রভৃতি মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ লাভের সমস্ত উপাদানই এই পঞ্চ যজ্ঞের অন্তর্গত। ইহার একটী পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যত্ব লাভ অসম্ভব, এইজন্য শাস্ত্রে যথাশক্তি ইহার অনুষ্ঠানের উপদেশ। প্রাচীন

---

* উদ্ধৃতি-চিহ্নের অন্তর্গত মনুবচনের অনুবাদগুলি সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহাত্মা ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

প্রবন্ধ লেখক।

কালে এই পঞ্চযজ্ঞ কি প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইত, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

প্রথম, দেবযজ্ঞ। দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম করিবার নাম দেবযজ্ঞ। দেবার্চ্চনা ও মনুষ্যাদি প্রাণীর উপকার ইহার উদ্দেশ্য। অগ্নিহোত্র দ্বারা কিরূপে পরোপকার সিদ্ধ হইতে পারে, বিজ্ঞানালোকিত বর্ত্তমান যুগে তাহা বুঝান অতি দুষ্কর। এ সম্বন্ধে আর্য্যঋষিগণের যুক্তি এইরূপ,—

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥"
মনু ৩য় অ, ৭৬ শ্লোক।

অর্থাৎ অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্য্যে অর্থাৎ আকাশে বাষ্পরূপে উত্থিত হয়, পরে, সূর্য্য বা আকাশ হইতে বৃষ্টি হয়, এবং বৃষ্টি ফল শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া প্রজারক্ষা করিয়া থাকে। ভগবদ্গীতাতেও কথিত হইয়াছে,—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥"

অর্থাৎ "প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন্ন পর্জ্জন্য হইতে, পর্জ্জন্য যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে। (অগ্নিহোত্রাদি) কর্ম্ম বেদ হইতে, বেদ ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে; অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।" (মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ।) ফলতঃ ভগবৎ আরাধনা দ্বারা আধ্যাত্মিক বল সঞ্চয় ও ভক্তিবৃত্তির বিকাশ সাধনের জন্য আর্য্যগণ সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরোপাসনার বিধান করিয়াছেন। *

দ্বিতীয়, ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ। বেদাদি সৎশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নাম ঋষিযজ্ঞ। শাস্ত্র সকল ঋষিপ্রণীত, ঋষিরাই জ্ঞানের প্রচারক, শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা জ্ঞানচর্চ্চাই ঋষিদিগের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের প্রকৃত উপায়। মনুসংহিতার মূল শ্লোকে "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ" এইমাত্র আছে, কিন্তু টীকাকার কুল্লুকভট্ট বলেন, "অধ্যাপন শব্দেনাধ্যয়নমপি গৃহ্যতে" অর্থাৎ অধ্যাপন শব্দে অধ্যয়নও বুঝিতে হইবে। ফলতঃ অধ্যয়ন

* "সূর্য্যো জ্যোতি র্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা," "ওঁ ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি অগ্নিহোমমন্ত্র পাঠ করিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, উহা প্রাকৃত সূর্য্য ও ভৌতিক অগ্নির অর্চ্চনা। প্রকৃত পক্ষে এ গুলি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা পরমেশ্বরের অর্চ্চনামূলক বেদমন্ত্র। শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃত 'ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা' গ্রন্থ দেখ।

ব্যতীত অধ্যাপনা অসম্ভব। অধীত বিদ্যার উৎকর্ষ-সাধন, এবং লোক শিক্ষার বিস্তার দ্বারা জনসমাজের অজ্ঞানতা নিবারণ ঋষিযজ্ঞের উদ্দেশ্য। জ্ঞানেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ব্যতীত উৎকর্ষাপকর্ষ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বোধ হয় না। প্রাচীন আর্য্যেরা নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া জ্ঞানানন্দে আপনারা কৃতার্থ হইতেন, এবং অন্যকে মুক্তহস্তে তাহা বিতরণ করিয়া সমাজের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতেন। দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র বিতরণের ন্যায় জ্ঞানহীনকে জ্ঞান বিতরণ করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। শিক্ষার্থীকে অন্ন দিয়া পোষণ করিয়া জ্ঞান বিতরণ করিতে হইত, এখনকার ন্যায় বিদ্যাবিক্রয়-প্রথা ছিল না। অদ্যাপি হিন্দুসমাজে এই পরম পবিত্র ঋষিযজ্ঞের শেষচিহ্ন স্বরূপ চতুষ্পাঠী প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাকে জ্ঞানযোগে স্বার্থ হইতে পরার্থে আত্মসম্প্রসারণ বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ। শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ ও তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অনুষ্ঠানের নাম পিতৃযজ্ঞ। ইহার অনুষ্ঠানে পিতৃপিতামহাদি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি কৃতজ্ঞতা ও পরলোকে বিশ্বাস উদ্দীপ্ত হয়। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বিহীন হইলে জনসমাজ মরুভূমি ও শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হয়, এই কারণ পিতৃ-সেবার বিধি।* প্রাচীন কালে এই বিধি সম্যক অনুষ্ঠিত হইত বলিয়াই পিতৃপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এদেশের চিরন্তন প্রথা, এবং এই কারণেই মনু বলিয়াছেন,—

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥"

অর্থাৎ "শাস্ত্রের নানা প্রকার শাসন থাকিলেও যে শাস্ত্রার্থ পিতৃপিতামহাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, সেই সৎপথ, সে পথে গমন করিলে কোন মতে তাহাকে অধর্ম্মে আক্রমণ করিতে পারে না॥"

এই পিতৃযজ্ঞ যে কেবল নিজ বংশের পিতৃলোকদিগের উদ্দেশে সমাহিত

---

* আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী তৎপ্রণীত "পঞ্চমহাযজ্ঞবিধিঃ" গ্রন্থে কেবল জীবিত পিতৃলোকদিগের সেবার উপদেশ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেব, ঋষি ও পিতৃলোকের সেবার নাম পিতৃযজ্ঞ। যিনি জ্ঞানী ধার্ম্মিক পরোপকারী সত্যনিষ্ঠ, তিনি দেব; যাঁহারা বেদাদি সৎশাস্ত্রের পঠন পাঠনা দ্বারা জনসমাজের জ্ঞানোন্নতি সাধন করেন, তাঁহারা ঋষি; আর পিতা পিতামহ, মাতা মাতামহ প্রভৃতি তথা আচার্য্য ও জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত ইহাঁদিগের মিত্রস্থানীয় লোকদিগের নাম পিতৃলোক। প্রীতিপূর্ব্বক ইহাঁদিগের যে সেবা করা যায়, তাহার নাম তর্পণ। "প্রীত্যা যৎ সেবনং ক্রিয়তে তৎতর্পণম্।" আর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবার নাম শ্রাদ্ধ। "শ্রদ্ধয়া যৎ সেবনং ক্রিয়তে তচ্ছ্রাদ্ধম্।"

হইত তাহা নহে, এসংসারে যাহাদের আপনার বলিবার কেহ নাই, "যেষাং ন মাতা" যাহাদের মাতা নাই, "যেষাং ন পিতা" যাহাদের পিতা নাই, "ন বন্ধু" যাহাদের বন্ধু নাই, "নৈবান্নসিদ্ধির্ণতথান্নমস্তি" যাহাদের অন্নসিদ্ধি নাই, তাহাদিগেরও তৃপ্তি এবং সদগতির জন্য শুভকামনাও পিতৃযজ্ঞের অন্তর্গত। শ্রাদ্ধান্তে শ্রাদ্ধকর্ত্তার যে বর প্রার্থনার রীতি আছে, তাহাও অতি পবিত্র ও মধুর। যাঁহারা হিন্দুসমাজের অনুষ্ঠানগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন অসার কর্ম্মকাণ্ডের কোলাহল বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারা যেন নিম্নলিখিত প্রার্থনামন্ত্রগুলি একবার পাঠ করেন, এই অনুরোধ।

প্রথমতঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা বলিবেন, "ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃসন্তু গোত্রং নঃ পরিবর্দ্ধতাং", আমার পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি আমাদিগের নিকট অভয়প্রদ সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করুন, এবং আমাদের পুত্র পৌত্রাদিরূপ বংশ পরম্পরা যেন বর্দ্ধিত হয়। পুরোহিত প্রতিবচনে বলিবেন, "ওঁ বর্দ্ধতাম্", বর্দ্ধিত হউক। অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা করযোড়ে বলিবেন,

> "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেবচ।
> শ্রদ্ধাচ নোমা ধ্যগমৎ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্বিতি॥
> অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
> যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মাচ যাচিষ্ম কঞ্চন।
> অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু।" *

অর্থঃ—"আমাদিগের বংশে দাতৃশক্তিসম্পন্ন পুরুষসকল পরিবর্দ্ধিত হউক, অধ্যয়ন অধ্যাপন দ্বারা বেদশাস্ত্রের সমধিক আলোচনা হউক, পুত্র পৌত্রাদি সন্ততি সকল পরিবর্দ্ধিত হউক, বেদার্থের প্রতি শ্রদ্ধা আমার কুলে কাহারও কখন না যাউক, দান করিবার জন্য ধনাদি যথেষ্ট সম্পত্তি হউক। আমরা যেন প্রচুর পরিমাণে অন্ন ও বহু অতিথি লাভ করি। আমরা যেন কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা না করি, কিন্তু বহু ভিক্ষার্থীর প্রার্থনা পুরণ করিতে যেন সমর্থ হই। অন্ন নিত্যই বর্দ্ধিত হউক এবং দাতা দীর্ঘজীবী হউন।"

এই সকল প্রার্থনার মধ্যে পার্থিব কামনার গন্ধমাত্রও নাই, নিঃস্বার্থতা ও পরার্থপরতার ইহা জলন্ত নিদর্শন।

চতুর্থ নৃযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি সেবা। এক রাত্রি মাত্র পরগৃহে যিনি বাস

---

* সামবেদী শ্রাদ্ধমন্ত্র।

করেন এবং অপর তিথি অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন অবস্থান না করেন, তাঁহাকে অতিথি বলা যায়।*

"সংপ্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নঞ্চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধি পূর্ব্বকং॥"
(মনু, ৩য় অ, ৯৯।)

অর্থ :—"স্বয়ং গৃহাগত অতিথিকে বিধানানুসারে সৎকার করিয়া আসন, পাদপ্রক্ষালনের জল ও যথাশক্তি অন্ন ব্যঞ্জন প্রদান করিবে।" অতিথি ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র যে কোন জাতীয় হউন, হিন্দুর নিকট "সর্ব্বদেবময়োঽতিথি।" "অতিথি দেবোভব" † অতিথিকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবে, ইহা বেদের উপদেশ। গৃহীব্যক্তি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে শ্রান্তক্লান্ত অন্ধ আতুর সকল প্রকার অভ্যাগতকে যথাশক্তি বিশ্রামার্থ আসন ও অন্নজলাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিবেন, শাস্ত্রকৃদগণ ভূয়োভূয়, এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। গৃহস্থ যদি অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা অতিথির পরিচর্য্যায় একান্ত অসমর্থ হন, তবে শয্যাদি দান ও প্রিয়বচন দ্বারা সৎকার করিতে কথনও যেন অমনোযোগ না করেন, "যেহেতু শয়নীয় তৃণ, বিশ্রামভূমি, পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, ও প্রিয় বচন, অতিথি সেবার জন্য এ সকল ভদ্র লোকের গৃহে কথনই অপ্রাপ্ত হইতে পারে না।" ‡ সাধারণ ভিক্ষুকগণকে এক গ্রাসের ন্যূন না হয়, এইরূপ ভিক্ষাদানের বিধি। পরম শত্রুও যদি অতিথি হন, তাঁহাকেও যথাবিধি আদর অভ্যর্থনা করিতে হইবে, শাস্ত্রের এইরূপ আদেশ। অতিথি অভ্যাগত এমন কি দাস দাসী প্রভৃতির ভোজনাবসানে গৃহস্থ সস্ত্রীক ভোজন করিবেন, এইজন্য গৃহস্থের নাম "শেষভুক্।" "গৃহস্থঃ শেষভুক্ ভবেৎ।" অর্থাৎ "গৃহস্থ সকলের অন্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া পশ্চাৎ আপনি সস্ত্রীক অবশিষ্ট ভোজন করিবেন।"

"অঘং স কেবলং ভুঙক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।"

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আপনার জন্য পাক করিয়া ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে।" ইহাই হিন্দুর শিক্ষা। সকল নরনারী জগৎপিতা পরমেশ্বরের সন্তান, অতএব মানবসাধারণের প্রতি সহানুভূতি, সাম্য ও মৈত্রী অর্থাৎ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব শিক্ষা দেওয়াই অতিথি সেবার উদ্দেশ্য। প্রাচীনকালে এই নৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা যাদৃশ উদার সার্ব্বভৌমিক প্রীতির অনুশীলন হইত, এখনকার সহস্র সহস্র সভাসমিতি ও বক্তৃতা দ্বারা তাহার একাংশও সম্পন্ন হয় কি না সন্দেহ। হিন্দুসমাজ বর্ত্তমান সময়ে নানা দোষে

* মনু সংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, ১০২ শ্লোক।

† তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, একাদশ অনুবাক। ‡ মনু, ৩য় অধ্যায়, ১০১ শ্লোক।

দুষ্ট হইলেও এখনও পল্লিবাসী অনেক হিন্দুগৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হয় না, এবং নাগরিক সমাজে ইংরাজি সভ্যতা যতই বিস্তীর্ণ হউক, সৌভাগ্যবশতঃ পল্লিবাসিনী কোন কোন কুলরমণী আজও দাস দাসী অতিথি প্রভৃতির অগ্রে ভোজন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন।

পঞ্চম, ভূতযজ্ঞ। পশু পক্ষী কৃমি কীটাদি সর্ব্বভূত প্রাণি মাত্রের প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রকাশ এবং তাহাদের সেবার নাম ভূতযজ্ঞ। অতিথি সেবায় যেমন মানব প্রীতির পূর্ণ বিকাশ, ভূত সেবায় সেইরূপ বিশ্বপ্রীতির পূর্ণ বিকাশ। বোধ হয় এইজন্য ভগবান মনু ইহাকে "বৈশ্বদেববলি" শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। উদার মানবপ্রীতি ও বিশ্বজনীন দয়া, হৃদয়বৃত্তি অনুশীলনের চরম ফল। হিন্দুর জ্ঞান যেমন সুগভীর, হৃদয় সেইরূপ প্রশস্ত ও বিরাট। হিন্দুশাস্ত্র ব্যতীত আর কোন্ শাস্ত্রে এ প্রকার বিরাট বিশ্বজনীন প্রীতির উপদেশ আছে? গৃহপালিত অশ্বগবাদি হইতে আমরা নানারূপ উপকার লাভ করি, সুতরাং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য; ইহা দয়া নহে, কিয়ৎপরিমাণে কৃতজ্ঞতা ও স্বার্থই ইহার নেতা। কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রে নিঃস্বার্থ ভাবে, কেবল বিশ্বহিতৈষণা পরিস্ফুরণের জন্য পতিত, গলিত কুষ্ঠী প্রভৃতি প্রকৃত অভাবগ্রস্ত দুর্ভাগ্য ব্যক্তি ও ইতর প্রাণিদিগের সেবার বিধান রহিয়াছে। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রের এত মাহাত্ম্য। এ সম্বন্ধে মনুর বিধান এই,—

> "শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাং
> বায়সানাং কৃমীনাঞ্চ শনকৈর্নিবপেৎভুবি ॥"

অর্থাৎ "অন্ন পাত্রে উদ্ধার করিয়া, ধূলি না লাগে এমন করিয়া ভূমিতে কুকুর, পতিত, কুকুরোপজীবী পাপ রোগী, কাক ও কৃমিদিগকে প্রদান করিবে।" এই ভূত যজ্ঞের ফলশ্রুতিও অতি উচ্চ। যিনি প্রতিদিন এই রূপে সকল প্রাণীদিগকে বলি প্রদান করেন, "সগচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্ত্তিপথার্জ্জুনা" অর্থাৎ "তিনি অতি সরল আলোকময় পথ দ্বারা ব্রহ্মধামে গমন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়েন ॥"

এতাবতা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, জগতের সেবাব্রতই হিন্দুর গার্হস্থ্যের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মচর্য্যা ও পরোপকারই গৃহীর ধর্ম্ম।

> "দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৄণামাত্মনশ্চযঃ।
> ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন সজীবতি ॥" (মনু, ৩য়, ৭২।)

অর্থ ঃ—"দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা এই পাঁচকে যে

ব্যক্তি অন্ন না দেয়, সে নিশ্বাস প্রশ্বাস বিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে।" পুনশ্চ মনু বলিতেছেন,

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥

অর্থাৎ "যেমন প্রাণবায়ুর আশ্রয়ে যাবতীয় জীব জীবিত থাকে, তদ্রূপ গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকল আশ্রমবাসীরা জীবিকা করেন।" * "গৃহস্থেনেব ধর্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী" "অতএব গৃহস্থই সকল আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ আশ্রমবাসী জানিবে।" কিন্তু এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যগুলি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে শরীর ও মনের বলবীর্য্য, সুমার্জ্জিত বুদ্ধি, দিব্যজ্ঞান, চিত্তের পবিত্রতা ও অনুষ্ঠানে গভীর নিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। এই নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের বিধান। † নিরবচ্ছিন্ন অর্থোপার্জ্জন ও তদ্দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ, এবং অবকাশ কাল অসার ক্রীড়া কৌতুক ও বাদ প্রতিবাদে অতিবাহন করা যে সকল দুর্ব্বলেন্দ্রিয় লঘুচিত্ত ব্যক্তির নিত্যকর্ম্ম, হিন্দুর গার্হস্থ্য নীতির পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য এবং মহত্ব ও মহিমা তাহারা কিরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে? এই সমুদায় লোককে লক্ষ্য করিয়া ভগবান মনু বলিয়াছেন,

"স সন্ধার্য্য প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥"

অর্থাৎ যিনি পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ ও ইহলোকে নিত্য সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি প্রযত্ন সহকারে এই গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়-গণকে আয়ত্ত করিতে পারেন না, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

---

* "যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তিসংস্থিতিং।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিং॥" মনু ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৯০ শ্লোক।
অর্থাৎ "যেমন গঙ্গা শোণ প্রভৃতি সমুদয় নদ নদী সাগরে যাইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ অন্যান্য আশ্রমবাসীরাও সকলে গৃহস্থাশ্রমের সাহায্যে অবস্থিতি করে।"

† মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ব্রহ্মচর্য্যপ্রকরণ দেখ।

তুকারাম।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

হিন্দুজাতির সাধারণ বিশ্বাস যে যিনি যতই মহাপুরুষ হউন, দীক্ষা না হইলে তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের অধিকার জন্মে না। এই প্রচলিত বিশ্বাসের অনুসরণ করিয়াই আমাদিগের কথক ও গায়কগণ আজন্মতপস্বী মহাত্মা ধ্রুবকেও প্রথমে মহর্ষি নারদের দ্বারা দীক্ষিত করাইয়া, পরে তাঁহাকে ভগবানের প্রসাদ লাভের উপযুক্ত বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। কঠোর আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে তুকারাম এক্ষণে দীক্ষা লাভের উপযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দীক্ষা লাভ সাধারণ মনুষ্যদিগের ন্যায় হয় নাই। তাঁহার চরিতাখ্যায়কগণ বলেন যে, বিঠোবা তুকারামকে দীক্ষা যোগ্য দেখিয়া স্বয়ংই তাঁহাকে দীক্ষা দিবার সংকল্প করিলেন এবং তদনুসারে একদিন স্বপ্নযোগে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন। মহীপতি এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে একদা মাঘের শুক্ল দশমী বৃহস্পতিবার তুকারাম পাণ্ডুরঙ্গের (বিঠোবা) মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া নিদ্রিত হইবার পর স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি ইন্দ্রায়নী হইতে স্নান করিয়া বিঠোবার মন্দিরে গমন করিতেছেন, সেই সময় একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। তুকারাম আপনার অভ্যাসানুযায়ী ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে "রাম, কৃষ্ণ, হরি" এই মন্ত্র প্রদান করিলেন, এবং আপনার পরিচয় বা গুরু পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ভক্ত বৈষ্ণব রাঘব চৈতন্যের শিষ্য কেশব চৈতন্য, আমি তাঁহার শিষ্য, আমার নাম বাবাজী চৈতন্য;" এবং তাহার পর বলিলেন, "তুকারাম তুমি কিছুতেই পাণ্ডুরঙ্গের উপাসনা ও ধ্যান পরিত্যাগ করিও না।" তুকারাম পরম প্রীত মনে বলিলেন, আপনি আমার আশ্রমে পদার্পণ করিয়া আমাকে পবিত্র করুন্। ব্রাহ্মণ স্বীকার করিয়া তুকারামের সঙ্গে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু অবলাই এই নূতন অতিথিকে দেখিয়া তুকারামের সঙ্গে কলহ আরম্ভ করিলে, ব্রাহ্মণ সেই অবসরে অন্তর্দ্ধান করিলেন। এই সময় তুকারামের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের অদর্শনে তিনি একান্ত ব্যাকুলিত হইলেন এবং সংসারে থাকাতেই

যে তাঁহার স্বপ্নেও শান্তি ঘটিতেছে না এই ভাবিয়া আবার কিছু দিনের জন্য তিনি সংসার পরিত্যাগ করিলেন। অতিথি অভ্যাগতের সেবার জন্যই সংসারধর্ম্ম, কিন্তু স্বপ্নেও যখন তাঁহার সেই সেবাধর্ম্ম প্রতিপালনের শক্তি নাই, তখন এ সংসার পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়াই তুকারাম "বল্লালের বন" নামক একটী অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যূষে সেখান হইতে আসিয়া ইন্দ্রায়নীতে স্নানানন্তর বিঠোবার পূজা করিয়া পুনর্ব্বার অরণ্যে প্রতিগমন করিতেন। তখন তিনি সাধুভক্ত বলিয়া সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য আহার্য্য দ্রব্য লইয়া যাইতেন। যে দিন কিছু সংগ্রহ না হইত, সে দিন উপবাস করিতেন। প্রায় দুই মাস কাল এইরূপ অরণ্য বাসের পর এক দিন তুকারাম ইন্দ্রায়নীতে স্নানার্থ আগমন করিয়াছেন, অবলাইও সেই সময় জল আনয়নের জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তুকারামকে দেখিয়া অবলাই তাঁহার বস্ত্র আকর্ষণ পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি আজ দুই মাস আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছ ; আমাদিগের উপায় কি হইতেছে, তাহা কি তোমার মনে হয় না?" তুকারাম বলিলেন, "বিঠোবা ও রুক্মিণী জগতের পিতামাতা, আমরা সকলেই তাঁহাদিগের সন্তান, তুমি তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হও, তোমার অভাব থাকিবে না।" অবলাই অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া বলিলেন, "আমি আর তোমার ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যাঘাত করিব না, তুমি গৃহে চল, সেখানে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে হরিভজন করিবে।" তুকারাম স্বীকৃত হওয়াতে পতি পত্নীর এক প্রকার পুনর্ম্মিলন হইল, কিন্তু অবলাই যে অধিক কাল আপনার কথামত কার্য্য করিতে পারেন নাই, তাহা বলা অতিরিক্ত।

যাহা হউক তুকারাম গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার অঙ্গনস্থিত তুলসীমঞ্চের সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক হরিভজন আরম্ভ করিলেন এবং অবলাইয়ের শিক্ষার জন্য তাঁহাকেও পার্শ্বে বসাইয়া উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারাম কথকতা ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করা অবধি তাঁহার গৃহে সর্ব্বদাই লোকসমাগম হইত, অবলাই তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তুকারাম পত্নীকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ বিঠোবার সেবা করাতে সমস্ত বিশ্বই এক্ষণে আমাদের আত্মীয় হইয়াছে। নিজের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কে কোথায় কাহার গৃহে গমন করে? ইহারা যে সকল কার্য্য ছাড়িয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়, তুমি কোথায় তাহাতে গৌরবান্বিত হইবে, না বিরক্ত

হও। ইহাত কর্ত্তব্য নয়। পুত্র কন্যাদির জন্য তোমার এত চিন্তা কেন? বিঠোবা জগতের প্রতিপালক, তাঁহার উপর নির্ভর করিতে শিখিলে তোমার কোন অভাবই থাকিবে না। যত দিন সাংসারিক পদার্থের প্রতি তোমার মমতা থাকিবে, তত দিন তোমার হরিসাধন হইবে না। আগামী কল্য অতি শুভদিন, চিত্তকে দৃঢ় করিয়া ও বিনশ্বর পদার্থের প্রতি মায়া ত্যাগ করিয়া সংসারের যাহা কিছু আছে, দেব দ্বিজাদির সেবায় নিযুক্ত কর, এবং বৈষ্ণবের দাসী হইয়া অনন্যচিত্তে সাধুগণের শরণাপন্ন হও। ক্ষণস্থায়ী সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া যদি বিঠলের নাম গানে মগ্ন হইতে পার, তাহা হইলে পরমানন্দের অধিকারিণী হইবে।" তুকারাম একাদশটী অভঙ্গে পত্নীকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল অভঙ্গ "পূর্ণবোধ" নামে পরিচিত। তুকারামের উপদেশের গুণেই হউক, বা নিজের কথা রক্ষার জন্যই হউক, অবলাই পরদিন আপনাদিগের যথাসর্ব্বস্ব বিতরণে স্বীকৃতা হইলেন; এবং পরদিন প্রাতঃস্নানান্তে আপনাদিগের গৃহস্থালীর সমস্ত সামগ্রী বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহীপতি বলেন, যে এইরূপে তুকারামের তৈজস পাত্র বস্ত্রাদি সমস্তই বিতরিত হইল। এমন কি চুল্লীর পাংশু পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীদিগের কার্য্যে লাগিবে বলিয়া প্রদত্ত হইল। সমস্ত দ্রব্য বিতরিত হইলে একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক আসিয়া তুকারামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তুকারামের গৃহে তাহাকে দিবার উপযুক্ত আর কোন সামগ্রীই তখন ছিল না। অবলাইএর একখানি মাত্র জীর্ণ বস্ত্র অবশিষ্ট ছিল, তুকারাম পত্নীর অজ্ঞাতে তাহাই লইয়া বৃদ্ধাকে প্রদান করিলেন। অবলাই এপর্য্যন্ত সহিষ্ণুতার সহিত সমস্ত দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার লজ্জানিবারণ একমাত্র বস্ত্র বিতরিত হইতে দেখিয়া তাঁহার ধৈর্য্যলোপ হইল। এরূপ অবস্থায় যাহা সম্ভব অবলাই সেইরূপ সুমিষ্ট ভাষায় তুকারামকে পুরস্কৃত করিলেন। সে সকল এস্থলে উল্লেখ করার আবশ্যক নাই। মুখরা-ভার্য্যা দরিদ্র পাঠক স্বয়ংই তাহা অনুমান করিয়া লইবেন। নিজের এই সময়কার পারিবারিক অবস্থা ও পত্নীর ব্যবহার সম্বন্ধে তুকারাম যে কয়টী অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার যাহা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

৫৬৬

আমারি বেলায় উনি যোগী,
নিজের ত বাকী নাই সুখ,
সব সুখ ঘরে আসে, শুধু
আমারি ত ঘুচিল না দুখ।
ঘরে ঘরে অন্ন নেই ব'লে
বল দেখি যাই কার দ্বার?
এই পোড়া সংসারের তরে
আপদ সহিব কত আর?
অন্ন অন্ন কোরে র.ত দিন
ছেলে গুলো খেলে যে আমার!
মরণ তাদের হয় যদি
সকল বালাই ঘুচে যায়।
সকলি ঘেঁটিয়ে নিয়ে যান,
তিল মাত্র ঘরে থাকা ভার।
ঘরে যে গোবর দিতে হবে,
একটিও গরু নাই তার।
তুকা বলে, "দূর পোড়ামুখী,
আপনি মাথায় নিলি ভার।
এখন তাহার তরে, মিছে
কাঁদিলে কি হবে বল আর।"

৫৬৭

বোধ হয় এ পাষণ্ড,
পূর্ব্ব জন্মে ছিল মোর অরি।
এ জনমে স্বামী হোয়ে
বৈর সাধিতেছে এত করি!
কত দুঃখ সব আর,
কত ভিক্ষা মাগি পর দ্বারে।
বিঠোবার মুখে ছাই—
কি ভাল কোরেন এ সংসারে?
তুকা বলে "স্ত্রী আমার
রাগিয়া কতই কটু ভাষে।
কভু বা কাঁদিয়া মরে,
কভু বা আপন মনে হাসে।"

৫৬৮

ঘরে দুটা অন্ন এলে
ছেলেদের দেয় কোথা খেতে।
হতভাগা তা দেবে না,
সকলি পরেরে চা'ন দিতে!
তুকা বলে "অতিথিরে
যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রাক্ষসীর মত এসে
হতভাগী ধরে মোর হাত।

না জানি যে পূর্ব্ব জন্মে
কতই করিয়াছিলি পাপ।"
তুকা বলে "এ জনমে,
তাই এত পেতেছিস্ তাপ।"

৫৬৯

খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—
মাথায় জড়ান তিনি মালা,
ঘরে আর আসেন না ফিরে।
নিজের হলেই হল খাওয়া
আমাদের দেখেন না চেয়ে!
খর্ত্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু
মন্দিরে বেড়ান্ গেয়ে গেয়ে।
কি করিব বল্ দেখি বাছা,
কিছুই তো ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন এক রাত্তি,
চলে যান অরণ্যে সদাই।
তুকা বলে "ধৈর্য্য ধর মনে
এখনো সকল ফুরায় নাই।"

৫৭০

গেছে সে আপদ গেছে,
ঘরেতে থাকিবে তবু রুটি।
যা হোক্ তা হোক্ কোরে
পেটভরে খেতে পাবে দুটি।
বোকে বোকে দিনু এল্যে,
জ্বালাতন হনু হাড়ে মাসে,
তুকা বলে "যদিও সে
দিবানিশি কত কটু ভাষে।
তুকারে তুকার স্ত্রী যে
মনে মনে তবু ভাল বাসে।'

৫৭১

ঘরে আর আসে না সে,
কোন পরিশ্রম নাহি কোরে
নিজে না কি খেতে পায়
রোজ রোজ সুখে পেট ভোরে।
না উঠিতে শয্যা হতে
মিলি দল-বল-গুলা সাথে
করতাল বাজাইতে
আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।
খেয়েছে লজ্জার মাথা,
জ্যান্তে তারা মড়ার মতন।
ঘরে আছে ছেলে পিলে,
তাদের তো না করে যতন।

স্ত্রী তাদের পোড়ে আছে—
হতভাগী লাজ-দুঃখ-ভরে
অভিশাপ দিতে দিতে—
মাথায় পাথর ভেঙ্গে মরে।
"ভাগ্যে যাহা আছে তাহা,"
তুকা বলে "থাক সহ্য কোরে।"

৫১২

হেথা কেন আসে লোকগুলা,
তাদের কি কাজ নাই হাতে ?
তুকা কহে "ঈশ্বরের তরে,
ব্রহ্মাণ্ড মিলিছে মোর সাথে।
"ভাল মুখে দু চারিটা কথা,
না জানি তাহে কি ক্ষতি আছে !
"কোথাও যায় না যারা কভু
ভালবেসে বসে মোর কাছে।
"এও সে যাদের ভাল হায়,
ভাগ্য কিবা আছে এর বাড়া,
"সকল লোকের পাছে পাছে
কুকুরের মত করে তাড়া।"

তুকারামের গার্হস্থ্য সুখ কিরূপ ছিল, এই সকল কবিতাই তাহার প্রমাণ। তুকারামের তিনটী কন্যা ও দুইটী পুত্র ছিল।

কন্যা তিনটীর নাম কাশী, ভাগীরথী ও গঙ্গা ; পুত্র দুইটীর নাম মহাদেব ও বিঠোবা। প্রথমা কন্যাটী বিবাহযোগ্যা হইলে অবলাই তাহার বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। তুকারামকে কন্যার বিবাহের কথা বলাতে তুকারাম পাত্র অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই বৈবাহিক শুভ দিন ছিল। তুকারাম রাজপথে বাহির হইয়া ক্রীড়াশীল বালকদিগের মধ্যে আপনার স্বজাতীয় তিনটী বালক মনোনীত করিলেন এবং তাহাদিগকে নিজের গৃহে আনয়ন করিয়া একবারেই তিনটী কন্যার বিবাহ দিলেন। বিবাহের প্রীতিভোজন করাইবার অবস্থা তাঁহার ছিল না, বাজ্‌রা নামক শস্যের রুটী ও সামান্য একটু দুগ্ধ, ইহাই জামাতাদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। পরদিন এসংবাদ পাত্রদিগের পিতামাতার গোচর হইল। কিন্তু তুকারামের ন্যায় সাধুপুরুষের সহিত কুটুম্বিতা স্পৃহনীয় ভাবিয়া, তাঁহারা অসন্তোষের পরিবর্ত্তে এই বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গ্রামস্থ লোকেরাও তুকারামকে কিছু কিছু সাহায্য করিলেন এবং সকলের অনুগ্রহে বিবাহোৎসব একরূপ সুসম্পন্ন হইল।*

তুকারামের খ্যাতি ক্রমশঃ এরূপ বিস্তৃত হইতেছিল, যে অতি দূরদেশ হইতেও অনেকে আসিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। প্রবাদ আছে যে, একবার কোন জ্ঞানপিপাসু ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য পণ্টরপুরে বিঠোবার শরণাপন্ন হইলে তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়া-

* এই বিবাহ সম্বন্ধে মহীপতি বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কথা হইতে সন্দেহ হয়, যে তুকারাম একই দিনে এরূপ ভাবে তিনটী কন্যার বিবাহ দেন নাই ; কোন একটীরই দিয়া থাকিবেন।

ছিল যে তিনি জ্ঞানেশ্বরের আরাধনা করিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ তদনুসারে জ্ঞানেশ্বরের সমাধি মন্দিরে যাইয়া আরাধনা আরম্ভ করিলেন। সেখানে তাঁহার প্রতি এইরূপ আদেশ হইল যে "তুমি দেহুতে যাইয়া তুকারামের শরণাপন্ন হও, তাহা হইলেই তোমার বাসনা সিদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ তুকারামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার শিক্ষার জন্য একাদশটী অভঙ্গ রচনা করিলেন এবং সেই সঙ্গে একটী নারিকেল ফলও ভগবৎ-প্রসাদের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তুকারামের অভঙ্গগুলি সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে সাধারণ মহারাষ্ট্র ভাষায় রচিত দেখিয়া শাস্ত্রজ্ঞান প্রয়াসী ব্রাহ্মণের তাহা প্রীতিকর হইল না। তিনি একরূপ অবজ্ঞার সহিত তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার জ্ঞানেশ্বরের সমাধিমন্দিরে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার প্রতি আর কোন রূপই প্রত্যাদেশ হইল না। এদিকে কোণ্ডোবা নামক একটী নিরহঙ্কার ও অমায়িক প্রকৃতি ব্রাহ্মণ বহুদূর হইতে ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত অভঙ্গগুলি ও নারিকেল ফলটী অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাহা হইতে তাঁহার ধর্ম্মভাব সম্যক্ পরিস্ফুরিত হইল। তুকারামের রচিত এই অভঙ্গগুলি, "উত্তম জ্ঞান" নামে পরিচিত। তাঁহার শিষ্যগণ এখনও তাহা অতি সমাদরে পাঠ ও গান করিয়া থাকেন। নারিকেল ফলটীর সম্বন্ধেও এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, যে একজন ধনী বণিক আপনার কোন মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে জ্ঞানেশ্বরের সমাধিমন্দিরে প্রচুর অর্থ উপহার দিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে তাঁহার সংকল্পিত উপহার যেন তিনি তুকারামকেই প্রদান করেন। পাছে তুকারাম তাঁহার প্রদত্ত অর্থ গ্রহণে অস্বীকৃত হন, সেই আশঙ্কায় বণিক্ কৌশলক্রমে নারিকেলটীর ভিতর বহুমূল্য মণিমুক্তাদিতে পরিপূর্ণ করিয়া তাহা তুকারামকে প্রদান করিয়াছিলেন। নিস্পৃহ তুকারাম সেই দিনই তাহা জ্ঞান-পিপাসু ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করাতে কোণ্ডোবা তাহা প্রাপ্ত হন এবং তাহা ভগ্ন করিয়া তাহার অভ্যন্তর মণিমুক্তাদিতে পরিপূর্ণ দেখেন। এই ঘটনাটীর কোন কোন অংশ অতিরঞ্জিত হইলেও, তুকারামের প্রতিপত্তি এই সময় কিরূপ দেশব্যাপী হইয়াছিল, ইহা হইতে আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

অগ্নিপরীক্ষা।*

১৮১৪ খৃঃ অব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নেপাল রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জেনারেল মার্লি কাটামুণ্ডু আক্রমণের জন্য প্রেরিত হইলেন। জেনারেল উড গোরক্ষপুরে ছাউনি করিয়া তরাই প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। জেনারেল অক্টার্লোনি নেপাল রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে অমরসিংহের সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন; আর জেনারেল গিলেস্পি দেরাডুন হইতে কলুঙ্গা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে নেপাল রাজ্য চারি বিভিন্ন স্থান হইতে একেবারে আক্রান্ত হইল। নেপাল রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা সমুদয়ে দ্বাদশ সহস্র, তাহার বিরুদ্ধে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উনত্রিশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধের কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—প্রয়োজনও নাই।

অগ্নিদগ্ধ না হইলে স্বর্ণের পরীক্ষা হয় না। মনুষ্যও অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়। প্রলয়কালে পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা ও বন্ধন উর্ণনাভের তন্তুর ন্যায় ছিন্ন হইয়া যায়, বীরপুরুষ তখনই মুক্ত হইয়া আপনার প্রকৃতরূপ প্রকাশ করেন।

আমরা এই যুদ্ধানল হইতে একটী স্বর্ণকণা উদ্ধার করিব। এই যুদ্ধ ঘোষণার সময় নেপাল সীমান্তপ্রদেশে কলুঙ্গা নামক স্থানে অল্পসংখ্যক একদল গোরক্ষ সৈন্য ছিল। সৈন্যসংখ্যা তিন শত মাত্র; বলভদ্র থাপা তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন। এস্থানে বহুদিনের পুরাতন একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ ছিল। অস্ত্র শস্ত্রেরও বিশেষ অভাব—কাহারও তীর, ধনু ও খুড়কী, কাহারও বা পুরাতন বন্দুক—ইহাই যুদ্ধের উপকরণ। এত কাল যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা ছিল না, এই জন্য সৈনিকেরা তাহাদের পুত্র কলত্র লইয়া এই স্থানে বাস করিতেছিল। স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যা প্রায় দেড় শত হইবে।

হঠাৎ এক দিন সংবাদ আসিল যে ইংরেজ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং কলুঙ্গা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। বলভদ্র এই সংবাদ

---

* দুই বৎসর পূর্ব্বে লেখক নেপালের সীমান্তপ্রদেশে ভ্রমণকালে এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংগ্রহ করেন। "সাহিত্য" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন এই যুদ্ধ সম্বন্ধে অতি সুন্দর এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

পাইয়া পুরাতন ভগ্ন প্রাচীর কোন প্রকারে সংস্কার করিতে লাগিলেন। গোরক্ষ সেনাপতি স্ত্রীলোক ও শিশুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত; সৈন্য ও অস্ত্রাভাবে একান্ত বিপন্ন। এমন সময়ে ইংরেজ সেনাপতি মাউব্রি পঁয়ত্রিশ শত সৈন্য ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া সত্বর এই স্থান অবরোধ করিলেন।

যে যুদ্ধে জয়ের আশা থাকে, সে যুদ্ধ অনেকেই করিতে পারে, কিন্তু যাহাতে পরাভব নিশ্চিত, সে যুদ্ধ যুঝিতে অমানুষিক বলের প্রয়োজন।

দেখিতে দেখিতে ইংরেজ সৈন্য দুর্গের চারিদিক সেনাজালে আবদ্ধ করিল। বলভদ্র ভাবিতেছিলেন, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে সুদিনে কলুঙ্গার সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এখন দুর্দ্দিন উপস্থিত, আজ নিমকের পরীক্ষা হইবে।

২৫শে অক্টোবর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ইংরেজ দূত বলভদ্রের নিকট যুদ্ধ পত্র লইয়া আসিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বলভদ্র শয়ন করিতে গিয়াছেন, এমন সময় ইংরাজ সেনাপতির পত্র আসিল। পত্রে লিখিত ছিল, "এই অসম যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করা বীরপুরুষের গ্লানিজনক নহে; গোরক্ষ সেনাপতির বিনা রক্তপাতে দুর্গাধিকার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।" উত্তরে গোরক্ষ সেনাপতি ইংরেজ দূতকে বলিলেন, "তোমাদের সুবাদারকে বলিও, আগামী কল্য যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ইহার উত্তর পাইবেন।"

পরদিন প্রত্যুষে কামানের গর্জ্জন এই ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তর লইয়া আসিল। চতুর্দ্দিকে কামানের অগ্নির ধূম অপসারিত হইবার পূর্ব্বেই ইংরেজ সেনাপতি সমস্ত সেনা লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রস্তর স্তূপের পশ্চাতে এক অদম্য শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, কামানের গোলা তাহাকে ভেদ করিতে পারে না; সেই মানসিক মহাশক্তি আজ চকিতে দেখা দিল এবং সুবাদার হইতে সামান্য সেনার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কেবল যোদ্ধার হৃদয়ে নহে—দুর্ব্বল নারী ও নিরুপায় শিশুকেও সেই মহা অগ্নিশিখা উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল।

ইংরেজ সৈন্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে অক্ষম হইল। পরিশেষে জয়ের আশা নাই দেখিয়া দেরাদুনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

তৎপরদিন জেনারেল গিলেস্পি দুর্গভঙ্গ করিবার উপযোগী নূতন কামান এবং নূতন সৈন্য লইয়া মাউব্রির সহিত যোগ দিলেন। স্থির হইল চারি সৈন্য-

দল এক সময়ে চারিদিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিবে এবং কামানের গুলিতে দুর্গ-প্রাচীর ভগ্ন করিয়া অবারিত দ্বারে দুর্গে প্রবেশ করিবে।

২৬শে তারিখের নয় ঘটিকার সময় এই বিরাট আক্রমণ আরব্ধ হইল, কিন্তু অল্প সময়েই ইংরেজ সৈন্য পরাহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন জেনারেল গিলেস্পি স্বয়ং তিন দল নূতন সৈন্য লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। একেবারে বহুসংখ্যক কামান অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া দুর্গে অনলপূর্ণ গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সন্ত্রস্ত গোরক্ষ সেনা এখন চতুর্দ্দিক হইতে একেবারে আক্রান্ত হইল।

দুর্গের নামমাত্র যে প্রাচীর ছিল, এই ঝটিকায় তাহা আর রক্ষা পাইল না, গোলার আঘাতে প্রস্তরস্তূপ বালুর বাঁধের ন্যায় খসিয়া পড়িল। আক্রান্ত গোরক্ষ সৈন্যের ভাগ্যলক্ষ্মী এখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই সময়ে সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষিত হইল; ভগ্নস্থানে মুহূর্ত্ত মধ্যে এক প্রাচীর উত্থিত হইল। এই নূতন প্রাচীর সুকোমল নারীদেহে রচিত। গোরক্ষ রমণীগণ স্বীয় দেহ দ্বারা প্রাচীরের ভগ্নস্থান নিমেষে পূর্ণ করিলেন। ইহার অনুরূপ দৃশ্য পৃথিবীতে আর কখনও দেখা যায় নাই। কার্থেজের রমণীরা স্বীয় কেশপাশ ছিন্ন করিয়া ধনুর জ্যা রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু রক্তমাংস গঠিত জীবন্ত শরীর দিয়া কুত্রাপি দুর্গ-প্রাচীর নির্ম্মিত হয় নাই। কেবল প্রাচীর নহে—এই দুর্ব্বল কষ্ট অসহিষ্ণু দেহ বজ্রবৎ কঠিন ও রণে ভীষণ সংহারক অস্ত্র হইয়া উঠিল।

এই সময়ে জেনারেল গিলেস্পি সসৈন্যে দুর্গ-প্রাচীর অতিক্রম করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু অধিক দূর না যাইতেই বক্ষে গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুগামী সৈন্য মুহূর্ত্তের মধ্যেই তীর ও গুলির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল; ইংরেজ সৈন্যের ভগ্নাবশেষ দেরাদুনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ইহার পর দিল্লী হইতে নূতন সৈন্য দল ও বহুসংখ্যক কামান যুদ্ধ স্থানে প্রেরিত হইল। ২৪শে নবেম্বর তারিখে এই নূতন সৈন্য দল কলুঙ্গা আক্রমণ করিল।

এবার কামানের গুলি বারুদ ও গোলাপূর্ণ সেল অনবরত দুর্গে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, ভূমি স্পর্শ মাত্র এই গোলা ভীষণ রবে শতধা বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর করাল ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল। এত

দিন যোদ্ধার যোদ্ধার প্রতিযোগিতা চলিতেছিল—যাহারা মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি নির্ভীকচিত্তে দর্শন করিতে পারিত, এতদিন মৃত্যু তাহাদিগকেই স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু এখন মৃত্যু সর্ব্বগ্রাসীরূপে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। মাতার বক্ষে থাকিয়াও শিশু উদ্ধার পাইল না।

এক মাসের অধিক কাল কলুঙ্গার অবরোধ আরম্ভ হইয়াছে। আহার্য্য সামগ্রী ফুরাইয়া গিয়াছে, যুদ্ধের উপকরণও নিঃশেষ প্রায়। এত বিপদের মধ্যেও যোদ্ধারা অবিচলিতচিত্ত। মুমূর্ষু শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য সাগরোর্ম্মির ন্যায় ইংরেজ সৈন্য দুর্গোপরি বারংবার পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু গোরক্ষ সৈন্য অমানুষী শক্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বারুদ ফুরাইলে তীর ধনু দ্বারা, তাহা ফুরাইলে প্রস্তর নিক্ষেপে শত্রু বিনাশ করিতে লাগিল। এই অসম সংগ্রামে গোরক্ষদেরই জয় হইল। দুর্গাধিকারের কোন আশা নাই দেখিয়া ইংরেজ সৈন্য দেরাদূনে প্রত্যাগমন করিতে আদিষ্ট হইল।

এমন সময়ে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে কলুঙ্গার দুর্গে পানীয় জল নাই। দুর্গের বাহিরের এক নির্ঝরিণী হইতে গোরক্ষেরা রাত্রির অন্ধকারে জল লইয়া যায়। এই জল বন্ধ করিতে পারিলেই তৃষ্ণাতুর শত্রু নিরুপায় হইয়া পরাভূত হইবে।

নির্ঝরিণীর জল বন্ধ করা হইল। ইহার পর দুর্গমধ্যে যে ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, তাহা কল্পনারও অতীত, আহত ও মুমূর্ষ নরনারী এবং শিশুর "জল জল" এই আর্ত্তনাদ কেবল মৃত্যুর আগমনেই নীরব হইল।

এদিকে ইংরেজেরা শত্রুকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া সিংহশিশুদিগকে জীবন্ত শৃঙ্খলবদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। দুর্গের চতুর্দ্দিকে সৈন্যপাশ দৃঢ়ীকৃত হইল। অবরুদ্ধ দুর্গের বহির্গমন পথে বহু সংখ্যক সৈন্য সমাবেশিত হইল। তাহারা দিবারাত্রি পথ অবরোধ করিয়া রহিল।

গোরক্ষ সৈন্য সংখ্যা প্রথমে তিন শত ছিল, মাসাধিক যুদ্ধের পর সত্তর জন মাত্র রহিল। চারি দিন পর্য্যন্ত ইহাদের কেহ এক বিন্দু জল স্পর্শ করে নাই, অনশন ও তৃষ্ণা নীরবে সহ্য করিয়াছে—তাহারা এ সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেছিল, কিন্তু নারী ও শিশুর আর্ত্তনাদ ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। শত্রুর হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেই এই দারুণ কষ্ট শেষ হয়। কিন্তু হস্তের তরবারী শত্রুর পদে স্থাপন প্রাণ থাকিতে হইবে না। জীবন থাকিতে কোন উপায় নাই—

জীবন দিয়াই বা কি উপায় আছে? সম্মুখে চারিদিক বেষ্টন করিয়া লোহিত রেখার জাল ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতেছে—সেই রেখার মধ্যে মধ্যে অসিত বর্ণ কামানের বিকট মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে—এই জালে কি আবদ্ধ হইতে হইবে? অথবা জীবনবিন্দু এই রক্তিমা ক্ষণিকের জন্য গাঢ়তর করিবে?—তবে তাহাই হউক!

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ দুর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। যে দ্বার সঙ্গীন ও কামানের গোলার আঘাতে উদ্ঘাটিত হয় নাই, আজ তাহা স্বতঃই উন্মুক্ত হইল। আত্মবলিদানে উন্মুখ সেই সত্তরটী বীর—মুষ্টিপ্রমাণ কৃষ্ণ মেঘের ন্যায়—অগণিত শত্রুদলের উপর পতিত হইল এবং অসির আঘাতে পথ কাটিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল।

পরদিন প্রত্যূষে ইংরেজ সৈন্য, যোদ্ধৃপরিত্যক্ত দুর্গে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের উল্লাস বিষাদে পরিণত হইল। এই কি দুর্গ? না—শ্মশান? এই শবকবন্ধমণ্ডিত ভূমিতে কি প্রকারে মানুষ এত দিন বাস করিয়াছে? আহত, জীবিত ও মৃতের কি ভয়ানক সমাবেশ! এই যে সম্মুখে সুবাদারের মৃত শরীর পড়িয়া রহিয়াছে, ইহার ক্রোড়ে লুক্কায়িত চারি বৎসরের একটি শিশু কাঁদিতেছে। তাহার একটু অগ্রে একটী স্ত্রীলোক মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার দুই উরু ভেদ করিয়া কামানের গোলা চলিয়াগিয়াছে। অদূরে বহু ছিন্ন হস্ত পদ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখা যাইতেছে—এ স্থানে সেল পড়িয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল। নিকটে কয়েকটী শিশু রক্তাপ্লুত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে—এখনও তাহাদের প্রাণবায়ু বাহির হয় নাই। চতুর্দ্দিকে কেবল জল জল এই কাতর ধ্বনি! †

* * * * *

† "At three o'clock in the morning Major Kelly entered and took possession of the fort; and there indeed the desperate courage and bloody resistance they had opposed to means so overwhelming, were mournfully and horribly apparent. The whole area of the fort was a slaughter house strewed with the bodies of the dead and wounded and the dissevered limbs of those who had been torn to pieces by the bursting of the shells; those who yet lived piteously calling out for water, of which they had not tasted for days. The bodies of several women by shots and shells were discovered, and children mangled yet alive, by the same ruthless engines.

The determined resolution of the small party which held this small post, for more than a month, against so large a force, most surely wring,

বলভদ্র সত্তরটী সঙ্গী লইয়া যৌন্তগড়ের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইংরেজ সৈন্য এই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল কিন্তু অধিকার করিতে পারে নাই। তৎপর বলভদ্র সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া যৈতক দুর্গের আধিপত্য গ্রহণ করেন, এবং নেপাল যুদ্ধ শেষ হইলে স্বদেশে তাঁহার তরবারীর আর আবশ্যক নাই দেখিয়া সঙ্গী সহিত রণজিৎ সিংহের শিখ সৈন্যে প্রবেশ করেন।

এই সময়ে রণজিৎ সিংহ আফগান যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। একবার তাঁহার একদল সৈন্য বহুসংখ্যক আফগান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। অনেকে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল, কেবল সত্তরটী সেনা রণভূমি ত্যাগ করিল না। এই কয়টী সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শত্রুর দিকে মুখ করিয়া অটল পর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইহারা অনেক বিপদের সময় পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে, আজ এই শেষবার সুবাদার ও সিপাহি এক শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইল। দূর হইতে কামান গর্জ্জন করিতেছিল। এক এক বার সেই জীমূতনাদ পর্ব্বত ও উপত্যকা প্রতিধ্বনিত করিতেছিল—সেই সঙ্গে শ্রেণী মধ্যে এক একটি স্থান শূন্য হইতে লাগিল, কিন্তু শ্রেণী টলিল না। পরিশেষে পাশাপাশি সত্তরটী শবদেহ অনন্ত শয্যায় শায়িত হইল। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড ধরায় পতিত হইয়া চির শান্তি লাভ করিল।

ইংরেজ সৈন্য কলুঙ্গা অধিকার করিয়া দুর্গ সমভূমি করিল। এখন পূর্ব্ব দুর্গ স্থানে বন্ধুর প্রস্তরস্তূপ দৃষ্ট হয়। সেই দারুণ বিগ্রহের লীলাভূমিতে এখন গভীর নির্জ্জনতা বিরাজিত। মৃত্যুর এ পারেই ঝটিকা, পরপারে বোধ হয় চিরশান্তি। মরণের পরপার হইতেই বোধ হয় কোন শান্তিময় আত্মা এই রণস্থলে আবির্ভূত হইয়া জেতৃগণের বীরহৃদয়ে করুণারস সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। যে স্থানে জেতা ও বিজিতের দেহধূলি একত্র মিশ্রিত হইতেছিল, সেই স্থানে ইংরেজ দুটী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত করিল—ইহা অদ্যাপি দৃষ্ট

---

admiration from every voice, especially when the horrors of the latter portion of this time are considered, the dismal spectacle of their slaughtered comrades, the sufferings of their women and children, thus immured with themselves, and the hopelessness of relief, which destroyed any other motive for the obstinate defence they made, than that resulting from a sense of duty supported by unsubdued courage. This and a generous spirit of courtsey towards their enemy certainly marked the character of the garrison of Kalunga, during the period of its seige. * * They fought us in fair conflict like men, and in the intervals of combat showed us a liberal courtsey : so far from insulting the bodies of the dead and wounded, they permitted them to lie untouched till carried away."—

Mr. Fraser's Report.

হয়। একটী প্রস্তর ফলক জেনারেল গিলেস্পি ও কলুঙ্গা যুদ্ধে হত ইংরেজ সৈন্তের স্মরণার্থ স্থাপিত ; ইহার অদূরে দ্বিতীয় প্রস্তর ফলকে লিখিত আছেঃ—

"আমাদের বীর শত্রু
কলুঙ্গা দুর্গাধিপতি বলভদ্র ও তাঁহার অধীনস্থ বীর সেনা—
যাঁহারা কলুঙ্গার অবরোধের পর শিখ সৈন্তে প্রবেশ করিয়া
রণে জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন
এবং
আফগান কামানের সম্মুখীন হইয়া
একে একে অকাতরে প্রাণদান করিয়াছিলেন—
সেই বীরগণের স্মরণার্থ
এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইল।"

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

জীবনোপায়।

(১৯৬ পৃষ্ঠার পর)

ঐ দিবস অপরাহ্নে সাইমন-পত্নী বেলা থাকিতেই আপনার সমস্ত গৃহ-কর্ম্ম সারিয়া লইল। শীতকালের রাত্রি, স্বামীর গৃহে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে পারে ; হিমে পথ চলিয়া গৃহে আসিয়া যাহাতে উষ্ণতা অনুভব করিয়া পথের শ্রান্তি ক্লান্তি বিস্মৃত হইতে পারে, একারণ সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর পরিচর্য্যার্থ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করণাশয়ে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিল। সন্ধ্যা হইতে না-হইতেই সন্তানদিগকে আহার করাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল ; কারণ তাহা না করিলে সন্তানগণের হাত পা উত্তপ্ত করিবার জন্ত সন্ধ্যা হইতেই অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতে হয়। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অগ্নি রাখিতে হইবে, এত কাষ্ঠ কোথায় পাইবে ?

সমস্ত দৈনিক কর্ম্ম সারা হইলে মাত্রিওনা ভাবিল,—"সাইমন অবশ্যই সহর হইতে কিছু আহার করিয়া চলিবে। তাহা হইলে রাত্রিতে তাহার আর আহার প্রয়োজন হইবে না। আমি একেবারে আহারাদি সমস্ত শেষ করিয়া তাহার পর অগ্নি জ্বালিয়া বসিয়া সাইমনের জামা শেলাই করিতে করিতে তাহার জন্ত অপেক্ষা করিব।" এই ভাবিয়া মাত্রিওনা আহারে

বসিল। আহারান্তে যে রুটীটুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহা হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিল,—"সাইম যদি বাড়ী আসিয়া কিছু খাইতে না চায়, তবে এই রুটীটুকুতে আমাদের কাল চলিয়া যাইবে। ঘরে যে ময়দা আছে, তাহাতে আর একটী মাত্র রুটী হইবে। আজ আর আমি ময়দা ভিজাইব না, কাল ভিজাইলেই চলিবে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মাত্রিওনা হস্তস্থিত রুটী তুন্দুরের উপর ঢাকিয়া রাখিয়া অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিল, এবং তাহার পাশে বসিয়া সাইমনের একটী ছেঁড়া জামাতে তালি লাগাইতে আরম্ভ করিল। সেলাই করিতে করিতে আবার সেই রুটীর কথা মনে করিয়া ভাবিতে লাগিল,—"একটী রুটীতে আমাদের তিন দিন চলে। ইতিমধ্যে যদি হাতে কোন কাজ এবং সেই সঙ্গে কিছু অর্থ না আসে, তবে এই চারি দিন কাটিয়া গেলে কি উপায় হইবে? আমার হাতে যে দুইটী রুবল ছিল, তাহাও সাইমকে দিয়াছি, এখন সমূহ অর্থাভাবে দেখিতেছি আহার বন্ধ করিতে হইবে। যেমন আহারের কষ্ট তেমনই শীতের কষ্ট; শুবা না হইলেও ত প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। গত শীতে কি ভয়ানক কষ্টই না পাইতে হইয়াছে। যাহা হউক কপালে দুঃখ থাকিলে কে খণ্ডাইবে? এবার ত একটী ভাল শুবা হইবে। আট রুবল ত কম কথা নয়! তাহাতে একটী ভাল চামড়া পাওয়া যাইবে, তার পর আমরা স্বামী স্ত্রীতে ঘরে শুবা সেলাই করিয়া লইব। এখন তাহাকে যদি দোকানদার না ঠকায়, তবেই রক্ষা। সাইম যেরূপ সরল প্রকৃতির লোক! সে নিজে কাহাকেও এক পয়সা ঠকাইবে না, কিন্তু তাহাকে একটী বালকও ঠকাইয়া লইতে পারে। যদি ঠকিয়া আসে, কিম্বা চামড়া না পায়, তবে কি বিপদেই পড়িতে হইবে!"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে চলিল। সাইমনের বাড়ী ফিরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে মাত্রিওনা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, এবং উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতে লাগিল,—"আমার সাইম ত কোন মাতালের সঙ্গ লইয়া কোন মদ্যালয়ে রাত্রিযাপন করিতে যায় নাই?"—মাত্রিওনা হৃদয়ের আবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; এমন সময়ে বহির্দ্বারে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া উহা মনুষ্যপদশব্দ নিশ্চয় জানিয়া সাধ্বী স্ত্রী তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিতে গেল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিল,—"আমার স্বামীর পদশব্দ ত চিনিতে পারিলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে আবার একটী অপরিচিত পদশব্দও শুনা গেল। এ ব্যক্তি কে?"

মাত্রিওনা দ্বারের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। সাইমন এবং অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইল যে সাইমনের হাত খালি, চামড়া আনে নাই! তাহার পুরাতন শুবাটী পর্য্যন্ত গায়ে নাই। অধিকন্তু সাইমনের মুখে মদ্যগন্ধ! অপরিচিত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল যে স্বামীর শুবাটী তাহার গায়ে রহিয়াছে; অধিকন্তু তাহার শির নগ্ন, ও পায়ে যে জুতা আছে, তাহাও যেন অন্যের জুতা, পায়ে ঠিক বসিতেছে না। এই সকল দেখিয়া পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রীর মনে যে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, মাত্রিওনার তাহাই হইল;—সাইমন রাস্তায় এই অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়াছে; সে ব্যক্তির প্রলোভনে পড়িয়া উভয়ে মদ্যালয়ে গিয়াছে এবং সাইমনের অর্থে উভয়ে মদ্যপান করিয়াছে; সে সাইমনকে মাতাল করিয়া তাহার শুবাটী পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়াছে; তাহার পর আরও কোন দুরভিসন্ধি মনে মনে আঁটিয়া সাইমনের সঙ্গ লইয়া তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছে! এই ধারণা হইতে আগন্তুকের প্রতি মাত্রিওনার বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হইল।

সাইমন গৃহ প্রবেশ করিয়াই মাথার টুপি খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল এবং নিজে একটী বেঞ্চের এক পাশে উপবেশন করিয়া আগন্তুককেও বসিতে ডাকিল। আগন্তুক গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া যখন দেখিল যে গৃহস্বামিনী তাহাকে প্রবেশার্থ আহ্বান করিল না, তখন সে দ্বারদেশে দাঁড়াইল এবং একান্ত দীননেত্রে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সেই করুণ দৃষ্টি মাত্রিওনার চক্ষে পড়িল না। মাত্রিওনা ভাবিল,—এ ব্যক্তির অভিসন্ধি ভাল নহে, তাই আমাকে দেখিয়া আর গৃহ প্রবেশ করিতে সাহস. পাইতেছে না। মাত্রিওনা দ্বারদেশ হইতে সরিয়া তুন্দুরের নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

সাইমন মাত্রিওনার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"অমন মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া আছ কেন? সমস্ত দিনের পর বাড়ী আসিলাম, একটীও কথা কহিতেছ না যে? আজ সমস্ত দিন অনাহারে গিয়াছে; আমাদিগকে কিছু খাইতে দিবে না?"

মাত্রিওনা কিছুই উত্তর দিল না কিম্বা এক পাও নড়িল না। সাইমন মনে মনে বুঝিল, গতিক ভাল নহে! আগন্তুককে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এস, ভাই, বস। মাত্রিওনা আমাদের জন্ত

অবশ্যই খাবার রাখিয়াছে। এস, দুজনে ত আগে খাই, তাহার পর কথা বার্ত্তা হইবে। আগন্তুক আসিয়া বেঞ্চের এক কোণে অতি সন্তর্পণে উপবেশন করিল। কিন্তু মাত্রিওনা এক পাও নড়িল না। সাইমন আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ তুমি কিছুই রান্না কর নাই?"

মাত্রিওনা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল,—"রান্না করিব না কেন? কিন্তু মাতালদের জন্য আমার রান্না নহে। আমি প্রাতে এত অনুনয় করিয়া তোমাকে মদ্যপান করিতে বারণ করিয়া দিলাম, তুমি আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই। তুমি নূতন শুবার জন্য চামড়া আনিতে গিয়া পুরাতন শুবাটী পর্য্যন্ত তোমার মাতাল সঙ্গীকে দিয়া আসিয়াছ। কেবল তাহা নহে, সেই উলঙ্গ মাতালকে নিজের পোষাকে আচ্ছাদিত করিয়া আবার গৃহে আনিয়াছ। এমন সব মাতালকে আমি আহার দিতে পারি না।"

সাইমন উত্তর করিল,—"এইরূপ ভাবে কথা বলা তোমার বড়ই অন্যায়। তুমিত একবার জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতে যে এ ব্যক্তি"—

মাত্রিওনা তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"আমার টাকা কি করিয়াছ?"

সাইমন শুবার আস্তরণের ভিতর হইতে মাত্রিওনা-দত্ত রুবল দুইটী বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। মাত্রিওনা লম্ফ দিয়া রুবল দুইটী করলিত করিল, এবং "মাতালদিগকে আমি খাইতে দিতে পারি না" বলিয়া গৃহকোণে গিয়া দাঁড়াইল।

সাইমন বলিল,—"বারে বারে কেবল গালি দিতে আরম্ভ করিয়াছ। গালি দিবার আগে একবার আমার কথা শুন।"

মাত্রিওনা আবার বাধা দিয়া বলিল,—"মাতালের কথা আবার কে শুনে? এমন মাতালের হাতে বিধাতা আমায় ফেলিয়াছেন যে স্ত্রী পুত্র অনাহারে শীতে প্রাণ দিতেছে, কিন্তু তাহার মদ্যপানে বিরতি নাই। মা আমাকে কাপড় পাঠাইয়া দেন, আমি তাহা নিজে না পরিয়া তোমাকে পরাই, তুমি তাহা দিয়া মদ খাইয়া আইস। তোমাকে টাকা দিয়া চামড়া কিনিতে পাঠাই, তুমি সেই টাকা দিয়া মদ খাও।"

এইরূপে মাত্রিওনার রাগ ক্রমশঃ বিলাপে পরিণত হইল। কিয়ৎক্ষণ বিলাপের পর যখন দেখিল যে সাইমন কিছু উত্তর দিল না, তখন আবার রাগের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সাইমনের ইচ্ছা ছিল যে মাত্রিওনাকে আগ-

ন্তুক ব্যক্তি সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া বলে; কিন্তু মাত্রিওনা তাহাকে আর একটীও কথা বলিবার অবসর না দিয়া ক্রমাগত গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে একান্ত রোষপরবশ হইয়া দৌড়াইয়া সাইমনের নিকট গিয়া তাহার নিজের অঙ্গাভরণটী স্বামীর গাত্র হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহাদ্বারা স্বীয় মস্তক আবৃত করিয়া গালি দিতে দিতে গৃহবহিষ্কৃত হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

মাত্রিওনা দ্বারদেশে যাইতে যাইতে ভাবিল যে আগন্তুক ব্যক্তি একটীও কথা কহিতেছে না! তবে কি সে মাতাল নহে? মাতাল ত কখনও এত গালি খাইয়াও কোন উত্তর না দিয়া অপরাধীর ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা ভাবিয়া সে দ্বারদেশ হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল,—"এ ব্যক্তি যদি ভাল লোক হইবে, তবে উলঙ্গ হইয়া রাস্তায় আসিবে কেন? আর তোমরা যদি কোন অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিবে, তবে তুমি এতক্ষণ আমাকে বলিতেছ না কেন এ ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় কোথায় কুড়াইয়া পাইলে?"

সাইমন বুঝিল, এই তাহার কথা কহিবার সুযোগ; এই সুযোগে মাত্রিওনার হৃদয়দ্বারে আঘাত করিতে না পারিলে মাত্রিওনা গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। সে বলিল,—"আমি ত কতবারই বলিতে যাইতে-ছিলাম, কোথায় কি অবস্থায় এ ব্যক্তিকে পাইয়াছি; কিন্তু তুমি আমাকে বলিবার অবসর দিলে কই? যাহা হউক এখন বলি শুন।" এই বলিয়া সে যেরূপে আগন্তুককে ক্ষুৎপিপাসায় ও শীতে জড়সড় এবং কাতরাবস্থায় গীর্জ্জার পার্শ্বে পতিত দেখিয়াছিল, তাহা সমস্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিল। তৎপর বলিল,—"ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে যে আমি সেই সময় তাহার উদ্ধারার্থ উপস্থিত হইয়াছিলাম, নতুবা তাহার কি অবস্থা হইত, কে বলিবে? এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না। পরের দুঃখে সাহায্য করিতে সক্ষম হওয়া যখন যাহার ভাগ্যে ঘটে, তখন তাহার পরম সৌভাগ্য; ও তাহারই প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে! মাত্রিওনা, এইরূপ দৈবানুগৃহীত কার্য্যে ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়া মৃত্যুমুখগত ব্যক্তির প্রলাপের ন্যায়। ইহাতে তোমার ক্রোধ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? তোমাতে কি ঈশ্বর নাই?"

এতক্ষণ মাত্রিওনা অত্যাচরিত গৃহিণীর ভাবে কথা বার্ত্তা বলিতেছিল। সাইমনের এই কথা কয়টী তাহার প্রাণে পৌছিয়া অকস্মাৎ তাহার মাতৃভাব জাগরিত করিয়া তুলিল। মাত্রিওনা আগন্তুককে ক্লিষ্ট ও বিপন্ন সন্তানের ন্যায় মনে করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তখন আগন্তুকের করুণ দৃষ্টি মাত্রিওনার নেত্রপথে প্রথম পতিত হইল। আহা! কি মর্ম্মভেদী দৃষ্টি! সেই দৃষ্টিতেই মাত্রিওনা বুঝিয়া লইল, এ জগতে আর আগন্তুকের আশ্রয় অবলম্বন কিছুই নাই!

যে রমণী একবার মাতৃত্বের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার প্রেমে আর জোয়ার ভাঁটা থাকে না; তাহা নিয়ত বেগে এক দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। যখন যাহাকে ঘৃণা করিতে হয়, তখন সমস্ত প্রাণ মন দিয়া তাহাকে ঘৃণা করিবে, আবার যখন ভাল বাসিতে হয়, তখনও আপনা ভুলিয়া ভাল বাসিবে। রমণী যে পর্য্যন্ত আপনাকে মাতৃস্থানীয়া অনুভব না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার ভিতরে প্রেমের ভাব পুঁথিগত বিদ্যার ন্যায় থাকে; তাহা প্রাণেতে মিশিয়া যায় না। কারণ মাতৃত্বই রমণীর প্রাণ! মাতৃত্বে না পৌছিলে প্রেম রমণীর প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না।

মাত্রিওনা এতক্ষণ নারী ছিলেন না, কেবল মাত্র গৃহিণী ছিলেন। কিন্তু একবার মাতৃত্ব অনুভব করিয়াই একেবারে নারীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। আগন্তুকের করুণ নিরবলম্বন দৃষ্টি যেন সহস্র জিহ্বাতে প্রেমের ভাষা ব্যক্ত করিল; মাত্রিওনা আপনাকে মাতৃস্থানীয়া অনুভব করিলেন। তাঁহার রাগ মুহূর্ত্তমধ্যে দূরীভূত হইয়া গেল; তিনি নিজেদের অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া টেবিল পরিষ্কার করিলেন এবং গৃহে যাহা কিছু আহার্য্য সামগ্রী ছিল, তাহা বাহির করিয়া তদুপরি রাখিলেন। তদনন্তর আগন্তুকের দিকে চাহিয়া স্নেহার্দ্র কোমল স্বরে বলিলেন,—"খাও!"

আগন্তুক এতক্ষণ অধোদৃষ্টিতে বসিয়া ছিল; তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন ক্রমশঃ তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। মাত্রিওনার কোমল আহ্বান শুনিয়া সে চক্ষু তুলিয়া চাহিল। অকস্মাৎ তাহার চক্ষের ভাব বদলাইয়া গেল; করুণ চক্ষের তরলত্ব বিদূরিত হইয়া তাহাতে প্রেমের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। আগন্তুকের মুখে প্রথম হাসি দেখা দিল!

সাইমন রুটী কাটিতে কাটিতে সেই হাসি দেখিতে পাইল। তাহারও মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। উভয়ে আহারে প্রবৃত্ত হইলে মাত্রিওনা টেবিলের

অপর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহারই দুঃখের কথা ভাবিতে লাগিল! এতক্ষণে তাহার পূর্ণ রমণীত্ব লাভ হইল!!

আহার সমাপন হইলে মাত্রিওনা উঠিয়া টেবিল পরিষ্কার করিল। তৎপর সাইমনের পরদিনের পরিধানের জন্য যে জামাটীতে তালি লাগাইতেছিল, তাহা এবং সাইমনের একটী পুরাতন পায়জামা বাহির করিয়া আগন্তুককে পরিতে দিল। আগন্তুক গৃহকোণে গিয়া কাপড় পরিয়া আসিল। মাত্রিওনা তাহার নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"তোমার বাড়ী কোন্ দেশে?"

আগন্তুক,—"এদেশে নহে।"

মাত্রিওনা,—"তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে?"

আগন্তুক,—"আমার বলিবার সাধ্য নাই।"

মাত্রিওনা,—"তুমি রাস্তায় উলঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিলে কেন?"

আগন্তুক,—"ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। আমাকে উলঙ্গ দেখিয়া তোমার স্বামী নিজের পরিধেয় আমাকে পরাইয়া দিয়াছেন; আমাকে ক্ষুধিত দেখিয়া তুমি আপনাদের কল্যকার আহার্য্য না রাখিয়া আমাকে খাওয়াইয়াছ; ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন!"

রাত্রিতে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। সাইমন শুইতে গেলে পর মাত্রিওনা আগন্তুককে তুন্দুরের উপর শুইতে দেখাইয়া দিয়া নিজে গিয়া স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল না। মাত্রিওনার মনে কেবল আগন্তুকের সেই মোহিনী দৃষ্টি জাগিতেছিল! অনেকক্ষণ পর মাত্রিওনা ডাকিল,—"সাইম!"

সাইমন উত্তর দিল।

মাত্রিওনা,—"যে রুটীটুকু ছিল তাহা ত ফুরাইয়া গেল। আমি আর ময়দা ভিজাই নাই। কাল কি খাইব?"

সাইমন,—"ঈশ্বর উপায় করিয়া দিবেন। এখন ভাবিয়া কি হইবে?"

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিল। মাত্রিওনা আবার বলিল,—"আচ্ছা, এ ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছে না কেন?"

সাইমন,—"বোধ হয় সে কিছুই বলিতে পারিতেছে না। তাহার অবশ্যই কোন কারণ আছে।"

মাত্রিওনা,—"আচ্ছা, সাইম, আমরা খাইতে পাই না, তবুও লোকের

সাহায্য করি। আমাদের অভাবের সময় আমাদিগকে কেহ সাহায্য করে না কেন ?"

সাইমন পাদুকানির্ম্মাণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহার দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন হয় নাই। দেখিয়া শুনিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছে, তাহারই কথা কহিতে পারে। কিন্তু যুক্তিতর্কের বিষয়ে কি উত্তর দিবে ? সে,—"ঢের কথা বলিয়াছ, এখন ঘুমাও !" বলিয়া পাশ ফিরিয়া নেত্র মুদ্রিত করিল।

প্রভাতে সাইমন গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিল। মাত্রিওনা কোন প্রতিবেশীর গৃহে অন্যকার মতন রুটী ধার পাওয়া যায় কি না, দেখিতে গিয়াছে। আগন্তুক ব্যক্তি বেঞ্চের এক কোণে বসিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

সাইমন বেঞ্চের অপর পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিল,—"দেখ, মানুষের একটী উদর আছে, তাহা নিয়ত আহার চায়। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, তাহা নিয়ত আচ্ছাদন চায়। আমরা খাটিয়া নিজেদের অভাব পূরণ করি। তুমি কি করিতে চাও, কি করিতে জান ?"

আগন্তুক,—"জগতে এমন কোনই কাজ নাই, যাহা আমি করিতে জানি। আমি কখনও জীবিকানির্ব্বাহার্থ কোন কাজ করি নাই।"

সাইমন চমৎকৃত হইয়া গেল। তবে কি এ কোন রাজপুত্র ? তাহার পর বলিল,—"মানুষ যদি মন লাগাইতে পারে, তবে জগতে কোন কাজই তাহার অসাধ্য থাকে না।"

আগন্তুক,—"মানুষ খাটিয়া খায়, আমিও খাটিয়া খাইব।"

সাইমন,—"তোমার নাম কি ?"

আগন্তুক,—"মিখাইলা।"

সাইমন,—"আচ্ছা, মিখাইলা, তোমার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা আমাদিগকে বলা না বলা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে ভাল লোক বলিয়াই ধারণা করিয়া লইতেছি। এখন তোমাকে খাটিয়া খাইতে হইবে। তুমি যদি আমার কাজ শিখিতে পার, তবে আমি তোমাকে আমার কাছে রাখিব।"

মিখাইলা,—"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। এখন কেবল আমাকে দেখাইয়া দাও, কি করিতে হইবে, তবেই আমি শিখিতে পারিব এবং তোমার কার্য্য করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিব।"

ইত্যবসরে মাত্রিওনা রুটী লইয়া গৃহে ফিরিল। আহারান্তে সাইমন মিখাইলাকে কর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিল। মিখাইলা প্রথমে সূতা পর্য্যন্ত পাকাইতে জানিত না; যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কিছুই ধরিতে পর্য্যন্ত জানিত না। কিন্তু সাইমন যেরূপ দেখাইতে লাগিল, সে একবার করিয়া দেখিয়াই ঠিক তদ্রূপ শিক্ষা করিতে লাগিল, এবং দুই দিন মাত্র কার্য্য করিয়া এমন দক্ষতা প্রকাশ করিতে লাগিল যে, দেখিলে মনে হয় যেন সে আজীবন ঐ কার্য্য করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে মিখাইলার কার্য্যদক্ষতার বিষয় চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে সাইমনেরও পসার বাড়িতে লাগিল। সাইমন ও তাহার পত্নী উভয়েই তাহার প্রতি অধিকতর সদ্ভাব ও সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিল।

এইরূপে সাইমনের গৃহে কার্য্য করিয়া মিখাইলা দিনাতিপাত করিতে লাগিল। তাহাকে কদাপি বাহির হইতে দেখা যাইত না। সে অবিশ্রান্ত আপন কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিত এবং দিবসের কার্য্য শেষ হইলে গৃহের কোণে বসিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিত। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কদাপি কথা কহিত না। সে যদিও প্রথম দিবসের ন্যায় বিমর্ষ ছিল না, কিন্তু একবার বই তাহার মুখে আর কখনও হাসি দেখা যায় নাই। কার্য্যাবসানে সাইমনের সন্তানসন্ততিরা তাহার নিকটে বসিয়া গল্প করিত, সে চুপ করিয়া তাহাদের গল্প শুনিত এবং কখনও বা করুণনেত্রে তাহাদের মুখপানে তাকাইয়া থাকিত। সেই করুণ দৃষ্টি! তাহাতে বালকের মন পর্য্যন্ত গলিয়া যাইত। সকলেই মিখাইলাকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিল।

এইরূপে ক্রমে এক বৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় শীতকাল আসিল। সমস্ত দেশ বরফে ঢাকা পড়িয়া গেল। 'ত্রয়কা'* ভিন্ন লোকের চলাচল অসম্ভব হইয়া উঠিল।

একদা সাইমন ও মিখাইলা গৃহে বসিয়া কার্য্য করিতেছে; মাত্রিওনা আপন গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত আছে; এমন সময় একটা ত্রয়কা ঝুনু ঝুনু শব্দে ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে তাহাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। মাত্রিওনা জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিতে পাইল যে, প্রথমে একজন সুসজ্জিত ভৃত্য

---

* ত্রয়কা (Troika) রুশীয়াদেশে প্রচলিত এক প্রকার চক্রহীন গাড়ী বিশেষ। ইহা বরফের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলে। একজাতীয় হরিণ দ্বারা চালিত হয়। ঐ সকল হরিণের গলাতে ঘণ্টা বাঁধা থাকে; তাহার শব্দ দ্বারা ত্রয়কার গতিবিধি শ্রুতিগোচর হয়।

ত্রয়কার পশ্চাৎ হইতে অবতরণ করিয়া তাহার দ্বার খুলিয়া দিল; তৎপর একজন বিপুলকায় যুবক জমীদার ত্রয়কা হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদেরই দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। মাত্রিওনা দেখিবামাত্র একান্ত ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আগন্তুক গৃহে প্রবেশ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলে মাত্রিওনার মনে হইল যেন এ ব্যক্তির বিশাল দেহ তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহটী সমস্তই জুড়িয়া রাখিয়াছে। একে দেহের বিশাল আয়তন, তাহাতে পরিচ্ছদের জাঁকজমক। ইহার সমক্ষে তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহ আরও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হইতে লাগিল। গৃহস্থ সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল, কারণ ইহারা কেহই কখনত জমীদার দেখে নাই।

জমীদার মহাশয় একটী বেঞ্চ টানিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। বেঞ্চটী তাঁহার ভারে নমিত হইয়া পড়িল। উপবেশনান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"এই জুতার দোকান কার?"

সাইমন অগ্রসর হইয়া বলিল,—"আপনার কৃপায় এই দোকানটী আমার।"

আগন্তুক আপন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল,—"ওরে গাড়ী হইতে চামড়াটা নিয়ে আয় ত।"

ভৃত্য দ্রুতপদে গাড়ীতে গিয়া চামড়ার পুলিন্দা উঠাইয়া আনিল। আগন্তুকের ইঙ্গিতক্রমে সাইমন তাহা গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে চামড়া বাহির করিয়া টেবিলের উপর বিছাইল। আগন্তুক বলিলেন,—"দেখ, মুচি, এ কিরূপ চামড়া দেখিতে পাইতেছ?"

সাইমন,—"আজ্ঞে হাঁ।"

আগন্তুক,—"কেমন চামড়া বলিয়া তোমার মনে হয়?"

সাইমন,—"আজ্ঞে, বেশ চামড়া।"

আগন্তুক,—"বেশ চামড়া, তোমার মাথা! বেশ আবার একটা কথা! এরূপ চামড়া তোমার জীবনে কখনও দেখ নাই। আমি জার্ম্মনী হইতে বিশ রুবল দিয়া ইহা আনাইয়াছি!"

সাইমন বিশ রুবলের নাম শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। সে এত দরিদ্র যে বিশ রুবল কখনও একত্রে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ! সে অস্পষ্ট স্বরে বলিল,—"আমরা এরূপ চামড়া কোথায় দেখিব?"

আগন্তুক,—"তাই হউক। এখন এই চামড়া দ্বারা আমার এক যোড়া বুট-জুতা তৈয়ার করিয়া দিতে হইবে। পারিবে কি?"

সাইমন,—"আজ্ঞে, তা পারিব।"

আগন্তুক,—"'পারিব' বেশ কথা বটে, কিন্তু 'পারিব' বলাতে ও পারাতে অনেক তফাৎ। এইটী মনে রাখ যে, কি চামড়া দিয়া কাহার জন্য জুতা তৈয়ার করিতেছ। জুতা এমন করিতে হইবে যে, এক বৎসর ব্যবহার করিলেও কোন স্থানে একটু ময়লা পড়িবে না, কিম্বা কোঁকড়াইয়া অথবা বাঁকিয়া যাইবে না। যদি পার তবে চামড়া রাখ, নতুবা বল যে পারিবে না। আমি এক বৎসর পরিয়া সন্তুষ্ট হইলে তখন তোমার মজুরী দশ রুবল দিব। আর যদি জুতা ইতিমধ্যে কোনরূপ নষ্ট হয়, তবে তোমাকে জেলে পাঠাইব।"

সাইমন ভীত হইয়া মিখাইলার দিকে চাহিল। মিখাইলা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলে পর সাইমন জুতা প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইল।

আগন্তুক আপন বাম পায়ের জুতা খুলিয়া সাইমনকে তাহার মাপ লইতে বলিল। সাইমন ভাল করিয়া হাত ধুইয়া মুছিয়া মাপ লইতে আসিল, পাছে তাহার হাতের ময়লা লাগিয়া জমীদারের মোজাতে দাগ পড়ে। মাপ লইতে গিয়া দেখিল, জমীদারের পায়ের তলা সতর ইঞ্চি লম্বা!

সাইমন যখন মাপ লইতেছিল, তখন আগন্তুক গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। তিনি মিখাইলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও ব্যক্তি কে?" সাইমন উত্তর করিল,—"এইটী আমার কর্ম্মকারক। ইহার হাতেই হুজুরের জুতা তৈয়ার হইবে।" ইহা বলিতে বলিতে মিখাইলার দিকে নেত্রপাত করিয়া সাইমন দেখিতে পাইল যে, মিখাইলা আগন্তুকের দিকে দেখিতেছে না, কিম্বা তাঁহার কথাও শুনিতেছে না। আগন্তুকের পশ্চাতে যেন কি দাঁড়াইয়া আছে, মিখাইলা তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। সাইমন চাহিয়া দেখিল; কিছুই দেখিতে পাইল না। পুনরায় চাহিয়া দেখিতে পাইল যে, মিখাইলার মুখে হাসি দেখা দিতেছে। মিখাইলা বস্তুতঃই হাস্য করিল।—এই মিখাইলার দ্বিতীয়বার হাস্য!

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙ্গ।

সেক্সপিয়র সংসারকে রঙ্গমঞ্চ বলিয়াছেন।* ওআর্ডস্‌ওআর্থ শিশু মানবকে অভিনেতা উপাধি দিয়াছেন।† কিন্তু মানুষ যে শৈশব হইতেই অভিনয় করে, তাহার প্রকৃতিতে যে অভিনয়-বৃত্তি নিহিত আছে, তাহা বুঝাইবার ও প্রমাণ করিবার জন্য সেক্সপিয়র বা ওআর্ডস্‌ওআর্থের প্রেতাত্মার আবাহন করিবার প্রয়োজন নাই। বালিকাগণ, জননী হইবার বহুপূর্ব্বেই, অচেতন পুত্তলিকাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া মা হইয়া বসেন; কখনও বা পুতুলের বিবাহ দিয়া সঙ্গিনীর সহিত বৈবাহিকসম্পর্কে আবদ্ধ হন। কোন বালক চোর সাজেন, এবং অতি অপূর্ব্ব হিন্দী-ভাষী শিশু কন্‌ষ্টেবল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, বিচারার্থ, কল্পিত বিচারাসনে আসীন অপর এক জজ-রূপী সহচরের সম্মুখে আনীত হন। সৈনিকের পুত্র যুদ্ধাভিনয় এবং বণিকের পুত্র ক্রয়-বিক্রয়ের অভিনয় করেন। আমি অনেক ধনশালী বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সর্ব্ববিধ উপাদেয় সামগ্রী সম্ভোগ করিয়া যে সুখ পাই নাই, অনেক বালিকা-গৃহিণীর ধূলি-নির্ম্মিত ক্রীড়া ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া, তিন্তিড়ীপত্ররূপী চিপিটক ভোজনের অভিনয় ও আহারান্তে তুলসী পত্রের তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। যে বালক রাত্রিকালে যাত্রা শ্রবণানন্তর পর দিবস রাম সাজিয়া "রে দুর্ব্বৃত্ত দশানন" বলিয়া রাবণের উদ্দেশে বক্তৃতা না করিয়াছে, তাহাকে কেমন করিয়া বালক নামে অভিহিত করিব?

আমার মনে পড়ে, বাল্যকালে ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়ার অভিনয় পর্য্যন্ত করিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীর নিকটেই একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। একটি ছোট খাল ইহাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এরূপ খালকে

---

* "*Ant.* I hold the world but as the world *Gratiano*,
A stage where every man must play a part."
—*The Merchant of Venice.*

"All the world's a stage."
—*As You Like It.*

† "And with new joy and pride
The little Actor cons another part."
—*The Immortality Ode.*

আমাদের জেলায় "জোড়" বলে। একদিন আমার ও আমার তিন জন সঙ্গীর ইচ্ছা হইল, এই জোড়টির উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করিতে হইবে! এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংবাদ শুনিতে পাইলে ষ্ট্যান্‌লী সাহেব ভয় পাইতেন কি না জানি না। যাহাই হউক, আমরা চারি জন জোড়ের তীর দিয়া প্রায় দেড় ক্রোশ গিয়া দেখিলাম, একটি ধানের ক্ষেত্রের মধ্যে সামান্য পয়ঃপ্রণালীর আকারে জোড়টি ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিতেছে। অনতিদূরে কয়েক স্থানে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অঙ্গুলিপরিমিত কুণ্ড হইতে জল নিঃসৃত হইতেছে। সেখানে তিনটি ছোট বাব্‌লা গাছ দাঁড়াইয়া আছে। উৎপত্তি-স্থল আবিষ্কৃত হইল! এত বড় একটা মহৎ কাজ অঙ্গহীন থাকে কেন? যে সুবৃহৎ স্রোতস্বিনীর উৎপত্তিস্থল নির্দ্ধারিত হইল, তাহার নামকরণ একান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। আমরা স্ব স্ব নামের আদ্য অক্ষর সংযোজিত করিয়া জোড়টির নাম রাখিলাম "কারাগরা।" হায়, কারাগরা, অপরের কর্ণে তোমার নাম কর্কশ লাগিতে পারে, অপরের নিকট তুমি উপহাসের কারণ হইতে পার, কিন্তু আমার নিকট তোমার নাম বড়ই মধুর। তুমি আমার সোণার শৈশবের কথা মনে পড়াইয়া দিলে। তোমার সেতুর পার্শ্বে তৃণশয্যায় শুইয়া কত সুখস্বপ্নই না দেখিয়াছি। একদিন অপরাহ্নে তোমার সেতুর পার্শ্বে শুইয়া তোমার ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের কুল কুল ধ্বনি শুনিতে-ছিলাম। দুই দিকে দিগন্তপ্রসারিত ধান্যক্ষেত্র। বায়ুভরে ধানের গাছ-গুলি এক একবার শুইয়া পড়িতেছিল, আবার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে-ছিল। মধ্যে মধ্যে সমীরণ ধান্যরাজি হইতে সুস্নিগ্ধ অতি মৃদু সুমিষ্ট সৌরভ আনিয়া দিতেছিল।—নাগরিকগণ নগরে থাকিয়া যতই অর্থব্যয় করুন না কেন, এই স্বর্গীয় সৌরভ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন। ইহা একমাত্র জানপদবর্গেরই উপভোগ্য।—ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলশায়ী হইলেন। পশ্চিমাকাশ যেন গতাসু সূর্য্যের চিতানল-শিখা দ্বারাই লোহিতাভ নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এই শোভা ক্ষণকাল পরেই অন্তর্হিত হইল। ধূসর-বাসা সন্ধ্যাসতীর আগমনে সমস্ত প্রকৃতি অতি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। পশ্চিম গগনে শুক্রতারা তাঁহারই ললাটে সিন্দূর বিন্দুর মত শোভা পাইতে লাগিল। নদীটি এতক্ষণ সভয়ে ব্রীড়ান্বিতা কিশোরীর ন্যায় মৃদুগীতি গাইতেছিল। এখন সন্ধ্যা সমাগমে যেন সে হঠাৎ মুখরা হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুখরতা কেমন মর্ম্মস্পর্শিণী! দেখিলাম অদূরে আম্রোদ্যানের

ভিতর দিয়া একটি বালিকা প্রদীপ হস্তে গ্রাম্য পথ দিয়া যাইতেছে। কে ঐ বালিকা? সংসার-সমুদ্রের অসংখ্য উর্ম্মিমালার মধ্যে ঐ তরঙ্গটি এখন কোথায় গিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, জানি না। কিন্তু এই সায়ংকালীন দৃশ্যের শোভা, নদীর মৃদুগীতি, বায়ুচুম্বিত বৃক্ষপত্রের "সর" "সর" ধ্বনি, ঐ বালিকার স্মৃতির সহিত এমনই জড়াইয়া রহিয়াছে যে, আমার আশা হয় যে, তাহার সহিত যেন আবার কোথায় পরিচয় হইবে।

অন্তর্বিধ আর একটি শৈশবের ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। বাল্য-সহচরী এই ক্ষুদ্র নদীটির অদূরে শালপলাশবনের অঙ্কশায়ী ব—গ্রামে একটি জাম গাছ ছিল। আমাদের বালকসমাজে এই জাম গাছটির বড় সুখ্যাতি ছিল। তাহার জাম যেমন বড়, তেমনই সুমিষ্ট ও "চিকণ-কালা"। আমরা অনেক-বার ইহার জাম খাইয়া, কে কত বেশী খাইয়াছে পরীক্ষা করিবার জন্য জীভ্ বাহির করিয়া দেখিতাম, কাহার জীভ্ কত নীল হইয়াছে। নীলতম-জিহ্বাবিশিষ্ট বালক সকলের ঈর্ষার পাত্র হইত। একবার আমরা দেড় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নে এই গাছের জাম খাইতে গিয়াছিলাম। আমি তখন গাছে উঠিতে পারিতাম না। বয়োজ্যেষ্ঠেরা গাছে উঠিল। আমি তাহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া গাছের তলায় রহিলাম।—বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, জামগাছটা আমাদের কাহারও নয়, আমরা চুরি করিয়া জাম খাইতেছিলাম। কিন্তু সেকালে পরের বাগানের আম জাম খাওয়াটাকে একটা ন্যায়সঙ্গত অধিকার মনে করিতাম, চুরি মনে করিতাম না। এখন বয়স হইয়াছে, সন্তানসন্ততির নীতিশিক্ষার দায়িত্ব অনুভব করিতেছি; তথাপি, ভয়ে ভয়ে বলি, আম জাম চুরিটাকে চুরি বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমি যদি কখনও নীতিবিজ্ঞানের বহি লিখি, তাহা হইলে পরস্বাপহরণকে নিশ্চয়ই অপরাধ মধ্যে গণ্য করিব, কিন্তু বালকবৃন্দ কর্তৃক আম্র ও জম্বু অপহরণের চৌর্য্য আখ্যা দিব না। কেন না, গাছপালার সহিত তাহাদের বড়ই আত্মীয়তা।—আমার সঙ্গিগণ সুখে উদর পূরণ করিতেছিলেন; আমিও দুই চারিটি জাম পাইতেছিলাম। এমন সময়ে উক্ত ব—গ্রামের কয়েক জন যুবক আসিয়া আমাদিগকে জাম খাইতে নিষেধ করিল ও গাছ হইতে নামিতে বলিল। আমার সহচরেরা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। শত্রুদল আমাদিগকে জব্দ করিবার জন্য গাছের গুঁড়ি বাব্লার ডাল দিয়া বেড়িয়া দিল। কিন্তু বৃক্ষারূঢ় বালকগণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ

না করিয়া যতক্ষণ না পেট ভরিল, খাইতে লাগিল। পরে গাছের গুঁড়ি দিয়া না নামিয়া ডাল হইতে ঝুলিয়া মাটিতে ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। আততায়ী বালকগণ স্বীয় মনোরথ ব্যর্থ হইল দেখিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমরা সাহসিকতার ভাণ না করিয়া পলায়নপর হইলাম। শীঘ্রই মাঠের মধ্যে একটা পাথরের গাদায় পৌছিলাম। তখন আমাদের বিক্রম দেখে কে? আততায়িগণ প্রস্তরনিক্ষেপে ভীত হইয়া আর আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল না।

ব—গ্রামের অদূরবর্ত্তী শালবনগুলি আমার বড় প্রিয়। প্রায় দুই বৎসর হইল, আমার এক কবি-বন্ধুর সহিত প্রাতে উহার মধ্যে একটি বনে বেড়াইতে যাই। যখন নিকটে গেলাম, শালপত্রের উজ্জ্বল শ্যামল শ্রী চক্ষুর পরিতৃপ্তি সাধন করিল। এই স্থানের ভূমি ঈষৎ রক্তাভ ও এরূপ কঠিন যে বৃষ্টির পরও কর্দ্দমাক্ত হয় না। আমরা বনস্থলীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বৃক্ষপরিবৃত একটি প্রশস্ত সুশীতল স্থানে উপবেশন করিলাম। স্থানটি এমনই পরিচ্ছন্ন, বোধ হইল যেন বনদেবতাগণ অতিথিসৎকারের জন্য উহা সম্মার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্থানমাহাত্ম্য বশতঃ আমরা উভয়েই নির্ব্বাক ও আত্মহারা হইয়া এক অননুভূতপূর্ব্ব গভীর শান্তিরসের আস্বাদন করিতেছিলাম; এমন সময় বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে উদ্বুদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিলাম, সমীরণের একটি তরঙ্গ বৃক্ষশিরগুলি নত ও শাখাপত্ররাজি আন্দোলিত করিয়া চলিয়া গেল। শালতরুগুলি আবার চিত্রার্পিতপ্রায় নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বনস্থলী আবার নীরব হইল। আমার বন্ধুগণও কখনও আমাকে কবিত্বাপবাদ দেন নাই। কিন্তু তৎকালে আমার মনে হইল, যেন বনদেবী মস্তক নত করিয়া সহস্র অঙ্গুলির সঙ্কেত সহকারে বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি ব্যপদেশে তাঁহার মানব অতিথি দুই জনকে "স্বাগত" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। আমাদের দুই জনের একবার ঐ স্থানের নিকটে বাসগৃহ বাঁধিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ আনন্দ সকল দিনে সম্ভোগ্য নয়; সর্ব্বদা সুলভও নয়। পর্ব্ব দিবসের আমোদ কি সকল দিন পাওয়া যায়? কবি ওআর্ডস্ওআর্থ্ ইংলণ্ডের সুরম্য হ্রদমালাপরিশোভিত প্রদেশে (Lake District) বাস করিতেন। তিনি বলেন :—"People come to the Lakes, and are charmed with a particular spot, and build a house, and find themselves

discontented, forgetting that these things are only the sauce and garnish of life."*

বাল্যসহচরী ক্ষুদ্র নদীটির মোহন মন্ত্রে পথ ভুলিয়া কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! সাধে কি আত্মহারা হই? অপরের নিকট আমি সম্ভ্রান্ত মান্যগণ্য "বাবু" পদবাচ্য হইলেও হইতে পারি; অপরে আমার সহিত ভদ্রতা করে; তাহারা আদর করিলে মনে হয়, বুঝিবা ইহার ভিতর কত অনাদর লুকাইয়া আছে। কিন্তু যে জন্মভূমিতে আমি নগ্নদেহে অসভ্য অবস্থায় বিচরণ করিয়াছি, যাঁহার স্নেহে শরীর মন পুষ্ট হইয়াছে, যাঁহার নিকট আমার দেহ-মনের কোন সংবাদ অজানা নাই, যাঁহার গাছগুলি আমার দেহের সহিত বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তিনি আমাকে যেরূপ অকপট স্নেহের সহিত কোলে লন, এমন আর কে পারে? তাঁহার নিকট আমি যাহা ছিলাম, তাহাই রহিয়াছি। তাঁহার অঙ্গাভরণ এই ক্ষুদ্র নদীটির যে এক মোহিনী শক্তি থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? যাহা হউক, আবার আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করি।

এতক্ষণ নির্দ্দোষ অভিনয়ের কথাই বলিয়াছি। মানবসমাজে আর এক প্রকার অভিনয় প্রচলিত আছে। তাহা কপটাচারেরই নামান্তরমাত্র। আমি তাহার কথা বলিব না।

অভিনয় করা যেমন স্বাভাবিক, অভিনয় দেখিবার ও শুনিবার ইচ্ছাও তেমনি স্বাভাবিক। কোন না কোন আকারে সকল দেশেই অভিনয় বিদ্যমান আছে। আমাদের দেশে যেমন যাত্রা, নাটকাদি আছে, পাশ্চাত্যদেশ-সমূহেও তেমনি থিয়েটারে নাটকাভিনয় আছে। সুনীতির অনুরোধে, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য কেহ রঙ্গালয়ে না যাইতে পারেন; কিন্তু অভিনয় দর্শন ও শ্রবণের ইচ্ছা মানবহৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। অভিনয় দর্শন ও শ্রবণ গর্হিত নহে। তবে অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের চরিত্রদোষে রঙ্গালয়গুলি ভদ্রসমাজের পদার্পণের অযোগ্য হইতে পারে। কিন্তু এবিষয়ে আমার কিছু বলিবার অধিকার আছে কি না সন্দেহ। আমি বহুবৎসর কলিকাতায় যাপন করিয়াছি;

* "লোকে হ্রদগুলির নিকটে আসে, কোন একটি স্থান দেখিয়া মোহিত হয়, তথায় গৃহ নির্ম্মাণ করে, এবং অবশেষে অসন্তুষ্ট হয়। তাহারা ভুলিয়া যায় যে এই সুশোভন স্থলগুলি জীবনের চাট্‌নি ও ভূষণ স্বরূপ।

কিন্তু একবারও কোন থিয়েটারে যাই নাই। আমার বরাবর একটা নৈতিক সংস্কার আছে,—কুসংস্কার কি সুসংস্কার বলিতে পারি না,—যে থিয়েটারগুলাতে যে শ্রেণীর লোকে অভিনয় করে, তাহাতে তথায় যাওয়া উচিত নয়। কেহ কেহ এইটুকু পড়িয়াই হয়ত আমাকে সেই দলের লোক মনে করিবেন, যাঁহারা ব্যাকরণ হইতে স্ত্রীত্য প্রকরণ উঠাইয়া দিতে চান। এরূপ একটা দল আছে কি না জানি না, কিন্তু আমি সে দলের লোক নই। "একবারও কোন থিয়েটারে যাই নাই," বলাটা ঠিক নয়। একবার কোরিন্থিয়ান্ থিয়েটারে গিয়াছিলাম। কেহ যদি বলেন, দেশী থিয়েটারে যাও না,—কোরিন্থিয়ানে কেন গেলে? ইহার সদুত্তর থাকিলেও বাহুল্য ভয়ে দিলাম না। কেবল বলি, মানুষ ত কল নয় যে ঠিক এক ভাবেই কার্য্য করিবে; অবস্থাভেদে কার্য্যের বিভিন্নতাই সচেতন জীবের লক্ষণ।

এই একবার ব্যতীত কখনও থিয়েটারে যাই নাই, কিন্তু বাল্যকালে একবার নাটকাভিনয় করিয়াছিলাম। ইহাতে অভিনয় সম্বন্ধে হয়ত কিছু বলিবার অধিকার জন্মিতেও পারে। বাল্যের সেই অভিনয় এখনও মনে আছে। একখানা ছোট সতরঞ্চ যবনিকার কাজ করিয়াছিল। আমি কালনেমি সাজিয়াছিলাম। আমার যে সহচর হনুমান্ সাজিয়াছিল, কালনেমিকে পদাঘাতের অভিনয় করাই তাহার উচিত ছিল। কিন্তু সে অভিনয় না করিয়া কালনেমিরূপী আমাকে অতিশয় "ভক্তিপূর্ব্বক" * এক প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়াছিল।

একটু বয়স হইলেই বাজে কথা বলিবার প্রবৃত্তিটা বেশী হইয়া পড়ে;—বিশেষতঃ নিজের কথা। কিন্তু উহা আত্মম্ভরিতা-প্রসূত নহে। যাহা হউক, এখন আসল কথাটা বলি।

ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য সকল কলেজেই ছোট বড় এক একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার আছে। কারণ শুধু বই পড়িয়া বিজ্ঞান শেখা যায় না। কলেজের ছাত্রদিগকে যেমন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক পড়িতে

---

* আমার এক বন্ধু শিক্ষকতা করেন। তিনি কোন ছাত্রকে অপর ছাত্রের কাণ মলিতে বলিবার সময় বলেন, "খুব ভক্তি করিয়া কাণ মল।" ইহার মানেটা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। বোধ হয়, যাহার কাণ মলা হয় তিনি তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া কাণ মলিতে বলেন; অথবা খুব জোরে কাণ মলিতে বলেন। কারণ লোকে যাহা ভক্তিপূর্ব্বক করে, তাহা একাগ্রতা ও দেহমনের সমগ্র শক্তির সহিত নির্ব্বাহিত হয়।

হয়, তেমনি ইংরাজী ও সংস্কৃত অনেকগুলি নাটক পড়িতে হয়। আমার বোধ হয় অভিনয় করিয়া না দেখাইলে নাটকের প্রকৃত মর্ম্ম ছাত্রদিগের বোধগম্য হয় না। ছাত্রেরাও অভিনয় করিতে না পারিলে, নাটকের মর্ম্ম ও নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। তবে সকলেই যে ভাল অভিনেতা হইবে, এরূপ আশা করা যায় না।

মানুষ যখন শান্তভাবে কথা বলে, ক্রোধাদি কোন প্রবল বৃত্তি বা ভাব যখন হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে না, তখন শুধু কথার দ্বারাই মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। যখনই আমরা ক্রোধ, ঘৃণা, শোক বা অন্যবিধ কোন ভাবের অধীন হই, তখন আর শুধু ভাষায় কুলায় না। আমরা তখন মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গীর সাহায্য গ্রহণ করি। ক্রোধে ভ্রূ কুঞ্চিত কণ্ঠস্বর কর্কশ, হস্তের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হয়। শোকপরবশ হইয়া মানুষ কেশ ছিন্ন করে, বক্ষে করাঘাত করে। এইরূপ সমুদয় প্রবল মনোভাবেরই বাহ্য লক্ষণ আছে। মনের মধ্যে যখন কৌতুকের তরঙ্গ খেলিতে থাকে, তখন তাহাও মৃদু বা অট্টহাস্য দ্বারা সূচিত হয়। সুতরাং যখন কোন নাটক হইতে ক্রোধ, শোক বা ঘৃণাব্যঞ্জক অথবা হাস্যোদ্দীপক কথা পড়া হয়, তখন তদুপযোগী মুখ ও অঙ্গভঙ্গী না করিলে নাটককারের অভিপ্রেত সমস্ত অর্থ,—সমস্ত ভাবটুকু, আদায় হয় না। দেখা গিয়াছে যে এতদূর না করিয়া যদি অধ্যাপক ছাত্রবর্গকে কেবল বলিয়া দেন, কোন্ প্রসিদ্ধ অভিনেতা কোন্ কথাগুলি কিরূপ স্বরে, কিরূপ মুখভঙ্গী বা অঙ্গভঙ্গী সহকারে উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলেও ছাত্রগণ অতিশয় আগ্রহের সহিত অধ্যাপকের ব্যাখ্যা শুনে এবং নাটকখানিও সুবোধ্য হইয়া উঠে।

এখন কেহ বলিতে পারেন, অঙ্গ বা মুখভঙ্গী না করিয়া কি ভিন্ন ভিন্ন ভাবোপযোগী স্বরে নাটক পড়া যায় না? ইহার উত্তর এই যে, ইহা কিয়ৎপরিমাণে সম্ভব, সম্পূর্ণরূপে নয়। কারণ, মুখের ভাব (expression) পরিবর্ত্তন এবং অঙ্গসঞ্চালন ব্যতিরেকে কোন প্রবল মানসিক ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করা যায় না। মানসিক উত্তেজনা ও তাহার বাহ্য লক্ষণ এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট, যে সাধারণতঃ একটি ব্যতিরেকে অপরটির অস্তিত্ব সম্ভবেনা। সুতরাং কোন মনোবিকার প্রকাশ করিতে হইলে মুখাঙ্গভঙ্গীর প্রয়োজন। আর একটি কারণেও অঙ্গভঙ্গীর প্রয়োজন বুঝা যায়। মনের

মধ্যে যে ভাব নাই, বাহিরে ঠিক্ তাহার সত্যবৎ অভিনয় করা কঠিন। ক্রোধের, ঘৃণার, শোকের, বা বিস্ময়ের অভিনয় করিতে হইলে, অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও ক্রুদ্ধ, ঘৃণাপরবশ, শোকার্ত্ত বা বিস্ময়াবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। ইচ্ছা শক্তি দ্বারা মনে এই সকল ভাব আনা যায়; কিন্তু মুখ ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারাও মনোমধ্যে এই সকল ভাব আনয়নের সাহায্য হয়। যথা, ক্রুদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে ভ্রূ কুঞ্চিত, চক্ষু ঘূর্ণিত ও অধর দংশন করিলে হৃদয়ের উপর ক্রোধের ছায়া পড়ে। ইহা নিতান্ত কথার কথা নয়; দার্শনিকের আলোচনার বিষয়।*

দেখা গেল, মুখ ও অঙ্গভঙ্গী ব্যতীত মানসিক উত্তেজনা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না; মনোবিকারের প্রকৃত অভিনয় করিতে হইলে মনোমধ্যে বিকারের হেতুভূত ক্রোধাদি ভাব বিদ্যমান থাকা চাই; এবং মনের মধ্যে এই সকল ভাবের উদ্রেক করিতে হইলে উহাদের বাহ্যলক্ষণস্বরূপ নানাবিধ মুখ ও অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করিতে হয়।

কলেজের ক্লাসে বসিয়া চোগা চাপ্‌কান আঁটিয়া অভিনয় করিলে অধ্যাপক নিজ গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না। সে অবস্থায় অভিনয় করাও সম্ভব নয়। একাই এক শ হইয়া কথনও সরু গলা, কথনও মোটা গলা করিয়া কথা কহা বড়ই বিড়ম্বনা। তদ্ভিন্ন একজন অভিনেতা অপর কোন অভিনেতার সাহচর্য্যেই ভাল অভিনয় করিতে পারে। তুমি যদি আমাকে প্রহার করিতে আসিবার অভিনয় কর, তাহা হইলে আমার পক্ষে ক্রোধ বা ভয়ের অভিনয় করা সহজ হয়। তদ্ভিন্ন দৃশ্যের ও পরিচ্ছদের উপরও অভিনয়ের উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।—সে কথা পরে বলিতেছি।—আর একটা কথা ভাবিয়া দেখুন। চোগা-চাপ্‌কান-পরিহিত অধ্যাপক মহাশয় লীয়র নৃপতি, বা কণ্ব মুনির "অংশ" অভিনয় করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু যদি তিনি, শকুন্তলা, গৌতমী, কর্ডীলিয়া বা পোর্শিয়া হইয়া বসেন, তাহা হইলে ছাত্রবর্গের নীলকণ্ঠ বা গোবিন্দ অধিকারীর বৃন্দাদূতী সাজা মনে পড়িতে পারে।

* "The simplest form of this volitional excitation of feeling is seen in all histrionic imitation. * * * The mimic takes on the outward motor manifestations of the feelings he represents, such as the facial movements, gestures, bodily pose, and modifications of vocal action. Such assumption of motor concomitants, by introducing a part of the bodily resonance of the feeling, tends in a measure to develop this last."
—Sully's *Outlines of Psychology* (1894), P. 431.

পূর্ব্বে বলিয়াছি, দৃশ্য ও পরিচ্ছদের উপর অভিনয়ের উৎকর্ষ নির্ভর করে। দৃশ্যের কথা বেশী করিয়া বলিব না। পরিচ্ছদের কথাই বলি। আমার এক বন্ধু বলিতেন, কোট প্যাণ্টালুন পরিলেই মেজাজটা কিছু সাহেবী, কিঞ্চিৎ রুক্ষ হইয়া উঠে। কথাটা পরিহাসচ্ছলে উক্ত হইলেও নিতান্ত অসার নয়। পরিচ্ছদের সহিত মানসিক ভাবের সম্বন্ধ আছে। অস্মদ্দেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, পরমাত্মা নায়ক ও জীবাত্মা নায়িকা, এই ভাব সাধনই ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ অঙ্গের সাধন। কথিত আছে, এইরূপ সাধনে সিদ্ধ হইবার জন্য নারীপ্রকৃতি লাভার্থ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সাধনের এক অবস্থায় স্ত্রীলোকের মত বসন ভূষণ পরিধান করিতেন। আমার বোধ হয়, পুরুষকে স্ত্রীলোকের "অংশ" অভিনয় করিতে হইলে, অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও নারীপ্রকৃতি আত্মসাৎ করিবার জন্য, নারীর মত বেশ ভূষা করা চাই। কিন্তু অধ্যাপক ত নারী সাজিতে পারেন না।

এক্ষণে কতকগুলি আপত্তি উঠিতে পারে। ১। ছাত্রগণ অভিনয় করিতে শিখিলে জ্যাঠা হইবে। আমরা বলি যদি নাটক পড়িলে জ্যাঠা না হয়, তাহা হইলে অভিনয় করিলেই কেন জ্যেষ্ঠতাত হইবে? ২। অভিনয় শিখিবার বা করিবার সময় কই? ইহাতে তাহাদের পড়া শুনার ক্ষতি হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা অভিনয় শিখিতে পারে। এতদর্থে বি-এ কোর্সের একখানা নাটক কমাইয়া দিলেও চলে। বি-এ পরীক্ষার পর অভিনয় শিক্ষা করিয়া ছাত্রেরা কন্‌ভোকেষ্যন্ বা উপাধি বিতরণ উপলক্ষে অভিনয় করিতে পারে। ৩। অভিনয় শিখায় কে? ইহার উত্তর আপাততঃ দিতে পারিলাম না। ৪। অভিনয় করিতে হইলে সমস্ত সরঞ্জাম ও সাজসজ্জা বিশিষ্ট রঙ্গভূমি চাই; কেন না ছাত্রদিগকে প্রয়োজন মত নানাদেশীয়, নানাজাতীয়, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন স্ত্রী বা পুরুষ সাজিতে হইবে। এত টাকা কে দিবে? উত্তর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার নির্ম্মাণ ও যন্ত্র ক্রয়ার্থ যদি কলেজের স্বত্বাধিকারিগণ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন, তবে ইহার জন্য কেন না পারিবেন? যদি বাহ্যজগতের বিষয় বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝা প্রয়োজনীয় বোধ হয়, তবে মানবের আত্মারূপ যে অন্তর্জগৎ তাহার সম্যক্ জ্ঞান কি আবশ্যক নয়?

মানবচরিত্র অধ্যয়ন শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের একটি প্রধান উপাদান।

কিন্তু সংসারে নানা প্রকার চরিত্রের লোক আছে। সকলের সহিত মিশিয়া তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। তদ্ব্যতীত অসাধু ব্যক্তিগণের চরিত্র বুঝিবার জন্য তাহাদের সংসর্গ করা বাঞ্ছনীয়ও নয়, নিরাপদও নয়। ভূয়োদর্শন ভাল ; কিন্তু তদনুরোধে চরিত্র ভ্রংশ ঘটা কদাপি প্রার্থনীয় নহে। এই সকল কারণে অনেক সময় পুস্তকাধ্যয়ন দ্বারাই মানবচরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমরা স্ব স্ব প্রকৃতিতে মানব প্রকৃতির সমুদয় বৃত্তি ভাবাদির অস্তিত্ব অনুভব না করি, ততক্ষণ আমাদের মানবচরিত্র জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা বা বন্ধ্যা নারীর নিকট মাতৃস্নেহ যেমন একটা আভিধানিক কথা মাত্র, তদ্রূপ যে ভাব আমি কখনও অনুভব করি নাই, যে চিন্তা আমার মনে কখনও উদিত হয় নাই, যে বৃত্তি দ্বারা আমি কখনও পরিচালিত হই নাই, সেই সেই ভাব, চিন্তা ও বৃত্তি, আমার কল্পনার বস্তু হইতে পারে, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। বুদ্ধকে বুঝিতে হইলে ক্ষণেকের জন্যও বুদ্ধ হইতে হয় ; সীতাকে বুঝিতে হইলে মুহূর্ত্তের জন্যও সীতা হইতে হয়, রাবণকে বুঝিতে হইলে অল্প ক্ষণের জন্যও রাবণ হইতে হয়। এইরূপে সর্ব্ববিধ, অন্ততঃ অনেকবিধ, মানুষকে বুঝিতে পারিলে যেন আত্মার পরিসর বৃদ্ধি হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয়। ইহা দ্বারা এক দিকে যেমন মানব মাত্রেরই সহিত নিজের সাদৃশ্য অনুভব করিয়া মানুষের হৃদয়ে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রীতির সঞ্চার হয়, সকলকে "কুটুম্বক" বলিয়া মনে হয়, অপর দিকে তেমনি নিজ হৃদয়ে কাম ক্রোধ জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট বৃত্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া অতি সাধুশীল মনুষ্যও আপনাকে "তৃণাদপি সুনীচ" মনে করিতে পারেন। মানব চরিত্রের এইরূপ জ্ঞানলাভ নাটক পাঠ ও অভিনয় দ্বারা অর্জ্জন করা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ সুপ্রণালী ক্রমে নাটক পাঠ ও অভিনয় করিলে তাহা হইতে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। অধিকন্তু, সংস্কৃত সাহিত্যে চিত্রগীতবাদ্যাদি যে সকল "ললিত কলা"র (fine arts) উল্লেখ আছে, অভিনয়কে তাহার অন্তর্গত মনে করা যাইতে পারে। যদি উল্লিখিত কলাগুলির অনুশীলন অভিলষণীয় হয়, তবে অভিনয়ের চর্চ্চা করিতে দোষ কি ? অবশ্য সাবধান না হইলে, অপরাপর কলার অনুশীলনের ন্যায় অভিনয়ের অনুশীলনেও চরিত্রের লঘুত্বাদি দোষ জন্মিতে পারে। কিন্তু সে সকলের কথা এখন বলিবার স্থান নাই। শেষ

বক্তব্য এই যে, সকল কলেজের না থাকিলেও, অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি "রঙ্গ" অর্থাৎ থিয়েটার থাকা আবশ্যক। আমি বলিতেছি না যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরই অভিনয় শিক্ষা করা উচিত; অপর সাধারণেরও ইহা শিক্ষণীয়। বালকবালিকাগণের উপযোগী নাটক রচনা করিয়া তাহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দিলে তাহারা যেমন বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করে, তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি ও মুখভঙ্গীও তেমনি সুসংযত ও আয়ত্তাধীন হয়, এবং হৃদয় বিকসিত হইয়া উঠে।

উপনিবেশ স্থাপন।

বঙ্গদেশ যেরূপ ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত, তাহাতে বাঙ্গালীজাতির শরীর মন সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রাখা কঠিন ব্যাপার। জাতিগতভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইলে বাঙ্গালী জাতি কখনও উন্নতি লাভ করিয়া অন্য সবল পরাক্রমশালী জাতির সঙ্গে একাসনে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। জাতীয় স্বাস্থ্যের অবনতি যে যে কারণে ঘটিয়াছে, তাহার অনেকগুলি আমরা সচরাচর শুনিতে পাই। তন্মধ্যে একটি প্রধান কারণ স্থানের অস্বাস্থ্য ও বাসগৃহ বিষয়ে অমনোযোগিতা। ঘন পল্লীতে সংকীর্ণস্থানে বহু পরিবারসহ অবস্থিতিদ্বারা একেত বায়ু ও পানীয় জল প্রভৃতি দূষিত হয়, তাহার উপর স্থানের স্বাভাবিক দোষ এই যে উহা ভিজা, সেঁতসেতে নিম্নভূমি। এই সকল কারণে বৎসর বৎসর কত লোক অকালে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইতেছে ও চিররুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। গত বৎসরের স্যানিটেরি কমিশনারের রিপোর্টে দেখা গিয়াছে বঙ্গদেশে সাড়ে চৌদ্দ লক্ষের অধিক লোক কেবল জ্বররোগে এবং এক লক্ষ পঁচিশ হাজার লোক ওলাউঠায় মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। ইহাতে কত পরিবার নিঃস্ব ও শোকে রুগ্ন শীর্ণ হইয়া অর্দ্ধমৃতবৎ অন্যের গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই। পনর ষোল লক্ষ লোক যদি জ্বর ও ওলাউঠায় কবলিত হইয়া থাকে, অন্ততঃ তাহার দশগুণ লোকের অস্থিমাংস এই দুই প্রবল শত্রু চর্ব্বণ করিয়া তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছে। অথচ এই সকল অবস্থাতে আমরা সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে অনায়াসে অনেক পরিমাণে বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারি। দেশের সাধারণ অস্বাস্থ্য নিবারণের জন্য পয়ঃপ্রণা-

নীর বন্দোবস্ত ও উত্তম পানীয় জল, প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা গবর্ণমেণ্টও বুঝিয়াছেন এবং দেশীয় শিক্ষিত লোকেরাও বুঝিয়াছেন, কিন্তু তথাপি এই সকল বিষয়ে যত্নের ত্রুটি আমাদের জাতিগত অলসতা ও নির্জ্জীবতার পরিচায়ক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কেবল একটি বিষয়েরই আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ঘন বস্তি ও অস্বাস্থ্যকর স্থানের উন্নতি করিতে যে চেষ্টা যত্ন ও অর্থের প্রয়োজন, তাহার কিয়দংশও একত্র সংগ্রহ করিয়া স্বাস্থ্যকরস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলে স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সুখ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। এই বিষয়ে শিক্ষিত দেশহিতৈষী ও উদ্যমশীল বঙ্গবাসীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার এখন সময় আসিয়াছে। সুতরাং এই বিষয়ের আমরা এখন বিশেষরূপ আলোচনা করিব।

অনেকে বলেন বাঙ্গালী গৃহপ্রিয়, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র বসবাস করিতে অনিচ্ছুক। বাস্তবিকই একটি ক্ষুদ্রগ্রামে ক্ষুদ্র একখণ্ড জমীতে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে ও গৃহবিবাদে পৈতৃক বাসস্থান খণ্ড খণ্ড করিয়া শত অংশে পরিবারবর্গের মধ্যে বিভক্ত করিয়া থাকিতে বাঙ্গালী যেমন ভাল বাসে, এমন আর কে করে? পৈতৃক দশ বিশ হস্ত জমীর জন্য ভ্রাতায় ভ্রাতায় আত্মীয় স্বজনে বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমায় রাশীকৃত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতে প্রস্তুত, তবুও বাঙ্গালী স্থানান্তরে নূতন স্বাস্থ্যকর সুখকর গৃহ নির্ম্মাণে পরাঙ্মুখ। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ঘন বস্তিতে অস্বাস্থ্যকর স্থাপনে অবস্থিতি করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক কালগ্রাসে নিপতিত হইতেছে, অথচ স্থানান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিলে অকাল মৃত্যু ও দুঃখ দারিদ্র্যের হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে দূরে থাকা যায়। দেশে বৎসর বৎসর অনাবৃষ্টি কিম্বা অতিবৃষ্টিতে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতেও কত লোকের মৃত্যু হইতেছে। কিন্তু এই সমুদয়ের প্রতীকার হইতে পারে যদি উপনিবেশ স্থাপনে দেশীয়লোক বদ্ধপরিকর হন। ইংরেজ জাতি আমাদের অপেক্ষা কম গৃহপ্রিয় নহেন, কিন্তু তাঁহাদের গৃহপ্রিয়তা উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান কারণ বলিয়া বুদ্ধিমান লোকেরা অনুমান করেন; য়ুরোপের অন্য সকল জাতি অপেক্ষা ইংরেজ জাতির উপনিবেশই সমধিক ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ইহার একমাত্র কারণ, ইংরেজ গৃহপ্রিয়। ইংরেজ ইচ্ছা করেন, সুখ স্বচ্ছন্দপূর্ণ ও ইচ্ছানুরূপ সজ্জিত একটি বাড়ী তিনি আপনার বলিয়া অভিহিত করিবেন, স্ত্রীপুত্র

গণ তাহাতে স্বাস্থ্য ও আনন্দ সম্ভোগ করিবে এবং কাজ কর্ম্মের ভিড় হইতে আসিয়া স্বয়ং আরাম, বিশ্রাম ও আনন্দ সম্ভোগ করিবেন। সুতরাং এইরূপ গৃহ পৃথিবীর যে অংশে পাওয়া যায়, তিনি সেখানে চলিয়া যাইবেন। মহাসাগর, পাহাড়পর্ব্বত, নদনদী, মরুভূমি কিছুই ইংরেজের গতির প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমেরিকার জঙ্গল বিদীর্ণ করিয়া ইংরেজের গৃহ, উদ্যান; সুখ শোভার আধার হইয়া হাস্য করিতেছে। আফ্রিকার মরুভূমির সীমা যেখানে পর্য্যবসিত, সেই সকল স্থান এবং অষ্ট্রেলিয়া নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের জনশূন্য অথচ উর্ব্বর,শ্যামল, মনোহর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আজ ইংরেজের রমণীয় হর্ম্ম্য, বর্ত্ম ও সুশোভন নগরীর সৌন্দর্য্য ও কোলাহলে পরিপূর্ণ,ইংরেজের পদভরে কম্পিত, ও তাহাদের একগুণ শোভা আশ্চর্য্য বুদ্ধি-কৌশলে শতগুণ বর্দ্ধিত। ইংরেজ যেমন সুন্দর পরিপাটি গৃহের মূল্য বুঝেন,এমন অন্য কেহ বুঝেন কি না সন্দেহ। আমরা কথায় মাত্র বলি, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। কিন্তু আজ কাল বিষয় কার্য্যের যেরূপ ধূমধাম, ব্যস্ততা, ও প্রতিযোগিতা, কে কোথায় জন্মগ্রহণ করিতেছে, আবার কোথায় চলিয়া যাইতেছে, তাহার নিশ্চয় নাই। পিতা বৎসর বৎসর নানাস্থানে ঘুরিতেছেন,কোন সন্তানের জন্মভূমি এখানে, কোন সন্তানের জন্মভূমি শত ক্রোশ দূরে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সন্তান নূতন নূতন কার্য্যস্থানে গমন করিতেছেন। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির সঙ্গে কোন প্রকারের সম্বন্ধ জ্ঞানই হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রাচীন বাক্যের অর্থ একপ্রকার চলিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। গৃহপ্রিয়তা আমাদিগকে উত্তম গৃহের জন্য লালায়িত ও সচেষ্ট করা উচিত। আপনাদের এবং সন্তানদের, স্বদেশবাসীর এবং সমগ্র জাতির কল্যাণ যদি কামনা করি, তবে নিশ্চয়ই উপনিবেশ স্থাপনের জন্য আমরা ব্রতী হইব। সম্প্রতি ইংরেজেরা আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে ভারতবাসীর উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আফ্রিকাবাসীদিগকে সভ্য ও শাসনাধীন করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে এত পতিত স্থান, বিস্তীর্ণ উর্ব্বর দেশ রহিয়াছে যে, অনায়াসে ঘন লোকাকীর্ণ স্থান সমূহ কিছু কিছু অতিরিক্ত অধিবাসী দ্বারা সেই সকল স্থানকে লোকালয়ে পরিণত, সুশোভিত ও কার্য্যকর করিয়া দিতে পারে। বঙ্গদেশের ঘন পল্লীসমূহ হইতে লোক যাইয়া আপাততঃ বৈদ্যনাথ, মধুপুর, গিরিডি, ছোটনাগপুরে রাঁচি, হাজারিবাগ, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে উপনিবেশ স্থাপন

করিতে পারে। উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি হইতে জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত স্থান উপনিবেশের উপযুক্ত। আরও দূরে যাইতে ইচ্ছা করিলে বিহার, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভারতবর্ষের নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা যায়। কিন্তু এই মহা অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করিতে সমবেত চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন। আজ কাল যেমন দেশে নানাপ্রকার যৌথ ভাণ্ডারের সৃষ্টি হইয়া নানাপ্রকার কল কারখানা ও রেলওয়ের সূচনা হইতেছে, তদ্রূপ কতিপয় সৎসাহসী, ধর্ম্মভীরু ও কার্য্যক্ষম লোক একত্র হইয়া কোম্পানি গঠন করিতে পারিলে এই দুরূহ ব্যাপার সহজ হইয়া পড়িবে। এই উপনিবেশ কোম্পানি প্রথমে মেম্বরগণের নিকট হইতে মাসিক চাঁদা কিম্বা এককালীন দান আদায় করিয়া তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যের জমী ক্রয় কিম্বা গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, এবং যতদিন যথোচিত মূল্য সংগ্রহ না হইবে, মেম্বরগণের প্রদত্ত টাকার সুদ ব্যাঙ্কে জমা হইবে। এই সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেই সমুদয় বিষয় পরিষ্কার হইবে। ইংলণ্ডে এইরূপ দলবদ্ধভাবে জমী ক্রয় ও গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অনেক কোম্পানী আছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

লীডস্ স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ সমিতি (Leeds Permanent Building Society) প্রায় ২০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। গৃহনির্ম্মাণের জন্য মাসিক অর্থ সঞ্চয় মিতব্যয়িতা শিক্ষারও প্রকৃষ্ট উপায়। লাঙ্কেশায়েরের মধ্যে কয়েকটি গ্রাম ও নগরে এই উদ্দেশ্যে অনেক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। Padihamএর লোকসংখ্যা ৮,০০০ কিন্তু গৃহনির্ম্মাণের জন্য ১৫,০০০ পৌণ্ড সঞ্চিত। Bumleyতে গৃহনির্ম্মাণ সমিতির ৬,৬০৭ মেম্বর, ১৬০,০০০ পৌণ্ড সঞ্চিত; অর্থাৎ প্রতি জন গড়ে ২৪ পৌঃ সঞ্চয় করিয়াছে। এই সকল সমিতি ভাল বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিয়া থাকেন এবং সঞ্চিত অর্থ বৃদ্ধি করেন।

উপরে যে সকল সমিতির বিবরণ প্রদত্ত হইল, সমুদয়ই গরিব, সামান্য ব্যবসায়ী কিম্বা চাকুরেদের দ্বারা গঠিত। আমাদের দেশে মধ্যশ্রেণীর লোক প্রায়ই চাকরী দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। অনেকের সামান্য বেতনে গ্রাসাচ্ছাদনের ভালরূপে সংস্থান হয় না। উপনিবেশ স্থাপনের জন্য অর্থ কোথায় পাইবেন? কিন্তু মাসে মাসে ৫।৭ টাকা করিয়া যদি যৌথ ভাণ্ডারের হস্তে প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হন, তাহা হইলে নিয়মিত

ব্যয় কিছু কমাইয়া অনায়াসে চালাইতে পারেন। মাসিক পাঁচ টাকায় বৎসর ৬০৲ হইবে এবং ৮ বৎসরে সুদসহ ৫০০৲ মজুত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যাঁহারা অধিক সঞ্চয় করিতে সমর্থ, তাঁহারা ৮ বৎসরে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ সঞ্চয় করিয়া অনায়াসে ভাল বাড়ীর সংস্থান করিতে পারেন। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাদের অর্থের প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা সঞ্চিত অর্থ কোম্পানির ভাণ্ডার হইতে লইয়া যাইতে পারেন। বাড়ী নির্ম্মাণ করা না হইলেও, অর্থ অপব্যয় হইবে না, বরং সেভিংস্ ব্যাঙ্কের ন্যায় অর্থ সঞ্চয়ের একটি উপায় হইবে। আপাততঃ বিশটি পরিবার যদি সমবেতভাবে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ব্রতী হন এবং নূতন মনোনীত স্থানে জমী ক্রয় ও বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিতে পারেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অন্য অনেক লোক অনুসরণ করিবে আশা করা যায়। নূতন স্থানে গৃহনির্ম্মাণ, বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে হওয়া উচিত। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, প্রতি জনের অন্ততঃ কত জমী থাকা উচিত, কি প্রণালীতে সকলের গৃহনির্ম্মাণ হইবে, এবং সাধারণ পথ, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মশালা, বিদ্যালয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করা উচিত। গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে জমী ক্রয় করা আবশ্যক। প্রস্তাবিত কোম্পানী এক বৎসরের সঞ্চিত অর্থে মেম্বরদিগের অর্থানুসারে জমী ক্রয় করিয়া, আর ৫।৬ বৎসরের সঞ্চিত অর্থে আবশ্যকীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মসমাজ দেশে অনেক নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, পুরাতনের মধ্যে নূতন জীবন ও উৎসাহ আনয়ন করিয়াছেন। আমরা আশা করিতে পারি তাঁহাদের মধ্যে একদল উৎসাহী লোক এই কার্য্যে পথ-প্রদর্শক হইতে প্রয়াসী হইবেন। আপাততঃ দাসাশ্রমের মণ্ডলী যদি এ বিষয়ে নানা স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করিতে পারেন, বিজ্ঞাপন দ্বারা তাঁহারা জানিতে পারিবেন কে কে উপনিবেশ কোম্পানীতে যোগ দিতে প্রস্তুত এবং দেওঘর স্কুলের হেডমাষ্টার আমাদের বন্ধু বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু ও গিরিডি দাসাশ্রমের সেবকগণ তথাকার স্থানাদির বিষয়ে কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতে পারিবেন এবং পরে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া স্থান নির্ব্বাচনাদি ব্যাপার ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন করা যাইতে পারিবে। আশা করি, এই গুরুতর বিষয়ে দেশহিতৈষী বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

শ্রীরাজকুমার দাস।

বঙ্কিমচন্দ্র। ১।

(সমালোচনা)

"The great and good do not die, even in this world embalmed in books their spirits walk abroad."—*Smiles.*

ধর্ম্ম বা রাজনৈতিক জগতে মানবের বহুযুগব্যাপী বিশ্বাসের কোনও পরিবর্ত্তন করিতে হইলে এক একজন প্রচারকের আবশ্যক হয়; তাঁহারা সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে অন্ধ-বিশ্বাসে নিমজ্জিত মানবগণকে সম্বোধন করিয়া তাহাদিগের নিকট যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন যে, তাহাদিগের দীর্ঘ কালের বিশ্বাস সত্যের উপর স্থাপিত নহে, তাহা দৃঢ় হইতে পারে না; উন্নতি যখন জগতের আরাধ্য দেবতা, তখন তাহাদিগকে সেই উন্নতির আলোক লক্ষ্য করিয়া গভীর অন্ধকার হইতে অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহাদের এক একটি কার্য্যের স্মৃতি অনন্ত-কালের জন্য তাঁহাদের নামকে গিরিসম্রাটের উদয়রবি-রশ্মি-সমুজ্জ্বল চিরতুষার-মণ্ডিত মস্তকের মত উচ্চ এবং যশঃসমুজ্জ্বল করিয়া রাখে। সাহিত্যজগতে কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে এইরূপ প্রচারকের আবশ্যক হয়। সাহিত্য জগতে এই প্রচারকের গৌরব ধর্ম্ম বা রাজনৈতিক জগতে প্রচারকের গৌরব অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া মনে হয় না। এই সকল প্রচারক এক এক জন অবতার। ইঁহারা প্রতিভার অবতার, শক্তির অবতার, উন্নতির অবতার। ইঁহাদিগের কর্ম্মফলে জগতের সুখ সম্পদ বর্দ্ধিত হয়; চিরদুঃখকাতর মানব-হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র সেইরূপ অবতার।

প্রতিভার অবতার কর্ম্মযোগী বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষায় এক নূতন জীবন দিয়া গিয়াছেন। নির্ম্মাণকার্য্যে তাঁহার প্রতিভার কতকাংশ এবং এই প্রাণদান কার্য্যে তাহার অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন প্রভৃতি বঙ্গভাষা নির্ম্মাণের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন; বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি তাহাই পরিষ্কৃত করিয়া, সেই শিলাখণ্ড হইতে মূর্ত্তি বাহির করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পায় নাই। তিনি এই মূর্ত্তিতে জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। সেই জন্য বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান বড় উচ্চ। সাহিত্যের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধ কয় ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, আমরা পৃথক পৃথক ভাবে সে সকলের আলোচনা করিব।

ভাষা।—বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থানে বলিয়াছেন,—"অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর, সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলোপধায়িনী।" ফরাসী কবি ও দেশহিতৈষী মহাত্মা হুগো এক স্থানে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন,—"জগতের ভবিষ্যতে তরবারি নাই, পুস্তক।" সাহিত্য সেবকদিগের এই কথা বড় মূল্যবান্। বর্ব্বরতার মহান্ধকারের মধ্যে সভ্যতার আলোক প্রকাশের পর সভ্যজগতে যত কিছু মহদনুষ্ঠান বাক্যবলেই সাধিত হইয়াছে। অস্ত্রবল বাক্যবলের নিকট দাসের মত কার্য্য করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অস্ত্রবল অপেক্ষা গুরুতর বাক্যবল ছিল; তাঁহার মধুর ভাষার মোহিনী শক্তিতে পাঠক মাত্রেই মুগ্ধ। তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার প্রধান সহায় ভাষা। কোথাও তাহা জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত বসন্তের নীলাম্বরতলে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালার মৃদু মৃদু আন্দোলিতবক্ষ স্রোতস্বতীর মত বহিয়া গিয়াছে, অপ্সরা-কণ্ঠ সমুদ্ভব গীতির মত সেই কুলুকুলু মৃদুনাদ মধুর; আবার কোথাও তাহা "বর্ষাবারি প্রমথিতা" পরিপূর্ণা স্রোতস্বতীর মত বৃক্ষ লতা তৃণ সুশোভিত বেলাভূমি ভগ্ন করিয়া কল কল নাদে ছুটিয়াছে; কোথাও তাহা বাত্যাবিরল হিমঋতুতে তলতীরহীন সাগরের শান্তছবি; কোথাও তাহা উত্তাল তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ ফেনিল জলরাশির ক্রীড়াভূমি সাগর। কোথাও তাহা জীমূত গর্জ্জনের মত অসীম অম্বর প্রতিধ্বনিত করে; কোথাও তাহা অপ্সরানূপুর নিক্বণের মত কর্ণে আসিয়া মিলাইয়া যায়। তাঁহার উপন্যাসে এক ভাষা, তাহা মধুর কিন্তু তত গভীর বা গম্ভীর নহে, তাঁহার প্রবন্ধে এক ভাষা তাহা গভীর এবং গম্ভীর; আর এক ভাষা তাঁহার মহাগ্রন্থ "সাম্য" পুস্তকে, তাহা তীব্র, জ্বালাময়ী এবং তেজস্বিনী; আর এক ভাষা সেই বিদ্রূপময় "লোক রহস্য" ও "কমলাকান্ত" পুস্তক দ্বয়ে; তাহাও তেজস্বিনী কিন্তু বিদ্রূপপ্রবল। সাহিত্য সাম্রাজ্যে তাঁহার সিংহাসন দৃঢ় করিবার প্রধান সহায় তাঁহার সেই ভাষা—তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার দাস সেই আশ্চর্য্য ভাষাকৌশল। কোথাও তাহা কুণ্ঠিত নহে।

উপন্যাস।—বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁহার উপন্যাস গুলিই সাধারণের বড় প্রিয়। বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেগুলি পাঠ করে। যাহারা তাঁহার মহাগ্রন্থ "সাম্য" ও "কৃষ্ণ চরিত্রে"র নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করে নাই, তাহারাও তাঁহার উপন্যাস গুলি সযত্নে পাঠ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়; যেমন

সেগুলির ভাব তেমনই সেগুলির ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাস দোষ-শূন্য নহে, তাহারা প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসও নহে। কেন তাহাই বলিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র কোন প্রবন্ধে বলিয়াছেন "কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি ক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অন্য অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই।" তাঁহার আপনার এই সৃষ্টি ক্ষমতা ছিল, তাই তাঁহার গ্রন্থের এত আদর। তিনি ঐন্দ্রজালিকের মত পাঠককে যাহা ইচ্ছা করিতেন তাহাই দেখাইতে পারিতেন। ইহার স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য, দণ্ড পুরস্কার, দেখাইতে পারিতেন; সৃষ্টিক্ষমতা তাঁহার ছিল, তাহারই জন্য-বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় যশোবান। কিন্তু তিনি আবার বলিতেছেন, "সৃষ্টিক্ষমতা মাত্রই প্রশংসনীয় নহে। অনেক ইংরাজী আখ্যায়িকা লেখকের রচনা মধ্যে নূতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাপি ঐ সকলকে অপকৃষ্ট গ্রন্থ মধ্যে গণনা করিতে হয়; কেন না ঐ সকল সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট নহে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট না হইলে কোন প্রশংসা নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি যে সর্ব্বত্রই স্বভাবানুকারী এমন কথা বোধ হয় বলিতে পারি না। তাঁহার উপন্যাসে মানব চরিত্র বিশ্লেষণের অসীম ক্ষমতা দৃষ্ট হয় কিন্তু সময় সময় তাঁহার সৃষ্টি স্বভাবানুকারী নহে। বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ তাঁহার স্বপ্নাদিতে বিশ্বাস এবং সন্ন্যাসী প্রভৃতির অসীম ক্ষমতায় ভক্তিময় বিশ্বাস। যেখানেই তেজঃপুঞ্জ ধর্ম্মপ্রাণ কোন সন্ন্যাসী বা গুরুকে তিনি সম্মুখে দেখিয়াছেন, সেখানেই সাম্য মহামন্ত্রের প্রচারক আপনাকে যবনিকার অন্তরালে লইয়াছেন। সন্ন্যাসী বা গুরু যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন। এই সন্ন্যাসীর ক্ষমতায় দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহার "রজনী" নামক সুন্দর উপন্যাস খানির শেষভাগে অসম্ভবের ঘন স্নিগ্ধ ছায়া ঘনাইয়া আসিত না। "মৃণালিনী"র গুরুদেব অসীম ক্ষমতাপন্ন। "চন্দ্রশেখর"এ তিনি অলৌকিক ক্ষমতাবান, তিনি রহস্যময়; তাঁহার এক স্থানের কার্য্যকে সমর্থন করিতে যাইয়া গ্রন্থকার চতুরভাবে একটি অধ্যায়ের নাম দিয়াছেন "যোগ বল না Psychic Force?" পাছে কেবল যোগবল বলিলে কেহ বিশ্বাস না করে তাই এ নামকরণ। "সীতারাম"এ জয়ন্তীর ক্ষমতা সাধারণ মানবের ক্ষমতাপেক্ষা অধিক। "রজনী"র বিজ্ঞাপনে তিনি আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে ঐ গ্রন্থে "অনৈসর্গিক বা অপ্রকৃত" ব্যাপার আছে।

তথাপি সন্ন্যাসীর জন্য তিনি পথ পরিষ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থেই তিনি এই সকল অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মানবগণের অবতারণা করিয়াছেন।

আর বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ বৈচিত্রময় হইলেও তাহার শেষ এক। স্রোতস্বতী যেখান হইতে উৎপন্ন হউক, যত জনপদের মধ্য দিয়া যাউক, সে সাগরে পতিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে যত চরিত্র বা ঘটনা বৈচিত্র প্রদর্শিত হউক না প্রেম তাহার প্রধান অঙ্গ, মেরুদণ্ড। "দুর্গেশনন্দিনী" হইতে "রাজসিংহ" পর্য্যন্ত সেই এক তান। রজনী ত কণ্ঠস্বরেই মজিল। "দেবী চৌধুরাণী" ও "সীতারাম" তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ক উপন্যাস কিন্তু সে দুইখানিও প্রেমপ্রবণ। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লের জন্য পাগল, শ্রীর জন্য সীতারামের সকল গেল—অবশ্য সীতারামের বাসনা ব্রজেশ্বরের বাসনা অপেক্ষা হীন। "রাজসিংহ"ও প্রেমপ্রবণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে দোষ আছে তাহা স্বীকার করিয়াছি; কিন্তু গুণের কাছে তাহা নিতান্ত সামান্য "শুষ্ক বদরীর মত ক্ষুদ্র।" তাঁহার উপন্যাস "সাগরবৎ, হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ, দুরন্ত রাগদ্বেষ ঈর্ষাদি বাত্যাসন্তাড়িত, ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল উর্ম্মি-লীলা—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার বৃক্ষরাজি, ইহার মৃদুগীতি সাহিত্য সংসারে দুর্ল্লভ।" বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্য চিত্রকর। হইতে পারে তিনি উপন্যাস রচনার আদর্শ কেবল ইংরাজীতে নহে বাঙ্গালাতেও পাইয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র বঙ্গভাষায় উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরবের একবিন্দুও হানি হয় নাই। বরং আলালী বাঙ্গালা লইয়া তাঁহার বিপদ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ভাষা গঠনের সময় তাঁহাকে কেবল পণ্ডিতী নহে, পণ্ডিতী ও আলালী এই উভয় প্রকার বাঙ্গালার মধ্যে যাইতে হইয়াছিল। একদিকে সেই সন্ধিসমাসসঙ্কুল সংস্কৃত-প্রধান জটিল ভাষা, আর একদিকে সেই গাম্ভীর্য্যবিরহিত সাধারণের ব্যবহৃত গ্রাম্য ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা এতদুভয়ের মধ্য হইতে সার বাছিয়া বাহির করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তিনি ভাষাকে যেখানে যেরূপ আবশ্যক সেখানে সেইরূপ করিয়াছেন—বঙ্গভাষায় আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শিত করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চ।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলিকে কয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—সাধারণ—দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা।

সৌন্দর্য্য বিষয়ক—মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, রজনী, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল ও ইন্দিরা।

জাতীয় ভাব বিষয়ক—আনন্দমঠ।

ধর্ম্মভাব বিষয়ক—দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম।

ঐতিহাসিক—রাজসিংহ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় দাসাশ্রমের আর একটি মাস চলিয়া গেল। নিম্নে আতুরগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল :—

১। দামো, ২। তিতুরাম, ৩। টোকানি, ৪। দেবীয়া, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। শিবু, ৭। ফুলকুমারী, ৮। স্বর্ণ, ৯। কৃষ্ণপ্রসন্ন ইহারা সকলেই এক প্রকার কুশলে আছে।

১০। দুর্গামণি—বার্দ্ধক্যবশতঃ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ করিবে।

১১। রামজি—ইহার অবস্থাও ভাল নহে।

১২। বাবুরাম—সারিয়া উঠিয়াছে। তাহার ধর্ম্মপিতা বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট হইতে ৫৲ পাঁচটী টাকা চাহিয়া লইয়াছে। তাহার ইচ্ছা,—তাহার আরোগ্য উপলক্ষে ভগবানের নামে আতুরদিগকে একদিন ভাল করিয়া খাওয়াইবে। টাকা জমা আছে।

দানপ্রাপ্তি।

(২৪শে মার্চ্চ হইতে ২৩শে এপ্রেল পর্য্যন্ত)

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত দানগুলি বিগত মাসে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান পরদুঃখ কাতর দাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ।৹, বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ১।৹, নবাব সৈয়দ আব্দুল সেত্তান চৌধুরী মার্চ্চমাসের চাঁদা ১৲ 86, Harrision Road 1st floor mess ।৶, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা চৈত্র মাসের চাঁদা ॥৹, রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুরের শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার পুত্র বাবু জ্ঞানাভিরাম বড়ুয়া ১০৲, নাবালক শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ রায়চৌধুরীর বিবাহ উপলক্ষে ১০৲, Mr. S. Kattya Naidu ৩৲, বাবু গোপালচন্দ্র সাহা ।৹, বাবু কামিনীকুমার গুহ মার্চ্চ মাসের চাঁদা ১৲, বাবু আশুতোষ মিত্র ১৲, বাবু অন্নদা মুখোপাধ্যায় ৶৹, কোন হিন্দু মহিলা ১৲, সরকার্স ডিবেটিং ক্লাব হইতে বাবু চারুচন্দ্র মুখার্জি কর্ত্তৃক সংগৃহীত :—বাবু যতীন্দ্রনাথ বসু ।৹, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ মুখো ॥৹, বাবু রসগুণাকর মিত্র ॥৹, A friend ২৲, বাবু সদয়াচরণ মিত্র M. A. B. L ৪৲, বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ ১৲, বাবু রাধাকান্ত দত্ত বাঁকীপুর ২৲

বাবু দামোদর পাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১৷৷৹, শ্রীমতী শশীমুখী দাস গুপ্তা ৷৷৹, বাবু রামযাদব মৈত্র ১৻, বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৻, বাবু মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৵৹, বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগ্‌ছী ৵৹, M. B, J ১৲, বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু শশীকুমার বন্দো ৷৷৹, A friend ৷৹, একজন হিতৈষী ৷৷৹, বাবু হরসুন্দর মজুমদার ২৲, বাবু বিষ্ণুচরণ বসু ১৻, গণেশ রামা ৸৫, শিলিগুড়ি বাজার হইতে সংগৃহীত ১৵৹, মুন্সী আলীয়ার রহমান ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র মার্চ্চ মাসের চাঁদা ১৻, জনৈক বন্ধু মাঃ বাবু রামানন্দ চট্টো ২৻, বাবু তেজচন্দ্র বসু মার্চ্চ মাসের চাঁদা ৷৷৹, Mr. N. K. Bose ঐ মাসের চাঁদা ১৲, Mr. P. C. Dutt ১৻, Mr. S. D. Ray ১৻, বাবু যতীন্দ্রমোহন কুমার ১৻, বাবু প্রহ্লাদচন্দ্র পাল ২৻, বাবু এককড়ি সিংহ রায় মাসীর আদ্যশ্রাদ্ধে ১৻, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র রায় ১৻, D. N. Bose Esq. ৷৷৹ বাবু হারানচন্দ্র বন্দো মার্চ্চ মাসের চাঁদা ১৻, বাবু বিপিনবিহারী ধর ৸৹, বাবু কেদারনাথ দাস মার্চ্চ মাসের চাঁদা ৷৹, K. C. Ghosh Esq. ১৲, গোপালচন্দ্র বন্দো ১৸৵১৹, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী চৈত্র বৈশাখ মাসের চাঁদা ২৻, জনৈক বন্ধু মাঃ শ্রীগোপাল বাবু ৷৵৹, বাবু দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় ১৻, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ১৻, বাবু রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৷৷৹, একজন হিতৈষী ৷৷৹, A Friend ৵৹, বাবু রোহিণীরঞ্জন সেন ৷৹, বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ ১৲, বাবু রাসবিহারী মজুমদার ৷৹, মুন্সী আব্দুল রহমান ২৻, মুন্সী রহিম বক্‌স পেস্কার ২৻, A Friend /৹, একজন হিতৈষী ৷৹, A Friend ৵৹, বাবু আনন্দচন্দ্র রাহুত ৷৹, মুন্সী এনাৎ উল্লা ২৻, একজন হিতৈষী৷৹, বাবু রামকুমার চক্রবর্ত্তী ২৻, বাবু অন্নদাচরণ গুপ্ত ১৻, বাবু সর্ব্বেশ্বর নাথ ৷৷৹, মুন্সী আব্দুল গফুর ৷৷৹, বাবু অক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু হরিশ্চন্দ্র লাহিড়ী ১৻, বাবু বরদাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ১৻, বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ ৷৹, বাবু আশুতোষ প্রামাণিক ১৲, বাবু হীরালাল মণ্ডল ১৻, শ্রীমতী গোপেশ্বরী সেন গুপ্তা ১৻, বাবু গুরুচরণ বসু ও বাবু নিবারণচন্দ্র ঘোষ ৷৷৹, বাবু যোগেশচন্দ্র রায় ৷৹, বাবু শরৎচন্দ্র শীল ৷৹, বাবু ইন্দুভূষণ ঘোষ ৷৹, নীলফামারী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ৩৷/৫, ডাঃ আনন্দচন্দ্র সেন ১৻, বাবু গোপালচন্দ্র মুখো ১৻, ডাঃ হরিনাথ সিংহ ১৲, বাবু বিশ্বেশ্বর সেন উকীল ১৲, বাবু প্রসন্নকুমার সেন ৶১৹, বাবু মতিলাল হালদারের কোন আত্মীয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে, সেই আত্মীয়ের পুত্রগণ ১৫৻, শ্রীমতী শৈলবালা সেন গুপ্তা ১৻, শ্রীমতী মহামায়া দাসী ১৲, বাবু গুরুচরণ মহলানবীশ ৵৹, বাবু শ্যামাচরণ হাজরা ১৻, বাবু নগেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৻, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষাল ৷৷৹, বাবু নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৲, বাবু সাতকড়ি চট্টো বাঁকীপুর ১৵৹, ডাঃ যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ ১৲।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

চাউল বিক্রয় ৩৻১৫, কম্বল বিক্রয় ১০৲, দাসী হইতে প্রাপ্ত ৩৶২৷৷, পুস্তক বিক্রয় ৷৷/৹, মিষ্টিকুমড়া বিক্রয় ৵১৹, উদ্বৃত্ত জমা ৷৷৹।

বস্ত্রাদি। কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু তিন বারে কতকগুলি কাপড় ও বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ মিষ্টি কুমড়া ১।

ইহা ছাড়া আমরা যথেষ্ট পরিমাণে মুষ্টি ভিক্ষাও পাইয়াছি।

আয়।

দানপ্রাপ্তি ১২৮৷৵১০, অন্যান্য প্রকারে আয় ১৭৷৵৭৷, বিগত মাসের জের ৩৶১৭৷৹, মোট আয় ১৫০৻১৫।

ব্যয়।

গিরিডি সেবালয়ে প্রেরণ ৯১৻, আদায় কারীর ব্যয় ১৫৶১৫, পার্শ্বেল ব্যয় ১৷৵১৫,হাওলাৎ কর্ম্মচারী ১০৻, রেবতী বাবুর সংগৃহীত টাকা ফেরত ২৻, ডাক ব্যয় ৷১০, ট্রাম ভাড়া ৵১০, হাওলাৎ বনমালী বাবু ৻১৫, ভিখারী ৻১০, প্রেক ৻৫, মোট আয় ১২১৷/০।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ১৫০৻১৫, মোট ব্যয় ১২১৷/০, হস্তেস্থিত ২৮৷৵১৫।

গিরিডির আয় ব্যয়।

মোট জমা।

মণি-অর্ডার ৯০৲, বাবু গোষ্টবিহারী কুণ্ডু মার্চ্চ মাসের চাঁদা ১৻, মাঃ বাবু ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৻, বাবু প্রতিভারঞ্জন রায় /০ একজন সেবালয় দর্শক ৵১০, গত মাসের জের ৫৷২৷ মোট জমা ১০৪৶১২৷।

মোট খরচ।

সংসার খরচ ৩২৷৵০, কর্ম্মচারীর বেতন ৩৭৷/১০, বাড়ী ভাড়া ১৮৻, গোয়ালা ৪৲, ব্যারামের অতিরিক্ত খরচ ৮৻, ধোপা ৷০, বাজে খরচ ।০, মোট ব্যয় ১০১৻১০।

মোট আয় ব্যয়।

মোট জমা—১০৪৶১২৷, মোট ব্যয়—১০১৻১০, হস্তেস্থিত—৩৶২৷।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। মার্চ্চ মাসের 'দাসী'র বিজ্ঞাপন স্তম্ভে যে সকল এজেণ্টের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া বাবু রজনীকান্ত দাস মাণিকদহে, এবং বাবু নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক কলিকাতায় দাসী ও দাসাশ্রমের এজেণ্টের কার্য্য করিবেন।

২। গ্রাহকগণ এজেণ্টগণের নিকট হইতে আমার স্বাক্ষরযুক্ত মুদ্রিত রসিদ গ্রহণ করিয়া টাকা দিবেন। তাহার ব্যতিক্রম হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৩। কেহ যদি কাগজ না পান, তবে ইংরেজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন। নতুবা আমরা দায়ী হইব না।

৪। কাহারও কোন জিজ্ঞাস্য থাকিলে, তিনি যেন রিপ্লাই কার্ডে বা টিকিট-সহ পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর দিতে বাধ্য হইব না।

২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
দাসী ও দাসাশ্রম কার্য্যালয়
কলিকাতা

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস
কার্য্যাধ্যক্ষ।

দাসী
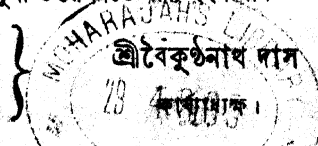
ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে।

আমাদের বাড়ীর নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরের এক সময়ে কূলপ্লাবন করিয়া জলস্রোতঃ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার ভাঁটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটী গতিপরিবর্ত্তনশীল চৈতন্যময় জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছাড়িয়া পড়িয়া, কুলুকুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত, এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখন মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে, ইহাতো কখনও ফিরে না; তবে এই অনন্তস্রোতঃ কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ"?—নদী উত্তর করিত, "মহাদেবের জটা হইতে"। তখন ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত।

তাহার পর, বড় হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়াছি, তখনই সেই চিরাভ্যস্ত কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্ব্ব-কথা শুনিতাম—"মহাদেবের জটা হইতে!"

একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্মপরিচিত, বাৎসল্যের বাস মন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল? যে যায়, সে তো আর ফিরে না; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই

কি জীবনের পরিসমাপ্তি ? যে যায়, সে কোথা যায় ? আমার প্রিয়জন আজ কোথায় ?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "মহাদেবের পদতলে"।

চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ, নদি ?" নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে।"

এক দিন আমি বলিলাম, "নদি, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি! বাল্যকাল হইতে এপর্য্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তি-স্থান দেখিয়া আসিব।"

শুনিয়াছিলাম, উত্তর-পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া, বহুগ্রাম জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কূর্ম্মাচল নামক পুরাণ-প্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূনদীর উৎ-পত্তি স্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুল গিরিগহন লঙ্ঘন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহ দ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, "এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজত-সূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে, উহাই বহুদেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী, কূল-প্লাবিনী স্রোতস্বতী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে, এই সূক্ষ্ম সূত্রের আরম্ভ কোথায়।"

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সম্মুখে দেখ! জয় নন্দাদেবী! জয় ত্রিশূল!"*

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পর্ব্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখের আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্ত প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলস্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষারমূর্ত্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটী গরীয়সী রমণীর ন্যায়। মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহুজীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্ত্তি সেই মাতৃ-রূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহারই অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া, মেদিনী বিদারণ পূর্ব্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে, সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তের আয়ুধ, সাকাররূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী, তাহা পরে বুঝিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, "সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে; উহা অতীব দুর্গম; দুই দিন চলিলে পর তুষার-নদী দেখিতে পাইবে।"

সেই দুই দিন বহুবন ও গিরি সঙ্কট অতিক্রম করিয়া, অবশেষে তুষার-ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটী সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এপর্য্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদুগীতি এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতে-ছিল, সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্ম্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে;যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ!" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিক খনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী; বহুদূরপ্রসারিত সেই পর্ব্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্য্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে।

---

* কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষার শিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

শিখর-তুষার নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষার-নদীর উপর দিয়া উর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবল গিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময় পর্ব্বত দেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তর স্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তর স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত উর্দ্ধে উঠিতেছি বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের * সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে হতচেতনপ্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম, সমগ্র পর্ব্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জল-প্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলু-মুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই সঙ্গে পারিজাত বৃক্ষ সকল স্বতঃ পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক্ আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল তুষার-পর্ব্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে, তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূম্ররাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষার কণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানস-চক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায়

* তুষার ক্ষেত্র জাত এক প্রকার সুগন্ধ গুল্ম বিশেষ।

উৎসে প্রত্যাবর্ত্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতেছি, হিমানুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্রনিনাদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষার-শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষার-শয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করি।"

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্য অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে, অনায়াসে সেই পর্ব্বত ভার বহিয়া নিয়ে চলিল। কোন পথ ছিল না, পতিত পর্ব্বত খণ্ডের ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল,—উপত্যকা রচিত হইল। পর্ব্বতগাত্রে ঘর্ষিত হইতে হইতে উপলস্তূপ চূর্ণীকৃত হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি, তাহার উভয়তঃ তুষারবাহিত প্রস্তর খণ্ড রাশীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্ব্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশ অতিবর্ত্তনপূর্ব্বক বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে।

পথে একস্থানে উভয়কূলস্থ দেশ মরুভূমি প্রায় হইয়াছিল। নদী তট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্ব্বতের অস্থিচূর্ণ সংযোগে মৃত্তিকার উর্ব্বরা শক্তি বর্দ্ধিত হইল। কঠিন পর্ব্বতের দেহাবশেষ দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যাম দেহ নির্ম্মিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে ধরণী ধৌত করিতেছে, এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্য চক্ষুর অগোচরে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে।

সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্ব্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভগ্ন করিতেছে।

জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি স্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া

আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদগাররূপে প্রকাশ পাইতেছে; সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে; উন্নত ভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নমিত হইয়া নূতন মহাদেশ নির্ম্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্য্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ইহারা ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝাবলে পর্ব্বতশিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটাজাল মধ্যে আশ্রয় লইবে; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্ব্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পাতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই!

এখনও ভাগীরথী-তীরে বসিয়া তাঁহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না।

'নদি, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ', ইহার উত্তরে এখন সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই—

"মহাদেবের জটা হইতে।"

ইংলণ্ডীয় সভ্যতা।

ইংলণ্ড সভ্য দেশ, ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু কি কি উপকরণে ইংলণ্ডের সভ্যতা গঠিত, তাহা কি আমরা চিন্তা করিয়া থাকি? এই বিষয়টী আমাদের চিন্তা করা উচিত; কেননা, আমরা সর্ব্বদাই ইংলণ্ডের সভ্যতার অনুকরণে ব্যস্ত, সভ্যতা ভ্রমে যদি অসভ্যতার অনুকরণ করিয়া ফেলি, তবে বড়ই বিপদের সম্ভাবনা। এই প্রবন্ধে ইংলণ্ডের সভ্যতার কয়েকটী উপকরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম। ইংরেজজাতি অত্যন্ত বিনীত ও শিষ্টাচারী; এইটী তাহাদের সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ। আমরা যে সকল ইংরাজ এদেশে দেখিতে পাই, তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া ইহা ধারণা করা কঠিন; কিন্তু যাঁহারা বিলাতে গিয়াছেন তাঁহারা ইংরেজ জাতির শিষ্টাচার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। শৈশবকাল হইতেই বাপ মায়ের নিকট হইতে ইংরাজেরা শিষ্টাচারের নিয়ম সকল শিক্ষা করিয়া থাকে। বিলাতে একটী বালকের মধ্যে যে প্রকার

শিষ্টভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশের অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকের মধ্যেও তাহা নাই। কি প্রকারে একজন ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে হয়, কি বলিয়া একজনকে অভ্যর্থনা করিতে হয়, এই সকল ইংরেজ বালক বালিকারা অতি সুন্দররূপে শিক্ষা করে। কথাবার্ত্তায় মধ্যে বিনীতভাব, কাহারও কথায় কর্কশভাবে প্রতিবাদ না করা, প্রতিবাদ করিতে হইলে ক্ষমা প্রার্থনা করা, এই সকল ইংরেজ জাতির চরিত্রগত সদ্‌গুণ। এমন কি ইংলণ্ডে চাকর চাকরাণীকে পর্য্যন্ত কোন প্রকারে অবজ্ঞা করা নিন্দনীয়। তাহাদিগের নিকটেও বিনীতভাবে কথা কহিতে হয়। কোন একটী আদেশ প্রতিপালন করিলে ধন্যবাদ দিতে হয়, এটী বড়ই সুন্দর ভাব। আমরা চাকর চাকরাণীকে কতই মনঃপীড়া দেই, তাহারা গরিব বলিয়া অন্নের দায়ে আমাদের অধীনে কাজ করিতে আসে; আর তাহারা যে মানুষ, আমাদের মত তাহাদেরও সুখ দুঃখ বোধ আছে, ইহা আমাদের যেন জ্ঞানই থাকে না। ভারতবর্ষীয় ইংরাজদেরত কথাই নাই, তাঁহারা চাকরদিগকে নৃশংস ভাবে কতই না পাদুকা প্রহার ও বেত্রাঘাত করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে আর একটী ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি, সেখানে বৃদ্ধ ও যুবকের সম্বন্ধ আমাদের দেশ হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। আমরা মনে করি বৃদ্ধের নিকটে মন খুলিয়া গল্প করা কি আমোদ করা বেয়াদবী; কিন্তু বিলাতে তাহা দেখা যায় না; বৃদ্ধ ও যুবকের মধ্যে বেশ সখ্যভাব। যুবকই যে কেবল বৃদ্ধের নিকট বিনীত আর বৃদ্ধ যুবকদের নিকটে উদ্ধত হইবেন, ইহা সেখানে দেখা যায় না। বিলাতে শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পর ব্যবহার চিন্তা করিলে এই ভাবটী আরও পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। শিক্ষক সর্ব্বদাই রুদ্রমূর্ত্তি আর ছাত্র ভয়ে বিকম্পিত, এটী বিলাতে খুবই কম। ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ সখ্যভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষক যেমন ক্লাসের বাহিরে আসিলেন, অমনই ছাত্র ও শিক্ষক পরস্পরের বন্ধু, উভয়ে সমভাবে কথা কহিবার অধিকারী। ছাত্রদের প্রতি শিক্ষক মহাশয়দিগের শিষ্ট ও বিনীতভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। একজন শিক্ষকের বাড়ীতে যদি যাওয়া যায়, তবে তিনি অন্য দশজন ভদ্রলোককে যে প্রকার সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন, ছাত্রকেও ঠিক্ সেইরূপ করিয়া থাকেন, এমন কি বসিবার জন্য ভাল আসন খানা ছাড়িয়া দেন্। আমি সর্ব্বপ্রথমে যেদিন প্রফেসার কল্‌ডারউডের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে দেখা করিতে গেলাম, তিনি যে প্রকারে আমাকে অভ্যর্থনা

করিলেন, আমি দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। একখানা ভাল আসনে বসাইয়া অত্যন্ত বিনয় ও সদ্ভাবের সহিত আলাপ ত করিলেনই; তারপর আমি যখন উঠিয়া আসি তিনি সঙ্গে সঙ্গে সদর দুয়ার পর্য্যন্ত আসিলেন এবং আমার বড় কোট্‌টা গায়ে পরাইয়া দিলেন। তিনি যে আমাকে নূতন লোক পাইয়া এইরূপ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; আমি তারপর যতদিন তাঁহার বাড়ী গিয়াছি, প্রতিদিনই তিনি ঐরূপ করিয়াছেন। যাঁহারা শিক্ষিত লোক, কেবল তাঁহাদের মধ্যেই এই বিনয় ও শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে;—ইতর ও সাধারণ লোকের মধ্যেও ইহা বেশ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ লোকেরা রাজপথে দাঁড়াইয়া অসভ্য ভাষায় পরস্পরের সহিত গালাগালি করিতেছে, ইহা বিলাতে খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়। মদ খাইয়া যখন মাতাল হয়, তখনই ঐরূপ করে। অনেকে মনে করেন যে ইংরাজের যে শিষ্টাচার, এটা কেবল বাহ্যিক এবং অনেক পরিমাণে কপটাচার। আমি এই মতে সম্পূর্ণ সায় দিতে প্রস্তুত নই। শিষ্টাচার যাহাদের মজ্জাগত হইয়াছে, তাহাদের নিকটে উহা আর বাহ্যিক কি করিয়া হইতে পারে? অবশ্য ভদ্রতার খাতিরে অনিচ্ছা সত্বেও অনেক সময় অনেকে শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ উহাকে কপটাচার অথবা Artificial বলিয়া নিন্দা করা অন্যায়। আমরা যখন বিলাতে যাই এবং যাইয়া যখন ইংরাজী সভ্যতা নকল করিতে থাকি, তখন তাহা কপটতা ও Artificial; কেন না আমরা ত আর শৈশবকাল হইতে ঐভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসি নাই। আমরা অনেক সময়েই আমাদের নিজের মনের অবস্থা দ্বারা বিচার করি বলিয়াই ঐরূপ নিন্দা করিয়া থাকি। ইংলণ্ডে একজন লোককে ভদ্র হইতে হইলে, M. A., B. A. পাশ ও কতকগুলি অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত আরও কিছু করিতে হয়। তাহাদের শিষ্টাচারী হওয়া দরকার। আমরা ত অনেকেই M. A., B. A. পাশ করিয়া থাকি কিন্তু কয়জন শিষ্টাচার শিক্ষা করি? একজন লোকের সঙ্গে ভাল ভাবে কিরূপে কথা কহিতে হয়, তাহা আমরা অনেকে জানি না। এই শিক্ষা স্কুল কলেজে হওয়া অসম্ভব। ইহা গৃহের শিক্ষা, বাপ্ মায়ের কাছে এ শিক্ষা পাইতে হয়। আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াও যে সভ্য হইতে পারি নাই, তাহা ধরা পড়ে। যখন আমরা একজন ইংরাজের সংসর্গে যাই, তখনই বুঝিতে পারি, আমাদের কত অভাব রহিয়াছে।

দ্বিতীয়। আমরা যদি এই শিষ্টাচারের গূঢ় কারণ জিজ্ঞাসা করি, তবে বলিতে হইবে, ইংরাজের স্বভাবজাত স্বাধীনতাপ্রিয়তাই ইহার মূল কারণ। স্বাধীনতা কাহাকে বলে? নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান। সেই সম্মানই অন্যের ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে শিক্ষা দেয়। আমি যে একটা মানুষ এবং আমার জীবনের যে একটা মূল্য আছে, এই বোধ যদি না থাকে, তবে অন্যকে প্রকৃত ভাবে সম্মান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেক ইংরাজই অল্লাধিক পরিমাণে আপনার জীবনের মূল্য বুঝেন এবং তদ্দ্বারাই আপনার প্রতিবাসীকেও সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন। ইংরাজ জাতি যে স্বাধীনতাপ্রিয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। স্বাধীনতা ইংরাজসমাজে সভ্যতার আরেকটী উপকরণ। বাঙ্গালীরা বিলাতে যাইয়া যে এত সুখ অনুভব করেন, তাহার প্রধান কারণ আমার মনে হয় এই যে তাঁহারা সেখানে স্বাধীনতার বায়ু সেবন করিয়া বিমলানন্দ অনুভব করেন। সেখানে বাঙ্গালী ও ইংরাজে পার্থক্য নাই। আমি ও আমার ইংরাজ বন্ধু দুই সমান; আমাকে কোন ইংরাজের হস্তে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয় না। আমার সঙ্গে সকলেই ভদ্র ও শিষ্টভাবে কথা কহেন, আমিও তখন আমার জীবনের মূল্য কতক পরিমাণে অনুভব করি। ভারতবাসীদের বিলাতে যাওয়া যে কর্ত্তব্য, তাহার প্রধান কারণ এই যে সেখানে তাঁহারা আত্মমর্য্যাদা শিক্ষা করিতে পারেন। দেখিয়া অবাক্ হইতে হয় যে ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মানের ভাব ইংলণ্ডে এতই প্রবল যে, তদ্ধেতু জাতিগত বিদ্বেষ ও অসদ্ভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে। কোন অসভ্য বিদেশীয় লোক ইংলণ্ডে যাইয়া যেন ইংরাজ জাতির সঙ্গে এক হইয়া পড়ে। দেখিয়াছি যে আফ্রিকা ও আমেরিকা হইতে কাফ্রিগণও ইংলণ্ডে যাইয়া ইংরাজের সঙ্গে এক হইয়া যায়। ইংরাজ রমণীগণ তাহাদিগকে আপনাদের গৃহে স্থানদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন্ না। এই উদার ভাব এতই প্রবল যে অনেক ইংরাজ মহিলা কৃষ্ণকায় কাফ্রীদের পাণিগ্রহণেও কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন না। আমাদের দেশে জাতিভেদরূপ ভয়ানক অনুদারতা যে বিদ্যমান, তাহার কারণ এই যে জাতিগত বিভিন্নতা সত্বেও মানুষের মনুষ্যত্বকে আমরা সম্মান করিতে পারি না।

তৃতীয়। ইংলণ্ডের সভ্যতার তৃতীয় উপকরণ স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ও তাহাদের শিক্ষা। যে জাতিতে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান নাই এবং তাহাদিগকে

যথোপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না, সে জাতিকে ইংরাজেরা সভ্য বলিতে একেবারেই প্রস্তুত নয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে ইংরাজেরা ভারত-বাসীদিগকে সাধারণতঃ এত ঘৃণার চক্ষে কেন দেখেন? তাহার উত্তর এই যে, ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয় না। ভারতবাসীদের প্রতি ইংরাজের যে এই ভাব, তাহা ইংলণ্ডে না গেলে সম্যক-রূপ অনুভব করা যায় না। ইংলণ্ডবাসীরা ভারতবাসীদের সম্বন্ধে যদি কিছু জানে, তাহা স্ত্রীজাতির দুর্দ্দশা। সেখানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মনেই এই সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ। সেখানে যদি কোন অশিক্ষিত কৃষককেও জিজ্ঞাসা করা যায়,—"তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি জান?" সে নিশ্চয়ই বলিবে, "ভারতবর্ষ এমন এক দেশ যেখানে স্ত্রীলোকের প্রতি মহা উৎপীড়ন হইয়া থাকে।" দিবাবসানে কোন গৃহস্থ ইংরাজ দিবসের কার্য্য শেষ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করে এবং আপনার স্ত্রী পুত্র লইয়া অগ্নিকুণ্ডের সমক্ষে বসিয়া নানারূপ উপাখ্যান দ্বারা শ্রম নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যদি কোন এক ভারতবাসী লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করেন, তবে হয় ত শুনিবেন, কোন ভারতবর্ষীয়া দুঃখিনী বিধবার দুঃখ কাহিনী বর্ণিত হইতেছে—কি প্রকারে সে অনাথা হইয়া আত্মীয়-গণের অশেষ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া থাকে, অথবা কি প্রকার স্বামীর মৃত দেহের সহিত আপনার জীবন্তদেহ ভস্মসাৎ করে। ইংলণ্ডে অনেকে মনে করেন যে এখনও ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে যে স্ত্রীজাতির প্রতি বহুল সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সে বিষয়ের অধিক বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। আমাদের দেশে এমন শুভদিন কবে আসিবে, যে আমরা স্ত্রী জাতির যথার্থ সম্মান রক্ষা করিতে শিক্ষা করিব! কবে তাহাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত করিয়া আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বল করিব! ঈশ্বর করুন আমাদের দেশে ত্বরায় সেই শুভদিন আগমন করুক; এবং আমরা জগতের সমক্ষে সুসভ্যজাতি বলিয়া পরিচিত হই।

শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

তুকারাম।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

তুকারাম যেরূপে একজন প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষ বলিয়া খ্যাতি-লাভ করিতেছিলেন, পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার অকৃত্রিম সরলতা, ভগবন্নিষ্ঠা, জীবানুকম্পা প্রভৃতি গুণে এবং তাঁহার প্রদত্ত মধুর ধর্ম্মোপদেশের জন্ত তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বিশেষ-রূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতীয় অনেক ব্যক্তিও তাঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অমূল্য উপদেশ শ্রবণে অনেকেই সংসারের প্রতি আস্থাশূন্ত হইয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে গঙ্গাধর পন্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ও সন্তাজী নামক একজন তৈলিক, এই দুই জনই প্রধান। তুকারামের সংকীর্ত্তন ও কথকতার সময় ইঁহারা করতাল ও বীণা হস্তে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া ধ্রুবা (ধূয়া) ধরিতেন। গঙ্গাধর পন্তের উপর তুকারামের কবিতাদি লিখিবার ভার ছিল। কিন্তু সাধারণের নিকট এইরূপ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে তৎকালের ভাক্ত সাধুগণের নিকট তুকারামের প্রশংসা অতিশয় অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বর্দ্ধনে তাঁহাদিগের নিজের প্রতিপত্তি হ্রাস হইবার আশঙ্কায়, তাঁহারা তুকারামের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। "মম্বাজী বাবা গোঁসাই" নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রথম তুকা-রামের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তিনি দেহু গ্রামে এক মঠ সংস্থাপন করিয়া, সেখানকার "মোহান্ত" হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে "মম্বাজী বাবা মহাপুরুষ" বলিত। কিন্তু ক্রমশঃ সাধারণ লোক তাঁহার অপেক্ষা তুকারামের প্রতি সমধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করায়, তুকারাম মম্বাজীর বিষনয়নে পতিত হইলেন। মম্বাজী তাঁহাকে অপমানিত করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। পরিবার প্রতিপালনের ভার স্ত্রীর স্কন্ধে অর্পণ করিয়া তুকারাম বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে, অবলাইয়ের পিতা "আপ্পাজী" কন্তার প্রতি স্নেহবশতঃ সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে আপ্পাজী তুকারামকে একটি মহিষ প্রদান করিয়াছিলেন। বিঠোবার মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে মম্বাজীর একটি উদ্যান ছিল। দৈবক্রমে একদিন

তুকারামের মহিষ সেই উদ্যানের বেড়া ভাঙ্গিয়া তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক কতিপয় পুষ্পবৃক্ষ ভগ্ন করিয়াছিল। তদ্দর্শনে মম্বাজী ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে তুকারামের উদ্দেশে অজস্র কটুকাটব্য বর্ষণ করিলেন। কিন্তু তুকারামকে নিকটে না পাইয়া সেদিন আর অধিক কিছু করিবার সুবিধা পাইলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে আর এক ঘটনায় তুকারাম মম্বাজীর কোপে পতিত হইলেন। একদা সায়ংকালে একাদশী উপলক্ষে দেহুতে বিঠোবার দর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। মম্বাজী স্বীয় উদ্যানটিকে কণ্টক দ্বারা বেষ্টন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যানের কণ্টক বেষ্টনে দেব-দর্শনার্থিগণের প্রদক্ষিণ স্থান পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়াছে দেখিয়া, অন্ধকারে নবাগত দর্শনার্থিগণের পদে কণ্টক বিদ্ধ হইবার আশঙ্কায় তুকারাম স্বহস্তে সেগুলি উৎপাটিত করতঃ স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মম্বাজী পূর্ব্বাবধিই অবসর খুঁজিতেছিলেন। এক্ষণে তুকারামকে তাঁহার উদ্যানের কণ্টক বেষ্টন উৎপাটন ও ভগ্ন করিতে দেখিয়া একেবারে ক্রোধান্ধ হইলেন। তিনি কটু ভাষা উচ্চারণ করিতে করিতে তুকারামের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহারই উৎপাটিত কণ্টক যষ্টি দ্বারা তাঁহাকে অতি নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। একটির পর আর একটি করিয়া ১০।১৫টি কণ্টক-যষ্টি তুকারামের পৃষ্ঠে ভগ্ন হইলে মম্বাজী ক্লান্ত হইয়া প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন। তুকারাম অকাতরে ও নিঃশব্দে সমস্ত সহ্য করিলেন। মম্বাজীর প্রহারকালে তিনি মনে মনে কেবল নাম জপ করিতেছিলেন। গোঁসাইজী প্রহার কার্য্য সমাধা করিয়া মঠে প্রতিগমন করিলে তুকারাম মন্দিরে আগমন পূর্ব্বক বিঠোবার নিকট সমস্ত দুঃখ নিবেদন করিলেন। তুকারামের এইরূপ দুর্গতি দর্শনে সকলেরই নেত্র অশ্রুপূরিত হইল। তুকারামের জীবনের অনেক ঘটনা, তিনি তাঁহার অভঙ্গগুলিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত, তাঁহার পারিবারিক অবস্থা, তাঁহার নির্ভরশীলতা প্রভৃতি অনেক বিষয় তাঁহার অভঙ্গ হইতে অবগত হওয়া যায়। এই ঘটনারও উল্লেখ করিয়া তুকারাম ছয়টি অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটির মর্ম্ম মহীপতি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ;—"হে ভগবন্‌! বুঝিয়াছি, দুর্জ্জনের সান্নিধ্যে কিরূপে সাধুগণের মানসিক শান্তি অন্তর্হিত হইয়া অনিষ্টের উৎপত্তি হয়, তাহা দেখাইবার জন্যই তুমি আমাকে এই শিক্ষা প্রদান করিলে। এইবার হইতে দুর্জ্জনের সহবাস হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিবার চেষ্টা

করিব।" এই ঘটনায় রচিত অভঙ্গগুলির মধ্যে তিনটির অনুবাদ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "বোম্বাই চিত্র" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার দুইটি আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।*

প্রথম।

ছাড়িব না ছাড়িব না,
ছাড়িব না হে বিঠোবা তোমারি চরণ।
যতই যন্ত্রণা আসে,
আসুক কি করিবে সে,
না হয় হইবে মরণ॥
শস্ত্রধারী আসি কেহ,
খণ্ড করে যদি দেহ,
তবু নাহি ডরি।
তুকা বলে "সাবধান,
হোয়ে আছি আগুয়ান,
চিত্তে মোর শম গুণ ধরি॥"

দ্বিতীয়।

বেশ বেশ বড় ভাল, বিঠোবা হে ক'লে ভাল,
পাপে বয় বান।
ক্ষমাগুণ শেখাবারে, হানিলে এ দেহোপরে
কণ্টকের বাণ॥
কটু কাটব্য গালি, মোর পৃষ্ঠে দিলা ঢালি,
তাহে পাই প্রাণ—
তুকা বলে "কৃপা করি, সংহারিয়া ক্রোধ অরি,
দিলে পরিত্রাণ॥"

তুকারাম যে কিরূপ অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন, এই সকল অভঙ্গে প্রকাশিত তাঁহার হৃদয়ের ভাব হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। কঠোর নিগ্রহ ও সংযম দ্বারা তিনি যে তাঁহার শরীরকে বশীভূত করিয়াছিলেন, এত দিন পরে শত্রুকৃত নির্য্যাতন অম্লানমুখে সহ্য করাতে যেন তাহার সার্থকতা হইল। যাহা হউক প্রহার প্রাপ্ত হইয়া, তুকারাম গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, অবলাই তাঁহার অঙ্গবেদনা লাঘবের জন্য তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন; এবং তুকারাম কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইলেন। অবলাই স্বামীর সংকীর্ত্তনের ও একাদশী-নিমিত্ত হরিজাগরণের আয়োজন

* সত্যেন্দ্র বাবুর কৃত তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদগুলি এমনই সুন্দর যে তাহার নূতন অনুবাদ করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এই প্রবন্ধে সত্যেন্দ্র বাবুর অনুবাদই কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করিব। যে সকল অভঙ্গের সত্যেন্দ্র বাবু অনুবাদ করেন নাই, তাহারই নূতন অনুবাদ করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল।

করিয়া দিলেন। তুকারামের সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য সকলেই যথারীতি আগমন করিলেন। মম্বাজী বাবা তুকারামের প্রতি মনে মনে অতিশয় অসন্তুষ্ট থাকিলেও, লোক লজ্জার জন্য যথা নিয়মে তাঁহার সংকীর্ত্তনে আগমন করিতেন, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বশত সে দিন তিনি তুকারামের সংকীর্ত্তনে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তুকারাম তাঁহার জন্য কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া, তাঁহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। উত্তরে মম্বাজী বলিয়া পাঠাইলেন যে, "অদ্য আমার শরীর অসুস্থ; সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করিতেছে; সংকীর্ত্তনে যাইতে পারিব না।" ইহা শুনিয়া তুকারাম স্বয়ং তাঁহার মঠে গমন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "স্বহস্তে বহুক্ষণ যষ্টি প্রহার করাতে প্রভুর শ্রান্তি জন্মিয়াছে। আমি যদি আপনার উদ্যানের কণ্টকবেষ্টন উৎপাটন না করিতাম, তাহা হইলে আপনার রোষোৎপত্তি হইত না। সুতরাং আমিই সমস্ত অনর্থের মূল। প্রভু, নিজ গুণে আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিয়া কৃপা পুরঃসর সংকীর্ত্তন স্থলে আগমন করুন।" এই বলিয়া মম্বাজীর বেদনা উপশমের জন্য তুকারাম স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গমর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারামের এইরূপ ব্যবহারে মম্বাজী অতিশয় লজ্জিত হইয়া সংকীর্ত্তন স্থলে উপনীত হইলেন। তুকারাম মম্বাজীকে লইয়া সমস্ত নিশা সংকীর্ত্তনে যাপন করিলেন। এইরূপে তুকারাম সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিলেন। সেই দিবস হইতে মম্বাজী বাবা তুকারামের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। (১)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু,
বৈদ্যনাথ দেওঘর।

---

(১) মহীপতি বলেন যে দিন এই সকল ঘটনা ঘটে, সেই দিন রাত্রে কয়েক জন তস্কর তুকারামের মহিষটি অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। ভক্তবৎসল বিঠোবা ভয়ঙ্কর কালপুরুষ বেশে প্রকাণ্ড লগুড় হস্তে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করায় তাহারা মহিষ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। তথাপি কালপুরুষ তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া সংকীর্ত্তন স্থলে গমন পূর্ব্বক তুকারামের শরণাপন্ন হইল। তুকারাম তাহাদিগকে অন্তরের সহিত মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "তোমাদের যদি মহিষের আবশ্যক থাকে, আমার মহিষটি লইয়া যাইতে পার।" তস্করগণ মহিষপ্রার্থী হইতে সাহসী হইল না। তুকারামের গুণ গান করিতে করিতে প্রাণ লইয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মম্বাজী তুকারামের অচলা ভক্তি ও অসাধারণ মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি বৈরভাব পরিত্যাগ করিলেন।

জীবনোপায়।

রুশীয়া সাম্রাজ্যের কোন গ্রামে এক দরিদ্র চর্ম্মকার বাস করিত। সে কায়ক্লেশে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিগণের আহারসংস্থান মাত্র হইত; সুতরাং তাহার নিজের একখানা গৃহ নির্ম্মাণেরও সংস্থান ছিল না। গ্রামের এক কৃষক দয়া করিয়া স্বীয় আবাসগৃহের একাংশ ছাড়িয়া দেওয়াতে সাইমন তাহাতে বাস করিয়া পাদুকা নির্ম্মাণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

রুশীয়ায় শীতের প্রকোপ অতি ভীষণ; তথায় শীতবস্ত্রের পরিবর্ত্তে মেষচর্ম্ম নির্ম্মিত আঙ্গরাখা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দরিদ্র গ্রামবাসীরা আহারার্থ যে সকল মেষ হনন করিয়া থাকে, তাহাদের চর্ম্ম দ্বারাই আঙ্গরাখা প্রস্তুত করে; ইহাকে 'ওবা' কহে। সাইমনের গৃহে একটী মাত্র ওবা ছিল, তাহা তাহার বিবাহকালে উপহার প্রাপ্ত। বহুকাল ব্যবহৃত হওয়াতে তাহা ক্রমে গলিত ও পলিত হইয়া পড়িয়াছে। কিছু দিন হইতে তাহার ব্যবহারেরও সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে, কারণ কেবলমাত্র বহির্গমন কাল ভিন্ন আর কখনও কেহ তাহা ব্যবহার করিত না। সাইমন দরিদ্র বলিয়া তাহার গৃহে কদাপি মেষ হনন হইত না। কাজেই একটী নূতন ওবা প্রস্তুত করণার্থ তাহাকে চর্ম্ম ক্রয় করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কিছু দিন হইতে অর্থ সঞ্চয় করিতে হইতেছিল।

একদা সাইমন হিসাব করিয়া দেখিতে পাইল যে তাহার কয়েক জন গ্রাহকের নিকট যাহা প্রাপ্য হইয়াছে, তাহা একত্রে আদায় করিয়া লইতে পারিলে একটী চর্ম্ম ক্রয় করা যাইতে পারে। অতএব পরদিন প্রত্যূষে তাহার স্ত্রীর নিকট এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল যে সে পরবর্ত্তী গ্রামে স্বীয় প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহার্থ যাইতেছে; তাহা সংগৃহীত হইলে সেই দিনই নিকটবর্ত্তী সহরে গিয়া চর্ম্ম ক্রয় করিয়া রাত্রিতে গৃহ প্রত্যাগমন করিবে। সাইমনের কিঞ্চিৎ পানদোষ ছিল, এজন্য তাহার স্ত্রী তাহাকে বিশেষরূপ সাবধান করিয়া দিল যেন কোন কুলোকের সঙ্গ গ্রহণ না করে। স্বামীর রাত্রে বাড়ী ফিরিতে শীত লাগিবে বলিয়া সাধ্বী স্ত্রী নিজের অঙ্গাভরণটী স্বামীকে পরাইয়া তাহার উপর গলিত ওবাটী বান্ধিয়া দিল। নিজের হস্তে

যে দুইটী মাত্র 'রুবল' * সঞ্চিত ছিল, তাহাও স্বামীর হস্তে দিয়া বলিল যে সমস্ত সংগৃহীত অর্থ একত্র করিলে একটী উৎকৃষ্ট চর্ম্ম পাওয়া যাইবে। আবার কখন এমন সুদিন আসিবে তাহার ঠিক নাই, এখন সুবিধা মত একটী ভাল শুবা করিয়া লইতে পারিলে অনেক দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে। স্ত্রীর এইরূপ পরিণামদর্শিতাতে প্রীত হইয়া তাহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া সাইমন নিকটবর্ত্তী গ্রামের দিকে যাত্রা করিল।

ঐ গ্রামে এক গৃহস্থের নিকট পাদুকানির্ম্মাণ জন্য তিন রুবল এবং পাদুকাসংস্কার জন্য বিশ 'কোপেক' † প্রাপ্য ছিল। গৃহস্বামী বাড়ী না থাকাতে রুবল তিনটী পাওয়া গেল না; সাইমন কেবলমাত্র বিশটী কোপেক লইয়া বিদায় হইল। অপর এক গৃহস্থের বাড়ীতেও তিন রুবল প্রাপ্য ছিল, তাহাও পাওয়া গেল না; গৃহস্বামী গৃহে নাই, গৃহিণী বলিলেন স্বামী আসিলেই প্রাপ্য অর্থ পাঠাইয়া দিবেন। ইত্যবসরে জীর্ণসংস্কারার্থ স্বামীর এক যোড়া বুট জুতা দিয়া গৃহিণী সাইমনকে বিদায় করিলেন।

অর্থ সংগৃহীত না হওয়াতে একান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া সাইমন পথপ্রান্তে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া এই স্থির করিল, সহরে গিয়া দেখা যাউক যদি কোন চর্ম্ম বিক্রেতা দয়া করিয়া একটী শুবার উপযোগী চর্ম্ম বাকী মূল্যে তাহার নিকট বিক্রয় করে, তাহা হইলে যে দুইটী রুবল হাতে আছে তাহা এক্ষণে দিয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট মূল্য ২।১ দিবসের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে সহরের দিকে চলিতে লাগিল এবং অপরাহ্ণে এক চর্ম্মবিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইয়া উল্লিখিত প্রস্তাব করিলে পর চর্ম্মবিক্রেতা অপরিচিত বলিয়া তাহাতে সম্মত হইল না। ক্রমে আরও ২।৩ দোকান দেখিল, কোথাও সফলকাম হইল না। কোন চর্ম্মবিক্রেতা পরিচিত থাকা সত্ত্বেও এই বলিয়া, অসম্মত হইল যে সাইমন যেরূপ দরিদ্র তাহাতে মূল্য আদায়ের সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। একে সমস্তদিন পথ চলিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তাহার উপর এইরূপ নিরাশ হওয়াতে সাইমন নিজকে একান্ত হতভাগ্য মনে করিতে লাগিল; ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হওয়াতে শীত বোধও হইতে লাগিল। শরীরের ক্লান্তি, মনের গ্লানি এবং শীতের জড়তাতে একান্ত অভিভূত হইয়া সে প্রভাতে স্ত্রীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়া-

* 'রুবল' (Ruble) = চৌদ্দ আনা। † 'কোপেক' (Kopek) = অর্দ্ধ পয়সা।

ছিল, তাহা ভুলিয়া এক মদ্যালয়ে প্রবেশ করিল এবং স্বীয় হস্তস্থিত বিশ কোপেক দিয়া উগ্রকর মদ্য ক্রয় করিয়া পান করিল। পানান্তে মন ও শরীর কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি অনুভব করাতে আর ঘুরিয়া বেড়ান নিরর্থক মনে করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সাইমন পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল যে আমি দরিদ্র বলিয়া আমাকে কেহ মূল্য নগদ না পাইলে জিনীস দেয় না। কিন্তু আবার যাঁহাদের নিকট আমার মূল্য প্রাপ্য আছে, তাঁহারা এইটী ভাবেন না যে, আমি দরিদ্র আমার কিরূপে চলে? যাঁহার গৃহ আছে, আহার সংস্থান আছে, দশটী গো মহিষাদি পালিতে পারেন, তাঁহার নিকট টাকা চাহিতে গেলে বলেন, 'আমি দরিদ্র, হাতে টাকা থাকে না, অন্য সময় দিব।' তাঁহাদের বেলা যদি এই কথা হইল, তবে আমার যে গৃহ নাই, অন্ন মিলে না, একটা শীতবস্ত্র পর্য্যন্ত করিতে পারি না, আমার অবস্থা কি? এই ত সমস্ত দিন চলিয়া বিশ কোপেক মাত্র সংগ্রহ হইল; ইহাতে কি করা যায়? চলিয়া ক্লান্ত হইলাম, বিশ কোপেকের মদ্যপান হইল, এইমাত্র! দূর হউক, আর ভাবিয়া কি হইবে? শুবা হইল না, কি করিব? মদ্যপানে ত শরীর উষ্ণ হইয়াছে, এখন আমার আর শুবার অভাব বোধ হইতেছে না। কিন্তু মাত্রিওনা (Matriona—সাইমনের স্ত্রীর নাম) বড়ই ক্ষুন্ন হইবে। সারা বৎসর কত কষ্টে অর্থ সঞ্চয় করিলাম, তাহার ফল এই হইল? যাহা হউক, আমি যে মাত্রিওনার দুইটী কম্বল ভাঙ্গিয়া মদ্যপান করি নাই, সেজন্য সে সন্তুষ্ট হইবে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সাইমন নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বোক্ত জুতাযোড়া হাতে করিয়া দোলাইতে দোলাইতে ক্রমে ঐ গ্রামের মধ্যবর্ত্তী গির্জ্জার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইল, যেন গির্জ্জার পশ্চাতে কি একটা ধবলাকার পদার্থ পড়িয়া রহিয়াছে। তখনও অল্প অল্প সন্ধ্যালোক ছিল, তাহাতে সুস্পষ্ট কিছুই লক্ষিত হইতেছিল না। সাইমন প্রথমে মনে করিল, হয় ত একটী শ্বেত প্রস্তর; পরে ভাবিল ঐ স্থানে পূর্ব্বে ত কোন প্রস্তর ছিল না, তবে হয় ত একটা গাভী হইবে। কিন্তু অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইল, যেন মাথাটী মানুষের মতন। কিন্তু ঐ শ্বেত পদার্থ কি? মানুষ ত এরূপ শীতের সময় শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতে পারে না!

অবশেষে সাইমন সাহসে ভর করিয়া গীর্জ্জার সীমানায় পদার্পণ করিল। তখন দেখিতে পাইল যে একটী মানুষই বটে—দিব্যকান্তি পুরুষ, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছে; তাহার দেহে বস্ত্রের লেশমাত্র নাই; গীর্জ্জার সিঁড়ীতে ঠেস দিয়া অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় পড়িয়া আছে। সাইমন ত দেখিয়া অবাক্! প্রথমতঃ তাহার মনে হইতে লাগিল যে কোন দুষ্ট ব্যক্তি ইহাকে হত্যা করিয়া সমস্ত বস্ত্রাদি অপহরণ করিয়া মৃতদেহটী এস্থানে ফেলিয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই তাহার এই ধারণা হইল যে যদি কেহ তাহাকে ঐ স্থানে এ অবস্থায় দেখিতে পায়, তবে নিশ্চয়ই মনে করিবে ইহা তাহারই কার্য্য, কারণ সকলেই জানে সে দরিদ্র, অর্থাভাবে ক্লিষ্ট ও কাতর। ইহা মনে উদয় হওয়া মাত্র সে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া সাইমন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে পাইল যে ঐ উলঙ্গ ব্যক্তি আর পূর্ব্বমত পড়িয়া নাই, সে গাত্রোত্থান করিয়া সাইমনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখন তাহার মনে ভয় সঞ্চার হইল; সে মনে করিল ঐ ব্যক্তি এরূপাবস্থায় যখন মানুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে তখন অবশ্য ইহার কোন দুরভিসন্ধি আছে। এই ভাবিয়া সাইমন দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইতে লাগিল যে হয় ত ঐ ব্যক্তি কোন দুরবস্থায় পড়িয়া সাইমনের সাহায্য গ্রহণার্থ আসিতেছে, এমতাবস্থায় তাহার সাহায্য না করা একান্ত অমানুষিক কার্য্য হইবে। "আমি দরিদ্র, সে দুষ্টাভিসন্ধি করিয়া আসিলেও আমার কি অপহরণ করিবে? কিন্তু এ অবস্থায় হয় ত আমি তাহার অবস্থা দেখিতে পাইয়াও সাহায্য না করিলে তাহার প্রাণনাশ হইতে পারে।" সাইমন ইহা ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া চলিল এবং ঐ লোকটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইল যে সে একজন দিব্যকান্তি যুবাপুরুষ; তাহার দেহে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন নাই, অথচ দেখিলে মনে হয় যেন বড় দুর্ব্বল ও শীতে ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সাইমন নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ ব্যক্তি তাহার মুখের দিকে নেত্রপাত করিল;—সেই দৃষ্টিতেই তাহার হৃদয় গলিয়া গেল, সেই চক্ষের কাতরতা যেন দরিদ্র সাইমনের হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ করিয়া তাহার সমস্ত দয়াপ্রবণতা জাগরিত করিয়া তুলিল।

সাইমন হস্তস্থিত জুতাযোড়া মাটিতে রাখিয়া ক্ষীপ্র হস্তে আপনার অঙ্গ হইতে জুবা খুলিয়া লইল এবং ঐ অপরিচিত ব্যক্তির হস্তে দিয়া তাহা পরি-

ধান করিতে বলিল। সে ব্যক্তি কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শীতে জড়সড় হওয়াতে মুখ দিয়া যেন কথা ফুটিতেছিল না। সাইমন তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "আর কিছু বলিতে হইবে না, এখন শীঘ্র শীঘ্র পরিয়া লও।" এই বলিয়া তাহার হাতে ধরিয়া জুবা পরাইয়া দিতে লাগিল; সে জুবার ভিতরে হাত দিতে পারিতেছিল না, যেন শীতে তাহার হাত অবশ হইয়া গিয়াছে। সাইমন জুবা পরাইতে গিয়া দেখিতে পাইল যে ঐ ব্যক্তির হস্ত পদাদি রমণীর হস্তপদের ন্যায় কোমল, শিরে সুদীর্ঘ কেশ লম্বিত, সর্ব্বাঙ্গ এত মসৃণ ও কোমল যে শরীর স্পর্শ করিলে তাহাকে রাজ-পুত্র বলিয়া ধারণা হয়। সাইমনের হস্তে যে জুতা ছিল তাহা ঐ ব্যক্তিকে পরাইয়া দিল; এবং নিজের মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া পরাইতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মনে হইল যে ঐ ব্যক্তির সুদীর্ঘ কেশ আছে, তাহার নিজের মস্তক কেশ শূন্য! এই ভাবিয়া টুপিটী আবার নিজেরই মস্তকাবরণ জন্য রাখিল।

তৎপর সাইমন তাহাকে চলিতে বলিলে সে ব্যক্তি এক পা দুই পা করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে মনে হইল যেন সে এই নূতন চলিতে আরম্ভ করিতেছে; কিন্তু ২।১ পা চলিয়াই বেশ সুস্থ ও সবল ব্যক্তির ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিল। সাইমন তাহাকে লইয়া গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল।

এ পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি একটীও শব্দ উচ্চারণ করে নাই। সাইমন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কথা বলিতেছ না কেন? এখন আর ভয় কি? এসব ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে, মানুষের ঐ ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিবার সাধ্য কি আছে?"—তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাড়ী কোথায়?"

অপরিচিত ব্যক্তি প্রথম কথা বলিল,—"আমার বাড়ী এ অঞ্চলে নহে।"

সাইমন,—"তাহা ত জানিতেছি; কারণ আমি হেথাকার সকল লোককে চিনি।"

সাইমন আবার বলিল,—"তুমি এখানে কিরূপে আসিয়াছ?"

অপরিচিত ব্যক্তি,—"তাহা আমার বলিবার সাধ্য নাই।"

সাইমন,—"তোমার উপর কি কেহ অত্যাচার করিয়া তোমাকে এখানে ছাড়িয়া দিয়াছে?"

অপরিচিত ব্যক্তি—"ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। কোন মানুষের ইহাতে কোন হাত নাই।"

সাইমন,—"ঈশ্বর ত সবই করেন। সে যা হউক, তুমি অবশ্য কোথাও যাইতেছিলে ; এখন কোথায় যাইতে চাও।"

অপরিচিত ব্যক্তি,—"আমাকে যেখানে যাইতে বল সেখানেই যাইতে পারি।"

সাইমন ঐ ব্যক্তির এবম্বিধ উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া একান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। পরে ভাবিতে লাগিল যে "মানুষের অদৃষ্টে এরূপ দুর্ঘটনা সচরাচর ঘটে না। এ ব্যক্তি যে বিপদ্‌গ্রস্ত, তাহার আর ভুল নাই। তবে যে সে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছে না, তাহার অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ রহিয়াছে। এরূপ বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে সক্ষম হওয়াও সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ঈশ্বরই দয়া করিয়া আমাকে ইহার পথে আনিয়া দিয়াছেন।" এই ভাবিয়া সাইমন তাহাকে বলিল,—"তবে তুমি আমারই গৃহে চল। অবশ্য তোমাকে আমি সুখ স্বচ্ছন্দতা দিতে পারিব না, কারণ আমি বড়ই দরিদ্র।"

অপরিচিত ব্যক্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া সাইমনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। সাইমন, গৃহে পৌঁছিলে মাত্রিওনা কি বলিবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত।

বাঙ্গালী।

বাঙ্গালী জাতি বলিলে কাহাদিগকে বুঝায় এবং তাহাদের উৎপত্তি কিরূপ, এ সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অসংশয়িত ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধানে যাঁহারা ইহা পাঠ করিবেন, প্রথমেই বলিয়া রাখি, তাঁহারা নিরাশ হইবেন। এই মুখবন্ধের পর প্রবন্ধটি পাঠ করা না করা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। এখন বক্তব্য আরম্ভ করা যাউক।

বঙ্গে আর্য্য উপনিবেশের বহুপূর্ব্বে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থানই জলা ও জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। ঐ ঐ প্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নহে। বঙ্গের প্রধান প্রধান নদ নদী সকল তখন বঙ্গোপসাগরে আধুনিক মিম্ন বঙ্গদেশে

রচনায় ব্যাপৃত ছিল। এখনও যে তাহাদের কার্য্যের শেষ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

সাঁওতাল, কোল, ওরাঁও, বাউরী প্রভৃতি জাতিরাই যে বঙ্গদেশের আদিম নিবাসী তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ইহারা বঙ্গদেশের কোন্ অংশে বসতি করিত, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহারা নিম্নবঙ্গের উর্ব্বর ক্ষেত্রে বাস করিত; পরে প্রবল আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইহারা পশ্চিমবঙ্গের পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই অবধি ইহারা এই শেষোক্ত প্রদেশেই বাস করিতেছে। সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় অনার্য্যেরা লৌহাদি ধাতুর ব্যবহার জানিত না। কৃষিকার্য্যও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। আর্য্যেরাই যে ভারতে কৃষিকার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তক, ইহা ইতিহাসের একপ্রকার মীমাংসিত সত্য। সুতরাং অনার্য্যদিগের নিকট জলাজঙ্গলময়, নক্রকুম্ভীরসঙ্কুল, অস্বাস্থ্যকর, পরন্তু উর্ব্বর নিম্নবঙ্গের যে সবিশেষ আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহা বোধ হয় না। মৃগয়াই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল; এখনও অনেকটা বটে। যেখানে ভক্ষ্য পশুপক্ষী সুলভ, বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা অল্প, আশঙ্কা থাকিলেও যেখানে তাহারা অত্যল্পকাল মধ্যে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভ করিতে পারে, বসবাসের জন্য সেইরূপ স্থান মনোনীত করাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, কেবল আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশেই তাহাদের উক্ত উদ্দেশ্যগুলির সুসিদ্ধ হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি, পূর্ব্বোক্ত অনার্য্যজাতিরা স্মরণাতীত কাল হইতে পশ্চিম বঙ্গের আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিয়া আসিতেছে। নিম্নবঙ্গে তাহারা বাস করিত না; কোন কোন সম্প্রদায় বাস করিলেও প্রবল আর্য্যজাতির অভিযানের সম্মুখে তাহারা পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া পশ্চিম-বঙ্গের অরণ্য ও পর্ব্বতসমূহে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকিবে।

বঙ্গদেশের মধ্যে (Bengal Presidency) মিথিলা বা বর্ত্তমান ত্রিহুত অঞ্চলেই আর্য্যগণের প্রথম শুভাগমন হয়। আর্য্যজাতির যে সম্প্রদায় এই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা বিদেহ নামে ইতিহাসে খ্যাত আছেন। বিদেহগণের নেতা মাধব বিদেহই দলবল লইয়া সর্ব্বপ্রথমে উক্ত দেশে আগমন করেন। সঙ্গে ছিলেন পুরোহিত মহর্ষি গৌতম।

কথিত আছে, স্বয়ং বিভাবসুই ইঁহাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন। গণ্ডক নদের তটে উপনীত হইয়া বিভাবসু নিশ্চল হইলেন। তখন মাধব বিদেহ তাঁহাকে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশের প্রার্থনা জানাইলেন। অগ্নি তাঁহাদিগকে গণ্ডক নদের পূর্ব্বতটবর্ত্তী উর্ব্বর প্রদেশে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। তদনুসারে বিদেহগণ উক্ত প্রদেশে বাস করিয়া পরাক্রান্ত মিথিলা-রাজ্য স্থাপন করিলেন।*

মিথিলায় আর্য্যগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইলে, কালক্রমে মগধ (বর্ত্তমান বিহার) এবং অঙ্গদেশেও (ভাগলপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও) আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে এই দুই প্রদেশের অধিকাংশ স্থানই মহারণ্যে সমাবৃত ছিল। কোন কোন স্থানে মহর্ষিগণ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন বটে; কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদাই অনার্য্যগণ (রাক্ষসগণ) কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইতেন। যাহা হউক, মিথিলা রাজ্যের গৌরব প্রনষ্ট হইলে, মগধ রাজ্য সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। মগধের রাজগণ সমগ্র উত্তর-ভারতে আপনাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বিস্তার করিলেন। কোশল, পাঞ্চাল, অঙ্গ, মিথিলা সমস্তই মগধ রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিল। মগধের রাজগণ কতিপয় শতাব্দী ধরিয়া উত্তর-ভারতে একচ্ছত্র রাজত্ব করিলেন।

মগধ এবং অঙ্গদেশে আর্য্যগণের সমাগম হইলে, তাঁহারা ধীরে ধীরে আধুনিক বঙ্গদেশে † আসিয়া উপনীত হইতে লাগিলেন। ভগীরথের গঙ্গা

---

* এই বৈদিক গল্পের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক সত্য লুকায়িত থাকিবার সম্ভাবনা। অগ্নি বিদেহগণের পথপ্রদর্শক ছিলেন, ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেও পারে যে, বিদেহগণ অগ্নির সাহায্যে দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া মিথিলায় উপনীত হইয়াছিলেন। অগ্নি গণ্ডকের তটে আসিয়া নিশ্চল হইলেন, অর্থাৎ গঙ্গার উত্তর তটবর্ত্তী প্রশস্ত উর্ব্বর ক্ষেত্র সকল বনাচ্ছন্ন না থাকায়, অগ্নির সহায়তার আর প্রয়োজন হইল না এবং উক্ত প্রদেশেই বসবাসের উপযুক্ত বিবেচিত হইল। পুরাকালে মগধ প্রভৃতি দেশ যে মহারণ্যে সমাবৃত ছিল, তাহা মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ পাঠেও অবগত হওয়া যায়।

† বঙ্গদেশ অর্থাৎ Bengal Proper। দেশের নাম "বঙ্গদেশ" হইল কেন, এ সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্ত আছে, তাহা অবগত নহি। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটী কথা আমার মনে হই-তেছে; ভয়ে ভয়ে তাহা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। কোন সাঁওতালেরা তাহাদের প্রধান দেবতাকে "বঙ্গা" বলে; এই "বঙ্গার" একটী "বঙ্গী"ও আছেন। বঙ্গার উপাসনা করে বলিয়াই হউক, কিম্বা অপর কোন কারণেই হউক, এই অনার্য্যেরা বাঁকুড়া মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে "বঙ্গা" নামেই অভিহিত হয়। এই কারণে, উক্ত অঞ্চলে "বঙ্গা" অর্থে নির্ব্বোধও বুঝায়। যাহা হউক, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'বঙ্গাদের দেশ"ই তো "বঙ্গদেশ" হয় নাই? পুরাতত্ত্ববিৎ পাঠকেরা আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমি কস্মিন্‌কালেও ইহাকে পুরাতত্ত্বের অভিনব আবিষ্কার মনে করি নাই।

আনয়নরূপ আখ্যানে আর্য্যগণের বঙ্গদেশে প্রথম পদার্পণের কথা সূচিত হইতেছে, এইরূপ মনে করা বোধ করি নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কৃষিপ্রিয় আর্য্যেরা যে ভাগীরথী দামোদর প্রভৃতি নদনদীর উভয়তটবর্ত্তী প্রশস্ত উর্ব্বর ক্ষেত্র দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ না করাই কর্ত্তব্য। এই উর্ব্বর দেশে বাস করিয়া ইহাঁরা ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, নিম্নবঙ্গে অনার্য্য রাক্ষসেরা বাস করিত না; যাহারা বাস করিত, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া পর্ব্বতে ও অরণ্যে পলায়ন করিল; অবশিষ্টেরা তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিল। এই শেষোক্তেরা কালক্রমে রাক্ষসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং আর্য্যগণের নিকট কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। ইহারাই বঙ্গদেশের নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দু।

আর্য্যেরা বঙ্গদেশে আসিয়া অপেক্ষাকৃত সুখে ও নির্ব্বিবাদে বাস করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু এই কারণেই তাঁহাদের প্রকৃতির বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইল। পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে যে সকল আর্য্য বাস করিতেন, তাঁহারা নিকট-বর্ত্তী পর্ব্বত ও অরণ্যবাসী দুর্দ্দান্ত অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই আক্রান্ত উৎপীড়িত ও উপদ্রুত হইতেন। * এই কারণে প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাঁহাদিগকে সশস্ত্র থাকিতে হইত এবং পুনঃ পুনঃ সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হইতে হইত। এইরূপে নিয়ত অস্ত্রশস্ত্রের পরিচালনা করিতে করিতে তাঁহারা বিলক্ষণ যুদ্ধপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। সুতরাং যুদ্ধপ্রিয়তা এবং সাহসিকতা তাঁহাদের প্রকৃতির সর্ব্ব-প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল। উক্ত প্রদেশের জলবায়ুও তাঁহাদের দৈহিক বিকাশ সাধন এবং বলবীর্য্য সংরক্ষণের বিলক্ষণ সহায় হইল। প্রায় এই সমস্ত কারণেই, কোশল, মগধ, পাঞ্চাল, মিথিলা, অঙ্গ প্রভৃতি দেশের আর্য্যেরাও বিলক্ষণ সাহসী ও তেজস্বী হইলেন। কিন্তু যে আর্য্যসম্প্রদায় নিম্নবঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তাঁহারা সেই প্রদেশে নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পাইয়া অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার প্রায় বিস্মৃত হইয়া গেলেন। ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু ইহাদেরই মধ্যে যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য ও পর্ব্বতময় প্রদেশের সন্নিধানে বাস করিলেন, তাঁহাদিগকে প্রায়ই অনার্য্যগণের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইতে হইত। এই

* ইংরেজের শাসনেও অদ্যাপি এই উপদ্রবের শান্তি হয় নাই।

কারণে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার বিস্মৃত হওয়া চলিল না। তাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশকে "বীর-ভূমি", "মল্ল-ভূমি" প্রভৃতি বীরত্বব্যঞ্জক অভিধানে অভিহিত করিলেন এবং যুদ্ধবিদ্যার যৎসামান্য চর্চ্চাও রাখিতে বাধ্য হইলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশের সন্নিহিত বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুও নিম্নবঙ্গের জলবায়ু অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যজনক এবং বলবীর্য্য বিকাশের অনুকূল হইল। অদ্যাপি বীর-ভূমি, মল্ল-ভূমি প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা নিম্নবঙ্গবাসীদের অপেক্ষা অধিকতর বলবান্, দৃঢ়মূর্ত্তি ও সাহসী।*

যাহা হউক, নিম্নবঙ্গবাসী আর্য্যেরা যুদ্ধবিদ্যার অনুশীলনাভাবে একদিকে যেরূপ অন্যান্য আর্য্যসম্প্রদায় অপেক্ষা বলবীর্য্যে হীন হইলেন, সেইরূপ অপর দিকে শান্তিসুখের অধিকারী হইয়া তাঁহারা আপনাদের মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে প্রখর প্রতিভাকে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন। কাব্য, ধর্ম্মশাস্ত্র, সুকুমার শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হওয়াতে ইঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত ও মার্জ্জিত হইল এবং হৃদয়ের সুকুমার ভাবগুলিও যথোচিত কর্ষিত হইল। ভারতবর্ষের অন্য সকল আর্য্যসম্প্রদায় অপেক্ষা বঙ্গদেশবাসী আর্য্যগণ এই কারণেই বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে অধিকতর বলীয়ান্ এবং বর্ত্তমানকালেও উন্নতির পথে অগ্রণী।

বঙ্গদেশে বাস করিয়া বঙ্গীয় আর্য্যগণের প্রকৃতিতে এইরূপে কতিপয় বিশেষত্ব জন্মগ্রহণ করিল। প্রথমতঃ বাঙ্গালী দুর্ব্বল ও ভীরু হইল; দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালী বিলাসী ও শান্তিপ্রিয় হইল; এবং তৃতীয়তঃ বাঙ্গালী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভাসম্পন্ন হইল। বঙ্গদেশের জলবায়ুর গুণই এই প্রকার। শুধু হিন্দু আর্য্যগণের কথা নহে, বঙ্গদেশে যাহারা অধিককাল বাস করিবে, তাহাদেরই প্রকৃতিতে পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্বগুলির অঙ্কুর ও বৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠকবর্গ আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গদেশবাসী মুসলমান †, ক্ষত্রিয় ‡, জৈন §, য়ুরোপীয় এবং

---

* আর্দ্রভূমি নিম্নবঙ্গের জলাজঙ্গলোত্থিত দূষিত বিষাক্ত বাষ্প বহুকাল ধরিয়া বীর্য্যশালী আর্য্যগণকে নিবীর্য্য করিতেছে। অদ্যাপি নিম্নবঙ্গের বায়ুরাশি ম্যালেরিয়া বিষে ওতঃপ্রোতঃরূপে পরিপূর্ণ। বঙ্গদেশে যে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে ধান্যই প্রধান। সুতরাং তণ্ডুলই বঙ্গদেশবাসীর প্রধান খাদ্য। এই খাদ্যও যে বাঙ্গালীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের অন্যতম কারণ নহে, তাহা কে বলিতে পারে?

† যে সকল উচ্চ বা নিম্ন সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি না।

‡ বাঁকুড়া বীরভূম অঞ্চলে বিস্তর ক্ষত্রিয় বা "ছেত্রী" দেখিতে পাওয়া যায়। এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে কেবল "ছেত্রী"রই বাস। পশ্চিম বঙ্গে বাস করিয়া ইহাদের দৈহিক অবনতি হইয়াছে।

§ মুর্শিদাবাদ জেলায় আজিমগঞ্জ, বালুচর প্রভৃতি স্থানে জৈনধর্ম্মাবলম্বী বিস্তর ওসোয়াল্ বাস করে, ইহাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে অনেক কথা লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ব্যক্তিরা,—অর্থাৎ যাহারা এদেশে অধিক দিন বাস করিতেছে,—তাহারা সকলেই ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর স্বভাব ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপ বিশ্বাস হয়, কালক্রমে সকলেই সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীত্ব প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু কখনও বাঙ্গালী হইবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমরা আমাদের বক্তব্য নিম্নে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যাই সমধিক। কোন কোন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অনার্য্য-জাতিও হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। হিন্দুর জনসংখ্যা হইতে ইহা-দিগকে বর্জ্জন করিলেও অবিমিশ্র আর্য্য হিন্দুর সংখ্যা বঙ্গদেশে নিতান্ত অল্প হইবে না। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জনসংখ্যার তুলনায় বঙ্গদেশে আর্য্য-হিন্দুর সংখ্যা বোধ হয় অধিক হইবে। কিন্তু ইহাদের সকলেই কি "বাঙ্গালী"-পদবাচ্য? বাঙ্গালী বলিলে কাহাদিগকে বুঝায়, তৎসম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

"বাঙ্গালী" নামের উচ্চারণে আজ কাল নানা লোকের মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে। কেহ ঘৃণার, কেহ সম্মানের, কেহ শ্রদ্ধার এবং কেহ বা ঈর্ষার চক্ষেও বাঙ্গালীকে দেখিয়া থাকেন। বাঙ্গালী আজ কাল সকলেরই সুপরিচিত বটে। আকার প্রকার দেখিলেও বাঙ্গালীকে চেনা যায়। কিন্তু বঙ্গদেশবাসী নানাজাতীয় ও বিভিন্নদেশাগত লোকের মধ্যে বাঙ্গালীকে চিনিবার আরও কতিপয় লক্ষণ আছে, নিম্নে সেগুলির নির্দ্দেশ করা গেল।

বাঙ্গালী হইতে হইলে প্রথমতঃ বঙ্গদেশে বাসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহাই বাঙ্গালীর একমাত্র লক্ষণ নহে! * এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই; কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্গদেশবাসী ইংরেজ, মুসলমান, জৈন প্রভৃতি বিভিন্নদেশাগত ব্যক্তিগণের কথা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশের আদিমনিবাসী কোল সাঁওতালেরাও আপনাদিগকে "বাঙ্গালী" নামে অভিহিত করে না। অপর সকলে যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলে, তাহারাও তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া থাকে। বাঙ্গালীর দ্বিতীয় লক্ষণ বঙ্গভাষার ব্যবহার †; কিন্তু ইহাও বাঙ্গালীত্বের সম্যক্ পরিচয় নহে।

---

* British-born শব্দের ন্যায় বঙ্গদেশে কোনও শব্দ প্রচলিত নাই।

† পশ্চিমদেশবাসী কোন কোন বাঙ্গালী পরিবারের হিন্দীই "মাতৃভাষা" হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশের সহিত সংস্রব একেবারে পরিত্যক্ত না হওয়ায়, ইহাদের এখনও "বাঙ্গালী" নাম ঘুচে নাই।

জৈন, মুসলমান প্রভৃতি জাতি যাহারা বহুকাল এদেশে বাস করিতে করিতে কথোপকথনে প্রধানতঃ বঙ্গভাষারই ব্যবহার করিয়া থাকে,—তাহারাও আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত করে না। বঙ্গদেশের নানা স্থানে অনেক "হিন্দুস্থানী" পরিবার দৃষ্ট হয়; বঙ্গভাষাই ইহাদের "মাতৃভাষা" হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহারা "বাঙ্গালী" নহে। অবশ্য যে সকল প্রকৃত বাঙ্গালী মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা আপনাদিগকে "বাঙ্গালী মুসলমান" বা "বাঙ্গালী খৃষ্টান" নামে অভিহিত করে বটে; কিন্তু তাহাদের মধ্যেও অনেকে আপনাদিগকে বাঙ্গালীর সহিত একীভূত করিতে কুণ্ঠিত হয়। * তবে কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বনই বাঙ্গালীত্বের প্রধান লক্ষণ? তাহাও বোধ হয় না। যেহেতু বঙ্গদেশবাসী, বাঙ্গলাভাষী, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বিহারী, খোট্টা এবং মাড়োবারীরাও কখনই আপনাদিগকে "বাঙ্গালা"র মধ্যে গণ্য করে না। তবে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ কি? আমাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রবান লক্ষণ হইতেছে বঙ্গদেশ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বন। বলা বাহুল্য যে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসকলও বিদ্যমান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহের এক একটী বা সমষ্টিও "বাঙ্গালাত্ব" গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বঙ্গদেশপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে কস্মিন্‌কালেও বাঙ্গালা হওয়া যায় না; অর্থাৎ যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মৎস্য মাংস খাইয়াও প্রকৃত আর্য্যব্যক্তিকে কখনও সমাজ মধ্যে দূষিত বা "পতিত" হইতে হয় না। বঙ্গদেশবাসী, বাঙ্গালাভাষী, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী † মৎস্যাশী আর্য্য ব্যক্তিরাই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী। বঙ্গদেশ, বাঙ্গলাভাষা এবং মৎস্যাহার পরিত্যাগ করিলেও হিন্দু বাঙ্গালীর "বাঙ্গালী" নাম সহজে যাইবে না। মৎস্যাশী ব্যক্তিগণের শোণিত তো তাহার শিরায় শিরায় প্রধাবিত হইয়া থাকে। মৎস্যাহার কারণে তো তাহার পাতিত্য দোষ জন্মে না? তাহা হইলেই তাহার বাঙ্গালী নাম ঘুচিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ হইল। বঙ্গদেশবাসী, বাঙ্গালাভাষী, কানাকুব্জ ব্রাহ্মণেরা যতদিন মৎস্যাহার আরম্ভ করেন নাই, ততদিন তাঁহারা "বাঙ্গালী ছিলেন না।

---

* বাঙ্গালী খৃষ্টান বা বাঙ্গালী মুসলমানগণের আত্মীয় স্বজনেরা অনেকেই "বাঙ্গালী"। সুতরাং তাহারা আপনাদিগকে বাঙ্গালী না বলিয়া কি করিবে? তবে যাহারা ইংরেজ বা পশ্চিমদেশবাসী মুসলমানের সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হয়, তাহাদের পুত্র সন্তানেরা আপনাদিগকে আর বাঙ্গালী বলে না।

† ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত ধরিয়া লইতেছি।

মৎস্যাহার আরম্ভ করিয়া অবধি তাঁহারা "তাঁহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে"* "বাঙ্গালী" হইয়া গিয়াছেন! এখন আর তাঁহারা বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না।

মৎস্যাহার হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে আর কোথাও প্রচলিত নাই, বরং তাহা ঘৃণা ও পাতিত্যেরই কারণ মধ্যে পরিগণিত হয়। কেবল বঙ্গদেশবাসী হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যেই তাহা তদ্রূপ বিবেচিত হইল না, ইহার তাৎপর্য্য কি? আর্য্যেরা যখন বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন, তখন বোধ হয় মৎস্যাহার নিন্দনীয় ছিল না। সমুদ্রতটবর্ত্তী জলাময়দেশে বাস করিয়া তাঁহারা প্রচুর মৎস্য দেখিতে পাইলেন। মৎস্যের বিজাতীয় দুর্গন্ধ থাকিলেও, সুপক্ক হইলে তাহা খাইতে মন্দ নহে; বিশেষতঃ মৎস্যভক্ষণে দেহ পুষ্টিলাভও করিয়া থাকে। সুতরাং বঙ্গদেশীয় আর্য্যগণের মধ্যে মৎস্য-ভক্ষণ-প্রথা প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক। পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে বঙ্গদেশের ন্যায় মৎস্য সুলভ নহে। সুতরাং তত্রত্য আর্য্যেরা কচিৎ মৎস্য ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু পশুমাংস খাইতে কাহারও আপত্তি ছিল না। যেহেতু যজ্ঞে পশুহনন করিয়া পশু-মাংস ভক্ষণ করা শাস্ত্রসম্মত ও দেশপ্রচলিত ছিল। কালক্রমে উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের উপর বহুকাল প্রাধান্য স্থাপন করে। "অহিংসা এবং সর্ব্বভূতে দয়া প্রদর্শনই" বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল; সুতরাং উত্তর-ভারতবাসী আর্য্যগণ বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষাগুণে মৎস্যমাংসাহার বর্জ্জন এবং মৎস্যমাংসাহারী ব্যক্তিগণকে যে ঘৃণা করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? কালের বিচিত্র গতিতে, হিন্দুধর্ম্ম যখন ভারতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল, তখন যজ্ঞার্থে পশুবধ করা শাস্ত্র সম্মত থাকায়, কেহ কেহ পশুমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মৎস্যাহার বহুকাল পরিত্যক্ত থাকায়, এবং তৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান বা আদেশ না থাকায়, হিন্দুধর্ম্মের নরভক্তগণের নিকট তাহা নিন্দনীয় ও পাতিত্যের কারণ হইয়া উঠিল। উত্তর-ভারতবাসী আর্য্য-গণের মধ্যে মৎস্যের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা† এইরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

---

* অনেক বাঙ্গালী কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণকে এইরূপ বিলাপ করিতে শুনা যায়।

† পশ্চিমাঞ্চলে অনেক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকে পাঁঠার মাংস খাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু প্রাণান্তেও তাহারা মৎস্য স্পর্শ করিবে না। তান্ত্রিক ধর্ম্মোক্ত কার্য্যকলাপে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইলে, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হয়। বৈষ্ণবধর্ম্মও "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মত প্রচার করিয়া-ছিল। অদ্যাপি বঙ্গদেশে অনেক নিরামিষভোজী বৈষ্ণব পরিবার দৃষ্ট হয়। অনেক বৈষ্ণব

বৌদ্ধধর্ম্ম যে বঙ্গদেশে কখনও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। প্রাধান্য লাভ করিলে, মৎস্যমাংসাহার একেবারে পরিত্যক্ত না হউক, অন্ততঃ ঘৃণিতও হইত। এই ধর্ম্মের দুই একটী তরঙ্গ আসিয়া বঙ্গদেশকে অভিঘাত করিয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর; কিন্তু সে অভিঘাতে বঙ্গীয় আর্য্য-সমাজ যে কিছুমাত্রও বিচলিত হয় নাই, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। বিচলিত হইলে, কিয়দ্দিন পরে তান্ত্রিক ধর্ম্মের এরূপ প্রসর ও প্রতিপত্তি লাভ হইত না। মৎস্যমাংসাহার নিষেধ করা দূরে থাকুক, তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ঐ বিষয়ের সবিশেষ প্রশ্রয়ই দিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই, বঙ্গদেশে মৎস্যাহার নিষিদ্ধ হয় নাই এবং স্মরণাতীত কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বঙ্গীয় আর্য্যসমাজে এই প্রথার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

মৎস্যাহারই বঙ্গীয় আর্য্যগণকে ভারতবর্ষীয় অন্যান্য আর্য্যগণ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিতেছে। মৎস্যাশী না হইলে, বাঙ্গালী অন্যান্য প্রদেশের আর্য্যগণের নিকট এরূপ নিন্দাভাজন ও ঘৃণাস্পদ হইত না। * যাহাই হউক, মৎস্য ভক্ষণ যে বাঙ্গালী আর্য্যগণের একটী বিশেষত্ব তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালীর আরও কতিপয় বিশেষত্ব আছে, তাহাদের এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করি না। কিন্তু একটীর যৎসামান্য উল্লেখ না করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না, তাহা বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে। বাঙ্গালীর দেশীয় পরিচ্ছদ দেখিয়াই বাঙ্গালীকে চেনা যায়; এই পরিচ্ছদের প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে, উত্তমাঙ্গের অনাচ্ছাদন। বাঙ্গালী-বিদ্বেষী অনেক আর্য্যকে এই বিষয় লইয়া অনার্য্যের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতে দেখা যায়। সে সব কথাবার্ত্তা আর্য্যব্যক্তির অশ্রাব্য ও অপাঠ্য সুতরাং এস্থলেও উল্লেখের অযোগ্য। প্রাকৃতিক কারণের বশবর্ত্তী হইয়াই যে বাঙ্গালী মস্তকাচ্ছাদন করে'না, ইহা যাহারা বুঝিতে না পারে, তাহাদের মস্তিষ্ক যে

আবার মৎস্যমাত্র ভক্ষণ করে; কিন্তু পাঁঠার নামে কর্ণে অঙ্গুলি দেয়। পূর্ব্বোক্ত হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদের এবং ইহাদের ব্যবহার পরস্পর বিরোধী। বাঙ্গালী মাছ খায় বলিয়া হিন্দুস্থানী-দের নিকট যারপরনাই ঘৃণ্য। "বাঙ্গালী মছলী খাতা হেয়" একথা যার তার মুখে শুনা যায়।

* বাঙ্গালীর আচার ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া বিহারে অনেক সংস্কৃত শ্লোক রচিত হইয়াছিল। একটী প্রাচীন শ্লোক এইরূপ:—

"আহারে কাক বক শূকর সমাঃ * * * * ।
বাঙ্গালাঃ যদি মানবাঃ হরিঃ হরিঃ প্রেতাস্তদা কীদৃশাঃ ॥"

Indian Antiquary (Part cxcviii, vol. xvi.)

"মেড়ূয়া" ভক্ষণজনিত রসদ্বারা পরিপুষ্ট, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমুদ্র যে দেশের নিকটবর্ত্তী, সে দেশে যে শীতের প্রাবল্য বা গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য থাকে না, সুতরাং লোকের শিরস্ত্রাণেরও প্রয়োজন হয় না, ইহা আশা করি বালক ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

যাহা হউক, বাঙ্গালীজাতির উৎপত্তি ও লক্ষণ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা শেষ করিলাম। বলা বাহুল্য এই প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সত্য ও সমধিক কল্পনা থাকাই সম্ভবপর। সম্ভবপর কেন, বস্তুতঃই আছে। সুতরাং আমি বাঙ্গালীর এই ইতিহাসটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহাকেও অনুরোধ করিতেছি না। কোন পুরাতত্ত্ববিৎ পাঠক ইহা পাঠ করিয়া যদি বাঙ্গালীজাতির একটী প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই আমার এই প্রবন্ধের যৎকিঞ্চিৎ আদর হইবে, আমিও সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া একটা কৈফিয়ৎ দিতে পারিব এবং সর্ব্বোপরি সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস।

ইংরাজ সমাজ।

আমাদের দেশে ইংরাজ সমাজের বিরুদ্ধে এক বিষম কুসংস্কার আছে। বিশেষতঃ আজ কয়েক বৎসর হইল সেই কুসংস্কার অনেকের মনকে আরও বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে যাহাকেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনিই বলেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস ;—ইংরাজ সমাজ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার কিছুই জানা নাই। যাঁহাদেরও বা এরূপ কিছু কিছু সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে, তাঁহাদের মধ্যেও হয়ত অনেকের পূর্ব্বার্জ্জিত কুসংস্কার বশতঃ দৃষ্টির বক্রতা হয়। তদ্ব্যতীত, অল্পজ্ঞান অজ্ঞানতা অপেক্ষা অবশ্যই অধিকতর দূষনীয়। ইংরাজ সমাজের নীতি সকল আমাদের দেশের নীতি হইতে শুধু ভিন্ন নহে—অনেক স্থলে তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হয় ; সুতরাং যাঁহারা আমাদের নীতিকেই অনিন্দনীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন ও ইংরাজ সমাজ পক্ষপাতশূন্য হইয়া দর্শন ও বিচার না করেন, তাঁহাদের যে ইহার উপর অতীব অনাস্থা জন্মিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

ইংরাজ সমাজেও এক প্রকার জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে। তবে আমাদের দেশের লোকের মত তাঁহারা নৈয়ায়িক নহেন, সুতরাং তাঁহাদের জাতিভেদের কিছু লক্ষণ নাই। আমাদের সমাজে কত দিন, হয়ত, কত সহস্র বৎসর অগ্রে স্থির হইয়া গিয়াছে, জন্মই জাতিভেদের লক্ষণ হইবে; স্থূলতঃ ধরিতে গেলে তাহাই বরাবর ন্যায়ানুযায়িক স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইংরাজের মধ্যেও বংশমর্য্যাদা আছে, কিন্তু তাঁহারা তজ্জন্য ভুলিয়া যান নাই যে শুধু বংশমর্য্যাদাই জাতিভেদের লক্ষণ হইলে, বহুল কুফল ফলিতে পারে। এই জন্য ধনমর্য্যাদা, বিদ্যাযশঃ, মেধা, এই সকলেরই উপর বিশেষ ভাবে, বিশেষ বিশেষ স্থলে সামাজিক পদ নির্ভর করে। ইংরাজ সমাজে স্থূলতঃ দুই প্রধান বিভাগ দৃষ্ট হয়। ভদ্র শ্রেণী ও সাধারণ লোক। শিক্ষা, শিষ্টাচার ও কতক পরিমাণ অর্থ ভদ্রের প্রধান লক্ষণ। বংশমর্য্যাদা তাহাদের সহানুগামী মাত্র। সকল দেশেই পূর্ব্বোক্ত গুণ গুলি শেষোক্তের সহিত জড়িত। কিন্তু তাহা বলিয়া, তাহাদের কথা ভুলিয়া গিয়া শেষোক্তটীকে জাতিবিভাগের এক মাত্র লক্ষণ করিয়া নৈয়ায়িকতার সহিত তাহা রক্ষা করিলে যে বিষময় ফল হয়, আমাদের কৌলীন্যপ্রথা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। সেইরূপে বংশের ন্যায় অর্থকেই শ্রেণীবিভাগের একমাত্র লক্ষণ ধরিলে অনেক কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। ইংরাজ সমাজ বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে মনে হইতে পারে, অর্থই তথাকার জাতিবিভাগের প্রধান লক্ষণ। তাহার কারণ, ইংলণ্ডে অর্থশালী লোকের অর্থ এত অধিক, অর্থবিহীন লোকের এত দুরবস্থা, অর্থের এত প্রয়োজন যে, নিঃস্ব লোকে নানাগুণ সম্পন্ন হইলেও তাহার ভদ্র সমাজে চলা অসাধ্য হইয়া উঠে। বিবাহ নিমন্ত্রণ প্রভৃতিতে ভদ্র সমাজের অধিকাংশ লোকের সহিত এরূপ লোকের সমকক্ষতা চলে না। তবে ইহা স্মরণ রাখা উচিত, অধ্যাপক, পাদরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী লোক, কিম্বা যাঁহারা কোন প্রকারে মেধার পরিচয় দিয়াছেন এরূপ লোক সর্ব্বত্র সমাদৃত—উন্নতসমাজভুক্ত। আরও এক কথা—অর্থ না থাকিলে সেখানে শিক্ষালাভ হওয়া অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে হইলে, এক, অনেক অর্থের প্রয়োজন; না হয়, বৃত্তিলাভ করিতে পারা চাই। সেইরূপ প্রধান প্রধান স্কুলেরও ব্যয় অনেক। এইরূপে অর্থের ক্ষমতা বুঝিতে পারা যাইতেছে। অনেক সময়ে একজন মেধাবী লোক বহুল অর্থ উপার্জ্জন

করেন; তাঁহার শিক্ষা, শিষ্টাচার-জ্ঞান নাই, সুতরাং ভদ্র সমাজে তাঁহার স্থান নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র কন্যা অর্থের বলে যথার্থ শিক্ষালাভ করিয়া অনায়াসেই ভদ্র সমাজে গৃহীত হইবেন। নির্গুণ অর্থশালী লোকে, নির্গুণ বংশমর্য্যাদাবান লোকে, অনেক সময়ে ইংরাজ সমাজে সম্যক্ উন্নতস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সমাজে নূতন লোকের (Parvenu) প্রতি বিদ্বেষভাব মনুষ্যস্বভাবসুলভ। লোকের পক্ষে সাধারণ বাধা বিপত্তি ভেদ করিয়া বিদ্যা ও ধন উপার্জ্জন করা আজিও সহজ নহে। তাহাদের কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; তাহার সহিত এরূপ অস্বাভাবিক বাধা বিপত্তিও ক্রমশঃ লোপ পাইবে, আশা করা যায়।

স্থূলতঃ, ইংরাজ সমাজ স্বাভাবিক নিয়মের উপর সংরক্ষিত। ইহা আর কাহারও অবিদিত নাই, যে সময়বিশেষে মনুষ্য সমাজের সাময়িক অস্বাভাবিকতাও, এই নিয়মের অধীন, এবং এই অস্বাভাবিকতার পরিহারও সেই নিয়ম অনুসারেই হইয়া থাকে। মনুষ্য সমাজ মাত্রেই শ্রেণী বিভাগ থাকিবে; সভ্যতার উন্নতি অবনতি অনুসারে সেই শ্রেণীবিভাগের ধারা বিভিন্ন হইবে। কিন্তু যদি নিয়ম করিয়া এই ধারার পরিবর্ত্তন হইতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমাজের জীবনীভাব ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যাইবেই যাইবে। লোক বিশেষে, স্থান বিশেষে, এক ধারা অল্প দিন বা অধিক দিন চলিতে পারে, কিন্তু চিরকাল কখনই চলিতে পারে না। পরিবর্ত্তনশীলতা জগতের নিয়ম। এ নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে অবশেষে কখনই অশুভ ভিন্ন শুভ হইতে পারে না।

স্ত্রীলোকের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিলাতে অল্প দিন হইল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখনও কেম্ব্রিজে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ও উপাধি লাভের অধিকার পান নাই। গার্টন (Girton) ও নিউনহাম (Newnham) এর ছাত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদিগের দ্বারা পরীক্ষিত হন, কিন্তু তাঁহাদের পরীক্ষার ফলের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুই সম্পর্ক নাই। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু অনেক দিন হইল স্ত্রীলোকদিগকে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত, উচ্চশিক্ষা, সুধু বিশ্ববিদ্যালয়গত নহে। প্রত্যেক ভদ্রমহিলা শিক্ষিতা হইবেন, এ প্রথা অনেক দিন হইতে রহিয়াছে। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত লোকের বালিকারা ১৬।১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে

থাকেন। সেখানে, সঙ্গীত, চিত্র, ফরাসিভাষা, কিঞ্চিৎ ভূগোল ইতিহাস ও গণিত, হয়ত একটু লাটিন গ্রীক শিক্ষা হয়। স্কুলের বালিকারা ভোজ কি নৃত্যে (Ball) নিমন্ত্রিত হন না। স্কুল ছাড়িয়া তবে প্রথম সমাজে প্রবেশাধিকার পান। অনেকেই জানেন, সেই ঘটনা জানাইবার জন্য, তাঁহাদের পিতা মাতা অনেক সময়ে বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করেন। তাহার পর সাংসারিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। যদি তখন সময় থাকে, শিক্ষায় আস্থা থাকে, তাহা হইলে পুস্তকগত শিক্ষাও চলিতে থাকে। পুস্তকগত শিক্ষা অপেক্ষা, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার উপর বালিকাদিগের লক্ষ্য অধিক এবং সাধারণ মতে ইহাই বাঞ্ছনীয়। সমস্ত গৃহকার্য্যে কর্তৃত্ব করা; জিনিষপত্র ক্রয় করা, গৃহটীকে দেবালয়ের মত সজ্জিত ও পরিষ্কার রাখা, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, তাঁহাদিগকে আহ্বান ও অভ্যর্থনা করা, গৃহকর্ত্রীর বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে; এ সকল বিষয়ে তাঁহার বয়স্কা কন্যাগণ তাঁহার সাহায্য করেন ও তাঁহা হইতে শিক্ষা লাভ করেন। ইংরাজ ভদ্রলোকের ও অনেক সামান্য লোকের গৃহ দেখিলে, সেখানে লক্ষ্মী বিরাজমান বলিয়া বোধ হয়। সেখানে প্রবেশ করিয়া গৃহকর্ত্রী ও তাঁহার কন্যাগণের শিষ্টাচার ও সাদর সম্ভাষণে মন উন্নত হয়, তাঁহাদের সঙ্গীতে ও সদালাপে মনের বিকার দূর হয়, ও মনে প্রফুল্লতা স্বতঃই উপস্থিত হয়। এই চিত্রের অপর দিক্ও আছে। মিষ্টতাদির সহিত কখনও কখনও কপটতা ও অস্বাভাবিকতা জড়িত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার জন্য মনুষ্যের স্বাভাবিক অপকৃষ্টতাই অধিক দায়ী। অনেক সময়ে বালিকাদিগের জ্ঞানচর্চ্চার অত্যল্পতা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে বেশ ভূষার আলাপেই অনেক সময় ব্যয় করেন, কিন্তু তাহা অনেকের কর্ণে বৈজ্ঞানিক আলাপ অপেক্ষা অনেক সুমধুর বোধ হয়। জীবনের মাধুরী ও সৌন্দর্য্য বিকাশে সাহায্য করাই স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ কার্য্য।

ইংরাজ সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীলোকের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, স্বামীর সমকক্ষা, অধীন নন, ইহাই ইংরাজ সমাজের মূলমন্ত্র। পরস্ত্রী, পরকন্যাকে, ভক্তি করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে বন্ধুভাবে দেখিতে হইবে, ইহাই এই সমাজনীতির লক্ষণ। সকল সাংসারিক বিষয়ে স্ত্রী ও স্বামী পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষায়

মাতারই কর্ত্তব্য অধিক; মাতার স্নেহ, মাতার সুমধুরতা, অনেক কার্য্য করে। কিন্তু মাতার শিক্ষকতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভদ্রবংশীয় ইংরাজ বালক-বালিকাগণ জন্মাবধি সদাচার, সততা শিক্ষা করে। কে না জানেন, বাল্য-কালের শিক্ষাই চরিত্রগঠনে বিশেষ কার্য্য করে? স্ত্রীস্বাধীনতার ফল যেমন পরিবারের মধ্যে, তেমনি সামাজিক ব্যবহারেও লক্ষিত হয়। পরস্ত্রী, পরকন্যার সহিত বাল্যকাল হইতে সরলভাবে, বন্ধুভাবে আলাপ করিতে না শিখিলে "পরস্ত্রী মাতৃবৎ" বচনটী বাক্যগত হইয়া দাঁড়ায়। বালক-বালিকার, পুরুষ স্ত্রীর যে পবিত্র স্বর্গীয় সম্বন্ধ, তাহার পরিবর্ত্তে এক অস্বাভাবিক ভাব ও কৃত্রিম ব্যবহার প্রবর্ত্তন, যে অবনতিসূচক, ইহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়। মনুষ্য চরিত্রে অপকৃষ্টতা অনেক; কিন্তু তাহা বলিয়া সেই চরিত্রে অবিশ্বাস, উহার অপকৃষ্টতা দূরীকরণে সহযোগী হইতে পারে না। তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতিতে বিশ্বাস করিয়া এই উন্নতি সাধনার্থ স্বাভা-বিক নীতি অবলম্বন করাই বিজ্ঞানসম্মত। ইংরাজ সমাজে এই নীতি প্রবর্ত্তিত; কেবলমাত্র তাহার কুফলের দিকেই দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অতি ভ্রান্ত বিশ্বাসে উপনীত হইতে হইবে। এই নীতির গুণে অনেক বালিকাই অকাল-পক্বতা হইতে রক্ষিত হন।

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংরাজ স্বীয় সমাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের নিকট বিনয় শিক্ষা করিয়া, মনুষ্যত্ব লাভ করেন। স্ত্রীলোকের নিকট পুরুষের পদমর্য্যাদা নাই। ডিউক হইতে সাধারণ ভদ্রলোক পর্য্যন্ত সকলকেই, ভদ্রমহিলা-মাত্রেরই অনুগামী হইতে হইবে। 'ইংরাজী-ভদ্রতা' এই প্রণালী হইতেই তাহার মাধুর্য্য লাভ করিয়াছে।

অল্পদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে সঙ্গীতের চর্চ্চা বিষয়ে বিষম কুসংস্কার ছিল। তাহার কারণ আর কাহারও অবিদিত নাই। স্বর্গীয় বস্তু কারণ-বিশেষে কলুষিত হইয়াছিল; এখন সে কলুষ কতক অপনোদিত হইতেছে; কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যিনি পবিত্র রমণীর মুখে সঙ্গীত শ্রবণ না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই স্বর্গীয় ভাব এখনও অস্ফুট রহিয়াছে। ইংরাজ সমাজ সঙ্গীতের এই মোহিনী শক্তিতে, সহস্র বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও উন্নতির দিকে অগ্র-সর হইতেছে, ইহা হৃদয়বান্ লোক মাত্রেই যে স্বীকার করিবেন, তাহা স্পর্দ্ধার সহিত বলা যাইতে পারে।

"জিজ্ঞাসা"র উত্তর।

বিগত মার্চ্চ মাসের "দাসী"তে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—হরিদাস ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন, এ কথার প্রমাণ কি?—জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,—হরিদাস ব্রাহ্মণ-সন্তান নহেন। স্বমত পরিপোষণার্থ তিনি নিম্নোক্ত প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১। "জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে। জন্মিলেন নীচকুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে॥ * * * উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে। কুলে তারে কি করিবে নরকেতে মজে॥ এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে। জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥"

২। "জাতিকুল ক্রিয়াধনে কিছু নাহি করে। প্রেমধন আর্ত্তি বিনা না পায় কৃষ্ণেরে॥ যে তে কুলে কেনে বৈষ্ণবের জন্ম নহে। তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥ এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস। ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিল পরকাশ॥"—চৈতন্যভাগবত।

তৃতীয়তঃ, কাজি হরিদাসকে বিচারার্থ আহ্বান ও পুনর্ব্বার মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলে হরিদাস বলিয়াছিলেন:—

"শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর। নামমাত্র ভেদ করে হিন্দু ও যবনে। পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥ * * * হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ। আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥ হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই ধর্ম্ম। আপনে যে মৈল, তারে মারিয়া কি কর্ম্ম॥"—চৈঃ ভাঃ।

অঘোর বাবু বলেন—"হরিদাস যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিতেন, তাহা হইলে মুলুকপতিকে স্পষ্টতঃ বলিতে পারিতেন যে হরিনাম কীর্ত্তন করাই আমার কুলধর্ম্ম, আমি মুসলমান গৃহে কিছুদিন প্রতিপালিত হইয়াছিলাম মাত্র, অতএব আমার প্রতি আর অত্যাচার করিও না।" তাঁহার আর একটী 'অকাট্য যুক্তি' এই যে, হরিদাস যবন কুলোদ্ভব না হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে, আপনাকে "হীন জাতি জন্ম মোর" ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় দিতেন না। এখন, দেখিতে হইবে, বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের লিখন ভঙ্গী কিরূপ; তাঁহাদের অভিপ্রায় না বুঝিতে পারিলে গোলে পড়িবার সম্ভাবনা। দেখিয়াছি—তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া কোন কোন লেখক সম্প্রতি প্রচার করিতেছেন, রূপসনাতন যবন ছিলেন; আর সনাতন শ্রীরূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা! অথচ 'বৈষ্ণব ইতিহাসে অভিজ্ঞ' বলিয়া যে সকল অভিমানী লেখক দম্ভ করিয়া থাকেন, বৈষ্ণব ইতিহাসের এ ঘোর অবমাননা অবলীলা-

ক্রমে তাঁহারা সন্দর্শন করিলেন, একটী কথা বলিতে অবসর পাইলেন না, আশ্চর্য্য কথা।

১। সে যা'ক, হরিদাস হিন্দু ছিলেন, একথা ভাবিবার কএকটী সূক্ষ্ম হেতু প্রদর্শিত হইয়া থাকে। "সে সময়ে হিন্দুধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ, প্রচুর অর্থলোভেও ব্রাহ্মণ সন্তানেরা তখন ম্লেচ্ছের সংস্পর্শে আসিতেন না।" (ভক্ত-চরিতামৃত)। সেই সময়েই আবার ফুলিয়ার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ হরিদাসের সংস্পর্শে আসিতেন, প্রত্যহ একবার তৎসহ সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। কেহ বলিতে পারে—হরিদাস মূলে যবন ছিলেন না বলিয়াই ব্রাহ্মণগণ সেই হিন্দুধর্ম্মের প্রবল প্রতাপের কালেই হরিদাসের সংস্পর্শে আসিতে ভয় করিতেন না।

২। অদ্বৈত প্রভু হরিদাসকে "শ্রাদ্ধপাত্র" ভোজন করাইয়াছিলেন। (চরিতামৃত)। একমাত্র বেদজ্ঞ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণই "শ্রাদ্ধপাত্র" ভোজনের অধিকারী। সত্য বটে—পরম-ভক্তিপরায়ণ বলিয়াই হরিদাসকে "শ্রাদ্ধপাত্র" দেওয়া হয়, কিন্তু সমাজের সাধারণ লোক আর ভক্তির অনুরোধে কিছু সামাজিকতা ত্যাগ করে না,—বিশেষ সে ভক্তিশূন্য কালে। সত্য বটে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল, জাতিভেদ প্রায় রহিত হইয়াছিল; কিন্তু সে কেবল বৈষ্ণব সমাজে। অন্যথা—নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহের পূর্ব্বে "গাই গোত্র" উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে উপবীত ধারণ করিতে হইত না। অদ্বৈত প্রভু যখন হরিদাসকে ব্রাহ্মণযোগ্য ঈদৃশ সম্মান করিতেছিলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ দিগম্বর শিশু মাত্র। তবে সে সময়ে অদ্বৈতের এ সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্যের—এ অসম সাহসের মূলে অন্য কিছু যে ছিল না, তাহার প্রমাণ কি? কেহ বলিতে পারে—জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ সন্তান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ব্রাহ্মণযোগ্য সদাচার ও নিষ্ঠাদি ছিল, তিনি হিন্দুসমাজে একপ্রকার পরিগৃহীত হইয়াছিলেন বলিয়া "শ্রাদ্ধপাত্র" দেওয়ায় হিন্দুগণ আপত্তি করেন নাই।

৩। কুলীন গ্রামের সত্যরাজ ও রামানন্দ বসু সন্ন্যাসের পর (দক্ষিণ ভ্রমণ কালে) মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হন, তাহার বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ চৈতন্যের ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে, হরিদাস কুলীন গ্রামের একটী বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদ্বয়কে শিষ্য করেন।

"তার উপশাখা আর কুলীন গ্রামীজন। সত্যরাজ রামানন্দ তার কৃপার ভাজন।" চরিতামৃত।

কেহ বলিতে পারে—ব্রাহ্মণসন্তান না হইলে কুলীনগ্রামী হরিদাসের এরূপ বাধ্য হইতেন না। কাজিকৃত প্রহারে হরিদাসের 'মৃত্যু (সমাধি) ও তাঁহার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি'কে (কর্ণপূরকৃত চৈতন্য চন্দ্রোদয়) হিন্দুসমাজ তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত গণ্য করিয়াছিল এবং তাহাতেই তিনি সমাজে একপ্রকার গৃহীত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় সেই হিন্দুধর্ম্মের প্রবল প্রতাপের কালেও কুলীনগ্রামী হরিদাসের অনুগত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের পূর্ব্বে শূদ্রের কাছেই শিষ্য হইবার প্রথা ছিল না, তখনও হিন্দুসমাজ-গ্রন্থি শিথিল হয় নাই। সে সময়ে একটী খাঁটি যবনের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিতে কুলীন গ্রামী সাহস করিতেন, বোধ হয় না।

৪। হরিদাস যখন গৃহত্যাগ করিয়া বেণাপোলের জঙ্গলে বাস করিতেছিলেন, তখন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের অন্ন গ্রহণ করিতেন না; পরেও না। কেন?

"রাত্রে দিনে তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন। ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহন।"—চৈ: চ:।

এ সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্ত এই যে, হরিদাস ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন, যখন তিনি প্রতিপালকের গৃহত্যাগে স্বাধীন হইলেন, হিন্দুসমাজের সহিত সংশ্রব রাখিতে সেই কারণে তিনি যত্ন করিতেন, সেই কারণে তখন ব্রাহ্মণেতর জাতির অন্ন গ্রহণ করিতেন না। যদি হরিদাস সম্বন্ধে পরম্পরাপ্রচলিত প্রাচীন কোন জনশ্রুতি থাকে, আর যাঁহারা সে সংবাদ অধিকতররূপে রাখিবার সম্ভব, তাঁহাদের মত এইরূপ।

৫। কাজি হরিদাসকে যখন মুসলমান ধর্ম্ম পুনঃগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, আর উত্তরে হরিদাস যাহা বলেন,—উদ্ধৃত হইয়াছে। অঘোর বাবু বলেন যে, হরিদাস ব্রাহ্মণ হইলে কাজিকে উত্তর দিতেন, হরিনাম করাই তাহার কুলধর্ম্ম ইত্যাদি। কিন্তু,

"হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ। আপন ইচ্ছায় হয় আসিয়া যবন।" ইত্যাদি

লিখার ভঙ্গীতে কি তাহাই বুঝাইতেছে না? বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই যে, উদ্ধৃত পয়ারে "ব্রাহ্মণ" শব্দ থাকায় তাহাই নির্দ্দেশিত হইতেছে। বিশেষত্ব বোধক "ব্রাহ্মণ" শব্দ দিবার অভিপ্রায় তাহাই। "আপনি যে মৈল তারে মারিয়া কি কর্ম্ম।" এই পদে হরিদাসের মনের কি অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে? "আমার প্রতি আর অত্যাচার করিও না" এই ভাব কি প্রকাশ পাইতেছে না? যদি তাই হয়, তবে অঘোর বাবুর কথাই হইল।

৬। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে উচ্চ নীচাদি কুলভেদ আছে, তাহাতেই বৃন্দাবনের "সগৌড়িয়া বিপ্র" মহাপ্রভুর কাছে হীনকুলোৎপন্ন বলিয়া স্বীয় পরিচয় দেন। হরিদাসের পিতা, ব্রাহ্মণের উচ্চ কি নীচ শ্রেণীতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কে বলিবে? বিশেষতঃ হরিদাস যবনপালিত হওয়ায় নীচ জাতি বলিয়া পরিচয় দিবেন, আশ্চর্য্য নহে। এবং এইরূপ যবনসংস্পৃষ্ট হরিদাসকে "যবন হরিদাস" "হীনজাতি" প্রভৃতি বলা অসঙ্গত হয় নাই। বস্তুতঃ এরূপ ব্যবহার বৈষ্ণবগ্রন্থে অপরাপর স্থলেও দৃষ্ট হয়।

যথা—চৈতন্যচরিতামৃতে :—

"নীচ শূদ্র যারে করে ভক্তির প্রকাশ। ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহায় রায় করি বক্তা। আপনে প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা। হরিদাস যারায় নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ। সনাতন যারায় ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস।" ইত্যাদি।

এ স্থলে শূদ্র একমাত্র রামরায় এবং নীচ হরিদাস ও সনাতনের প্রতি প্রযুজ্য হইয়াছে। কিন্তু সনাতন মহাবংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ সন্তান।

৭। "মর্য্যাদা রক্ষণ এই সাধুর ভূষণ।" হরিদাস ও সনাতন এই মর্য্যাদা রক্ষার্থ নীলাচলের মন্দির সন্নিকটে যাইতেন না।

অঘোর বাবুর 'অকাট্যযুক্তি' এই যে, হরিদাস নিজ মুখে বলিয়াছেন :—

"হীনজাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর। হীনকর্ম্মে রত মুই অধম পামর।"—চৈঃ চঃ।

তিনি ব্রাহ্মণ পুত্র হইলে মহাপ্রভুর কাছে এ কথা কখনই বলিতেন না। কিন্তু চরিতামৃতে দেখি যে, ব্রাহ্মণ সন্তান সনাতনও এইরূপ হীনজাতি বলিয়া মহাপ্রভুর কাছে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন।

সনাতনের উক্তি যথা চরিতামৃতে :—

"নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ। তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ।"

নীচ সঙ্গী অর্থাৎ মুসলমানের সঙ্গী; কেননা সনাতন সৈয়দ হুসেন সার মন্ত্রী ছিলেন। আবার জগাই মাধাইয়ের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :—

"ব্রাহ্মণ জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর। নীচ সেবা না করে নহে নীচের কূর্প্পর।"—চৈঃ চঃ।

এখন, "ব্রাহ্মণ জাতি তারা" ইত্যাদি বলিয়া সনাতন জগাই মাধাইয়ের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন। তবে কি সনাতন ব্রাহ্মণ সন্তান নহেন? যাঁহারা আপনাদিগকে 'তৃণাদপিনীচ' মনে করিতেন, যবন সংশ্রবে থাকিয়া যাঁহারা আপনাদিগকে পতিত মনে করিতেন, নিজ মুখে তাঁহাদের এইরূপ আত্মপরিচয়ই সঙ্গত। তাই বলিয়াই কি তাঁহাদের কথা,—তাঁহাদের দৈন্যবাক্য, অর্থান্তরে বিবেচিত হইবে? তাই বলিয়াই কি ব্রাহ্মণসন্তানের যবনত্ব প্রতিপাদিত হইবে?

৮। অঘোর বাবু বলেন—হরিদাস ব্রাহ্মণসন্তান হইলে সে "বৃত্তান্ত বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতে অবশ্যই উল্লেখ করিতেন।" অবশ্য উল্লেখ করিতেন, তাহা বলা যায় না। কেননা, এতদপেক্ষা গুরুতর বিষয়ও বৃন্দাবন দাস বর্ণন করেন নাই। হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ মালা জপ করিতেন, বৈষ্ণব গ্রন্থকারের অবশ্য বর্ণিতব্য এই বিষয়টীর উল্লেখ চৈতন্যভাগবতে নাই। হরিদাসের মহিমা প্রকাশক বারবনিতার বিবরণ বৃন্দাবন দাস বলেন নাই; আরও অনেক কথা বলেন নাই। অতএব তিনি ব্রাহ্মণসন্তান হইলেই সে কথা অবশ্য বিবর্ণিত থাকিত, বলা যায় না। হরিদাসের জন্ম বিবরণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র বলিবার চেষ্টা বৃন্দাবন দাস করেন নাই। যে দুই এক স্থানে হরিদাসকে যবন বা নীচ বলা গিয়াছে, তাহা ভজন ও বৈষ্ণব মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ। তাহার মূল্য অধিক নহে। তাহা একমাত্র হরিদাসের প্রতি প্রযুজ্য, এ কথা কি অঘোর বাবু বলেন ?

যথা—জাতি কুলে ইত্যাদি।

যথা—যেতে কুলে ইত্যাদি।

অঘোর বাবু টীকায় প্রেমদাসের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা চৈতন্য ভাগবতের প্রতিধ্বনি মাত্র। তাহার আর পৃথক উত্তর দেওয়ার আবশ্যক দেখিতেছি না।

৯। প্রাচীন গ্রন্থকারগণের বর্ণনার একটী ক্রম দৃষ্ট হয়। প্রধান প্রধান বৈষ্ণব গ্রন্থকার কেহই পূর্ব্ববর্ণিত বিষয় পুনঃ বর্ণন করেন নাই। তবে পূর্ব্ব গ্রন্থকারের বর্ণনাবশিষ্ট পরিপুষ্ট করিতে যথেষ্ট যত্ন করিতেন, পূর্ব্ব গ্রন্থকারের অপূর্ণ বর্ণনা পূর্ণ করিতেন। এই জন্যই চৈতন্য ভাগবতে যে চরিত্রের যে অংশ বর্ণিত হয় নাই, কৃষ্ণদাস তাহা লিখিয়াছেন। চরিতামৃতে যাহা লিখেন নাই, ভক্তিরত্নাকরাদিতে তাহা পাওয়া যায়। এই ক্রমানুসারে চৈতন্য সঙ্গীতা গ্রন্থে বহুতর অভিনব কাহিনী বর্ণিত আছে। সেই অভিনব কাহিনী সকলের মধ্যে হরিদাসের বাল্যবিবরণ একটী। তাহা এই :—

"প্রভুর প্রধান ভক্ত ব্রহ্ম হরিদাস। শুন সবে যেই রূপে তাহার প্রকাশ। সুমতি নামেতে দ্বিজ হরিপরায়ণ। গৌরী নামে নারী তার সতীতে গণন। হরিনামে ব্রহ্ম এই করিয়াছে সার। কত দিনে এক পুত্র হইল তাহার। নাম ব্রহ্ম এই মাত্র মনেতে বিশ্বাস। রাখিল পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদাস। আয়ুশেষে কৈল দ্বিজ স্বর্গে গমন। গৌরীদেবী পতিসহ সহগামী হন। * * * * * * ছয় মাসের পুত্র রাখি যবন আলয়। যবন আপন পুত্র সমান পালয়।" ইত্যাদি।

১০। অঘোর বাবুর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর যথাযথ লিখিত হইল।

বিষয়টী ভিত্তিবিহীন জনশ্রুতি মাত্র বা আমার মনঃকল্পিত নহে; এখন মানা না মানা হৃদ্‌গত বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

হরিদাস যবন-সন্তান হইলে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা আছে। ব্রাহ্মণ-সন্তান সাধু হইলে আর বিশেষ কি? তাহার তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যবন বৈষ্ণব হইলে হিন্দুর, বৈষ্ণব ধর্ম্মের গৌরব আছে। গৌরব আছে বলিয়া এক দেশ দর্শন করা 'সুবুদ্ধির পরিচায়ক' নহে।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব। ঋগ্বেদকেই অনেকে প্রাচীনতম গ্রন্থ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা কত হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, স্থির করা সহজ নয়। হার্ গিঞ্জেল (Herr Ginzel) নামক একজন জর্ম্মান জ্যোতির্ব্বিদ্ পুরাকালের গ্রহণসমূহের কালনির্ণয় করিতেছেন। ঋগ্বেদে চারিবার গ্রহণের উল্লেখ আছে। সুতরাং তিনি উহার রচনাকাল নির্ণয় করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। সকলেই জানেন আর্য্য ঋষিগণ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে পঞ্জাব অঞ্চলেই আগমন ও বাস করেন। সুতরাং বহু পূর্ব্বে কোন্ কোন্ বৎসরে উক্ত প্রদেশে গ্রহণ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। অব্‌-জার্ভেটরী (Observatory) পত্রিকা বলেন, গিঞ্জেল সাহেব স্থির করিয়াছেন, যে খৃষ্টপূর্ব্ব ১২৫০ হইতে ১৩৮৬ অব্দের মধ্যে লাহোরে তিনটি বৃহৎ সূর্য্যগ্রহণ লক্ষিত হইয়া থাকিবার কথা; এবং এই গ্রহণত্রয় ঋগ্বেদোল্লিখিত গ্রহণ গুলির সহিত অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। এই তিনটির প্রথমটি ১৩৮৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ২৮শে নবেম্বরের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, দ্বিতীয়টি ১৩০১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ৪ঠা নবেম্বরের প্রায় মধ্যাহ্নে, এবং তৃতীয়টি ১২৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ লক্ষিত হইয়াছিল। চতুর্থটির তারিখ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

সর্পের সর্পভক্ষণ। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের কোন কোন কাগজে একটা খবর বাহির হয় যে, আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটা বৃহৎ বোড়া সাপ আর একটা বড় বোড়া সাপকে গিলিয়া ফেলিয়াছে।

ঘটনাটা কিন্তু ঘটিয়াছিল লণ্ডনের চিড়িয়াখানায়। সুতরাং, আমরা আলিপুরের জীবনিবাসের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়কে খবরটা ঠিক্ কি না, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, "হইতে পারে, কিন্তু আমি জানি না।" এই উত্তর পাইয়া অনেক সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে একটা পুরাতন গল্প মনে পড়িল। এক ব্যক্তি নিজের একজন বন্ধুকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "কিহে, আমি যে শুনেছিলাম যে তুমি মারা প'ড়েছ।" বন্ধু বলিলেন, "কই না; এই তো তোমার সম্মুখেই রয়েছি।" প্রথম বক্তা বলিলেন, "না না, তুমি নিশ্চয়ই মারা প'ড়েছে; আমি খুব বিশ্বস্ত লোকের কাছে শুনেছি; তিনি তো মিথ্যা কথা বল্‌বার লোক নন।" সে যাহাই হউক, লণ্ডন জীবনিবাসের এই ঘটনা ১৮৯৪ সালের ২৬এ অক্টোবরের টাইম্‌স্ কাগজে বাহির হইবার পর আর্থার ই. ভিনী নামক একজন সাহেব দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপ কলোনি হইতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি টাইম্‌স্ কাগজে লিখিয়া পাঠান। "এই অঞ্চলে সম্প্রতি একটা বড় কাল সাপ মারিয়া ফেলা হয়। ইহার দৈর্ঘ্যের তুলনায় শরীরটা বেশী মোটা বোধ হওয়ায় পেট চিরিয়া ফেলা হয়। তাহাতে দেখা গেল, ইহার ভিতর প্রায় ইহার সমান লম্বা একটা হরিদ্রাবর্ণ সাপ রহিয়াছে। হরিদ্রাবর্ণ সর্পের ভিতর আবার একটা বড় কাল সাপ ছিল; এবং এই শেষোক্ত কৃষ্ণ সর্পের উদরে ৩০ টা ডিম ছিল। প্রত্যেক ডিম্বের ভিতর এক একটা ছানা ছিল। এই উদররূপ সমাধিতে থাকায় তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একটা সাপের ভিতর সর্ব্বশুদ্ধ বত্রিশটা সাপ ছিল।"

নস্যভোজন। সর্ব্বদেশেই নাসারন্ধ্রের ভিতর নস্য প্রয়োগের রীতি আছে বলিয়াই জানিতাম; কিন্তু মাডাগাস্কার দ্বীপের লোকেরা এ বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। তাহারা অপরের অনুকরণ না করিয়া "মৌলিকত্ব" দেখাইয়াছে। তাহারা মুখবিবরে নস্য গ্রহণ করে!

অপরাধ-প্রবণতা। আমাদের দেশে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ কয়েদীর সংখ্যা অনেক অধিক। অনেকে মনে করিতে পারেন, নারী-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতা ইহার কারণ নয়, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অপরাধে লিপ্ত হইবার সুযোগ পায় না বলিয়াই স্ত্রী অপরাধীর সংখ্যা এত কম। কিন্তু হঠাৎ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা

স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র গতিবিধি করে এবং নিজ নিজ জীবিকা অর্জ্জন করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও তো পুরুষের তুলনায় অল্প স্ত্রীলোকেই অপরাধিনী বলিয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়। অনেকে বলিবেন, আমাদের দেশে অবরোধ প্রথা থাকায় স্ত্রীলোকেরা অপরাধিনী হয় না। অতএব যে সকল দেশে অবরোধ প্রথার লেশমাত্র নাই, তথাকার অবস্থা কিরূপ দেখা যাক্। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরী হইতে প্রকাশিত International Journal of Ethics নামক সুবিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে নিম্নলিখিত মত অভিব্যক্ত হইয়াছে। লেখক বিলাতের কথা বলিতেছেন। "অপরাধপ্রবণতার সহিত লিঙ্গভেদের বিশেষ সম্পর্ক আছে। আমাদের কারাগারসমূহে ২১ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক ১০০ জন অপরাধীর মধ্যে ৮৪ জন পুরুষ, ১৬ জন মাত্র স্ত্রীলোক। চরিত্র-সংশোধক বিদ্যালয়-সমূহে (Reformatory Schools) ১০০ জনের মধ্যে ৮৫ জন বালক ১৫ জন বালিকা। এইরূপ সর্ব্বত্রই বালক অপরাধীর সংখ্যা বালিকাদের অন্ততঃ পাঁচ গুণ বেশী। [অতঃপর লেখক অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগেরই সংখ্যার উল্লেখের কারণ বলিতেছেন।] অনেকে বলেন, অপরাধ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার প্রভেদ প্রধানতঃ স্ত্রীলোক এবং পুরুষের সামাজিক কার্য্যবিভাগের বিভিন্নতা হইতে উৎপন্ন। এই কথার মধ্যে যে অনেকটা সত্য আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা যদি সম্পূর্ণরূপে সত্য হইত, তাহা হইলে যে সকল স্থলে স্ত্রী ও পুরুষ একই অবস্থার মধ্যে কার্য্য করে এবং যে বয়সে তাহাদের মধ্যে জীবন বা অবস্থাগত কোন প্রভেদ জন্মে নাই, সেই সকল স্থলে এবং সেই বয়সে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমান অপরাধপ্রবণ হইত। ১৪ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকবালিকার মধ্যে কার্য্যতঃ অবস্থা, কার্য্য বা সামাজিকজীবনগত কোন প্রভেদই নাই। [মনে রাখিতে হইবে, লেখক বিলাতের কথা বলিতেছেন।] এই বয়স পর্য্যন্ত বালকবালিকাগণ একই ভাবে পালিত ও শিক্ষিত হয়। তাহারা একই প্রকার তত্ত্বাবধায়কতার অধীন থাকে; তাহাদের সামাজিক জীবন প্রধানতঃ একই প্রকার থাকে। অথচ দেখা যায় যে ১৪ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকের অপরাধী হইবার সম্ভাবনা, তুল্যবয়স্কা বালিকার অপেক্ষা পাঁচ গুণ অধিক। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোক এবং পুরুষ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।" নারীপ্রকৃতির উৎকর্ষের ইহা একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

মশার রক্ত শোষণ। অনেকে হয় ত জানেন না যে, মশা যে রক্ত শোষণ করে, তাহা তাহার শরীরের পুষ্টি বা রক্ষার জন্য আবশ্যক নহে। তবে রক্ত যে তাহার কি কাজে লাগে, এখনও তাহা স্থির হয় নাই। মশা সম্বন্ধে আর একটি কৌতুকজনক তত্ত্ব আছে। পুরুষজাতীয় মশা দংশন বা রক্ত শোষণ করে না। স্ত্রী-মশারাই রক্ত খায়।—আমাদের দেশে কন্যার বিবাহে কম রক্ত শোষিত হয় না! সেটা কিন্তু কন্যার দ্বারা হয় না।

গণিত-শাস্ত্রে বিদুষী নারী। সোফী কোবালেব্স্কী রুশীয়াদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুইডেনের অন্তঃপাতী ষ্টক্হল্ম্ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ গণিতের অধ্যাপক (অধ্যাপিকা ?) ছিলেন। ইউলার এবং লাগ্রেঞ্জের সহিত তাঁহার নাম গণিতবিষয়ক পুস্তকাদিতে সমান সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইয়া থাকে। অল্পবয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জীবন উপন্যাস-সুলভ ঘটনাবৈচিত্রে পূর্ণ। তাঁহার পিতা সেনানী ক্রোকোব্স্কী একদিন দ্যূত ক্রীড়ায় এত টাকা হারিয়া আসেন যে, নিজ পত্নীর জড়োয়া অলঙ্কার বন্ধক দিতে বাধ্য হন। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরেই সোফী জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার জীবনের আরম্ভটা ভাল হয় নাই। ইহার উপর তাঁহার মাতা রূপসী ও "ফ্যাশন"-প্রিয়া ছিলেন। কন্যার কোন যত্নই হইত না। সুতরাং তাঁহার জীবনের প্রভাত দেখিলে মধ্যাহ্ন যে ভাল হইবে, এরূপ মনে না হইবারই কথা। ক্রোকোব্স্কী পরিবার খুব সম্ভ্রান্ত অভিজাত-বর্গের অন্তর্গত ছিল। তাহারা হঙ্গেরীর রাজা ম্যাথিয়স্ কর্ভিনসের বংশোদ্ভূত বলিয়া বংশগৌরবে গর্ব্বিত ছিল। সেনানী ক্রোকোব্স্কী পালিবিনো নামক একটি সুদূর পল্লীগ্রামে জীবনের শেষ ভাগ যাপন করিবার জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া তথায় বাস করিতে গিয়াছিলেন। এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে দিগন্তব্যাপী সমতলক্ষেত্র ও গভীর অরণ্য ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য ও জনকোলাহল হইতে ইহা এতই দূরে ছিল যে, এখানে সপ্তাহের মধ্যে একবার মাত্র চিঠি লইয়া ডাকহরকরা আসিত। সুতরাং ক্রোকোব্স্কী মনে করিলেন, এখানে তাঁহার সন্তানগণ—এক পুত্র ও দুই কন্যা—সামাজিকবিপ্লব-সংসাধক নূতন নূতন মতের প্রভাব হইতে অতিদূরে নিরাপদে থাকিবে। কিন্তু সেনাপতি মহাশয় তাঁহার কন্যাদ্বয়কে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রুশীয়ার রাজধানী সেণ্টপীটার্সবর্গে লইয়া গেলেন। তথায় "সোনিয়া" (সোফীর আর একটি নাম) গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা

দেখাইতে লাগিল। ইহাদের পরিবারের একজন বন্ধু সেনাপতিকে তাঁহার কন্যার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সোফীর পিতা তাহার উন্নতিতে ভীত হইলেন, এবং শিক্ষার জন্য কন্যাকে বিদেশে রাখিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইহাতে কিন্তু কন্যাদ্বয় নিরস্ত হইল না। তাহাদের "ঈনা" নাম্নী এক সখি ছিল, তাহারও অবস্থা তাহাদেরই মত। তাহারা ঈনার সহিত পরামর্শ করিয়া এক বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করিল। তাহারা স্থির করিল, একটা "জাল" বা "কাল্পনিক" বিবাহ করিবে; তাহা হইলেই তাহারা স্বাধীন হইতে পারিবে। অর্থাৎ তাহাদিগকে পিতার অধীন থাকিতে হইবে না, অথচ প্রকৃত বিবাহে যেরূপ স্বামীর অধীন হইতে হয়, তাহাও হইবে না। তাহারা প্রথমে একজন যুবা অধ্যাপককে এই অদ্ভুত বিবাহাভিনয়ের নায়কত্ব গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইল না। তাহার পর বয়োজ্যেষ্ঠা দুইটী যুবতী ব্লাডিমির কোবালেবস্কী নামক এক ছাত্রের নিকট পূর্ব্বোক্ত "কাল্পনিক" বিবাহের প্রস্তাব করিল। ছাত্র এই সর্ত্তে প্রস্তাবে সম্মত হইল যে সে সোফীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে কিম্বা ঈনাকে "কাল্পনিক" পত্নীরূপে গ্রহণ না করিয়া "সোফী"কেই মনোনয়ন করিতে পাইবে। অতঃপর সোফী প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিয়া পিতার নিকট বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিল। পিতা অবশ্য রোষের সহিত নিজের সম্পূর্ণ অনভিমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সোফী স্বাধীনতার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অনেকগুলি উপন্যাসও পড়িয়াছিল। সে জোর করিয়া পিতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার অনুমতি আদায় করিল। যুবা ছাত্র ব্লাডিমির কোবালেবস্কী ও সোফীর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিবাহ হইল। বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁহারা অধ্যয়নার্থ জার্ম্মেনী যাত্রা করিলেন। তাহার পর হাইডেলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের বিচিত্র জীবনের সূত্রপাত হইল। "স্বামী" ভূতত্ত্ব (Geology) এবং "পত্নী" গণিতের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সোফী কোবালেবস্কীর অসাধারণ প্রতিভার কথা অধ্যাপক মহলে আলোচিত হইতে লাগিল। স্বামী স্ত্রীর কার্য্যবিভাগের এস্থলে বৈপরীত্য ঘটিল। সোফী তপশ্চর্য্যার মত একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সহিত গণিত চর্চ্চা করিতেন। ব্লাডিমির বাজার করিতেন, এমন কি দরজির সহিত সোফীর পরিচ্ছদ কিরূপ হইবে, তাহাও আলোচনা করিয়া স্থির করিতেন। শেষোক্ত কাজটা যে কত কঠিন, তাহা একমাত্র

সাটীপরিহিতা বঙ্গনারীগণ বা তাঁহাদের সম্পর্কীয় পুরুষেরা বুঝিবেন না। তাঁহাদের সঙ্গে আর একটি ছাত্রী বাস করিতেন। তিনি ইঁহাদের একটি বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, সোফী ও ব্লাডিমিরের মধ্যে, লোকে প্রেম বলিলে যে একটা জঘন্য মানসিক ব্যাধি বুঝে, তাহা ছিল না; তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অতি গভীর আধ্যাত্মিক প্রীতি ছিল।

সোফীর ভগিনী কিছুকাল পরে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, যে কালক্রমে সোফী তাঁহার স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অকৃত্রিম অনুরাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। দাম্পত্য-প্রেমের অভিনয় করিতে গিয়া সোফী সত্য সত্যই ব্লাডিমিরকে প্রাণ মন সঁপিয়া দিয়াছেন। প্রেম লইয়া খেলা আর আগুন লইয়া খেলা, একই কথা। স্বামীর কিন্তু "বিবাহ" নাটকের এই নূতন অঙ্ক ভাল লাগিল না। বিদ্যাদেবীই এখনও তাঁহার হৃদয়েশ্বরী ছিলেন। তিনি হাইডেলবর্গে সোফীকে ফেলিয়া অধ্যয়নার্থ জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিলেন। সোফী প্রোষিতভর্তৃকা অবস্থায় পতির অবহেলার পাত্রী হইয়া হাইডেলবর্গে মনোদুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া তিনি এখন এরূপ অনুরাগের সহিত গণিতের উচ্চাঙ্গ সকলের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার তাৎকালিক অনুশীলনই তাঁহার ভবিষ্যৎ যশোমন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রেমের অভিনয়ের শেষ কয়েকটী অঙ্ক অভিনীত হইতে এখনও বাকী ছিল। এক্ষণে তাঁহার স্বামীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল। উভয়ে কিছুকাল পারিস সহরে অন্যান্য দম্পতির মত বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়েই সোফীর একমাত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। দম্পতির পুনর্মিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। এরূপ একঘেয়ে উত্তেজনাবিহীন জীবন সোফীর ভাল লাগিল না, তিনি জার্ম্মেনীতে ফিরিয়া গেলেন; এবং অবশেষে ব্লাডিমির কোবালেবস্কী উন্মাদগ্রস্ত হইয়া তাঁহারই নামধারিণী নারী হইতে দূরে প্রাণত্যাগ করিলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি ষ্টক্‌হল্‌ম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে তথাকার গণিতাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৮৮ সালে তিনি ফরাসীশ বিজ্ঞান পরিষদের (French Academy of Sciences) সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। এখন তাঁহার সম্মানের আর সীমা রহিল না। তিনি যখন ভ্রমণ করিতেন, তখন রাজ্ঞীর মত সমাদর ও সম্মান পাইতেন। কিন্তু ইহাতেও

সোফী সুখী হইলেন না। তিনি প্রেমের অভাবে জীবন্মৃতা ছিলেন। এই প্রেমপিপাসাই পৃথিবীর মধ্যে অতি উচ্চস্থানীয় এই বৈজ্ঞানিক জীবনের অকাল পরিসমাপ্তির কারণ হইয়াছিল।

১৮৮৮ অব্দের প্রারম্ভে বিবি সোফী কোবালেবস্কী "ক—" নামক এক রুশীয় ভদ্র লোকের গভীর প্রেমে নিমগ্ন হন। "ক—" প্রথম প্রথম সোফীর বুদ্ধি বিদ্যারই উপাসক ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ; তাঁহার নারী-সুলভ রূপ গুণে আকৃষ্ট হন নাই। সোফী প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে এই বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যে তিনি বাস্তবিকই কেবল নারী মাত্র, আর কিছু নহেন। যদি তাঁহাকে ভালবাসিতে হয়, নারী বলিয়াই বাসিতে হইবে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য নয়। পরিশেষে "ক—" র প্রাণে প্রেমের আগুন জ্বলিল। তিনি বলিলেন, "তুমি আর সকল ছাড়িয়া আমার পত্নী হও,—কেবল আমার পত্নী হও।" সোফী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কার্য্য ও বিদ্যানুরাগ এবং প্রেম এই উভয়ের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, পরিশেষে তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। তিনি ষ্টকহল্মে ফিরিয়া গেলেন। হঠাৎ এতই বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহার বন্ধুগণও কষ্টে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। তিনি শোক ও নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হইয়া ১৮৯১ অব্দ পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেবল জোনাস্ লাই নামক নরওয়েবাসী ঔপন্যাসিক ব্যতীত কেহই তাঁহার প্রকৃতি বা দুঃখ বুঝিতে পারেন নাই। লাই বলেন, যেমন একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে যতই সুন্দর জিনিষ দাও না কেন,সে যতক্ষণ তাহার প্রার্থিত কমলালেবুটি না পায়, ততক্ষণ "করুণ নয়নে" হাত বাড়াইয়া থাকে ; তেমনি সোফী[illegible] বিধাতা আর সকল সম্পত্তিই দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের পি[illegible] প্রেম না পাওয়ায় তিনি আজীবন অসুখীই ছিলেন।

[illegible] বলিয়াছেন—"প্রেম পুরুষের খেলার জিনিষ, কিন্তু ইহা না[illegible]রীর সর্ব্বস্ব।"

প[illegible]স্য। "কলা ঝলসাইতে লাগিল" ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে [illegible]হইয়াছিল। একজন ছাত্র লিখিয়াছেন, "roasted some plantations" ; আর একজন লিখিয়াছেন, "roasted some Plantagenets" ; অপর একজন লিখিয়াছেন, "roasted some plaintiffs"। কেহ মনে করিবেন না যে ইহা কল্পিত উত্তর। সত্য সত্যই এরূপ উত্তর

পাওয়া গিয়াছে। বধিরতা সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলা হয়। তাহাতে একটি ছাত্র নিম্নলিখিত গল্পটি লিখিয়াছেন।

একটি পরিবার ছিল. তাহার সকলেই কালা। জামাতাও বধির। একদিন জামাতা মাঠে লাঙ্গল দিতেছেন; এমন সময় একজন কনষ্টেবল তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিল, "আমাকে একটা পুকুর দেখাইয়া দিতে পার? জল খাইব।" জামাতা বাবাজি কালা। কনষ্টেবলের কথা বুঝিতে না পারিয়া গরু জোড়া ও লাঙ্গল ফেলিয়াই একেবারে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত। সেখানে গিয়া "তোর বাবা আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত পুলিস পাঠাইয়াছিল," শ্বশুরের কন্যা অর্থাৎ পত্নীকে এইবলিয়া প্রহার আরম্ভ করিলেন।

গল্পটি এই পর্য্যন্ত। বোধ হয়, কন্যাটিও কালা বলিয়া স্বামীর কথা শুনিতে ও প্রহারের কারণ বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক গল্পটি বলিয়া ছাত্র মহাশয় এই moral বা নীতি "আকর্ষণ" করিতেছেন,—"Therefore deafness is dangerous" অর্থাৎ বধিরতা বিপজ্জনক! বিপদ্‌টা কিন্তু বধিরের নয়; তাহার পত্নীরূপ জীবের!

ইতরপ্রাণীর পরার্থপরতা। অনেকে মনে করেন, মানুষের সমুদয় মানসিক বৃত্তি ও কার্য্য স্বার্থমূলক। প্রেম, বন্ধুত্ব, সহানুভূতি, জনহিতৈষণা,—কিছুই পরার্থমূলক নয়। দুই একজন বড় বড় দার্শনিকও এইরূপ মনে করেন। এই মতের বিরুদ্ধে International Journal of Ethicsএ একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। লেখক বিবর্ত্তন বাদের (Evolution) দিক্ দিয়া এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। বিবর্ত্তনবাদিগণ বলেন, যেমন মানুষের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গই অবিকশিত বা অঙ্কুরাবস্থায় ইতরপ্রাণিগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মানুষের মানসিক বৃত্তিসমূহও অবিকশিত অবস্থায় ইতরপ্রাণীতে লক্ষিত হয়। ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত ফেব্রুয়ারী মাসের "দাসী"তে দেওয়া হইয়াছে। এই মুখবন্ধ করিয়া লেখক বলিতেছেন যে, যদি ইতরপ্রাণিগণের মধ্যে পরার্থপরতার সত্তা প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে মানবের প্রেম, বন্ধুত্বাদিও যে পরার্থপরতাপ্রসূত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিবে না। তৎপরে তিনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

লবক সাহেব পিপীলিকাগণের জীবন, প্রকৃতি ও ব্যবহার বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। পিপীলিকাগণের হৃদয় সম্বন্ধে তাঁহার মত ভাল নয়। তথাপি তিনি পিপীলিকাগণের পরার্থপরতার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। "হস্ত" বিহীন একটি পিপীলিকা ভিন্ন জাতীয় এক পিপীলিকা কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। এমত অবস্থায় ইহাকে ইহার স্বজাতীয় একটি পিপীলিকা দেখিতে পাইল। সে অতিশয় যত্ন ও মনোযোগের সহিত তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিল; তাহার পর উহাকে নিজেদের বাসায় বহন করিয়া লইয়া গেল। লবক বলেন, "এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার মধ্যে দয়া

বৃত্তির বিদ্যমানতা অস্বীকার করা অসম্ভব।” রোমেঞ্জ্ সাহেব ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “বেল্ট সাহেব বলেন, ‘আমি একদিন পিপীলিকাগণের একটি উপনিবেশ দেখিতেছিলাম। তাহাদের একটির উপর আমি একটা ছোট পাথর চাপাইয়া দিলাম। উহার অব্যবহিত পরে যে পিঁপড়াটি ছিল, সে সঙ্গীর এই অবস্থা দেখিয়া পিছাইয়া গেল, এবং অতিশয় উত্তেজিত ভাবে অপর পিপীলিকা সকলকে এই কথা জানাইল। সকলেই বিপন্ন সঙ্গীর উদ্ধারার্থ দৌড়িয়া আসিল। কেহ কেহ কামড়াইয়া পাথরটি সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অপর কয়েক জন এরূপ জোরে কয়েদীটির পা ধরিয়া টানিতে লাগিল যে আমার মনে হইল যে, উহার পা দুখানা বুঝিবা ছিঁড়িয়া আসে। কিন্তু সহচরবর্গের অধ্যবসায়ের প্রভাবে পরিশেষে সে মুক্তিলাভ করিল। ইহার পর আমি কেবল একখানা “হাত” বাহিরে রাখিয়া একটা পিঁপড়ার সর্ব্বাঙ্গ কাদা দিয়া ঢাকিয়া দিলাম। ইহার সহচরেরা শীঘ্রই তাহা দেখিতে পাইল; এবং একটু একটু করিয়া দাঁত দিয়া কাদাটুকু সরাইয়া সঙ্গীর উদ্ধার সাধন করিল। আর এক সময় কতকগুলি পিপীলিকাকে পরস্পর হইতে দূরে দূরে সারি বাঁধিয়া যাইতে দেখিয়া, আমি একটাকে সারি হইতে কিছু দূরে লইয়া গিয়া মাথাটি বাহিরে রাখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাদা চাপা দিলাম। তাহার অনেক সহচর কিছু সন্দেহ না করিয়া চলিয়া গেল। পরিশেষে একজন উহার দুর্দ্দশা দেখিতে পাইয়া উহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু না পারিয়া চলিয়া গেল। আমি মনে করিলাম সে নিজ বন্ধুকে বিপদে ফেলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম সে জন বারো সহচর লইয়া উপস্থিত হইল, এবং একেবারে কাদাচাপা পিঁপড়াটির নিকট গিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিল। আমার বোধ হয়, ইহার মধ্যে সহজাত সংস্কার (instinct) ব্যতিরেকে আরও কিছু ছিল।’”

পিপীলিকাগণের এরূপ আচরণে কি স্বার্থ ছিল? কি পুরস্কারের প্রত্যাশা ছিল? কিন্তু আরও দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। রোমেঞ্জ্ সাহেব বলেন, পারিসের চিড়িয়াখানায় একটি উট পক্ষী পক্ষিণীর মৃত্যু হওয়ায় শোকে প্রাণত্যাগ করে। ইহাতে উট পক্ষীর কি স্বার্থ ছিল? সেকি পত্নীব্রত স্বামী বা প্রেমিক বলিয়া মৃত্যুর পর যশস্বী হইবে ভাবিয়া এরূপ করিয়াছিল, না, স্বর্গকামনায় এরূপ করিয়াছিল? দুই একমাস পূর্ব্বে এই কলিকাতা সহরে এবম্বিধ একটি ঘটনা পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল। শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে আমার এক বন্ধু থাকেন। তাঁহার বাসায় একটা নারিকেল গাছে চীলের দুইটি বাচ্চা হইয়াছিল। একদিন প্রাতে একটি ছানা মাটিতে পড়িয়া মারা গেল। দুপরে আর একটি গাছ হইতে পড়িয়া মরিয়া গেল। তাহাদের তখনও ডানা হয় নাই। ইহার পর তাহাদের মাতা পাখা গুটাইয়া মাটিতে পড়িল। উচ্চ স্থান হইতে পড়ায় মৃতপ্রায় হইয়া গেল। আমার বন্ধু তাহাকে অনেক যত্ন করিয়া তুলিয়া শুশ্রূষা করায় দুই একদিন পরে চীলটির প্রাণ রক্ষা হয়।

জেম্‌স্ ম্যাক্‌ম্ সাহেব একবার এক জাহাজে ছিলেন। তথায় দুটি বানর ছিল। তাহাদের পরস্পর কোন সম্পর্ক ছিল না। একদিন ছোট বানরটা সমুদ্রে পড়িয়া যায়। ইহা দেখিয়া বড়টা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে এক হাত দিয়া জাহাজের পার্শ্বটা ধরিল

এবং অপর হাত বাড়াইয়া নিজ শরীরে বাঁধা এক গাছি দড়ি ঝুলাইয়া ধরিল। জাহাজস্থ সকলে ইহা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন। বানরের সাহায্যে তাহার সঙ্গীর জীবন রক্ষা হইত না। কারণ দড়িটা ছোট ছিল। একজন নাবিক জলমগ্ন বানরটাকে রক্ষা করিল। যাহাই হউক, বড় বানরটার চেষ্টা সফল না হইলেও তাহার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল।

আর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে স্বার্থবাদীদের মতটা পরীক্ষা করিয়া দেখা থাক্। তাঁহারা বলেন, "সকল কার্য্যই স্বার্থপ্রসূত।" যদি দেখান যায় যে কোন কোন কার্য্য স্বার্থপ্রসূত নয়, তাহা হইলেই তাঁহাদের মত খণ্ডিত হইল। বাস্তবিক উল্লিখিত দৃষ্টান্ত গুলিতে ব্যক্তিগত কি স্বার্থ থাকিতে পারে? সন্তান বা স্ত্রীর শোকে মরিয়া ইতরপ্রাণিবিশেষের কি স্বার্থ সিদ্ধ হয়? স্বার্থবাদী বলিবেন, "যাহা আমাদিগ[illegible] মৃত্যুর দিকে আকৃষ্ট করে, মৃত্যু কামনা করায়, তাহা, পার্থিব সুখ[illegible]ক্ষা অধিক মূল্যবান্, অধিক স্থায়ী, অনন্ত সুখের আশা ব্যতীত আর [illegible] নয়।" আচ্ছা! এই মতটা ইতরপ্রাণিগণের সম্বন্ধে খাটে কি[illegible]। তাহারা কি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে,—পুরস্কারে, পর[illegible]স করে? তাহারা তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করে নাকি? ইহা অতি হাস্যক[illegible]।

অভিবাদন প্রথা। আমাদের দেশে প্রণাম বা নমস্কার করিয়া অভিবাদন করিতে হয়। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড ও নবজীল্যাণ্ডবাসীরা নাসিকা ঘর্ষণ করিয়া অভিবাদন্ করে। উত্তর-আমেরিকার আদিমনিবাসীরা কেহবা বক্ষঃস্থলে, কেহবা বাহুতে, কেহবা উদরে থাবড়া মারিয়া অভিবাদন করে। পলিনেসীয়গণ অপরের হস্ত বা পদদ্বারা নিজমুখে আস্তে আস্তে আঘাত করে। আফ্রিকার অন্তঃপাতী লোয়াঙ্গোদেশে হাততালি দিতে দিতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অগ্রসর হওয়া ও পিছাইয়া যাওয়াই অভিবাদনের রীতি। আফ্রিকার ডেহমীদেশের লোকেরা আঙ্গুল মটকায়। বাটঙ্গানেরা পিঠের উপর মাটিতে গড়াইতে গড়াইতে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উরুদেশে করাঘাত করিতে থাকে। আবিসিনীয়গণ আগন্তুকের করতল ধরিয়া তাহাতে থুথু ফেলার ভাণ করে। পলিনেসিয়া ও মালয়দেশের লোকেরা মান্য ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার সময় উপবেশন করিয়া কথা কয়; চীনেরা টুপি না খুলিয়া টুপি পরিয়া থাকে; মধ্য আফ্রিকার কঙ্গোনদীর তীরে এবং অন্যত্র সম্মান প্রদর্শন করিতে হইলে মান্য ব্যক্তির দিকে মুখ না ফিরাইয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনই রীতি। ফিজিদ্বীপে যদি কোন গুরু বা মান্য জন পা পিছ্‌লাইয়া মাটিতে পড়িয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার

অধস্তন সকলকেও তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে হয়। চীন ও শ্যামদেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করাই রীতি। মাডাগাস্কারদ্বীপের অধিবাসী মালাগাসী-দিগের প্রাচীন একটি প্রথা এই যে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট যাইতে হইলে শিশুর মত হামা দিয়া যাইতে হয় এবং তাঁহার পদলেহন করিতে হয়। চীনদেশে প্রণামের আটটি ক্রম, গ্রাম বা মাত্রা আছে। (১) হাত জোড় করিয়া বক্ষের সম্মুখে রাখা; (২) কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক নত করা; (৩) হাঁটু নত করা; (৪) হাঁটুগাড়িয়া বসা; (৫) হাঁটুগাড়িয়া মাটিতে মাথা ঠোকা; (৬) পঞ্চমেরই মত, অধিকন্তু তিনবার গড় করিতে হয়; (৭) ষষ্ঠের দ্বিগুণ; (৮) সপ্তমের দ্বিগুণ। সাহেবেরা সম্মান দেখাইবার জন্য টুপি খুলেন, কিম্বা টুপির প্রান্তদেশ স্পর্শ করেন। অনেক দেশে জুতা খুলাই রীতি। টাহিটীদ্বীপে সম্মান প্রদর্শনার্থ মস্তক হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত অনাবৃত করিতে হয়। আফ্রিকার অন্তঃপাতী উগাণ্ডার রাজার দাসীগণকে সম্মান প্রদর্শনার্থ রাজার সম্মুখে সম্পূর্ণ দিগ্বসনা হইতে হয়।

হিন্দু সৎকার সমিতি। অসহায় হিন্দুবংশীয় মৃত ব্যক্তির সৎ-কারার্থ উক্ত নামে একটি সমিতি হারিসন রোডে স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির উদ্দেশ্য ভাল এবং ইতিমধ্যেই উদ্দেশ্যানুযায়ী কিছু কিছু কার্য্যও হইয়াছে।

পৃথিবীর সেবক দল।

ধর্ম্ম সংস্কারে বল, সমাজ সংস্কারে বল, আর মানব সমাজের অন্য নানা-বিধ কল্যাণ সাধনেই বল, মানুষ আত্মোৎসর্গ না করিলে কোন কাজে সিদ্ধকাম হইতে পারে না। পাঁচ কাজে ছুটাছুটি করিতেছি, পাঁচ জনকে পাঁচ কাজে জীবনটাকে ভাগ করিয়া দিয়াছি, সময় নাই, অসময় নাই, কাজের জন্য পাঁচজনেই টানাটানি করিতেছে, কোন্ দিকে যাই, কার সেবা করি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না; এরূপ কার্য্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়া যাহাদের জীবনের দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে, হা হুতাশ করিতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে অশ্রুজল মোচন করিতে যাহাদের সমগ্র সময় কাটিয়া যাইতেছে, তাহাদের আত্মনিন্দায় ও পরশ্রীকাতরতায় সেবার সূত্রপাত হয় না। পৃথিবীর এই অসংখ্য জনমণ্ডলীর দুঃখ দারিদ্র্য সন্দর্শনে যাঁহারা আত্মবিস্মৃত হন, তাঁহারাই সেবকদলের অগ্রণী। নিজের অন্ন

সংস্থান নাই, কিন্তু অপরে খাইতে পাইতেছে না শুনিয়া যাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, তাঁহাদেরই প্রাণধারণ সার্থক, যাঁহারা আপনাদের প্রজ্জলিত জঠরানল বিস্মৃত হইয়া অন্যের ক্ষুধা নিবারণে ব্যস্ত, তাঁহাদের সেই ব্যস্ততার অন্তরালে কি সেই চির অনাহারী উপবাসী বিশ্বপ্রাণ মহাদেব দেবলীলা দেখিতে পাওয়া যায় না? হিন্দুগৃহের অতিথিসেবাপরায়ণ নিষ্ঠাবান লোকদের নিত্য জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। আমরা শৈশবে নিজেরাই স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক নিজের জন্য প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনে অভ্যাগত জনের পরিচর্য্যা করিয়া আহারজনিত তৃপ্তি অপেক্ষা শতগুণে অধিক সুখ অনুভব করিয়াছেন। এরূপও শুনা গিয়াছে যে নিজের ও নিজ পরিবার বর্গের অন্ন সংস্থান নাই, হয়ত সমস্ত দিন উপবাসেই কাটিবে, সেদিকে দৃষ্টি নাই, অতিথি সেবার জন্য বিব্রত ও ব্যস্ত। এখনকার এই ঘোর স্বার্থপরতার দিনে ইহা চিন্তা করিতেও প্রাণে পুণ্যের হাওয়া প্রবাহিত হয়।

আপনার দুঃখে সহজেই চক্ষে জল পড়ে, পরের দুঃখে সহজে কঠোর প্রাণ কোমল হয় না, পরের কাতরতায় শুষ্ক হৃদয়ে সহজে সমবেদনার সরস ভাব প্রকাশ পায় না, হৃদয়ের স্নেহ বিন্দু বিন্দু ক্ষরিয়া নয়ন প্রান্তে দেখা দেয় না। পরের দুঃখে সত্যসত্যই কাতর হওয়া অতি কঠিন কাজ; তবুও যদি কেহ কাঁদে তবে অবশ্যই বলিতে হইবে তাহার হৃদয়ে স্নেহ আছে, তাহার প্রাণে প্রেম আছে, তাহার চক্ষে জল আছে। কিন্তু এসকল ত গেল সাধারণ নিয়ম। পরের জন্য অসাধারণ কান্না কেহ কাঁদিয়াছে কিনা? পৃথিবীতে পরের জন্য প্রাণপাত করিয়া কাঁদিয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক না হইলেও নিতান্ত বিরল নহে। আমেরিকার থিওডোর পার্কার দাসদিগের দাসত্ব ঘুচাইবার জন্য প্রাণপাত করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। একবার এক কাফ্রি রমণীর প্রভুর পীড়নে প্রাণান্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার প্রভুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার মানসে তিনি বলপূর্ব্বক তাহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। দাসপ্রভু এই আইনবিরুদ্ধ আচরণে উত্তেজিত হইয়া দলবলসহ পার্কারের গৃহ আক্রমণ করিতে ও কাফ্রি রমণীকে স্বাধিকারে আনিতে অগ্রসর হইলেন। পার্কার গৃহের দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন:—"আর একপা অগ্রসর হইয়াছ কি আমি এই বন্দুকের গুলিতে তোমার প্রাণ সংহার করিব।" (One step more and I will put this

gun-in operation) আততায়ী দল বিদ্যুৎচমকে চমকিত ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া ক্ষণকাল পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া পরিশেষে প্রাণ হারাইতে অসম্মত হইয়া ভীরুর ন্যায় পলায়ন করিল। মহাত্মার অসাধারণ অশ্রুজলের বলে কাফ্রি রমণী দাসত্ব বন্ধন মুক্ত হইয়া উত্তর আমেরিকার মুক্তভূমি ক্যানেডাতে প্রেরিত হইল।

আর এক ইংরাজ সন্তান নিজের সুখ সুবিধা বিস্মৃত হইয়া হতভাগ্য চিরঘৃণিত কারাবাসিগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহাদের দুঃখ কষ্টের কথা জনসমাজের গোচর করিতে এবং সম্ভব হইলে কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সমগ্র ইউরোপ খণ্ড ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সকল সদনুষ্ঠানের সূত্রপাতে যেমন লোক বাধা জন্মাইয়া থাকে জনহাউয়ার্ডের কারাগার পরিদর্শন কার্য্যেও তদ্রূপ প্রথম প্রথম বহুবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মানব-প্রেমের প্রবল স্রোতে সকল বাধাই ভাসিয়া গেল। তাঁহার এইরূপ ভ্রমণে যে কত আঁধার কারাগহ্বরে দুঃখের হাহাকারে আশার আলোকে সুখের রেখা দেখা গিয়াছিল, কত লোকের নিরবচ্ছিন্ন সুতীব্র নিগ্রহজনিত জীবনব্যাপী বিষাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সুখভোগের শুভ সূচনা হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। জনহাউয়ার্ড পরিত্যক্ত ও ঘৃণিত মানবসন্তানের অশ্রুমোচনে অগ্রসর হইয়া সমবেদনার সমতল ক্ষেত্রে সুকোমল প্রেমের প্রান্তরে দেবলীলার প্রকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাকেই মানব-দেবতা বলে অথবা মানবে দেবত্বের বিকাশ বলে।

এই মানব-দেবতার অভ্যুদয় কি আমাদের দেশে হয় না? ভারতবর্ষে কারাবাসিগণকে যে কি দারুণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহার প্রকৃত চিত্র আমরা অনুভবই করিতে পারিব না, কারণ আমাদের সে সহৃদয়তা নাই। সামাজিক জীব তুমি আমি সর্ব্বদা কত শত অপরাধ করিয়াও বিধাতার কৃপা লাভে বঞ্চিত নহি, সমাজ সুখে বঞ্চিত নহি; বারমাসে তের পার্ব্বণ সুখে সম্ভোগ করিতেছি, পুত্র কলত্র লইয়া আহ্লাদে কালহরণ করিতেছি, আর একবার ভাব ত আমাদের মত শত শত লোক সমান ভাবে বিষণ্ণ মুখখানি বুজাইয়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে উদরান্ত সমাপন করিতেছে; মানব প্রাণের শত প্রকার আশা ভরসার স্মৃতি সহস্র সহস্র দীর্ঘ নিশ্বাসে নীরবে দগ্ধ হইতেছে। মানব সেবকদিগের কেহ কি হাউ-

য়ার্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কারাবাসের দাসত্বের মধ্যে একটু মনুষ্যত্ব আনয়নে প্রয়াসী হইবেন না ?

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

পরমেশ্বরের কৃপায় দাসাশ্রমের আর এক মাস চলিয়া গেল। এ মাসে গিরিডিস্থ সেবালয়ে ১১ জন আতুর ও দুই জন অস্থায়ী রোগীকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। নিম্নে তাহাদের নাম ও কাহারও কাহারও বৃত্তান্ত দেওয়া গেল। এ মাসে ১ জন নূতন আতুর আশ্রয় পাইয়াছে।

১। দামো, ২। রামজি, ৩। তিতুরাম, ৪। বাবুরাম, ৫। টোকামি-ঋষি, ৬। দেবীয়া, ৭। দুর্গাতারিণী, ৮। শিবু, ৯। দুর্গামণি, ১০। ফুলকুমারী, ১১। স্বর্ণ, ১২। কৃষ্ণপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, ১৩। চন্দ্রনাথ মজুমদার।

রামজি। বৃদ্ধ বয়সে নানাপ্রকার রোগে ক্লেশ পাইতেছে।

বাবুরাম। বসন্তে ভয়ানক ক্লেশ পাইতেছে। একে ত বেচারা অন্ধ, তাহার উপর দারুণ মিশ্র বসন্তের চিন্তাতীত যাতনা কি যে পাইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এক দিন ত নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রায় যায় যায় হইয়াছিল। যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় বোধ হয় এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল। এই পীড়ার কালে নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে বাবুরাম ক্রমাগত ভগবানকে ডাকিয়াছে। তাহার সে সময়কার ভক্তির উচ্ছ্বাস জ্ঞানী বৃদ্ধজনেরও অনুকরণীয়। ভগবান তাহার বিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধি করুন।

দুর্গামণি। ৭৭ বৎসরের বৃদ্ধার পা মুখ চোখ ফুলিয়া গিয়া একেবারে শেষ দশায় উপনীত হইয়াছে।

বাবু চন্দ্রনাথ মজুমদার। এই মহাত্মা চিরদিনের জন্য এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি নিত্য পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হইয়া আপনার জীবন মরণ উপেক্ষা করিয়া দীন দুঃখী অনাথ নিরাশ্রয় রোগীদিগের সেবা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, তিনি আজ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র অন্ধকার করিয়া স্নেহশীল বন্ধুগণের প্রাণ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক চন্দ্রনাথ বাবু গুপ্ত মহাপুরুষ ছিলেন। এমন স্বার্থশূন্য, নিস্পৃহ, লোকসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রায় দেখা যায় না। তিনি ৫০ বৎসর বয়সে বৃদ্ধা জননী, বিংশবর্ষবয়স্কা স্ত্রী ও দেড় বৎসরের একটী পুত্র, অধিকন্তু অবশাঙ্গ একটী ভগ্নীপতি, ও ভগিনী এবং একটী নাবালক ভাগিনেয় রাখিয়া সকলকে দুই খানি জীর্ণ কুটীরের অধিকারী করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মাকে শান্তি দিন ও তাঁহার পরিবারমণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিয়া মহাবিপদ সমুদ্র হইতে মুক্ত করুন। তাঁহার কোন বন্ধু কর্ত্তৃক রচিত তাঁহার জীবনীর হস্তলিপি হইতে তাঁহার জীবনের দুই একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এখানে উল্লিখিত হইতেছে। তিনি বরিশালের দরিদ্র-ভাণ্ডারের সম্পাদক ও প্রাণ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বড় মাতৃভক্ত ছিলেন। "মা যাহা ভালবাসিতেন, যাহা যাহা করিতে বলিতেন, তাহা সম্পাদন না করিলে তাঁহার হৃদয়ে শান্তি আসিত না। তাঁহার মাতা হেলেঞ্চা শাক বড় ভালবাসিতেন। চন্দ্র বাবু বরিশালের কোন বাসায় হেলেঞ্চা দেখিয়া একমুঠা তুলিয়া লইলেন এবং সেই দিনই বরিশাল হইতে দশ ক্রোশাধিক দূরবর্ত্তী পৈত্রিক গ্রাম গোনাবালিয়ায় পদব্রজে গিয়া মাকে দিয়া আসিলেন। চন্দ্র বাবু বাড়ীতে থাকিলে মাতৃদেবীর পাদোদক পান না করিয়া জলবিন্দুও স্পর্শ করিতেন না।" "একদিন বাড়ীর গৃহ-সংস্কার মানসে কতকগুলি খড় ক্রয় করিয়া গৃহ-সংস্করণে

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বোপকারী স্বদেশী দুর্গাচরণ ডাক্তার বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন। অর্থাভাবে তাঁহার জীর্ণ গৃহের সংস্কার হইতেছে না। অমনি নিজের সংগৃহীত খড় দ্বারা তাঁহার জীর্ণ গৃহের সংস্কার করিয়া দিলেন। নিজের গৃহ জীর্ণাবস্থায়ই পড়িয়া রহিল।" "তিনি প্রাণপণে রোগীর সেবা করিতেন। একদিন তিনি শুনিলেন, বরিশালের কোন অসহায় পতিতা নারী দারুণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে লোক-জনের সাড়া শব্দ নাই। হতভাগিনী 'জল দেও', 'জল দেও' বলিয়া হৃদয় বিদারী চীৎকার করিতেছে। অমনি তাঁহার দয়াপ্রবণ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। জনৈক বন্ধু সমভিব্যাহারে তথায় যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। বেশ্যাগৃহ বলিয়া বন্ধুটি যাইতে কিছু সঙ্কুচিত হওয়ায়," তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া লইয়া গিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়া আসিলেন। "একদিন বরিশালের কোন এক দোকান গৃহে একটি কাক রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া ছটফট করিতেছিল। তদ্দর্শনে চন্দ্রবাবুর দয়াপ্রবণ হৃদয় গলিয়া গেল। অমনি তিনি এই দোকানীর নিকট কাকটির জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। কিন্তু দোকানী কাককে ছাড়িয়া দেওয়া দূরে থাকুক, আরও চন্দ্রবাবুকে যথেচ্ছ তিরস্কার করিতে লাগিল। অগত্যা তাহার পা পর্য্যন্ত ধরিতেও প্রস্তুত হইলেন। তাহাতেও যখন দোকানী স্বীকৃত হইল না, তখন নানা চেষ্টায় মিউনি-সিপালিটির সাহায্যে কাকটিকে মুক্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।" "চন্দ্রবাবুর পূর্ব্বপুরুষোপার্জ্জিত কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। এক সময়ে তাঁহার উপরই সংসারের ভার ছিল। যখন তিনি শুনিলেন, উহা সদুপায়ে উপার্জ্জিত নহে, তখন উহা তৃণবৎ পরিহার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না; পরিবারের দিকে না তাকাইয়া উহা অম্লান বদনে ছাড়িয়া দিলেন। একদিন কোন ব্যবসায়ীর নিকট একটি জিনিস ক্রয় করিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাসায় আসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, ক্রীত দ্রব্যের মূল্য যাহা স্থির হইয়াছিল. ভ্রমক্রমে তাহা অপেক্ষা দুই আনা কম দিয়া আসিয়াছেন। তখনই ছুটিয়া যাইয়া ঐ ব্যবসায়ীর বাকী মূল্য দিয়া আসিলেন।" চন্দ্রবাবু ধ্যানপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি ছিলেন।

স্বর্ণ। হতভাগিনী জন্মান্ধ। পিতৃকুল বা পতিকুলে কেহই নাই। এই ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়া দিন চালাইয়াছে। কয়েকটী দয়ালু ছাত্র আমাদের কার্য্যালয়ে রাখিয়া যান। আমরা গিরিডি সেবালয়ে পাঠাইয়া দি।

দানপ্রাপ্তি।

(২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত দানগুলি বিগত মাসে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান পরদুঃখকাতর দাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অর্থ। ডাঃ সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী /০, বাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী ৵০, একজন সহানুভূতি-কারক নাটোর ১৲, মহারাজা জগদীন্দ্র নারায়ণ ২৲, শ্রীমতী বৃন্দেশ্বরী দেব্যা ১৲, রাণী হেমন্তকুমারী দেবী পুঠিয়া ৫৲, জনৈক হিতৈষী ।০, একজন ভদ্রলোক ।০, একজন বন্ধু নাটোর ॥০, বাবু রামচন্দ্র মিত্র ফেব্রুয়ারি মাসের চাঁদা ১৲, বাবু নন্দলাল দত্ত ফেব্রুয়ারি মাসের চাঁদা ১৲, R. M. G. ৵০, বাবু সত্যকুমার সেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১৫, বাবু রাধিকানারায়ণ ঘোষের বাটী হইতে প্রাপ্ত ১৲, বাবু দেবেন্দ্রনাথ শীল /০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সিংহ ১০, বাবু রাখালদাস মিত্র জানুয়ারি মাসের চাঁদা ।০, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী মাঘ মাসের চাঁদা ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী মাঘ মাসের চাঁদা ১৲, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা ॥০, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ।০, বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ॥০, মারফতে বাবু চারুচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ১৲, একজন ভদ্রলোক ।০, বাবু উমেশচন্দ্র দাস ৵০, শ্রীমতী ক্ষীরদা মিত্র ১৲, বাবু হরিমোহন হাজরা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ।৵০, Mrs A. M. Bose ৫৲, Dr. P. C. Roy ১৲, বাবু হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জানুয়ারি মাসের চাদা ১৲, রায় ক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ৪৫।৫ বেনেটোলা লেন ৷৹, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা ফাল্গুন মাসের চাদা ৷৹, কুমারী হেমপ্রভা বসু ২৷৶৹, কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু ২৲, বাবু গৌরীকান্ত রায় মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, মৌলবী ইমাজুদ্দিন সেখ ২৲, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী ফাল্গুন মাসের চাঁদা ১৲, বাবু পরেশনাথ বিশ্বাস পিতৃব্যের বার্ষিক শ্রাদ্ধে ১৲, বাবু কেদারনাথ দাস ফেব্রুয়ারি মাসের চাঁদা ।৹, বাবু নন্দলাল দে ।৹, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ৩৲, বাবু রমণীমোহন রায় কাকীনিয়া পুত্রের জন্ম দিনে ১৲, কাকীনিয়ার জনৈক ভদ্রলোক ৶৹, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যো ৩৲, বাবু শশিভূষণ মুখার্জ্জি ১৲, বাবু জানকীনাথ মজুমদার ১৲, বাবু রামলাল সিংহ ১৲, বাবু হংসনারায়ণ দত্ত ১৲, জনৈক হিন্দু-মহিলা মার্চ্চ মাসের চাদা ১৲, বাবু রেবতীমোহন সেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ২৲, বাবু লালমাধব মুখার্জ্জি ২৲, বাবু অবতারচন্দ্র সাহা ১৲, বাবু অন্নদামোহন রায় ১৲, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী ১৲, শ্রীমতী—সেনগুপ্তা ৷৹, রায় উমাকান্ত দাস গুপ্তের ফেব্রুয়ারি মাসের চাঁদা ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত দাস গুপ্ত ঐ মাসের চাঁদা ।৹, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস M. A. B. L. ১৲, বাবু পশুপতিনাথ বসু মার্চ্চ মাসের চাদা ১৲, বাবু সত্যপ্রিয় মিত্র ১৲, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন L. M. S. ২৲, বাবু শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি ৷৹, বাবু কালীনাথ ঘোষ পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস ডিসেম্বর ও জানুয়ারির চাদা ২৲, Justice Gurudas Bauerji ৫৲, Sirkar's Debating Club হইতে সংগৃহীতঃ—বাবু হরিলাল মুখার্জ্জি ৷৹, বাবু চন্দ্রপ্রিয় মিত্র ১৲, বাবু রমেশচন্দ্র বিশ্বাস ৷৹, বাবু সুশীলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ৷৹, বাবু বীরেন্দ্রনাথ সরকার ১৲, বাবু ভুজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ১৲, বাবু নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি ৷৹, বাবু নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ৷৹, বাবু চারুচন্দ্র মুখো ৷৹, ঐ জ্যোতিন্দ্রনাথ সরকার ১৲, ঐ মণিলাল চট্টো ৷৹, ঐ নরেন্দ্রনাথ সেট ৷৹, ঐ সতীন্দ্রনাথ সরকার ১৲, ঐ হরিমন দে ১৲, ঐ শ্যামাচরণ চৌধুরী ১৲, ঐ গুরুপদ হালদার ১৲, ১০৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৸৹, বাবু পঞ্চানন মুখো ৫৲, ঐ গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ মার্চ্চ মাসের চাঁদা ।৹, ঐ মহেশচন্দ্র সান্ন্যাল ১৲, ঐ প্রসন্নকুমার দত্ত ১৲, Miss. C. Hodgkinsous (Protestaut Home) ২৲, বাবু গঙ্গাধর ঘোষ ১৲, ঐ লোকনাথ সাহা ১৲, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ১৲, বাবু অন্নদাপ্রসাদ দাসগুপ্ত ১৲, ঐ দেবেন্দ্রনাথ শীল ১৲, Mrs. A. Alexander ১৲।

গিরিডিস্থ সেবালয়ের বসন্ত রোগগ্রস্ত অন্ধ বালকের সেবার জন্য নিম্নলিখিত দানগুলিও পাওয়া গিয়াছে:—

কুমারী মনোরমা রায় ১৲, বাবু গৌরলাল রায় কাকিনীয়া ২৲, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়:—কুমারী নিরুপমা গাঙ্গুলি ।৹, কুমারী সুনীতিবালা চট্টো ।৹, কুমারী সুনলিনী বসু ৷৹, কুমারী শৈবলিনী বসু ৷৹, কুমারী প্রফুল্লবালা রায় চৌধুরী /৹, কুমারী হেমন্তকুমারী সিংহ /৹, কুমারী সুনীতিবালা নিয়োগী ৴১০, কুমারী স্নেহলতা নিয়োগী ৴১০, কুমারী রতনকুমারী মিত্র ৷৹, কুমারী বাসন্তী মিত্র ৷৹, সিটি স্কুল পঞ্চম শ্রেণী:—দেবেন্দ্রমোহন বসু ৴১০, সুরেশ-মোহন বসু ৴১০, ক্ষতীশমোহন বসু ৴৫, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ৴৫, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যো ৴১০, জ্যোতিভূষণ নিয়োগী ৴৫ সুকুমার মিত্র ৷৹।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

"দাসী" হইতে মার্চ্চ মাসের সাহায্য২৫৲, "দাসী" হইতে ধার ৪৪৷৴১৫, 'দাসী' হইতে খুচরা সাহায্য ১৸৴১৫, চাউল বিক্রয় ৬৷/৹, দাসীর ধার শোধ ৴১৭৷।

মোট আয়।

দানপ্রাপ্তি ১০৯।/১০, অন্যান্য প্রকারে আয় ৭৭৮/৭॥, বিগত মাসের জের ২৻১৫, মোট আয় ১৮৯।৶১২॥।

চাউল।

বিগত মাসে যাঁহারা মুষ্টিভিক্ষা দিয়াছিলেন, এ মাসেও তাঁহারা দিয়াছেন। নূতন কোন নাম না থাকায় এ মাসে আর পৃথকভাবে কোন নামের লিষ্ট প্রকাশিত হইল না।

বস্ত্রাদি। রামপ্রসাদ মিত্র:—ধুতি ১, চাদর ১, তিনকড়ি বসু:—১খান নূতন কাপড়, ঐ যদুনাথ ঘোষের বাড়ী হইতে:—ধুতি ১, কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব শোভাবাজার ৩৫টী এলোপ্যাথিক ঔষধ দিয়াছেন, উমেশচন্দ্র দাস:—র‍্যাপার ১, মিসেস্ অধোর এলাহাবাদ:—বগুণা ১, থালা ১, বাটী ১, রেকাব ১, ঘটী ৩, মকমলের জ্যাকেট ১, পেন্সিফ্রক ২৲, সার্ট ২, ধুতি ১, নূতন ধুতি ১, কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু:—১ম বারে—ধুতি ৫, বিছানার চাদর ২, ২য় বারে—ধুতি ২, জ্যাকেট ২, ৩য় বারে—ধুতি ৪, জ্যাকেট ১১, বালিসের ওয়াড় ৪, জাঙ্গিয়া ৪, পোটিকোট ১, সেমিজ ২, বিছানার চাদর ১, মোজা ৮ জোড়া, রমেশচন্দ্র সেনের পত্নী নূতন কাপড় ১।

কলিকাতার আয় ব্যয়।

(২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত)

গিরিডি সেবালয়ে প্রেরণ মঃ অঃ কমিশন সহিত ৯৪৶০, আদায়কারীর ব্যয় ১৫৶০, কর্ম্মচারীর বেতন ৮।৶৫, ডাক খরচ ৻১০, হাঁড়ি ৶০, ব্যাগ।/০, গিরিডিতে রোগী প্রেরণের ব্যয় ৮৸০, বিবিধ।/১০, ট্রাম ভাড়া /৫, ভিক্ষার বাক্স ১৸০, প্যাকিং ৻১০ খাতা খরিদ ৻১৭॥, দাসীকে ধার দেওয়া ৻১৭॥, পূর্ব্বের বাড়ী ভাড়া শোধ ৫০৲ দাসীর ঋণ শোধ ৩।/০, মোট ব্যয় ১৮৫॥/১৫।

মোট আয় ব্যয়।

মোট আয় ১৮৯।৶১২॥, মোট ব্যয় ১৮৫॥/১৫, হস্তেস্থিত ৩৸/১৭॥।

গিরিডিস্থ সেবালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়।

বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ৫৲, বাবু গোষ্ঠবিহারী কুণ্ড ১৲, স্বর্ণের হরণ জমা ৶১৭॥০, গত মাসের জের ১॥৶১০, কলিকাতা দাসাশ্রম কার্য্যালয় হইতে প্রাপ্ত ৯৩৲। মোট ১০০৸/৭॥।

ব্যয়।

বাটীভাড়া ১৮৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৩১।১৫, ধোপা ১/১৫, নাপিত /১০, গোয়ালা ।/০, ঔষধ ৩।০, বারামের জন্য অতিরিক্ত খরচ ৩৸/১৫, বিবিধ।০, সংসার খরচ ৩৬৸১০। মোট ৯৫।/৫। হস্তেস্থিত—৫॥২॥০।

দাসী

জগদ্রাম রায়।

আমি "দাসী"র ৪র্থ ভাগ ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায় জগদ্রাম সম্বন্ধে যে দুইটী প্রবন্ধ লিখি, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। আমি চিরকালই জগদ্রাম রায়ের গোঁড়া। আমাদের বাটীতে তাঁহার রচিত একখানি "দুর্গা পঞ্চরাত্রি" পুস্তক আছে;—উক্ত পুস্তক প্রতিবৎসর দুর্গাপূজার সময় পাঠ হইয়া থাকে। আমার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ অপরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উক্ত পুস্তক সুর ধরিয়া পাঠ করিতেন, তখন এমন কোন পাষাণ-হৃদয় লোক ছিল না যে উক্ত পাঠ শুনিয়া মুগ্ধ না হইত। বাল্যকালে যখন আমি পুস্তকের অর্থ পর্য্যন্ত বুঝিতাম না, তখনও মুগ্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাশয়ের পাঠ শুনিতাম। বয়সের সহিত যখন সেই পুস্তকের অর্থ গ্রহণ করিতে ও কাব্যের রস আস্বাদন করিতে সক্ষম হইলাম, তখন উক্ত পুস্তক আরও মধুর হইতে মধুরতর বোধ হইতে লাগিল, এবং তদবধি জগদ্রামের কাব্যের রস সাধারণের নিকট জানাইবার ইচ্ছা বলবতী হইল। আজ বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই রস আস্বাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন দেখিয়া আমার এরূপ আনন্দ। ইণ্ডিয়ান মিরর ও পৌষ মাসের "সাহিত্য-সেবক" "দাসী"তে প্রকাশিত আমার উক্ত দুই প্রবন্ধের উল্লেখ করতঃ জগদ্রাম রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সাহিত্য-সেবকের সম্পাদক মহাশয় আমার উপর কয়েকটি গুরু ভার অর্পণ করিয়াছেন। উক্ত গুরুভার কয়টী যথাসাধ্য আমি আনন্দের সহিত বহন করিবার চেষ্টা করিব।

আমি জগদ্রাম রায়ের জীবনী সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখি নাই বলিয়া সাহিত্য-সেবকের সম্পাদক মহাশয় আমার উপর অভিমান করিয়াছেন; কিন্তু আমার উক্ত দুই প্রবন্ধ লিখিবার মূল উদ্দেশ্য পাঠক মহাশয়গণকে জগদ্রামের কাব্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া। অজ্ঞাত কবির কাব্যের পরিচয় অগ্রে না দিয়া তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা

আমার মতে ঘোটকের অগ্রভাগে গাড়ি যোজনের ন্যায় বোধ হয়; এই কারণে জগদ্রামের জীবনী সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলি নাই। এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন তাঁহার জীবনী জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, বারান্তরে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিবার ইচ্ছা রহিল। অদ্য এই প্রবন্ধে তাঁহার সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিব।

মল্লিখিত জগদ্রাম রায় সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে আমি কবির সময় নিরূপণ করিতে গিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। সাহিত্য-সেবকের সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার উক্ত ভ্রম দেখাইয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। কেবল কবির "অদ্ভুত রামায়ণে"র রচনার সময় দেখিয়াই আমি উক্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। আমি যে সময় উক্ত প্রবন্ধ লিখি, তখন আমার নিকট দুর্গা পঞ্চরাত্রি পুস্তক ছিল না; থাকিলে এরূপ ভ্রম কখনই হইত না।

সাহিত্য সেবকের সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় "দুর্গাপঞ্চরাত্রি"র সময় নিরূপণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

"দুর্গাপঞ্চরাত্রি কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহার নির্ণয় পক্ষে কিঞ্চিৎ অসুবিধা দেখা যায়। কাব্যের উপসংহার ভাগে স্পষ্টই লেখা আছে—

ভুজরন্ধ্র রসচন্দ্র শক পরিমাণে।
মাধব মাসেতে শুক্লপক্ষ শুভদিনে॥
ষোড়শ দিবস প্রতিপদ গুরুবারে।
কৃত্তিকা নক্ষত্র যোগ সৌভাগ্য সুন্দরে।
কাব্য দুর্গাপঞ্চরাত্রি গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল।
সভাজন শান্তমনে হরি হরি বল॥

এ স্থলে প্রথম গোলযোগ রন্ধ্র লইয়া। স্বর্গীয় শিবদাস বাবু এই রন্ধ্র অর্থে শূন্য (০) ধরিয়া ১৬০২ শকে এই কাব্যের রচনা কাল স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বলরাম বাবু কবির "অদ্ভুত রামায়ণে"র রচনা কাল নিরূপণার্থ পুঁথির শেষ পৃষ্ঠা উন্মোচন পূর্ব্বক দেখিতে পান—

সপ্তদশ শতাব্দ দ্বাদশ যুক্ত তাথে।
ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে॥
ঊনত্রিশ দিবস বারেতে বৃহস্পতি।
জন্মভূমি ভুলুই গ্রামেতে করি স্থিতি॥
দ্বিজ জগদ্রাম কাব্য করিল সম্পূর্ণ।
রাম ধ্বনি কর, পাপ তাপ হ'ক চূর্ণ॥

ইহাতে বুঝা যায় ১৭১২ শকাব্দে (১) "অদ্ভুত রামায়ণ" কাব্য সমাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা এই দুই গ্রন্থের রচনাকাল মধ্যে ১১০ বৎসরের ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব—পুত্রের রচিত গ্রন্থের ১১০ বৎসর পরে পিতা অপর গ্রন্থ রচনা করিলেন, এরূপ হইতেই পারে না। অতএব শিবদাস বাবুর গণনা নিশ্চয়ই ভ্রমপূর্ণ। অতঃপর "রন্ধ্র" অর্থে দ্বার (ছিদ্র) ধরিলে, সর্ব্ব-জন-বিদিত "নবদ্বার" মতে "রন্ধ্র" শব্দ দ্বারা ৯ বুঝাইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা ১৬৯২ শকে "দুর্গাপঞ্চরাত্রি"র সমাপ্তি কাল প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে ঐ দুই গ্রন্থের রচনা কাল মধ্যে মাত্র বিংশতি বর্ষের ব্যবধান থাকে; ইহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু এই গণনা পক্ষেও এক অন্তরায় দেখা যায়। রামপ্রসাদ নবমী পালারম্ভে লিখিয়াছেন—

পিতা জগদ্রাম মোর রামপরায়ণ।
যেঁহ কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ॥
তা' পর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম।
দুর্গা প্রীতে কাব্য কৈলা অতি অনুপাম॥

ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায়, "অদ্ভুত রামায়ণ" পরিসমাপ্তির পরে জগদ্রাম "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু উপরি লিখিত গণনা মতে দেখা গিয়াছে, দুর্গাপঞ্চরাত্রি সমাপনের বিংশতি বৎসর পরে অদ্ভুত রামায়ণ সম্পূর্ণ হয়। এখন কোন্ কথা সত্য, নির্ণয় করা দুরূহ। বলরাম বাবুর অধীনে কবির উভয় গ্রন্থ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, তিনি গ্রন্থ দ্বয়ের রচনাকালঘটিত এই পার্থক্যের সামঞ্জস্য বিধানে বাক্য মাত্র ব্যয় করেন নাই কেন বুঝা সুকঠিন। ভরসা করি, পরবর্ত্তী প্রস্তাবে এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া তিনি আমাদিগের এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের কৌতূহল দূর করিবেন। উপস্থিত ১৬৯২ শকেই দুর্গাপঞ্চরাত্রির রচনা কাল স্থির করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই।"

এখন দেখিতেছি, অদ্ভুতরামায়ণের "শতাব্দ"কে "শক" ধরিয়া আমি যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, সাহিত্য-সেবকের সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ও সেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল পরস্পর নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য "রন্ধ্র" শব্দের কষ্ট-কল্পনাপ্রসূত অর্থ (রন্ধ্র = ছিদ্র = নবদ্বার) করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অল্প মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল সম্বন্ধে তত গোল নাই এবং শিবদাস বাবু রন্ধ্র শব্দের যাহা সহজ অর্থ করিয়াছেন তাহাই ঠিক। দুর্গাপঞ্চরাত্রি ১৬০২ শকেই রচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে গ্রন্থের সমাপ্তির সময় লিখিতে হইলে গ্রন্থকারগণ কেবল দুইটী অব্দ ব্যবহার করিতেন—একটী "শক" ও অপরটী "সম্বৎ"। সনের কেহ উল্লেখ প্রায় করি-

(১) "শতাব্দী"র আধুনিক অর্থ ধরিলে ১৬১২ বুঝাও নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। লেখক।

তেন না। রামপ্রসাদ দুর্গাপঞ্চরাত্রিতে "শক" শব্দ স্পষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু জগদ্রাম তাঁহার অদ্ভুতরামায়ণে "শক" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "শতাব্দ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। জগদ্রাম নিজে যে শব্দ ব্যবহার করেন নাই সেই শব্দ আমরা ব্যবহার করিলে যে ভ্রমে পতিত হইব তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। আমার মতে জগদ্রাম "শতাব্দ" শব্দ সম্বতের শতাব্দ অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। এরূপ ধরিলে গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল সম্বন্ধে আর কোন গোল-যোগ থাকে না। বর্ত্তমান সনে অর্থাৎ ১৩০২ সনে ১৮১৭ শকাব্দা ও ১৯৫২ সম্বৎ চলিতেছে। অতএব দেখা যায় সম্বতে ও শকে (১৯৫২—১৮১৭) ১৩৫ বৎসরের ব্যবধান; অর্থাৎ সম্বৎকে শকে পরিণত করিতে হইলে ১৩৫ বৎসর বাদ দিতে হয় এবং শককে সম্বতে আনিতে হইলে তাহাতে ১৩৫ বৎসর যোগ করিতে হয়। অদ্ভুতরামায়ণের রচনাকালকে (অর্থাৎ ১৭১২কে) সম্বৎ ধরিলে দেখা যায় ঐ সময় (১৭১২—১৩৫)=১৫৭৭ শক ছিল অর্থাৎ জগদ্রাম তাঁহার অদ্ভুতরামায়ণ ১৫৭৭ শকে রচনা করেন এবং তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ ২৫ বৎসর পরে তাঁহার পিতার আরব্ধ দুর্গাপঞ্চরাত্রি ১৬০২ শকে শেষ করেন। কারণ ১৫৭৭+২৫=১৬০২। এই মত ঠিক হইলে আমি পূর্ব্বে যে জগদ্রামকে দেড় শত বৎসরের কবি বলিয়াছি তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয় এবং শিবদাস বাবু যে তাঁহাকে আড়াই শত বৎসরের কবি বলিয়াছেন তাহাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটুকু গোলযোগ আছে। জগদ্রাম রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রামদয়াল রায় মহাশয় জীবিত আছেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০। ৬৫ হইবে। তাঁহার পুত্রকেও একপুরুষ ধরিলে জগদ্রামের এখন ষষ্ঠ পুরুষ চলিতেছে। ইংরাজদের মতে * প্রতি পুরুষে গড়ে ২০

---

* লেখক মহোদয় ভ্রমে পড়িয়াছেন। ইংরাজেরা প্রতি পুরুষের স্থিতি গড়ে ২০ বৎসর ধরেন না; তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরেন। তথাহি:—

"Generation.—The ordinary period of time at which one rank follows another, or father is succeeded by child, usually assumed to be one third of a century." — *Webster.*

"In years three generations are accounted to make a century."
—*Chambers's Encyclopædia.*

সুতরাং জগদ্রামকে ছয় পুরুষ পূর্ব্বের লোক ধরিলে ইংরাজী মতে তাঁহাকে দুইশত বৎসর পূর্ব্বের কবি অনায়াসেই বলা যায়। বরং ১৭১২ শকাব্দে তাঁহার রামায়ণ সমাপ্ত হইয়াছিল ধরিলে পুরুষ হিসাবে কিছু বিপদে পড়িতে হয়। ২০০ বৎসর ত পাওয়া গেল; বাকী ৪০ বৎসরের একটা উপায় বোধ হয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা করিতে পারিবেন। সম্পাদক।

বৎসর করিয়া ধরিলে জগদ্রামের সময় ১২০ বৎসরের বেশী পূর্ব্বের হয় না। শকাব্দার হিসাবমতে তিনি ২৪০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন কিন্তু পুরুষের হিসাব ধরিলে তাঁহার জীবিতকাল ১২০ বৎসর অপেক্ষা পূর্ব্বের হয় না। এ পার্থক্যের সামঞ্জস্যের কোন উপায় দেখা যায় না। অবশ্য প্রতি পুরুষ গড়ে ৪০ বৎসর ধরিলে আর কোন গোলযোগ ঘটিতে পারে না, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাতে সম্মত হইবেন কি না বলিতে পারি না। যাহা হউক, এ গোলযোগ মিটাইবার জগদ্রাম রায় মহাশয় নিজেই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ উভয়েই কেবল গ্রন্থসমাপ্তির বর্ষ দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; তাঁহারা মাস, তারিখ, বার নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্ত দিয়া গিয়াছেন। যে নিয়মে নষ্ট কোষ্ঠীর উদ্ধার হয় সেই নিয়মে উক্ত শকের উক্ত মাসের উক্ত দিনে বার, তিথি এবং নক্ষত্র প্রভৃতি মিলে কি না দেখিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায় এবং তাঁহাদের সময়-নির্দ্ধারণে আর কোন সন্দেহ থাকে না। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি নিজে জ্যোতির্ব্বিদ্ নহি, তবে আমার একটী জ্যোতির্ব্বিদ্ বন্ধু আছেন, তাঁহাকে শক, মাস এবং দিন বলিয়া দিলে, তিনি উক্ত দিবসের বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি বলিয়া দিতে পারেন। আমি তাঁহার দ্বারা বার, তিথি, নক্ষত্র মিলাইয়া জগদ্রাম রায়ের ঠিক সময় পাঠকগণকে জানাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি স্বদেশে গমন করার জন্য তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। তিনি স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলেই তাঁহার দ্বারা গণনা করাইয়া * জগদ্রামের ঠিক সময় পাঠকগণকে জানাইব এবং যে পর্য্যন্ত তাহা না করিতে পারি, সে পর্য্যন্ত স্বর্গীয় শিবদাস বাবুর সহিত আমিও জগদ্রামকে ২৫০ বৎসরের পূর্ব্বের কবি বলিয়া ধরিব। বারান্তরে কবির জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা জ্যোতিষ জানেন এবং এইরূপ গণনা করিতে পারেন, তাঁহারা অঙ্কপাত করিয়া কি ফল হয়, জানাইলে বাধিত হইব। সম্পাদক।

সত্যধর্ম্ম ও সমাজ।

(৩)

এক্ষণে বিজ্ঞান বলিতে কি বুঝিতে হইবে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। জগতের কার্য্যপরম্পরা দর্শন ও পর্য্যালোচনা করিলে ইহা লক্ষিত হইয়া থাকে যে, প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা কারণ রহিয়াছে। কারণানুসন্ধানের প্রয়াস পাওয়া মানব-মনের একটী প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম; এ কারণ মানুষ জগতে কার্য্য-পরম্পরা সন্দর্শন করিয়া তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, এবং ঐ আলোচনা স্বতঃই কারণানুসন্ধানের দিকে নীত হয়। যে প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক মানুষ কার্য্য দর্শন ও তদালোচন হইতে তাহার কারণ নির্দ্দেশের পথে পরিচালিত ও পরিশেষে ঐ কারণ নির্দ্দেশে সক্ষম হয় তাহাকেই 'বিজ্ঞান' কহে। ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, কার্য্যদৃষ্টে কারণানু-সন্ধান ও পর্য্যালোচনা দ্বারা কারণ নির্দ্দেশ করিবার যে প্রণালী তাহারই নাম বিজ্ঞান। গতবারে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বহির্জগত হইতে জ্ঞানাহরণের নামই বিজ্ঞান। এই উভয় সংজ্ঞার সামঞ্জস্য করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে 'জ্ঞানাহরণ' দ্বারা কেবল কারণানুসন্ধানের প্রণালী মাত্র উপলক্ষ হইতেছে। কোন কার্য্য দর্শন করিলে যে পর্য্যন্ত তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি না জন্মাইবে এবং প্রবৃত্তি জন্মাইলে যে পর্য্যন্ত তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম না হওয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত ইহা কখনই বলা যাইতে পারিবে না যে, উক্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ ঘটিয়াছে। গতবারে ইহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, বিজ্ঞান জ্ঞানের সোপান মাত্র। অতএব এস্থলে আমরা জ্ঞান বলিতে 'কারণ নির্দ্দেশ,' এবং বিজ্ঞান বলিতে কার্য্য পর্য্যা-লোচনা দ্বারা কারণ নির্দ্দেশের পথে অগ্রসর হইবার যে প্রণালী তাহা বুঝিব। এ বিষয়ে একমত হইলে ইহা সহজেই আমাদের বোধগম্য হইবে যে, বিজ্ঞান যে ধর্ম্মলাভের কেবল সহায় তাহা নহে, তাহা ধর্ম্মলাভের এক মাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। অতএব বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের অন্তরায় বলিতে গেলে তাহা যে কেবল অবৈজ্ঞানিকের মত কথা কহা হয় এমত নহে, তাহাতে অধার্ম্মিকত্বও প্রকাশ পায়। একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ হয়েন, তবে কারণানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহা প্রচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব; একদিন না একদিন তাঁহাকে কারণ খুঁজিতে খুঁজিতে গিয়া

'আদি কারণে' অবশ্যই পৌঁছাইতে হইবে। অতএব বিজ্ঞানের পথে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ যেরূপ ধ্রুব সত্য, এরূপ অপর কোন পন্থায় নহে।

তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের বিরোধ কোথায়? ইহার এক-মাত্র উত্তর,—ঐ বিরোধ মানুষের স্বল্পদর্শিতাতে! উভয় দিক্ হইতে দেখিলে একই উত্তর পাওয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াশীল মন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছেন,—কার্য্য হইতে প্রথমে এক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া লইতেছেন,আবার দেখিতে পাইতেছেন যে, তাহারও অপর কারণ রহিয়াছে। অনেকগুলি আপাতঃ বিসদৃশ কার্য্যের যেমন এক কারণ নির্দ্দেশিত হইতেছে তেমনই অপর অনেকগুলি আপাতঃ বিশ্লিষ্ট কারণেরও এক মূল কারণ প্রতিভাত হইয়া পড়িতেছে; এইরূপে কারণ হইতে কারণান্তরে পরিক্রমণ করিতে করিতে বৈজ্ঞানিক যে একদিন আদি কারণে পৌঁছাইতে পারিবেন ইহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের যদি আদি কারণ একজন স্রষ্টা থাকেন, তবে আমাদের কারণা-নুসন্ধিৎসার চক্ষে তাঁহাকে কোন দিন প্রত্যক্ষগোচর হইতেই হইবে।

অপর দিকে ধার্ম্মিক বলিতেছেন,—তুমি বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানবলে ঈশ্বর প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছ!—ইহাও কি কখনও সম্ভব? অপূর্ণ-জ্ঞানশীল মানব, পূর্ণজ্ঞান আয়ত্ত করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ! কারণ খুঁজিতে গিয়া কেন অকারণে আত্মহারা হইবে? যাহা সহজ বিশ্বাস দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারে তাহা অবহেলা করিয়া কেন মরুভূমে মরীচিকা অন্বেষণ করিতে যাইতেছ।

ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন,—আমি কারণানুসন্ধান করি-তেছি; অপূর্ণ জ্ঞান লইয়া জন্মাইলেও অপূর্ণতার মাত্রা হ্রাস করিবার বাসনা করিয়াছি। অপূর্ণতা হইতে ক্রমে জ্ঞানলাভ করিতে করিতে মানুষ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তবে আমি কেন কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া কালে আদিকারণে না পৌঁছাইতে পারিব? যদি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অদ্বি-তীয় আদিকারণ থাকে, তাহা অবশ্যই আমার জ্ঞানলব্ধ হইবে। যদি অনুসন্ধান করিতে গিয়া একাধিক আদিকারণ প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে কিম্বা জগৎ একটী অকারণসম্ভূত ক্রিয়ারূপে প্রতিপন্ন হয়, সে দোষ আমার নহে। যাহা হউক বিশ্বাস করিয়া মোহান্ধ থাকা অপেক্ষা অবিশ্বাসের পথে সত্যরাজ্যে প্রবেশ করা অধিকতর শ্রেয়স্কর। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক নিজকে

জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিপোষক মনে করেন। এমন তিনজন বৈজ্ঞানিকের কথা শুনা গিয়াছে, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময় একত্রে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে "জগৎকে আমরা যে জ্ঞানধনে ধনী পাইয়াছি তাহাপেক্ষা জগতের জ্ঞানধন কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বৃদ্ধি না করিয়া কখনও এই জগৎ পরিত্যাগ করিব না"।* তাঁহারা যে স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

আবার ধার্ম্মিক বলিতেছেন,—তুমি বৈজ্ঞানিক, আদিকারণ খুঁজিতে না গিয়া কেবল জগতে কারণবাহুল্য বিস্তার করিতেছ। জগতে যত জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে ততই নানা জাতীয় কার্য্যের নানা জাতীয় কারণ অভ্যুদিত হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে কেবল মানবজীবনের ক্ষয় ভিন্ন জ্ঞান লাভের অপর কি পরিণাম হইতে পারে?

যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারা বিশ্বাসের ভান করিয়া অন্তরে অবিশ্বাস পোষণ করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাসের মূল অবিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রোথিত রহিয়াছে। তাঁহারা ভয় করেন যে যদি আদিকারণ খুঁজিতে গিয়া তাহা না মিলে, তবে আমাদের বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাসে পর্য্যবসিত হইবে। বৈজ্ঞানিক তাঁহাদিগকে আশ্বাসবাণী দিতেছেন,—মানুষ অপূর্ণ জ্ঞান লইয়া জন্মিয়াছে বটে কিন্তু তাহার উৎকর্ষ না করিয়া মরিতেছে না। ব্রহ্মজ্ঞান অনন্ত হইলেও মানবজীবনও অনন্ত; অনন্তজীবন দিয়া অনন্ত জ্ঞানলাভ করিতে প্রয়াস পাওয়া অলীক কল্পনা নহে। বিজ্ঞান কারণের বিশ্লেষণ এবং বাহুল্য ঘটাইলেও ক্রমে আবার তাহার সামঞ্জস্য করণেও সক্ষম হইতেছে। বিজ্ঞান দেখাইয়া দিতেছে যে, যে কারণে বৃক্ষ হইতে চ্যুত হইয়া ফল ভূতলে পতিত হইতেছে সেই কারণে চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া এবং পৃথিবীসম্বলিত গ্রহমালা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে; যে কারণে পৃথিবীর চৌম্বকশক্তি বিক্ষোভিত হইয়া তাহাকে তরঙ্গায়িত করিতেছে সেই কারণে সৌরদেহে বুদ্বুদ্ ফুটিয়া উঠিতেছে; যে কারণে জননী-জঠরে সন্তান জন্মগ্রহণ করিতেছে, ঠিক সেই কারণে পুষ্পবৃন্তে ফলের অঙ্কুরোদ্গম হই-

* Sir John Herschel, Peacock and Babbage, three of the most distinguished 'Sons' of Cambridge, made an early compact, while at Cambridge, "to do their best to leave the world wiser than they found it." They graduated in 1813.

তেছে। বৈজ্ঞানিক কারণানুযায়ী বিধানবিভাগ এবং বিধানানুযায়ী জাতিবিভাগ করিতে গিয়া দেখিতে পাইতেছেন যে, বৃক্ষের ফল ও গগনের তারকা একবিধানানুযায়ী, অতএব একজাতীয়; পৃথিবীর চৌম্বকশক্তির তরঙ্গ ও সৌরদেহের বুদ্বুদ একবিধানানুযায়ী অতএব একজাতীয়; বৃক্ষের ফুল ও জীবের জননী একবিধানানুযায়ী অতএব একজাতীয়! এইরূপে নানাবিধানের সমীকরণ দ্বারা এক মহাবিধানে এবং নানা কারণের একীকরণ দ্বারা এক আদিকারণে উপনীত হওয়া বিজ্ঞানেরই পক্ষে সম্ভাবনীয়!

অপর একদল গোঁড়া ধার্ম্মিক আছেন, তাঁহারা মনে করেন "বিজ্ঞানটী সয়তানের সৃষ্টি!" তাঁহাদের মতে জগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং বিশ্ব-বিধাতার কারুকার্য্য বিনষ্ট করিবার জন্যই সংসারে উদ্ভিদ্বিদ্যা ও ভূবিদ্যা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। (ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত Ruskin এই শ্রেণীর অগ্রবর্ত্তী: শুনিতে পাই Wordsworthও এই দলভুক্ত ছিলেন। বোধ হয় ইহা বলিলে মার্জ্জিত হইব যে, যাঁহারা 'নিষ্ঠুরতা' নাম দিয়া Vivisection কে অন্ধকূপে নিমজ্জিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা কতকপরিমাণে এই শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে পারেন।) তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে বিজ্ঞানের প্রতি বিধাতার কোপদৃষ্টি আছে; ব্রহ্মাণ্ডের অস্ত্র-বিশ্লেষণপূর্ব্বক তাহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্য উদ্ভেদন করা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত! তাহা করিতে গেলেই বৈজ্ঞানিকের কার্য্য নিষ্ঠুরতা, পাপাচরণ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইবে!! জগতের কার্য্যবিশ্লেষণপূর্ব্বক তাহার বিধানবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে যাওয়া ঈশ্বরের অনভিপ্রেত,—একথা বলিতে গেলে ঈশ্বরকে একান্তই জিঘাংসাপরায়ণরূপে প্রতিপন্ন করিতে হয়। অথবা ইহাই মনে করিতে হয়, যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত নহে! ব্রহ্মজ্ঞান যদি লাভ করিতেই হয় তবে যাঁহারা ভ্রমান্ধকার বিদূরণ জন্য ঈশ্বরের কার্য্যদৃষ্টেই তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে প্রয়াস পায়, তাহাদের কার্য্যপ্রণালীকে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত বলা যাইতে পারে না। জ্ঞানলাভ করিতে হইলেই বিশ্লেষণ অবশ্যকর্ত্তব্য; তদ্ভিন্ন জ্ঞানলাভ অসম্ভব। বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিককে যদি কথঞ্চিৎ নিষ্ঠুরাচরণও করিতে হয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দায়ে তাহাতে পরাঙ্মুখ হন না; কারণ তাঁহার নিকট, অজ্ঞানতা ও নিষ্ঠুরতা এতদুভয়ের মধ্যে

অজ্ঞানতাকে অধিকতর হেয়জ্ঞান হয়। বৈজ্ঞানিক অজ্ঞানতাকে পাপের চরম বলিয়া মনে করেন; অতএব ঐ মহাপাপ ক্ষালন জন্য যদি অপর কোন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পাপও আচরণ করিতে হয়, তিনি তাহা অকর্ত্তব্য-বোধে পরিহার করেন না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কার্য্যদৃষ্টে কারণানুসন্ধানের প্রণালীর নাম বিজ্ঞান। অতএব বিজ্ঞানশিক্ষা মানুষকে নিয়ত বিধানের রাজ্যে প্রবিষ্ট করাইতেছে, এবং বিধান-পর্য্যালোচনাক্রমে তাহাকে বিধাতার দিকে অগ্রসর করিতেছে। তাহা হইলে আবার প্রশ্ন উঠিতেছে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে বিরোধ কেন? (এবার প্রশ্নটীকে হেতুবাচকরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।) এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমতঃ বিজ্ঞাননির্দ্দেশিত কারণের স্বরূপ আলোচনা করিতে হয়। জগতের কার্য্যপরম্পরার দুই জাতীয় কারণ থাকিতে পারে;—প্রথম, অহেতুক কারণ; দ্বিতীয়, হেতুগত কারণ। যে সকল কার্য্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে আপনা আপনি ঘটিয়া থাকে এবং কেবলমাত্র অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহাদের কারণকে অহেতুক কারণ বলা যায়। যথা, ফল শাখাচ্যুত হইলেই ভূতলে পতিত হয়; ইহাতে উদ্দেশ্যের কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হইতেছে না, সকল সময়ে সর্ব্বত্রই ফল তদবস্থ হইলে তাহার পতন ঘটিয়া থাকে। যদি অবস্থাবিশেষে ফলকে শাখাচ্যুত হইয়াও ভূতলে পতিত হইতে না দেখা যাইত, তবে তখন মনে করা যাইত যে ফলের পতনের উদ্দেশ্য রহিয়াছে। বিজ্ঞান পর্য্যালোচনাকালে এইরূপ অহেতুক কারণ বৈজ্ঞানিকের চক্ষে এমত পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে, তখন অনেক সময় তাঁহাকে বিধানরাজ্যে বিধাতার অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দিগ্ধ করিয়া দেয়। এই সকল অহেতুক কারণই বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মিলন বিষয়ে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সহজে প্রতিপন্ন হইবে, হেতুগত কারণের অনুসন্ধান বিষয়ে অহেতুক কারণ অতি উপাদেয়। বৈজ্ঞানিক কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বপ্রথম এক শ্রেণীর অহেতুক কারণ তাঁহার পর্য্যালোচনার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। তিনি যদি সে সকলকে বিধিবদ্ধ করিয়া তাহাদের পুনঃ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ঐ সকল কারণের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তবে দেখিতে পাইবেন ক্রমশঃ তাঁহার পর্য্যালোচনা তাঁহাকে কোন এক মূল-কারণের দিকে অগ্রসর করিতেছে। ইহার একটী মহদ্দৃষ্টান্ত আগামী

বারের আলোচনার জন্য রাখিয়া বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের আপাততঃ বিরোধ বিষয়ে অপর এক কারণের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের বিরোধের অপর এক কারণ বৈজ্ঞানিকদিগের অবিশ্বাসের ভান। বৈজ্ঞানিক যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে বিজ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন, তবে যাহা প্রত্যক্ষতঃ প্রমাণিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন অপর কিছুই স্বীকার্য্য মানিয়া লইতে প্রস্তুত হন না;—তিনি প্রমাণ ভিন্ন কিছুই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। অথচ তিনি সাংখ্যকারের মত ইহাও বলেন না যে ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ। তাঁহার উক্তি এই,—'আমি অনুসন্ধান করিতেছি, যখন প্রমাণ পাইব তখন বিশ্বাস করিব। ঈশ্বর যদি "সিদ্ধ" প্রমাণ হন, তবে তাহাই গ্রহণ করিব, এবং যদি "অসিদ্ধ" প্রমাণ হন তবে তাহাও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিব!" এইরূপ অবিশ্বাসের ভান করিতে গিয়া জগতের দুই জন মহামনীষী "নাস্তিক" নামে অভিহিত হইয়া গিয়াছেন। পাঠকদিগের নিকট ঐ দুইটী নাম সুপরিচিত;—এবং উভয়ে "নাস্তিক" বলিয়াও সুপরিচিত। কিন্তু ইহা দৃষ্ট হইবে যে, ইহারাই জগতের কার্য্য-পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অহেতুক কারণ হইতে বিজ্ঞানকে ক্রমে হেতুগত কারণের দিকে অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন। ইহারা ব্রহ্মাণ্ডের একজন বিধাতা স্বীকার্য্য না করিয়া,—তাঁহার অস্তিত্ববিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া,—কারণ হইতে কারণান্তর প্রত্যবধান পূর্ব্বক একজন বিধাতা সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহা আগামী বারের আলোচ্য বিষয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

দেবী, মানবী ও দানবী।

বিজ্ঞান বলেন সকল বস্তুরই শ্রেণী বিভাগ অত্যন্ত আবশ্যকীয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের পক্ষে ইহা এক প্রধান সহায়। আজকাল সভ্য জগতে বিজ্ঞানের প্রায় একাধিপত্য বলিলেও চলে। কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় পদ্ধতি বিজ্ঞানানুমোদিত না হইলে আর রক্ষা নাই। কাজে কাজেই আমার এই সামান্য প্রস্তাবেও বিজ্ঞান প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে হইল। নারী জাতিকে অদ্য আমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলাম। (১) দেবী, (২) মানবী, (৩) দানবী।

(১) দেবী—যে সব স্ত্রীলোক আত্মহারা হইয়া পরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন; পরোপকার করিতে যাঁহারা এত ব্যস্ত যে আপনার কথা ভাবিবার আসলেই সময় পান না, এরূপ স্ত্রীলোক দেবীশ্রেণীভুক্ত। ইহাঁরা সংসারে থাকেন বটে কিন্তু বস্তুতঃ সংসারী নন। কবির কথায় বলিতে গেলে ইহাঁরা—

"ভূলোক মাঝে দ্যুলোক মেয়ে।"

(২) মানবী—ইহাঁরা পরোপকার করিতে ইচ্ছুক, এবং সুবিধা পাইলে করিয়াও থাকেন বটে কিন্তু আত্মহারা হইতে পারেন না। অনেক সময় আত্মপর ভেদ করেন; পরের ছেলেটাকে ঠিক আপনার মত দেখিতে পারেন না। অন্যের দুঃখে যথেষ্ট কাতর হন বটে কিন্তু অধিকাংশ সময় নিজের স্বামীপুত্র লইয়া ব্যস্ত থাকেন। মানব মনে যে সব নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে তাহাদিগকে ইহাঁরা দমনে রাখেন বটে, কিন্তু একেবারে তাহাদের নির্যাতন সাধন করেন না; বা করিতে পারেন না।

(৩) দানবী—যে সব স্ত্রীলোকের মনে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি প্রবলা (যদিও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয় নাই), যাঁহারা অনেক সময়েই প্রথমোক্ত প্রবৃত্তিগুলির বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করেন, যাঁহারা নিজে পাপসাগরের দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন এবং লোককে সেই দিকে যাইতে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন সেই সব স্ত্রীলোকই এখানে দানবী বলিয়া উক্ত হইলেন।

২। এই মর-জগতে দেবী অবশ্য বড় দুর্লভ। তাহা না হইলে ইহা এতদিন অমর জগত হইয়া যাইত। দুর্লভ হইলেও এই দেবী মূর্ত্তি মনুষ্য-সমাজ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। পাঠকেরা সকলেই জানেন উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধ-কলেবরের পুষ্টি সাধন করা রোগ আমার নাই বলিলেই হয়, নহিলে গুটিকতক দেবী রমণীর উদাহরণ দিতাম। আদর্শ হিন্দু বিধবা এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ব্রহ্মচর্য্যই তাঁর অবলম্বন, পরের জন্য দেহপাতই তাঁর ব্রত, পরোপকার সাধনে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। কিন্তু উপরে বলিয়াছি দেবী রমণী বড় বিরল। এই কথা শুনিয়া হয়ত অনেক স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। তাঁহারা বলেন "হিন্দু সমাজের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাজ আর নাই ও হইতে পারে না। হিন্দু রীতি নীতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রীতিনীতি অসম্ভব, এবং যে দিন পৃথি-

বীর অন্যান্য জাতি হিন্দুদিগের অনুকরণ করিতে শিখিবে সেইদিন পুনরায় সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে। হিন্দু সমাজপদ্ধতি ও রীতি নীতির এক সর্ব্বোত্তম ফল আদর্শ হিন্দু বিধবা ; এবং ঐ পদ্ধতির ও রীতি নীতির প্রধান গৌরব এই যে, উহা বহুল পরিমাণে আদর্শ বিধবা প্রস্তুত করণে বিশেষ সহায়তা করে।" দেশহিতৈষিতায় খাতিরে কিন্তু সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ করা যায় না। হিন্দু বিধবার ঢের গুণ তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা দেখান তাহাকেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীর দোষই বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন ইহাতে খুব ভাল জিনিষের সংখ্যা কম। মানবরূপ-ধারী দেবতা এখানে আছেন বটে, কিন্তু খুব বেশী নাই। আদর্শ হিন্দু বিধবা অবশ্য আছেন, কিন্তু প্রত্যেক হিন্দু গৃহই যে তাঁহাদের দ্বারা আলোকিত তাহা নয়।

৩। মানবী রমণীই বেশী। সংসার করাই এ জগতে মানুষের প্রধান কাজ। সেই জন্য এথায় সংসারোপযোগী সামগ্রীই অধিক পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই সেই জন্য—

"এত ভাল কিম্বা এত সমুজ্জ্বল নন,
অপারগ প্রাত্যহিক ব্যভারে আসিতে।" *

মানব মনে এমন অনেক প্রবৃত্তি আছে সংসার করিতে যাহাদের সংযমের আবশ্যক, কিন্তু যাহাদের সম্পূর্ণ দমন সংসারের বিরোধী। যে সব লোক সেই সব প্রবৃত্তির নির্যাতন করিতে অক্ষম হইয়াছেন তাঁহারা সংসারাশ্রমের অনুপযুক্ত। সেই অনুপযুক্ততা যে দোষের চিহ্ন তাহা যেন কেহ মনে না করেন। অবস্থাভেদে খুব উৎকৃষ্ট বস্তুও অনাবশ্যক বা অপকারী হইতে পারে। কলিকাতায় বড়বাজারের রাতাবি অনেকেরই মতে খুব উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু একজন রোগীর পক্ষে উহা বিষতুল্য। একজন নিষ্কাম যোগরত ব্যক্তি মানব জাতির এক গৌরবের জিনিষ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে লইয়া সংসার চলে না। সংসার করিতে হইলে মানবী রমণীই দরকার।

---

* Not too bright or good
For human nature's daily food'
Wordsworth.

৪। পৃথিবীতে দানবীরও অভাব নাই এবং মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় দানবী না থাকিলেও চলে না। তাহাদের অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। স্বভাবের নিয়মই হইতেছে যে বস্তুর আবশ্যক নাই, তাহার ক্রমে লোপ হয়।

৫। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আদর্শ হিন্দুবিধবার সংখ্যা কম। সকল বিধবা দেবী হইয়া উঠিতে পারেন না, দেবী হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। নিজকে সম্পূর্ণরূপ স্বার্থশূন্য করিতে, হৃদয়ের সমস্ত বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিতে, পরের জন্য মন প্রাণ ঢালিয়া দিতে যে চেষ্টা, যে একাগ্রতা যে শিক্ষা চাই তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিতে পারে না। কাজে কাজেই অনেক হিন্দু বিধবাই মানবী থাকিয়া যান। যতদিন রক্তের জোর থাকে ততদিন বাসনা ও সুখেচ্ছা প্রবল থাকে। কেহ হয়ত বলিবেন চরিতার্থ না হইতে পারিলে উহাদের প্রাবল্য ক্রমে কমিয়া আসে। কমিয়া আসে অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু ঐ কমা যে কত সময় সাপেক্ষ ও কষ্টকর তাহা কি কেহ একবার ভাবিয়া দেখেন? শরীরধর্ম্ম এবং মনোধর্ম্ম বলিয়া যে দুইটা বস্তু আছে তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। আর একটু কথা আছে। হিন্দু সমাজে বৈধব্য ব্রত পালন করা বড় কঠিন বলিয়া কি কতকগুলি বিধবা দানবীতে পরিণত হন না? সমাজ-শাসনের কঠোরতা হেতু যদি কতকগুলি লোক পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়, তাহার জন্য কি সমাজ দায়ী নয়?

৬। কেহ যেন মনে না করেন আমি বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে এক প্রকাণ্ড প্রস্তাব লিখিতে বসিয়াছি। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অশাস্ত্রীয়তার বিষয় বিচার করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আমার নাই। যাঁহাদের সহিত তুলনায় আমি কীটানুকীট এরূপ অনেক মহামান্য ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বিস্তর কথা বলিয়া গিয়াছেন। সমাজের উপকারার্থে তাহার নেতৃবর্গকে দুই একটা কথা বলা, ও তাঁহাদিগকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করা মাত্র আমার উদ্দেশ্য।

মনে করুন এক সময়ে ১০০ শতটী স্ত্রীলোক বিধবা হইলেন। ইহাঁদের মধ্যে ৫০ জনের বয়স ভাঁটিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার নাই। বাকী ৫০ জনের মধ্যে ধরুন ১০ জন দেবী হইয়া দাঁড়াইলেন, ২৫ জন মানবী রহিয়া গেলেন এবং ১৫ জন দানবী হইয়া পড়িলেন। যদি সমাজে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে হয়ত এরূপ দাঁড়া-

ইতে পারে যে, প্রথম ১০ জনের মধ্যে ৫ জন মাত্র আর বিবাহবন্ধনে বদ্ধ না হইয়া আপনাদিগকে দেবী করিয়া তুলিলেন। বাকী ৫ জন আবার সংসার ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া মানবী রহিয়া গেলেন। কিন্তু ইহাদিগকে আর "হৃদে পুরি বাসনা" মানবী থাকিতে হইল না। মানবীর সমস্ত অধিকারই ইহারা প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বে যে ২৫ জন মানবী রহিয়া গিয়াছিলেন পুনর্ব্বার সংসারে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হওয়ার দরুণ ইহাদের মধ্যে ৫ জন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়া দানবীতে পরিণত হইলেন। বাকী ১০ জন বিবাহ করিতে যাইয়াই হউক বা না যাইয়াই হউক মানবীই রহিয়া গেলেন। অপর দিকে হয়ত বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়ার দরুণ শেষোক্ত ১৫ জনের মধ্যে ১০ জনের কোন অবনতি হইল না, তাঁহারা মানবী থাকিতে পাইলেন। দেখা যাউক অনুমানটা কিরূপ দাঁড়াইল। পূর্ব্বে ছিলেন ১০ জন দেবী ২৫ জন মানবী ও ১৫ জন দানবী। এখন হইলেন ৫ জন দেবী, ৩৫ জন মানবী ও ১০ জন দানবী। বিধবাবিবাহ যদি হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয় তাহা হইলে অবস্থা কতকটা এইরূপ দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই দুই অবস্থার মধ্যে কোনটা ভাল? সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমার বোধ হয় শেষোক্ত অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। দেবী ও মানবীতে যত প্রভেদ, মানবী ও দানবীতে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ; সুতরাং ৫ জন দেবী কমাইয়া যদি ৫ জন দানবী কমান যায় তাহা হইলে সমাজ বেশী লাভবান হইল। সংসারে মানবীরই বেশী দরকার এবং তাঁহাদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই সমাজের মঙ্গল। দানবী সংখ্যা কমাতে যদি কাহারও ভয় হয় তাঁহাকে আমরা অভয় দিতেছি। দানবী দল কমিয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহা উঠিয়া যাইবার এখনও ঢের দেরী। কলির কয়দিন আর সমাজের তেমন অবস্থা হইতেছে না।

৭। কিন্তু গুটিকতক কথা আছে। অনেক মাথাগুঁজি লোক আজ কাল বলিতেছেন "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"। কথাটা খুব উচ্চ তার আর সংশয় নাই! কিন্তু ইহার প্রয়োগের বিষয়ে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। যেরূপ দেখিতে পাই অনেকে গরীব বিধবাদের উপর ইহা প্রয়োগ করিয়াই যথেষ্ট হইল মনে করেন। বোধ হয়, শুধু নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কেন সকল প্রবৃত্তিরই আধিক্য দোষের। এমন যে দয়া তাহাও অপরিমিত হইয়া পড়িলে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক করে। সকল প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যই যথার্থ উন্নতি

এবং তাহাই মানুষের গৌরব। সভ্য ও অসভ্য মানুষের প্রধান প্রভেদই এই যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সংযমী ও দ্বিতীয় অসংযমী। শাস্ত্রকার যখন নিবৃত্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না যে সমস্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিগ্রহ করিতেই হইবেক। অনেকগুলি প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে সংসার উঠিয়া যাইবে। সংসার উঠিয়া গেলে সকল আপদ চুকিয়া যাইবেক বটে, কিন্তু পুরাকালে বোধ হয় মানুষের মনে একথা উদয় হয় নাই। যদি "নিবৃত্তির" অর্থ বিরতি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে হিন্দুবিধবা ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি এই বাক্য প্রয়োগে কি কিছু বাধা আছে? যখন ৪৫ বৎসরের এক প্রৌঢ় ব্যক্তি কিম্বা ৫৫ বৎসর বয়সের একজন বৃদ্ধ বিবাহের জন্য ক্ষেপিয়া উঠেন তখন এই বাক্য কোথায় থাকে? পুরুষেরাই সমাজের নিয়ন্তা। ঐ মহাবাক্যের উপকারিতা যদি তাঁহারা এতই উপলব্ধি করিয়া থাকেন নিজেরাই উহার অনুসারে কাজ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না কেন? ৫৫ বৎসরের বৃদ্ধের সম্বন্ধে যে কথা আদৌ উঠে না, ১৫ বৎসরের বালবিধবা অথবা ২৫ বৎসরের যুবতী বিধবার সম্বন্ধে সে কথা উঠে কেন? ইহাতে কি একটু স্বার্থপরতার আমেজ নাই? স্বেচ্ছাচারী বাবুরা যখন বিধবাদিগকে নিবৃত্তির উপদেশ দিতে বসেন, আমার মনে হয়, "আহা! আপনার বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছেন মানুষের বেলা।" একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কোন বিধবা যদি বিবাহ করিবার ইচ্ছা করেন, তিনি যে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়াই সে ইচ্ছা করিতেছেন তাহা কি করিয়া স্থির হইতে পারে? নিত্যধামের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের এই অনিত্যধামে সংসার করা যে নরনারীর প্রধান কাজ তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সংসার করিতে না পাইলে অনেক সময় তাঁহাদের পূর্ণতা সাধন হয় না। মনের একটা ক্ষুধা, হৃদয়ের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। সমাজস্থ যত অধিক লোকের পূর্ণতা সাধিত হয় এবং ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় সমাজের ততই মঙ্গল। আর একটু কথা আছে। নিকৃষ্টবৃত্তিগুলাকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলা কিছু নয়। উহাতে সমাজের অপকারই সাধিত হয়। পাপস্রোত বৃদ্ধি পায় মাত্র। যখন দেশে বহুলপরিমাণে শাস্ত্রালোচনা হেতু নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলা উঠিয়া যাইবে তখন আর উহাদের কথা ভাবিবার দরকার হইবে না; কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন উহাদের নিয়ন্ত্রিত চরিতার্থতার আবশ্যক।

৮। কেহ কেহ বলেন বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করুন, তাঁহাদের আর সংসারের পাপহ্রদে ডুবিবার দরকার কি? ব্রহ্মচর্য্য কঠিন কিন্তু যত পালন করা যায় তত সহজ হয়। একজন বালবিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে বলা নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যিনি সংসারকে পাপ-হ্রদ বলিয়া বোধ করেন, তাঁর নিশ্চয় বিশ্বাস বিধবারা বড় ভাগ্যবতী, অতি সহজেই তাঁহারা হ্রদের অপরপারে গিয়া উঠিয়াছেন, এবং যিনি যত শীঘ্র বিধবা হইতে পারিয়াছেন তিনি তত অধিক ভাগ্যবতী। ভাবটা একটু নূতন বটে। ব্রহ্মচর্য্য-পক্ষপাতী ও পাপ-হ্রদবাদীদিগকে আমি একটা কথা বলিতে চাই—ভাই সকল, ব্রহ্মচর্য্য যখন এত উৎকৃষ্ট জিনিষ ও ক্রমে যখন সহজসাধ্য হইয়া পড়ে, এবং সংসার যখন পাপহ্রদ, আসুন আমরা বিবাহরূপ বীভৎস ব্যাপারটা তুলিয়া দিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে ও ডঙ্কা বাজাইয়া সংসার হ্রদের অপর পারে যাইতে বদ্ধপরিকর হই। আমরা সফল হইলে অনেক দুর্ব্বলহৃদয়া স্ত্রীলোক আমাদের পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

৯। "বিধবা স্বার্থত্যাগ করিয়া পরের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করুন" কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন। হুকুমটী যত সহজ, তামিলটী তত সহজ বলিয়া বোধ হয় না। বয়োধিকা বিধবারা কিয়ৎ পরিমাণে আত্মীয় স্বজনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সকল বিধবাই যে বয়োধিকা তাহা বোধ হয় না। অনেকে এমন বয়সে বিধবা হন যে, তাঁহাদের নিস্বার্থ ব্রত পালন করা দূরে থাকুক, তাহা বুঝিবারই ক্ষমতা হয় না। তাঁহাদের কি কিছু উপায় করা দরকার নয়? যাহারা পূর্ব্বোক্তরূপ পরামর্শ বা আজ্ঞা দেন, তাঁহারা যদি উহা পালন করিবার একটা উপায় বলিয়া দেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। একজন লোককে একটা নূতন পথ দেখাইবার পূর্ব্বে সে পথে সে গমনক্ষম কি না, তাহা একবার দেখিতে পারিলে ভাল হয়। একজন বালবিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বলা যেমন নিষ্ঠুরতা, স্বার্থত্যাগ করিয়া পরের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে বলা তাহার অপেক্ষা কম নিষ্ঠুরতা নয়। স্বার্থত্যাগ যদি এতই ভাল ও সহজ হয় আমরা নিজে কেন তাহা একবার করিয়া দেখিনা? "পরোপকারায় হি সতাং জীবনং" এই মহাবাক্যের সার্থকতা করিতে অগ্রসর হওয়া কি দৃঢ়মনা পুরুষদের উচিত

নয়? কিম্বা তাঁহারা হয়ত মনে করেন, পরের হস্তদ্বারা ভাল্লুকের লাঙ্গুল ধরানই ভাল।

১০। শুনিতে পাই নাকি হিন্দুস্ত্রীর স্বামী "একমেবাদ্বিতীয়ং", এবং যতই ছোট হউন না কেন হিন্দু বিধবা কখন পতিকে ভুলিতে পারেন না। আমি অন্তর্যামী নই, সুতরাং এ সকল গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা আমার দ্বারা সম্ভবে না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, কার্য্যতঃ সকল বিধবা স্বামী সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন বলিয়া বোধ হয় না, এবং স্বামীর চিত্রপট যে তাঁহাদের মন হইতে অপনীত হইতে পারে না, তাহার বাহ্যিক চিহ্ন সব সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদীদের কথায় হয়ত আমি কূট অর্থ করিতেছি। ইহার বোধ হয় প্রশস্ত অর্থ এই যে, হিন্দু স্বামী "একমেবাদ্বিতীয়ম্" হওয়া উচিত এবং হিন্দু বিধবার মৃত স্বামীকে ভুলা উচিত নয়। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, যদি কেহ এই অদ্বৈতবাদ স্বীকার না করেন এবং মৃত স্বামীকে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে কি হইবেক? তুষানল আজ কাল চলে না, এবং ঐরূপ স্ত্রীলোককে ঘোর পাপীয়সী বলিয়া ছাড়িয়া দিলেই সমাজের কার্য্য স্থির হইল না। পাপীয়সী বলিয়া ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে ইহাও দেখা উচিত, একজন ১৫ বৎসরের বালিকা ৫ বৎসর পূর্ব্বে মৃত প্রায় অজানিত স্বামীকে যদিও ভুলিয়া যায়, বস্তুতঃ তাহার কোন পাপ সঞ্চয় হয় কি না। কবি ঠিকই বলিয়াছেন—

"পুরুষ দুদিন পরে, আবার বিবাহ করে;
অবলা রমণী বলে এতই কি সয়রে।"

১১। কোন কোন মনীষী বলেন, বিবাহ আত্মায় আত্মায় এবং আত্মা অবিনশ্বর, অতএব একবার বিবাহ হইলে আর তাহা ভঙ্গ হইতে পারে না। এই নিয়ম যদি স্ত্রীলোকের বেলায় খাটে, তবে পুরুষের বেলায় খাটেনা কেন? অথবা এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই মূর্খতা। স্ত্রী-আত্মারই বহুবিবাহ নিষেধ, হিন্দু পুরুষের আত্মার পক্ষে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ বস্তু নয়, বরং অনেক স্থলে তাহা না করিলেই মহাপাপ। আত্মা লইয়া আমরা অনেক সময় এমন বিভোর হইয়া পড়ি যে, মানুষের যে শরীর আছে তাহা ভুলিয়া যাই, এবং শরীরধর্ম্ম অনেক সময় যে খুব প্রবল তাহা স্বীকার করি না। পোড়া শরীরটা না থাকিলে ভাল হইত বটে কিন্তু এখন আর উপায় কি? শরীরটা ফেলিয়া দেওয়া যায়, এরূপ কোন বন্দোবস্ত অদ্যাবধি হয় নাই। কতদিন

শরীরটা বাদ দিবার উপায় উদ্ভাবিত না হইতেছে, ততদিন যতই ঊর্দ্ধে উঠিনা কেন সর্ব্বদাই আমাদিগকে মাটীতে আসিয়া পড়িতে হইবেক।

১২। শুনিতে পাই বিধবার বিবাহ দিলে হিন্দুর হিন্দুয়ানি থাকিবেনা। এ বড় গুরুতর কথা। যাহাতে লোকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন এমন কাজ করিতে কেহ তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে পারে না, এবং এরূপ অনুরোধ করা উচিতও নয়। আমার মনে এ সম্বন্ধে কিন্তু একটু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দুয়ানি কাহাকে বলে? কেহ কি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন হিন্দুয়ানি কি? অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, হিন্দুয়ানির সংজ্ঞা কোথাও পাই নাই। আমি যাহাকে হিন্দুয়ানি বলি আর একজন তাহাকে হিন্দুয়ানি বলেন না। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুয়ানি জ্ঞান পশ্চিম বঙ্গের জ্ঞানের সঙ্গে ঠিক মিলেনা। বিহারি হিন্দুয়ানি সকল সময় বঙ্গীয় হিন্দুয়ানি নয়। বঙ্গীয় হিন্দুয়ানি পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুয়ানি হইতে অনেক বিভিন্ন। আমার বিবেচনায় আমাদের দেশের ধুরন্ধরেরা যদি কি কি হিন্দুয়ানি ও কি কি হিন্দুয়ানি নয় (কিম্বা একটা করিলে অপরটা করা হইবে) তাহার একটা তালিকা করিয়া দেন, তাহা হইলে দেশের যে কি প্রভূত উপকার সাধন করা হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জিনিষটা এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, উহা বজায় রাখিতে হইলে সাধারণ লোকের পক্ষে ঐরূপ একটা তালিকা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। কেহ হয়ত বলিবেন বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয়। হিন্দুশাস্ত্রত সমুদ্রতীরস্থ বালুকা-কণার ন্যায় অসংখ্য। কোনগুলি মানিতে হইবেক, কোনগুলি মানা স্বেচ্ছাধীন, ও কোনগুলি না মানিলে চলিতে পারে তাহার মীমাংসা কে করিবে? প্রাণ খুলিয়া সরলভাবে সকল কথা বলিতেছি বলিয়া হয়ত কোন ধর্ম্ম-প্রাণ বীরপুরুষ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবেন,—অথবা আমার সে ভয় মিছা। আমার লেখা তাঁহাদের গোচরে আসিবারই সম্ভাবনা নাই। যদিই বা বিধবাবিবাহের হিন্দুয়ানি প্রতিবন্ধকতা ও সম্পূর্ণরূপ অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণীকৃত হয় তাহা হইলেও আমার দুইটী বক্তব্য আছে:—১। যখন আমরা শাস্ত্রের অধিকাংশ শাসন অমান্য করিয়া চলিতেছি, তখন দুই একটা অধিক অমান্য করিলে আর বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবেক না। তাহা বোঝার উপর শাক আটিটা হইবেক মাত্র। ২। যদি সমস্ত বিষয়েই

আমাদিগকে শাস্ত্রানুযায়ী চলিতে হইবেক, দেশ কাল পাত্র ভেদে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না, তাহা হইলে যুক্তি ও হিতাহিত জ্ঞানের আর আবশ্যক কি? উহারা কেবল ভার মাত্র; সুধু তাহা নয়, উহারা ধর্ম্মপথের কণ্টক ভিন্ন আর কিছুই নয়। মানব হৃদয় হইতে যত শীঘ্র উহারা উৎপাটিত হয়, ততই তাহাদের ও সমাজের মঙ্গল। এত দিনের পর বাইবেলোক্ত জ্ঞানবৃক্ষের অসারতার কথা পরিষ্কার রূপে বুঝা গেল। যুক্তি ও বিবেকের আদ্যকৃত্য সমাপন করিয়া মানুষ যদি ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারিত, তাহা হইলে সংসার আজ কি সুখের হইত? কোন ঝঞ্ঝাট থাকিত না। দ্বিধাশূন্য হইয়া নরনারী বৃন্দ শাস্ত্রশাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া নিজেদের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করিতে পারিত। বস্তুতঃ বিধবাবিবাহসংক্রান্ত দুই চারিটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার যুক্তির অযৌক্তিকত্ব ও বিবেকের অবিবেকত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইয়াছে। এত দিন জ্ঞানরূপ আলোকের কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু উহা যে অন্ধকার তাহা আমার এখন প্রতীতি হইয়াছে। পাঠক আজি হইতে জ্ঞানালোক না বলিয়া জ্ঞানান্ধকার বলিতে অভ্যাস করুন।

১৩। একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন, হিন্দু সাম্যবাদী নন। স্ত্রী পুরুষের সাম্য তিনি স্বীকার করেন না। স্ত্রী যদি পুরুষের সমান না হইল, তাহা হইলে পুরুষ যেরূপ ভাবে চলে স্ত্রীলোককে কখনও সেরূপ ভাবে চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না। পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য স্ত্রীলোকের তাহা কর্ত্তব্য হইতে পারে না। পুরুষকে যে স্বাধীনতা দেওয়া যায় স্ত্রীলোককে সে স্বাধীনতা দিলে আর পার্থক্য কি রহিল? মহাকবি মিল্‌টনের স্ত্রীজাতির প্রতি মনের ভাব সমালোচনা করিতে গিয়া বৃদ্ধ জন্‌সন্‌ বলিয়াছিলেন "মিল্‌-টনের বিশ্বাস ছিল স্ত্রীলোক কেবল বশ্যতার জন্য ও পুরুষ কেবল বিদ্রোহের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাসও ঐরূপ বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীলোক পুরুষের সমকক্ষ কি না সে জটিল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিবার আমাদের দরকার নাই। এই মাত্র বলিতে চাই যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ক্ষমতাশালী বলিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠতার ও ক্ষমতার কি এইরূপ ব্যবহার করা উচিত? স্ত্রীজাতি আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া তাহাদিগকে যে বিধিমতে নিগৃহীত করিতে হইবে ইহা রাজনীতি সম্মত হইতে পারে, কিন্তু নীতিসম্মত নয়। হিন্দু পুরুষ কি নিজের ক্ষমতা

অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই স্ত্রীলোকের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন? হইতে পারে, কারণ মানুষ স্বভাবতঃ ক্ষমতাপ্রিয়, এবং রমণী ব্যতীত হিন্দু পুরুষের ক্ষমতা প্রয়োগের আর লোকও নাই। কিন্তু আশ্রিতের উপর অত্যাচার করিয়া অধঃপতিত হিন্দু যে আরও অধঃপাতে যাইতেছেন, তাহা কেহ একবার ভাবিয়া দেখেন না। কবি ঠিকই বলিয়াছেন—

"দেখ রে দুর্ম্মতি যত চিরম্লেচ্ছপদানত।
বিধবার শাপে হায় এ দুর্গতি হয় রে॥"

১৪। "হিন্দু কন্যার এক জনের সহিত বিবাহ নয়, এক পরিবারের সহিত বিবাহ। অতএব স্বামী মরিলেও কুলত্যাগ তাহার পক্ষে অসম্ভব, করিলেই অধর্ম্ম।" দেশের একজন প্রধান বিদ্বান লোককে এই যুক্তি অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি। যুক্তিটার একটু নূতনত্ব আছে। কিন্তু ইহা হৃদয়-বিহীন এবং অর্থশূন্য। ইহা ন্যায়ের ফাঁকি, একটা গুরুতর সামাজিক প্রশ্নের উত্তর নয়। মানবহৃদয় ও মনবিশিষ্টা একজন বালবিধবাকে এই যুক্তি দ্বারা নিরস্ত করা যায় না। একজন সহৃদয় ব্যক্তির কাছে ইহার কোন মূল্য নাই। ইহা একটা পুরাতন প্রথা বজায় রাখিবার চেষ্টার ফাঁদ পাতা মাত্র। ধরিয়া লইলাম কুলত্যাগে হিন্দু কন্যার অধর্ম্ম হয়, কিন্তু একজন সমাজতত্ত্ববিদের জানা উচিত যে, অধর্ম্মের ক্রম আছে এবং একটা উচ্চতর অধর্ম্ম নিবারণ করিবার জন্য অনেক সময় একটা নিম্নতর অধর্ম্ম প্রচলিত করা সমাজতত্ত্বের অনুমোদিত।

১৫। হইতে পারে, আমরা যে সব কথা বলিলাম তাহা বস্তুতঃ অন্তঃসারবিহীন, এবং পুরাতন রীতি নীতির গোঁড়ারা যাহা বলেন তাহাই ঠিক। আমরাই নির্ব্বোধ, এবং তাঁহারাই বুদ্ধিমান। কিন্তু ইহার প্রমাণ দরকার। তাঁহারা বলেন যাহা পুরাতন তাহাই ভাল, এবং সমাজ রক্ষা করিতে হইলে রক্ষণশীল হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। আমরা বলি পুরাতন হইলেই যে ভাল হইবে তাহা নয়, পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম এবং কোন জিনিষকে সময়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাহার অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন ও মেরামত আবশ্যক। সংস্কার ভিন্ন রক্ষণ অসম্ভব। কেহ যেন না মনে করেন আমরা সমাজ বিপ্লব সাধন করিতে উদ্যত। জোর করিয়া যে অন্তর্জ্জলীকৃত অশীতি-বর্ষীয়া বিধবা হইতে কুসুমকোমলা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালবিধবা পর্য্যন্ত

সকলেরই বিবাহ দিতে হইবে, তাহা আমরা বলি না। তবে আমরা জবরদস্তি বৈধব্যের পক্ষপাতী নই—

"বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারীবধ করে তুষ্ট করে দেশাচার।"

এরূপ প্রথার আমরা বিরোধী। কেহ যদি ভয় করেন একাদশী ও সাদা ধুতি দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে, তাঁহাকে আমরা অভয় দিতেছি। যে সব দেশে জবরদস্তি বৈধব্য প্রথা নাই, সে সব দেশেও অনেক বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহের কথা মনে আনা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও ভাবে না। আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে যে, ইহার উল্টা হইবেক তাহা ভাবিবার কোন কারণ নাই। আর এক কথা; বিবাহে দুই পক্ষ চাই; বিধবা স্ত্রীলোক বহুল পরিমাণে রাজী হইলেও বিধবা বিবাহ করণেচ্ছু পুরুষ যে বহুল পরিমাণে মিলিবে তাহা কে বলিল? আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, জোর করিয়া বৈধব্য প্রথা প্রচলিত রাখিবার কোন দরকার নাই, ইহাতে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হইতেছে।

১৬। এ প্রবন্ধে যে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা হইল তাহা নয়। তাহা করাও ইহার উদ্দেশ্য নয়। যে প্রশ্নের আলোচনায় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জীবনের কিয়দংশ ক্ষয় করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার সরকার, বীরেশ্বর পাঁড়ে* প্রভৃতির ন্যায় মহারথিগণ যে সম্বন্ধে তাঁহাদের ক্ষমতাশালী লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে মাদৃশ ব্যক্তির কিছু বলা না বলায় বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু আজ কালকার ভণ্ডামি ও "আর্য্যামি" অনেক সময় অসহ্য হইয়া উঠে; সেই জন্যই বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া ফেলিলাম। যদি কিছু ধৃষ্টতা হইয়া থাকে, সহৃদয় পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

দ।

---

* "সাবিত্রী" দেখুন।

পলাশ-বন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তি যে পলাশবনের ন্যায় একটী গ্রাম সমুজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছেন, ইহা আমি কেন, অনেক ব্যক্তিই জানিতেন না। ইহার একটী কারণও ছিল। গোস্বামী মহাশয় পলাশ-বনের আদিম নিবাসী নহেন; ইনি সবে দুই তিন বৎসর মাত্র পলাশবনে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে হুগলী জেলার অন্তর্গত কোনও গ্রামে ইহার পৈত্রিক বাসস্থান ছিল। কিন্তু হুগলী জেলায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, রোগযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায়, ইনি পলাশবনে আসিয়া সপরিবারে এক শিষ্যের বাটীতে কিয়দ্দিন বাস করেন। দরিদ্র শিষ্যের বাটীতে বহুদিন থাকা অনুচিত বিবেচনা করিয়া ইনি এই গ্রামে একটী স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করেন। পলাশবনে অবস্থানকালে ইহার উন্নত ধর্ম্মজীবন ও উদারচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া প্রায় গ্রামসুদ্ধ লোকই ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং তাহাদেরই সবিশেষ অনুরোধ ক্রমে ইনি পলাশবনেই বসবাস করিবার সঙ্কল্প করেন। সঙ্কল্পানুসারে ইনি স্বদেশের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে পলাশবনে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন এবং তাহার উপসত্বেই গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মসেবায় নিযুক্ত হন।

আমার গৃহনির্ম্মাণ কালে তাহার পর্য্যবেক্ষণের জন্য, পিতৃদেব প্রায়ই পলাশবনে গমনাগমন করিতেন। এইরূপ দুই চারিবার যতায়াত করিতে করিতে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন। আমি যে দিন পলাশবনে গৃহ দেখিতে প্রথম আসিলাম, সেই দিন পিতৃদেব আমাকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আমি যে একটা অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, তাহা পলাশবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শুনিয়াছিল, সুতরাং গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আমার আর নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন হইল না। আমরা সন্ধ্যার পর তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত

হইয়া দেখিলাম, তাঁহার বহির্ব্বাটীর সংলগ্ন বৃহৎ আটচালাটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গ্রামবাসিনী বর্ষীয়সীরাও সেখানে একত্র হইয়াছেন। খোল, করতাল ও মৃদঙ্গাদি যন্ত্র সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই লোকারণ্যের মধ্যে একটী উচ্চ বেদী; বেদীটি নানাবিধ পুষ্পে সুসজ্জিত এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেরই গলদেশে এক একটী পুষ্পমালা লম্বিত। বেদীর উপর একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে একটী ধর্ম্মগ্রন্থ চন্দনচর্চ্চিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা সেই গৃহে প্রবেশ করিলে, পিতৃদেবকে দেখিবামাত্র সকলে প্রণাম করিল এবং ইঙ্গিতে আমার পরিচয় পাইয়া আমাকেও অভিবাদন করিল। আমি উপবিষ্ট হইলে, দেখিলাম সভাস্থ সকলেই কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। পিতা আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিকটবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে 'গোস্বামী মহাশয় কোথায়' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই ব্যক্তি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, গোস্বামী মহাশয় আটচালা গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইল; পরে তিনি উপবিষ্ট হইলে, সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। গোস্বামী মহাশয় পিতৃদেবকে দেখিয়া প্রসন্নমুখে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং পরিচয় পাইয়া আমারও যথোচিত সমাদর করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের বিবরণ শুনিয়া ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি জন্মিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার সৌম্য ও প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিয়া সহজেই সেই ভক্তির উদয় হইল। আমাকে দেখিয়া তিনি অতিশয় সুখী হইয়াছেন, আমি পলাশবনে বাস করিলে গ্রামবাসী সকলেই যার পর নাই আনন্দিত ও উপকৃত হইবে এবং আমার সঙ্কল্প যে সাধু এবং আজিকালিকার দিনে কিছু আশ্চর্য্যেরও বিষয়, এই সম্বন্ধে পিতৃদেবের সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া তিনি বেদীতে উপবেশপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাঠারম্ভ হইবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ হরি-সঙ্কীর্ত্তন হইল। গয়ারাম ঘোষ নামক জনৈক প্রবীণ গ্রামবাসী গায়কদলের নেতা হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভক্তিরসের মধুর স্রোত ছুটাইলেন। আমি অনেক সুগায়কের মধুময় কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; কিন্তু গয়ারাম ঘোষের তানলয়হীন ভক্তিমিশ্রিত আড়ম্বরশূন্য সরল হরি-সঙ্কীর্ত্তনে আমার অন্তরাত্মা যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিল, এরূপ পরিতৃপ্তি আমি বহুকাল অনুভব করি নাই।

সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে পল্লীর বালকবালিকারা দলে দলে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। দেখিলাম, গোস্বামী মহাশয়ের অন্তঃপুর হইতেও দুইটী বালিকা ও একটী বালক আসিয়া বেদীর নিকট উপস্থিত হইল। বালকটি সর্ব্বকনিষ্ঠ। আকার প্রকারে বুঝিলাম, ইহারা গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রকন্যা। ইহাদের সকলেই শান্তমূর্ত্তি, সুশ্রী ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন। ইহাদের সকলেরই মুখমণ্ডলে মাধুর্য্য ও পবিত্রতাব্যঞ্জক কেমন একটী দিব্য লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছিল। সে লাবণ্যের এরূপ আকর্ষণী শক্তি যে, একবার তাহাতে চক্ষু পড়িলে, সহজে আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। চক্ষু যেন সেই লাবণ্যসুধা অবিতৃপ্তরূপে পান করিতে থাকে। আমি প্রাণস্পর্শী মধুর হরি-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে দেবতার ন্যায় সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন সেই বালকবালিকাগুলিকে দেখিয়া মনোমধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন পাপ-কোলাহলময় সংসারক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কোন্ এক দেবরাজ্যে আসিয়াছি। মুহূর্ত্তমধ্যে এই স্থূল জড়দেহ যেন পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেল; অশরীরী লঘু আত্মা যেন বন্ধনমুক্ত হইয়া, নভোমণ্ডলে কোনও জ্যোতিষ্কের ন্যায়, সেই সঙ্গীতোদ্দীপিত ভাবরাশির মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এক কথায়, কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব মহাসঙ্গীতের সহিত আমার আত্মার গভীর সঙ্গীত যেন মিলিত হইয়া গেল এবং আমিও যেন স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া গেলাম। কিয়ৎক্ষণপরে সঙ্গীত নিবৃত্ত এবং সভাস্থল নীরব হইল; কিন্তু আমার আত্মার মধ্যে যে সঙ্গীতের ঝঙ্কার হইতেছিল, তাহার আর নিবৃত্তি হইল না; গোস্বামী মহাশয় যে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না ও সেই সভাস্থ কোন ব্যক্তিই আমার চক্ষুতে প্রতিভাত হইল না। আমি এক অনির্ব্বচনীয় মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলাম। কতক্ষণ এইভাবে নিমগ্ন ছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না। তবে তাহা যে বহুক্ষণ হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গোস্বামী মহাশয় সে রাত্রির মত ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শেষ করিয়াছিলেন এবং উপস্থিত সকলে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আমাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পিতৃদেব আমার গাত্র-স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "যেবু, তোমার কি নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে? রাত্রি অধিক হইয়া থাকিবে; চল, অদ্যকার মত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট

বিদায় লইয়া গৃহে গমন করা যাউক।" এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; আমিও তাঁহার কথায় সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সহসা দণ্ডায়মান হইলাম। তৎপরে উভয়ে গোস্বামী মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। গ্রামস্থ ব্যক্তিরাও একে একে গৃহে গমন করিতেছিল; কেহ কেহ আমাদের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়া আবার গৃহে প্রত্যাগত হইল। আমরা পিতা পুত্রে আরণ্যপথ বাহিয়া চলিতে লাগিলাম।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। জ্যোৎস্নালোকে আরণ্য রাজপথ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছিল। পথের উভয়পার্শ্ববর্ত্তী শালবনের মনোহারিণী শোভা নয়নযুগলের তৃপ্তি সাধন করিতেছিল। বৃক্ষরাজী নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান থাকায় বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা সুধাকরের সুধাংশুরাশি মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া পূর্ণ তৃপ্তি ও সুখ অনুভব করিতেছে; যেন তাহাদেরও সরস হৃদয় মধ্যে এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের ঝঙ্কার হইতেছে। নীরব আরণ্য-পথে বনের এই বিচিত্র ভাব ও শোভা দেখিতে দেখিতে স্বপ্নাবিষ্টচিত্তে পিতৃদেবের সহিত চলিতে লাগিলাম। সহসা তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"দেবু, গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া তোমার মনে কি হইল?"

আমি বলিলাম—"গোস্বামী মহাশয়কে মহাত্মা ব্যক্তি বলিয়াই আমার মনে হইল। এরূপ ব্যক্তির নিকটে থাকিতে পাইব বলিয়া আমি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।"

পিতৃদেব বলিলেন—"গোস্বামী মহাশয় সম্বন্ধে আমারও ঐরূপ মত বটে। তুমি কি তাঁহার ছেলে মেয়েগুলিকে দেখিয়াছিলে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ ছেলে মেয়েগুলিকে? যা'রা তাঁ'র দক্ষিণ দিকে ব'সে ছিল, তারাই কি?"

পিতৃদেব বলিলেন—"হাঁ, তারাই বটে।"

আমি বলিলাম—"বেশ, ছেলেমেয়েগুলি।"

পিতৃদেব নীরব হইলেন; আর কোনও কথাবার্ত্তা হইল না। আমিও যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার ভয় হইতেছিল, ভাগবতের যে বিষয় অদ্য ব্যাখ্যাত হইতেছিল, পাছে তাহারই সম্বন্ধে তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলেন। সে রাত্রিতে কি বিষয় পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা আমি আদৌ জানিতাম না। যাহা হউক, পিতৃদেব নীরব হইলে

আমার চিন্তাস্রোত কি জানি কেন গোস্বামী মহাশয়ের সেই ছেলেমেয়ে-গুলির দিকেই প্রধাবিত হইল। সেই সুন্দর মুখগুলি আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। তন্মধ্যে একখানি মুখ কেমন সুন্দর ও পবিত্র! যেন সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য; যেন পবিত্রতার মধ্যেও পবিত্রতা! কি জানি কেন আমার অজ্ঞাতসারে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে, একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পলাশবনে আসিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যে গ্রামস্থ সকল ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলাম। আমার নূতন গৃহে প্রথম কতিপয় দিবস প্রায় প্রত্যহই বহু লোকের সমাগম হইত। কিন্তু সকলের সহিত পরিচয়কার্য্য সমাপ্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে লোকসংখ্যার হ্রাস হইতে লাগিল। গ্রামবাসী অধিকাংশ ব্যক্তিকেই কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। আমার মত নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি গ্রামে অত্যল্পই ছিল। সুতরাং আমার নিকটে আসিয়া সময় নষ্ট করিবার অবসর কাহারই ছিল না। কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিরা দিবসের অধিকাংশ ভাগ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত; কেবল সন্ধ্যার পর তাহাদের কিছু অবকাশ হইত। এই অবকাশ সময়টি তাহারা সাধারণ আটচালা গৃহে গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্র ব্যাখ্যা-শ্রবণে অতিবাহিত করিত। আমিও হরিসঙ্কীর্ত্তন ও তত্ত্বকথা শুনিবার আশায় প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে উপস্থিত হইতাম।

গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র কন্যাগুলিকে প্রতিদিন বেদীর দক্ষিণ ভাগে উপবিষ্ট দেখিতে পাইতাম। জ্যেষ্ঠা কন্যাটির বয়ঃক্রম অনুমান ত্রয়োদশ বর্ষ হইবে। শুনিলাম কন্যাটির তখনও বিবাহ হয় নাই। কন্যার উপযুক্ত পাত্র স্থিরীকৃত হয় নাই বলিয়াই বিবাহ হয় নাই; নতুবা অনেকদিন বিবাহ হইয়া যাইত। গোস্বামী মহাশয় পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করায় যোগ্য পাত্র সন্ধানের পক্ষে কিছু বিলম্ব ও অসুবিধা ঘটিতেছিল। সহস্র চেষ্টাতেও পশ্চিম বঙ্গের আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে একটীও উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় নাই। অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান করা অপেক্ষা কন্যার আরও দুই এক বৎসর অনূঢ়া থাকা ভাল, শুনিলাম গোস্বামী মহাশয়ের ইহাই মত। গয়া-

রাম ঘোষের মুখে গোস্বামী মহাশয়ের এই মত শুনিয়া আমি একটু বিস্মিত হইলাম। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যভাব বর্জ্জিত অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যে এরূপ মত হইতে পারে, ইহা আমার নিকট কিছু অভিনব ও বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল।

আমি যাহাতে সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকি, তদ্বিষয়ে গ্রামবাসী ব্যক্তিরা যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিল। কেশব ঘোষ নামে একটী পিতৃমাতৃহীন কৃষক যুবা আমার একান্ত অনুগত হইল। তাহার ভূসম্পত্তি কিছুই না থাকায় সে দৈহিকপরিশ্রম-লব্ধ অর্থ দ্বারা কোনও প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। তাহার পবিত্র স্বভাবের জন্ত গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাকে ভাল বাসিত। আমিও কেশবের দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ ও সরল সানন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া বড় প্রীত হইতাম। তাহাকে আমার নিকটে রাখিবার অভিপ্রায়ে আমি তাহার উপযুক্ত মাসিক বর্ত্তন স্থির করিয়া তাহাকে আমার গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিলাম।

আমার আবার গৃহকার্য্য কি, তাহা হয়ত পাঠকবর্গের জানিতে কৌতূহল হইয়া থাকিবে। গৃহকার্য্য আর কি? গৃহটিকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা, আমার পুস্তক ও অন্যান্ত দ্রব্যগুলির যত্ন করা এবং আমার অনুপস্থিতিতে গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করা। কেশবের ইহাই গৃহকার্য্য ছিল। জননীর অনুরোধে আমি বাটীতেই আহার ও শয়ন করিতাম। আমি যে জঙ্গলের মধ্যে, গ্রামের বহির্ভাগে, একমাত্র লোকের সহবাসে ও এক জনশূন্য গৃহে বাস করিয়া থাকিব, এ প্রস্তাবে তিনি কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার মনে অনর্থক কষ্ট দেওয়াও আমি উচিত বিবেচনা করিলাম না। সুতরাং আমি প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পলাশবনে আগমন করিতাম এবং কেশবের নিকট বিগত নিশার সংবাদাদি শুনিয়া ভ্রমণ জন্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইতাম। ভ্রমণের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান বা দিক্ ছিল না। কিন্তু আমি সচরাচর সর্ব্বাগ্রে গৃহের উত্তরদিকস্থ সেই ক্ষুদ্র শৈলের নিকট উপস্থিত হইয়া তদুপরি আরোহণ করিতাম এবং সেই উচ্চস্থান হইতে একবার চতুর্দ্দিকের শোভা দেখিয়া লইতাম। নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে নয়ন মন কিয়ৎপরিমাণে পরিতৃপ্ত হইলে, আমি যমুনাতটিনীর বক্রগতি ধরিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অরণ্যের নানাস্থানে উপস্থিত হইতাম এবং প্রকৃতির ভীষণ ও মধুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুলকিত হইতাম।

প্রথমে যমুনার অনুসরণ করিতে করিতে আমি আমার বাটীর পশ্চিম দিক্‌স্থ বনের মধ্যে প্রবেশ করিতাম, পরে গৃহের দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতাম। সেই দিকে যমুনাতটবর্ত্তী উর্ব্বর শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে উপনীত হইতাম। তৎপরে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গোস্বামী মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া নিজ কুটীরে উপনীত হইতাম। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে স্নান ও কিছু ভক্ষণ করিয়া পাঠগৃহে প্রবেশ করিতাম। সেখানে ইচ্ছামত পাঠাদি সমাপন করিয়া বাটীতে আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতাম। অপরাহ্ন সময়ে আবার আমি পলাশবনে আসিয়া গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতাম এবং সন্ধ্যার পর আটচালায় হরিসঙ্কীর্ত্তন ও গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আবার বাটীতে প্রত্যাগত হইতাম। গৃহ পর্য্যন্ত প্রায়ই কেহ সঙ্গে যাইত। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কোন লোকেরই প্রয়োজন হইত না; তবে অন্ধকার হইলে, একটা আলোকের আবশ্যকতা অনুভব করিতাম। সেই সময়ে জননী দেবী বাটীর ভৃত্যকে আলোকসহ পলাশবনে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু নিজের লোক কেহ সঙ্গে না থাকিলেও পথে লোকের বড় একটা অভাব হইত না। গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিবার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে ভক্তেরা প্রত্যহই পলাশবনে উপস্থিত হইত।

জননীদেবী একদিন পলাশবনে আসিয়া আমার গৃহ দেখিয়া গেলেন। গৃহ ও স্থানটি দেখিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল। প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা আসিয়া জননীর সহিত পরিচিত হইল। গোস্বামী মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী জননীর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক লইয়া গেলেন। আমারও সেইদিন গোস্বামী মহাশয়ের গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ হইল। জননীদেবী সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। আমিও যথা-সময়ে বাটীতে উপস্থিত হইলাম। জননীদেবী পলাশবনে সেই দিবস যাপন করিয়া যারপর নাই পুলকিত হইয়া থাকিবেন; যেহেতু তিনি পুনঃ পুনঃ সেই স্থানের গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের এবং সর্ব্বোপরি গোস্বামীপত্নী ও তাঁহার পুত্রকন্যাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্তদের উল্লেখ করিয়া তিনি প্রতিবাসিনী বর্ষীয়সীকে বলিতে লাগিলেন,

"যেমন মা, তেমনি ছেলেমেয়েগুলি! যেমন মুখের গড়ন ও শ্রী, তেমনি স্বভাব,—আহা, কেমন শান্ত, শিষ্ট, সদানন্দ! দেখলে, চোখ

জুড়োয়। আমি যতক্ষণ ছিলুম, ছেলেটি আর মেয়ে দুটি এক দণ্ডের তরেও আমার কাছছাড়া হয় নি। বড় মেয়েটির নাম যোগমায়া। যোগমায়া তো যোগমায়াই বটে; যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। রূপ যেন উচ্‌ছলে পড়্‌ছে। মেয়েটির এখনও বিয়ে হয় নি। মেয়ের বাপ মা দেশ ছেড়ে এখানে আছে; আর এই বনজঙ্গলের দেশে ভাল পাত্রও পাওয়া যাচ্চে না, তাই বিয়ে হতে এত দেরী হচ্চে। মেয়ের মা এর জন্যে কত ভাবনা চিন্তে কর্‌ছিল। মেয়েটিকে দেখে আমার দেবুর কথা ভাব্‌ছিলুম; কিন্তু আমার কেমন দুরদেষ্ট, দেবু আমার যেন সন্নিসি হ'য়ে গেছে। এই দেখনা, সে কত লেখাপড়া শিখেছে, যেন বিদ্যের একটা জাহাজ। কিন্তু দেবু চাক্‌রী বাক্‌রী কল্লে না; চাক্‌রী কল্লে সে আজ একটা মস্ত বড় চাকুরে হ'তে পার্‌তো। আমার আর দুটি ছেলে তোমাদের আশীর্ব্বাদে বড় বড় চাক্‌রী কচ্চে,আর বৌ ছেলে নিয়ে সুখে আছে; কেবল দেবুই আমার কেমন একরকম হ'য়ে গেল! দেখ, তার কোন বিষয়ে সখ্‌ নেই, কারুর সঙ্গে আমোদ করা নেই, আহ্লাদ করা নেই, দুটো কথা বলা নেই, একটা ভাল কাপড় পরা নেই, যেমন তেমনেই সন্তুষ্ট—আর কি এক রোগ হ'য়েচে, দিন নেই রাত নেই পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়াচ্চে, আর কেবল বই পড়্‌চে, আর একলা আছে, আর বিয়ের নাম কল্লে তেলেবেগুনে জলে উঠ্‌চে! কেন যে দেবু এমনতর হ'ল তা তো আমি জানি না। আমার অদৃষ্টে যে কি আছে, তা ভগবানই জানেন। দিদি, আমার সব সুখ হ'য়েও কিছু হয় নি। দেবু আমার বড় আদরের সামিগ্রী - দেবুকে আমার সংসারীর মতন দেখে গেলে আমি সুখে মর্‌তে পার্‌তুম; কিন্তু সে সুখ আমার কপালে নেই!"

এই বলিয়া জননীদেবী নিরস্ত হইলেন। শেষোক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। আমি যদিও তাঁহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া নিশ্চিত দুই চারি বিন্দু অশ্রু পড়িয়াছিল; যেহেতু বগলাপিসী তৎক্ষণাৎ আমার আচরণের উপর কটাক্ষ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ্‌ বৌ, তুই কাঁদিস্‌ নে। তোর কিসের কষ্ট যে, তুই চোখ থেকে জল ফেলিস্? বল্লে তুই রাগ কর্‌বি, তাই বলি নি; তা নইলে আসল কথা বল্‌তে গেলে, দেবুর তো আমি তত দোষ দিই না। তার আর দোষ কি? যত দোষ তার বাপের! এ কথা তোমার কাছে বল্‌চি, আর সকলের কাছেও বলব।

সত্যি কথা বল্‌ব, তার আর ভয় কি? আমরা যখন বিয়ে দিতে বল্লুম, তখন ছেলের বিয়ে দেওয়া হ'ল না। বাপ ছেলেকে নাই দিয়ে দিয়ে তালগাছে তুলে ফেল্‌লেন। এখন ছেলে ধিঙ্গী হ'য়ে বনের মাঝে একটা ঘর ক'রে ব'সেচে। আর ছেলেরই বা তোমার এ কি রীত গা? বাপ মা রইলেন এখানে, ছেলে রইলেন ওখানে; এ কোন্ দেশের কথা গা? ছেলে তোমার বিদ্যের জাহাজ, তা নেই মান্‌লুম; কিন্তু দেশে কি আর কারুর ছেলে লেখাপড়া জানে না? আর সকলের ছেলেই কি লেখাপড়া শিখে সন্নিসি হ'য়ে বেড়াচ্চে? এই ধর না তোমারই কথা। তোমার নৃপেন আর সুরেনও তো তোমার দেবনের চেয়ে কিছু কম লেখাপড়া জানে না; কই তারা কি বৌ ছেলে ফেলে কৌপীন প'রে উদাসীন হ'য়েচে? আমি তোমাকে সত্যি বল্‌চি, ছেলের বাপই ছেলেকে এমন ক'রেচে। কিন্তু যাক্ ও সব কথা—এখন একটা কথা আমার মনে হ'চ্চে। গোস্বামীর মেয়ে যোগবালা—না—কি নাম বল্লে?—ঐ মেয়েটি ডাগর আর প্রতিমার মত সুন্দরী বল্‌চ। আমার বেশ মনে ধর্‌চে, ঐ মেয়েই দেখো তোমার বৌ হ'বে। তুমি আজকালকার ছেলেগুলোকে তো চেনো না, ভাই। ওরা এক ধারার ছেলে; সোজা পথে তো কখনও যাবে না! স্পষ্ট ক'রে বল্লেই তো হ'তো যে, ঐ মেয়ের সঙ্গে যদি বিয়ে হয়, তবে বিয়ে কর্‌বো, তা নইলে ক'র্‌বো না। এত মার পেঁচে কাজ কি বাবা? হুঁঃ—,তোমার দেবন আগে ঐ মেয়েটাকে দেখে যদি পলাশবনে ঘর না ফাঁদিয়ে থাকে, তবে আমার নাম বগলা সুন্দরীই নয়। বনে জঙ্গলে বেড়ানো আমরা আবার বুঝি না? দেখো, ঐ যোগবালাই তোমার বৌ হ'বে, এ কথা আজ আমি ব'লে যাচ্চি, আর তুমিও মনে রেখো। যখন আমার কথা সত্যি হবে, তখন বোলো।" এই বলিয়া বগলাসুন্দরী গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিলেন; জননী দেবীও তাঁহাকে কি বলিতে বলিতে তাঁহার সহিত সদর দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলেন। বগলাসুন্দরী এবং জননী দেবীও হয়ত মনে করিয়াছিলেন, আমি নিদ্রামগ্ন হইয়াছি। কিন্তু আমি শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া বগলাসুন্দরীর এই অদ্ভুত বক্তৃতা গলাধঃকরণ করিতেছিলাম এবং তাঁহার অন্তর্যামিতা ও লোকচরিত্র-জ্ঞানের বিচিত্র পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছিলাম। তদ্দণ্ডেই বগলাসুন্দরীর সম্বন্ধে জননীদেবীকে দুই একটা কথা বলিতে আমার একান্ত ইচ্ছা

হইল; কিন্তু আমি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া সে রাত্রিতে আর কোন কথা উত্থাপন করিলাম না। বগলাসুন্দরী যে সমাজে আছেন, সে সমাজে বাস করা বা জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা কিরূপ সহজ ব্যাপার, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইল না। ক্রোধে ও অভিমানে হৃদয় বড়ই ক্ষুব্ধ হইল। চরিত্রের উপর অযথা দোষারোপ করিলে, সকলেরই হৃদয় এইরূপ ব্যথিত হইয়া থাকে। কিন্তু মনের কেমন স্থিতিস্থাপক গুণ, কিয়ৎক্ষণ পরে ক্ষুদ্রমনা বগলার উপর আমার আর কিছুমাত্র ক্রোধ রহিল না। নিরক্ষর, নির্ব্বুদ্ধি, প্রগল্‌ভা, বৃথাভিমানিনী বগলার যে এইরূপ স্বভাব হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? যোগমায়ার সহিত কোনও দিন আমার বিবাহ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই কন্যা লাভের উদ্দেশ্যেই যে আমি পলাশবনে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বকধার্ম্মিকের ন্যায় বসিয়া আছি, এ কথা অতীব নীচ, ঘৃণিত ও অসত্য। কথা যখন অসত্য, তখন আমার ক্রোধের আর কারণ কি? আমার মনের যাহা প্রকৃত অবস্থা, তাহা সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান জানেন; তিনি জানিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। যেহেতু আমি আমার চিন্তা ও কার্য্যকলাপের জন্য একমাত্র তাঁহারই নিকটে দায়ী। বগলা যদি অন্যরূপ জানে, তাহাতে আমার তত ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সংসারের প্রতি আমার ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মিতে লাগিল এবং পরমেশ্বরকে ভুলিয়া লোকে অসত্যের কিরূপ সেবা করে, তাহাও মনে হইতে লাগিল। শেষে সাধু-চরিত্র মহাপুরুষগণের কথা মনে পড়িল। জগতের উপকার করিতে গিয়া কত মহাপুরুষকে যে কত গ্লানি, নিন্দা, অযথা দোষারোপ ও নির্য্যাতন পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি তো কীটানুকীট, কোন্ ছার। পরার্থের কথা দূরে থাকুক, আমি তো স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি কখন নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

প্রভাতে উঠিয়া পলাশবনে যাইতে যাইতে আমার বিবাহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি বিবাহ করিলে, পিতা মাতা উভয়েই

সুখী হন। পিতামাতাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করাই পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য। শাস্ত্রও বলিতেছেন, পিতামাতা পুত্রের উপর প্রীত হইলে, দেবতারাও তাহার উপর প্রীত হন। বিবাহের প্রতি আমার যে কোন বিদ্বেষ ছিল, তাহা নহে। কিন্তু ইহাও বলা উচিত, বিবাহের জন্য আমার তাদৃশ আগ্রহ বা আস্থা ছিল না। আমি স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয়। শান্তিতে কালযাপন করাই আমার একান্ত অভিপ্রেত। সচ্চিন্তা, সদ্‌গ্রন্থপাঠ, পরমেশ্বরের আরাধনা এবং সাধ্যমত লোকের উপকারসাধন,—এইগুলিই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাগুলির চরিতার্থতা সম্পাদনোদ্দেশে আমি দুইটী বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা স্থির করিয়াছিলাম; প্রথমতঃ অবিবাহিত থাকা; দ্বিতীয়তঃ উদরান্নের সংস্থান করা। এই কারণে আমি বিবাহ করিতে কোন মতেই সম্মত হই নাই এবং উদরান্নের সংস্থানের জন্যও এই পলাশবন মৌজা ক্রয় করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম, আমার উপার্জ্জনের উপর কেহই নির্ভর করেন না; সুতরাং আমার নিজের ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা আয়কেই আমি প্রচুর এবং এমন কি অতিরিক্তও মনে করিয়াছিলাম। বিবাহ করিলে পাছে আমার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটে, ইহাই আমার প্রধান ভয় ছিল। স্ত্রী হয়ত বিভিন্ন রুচির ও বিভিন্নপ্রকৃতির হইবে। যাহা আমার জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা হয়ত তাহার জীবনের উদ্দেশ্য হইবে না। এইরূপ কারণ উপস্থিত হইলে, মনের মিলন না হওয়াই স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। স্বামী-স্ত্রীর যদি মনের মিল না হয়, তবে সে সংসারে আর শান্তি কোথায়? আমি ইচ্ছা করিয়া এই অশান্তি ও দুঃখ ক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। ইচ্ছা করিয়া কয় জন ব্যক্তি স্বপদে কুঠারাঘাত করিয়া থাকে? তাহার পর যদি মনের মিলনও হয়, তাহা হইলেও আমাদের অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইতে পারে। পরিবার বৃহৎ হইলে, এত অল্প আয়ে তাহাদের লালন পালন, সুশিক্ষা সাধন ও বিবাহাদি প্রদান করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ অবস্থা ঘটিলে অন্ততঃ প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জ্জনের জন্যও আমার চাকুরী হউক বা ব্যবসায় হউক কোনও উপায় অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। তাহা হইলে, আমার আর কি হইল? আমি তো আর নির্ব্বিবাদে শান্তিসুখ ভোগ করিতে পাইব না? সর্ব্বোপরি সংসারের অনিত্যতা প্রিয়জনবিয়োগ এবং সংসারের পাপময় কোলাহল আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

আমাকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। এই সমস্ত কারণে আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এ জীবনে বিবাহ করিব না, ইহাই স্থির করিয়াছিলাম। বিবাহের চিন্তা হইতে আমি মনকে যথাসাধ্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহাকে অন্যদিকে প্রধাবিত করিয়াছিলাম। সেই অবধি বিবাহের চিন্তা মনোমধ্যে বড় একটা উদিত হইত না। হইলে তৎক্ষণাৎ কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে ভগবৎ-পদে নিয়োজিত করিতাম। বলিতে লজ্জা কি, যোগমায়াকে দেখিয়া এই দুর্ব্বল হৃদয়ে একটী দিন ক্ষণেকের জন্য বিবাহের চিন্তা সমুদিত হইয়াছিল। কিন্তু সহসা তৎক্ষণাৎ কিজানি কাহার বজ্রগম্ভীর রবে আমি কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবনের মহাভাব ও মহালক্ষ্য আসিয়া আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আমি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়া সেই মহাভাবে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, এবং সেই মহালক্ষ্যপথে অদম্যতেজে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত হৃদয়ে নববল ও নবোৎসাহ সঞ্চিত করিয়াছিলাম।

আজ আবার বিবাহের সেই সমস্ত প্রসুপ্ত চিন্তা জাগরিত হইয়া আমার মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। একদিকে পিতামাতার সুখসম্পাদন, অপরদিকে আমার অবশ্যম্ভাবী পতন—এই দুইটী কঠোর সমস্যার মধ্যে মনের ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। ক্রমিক ঘাতপ্রতিঘাতে মন নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। আমি কোন সুচারু সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিলাম না। পরিশেষে হতাশ হৃদয়ে ও ক্লান্ত মনে এক বৃক্ষের তলে অর্দ্ধ শয়ান অবস্থায় বসিয়া পড়িলাম। ক্রমে চক্ষুর্দ্বয় আমার অজ্ঞাতসারে নিমীলিত হইয়া আসিল এবং অনতিবিলম্বেই আমি প্রাভাতিক মারুতহিল্লোলে, সেই সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।

নবাবিষ্কৃত কিরণ।

সকলেরই ধারণা আছে যে, "ফটো" তুলিলে বাহ্যিক আকারের প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়। আমরা যাহাকে যেমনটি দেখি, ফটোতে ঠিক তাহার সেইরূপ ছবি উঠে। তাহার ভিতরে কি আছে, তাহা দেখা যায় না। সম্প্রতি জর্ম্মণিতে রণ্টন্ নামক একজন বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এক প্রকার কিরণের (rays) আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে "ফটো" তুলিলে

বাহিরের চিত্র না পাইয়া ভিতরের ছবি পাওয়া যায়। এই নবাবিষ্কৃত কিরণের কি কি গুণ এবং এই নূতন রূপ "ফটো" তুলিবার প্রকরণাদি সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নাই। তবে যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমরা এ স্থলে তাহার পরিচয় দিব। সুতরাং আলোক, কিরণ প্রভৃতি ইহার আনুষঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের স্থূল বিবরণ জানা আবশ্যক।

কতকগুলি রৌপ্য-লবণে (Silver Salts) সূর্য্যের আলোক লাগিলে তাহার গুণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে*; এবং কতকগুলি দ্রব্যের এই গুণ আছে যে তাহারা সেই পরিবর্ত্তিত রৌপ্য-লবণকে অতি সূক্ষ্ম রৌপ্যচূর্ণে পরিণত করে। এই রৌপ্যচূর্ণের রঙ্ স্বভাবতঃ কাল। উক্ত দ্রব্যগুলি রৌপ্য-লবণের পূর্ব্বাবস্থায় কোনরূপ কার্য্য করিতে পারে না। এই প্রক্রিয়ার উপর "ফটোগ্রাফের" কার্য্য নির্ভর করে। "ফটো" তুলিতে হইলে কোন লালাযুক্ত দ্রব্যের সহিত রৌপ্য-লবণ (Salt) মিশ্রিত করিয়া কাঁচের ফলকের উপর মাখাইয়া দেওয়া হয়। এই ফলকের উপর কোন বস্তু রাখিয়া আলোকে ধরিলে ফলকের উপরিস্থ যে যে স্থান দিয়া আলো যাইতে পারে, সেই সেই স্থানের রৌপ্য-লবণ পরিবর্ত্তিত এবং যে যে স্থানে আলোক প্রবেশ করে না, সেই সেই স্থান পূর্ব্ববৎ থাকিয়া যায়। এক্ষণে আমরা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলি দ্বারা পরিবর্ত্তিত স্থান সকল কাল করিতে পারি এবং যে যে স্থান পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তথাকার রৌপ্য-লবণকে সোডা হাইপো-সল্ফাইট্ দিয়া গলাইয়া ফলকের উপরিস্থ বস্তুর চিত্র তুলিতে পারি।

সূর্য্যকিরণ ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার কিরণের দ্বারাও এইরূপ ছবি তুলিতে পারা যায়। এক্ষণে ইহাদিগের কিছু পরিচয় আবশ্যক। একটী বস্তুর উপর আর একটী বস্তুর আঘাত করিলে উভয়ই কম্পিত হয়। কোন কোন স্থলে তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি, কোন কোন স্থলে পারি না। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎগণ অনেক বিচারের পর স্থির করিয়াছেন যে এইরূপ আঘাত, ঘর্ষণ বা অপর কোন উপায়ে বস্তু সকল কম্পিত হইয়া ঈথর নামক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অতি সূক্ষ্ম পদার্থে তরঙ্গ উৎপাদন করে। সেই তরঙ্গই তাড়িত, আলোক এবং উত্তাপ প্রভৃতির কারণস্বরূপ। পণ্ডিতগণ ইহাও স্থির করেন যে, যখন সেই তরঙ্গমালা অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার থাকে, তখন তাহা হইতে উত্তাপ উৎপন্ন হয়। এবং তদপেক্ষা

---

* যেমন "কষ্টিকে" আলো লাগিলে তাহা কাল হইয়া যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ হইতে আলোক উৎপন্ন হয়। যে সকল কিরণ হইতে আলোক উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আলোক-কিরণ বলা যাইতে পারে। আলোক-তরঙ্গ হইতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ আছে। তাহারা সাধারণতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাহাদের অস্তিত্ব আমরা দুই প্রকারে অনুভব করিতে পারি। সেই তরঙ্গাণু সকল (Quinine Sulphate) কুইনাইন প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে অন্ধকারে আপনা হইতে জ্যোতিঃ বিকিরণের শক্তি প্রদান করে। আমরা এই শক্তিকে জ্বালাময়ী শক্তি (Flamescence) বলিব। এবং এই তরঙ্গ-মালা সমুত্থিত কিরণ যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ এবং পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর সংমিশ্রন প্রভৃতি কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করে। অন্ধকার গৃহে কোন রন্ধ্র পথ দিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিলে যদ্যপি সেই আলোকপথে ঝাড়ের কলমের ন্যায় একটী ত্রিপার্শ্ব কাচ (Prism) রাখা যায় তাহা হইলে সেই ত্রিপার্শ্ব কাচ ভেদ করিয়া আলোক-রেখা বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই বিভাগ লোহিত, হরিদ্রা, সবুজ, নীল, প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা অনুভব করা যায়।

একখণ্ড সাদা কাগজের উপর এই প্রকারে বিভক্ত আলোক-রেখা ধরিলে প্রথমে লোহিত, পরে কমলালেবুর বর্ণ, তৎপরে হরিদ্রা, সবুজ, নীল, বেগুনে-নীল (Indigo) এবং পরিশেষে বেগুনে (violet) বর্ণ দেখা যায়। এই বেগুনে বর্ণের পর কাগজের উপর জলে বিগলিত কুই-নাইন রাখিলে তাহা গাঢ় উজ্জ্বল নীলবর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে বেগুনের পরে কোন অদৃশ্য কিরণ আছে, যাহার এবম্ভুত রাসায়নিক শক্তি আছে। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে এই সাত বর্ণের আলোকের মধ্যে লাল কিরণের তরঙ্গগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বেগুনে কিরণের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ত্রিপার্শ্ব কাচের একটী গুণ আছে যে ইহার ভিতর দিয়া যত ক্ষুদ্র তরঙ্গোত্থিত কিরণ গমন করে, তাহার গতি ততই বক্র (refracted) হইয়া যায়। ইহা হইতে এবং উপরি উক্ত পরীক্ষা (experiment) হইতে আমরা সূর্য্যকিরণে পূর্ব্বলিখিত ইন্দ্রিয়ের অগোচর কিরণের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই। এই কিরণ বেগুনে কিরণের পরবর্ত্তী বলিয়া আমরা উহাকে "বেগুনে-পর" কিরণ (ultra-violet) বলিব। সূর্য্য-কিরণের রৌপ্য-লবণ পরিবর্ত্তিত করিবার যে ক্ষমতা আছে,

তাহা এই কিরণেও আছে। কিন্তু যে সকল দ্রব্যের ভিতর দিয়া আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, সেই সকল বস্তুকে বেগুনেপর কিরণও ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। অতএব এই কিরণের সাহায্যে আমরা কাষ্ঠ, চর্ম্ম ও কাগজ প্রভৃতি (আলোক সম্বন্ধে) অস্বচ্ছ বস্তু দ্বারা আবৃত কোন দ্রব্যের প্রতিরূপ (Photo) তুলিতে পারি না। কিন্তু অধ্যাপক রঞ্জটনের নবাবিষ্কৃত কিরণের সাহায্যে কতকগুলি অস্বচ্ছ দ্রব্যাবৃত বস্তুর প্রতিকৃতি লইতে পারা যায়।

কাচের উপর রেশম ঘষিলে কাচের আকর্ষণী শক্তি জন্মায়। যাহা হইতে কাচ এই শক্তি পায়, তাহার নাম তাড়িত। আবার গালাতে এইরূপ রেশম ঘর্ষণ করিলে গালাও ঐ গুণ প্রাপ্ত হয়। দেখা যায় যে দুইটী তাড়িতবিশিষ্ট কাচ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, কিন্তু তাড়িতযুক্ত কাচ ও গালা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সুতরাং কাচের ও গালার তাড়িত ভিন্ন প্রকার। আমরা এই দুই তাড়িতের প্রভেদার্থ কাচতাড়িত ও লাক্ষাতাড়িত শব্দ প্রয়োগ করিব। ইহাও দৃষ্ট হয় যে কাচে রেশম ঘর্ষণ করিলে কাচে যে তাড়িত জন্মে, রেশমে তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের তাড়িত উৎপন্ন হয়। এই মূলতত্ত্ব অনুসারে Holtz, Wimshurt প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ একপ্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহা হইতে উক্ত দুই প্রকার তাড়িত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই যন্ত্র চালিত করিলে ইহার লাক্ষাতাড়িত আশ্রয়-স্থলের শেষ সীমা অর্থাৎ বিয়োগ কেন্দ্র (Negative pole) হইতে কুঁচের আকারে একপ্রকার ছটাবিশিষ্ট আলোক নির্গত হয় এবং তথা হইতে আরও একপ্রকার কিরণ বহির্ভূত হয়, যাহার "বেগুনে-পর" কিরণের ন্যায় জ্বালাময়ী (বা জ্যোতির্ম্ময়ী) শক্তি আছে, যাহাকে গালা-কিরণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই দুইটী কিরণের পার্থক্য এই যে গালা-কিরণ বেগুনে-পর কিরণের (ultra violet rays) অভেদ্য অনেকগুলি বস্তু ভেদ করিয়া যাইতে পারে। দুইটী ভিন্ন পোল অর্থাৎ তাড়িত-কেন্দ্রকে পরস্পর সন্নিকট করিলে তাহার মধ্য হইতে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। কিন্তু ইহাদিগকে কোন বায়ুশূন্য স্থানে পরস্পর সন্নিকট রাখিলে দেখা যায় যে স্ফুলিঙ্গের পরিবর্ত্তে একটী অণ্ডাকার জ্যোতিঃ তাহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনা (phenomena) পরীক্ষা করিবার জন্য

Esler, Lenard, Crookes আদি বৈজ্ঞানিকগণ কাচের নল বা কাচস্থালী (bulb) হইতে বায়ু নিষ্কাষিত করিয়া ও তাহার দুই প্রান্তে দুইটী তাড়িত-বাহক ধাতুর তার যৌজিত করিয়া একপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। ক্রুক্স্ তাঁহার গোলকের দুই প্রান্তে প্লাটিনম্ নামক অতি কঠিন তাড়িতবাহক ধাতুর তার সংলগ্ন করিয়া সেই গোলকের ভিতর দিকে তার দুইটির শেষ ভাগে দুইটি প্লাটিনমের পাত যোজিত করিয়া দেন। এই গোলকের তারের সহিত তাড়িতকেন্দ্র দুইটী সংলগ্ন করিয়া যন্ত্র চালিত করিলে প্রচুর পরিমাণে গালাকিরণ পাওয়া যায় এবং এই গোলক হইতে আর এক প্রকার কিরণও নির্গত হইয়া থাকে ; ইহাই রন্জটনের নবাবিষ্কৃত কিরণ। ইহার কোন নাম না থাকায় আমরা ইহাকে নবকিরণ বলিব।

আমরা দেখিলাম যে [তাপ-কিরণ ব্যতীত] দৃষ্টির অগোচর তিন প্রকার কিরণ আছে, যথা—বেগুনে-পর, গালাকিরণ ও নবকিরণ। তন্মধ্যে বেগুনে-পর কিরণ হইতে আর দুটীর প্রভেদ সহজেই উপলব্ধ হয়। গালাকিরণ ও নবকিরণের বিভিন্নতা পরে দৃষ্ট হইবে।

এক্ষণে আমরা অধ্যাপক রন্জটনের পরীক্ষা (experiment)র বিষয় বলিব। রুমকর্ফ এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যদ্দারা ব্যাটারি হইতে উৎপন্ন তাড়িতকে বহুগুণ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। অধ্যাপক রন্জটন এইরূপ একটী যন্ত্র দ্বারা ক্রুক্সের গোলোকের ভিতর তাড়িত প্রবাহিত করেন। গোলাকার একখানি গোলোকের চতুর্দ্দিক একখানি কাল কাগজে ভালরূপে মুড়িয়া দেন। তাহার পর একখানি Barium platino cyanide (এক প্রকার জ্যোতিষ্মান পদার্থ) মাখান একখণ্ড কাগজ লইয়া দেখিলেন যে উহা জ্বালাময়ী শক্তি প্রভাবে জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল (it lights up with brilliant phosphoreseence)। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন যে গোলোকের এবং কাগজের মধ্যে বেগুনে-পর কিরণের অভেদ্য অনেকগুলি বস্তু রাখিলেও কাগজের জ্বালাময়ত্ব থাকে এবং এই শক্তি গোলোক হইতে প্রায় চারিহস্ত দূরে, অনুভূত হইয়া থাকে। অধ্যাপক রন্জটন স্বকীয় পরীক্ষার দ্বারা এবং লেনার্ডের পূর্ব্ব পরীক্ষার ফল হইতে স্থির করিয়াছেন যে নবকিরণ বায়ু ও অন্যান্য বস্তু সকলকে গালা-কিরণ অপেক্ষা সহজে ভেদ করিতে পারে। তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা ইহার পোষকতা করিতেছে। কেননা গালাকিরণের জ্বালাময়ী শক্তি চারিহস্ত দূরে অনুভূত

হইতে পারে না। আরও দেখা যায় যে, গালাকিরণের নিকট চুম্বক আনিলে গালাকিরণের গতি পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু নবকিরণের উপর চুম্বকের কোন প্রভাব (influence) দেখা যায় না। অতএব নবকিরণ গালাকিরণ হইতে পৃথক ইহা জানা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আলোক ও বেশুনে-পর কিরণের গতি ত্রিপার্শ্ব-কাচ দ্বারা বাঁকাইয়া দেওয়া যায়। এক্ষণে দেখা যায় যে এই কারণেই বাহিরের বস্তুর প্রতিকৃতি camera দ্বারা সহজে লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু রঙ্গটন সাহেব নবকিরণের গতি পরিবর্ত্তন করিতে বহু চেষ্টা পাইয়াও কোন বিশেষ ফল পান নাই। আমরা সাধারণতঃ যেরূপ ফটো তুলি নবকিরণ দ্বারা তাহা হইতে পারে না। ইহা যে সকল বস্তু ভেদ করিতে পারে না, কেবল তাহারই প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। রঙ্গটন প্রভৃতি এরূপ অনেক বস্তুর ফটোগ্রাফ লইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে হাতের মাংসের ছবি না উঠিয়া হাড়ের চিত্র উঠিয়াছে দেখা যায়। রঙ্গটন সাহেবের প্রকরণে আমরা এলাহাবাদ মিওর কলেজে অনেকগুলি প্রতিকৃতি লইয়াছিলাম। তন্মধ্যে একটী ছবি নিম্নে প্রদত্ত হইল। রঙ্গটন সাহেব অনুমান করেন যে,

লাক্ষা বা বিয়োগকেন্দ্র হইতে গালাকিরণ নির্গত হইয়া গোলকের অপর দিকে যে স্থানে আঘাত করে সেই স্থানেই নবকিরণের উৎপত্তি। কাচের

গাত্রে উৎপন্ন হইয়া নবকিরণ চতুর্দ্দিকে সরল রেখায় ধাবিত হয়। তিনি বলেন চুম্বকের দ্বারা পালাকিরণের গতি ফিরাইয়া দিলে নবকিরণেরও উৎপত্তি স্থান পরিবর্ত্তিত হয়। আলোক-কিরণ কোন জ্যোতিষ্মান (Luminous) বিন্দু হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে সরল রেখায় ধাবিত হয় বলিয়া আলো হইতে একটু দূরে কোন বস্তু রাখিলে তাহার দৈর্ঘ্য যত বড় হয়, সেই বস্তু তাহার দ্বিগুণ দূরে রাখিলে দৈর্ঘ্য পরিমাণ অর্দ্ধেক হয়। নবকিরণের ছায়ার ঐরূপ কোন গুণ আছে কি না দেখিবার জন্য আমরা একটী লোহার তারের ঝাঁঝরিকে প্রথমে গোলকের নিকটে ও তৎপরে পূর্ব্বাপেক্ষা দূরে রাখিয়া তাহার চিত্র লইয়াছিলাম। তাহাতে গণনা করিয়া দেখিলাম যে গোলকের গায়ের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানকে নবকিরণের উৎপত্তি স্থান ধরিলে নবকিরণের ব্যবহার আলোক-কিরণের মত বোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থানটী লাক্ষাকেন্দ্রের অপর পারে এবং কাচকেন্দ্রের নিম্নভাগে স্থিত। এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান জন্য মিওর কলেজের রাসায়নিক অধ্যাপক হিল্‌সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে একটী কার্ডের উপর সমদূরবর্ত্তী কতকগুলি আল্‌পিন পুঁতিয়া তাহার ছবি লওয়া হয়। ইহা হইতে আমরা উপরিউক্ত ফল প্রাপ্ত হই। আমরা ক্রুক্‌সের গোলককে সমতল ভাবে রাখিয়া তাহার নীচে হাতের একটী ছবি লইয়াছি। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় ইহা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ছবিতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি উৎপত্তি স্থানের ঠিক নিম্নে রাখা হয়, তাহাতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির স্বাভাবিক স্থূলত্ব ছবিতে উঠে। কিন্তু অপরগুলির ছবি ক্রমানুসারে মোটা হয়। সেই-রূপে বাক্সের ছবি তুলিলে বাক্সের দুইটী ধার সরু ও দুইটি মোটা হইতে দেখা গিয়াছে।

এই আশ্চর্য্য নবকিরণের এখনও কেহ স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক রঞ্জটন বৈজ্ঞানিক জগতের এবং বিশেষতঃ অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তারদিগের উপকার করিয়া সকলের নিকটেই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বন্দুকের গুলি লাগিয়া বা অন্য কোন প্রকার আঘাতে শরীরমধ্যস্থ অস্থি ভগ্ন বা চূর্ণ হইলে এখন তাহা অনায়াসেই ধরা যাইবে। সুতরাং অস্ত্র চিকিৎসা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক নিরাপদ ও অল্প ক্লেশদায়ক হইবে।

শ্রীবেণীমাধব মুখোপাধ্যায়।

গীতোক্ত অবতার-তত্ত্ব।

(উত্তর)

গত ফেব্রুয়ারী মাসের দাসীতে বাবু বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত "গীতোক্ত অবতার তত্ত্ব" সম্বন্ধে দুই একটী কথা কহিয়াছেন। কথাগুলি মনোযোগের সহিত শুনিয়াছি এবং যথাসম্ভব ভাবিয়াও দেখিয়াছি। কিন্তু কৈ, তাহাতে আমার মত পরিবর্ত্তন করিবার কোনও কারণ দেখিলাম না। তিনি যে দু একটী কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা বিচারে টিকিবে না।

তাঁহার প্রথম কথা—"প্রতুল বাবু কৃষ্ণ অপেক্ষা চৈতন্তকে বড় বলিতে চান কিনা জানি না ; কিন্তু লেখার আভাসে মনে হয় যেন তাহাই বলা তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহা হউক এই বিষয়টা তত মারাত্মক নহে ; কারণ যদি কেহ আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলে যে বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় লোকটা ভাল নহে, কিন্তু বালিজুড়ি নিবাসী ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র লোক বেশ ভাল, তবে আমার বুঝা উচিত যে, আমি লোক মন্দ নহি, তবে আমার যাহা কিছু দোষ আছে তাহা আমার নামের দোষ। সেইরূপ কৃষ্ণ ও চৈতন্তকে ভগবানের অবতার স্বীকার করিয়া কৃষ্ণ অপেক্ষা চৈতন্ত বড় বলিলে ইহাই বুঝা উচিত যে কৃষ্ণ ছোট নয়, তবে তাঁহার নাম ছোট, কারণ আমি কথনও আমা অপেক্ষা বড় বা ছোট হইতে পারি না।" বলরাম বাবু ভাবিয়াছেন যে বালিজুড়ি নিবাসী ৺ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র বলিলে যেমন তাঁহাকেই বুঝাইবে ইহা ধ্রুব সত্য, তেমনি কৃষ্ণ ও চৈতন্ত উভয়কে ভগবানের অবতার বলিলে কৃষ্ণ ও চৈতন্তের সমতা স্বীকার অপরিহার্য্য। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে জ্যামিতির প্রথম স্বীকার্য্য লক্ষিত বা অলক্ষিত ভাবে কার্য্যকর হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে অবতার এই সাধারণ কথাটী কৃষ্ণ ও চৈতন্ত উভয়েতে প্রযুক্ত হইয়াই যে এই প্রমাদ ঘটাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার প্রবন্ধটা একটু তলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাইতেন আমি এই ভ্রমের পথ রাখি নাই। "বিশ্বের সর্ব্বত্রই কি তিনি সমান ভাবে প্রকাশিত ?" এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া তাহার উত্তরে বলিয়াছি :—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
(১৮ শ্লোক, ৫ম অধ্যায়)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে ও কুকুরে জ্ঞানী-গণ সমদর্শী।"

"পণ্ডিতেরা গরু, হাতী, কুকুর, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণে সমদর্শী সত্য কিন্তু এই সমদৃষ্টি সকলই ভগবৎ প্রকাশ বলিয়া। গরু, হাতী, কুকুর বা চণ্ডালে নাই, ভগবান শুধু ব্রাহ্মণে আছেন, ইহা ভেদবুদ্ধি। এই ভেদবুদ্ধির অভাবই সমদৃষ্টির কারণ, প্রকাশের সমতা সমদৃষ্টির কারণ নহে।" আমি যে ভ্রম নিবারণ করিতে এত কথা বলিলাম, বলরাম বাবু ঠিক সেই ভ্রমই করিয়াছেন। ভগবান বলিয়াছেন তিনি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদের মধ্যে ব্যাস, কবিদের মধ্যে উষণা কবি। শুধু তাহাই নয়, তিনি বৃক্ষরাজির মধ্যে অশ্বথ, ঘোড়ার মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, হাতীর মধ্যে ঐরাবত। বাসুদেব, ধনঞ্জয়, ব্যাস, উষণা কবি, অশ্বথ, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত সকলই তাঁহার অবতার। এই সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভেদ নাই কি? বাসুদেব ও ব্যাসে, উষণা কবিতে ও অশ্বথে, ধনঞ্জয়ে ও উচ্চৈঃশ্রবায়, ব্যাসে ও ঐরাবতে কোন ইতরবিশেষ আছে কিনা? যদি বলেন আছে, তবে কৃষ্ণ ও চৈতন্যে থাকিতে দোষ কি? কৃষ্ণ ও চৈতন্যকে যদি পূর্ণাবতার বলিয়া পরে এক হইতে অন্যকে বড় করিতে যাইতাম তবে আমার কথা অযৌক্তিক হইত সন্দেহ নাই। তাহাত আমি কোথাও বলি নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত বা সংস্কারগত পূর্ণাবতার কৃষ্ণ ও চৈতন্য বিভিন্ননামধারী এক ব্যক্তি হইতে পারেন। পূর্ণাবতার নয় বলিয়া তাঁহারা আমার নিকট বিভিন্ন ব্যক্তি। সুতরাং শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও ৺ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের অভিন্নতা স্থিরনিশ্চয় হইলেও বিভিন্ন দেশকালে প্রকাশিত কৃষ্ণ ও চৈতন্যের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে না।

"প্রতুল বাবু কয়েকটী কথায় সাধারণ অর্থ লইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিনাশ শব্দের সাধারণ অর্থ লয় প্রাপ্ত হওয়া, মারিয়া ফেলা। অর্জ্জুন যখন ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে এই অর্থে মারিয়া ফেলিতে অস্বীকার হইয়া যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন ভগবান যে সকল কথা

অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, তাহা কি প্রতুল বাবু পাঠ করেন নাই ?" অনেক বার করিয়াছি। বলরাম বাবু তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের একে "দেহান্তর-প্রাপ্তি" অপরে "ইনি হত্যা করেন না ও হত হন না" দেখিতে পাইয়া ঠাওরাইয়াছেন, তবে বুঝি বিনাশের অর্থ "লয়প্রাপ্ত হওয়া" নয়, "দেহান্তর-প্রাপ্তি," কারণ ইনি হত হন না; বিনাশের অর্থ মারিয়া ফেলা নয় "দেহান্তর-প্রাপ্তি করান," কারণ ইনি হত্যা করেন না। যদি বিনষ্ট হওয়া ও বিনাশ করা ব্যাপারটাই সম্ভব না হইল, তবে ত দুষ্টের "বিনাশ" নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সিদ্ধান্তে আসিয়াই ভাবিয়াছেন "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ও "নায়ং হন্তি ন হন্যতে" এ দুয়ের বিরোধ ঘুচিল। কিন্তু এ বিরোধটা এত গভীর যে বিনাশে দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থ করিলেই যে ইহা মিটিবে তাহা নয়। আত্মার নিষ্ক্রিয়তা ও মায়া প্রভাব এই দুইয়ের ভেদা-ভেদ বুঝা আবশ্যক। বিষয়টা বড়ই দুরূহ, তাই এখানে ইহার অবতারণা করিব না। তবে বলিয়া রাখি দেহান্তর প্রাপ্তির আকষী সেখানে পৌছায় না। আরও বলি দেহান্তর প্রাপ্তি কি বিনাশের একটা অসাধারণ অর্থ ? এক ছাড়িয়া ত অপর গ্রহণ করিতে হয় ? দেহান্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বে একদেহ ত্যাগ হইয়াছে বলিতে হইবে; এই দেহত্যাগই বিনাশ। এই দেহত্যাগকে লক্ষ্য করিয়াই গীতায় বিনাশ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ বলরাম বাবু বলেন গীতায় দেহনাশকে বিনাশ বলে না। বলরাম বাবু আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তির অন্তরালে দেহত্যাগ বা দেহনাশ রাখিয়া যদি বলিতে চান, ঐ দেখ বিনাশ নাই, আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তি, শুধু আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তি, তবে তাহা ভোজের বাজি। বালক বই আর কেহ তাহাতে ভুলিবে না।

বলরাম বাবুর তৃতীয় কথা "প্রতুল বাবু হয়ত বলিবেন যে, এই দেহের নাশের আবশ্যক কি ? চৈতন্য মহাপ্রভু অনেক দুষ্টের উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ত কখনও তাহাদের নাশ করেন নাই! গীতায় কৃষ্ণ ধর্ম্মের এই মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, সেই জন্য দুষ্টের বিনাশ দ্বারা তাহাদের উদ্ধারের উপদেশ দেন।"

"গীতার কৃষ্ণ চৈতন্যের ধর্ম্মের মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া-ছিলেন কিনা, সে বিষয় লইয়া আমার বাগবিতণ্ডা করিবার ইচ্ছা নাই; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তিনি ধর্ম্মের এই মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম

করিতে সক্ষম হইলেও যেরূপ অবস্থায় অর্জ্জুনকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, সেরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের উক্ত মহান্ ভাব ব্যক্ত করিলে তিনি কেবল হাস্যাস্পদ হইতেন। দেশ, কাল ও পাত্র এই তিনটীর বিবেচনা করিয়া সকল সময়ে উপদেশ দিতে হয়।" ঠিক কথা কিন্তু আমি কি আমার প্রবন্ধে বলিয়াছি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া কৃষ্ণ অন্যায় করিয়াছেন? তবে এ দেশ কাল পাত্র ভেদের কথা উত্থাপিত করিবার সার্থকতা কি? ভগবৎ বুদ্ধিতে স্বীয় অবতারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কৃষ্ণ ধর্ম্মাবতার পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, প্রেমাবতারে পঁহুছান নাই। প্রেমাবতারতত্ত্ব গীতায় উক্ত হয় নাই। গীতায় কৃষ্ণ কোথাও কি বলিয়াছেন, "আমি পীড়িতের জন্য আসিয়াছি, সুস্থের জন্য আসি নাই"? কৈ একথা ত গীতায় কৃষ্ণের মুখে শুনি নাই? যদি আবার দেশ কাল পাত্র ভেদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, একথা তাঁহার মুখে সাজে না, কারণ তিনি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনের জন্য আসিয়াছিলেন। বেশ কথা, যাহা তিনি করিয়াছেন তাহার জন্যে তিনি প্রশংসার্হ। কিন্তু তিনি যাহা করিয়া যান নাই, পরে অপরেরা তাহা করিয়াছে বলিতে দোষ কি? তাহা হইতে দুষ্টের দমন হইয়াছে, কিন্তু নিতাই চৈতন্য হইতে দুষ্টের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দমন অপেক্ষা হৃদয় পরিবর্ত্তন যদি উচ্চতর হয়, তবে গীতোক্ত অবতারতত্ত্ব অপেক্ষা নিতাই চৈতন্যে প্রকাশিত অবতারতত্ত্ব উচ্চতর বলিতে আপত্তি কি? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিবেন "আলিঙ্গন ধর্ম্ম বিনাশ ধর্ম্ম হইতে উচ্চ হইলেও সকল সময়ে ও সকল স্থানে উচ্চ নহে বা উচ্চ হইতে পারে না।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে আলিঙ্গন ধর্ম্ম সর্ব্বত্র ফলপ্রদ নয়। তাই তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের ডাকাতের গলা ধরিয়া কান্নার দৃষ্টান্ত আনিয়াছেন। আমিও একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলি। ক্ষত রোগে একজনের অঙ্গুলি পচিয়া যাইতেছে, আশঙ্কা সমস্ত শরীর পচিয়া যাইবে। দুজন চিকিৎসক আহূত হইলেন। একজন বলিলেন ক্ষতাক্রান্ত অঙ্গুলি ছেদন বই গত্যন্তর নাই। অপরে কহিলেন, ছেদনে ত সারিবেই, ঔষধ ব্যবহারেও সারিয়া যাইতে পারে। তিনি এমন অনেক আরোগ্য করিয়াছেন। শেষোক্ত চিকিৎসক যদি নির্দ্দিষ্ট স্থলে অকৃতকার্য্যও হন; তবু বলিতে হইবে তাঁহার প্রণালীই শ্রেষ্ঠতর; কারণ ইহা এখানে না হউক অপর দশ স্থলে অটুট রাখিয়াই আঙ্গুল সারাইয়াছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি যেখানে আরোগ্য করিয়াছেন সেখানে আঙ্গুল কাটিয়া।

তাই বলি আলিঙ্গন ধর্ম্ম সর্ব্বত্র ফলপ্রদ না হইলেও বিনাশের ধর্ম্ম অপেক্ষা ইহা উচ্চতর। গীতার অবতার হৃদয় পরিবর্ত্তনের সঙ্কেত অবগত ছিলেন এমন কোন নিদর্শন পাই না। সুতরাং বলিতে বাধ্য, গীতার অবতারতত্ত্ব অতি মনোহর ও বিশদ হইলেও অসম্পূর্ণ।

প্রফুল্লচন্দ্র সোম।

মুসলমান বৈষ্ণব কবি।

"মুসলমান বৈষ্ণব" কথাটি নূতন এবং এইরূপ সংমিশ্রন,—যবনের বৈষ্ণবত্ব আশ্চর্য্যজনকও বটে। এক সময় ইহা অসম্ভাবিত ছিল, কিন্তু নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের কৃপায় ইহা আর নূতন, আশ্চর্য্যজনক বা অসম্ভাবিত বিষয় নহে।

চারিশতবর্ষ পূর্ব্বে এই হতভাগ্য বঙ্গভূমে যে প্রবল বন্যা বহিয়াছিল, যে তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে পাপী তাপী, অধম নীচ, চণ্ডাল যবন; সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল;—ভেদ বিচার করে নাই।

হিন্দুদের শাস্ত্রে ছিল বটে যে, ভক্তিমান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই কুলীন, তিনিই ব্রাহ্মণ; কিন্তু এই আদেশ সমাজের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্ত বন্যার প্রখর তেজে জরাজীর্ণ সমাজগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, শাস্ত্রের এই উদার আদেশ তখন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

হরিদাসের কথা পাঠক অবগত আছেন। এই হরিদাস "যবন" হইলেও ব্রাহ্মণ ভক্তগণ তাঁহার পাদোদক পান করিতেন, চৈতন্যচরিতামৃতে একথা লেখা আছে।

এই অদ্ভুত বন্যার মহিমায় মৃত তরু মঞ্জুরিত—ফল ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল, বোবা সঙ্গীত ধরিয়াছিল, পঙ্গু সুরঙ্গে নৃত্য করিয়াছিল।

এ সব কথা কি অতিবর্ণনা? সুসাত্ত্বিক ভারতীয় ব্রাহ্মণেরও সাধন সাপেক্ষ যে কৃষ্ণপ্রেম, সেই পবিত্র প্রেমে যদি যবনকে নৃত্য করিতে দেখি, গান গাইতে শুনি, তবে পঙ্গুর নৃত্য হইতে তাহা কম আশ্চর্য্যজনক নহে।

---

* মূল্য ৷৴৹ আনা মাত্র। কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে গুরুদাস বাবুর নিকট প্রাপ্তব্য।

এতাদৃশ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারও এই বঙ্গভূমে ঘটিয়াছিল ; "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" পাঠে আমরা তাহা বুঝিতে পারি।

কাব্যরসিক শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় বঙ্গসাহিত্য সমাজকে তিনখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ উপহার দিলেন। তিনি বিশুদ্ধভাবে সটীক "চণ্ডীদাস" ও "জ্ঞানদাস" সুচারুরূপে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" তাঁহারই আর এক কীর্ত্তি। মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের রসময়ী কবিতাগুলি একত্রে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। পদকর্ত্তাগণের নাম,—আকবর সাহা, নশীর মামুদ, সৈয়দ মর্ত্তুজা, ফকির হবিব, সেখ ভিখন, সেখ লাল, সালবেগ, প্রভৃতি। পদকর্ত্তাদের পরিচয় ভূমিকাতে দেওয়া হইলে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত সন্দেহ নাই। আশা আছে দ্বিতীয় সংস্করণে রমণী বাবু এ অভাব দূর করিবেন।

মুসলমান পদকর্ত্তাগণের সোচ্ছ্বাস ভাবময়ী পদগুলি সুকবি-সুলভ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিরহিত নহে। বৈষ্ণব কবি কুলের কোমলতা—প্রেম প্রফুল্লতা প্রতি ছত্রে সুচিত্রিত রহিয়াছে।

কোন কবি স্বীয় "পরাণের ধন" আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,— • • •

"মোরে কর দয়া, দেহ পদ ছায়া,
শুনহ পরাণ কানু।
কুলশীল সব, ভাসাইনু জলে,
প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে, কানুর চরণে,
নিবেদন শুন হরি!
সকল ছাড়িয়া, রহিনু তুয়া পায়ে,
জীবন মরণ ভরি॥"

কি স্বাভাবিক সুস্ফুট ভাব!! মর্ত্তুজা সাহেব! "কুলশীল সব" যথার্থই তুমি কানুর জন্য "জলে ভাসাইয়াছ।" এ কথা বলিবার যথার্থ অধিকারীই তুমি।

সে যা'ক, আমাদের অদ্যকার বিশেষ আলোচ্য, আকবর সাহার ভণিতা যুক্ত গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদটি। এই পদটি স্বনাম খ্যাত মোগল সম্রাট বিরচিত কিনা, সম্পাদক স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন নাই। তবে "বিজ্ঞাপনে"

"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা" হইতে একটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"এক সময়, জাগ্রত বা স্বপ্নেই হউক, শ্রীমহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনলীলা চাক্ষুষে দর্শন করিয়া আকবর সাহ এই পদরত্ন রচনা করিয়াছিলেন।" এই কথাটিতে পাঠক সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন কিনা জানি না; কিন্তু ইহা যথার্থ যে, আরও কিছু প্রমাণের জন্ত পাঠকের মন ব্যাকুলিত হইয়া উঠে।

যে মোগল কুলমণি "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন, তিনি দীনা ক্ষীণা ও নবীনা বঙ্গভাষার গলে এই মূল্যবান হার কি যথার্থই পরাইয়া দিয়াছিলেন? এ প্রশ্ন আমাদেরও মনে উত্থিত হইয়াছিল। আকবর বিরচিত পদটি এই:—

"জিউ জিউ মোর মনচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত মাতোয়ালিয়া॥
ঐ ছন পহুঁকে যাহু বলিহারি।
সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী॥"

যথার্থ বটে, আকবর সাহা অতি উদার হৃদয় ছিলেন, কোন ধর্ম্ম বিশেষের উপর তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। এই কারণে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে নানাজনে নানা কথা বলিয়াছেন; কোন ঐতিহাসিক অর্দ্ধখৃষ্টিয়ান বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই কারণে গোঁড়া মুসলমানগণের কাছে তিনি "বিধর্ম্মী" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই গুণগ্রাহী সম্রাট, তাঁহার সমসাময়িক মহামহিমাময় সদ্ধর্ম্মের প্রচারক-প্রবরের গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন, আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তিনি যে ঐ পদের রচয়িতা তাহার প্রমাণ কৈ? ভণিতায় যে "সাহ আকবর" নাম আছে, উনি ভিন্ন ব্যক্তি, না সেই স্বনামখ্যাত সম্রাট? এ প্রশ্ন সহজেই মনে হইতে পারে।

এই প্রশ্নের মীমাংসা ইতিহাস করেন নাই। ইতিহাসে এ সম্বন্ধে কোন কথা না থাকিলেও একবারে প্রমাণাভাব নহে। আমরা একখানি চিত্রের কথা বলিতেছি।

এই চিত্রখানি চারিশত বর্ষের প্রাচীন। এখন স্থিতাপ্ত জীর্ণ হইয়া

গিয়াছে, আর অধিককাল কালের সহিত বিবাদ করিয়া থাকিতে পারিবে না। চিত্রখানি যিনি ইচ্ছা দেখিতে পারেন। বৃন্দাবনে—রাধাকুণ্ডে, শ্রীজাহ্নবাজির কুঞ্জে তাহা অদ্যাপি আছে।

বিদিত আছে যে, শ্রীমহাপ্রভুর গুণগ্রাম শ্রবণে গুণগ্রাহী আকবর সাহা একদা তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষ করেন। মহাপ্রভু তখন নীলাচলে। নীলাচলে তখন প্রতাপরুদ্র গজপতি স্বাধীন নৃপতি। মহাপ্রভুকে দিল্লী পাঠাইয়া দিতে, সম্রাট প্রতাপরুদ্রকে অনুরোধ করেন। সম্রাটের আদেশ-লিপি পাইয়া গজপতি ভীত হইলেন। তিনি জানেন, শ্রীমহাপ্রভু রাজদর্শন করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। (স্বয়ং প্রতাপরুদ্র কত কষ্টে মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হন, চরিতামৃতের পাঠক তাহা জানেন)। সম্রাটের প্রস্তাব মহাপ্রভুকে বলিতেও তিনি সাহস করিলেন না; তবে সার্ব্বভৌমাদির পরামর্শ মতে প্রতাপরুদ্র শ্রীমহাপ্রভুর একখানি চিত্রপট, সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই চিত্র খানির কথাই আমি বলিতেছি, বৃন্দাবনে জাহ্নবাজির কুঞ্জে তাহাই বিরাজিত।

প্রতাপরুদ্র প্রেরিত এই চিত্রখানি পাইয়া সম্রাট বিমুগ্ধ হন, এবং পরম যত্নে তাহা স্বীয় প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে রক্ষা করেন। কালে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিল, কিন্তু চিত্রখানি প্রাসাদেই রহিল। অবশেষে ভরতপুরের রাজা বলদেব সিংহ দিল্লী লুণ্ঠন কালে চিত্রখানি প্রাপ্ত হন; অন্যান্য রত্নের সহিত এখানিও তিনি আনয়ন করেন, ও বৃন্দাবনের ভজনানন্দ সিদ্ধ কৃষ্ণ-দাস বাবাজিকে দান করেন। চিত্রখানি বাবাজির হৃদয়ের ধন ছিল, এখানি দেখিলেও তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের উৎস খুলিত। এইরূপে চিত্রখানি বৃন্দাবনে আইসে।

যদি কোন পাঠক বৃন্দাবনে যান, সে পুরাতন চিত্রখানি দেখিবেন। দেখিতে পাইবেন, তাহা একখানি সংকীর্ত্তনের আলেখ্য। স্থান, সমুদ্রতীর, বৃক্ষাদি কিছুই নাই, কেবল সাদা সাদা বালুকা। সেই বালুকা-প্রান্তরে ছয়জনে মিলিয়া কীর্ত্তন গাইতেছেন। মধ্যস্থলে যিনি,—সুদীর্ঘ সুন্দর অথচ জীর্ণশীর্ণ, তিনিই শ্রীমহাপ্রভু। মহাপ্রভু নৃত্যকারী, তিনজন ভক্ত করতাল ও দুইজন মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। সকলেই মণ্ডলী বন্ধনে কীর্ত্তন করিতেছেন। চিত্রে এ কি দেখা যাইতেছে? তাঁহাদের পা কি বালুতে বসিয়া যাইতেছে? হাঁ, তাহাই বটে; তাহারই চিহ্ন দেখা যাইতেছে

মহাপ্রভুর পরিধান কৌপীন—বহির্ব্বাস, মস্তক মুণ্ডিত। তাঁহার প্রতিভা প্রদীপ্ত দেহ হইতে যেন একটি অমানুষিক তেজ নির্গত হইতেছে।

এই সুচিত্রিত প্রকৃত চিত্রখানি দেখিয়া পাঠক,সাহ আকবরের ভণিতাযুক্ত পদটি স্মরণ করুণ, উভয় চিত্র,—কবিতা ও আলেখ্য, কি এক—অভেদ বলিয়া বোধ হয় না। ছবিতে দেখিতে পাইবেন, সেই "মনচোরা গোরা, আপহি নাচত আপন রসে ভোরা," চিত্রিত। দেখিতে পাইবেন "খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া, আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া," এ চিত্রও অঙ্কিত রহিয়াছে। তবে কি কবিতাটি যথার্থ আকবর বিরচিত, চিত্র দর্শনে বিমুগ্ধ সম্রাট চিত্তে যথার্থই কি, কবিতার পবিত্র উৎস উচ্ছ্বাসিত হইয়াছিল? সুধীগণ এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিবেন।

বাঙ্গালী কবিগণ ব্রজ-নায়ক শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনে যেমন ব্রজ ভাষাকে ভুলেন নাই, বঙ্গ-নায়ক শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণনে তদ্রূপই বস্তুতঃ বঙ্গভাষায় পদটি বিরচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে যদি কেহ বলেন যে, আকবরের আদেশে,বঙ্গভাষাভিজ্ঞ কোন কবি কর্ত্তৃক এই পদ বিরচিত হইয়াছে, তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে,কবিতাটি সম্রাটের মনভাবোদ্গত; সুতরাং ইহা সম্রাট বিরচিত বলিতে আপত্তি কি? সে যা'ক, ভরসা করি, রমণী বাবু এ সকল কথার আলোচনা করিয়া পাঠকের কৌতুহল তৃপ্তি করিবেন।

শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

নানা অভাব ও গোলমালের মধ্য দিয়া দাসাশ্রম ভগবানের কৃপাবলে আর এক মাস কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। যতই দিন যাইতেছে ততই দাসাশ্রমের গুরুত্ব বাড়িতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের লোকবল বাড়িত তাহা হইলে আমরা এই কার্য্যে আরও উৎসাহিত হইতাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এখনও আমরা এই সুবৃহৎ কার্য্যের উপযুক্ত লোক পাইতেছি না। আমাদের আশ্রমে কতকগুলি রোগী ও আতুরের বিছানা খালি হইয়াছে। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে আমাদের দেশে অনাথ আতুর নাই। কখনই নহে। আমরা জানি প্রত্যেক গ্রামেই দুই একজন করিয়া অনাথ আতুর কত কষ্টে জীবনাতিপাত করিতেছে। অনাথ আতুর নাই ইহা সত্য নহে, পরন্তু উহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া উদ্যোগ করিয়া দাসাশ্রমে পাঠাইয়া দিবার লোক নাই ইহাই সত্য। আমাদের প্রার্থনা আমাদের প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা একটি পরিবার [illegible]

দেখিবেন তাঁহাদের গ্রামে অথবা সহরে কোন্ অনাথ আতুর কষ্ট পাইতেছে। চিন্তা মাত্রেই তাহার নিকট গিয়া দাসাশ্রমের কথা বুঝাইয়া দিবেন। এই সকল অজ্ঞলোক ভয়ে সারা হয়। তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া আমাদিগকে তাহাদের অবস্থা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমরা পত্র পাঠ তাহাদিগকে আনাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিব। অবশ্য প্রত্যেকেই দাসাশ্রমের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে লিখিবেন।

বর্ত্তমান মাসের রোগী সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। রসিকচাঁদ, ৩। ছৈয়লুল্লা, ৪। গোপালচন্দ্র নন্দী, ৫। দেবীয়া, ৬। স্বর্ণ, ৭। কুলমণি, ৮। দুর্গামণি, ৯। নবদুর্গা, ১০। হীরামণি, ১১। রাজেশ্বরী ১২। যুগুমনি, ১৩। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ১৪। মুক্ত, ১৫। অটল, ১৬। ঈশ্বরী, ১৭। শ্যাম দাস, ১৮। রামবরণ, ১৯। রঘু মিত্র।

রসিক চাঁদ। আমাদের পুরাতন রসিকচাঁদ এ সংসারে আর নাই। গত ৩০ বৎসর কাল ক্রমাগত কষ্ট যন্ত্রনা ভোগ করিয়া এত দিনে সকল কষ্ট যন্ত্রনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল। যিনিই দাসাশ্রম দেখিতে আসিতেন তিনিই অবাক হইয়া ইহার যন্ত্রনা প্রত্যক্ষ করিতেন। পাশ ফিরাইয়া না দিলে পাশ ফিরিতে পারিত না। ইদানিং ইহার পক্ষে সকল কার্য্যই যেন কষ্ট সাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন হইতে রসিক দিন দিন আরও শুখাইয়া যাইতে লাগিল। মৃত্যুর ৪।৫ দিন পূর্ব্ব হইতে একেবারে আহার ত্যাগ করিল। ভাতের জল নেবুর রস দিয়া খাইয়া বড়ই তৃপ্তি অনুভব করিত। আমাদের অন্ধ বালক বাবুরাম রসিকের বড়ই সেবা করিত। তাই রসিক বাবুরামকে মামা বলিয়া ডাকিত। কি জানি কি কারণে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে বাবুরাম রসিকের নিকট বড় যাইতে চাহিত না। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রসিক বলিল "বাবুরাম মামা আমার কাছে আসে না কেন? আমি তাহাকে একবার দেখিব।" হায়রে ভালবাসা, জগতে তোরই জয় সর্ব্বত্র। বাবুরাম সেই হইতে রসিকের পার্শ্ব আশ্রয় করিল। মৃত্যুর দিবস প্রাতে বাবুরাম আসিয়া বলিল "রসিক পেঁপে খেতে চাচ্ছে।" পেঁপে আনা হইল, কিন্তু খাইতে পারিল না। গলাধঃ হইল না। ৩১শে মার্চ্চ বৈকালে আস্তে আস্তে অতি ধীর ও শান্তভাবে রসিক ইহলোক ছাড়িয়া পরম শান্তিময়ীর ক্রোড় আশ্রয় করিল। ভগবান তাহার আত্মার কল্যান সাধন করুন।

ছৈলুল্লা। এই হতভাগ্য পক্ষাঘাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া মেডিকেল কলেজে ছিল, আরোগ্য লাভ করিতে না পারাতে বিদায় প্রাপ্ত হয় এবং দাসাশ্রমে গিরিধীতে প্রেরিত হয়। এদিকে তাহার সহোদর ভ্রাতা তাহাকে কলিকাতায় আসিয়া খুঁজিয়া না পাওয়ায় পুনরায় খুঁজিতে খুঁজিতে বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে যায়। তাহার পরে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ছৈলুল্লা ইদানিং একটু একটু দেখিতে পাইত। যখন তাহার ভাই আসিল তখন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ভ্রাতায় ভ্রাতায় এই সম্মিলন অতি অপূর্ব্ব। ছৈলুল্লার প্রকৃতি, তাহার হাস্য আমাদিগকে বড়ই আনন্দ দিত।

কিন্তু তাহার এই ভ্রাতার সহিত হতাশ জীবনের আশ্চর্য্য সম্মিলন আমাদিগকে আরও আনন্দিত করিয়াছে। তাহার ভ্রাতা তাহাকে পরমাদরে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছে।

রাজেশ্বরী] আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছে। কিন্তু তাহার যে প্রকার লোভ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ভয় হয় পাছে অত্যাচার করিয়া আবার রোগাক্রান্তা হয়।

ঘুণুমণি। বেশ আরোগ্য হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু কি জানি কেন হটাৎ একদিন সন্ধ্যা হইতে ঘুণুমণির অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িল। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। ঘন ঘন মুচ্ছি‍ত হইতে লাগিল। সে কি যন্ত্রনা, সে কি ছট্‌ফটানি। কোন গতিকে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহাকে রাখা গেল। ক্রমে ইহার অবস্থা শোচনীয় হইতেছে দেখিয়া ইহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। নিবাস গুড়বৈঠকখানা। খ্রীষ্টিয়ান বাবু গোপাল চন্দ্র লাহার সাহায্যে এখানে আসেন। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে জলে ডুবিয়া যান ও কতকগুলি রাস্তার লোক তাঁহাকে উঠান। সেই অবধি যেন কেমন অজ্ঞানভাব হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে না খাইয়া এমনই দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় যে একেবারে শয্যাগত হয়। সেই অবস্থায় এখানে আনীত হইয়াছে। এখন বেশ আরাম হইয়াছে। দিন দিন বল প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু ভ্রমের ভাব কিছুতেই চাইতেছে না। সমস্ত বাটিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অথচ বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ করে। তাহার বিশ্বাস যে সে একজন মহাপুরুষ। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল "মহাপুরুষেরা কি বিছানা নষ্ট করে ?" সে বলিল "তা যদি না হবে তাহা হইলে আমি করি কেন ?" এ উত্তম যুক্তি বটে। যাহা হউক এখন ইহার ভ্রমগুলি গেলেই আমরা বাঁচি।

মুক্ত। বাপের নাম রামধন গোয়ালা। বাটি নদিয়া, শান্তিপুর। বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। চক্ষু কর্ণের শক্তি প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চলিবার শক্তি একেবারে নাই উদরাময় রোগে একেবারে শয্যাগত। পূর্ব্বে ভিক্ষা করিয়া কোনও গতিকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; কিন্তু প্রায় দুই মাস কাল একেবারে চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়ে। হামা দিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িয়া থাকিত আর যে যাহা দিত তাহা দিয়া কোনও গতিকে জীবন ধারণ করিত। দাসাশ্রমের একজন সহায় ইহার দুরবস্থা দেখিয়া ইহাকে আশ্রমে আনয়ন করেন। যখন আসিল তখন কর্ম্মচারীগণ ব্যাস্ত হইয়া ইহার পা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে গেলে বৃদ্ধা কিছুতেই পা ছুঁইতে দিবে না। সে কাতর হইয়া বলিল "না—না, না জানি পূর্ব্বজন্মের কত পাপের ভোগে এ জন্মে এত কষ্ট পাইলাম। আবার তোমরা পায়ে হাত দিয়া আমার পাপের বোঝা বাড়াও আর আমি আর জন্মে এর চাইতে আরও কষ্ট পাই।" বৃদ্ধার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে, না জানি কোন দিন হতভাগিনী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

অটল। নিবাস পুরুলিয়া, বয়স প্রায় ৪০ বৎসর, জাতিতে চণ্ডাল। বুকে ঘা হইয়া মেডিকেল কলেজে যায়। সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইতেই বিদায় প্রাপ্ত হয়। কোথাও

দাঁড়াইবার স্থান থাকাতে দাসাশ্রমে আসে। তাহাকে পুনরায় অন্ত হাঁসপাতালে দেওয়া হইয়াছে।

ঈশ্বরী। নিবাস কলিকাতা। বয়স ৭২ বৎসর। জাতি সুবর্ণবণিক। স্বামীর নাম পরমানন্দ দত্ত। তিনি জীবিত কিন্তু অথর্ব্ব অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ভিক্ষাবৃত্তি জীবিকা। স্ত্রী উদরী রোগে শয্যাগত হওয়াতে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় এখানে আনয়ন করেন। ঈশ্বরী দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতেছে। জল প্রায় শুখাইয়া গিয়াছে।

শ্যাম দাস। নিবাস কটক। বয়স ৪৪।৪৫ একজনের গৃহে চাকর ছিল। জ্বর ও বাত শ্লেষা রোগে শয্যাগত অবস্থায় একজন আমাদের সহায় কর্তৃক এখানে আনীত হয়। পরদিন সকালে পায়খানা গেল। কিন্তু তৎপর মুহূর্ত্তে দেখা গেল শ্যাম দাস মৃত্যুমুখে পতিত। এমন আশ্চর্য্য মৃত্যু আমরা কখনও দেখি নাই। হতভাগ্য নিজেও বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্তও ভাবে নাই তাহার মৃত্যু এমন হটাৎ হইবে। আমাদের দুঃখ এই যে, আমরা তাহার যথেষ্ট চিকিৎসা ও সেবার অবকাশ পাই নাই।

রামবরণ। বয়স প্রায় ৫০ নিবাস গোরখপুর জেলা, জাতি কনৌজিয়া, ব্যবসা খোপার। রাস্তারধারে পড়িয়াছিল। একজন খ্যাতনামা ডাক্তার দয়া পরবশ হইয়া গাড়িতে করিয়া দাসাশ্রমে দিয়া যান। রোগ পুরাতন জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ। মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিতে অনেক চেষ্ঠা করে কিন্তু পারে নাই। ইহার অবস্থা একটু একটু ভাল হইতেছে।

রঘুমিশ্র। বাড়ী গয়া জেলা। অন্ধ, বয়স ২০।২১ সে বলে একজন দুষ্ট লোক তাহার ৫৲ ঠকাইয়া লইয়া রাস্তায় ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে। মিশ্র মহাশয় বোধ হয় তাহার শোধ তুলিবার জন্তই একদিন থাকিয়া তাহার পরদিন সন্ধ্যার পর থালা গেলাস কম্বলাদি পোঁটলা বাঁধিয়া কোথায় চম্পট দিয়াছেন, আর ধরিতে পারা গেল না। ইহাকে বাবু রাজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আশ্রমে আনয়ন করেন।

দানপ্রাপ্তি।

মাসিক চাঁদা।

১৮ নং আমহার্ষ্টষ্ট্রিটের ছাত্রগণ ফেব্রুয়ারী মাস ।০, যদুনাথ সেন মার্চ্চ ১৲, তেজচন্দ্র শীধু ফেব্রুয়ারী ।০, কালী শঙ্কর শুকুল জানুয়ারী ১৲, নন্দকুমার দত্ত ফেব্রুয়ারী ১৲, ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ফেব্রুয়ারী ।০, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ফেব্রুয়ারী ১৲, Lady C/o Babu Srinath Das ফেব্রুয়ারী ১৲, কেদারনাথ দাস জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ।০, অনাথনাথ দেব জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ২৲ N. D. BoseEsqr জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ ৩৲, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ফেব্রুয়ারী ।০, বিপিন বিহারী রায় চৌধুরী মার্চ্চ ১৲; ৪০।১ কলুটোলা ষ্ট্রিটের ছাত্রগণ ফেব্রুয়ারী ৪০, অনারেবল মোহিনী মোহন রায় মাঘ হইতে চৈত্র ৩৲ মহেন্দ্র লাল দাস জানুয়ারী ১৲ রামচন্দ্র মিত্র মার্চ্চ ১৲ শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মার্চ্চ ।০ A. B. Chatterjee মার্চ্চ হইতে মে ১৲ বঙ্কুবিহারী মিত্র ফেব্রুয়ারী ।০ রায় পশুপতি নাথ বসু বাহাদুর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ২৲ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফেব্রুয়ারী ১৲ প্যারী মোহন ভড় ফেব্রুয়ারী মাসের ।০ কালী

শঙ্কর মুকুন্দ ফেব্রুয়ারী ১৲ প্রমথনাথ দাস ফেব্রুয়ারী ২৲ নবাব সৈয়দ আব্দুল সোভান চৌধুরী জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ২৲ নবীনচন্দ্র বড়াল ফেব্রুয়ারী ১৲ শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন ৪৲ অভয় চরণ মল্লিক মার্চ্চ ।৹ ছকুখানসামার লেনের ছাত্রগণ মার্চ্চ ।৹ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মার্চ্চ ।৹ শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারী দেবী মার্চ্চ ১৲ গৌরীশঙ্কর দে ফেব্রুয়ারী ।৹ মোট ৩৬৲

বার্ষিক চাঁদা।

ঈশ্বরচন্দ্র দিণ্ডা চণ্ডিভেটী ১৮৯৪।৯৫ সালের ২৲ ক্ষেত্রমোহন মাইতী বাজিয়া ১৩০১ সাল ৩৲ রাধাচরণ বরমহগোড়া ১৩০২ ৩৲ রাধাকৃষ্ণ মাইতি দহগোড়া ১৩০২ সনের ১২৲ মধ্যে ৫৲ কাশীনাথ শাসমাল চণ্ডিভেটী ৫৲ বিপিন বিহারী শাসমাল কাঁথী ৪৲ মোট ২২৲

এককালীন দান।

রাজনারায়ণ বসু ১৲ কুন্দ নন্দিনী গুপ্তা ২৲ আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় ১৲ সোনাতন দাস ১৲ নকুলেশ্বর গুহ ১৲ অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲ ভোলানাথ দাস ১৲ কালী চরণ বন্দো-পাধ্যায় ১৲ অক্ষয়কুমার মিত্র ২৲ মুন্সী সেখ হামিদার রহমান ২৲ শ্রীমতী শশিমুখী দেবী ১৲ গিরিবালা ঘোষ দ্বিতীয় পুত্রের জন্মোপলক্ষে ॥৹ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ৻১০ কাজি এবদুল্যা ।৹ শ্রীমতী জ্ঞানদা সুন্দরী দেবী ১৲ শ্রীমতী বসন্ত কুমারী সিংহ ১৲ চারুচন্দ্র গোস্বামী স্ত্রীর আরোগ্য উপলক্ষে ১৲ সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২৲ অনাথ বন্ধু সমিতি ১৲ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ২৲ রমেশচন্দ্র সেন ২৲ শ্যামাচরণ মিত্র ১০৲ ৫০নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ ৷/৹ নং ৬৩ হ্যারিসন রোড মেস ৵১৫ নং ২৪ রামকান্ত মিস্ত্রির লেন মেস ১৲ ১২৬নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস ।৹ নং ৮।১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন মেস্ ॥৹ ১৬নং মুসলমান পাড়া লেন মেস্ ৷৵৹ বিপিন বিহারী নন্দী ৵৹ বিপিন কৃষ্ণ বসু নাগপুর ৫৲ দামোদর দত্ত ২৲ শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী ॥৵৹ দিননাথ গাঙ্গুলী ২৲ রাজেন্দ্রলাল সিংহ ১৲ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ।৹ গঙ্গা নারায়ণ মিত্র ১৲ প্রাণ কুমার ঘোষ ২৲ হরিদাস পাল Esq ১৲ শ্রীনারায়ণ তেওয়ারী ।৹ শ্রীমোহন সিংহ ১৲ কামিনীকান্ত গুপ্ত ২৲ বিপিন বিহারী রায় ৫৲ কুঞ্জ বিহারী সেন পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ১৲ তারকনাথ মিত্র পুত্রের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে ২৲ হিরালাল মিত্র ১৲ বরদাকান্ত রায় ১৲ Deabating club First-year Finstitution ২৲ কুমুদিনী কান্ত বন্দোপাধ্যায় ২৲ কুমার বলভদ্র দেব ১৲ শ্রীমতী সুমতীবালা দেবী কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে ২৲ কুমারী মৃণালিনী কর ২৲ শ্রীমতী হেমন্তবালা গুহ ১৲ শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দত্ত ।৹ সত্য প্রসাদ দত্ত ৵৹ ভগবান ১৲ নিলমণী দে ৵৹ প্রসন্ন কমল সিংহ ২৲ কৈলাস চন্দ্র প্রধান ১৲ একজন ভদ্রলোক রামচরণের খরচের জন্য ২৲ নং৬৭ ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ ৷৵৫ নং২১৷১ পটুয়াটোলা লেন ।৹ ১৩৪ ওল্ড বৈঠকখানা মেস ৷৹ প্রবোধচন্দ্র দত্ত ।৹ সার রমেশচন্দ্র মিত্র ৪৲ A sympathiser ।৹ রাধাকান্ত দত্ত ।৹ a Friend of Dasasram ১৲ সন্তোশচন্দ্র সাহা ।৹ একজন বন্ধু খাওয়াইবার জন্য ১৲ আশুতোষ মল্লিকের ভিক্ষা প্রাপ্ত ১৲ ঐ পড়িয়া পাওয়া ।৹ বসন্ত বাবদ ফেরত গাড়ী ভাড়া মাঃ রামচন্দ্র মিত্র ২৲ A friend ১৲ শ্রীমতী চিন্তামনী দাসী চণ্ডিভেটী ৩৲ সুরেন্দ্রনাথ শাসমাল

চণ্ডিভেটী ২৲অভয় চরণ মাইতীর স্ত্রী ২৲ মাখনলাল ঘোষক ।০ অঘোরচাঁদ বন্দোপাধ্যায় ১৲ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ ১৵১০ রাজিব লোচন দাস ।০ দুঃখের অন্ত ।০ ক্ষুদ্র দান শিলং ১৲ অনৈক ব্রাহ্মণ ৶৫ বাক্সে প্রাপ্ত ১।১৭। ব্রজগোপাল বসু ।০ মোট ১১০৶২।০

বস্ত্রাদিদান।

বাবু বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী ধুতি ৩, মিরজাই ১, মোটা জামা ১, বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নূতন পঞ্জীকা ১, কম্বল ১, শিবপুর এনজিনিয়ারিং কলেজ আলোয়ান ১, সাট ৫, কোট ১, ধুতি ১।

জমা।

মাসিক চাঁদা ৩৬৲ বার্ষিক চাঁদা ২২৲ এককালীন দান ১১০৶২।০ দাসীর সাহায্য ২৬৲ ঘর ভাড়া আদায় ৪৲ প্রাপ্ত গচ্ছিত ২৫৲, পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় ৩৵০ কাগজ বিক্রয় ১৸৶০ শিশি বিক্রয় ৸৶০ পুস্তক বিক্রয় ১৵০ পূর্ব্ব মাসের স্থিত ২৭৶১০ নিত্য খরচের স্থিত ২৶১০ বাজে জমা ১৲। মোট ২৬০৸২।

খরচ।

সংসার খরচ ৪৯।৵৭।০, গিরিডি হইতে আসার বাকি শোধ ২৲, বিছানা খরিদ ৶০ ধোপা ১।০ দাহখরচ ১২।০, গাড়ী ভাড়া ৩৲১০, চাকর ৪৲, রাঁধুনী ১৷৶০ মেথর ৬।/১৫, দুগ্ধ ৮৶০, বাটী ভাড়া ৫৩৸/১৫ কর্ম্মচারী ৫১৸০ খাট খরিদ ২১৲ টাকার সুদ ১৲ খুচরা খরচের বাকী ১৶৫। মোট ২৪৫৸২।০

জমা খরচ।

মোট জমা ২৬০৸২।০, মোট খরচ ২৪৫৸২।০ মোট হস্তেস্থিত ১৫৲

জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ এই তিন মাসে দাসাশ্রম মেডিকেল হল দাসাশ্রমকে ১১২৵০ ঔষধ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

ভ্রমসংশোধন।

ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মেদিনীপুর না হইয়া শরৎচন্দ্র ঘোষ হইবে।